اشرف الهداية

আশরাফুল হিদায়া

বাংলা

৪

অনুবাদক

মাওলানা রফীকুল ইসলাম (কিশোরগঞ্জ)

মুহাদ্দিস, জামেয়া ইবরাহীম, সাইনবোর্ড, নারায়ণগঞ্জ

সম্পাদনায়

মাওলানা আহমদ মায়মূন

মুহাদ্দিস, জামেয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ, ঢাকা

পরিবেশক

ইসলামিয়া কুতুবখানা

৩০/৩২ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

https://e-ilm.weebly.com/

আশরাফুল হিদায়া

অনুবাদক ❖ মাওলানা রফীকুল ইসলাম (কিশোরগঞ্জ)
মুহাদ্দিস, জামেয়া ইবরাহীম, সাইনবোর্ড, নারায়ণগঞ্জ

সম্পাদনায় ❖ মাওলানা আহমদ মায়মূন
মুহাদ্দিস, জামেয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ, ঢাকা

প্রকাশক ❖ মাওলানা মুহাম্মদ মুস্তফা
[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]
শব্দবিন্যাস ❖ ইসলামিয়া কমপিউটার হোম
প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণে ❖ ইসলামিয়া অফসেট প্রেস
প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১১০০

হাদিয়া ❖ ৬৫০.০০ [ছয়শত পঞ্চাশ টাকা মাত্র]

https://e-ilm.weebly.com/

ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى اله وأصحابه أجمعين - اما بعد :

ফিকহে হানাফীতে হিদায়া গ্রন্থখানির গুরুত্ব অপরিসীম। এ গুরুত্বের বিবেচনায়ই গ্রন্থখানি শত শত বছর ধরে প্রাতিষ্ঠানিক পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে এবং সোয়া আটশ' বছরের অধিককাল যাবৎ এটি ফিকহশাস্ত্রের অতি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হিসেবে সারা বিশ্বে পঠিত হয়ে আসছে। পৃথিবীর প্রায় সকল সমৃদ্ধ ভাষায় এর অনুবাদ ও ভাষ্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। খোদ আরবি ভাষায় গ্রন্থখানির ভাষ্য প্রণীত হয়েছে সবচেয়ে বেশি; প্রায় অর্ধ শতকের মতো। বাংলা ভাষায় ইতঃপূর্বে বিভিন্ন প্রকাশনা থেকে এর আংশিক অনুবাদ এবং ভাষ্যগ্রন্থ প্রকাশিত হলেও সুখের কথা যে, এটি পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকেও প্রকাশিত হয়েছে কিছুদিন পূর্বে। অবশ্য শুধু অনুবাদের সাহায্যে হিদায়ার মতো গ্রন্থ ভালোভাবে বোঝা বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার, তাই এর একখানা নির্ভরযোগ্য ও পূর্ণাঙ্গ বাংলা ভাষ্যগ্রন্থের প্রয়োজন তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছিল দীর্ঘদিন থেকে, যা এখনো পর্যন্ত পূরণ হয়নি। উর্দু ভাষায়ও 'আইনুল হিদায়া' নামে এর একখানা সংক্ষিপ্ত কিন্তু পূর্ণাঙ্গ এবং 'আশরাফুল হিদায়া' নামে একখানা সবিশদ অপূর্ণাঙ্গ ভাষ্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়ে বেশ সমাদৃত হয়েছে।

ইসলামিয়া কুতুবখানার স্বত্বাধিকারী আলহাজ্জ মাওলানা মোহাম্মদ মোস্তফা সাহেব একজন বড় ও সাহসী হৃদয়ের মানুষ। তিনি বিশাল সাহস নিয়ে হিদায়ার একখানা পূর্ণাঙ্গ ভাষ্যগ্রন্থ প্রস্তুত করা ও প্রকাশ করার লক্ষ্যে উর্দু ভাষ্যগ্রন্থ আশরাফুল হিদায়ার অনুবাদ প্রকাশ করার ইচ্ছা করেন এবং মরহুম হযরত মাওলানা ইসহাক ফরিদী (র.)-এর তত্ত্বাবধান ও সম্পাদনায় উর্দু আশরাফুল হিদায়ার অনুবাদ প্রকাশের কাজে হাত দেন। ইতঃমধ্যে হিদায়া আউয়ালাইনের তিন খণ্ডের অনুবাদ প্রকাশিত ও সমাদৃত হয়েছে। হিদায়া আখেরাইনের ভাষ্যগ্রন্থ হিসেবে আমার তত্ত্বাবধান ও সম্পাদনায় উর্দু আশরাফুল হিদায়ার অনুবাদ প্রকাশ করার ইচ্ছা ব্যক্ত করলে আমি তাঁকে আখেরাইনের জন্য উর্দু আশরাফুল হিদায়া'র অনুবাদ না করে হিদায়ার প্রধান আরবি ভাষ্যগ্রন্থ 'ফাতহুল কাদীর' ও 'আল-বিনায়া' সামনে রেখে প্রয়োজনবোধে উর্দু আশরাফুল হিদায়া থেকে সাহায্য নিয়ে একখানা মৌলিক ভাষ্যগ্রন্থ প্রস্তুত করানোর পরামর্শ দেই। সে মোতাবেক তিনি আমাকে ফাতহুল কাদীর, আল-বিনায়া ও উর্দু আশরাফুল হিদায়া– এ তিনটি গ্রন্থের প্রয়োজনীয় অংশ সরবরাহ করেন। আমি গ্রন্থখানির একটি মৌলিক ভাষ্য প্রণয়নের কিছু মূলনীতি তৈরি করি এবং এ কাজের জন্য আমার অত্যন্ত স্নেহভাজন ও এক সময়কার মেধাবী ছাত্র, যাঁরা বর্তমানে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শীর্ষস্থানীয় শিক্ষক ও মুহাদ্দিস পদে কর্মরত আছেন, তাঁদেরকে মনোনীত করে তাঁদের উপর এ দায়িত্ব ন্যস্ত করি। তাঁরা হলেন, মাওলানা অছিউর রহমান, মুহাদ্দিস, জামেয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ, ঢাকা; মাওলানা আবূ বকর, মুহাদ্দিস, দারুল উলূম টঙ্গী, গাজীপুর; মাওলানা মুফতী ফয়জুল্লাহ, মুহাদ্দিস, জামিয়া ইসলামিয়া মিফতাহুল উলূম, মধ্যবাড্ডা, ঢাকা এবং মাওলানা বশীরুল্লাহ, মুহাদ্দিস, জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া, গুলশান, ঢাকা।

তাঁরা অত্যন্ত পরিশ্রম করে উপরিউক্ত তিনটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ সামনে রেখে হিদায়ার একখান সহজবোধ্য, সাবলীল ও নির্ভরযোগ্য মৌলিক বাংলা ভাষ্যগ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন এবং আমি গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত দেখে পরিমার্জনা ও সম্পাদনা করে দিয়েছি। সুতরাং হিদায়া আউয়ালাইনের ভাষ্যগ্রন্থ 'আশরাফুল হিদায়া বাংলা সংস্করণ' উর্দু আশরাফুল হিদায়ার অনুবাদ হলেও আখেরাইনের ভাষ্য অংশটি উর্দু আশরাফুল হিদায়ার অনুবাদ নয়; বরং এটি হিদায়া আখেরাইনের একখানা স্বতন্ত্র ও মৌলিক ভাষ্যগ্রন্থ।

https://e-ilm.weebly.com/

এটি একটি স্বতন্ত্র ও মৌলিক ভাষ্যগ্রন্থ হওয়া সত্ত্বেও একে 'আশরাফুল হিদায়া' নামকরণের ব্যাপারে আমার একটুখানি কৈফিয়ত আছে। একটি স্বতন্ত্র ভাষ্যগ্রন্থ হিসেবে এর আশরাফুল হিদায়া নামকরণের আমার জোর আপত্তি ছিল, কিন্তু জনাব প্রকাশক মহোদয়ের আবদার ছিল 'আশরাফুল হিদায়া' নামটি ধরে রাখার। কারণ তিনি ইতঃপূর্বে 'আশরাফুল হিদায়া' নামক ভাষ্যগ্রন্থ প্রকাশের ঘোষণা দিয়েছিলেন এবং এ নামে আউয়ালাইনের ব্যাখ্যাগ্রন্থ উর্দু আশরাফুল হিদায়া'র তিন খণ্ডের অনুবাদ প্রকাশও করে ফেলেছেন। তাই তাঁর আবদার রক্ষার্থে 'আশরাফুল হিদায়া' নামকরণের সম্মত হই। অবশ্য এর পক্ষে একটি যুক্তিও পেয়ে যাই যে, কখনো দেখা যায়, দুজন পৃথক পিতার দু সন্তানের নাম একই হয়ে থাকে, তাই বলে দু সন্তান তো আর এক হয়ে যায় না। পূর্ববর্তীদের রচনাবলিতেও আমরা এরূপ দেখতে পাই যে, একই নামে পৃথক দুই বা ততোধিক লেখক পৃথক পৃথক গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। এর বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। তাই 'আশরাফুল হিদায়া' নামকরণকে অনুচিত বলা যায় না। অন্যের রাখা কোনো একটি নাম কারও পছন্দ হলে সে নামটি তো অন্য কেউ ধার করেও নিতে পারে। সমাজের অনেকে এমন তো নেয়ও। এতে তেমন অসুবিধার তো কিছু নেই।

হিদায়া গ্রন্থখানি এমনিতেই একটি সমুদ্র। তার একটি মৌলিক ভাষ্যগ্রন্থ তৈরি করা কত বড় কঠিন কাজ তা সহজেই অনুমেয়। এজন্য লেখকবৃন্দ, সম্পাদক, প্রকাশকসহ সংশ্লিষ্ট সকলেরই অটুট ধৈর্য, নিরলস শ্রম ও পর্যাপ্ত সময় এবং সর্বোপরি আল্লাহ তা'আলার তৌফিকপ্রাপ্তির বড় প্রয়োজন ছিল। আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিজ অনুগ্রহে সব কিছু সহজ করে দিয়েছেন। এজন্য সকল প্রশংসা তাঁরই।

হে মহান করুণাময় আল্লাহ! আমাদের সবাইকে এবং সকল মানুষকে সকল নেক কাজে ইখলাস দান করুন। বিশেষ করে এ বিশাল কাজটির রচনা, সম্পাদনা, মুদ্রণ, প্রুফ সংশোধন ইত্যাদির সাথে যারা জড়িত ছিলেন এবং আছেন, তাদের সবার শ্রমটুকু কেবল দুনিয়ার জন্য না বানিয়ে আপনার প্রিয় দীনের উপকারার্থে কাজে লাগিয়ে সকলের পরকালের নাজাতের অসিলা বানিয়ে দিন এবং আমাদের সবাইকে এর জাযায়ে খায়ের দান করুন। হে আল্লাহ! পরকালের পুরস্কারপ্রাপ্তিই বড় প্রাপ্তি। আমাদের শ্রম-সুনাম সবটুকু আপনার জন্য কবুল করে নিন। আপনি আমাদের কাউকে পরকালের প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত করবেন না। আমরা সবাই আপনার অনুগ্রহের ভিখারি। আপনি একমাত্র দয়ালু দাতা।

আরজগুজার

মাওলানা আহমদ মায়মূন
মুহাদ্দিস, জামেয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ, ঢাকা।

https://e-ilm.weebly.com/

সূচিপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
كِتَابُ الْاَيْمَانِ	**অধ্যায় : কসম**	০৯
بَابُ مَا يَكُوْنُ يَمِيْنًا وَمَا لَايَكُوْنُ يَمِيْنًا	**পরিচ্ছেদ** : কোন বাক্য কসমরূপে বিবেচ্য আর কোন বাক্য কসমরূপে বিবেচ্য নয়	১৫
فَصْلٌ فِي الْكَفَّارَةِ	**অনুচ্ছেদ** : কাফফারা প্রসঙ্গে	২৩
بَابُ الْيَمِيْنِ فِى الدُّخُوْلِ وَالسُّكْنٰى	**পরিচ্ছেদ** : প্রবেশ এবং বসবাস বিষয়ক কসম	৩১
بَابُ الْيَمِيْنِ فِىْ الْخُرُوْجِ وَالْاِتْيَانِ وَالرُّكُوْبِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ	**পরিচ্ছেদ** : বের হওয়া, অথবা আরোহণ করা ইত্যাদি সংক্রান্ত কসম	৪০
بَابُ الْيَمِيْنِ فِى الْاَكْلِ وَ الشُّرْبِ	**পরিচ্ছেদ** : পানাহার সংক্রান্ত কসম	৪৫
بَابُ الْيَمِيْنِ فِى الْكَلَامِ	**পরিচ্ছেদ** : কথোপকথনের মধ্যে শপথ করা	৫৯
بَابُ الْيَمِيْنِ فِىْ الْعِتْقِ وَالطَّلَاقِ	**পরিচ্ছেদ** : মুক্তি দান ও তালাক সম্পর্কিত কসম	৭৪
بَابُ الْيَمِيْنِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالتَّزَوُّجِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ	**পরিচ্ছেদ** : ক্রয় বিক্রয়, বিবাহ ও অন্যান্য বিষয়ের কসম	৮৪
بَابُ الْيَمِيْنِ فِي الْحَجِّ وَالصَّلٰوةِ وَالصَّوْمِ	**পরিচ্ছেদ** : হজ, নামাজ ও রোজা ইত্যাদির কসম প্রসঙ্গ	৯৪
بَابُ الْيَمِيْنِ فِيْ لُبْسِ الثِّيَابِ وَالْحُلِيِّ وَغَيْرِ ذٰلِكَ	**পরিচ্ছেদ** : বস্ত্র বা অলংকার পরিধান ও অন্যান্য বিষয়ের কসম	১০০
بَابُ الْيَمِيْنِ فِىْ الْقَتْلِ وَالضَّرْبِ وَغَيْرِهٖ	**পরিচ্ছেদ** : হত্যা করা,প্রহার করা ইত্যাদি সম্পর্কিত কসম প্রসঙ্গ	১০৪
بَابُ الْيَمِيْنِ فِىْ تَقَاضِىْ الدَّرَاهِمِ	**পরিচ্ছেদ** : দিরহাম পরিশোধ করা সম্পর্কে কসম খাওয়া	১০৮
مَسَائِلُ مُتَفَرِّقَةٌ	**বিবিধ মাস'আলা**	১১২

https://e-ilm.weebly.com/

كتاب الحدود **অধ্যায় : হুদূদ (শাস্তি)**			১১৯
فصل في كيفية الحد واقامته	অনুচ্ছেদ	: হদ্দ ও তা প্রতিষ্ঠা করার বিবরণ	১২৬
باب الوطي الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه	পরিচ্ছেদ	: যে সঙ্গম হদ্দ ওয়াজিব করে এবং যেটি করে না	১৪০
فصل في كيفية الحد واقامته	অনুচ্ছেদ	: হদ্দ ও তা প্রতিষ্ঠা করার বিবরণ	১২৬
باب الوطي الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه	পরিচ্ছেদ	: যে সঙ্গম হদ্দ ওয়াজিব করে এবং যেটি করে না	১৪০
بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الزِّنَاءِ وَالرُّجُوْعِ عَنْهَا	পরিচ্ছেদ	: জেনা সম্পর্কে সাক্ষ্য এবং তা প্রত্যাহার	১৫৭
بَابُ حَدُّ الشُّرْبِ	পরিচ্ছেদ	: মদ্যপানের হদ্দ (শাস্তি)	১৮২
بَابُ حَدُّ الْقَذْفِ	পরিচ্ছেদ	: অপবাদের হদ্দ	১৯২
فَصْلٌ فِى التَّعْزِيْرِ	অনুচ্ছেদ	: সাধারণ শাস্তির বিধান	২২২
كِتَابُ السَّرِقَةِ **অধ্যায় : চুরি**			২২৯
بَابُ مَا يُقْطَعُ فِيْهِ وَمَالَا يُقْطَعُ	পরিচ্ছেদ	: যে বিষয়ে কর্তন হবে আর যে বিষয়ে কর্তন হবে না	২৩৯
فَصْلٌ فِي الْحِرْزِ وَالْاَخْذِ مِنْهُ	পরিচ্ছেদ	: সংরক্ষিত (বস্তু) ও তা নিয়ে যাওয়া প্রসঙ্গে	২৬২
فَصْلٌ فِىْ كَيْفِيَةِ الْقَطْعِ وَاِثْبَاتِه	অনুচ্ছেদ	: হস্তকর্তন ও তার সাব্যস্তের পদ্ধতি সম্পর্কে	২৮৩
بَابُ مَا يُحْدِثُ السَّارِقُ فِي السَّرِقَةِ	পরিচ্ছেদ	: চুরিকৃত মালের পরিবর্তন সাধন	৩১৮
بَابُ قَطْعِ الطَّرِيْقِ	পরিচ্ছেদ	: রাহাজানি সম্পর্কে	৩২৬
كِتَابُ السِّيَرِ **অধ্যায় : জিহাদ**			৩৪৩
بَابُ كَيْفِيَةِ الْقِتَالِ	পরিচ্ছেদ	: জিহাদ ও লড়াইয়ের পদ্ধতি	৩৫০
بَابُ الْمُوَادَعَةِ وَمَنْ يَجُوْزُ اَمَانُهُ	পরিচ্ছেদ	: সন্ধিস্থাপন ও যাকে নিরাপত্তা দেওয়া যায়	৩৬১
بَابُ الْغَنَائِمِ وَقِسْمَتِهَا	পরিচ্ছেদ	: গনিমতের মাল ও তার বণ্টন	৩৭২

https://e-ilm.weebly.com/

فَصْلٌ فِي كَيْفِيَّةِ الْقِسْمَةِ	**অনুচ্ছেদ** : গনিমতের মাল বণ্টন পদ্ধতি	৩৯৯
فَصْلٌ فِي التَّنْفِيْلِ	**অনুচ্ছেদ** : নফল বা হিস্সার অতিরিক্ত প্রদান	৪১৬
بَابُ اسْتِيْلَاءِ الْكُفَّارِ	**পরিচ্ছেদ** : কাফেরদের দখল ও আধিপত্য বিস্তার	৪২২
بَابُ الْمُسْتَأْمِنِ	**পরিচ্ছেদ** : নিরাপত্তা অর্জনকারী ব্যক্তি	৪৩৭
بَابُ الْعُشْرِ وَالْخَرَاجِ	**পরিচ্ছেদ** : উশর ও খারাজ প্রসঙ্গে	৪৫৯
بَابُ الْجِزْيَةِ	**পরিচ্ছেদ** : জিজিয়া প্রসঙ্গ	৪৭৫
بَابُ احْكَامِ الْمُرْتَدِّيْنَ	**পরিচ্ছেদ** : মুরতাদদের বিধানসমূহ	৫০৫
بَابُ الْبُغَاةِ	**পরিচ্ছেদ** : বিদ্রোহী দল প্রসঙ্গ	৫৪৩

كِتَابُ اللَّقِيطِ
অধ্যায় : কুড়িয়ে পাওয়া শিশু — ৫৬০

كِتَابُ اللُّقْطَةِ
অধ্যায় : লোকতা বা কুড়ানো বস্তু প্রসঙ্গে — ৫৬৯

كِتَابُ الْإِبَاقِ
অধ্যায় : দাস-দাসীর পলায়ন — ৫৯০

كِتَابُ الْمَفْقُوْدِ
অধ্যায় : নিখোঁজ ব্যক্তি প্রসঙ্গ — ৬০০

كِتَابُ الشِّرْكَةِ
অধ্যায় : অংশীদারিত্ব — ৬১৩

كِتَابُ الْوَقْفِ
অধ্যায় : ওয়াক্ফ — ৬৭৫

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْاَيْمَانِ

অধ্যায় : কসম

শুরুর কথা : জেনে রাখা উচিত যে, حَلَفَ এর অর্থ হচ্ছে কসম বা শপথ করা। আর শপথকারী ব্যক্তিকে (حَالِف) হালেফ বলে, আর যে বিষয়ের উপর শপথ করা হয় তাকে বলে مَحْلُوْف عَلَيْه যে বিষয়ের ব্যাপারে শপথ করা হয় তা যদি পালন করা হয় তখন কাফফারা আবশ্যক হয়ে যায়। যেমন কোনো ব্যক্তি বলল, আল্লাহর নামে কসম করে বলছি যে, আমি এই বস্তুটা খাব না। এ কথা বলার পর সে যদি এ বস্তুটা খায় তাহলে তার উপর কাফফারা আবশ্যক হয়ে যাবে। ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন, এটাও কসমের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। অথবা কেউ বলল, আমি যদি এই বস্তুটা খাই তাহলে আমার গোলাম আজাদ। অতঃপর ঐ বস্তুটা খেলে তার গোলাম আজাদ হয়ে যাবে।

শব্দবিশ্লেষণ : اَيْمَانٌ শব্দটি يَمِيْن এর বহুবচন -এর অর্থ হলো কসম করা, শপথ করা। আর পরিভাষায় يَمِيْن বলা হয় : عَقْدٌ قَوِى بِه عَزْمُ الْحَالِفِ عَلَى الْفِعْلِ اَوِ التَّرْكِ অর্থাৎ শপথকারীর সংকল্পকে দৃঢ় করে এমন প্রতিশ্রুতিকে ইয়ামীন বলা হয়।

কাওয়াইদুল ফিকহ গ্রন্থে এর সংজ্ঞা এভাবে দেওয়া হয় যে, تَقْوِيَةُ اَحَد طَرْفَى الْخَبرِ بِذِكْرِ اللهِ تَعَالَى اِذ التَّعْلِيْقُ অর্থাৎ কোনো বিষয়ের সংবাদের দুই দিকের এক দিককে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে দৃঢ় করা, কিংবা অন্য বিষয়ের উপর নির্ভর করে দৃঢ় করাকে ইয়ামীন বলা হয়, حِنْث শব্দের অর্থ হচ্ছে শপথ ভেঙ্গে ফেলা। حَانِثٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে শপথ ভঙ্গকারী।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ الْاَيْمَانُ عَلٰى ثَلَاثَةِ اَضْرُبٍ اَلْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ وَيَمِيْنٌ مُنْعَقِدَةٌ، وَيَمِيْنُ لَغْوٍ. فَالْغَمُوْسُ هُوَ الْحَلْفُ عَلٰى اَمْرٍ مَاضٍ يَتَعَمَّدُ الْكَذِبَ فِيْهِ، فَهٰذِهِ الْيَمِيْنُ يَأْثَمُ فِيْهَا صَاحِبُهَا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿مَنْ حَلَفَ كَاذِبًا اَدْخَلَهُ اللّٰهُ النَّارَ﴾ وَلَا كَفَّارَةَ فِيْهَا اِلَّا التَّوْبَةَ وَالِاسْتِغْفَارَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ : فِيْهَا الْكَفَّارَةُ لِاَنَّهَا شُرِعَتْ لِرَفْعِ ذَنْبٍ هَتَكَ حُرْمَةَ اسْمِ اللّٰهِ تَعَالٰى، وَقَدْ تَحَقَّقَ بِالِاسْتِشْهَادِ بِاللّٰهِ كَاذِبًا فَاَشْبَهَ الْمَعْقُوْدَةَ . وَلَنَا اَنَّهَا كَبِيْرَةٌ مَحْضَةٌ، وَالْكَفَّارَةُ عِبَادَةٌ تَتَاَدّٰى بِالصَّوْمِ، وَيُشْتَرَطُ فِيْهَا النِّيَّةُ فَلَا تُنَاطُ بِهَا، بِخِلَافِ الْمَعْقُوْدَةِ لِاَنَّهَا مُبَاحَةٌ، وَلَوْ كَانَ فِيْهَا ذَنْبٌ فَهُوَ مُتَاَخِّرٌ مُتَعَلِّقٌ بِاخْتِيَارٍ مُبْتَدَاٍ، وَمَا فِي الْغَمُوْسِ مُلَازِمٌ فَيَمْتَنِعُ الْاِلْحَاقُ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কসম (শপথ) তিন প্রকার- **يَمِيْنُ الْغَمُوْسُ (ইয়ামীনে গুমূস) মিথ্যা শপথ يَمِيْنٌ مُنْعَقِدَةٌ** (ইয়ামীনে মুন'আকিদাহ) **ইচ্ছাকৃত শপথ يَمِيْنُ لَغْوٍ** (ইয়ামীনে লাগব)। **ইয়ামীনে গুমূস অর্থ** অতীতের **কোনো বিষয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা শপথ করা। এ ধরনের শপথকারী গুনাহগার হবে।** কেননা নবী করীম ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা কসম করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। **এ ধরনের কসমের ক্ষেত্রে কোনো কাফফারা নেই। তবে তওবা ইস্তিগফার করা আবশ্যক।**

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, এ ক্ষেত্রেও কাফফারা রয়েছে। কেননা শরিয়তে কাফফরার বিধান এসছে আল্লাহর নামের মর্যাদা লঙ্ঘনের পাপ মোচনের জন্য। আর মিথ্যাভাবে আল্লাহকে সাক্ষীরূপে পেশ করার মাধ্যমে এ পাপ সাব্যস্ত হয়েছে । সুতরাং তা ইয়ামীনে মা'কূদাহ (মুন'আকিদা) সদৃশ হলো। আমাদের দলিল এই যে, উপরিউক্ত কসম হচ্ছে সর্বোতভাবে একটি কবীরা গুনাহ। পক্ষান্তরে কাফফারা হচ্ছে একটি ইবাদত, যা রোজা দ্বারা আদায় করা হয় এবং তাতে নিয়তের শর্ত রয়েছে। সুতরাং কবিরা গুনাহের সাথে এটা সম্পৃক্ত হতে পারে না। ইয়ামীনে মা'কূদাহ এর ব্যতিক্রম। কেননা তা শরিয়ত অনুমোদিত বিষয়। আর তাতে যদি কোনো পাপ হয়ে যায় তাহলে তা পরবর্তী পর্যায়ে (শপথ ভঙ্গের কারণে) যার সম্পর্ক হচ্ছে নতুন একটি ইচ্ছা প্রয়োগের সাথে। আর ইয়ামীনে গুমূসের ক্ষেত্রে গুনাহ হচ্ছে তার সঙ্গে জড়িত। সুতরাং এর সাথে তার সম্পৃক্ততা সম্ভবপর নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ইয়ামীন তিন প্রকার। যথা- ১. গুমূস, ২. মুন'আকিদাহ, ৩. লাগবি, গুমূস বলা হয় অতীত কালের কোনো বিষয়ের উপর মিথ্যা শপথ করাকে। যে ব্যক্তি এ ধরনের কসম করবে সে গুনাহগার হবে। অর্থাৎ এ ধরনের কসম করা কবিরা গুনাহ। কেননা হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে, যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথ করবে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে অর্থাৎ সহীহ ইবনে হিব্বানে পুরো হাদীসটি এভাবে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন। মিথ্যা শপথ করে অন্যায়ভাবে যদি অন্যের সম্পদ দখল করে তাহলে আল্লাহ তা'আলা তার উপর জান্নাত হারাম করে দিবেন। আর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। আর সহীহাইন তথা বুখারী ও মুসিলমে বর্ণিত রয়েছে যে, সেই ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, আল্লাহ তা'আলা তার উপর রাগান্বিত।

https://e-ilm.weebly.com/

وَلَا كَفَّارَةَ فِيهَا إِلَّا التَّوْبَةَ : ইয়ামীনে গুমূস -এর ক্ষেত্রে তওবা ও ইস্তিগফার ব্যতীত অন্য কিছু আবশ্যক হয় না। বিধায় কাফফারাও আবশ্যক হবে না।

ফায়দা : এ ধরনের কসম করাটা এমন কোনো গুনাহ নয় যা কাফফারা দ্বারা মাফ হয়ে যায়। বরং তা হলো কবিরা গুনাহ যা তওবা ও ইস্তিগফার ব্যতীত মাফ হবে না। বুখারী শরীফে বর্ণিত রয়েছে, রাসূল ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলার সাথে অন্য কাউকে শরিক করা, পিতা মাতার অবাধ্যতা করা এবং ইয়ামীনে গুমূস করা কবিরা গুনাহসমূহের অন্তর্ভুক্ত। বিধায় এই হাদীস দ্বারা বুঝা যায় কাফফার দ্বারা তা মাফ হবে না। ইমাম মালেক (র.) ইমাম আহামদ ইবনে হাম্বল (র.) এবং জমহুর ওলামায়ে কেরাম উক্ত মতামতই প্রকাশ করেছেন।

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رحـ) فِيهَا الْكَفَّارَةُ لِأَنَّهَا شُرِعَتْ الخ : পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, ইয়ামীনে গুমূসের ক্ষেত্রে ও ইয়ামীনে মুন'আকিদার ন্যায় কাফফারা আবশ্যক হবে। কেননা শরিয়তে কাফফারাকে আবশ্যক করেছে আল্লাহ তা'আলার নামের অবমাননা দূর করার জন্য। আর ইয়ামীনে গুমূসের ক্ষেত্রেও আল্লাহর নামের অবমাননার গুনাহ রয়েছে। কেননা সে মিথ্যা এবং অন্যায় ভাবে আল্লাহ তা'আলার নামের সাক্ষী প্রদান করেছে। সুতরাং তা মুন'আকিদার ন্যায় হয়ে গেল।

আর আমাদের প্রমাণ হলো : ইয়ামীনে গুমূস একটি কবিরা গুনাহ। আর কাফফারা হলো একটি ইবাদত, যা রোজা রাখার মাধ্যমেও নিয়ত করে আদায় করা হয়। সুতরাং গুনাহের কাজটি কি করে ইবাদত আবশ্যক হওয়ার মাধ্যম ও কারণ হবে? এটা আমাদের বোধগম্য নয়। পক্ষান্তরে ইয়ামীনে মুন'আকিদাহ হলো একটি মুবাহ- বৈধ বিষয়। আর তাতেও গুনাহের আনজাম রয়েছে, তবে তা হলো কসম অনুপাতে আমল না করলে বা তা বহাল না রাখলে। নতুন ইচ্ছায় ঐ কসম ভেঙ্গে ফেললে গুনাহ হয়। কিন্তু ইয়ামীনে গুমূসের ক্ষেত্রে গুনাহ শুরু থেকেই জড়িত রয়েছে।

ফায়দা : ইয়ামীনে মুন'আকিদাহ ভবিষ্যতে কোনো কাজ করা বা না করার উপর হয়ে থাকে। সুতরাং বর্তমানে এমন শপথ করতে কোনো গুনাহই নেই। বরং ভবিষ্যতে তার ঐ প্রতিজ্ঞা ও শপথ মোতাবিক যদি কাজ না করে তার উল্টোটা করে তাহলে সে গুনাহগার হবে। কাফফারা দ্বারা এই গুনাহ দূরীভূত হয়ে যাবে। কেননা আল্লাহ ত'আলা ইরশাদ করেছেন- إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ - নিঃসন্দেহে নেক কাজ গুনাহকে মিটিয়ে দেয়। এবং হাদীস শরীফেও তার ব্যাখ্যা বিদ্যমান রয়েছে।

পক্ষান্তরে ইয়ামীনে মুন'আকিদার ক্ষেত্রে বুঝে শুনেই অন্যায় মূলক কসম করেছে। সুতরাং এটাকে অন্যের সাথে সম্পর্ক যুক্ত করা যাবে না। বরং আল্লাহ তা'লার নিকট একাগ্রতার সাথে তওবা ও ইস্তিগফার করবে। ফতোয়ার কিতাবে রয়েছে কেউ যদি বর্তমান কালেও ইচ্ছাকৃত এ ধরনের কসম করে তাহলেও তা গুমূসের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। -[মাবসূতুস সারাখসি]

আর কেউ যদি এভাবে বলে যে, যদি বিষয়টি এমন না হয় তাহলে তার স্ত্রী তালাক অথবা তার গোলাম আজাদ, অথচ সে জেনে শুনে এই মিথ্যা কথাটি বলেছে। তাহলে তা গুমূস হবে না। আবার লাগবও হবে না। এমন কি যদি তার বিপরীত জানে অথবা না জানে উভয় অবস্থায় তার স্ত্রী তালাক বা গোলাম আজাদ হয়ে যাবে। -[ইজাহ]

আর যদি কেউ এমন বলে যে, আল্লাহর কসম করে বলছি এমন হয়েছে অথচ বাস্তবে তা সেরকম হয়নি। কিন্তু শপথকারী তার বক্তব্যের ব্যাপারে সন্দিহান ছিল না অর্থাৎ সে তার জানা হিসাবে বলেছিল ইচ্ছাকৃত মিথ্যা বলেনি, তাহলে এটা গুমূসের অন্তর্ভুক্ত হবে না। আর যদি কোনো ব্যক্তি বলে যে, এটা যদি অমুক ব্যক্তি না হয় তাহলে আমার উপর হজ আবশ্যক। এ কথার ব্যাপারে তার কোনো সন্দেহ ছিল না। অথচ বাস্তবে লোকটি অমুক ছিল না। তাহলে শপথকারীর উপর হজ ওয়াজিব হয়ে যাবে। -[খুলাসা]

https://e-ilm.weebly.com/

وَالْمُنْعَقِدَةُ مَا يَحْلِفُ عَلٰى اَمْرٍ فِي الْمُسْتَقْبَلِ اَنْ يَفْعَلَهُ اَوْ لَا يَفْعَلَهُ وَاِذَا حَنِثَ فِي ذٰلِكَ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ﴾ وَهُوَ مَا ذَكَرْنَا وَالْيَمِيْنُ اللَّغْوُ اَنْ يَحْلِفَ عَلٰى اَمْرٍ مَاضٍ وَهُوَ يَظُنُّ اَنَّهُ كَمَا قَالَ وَالْاَمْرُ بِخِلَافِهٖ فَهٰذِهِ الْيَمِيْنُ نَرْجُوْ اَنْ لَا يُؤَاخِذَ اللّٰهُ بِهٖ صَاحِبَهَا وَمِنَ اللَّغْوِ اَنْ يَقُوْلَ : وَاللّٰهِ اِنَّهُ لَزَيْدٌ وَهُوَ يَظُنُّهُ زَيْدًا وَاِنَّمَا هُوَ عَمْرٌو، وَالْاَصْلُ فِيْهِ قَوْلُهُ تَعَالٰى ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ﴾ الْاٰيَةَ، اِلَّا اَنَّهُ عَلَّقَهُ بِالرَّجَاءِ لِلْاِخْتِلَافِ فِي تَفْسِيْرِهٖ قَالَ وَالْقَاصِدُ فِي الْيَمِيْنِ وَالْمُكْرَهُ وَالنَّاسِيْ سَوَاءٌ حَتّٰى تَجِبُ الْكَفَّارَةُ لِقَوْلِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ : النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالْيَمِيْنُ﴾ وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللّٰهُ يُخَالِفُنَا فِيْ ذٰلِكَ، وَسَنُبَيِّنُ فِي الْاِكْرَاهِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى ـ

অনুবাদ : আর ইয়ামীনে মুন'আকিদাহ (ইচ্ছাকৃত শপথ) অর্থ ভবিষ্যতে কোনো কাজ করবে বা এ মর্মে কসম করা। যদিও এ ক্ষেত্রে শপথ ভঙ্গ করে তাহলে তার উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِي اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ অর্থাৎ তোমাদের লাগব (নিরর্থক) শপথের ব্যাপারে আল্লাহ তোমাদের পাকড়াও করবেন না, তবে যে শপথ তোমরা ইচ্ছাকৃতভাবে করেছ সে বিষয়ে তোমাদের পাকড়াও করবেন। এখানে আয়াতের উদ্দেশ্য হলো আমরা যা বলেছি। **আর ইয়ামীনে লাগব অর্থ অতীতের কোনো বিষয়ে কসম করা এ ধারণায় যে, বিষয়টি তেমনই যেমন সে বলেছে, অথচ বাস্তবে বিষয়টি তার বিপরীত। এই শপথ সম্পর্কে আমরা আশা করি যে আল্লাহ তা'আলা শপথকারীকে পাকড়াও করবেন না। লাগব শপথের আরেকটি সুরত এই যে, কেউ বলল আল্লাহর কসম সে যায়েদ। আর সে তাকে যায়েদই ভেবেছে অথচ বাস্তবে সে আমর।** লাগব শপথ সম্পর্কে মূল হচ্ছে- لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْ اَيْمَانِكُمْ আয়াতটি। তবে লাগব শপথের ব্যাখ্যায় মতপার্থক্য থাকার কারণে ইমাম মুহাম্মদ (র.) বিষয়টিকে আশাবাদের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন।

কুদূরী প্রণেতা বলেন, **কসমের ব্যাপারে স্বেচ্ছায় জোর জবরদস্তিতে কসমকারী এবং ভুলে যাওয়া অবস্থায় কসমকারী সমান।** সুতরাং সবার ক্ষেত্রে কাফফারা ওয়াজিব হবে। কেননা নবী করীম ﷺ বলেছেন- ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ : النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالْيَمِيْنُ অর্থাৎ তিনটি বিষয় এমন যে, তাদের নিশ্চিতটিও নিশ্চিতই এবং তাদের উপহাসটিও নিশ্চিত রূপে গণ্য: বিবাহ, তালাক, ও শপথ। ইমাম শাফেয়ী (র.) এ বিষয়ে আমাদের সাথে ভিন্নমত পোষণ করেন। ইনশাআল্লাহ "বল প্রয়োগ" অধ্যায়ে তা আমরা বর্ণনা করব।

https://e-ilm.weebly.com/

وَمَنْ فعل الْمحْلُوْف عَلَيْهِ مُكْرَهًا اَوْ نَاسِيًا فَهُو سَوَاءٌ؛ لِاَنَّ الْفِعْلَ الْحَقِيْقِيَّ لَا يَنْعَدِمُ بِالْاِكْرَاهِ وَهُو الشَّرْطُ. وَكَذَا اِذَا فَعَلَهُ وَهُوَ مغْمِيٌّ عَلَيْهِ اَوْ مَجْنُوْنٌ لِتَحَقُّقِ الشَّرْطِ حَقِيْقَةً. وَلَوْ كَانَتْ الْحِكْمَةُ رَفْع الذَّنْبِ فَالْحُكْمُ يُدَارُ عَلٰى دَلِيْلِهٖ وَهُوَ الْحِنْثُ لَا عَلٰى حَقِيْقَةِ الذَّنْبِ ـ

অনুবাদ : শপথকৃত কর্মটি যদি বল প্রয়োগের কিংবা ভুলে যাওয়ার কারণে করে তাহলে তাও ইচ্ছাকৃতভাবে করার সমতুল্য। কেননা বল প্রয়োগের কারণে 'বাস্তব কর্ম' কর্ম বিলুপ্ত হয় না আর বাস্তব কর্ম সম্পাদই হলো শর্ত। অদ্রূপ বেহুঁশ অবস্থায় কিংবা পাগল অবস্থায় যদি কর্মটি করে। কেননা তাতেও প্রকৃত পক্ষে শর্ত সাব্যস্ত হয়।

আর যদি কাফফারার হেকমত পাপ মোচন হয়ে থাকে তাহলে হুকুম আবর্তিত হবে এর প্রমাণের উপর। আর তা হলো কসম ভঙ্গ হওয়া, প্রকৃত পাপের উপর নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ভবিষ্যতে কোনো কাজ করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা বা না করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করার পর যদি তা পরিপূর্ণ না করে তাহলে তার উপর শাস্তি স্বরূপ কাফফারা আবশ্যক হবে। ইয়ামীনে মুন'আকিদার দৃষ্টান্ত হলো : কেউ বলল, আল্লাহ তা'আলার শপথ! আমি তার ঘরে যাব না। অতঃপর অসুস্থ অথবা বেহুঁশ অবস্থায় তাকে অন্য কেউ সে ঘরে নিয়ে গেল তাহলে তার উপর কাফফারা আবশ্যক হবে। অর্থাৎ যে ব্যাপারে শপথ করবে তা যদি ভঙ্গ করে ফেলে তাহলে তার উপর কাফফারা আবশ্যক হবে। শপথ করাটা চাই ইচ্ছাকৃত হোক বা অনিচ্ছাকৃত। সুস্থ, অসুস্থ বা বেহুশ যে কোনো অবস্থায় ঐ কাজটা সম্পাদিত হলেই সে কসম ভঙ্গকারী হয়ে যাবে। আর তার উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে।

وَالْيَمِيْنُ اللَّغْوُ اَنْ يَحْلِفَ الخ : ইয়ামীনে লাগব বলা হয় অতীতকালের কোনো বিষয়ে এ ধারণা করে শপথ করা যে, তার জানা মতে ও বিশ্বাস মতে বিষয়টি এমনই। তার ধারণা হলো আমি যা বলছি তা সঠিক ও বাস্তব সম্মত। অথচ বাস্তবে বিষয়টি তেমন নয় বরং তার উল্টা। এ ধরনের শপথের ক্ষেত্রে আশা করা যাচ্ছে যে, কসমকারীর প্রতি আল্লাহ তা'আলা অসন্তুষ্ট হবেন না এবং তাকে পাকড়াও করবেন না।

লাগব কসমের একটি পদ্ধতি হলো– কোনো ব্যক্তি বলল, আল্লাহর কসম এটা যায়েদই। সে বলল, তার ধারণা এবং বিশ্বাস যে এটা যায়েদ ছাড়া আর কেউ হবে না অথচ বাস্তবে সে হলো খালেদ।

ইয়ামীনে লাগব এর ক্ষেত্রে গ্রন্থকার বলেছেন শপথকারীর ব্যাপারে আশা করা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে মাফ করে দিবেন পাকড়াও করবেন না। অথচ তাকে পাকড়াও করাকে মুসান্নেফ (র.) আশা করা যায় বলে ব্যক্ত করেছে। এর কারণ হলো উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় মতানৈক্য রয়েছে।

কায়দা : হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, লাগব কসমের সুরত হলো যেমন কোনো ব্যক্তি বলল وَاللّٰهِ - وَاللّٰهِ بَلٰى এই বর্ণনাটি বুখারী শরীফেও ইবনে হিব্বান হতে অনুরূপই বর্ণিত রয়েছে। আর দারাকুতনী মাওকূফ হিসাবে বর্ণনা কে সহীহ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

ইমাম শাফেয়ী (র.) এবং ইমাম মালেক (র.) ও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তার অর্থ হলো কেউ অন্যকে বলল আজ তুমি সেখানে যাওনি? সে উত্তরে বলল না, আল্লাহর কসম যাইনি। যদি সে বাস্তবেই সেখানে না গিয়ে থাকে তাহলে উক্ত কসমকে লাগব বলা হবে। অথবা কোনো ব্যক্তি বলল, আল্লাহর কসম! আমি এই হলুদ কাগজে লিখি, এ কথা বলার দ্বারা

https://e-ilm.weebly.com/

এটা ইয়ামীনে লাগব হয়ে যাবে। এটা লাগব হওয়ার কারণ হলো তার এই লেখাটা তো তারা দেখতেই পাচ্ছে। তারপরও وَاللّٰهِ বলাটা নিষ্প্রয়োজনীয় বিধায় তা লাগব হবে।

মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক গ্রন্থে হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত রয়েছে– ইয়ামীনে লাগব হলো মানুষ নিজ ধারণা মোতাবেক কসম করে কোনো কথা বলল অথচ বাস্তব দেখা গেল তার বিপরীত, তাহলে ঐ কসমটি লাগব বলে গণ্য হবে। আর হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (র.) বর্ণনা করেন– মানুষ কোনো অবৈধ কাজের ব্যাপারে শপথ করল যে, আমি তা করব না। আর হাসান বসরী এবং ইবরাহীম নাখয়ী (র.) বলেছেন, লাগব হলো ব্যক্তি কোনো বিষয়ের ব্যাপারে শপথ করে ভুলে গেলে ঐ শপথকে লাগব বলা হবে। আর সারাখাসী (র.) তাঁর উসূলে বলেছেন, আমাদের উলামায়ে কেরামের নিকট লাগব হলো ঐ শপথ যা শরিয়ত এবং গুণগত কসমের ফায়দা থেকে মুক্ত হয়। কেননা কসমের ফায়দা হলো ব্যক্তি এমন সংবাদ দেওয়া যার মাঝে মিথ্যার সম্ভাবনা থাকে। অতঃপর কসম করে তার সত্যতা প্রমাণ করতে চায়। এখন সংবাদের মাঝে যদি মিথ্যার সম্ভাবনাই না থাকে তার পরেও শপথ করে তাহলে উক্ত শপথটি ফায়দা থেকে মুক্ত হচ্ছে বিধায় তা ইয়ামীনে লাগব বলে গণ্য হবে। তাহলে ইহাও ইয়ামীনে লাগব হবে।

وَالْقَاصِدُ فِي الْيَمِينِ وَالْمُكْرَهُ الخ : সেচ্ছায় কসম করা জোর জবরদস্ত কসম করা এবং ভুলে যাওয়া অবস্থায় কসম করার হুকুম সমান। কেননা রাসূল ﷺ বলেছেন, তিনটি বিষয় এমন যে, তাদের নিশ্চিতটিকে নিশ্চিতই এবং তাদের উপহাসটিও নিশ্চিত রূপে গণ্য, বিবাহ ,তালাক এবং কসম।

ফায়দা : উক্ত হাদীসটি ইমাম আবূ দাউদ, তিরমিযী এবং ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেছেন। আর তিরমিযী (র.) বলেছেন যে, এটা হাসান পর্যায়ের হাদীস। তবে এই বর্ণনায় তৃতীয় বিষয়টি কসমের পরিবর্তে রাজআত (ফিরিয়ে নেওয়া) করা রয়েছে "ই'তাক"। আর মুসনাদে হারেসে তৃতীয় বিষয় (আজাদ করা) বর্ণিত হয়েছে।

কিন্তু আলোচ্য মাসআলায় ইমাম শাফেয়ী (র.) ভিন্নমত পোষণ করেছেন। আমাদের মাযহাব মোতাবেক কোনো ব্যক্তি যদি জোর জবরদস্তিতে কসমের পরিপন্থি কাজ করতে বাধ্য হয়। অথবা ভুলে যাওয়া অবস্থায় বিপরীত কাজ করে ফেলে তাহলে তার উপর এমনই কাফফারা আবশ্যক হবে যেভাবে সেচ্ছায় বিপরীত করলে কাফফারা আবশ্যক হতো। কেননা রাসূল ﷺ তিনটি বিষয়কে সমান বলে আখ্যায়িত করেছেন। তবে ইমাম শাফেয়ী (র.) এগুলোর মাঝে ব্যবধান করেন। আমাদের আরেকটি প্রমাণ হলো যদিও জোর জবরদস্তিতে শিকার ব্যক্তি নিজ খুশিতে কাজটি সম্পাদ করেনি ঠিক তার পরও কাজটি অস্তিত্বে চলেই আসে। আর কাফফারা ওয়াজিব ঐ কাজটি অস্তিত্বে আসার উপরই নির্ভরশীল।

এমনিভাবে নেশাগ্রস্থ হয়ে যদি কাজটি করে ফেলে তাহলেও কাফফারা ওয়াজিব হবে। কেননা শর্ত পাওয়া গেছে। কাফফারা আব্যশক হওয়ার হেকমত যদি গুনাহ মোচন হয়ে থাকে তাহলে তার হুকুম -এর ভিত্তি দলিলের উপর হবে। অর্থাৎ কসম পরিপন্থি কাজ করার উপর গুনাহের উপর নয়।

ফায়দা : কাফফারা আবশ্যক হবে কসম ভঙ্গকারী হলে এবং কসম পরিপন্থি কাজ করলে। কসম পরিপন্থি কাজ করার দ্বারা সে গুনাহগার হোক বা কোনো কারণে গুনাহগার না হোক। যেমন কোনো ব্যক্তি ভালো কাজ না করার কসম করল, উদাহরণ স্বরূপ বলল, আমি আমার নিকটাত্মীয়দের উপর দয়া করব না। এমতাবস্থায় শরিয়তের বিধান হলো সে উক্ত কসম ভেঙ্গে ফেলবে অর্থাৎ আত্মীয়ের প্রতি দয়া করবে এবং কাফফারাও পরিশোধ করে দিবে। তাহলে এ অবস্থায় কাফফারা আবশ্যক হলো। কেননা সে কসম পরিপন্থি কাজ করেছে তবে এর দ্বারা সে গুনাহগার হবে না। কেননা সে শরিয়তের বিধান মোতাবেক কসম ভঙ্গ করেছে।

মাসাইল : ক. স্বপ্নে কসম করার গ্রহণ যোগ্যতা নেই (আল এখতিয়ার)

খ. আল্লাহর নামে কসম করা মাকরূহ নয়। তারপরও সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

গ. তালাক ও ই'তাক সম্পর্কে কসম করাটা জমহুর উলামাদের নিকট মাকরূহ নয়। বিশেষ করে আমাদের জমানায় এর দ্বারা কথা দৃঢ় করা হয় না। –[আলকাফী]

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ مَا يَكُوْنُ يَمِيْنًا وَمَا لَايَكُوْنُ يَمِيْنًا

قال : وَالْيَمِيْنُ بِاللّٰهِ تَعَالٰى اَوْ بِاسْمٍ اٰخَرَ مِنْ اَسْمَاءِ اللّٰهِ تَعَالٰى كَالرَّحْمٰنِ وَالرَّحِيْمِ اَوْ بِصِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ الَّتِي يُحْلَفُ بِهَا عُرْفًا كَعِزَّةِ اللّٰهِ وَجَلَالِهِ وَكِبْرِيَائِهِ لِاَنَّ الْحِلْفَ بِهَا مُتَعَارَفٌ، وَمَعْنَى الْيَمِيْنِ وَهُوَ الْقُوَّةُ حَاصِلٌ؛ لِاَنَّهُ يَعْتَقِدُ تَعْظِيْمَ اللّٰهِ وَصِفَاتِهِ فَصَلُحَ ذِكْرُهُ حَامِلًا وَمَانِعًا اِلَّا قَوْلَهُ وَعِلْمِ اللّٰهِ فَاِنَّهُ لَا يَكُوْنُ يَمِيْنًا لِاَنَّهُ غَيْرُ مُتَعَارَفٍ . وَلِاَنَّهُ يُذْكَرُ وَيُرَادُ بِهِ الْمَعْلُوْمُ، يُقَالُ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ عِلْمَكَ فِيْنَا : اَيْ مَعْلُوْمَكَ وَلَوْ قَالَ وَغَضَبِ اللّٰهِ وَسَخَطِهِ لَمْ يَكُنْ حَالِفًا وَكَذَا وَرَحْمَةِ اللّٰهِ؛ لِاَنَّ الْحِلْفَ بِهَا غَيْرُ مُتَعَارَفٍ؛ وَلِاَنَّ الرَّحْمَةَ قَدْ يُرَادُ بِهَا اَثَرُهُ، وَهُوَ الْمَطَرُ اَوْ الْجَنَّةُ وَالْغَضَبُ وَالسَّخَطُ يُرَادُ بِهِمَا الْعُقُوْبَةُ وَمَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللّٰهِ لَمْ يَكُنْ حَالِفًا كَالنَّبِيِّ وَالْكَعْبَةِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿مَنْ كَانَ مِنْكُمْ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللّٰهِ اَوْ لِيَذَرْ﴾

পরিচ্ছেদ : কোন বাক্য কসমরূপে বিবেচ্য আর কোন বাক্য কসমরূপে বিবেচ্য নয়

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন 'আল্লাহ' শব্দযোগে কিংবা আল্লাহ তা'আলার অন্যান্য নামের কোনো নাম যেমন– রাহমান, রাহীম, যোগে কিংবা আল্লাহর গুণসমূহের কোনো গুণযোগে, যেগুলো দ্বারা শপথ করার প্রচলন রয়েছে। যেমন আল্লাহর ইজ্জত (মর্যাদা) জালাল (মহিমা) এবং আল্লাহর বড়ত্ব ইত্যাদি যোগে কসম সম্পন্ন হয়। কেননা এগুলোর দ্বারা কসম করার প্রচলন রয়েছে এবং ইয়ামীনের মর্মার্থ হলো দৃঢ়তা আর তা অর্জিত হয় (এগুলো দ্বারা) কেননা শপথকারী আল্লাহর নামের এবং তাঁর গুণাবলির মর্যাদা বিশ্বাস করে। সুতরাং কোনো বিষয়ে উদ্বুদ্ধকারী ও বারণকারীরূপে এগুলো উল্লেখ উপযোগী হবে :

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কিন্তু 'আল্লাহর ইলমের কসম' শপথ কারীর এ বাক্য শপথরূপে বিবেচ্য হবে না। কেননা কসমে এটি প্রচলিত নয়। তাছাড়াএ জন্য যে, এরূপ বাক্যে 'ইলম' দ্বারা উদ্দেশ্য হয় জ্ঞাত বিষয়। যেমন বলা হয়– হে আল্লাহ! আমাদের সম্বন্ধে তোমার 'ইলম' মাফ কর অর্থাৎ তোমার জ্ঞাত অপরাধসমূহ। **তদ্রূপ যদি বলে, আল্লাহর গজব কিংবা অসন্তুষ্টি কিংবা আল্লাহর রহমতের কসম তাহলে সে শপথকারী হবে না।** কেননা এগুলো দ্বারা শপথ করার প্রচলন নেই। তাছাড়া রহমত দ্বারা কখনো কখনো রহমতের প্রকাশ ক্ষেত্র তথা বৃষ্টি বা জান্নাত উদ্দেশ্য হয় এবং গজব ও অসন্তুষ্টি দ্বারা শাস্তি উদ্দেশ্য হয়।

যে ব্যক্তি গায়রুল্লাহ দ্বারা কসম করবে সে কসমকারী বিবেচিত হবে না। যেমন নবীর কসম, কাবার কসম। কেননা নবী করীম ﷺ বলেছেন– مَنْ كَانَ مِنْكُمْ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللّٰهِ اَوْ لِيَذَرْ -তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কসম করতে চায় সে যেন আল্লাহর নামে কসম করে, অন্যথা যেন কসম পরিহার করে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَكَذَا اذَا حَلَفَ بِالْقُرْاٰنِ لِاَنَّهٗ غَيْرُ مُتَعَارَفٍ، قَالَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : مَعْنَاهُ اَنْ يَقُوْلَ وَالنَّبِيِّ وَالْقُرْاٰنِ، اَمَّا لَوْ قَالَ اَنَا بَرِيْءٌ مِنْهُمَا يَكُوْنُ يَمِيْنًا؛ لِاَنَّ التَّبَرِّيْ مِنْهُمَا كُفْرٌ ـ

অনুবাদ : তদ্রূপ যদি কুরআনের নামে কসম করে। কেননা তা প্রচলিত নয়। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন -এর অর্থ হলো নবীর কসম এবং কুরআনের কসম বলা। পক্ষান্তরে যদি বলে, (আমি এমন কাজ করলে) আমি নবী থেকে এবং কুরআন থেকে সম্পর্কহীন, তাহলে কসম হবে। কেননা নবী বা কুরআন থেকে সম্পর্কহীন হলো কুফরি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আল্লাহর নামে কসম করলে তা সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে কারো কোনো দ্বি-মত নেই। যেমন বলল بِاللّٰه، والله- আল্লাহর নামে কসম করতেছি। আর যদি আল্লাহ তা'আলার কোনো পবিত্র নামে কসম করা হয়, তাহলে প্রসিদ্ধ (জাহিরী মাযহাব) মত হলো কসম সংঘটিত হয়ে যাবে। এ নামে কসম করার প্রচলন থাক বা না থাক। এটাই বিশুদ্ধ অভিমত। আল্লাহ তা'আলার গুণবাচক নামের ক্ষেত্রে প্রচলনের গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে, আল্লাহ তা'আলার সত্তা মোতাবিক যে সব গুণ প্রযোজ্য হতে পারে তার নামে কসম করা সম্পর্কে উক্ত বক্তব্য যেমন ইজ্জত, মর্যাদা, জালাল, মহত্ত্ব কিবরিয়া,বড়ত্ব এবং আযমত ইত্যাদি। এগুলোর দ্বারা নাম বানানো যেমন আযীয, জলীল ইত্যাদি। এসব গুণাবলি দ্বারা কসম করার ব্যাপারে মাওয়ারাউন নাহারের মাশায়েখদের গ্রহণযোগ্য অভিমত হলো: এ ধরনের গুণবাচক নাম নিয়ে কসম করা যদি প্রচলিত থাকে তাহলে কসম সংঘটিত হবে অন্যথায় নয় (আল কাফী) এবং এটাই বিশুদ্ধ অভিমত। -[আল বারজান্দী]

পক্ষান্তরে আল্লাহর গজব, আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টি কিংবা আল্লাহ তা'আলার রহমতের নামে কসম করার দ্বারা কসম সংঘটিত হবে না। কেননা এ সমস্ত শব্দাবলির দ্বারা কসম করাটা প্রচলিত নয়। তাছাড়া এজন্যও কসম হবে না। যে, রহমত দ্বারা কখনো রহমতের প্রকাশ ক্ষেত্র বা জান্নাত উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। আর গজব ও অসন্তুষ্টির দ্বারা কখনো আজাব ও শাস্তি উদ্দশ্য হয়ে থাকে।

ফায়দা : কোনো দেশে গুণবাচক নাম দ্বারা কসম করাটা প্রচলিত থাকে, আর অন্য দেশে প্রচলিত না থাকে, তাহলে যেথায় প্রচলিত আছে সেখানে কসম সংঘটিত হবে আর যেখানে নেই সেখানে সংঘটিত হবে না। -[আলবাদায়ে]

হকের কসম দ্বারা যদি আল্লাহর নাম উদ্দেশ্য হয়, আর কসম দ্বারা মহত্ত্ব-আযমত, মালাকুতে এলাহী বা কুদরতে এলাহী বা জাবরুতে এলাহী বা কুউয়তে এলাহী বা ইবাদাতে এলাহী বা মাশিয়্যাতে এলাহী বা মহব্বতে এলাহী অথবা কালামে এলাহী উদ্দেশ্য হয়, তাহলে এসব অবস্থায় কসম সংঘটিত হয়ে যাবে।

وَمَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللّٰهِ لَمْ يَكُنْ الخ : আল্লাহ ভিন্ন অন্যের নামের উপর কসম করলে কসম সংঘটিত হয় না। যেমন নবীর কসম, কা'বার কসম। কেননা রাসূল ﷺ বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কসম করতে চায় সে যেন আল্লাহর নামে কসম করে অন্যথায় যেন কসম পরিহার করে।

নোট : বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ এবং সুনানের কিতাবসমূহে এ হাদীসটি এভাবে আছে রাসূল ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে এ থেকে নিষেধ করেছেন যে, পিতা দাদার নামে কসম কর, বরং যে ব্যক্তি কসম করতে চায় সে যেন আল্লাহর নামে কসম করে অথবা চুপ থাকে।

বুখারী ও মুসলিমের অন্য বর্ণনায় রয়েছে, যে কসম করতে চায় সে যেন আল্লাহ ভিন্ন অন্যের নামে কসম না করে।

আবূ দাউদ ও নাসায়ী -এর বর্ণনায় আছে তোমরা পিতা দাদা ও মাদের কসম কর না এবং আল্লাহরও কসম কর না তবে যদি সত্যবাদী হয়ে থাক।

https://e-ilm.weebly.com/

আবূ দাউদ, হাকেম, আহমদ এবং নাসায়ী (র.)-এর বর্ণনায় রয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ভিন্ন কারো নামের কসম করল তাহলে সে শিরক করল। বুখারী শরীফের বর্ণনায় রয়েছে রাসূল ﷺ অধিকাংশ সময়ে বলতেন (مقلب القلوب) অন্তর পরিবর্তনকারীর কসম। সুনানের চার কিতাব এবং মালেক (র.) ও এ বর্ণনা করেছেন। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে যখন তিনি দৃঢ়ভাবে কসম করতেন তখন বলতেন ঐ সত্তার কসম যার হাতে আমার জীবন। এমনিভাবে কুরআনের নামে কসম করলেও কসম হবে না। কেননা এর প্রচলন নেই।

ফায়েদা : বাদায়েউস সানায়ে গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে কালামুল্লাহর কসম করলে কসম সংঘটিত হয়ে যাবে। আর আমি অনুবাদক বলব এটাই বাস্তব কথা এবং এর উপরই ফতোয়া। আম্বিয়া, ফেরেশতা, নামাজ, রোজা, ইত্যাদি বিষয়ে কসম করা বা এমনিভাবে কা'বা হেরেম, ও জমজম ইত্যাকার বিষয়ে কসম করা জায়েজ নেই। (বাদায়ে') কোনো ব্যক্তি যদি এভাবে কসম করে যে, আমি যদি এমন কাজটি করি তাহলে নবী কুরআন থেকে মুক্ত তাহলে এর দ্বারা কসম সংঘটিত হয়ে যাবে। কেননা কুরআন ও নবী থেকে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করা হলো কুফরি এটা গ্রহণযোগ্য মত। কোনো কোনো মাশায়েখ বলেছেন কোনো ব্যক্তি যদি কুরআনের কসম করে অর্থাৎ এভাবে বলল- কুরআনের কসম! আমি এটা করব, তাহলে আমাদের নিকট তা কসম হিসেবে সাব্যস্ত হয়ে যাবে। আমরা এটাই বলে থাকি আমাদের বিশ্বাসও তাই। জমহুর মাশায়েখের অভিমতও এটাই। -[আল মুজমারাত]

কোনো ব্যক্তি যদি বলে যে, আমি এমন করলে শাফায়াত থেকে মুক্ত, তাহলে বিশুদ্ধমত হিসাবে এটা কসম হবে না। (জাহিরিয়া) আর যদি এভাবে বলে যে, যদি আমি এমন করি তাহলে কুরআন, কিবলা, নামাজ অথবা রমজানের রোজা থেকে মুক্ত, তাহলে গ্রহণযোগ্য অভিমত মোতাবেক সেটা কসম হিসাবে গণ্য হয়ে যাবে।

এমনিভাবে তাওরাত, যাবূর, ইঞ্জিল, আসমানি কিতাব থেকে মুক্ত ঘোষণা করাও কসম হিসাবে সাব্যস্ত হয়ে যাবে। অনুরূপ যে কোনো বিষয় থেকে মুক্ত হওয়াটা কুফরি তাই অনুরূপ শব্দ দ্বারা কসম করলে কসম হয়ে যাবে। -[খুলাসা]

আর যদি কেউ বলে আমি মুমিনদের থেকে মুক্ত বা ঈমান থেকে মুক্ত তাহলেও মাশায়েখদের মতে কসম হয়ে যাবে।

জেনে রাখতে হবে যে, আল্লাহর নামে কসম করার ক্ষেত্রে কসমকারী বিবেক সম্পন্ন ও প্রাপ্ত বয়স্ক হতে হবে। কেননা পাগল ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির কসম সংঘটিত হয় না, যদিও ঐ বাচ্চা বুদ্ধি সম্পন্ন হয় না কেন। এমনিভাবে কসমকারী মুসলমান হওয়া শর্ত। কেননা কাফেরের কসম বিশুদ্ধ নয়। তাই তো কোনো ব্যক্তি কাফের অবস্থায় কসম করার পর মুসলমান হয়ে যদি ঐ কসম ভেঙ্গে ফেলে তাহলে তার উপর কাফফারা ওয়াজিব হয় না। তবে কৃতদাসের কসম সংঘটিত হয়ে যায়। এমতাবস্থায় দাস যদি তার কসম ভঙ্গ করে ফেলে তাহলে তাৎক্ষণিক তার উপর অর্থের সাথে সম্পর্ক এমন কোনো কাফফারা ওয়াজিব হবে না। বরং সে শুধু রোজা দ্বারা কাফফারা আদায় করবে। জোর জবরদস্তিতে কেউ যদি কসম করে তাহলে আমাদের মতে তার কসম সংঘটিত হয়ে যাবে।

উল্লেখ্য যে, যেই বিষয়ের উপর কসম করা হচ্ছে তা সেই সময় অস্তিত্বে বা বাজারজাত হতে হবে। এ কারণেই যদি বাস্তবে তা পাওয়াটা অসম্ভব হয় তাহলে কসম সংঘটিত হবে না। আর কসম করার পর যদি দুর্বল হয়ে যায় তাহলে কসমের বিধান বাকি থাকবে না। ইমাম আবূ হানীফা (র.) এবং মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমত এটাই। কোনো ব্যক্তি কসম করার সাথে সাথে যদি ইনশাআল্লাহ বলে ফেলে অথবা অন্য কোনো শব্দ দ্বারা তা থেকে কিছু বাদ দিয়ে দেয়, যেমন বলল, আল্লাহর কসম করে বলতেছি আমি এ কাজটি করব, তবে যদি আমার পরবর্তীতে মত পরিবর্তন না হয়। অথবা বলল, আল্লাহ তা'আলা যদি সাহায্য করেন। এসব সুরতে কসম সংঘটিত হবে না।

-[বাদায়ে উস্ সানায়ে]

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ وَالْحِلْفُ بِحُرُوْفِ الْقَسَمِ. وَحُرُوْفُ الْقَسَمِ الْوَاوُ كَقَوْلِهِ وَاللّٰهِ وَالْبَاءُ كَقَوْلِهِ بِاللّٰهِ وَالتَّاءُ كَقَوْلِهِ تَاللّٰهِ لِاَنَّ كُلَّ ذٰلِكَ مَعْهُوْدٌ فِي الْاَيْمَانِ وَمَذْكُوْرٌ فِي الْقُرْاٰنِ وَقَدْ يُضْمِرُ الْحَرْفَ فَيَكُوْنُ حَالِفًا كَقَوْلِهِ لِلّٰهِ لَا اَفْعَلُ كَذَا لِاَنَّ حَذْفَ الْحَرْفِ مِنْ عَادَةِ الْعَرَبِ اِيْجَازًا. ثُمَّ قِيْلَ يُنْصَبُ لِانْتِزَاعِ الْحَرْفِ الْخَافِضِ. وَقِيْلَ يُخْفَضُ فَتَكُوْنُ الْكَسْرَةُ دَالَّةً عَلَى الْمَحْذُوْفِ. وَكَذَا اِذَا قَالَ لِلّٰهِ فِي الْمُخْتَارِ لِاَنَّ الْبَاءَ تُبْدَلُ بِهَا. قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى ﴿اٰمَنْتُمْ لَهُ﴾. اَيْ اٰمَنْتُمْ بِهِ . وَقَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ : اِذَا قَالَ وَحَقِّ اللّٰهِ فَلَيْسَ بِحَالِفٍ. وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَاِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ اَبِيْ يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى . وَعَنْهُ رِوَايَةٌ اُخْرٰى اَنَّهُ يَكُوْنُ يَمِيْنًا لِاَنَّ الْحَقَّ مِنْ صِفَاتِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَهُوَ حَقِيَّتُهُ فَصَارَ كَاَنَّهُ قَالَ وَاللّٰهِ الْحَقِّ وَالْحِلْفُ بِهِ مُتَعَارَفٌ . وَلَهُمَا اَنَّهُ يُرَادُ بِهِ طَاعَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى. اِذِ الطَّاعَاتُ حُقُوْقُهُ فَيَكُوْنُ حَلِفًا بِغَيْرِ اللّٰهِ. قَالُوْا : وَلَوْ قَالَ وَالْحَقِّ يَكُوْنُ يَمِيْنًا. وَلَوْ قَالَ حَقًّا لَا يَكُوْنُ يَمِيْنًا؛ لِاَنَّ الْحَقَّ مِنْ اَسْمَاءِ اللّٰهِ تَعَالٰى، وَالْمُنَكَّرُ يُرَادُ بِهِ تَحْقِيْقُ الْوَعْدِ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কসম সংঘটিত হয় কসমের বিশেষ হরফের মাধ্যমে এবং সেই হরফসমূহ হচ্ছে- الواو (ওয়াও) যেমন শপথকারীর বাণী- وَاللّٰه (আল্লাহর শপথ!) والباء (বা) যেমন শপথকারীর বাণী- بِاللّٰه (আল্লাহর শপথ!), والتاء (তা) যেমন শপথকারীর বাণী- تَاللّٰه (আল্লাহর শপথ!) কেননা উহার প্রতিটি শব্দই শপথের ব্যাপারে পরিচিত এবং পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত। এবং কখনো কখনো শপথকারী শপথের হরফকে উহ্য রেখে শপথ করে তবুও সে শপথকারী বলে বিবেচিত হবে। যেমন শপথকারীর বাণী- لِلّٰهِ لَا اَفْعَلُ كَذَا (আল্লাহর কসম! আমি অনুরূপ করব না)। কেননা সংক্ষিপ্ত করণার্থে শপথের হরফেকে উহ্য করা আরববাসীদের অভ্যাস। অতঃপর কেউ কেউ বলেন, শপথের শব্দটি যার দ্বারা পড়া হবে যের দানকারী হরফ পরিহার করার কারণে। আর কেউ কেউ বলেন, যের দ্বারা পড়া হবে, যখন যের দলিল হবে কসমের হরফ উহ্য করার ব্যাপারে। অনুরূপভাবে গ্রহণ যোগ্য মত অনুযায়ী শপথকারী যদি لِلّٰه (লিল্লাহ) বলে, তাহলেও সে শপথকারী বলে বিবেচিত হবে। কেননা এখানে باء (বা) কে لام (লাম) দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ তা'আলার বাণী- اٰمَنْتُمْ لَهُ অর্থাৎ اٰمنتم به। ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, শপথকারী যদি وَحَقِّ اللّٰه আল্লাহর হকের শপথ করে তাহলে সে শপথকারী বলে বিবেচিত হবে না। আর ইহা ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমত এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর ও একটি অভিমত। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দ্বিতীয় অভিমত হলো সে ব্যক্তি শপথকারী বলে বিবেচিত হবে। কেননা حَقّ (হক্ব) আল্লাহ তা'আলার গুণসমূহের অন্তর্ভুক্ত হওয়াই হাকীকত। অতএব তখন এমন মনে হবে যে, শপথকারী বলছে- وَاللّٰهِ الْحَقِّ (আল্লাহর হকের শপথ) আর এই শব্দ দ্বারা শপথ করার প্রচলন রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো حَقّ (হক্ব) দ্বারা উদ্দেশ্য আল্লাহর আনুগত্য করা। কেননা আনুগত্য করা তারই হক (প্রাপ্য)। সুতরাং শপথকারী যেন গায়রুল্লাহর নামে শপথ করেছে। ফুকাহায়ে কেরাম বলেন, শপথকারী যদি বলে وَالْحَقِّ (হকের শপথ!) তাহলে সে শপথকারী বলে বিবেচিত হবে এবং সে যদি বলে حَقًّا (হক্কান) তাহলে সে শপথকারী বলে বিবেচিত হবে না। কেননা حَقّ (হক্ব) আল্লাহর গুণবাচক নাম সমূহের একটি নাম। আর যে তা অস্বীকার করবে সে শাস্তি যোগ্য হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কসম বুঝায় আরবি ভাষায় এমন কিছু বিশেষ হরফ রয়েছে। সুতরাং আরবিতে কসম করতে হলে সেগুলো প্রয়াগ করতে হবে, তাছাড়া কসম হবে না। কিন্তু আমাদের বাংলা ভাষায় ঐ ধরনের বিশেষ কোনো হরফ নেই। হরফ ছাড়া কসম শব্দ ব্যবহার করেই কসম করতে হবে। (অনুবাদক)

https://e-ilm.weebly.com/

وَلَوْ قَالَ أُقْسِمُ اَوْ أُقْسِمُ بِاللّٰهِ اَوْ اَحْلِفُ اَوْ اَحْلِفُ بِاللّٰهِ اَوْ اَشْهَدُ اَوْ اَشْهَدُ بِاللّٰهِ فَهُوَ حَالِفٌ: لِاَنَّ هٰذِهِ الْاَلْفَاظَ مُسْتَعْمَلَةٌ فِي الْحِلْفِ وَهٰذِهِ الصِّيْغَةُ لِلْحَالِ حَقِيْقَةً وَتُسْتَعْمَلُ لِلْاِسْتِقْبَالِ بِقَرِيْنَةٍ فَجُعِلَ حَالِفًا فِي الْحَالِ، وَالشَّهَادَةُ يَمِيْنٌ، قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى ﴿قَالُوْا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ﴾ ثُمَّ قَالَ ﴿اِتَّخَذُوْا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً﴾ وَالْحِلْفُ بِاللّٰهِ هُوَ الْمَعْهُوْدُ الْمَشْرُوْعُ وَبِغَيْرِهِ مَحْظُوْرٌ فَصُرِفَ اِلَيْهِ . وَلِهٰذَا قِيْلَ لَا يَحْتَاجُ اِلَى النِّيَّةِ . وَقِيْلَ لَا بُدَّ مِنْهَا لِاِحْتِمَالِ الْعِدَةِ وَالْيَمِيْنِ بِغَيْرِ اللّٰهِ وَلَوْ قَالَ بِالْفَارِسِيَّةِ سوكند ميخورم بخداي يَكُوْنُ يَمِيْنًا؛ لِاَنَّهُ لِلْحَالِ . وَلَوْ قَالَ سوكند خورم قِيْلَ لَا يَكُوْنُ يَمِيْنًا وَلَوْ قَالَ بِالْفَارِسِيَّةِ سوكند خورم بِطَلَاقِ زنم لَا يَكُوْنُ يَمِيْنًا ؛ لِعَدَمِ التَّعَارُفِ قَالَ وَكَذَا قَوْلُهُ لَعَمْرُ اللّٰهِ وَاَيْمُ اللّٰهِ لِاَنَّ عَمْرَ اللّٰهِ بَقَاءُ اللّٰهِ، وَاَيْمُ اللّٰهِ مَعْنَاهُ اَيْمُنُ اللّٰهِ وَهُوَ جَمْعُ يَمِيْنٍ، وَقِيْلَ مَعْنَاهُ وَاللّٰهِ وَاَيْمُ صِلَةٌ كَالْوَاوِ، وَالْحِلْفُ بِاللَّفْظَيْنِ مُتَعَارَفٌ . وَكَذَا قَوْلُهُ وَعَهْدُ اللّٰهِ وَمِيْثَاقُهُ لِاَنَّ الْعَهْدَ يَمِيْنٌ . قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى ﴿وَاَوْفُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ﴾ وَالْمِيْثَاقُ عِبَارَةٌ عَنِ الْعَهْدِ وَكَذَا اِذَا قَالَ عَلَيَّ نَذْرٌ اَوْ نَذْرُ اللّٰهِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَذَرَ نَذْرًا وَلَمْ يُسَمِّ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ ـ

অনুবাদ : যদি বলে কসম করে বলছি কিংবা আল্লাহর নামে কসম করে বলছি, কিংবা 'হলফ করে বলছি কিংবা আল্লাহর নামে হলফ করে বলছি, কিংবা আমি সাক্ষী রেখে বলছি, কিংবা আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি, তাহলে সে শপথকারী হয়ে যাবে। কেননা এ শব্দগুলো শপথের অর্থে ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া আল্লাহকে সাক্ষী রাখার অর্থ কসম করা। আর 'হলফ' শব্দটির ক্ষেত্রে আল্লাহ শব্দটি ব্যবহার না করলেও আল্লাহর নামে হলফ বলে বিবেচ্য এবং শরিয়ত সম্মত। কেননা গায়রুল্লাহর নামে হলফ নিষিদ্ধ। সুতরাং হলফ শব্দকে সে অর্থেই গ্রহণ করা হবে। এ কারণেই বলা হয় শুধু কসম বা শুধু হলফ শব্দের ক্ষেত্রে নিয়তের প্রয়োজন নেই। আর কেউ কেউ বলেন নিয়ত অপরিহার্য। কেননা এটা নিছক প্রতিশ্রুতি অর্থে এবং গায়রুল্লাহর নামে কসমের অর্থে হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

যদি ফারসি ভাষায় বলে 'সুগন্দ মীখোরাম বখোদায়ে' (আমি খোদার নামে কসম খাচ্ছি) তবে তা কসম হয়ে যাবে। কেননা তা বর্তমানের জন্য। আর যদি বলে সুগন্দ খোরাম' তবে কারো কারো মতে তা কসম হবে না। যদি বলে আমার স্ত্রীর তালাকের কসম খাচ্ছি তাহলে কসম হবে না। কেননা কসমের ক্ষেত্রে এর প্রচলন নেই। **আর তেমনি যদি বলে 'আল্লাহর নামে ওয়াদা করছি এবং অঙ্গীকার করছি' (তবে কসম হয়ে যাবে)** কেননা অঙ্গীকারও শপথের শামিল।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– وَاَوْفُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ তোমরা আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ কর مِيْثَاقٌ শব্দটি অঙ্গীকার অর্থে ব্যবহৃত হয়। তেমনি যদি বলে আমার উপর মানত অথবা আল্লাহর নামে মানত, তাহলে কসম হবে। কেননা হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে مَنْ نَذَرَ نَذْرًا وَلَمْ يُسَمِّ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ কেউ যদি মানত করে আর মানতের বিষয় উল্লেখ না করে, তাহলে তার উপর কসমের কাফফারা ওয়াজিব।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কেউ যদি বলে আমি 'হলফ করছি' বা 'আল্লাহর নামে হলফ করছি' অথবা 'আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি' ইত্যাদি বাক্য ব্যবহার করার মাধ্যমে কেউ যদি কসম করে তাহলে তার কসম সংঘটিত হয়ে যাবে। কেউ কেউ বলেন, উক্ত বাক্যগুলো কসমের অর্থেই ব্যবহার হয়ে থাকে। অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যতকাল বুঝায় যে কোনো শব্দ ব্যবহার করুক না কেন। বাক্যে আল্লাহর নাম উল্লেখ না করলেও কসম সংঘটিত হয়ে যাবে, অধিকন্তু নিয়তেরও প্রয়োজন হবে না।

وَلَوْ قَالَ بِالْفَارِسِيَّةِ سوكند : বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী আমরুল্লাহ, আইমুল্লাহ, মিছকুল্লাহ, অনুরূপ আল্লাহর সত্তার কসম, আল্লাহর কসম, আল্লাহর অঙ্গীকার ইত্যাদি শব্দ দ্বারা কসম সংঘটিত হয়ে যায়। এমনিভাবে কেউ যদি বলে আমার উপর মানত আবশ্যক অথবা আল্লাহর মানত আবশ্যক তাহলে তা কসম হিসেবেই গণ্য হবে। কেননা রাসূল ﷺ বলেছেন যে; কেউ মানত করল আর তা না করলে কি হবে তা উল্লেখ করেনি তাহলে তার উপর কসমের কাফফারা আবশ্যক হবে।

ফায়দা : ইমাম আবূ দাউদ (র.) ও ইবনে মাজাহ উক্ত হাদীসটি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম তিরমিযী (র.) হযরত আকীকা ইবনে আমর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। কোনো ব্যক্তি যদি গুনাহের কাজ করার উপর কসম করে তাহলে তার কাফফারা আবশ্যক হবে। আর যদি কেউ এমন কসম করে পুরা করা সম্ভব নয় তাহলে তার কাফফারাও কসমের কাফফারা হবে। আবূ দাউদ ও নাসায়ী ও এরূপ বর্ণনা করেছেন। এবং একথাও উল্লেখ করেছেন। এই হাদীসটি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বক্তব্য। আর কোনো কোনো আলেম বলেছেন, গুনাহের কসম করার ব্যাপারে কোনো কাফফারা আবশ্যক হয় না। কেননা বুখারী শরীফে রয়েছে কোনো ব্যক্তি যদি গুনাহের কাজ করার উপর মানত করে তাহলে সে ঐ গুনাহের কাজটি সম্পন্ন করবে না। এমনিভাবে হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (র.)-এর বর্ণনাও এ ব্যাপারে বিদ্যমান যে গুনাহের মানত পুরা হয় না। এই বর্ণনাটি মুসলিম শরীফেও রয়েছে।

এসব বর্ণনার উত্তর হলো উক্ত হাদীসগুলোতে রাসূল ﷺ গুনাহের মানত পুরা করতে নিষেধ করেছেন। কাফফারা আবশ্যক হওয়াকে নিষেধ করেন নাই। কেননা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণিত হাদীস দ্বারা কাফফারার বিষয়টি প্রমাণিত এবং অন্য হাদীসে রয়েছে গুনাহের কাজের ব্যাপারে মানত নেই। বরং তার কাফফারা তাই হবে যা কসমের কাফফারা হয়। ইমাম ত্বহাবী (র.) এই হাদীসকে বিশুদ্ধ বলেছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

وَإِنْ قَالَ إِنْ فَعَلْتُ كَذَا فَهُوَ يَهُوْدِيٌّ اَوْ نَصْرَانِيٌّ اَوْ كَافِرٌ تَكُوْنُ يَمِيْنًا لِاَنَّهُ لَمَّا جَعَلَ الشَّرْطَ عَلَمًا عَلَى الْكُفْرِ فَقَدْ اِعْتَقَدَهُ وَاجِبَ الِامْتِنَاعِ، وَقَدْ اَمْكَنَ الْقَوْلُ بِوُجُوْبِهِ لِغَيْرِهِ بِجَعْلِهِ يَمِيْنًا كَمَا تَقُوْلُ فِيْ تَحْرِيْمِ الْحَلَالِ . وَلَوْ قَالَ ذٰلِكَ لِشَيْءٍ عَقَدَ فِعْلَهُ فَهُوَ الْغَمُوْسُ، وَلَا يَكْفُرُ اِعْتِبَارًا بِالْمُسْتَقْبَلِ . وَقِيْلَ يَكْفُرُ؛ لِاَنَّهُ تَنْجِيْزٌ مَعْنًى فَصَارَ كَمَا اِذَا قَالَ هُوَ يَهُوْدِيٌّ . وَالصَّحِيْحُ اَنَّهُ لَا يَكْفُرُ فِيْهِمَا اِنْ كَانَ يَعْلَمُ اَنَّهُ يَمِيْنٌ، وَاِنْ كَانَ عِنْدَهُ اَنَّهُ يَكْفُرُ بِالْحِلْفِ يَكْفُرُ فِيْهِمَا؛ لِاَنَّهُ رَضِيَ بِالْكُفْرِ حَيْثُ اَقْدَمَ عَلَى الْفِعْلِ وَلَوْ قَالَ اِنْ فَعَلْتُ كَذَا فَعَلَيَّ غَضَبُ اللّٰهِ اَوْ سَخَطُ اللّٰهِ فَلَيْسَ بِحَلِفٍ لِاَنَّهُ دُعَاءٌ عَلٰى نَفْسِهِ، وَلَا يَتَعَلَّقُ ذٰلِكَ بِالشَّرْطِ؛ وَلِاَنَّهُ غَيْرُ مُتَعَارَفٍ وَكَذَا اِذَا قَالَ اِنْ فَعَلْتُ كَذَا فَاَنَا زَانٍ اَوْ سَارِقٌ اَوْ شَارِبُ خَمْرٍ اَوْ اٰكِلُ رِبًا؛ لِاَنَّ حُرْمَةَ هٰذِهِ الْاَشْيَاءِ تَحْتَمِلُ النَّسْخَ وَالتَّبْدِيلَ فَلَمْ تَكُنْ فِيْ مَعْنَى حُرْمَةِ الِاسْمِ وَلِاَنَّهُ لَيْسَ بِمُتَعَارَفٍ ـ

অনুবাদ : আর যদি বলে, যদি আমি এটা করি তাহলে "সে" ইহুদি বা খ্রিস্টান বা কাফের, তাহলে কসম হবে। কেননা শর্তকৃত কর্মটি কে সে যখন কুফরির নিদর্শন রূপে ঘোষণা করেছে তখন বোঝা গেল যে, হলফকৃত কর্মটি পরিহার করা সে আবশ্যক মনে করে। আর শর্তায়ন ছাড়াও এটার আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করা ইয়ামীন ও কসম সাব্যস্ত করার মাধ্যমে সম্ভব। যেমন কোনো হালাল বিষয়কে নিজের জন্য হারাম করার ক্ষেত্রে আমরা বলে থাকি। যদি একথা এমন কোনো কাজের ক্ষেত্রে বলে যা সে বিগত সময়ে করেছে। তাহলে এটা মিথ্যা কসম বলে বিবেচিত হবে এবং তাকে কাফের বলা যাবে না। যেমন ভবিষ্যত সম্পর্কে কসম করলে সাব্যস্ত হয়, কিন্তু কাফের সাব্যস্ত হয় না। কারো কারো মতে সে কাফের হয়ে যাবে। কেননা মর্মগত দিক থেকে এটা শর্তহীন ও তৎক্ষণাৎ বুঝায়। যেমন যদি সে বলে যে সে ইহুদি কিন্তু বিশুদ্ধ মতে অতীত ও ভবিষ্যত উভয় ক্ষেত্রেই তাকে কাফের বলা যাবে না। যদি সে জেনে থাকে যে, এটা কসম। পক্ষান্তরে যদি তার বিশ্বাস এই হয় যে, এ বক্তব্য দ্বারা কাফের সাব্যস্ত হয় তাহলে বর্তমান ও ভবিষ্যত উভয় অর্থেই কাফের হয়ে যাবে। কেননা শর্তকৃত কর্মটি সম্পন্ন করে সে নিজেই কুফরির প্রতি তার সম্মতি প্রকাশ করেছে। **আর যদি বলে, যদি আমি তা করি তাহলে আমার উপর আল্লাহর গজব বা আমার উপর অসন্তুষ্টি, তাহলে সে কসমকারী হবে না।** কেননা এটা হলো নিজের উপর বদদোয়া। আর তা শর্তের সাথে সম্পৃক্ত নয়। আর এ জন্য যে, এ ধরনের কসম প্রচলিত নয়। **তদ্রূপ (কসম হবে না) যদি বলে যে, যদি আমি এটা করি তাহলে আমি জেনাকারী বা আমি চোর বা আমি মদখোর বা সুদখোর।** কেননা এই কার্যগুলোর নিষিদ্ধতা রহিত ও পরিবর্তিত হওয়ার যোগ্য। সুতরাং এগুলো আল্লাহর নামের মর্যাদার সমপর্যায়ের নয়। তাছাড়া এগুলো কসমের জন্য প্রচলিতও নয়।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যদি কোনো ব্যক্তি এ কথার বিশ্বাস পোষণ করে কসম করে যে, এ ধরনের কসম করলে কাফের হয়ে যায়, তা সত্ত্বেও সে কসম করল যে আমি ইহুদি বা খ্রিস্টান তাহলে সে তাই হয়ে যাবে। আ যদি উক্ত কথা কসম হিসেবে বলে থাকে তাহলে কাফফারা দিতে হবে। বাকি সে কাফের হবে না।

আর কসম হিসেবে যদি বলে যে, আমি যদি এ ধরনের কাজ করি তাহলে আমি ব্যভিচারী, চোর, শরাবখোর, সুদখোর, ইত্যাদি তাহলে তার উক্ত কথার দ্বারা কসম করাটা প্রচলিত নয় বিধায় সংঘটিত হবে না।

সংশ্লিষ্ট কিছু মাসআলা :

১. একাধিক কসমের দ্বারা একাধিক কাফফারা আবশ্যক হবে। কসমগুলো এক মজলিসে করা হোক বা একাধিক মজলিসে করা হোক।

২. যদি কোনো ব্যক্তি বলে যে, আমি এমনটি করলে আমি ইহুদি অথবা খ্রিস্টান, তাহলে উক্ত কথার দ্বারা দুটি কসম হবে।

৩. ভিন্ন ভিন্ন করে যদি বলে যে, আল্লাহর কসম তাহলে এর দ্বারাও দুটি কসম হবে।.

৪. যদি কোনো ব্যক্তি বলে আমার জীবনের কসম, অথবা তোমার জীবনের কসম, অথবা তোমার মাথার কসম, তাহলে সে কাফের হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এ সব কথার দ্বারা যদি সে এই বিশ্বাস রাখে যে আমাকে উক্ত কসম পুরা করতেই হবে। পুরা করা আমার উপর আবশ্যক, তাহলে এর দ্বারা কাফের হয়ে যাবে।

৫. যদি কেউ বলে যে, আল্লাহ তা'আলা জানেন যে, আমি এমনটি করেছি, অথবা আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি যে আমি এমনটি করি নি। অথবা আল্লাহকে সাক্ষী রেখে যদি সাক্ষ্য দেয় অথচ সে যেই ব্যাপারে কথা বলেছে তা মিথ্যা, তাহলে এ ব্যাপারে জাহেদী (র.) বলেছেন যে, এর দ্বারা সে কাফের হয়ে যাবে। আর আল্লামা শুমুন্নী (র.) বলেছেন যে, বিশুদ্ধ মত হলো সে কাফের হবে না।

وَكَذَا اِذَا قَالَ اِنْ فَعَلْتُ كَذَا الخ : কসমের ক্ষেত্রে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা যেমন আল্লাহর অসন্তুষ্টি ইত্যাকার শব্দাবলি দ্বারা কসম সংঘটিত হবে না। তাছাড়া এগুলো কসমের ক্ষেত্রে প্রচলিত নয়।

https://e-ilm.weebly.com/

فَصْلٌ فِي الْكَفَّارَةِ

قَالَ كَفَّارَةُ الْيَمِيْنِ عِتْقُ رَقَبَةٍ يُجْزِيْ فِيْهَا مَا يُجْزِيْ فِي الظِّهَارِ وَإِنْ شَاءَ كَسَا عَشَرَةَ مَسَاكِيْنَ كُلَّ وَاحِدٍ ثَوْبًا فَمَا زَادَ، وَأَدْنَاهُ مَا يَجُوْزُ فِيْهِ الصَّلَاةُ وَإِنْ شَاءَ أَطْعَمَ عَشَرَةَ مَسَاكِيْنَ كَالْإِطْعَامِ فِيْ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَالْأَصْلُ فِيْهِ قَوْلُهُ تَعَالٰى ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِيْنَ﴾ الْآيَةَ، وَكَلِمَةُ أَوْ لِلتَّخَيُّرِ فَكَانَ الْوَاجِبُ أَحَدَ الْأَشْيَاءِ الثَّلَاثَةِ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلٰى أَحَدِ الْأَشْيَاءِ الثَّلَاثَةِ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللّٰهُ : يُخَيَّرُ لِإِطْلَاقِ النَّصِّ . وَلَنَا قِرَاءَةُ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ وَهِيَ كَالْخَبَرِ الْمَشْهُوْرِ۔

অনুচ্ছেদ : কাফফারা প্রসঙ্গে

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কসমের কাফফারা হলো একটি গোলাম আজাদ করা। যিহার এর কাফফারার ক্ষেত্রে যে ধরনের গোলাম গ্রহণযোগ্য হয়। এক্ষেত্রেও তা গ্রহণযোগ্য হবে। আর ইচ্ছা করলে দশজন মিসকিনের প্রত্যেককে এক বা একাধিক বস্ত্রদান করবে। আর বস্ত্রের সর্বনিম্ন পরিমাণ হলো যা দ্বারা সালাত আদায় করা জায়েজ হয়। আবার ইচ্ছা করলে দশজন মিসকিনকে যিহারের কাফফারার অনুরূপ খাদ্য প্রদান করবে। এক্ষেত্রে দলিল হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী- فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِيْنَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ أَهْلِيْكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ অতঃপর কসমের কাফফারা হলো দশজন মিসকিনকে খাদ্য প্রদান। তোমাদের পরিবারকে তোমরা যে খাদ্য প্রদান কর তার মধ্যম মানের খাবার কিংবা তাদের কে বস্ত্র প্রদান করা কিংবা একটি গোলাম আজাদ করা। আয়াতে او (অথবা) অব্যয়টি ইচ্ছাধিকার প্রদানের জন্য। সুতরাং এই তিনটি জিনিসের যে কোনো একটি ওয়াজিব।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, এই তিনটির কোনোটি যদি আদায় করতে সক্ষম না হয়, তাহলে লাগাতার তিনদিন রোজা রাখবে। আর ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, তাকে লাগাতার রোজা রাখা বা না রাখার ব্যাপারে ইচ্ছা প্রদান করা হবে। কেননা আয়াতটি নিঃশর্ত। আমাদের প্রমাণ হলো হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত কেরাত যেখানে فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ বরং এটা মাশহুর হাদীসের পর্যায়ে বলে গণ্য।

https://e-ilm.weebly.com/

ثُمَّ الْمَذْكُوْرُ فِي الْكِتَابِ فِي بَيَانِ اَدْنَى الْكِسْوَةِ مَرْوِيٌّ عَنْ مُحَمَّدٍ . وَعَنْ اَبِيْ حَنِيْفَةَ وَاَبِيْ يُوْسُفَ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ اَنَّ اَدْنَاهُ مَا يَسْتُرُ عَامَّةَ بَدَنِهِ حَتّٰى لَا يَجُوْزَ السَّرَاوِيْلَ، وَهُوَ الصَّحِيْحُ لِاَنَّ لَابِسَهُ يُسَمّٰى عُرْيَانًا فِي الْعُرْفِ، لٰكِنَّ مَا لَا يُجْزِيْهِ عَنِ الْكِسْوَةِ يُجْزِيْهِ عَنِ الطَّعَامِ بِاِعْتِبَارِ الْقِيْمَةِ ـ

অনুবাদ : সর্বনিম্ন পরিমাণ বস্ত্র সম্পর্কে কিতাবে যা উল্লেখ করা হয়েছে, তা ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ ও আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত যে, সর্বনিম্ন বস্ত্রের পরিমাণ হলো দেহের অধিকাংশ আবৃত করে। একারণেই শুধু পায়জামা (বা লুঙ্গি) দেওয়া জায়েজ হবে না। এটাই সঠিক অভিমত। কেননা লোক প্রচলনে এতটুকু পোশাক পরিধানকারী কে নগ্ন বলা হয়। তবে পোষাক হিসেবে যে পরিমাণ গ্রহণযোগ্য নয়, মূল্য বিবেচনায় তা খাদ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কসম সংঘটিত হওয়ার পর তা সম্পূর্ণ করা আবশ্যক। কিন্তু যদি তা পূরণ না করে রবং ভঙ্গ করে দেয় তাহলে সে আল্লাহর নামের অবমাননা করল। আল্লাহর নামের এই অবমামনার গুনাহ থেকে বাচার জন্য কাফফারা ওয়াজিব হয়। আর সেই কাফফারা আদায় হবে গোলাম আজাদ করা, খানা খাওয়ানো অথবা কাপড় প্রদান করার মাধ্যমে। উক্ত তিনটি থেকে কসম ভঙ্গকারী যে কোনো একটিকে নির্বাচন করে আদায় করে দিবে।

قوله : فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَحَدِ الْأَشْيَاءِ الخ : ইমাম আবূ হানীফা (র.) এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, কাফফারার ক্ষেত্রে কাপড় প্রদান করলে এতটুকু পরিমাণ দিতে হবে যার দ্বারা শরীরের অধিকাংশ আবৃত হয়ে যায়। সুতরাং পুরুষকে শুধু পায়াজমা বা লুঙ্গি প্রদান করলে কাফফারা আদায় হবে না। এই মতামতই বিশুদ্ধ। কেননা পায়জামা পরিধানকারীকে পরিভাষায় উলঙ্গ হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়। তবে কাপড় ক্রয় করতে যে পরিমাণ টাকার প্রয়োজন হয় তা থেকে কম টাকা দিয়ে যদি খানার ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে তা দিয়ে খানার ব্যবস্থা করলে কাফফারা আদায় হয়ে যাবে।

নোট : উদাহরণ স্বরূপ কারো নিকট দশ টাকা আছে যার দ্বারা দশজন ফকিরকে ভালোভাবে খানা খাওয়ানো যায় কিন্তু কাপড় দিলে তা দ্বারা সম্ভব নয়; বরং ত্রিশ টাকার প্রয়োজন হয়। এমতাবস্থায় দশ টাকা যদি কাপড় বাবদ দিয়ে দেয় তাহলে কাফফারা আদায় হবে না। আর যদি তা দ্বারা খানা প্রদান করে তাহলে কাফফারা আদায় হয়ে যাবে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَإِنْ قَدَّمَ الْكَفَّارَةَ عَلَى الْحِنْثِ لَمْ يُجْزِهِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يُجْزِيْهِ بِالْمَالِ لِأَنَّهُ أَدَّاهَا بَعْدَ السَّبَبِ وَهُوَ الْيَمِيْنُ فَأَشْبَهَ التَّكْفِيْرَ بَعْدَ الْجَرْحِ . وَلَنَا أَنَّ الْكَفَّارَةَ لِسَتْرِ الْجِنَايَةِ وَلَا جِنَايَةَ هَاهُنَا، وَلَيْسَتْ بِسَبَبٍ لِأَنَّهُ مَانِعٌ غَيْرُ مُفْضٍ، بِخِلَافِ الْجَرْحِ لِأَنَّهُ مُفْضٍ . ﴿ثُمَّ لَا يُسْتَرَدُّ مِنَ الْمِسْكِيْنِ﴾ لِوُقُوْعِهِ صَدَقَةً ـ

অনুবাদ : যদি কসম ভঙ্গের আগে কাফফারা আদায় করে তাহলে যথেষ্ট হবে না। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, সম্পদ দ্বারা আদায়কৃত কাফফারা গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা সে কাফফারার কারণ তথা কসম সংঘটিত হওয়ার পর কাফফারা আদায় করেছে। সুতরাং এটি আঘাত করার পর (আহত ব্যক্তির মৃত্যুর পূর্বে) আদায়কৃত কাফফারার সদৃশ হলো। আমাদের দলিল এই যে, কাফফারা হচ্ছে অপরাধ ঢাকা দেওয়ার জন্য। অথচ এখানে কোনো অপরাধ নেই। আর কসম কাফফারার কারণ নয়। কেননা কসম তো রোধকারী, কাফফারার প্রতি উপনীতকারী নয়। পক্ষান্তরে আঘাত হচ্ছে মৃত্যুতে উপনীতকারী। তবে (আদায়কৃত কাফফারা) দরিদ্রের কাছ থেকে ফেরত নেওয়া যাবে না। কেননা তা সদকা হয়ে গেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কোনো বিষয়ের উপর কসম করার পর তা ভঙ্গ করার পূর্বে কাফফারা আবশ্যক হয় না। সুতরাং কসম ভঙ্গ করার পূর্বে তা আদায় করলে আদায় হবে না। এটা হানাফী মাজহাবের অভিমত। কিন্তু শাফেয়ীদের মাযহাব হলো : সম্পদ দ্বারা যদি কাফফারা আদায় করে তহলে তা আদায় হয়ে যাবে। কেননা কাফফারা আবশ্যক হওয়ার কারণ অর্থাৎ কসম করা তা পূর্বেই পাওয়া গেছে। এর উদাহরণ স্বরূপ যদি তার ক্ষতি পূরণ দিয়ে দেয় তাহলে তা আদায় হয়ে যায়।

আমাদের দলিল হলো কাফফারা দেওয়ার উদ্দেশ্য হলো কৃত অপরাধকে ঢাকা দেওয়া। আর কসম করার দ্বারা কোনো অপরাধ হয় না বরং ভঙ্গ করার দ্বারা অপরাধ হয়। সুতরাং কসম ভঙ্গ করার পূর্বে কসমের কাফফারা আদায় করে কাকে ঢাকবে? কসম কোনো অপরাধ না! কারণ কসম করা হয় কোনো বিষয়কে দৃঢ় করার জন্য। কাজ করা বা না করার জন্য প্রত্যয়পণ হওয়া সুতরাং তা কি করে আপরাধ হতে পারে? তাছাড়া কসম করলেই যে ভঙ্গ করতে হবে তাও না বরং ভঙ্গ না করারই সম্ভাবনা বেশি। সুতরাং কোনোভাবেই কসম করাকে অপরাধ বলে ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। কিন্তু ক্ষত করার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা ক্ষত করাটা ব্যক্তিকে মৃত্যু পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়।

অর্থাৎ জখম করার ব্যাপারে মৃত্যুর পূর্বেই কাফফারা দিলে আদায় হওয়ার কারণ হলো এ ধরনের মারাত্মক আঘাত এর পরিণাম মৃত্যুই হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে কসম করাটা কাফফারা পর্যন্ত পৌছানো স্বাভাবিক নয়। কেননা এমন অনেক মানুষ আছে যে, কসম করে ঐ কসমের উপর আজীবন বহাল থাকে সে তার কসম কে ভঙ্গ করে না। ফলে তার উপর কাফফারা আবশ্যক হয় না, বিধায় কসম ভঙ্গ করার আগে যদি কাফফারা দিয়ে দেয় তাহলে ঐ কাফফারা যথেষ্ট হবে না তবে ঐ কাফফারাটি সদকা হিসেবে হয়ে যাবে।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ وَمَنْ حَلَفَ عَلٰى مَعْصِيَةٍ مِثْلَ اَنْ لَا يُصَلِّيَ اَوْ لَا يُكَلِّمَ اَبَاهُ اَوْ لَيَقْتُلَنَّ فُلَانًا يَنْبَغِي اَنْ يُحْنِثَ نَفْسَهُ وَيُكَفِّرَ عَنْ يَمِيْنِهِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ وَرَاٰى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ثُمَّ لِيُكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِهِ» " وَلِاَنَّ فِيْمَا قُلْنَاهُ تَفْوِيْتُ الْبِرِّ اِلٰى جَابِرٍ وَهُوَ الْكَفَّارَةُ وَلَا جَابِرَ لِلْمَعْصِيَةِ فِي ضِدِّهِ وَاِذَا حَلَفَ الْكَافِرُ ثُمَّ حَنِثَ فِيْ حَالِ كُفْرِهِ اَوْ بَعْدَ اِسْلَامِهِ فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ لِاَنَّهُ لَيْسَ بِاَهْلٍ لِلْيَمِيْنِ لِاَنَّهَا تُعْقَدُ لِتَعْظِيْمِ اللّٰهِ تَعَالٰى، وَمَعَ الْكُفْرِ لَا يَكُوْنُ مُعَظِّمًا وَلَا هُوَ اَهْلُ الْكَفَّارَةِ لِاَنَّهَا عِبَادَةٌ وَمَنْ حَرَّمَ عَلٰى نَفْسِهِ شَيْئًا مِمَّا يَمْلِكُهُ لَمْ يَصِرْ مُحَرَّمًا وَعَلَيْهِ اِنِ اسْتَبَاحَهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ : لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ لِاَنَّ تَحْرِيْمَ الْحَلَالِ قَلْبُ الْمَشْرُوْعِ فَلَا يَنْعَقِدُ بِهِ تَصَرُّفٌ مَشْرُوْعٌ وَهُوَ الْيَمِيْنُ . وَلَنَا اَنَّ اللَّفْظَ يُنْبِئُ عَنْ اِثْبَاتِ الْحُرْمَةِ، وَقَدْ اَمْكَنَ اِعْمَالُهُ بِثُبُوْتِ الْحُرْمَةِ لِغَيْرِهِ بِاِثْبَاتِ مُوْجِبِ الْيَمِيْنِ فَيُصَارُ اِلَيْهِ۔

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কেউ যদি কোনো গুনাহ করার ব্যাপারে কসম করে। যেমন কসম করল নামাজ পড়বে না, কিংবা সে তার পিতার সাথে কথা বলবে না কিংবা অমুককে হত্যা করবে। তাহলে তার কর্তব্য হবে কসম ভঙ্গ করে ফেলা এবং কাফফারা আদায় করা। কেননা নবী করীম ﷺ বলেছেন– مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ وَرَاٰى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ثُمَّ لِيُكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِهِ - যে ব্যক্তি কোনো বিষয়ের কসম করে কিন্তু বিপরীত বিষয়টি কে কসমের চেয়ে উত্তম মনে করে তাহলে সে যেন উত্তমটি করে, অতঃপর কসমের কাফফারা আদায় করে।

তাছাড়া এই কারণে যে আমরা যে সুরতে বলেছি তাতে যদিও কসম পূর্ণ হওয়া হাতছাড়া হয়ে যায়। তবু কাফফারা দ্বারা তার ক্ষতি পূরণ হয়ে যায়। আর এর বিপরীত গুনাহের কর্ম করে ফেললে ক্ষতিপূরণের কোনো অবকাশ নেই।

কাফের যদি কসম করে, অতঃপর কাফের অবস্থায় কিংবা ইসলাম গ্রহণের পর কসম ভঙ্গ করে তাহলে সে কসম ভঙ্গের অপরাধী হবে না। কেননা সে কসমের যোগ্য নয়। কারণ কসম তো আল্লাহর নামের মর্যাদার ভিত্তিতে সংঘটিত হয়। আর কুফরের অবস্থায় সে (আল্লাহর নামের প্রতি) সম্মান প্রদর্শনকারী গণ্য নয়। আর সে কাফফারা আদায় করারও যোগ্য নয়। কেননা কাফফারা হচ্ছে ইবাদত বিশেষ।

কেউ যদি নিজের মালিকানা কোনো বস্তুকে নিজের জন্য হারাম ঘোষণা করে তাহলে তা হারাম হবে না। এখন যদি উক্ত ব্যক্তি সেগুলোকে মুবাহরূপে ব্যবহার করে তাহলে তার উপর কসমের কাফফারা ওয়াজিব হবে।

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, তার উপর কাফফারা নেই। কেননা হালালকে হারাম ঘোষণা করার অর্থ শরিয়তের বিধান পরিবর্তন করা। সুতরাং এ দ্বারা শরিয়তের একটি বৈধ কর্ম তথা কসম সংঘটিত হবে না। আমাদের দলিল এই যে, তার বক্তব্য হারাম হওয়ার অর্থ ব্যক্ত করে। আর তা কার্যকরী করা সম্ভবত ভিন্নভাবে হারাম সাব্যস্ত করার মাধ্যমে; অর্থাৎ কসমের হুকুম প্রবর্তন করার মাধ্যমে। সুতরাং সে হুকুমের দিকেই উপনীত হতে হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

ثُمَّ اِذَا فعل مِمَّا حَرَّمَهُ قَلِيْلًا اَوْ كَثِيْرًا حَنِثَ وَوَجَبَتِ الْكَفَّارَةُ وَهُوَ الْمَعْنٰى مِنَ الْاِسْتِبَاحَةِ الْمَذْكُوْرَةِ لِاَنَّ التَّحْرِيْمَ اِذَا ثَبَتَ تَنَاوَلَ كُلَّ جُزْءٍ مِنْهُ ـ

অনুবাদ : অতঃপর যা সে হারাম করেছে, তার অল্প বা বেশি যদি ব্যবহার করে ফেলে তাহলে কসম ভঙ্গকারী হয়ে যাবে এবং কাফফারা ওয়াজিব হবে। আর তাই হলো উল্লিখিত মুবাহরূপে ব্যবহারের অর্থ। কেননা হারাম হওয়া যখন সাব্যস্ত হলো তখন তা সে বিষয়ের প্রতিটি অংশকে অন্তর্ভুক্ত করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কোনো ব্যক্তি যদি গুনাহ করার ব্যাপারে কসম করে তাহলে তার উচিত ঐ কসম ভঙ্গ করে ফেলা কসমের জন্য কাফফারা আদায় করে দেওয়া। কেননা কসম ভঙ্গ করার অন্যায় মোচনের জন্যই শরিয়ত কাফফারার বিধান রেখেছে। সুতরাং তা গ্রহণ করা উচিত। এমনিভাবে রাসূল ﷺ উম্মতকে এ দিকে পথ নির্দেশ করেছে।

قَوْلُهُ : وَاِذَا حَلَفَ الْكَافِرُ ثُمَّ حَنِثَ الخ : কোনো ব্যক্তি যদি কাফের অবস্থায় কোনো ভালো কাজের কসম করে, তাহলে মুসলমান হওয়ার পর ঐ কাজটা পুরা করা মোস্তাহাব। এটা ইমাম আবূ হানীফা ও মালেক (র.) এর অভিমত। –[তাকমিলায়ে ফতহুল মুলহিম ২য় খণ্ড; ২১৮ পৃষ্ঠা]

আর যদি সে ঐ কাজটি সম্পন্ন না করে তাহলে তার উপর কাফফারা আবশ্যক হবে না। কেননা কাফের অবস্থায় যেই কসম করা হয়েছে সেই সময় সে শরিয়তের আওতাভুক্ত না হওয়ার কারণে কসমটি তার উপর আবশ্যক হয় না। বিধায় কাফফারাও লাযেম হবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

وَلَوْ قَالَ كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ حَرَامٌ فَهُوَ عَلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ اِلَّا اَنْ يَنْوِيَ غَيْرَ ذٰلِكَ وَالْقِيَاسُ اَنْ يَحْنَثَ كَمَا فَرَغَ لِاَنَّهُ بَاشَرَ فِعْلًا مُبَاحًا وَهُوَ التَّنَفُّسُ وَنَحْوُهُ، هٰذَا قَوْلُ زُفَرَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى . وَجْهُ الْاِسْتِحْسَانِ اَنَّ الْمَقْصُوْدَ وَهُوَ الْبِرُّ لَا يَتَحَصَّلُ مَعَ اعْتِبَارِ الْعُمُوْمِ، وَاِذَا سَقَطَ اعْتِبَارُهُ يَنْصَرِفُ اِلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ لِلْعُرْفِ فَاِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ فِيْمَا يَتَنَاوَلُ عَادَةً . وَلَا يَتَنَاوَلُ الْمَرْاَةَ اِلَّا بِالنِّيَّةِ لِاِسْقَاطِ اعْتِبَارِ الْعُمُوْمِ . وَاِذَا نَوَاهَا كَانَ اِيْلَاءً وَلَا تُصْرَفُ الْيَمِيْنُ عَنِ الْمَاْكُوْلِ وَالْمَشْرُوبِ، وَهٰذَا كُلُّهُ جَوَابُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ . وَمَشَايِخُنَا قَالُوْا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ عَنْ غَيْرِ نِيَّةٍ لِغَلَبَةِ الْاِسْتِعْمَالِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوٰى، وَكَذَا يَنْبَغِيْ فِيْ قَوْلِهِ حَلَالٌ يُرْوٰى حَرَامٌ لِلْعُرْفِ . وَاخْتَلَفُوْا فِيْ قَوْلِهِ هرجه بردست رَاسَتْ كيرم بروي وَخِيَارْ اَنَّهُ هَلْ تُشْتَرَطُ النِّيَّةُ وَالْاَظْهَرُ اَنَّهُ يُجْعَلُ طَلَاقًا مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ لِلْعُرْفِ ـ

অনুবাদ : আর যদি বলে সকল হালাল আমার জন্য হারাম তাহলে তা শুধু পানাহারকে অন্তর্ভুক্ত করবে। অবশ্য অন্য কিছু নিয়ত করলে তাও অন্তর্ভুক্ত হবে। তবে কিয়াসের দাবি এই যে, কসমের উচ্চারণ থেকে ফারেগ হওয়া মাত্র সে কসম ভঙ্গকারী হয়ে যাবে। কেননা একটি হালাল কাজ সে করেছে। আর তা হলো শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ ইত্যাদি। আর তা ইমাম যুফার (র.)-এর মতে ইস্তেহসান তথা সূক্ষ্ম কিয়াসের দলিল এই যে, ইয়ামীন বা কসমের উদ্দেশ্য হচ্ছে কসম রক্ষা করা। আর ব্যাপকতা বিবেচনার অবস্থা তা অর্জিত হয় না। আর ব্যাপকতার দিকটি বিবেচনা করা যখন রহিত হয়ে গেল তখন প্রচলিত ব্যবহার হিসেবে তা পানাহারের দিকেই অভিমুখী হবে। কেননা হালাল শব্দটি সাধারণত পানাহারের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা হয়।

আর ব্যাপকতার দিকটি রহিত হয়ে যাওয়ার কারণে নিয়ত ছাড়া স্ত্রী তার অন্তর্ভুক্ত হবে না। আর যদি স্ত্রীর নিয়ত করে তাহলে সেটা ঈলা (স্ত্রী সহবাস না করার শপথ) হবে। আর তা সত্ত্বেও কসমটি খাদ্য ও পানীয় থেকে রহিত হবে না। এ সবই জাহিরে রেওয়াতের সিদ্ধান্ত। আর আমাদের মাশায়েখগণ বলেছেন, উপরিউক্ত বাক্য দ্বারা নিয়ত ছাড়া তালাক পতিত হবে। কেননা এ অর্থেই এর ব্যবহার অধিক এবং এর উপর ফতোয়া। অনুরূপভাবে তার বক্তব্য "প্রত্যেক হালাল বস্তু আমার জন্য হারাম দ্বারা উদ্দেশ্য যা প্রচলনে হারাম এ সুরতে তালাক পতিত হওয়া উচিত। তবে যদি বলে ডান হাতে আমি যা ধরব তা আমার উপর হারাম, তাহলে নিয়ত শর্ত কিনা এ ব্যাপারে দ্বিমত রয়েছে। প্রকাশ্য কথা হলো এ ব্যাপারে নিয়ত ছাড়াই তালাক হবে প্রচলন থাকার কারণে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যদি কোনো ব্যক্তি বলে প্রত্যেক বৈধ বস্তু আমার উপর হারাম। তাহলে কিয়াসের চাহিদা মোতাবেক সে শ্বাস গ্রহণের দ্বারাই কসম ভঙ্গকারী সাব্যস্ত হয়ে যায়। কেননা শ্বাস গ্রহণ করাটাও "প্রত্যেক বৈধ বস্তু" এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু ফুকাহায়ে কেরাম এস্তেহসান হিসেবে বলেছেন, সে কসম ভঙ্গকারী হবে না। কেননা কসম করাই হয় পূর্ণতার জন্য । সুতরাং পূর্ণ করার জন্য তাকে সুযোগ দিতে হবে। বিধায় উক্ত বক্তব্য দ্বারা ঐ সমস্ত বস্তুই কসমের অন্তর্ভুক্ত হবে যা প্রচলনে রয়েছে। আর যদি এর দ্বারা নিজ স্ত্রী উদ্দেশ্য হয়, তাহলে ঈলা স্ত্রী সহবাস না করার শপথ হবে। এটা হলো জাহেরে রেওয়ায়েত। কিন্তু মাশায়েখগণ বলেছেন নিয়ত করুক বা না করুক উক্ত বক্তব্য দ্বারা তালাক পতিত হয়ে যাবে।

https://e-ilm.weebly.com/

ومَنْ نذر نذْرًا مُطْلقًا فعليْهِ الْوَفاءُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ ﴿مَنْ نَذَرَ وَسَمّٰى فَعَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِمَا سَمّٰى﴾ . وانْ علّق النّذْرَ بشرْطٍ فوُجِدَ الشّرْطُ فَعَلَيْهِ الْوَفاءُ بنفْسِ النّذْرِ لِإطْلَاقِ الْحديْث، ولِانّ الْمُعلّق بِالشّرْطِ كَالْمُنَجّزِ عِنْدَهُ (وَعَنْ ابِيْ حنِيْفَةَ رحِمَهُ اللّٰهُ انّهُ رجَعَ عَنْهُ وقال : اذا قال انْ فعلْت كَذَا فَعَلَيَّ حَجّةٌ اَوْ صَوْمُ سَنَةٍ اَوْ صَدَقَةُ مَا اَمْلِكُهُ اَجْزَاهُ مِنْ ذٰلك كفّارَةُ يَمِيْنٍ . وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ) وَيَخْرُجُ عَنِ الْعُهْدَةِ بِالْوَفاءِ بِمَا سَمّٰى ايضا . وَهٰذا اذَا كَانَ شَرْطًا لَا يُرِيْدُ كَوْنَهُ لِانّ فِيْهِ مَعْنَى الْيَمِيْنِ وَهُوَ الْمَنْعُ وَهُوَ بِظَاهِرِهِ نَذْرٌ فيَتخيّرُ وَيَمِيْلُ اِلٰى اَيِّ الْجِهَتَيْنِ شَاءَ، بِخِلَافِ مَا اِذَا كَانَ شَرْطًا يُرِيْدُ كَوْنَهُ كَقَوْلِهِ اِنْ شفَى اللّٰهُ مَرِيضِيْ لِانْعِدَامِ مَعْنَى الْيَمِيْنِ فِيْهِ وَهٰذَا التَّفْصِيْلُ هُوَ الصَّحِيْحُ قَالَ ومَنْ حلف علٰى يَمِيْنٍ وَقَالَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مُتَّصِلًا بِيَمِيْنِهِ فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ ﴿مَنْ حَلَفَ عَلَىٰ يَمِيْنٍ وَقَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ فَقَدْ بَرَّ فِي يَمِيْنِهِ﴾ اِلَّا اَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الِاتِّصَالِ لِاَنَّهُ بَعْدَ الْفَرَاغِ رُجُوْعٌ وَلَا رُجُوْعَ فِي الْيَمِيْنِ -

অনুবাদ : কেউ যদি শর্তহীন মানত করে তাহলে তাকে তা পূর্ণ করতে হবে। কেননা নবী করীম ﷺ বলেছেন– যে ব্যক্তি কোনো বিষয়ের উল্লেখ করে মানত করে তার কর্তব্য হবে উল্লেখিত বিষয়টি সম্পন্ন করা। আর যদি মানতকে কোনো শর্তের সাথে যুক্ত করে আর ঐ শর্ত অস্তিত্ব লাভ করে তাহলে স্বয়ং মানতটি পূর্ণ করা তার জন্য অবশ্য কর্তব্য। কেননা সংশ্লিষ্ট হাদীসটি নিঃশর্ত। তাছাড়া ইমাম আবূ হানীফা (র.) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি এ মত থেকে প্রত্যাবর্তন করেছেন। তিনি বলেছেন, যদি কেউ বলে– যদি আমি এ কাজ করি তাহলে আমার উপর এক হজ কিংবা এক বছরের রোজা কিংবা আমার মালিকানার মাল সদকা করা ওয়াজিব হবে। তাহলে এর পরিবর্তে কসমের কাফফারাই যথেষ্ট হবে। এটা ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমত এবং উল্লেখকৃত আমলটি সম্পন্ন করার মাধ্যমেও সে দায়িত্ব মুক্ত হয়ে যাবে। এ সিদ্ধান্ত হবে তখন যখন শর্তটি এমন হয়, যা সম্পন্ন হওয়া তার কাম্য নয়। কেননা এতে কসমের মর্ম বিদ্যমান রয়েছে। আর তা হলো বিরত থাকা। কিন্তু বাহ্যত এটা হচ্ছে মানত। সুতরাং তাকে ইচ্ছাধিকার প্রদান করা হবে। আর দুটি দিকের যে কোনো একটি দিক সে গ্রহণ করতে পারে। পক্ষান্তরে যদি এমন শর্ত হয় যা তার কাম্য, যেমন সে বলল আল্লাহ যদি আমাকে আরোগ্য দান করেন তাহলে বিষয়টি ভিন্ন হবে। কেননা তাতে কসমের মর্ম বিদ্যমান নেই। আর তা হচ্ছে বিরত থাকা। এই বিশদ বিবরণই বিশুদ্ধ।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কেউ যদি কোনো বিষয়ের উপর কসম করে এবং কসমের সাথে সাথে ইনশাআল্লাহ বলে, তাহলে সে কসম ভঙ্গকারী হবে না। কেননা নবী করীম ﷺ বলেন : কেউ যদি কোনো বিষয়ের উপর কসম করে এবং সেই সাথে ইনশাআল্লাহ বলে তাহলে সে তার কসমের ব্যাপারে দায় মুক্ত হয়ে গেল। তবে সাথে সাথে হওয়া অপরিহার্য। কেননা কসম উচ্চারণ থেকে ফারেগ হওয়ার পর ইনশাআল্লাহ বলার অর্থ হলো প্রত্যাহার করা। অথচ ইয়ামীনের ক্ষেত্রে প্রত্যাহার করার কোনো অবকাশ নেই।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

নোট : কোনো ব্যক্তির কথার মাঝে যদি এমন কোনো শর্ত থাকে যা হওয়া তার কাম্য তাহলে সেটা মানত বলে আখ্যায়িত হবে। আর যদি এমন শর্ত হয় যেটা হওয়াকে সে পছন্দ করে না বা তার কাম্য নয়, তাহলে তাতে বিরত থাকার অর্থ পাওয়া যাওয়ার কারণে এক দৃষ্টিকোণে সেটা মানত অপর দৃষ্টিকোণে সেটা কসম হবে। সুতরাং ইচ্ছা মানত হলে পূরণ করবে নতুবা কাফফারা দিবে।

কোনো ব্যক্তি যদি শর্তহীন মানত করে তাহলে তা পূরণ করা তার জন্য আবশ্যক। কেননা এ অবস্থায় মানত পূরণ করতে রাসূল ﷺ নির্দেশ দিয়েছেন।

নোট : উক্ত হাদীসটি গরীব। যদিও এই মর্মে আরো অনেক হাদীস রয়েছে, যেমন হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদীসের শেষাংশে রয়েছে : রাসূল ﷺ বলেন, তুমি কি তার ঋণ পরিশোধ করাকে আবশ্যক মনে কর না? প্রশ্নকারী বলল অবশ্যই। তারপর রাসূল ﷺ আবার বললেন, সুতরাং আল্লাহ তা'আলার ঋণ পরিশোধ করা আরো বেশি উপযোগী। -[বুখারী]

অপর এক বর্ণনায় এসছে রাসূল ﷺ -এর নিকট হযরত ওমর (রা.) আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ আমি জাহেলি জমানায় মানত করেছিলাম বায়তুল্লাহ শরীফে একদিন এতেকাফ করব। উত্তরে রাসূল ﷺ বললেন, তুমি তোমার মানত পূর্ণ কর। -[বুখারী মুসলিম]

অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে গুনাহের মান্নত পূর্ণ করবে না। -[মুসলিম]

অপর বর্ণনায় আছে এক মহিলা এসে রাসূল ﷺ -এর নিকট আরজ করল ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! আমি এই মর্মে মানত করেছি যে, আপনার উপস্থিতিতে দফ বাজাব, তখন রাসূল ﷺ বললেন, তুমি তোমার মানত পূরণ কর। আবূ দাউদ শরীফে এই বর্ণনাটি রয়েছে। এই হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে দফ বাজানো এটা অন্যায়ের কিছু নয়। এ কারণেই বিবাহে দফ বাজনোর মাধ্যমে ঘোষণার সুযোগ রয়েছে।

আরেক বর্ণনায় রয়েছে যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'লার আনুগত্যের ইচ্ছা করে তাহলে সে যেন তা করে ফেলে, আর কেউ যদি নাফরমানির ইচ্ছা করে তাহলে সে যেন তা থেকে বিরত থাকে। -[বুখারী]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, কোনো ব্যক্তি কসম করার পর সাথে সাথে যদি বলে যে, আল্লাহ চাহে তো ইনশাআল্লাহ তাহলে সে কসম ভঙ্গকারী হবে না। তবে তা বলতে হবে কসমের সাথে সাথেই, কেননা কসম করার দীর্ঘ সময় পর তা বললে কসম থেকে প্রত্যাবর্তন করা আবশ্যক হয়, আর কসম সম্পন্ন করার পর তা থেকে প্রত্যাবর্তন করা যায় না।

নোট : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, কসমের পরও তা থেকে কিছু বিষয়কে বাদ দেওয়া যায়। আর হযরত জাবের (রা.) বলেন রাসূল ﷺ এক ব্যক্তিকে দেখে বললেন, আল্লাহ তা'আলা তাকে হত্যা করাক! সে বলল, হে রাসূল ﷺ আল্লাহর রাস্তায়? রাসূল বললেন, হ্যাঁ আল্লাহর রাস্তায়। পরবর্তীতে সেই লোক আল্লাহর পথে শহীদ হয়ে যায়। (মুয়াত্তা মালেক) জমহুর উলামায়ে কেরামের নিকট কসম করার পর তা থেকে কিছু আলাদা করা যায় না।

قَوْلُهُ : وَمَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ الخ : বর্ণিত রয়েছে বাদশা হারুনুর রশীদ ইমাম আবূ হানীফা (র.) কে ডেকে বললেন যে, আপনি আমার দাদা তথা ইবনে আব্বাস (রা.)-এর সাথে ইনশাআল্লাহর মাসআলায় দ্বিমত পোষণ করেন? তখন ইমাম আবূ হানীফা (র.) বললেন, জনাব আমার দ্বিমত করাটা হলো আপনার খেলাফত টিকিয়ে রাখা। খলিফা জিজ্ঞাসা করলেন তা কিভাবে? উত্তরে বললেন, যারা আপনার খেলাফত মেনে বায়আত গ্রহণ করেছে তাদের যখন মন চাইবে ইনশাআল্লাহ বলে যেন বায়আত থেকে বের হয়ে আসতে না পারে। তখন খলিফা আশ্চর্য হয়ে গেলেন।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ الْيَمِيْنِ فِى الدُّخُوْلِ وَالسُّكْنٰى

وَمَنْ حلف لا يَدْخُلُ بَيْتًا فدخل الْكَعْبَةَ اَوْ الْمَسْجِدَ اَوْ الْبِيْعَةَ اَوْ الْكَنِيْسَةَ لَمْ يَحْنَثْ لِاَنَّ الْبَيْت ما أُعِدَّ لِلْبَيْتُوتَةِ وَهٰذِهِ الْبِقَاعُ مَا بُنِيَتْ لَهَا وكذا اذا دخل دِهْلِيْزًا اَوْ ظُلَّةَ بَابِ الدَّارِ لِمَا ذكرنا. وَالظُّلَّةُ ما تكون على السِّكَّةِ. وَقِيْلَ اِذَا كَانَ الدِّهْلِيْزُ بِحَيْثُ لَوْ أُغْلِقَ الْبَابُ يَبْقَى داخلا وهُو مُسْقف يَحْنَثُ لِاَنَّهُ يُبَاتُ فِيْهِ عَادَةً وَاِنْ دَخَلَ صُفَّةً حَنِثَ لِاَنَّهَا تُبْنَى لِلْبَيْتُوتَةِ فِيْهَا فِيْ بعْض الْاَوْقاتِ فَصَارَ كَالشَّتْوِيِّ وَالصَّيْفِيِّ . وَقِيْلَ هٰذَا اِذَا كَانَتْ الصُّفَّةُ ذَاتَ حوائط اَرْبَعَةٍ، وهٰكَذَا كَانَتْ صِفَافُهُمْ . وَقِيْلَ الْجَوَابُ مُجْرًى عَلٰى اِطْلَاقِهِ وَهُوَ الصَّحِيْحُ ـ

পরিচ্ছেদ : প্রবেশ এবং বসবাস বিষয়ক কসম

অনুবাদ : কেউ যদি কসম করে যে, কোনো গৃহে সে প্রবেশ করবে না। অতঃপর বায়তুল্লায় কিংবা কোনো মসজিদে কিংবা গির্জায় কিংবা ইহুদিদের উপাসনালয়ে প্রবেশ করে তাহলে সে কসম ভঙ্গকারী হবে না। কেননা গৃহ দ্বারা রাত্রি যাপনের জন্য নির্ধারিত গৃহকেই বোঝানো হয়েছে। অথচ এ সকল গৃহ সেজন্য তৈরি করা হয় না। **অদ্রূপ যদি কোনো গৃহের বারান্দায় বা গৃহের প্রবেশ পথের ছাউনীতে প্রবেশ করে, তাহলে কসম ভঙ্গকারী হবে না।**

কারণ সেটাই, যা আমরা উল্লেখ করেছি। ছাউনী বলতে ঐ অংশ উদ্দেশ্য যা বাড়ির বাইরে গলির উপর থাকে। কোনো কোনো মতে বারান্দা যদি এমন হয় যে, দরজা বন্ধ করলে তা ঘরের ভিতরে এসে যায় এবং ছাদ যুক্ত হয় তাহলে কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা এ ধরনের স্থানে সাধারণত রাত্রি যাপন করা হয়। **যদি চত্বরে প্রবেশ করে তাহলেও কসম ভঙ্গ হবে।** কেননা মাঝে মধ্যে রাত্রিযাপন করা হবে, এ উদ্দেশ্যেই তা বানানো হয়। সুতরাং শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন রাত্রি যাপনের উদ্দেশ্যে তৈরি স্থানের মতোই হলো। কোনো কোনো মতে চত্বর যদি চার দেয়াল বিশিষ্ট হয়। তাহলে উপরিউক্ত সিদ্ধান্ত হবে। আর কুফার লোকদের চত্বরগুলো তেমনই হতো। কোনো কোনো মতে সিদ্ধান্তটি চার দেয়াল থাকা না থাকার শর্ত থেকে মুক্ত। এটাই বিশুদ্ধ অভিমত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ঘর বলা হয় ঐ স্থানকে যার চার দেয়াল থাকে ছাদ এবং দরজা বিশিষ্ট হয় এবং রাত্রে থাকার জন্য যাকে বানানো হয়। এই সংজ্ঞা মতে কেউ যদি কসম করে যে আমি ঘরে প্রবেশ করব না। অতঃপর বারান্দায় প্রবেশ করলে কসম ভঙ্গকারী হবে না। কেননা রাত্রে থাকার জন্য বারান্দা বানানো হয় না। তবে কারো কারো অভিমত হলো ঘরের দরজা বন্ধ করার পর বারান্দা যদি বাহিরের অংশে পরিণত হয়, তাহলে তাতে প্রবেশ করলে কসম ভঙ্গ হবে না। আর দরজা বন্ধ করলে যদি তা ঘরের ভিতরের অংশ হিসেবে পরিণত হয় এবং তার উপর ছাদ থাকে তাহলে ঐ বারান্দায় প্রবেশ করলে কসম ভঙ্গকারী হয়ে যাবে। কেননা এ ধরনের বারান্দায় রাত্রিযাপনের প্রচলন রয়েছে।

নোট : বাদায়েউস্ সানায়ে নামক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে, ও বিশুদ্ধ অভিমত হলো বারান্দায় রাত্রি যাপনের প্রচলন নেই। সুতরাং যে স্থান দরজা বন্ধ করলে ঘরের বাহিরে থেকে যায়, সেখানে প্রবেশ করলে কসম বঙ্গ হবে না। -[বাদায়ে']

কিন্তু আমাদের দেশের প্রচলন হলো বারান্দায় রাত্রিযাপন করা। সুতরাং তাতে প্রবেশ করলে কসম ভঙ্গ হয়ে যাওয়ার উপরই ফতোয়া হওয়া উচিত। ظُلَّة শব্দের অর্থ হলো-দরজা দেয়ালের সাথে লাগানোর জন্য যে কাঠ লাগানো হয় এবং দরজা বন্ধ করলে ভিতরে অথবা বাইরে অতিরিক্ত অংশটি থাকে তাকে ظُلَّة বলা হয়।

https://e-ilm.weebly.com/

وَمَنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارًا فَدَخَلَ دَارًا خَرِبَةً لَمْ يَحْنَثْ، وَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ هٰذِهِ الدَّارَ فَدَخَلَهَا بَعْدَمَا انْهَدَمَتْ وَصَارَتْ صَحْرَاءَ حَنِثَ لِاَنَّ الدَّارَ اِسْمٌ لِلْعَرْصَةِ عِنْدَ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ، يُقَالُ دَارٌ عَامِرَةٌ وَدَارٌ غَامِرَةٌ، وَقَدْ شَهِدَتْ اَشْعَارُ الْعَرَبِ بِذٰلِكَ فَالْبِنَاءُ وَصْفٌ فِيْهَا غَيْرَ اَنَّ الْوَصْفَ فِي الْحَاضِرِ لَغْوٌ وَفِي الْغَائِبِ مُعْتَبَرٌ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ هٰذِهِ الدَّارَ فَخَرِبَتْ ثُمَّ بُنِيَتْ اُخْرٰى فَدَخَلَهَا يَحْنَثُ لِمَا ذَكَرْنَا اَنَّ الْاِسْمَ بَاقٍ بَعْدَ الْاِنْهِدَامِ، وَاِنْ جُعِلَتْ مَسْجِدًا اَوْ حَمَّامًا اَوْ بُسْتَانًا اَوْ بَيْتًا فَدَخَلَهُ لَمْ يَحْنَثْ لِاَنَّهُ لَمْ يَبْقَ دَارًا لِاعْتِرَاضِ اسْمٍ اٰخَرَ عَلَيْهِ، وَكَذَا اِذَا دَخَلَهُ بَعْدَ اِنْهِدَامِ الْحَمَّامِ وَاَشْبَاهِهِ لِاَنَّهُ لَا يَعُوْدُ اِسْمُ الدَّارِيَةِ وَاِنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ هٰذَا الْبَيْتَ فَدَخَلَهُ بَعْدَمَا اِنْهَدَمَ وَصَارَ صَحْرَاءَ لَمْ يَحْنَثْ لِزَوَالِ اسْمِ الْبَيْتِ لِاَنَّهُ لَا يُبَاتُ فِيْهِ، حَتّٰى لَوْ بَقِيَتِ الْحِيْطَانُ وَسَقَطَ السَّقْفُ يَحْنَثُ لِاَنَّهُ يُبَاتُ فِيْهِ وَالسَّقْفُ وَصْفٌ فِيْهِ وَكَذَا اِذَا بَنٰى بَيْتًا اٰخَرَ فَدَخَلَهُ لَمْ يَحْنَثْ لِاَنَّ الْاِسْمَ لَمْ يَبْقَ بَعْدَ الْاِنْهِدَامِ -

অনুবাদ : কেউ যদি শপথ করে যে, কোনো বাড়িতে প্রবেশ করবে না। অতঃপর সে এক বিরান বাড়িতে প্রবেশ করল তাহলে সে কসম ভঙ্গকারী হবে না। পক্ষান্তরে যদি কসম করে যে, এই বাড়িতে প্রবেশ করবে না। অতঃপর সে বাড়ি ধ্বংস হয়ে খোলা মাঠ হয়ে যাওয়ার পর সেখানে গেল তাহলে সে কসম ভঙ্গকারী হবে। কেননা আরব আজম সকলেই এই উন্মুক্ত ভিটাকে বাড়ি বলে। বলা হয় دَارٌ عَامِرَةٌ (আবাদি বসতিপূর্ণ বাড়ি) دَارٌ غَامِرَةٌ (অনাবাদি বাড়ি) আর আরবি কবিতা এ অর্থের সাক্ষ্য বহন করে। ভবনাদি হলো তার অবস্থা বিশেষ। আর নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে গুণগত দিকটি ধর্তব্য নয়। পক্ষান্তরে অনুপস্থিত ক্ষেত্রে তা বিবেচ্য।

যদি কসম করে যে এই গৃহে প্রবেশ করবে না। অতঃপর তা বিধ্বস্ত ও বিরান হয়ে গেল এবং তদস্থলে অন্য ভবন তৈরি হলো আর সে তাতে প্রবেশ করল তাহলে সে কসম ভঙ্গকারী হবে। কেননা আমরা উল্লেখ করেছি যে, বিধ্বস্ত হওয়ার পরও বাড়ির নাম বিদ্যমান রয়েছে। **আর যদি সেখানে মসজিদ বা হাম্মাম বা বাগান বা অন্য কোনো ভবন তৈরি করা হয়, তাহলে সেখানে প্রবেশ করলে কসম ভঙ্গ করা হবে না।**

কেননা উক্ত স্থানের উপর অন্য একটি নাম আরোপিত হওয়ার কারণে সেটা বাড়িরূপে বহাল থাকেনি। তদ্রূপ (কসম ভঙ্গ হবে না) যদি মসজিদ, হাম্মাম ইত্যাদি ধ্বসে যাওয়ার পর সেখানে প্রবেশ করে। কেননা তাতে স্থানটির বাড়ি পরিচিতি ফিরে আসে না। **আর যদি কসম করে যে এই গৃহে প্রবেশ করবে না। অতঃপর ঘর ভেঙ্গে ময়দানে পরিণত হয়ে যাওয়ার পর তাতে প্রবেশ করল তাহলে কসম ভঙ্গ হবে না।** কেননা এতে রাত্রিযাপন হয় না বলে তার গৃহ নাম তিরোহিত হয়ে গেছে। এমনকি যদি দেয়ালগুলো বহাল থাকে এবং ছাদ পড়ে যায় তাহলেও কসম ভঙ্গ করা হবে। কেননা ছাদ পড়ে

https://e-ilm.weebly.com/

যাওয়ার পরও তাতে রাত্রিযাপন হয়। ছাদ হচ্ছে গৃহের গৌণ বিষয়। **অদ্রূপ যদি তদস্থলে অন্য একটি ঘর তৈরি করে আর সে তাতে প্রবেশ করে তাহলে কসম ভঙ্গকারী হবে না।** কেননা ধ্বসে যাওয়ার পর গৃহ নাম অব্যাহত থাকে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কোনো ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ না করার কসম করার পর বিরান ঘরে প্রবেশ করলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। কেননা বিরান নিশ্চিহ্ন হওয়া স্থানকে ঘর বলে না। তবে কেউ যদি নির্দিষ্ট করেল বলে যে, আমি এই ঘরে প্রবেশ করব না। অতঃপর বিরান হওয়ার পর যদি ঐ ঘরে প্রবেশ করে তাহলে কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা পরিভাষায় বিরান হওয়ার পরও ঐ জায়গাকে ঘরই বলা হয়। বিধায় কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ : وَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ هٰذِهِ الدَّارَ الخ : কোনো ঘর যদি বিশেষ নামে পরিচিত হয় যেমন হাম্মাম-গোসলখানা ইত্যাদি। অতঃপর বিরান হয়ে যাওয়ার পর তাতে আর ঐ নাম প্রযোজ্য হয় না। এবং ঐ নামে তার পরিচয় বাকি থাকে। সুতরাং কেউ যদি কসম করে এ ঘরে আমি প্রবেশ করব না, অতঃপর ঐ ঘর বিরান হয়ে মাঠে ময়দানে পরিণত হওয়ার পর যদি তাতে প্রবেশ করে তাহলে কসম ভঙ্গকারী হবে না। কেননা এখন আর তার সেই নাম নেই। সেখানে এখন রাত্রিযাপন করা হয় না। এবং রাত্রিযাপন করা সম্ভবও নয়। তবে যদি ছাদ ধ্বসে যাওয়ার পর দেয়াল বহাল থাকা অবস্থায় যদি তাতে প্রবেশ করে তাহলে কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা এতে রাত্রিযাপন করা যায়। আর ছাদ থাকাটা গৌণ বিষয়। তবে সেখানে অন্য একটি ঘর নির্মাণের পর তাতে প্রবেশ করলে কসম ভঙ্গকারী হবে না। কেননা ঐ ঘর ধ্বসে যাওয়ার পর নতুন ঘর নির্মিত হয়েছে। আর এতে প্রবেশ না করার কসম করে নি। বিধায় কসম ভঙ্গকারী হবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ وَمَنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ هٰذِهِ الدَّارَ فَوَقَفَ عَلٰى سَطْحِهَا حَنِثَ لِاَنَّ السَّطْحَ مِنَ الدَّارِ؛ اَلَا تَرٰى اَنَّ الْمُعْتَكِفَ لَا يَفْسُدُ اِعْتِكَافُهٗ بِالْخُرُوْجِ اِلٰى سَطْحِ الْمَسْجِدِ . وَقِيْلَ فِيْ عُرْفِنَا لَا يَحْنَثُ وَهُوَ اخْتِيَارُ الْفَقِيْهِ اَبِي اللَّيْثِ . قَالَ وَكَذَا اِذَا دَخَلَ دِهْلِيْزَهَا يَحْنَثُ وَيَجِبُ اَنْ يَكُوْنَ عَلَى التَّفْصِيْلِ الَّذِيْ تَقَدَّمَ وَاِنْ وَقَفَ فِيْ طَاقِ الْبَابِ بِحَيْثُ اِذَا اُغْلِقَ الْبَابُ كَانَ خَارِجًا لَمْ يَحْنَثْ لِاَنَّ الْبَابَ لِاِحْرَازِ الدَّارِ وَمَا فِيْهَا فَلَمْ يَكُنْ الْخَارِجُ مِنَ الدَّارِ قَالَ وَمَنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ هٰذِهِ الدَّارَ وَهُوَ فِيْهَا لَمْ يَحْنَثْ بِالْقُعُوْدِ حَتّٰى يَخْرُجَ ثُمَّ يَدْخُلَ اسْتِحْسَانًا. وَالْقِيَاسُ اَنْ يَحْنَثَ لِاَنَّ الدَّوَامَ لَهٗ حُكْمُ الِابْتِدَاءِ. وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ اَنَّ الدُّخُوْلَ لَا دَوَامَ لَهٗ لِاَنَّهٗ اِنْفِصَالٌ مِنَ الْخَارِجِ اِلَى الدَّاخِلِ۔

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কেউ যদি কসম করে যে, এই বাড়িতে প্রবেশ করবে না। অতঃপর সে বাড়ির ছাদে উঠল, তাহলে কসম ভঙ্গকারী হবে। কেননা ছাদ হচ্ছে বাড়ির অন্তর্ভুক্ত। এ কারণেই তো ই'তিকাফকারী মসজিদের ছাদে গিয়ে উঠলে তার ই'তিকাফ ভঙ্গ হয় না। আর কেউ কেউ বলেছেন, আমাদের প্রচলন অনুযায়ী কসম ভঙ্গকারী হবে না। এটাকে ফকীহ আব্দুল লাইছ পছন্দ করেছেন। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, **তদ্রূপ যদি বাড়ির বারান্দায় প্রবেশ করে তাহলে কসম ভঙ্গকারী হবে** তবে অবশ্যই সিদ্ধান্তটি বারান্দা সম্পর্কিত পূর্ববর্তী ব্যাখ্যা মোতাবিক হবে।

আর যদি গৃহদ্বারের সম্মুখস্থ তাকে দাঁড়ায় আর তা এমন যে দরজা বন্ধ করলে তা বাইরে থাকে, তাহলে সে কসম ভঙ্গকারী হবে না। কেননা দরজা হলো বাড়ির ভিতরের জিনিস রক্ষা করার জন্য, সুতরাং দরজার বাইরের অংশ বাড়ির অন্তর্ভুক্ত হবে না।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, **কেউ যদি বাড়িতে থাকা অবস্থায় কসম করে যে, এই বাড়িতে প্রবেশ করবে না। তাহলে বসা (বা অবস্থান) দ্বারা কসম ভঙ্গকারী হবে না। যতক্ষণ না বের হয়ে গিয়ে পুনরায় প্রবেশ করে।** এ হলো সূক্ষ্ম কিয়াসের সিদ্ধান্ত। পক্ষান্তরে সাধারণ কিয়াসের সিদ্ধান্ত এই যে, কসম ভঙ্গকারী হবে। কেননা কোনো কর্ম অব্যাহত রাখা উক্ত কর্ম আরম্ভ করার হুকুমভুক্ত। আর সূক্ষ্ম কিয়াসের কারণ এই যে, প্রবেশ কর্মটির অব্যহততা নেই। কেননা প্রবেশের অর্থ হলো বাহির থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অভ্যন্তরমুখী হওয়া।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কোনো ব্যক্তি যদি এভাবে কসম করে لَا يَدْخُلُ هٰذِهِ الدَّارَ (আমি এই ঘরে প্রবেশ করব না)। অতঃপর সে ঐ ঘরের ছাদের উপর উঠে তাহলে ঐ ব্যক্তির কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা ছাদও ঘরের অংশ। এই মাসআলাকে মসজিদের মাসআলার সাথে তুলনা করা হয়েছে। কেননা ই'তিকাফকারী মসজিদের ছাদে উঠলে তার ই'তিকাফ নষ্ট হবে না। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ছাদও মসজিদের অন্তর্ভুক্ত। কেননা ঘর বলা হয় চার দেয়াল ও ছাদ যুক্ত ফ্লোর বিশিষ্ট জায়গাকে। সুতরাং ছাদও ঘরের অংশ হিসেবে পরিগণিত। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কসমকারী ব্যক্তি যদি বাহির থেকে ছাদে উঠে তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কিন্তু ফকীহ আবুল লাইস সমরকন্দী (র.) বলেন, আমাদের পরিভাষা

https://e-ilm.weebly.com/

অনুযায়ী বাহির থেকে ছাদে উঠলে কসম ভঙ্গকারী হবে না। কেননা আনারবদের প্রচলন অনুযায়ী ছাদকে ঘরের অংশ হিসেবে গণ্য করা হয় না।

প্রথম অভিমতের প্রমাণ হলো : গৃহের ছাদ যদি ভেঙ্গে ফেলে তারপর ও তাকে ঘরই বলা হয়। আর (بيت ও دار) বাড়ি ও ঘর এর মাঝে যদি ব্যবধানের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয় তাহলে ভাষাবিদ আরবদের প্রচলনের প্রতি লক্ষ্য করতে হবে : কেননা আরব অধিবাসীদের নিকট একটা গৃহের জন্য প্রাসঙ্গিক সব বিষয়কে তারা আবশ্যক মনে করে। এবং ছাদকেও তারা আবশ্যকীয় মনে করে। সুতরাং কোনো ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ করবে না' এই সকম করার পর যদি গাছ অথবা রশি সংযোগে ছাদে উঠে তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না কিন্তু পরবর্তীদের নিকট উক্ত সুরতে তার কসম ভঙ্গ হবে না। কিন্তু আরব-অনারব সবার বক্তব্য মোতাবেক ছাদকে ঘরের অংশ বিশেষ ধরে নেওয়াটাই উত্তম।

আর কোনো ব্যক্তি কসম করার সময় যদি বলে لَا يَدْخُلُ هٰذِهِ الدَّارَ 'আমি এই ঘরে প্রবেশ করব না' অতঃপর ঘরের দরজার সম্মুখ ভাগে এমন জায়গায় দাঁড়াল যে, দরজা বন্ধ করলে তা ঘরের বাইর চলে যায় তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। আর দরজা বন্ধ করার পর যদি ঘরের ভেতরে চলে যায় তাহলে সেখানে দাড়ালে কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা প্রথম সুরতে দরজার বাইরে হওয়ার কারণে ঘরের অংশ নয়। আর দ্বিতীয় সুরতে তা ঘরের অংশে পরিণত।

এর বিপরীত একটি সুরত হলো : কোনো ব্যক্তি যদি বলে যে, لَا أَخْرُجُ مِنْ هٰذِهِ الدَّارِ এই ঘর থেকে আমি বের হব না। তাহলে তার বিধান ভিন্ন রকম হবে। অর্থাৎ তাক যদি দরজার বাইরে হয়, আর ঐ ব্যক্তি তাকে আসে তাহলে কসম ভঙ্গকারী হয়ে যাবে। আর দরজা বন্ধ করলে তাক যদি ভিতরে থাকে তাহলে সেই তাকে আসলে কসম ভঙ্গকারীর হবে না। কেননা এ অবস্থায় সে ঘরের বাহিরে আসছে বলে গণ্য করা হয় না।

قَوْلُهُ : وَمَنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ هٰذِهِ الدَّارَ الخ : কোনো ঘরে অবস্থান কালে যদি কেউ এ বলে কসম করে যে, আমি এই ঘরে প্রবেশ করব না। তাহলে সে ব্যক্তি ঐ ঘর থেকে বের হওয়ার পর পুনরায় প্রবেশ করলে কসম ভঙ্গকারী হবে। অন্যথা নয়। এই কসম করার পর সে যদি দীর্ঘক্ষণ সেই ঘরেই বসে থাকে বের না হয়ে অবস্থান করে তাহলেও তার কসম ভঙ্গ হবে না। কিন্তু কিয়াসের দাবি হলো কসম করার পরক্ষণ বের না হলেই কসম ভঙ্গকারী হয়ে যাবে। কেননা অবস্থান করাটা নতুন প্রবেশের মতোই আর ইসতিহসান– সূক্ষ্ম কিয়াসের কারণ হলো : প্রবেশ করাটা এমন কোনো কাজ নয় যা অব্যাহত থাকে সুতরাং কসম করার পর বের হয়ে পুনরায় প্রবেশ করলেই কসম ভঙ্গ হবে। আর এ কাজ মুহূর্তের মাঝে হতে পারে এর জন্য দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন নেই। আর বসা অবস্থান করার মাঝে দীর্ঘ সময়ের সুযোগ রয়েছে। সুতরাং বসে থাকাটা নতুন করে প্রবেশের বিধানে নয়; বিধায় বসে থাকলে কসম ভঙ্গকারী হবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

وَلَوْ حلف لَا يَلْبَسُ هٰذَا الثَّوْبَ وَهُوَ لَابِسُهُ فَنَزَعَهُ فِي الْحَالِ لَمْ يَحْنَثْ وَكَذَا اِذَا حلف لَا يَرْكَبُ هٰذِهِ الدَّابَّةَ وَهُوَ رَاكِبُهَا فَنَزَلَ مِنْ سَاعَتِهِ لَمْ يَحْنَثْ، وَكَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يَسْكُنُ هٰذِهِ الدَّارَ وَهُوَ سَاكِنُهَا فَاَخَذَ فِي النَّقْلَةِ مِنْ سَاعَتِهِ وَقَالَ زُفَرُ : يَحْنَثُ لِوُجُوْدِ الشَّرْطِ وَاِنْ قَلَّ. وَلَنَا اَنَّ الْيَمِيْنَ تُعْقَدُ لِلْبِرِّ فَيُسْتَثْنٰى مِنْهُ زَمَانُ تَحَقُّقِهِ فَاِنْ لَبِثَ عَلٰى حَالِهِ سَاعَةً حَنِثَ لِاَنَّ هٰذِهِ الْاَفَاعِيْلَ لَهَا دَوَامٌ بِحُدُوْثِ اَمْثَالِهَا؛ اَلَا يَرٰى اَنَّهُ يُضْرَبُ لَهَا مُدَّةٌ يُقَالُ رَكِبْتُ يَوْمًا وَلَبِسْتُ يَوْمًا بِخِلَافِ الدُّخُوْلِ لِاَنَّهُ لَا يُقَالُ دَخَلْتُ يَوْمًا بِمَعْنَى الْمُدَّةِ وَالتَّوْقِيْتِ وَلَوْ نَوَى الْاِبْتِدَاءَ الْخَالِصَ يُصَدَّقُ لِاَنَّهُ مُحْتَمَلُ كَلَامِهِ .

অনুবাদ : আর যদি বস্ত্র পরিহিত অবস্থায় কসম করে যে, এই কাপড় পরিধান করবে না। আর সঙ্গে সঙ্গে তা খুলে ফেলে তাহলে কসম ভঙ্গকারী হবে না। তদ্রূপ যদি আরোহণের অবস্থায় কসম করে যে, এই বাহনে আরোহণ করবে না, আর সঙ্গে সঙ্গে নেমে যায় তাহলে কসম ভঙ্গকারী হবে না। কিংবা বসবাস করা অবস্থায় যদি কসম করে যে, এই ঘরে বাস করবে না আর সঙ্গে সঙ্গে গৃহ ত্যাগের আয়োজনে লেগে যায় তাহলে কসম ভঙ্গকারী হবে না। ইমাম যুফার (র.) বলেন, কসম ভঙ্গকারী হবে। কেননা সামান্য হলেও কসম ভঙ্গের শর্ত পাওয়া গেছে। আমাদের দলিল এই যে, কসম করা হয় তা রক্ষা করার জন্য, সুতরাং কসম রক্ষার বিষয়টি সম্পন্ন হওয়ার সময়টুকু ব্যতিক্রম করা হবে।

পক্ষান্তরে যদি ঐ অবস্থায় কিছু সময়ও থাকে তাহলে কসম ভঙ্গকারী হবে। কেননা এ সকল কর্ম সদৃশ কর্মের পুনঃ পুনঃ সংঘটন করার দ্বারা অব্যাহততা লাভ করে। এ কারণেই তো এ সকল কর্মের ক্ষেত্রে মেয়াদ উল্লেখ করে বলা হয়। একদিন (সময়) আরোহণ করেছি। একদিন পরিধান করেছি। প্রবেশের ব্যাপারটি ভিন্ন। কেননা মেয়াদ বা দীর্ঘ সময় অর্থে একদিন প্রবেশ করেছি বলা হয় না। আর যদি উক্ত বক্তব্য দ্বারা সে নতুন সূচনার নিয়ত করে থাকে [অর্থাৎ নতুন করে আরোহণ করবো না বা পরিধান করবো না] তাহলে তার কথার সত্যতা গ্রহণ করা হবে। কেননা এটা তার বক্তব্যের সম্ভাবনাভুক্ত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কোনো ব্যক্তি যদি কসম করে যে আমি এই কাপড় পরিধান করব না। অথচ ঐ সময় কাপড়টি তার পরিধানেই রয়েছে। অতঃপর তাৎক্ষণিক কাপড়টি সে খুলে তাহলে সে কসম ভঙ্গকারী হবে না। এমনিভাবে যদি কসম করে যে আমি এই প্রাণীতে আরোহণ করব না। অথচ ঐ সময় সে আরোহণেই রয়েছে কিন্তু সাথে সাথে নেমে যায় তাহলে সে কসম ভঙ্গকারী হবে না। তদ্রূপ যদি বলে, আমি আর এই ঘরে থাকব না অথচ ঐ সময় সে সেথায় অবস্থানরত, অতঃপর ঘরের সামান পত্র বের করার কাজে লেগে যায় তাহলে কসম ভঙ্গকারী হবে না। কারণ হলো ইয়ামীন যে বিষয়ে করা হয় সেই কাজ পরিপূর্ণ করাই তার উদ্দেশ্য থাকে। সুতরাং তার ইচ্ছা বাস্তবায়নের জন্য যতটুকু সময়ের প্রয়োজন ততটুকু সুযোগ তাকে দিতেই হবে। অন্যথা

https://e-ilm.weebly.com/

সাধ্যের বাইরের বিষয়কে চাপিয়ে দেওয়া হয়ে যাবে। সুতরাং কাপড় পরিধান না করা, বাহনে আরোহণ না করার কসমের ব্যাপারে তাকে এতটুকু সুযোগ দিতে হবে যেন সে কাপড় খুলতে ও বাহন থেকে অবতরণ করতে পারে। এমনিভাবে ঘরে বসবাস না করার কসমের ক্ষেত্রেও। অর্থাৎ ঘরের সামানপত্র বের করার সুযোগ তাকে দিতে হবে। তবে এসব অবস্থাতেই কসমকারীকে তাৎক্ষণিক ঐ কাজ সম্পূর্ণ করণে লেগে যেতে হবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, ঐ ঘরে যদি কসমকারীর সামন্যতম সামানও বাকি থেকে যায় তাহলে সে কসম ভঙ্গকারী হয়ে যাবে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, অধিকাংশ সামান যদি বের করে ফেলে তাহলে কসম ভঙ্গকারী হবে না। আর অধিকাংশ সামান যদি ঘরে থেকে যায় তাহলে কসমভঙ্গকারী হয়ে যাবে।

আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, কসমকারী যদি এতটুকু পরিমাণ সামান বের করে ফেলে যা দ্বারা তার ঘরের প্রয়োজনও আবাসের জরুরত পূর্ণ হয়ে যাবে তাহলে সে কসম ভঙ্গকারী হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম যুফার (র.) বলেন, কসমকারীকে তার কসম পুরা করতে কোনো সুযোগ দেওয়া হবে না। কেননা তার নিকট কসম করার সাথে সাথে ব্যক্তিকে ঐ কাজেই পাওয়া গেছে যে কাজ না করার সে কসম করেছিল। অথাৎ কাপড় পরিহিত, বাহনে আরোহীত ও ঘরে অবস্থানরত। সুতরাং সে কসম ভঙ্গকারী হয়ে যাবে। চাই এই সময়টা অল্প সামান্যই হোক না কেন। হানাফীদের পক্ষ হতে ইমাম যুফার (র.)-এর দলিলের উত্তের বলা হবে। কসমকারীকে যদি সামান্যতম সময় ও সুযোগ দেওয়া না হয়, তাহলে তার উপর অসম্ভব বস্তু চাপিয়ে দেওয়া হবে। যা সাধ্যের বাইরে বিষয় চাপিয়ে দেওয়ার নামান্তর। আর এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ পাক বলেন– لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا (سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ ২৮২) "আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যতীত কোনো কাজের ভার দেন না" তাহলে আমরা কিভাবে বান্দার উপর সাধ্যাতীত হুকুম চাপিয়ে দিব?। সুতরাং তাকে কিছু সময়ের জন্য হলেও সুযোগ দেওয়া হবে। কেননা পরিধান ও আরোহণ এবং অবস্থান করা কাজগুলো দীর্ঘ সময়ের জন্যও হতে পারে। বিধায় সামান্য সময়ের মধ্যে যদি সে বিরত থাকার আবশ্যকীয় কাজ সম্পাদন না করে দীর্ঘ সময় ঐ কাজে লিপ্ত থাকে তাহলে কসম ভঙ্গকারী হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে প্রবেশ করা এবং বের হওয়া ক্রিয়াগুলোর সাথে দীর্ঘ সময়ের গুণ যুক্ত হয় না।

এমন বলা না হয় যে, একদিন বা দুই দিন প্রবেশ বা বের হয়েছি। কিন্তু একদিন বা দু'দিন অবস্থান করেছি, আরোহণ করেছি ইত্যাদি বলা হয়। সুতরাং উভয়ের মাঝে ব্যবধান স্পষ্ট।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ وَمَنْ حَلَفَ لَا يَسْكُنُ هٰذِهِ الدَّارَ فَخَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَتَاعُهُ وَاَهْلُهُ فِيْهَا وَلَمْ يُرِدْ الرُّجُوْعَ اِلَيْهَا حَنِثَ لِاَنَّهُ يُعَدُّ سَاكِنَهَا بِبَقَاءِ اَهْلِهِ وَمَتَاعِهِ فِيْهَا عُرْفًا، فَاِنَّ السُّوْقِيَّ عَامَّةَ نَهَارِهِ فِي السُّوقِ وَيَقُوْلُ اَسْكُنُ سِكَّةَ كَذَا، وَالْبَيْتُ وَالْمَحَلَّةُ بِمَنْزِلَةِ الدَّارِ . وَلَوْ كَانَ الْيَمِيْنُ عَلَى الْمِصْرِ لَا يَتَوَقَّفُ الْبِرُّ عَلَى نَقْلِ الْمَتَاعِ وَالْاَهْلِ فِيْمَا رُوِيَ عَنْ اَبِيْ يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ لِاَنَّهُ لَا يُعَدُّ سَاكِنًا فِي الَّذِي اِنْتَقَلَ عَنْهُ عُرْفًا . بِخِلَافِ الْاَوَّلِ وَالْقَرْيَةُ بِمَنْزِلَةِ الْمِصْرِ فِي الصَّحِيْحِ مِنَ الْجَوَابِ . ثُمَّ قَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ : لَا بُدَّ مِنْ نَقْلِ كُلِّ الْمَتَاعِ، حَتّٰى لَوْ بَقِيَ وَتَدٌ يَحْنَثُ لِاَنَّ السُّكْنٰى قَدْ ثَبَتَ بِالْكُلِّ فَيَبْقٰى مَا بَقِيَ شَيْءٌ مِنْهُ . وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ . يُعْتَبَرُ نَقْلُ الْاَكْثَرِ لِاَنَّ نَقْلَ الْكُلِّ قَدْ يَتَعَذَّرُ . وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ : يُعْتَبَرُ نَقْلُ مَا يَقُوْمُ بِهِ كَدَخْدَائِيَّتِهِ لِاَنَّ مَا وَرَاءَ ذٰلِكَ لَيْسَ مِنَ السُّكْنٰى . قَالُوا : هٰذَا اَحْسَنُ وَاَرْفَقُ بِالنَّاسِ وَيَنْبَغِي اَنْ يَنْتَقِلَ اِلٰى مَنْزِلٍ اٰخَرَ بِلَا تَاْخِيْرٍ حَتّٰى يَبَرَّ، فَاِنْ انْتَقَلَ اِلَى السِّكَّةِ اَوْ اِلَى الْمَسْجِدِ قَالُوْا لَا يَبَرُّ، دَلِيْلُهُ فِي الزِّيَادَاتِ اَنَّ مَنْ خَرَجَ بِعِيَالِهِ مِنْ مِصْرِهِ فَمَا لَمْ يَتَّخِذْ وَطَنًا اٰخَرَ يَبْقٰى وَطَنُهُ الْاَوَّلُ فِيْ حَقِّ الصَّلَاةِ كَذَا هٰذَا ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কেউ যদি কসম করে যে, এই বাড়িতে বসবাস করবে না। অতঃপর সে নিজে বেরিয়ে যায় কিন্তু তার আসবাবপত্র ও পরিবার পরিজন সেখানে থেকে যায় এবং সেই গৃহে ফিরে আসার নিয়ত না করে তাহলেও কসম ভঙ্গকারী হবে। কেননা লোক প্রচলনের দিক থেকে আসবাব পত্র ও পরিবার পরিজনের অবস্থানের কারণে তাকে সেই বাড়ির বাসিন্দাই ধরা হয়। তাই বাজারের দোকানদার অধিকাংশ দিন বাজারে থাকা সত্ত্বেও বলে আমি অমুক গলিতে থাকি। ঘর এবং মহল্লা এ ক্ষেত্রে বাড়ির পর্যায়ভুক্ত। পক্ষান্তরে যদি শহর সম্পর্কে কসম করে, তাহলে কসম রক্ষার বিষয়টি আসবাবপত্র ও পরিবার পরিজন শহর থেকে সরিয়ে দেওয়ার উপর করবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে এটি বর্ণিত। কেননা যে শহর থেকে সে বের হয়ে গেছে, লোক প্রচলন হিসেবে তাকে সে শহররের বাসিন্দা গণ্য করা হয় না।

কিন্তু প্রথম বিষয়টি ভিন্ন। বিশুদ্ধ বর্ণনামতে উক্ত হুকুমের ক্ষেত্রে গ্রামও শহর সমতুল্য। স্থানান্তরের ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, সমস্ত আসবাবপত্র সরাতে হবে। এমনকি একটিও যদি থেকে যায়, তাহলে কসম ভঙ্গ করা হবে। কেননা সমগ্র আসবাবপত্র দ্বারাই তার বাসিন্দা সাব্যস্ত হয়েছিল। সুতরাং যতক্ষণ ঐ আসবাবপত্রের কিছু অংশের বিদ্যমান থাকবে ততক্ষণ তার বসবাস অব্যাহত থাকবে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, অকিাংশ সামানপত্র সরানো যথেষ্ট। কেননা সমগ্র সামান, সরানো কঠিন হতে পারে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, গৃহস্থালি জিনিসপত্র সরিয়ে ফেলাই হলো বিবেচ্য। কেননা এর অতিরিক্তগুলো বসবাসের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। ফকীহগণ বলেন, এ মতই উত্তম এবং মানুষের জন্য সহজতর। তবে তার কর্তব্য হলো অবিলম্বে অন্য গৃহে স্থানান্তরিত হয়ে যাওয়া, যাতে কসম রক্ষিত হয়। আর যদি রাস্তায় বা মসজিদে স্থানান্তরিত হয় তাহলে ফকীহগণ বলেছেন সে কসম রক্ষিত হবে না। الزِّيَادَات গ্রন্থে এর দলিল উল্লেখ করা হয়েছে যে, কেউ যদি সপরিবারে শহর থেকে বের হয়ে যায় তাহলে অন্য কোনো আবাসস্থল গ্রহণ করার পূর্ব পর্যন্ত সালাতের ব্যাপারে প্রথম আবাসস্থলটি বিবেচ্য হয়ে থাকে। সুতরাং এক্ষেত্রেও তাই হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যিয়াদাত গ্রন্থে রয়েছে যে, যদি কেউ কসম করে যে, সে এই ঘরে থাকবে না। তাহলে তার জন্য আবশ্যক তাৎক্ষণিক নিজ সামান পত্র অন্য ঘরে স্থানান্তরিত করতে লেগে যাওয়া। যেন তার কসম পুরা হয়ে যায়। কিন্তু সে যদি তার সামান পত্র ঘর থেকে বের করে রাস্তায় বা মসজিদে রেখে যায় তাহলে তার কসম পুরা হবে না। যিয়াদাত গ্রন্থে এর প্রমাণ পেশ করা হয়েছে এ বলে যে, যে ব্যক্তি নিজের সাথে সম্পর্কিত সন্তানাদি নিয়ে অন্য শহরে যদি গমন করে তাহলে নামাজের ব্যাপারে তার প্রথম বাড়িরই হিসেব করা হবে। যতক্ষণ না সে অন্যস্থানে নিজ বাড়ি বানাবে। আলোচ্য মাসাআলায়ও তাই প্রযোজ্য। নিজ বাড়ি থেকে বের হয়ে অন্যস্থানে বাড়ি বানানোর পূর্ব পর্যন্ত তাকে প্রথম বাড়ির দিকেই সম্পর্কিত করা হয়। কেননা মসজিদ এবং রাস্তা বসবাসের জন্য নয়।

বিশেষ কিছু মাসআলা :

১. কেউ কসম করল যে, আমি অমুক মসজিদে যাব না, অতঃপর ঐ মসজিদ ভেঙ্গে পুনরায় মসজিদ নির্মাণের পরও যদি সেই মসজিদে সে যায়, তাহলে কসম ভঙ্গকারী হয়ে যাবে।

২. আর ঐ মসজিদ বিরান হওয়ায় কেউ যদি সেখানে নিজের থাকার জায়গা বানিয়ে নেয়। অতঃপর কসমকারী ব্যক্তি সেথায় প্রবেশ করে তাহলে কসম ভঙ্গকারী হবে না।

৩. যেই মসজিদে না যাওয়ার কসম করেছিল সেই মসজিদের সাথে যদি আরো কিছু অংশ বাড়ানো হয় আর কসমকারী ঐ অংশে প্রবেশ করে তাহলে কসম ভঙ্গকারী হবে না।

৪. মসজিদে প্রবেশ করবে না বলে কসম করার পর যদি ঐ মসজিদের ছাদে উঠে তাহলে সে অনারবি হওয়ার শর্তে তার কসম ভঙ্গ হবে না।

৫. কেউ কসম করল যে, আমি এই ঘরে যাব না। অতঃপর সে আরোহণ করে অথবা কেউ তাকে মাথায় করে যদি ঘরে নিয়ে যায় তবুও কসম ভঙ্গকারী হয়ে যাবে।

৬. আর সে যদি ঘোড়ায় আরোহী অবস্থায় থাকে আর ঘোড়া তার নিয়ন্ত্রণে বাইরে চলে যায় এবং ঐ ঘরে প্রবেশ করে সে বারবার ফিরানের চেষ্টা সত্ত্বেও চলে যায় তাহলে কসম ভঙ্গকারী হবে না।

৭. কোনো ব্যক্তি কসমকারীর নির্দেশ ব্যতীত যদি কসমকারীকে ঐ ঘরে মাথায় করে নিয়ে যায়, তাহলে কসম ভঙ্গকারী হবে না। চাই সে মন থেকে রাজি থাক বা না থাক এবং ফিরাতে সক্ষম হোক না হোক। জমহুর মাশায়েখের বক্তব্য এটাই।

৮. যদি শুধু একটি পা ভিতরে রাখে তাহলে কসম ভঙ্গকারী হবে না। এটাই বিশুদ্ধ অভিমত।

৯. পিছলি খেয়ে পড়ে যদি ঘরে চলে যায়, তাহলে বিশুদ্ধ মত হলো কসম ভঙ্গকারী হবে না। আর কেউ তাকে জোর জবরদস্তি নিয়ে যায়। অতঃপর সে বের হয়ে আবার প্রবেশ করে তাহলে কসম ভঙ্গকারী হয়ে যাবে।

১০. কসম করেছে যে, এই ঘরে প্রবেশ করবে না। এ ব্যাপারে তার কোনো নিয়তও ছিল না। অতঃপর সে ঐ এলাকায় আসল যেখানে এই ঘর অবস্থিত তাহলে কসম ভঙ্গকারী হবে না। এটা হলো আরবদের প্রচলন হিসাবে। কেননা তারা (بيت-বাইত) ঘর বলে বিশেষ তৈরি রুম কক্ষকে। আর যেখানে কয়েকটি কক্ষ হয় সেটাকে মঞ্জিল বলে। কিন্তু আমাদের প্রচলন হিসেবে সবগুলোকে ঘর বলে। সুতরাং সে উঠানে যাওয়ার দ্বারা কসম ভঙ্গকারী হবে না। এর উপরই ফতোয়া। আইনী ফতহুল কাদীরসহ অন্যান্য কিতাবে এ ধরনের বিবরণই বিদ্যমান।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ الْيَمِيْنِ فِيْ الْخُرُوْجِ وَالْاِتْيَانِ وَالرُّكُوْبِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ

قَالَ وَمَنْ حَلَفَ لَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاَمَرَ اِنْسَانًا فَحَمَلَهُ فَاَخْرَجَهُ حَنِثَ لِاَنَّ فِعْلَ الْمَامُوْرِ مُضَافٌ اِلَى الْاٰمِرِ فَصَارَ كَمَا اذَا رَكِبَ دَابَّةً فَخَرَجَتْ وَلَوْ اَخْرَجَهُ مُكْرَهًا لَمْ يَحْنَثْ لِاَنَّ الْفِعْلَ لَمْ يَنْتَقِلْ اِلَيْهِ لِعَدَمِ الْاَمْرِ وَلَوْ حَمَلَهُ بِرِضَاهُ لَا بِاَمْرِهِ لَا يَحْنَثُ فِي الصَّحِيحِ، لِاَنَّ الِانْتِقَالَ بِالْاَمْرِ لَا بِمُجَرَّدِ الرِّضَا قَالَ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَخْرُجُ مِنْ دَارِهِ اِلَّا اِلَى جِنَازَةٍ فَخَرَجَ اِلَيْهَا ثُمَّ اَتَى حَاجَةً اُخْرٰى لَمْ يَحْنَثْ لِاَنَّ الْمَوْجُودَ خُرُوْجٌ مُسْتَثْنًى، وَالْمُضِيَّ بَعْدَ ذٰلِكَ لَيْسَ بِخُرُوجٍ . وَلَوْ حَلَفَ لَا يَخْرُجُ إِلَى مَكَّةَ فَخَرَجَ يُرِيْدُهَا ثُمَّ رَجَعَ حَنِثَ لِوُجُوْدِ الْخُرُوْجِ عَلٰى قَصْدِ مَكَّةَ وَهُوَ الشَّرْطُ، اِذِ الْخُرُوْجُ هُوَ الْاِنْفِصَالُ مِنَ الدَّاخِلِ اِلَى الْخَارِجِ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْتِيْهَا لَمْ يَحْنَثْ حَتّٰى يَدْخُلَهَا لِاَنَّهُ عِبَارَةٌ عَنِ الْوُصُوْلِ، قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى ﴿فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا﴾ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَذْهَبُ اِلَيْهَا قِيْلَ هُوَ كَالْاِتْيَانِ، وَقِيْلَ هُوَ كَالْخُرُوْجِ وَهُوَ الْاَصَحُّ لِاَنَّهُ عِبَارَةٌ عَنِ الزَّوَالِ ـ

পরিচ্ছেদ : বের হওয়া, অথবা আরোহণ করা ইত্যাদি সংক্রান্ত কসম

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, কেউ যদি কসম করে যে, মসজিদ থেকে বের হবে না। অতঃপর যে কোনো এক ব্যক্তিকে আদেশ করল এবং সে তাকে তুলে বের করে নিয়ে এলো তাহলে কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা আদিষ্ট ব্যক্তির কর্ম আদেশ দাতার সাথেই সম্পৃক্ত হয়। সুতরাং ঘটনাটি এমনই হলো যেন সে কোনো বাহনে আরোহণ করল আর বাহনটি তাকে নিয়ে বের হয়ে গেল।

পক্ষান্তরে যদি তাকে বলপূর্বক বের করা হয় তাহলে কসম ভঙ্গ হবে না। কেননা আদেশ না করার কারণে কর্মটি তার দিকে সম্পৃক্ত হবে না। **যদি তার আদেশ নয় কিন্তু এতে তার সম্মতি ছিল এমতাবস্থায় তাকে বের করে আনা হয় তাহলে সে কসম ভঙ্গকারী হবে না,** বিশুদ্ধ অভিমত অনুযায়ী। কেননা স্থানান্তর সাব্যস্ত হবে আদেশ দ্বারা নিছক সম্মতি দ্বারা নয়।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি কসম করে যে, সে জানাযায় শরিক হওয়া ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে নিজ বাড়ি থেকে বের হবে না। অতঃপর সে জানাযার উদ্দেশ্যই বের হলো কিন্তু পরে অন্য একটি প্রয়োজনও সেরে নিলে তাহলে কসম ভঙ্গ হবে না। কেননা ব্যতিক্রমকৃত বের হওয়াই পাওয়া গেছে। আর বের হওয়ার পর গমন করা বের হওয়া নয়।

যদি কসম করে যে, মক্কার উদ্দেশ্য রওয়ানা হবে না। এর পর সে মক্কার উদ্দেশ্য বের হয়ে আবার ফিরে আসে তাহলে কসম ভঙ্গ হবে। কেননা মক্কার উদ্দেশ্যে বের হওয়া পাওয়া গেছে, আর তাই হলো শর্ত। কারণ বের হওয়া অর্থ হলো অভ্যন্তর পরিত্যাগ করে বহিরাগমন করা। **পক্ষান্তরে যদি কসম করে যে, মক্কা আসবে না, তাহলে মক্কায় প্রবেশ না করা পর্যন্ত কসম ভঙ্গকারী হবে না।** কেননা আসার অর্থ হলো উপনীত হওয়া। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন : (فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا) তোমরা ফেরাউনের নিকট আস এবং তাকে বল আর যদি কসম করে যে মক্কায় যাবে না। তবে কেউ কেউ বলেছেন তাও আসবে না বলার মতোই। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এটি বের হওয়া বলার মতো। আর এটাই বিশুদ্ধ অভিমত। কেননা এ দ্বারা স্থান ত্যাগ করা বুঝায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কোনো ব্যাপারে কসম করলে তা পুরা করা আবশ্যক হয়ে যায়। এবং তার পরিপন্থি কাজ করলে কসম ভঙ্গ হয়ে যায়। বিধায় কাফফারা আবশ্যক হবে। সুতরাং সেচ্ছায় নিজে তার পরিপন্থি কাজ করলে অথবা অন্যের মাধ্যমে নির্দেশ দিয়ে করালে কসম ভঙ্গকারী হয়ে যাবে।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ وَإِنْ حَلَفَ لَيَأْتِيَنَّ الْبَصْرَةَ فَلَمْ يَأْتِهَا حَتّٰى مَاتَ حَنِثَ فِيْ آخِرِ جُزْءٍ مِنْ اَجْزَاءِ حَيَاتِهِ لِاَنَّ الْبِرَّ قَبْلَ ذٰلِكَ مَرْجُوٌّ . وَلَوْ حَلَفَ لَيَأْتِيَنَّهُ غَدًا اِنِ اسْتَطَاعَ فَهٰذَا عَلٰى اِسْتِطَاعَةِ الصِّحَّةِ دُونَ الْقُدْرَةِ، وَفَسَّرَهُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ وَقَالَ : اِذَا لَمْ يَمْرَضْ وَلَمْ يَمْنَعْهُ السُّلْطَانُ وَلَمْ يَجِئْ اَمْرٌ لَا يَقْدِرُ عَلٰى اِتْيَانِهِ فَلَمْ يَأْتِهِ حَنِثَ، وَاِنْ عَنٰى اِسْتِطَاعَةَ الْقَضَاءِ دِيْنَ فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَهٰذَا لِاَنَّ حَقِيْقَةَ الْاِسْتِطَاعَةِ فِيْمَا يُقَارِنُ الْفِعْلَ وَيُطْلَقُ الاِسْمُ عَلٰى سَلَامَةِ الْاٰلَاتِ وَصِحَّةِ الْاَسْبَابِ فِي الْمُتَعَارَفِ . فَعِنْدَ الْاِطْلَاقِ يَنْصَرِفُ اِلَيْهِ وَتَصِحُّ نِيَّةُ الْاَوَّلِ دِيَانَةً لِاَنَّهُ نَوٰى حَقِيْقَةَ كَلَامِهِ ثُمَّ قِيْلَ وَتَصِحُّ قَضَاءً اَيْضًا لِمَا بَيَّنَّا، وَقِيلَ لَا تَصِحُّ لِاَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি কসম করে যে, অবশ্যই সে বসরায় আসবে। কিন্তু সে তথায় এলো না। এমনকি মারা গেল, তাহলে সে জীবনের সর্বশেষ অংশে কসম ভঙ্গকারী হবে। কেননা তার পূর্বে কসম পূর্ণ করার আশা রয়েছে। যদি কসম করে যে, যদি সে সক্ষম হয় তাহলে আগামীকাল অবশ্যই তার কাছে আসবে তাহলে এর উদ্দেশ্য হবে স্বাস্থ্যগত সক্ষমতা, তাকদীর সম্পর্কিত সক্ষমতা নয়।

জামে সগীর গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, যদি সে অসুস্থ না হয়ে পড়ে এবং শাসক তাকে বাধা প্রদান না করে এবং তার নিকট গমনের ব্যাপারে অক্ষম হওয়ার কোনো বিষয় না ঘটে এরপরও সে এলো না তাহলে কসম ভঙ্গকারী হবে। পক্ষান্তরে যদি তাকদীর সম্পর্কিত সক্ষমতার নিয়ত করে থাকে তাহলে আল্লাহর নিকট সত্যতা গ্রহণীয় হবে।

কেননা প্রকৃত সক্ষমতা তো তা-ই যা কর্ম সম্পাদনের নিকটবর্তী হয়ে থাকে। তবে সাধারণ ব্যবহারের দিক দিয়ে উপায় উকরণের সুষ্ঠুতা সুস্থতার উপর শব্দটি প্রয়োগ হয়। সুতরাং শব্দটি শর্তহীন প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রচলিত অর্থেই সেটি গ্রহণ করা হবে। তবে দিয়ানত (অর্থাৎ আল্লাহও বান্দার মাঝে সম্পর্কের) হিসেবে প্রথম অর্থের নিয়তও গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা সে উচ্চারিত বক্তব্যের প্রকৃত অর্থটি গ্রহণ করেছে। তবে কোনো কোনো মতে আইনগতভাবেও তা সহীহ বলে গৃহীত হবে। কারণ তাই শব্দের প্রকৃত অর্থ। আর কোনো কোনো মতে গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা এটি বাহ্যিক ব্যবহারের বিপরীত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কোনো ব্যক্তি যদি কসম করে যে। আমি অবশ্যই বসরা বা অমুক জায়গায় আসবো এরপর সে আসে নাই, এমনকি মারা গেল। তাহলে জীবনের শেষের দিকে এসে সে কসম ভঙ্গকারী হয়ে যাবে। কেননা জীবনের শেষ অংশের দিকে আসার পূর্ব পর্যন্ত কসম পুরা করায় তার আগমনের সম্ভাবনা ছিল।

উল্লেখ্য যে, সক্ষমতার দু'টি অর্থ রয়েছে, এক হলো শারিরীক ও আসবাব উপকরণ সঠিক থাকা। যেমন হজ্ব ফরজ হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا অর্থাৎ যে ব্যক্তি হজ্জে আসার সক্ষম হবে। হাদীসে উক্ত আয়াতে এ ধরনের ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তির নিকট রাস্তায় চলার উপায় উপকরণ প্রস্তুত রয়েছে। আর সক্ষমতার দ্বিতীয় অর্থ হলো : প্রকৃত সক্ষমতা যা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রদানকৃত যাকে তাকদীরও বলা হয়। আল্লাহ তা'আলার কর্ম সম্পাদন মুহূর্তে যা সৃষ্টি করে দেন। প্রথম সক্ষমতাকে এসতেতায়াতে সিহহত বলা হয়। আর দ্বিতীয়টাকে এসতেতায়াতে কাযা বলা হয়।

https://e-ilm.weebly.com/

وَمَنْ حَلَفَ لَا تَخْرُجُ اِمْرَاَتُهُ اِلَّا بِاِذْنِهِ فَاَذِنَ لَهَا مَرَّةً فَخَرَجَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ مَرَّةً اُخْرٰى بِغَيْرِ اِذْنِهِ حَنِثَ وَلَا بُدَّ مِنَ الْاِذْنِ فِيْ كُلِّ خُرُوْجٍ لِاَنَّ الْمُسْتَثْنٰى خُرُوْجٌ مَقْرُوْنٌ بِالْاِذْنِ، وَمَا وَرَاءَهُ دَاخِلٌ فِيْ الْحَظْرِ الْعَامِّ . وَلَوْ نَوَى الْاِذْنَ مَرَّةً يُصَدَّقُ دِيَانَةً لَا قَضَاءً لِاَنَّهُ مُحْتَمَلُ كَلَامِهِ لٰكِنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ وَلَوْ قَالَ اِلَّا اَنْ اٰذَنَ لَكِ فَاَذِنَ لَهَا مَرَّةً وَاحِدَةً فَخَرَجَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ بَعْدَهَا بِغَيْرِ اِذْنِهِ لَمْ يَحْنَثْ لِاَنَّ هٰذِهِ كَلِمَةُ غَايَةٍ فَتَنْتَهِيْ الْيَمِيْنُ بِهِ كَمَا اِذَا قَالَ حَتّٰى اٰذَنَ لَكِ . وَلَوْ اَرَادَتِ الْمَرْاَةُ الْخُرُوْجَ فَقَالَ اِنْ خَرَجْتِ فَاَنْتِ طَالِقٌ فَجَلَسَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ لَمْ يَحْنَثْ وَكَذٰلِكَ اِذَا اَرَادَ رَجُلٌ ضَرْبَ عَبْدِهِ فَقَالَ لَهُ اٰخَرُ اِنْ ضَرَبْتَهُ فَعَبْدِيْ حُرٌّ فَتَرَكَهُ ثُمَّ ضَرَبَهُ وَهٰذِهِ تُسَمّٰى يَمِيْنَ فَوْرٍ . وَتَفَرَّدَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ بِاِظْهَارِهِ . وَوَجْهُهُ اَنَّ مُرَادَ الْمُتَكَلِّمِ الرَّدُّ عَنْ تِلْكَ الضَّرْبَةِ وَالْخَرْجَةِ عُرْفًا، وَمَبْنَى الْاَيْمَانِ عَلَيْهِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন যে, কেউ যদি কসম করে যে তার স্ত্রী তার অনুমতি ছাড়া বের হবে না অতঃপর সে তাকে একবার অনুমতি দিল এবং স্ত্রী বের হলো কিন্তু পরবর্তীবার তার অনুমতি ছাড়াই বের হলো তাহলে সে কসম ভঙ্গকারী হবে। কারণ প্রত্যেক বার বের হওয়ার সময় অনুমতি আবশ্যক। কেননা অনুমতিযুক্ত বের হওয়াকেই শুধু ব্যতিক্রম সাব্যস্ত করা হয়েছে। এছাড়া অন্য বের হওয়ার সাধারণ নিষিদ্ধতার অন্তর্গত রয়েছে। আর যদি সে এ অনুমতির নিয়ত করে থাকে তাহলে দিনায়তের ক্ষেত্রে তা সত্য হলে গণ্য করা হবে। আইনগত ক্ষেত্রে নয়। কেননা এটি তার বক্তব্যের সম্ভাব্য অর্থ হলেও বাহ্যিক অর্থের বিপরীত।

পক্ষান্তরে যদি বলে, **তবে যদিবলে তোমাকে অনুমতি দেই অতঃপর তাকে একবার অনুমতি দিল আর সে বের হলো তারপর তার অনুমতি ছাড়াই বের হলো তাহলে সে কসম ভঙ্গকারী হবে না।** কেননা 'তবে যদি' অংশটি শেষ সীমা নির্দেশক। সুতরাং তা দ্বারা কসমও সমাপ্ত হয়ে যাবে। যেমন যদি বলে যে পর্যন্ত না আমি তোমাকে অনুমতি দেই।

এমন যদি হয় যে, **স্ত্রী বের হতে চাইল তখন স্বামী বলল , যদি তুমি বের হও তাহলে তুমি তালাক, তখন সে বসে পড়ল, অতঃপর বের হলো তাহলে কসম ভঙ্গ হবে না। অদ্রূপ কোনো লোক যদি দাসকে প্রহার করতে চায় আর অন্য একজন তাকে বলে যে, তুমি যদি তোমার গোলামকে প্রহার কর তাহলে আমার গোলাম আজাদ। তখন সে তার গোলামকে (প্রহার না করে) ছেড়ে দিল। এরপর তাকে প্রহার করল, এ অবস্থায় কসম ভঙ্গ হবে না।** এটাকে (ইয়ামীনে ফাওর) তাৎক্ষণিক কসম বলে। এ প্রকার কসম নির্ধারণের ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র.) একক আবিষ্কারের অধিকারী। এর কারণ এই যে, লোক প্রচলনের আলোকে বক্তার উদ্দেশ্য হচ্ছে উপস্থিত প্রহার এবং উপস্থিত বের হওয়া রোধ করা। আর কসমের ভিত্তিই হচ্ছে প্রচলনের উপর।

https://e-ilm.weebly.com/

وَلَوْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ اِجْلِسْ فَتَغَدَّ عِنْدِيْ قَالَ اِنْ تَغَدَّيْتُ فَعَبْدِيْ حُرٌّ فَخَرَجَ فَرَجَعَ اِلَى مَنْزِلِهِ وَتَغَدّٰى لَمْ يَحْنَثْ لِاَنَّ كَلَامَهُ خَرَجَ مَخْرَجَ الْجَوَابِ فَيَنْطَبِقُ عَلَى السُّؤَالِ فَيَنْصَرِفُ اِلَى الْغَدَاءِ الْمَدْعُوِّ اِلَيْهِ، بِخِلَافِ مَا اِذَا قَالَ اِنْ تَغَدَّيْتُ الْيَوْمَ لِاَنَّهُ زَادَ عَلَى حَرْفِ الْجَوَابِ فَيُجْعَلُ مُبْتَدَأً وَمَنْ حَلَفَ لَا يَرْكَبُ دَابَّةَ فُلَانٍ فَرَكِبَ دَابَّةَ عَبْدٍ مَأْذُوْنٍ لَهُ مَدْيُوْنٍ اَوْ غَيْرِ مَدْيُوْنٍ لَمْ يَحْنَثْ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ اِلَّا اَنَّهُ اِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ لَا يَحْنَثُ وَاِنْ نَوٰى لِاَنَّهُ لَا مِلْكَ لِلْمَوْلٰى فِيْهِ عِنْدَهُ، وَاِنْ كَانَ الدَّيْنُ غَيْرَ مُسْتَغْرِقٍ اَوْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَا يَحْنَثُ مَا لَمْ يَنْوِهِ لِاَنَّ الْمِلْكَ فِيْهِ لِلْمَوْلٰى لٰكِنَّهُ يُضَافُ اِلَى الْعَبْدِ عُرْفًا، وَكَذَا شَرْعًا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ﴿مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَهُوَ لِلْبَائِعِ﴾ اَلْحَدِيْثَ فَتَخْتَلُّ الْاِضَافَةُ اِلَى الْمَوْلٰى فَلَا بُدَّ مِنَ النِّيَّةِ ـ وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ : فِي الْوُجُوْهِ كُلِّهَا : يَحْنَثُ اِذَا نَوَاهُ لِاخْتِلَالِ الْاِضَافَةِ . وَقَالَ مُحَمَّدٌ : يَحْنَثُ وَاِنْ لَمْ يَنْوِهِ لِاعْتِبَارِ حَقِيْقَةِ الْمِلْكِ اِذِ الدَّيْنُ لَا يَمْنَعُ وُقُوْعَهُ لِلسَّيِّدِ عِنْدَهُمَا ـ

অনুবাদ : আর কেউ যদি তাকে বলে বসো এবং আমার এখানে দুপুরের আহার গ্রহণ কর। আর সে বলে যদি আমি দুপুরের আহার গ্রহণ করি তাহলে আমার গোলাম আজাদ। অতঃপর সে বের হয়ে বাড়িতে গেল এবং দুপুরের আহার গ্রহণ করল তাহলে কসম ভঙ্গকারী হবে না। কেননা তার বক্তব্যটি অপর পক্ষের কথার প্রতি উত্তরে এসছে। সুতরাং তা উক্ত আহবানের সাথে জড়িত হবে। সুতরাং নিমন্ত্রণকৃত মধ্যাহ্নভোজই উদ্দেশ্য হবে। পক্ষান্তরে যদি বলে আজ দুপুরের আহার গ্রহণ করি তাহলে বিষয়টি ভিন্ন হবে। কেননা প্রতি উত্তরে সে অতিরিক্ত কথা যোগ করেছে। সুতরাং এটা স্বতন্ত্র সূচনা বক্তব্য ধরা হবে।

যে ব্যক্তি কসম করল যে, অমুকের সওয়ারিতে আরোহণ করবে না। অতঃপর সে অমুকের ঋণগ্রস্থ বা ঋণমুক্ত অনুমতি প্রাপ্ত গোলামের সওয়ারিতে আরোহণ করল, তাহলে সে কসম ভঙ্গকারী হবে না। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে। পক্ষান্তরে যদি সে বেষ্টনকারী ঋণগ্রস্ত হয় তাহলে নিয়ত করলেও কসম ভঙ্গকারী হবে না। কেননা এক্ষেত্রে তাঁর মতে উক্ত গোলামের সাওয়ারিতে মনিবের মালিকানা নেই। পক্ষান্তরে ঋণ যদি বেষ্টকারী না হয় কিংবা কোনো ঋণই না থাকে তাহলে যতক্ষণ সওয়ারিটিকেও নিয়ত না করবে ততক্ষণ কসম ভঙ্গকারী হবে না। কেননা গোলামের মালিকানাধীন বস্তুতে মূল মালিকানা হচ্ছে মনিবের। কিন্তু লোক প্রচলনও শরিয়ত উভয় দিক থেকেই উক্ত বস্তুর মালিকানা গোলামের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়। নবী করীম ﷺ বলেছেন مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَهُوَ لِلْبَائِعِ (رواه السنة) কেউ যদি কোনো গোলাম বিক্রি করে আর তার কোনো মাল থাকে তাহলে ঐ মাল বিক্রেতার হবে। ফলে মনিবের সাথে মালিকানা সম্পৃক্তি ত্রুটিপূর্ণ হয়েছে। সুতরাং নিয়ত জরুরি হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, উক্ত সকল ক্ষেত্রে যদি সে নিয়ত করে তাহলে কসম ভঙ্গকারী হবে। কেননা মনিবের সাথে মালিকানার সম্পৃক্তি ত্রুটিপূর্ণ হয়েছে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) মনিবের প্রকৃত মালিকানাকে বিবেচনায় এনে বলেছেন, নিয়ত না করা সত্ত্বেও (সকল ক্ষেত্রে) কসম ভঙ্গকারী হবে। কেননা উভয়ের মতে ঋণগ্রস্ততা মনিবের মালিকানা হওয়া রোধ করে না

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কোনো অপর ব্যক্তিকে এ মর্মে দাওয়াত দিল যে, আগামীকাল আমার নিকট এসে খানা খাবে। উত্তরে আমন্ত্রিত মেহমান ব্যক্তি বলল, আমি যদি আগামীকাল তোমার সাথে খানা খাই তাহলে আমার গোলাম আজাদ। সুতরাং যদি সে আমন্ত্রণকারীর সাথে খানা খায় তাহলে তার গোলাম আজাদ হয়ে যাবে। কেননা এতে তার কৃত শর্ত পাওয়া যায়। কিন্তু আমন্ত্রিত ব্যক্তি যদি দাওয়াতকারীর বাড়ি না গিয়ে নিজস্ব বাড়ির খানা খায় তাহলে তার কসমভঙ্গকারী হবে না। কেননা কসম ভঙ্গের জন্য দাওয়াতকারীর সাথে খাওয়াটা আবশ্যক ছিল। আর এখানে সেটা পাওয়া যায়নি। অনুরূপভাবে ঐ দিন না খেয়ে অন্য দিন দাওয়াতকারীর সাথে খেলেও কসম ভঙ্গ হবে না। পক্ষান্তরে আমন্ত্রিত ব্যক্তি যদি বলে আজ আমি খানা খাব না। তাহলে সে যে কোনো জায়গায় আজ খেলেই কসম ভঙ্গকারী হয়ে যাবে। কেননা সে দাওয়াতকারীর দাওয়াকেই কেবল প্রত্যাখ্যান করেনি বরং আজ দিন না খাওয়ার কসম করেছে। সুতরাং আজ যে কোনো জায়গায় খেলেই কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে।

এমনিভাবে যদি কোনো ব্যক্তি কসম করে বলে যে, আমি অমুক তথা খালেদের সওয়ারিতে আরোহণ করব না। কিন্তু পরবর্তীতে সে খালেদের এমন গোলাম যাকে ব্যবসার অনুমতি প্রদান করেছে তার সওয়ারিতে আরোহণ করেছে। তাহলে এমতাবস্থায় ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে উক্ত ব্যক্তি কসম ভঙ্গকারী হবে না। খালেদের গোলাম ঋণগ্রস্ত হোক বা ঋণমুক্ত হোক। তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন যে, কসমকারী উক্ত সব শর্ত পাওয়া সত্ত্বেও কসম ভঙ্গকারী হয়ে যাবে। যদি সে তার নিয়ত করে থাকে।

আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, সর্বাবস্থায় উক্ত মাসআলায় কমসকারী কসম ভঙ্গকারী হয়ে যাবে। নিয়তেরও প্রয়োজন নেই। কেননা এতে মনিবের প্রকৃত মালিকানা থাকা জরুরি।

মোটকথা : যেই গোলামকে ব্যবসার অনুমিতি দেওয়া হয়েছে প্রকৃত পক্ষে ঐ গোলাম এখনও মনিবের গোলাম হিসেবেই রয়েছে। কিন্তু প্রচলনে অনুমতি প্রাপ্ত গোলাম বলা হয়।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) সাধারণ প্রচলনের প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন। কেননা কসমের ভিত্তিই হলো সাধারণ প্রচলনের উপর। এখন গোলাম যদি ঋণ দ্বারা পরিপূর্ণভাবে বেষ্টিত হয় তাহেল প্রচলন এবং বাস্তবতা কোনোভাবেই গোলাম আর সে মনিবের থাকে না। সুতরাং ঐ গোলামের সওয়ারিতে আরোহণ করলে কসম ভঙ্গকারী হবে না। কিন্তু সাহেবাইনের মতে এখনও গোলামের উপর মনিবের মালিকানা বহাল রয়েছে। তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) মতে সম্পর্কের মাঝে একটু ত্রুটি আসার কারণে নিয়ত করতে হবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে নিয়তের প্রয়োজন নেই।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ الْيَمِيْنِ فِى الْاَكْلِ وَ الشُّرْبِ

قَالَ وَمَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ هٰذِهِ النَّخْلَةِ فَهُوَ عَلٰى ثَمَرِهَا لِاَنَّهٗ اَضَافَ الْيَمِيْنَ اِلٰى مَا لَا يُؤْكَلُ فَيَنْصَرِفُ اِلٰى مَا يَخْرُجُ مِنْهُ وَهُوَ الثَّمَرُ لِاَنَّهٗ سَبَبٌ لَهٗ فَيَصْلُحُ مَجَازًا عَنْهُ، لٰكِنَّ الشَّرْطَ اَنْ لَا يَتَغَيَّرَ بِصُنْعِهٖ جَدِيْدَةً حَتّٰى لَا يَحْنَثَ بِالنَّبِيْذِ وَالْخَلِّ وَالدِّبْسِ الْمَطْبُوْخِ وَاِنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ هٰذَا الْبُسْرِ فَصَارَ رُطَبًا فَاَكَلَهٗ لَمْ يَحْنَثْ . وَكَذَا اِذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ هٰذَا الرُّطَبِ اَوْ مِنْ هٰذَا اللَّبَنِ فَصَارَ تَمْرًا اَوْ صَارَ اللَّبَنُ شِيرَازًا لَمْ يَحْنَثْ لِاَنَّ صِفَةَ الْبُسُوْرَةِ وَالرُّطُوْبَةِ دَاعِيَةٌ اِلَى الْيَمِيْنِ، وَكَذَا كَوْنُهٗ لَبَنًا فَيَتَقَيَّدُ بِهٖ، وَلِاَنَّ اللَّبَنَ مَأْكُوْلٌ فَلَا يَنْصَرِفُ الْيَمِيْنُ اِلٰى مَا يُتَّخَذُ مِنْهُ، بِخِلَافِ مَا اِذَا حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ هٰذَا الصَّبِيَّ اَوْ هٰذَا الشَّابَّ فَكَلَّمَهٗ بَعْدَمَا شَاخَ لِاَنَّ هِجْرَانَ الْمُسْلِمِ بِمَنْعِ الْكَلَامِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ فَلَمْ يُعْتَبَرْ الدَّاعِيْ دَاعِيًا فِي الشَّرْعِ ـ

পরিচ্ছেদ : পানাহার সংক্রান্ত কসম

অনুবাদ : কেউ যদি কসম করে যে, আমি এই খেজুর বৃক্ষ থেকে ভক্ষণ করব না। তাহলে এটা তার ফলের উপর প্রযোজ্য হবে। কেননা কসমটিকে সে যা খাওয়া যায় না তার সাথে সম্পৃক্ত করেছে। সুতরাং তা থেকে উৎপন্ন ফলের দিকেই কসমটি প্রত্যাবর্তিত হবে। কারণ বৃক্ষ হচ্ছে ফলের উপকরণ সুতরাং বৃক্ষ দ্বারা রূপক অর্থে ফল উদ্দেশ্য হতে পারে। তবে শর্ত এই যে, নতুন কোনো প্রক্রিয়া দ্বারা তাতে যেন কোনো পরিবর্তন না হয়। এ কারণেই নাবিয, সিরকা ও জ্বাল দেওয়া শিরা পান করার দ্বারা কসম ভঙ্গকারী হবে না।

যদি কসম করে যে, এই কাঁচা খেজুর থেকে খাব না। অতঃপর তাকে খাওয়ার পর খায় তাহলে কসম ভঙ্গকারী হবে না। তদ্রূপ যদি কসম করে যে, সে এই তাজা খেজুর থেকে খাবে না বা এই দুধ খাবে না। অতঃপর পাকা খেজুর খোরমা হয়ে গেল এবং দুধ ছানা হয়ে গেলে খেল তাহলে সে কসম ভঙ্গকারী হবে না।

কেননা খেজুরে কাঁচা পাকা গুণ কসম করার কারণ হতে পারে। তদ্রূপ দুধের অবস্থাও কসমের কারণ হতে পারে। সুতরাং কসম উল্লিখিত শব্দের সাথে সীমাবদ্ধ হবে। তা ছাড়া দুধ যেহেতু আহারযোগ্য সেহেতু দুধ থেকে যা তৈরি করা হয় কসমটি সেদিকে অভিমুখী হবে না।

পক্ষান্তরে যদি কসম করে যে, এই বালকের সাথে কথা বলবে না। কিংবা এই যুবকের সাথে কথা বলবে না। অতঃপর সে বৃদ্ধ হওয়ার পর তার সাথে কথা বলল, তাহলে বিষয়টি ভিন্ন হবে। কেননা কথা বন্ধের মাধ্যমে মুসলমানের সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করা শরিয়তে নিষিদ্ধ। সুতরাং কসমের কারণরূপে বিবেচ্য অবস্থাগুলো শরিয়তের দৃষ্টিতে এখানে কারণ রূপে গণ্য হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কেউ যদি কোনো বস্তু না খাওয়ার কসম করে তাহলে ঐ বস্তুটা সেই গুণের সাথে থাকে, ঐ অবস্থার উপরই তা খাওয়া নিষেধ হয়ে যাবে। কিন্তু যদি গুণ পরিবর্তন হয়ে যায় তাহলে তার সাথে কসমের বিধানটা নিষেধ হিসেবে বাকি থাকবে না। যেমন কোনো ব্যক্তি কসম করল যে, সে খেজুর খাবে না বা দুধ খাবে না। অতঃপর খেজুর বা দুধের যেই গুণের উপর কসম করেছিল ঐ অবস্থা পরিবর্তন হয়ে গেলে কসমের হুকুম তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। সুতরাং দুধ দ্বারা পনির বা খেজুর দ্বারা অন্য কিছু বানালে তা খাওয়া নিষেধ হবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَحْمَ هٰذَا الْحَمَلِ فَأَكَلَ بَعْدَمَا صَارَ كَبْشًا حَنِثَ لِاَنَّ صِفَةَ الصِّغَرِ فِيْ هٰذَا لَيْسَتْ بِدَاعِيَةٍ اِلَى الْيَمِيْنِ فَاِنَّ الْمُمْتَنِعَ عَنْهُ اَكْثَرُ اِمْتِنَاعًا عَنْ لَحْمِ الْكَبْشِ . قَالَ وَمَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ بُسْرًا فَأَكَلَ رُطَبًا لَمْ يَحْنَثْ لِاَنَّهُ لَيْسَ بِبُسْرٍ . وَمَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ رُطَبًا اَوْ بُسْرًا اَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ رُطَبًا وَلَا بُسْرًا فَأَكَلَ مُذَنِّبًا حَنِثَ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ، وَقَالَا لَا يَحْنَثُ فِي الرُّطَبِ يَعْنِي بِالْبُسْرِ الْمُذَنِّبِ وَلَا فِي الْبُسْرِ بِالرُّطَبِ الْمُذَنِّبِ لِاَنَّ الرُّطَبَ الْمُذَنِّبَ يُسَمّٰى رُطَبًا وَالْبُسْرَ الْمُذَنِّبَ يُسَمّٰى بُسْرًا فَصَارَ كَمَا اِذَا كَانَ الْيَمِيْنُ عَلَى الشِّرَاءِ . وَلَهُ اَنَّ الرُّطَبَ الْمُذَنِّبَ مَا يَكُوْنُ فِيْ ذَنَبِهِ قَلِيْلُ بُسْرٍ، وَالْبُسْرَ الْمُذَنِّبَ عَلٰى عَكْسِهِ فَيَكُوْنُ اٰكِلُهُ آكِلَ الْبُسْرِ وَالرُّطَبِ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مَقْصُوْدٌ فِي الْاَكْلِ بِخِلَافِ الشِّرَاءِ لِاَنَّهُ يُصَادِفُ الْجُمْلَةَ فَيَتْبَعُ الْقَلِيْلُ فِيْهِ الْكَثِيْرَ .

অনুবাদ : কেউ যদি কসম করে যে, মেষ শাবকের গোশ্ত খাবে না। অতঃপর মেষ হওয়ার পর তার গোশত খেল, তাহলে কসম ভঙ্গকারী হবে। কেননা এখানে 'শাবকত্ব এমন গুণ নয় যা কসম করার কারণ হতে পারে। কারণ যে ব্যক্তি শাবকের গোশ্ত পরিহার করে সে মেষের গোশ্ত থেকে আরো অধিক পরিহারকারী হবে।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, **কেউ যদি কসম করে যে কাঁচা খেজুর খাবে না। অতঃপর পাকা খেজুর খায় তাহলে সে কসম ভঙ্গকারী হবে না।** কেননা যে ফলটি সে খেল তা কাঁচা খেজুর নয়। **কেউ যদি কসম করে যে, কাচা খেজুর বা পাকা খেজুর খাবে না। কিংবা পাকা খেজুর ও কাঁচা খেজুর খাবে না। অতঃপর গোড়ার দিকে পাকা ধরা খেজুর খেল তাহলে সে ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মতে কসম ভঙ্গকারী হবে। সাহেবাইনের মতে পাকা খেজুর খেলে কসম ভঙ্গকারী হবে না।** অর্থাৎ কাঁচা খেতে যেটি গোড়ার দিকে কাঁচা খেজুর খাওয়া এবং পাকা খেজুরের ক্ষেত্রে শুধু গোড়ায় পাক ধরা খেজুর খাওয়া দ্বারা কসম ভঙ্গ হবে না।

কেননা গোড়ায় পাক ধরা খেজুরকে কাচাঁ খেজুরই বলা হয় এবং শুধু গোড়ার দিকে কাঁচা অবস্থায় খেজুর কে কাঁচা খেজুরই বলা হয়। সুতরাং খাওয়ার ব্যাপারে কৃত কসমটি ক্রয়ের ব্যাপারে কৃত কসমের মতোই হলো: ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল এই যে, যে কাঁচা-পাকার পরিমাণ যাই হোক মিশ্র খেজুর ভক্ষণকারী প্রকৃত পক্ষে কাঁচা ও পাকা উভয় অবস্থার খেজুর ভক্ষণকারী হবে। আর ভক্ষণের ক্ষেত্রে উভয় অবস্থাই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে ক্রয়ের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা ক্রয় সমগ্র এর সাথে সংযুক্ত হয়। সুতরাং অল্প যেখানে অধিকের অনুগামী হয়।

https://e-ilm.weebly.com/

وَلَوْ حلف لَا يَشْتَرِيْ رُطَبًا فَاشْتَرٰى كِبَاسَةَ بُسْرٍ فِيْهَا رُطَبٌ لَا يَحْنَثُ لِاَنَّ الشِّرَاءَ يُصَادِفُ الْجُمْلَةَ وَالْمَغْلُوبُ تَابِعٌ وَلَوْ كَانَتْ الْيَمِيْنُ عَلٰى الْاَكْلِ يَحْنَثُ لِاَنَّ الْاَكْلَ يُصَادِفُهٗ شَيْئًا فَشَيْئًا فَكَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا مَقْصُوْدًا وَصَارَ كَمَا اِذَا حَلَفَ لَا يَشْتَرِيْ شَعِيرًا اَوْ لَا يَاْكُلُهٗ فَاشْتَرٰى حِنْطَةً فِيهَا حَبَّاتُ شَعِيرٍ وَاَكَلَهَا يَحْنَثُ فِيْ الْاَكْلِ دُوْنَ الشِّرَاءِ لِمَا قُلْنَا قَالَ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَاْكُلُ لَحْمًا فَاَكَلَ لَحْمَ السَّمَكِ لَا يَحْنَثُ وَالْقِيَاسُ اَنْ يَحْنَثَ لِاَنَّهٗ يُسَمّٰى لَحْمًا فِيْ الْقُرْاٰنِ . وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ اَنَّ التَّسْمِيَةَ مَجَازِيَّةٌ لِاَنَّ اللَّحْمَ مُنْشَؤُهٗ مِنَ الدَّمِ وَلَا دَمَ فِيْهِ لِسُكُوْنِهٖ فِيْ الْمَاءِ وَاِنْ اَكَلَ لَحْمَ خِنْزِيرٍ اَوْ لَحْمَ اِنْسَانٍ يَحْنَثُ لِاَنَّهٗ لَحْمٌ حَقِيقِيٌّ اِلَّا اَنَّهٗ حَرَامٌ . وَالْيَمِيْنُ قَدْ يُعْقَدُ لِلْمَنْعِ مِنَ الْحَرَامِ وَكَذَا اِذَا اَكَلَ كَبِدًا اَوْ كَرِشًا لِاَنَّهٗ لَحْمٌ حَقِيْقَةً فَاِنَّ نُمُوَّهٗ مِنَ الدَّمِ وَيُسْتَعْمَلُ اسْتِعْمَالَ اللَّحْمِ . وَقِيْلَ فِيْ عُرْفِنَا لَا يَحْنَثُ لِاَنَّهٗ لَا يُعَدُّ لَحْمًا ـ

অনুবাদ : যদি কেউ কসম করে যে, পাকা খেজুর ক্রয় করবে না। অতঃপর সে কাঁচা খেজুরের গুচ্ছ ক্রয় করে, যাতে কিছু পাকা খেজুরও রয়েছে। তাহলে কসম ভঙ্গকারী হবে না। কেননা ক্রয় 'সমগ্র' এর সাথে সম্পৃক্ত হয় এবং স্বল্প অংশটি অনুগামী হবে। **পক্ষান্তরে যদি খাওয়ার ব্যাপারে কসম হয় তাহলে কসম ভঙ্গ করা হবে।** কেননা ভক্ষণ কর্মটি ধীরে ধীরে বস্তুটির সাথে যুক্ত হয়। ফলে কাঁচা ও পাকা উভয় অংশটি উদ্দেশ্যভুক্ত হয়। সুতরাং এমন হলো যে, যব ক্রয় করবে না বা খাবে না বলে কসম করল । অতঃপর গম ক্রয় করল যাতে কিছু যবের দানা ছিল এবং সে তা খেল। এ অবস্থায় ভক্ষণের ক্ষেত্রে কসম ভঙ্গ হবে কিন্তু ক্রয়ের ক্ষেত্রে ভঙ্গ হবে না। কারণ এটিই যা আমরা বলেছি।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, **যদি কসম করে যে, গোশ্‌ত খাবে না, অতঃপর সে মাছের গোশত খেল তাহলে কসম ভঙ্গ হবে না।** কিয়াসের দাবি হচ্ছে কসম ভঙ্গ হওয়া। কেননা কুরআনে মাছের ক্ষেত্রে গোশত ব্যবহার করা হয়েছে। সূক্ষ্ম কিয়াসের কারণ এই যে, মাছের ক্ষেত্রে "গোশত" শব্দের ব্যবহার হচ্ছে রূপক। কেননা গোশতের উৎপত্তি হচ্ছে রক্ত থেকে। অথচ পানিতে বাসকারী মাছের রক্ত নেই। **আর যদি শুকরের কিংবা মানুষের গোশত ভক্ষণ করে তাহলে কসম ভঙ্গকারী হবে।** কেননা এটি প্রকৃত গোশ্‌ত তবে তা হারাম। আর কসম সংঘটিত হয় হারাম থেকে রোধ করার জন্য। **এই হুকুম হবে যদি কলজে বা পাকস্থলী ভক্ষণ করে।** কেননা প্রকৃত পক্ষে ইহা গোশ্‌ত। কেননা এর উৎপত্তি ও বর্ধন রক্ত থেকে আর গোশ্‌তের মতোই এগুলো ব্যবহার করা হয়। কোনো কোনো আলেমের মতে আমাদের প্রচলন অনুযায়ী কসম ভঙ্গ হবে না। কেননা এটাকে গোশ্‌ত হিসেবে ধরা হয় না।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কোনো ব্যক্তি যদি কসম করে যে, যব খাবে না। অতঃপর যদি সে গম খায় আর তাতে যবের 'দু' একটা দানা থাকে তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যদি কসম করে যে যব ক্রয় করবো। অতঃপর গম ক্রয় করে আর তাতে যবের 'দু একটি দানা থাকে তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। এতদুভয়ের মাঝে পার্থক্যের কারণ হলো কেনার ক্ষেত্রে অধিকাংশ পরিমাণটা মূল উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। সুতরাং অল্পটা অধিকের অনুগত হয়। বিধায় গমের পরিমাণ বেশি হলে ক্রয়ের ক্ষেত্রে কসম ভঙ্গ হবে না। পক্ষান্তরে খাওয়ার ক্ষেত্রে কম-বেশি পুরোটাই মূল উদ্দেশ্য হয়ে থাকে বিধায় এক্ষেত্রে কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে।

কোনো ব্যক্তি যদি কসম করে যে, গোশ্‌ত খাবে না। অতঃপর সে মাছ খায় তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। এটা হলো সূক্ষ্ম কিয়াসের রায়। আবার কোনো কোনো ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন যে, কসমকারী যদি মুসলমান হয় তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। এ মতটি বিশুদ্ধ। এমনিভাবে গোশত খাবে না বলে কসম করার পর যদি কলিজা বা ভূরি খায় তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা কলিজা এবং ভূরি মৌলিকভাবে গোশ্‌ত বিশেষ। কেননা এসব কিছু রক্ত থেকেই সৃষ্ট। এবং গোশতের মতোই তা ব্যবহার করে থাকে। আর কোনো কোনো ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন যে, কসম ভঙ্গ হবে না। কেননা আমাদের প্রচলনে তাকে গোশত বলা হয় না।

খোলাসা ও মুহিত গ্রন্থে এই মতটিকেই বিশুদ্ধ বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

মাসআলা : গোশ্‌ত খাবে না। এ কসম করার পর যদি কাঁচা গোশত খায় তাহলে এক বর্ণনা মতে কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) উক্ত মত পোষণ করেছেন। আর অন্য বর্ণনা মতে কসম ভঙ্গ হবে না। ইমাম মালেক (র.) এ মতটি গ্রহণ করেছেন।

আর যদি উক্ত ব্যক্তি পা খায় তাহলে ইমাম শাফেয়ী (র.) এর মতে কসম ভঙ্গ হবে না। আর যদি গুর্দা খায় তাহলে আমাদের মতে কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। তবে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে কসম ভঙ্গকারী হবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

وَلَوْ حلف لَا يَأْكُلُ أَوْ لَا يَشْتَرِيْ شَحْمًا لَمْ يَحْنَثْ إِلَّا فِيْ شَحْمِ الْبَطْنِ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ . وَقَالَا : يَحْنَثُ فِيْ شَحْمِ الظَّهْرِ أَيْضًا وَهُوَ اللَّحْمُ السَّمِينُ لِوُجُودِ خَاصِّيَّةِ الشَّحْمِ فِيْهِ وَهُوَ الذَّوْبُ بِالنَّارِ . وَلَهُ أَنَّهُ لَحْمٌ حَقِيْقَةً؛ أَلَا تَرَاهُ أَنَّهُ يَنْشَأُ مِنَ الدَّمِ وَيُسْتَعْمَلُ اِسْتِعْمَالَهُ وَتَحْصُلُ بِهِ قُوَّتُهُ وَلِهَذَا يَحْنَثُ بِأَكْلِهِ فِيْ الْيَمِيْنِ عَلَى أَكْلِ اللَّحْمِ، وَلَا يَحْنَثُ بِبَيْعِهِ فِيْ الْيَمِيْنِ عَلَى بَيْعِ الشَّحْمِ، وَقِيْلَ هٰذَا بِالْعَرَبِيَّةِ، فَأَمَّا اِسْمُ بِيْهِ بِالْفَارِسِيَّةِ لَا يَقَعُ عَلَى شَحْمِ الظَّهْرِ بِحَالٍ . وَلَوْ حلَفَ لَا يَشْتَرِيْ أَوْ لَا يَأْكُلُ لَحْمًا أَوْ شَحْمًا فَاشْتَرَى أَلْيَةً أَوْ أَكَلَهَا لَمْ يَحْنَثْ لِأَنَّهُ نَوْعٌ ثَالِثٌ حَتَّى لَا يُسْتَعْمَلَ اِسْتِعْمَالَ اللُّحُوْمِ وَالشُّحُوْمِ ـ

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি কসম করে যে, চর্বি খাবে না বা ক্রয় করবে না। তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে শুধু উদরের চর্বির ক্ষেত্রেই কসম ভঙ্গ হবে। সাহেবাইন (র.) বলেন, পিঠের চর্বির ক্ষেত্রেও কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে।

মূলত : এটা চর্বি মিশ্রিত মাংস। কেননা তাতে চর্বির বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আর সেটা হলো আগুনে গলে যাওয়া । ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো এই যে, যেহেতু এটা রক্ত থেকে উৎপন্ন। সেহেতু এটা প্রকৃত গোশত এবং গোশতের মতোই ব্যবহৃত হয়। আর তা দ্বারা গোশতের শক্তি অর্জিত হয়।

একারণেই গোশ্‌ত না খাওয়ার কসম করার ক্ষেত্রে তা আহার করলে কসম ভঙ্গ হয়। অথচ চর্বি বিক্রয় না করার কসমের ক্ষেত্রে তা বিক্রি করলে কসম ভঙ্গ হবে না। কোনো কোনো আলেমের মতে এই মতপার্থক্য হচ্ছে আরবিতে شَحْمٌ শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে। পক্ষান্তরে ফার্সিতে پیه (বাংলায় চর্বি) ব্যবহার করলে পৃষ্ঠের চর্বি কোনো অবস্থাতেই কসমের অন্তর্ভুক্ত হবে না। **যদি কসম করে যে, গোশ্‌ত বা চর্বি আহার করবে না বা ক্রয় করবে না। অতঃপর সে দুম্বার ঝুলন্ত নিতম্ব ক্রয় করল বা আহার করল তাহলে কসম ভঙ্গ হবে না।** কেননা এটা তৃতীয় প্রকার বস্তু এবং তা গোশত বা চর্বির মতো ব্যবহার হয় না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যদি কোনো ব্যক্তি কসম করে বলে যে, আমি চর্বি খাব না। অথবা ক্রয় করব না, তাহলে পিঠের চর্বি খেলে বা ক্রয় করলে কসম ভঙ্গ হবে কিনা এ ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও সাহেবাইন (র.)-এর মাঝে দ্বিমত রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, পিঠের চর্বি খেলে বা ক্রয় করলে কসম ভঙ্গ হবে না। বরং পেটের চর্বি খেলে বা ক্রয় করলেই কসম ভঙ্গ হবে। আর সাহেবাইন বলে যে, পেট ও পিঠ উভয়ের চর্বির ক্ষেত্রেই তার কসম প্রযোজ্য। সুতরাং যেটাই খাবে বা ক্রয় করবে কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَمَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ هٰذِهِ الْحِنْطَةِ لَمْ يَحْنَثْ حَتّٰى يَقْضِمَهَا، وَلَوْ اَكَلَ مِنْ خُبْزِهَا لَمْ يَحْنَثْ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ . وَقَالَا : اِنْ اَكَلَ مِنْ خُبْزِهَا حَنِثَ اَيْضًا لِاَنَّهُ مَفْهُوْمٌ مِنْهُ عُرْفًا . وَلِاَبِيْ حَنِيْفَةَ اَنَّ لَهُ حَقِيْقَةً مُسْتَعْمَلَةً فَاِنَّهَا تُقْلٰى وَتُغْلٰى وَتُؤْكَلُ قَضْمًا وَهِيَ قَاضِيَةٌ عَلَى الْمَجَازِ الْمُتَعَارَفِ عَلٰى مَا هُوَ الْاَصْلُ عِنْدَهُ . وَلَوْ قَضَمَهَا حَنِثَ عِنْدَهُمَا هُوَ الصَّحِيْحُ لِعُمُوْمِ الْمَجَازِ، كَمَا اِذَا حَلَفَ لَا يَضَعُ قَدَمَهُ فِيْ دَارِ فُلَانٍ . وَاِلَيْهِ الْاِشَارَةُ بِقَوْلِهِ فِي الْخُبْزِ حَنِثَ اَيْضًا ـ

অনুবাদ : যদি কেউ কসম করে যে, এই গম থেকে আহার করবে না, তাহলে দাঁতে চিবানো ছাড়া কসম ভঙ্গ হবে না। এবং যদি উক্ত গমের তৈরি রুটি আহার করে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে কসম ভঙ্গ হবে না। সাহেবাইন (র.) বলেন, উক্ত গমের রুটি আহারেও কসম ভঙ্গ হবে। কেননা প্রচলনে এ ধরনের কথা দ্বারা রুটি বোঝানো হয়।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল এই যে, গম আহারে একটি প্রকৃত অর্থ রয়েছে, যা ব্যবহৃত হয়। কেননা এটা সিদ্ধ করে এবং ভেজে দাঁতে চিবিয়ে খাওয়া হয়। আর ব্যবহৃত প্রকৃত অর্থ প্রচলিত রূপক অর্থের উপর প্রাধান্য লাভ করে। এটাই হলো ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মূলনীতি। আর যদি তা চিবিয়ে খায় তাহলে সাহেবাইনের মতেও রূপক অর্থের ব্যাপকতার ভিত্তিতে কসম ভঙ্গ হবে। এটিই বিশুদ্ধ অভিমত। যেমন যদি কসম করে যে, অমুকের বাড়িতে রাখবে না। এই রূপক অর্থ ব্যাপকতার দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে রুটির ক্ষেত্রেও কসম ভঙ্গ হবে বলে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কোনো ব্যক্তি যদি কসম করে যে, "গম খাবে না" তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে কসম ভঙ্গ হওয়ার জন্য গম চিবানোর মাধ্যমে খেতে হবে অন্যথায় কসম ভঙ্গ হবে না। কিন্তু সাহেবাইন (র.) বলেন, আস্ত গম চিবানোর মাধ্যমে খেলেও কসম ভঙ্গ হবে। আবার আটার রুটি খেলেও কসম ভঙ্গ হবে। মতবিরোধের মূল কারণ হলো একটি মূলনীতিতে মতবিরোধ হওয়া। আর তা হচ্ছে এই- কোনো শব্দের যদি দু'টি অর্থ থাকে একটি হাকিকী (প্রকৃত) আর অপরটি মাজাযী (রূপক) তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, প্রকৃত অর্থই উদ্দেশ্য হবে। আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে উভয়টাই এক সাথে উদ্দেশ্য হওয়াটা সম্ভব হলে তাই হবে। এ কারণে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মত অনুযায়ী 'গম খাওয়া' এর হাকিকী অর্থ মুরাদ নেওয়াই সাব্যস্ত। আর সাহেবাইন (র.)-এর নিকট হাকিকীর সাথে সাথে রূপক অর্থ হিসেবে কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে

https://e-ilm.weebly.com/

وَلَوْ حلَفَ لَا يَاْكُلُ مِنْ هٰذَا الدَّقِيقِ فَاَكَلَ مِنْ خُبْزِهٖ حَنِثَ لِاَنَّ عَيْنَهٗ غَيْرُ مَاْكُوْلٍ فَانْصَرَفَ اِلٰى مَا يُتَّخَذُ مِنْهُ وَلَوْ اِسْتَفَّهٗ كَمَا هُوَ لَا يَحْنَثُ هُوَ الصَّحِيْحُ لِتَعَيُّنِ الْمَجَازِ مُرَادًا . وَلَوْ حلَفَ لَا يَاْكُلُ خُبْزًا فَيَمِيْنُهٗ عَلٰى مَا يُعْتَادُ اَهْلُ الْمِصْرِ اَكْلَهٗ خُبْزًا وَذٰلِكَ خُبْزُ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ لِاَنَّهٗ هُوَ الْمُعْتَادُ فِيْ غَالِبِ الْبُلْدَانِ وَلَوْ اَكَلَ مِنْ خُبْزِ الْقَطَائِفِ لَا يَحْنَثُ لِاَنَّهٗ لَا يُسَمّٰى خُبْزًا مُطْلَقًا اِلَّا اِذَا نَوَاهُ لِاَنَّهٗ مُحْتَمَلُ كَلَامِهٖ وَكَذَا لَوْ اَكَلَ خُبْزَ الْاُرْزِ بِالْعِرَاقِ لَمْ يَحْنَثْ لِاَنَّهٗ غَيْرُ مُعْتَادٍ عِنْدَهُمْ حَتّٰى لَوْ كَانَ بِطَبَرِسْتَانَ اَوْ فِيْ بَلْدَةٍ طَعَامُهُمْ ذٰلِكَ يَحْنَثُ . وَلَوْ حلَفَ لَا يَاْكُلُ الشِّوَاءَ فَهُوَ عَلٰى اللَّحْمِ دُوْنَ الْبَاذِنْجَانِ وَالْجَزَرِ لِاَنَّهٗ يُرَادُ بِهِ اللَّحْمُ الْمَشْوِيُّ عِنْدَ الْاِطْلَاقِ اِلَّا اَنْ يَنْوِيَ مَا يُشْوٰى مِنْ بَيضٍ اَوْ غَيْرِهٖ لِمَكَانِ الْحَقِيْقَةِ . وَاِنْ حلَفَ لَا يَاْكُلُ الطَّبِيْخَ فَهُوَ عَلٰى مَا يُطْبَخُ مِنَ اللَّحْمِ وَهٰذَا اسْتِحْسَانٌ اعْتِبَارًا لِلْعُرْفِ، وَهٰذَا لِاَنَّ التَّعْمِيْمَ مُتَعَذِّرٌ فَيُصْرَفُ اِلٰى خَاصٍّ هُوَ مُتَعَارَفٌ وَهُوَ اللَّحْمُ الْمَطْبُوْخُ بِالْمَاءِ اِلَّا اِذَا نَوٰى غَيْرَ ذٰلِكَ لِاَنَّ فِيْهِ تَشْدِيْدًا، وَاِنْ اَكَلَ مِنْ مَرَقِهٖ يَحْنَثُ لِمَا فِيْهِ مِنْ اَجْزَاءِ اللَّحْمِ وَلِاَنَّهٗ يُسَمّٰى طَبِيْخًا ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, **যদি কসম করে যে, এই আটা থেকে খাবে না। অতঃপর ঐ আটার তৈরি রুটি ভক্ষণ করল তাহলে কসম ভঙ্গ হবে।** কেননা খোদ আটা আহারযোগ্য নয়। সুতরাং আটা দ্বারা তৈরি রুটির দিকেই কসমটি অভিমুখী হবে। **আর যদি আটা যে অবস্থায় আছে সে অবস্থায়ই মুখে দিয়ে খেয়ে ফেলে তাহলে কসম ভঙ্গ হবে না।** এটিই বিশুদ্ধ অভিমত। কেননা এখানে রূপক অর্থটি (প্রকৃত অর্থরূপে) নির্ধারিত হয়েছে।

যদি কসম করে যে, রুটি খাবে না, তাহলে তার কসমটি শহরবাসী যে ধরনের রুটি খাওয়ায় অভ্যস্ত তার উপর প্রযোজ্য হবে। আর তাহলো গমের বা যবের রুটি। কেননা অধিকাংশ শহরে এটিই হচ্ছে অভ্যস্ত রুটি। **আর যদি বাদামের তৈরি রুটি খায় তাহলে কসম ভঙ্গ হবে না।** কেননা নিঃশর্তভাবে এটাকে রুটি বলা হয় না। তবে এটার নিয়ত করলে কসম ভঙ্গ হবে। কারণ এটা তার বক্তব্যের সম্ভাবনাভুক্ত। **অদ্রূপ ইরাক অঞ্চলে চালের রুটি খেলে কসম ভঙ্গ হবে না।** কেননা এটা তাদের নিকট অভ্যস্ত রুটি না। পক্ষান্তরে তাবরিস্থানে কিংবা যে শহরের সাধারণ খাদ্য হলো চালের রুটি তাদের ক্ষেত্রে কসম ভঙ্গ হবে।

যদি কসম করে যে, 'ভুনা খাবে না তাহলে তা ভুনা গোশতের উপর প্রযোজ্য হবে। বেগুন অথবা গাজর ভুনার উপর প্রযোজ্য হবে না।

কেননা নিঃশর্ত ভুনা শব্দ দ্বারা ভুনা গোশত উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। তবে যদি ডিম ভাজা বা এ জাতীয় অন্য কিছু নিয়ত তাহলে প্রকৃত অর্থের ভিত্তিতে তাতেও কসম ভঙ্গ হবে। **যদি কসম করে যে, রান্না করা কিছু খাবে না, তাহলে প্রচলনের ভিত্তিতে রান্না করা গোশ্‌ত উদ্দেশ্য হবে** এ হলো সূক্ষ্ম কিয়াসের সিদ্ধান্ত। কেননা বক্তব্যটির ব্যাপকায়ন কঠিন। সুতরাং প্রচলিত বিশিষ্ট ক্ষেত্রের দিকেই কসমকে অভিমুখী করা হবে। আর তা হলো পানি দিয়ে রান্না করা গোশত। তবে যদি অন্য কিছুও নিয়ত করে (তাহলে গ্রহণ করা হবে) কেননা এতে নিজের উপর কঠোরতা রয়েছে। **আর যদি গোশ্‌তের ঝোল খায় তাহলেও কসম ভঙ্গ হবে।** কেননা এতে গোশ্‌তের অংশ রয়েছে। আর এজন্য যে, একে রান্নাকৃত বলা হয়।

https://e-ilm.weebly.com/

وَمَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ الرُّءُوْسَ فَيَمِيْنُهُ عَلَى مَا يُكْبَسُ فِيْ التَّنَانِيْرِ وَيُبَاعُ فِيْ الْمِصْرِ وَيُقَالُ يُكْنَسُ وَفِيْ الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ : لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ رَأْسًا فَهُوَ عَلَى رُءُوْسِ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ، وَقَالَ أَبُو يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ عَلَى الْغَنَمِ خَاصَّةً ، وَهٰذَا اِخْتِلَافُ عَصْرٍ وَزَمَانٍ كَانَ الْعُرْفُ فِيْ زَمَنِهِ فِيْهِمَا وَفِيْ زَمَنِهِمَا فِيْ الْغَنَمِ خَاصَّةً وَفِيْ زَمَانِنَا يُفْتٰى عَلٰى حَسَبِ الْعَادَةِ كَمَا هُوَ الْمَذْكُوْرُ فِي الْمُخْتَصَرِ ـ

অনুবাদ : যদি কসম করে যে মাথা খাবে না, তাহলে কসম দ্বারা এ সকল মাথা উদ্দেশ্য হবে যা তন্দুরে ঢুকিয়ে স্যাঁকা হয় এবং বাজারে বিক্রি হয়। পক্ষান্তরে জামে সগীর কিতাবের বর্ণনা মতে যদি কসম করে যে, মাথা খাবে না তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে গরু ও খাসীর মাথা উদ্দেশ্য হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.) বলেছেন। শুধু খাসীর মাথা উদ্দেশ্য হবে। এটা মূলত (প্রমাণ ভিত্তিক মতপার্থক্য নয়, বরং) দেশ-কাল ভিত্তিক মতপার্থক্য অর্থাৎ ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর সময় উভয় মাথার ক্ষেত্রে প্রচলন ছিল। আর আমাদের সময় অভ্যাস ও প্রচলন হিসেবেই ফতোয়া দেওয়া হবে। যেমন মুখতাসারুল কুদূরীতে উল্লিখিত হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাথা খাব না একথার কসম করার দ্বারা ঐ মাথা খাওয়াই নিষেধ হয়ে যাবে সমাজে মাথা খাওয়া হিসাবে যা প্রচলিত রয়েছে। ব্যাপকভাবে গোশ্‌তওয়ালা প্রত্যেক প্রাণীর মাথাই এই কসমের আতওতাভুক্ত হবে না। যেমন চড়ুই পাখির মাথা, মানুষের মাথা, শুকরেরর মাথা ইত্যাদি। কেননা "মাথা খাওয়া" কথায় সমাজে উল্লিখিত প্রাণীর মাথাকে বুঝায় না। সুতরাং উক্ত কসম করার পর বৈধ না হওয়া সত্ত্বেও যদি কেউ মানুষ বা শুকরের মাথা খায় তাহলে তা দ্বারা কসম ভঙ্গ হবে না। এ ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর পূর্বের বক্তব্য ছিল যে, উট, গাভী বকরির মাথা খাওয়ার দ্বারা কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কিন্তু পরবর্তীতে উটের মাথার ব্যাপারে উক্ত বক্তব্য থেকে প্রত্যাবর্তন করে বলেছেন শুধু মাত্র বকরি আর গাভীর মাথা খেলেই কসম ভঙ্গ হবে। কিন্তু সাহেবাইনের নিকট কেবল বকরির মাথা খেলেই কসম ভঙ্গ হবে অন্য মাথা খেলে কসম ভঙ্গ হবে না। উক্ত বক্তব্য হিসেবে উটের মাথা খাওয়ার দ্বারা কসম ভঙ্গ না হওয়ার ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও সাহেবাইন (র.) একমত। কেননা যে ব্যাপারে কসম করা হয়, তা উদ্দেশ্য বস্তু হিসাবেই গ্রহণযোগ্য হয়, আর উটের মাথা সমাজে খাওয়ার প্রচলন নেই, সুতরাং তা খাওয়ার দ্বারা কসম ভঙ্গ হবে না।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও সাহেবাইনের মধ্যকার উক্ত মতবিরোধের কারণ এ বলা হয়েছে যে, তাদের যুগে মাথা খাওয়ার বিষয় ভিন্ন ভিন্ন ছিল। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর জমানায় মাথা খাওয়ার প্রচলন বকরি এবং গরুর ক্ষেত্রে ছিল : পক্ষান্তরে সাহেবাইন তাদের যুগের প্রতি লক্ষ্য করে বকরির মাথার কথা বলেছেন। মোটকথা কসমের ব্যাপারে সমাজ ও কালের প্রচলন হিসাবে ফয়সালা হবে। সে মতে বর্তমান কালে যা বুঝাবে সে হিসাবেই ফয়সালা হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ وَاِنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ فَاكِهَةً فَاكَلَ عِنَبًا اَوْ رُمَّانًا اَوْ رُطَبًا اَوْ قِثَّاءً اَوْ خِيَارًا لَمْ يَحْنَثْ، وَاِنْ اَكَلَ تُفَّاحًا اَوْ بِطِّيْخًا اَوْ مِشْمِشًا حَنِثَ، وَهٰذَا عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ . وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ : حَنِثَ فِي الْعِنَبِ وَالرُّطَبِ وَالرُّمَّانِ اَيْضًا وَالْاَصْلُ اَنَّ الْفَاكِهَةَ اِسْمٌ لِمَا يُتَفَكَّهُ بِهٖ قَبْلَ الطَّعَامِ وَبَعْدَهُ : اَيْ يُتَنَعَّمُ بِهٖ زِيَادَةً عَلَى الْمُعْتَادِ، وَالرُّطَبُ وَالْيَابِسُ فِيْهِ سَوَاءٌ بَعْدَ اَنْ يَكُوْنَ التَّفَكُّهُ بِهٖ مُعْتَادًا حَتّٰى لَا يَحْنَثَ بِيَابِسِ الْبِطِّيْخِ، وَهٰذَا الْمَعْنٰى مَوْجُوْدٌ فِي التُّفَّاحِ وَاَخَوَاتِهٖ فَيَحْنَثُ بِهَا وَغَيْرُ مَوْجُوْدٍ فِي الْقِثَّاءِ وَالْخِيَارِ لِاَنَّهُمَا مِنَ الْبُقُوْلِ بَيْعًا وَاَكْلًا فَلَا يَحْنَثُ بِهِمَا . وَاَمَّا الْعِنَبُ وَالرُّطَبُ وَالرُّمَّانُ فَهُمَا يَقُوْلَانِ اِنَّ مَعْنَى التَّفَكُّهِ مَوْجُوْدٌ فِيْهَا فَاِنَّهَا اَعَزُّ الْفَوَاكِهِ وَالتَّنَعُّمُ بِهَا يَفُوْقُ التَّنَعُّمَ بِغَيْرِهَا، وَاَبُوْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ يَقُوْلُ : اِنَّ هٰذِهِ الْاَشْيَاءَ مِمَّا يُتَغَذّٰى بِهَا وَيُتَدَاوٰى بِهَا فَاَوْجَبَ قُصُوْرًا فِيْ مَعْنَى التَّفَكُّهِ لِلْاِسْتِعْمَالِ فِيْ حَاجَةِ الْبَقَاءِ وَلِهٰذَا كَانَ الْيَابِسُ مِنْهَا مِنَ التَّوَابِلِ اَوْ مِنَ الْاَقْوَاتِ .

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, **যদি কসম করে যে, ফল খাবে না অতঃপর আঙ্গুর বা আনার বা তাজা খেজুর বা কাকরি বা শষা খেল, তাহলে কসম ভঙ্গ হবে না। আর যদি আপেল বা তরমুজ বা কিসমিস খায় তাহলে কসম ভঙ্গ হবে।** এ হলো ইমাম আবূ হানীফ (র.)-এর অভিমত। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ও মুহাম্মদ (র.) বলেন, আঙ্গুর, তাজা খেজুর ও আনারের রসের ক্ষেত্রেও কসম ভঙ্গ হবে।

এই বিষয়ে মূলনীতি এই যে, ফল অর্থ যা মূল খাবারের আগে উপরে বিনোদন মূলকভাবে খাওয়া হয়। অর্থাৎ অভ্যস্ত পরিমাণের অতিরিক্ত আনন্দ উপাদান হিসেবে ব্যবহার করা হয়। আর বিনোদন মূলকও হওয়ার ব্যাপারে কাঁচা ও শুকনো দুটোই সমান, যদি এগুলো বিনোদন হিসাবে ব্যবহারের প্রচলন থাকে এ কারণেই শুকনো তরমুজ খাওয়ার দ্বারা কসম ভঙ্গ হবে না। আর এই বিনোদনগত দিকটি আপেল ও অন্যান্য ফলেও বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং এসব ক্ষেত্রে কসম ভঙ্গ হবে কিন্তু ককরি ও শসায় তা বিদ্যমান নেই। কেননা এগুলো সবজি রূপেই বিক্রি হয় এবং খাওয়া হয়। সুতরাং এ দুটো খাওয়া দ্বারা কসম ভঙ্গ হবে না। আর আঙ্গুর, আনার ও তাজা খেজুর সম্পর্কে সাহেবাইনের বক্তব্য এই যে, বিনোদনগত দিকটি এগুলোতে বিদ্যমান রয়েছে। বরং এগুলো উচ্চমানের ফল। এগুলো দ্বারা বিনোদন অন্যান্যা ফলের দ্বারা বিনোদনের চেয়ে অধিক বিদ্যমান।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, এগুলো (আঙ্গুর ইত্যাদি) খাদ্য রূপে ব্যবহার হয় এবং ঔষধ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। সুতরাং জীবন ধারণের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হওয়ার কারণে বিনোদনের দিকটি ত্রুটিপূর্ণ হয়েছে। এ কারেণেই উপরিউক্ত ফলের শুকনোগুলো মশলা বা খাদ্য রূপে বিবেচিত।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْتَدِمُ فَكُلُّ شَيْءٍ اُصْطُبِغَ بِهِ فَهُوَ اِدَامٌ وَالشِّوَاءُ لَيْسَ بِإِدَامٍ وَالْمِلْحُ اِدَامٌ، وَهٰذَا عِنْدَ اَبِيْ حَنِيفَةَ وَاَبِيْ يُوسُفَ . وَقَالَ مُحَمَّدٌ : كُلُّ مَا يُؤْكَلُ مَعَ الْخُبْزِ غَالِبًا فَهُوَ اِدَامٌ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ اَبِيْ يُوسُفَ لِاَنَّ الْإِدَامَ مِنَ الْمُوَادَمَةِ وَهِيَ الْمُوَافَقَةُ وَكُلُّ مَا يُؤْكَلُ مَعَ الْخُبْزِ مُوَافِقٌ لَهُ كَاللَّحْمِ وَالْبِيْضِ وَنَحْوِهِ . وَلَهُمَا اَنَّ الْإِدَامَ مَا يُؤْكَلُ تَبَعًا، وَالتَّبَعِيَّةُ فِي الْإِخْتِلَاطِ حَقِيْقَةً لِيَكُونَ قَائِمًا بِهِ، وَفِيْ اَلَّا يُؤْكَلَ عَلَى الْإِنْفِرَادِ حُكْمًا، وَتَمَامُ الْمُوَافَقَةِ فِي الْإِمْتِزَاجِ اَيْضًا، وَالْخَلُّ وَغَيْرُهُ مِنَ الْمَائِعَاتِ لَا يُؤْكَلُ وَحْدَهُ بَلْ يُشْرَبُ، وَالْمِلْحُ لَا يُؤْكَلُ بِانْفِرَادِهِ عَادَةً وَلِاَنَّهُ يَذُوْبُ فَيَكُوْنُ تَبَعًا، بِخِلَافِ اللَّحْمِ وَمَا يُضَاهِيْهِ لِاَنَّهُ يُؤْكَلُ وَحْدَهُ اِلَّا اَنْ يَنْوِيَهُ لِمَا فِيْهِ مِنَ التَّشْدِيْدِ، وَالْعِنَبُ وَالْبِطِّيْخُ لَيْسَا بِإِدَامٍ هُوَ الصَّحِيْحُ وَاِذَا حَلَفَ لَا يَتَغَدّٰى فَالْغَدَاءُ الْاَكْلُ مِنْ طُلُوْعِ الْفَجْرِ اِلَى الظُّهْرِ وَالْعَشَاءُ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ اِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ لِاَنَّ مَا بَعْدَ الزَّوَالِ يُسَمّٰى عِشَاءً وَلِهٰذَا تُسَمَّى الظُّهْرُ اِحْدٰى صَلَاتَيِ الْعِشَاءِ فِي الْحَدِيْثِ وَالسُّحُوْرُ مِنْ نِصْفِ اللَّيْلِ اِلٰى طُلُوْعِ الْفَجْرِ لِاَنَّهُ مَاْخُوْذٌ مِنَ السَّحَرِ وَيُطْلَقُ عَلٰى مَا يَقْرُبُ مِنْهُ . ثُمَّ الْغَدَاءُ وَالْعَشَاءُ مَا يُقْصَدُ بِهِ الشِّبَعُ عَادَةً وَتُعْتَبَرُ عَادَةُ اَهْلِ كُلِّ بَلْدَةٍ فِيْ حَقِّهِمْ، وَيُشْتَرَطُ اَنْ يَكُوْنَ اَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ الشِّبَعِ ـ

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি কসম করে যে, সালন খাব না তাহলে যা কিছু মিলিয়ে খাওয়া হয় তাই সালন। ভুনা গোশ্‌ত সালন নয়। লবণ সালন রূপে বিবেচ্য। এ হলো ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর অভিমত। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, সাধারণত : যা কিছু রুটির সাথে খাওয়া হয় তাই সালন। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে এটিও বর্ণিত। কেননা সালন হলো এমন সবকিছু যা রুটির সঙ্গে (বা ভাতের সঙ্গে সহযোগী রূপে খাওয়া হয়। যেমন– গোশত, ডিম ইত্যাদি ।

শায়খায়নের দলিল এই যে, সালন হলো যা সাধারণভাবে অনুগামীরূপে খাওয়া হয়। আর অনুগামিত্ব হলো প্রকৃত পক্ষে মিশ্রণের মধ্যে যা মূল খাদ্যের সাথে লেগে থাকে। আর যা গুণগত দিক দিয়ে স্বতন্ত্রভাবে খাওয়া হয় না। আর পূর্ণ সহযোগিত্ব সাব্যস্ত হবে সংমিশ্রণের দ্বারা। আর সিরকা ও অন্যান্য তরল পদার্থ কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে খাওয়া হয় না। বরং পান করা হয়। আর লবণ সাধরণত আলাদা খাওয়া হয় না। তাছাড়া এটা দ্রবীভূত হয়ে যায়। সুতরাং তা অনুগামী হিসেবে সালন হবে। গোশ্‌তও এ জাতীয় বস্তু এর বিপরীত। কেননা সেগুলো আলাদাভাবে খাওয়া যায়। তবে সেগুলোর নিয়ত করলে তাও বিবেচ্য হবে। কেননা এতে কঠোরতা রয়েছে। আর আঙ্গুর ও তরমুজ ব্যঞ্জন এটাই বিশুদ্ধ মত।

যদি কসম করে যে, সকালের আহার করবে না, সকালের আহার ভোর থেকে দুপুর পর্যন্ত সময়ের খাওয়া। আর বৈকালীন আহার হলো জোহরের সালাত থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত। কেননা প্রচলিত অর্থে সূর্য হেলে পড়ার পর থেকে বিকাল বলা হয়। আর একারণেই হাদীস শরীফে জোহরের সালাতকে বৈকালীন দুই সালাতের এক সালাত বলা হয়েছে। আর সেহরি খাওয়া দ্বারা মধ্যরাত থেকে সোবহে সাদেক পর্যন্ত খাওয়া উদ্দেশ্য হবে। কেননা আরবি سُحُوْرٌ শব্দটি سَحَرٌ থেকে নির্গত আর তা উক্ত সময় ও তার নিকটতম সময়ের উপর প্রযোজ্য হয়।

অতঃপর মধ্যাহ্ন ভোজ ও নৈশ ভোজ দ্বারা ঐ খাবার উদ্দেশ্য হবে যা দ্বারা তৃপ্তি পরিমাণ উদর পূর্তি উদ্দেশ্য এবং প্রত্যেক এলাকার জন্য তাদের অভ্যাস বিবেচ্য হবে এবং অর্ধেকের অধিক তৃপ্তি লাভ শর্ত হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَمَنْ قَالَ اِنْ لَبِسْتُ اَوْ اَكَلْتُ اَوْ شَرِبْتُ فَعَبْدِيْ حُرٌّ، وَقَالَ عَنَيْتُ شَيْئًا دُوْنَ شَيْءٍ لَمْ يُدَنْ فِي الْقَضَاءِ وَغَيْرِهِ لِاَنَّ النِّيَّةَ اِنَّمَا تَصِحُّ فِي الْمَلْفُوْظِ وَالثَّوْبُ وَمَا يُضَاهِيْهِ غَيْرُ مَذْكُوْرٍ تَنْصِيْصًا وَالْمُقْتَضٰى لَا عُمُوْمَ لَهُ فَلَغَتْ نِيَّةُ التَّخْصِيْصِ فِيْهِ وَاِنْ قَالَ اِنْ لَبِسْتُ ثَوْبًا اَوْ اَكَلْتُ طَعَامًا اَوْ شَرِبْتُ شَرَابًا لَمْ يُدَنْ فِي الْقَضَاءِ خَاصَّةً لِاَنَّهُ نَكِرَةٌ فِيْ مَحَلِّ الشَّرْطِ فَتَعُمُّ فَعُمِلَتْ نِيَّةُ التَّخْصِيْصِ فِيْهِ اِلَّا اَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ فَلَا يَدِيْنُ فِي الْقَضَاءِ ـ قَالَ وَمَنْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مِنْ دَجْلَةَ فَشَرِبَ مِنْهَا بِاِنَاءٍ لَمْ يَحْنَثْ حَتّٰى يَكْرَعَ مِنْهَا كَرْعًا عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ وَقَالَا : اِذَا شَرِبَ مِنْهَا بِاِنَاءٍ يَحْنَثُ لِاَنَّهُ مُتَعَارَفُ الْمَفْهُوْمِ . وَلَهُ اَنَّ كَلِمَةَ مِنْ لِلتَّبْعِيْضِ وَحَقِيْقَتُهُ فِي الْكَرْعِ وَهِيَ مُسْتَعْمَلَةٌ ، وَلِهٰذَا يَحْنَثُ بِالْكَرْعِ اِجْمَاعًا فَمُنِعَت الْمَصِيْرُ اِلَى الْمَجَازِ وَاِنْ كَانَ مُتَعَارَفًا. وَاِنْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مِنْ مَاءِ دِجْلَةَ فَشَرِبَ مِنْهَا بِاِنَاءٍ حَنِثَ لِاَنَّهُ بَعْدَ الْاِغْتِرَافِ بَقِيَ مَنْسُوْبًا اِلَيْهِ وَهُوَ الشَّرْطُ فَصَارَ كَمَا اِذَا شَرِبَ مِنْ مَاءِ نَهْرٍ يَاْخُذُ مِنْ دِجْلَةَ ـ

অনুবাদ : কেউ যদি বলে, যদি আমি পরিধান করি বা আহার করি বা পান করি তাহলে আমার গোলাম আজাদ। অতঃপর সে বলল, আমি কিছু জিনিস বাদ দিয়ে কিছু জিনিস উদ্দেশ্য করেছি, তাহলে আইন ও দিয়ানত কোনো ক্ষেত্রেই তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

কেননা নিয়ত গ্রহণযোগ্য হয় উল্লেখকৃত বস্তুর ক্ষেত্রে। কিন্তু এখানে পরিধেয় ও অন্যান্য বস্তু প্রত্যক্ষভাবে উল্লেখ করা হয় নি। আর ক্রিয়ার অনিবার্য দাবি রূপে যে কর্মবাচ্য এখানে বিদ্যমান রয়েছে তাতে ব্যাপকতা নেই। সুতরাং বিশিষ্ট করণের নিয়ত এখানে বাতিল হবে।

আর যদি বলে যে, যদি আমি কোনো কাপড় পরিধান করি কিংবা কোনো খাবার গ্রহণ করি কিংবা কোনো পানীয় পান করি তাহলে (তার উক্ত নিয়ত) শুধু আইনগত ক্ষেত্রে বিশিষ্টতা গ্রহণ করা হবে না। কেননা এখানে শর্তবাচক বাক্যে অনির্দিষ্ট শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং তাতে ব্যাপকতা হবে এবং বিশিষ্ট করণের নিয়ত ও কষ্টকর হবে। তবে যেহেতু এটা বাহ্যিক অবস্থার বিপরীত সেহেতু আইনগত ক্ষেত্রে তার কথা গ্রহণ করা হবে না।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কেউ যদি বলে যে, দজলা থেকে পান করবে না। অতঃপর সে পাত্র দ্বারা দজলা থেকে পানি তুলে পান করল, তাহলে কসম ভঙ্গকারী হবে না। যতক্ষণ না সে মুখ লাগিয়ে দজলা থেকে পান করে। এ হলো ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত। আর সাহেবাইনের মতে পাত্র দ্বারা দজলা থেকে পান করলেও কসম ভঙ্গ হবে।

কেননা প্রচলন অনুযায়ী পাত্র দ্বারা পান করাই বোধগম্য। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল এই যে, (من) থেকে অব্যয়টি আংশিক জ্ঞাপক। আর মুখ লাগিয়ে পান করাই হলো তার প্রকৃত অর্থ বরং তা-ই ব্যবহৃতও রয়েছে একারণেই মুখ লাগিয়ে পান করার দ্বারা সর্বসম্মতি ক্রমে কসম ভঙ্গ হয়ে যায়। সুতরাং তা রূপক অর্থ গ্রহণকে রোধ করবে। যদিও তা প্রচলিত থাকে।

আর যদি কসম করে যে দজলার পানি থেকে পান করবে না। অতঃপর পাত্র দ্বারা দজলা থেকে পানি নিয়ে পান করল তাহলে কসম ভঙ্গ হবে। কেননা পাত্রে পানি নেওয়ার পরও তার পরিচিতি দজলার সাথেই সম্পৃক্ত থাকবে। আর তা-ই ছিল কসম ভঙ্গের শর্ত। সুতরাং এমনই হলো যেন ঐ নদী থেকে পানি পান করল যে নদী দজলা থেকে পানির প্রবাহ লাভ করে।

https://e-ilm.weebly.com/

مَنْ قَالَ اِنْ لَمْ اَشْرَبْ الْمَاءَ الَّذِيْ فِيْ هٰذَا الْكُوْزِ الْيَوْمَ فَامْرَاَتُهٗ طَالِقٌ وَلَيْسَ فِي الْكُوْزِ مَاءٌ لَمْ يَحْنَثْ، فَاِنْ كَانَ فِيْهِ مَاءٌ فَاُهْرِيْقَ قَبْلَ اللَّيْلِ لَمْ يَحْنَثْ، وَهٰذَا عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ . وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ : يَحْنَثُ فِيْ ذٰلِكَ كُلِّهٖ يَعْنِيْ اِذَا مَضَى الْيَوْمُ، وَعَلٰى هٰذَا الْخِلَافِ اِذَا كَانَ الْيَمِيْنُ بِاللّٰهِ تَعَالٰى . وَاَصْلُهٗ اَنَّ مِنْ شَرْطِ انْعِقَادِ الْيَمِيْنِ وَبَقَائِهٖ تَصَوُّرُ الْبِرِّ عِنْدَهُمَا خِلَافًا لِاَبِيْ يُوْسُفَ لِاَنَّ الْيَمِيْنَ اِنَّمَا تُعْقَدُ لِلْبِرِّ فَلَا بُدَّ مِنْ تَصَوُّرِ الْبِرِّ لِيُمْكِنَ اِيْجَابُهٗ . وَلَهٗ اَنَّهٗ اَمْكَنَ الْقَوْلُ بِانْعِقَادِهٖ مُوْجِبًا لِلْبِرِّ عَلٰى وَجْهٍ يَظْهَرُ فِيْ حَقِّ الْخُلْفِ وَهُوَ الْكَفَّارَةُ . قُلْنَا : لَا بُدَّ مِنْ تَصَوُّرِ الْاَصْلِ لِيَنْعَقِدَ فِيْ حَقِّ الْخُلْفِ وَلِهٰذَا لَا يَنْعَقِدُ الْغَمُوْسُ مُوجِبًا لِلْكَفَّارَةِ وَلَوْ كَانَتْ الْيَمِيْنُ مُطْلَقَةً؛ فَفِي الْوَجْهِ الْاَوَّلِ لَا يَحْنَثُ عِنْدَهُمَا، وَعِنْدَ اَبِيْ يُوْسُفَ يَحْنَثُ فِي الْحَالِ، وَفِي الْوَجْهِ الثَّانِيْ يَحْنَثُ فِيْ قَوْلِهِمْ جَمِيْعًا فَاَبُوْ يُوْسُفَ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُطْلَقِ وَالْمُوَقَّتِ . وَوَجْهُ الْفَرْقِ اَنَّ التَّوْقِيْتَ لِلتَّوْسِعَةِ فَلَا يَجِبُ الْفِعْلُ اِلَّا فِيْ اٰخِرِ الْوَقْتِ فَلَا يَحْنَثُ قَبْلَهٗ،

অনুবাদ : কেউ যদি বলে এই পাত্রে যে পানি আছে তা যদি আজ পান না করি তাহলে তার স্ত্রী তালাক। অথচ উক্ত পাত্রে পানি নেই, তাহলে কসম ভঙ্গ হবে না। আর যদি পাত্রে পানি থাকে আর ঐ পানি রাত হওয়ার আগেই ফেলে দেওয়া হয় তাহলে কসম ভঙ্গ হবে না। এ হলো ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমত। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, সবকটি ক্ষেত্রেই কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। অর্থাৎ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর।

একই মতপার্থক্য রয়েছে, যদি আল্লাহর নামে কসম করে থাকে। মতপার্থক্যের মূল এই যে, তরফাইনের মতে কসম হওয়ার এবং তা অব্যাহত থাকার জন্য শর্ত হলো কসম রক্ষা করার সম্ভাব্যতা বিদ্যমান থাকা। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর বিপরীত মত পোষণ করেন।

কেননা কসম সংঘটিত হয় তা রক্ষা করার জন্য। সুতরাং কসম রক্ষার সম্ভাব্যতা বিদ্যমান থাকা জরুরি যাতে তাকে সে কাজে বাধ্য করা সম্ভব হয়।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল এই যে, কসম সংঘটিত হওয়ার কথা এভাবে বলা সম্ভব যে, তা পূর্ণ করা এমনভাবে ওয়াজিব যে, তার প্রকাশ ঘটবে স্থলবর্তীর ক্ষেত্রে। আর তা হলো কাফফারা। আমাদের বক্তব্য এই যে, মূলের সম্ভাব্যতা বিদ্যমান থাকা আবশ্যক। যাতে কসমটি স্থলবর্তীর ক্ষেত্রে প্রয়োগ হতে পারে। এ কারণেই মিথ্যা কসম কাফফারা ওয়াজিব হিসেবেও সংঘটিত হয় না।

আর কসমটি যদি সময়সীমা না হয় তাহলে প্রথম ক্ষেত্রে তরফাইনের মতে কসম ভঙ্গ হবে না। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে তাৎক্ষণিক কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সকলের মতেই কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। অর্থাৎ ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) সময়মুক্ত ও সময়াবদ্ধ কসমের মাঝে পার্থক্য করেছেন। পার্থক্যের কারণ এই যে, সময়াবদ্ধ করা হয় প্রশস্ততার জন্য। সুতরাং সময়ের শেষ অংশেই কর্মটি সম্পন্ন করা আবশ্যক। তাই শেষ সময়ের পূর্বে কসম ভঙ্গ হবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

وَفِي الْمُطْلَقِ يَجِبُ الْبِرُّ كَمَا فَرِغَ وَقَدْ عَجَزَ فَيَحْنَثُ فِي الْحَالِ وَهُمَا فَرَّقَا بَيْنَهُمَا. وَوَجْهُ الْفَرْقِ اَنَّ فِي الْمُطْلَقِ يَجِبُ الْبِرُّ كَمَا فَرِغَ، فَاِذَا فَاتَ الْبِرُّ بِفَوَاتِ مَا عُقِدَ عَلَيْهِ الْيَمِيْنُ يَحْنَثُ فِيْ يَمِيْنِهِ كَمَا اِذَا مَاتَ الْحَالِفُ وَالْمَاءُ بَاقٍ؛ اَمَّا فِي الْمُؤَقَّتِ فَيَجِبُ الْبِرُّ فِي الْجُزْءِ الْاَخِيْرِ مِنَ الْوَقْتِ وَعِنْدَ ذٰلِكَ لَمْ تَبْقَ مَحَلِّيَّةُ الْبِرِّ لِعَدَمِ التَّصَوُّرِ فَلَا يَجِبُ الْبِرُّ فِيْهِ فَتَبْطُلُ الْيَمِيْنُ كَمَا اِذَا عَقَدَهٗ اِبْتِدَاءً فِيْ هٰذِهِ الْحَالَةِ ـ

অনুবাদ : পক্ষান্তরে সময়মুক্ত কসমের ক্ষেত্রে বক্তব্য থেকে অবসর হওয়া মাত্রই কসম পূর্ণ করা আবশ্যক। অথচ সে পূর্ণ করতে অক্ষম। সুতরাং তৎক্ষণাৎ কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। তরফাইন ও উভয় অবস্থার মাঝে পার্থক্য করেছেন।

পার্থক্যের কারণ এই যে, সময়মুক্ত কসমের ক্ষেত্রে কসমের বক্তব্য থেকে অবসর হওয়া মাত্র কসম পূর্ণ করা আবশ্যক। সুতরাং যে বিষয়ের উপর কসম সম্পন্ন করেছে তা না থাকার কারণে কসম পূর্ণ করার সুযোগ হাত ছাড়া হয়ে যাবে । ফলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। যেমন– যদি পাত্রে পানি থাকা অবস্থায় কসমকারী মারা যায়। পক্ষান্তরে সময়াবদ্ধ কসমের ক্ষেত্রে সময়ের শেষ অংশে কসম পূর্ণ করা আবশ্যক। কিন্তু সে সময়ে সম্ভাব্যতা বিদ্যমান না থাকার কারণে কসম পূর্ণ করার পাত্র বিদ্যমান নেই। সুতরাং ঐ অবস্থায় কসম পূর্ণ করা আবশ্যক হবে না। এবং কসম বাতিল হয়ে যাবে। যেমন এই অবস্থায় যদি কসমের সূচনা করত তাহলে কসম বাতিল বলে গণ্য হতো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আলোচ্য মাসআলায় যদি 'আজ' কথাটি ব্যক্ত না থাকত অর্থাৎ এমন বলত যে "আমি এই পেয়ালা থেকে পানি পান করি" আর যদি পেয়ালায় পানি বিদ্যমান না থাকত, তাহলেও ইমাম আবূ হানীফা (র.) আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মতে কসম ভঙ্গকারী হতো না। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে তৎক্ষণাৎ কসম ভঙ্গকারী হয়ে যাবে। আর দ্বিতীয় অবস্থা তথা পেয়ালায় পানি ছিল, কিন্তু তা ফেলে দেওয়া হয়েছে। তাহলে সবার মতেই কসম ভঙ্গকারী হয়ে যাবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে তৎক্ষণাৎ কসম ভঙ্গকারী হয়ে যাবে।

আর দ্বিতীয় অবস্থা তথা পেয়ালার পানি ছিল, কিন্তু তা ফেলে দেওয়া হয়েছে। তাহলে সবার মতেই কসম ভঙ্গকারী হয়ে যাবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) এতদুভয়ের মাঝে এভাবে পার্থক্য করেছেন যে, কসমের ক্ষেত্রে যে অবস্থায় আজ যুক্ত করেছে তাহলে দিন অতিবাহিত হতেই কসম ভঙ্গকারী হয়ে যাবে। আর যেখানে উক্ত শর্তযুক্ত থাকবে না সে অবস্থায় তৎক্ষণাৎ কসম ভঙ্গকারী হয়ে যাবে। পার্থক্যের কারণ এই যে, যে কোনো বিষয় সময়ের সাথে শর্তারোপ করার উদ্দেশ্য থাকে সেই সময়ে করার অবকাশ বাকি থাকা। সুতরাং দিন থাকা অবস্থায় কসম ভঙ্গকারী হবে না। আর যে অবস্থায় সময়যুক্ত থাকবে না, সে ক্ষেত্রে কসম করার পরপরই তা পূর্ণ করতে হবে। অথচ তখন সে পানি পান করতে অক্ষম। কেননা পেয়ালায় তখন পানি নেই। সুতরাং তৎক্ষণাৎ কসম ভঙ্গকারী হয়ে যাবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও সময়যুক্ত এবং যুক্ত উভয় অবস্থার মাঝে ব্যবধান করেছেন। তবে ব্যবধানের পদ্ধতি ভিন্ন যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

قال وَمَنْ حلف لَيَصْعَدَنَّ السَّمَاءَ اَوْ لَيَقْلِبَنَّ هٰذَا الْحَجَرَ ذَهَبًا اِنْعَقَدَتْ يَمِيْنُهُ وَحَنِثَ عَقِيْبَهَا وَقَالَ زُفَرُ : لَا تَنْعَقِدُ لِاَنَّهُ مُسْتَحِيْلٌ عَادَةً فَاَشْبَهَ الْمُسْتَحِيْلَ حَقِيْقَةً فَلَا يَنْعَقِدُ . وَلَنَا اَنَّ الْبِرَّ مُتَصَوَّرٌ حَقِيْقَةً لِاَنَّ الصُّعُوْدَ اِلَى السَّمَاءِ مُمْكِنٌ حَقِيْقَةً؛ اَلَا تَرٰى اَنَّ الْمَلَائِكَةَ يَصْعَدُوْنَ السَّمَاءَ وَكَذَا تَحَوُّلُ الْحَجَرِ ذَهَبًا بِتَحْوِيْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى، وَاِذَا كَانَ مُتَصَوَّرًا يَنْعَقِدُ الْيَمِيْنُ مُوجِبًا لِخُلْفِهِ ثُمَّ يَحْنَثُ بِحُكْمِ الْعَجْزِ الثَّابِتِ عَادَةً . كَمَا اِذَا مَاتَ الْحَالِفُ فَاِنَّهُ يَحْنَثُ مَعَ اِحْتِمَالِ اِعَادَةِ الْحَيَاةِ بِخِلَافِ مَسْاَلَةِ الْكُوْزِ، لِاَنَّ شُرْبَ الْمَاءِ الَّذِي فِي الْكُوْزِ وَقْتَ الْحَلِفِ وَلَا مَاءَ فِيْهِ لَا يُتَصَوَّرُ فَلَمْ يَنْعَقِدْ.

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন : কেউ যদি কসম করে যে, অবশ্যই সে আসমানে আরোহণ করবে কিংবা এই পাথরকে স্বর্ণে রূপান্তরিত করবে। তাহলে তার কসম সংঘটিত হবে এবং সংঘটিত হওয়ার পরপরই তা ভঙ্গ হয়ে যাবে।

ইমাম যুফার (র.) বলেন, এই কসম সংঘটিত হবে না। কেননা স্বভাবত : তা অসম্ভব। সুতরাং তা প্রকৃত অসম্ভবের সদৃশ হবে। ফলে কসম সংঘটিত হবে না। আমাদের দলিল এই যে, কসম পূর্ণ করার প্রকৃত সম্ভাব্যতা বিদ্যমান রয়েছে। আসমানে আরোহণ করা সম্ভব। তুমি কি জান না ফেরেশতাগণ আসমানে আরোহণ করে থাকেন। তদ্রূপ আল্লাহ ত'আলার রূপান্তরিত করার দ্বারা পাথর স্বর্ণে রূপান্তরিত হওয়া সম্ভব। আর সম্ভাব্যতা যখন বিদ্যমান হলো তখন কসমটি তার স্থলবর্তী কাফফারাকে ওয়াজিবকারী অবস্থায় সংঘটিত হয়ে যাবে। অতঃপর বিদ্যমান স্বভাবতঃ অক্ষমতার কারণে কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। যেমন কসমকারী মারা গেলে পুনঃ জীবন লাভ সম্ভব হওয়া সত্ত্বেও কসম ভঙ্গ হয়ে যায়। পাত্রের মাসআলাটি ভিন্ন। কেননা কসম করার সময় পানিহীন পাত্রের পানি পান করা সম্ভব নয়। সুতরাং কসম সংঘটিত হবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ اليَمِيْنِ فِى الْكَلَامِ

قَالَ وَمَنْ حلفَ لَا يُكَلِّمُ فُلَانًا فَكَلَّمَهُ وَهُوَ بِحَيْثُ يَسْمَعُ اِلَّا اَنَّهُ نَائِمٌ حَنِثَ لِاَنَّهُ قَدْ كَلَّمَهُ وَوَصَلَ اِلَى سَمْعِهِ لٰكِنَّهُ لَمْ يَفْهَمْ لِنَوْمِهِ فَصَارَ كَمَا اِذَا نَادَاهُ وَهُوَ بِحَيْثُ يَسْمَعُ لٰكِنَّهُ لَمْ يَفْهَمْ لِتَغَافُلِهِ . وَفِيْ بَعْضِ رِوَايَاتِ الْمَبْسُوطِ شَرْطٌ اَنْ يُوقِظَهُ، وَعَلَيْهِ عَامَّةُ مَشَايِخِنَا، لِاَنَّهُ اِذَا لَمْ يَتَنَبَّهْ كَانَ كَمَا اِذَا نَادَاهُ مِنْ بَعِيْدٍ وَهُوَ بِحَيْثُ لَا يَسْمَعُ صَوْتَهُ .

وَلَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُهُ اِلَّا بِاِذْنِهِ فَاَذِنَ لَهُ وَلَمْ يَعْلَمْ بِالْاِذْنِ حَتّٰى كَلَّمَهُ حَنِثَ لِاَنَّ الْاِذْنَ مُشْتَقٌّ مِنْ الْاَذَانِ الَّذِي هُوَ الْاِعْلَامُ، اَوْ مِنَ الْوُقُوْعِ فِي الْاِذْنِ، وَكُلُّ ذٰلِكَ لَا يَتَحَقَّقُ اِلَّا بِالسَّمَاعِ، وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ (رحـ) لَا يَحْنَثُ لِاَنَّ الْاِذْنَ هُوَ الْاِطْلَاقُ، وَاَنَّهُ يَتِمُّ بِالْاِذْنِ كَالرِّضَا . قُلْنَا : الرِّضَاءُ مِنْ اَعْمَالِ الْقَلْبِ، وَلَا كَذٰلِكَ الْاِذْنُ عَلٰى مَا مَرَّ .

পরিচ্ছেদ : কথোপকথনের মধ্যে শপথ করা

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, **কেউ যদি কসম করে যে অমুকের সঙ্গে কথা বলবে না, অতঃপর তার সঙ্গে এমনভাবে কথা বলল যে, সে তা শুনতে পারে কিন্তু সে ঘুমন্ত; তাহলে কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে।** কেননা সে কথা বলেছে এবং কথা তার কান পর্যন্ত পৌছেছে। কিন্তু ঘুমন্ত থাকার কারণে সে বুঝতে পারেনি। ফলে তা এমন হলো যে, তাকে শোনা যায় এমন দূরত্ব থেকে ডাক দিল, কিন্তু অন্যমনস্কতার কারণে সে তা বুঝতে পারল না।

মাবসূতের কোনো কোনো বর্ণনা মতে শর্ত এই যে, তার কথার আওয়াজে সে জেগে যায়। আমাদের মাশায়েখগণ এ মত পোষণ করেন। কেননা যদি সে জাগ্রত না হয় তাহলে এমনই হলো যে, তাকে দূর থেকে ডাক দিল আর সে এমন দূরত্বে রয়েছে যে সে তার আওয়াজ শুনতে পাবে না।

যদি কসম করে যে, সে তার অনুমতি ছাড়া তার সাথে কথা বলবে না। অতঃপর সে তাকে অনুমতি দিল, কিন্তু সে অনুমতির কথা অবগত না হয়েই তার সাথে কথা বলল, তাহলে কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে।

কেননা অনুমতি বলা হয় অবহিত হওয়াকে অথবা তার অনুমতি শ্রুতিগোচর হওয়াকে। আর এর মধ্যে কোনোটিই শ্রবণ ব্যতীত সাব্যস্ত হয় না। ইমাম আবূ ইউসফ (র.)-এর মতে কসম ভঙ্গ হবে না। কেননা অনুমতির অর্থ হলো বাধা মুক্তি। আর তা এককভাবে অনুমতি দাতার দ্বারা সম্পন্ন হয়। যেমন সম্মতি এককভাবে সম্মত ব্যক্তির দ্বারা সম্পন্ন হয়। আমাদের দলিল এই যে, সম্মতি অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত একটি বিষয় কিন্তু অনুমতি তা নয়, যেমন পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কেউ কেউ বলেছেন, كَلَام শব্দটি মাসদার বা ক্রিয়ামূল। এর থেকে নির্গত ক্রিয়ারূপ হলো كَلَّمَ যেমন سَلَام মাসদার হতে سَلَّمَ নির্গত হয়ে থাকে। আর অধিকাংশ আলেম বলেছেন, كَلَام শব্দটি মাসদার নয়। বরং ইসমে মাসদার। আর মাসদার হলো اَلتَّكْلِيْمُ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًا: তিনি আরো ইরশাদ করেছেন صَلُّوْا

عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا অতএব كلام ও سلام শব্দ দুটি ইসমে মাসদার। كلام শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো আঘাত করা, আহত করা। নাহুবিদদের পরিভাষায় كلام বলা হয়, اسناد সহ দুটি কালিমার সমন্বয় কে। যেমন جَاءَ زَيْدٌ। ফকীহগণের পরিভাষায় كلام এর অর্থ হলো, নিজের বাক্য অন্য কে শুনানো কিংবা নিজেকে শুনানো। আর জনসাধারণ্যে كلام বলতে যা বুঝানো হয় তাহলো, শ্রবণযোগ্য আওয়াজে উচ্চারিত অর্থবোধক শব্দসমূহ।

কেউ যদি কসম করে যে, সে অমুকের সাথে, যেমন যায়েদের সাথে কথা বলবে না তবে তার অনুমতিক্রমে। অতঃপর যায়েদ তাকে অনুমতি দিয়ে দিল, কিন্তু কসমকারী ব্যক্তি উক্ত অনুমতি সম্পর্কে জানতে পারেনি। এমতাবস্থায় সে যায়েদের সাথে কথা বলে ফেলল, একারণে সে কসম ভঙ্গকারী হয়ে যাবে। কেননা اذن শব্দটি اذان হতে নির্গত, যার অর্থ হলো- অবগত করা। অথবা اذن হতে নির্গত, যার অর্থ হলো- কানে আওয়াজ আসা। আর এই অবগত হওয়া বা কানে আওয়াজ আসার বিষয়টি শ্রবণ করা ব্যতীত হতে পারে না। অতএব, অনুমতি সম্পর্কে অবগত না হওয়ার কারণে কেমন যেন অনুমতিই হয়নি। আর তাই তার কথা বলাটা অনুমতি ছাড়াই কথা বলা হয়েছে, বিধায় তার কসম ভঙ্গ হয়েছে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেছেন, আলোচ্য আবস্থায় ব্যক্তিটি কসম ভঙ্গকারী হবে না। কারণ اذن শব্দের অর্থ হলো অনুমতি দান করা, বৈধ করা। আর এ বিষয়টি কেবল অনুমতি দেওয়ার দ্বারা চূড়ান্ত হয়ে যায়, যাকে অনুমতি দেওয়া হলো তার শুনা বা অবগত হওয়া জরুরি নয়। অতএব, কসমকারী ব্যক্তি যেহেতু অনুমতি হওয়ার পরেই কথা বলেছে, সেহেতু সে কসম ভঙ্গকারী হবে না। যদিও সে প্রদত্ত অনুমতি সম্পর্কে অবগত হয়নি। অনুমতির বিষয়টি সম্মতির অনুরূপ। সম্মতি যেমন ব্যক্তি সম্মত হওয়ার দ্বারাই চূড়ান্ত হয়ে যায়। কারো জানার দরকার হয় না। তেমনি অনুমতিও কেবল অনুমতি দাতার দেওয়ার দ্বারাও চূড়ান্ত হয়ে যায়, কারো শুনার প্রয়োজন হয় না।

আমরা বলব, সম্মত হওয়া, এটি একটি কলবের ক্রিয়া, অর্থাৎ এমন কাজ, যা অন্তর দ্বারা সম্পাদিত হয়। এর সাথে শুনা বা অবগত হওয়ার কোনো আবশ্যকীয় সম্পর্ক নেই। বরং এটা শ্রবণযোগ্যও নয়। পক্ষান্তরে অনুমতি দেওয়া, এটা কোনো অন্তর আত্মার ক্রিয়া নয়, যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। অতএব, অনুমতিকে সম্মতির সাথে তুলনা করা ঠিক হবে না।

ফায়দা ঃ ফাতাওয়ায়ে ছুগরা ও তাতিম্মায়, নাওয়াযেলের বরাতে উল্লেখ আছে যে, কেউ কসম করল, তার স্ত্রী তার অনুমতি ছাড়া ঘর থেকে বের হবে না। অতঃপর সে এভাবে অনুমতি দিল যে, স্ত্রী তা শুনতে পায়নি, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.) -এর মতে এটা অনুমতি নয়। ইমাম আবূ ইউসুফ ও যুফার (র.) -এর মতে এটা অনুমতি।

وَلَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُهُ اِلَّا بِاِذْنِهٖ فَاَذِنَ الخ : আলোচ্য মাসআলায় বর্ণিত প্রথম মতটি ইমাম মালেক, আহমদ ও শাফেয়ী (র.) ও পোষণ করেন, অর্থাৎ তাঁদের মতেও কসম ভেঙ্গে যাবে। কেননা اذن শব্দটি اذان হতে উৎপন্ন। যার অর্থ হলো- اعلام বা অবগত করা। অথবা اذن হতে উৎপন্ন, এর অর্থ হলো কানে পড়া, কর্ণ গোচর হওয়া। উভয় অবস্থায় এ উৎপত্তির দাবি হলো।

শ্রবণ করা বা কর্ণগোচর হওয়া ব্যতীত اذن হতে পারে না। অতএব, অনুমতি দেওয়া সত্ত্বেও যদি কসমকারী ব্যক্তি সে অনুমতির ব্যাপারে অবগত না হয়, এবং এমতাবস্থায় কথা বলে ফেলে, তাহলে সে কসম ভঙ্গকারী হয়ে যাবে।

কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে পূর্বোক্ত অবস্থায় কসমকারী ব্যক্তি কসম ভঙ্গকারী হবে না। কেননা তার মতে اذن শব্দটি اِطْلَاق -এর অর্থে অর্থাৎ কোনো কিছু বৈধ করা, অনুমোদন করা। অতএব, এ কাজটি কেবল অনুমতি দাতার মাধ্যমেই চূড়ান্ত হতে পারে। যাকে অনুমতি দেওয়া হলো তার জানার প্রয়োজন নেই। যেমনিভাবে رِضَا বা কোনো ব্যাপারে কারো সম্মত হওয়া। যা কেবল কর্তা দ্বারাই সম্পন্ন হয়ে থাকে। তেমনি অনুমতিও কেবল অনুমতি দাতার দ্বারাই চূড়ান্ত হয়ে যাবে। কসমকারী ব্যক্তির তা শ্রবণ করা আবশ্যক নয়।

কিন্তু এ কথাটি (যুক্তিটি) প্রশ্নাতীত নয়। কারণ সম্মত হওয়া না হওয়া হলো একটি অন্তরাত্মার ক্রিয়া, যার সাথে জানা বা শুনার কোনো সম্পর্ক নেই। পক্ষান্তরে কসমের উদ্দেশ্য ও হিনসের আবশ্যকতা নিয়ে চিন্তা করলে বুঝা যায়, مَحْلُوْفٌ عَلَيْهِ (যার সম্পর্কে কসম করা হয়েছে) এর অনুমতি প্রদানের বিষয়টি حَالِفٌ তথা কসমকারী ব্যক্তির শোনা বা কর্ণ গোচর হওয়া অত্যাবশ্যক।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ وَإِنْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُهُ شَهْرًا فَهُوَ مِنْ حِيْنِ حَلَفَ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَذْكُرِ الشَّهْرَ لَتَأَبَّدَ الْيَمِيْنُ فَذَكَرَ الشَّهْرَ لِإِخْرَاجِ مَا وَرَاءَهُ فَبَقِيَ الَّذِي يَلِيْ يَمِيْنَهُ دَخْلًا عَمَلًا بِدَلَالَةِ حَالِهِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ وَاللّٰهِ لَأَصُوْمَنَّ شَهْرًا لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَذْكُرِ الشَّهْرَ لَا يَتَأَبَّدُ الْيَمِيْنُ فَكَانَ ذِكْرُهُ لِتَقْدِيرِ الصَّوْمِ بِهِ وَأَنَّهُ مُنَكَّرٌ فَالتَّعْيِيْنُ إِلَيْهِ

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, কেউ যদি কসম করে যে, তার সঙ্গে একমাস কথা বলবে না। তাহলে তা কসম করার সময় হতে গণ্য হবে। কেননা যদি সে মাস উল্লেখ না করত তাহলে উক্ত কসম চিরস্থায়ী হয়ে যেত। সুতরাং মাসের উল্লেখের উদ্দেশ্য হচ্ছে মাস পরবর্তী সময়কে বাদ দেওয়া। সুতরাং অবস্থার প্রেক্ষিত অনুযায়ী কসম সংলগ্ন সময়কে তার অন্তর্ভুক্ত ধরা হবে।

আর যদি বলে যে, আল্লাহর কসম আমি একমাস রোজা রাখব, তাহলে বিষয়টি ভিন্ন হবে। কেননা যদি সে মাস উল্লেখ না করত, তাহলে কসম চিরস্থায়ী হতো না। সুতরাং এখানে মাস উল্লেখের উদ্দেশ্য হচ্ছে, রোজার সময়কাল নির্ধারণ করা। আর যেহেতু সময়টি অনির্ধারিত, সেহেতু তা নির্ধারণের ভার তার উপরই অর্পিত হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিউক্ত ইবারতে কাছাকাছি দুটি মাসআলার মাঝে পার্থক্য দেখানো হয়েছে। তন্মধ্যে প্রথম মাসআলাটি হলো কোনো ব্যক্তি বলল, আমি অমুকের সাথে একমাস কথা বলব না। এক্ষেত্রে তার কসম করার মুহূর্ত হতে লাগাতার একমাস পর্যন্ত তার কসম কার্যকরী হবে। অর্থাৎ এ একমাস পর্যন্ত অমুকের সাথে কথা বলতে পারবে না। বললে কসম ভঙ্গকারী হয়ে যাবে। দ্বিতীয় মাসআলাটি হলো কোনো ব্যক্তি বলল, আমি একমাস রোজা রাখব এ ক্ষেত্রে তার বলার মুহূর্ত হতে লাগাতার একমাস পর্যন্ত রোজা রাখতে হবে না। বরং সে একমাস নির্ধারণ করা তার এখতিয়ারাধীন। যে কোনো মাস কে সে নির্ধারণ করতে পারবে।

মাসআলা দুটির মাঝে পার্থক্যের কারণ হলো এই যে, প্রথম মাসআলায় ব্যক্তি যদি شَهْرًا (একমাস) শব্দ উল্লেখ না করত, তাহলে তার কসমটি চিরকালের জন্য কার্যকরী হয়ে যেত। অর্থাৎ অমুকের সাথে সে আর কখনো কথা বলতে পারত না। কারণ কসমটি চিরকালের জন্য কার্যকারী হওয়ার পথে কোনো প্রতিবন্ধক নেই। এমতাবস্থায় شَهْرًا শব্দ বলার মাধ্যমে একমাস সময় কে কসমের আওতায় রেখে অবশিষ্ট কালকে বাদ দেওয়া হলো। অতএব, কসমকারী ব্যক্তির ক্রোধ বা অসন্তোষ জনিত বর্তমান অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে কসমটি লাগাতার একমাসের জন্যই কার্যকরী হবে।

বিপরীত পক্ষে কেউ যখন বলে, আমি একমাস রোজা রাখব, তখন شَهْرًا একমাস শব্দটি উল্লেখ না করলেও তার কথাটি চিরকালের জন্য কার্যকারী হয় না। যেহেতু বৎসরের কিছু দিন এমন রয়েছে, যে দিনগুলোতে রোজা রাখা বৈধ নয়। কথাটি চিরকালের জন্য কার্যকরী হওয়ার পথে এটা প্রতিবন্ধক। অতএব, ধরে নিতে হবে যে, উল্লিখিত شَهْرٌ শব্দটি রোজার পরিমাণ নির্ধারণের জন্য সে বলেছে। তবে শব্দটি نَكِرَة হওয়ার কারণে নির্দিষ্ট কোনো মাসও বুঝাবে না। তাই কোনো এক মাস রোজা রাখবে, এটা নির্ধারণ করাও তার এখতিয়ার থাকবে।

প্রথম মাসআলাটির অনুরূপ আরেকটি মাসআলা হলো- কেউ যদি বাড়ি ভাড়া দেয় একমাসের জন্য, তাহলে তা চুক্তির সময় হতে লাগাতার একমাসের উপরই কার্যকরী হয়। কারণ সে ক্ষেত্রে যদি একমাসের কথা উল্লেখ না করা হয়, তাহলে তা চিরদিনের জন্য হয়ে যায়, যা মূলত ফাসেদ। তাই একমাসের উল্লেখ হয়ে থাকে পরবর্তী সময়কাকে চুক্তির আওতামুক্ত করার উদ্দেশ্যে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَإِنْ حَلَفَ لَا يَتَكَلَّمُ فَقَرَأَ الْقُرْآنَ فِيْ صَلَاتِهِ لَا يَحْنَثُ . وَإِنْ قَرَأَ فِيْ غَيْرِ صَلَاتِهِ حَنِثَ وَعَلَى هٰذَا التَّسْبِيحُ وَالتَّهْلِيلُ وَالتَّكْبِيرُ، وَفِي الْقِيَاسِ يَحْنَثُ فِيْهِمَا وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ لِاَنَّهُ كَلَامٌ حَقِيْقَةً . وَلَنَا اَنَّهُ فِي الصَّلَاةِ لَيْسَ بِكَلَامٍ عُرْفًا وَلَا شَرْعًا، قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " ﴿اِنَّ صَلَاتَنَا هٰذِهِ لَا يَصْلُحُ فِيْهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ﴾ وَقِيْلَ فِيْ عُرْفِنَا لَا يَحْنَثُ فِيْ غَيْرِ الصَّلَاةِ اَيْضًا لِاَنَّهُ لَا يُسَمَّى مُتَكَلِّمًا بَلْ قَارِئًا وَمُسَبِّحًا

অনুবাদ : আর যদি কসম করে যে সে কথা বলবে না। অতঃপর সে নামাজের মাঝে কুরআন তেলাওয়াত করল, তাহলে কসম ভঙ্গ হবে না। আর নামাজের বাইরে তেলাওয়াত করলে ভঙ্গ হবে। তাসবীহ, তাহলীল ও তাকবীর সম্বন্ধেও একই সিদ্ধান্ত। অবশ্য কিয়াসের দাবিগুলো নামাজের বাইরে ও ভিতরে উভয় অবস্থায় ভঙ্গ হয়ে যাওয়া। এটি ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মত। কেননা প্রকৃতপক্ষে এটিই কথা। আমাদের দলিল হলো এই যে, প্রচলনে ও শরিয়তের দৃষ্টিতে নামাজের মাঝে কুরআন তেলাওয়াত কথা নয়। নবী করীম ﷺ বলেছেন, আমাদের এই নামাজে মানুষের কোনো কথা সমীচীন নয়। কোনো কোনো মতে আমাদের প্রচলন অনুযায়ী নামাজের বাইরেও কসম ভঙ্গ হবে না। কেননা এটাকে কথা বলেছে বলে বলা হয় না। বরং ক্বারী ও তাসবীহ পাঠকারী বলা হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কেউ যদি কসম করে যে, সে কথা বলবে না, অতঃপর সে কুরআন পাঠ করে, সুবহানাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ইত্যাদি পাঠ করে, তাহলে সে কসম ভঙ্গকারী হবে কি না এ বিষয়টি উপরিউক্ত ইবারতে আলোচিত হয়েছে। যার সারমর্ম হলো এই যে, এক্ষেত্রে দুটি সুরত বা-অবস্থা, এক. নামাজের ভিতরে কুরআন পাঠ করা, তাসবীহ তাহলীল পড়া, দুই. নামাজের বাইরে কুরআন পাঠ করা ও তাসবীহ তাহলীল পড়া।

ইমাম শাফেয়ী (রা.)-এর মতে উভয় অবস্থায় ব্যক্তি কসম ভঙ্গকারী হয়ে যাবে। এবং এটাই কিয়াসের দাবি করণ। কুরআন পাঠ, তাসবীহ তাহলীল সবই কথা, যেহেতু এগুলো অর্থবোধক শব্দ। নামাজের ভিতরেই হোক বা বাইরেই হোক।

কিন্তু আমাদের (আহনাফের) মাযহাব হলো উপরিউক্ত বিষয়গুলো নামাজের ভিতরে হলে এর দ্বারা ব্যক্তি কসম ভঙ্গকারী হবে না। নামাজের বাইরে হলে কসম ভঙ্গকারী হয়ে যাবে। দলিল হলো এই যে, নামাজের ভিতরের কুরআন পাঠ, তাসবীহ-তাহলীল ইত্যাদিকে কালাম বা কথা অভিধায় আখ্যায়িত করা হয় না। জনসাধারণের পরিভাষায়ও নয়, শরিয়তের পরিভাষায়ও নয়। কারণ "আমি কথা বলব না" এ বাক্যটি মানুষ কখনো নামাজ ছেড়ে দেওয়ার অর্থে ব্যবহার করে না। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, নামাজের মধ্যে কোনো কথাবার্তা বলা বৈধ নয়। নামাজ হলো, তাসবীহ, তাকবীর ও কুরআন পাঠের জন্য। (মুসলিম শরীফ) এর দ্বারা বুঝা গেল, নামাজের ভিতরে কুরআন পাঠ, তাসবীহ-তাহলীল ইত্যাদি কালাম বা কথার আওতায় পড়ে না। বিধায় ব্যক্তি কসম ভঙ্গকারী হবে না।

কেউ কেউ বলেছেন, এসব কাজ নামাজের বাইরে করলেও কসম ভঙ্গকারী হবে না। কারণ যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে, তাসবীহ পড়ে, তার সম্পর্কে মানুষ এটাই বলে যে, সে কুরআন পাঠ করছে, তাসবীহ পাঠ করছে। সে কথা বলছে এরূপ বলা হয় না।

ফকীহ আবুল লাইস (র.) জামে সগীরের ব্যাখ্যায় বলেছেন আমাদের অঞ্চলে এ মতই ধর্তব্য হবে। অর্থাৎ নামাজের ভিতরে বাইরে কোনো অবস্থাতেই কসম ভঙ্গকারী হবে না। ইমাম আহমদ ও সদরুশ শহীদ (র.)ও এ মত পোষণ করেন এবং এর উপরই ফতোয়া।

https://e-ilm.weebly.com/

وَلَوْ قَالَ يَوْمَ أُكَلِّمُ فُلَانًا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ فَهُوَ عَلَى اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لِأَنَّ اسْمَ الْيَوْمِ إِذَا قُرِنَ بِفِعْلٍ لَا يَمْتَدُّ يُرَادُ مُطْلَقُ الْوَقْتِ. قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى ﴿وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ﴾ وَالْكَلَامُ لَا يَمْتَدُّ وَانْ عَنِيَ النَّهَارَ خَاصَّةً دِيْنَ فِي الْقَضَاءِ لِأَنَّهُ مُسْتَعْمَلٌ فِيْهِ أَيْضًا. وَعَنْ أَبِيْ يُوْسُفَ انَّهُ لَا يَدِيْنُ فِي الْقَضَاءِ لِأَنَّهُ خِلَافُ الْمُتَعَارَفِ. وَلَوْ قَالَ لَيْلَةَ أُكَلِّمُ فُلَانًا فَهُوَ عَلَى اللَّيْلِ خَاصَّةً لِأَنَّهُ حَقِيْقَةٌ فِيْ سَوَادِ اللَّيْلِ كَالنَّهَارِ لِلْبَيَاضِ خَاصَّةً، وَمَا جَاءَ اسْتِعْمَالُهُ فِيْ مُطْلَقِ الْوَقْتِ .

অনুবাদ : আর যদি বলে যে, যেদিন অমুকের সাথে কথা বলব তার (অর্থাৎ নিজের) স্ত্রী তালাক। তাহলে দিবা রাত্রি পূর্ণ সময়ের সাথে কসমের সম্পর্ক হবে। কেননা দিন শব্দটি যখন প্রলম্বিত কোনো কর্মের সাথে সম্পৃক্ত হয়, তখন সাধারণ সময় উদ্দেশ্য হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ অর্থাৎ আর সে ব্যক্তি সেদিন তাদের থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে। আর কথা কোনো প্রলম্বিত কর্ম নয়। **আর যদি কেবল দিবস উদ্দেশ্য করে থাকে তাহলে আইনগতভাবে তা গ্রহণযোগ্য হবে।** কেননা দিন শব্দটি দিবস অর্থেও ব্যবহৃত হয়। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে আইনগতভাবে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা এটা প্রচলনের বিপরীত। **আর যদি বলে যে, রাত্রে অমুকের সাথে কথা বলব, তাহলে কসমটি শুধু রাত্রের সাথে সম্পৃক্ত হবে।** কেননা এর প্রকৃত অর্থ হলো সময়ের অন্ধকার অংশ। যেমন দিবসের প্রকৃত অর্থ হলো সময়ের আলোকিত অংশ আর সাধারণ সময় অর্থে এর ব্যবহারে নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

يَوْمٌ শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়, যেমন ১. সাধারণভাবে সময় অর্থে ২. সূর্যোদয় হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত, জনসাধারণের পরিভাষায় ৩. সুবহে সাদেক হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত, শরিয়তের পরিভাষায়। কেউ যদি বলে, যেদিন আমি অমুকের সাথে কথা বলব, সেদিন আমার স্ত্রী তালাক, তাহলে তার একথায় দিন শব্দটি কোন অর্থে গ্রহণ করা হবে এ বিষয়ে বলা হয়েছে যে, ব্যক্তি যেহেতু দিন শব্দটি কে فِعْلٌ غَيْرُ مُمْتَدّ অপ্রলম্বিত কাজের সাথে সংযুক্ত করেছে তাই এটা সাধারণভাবে সময় অর্থে গ্রহণ করা হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ সেদিন (জিহাদের সময়) যে ব্যক্তি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পালায়। এ আয়াতে يَوْمٌ দিন শব্দটি সময় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অতএব, এ ব্যক্তি দিনের বেলায় কিংবা রাতের বেলায় যখনই অমুকের সাথে কথা বলবে তখনই তার স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে।

তবে সে যদি বলে যে, দিন বলে আমার উদ্দেশ্য ছিল দিনের বেলা বুঝানো তাহলে তার কথা গ্রাহ্য হবে। অর্থাৎ সে মুতাবেক কাজি সাহেব ফয়সালা করবেন। কারণ يَوْمٌ (দিন) শব্দটি দিনের বেলা তথা ভোর হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত সময় অর্থেও ব্যবহৃত হয়। বরং এটা এ শব্দের প্রকৃত অর্থ। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, কাজি সাহেব তার কথা গ্রহণ করবে না, কারণ فِعْلٌ غَيْرُ مُمْتَدّ অপ্রলম্বিত কর্মের সাথে يَوْمٌ (দিন) শব্দ সংযুক্ত করে দিনের বেলা অর্থে ব্যবহার করার বিষয়টি প্রচলিত নিয়মের পরিপন্থি।

কেউ কেউ বলেন, আমি যদি অমুকের সাথে রাতে কথা বলি, তাহলে আমার স্ত্রী তালাক, তাহলে তার কথায় উল্লিখিত রাত বা لَيْلَةٌ শব্দটি কেবল রাতের বেলা অর্থেই গ্রহণ করা হবে। দিনের বেলায় কথা বললে স্ত্রী তালাক হবে না। কেননা لَيْلَةٌ শব্দ কেবল রাত্রিকালীন সময়ই বুঝিয়ে থাকে। যেমন النَّهَار শব্দ কেবল দিনের বেলা বুঝিয়ে থাকে। অতএব لَيْلَةٌ শব্দটি কে সাধারণভাবে সময় অর্থে গ্রহণ করা যাবে না, যেমন اَلْيَوْم (দিন) শব্দ কে সময় অর্থে গ্রহণ করা যায়।

https://e-ilm.weebly.com/

وَلَوْ قَالَ اِنْ كَلَّمْتُ فُلَانًا اِلَّا اَنْ يَقْدَمَ فُلَانٌ اَوْ قَالَ حَتّٰى يَقْدَمَ فُلَانٌ اَوْ قَالَ اِلَّا اَنْ يَّاْذَنَ فُلَانٌ اَوْ حَتّٰى يَاْذَنَ فُلَانٌ فَامْرَاَتُهٗ طَالِقٌ فَكَلَّمَهٗ قَبْلَ الْقُدُوْمِ وَالْاِذْنِ حَنِثَ . وَلَوْ كَلَّمَهٗ بَعْدَ الْقُدُوْمِ وَالْاِذْنِ لَمْ يَحْنَثْ لِاَنَّهٗ غَايَةٌ وَالْيَمِيْنُ بَاقِيَةٌ قَبْلَ الْغَايَةِ وَمُنْتَهِيَةٌ بَعْدَهَا فَلَا يَحْنَثُ بِالْكَلَامِ بَعْدَ انْتِهَاءِ الْيَمِيْنِ وَاِنْ مَاتَ فُلَانٌ سَقَطَتِ الْيَمِيْنُ خِلَافًا لِاَبِيْ يُوْسُفَ لِاَنَّ الْمَمْنُوْعَ عَنْهُ كَلَامٌ يَنْتَهِيْ بِالْاِذْنِ وَالْقُدُوْمِ وَلَمْ يَبْقَ بَعْدَ الْمَوْتِ مُتَصَوَّرُ الْوُجُوْدِ فَسَقَطَتِ الْيَمِيْنُ . وَعِنْدَهٗ التَّصَوُّرُ لَيْسَ بِشَرْطٍ ، فَعِنْدَ سُقُوْطِ الْغَايَةِ تَتَابَدُ الْيَمِيْنُ .

অনুবাদ : আর যদি বলে যে, যদি অমুক আসার পূর্বে কিংবা অমুকের অনুমতি দানের পূর্বে অমুকের সাথে কথা বলি কিংবা যদি বলে যে, যতক্ষণ না অমুক আগমন করে কিংবা অনুমতি দান করে তাহলে তার স্ত্রী তালাক। অতঃপর অমুকের আগমনের কিংবা অনুমতি দানের পূর্বে অমুকের সাথে কথা বলল, তাহলে সে কসম ভঙ্গকারী হবে। আর যদি আগমনের বা অনুমতি দানের পরে কথা বলে তাহলে কসম ভঙ্গকারী হবে না। কেননা আগমন ও অনুমতি প্রদান হচ্ছে কসম রক্ষা করার সীমা। আর সীমার পূর্বে কসম অব্যাহত থাকে এবং সীমার পরে সমাপ্তি লাভ করে। সুতরাং কসমের সমাপ্তির পর কথা বলা দ্বারা কসম ভঙ্গ হবে না।

আর যদি অমুক (আগমনকারী বা অনুমতি দাতা) মারা যায় তাহলে কসম রহিত হয়ে যাবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। কেননা কসমকারীর জন্য নিষিদ্ধ হচ্ছে ঐ কথা যার নিষিদ্ধতা অনুমতি দান বা আগমন দ্বারা সমাপ্তি লাভ করবে। কিন্তু মৃত্যুর পর এর সম্ভাব্যতা অবশিষ্ট থাকেনি। অতএব, কসম রহিত হয়ে যাবে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর মতে সম্ভাব্যতা শর্ত নয়। সুতরাং সীমা বিলুপ্ত হওয়ার পর কসম চিরস্থায়ী হয়ে যাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কেউ যদি বলে, অমুক আসার পূর্বে বা অমুকের আগমন ব্যতীত যদি আমি কার্যাবলি, অথবা যদি বলে, আমি যদি অমুকের অনুমতি ছাড়া কিংবা অনুমতির পূর্বে কথা বলি, তাহলে আমার স্ত্রী তালাক. এমতাবস্থায় হুকুম হলো এই যে, অমুকের আগমন বা অনুমতির পূর্বে কথা বললে স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে। অমুকের আগমন বা অনুমতির পরে কথা বললে স্ত্রী তালাক হবে না। কেননা তার বাক্যে ব্যবহৃত حتى ও الا শব্দ দুটি غاية সীমা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। حتى শব্দটির মূল অর্থই হলো সীমা, আর الا এর মূল অর্থ যদিও সীমা নয়, কিন্তু এখানে সীমা অর্থেই ব্যবহৃত। কারণ তার মূল হলো استثناء ; এখানে সে অর্থে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। কারণ الا এর পূর্বাপর অর্থাৎ কথা বলা ও অমুকের আগমন করা বা অনুমতি দেওয়া এক জিনিস নয়। তথা এক জাতীয় বিষয় নয় তাই الا শব্দটিও حتى -এর অর্থে ব্যবহৃত مجاز বা রূপকভাবে। দুয়ের মাঝে علاقة বা সংযোগ হলো এই যে, حتى ও الا উভয় অব্যয়ের পরবর্তী হুকুম পূর্বের হুকুমের বিপরীত হয়ে থাকে। যেমন جَاءَنِى الْقَوْمُ اِلَّا زَيْدًا এ বাক্যে الا পূর্ব শব্দ قوم -এর হুকুম হলো আসা, আর পরের শব্দ زيد -এর হুকুম হলো না আসা। অতএব, حتى ও الا এদিক থেকে পরস্পর সদৃশ্য। এ সাদৃশ্যের ভিত্তিতে কখনো উভয়ই এক অর্থে তথা غاية বা সীমা অর্থে ব্যবহৃত হয়। আলোচ্য মাসআলায়ও এমনটিই হয়েছে।

অতএব, অমুকের আগমন বা অনুমতি হলো কসমের غاية বা সীমা। তাই যদি সীমা বাস্তবায়িত হওয়ার পূর্বে কথা বলে তাহলে কসম ভঙ্গকারী হয়ে যাবে, যেহেতু তখন কসম অবশিষ্ট আছে। আর সীমা বাস্তবায়িত হওয়ার পর অর্থাৎ অমুকের আগমন বা অনুমতির পরে যদি কথা বলে তাহলে কসম ভঙ্গকারী হবে না। কারণ সীমা বাস্তবায়িত হওয়ার দ্বারা কসম শেষ হয়ে গেছে। আর শেষ হয়ে যাওয়ার পর কসম ভঙ্গ হওয়ার প্রশ্নই থাকে না।

যে ব্যক্তির আগমন বা অনুমতিকে কসমের غاية বানানো হয়েছে সে যদি মরে যায়, তাহলে কি হবে এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর মতে তার কসমটি চিরস্থায়ী কসমে পরিণত হবে। কেননা অমুকের আগমন বা অনুমতিকে কসমের غاية বা সীমা বানানো হয়েছিল। এখন যেহেতু মরে গেছে, তাই তার আগমন বা অনুমতি কখনো সম্ভব হবে না। বিধায়, তার কসমেরও ইতি ঘটবে না। কারণ ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর মতে غاية সম্ভাব্য হওয়া শর্ত নয়। যখনই কথা বলবে, তখনই স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে।

পক্ষান্তরে অন্যান্য ইমামগণ বলেন, অমুক মরে যাওয়ার পর কসম শেষ হয়ে যাবে। কারণ অমুকের আগমন বা অনুমতি অসম্ভব হয়ে পড়াতে স্বাভাবিকভাবে কসম থেকে মুক্তি পাওয়া অসম্ভব হয়ে গেছে। তাই কসমটি শেষ হয়ে যাবে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَمَنْ حلف لَا يُكَلِّمُ عَبْدَ فُلَانٍ وَلَمْ يَنْوِ عَبْدًا بِعَيْنِهِ اَوِ امْرَاَةَ فُلَانٍ اَوْ صَدِيْقَ فُلَانٍ فَبَاعَ فُلَانٌ عَبْدَهٗ اَوْ بَانَتْ مِنْهُ اِمْرَاَتُهٗ او عَادٰى صَدِيْقَهٗ فَكَلَّمَهُمْ لَمْ يَحْنَثْ لِاَنَّهٗ عَقْدُ يَمِيْنِهٖ عَلٰى فِعْلٍ وَاقِعٍ فِيْ مَحَلٍّ مُضَافٍ اِلٰى فُلَانٍ اِمَّا اِضَافَةُ مِلْكٍ اَوْ اِضَافَةُ نِسْبَةٍ وَلَمْ يُوْجَدْ فَلَا يَحْنَثُ قَالَ (رضـ) هٰذَا فِيْ اِضَافَةِ المِلْكِ بِالْاِتِّفَاقِ وَفِيْ اِضَافَةِ النِّسْبَةِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ (رحـ) يَحْنَثُ كَالْمَرْاَةِ وَالصَّدِيْقِ قَالَ فِيْ الزِّيَادَاتِ لِاَنَّ هٰذِهِ الْاِضَافَةَ لِلتَّعْرِيْفِ لِاَنَّ الْمَرْاَةَ وَالصَّدِيْقَ مَقْصُوْدَانِ بِالْهِجْرَانِ فَلَا يُشْتَرَطُ دَوَامُهَا فَيَتَعَلَّقُ الْحُكْمُ بِعَيْنِهٖ كَمَا فِيْ الْاِشَارَةِ وَ وَجْهُ مَا ذُكِرَ هٰهُنَا وَهُوَ رِوَايَةُ الجَامِعِ الصَّغِيْرِ اَنَّهٗ يَحْتَمِلُ اَنْ يَكُوْنَ غَرَضُهٗ هِجْرَانَهٗ لِاَجْلِ الْمُضَافِ اِلَيْهِ وِلِهٰذَا لَمْ يُعَيِّنْهُ فَلَا يَحْنَثُ بَعْدَ زَوَالِ الْاِضَافَةِ بِالشَّكِّ -

অনুবাদ : কেউ যদি কসম করে যে, অমুকের গোলামের সাথে কথা বলবে না কিন্তু নির্দিষ্ট কোনো গোলামের নিয়ত করল না। কিংবা অমুকের স্ত্রীর সাথে কিংবা অমুকের বন্ধুর সাথে কথা বলবে না। অতঃপর অমুক তার গোলাম বিক্রি করে ফেলল, কিংবা স্ত্রীর সাথে বিচ্ছেদ হয়ে গেল, কিংবা বন্ধুর সাথে শত্রুতা হয়ে গেল, অতঃপর সে তাদের সাথে কথা বলল, তাহলে কসম ভঙ্গ হবে না। কেননা সে তার কসমকে এমন ক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত করেছে, যা অমুকের সাথে সম্বন্ধিত পাত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট। হয় তার সাথে মালিকানার সম্বন্ধ, কিংবা তার প্রতি সম্পর্কের সম্বন্ধ। আর কথা বলার সময় এই সম্বন্ধ বিদ্যমান ছিল না। সুতরাং কসম ভঙ্গ হবে না। হেদায়া গ্রন্থকার বলেন, মালিকানা : সম্বন্ধের ক্ষেত্রে এ সিদ্ধান্ত সর্বসম্মত। পক্ষান্তরে সম্পর্কের সম্বন্ধের ক্ষেত্রে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে কসম ভঙ্গ হবে। যেমন স্ত্রী ও বন্ধু। زیادات এ ইমাম মুহাম্মাদ (র.) বলেছেন, এর কারণ এই যে, উক্ত সম্বন্ধ হচ্ছে পরিচয় প্রদানের জন্য। কেননা স্ত্রী বা বন্ধুর সত্তাই হচ্ছে কথা বর্জনের পাত্র। সুতরাং সম্পর্ক বজায় থাকা শর্ত নয়। বরং তাদের সত্তার সাথে হুকুম সম্পৃক্ত হবে। যেমন তাদের প্রতি ইশারার মাধ্যমে কসম করার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

জামে সাগীরের বর্ণনা অনুযায়ী এখানে যে সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তার কারণ এই যে, এখানে এমন সম্ভাবনা রয়েছে যে, তার উদ্দেশ্য হলো যার সাথে তার সম্বন্ধ রয়েছে তার কারণেই তাদের সাথে কথা বর্জন করা। একারণেই বর্জনকৃত সত্তাকে নির্দিষ্ট করেনি। সুতরাং এই সন্দেহের কারণে সম্বন্ধ শেষ হওয়ার পর কসম ভঙ্গ হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কেউ যদি কসম করে যে সে অমুকের কৃতদাসের সাথে কথা বলবে না এবং নির্দিষ্ট কোনো কৃতদাস উদ্দেশ্য না হয়, কিংবা যদি বলে অমুকের স্ত্রীর সাথে কথা বলবে না বা অমুকের বন্ধুর সাথে কথা বলবে না। অতঃপর যদি অমুক তার দাসকে বিক্রয় করে দেয়, স্ত্রী তালাক প্রাপ্তা হয়ে যায় এবং বন্ধু শত্রুতে পরিণত হয় তারপর যদি ঐ ব্যক্তি এদের সাথে কথা বলে তাহলে সে শপথ ভঙ্গকারী হবে না, প্রথম সুরতে সর্ব সম্মতিক্রমে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সুরতে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে শপথ ভঙ্গকারী হয়ে যাবে, অন্যান্যদের মতে শপথ ভঙ্গকারী হবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

এ জাতীয় মাসআলাগুলো একটি اصل বা মূলনীতির সাথে সম্পৃক্ত। মূলনীতি হলো এই যে, যদি এমন কোনো কাজের ব্যাপারে কসম করা হয়। যে কাজটি নির্দিষ্ট কোনো মহল বা ক্ষেত্রে সংঘটিত হয়, এবং সে ক্ষেত্রটি অন্যের সাথে সম্পৃক্ত থাকে, তাহলে সাধারণত দুরকম অবস্থা হতে পারে : ১. অন্যের সাথে সেই ক্ষেত্রের সম্পর্কটি মালিকানার সম্পর্ক হবে : ২. মালিকানা ছাড়া অন্য কোনো সম্পর্ক হবে। প্রথমোক্ত অবস্থায় শপথ ভঙ্গকারী হওয়ার জন্য শর্ত হলো, যে কাজের কসম করেছিল সে কাজ সংঘটিত হওয়ার সময় উক্ত সম্পর্ক বহাল থাকা। কসম করার সময় যদি সম্পর্ক থাকে এবং কথা ঘটার সময় সম্পর্ক বহাল না থাকে তাহলে শপথ ভঙ্গকারী হবে না। আর দ্বিতীয় প্রকারের ক্ষেত্রে শর্ত হলো শুধু কসম করার সময় সম্পর্ক থাকা, কাজ ঘটার সময় উক্ত সম্পর্ক বহাল না থাকলেও শপথ ভঙ্গকারী হয়ে যাবে। প্রথম প্রকারের উদাহরণ হলো এমন বলা যে, আমি অমুকের কৃতদাসের সাথে কথা বলব না, আমি অমুকের বাড়িতে প্রবেশ করব না, আমি অমুকের গাড়িতে উঠব না, আমি অমুকের খাদ্য খাব না, আমি অমুকের জামাটি পরিধান করব না ইত্যাদি। এসকল সুরতে যদি ব্যক্তির মালিকানা বাতিল হয়ে যাওয়ার পর কসমকৃত কাজটি সংঘটিত হয়, অর্থাৎ কসমকারী ব্যক্তি দাসের সাথে কথা বলে, বাড়িতে প্রবেশ করে, গাড়িতে উঠে, খাবার খায়, তাহলে সে শপথ ভঙ্গকারী হবে না। দ্বিতীয় সুরতের উদাহরণ হলো, এমন বলা যে, আমি অমুকের স্ত্রীর সাথে কথা বলব না, বা আমি অমুকের বন্ধুর সাথে কথা বলব না, অতঃপর যদি স্ত্রী তালাক প্রাপ্ত হয়ে যায়, এবং বন্ধু শত্রুতে পরিণত হয়ে যায় এবং সে তখন তাদের সাথে কথা বলে, তাহলে সে শপথ ভঙ্গকারী হবে না।

উপরিউক্ত দুসুরতের মাঝে এমন পার্থক্যের কারণ হলো এই যে, প্রথমোক্ত বিষয়গুলো অর্থাৎ মালিকানাধীন বিষয়গুলোর সত্তার সাথে কোনো বিরোধ থাকে না। বরং বিরোধ থাকে সেগুলোর মালিকের সাথে, পক্ষান্তরে দ্বিতীয় প্রকারের বিষয়গুলোর সত্তার সাথেই বিরোধ থাকতে পারে।

প্রশ্ন হতে পারে যে, ব্যক্তির কৃতদাস প্রথম প্রকারের আওতাভুক্ত। যেহেতু কৃতদাস মালিকানাধীন। অথচ কৃতদাসের সত্তার সাথে বিরোধ থাকা সম্ভব! জবাবে আমরা বলব যে, ইবনে সামাআ তার নাওয়াদের -এ উল্লেখ করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে কৃতদাসের ক্ষেত্রেও ব্যক্তি এ কারণে শপথ ভঙ্গকারী হয়ে যাবে।

তবে জাহেরুর রেওয়ায়েতের পক্ষে কারণ দর্শিয়ে বলা যায়, কৃতদাসের সত্তার সাথে বিরোধ থাকা যদিও সম্ভব, তথাপি বিষয়টি গণনায় নেওয়া হয়নি। কারণ সে মালিকাধীন হওয়ার কারণে বস্তুর পর্যায়ভুক্ত হয়ে গেছে। সে কারণেই তাকে জীবজন্তু ও জড়পদার্থের মতো বাজারে ক্রয় বিক্রয় করা হয়।

বর্ণিত মাসআলার তিন সুরতের মধ্যে হতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় সুরতের হুকুম ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মাযহাবে উপরে বর্ণিত উসূল মুতাবেক হয়েছে। অর্থাৎ স্ত্রী ও বন্ধু যেহেতু মালিকানাধীন নয়, তাই তাদের সম্পর্ক বহাল না থাকা অবস্থায় কথা বললেও শপথ ভঙ্গকারী হয়ে যাবে। আর জাহেরুর রেওয়ায়েতে যা বলা হয়েছে তা পূর্বোক্ত উসূলের খেলাফ। এই খেলাফ হওয়ার কারণ হলো ব্যক্তির স্ত্রী বা বন্ধুর সাথে কথা ত্যাগ করার কারণ যেমন স্ত্রী বা বন্ধু নিজে হতে পারে, তেমনি ব্যক্তিও হতে পারে। স্ত্রী বা বন্ধু নিজেই কারণ হলে শপথ ভঙ্গকারী হওয়া উচিত।

আর যদি ব্যক্তির সাথে বিরোধ থাকা মূল কারণ হয়, তাহলে সম্পর্ক বহাল না থাকার করণে শপথ ভঙ্গকারী না হওয়া উচিত। এরূপ সংশয়পূর্ণ অবস্থায় শপথ ভঙ্গকারী না হওয়ার দিকটিকেই জাহেরুর রেওয়ায়েতে প্রাধান্য দান করা হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَإِنْ كَانَتْ يَمِيْنُهُ عَلَى عَبْدٍ بِعَيْنِهِ بِاَنْ قَالَ عَبْدُ فُلَانٍ هٰذَا اَوْ اِمْرَاَةُ فُلَانٍ بِعَيْنِهَا اَوْ صَدِيْقُ فُلَانٍ بِعَيْنِهِ لَمْ يَحْنَثْ فِي الْعَبْدِ وَحَنِثَ فِي الْمَرْاَةِ وَالصَّدِيْقِ، وَهٰذَا قَوْلُ اَبِيْ حَنِيْفَةَ وَاَبِيْ يُوْسُفَ . وَقَالَ مُحَمَّدٌ : يَحْنَثُ فِي الْعَبْدِ اَيْضًا وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ وَاِنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارَ فُلَانٍ هٰذِهِ فَبَاعَهَا ثُمَّ دَخَلَهَا فَهُوَ عَلٰى هٰذَا الِاخْتِلَافِ وَجْهُ قَوْلِ مُحَمَّدٍ وَزُفَرَ اَنَّ الْاِضَافَةَ لِلتَّعْرِيْفِ وَالْإِشَارَةَ اَبْلَغُ مِنْهَا فِيْهِ لِكَوْنِهَا قَاطِعَةً لِلشَّرِكَةِ، بِخِلَافِ الْاِضَافَةِ فَاعْتُبِرَتِ الْاِشَارَةُ وَلُغِيَتِ الْاِضَافَةُ وَصَارَ كَالصَّدِيْقِ وَالْمَرْاَةِ . وَلَهُمَا اَنَّ الدَّاعِيَ اِلَى الْيَمِيْنِ مَعْنًى فِي الْمُضَافِ اِلَيْهِ لِاَنَّ هٰذِهِ الْاَعْيَانَ لَا تُهْجَرُ وَلَا تُعَادٰى لِذَوَاتِهَا، وَكَذَا الْعَبْدُ لِسُقُوْطِ مَنْزِلَتِهِ بَلْ لِمَعْنًى فِيْ مُلَّاكِهَا فَتَتَقَيَّدُ الْيَمِيْنُ بِحَالِ قِيَامِ الْمِلْكِ، بِخِلَافِ مَا اِذَا كَانَتِ الْاِضَافَةُ اِضَافَةَ نِسْبَةٍ كَالصَّدِيْقِ وَالْمَرْاَةِ لِاَنَّهُ يُعَادٰى لِذَاتِهِ فَكَانَتْ الْاِضَافَةُ لِلتَّعْرِيْفِ وَالدَّاعِيْ لِمَعْنًى فِي الْمُضَافِ اِلَيْهِ غَيْرُ ظَاهِرٍ لِعَدَمِ التَّعْيِيْنِ، بِخِلَافِ، مَا تَقَدَّمَ

অনুবাদ : আর যদি নির্দিষ্ট কোনো গোলামের ক্ষেত্রে কসম করে; যেমন বলল, অমুকের এই গোলামের সাথে কিংবা অমুকের নির্দিষ্ট স্ত্রীর সাথে কিংবা নির্দিষ্ট বন্ধুর সাথে কথা বলব না। তাহলে গোলামের ক্ষেত্রে কসম ভঙ্গ হবে না। কিন্তু স্ত্রী ও বন্ধুর ক্ষেত্রে কসম ভঙ্গ হবে। এ হলো ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর অভিমত। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, গোলামের ক্ষেত্রেও কসম ভঙ্গ হবে। এটা ইমাম যুফার (র.) -এর অভিমত।

আর যদি কসম করে যে, অমুকের এই বাড়িতে প্রবেশ করব না। অতঃপর সে তা বিক্রি করে ফেলল আর সে তাতে প্রবেশ করল, তাহলে তাতেও এই মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম মুহাম্মদ ও যুফার (র.) -এর দলিল এই যে, সম্বন্ধ হচ্ছে পরিচয়ের জন্য। আর পরিচয়ের ব্যাপারে ইশারা হচ্ছে অধিকতর পরিচয় জ্ঞাপক। কারণ এতে অন্যের অন্তর্ভুক্তি রহিত হয়ে যায়। কিন্তু সম্বন্ধের বিষয়টি ভিন্ন। সুতরাং ইশারাই বিবেচ্য হবে, এবং সম্বন্ধের বিবেচনা অকার্যকর হয়ে যাবে। আর ইঙ্গিতকৃত গোলামের বিষয়টি বন্ধু ও স্ত্রীর অনুরূপ হয়ে যাবে।

শাইখাইনের দলিল এই যে, কসমের প্রতি উদ্বুদ্ধকারী কারণটি তার মাঝেই নিহিত যার দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। কেননা এ সকল জিনিসের সাথে কথা বর্জন করা হয় না এবং সত্তাগত কারণে এগুলোর সাথে শত্রুতা করা হয় না। তদ্রূপ গোলামকেও নিম্ন শ্রেণির হওয়ার কারণে বর্জন করা হয় না। বরং মনিবের মাঝে নিহিত কোনো কারণেই গোলামের সাথে কথা বর্জন করা হয়। সুতরাং মালিকানা বিদ্যমান থাকার অবস্থার সাথেই কসমটি বন্ধনযুক্ত হবে।

আর সম্বন্ধ যদি নিছক পরিচয়ের জন্য হয়। যেমন স্ত্রী ও বন্ধু তাহলে বিষয়টি ভিন্ন হবে। কেননা সত্তাগত কারণেও এদের সাথে শত্রুতা করা হয়। সুতরাং সম্বন্ধের উল্লেখ শুধু পরিচয়ের জন্য হবে। আর যার সাথে সম্বন্ধ করা হচ্ছে, তার মাঝে উদ্বুদ্ধকারী কারণটি বিদ্যমান থাকার বিষয়টি অস্পষ্ট। কেননা কথা বর্জনের উদ্দেশ্য হিসাবে সে সুনির্ধারিত নয়। পক্ষান্তরে পূর্বে উল্লেখকৃত মালিকানাগত সম্বন্ধের বিষয়টি ভিন্ন।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ وَاِنْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ صَاحِبَ هٰذَا الطَّيْلَسَانِ فَبَاعَهُ ثُمَّ كَلَّمَهُ حَنِثَ لِاَنَّ هٰذِهِ الْاِضَافَةَ لَا تَحْتَمِلُ اِلَّا التَّعْرِيْفَ لِاَنَّ الْاِنْسَانَ لَا يُعَادٰى لِمَعْنًى فِي الطَّيْلَسَانِ فَصَارَ كَمَا اِذَا اَشَارَ اِلَيْهِ وَمَنْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ هٰذَا الشَّابَّ فَكَلَّمَهُ وَقَدْ صَارَ شَيْخًا حَنِثَ لِاَنَّ الْحُكْمَ تَعَلَّقَ بِالْمُشَارِ اِلَيْهِ اِذِ الصِّفَةُ فِي الْحَاضِرِ لَغْوٌ، وَهٰذِهِ الصِّفَةُ لَيْسَتْ بِدَاعِيَةٍ اِلَى الْيَمِيْنِ عَلٰى مَا مَرَّ مِنْ قَبْلُ .

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, **যদি কসম করে যে, এই চাদর পরিধানকারীর সাথে কথা বলবে না। অতঃপর সে তা বিক্রি করে ফেলল, অতঃপর সে তার সাথে কথা বলল, তাহলে কসম ভঙ্গ হবে।** কেননা এই সম্বন্ধের উল্লেখ পরিচয় ছাড়া অন্য কিছুর সম্ভাবনা রাখে না। কেননা মানুষ চাদরের সাথে সম্পৃক্ত কোনো কারণে কারো সাথে শত্রুতা পোষণ করে না। সুতরাং এটা চাদর ওয়ালার দিকে ইশারা করে কসম করার মতো হলো। **কেউ যদি কসম করে যে, এই যুবকের সাথে কথা বলবে না। অতঃপর বৃদ্ধ অবস্থায় তার সাথে কথা বলল। তাহলে কসম ভঙ্গ হবে** কেননা উপস্থিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে গুণের উল্লেখ যেহেতু অর্থহীন এবং যেহেতু এই গুণটি কসমের প্রতি উদ্বুদ্ধকারী নয় .যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, সেহেতু হুকুমের সম্পর্ক হবে ইঙ্গিতকৃত ব্যক্তির সাথে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কেউ যদি কসম করে, কোনো ব্যক্তির নির্দিষ্ট কৃতদাসের সাথে, বা নির্দিষ্ট স্ত্রীর সাথে অথবা নির্দিষ্ট বন্ধুর সাথে কথা বলবে না, অতঃপর যদি এ সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার পর তাদের সাথে কথা বলে তাহলে কি হুকুম এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও আবূ ইউসুফ (র.) -এর মতে কৃতদাসের ক্ষেত্রে শপথ ভঙ্গকারী হবে না। স্ত্রী ও বন্ধুর ক্ষেত্রে শপথ ভঙ্গকারী হয়ে যাবে। (পূর্ব বর্ণিত উসূল মুতাবেক) ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে কৃতদাসের ক্ষেত্রেও শপথ ভঙ্গকারী হয়ে যাবে। এটা ইমাম যুফার, শাফেয়ী, মালেক ও আহমদ (র.) -এর অভিমত।

কেউ যদি বলে, আমি অমুকের এ বাড়িতে প্রবেশ করব না, অতঃপর অমুক তার বাড়িটি বিক্রি করে দেয় এবং কসমকারী ব্যক্তি তাতে প্রবেশ করে, তাহলে এর হুকুমের ক্ষেত্রেও উপরিউক্ত মতভেদ। অর্থাৎ শাইখাইনের মতে শপথ ভঙ্গকারী হবে না। ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মতে শপথ ভঙ্গকারী হবে।

এ মাসআলায় শাইখাইনের মতামত যেহেতু বিগত মাসআলায় বর্ণিত উসূল মুতাবেক, তাই তাদের দলিল সুস্পষ্ট। অর্থাৎ বাড়িতে প্রবেশ না করার কারণ হলো মালিকের সাথে বিরোধ থাকা, কৃতদাস ও বাড়ির মতোই বস্তুর পর্যায়ভুক্ত। অতএব, এরা যখন সেই মালিকের মালিকানায় না থাকবে, তখন কসমকৃত কাজ সংঘটিত হলে শপথ ভঙ্গকারী না হওয়াই উসূলের তাকাযা বা দাবি। পক্ষান্তরে স্ত্রী ও বন্ধু যেহেতু নিজেরাই বিরোধের কারণ হতে পারে, তাই ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক না থাকা অবস্থায়ও তাদের সাথে কথা বললে শপথ ভঙ্গকারী হয়ে যাবে। এটাও উসূলের দাবি।

কিন্তু ইমাম মুহাম্মাদ (র.) -এর মতটি পূর্ব বর্ণিত উসূলের পরিপন্থি কৃতদাস ও বাড়ির ক্ষেত্রে। তাই এর দলিল স্বরূপ বলা হয়েছে যে, বাড়ি ও কৃতদাসকে যে ব্যক্তির দিকে ইযাফত করা হয়েছে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বাড়ি ও কৃতদাসকে নির্দিষ্ট করা। আর এ নির্দিষ্ট করণের ক্ষেত্রে ইযাফতের তুলনায় অধিক কার্যকরী হলো ইশারা। কারণ কোনো বস্তুর দিকে ইশারা করা হলে বস্তুটি একেবারেই সুনির্দিষ্ট হয়ে যায়। ইযাফতের দ্বারা যেমনটি হয় না। অতএব, যেখানে ইযাফত ও ইশারা একত্রিত হবে, সেখানে ইশারাই ধর্তব্য হবে এবং ইযাফত অকার্যকর হয়ে যাবে। সে হিসাবে কেমন যেন আলোচ্য মাসআলায় বাড়ি ও কৃতদাস কে কোনো ব্যক্তির সাথে সম্পৃক্তই করা হয়নি। বরং নির্দিষ্ট একটি বাড়িতে প্রবেশ না করার এবং নির্দিষ্ট একটি কৃতদাসের সাথে কথা না বলার কসম করা হয়েছে, এগুলো যার মালিকানাই হোক না কেন। এতএব, পূর্ব মালিকের মালিকানা বাতিল হয়ে যাওয়ার পরেও কসমকৃত কাজ সংঘটিত হলে কসমকারী শপথ ভঙ্গকারী হয়ে যাবে, এটা যুক্তিযুক্ত।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর দলিলের জবাবে শাইখাইনের পক্ষ হতে বলা হয় যে, বাড়ি ও কৃতদাস ইত্যাদির ক্ষেত্রে কসম করার উদ্দীপক কারণটি মূলত এদের সত্তার সাথে সম্পৃক্ত থাকে না। বরং কারণটি সম্পৃক্ত হয় এদের মালিকের সাথে। অতএব যতক্ষণ মালিকানা বহাল আছে, ততক্ষণই কসম কার্যকরী থাকবে। মালিকানা পরিবর্তন হলে আর কসম কার্যকরী থাকবে না। বিধায়, তখন কসমকৃত বাক্য সংঘটিত হলেও শপথ ভঙ্গকারী হবে না।

وَاِنْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ صَاحِبَ هٰذَا الطَّيْلَسَانِ : প্রথমোক্ত মাসআলায় কসমের উদ্দীপক কারণ মূলত ব্যক্তির মধ্যে, চাদরের মধ্যে নয়, অতএব, صَاحِبَ هٰذَا الطَّيْلَسَانِ-এর ইযাফতটি ইশারার পর্যায়ে। অতএব হুকুমের সম্পর্ক ব্যক্তির সাথে হবে, চাদরের সাথে নয়। অতএব, চাদর বিক্রি করে দেওয়ার পর ও তার সাথে কথা বললে শপথ ভঙ্গকারী হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে দ্বিতীয় মাসআলায় ও ইশারা ধর্তব্য হবে। যুবক হওয়ার সে সিফত বা গুণ উল্লেখ আছে, এর প্রতি লক্ষ্য করা হবে না। কেননা উপস্থিত ব্যক্তির সিফাত বর্ণনা করা অনর্থক। বিশেষত যখন উক্ত সিফাতের সাথে কসমের উদ্দীপক কারণের কোনো সম্পর্ক না থাকে।

https://e-ilm.weebly.com/

فَصْلٌ : قَالَ وَمَنْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ حِيْنًا اَوْ زَمَانًا اَوِ الْحِيْنَ اَوِ الزَّمَانَ فَهُوَ عَلٰى سِتَّةِ اَشْهُرٍ لِاَنَّ الْحِيْنَ قَدْ يُرَادُ بِهِ الزَّمَانُ الْقَلِيْلُ وَقَدْ يُرَادُ بِهِ اَرْبَعُونَ سَنَةً، قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى ﴿هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِنَ الدَّهْرِ﴾ وَقَدْ يُرَادُ بِهِ سِتَّةَ اَشْهُرٍ، قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى ﴿تُؤْتِيْ اُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍ﴾ وَهٰذَا هُوَ الْوَسَطُ فَيَنْصَرِفُ اِلَيْهِ، وَهٰذَا لِاَنَّ الْيَسِيْرَ لَا يُقْصَدُ بِالْمَنْعِ لِوُجُوْدِ الْاِمْتِنَاعِ فِيْهِ عَادَةً، وَالْمُؤَبَّدُ لَا يُقْصَدُ غَالِبًا لِاَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْاَبَدِ، وَلَوْ سَكَتَ عَنْهُ يَتَاَبَّدُ فَيَتَعَيَّنُ مَا ذَكَرْنَا. وَكَذَا الزَّمَانُ يُسْتَعْمَلُ اِسْتِعْمَالَ الْحِيْنِ، يُقَالُ مَا رَاَيْتُكَ مُنْذُ حِيْنٍ وَمُنْذُ زَمَانٍ بِمَعْنًى وَهٰذَا اِذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ، اَمَّا اِذَا نَوٰى شَيْئًا فَهُوَ عَلٰى مَا نَوٰى لِاَنَّهُ نَوٰى حَقِيْقَةَ كَلَامِهِ

অনুবাদ : অনুচ্ছেদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কেউ যদি আরবি ভাষায় বলে لَا اُكَلِّمُهُ حِيْنًا اَوْ زَمَانًا اَوِ الْحِيْنَ اَوِ الزَّمَانَ আমি তার সাথে বিশেষ এক কাল পর্যন্ত বা বিশেষ একটি সময় পর্যন্ত কথা বলব না। তাহলে এ কসমের মেয়াদ হবে ছয় মাস। কেননা বিশেষ সময় দ্বারা কখনো সামান্য সময় উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। আবার কখানো চল্লিশ বছর উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- । هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ অবশ্যই মানব জাতির উপর একটি নির্দিষ্ট সময় (৪০ বৎসর) অতিবাহিত হয়েছে। আবার কখনো ছয়মাস উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- تُؤْتِيْ اُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍ প্রতি মৌসুমে (৬ মাসে) ফল দান করে থাকে। আর এটা হলো মধ্যবর্তী সময়, অতএব, কসমকারীর আলোচ্য বাক্যটি এ অর্থের দিকে অভিমুখী হবে। এর কারণ এই যে, কসমের মাধ্যমে স্বল্প সময়ের জন্য বিরত থাকা উদ্দেশ্য হয় না। কেননা স্বল্প সময় বিরত থাকা সচরাচর হয়েই থাকে। আর বিশেষ সময় বলে সাধারণত চিরকালও উদ্দেশ্য হয় না। কেননা এটা সর্বদার স্থলবর্তী আর যদি বিশেষ সময় বলা থেকে বিরত থাকত, তাহলে কসমটি নিজে নিজেই চিরকালের জন্য হয়ে যেত। অতএব, আমরা যে সময় উল্লেখ করেছি, তাই নির্ধারিত হলো। তদ্রূপ কাল শব্দটি সময় এর স্থলে একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। বলা হয়ে থাকে তোমাকে বিশেষ সময় যাবৎ দেখিনি বা বিশেষ কাল যাবৎ দেখিনি উভয়টির মর্ম একই।

আর ছয় মাসের সিদ্ধান্ত তখনই হবে, যখন তার কোনো নিয়ত না থাকে, যদি কোনো সময়ের নিয়ত করে থাকে তাহলে যা নিয়ত করেছে, তাই ধর্তব্য হবে। কেননা সে তার কথার প্রকৃত অর্থই গ্রহণ করেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

এটি কোনো নতুন অধ্যায় নয়। বরং চলিত অধ্যায়ের অন্তর্গত একটি অনুচ্ছেদ। তাই লেখক فصل শব্দ ব্যবহার করেছেন, باب শব্দ নয়।

কেউ যদি বলে لَا اُكَلِّمُهُ حِينًا اَوْ زَمَانًا اَوِ الْحِينَ اَوِ الزَّمَانَ তাহলে এর কি হুকুম এটি জানার পূর্বে মনে রাখতে হবে যে, حين শব্দটি তিনটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। ১. ক্ষণিকের অর্থে যেমন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- فَسُبْحَانَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ সকাল-সন্ধ্যায় তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা কর। ২. ৪০ বৎসর অর্থে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ অবশ্যই মানুষের উপর একটি নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত

https://e-ilm.weebly.com/

হয়েছে। মুফাসসিরগণ বলেছেন, এ নির্দিষ্ট সময় ছিল ৪০ বৎসর কাল। ৩. ছয় মাসের অর্থে যেমন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍ ছয় মাসে একবার ফল দেয়।

অতএব, কেউ যখন حين (نكرة) বা الحين (معرفة) শব্দ ব্যবহার করে কথা না বলার কসম করে, তখন তা ছয় মাসের অর্থে গ্রহণ করা হবে। যেহেতু তিনটি অর্থের মাঝে এটি মধ্যবর্তী। আর মধ্যবর্তী জিনিসই উত্তম হয়। তাছাড়া আরেকটি কারণ হলো, প্রথম অর্থে কসমটি প্রয়োগ করা যায় না; কারণ অল্প সময় কথাবার্তা হতে স্বাভাবিক ভাবেই মানুষ বিরত থাকতে পারে, এর জন্য কসমের প্রয়োজন হয় না। আর ৪০ বৎসর অর্থেও গ্রহণ করা যায় না। কারণ ৪০ বৎসর এক দীর্ঘ সময় যা চিরদিনের পর্যায়ভুক্ত। বাকি থাকল ছয় মাস, তাই এ অর্থেই কসমটি গৃহীত হবে। زمان ও الزمان শব্দও উপরিউক্ত হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। কারণ حين ও زمان শব্দ দুটির ব্যবহার একই রকম।

আলোচ্য মাসআলায় ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) -এর মত হানাফীগণের অনুরূপ। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন, لَا يُكَلِّمُ حِيْنًا জাতীয় কসমসমূহ সর্বনিম্ন পরিমাণ সময়ের অর্থে প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ এক মুহূর্ত কথা না বললেই সে কসম হতে মুক্ত হয়ে যাবে। কারণ حين শব্দের এ অর্থটি নিশ্চিত, অন্য অর্থ দুটি সম্ভাব্য। অতএব, সম্ভাব্য ছেড়ে নিশ্চিতকেই গ্রহণ করা হবে। ইমাম মালেক (র.) বলেছেন, এক বৎসর অর্থে প্রযোজ্য হবে। কারণ এক বৎসর হলো মধ্যবর্তী অর্থ। তার মতে تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍ এ আয়াতে حين শব্দটি বৎসর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

এসব মতামত কেবল তখনই প্রযোজ্য, যখন ব্যক্তির কোনো নিয়ত বা উদ্দেশ্য না থাকে। আর যদি নির্দিষ্ট কোনো অর্থ বুঝানো ব্যক্তির উদ্দেশ্য হয়, তাহলে তার উদ্দিষ্ট অর্থই গ্রহণযোগ্য হবে।

ফায়দা : حين ও زمان শব্দ ال যুক্ত হয়ে বা ال মুক্ত হয়ে যেভাবেই ব্যবহার হোক, উভয়ের অর্থ এক دهر শব্দ এর বিপরীত। কারণ دهر শব্দ ال ছাড়া ব্যবহার হলে সাধারণভাবে সময়ের অর্থে গ্রহণ করা হয়। আর ال যোগ করে الدهر বলা হলে চিরকাল উদ্দেশ্য হয়। তাই دهري 'দাহরী' ঐ ব্যক্তি কে বলা হয়, যে কালের প্রবক্তা হয় এবং আল্লাহকে অস্বীকার করে অথচ কালের মধ্যে যত কিছু আছে সব কিছুরই স্রষ্টা মহান আল্লাহ তা'আলাই। হাদীসে এসেছে, তোমরা কালকে গালমন্দ করো না। কেননা কাল তো আমিই অর্থাৎ কালের স্রষ্টাও আমিই। এবং কাল নিজে কিছুই করতে পারে না। অতএব, কেউ যদি دهر শব্দে কসম করে, তাহলে তার উদ্দেশ্য জানতে হবে। সে যে অর্থ উদ্দেশ্য করেছে সে অর্থই গ্রহণযোগ্য হবে। যদি কোনো অর্থই তার উদ্দেশ্য না হয়, তাহলে এর অর্থ জানা সম্ভব হবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

وَكَذٰلِكَ الدَّهْرُ عِنْدَهُمَا . وَقَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ : اَلدَّهْرُ لَا اَدْرِيْ مَا هُوَ وَهٰذَا الْاِخْتِلَافُ فِي الْمُنَكَّرِ هُوَ الصَّحِيْحُ، اَمَّا الْمُعَرَّفُ بِالْاَلِفِ وَاللَّامِ يُرَادُ بِهِ الْاَبَدُ عُرْفًا . لَهُمَا اَنَّ دَهْرًا يُسْتَعْمَلُ اسْتِعْمَالَ الْحِيْنِ وَالزَّمَانِ يُقَالُ مَا رَاَيْتُكَ مُنْذُ حِيْنٍ وَمُنْذُ دَهْرٍ بِمَعْنًى وَاَبُوْ حَنِيْفَةَ تَوَقَّفَ فِيْ تَقْدِيْرِهِ لِاَنَّ اللُّغَاتِ لَا تُدْرَكُ قِيَاسًا وَالْعُرْفُ لَمْ يُعْرَفْ اسْتِمْرَارُهُ لِاخْتِلَافٍ فِي الِاسْتِعْمَالِ وَلَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُهُ اَيَّامًا فَهُوَ عَلٰى ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ لِاَنَّهُ اسْمُ جَمْعٍ ذُكِرَ مُنَكَّرًا فَيُتَنَاوَلُ اَقَلَّ الْجَمْعِ وَهُوَ الثَّلَاثُ . وَلَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُهُ الْاَيَّامَ فَهُوَ عَلٰى عَشَرَةِ اَيَّامٍ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ، وَقَالَا : عَلٰى اَيَّامِ الْاُسْبُوْعِ . وَلَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُهُ الشُّهُوْرَ فَهُوَ عَلٰى عَشَرَةِ اَشْهُرٍ عِنْدَهُ. وَعِنْدَهُمَا عَلٰى اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا لِاَنَّ اللَّامَ لِلْمَعْهُوْدِ وَهُوَ مَا ذَكَرْنَا، لِاَنَّهُ يَدُوْرُ عَلَيْهَا. وَلَهُ اَنَّهُ جَمْعٌ مُعَرَّفٌ فَيَنْصَرِفُ اِلٰى اَقْصٰى مَا يُذْكَرُ بِلَفْظِ الْجَمْعِ وَذٰلِكَ عَشَرَةٌ وَكَذَا الْجَوَابُ عِنْدَهُ فِي الْجُمَعِ وَالسِّنِيْنَ وَعِنْدَهُمَا يَنْصَرِفُ اِلَى الْعُمُرِ لِاَنَّهُ لَا مَعْهُوْدَ دُوْنَهُ

অনুবাদ : সাহেবাইনের মতে الدهر (কাল) শব্দ দ্বারাও ছয়মাস উদ্দেশ্য হবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, আমি জানি না الدهر -এর কী অর্থ? এ মত পার্থক্য نكره (অনির্দিষ্টতা) জ্ঞাপক শব্দের ক্ষেত্রে। এটাই বিশুদ্ধ মত। ال যুক্ত হলে প্রচলিত অর্থে এর দ্বারা স্থায়ী কাল বুঝানো হয়। সাহেবাইনের দলিল এই যে, دهر শব্দটি حين বা زمان শব্দের সমার্থকরূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন বলা হয়– আমি তোমাকে এককাল ও এক সময় থেকে দেখিনি। এ কথা দুটি সমার্থক। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র.) শব্দটির অর্থ নির্ধারণে মত প্রকাশ করা থেকে বিরত রয়েছেন। কেননা কিয়াস দ্বারা শব্দের অর্থ নির্ধারণ করা যায় না। আর ব্যবহারগত পার্থক্যের কারণে প্রচলনের অব্যাহততাও জানা যায়নি।

কেউ যদি কসম করে বলে সে তার সাথে কয়েকদিন কথা বলবে না, তাহলে তিন দিন উদ্দেশ্য হবে। কেননা বহুবচনের শব্দ نكره বা অনির্দিষ্টরূপে ব্যবহার করা হয়েছে। সুতরাং তা বহুবচনের সর্বনিম্ন পরিমাণকে অন্তর্ভুক্ত করবে। আর তা হলো তিন দিন।

যদি কসম করে বলে لَا يُكَلِّمُهُ الْاَيَّامَ অর্থাৎ সে তার সাথে কয়েক দিন কথা বলবে না। তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে দশ দিন উদ্দেশ্য হবে। আর সাহেবাইনের মতে এক সপ্তাহ উদ্দেশ্য হবে। আর যদি কসম করে বলে لَا يُكَلِّمُهُ الشُّهُوْرَ সে তার সাথে বহুমাস কথা বলবে না, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে দশ মাস উদ্দেশ্য হবে। আর সাহেবাইনের মতে বারো মাস উদ্দেশ্য হবে। কেননা দিন যেহেতু সপ্তাহে এবং মাস বছরে আবর্তিত হয়, সে যেহেতু নির্দিষ্টতা জ্ঞাপক ال দ্বারা যা উদ্দেশ্য হবে আমরা তাই উল্লেখ করেছি।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর দলিল এই যে, এটা হলো নির্দিষ্ট জ্ঞাপক বহুবচন। সুতরাং বহুবচন দ্বারা যে সংখ্যা বুঝানো হয় তার সর্বোচ্চ পরিমাণ উদ্দেশ্য হবে। আর তা হলো দশ দিন।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে الجمع (বহু সপ্তাহ) ও السنين (বহু বৎসর) উল্লেখের একই হুকুম। আর সাহেবাইনের মতে সারা জীবন বুঝানো হবে। কেননা এর নিচে শব্দদ্বয়ের কোনো নির্ধারিত সীমা নেই।

https://e-ilm.weebly.com/

وَمَنْ قَالَ لِعَبْدِهِ اِنْ خَدَمْتَنِيْ اَيَّامًا كَثِيْرَةً فَاَنْتَ حُرٌّ فَالْاَيَّامُ الْكَثِيْرَةُ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ عَشَرَةُ اَيَّامٍ لِاَنَّهُ اَكْثَرُ مَا يَتَنَاوَلُهُ اسْمُ الْاَيَّامِ، وَقَالَا : سَبْعَةُ اَيَّامٍ لِاَنَّ مَا زَادَ عَلَيْهَا تَكْرَارٌ . وَقِيْلَ لَوْ كَانَ الْيَمِيْنُ بِالْفَارِسِيَّةِ يَنْصَرِفُ اِلٰى سَبْعَةِ اَيَّامٍ لِاَنَّهُ يُذْكَرُ فِيْهَا بِلَفْظِ الْفَرْدِ دُوْنَ الْجَمْعِ .

অনুবাদ : কেউ যদি তার গোলামকে বলে তুমি যদি অনেক দিন আমার খেদমত কর তাহলে তুমি আজাদ। তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে অনেক দিন দ্বারা দশ দিন উদ্দেশ্য হবে। কেননা এটা হচ্ছে ايام অনেক দিনের সর্বোচ্চ সংখ্যা! আর সাহেবাইন (র.) বলেন, সাত দিন উদ্দেশ্য হবে। কেননা এর অতিরিক্ত দিনের মধ্যে পুনরাবৃত্তি রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, যদি কথাটি ফার্সি ভাষায় হয়, তাহলে সাত দিন-ই উদ্দেশ্য হবে। কেননা সেখানে দিন শব্দটি বহুবচনের পরিবর্তে একবচনরূপে ব্যবহার হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কেউ যদি কসম করে আরবিতে বলে لَا اُكَلِّمُهُ دَهْرًا। আমি তার সাথে কালব্যাপী কথা বলব না। তাহলে সাহেবাইন তথা ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে حِيْن ও زمان শব্দের মতো دهر শব্দ দ্বারাও ছয় মাসের কসম হবে। শব্দটি نكره বা معرفة যেভাবেই ব্যবহৃত হোক না কেন।

دهر শব্দ نكره রূপে ব্যবহার হওয়া অবস্থায় এর অর্থ সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফা (র.) নীরবতা অবলম্বন করতে বলেছেন- لَا أدرى مَاهُوَ؟ -এর কী অর্থ, আমি তা জানি না। তবে ال যোগে الدَّهْر ব্যবহার হলে এর অর্থ হবে চিরকাল, এটা সর্বসম্মত কথা।

دهر শব্দ نكره রূপে ব্যবহৃত হওয়া অবস্থায় ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও সাহেবাইনের মাঝে মতপার্থক্য হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সাহেবাইনের দলিল হলো এই যে, دهر শব্দটি حين এবং زمان শব্দের মতোই। কেননা আরবিগণ বলে থাকেন مَا رَأَيْتُكَ مُنْذُ دَهْرٍ - مَا رَأَيْتُكَ مُنْذُ حِيْنٍ যেহেতু আরবিদের কাছে দুই বাক্যের ব্যবহারে কোনো পার্থক্য নেই, তাই দুই বাক্যের অর্থও অবশ্যই এক হবে। এ কারণেই সাহেবাইন (র.) বলেছেন, যদি কেউ কসম করে বলে اَنْ صُمْتُ دَهْرًا। এবং নির্দিষ্ট কোনো অর্থ তার উদ্দেশ্য না হয় তাহলে ছয় মাস পর্যন্ত রোজা রাখতে হবে। কিছুদিন রোজা রেখে শেষ করে দিলে সে শপথ ভঙ্গকারী হয়ে যাবে। তবে সে যদি নির্দিষ্ট কোনো অর্থ উদ্দেশ্য করে থাকে তাহলে তার উদ্দিষ্ট অর্থ গ্রহণযোগ্য হবে। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, دهر শব্দ نكره রূপে ব্যবহৃত হলে নীরব থাকা উচিত। কেননা ইসম বা শব্দের আভিধানিক পরিমাণ বর্ণনার উপর নির্ভর করে থাকে। আর যেহেতু এক্ষেত্রে কুরআন হাদীস হতে কোনো নস বর্ণিত নেই, এবং ভাষাবিদগণও কোনো ব্যাখ্যা বর্ণনা করেননি, তাই دهر (نكره) -এর দ্বারা কী উদ্দেশ্য এটা জানার কোনো পন্থা নেই। অতএব, নীরব থাকাই আবশ্যক।

دهر অর্থ সাধারণভাবে সময়। دَهْرِى 'দাহরী' যুগবাদী ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়, যে ব্যক্তি আল্লাহকে অস্বীকার করে এবং কালের প্রবক্তা হয়। কালের মধ্যে যত কিছু রয়েছে সব কিছুর স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলাই। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন- اِنَّ الدَّهْرَ هُوَ اللّٰهُ تَعَالٰى নিশ্চয় কালের স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা। আরো ইরশাদ হয়েছে-

لَا تَسُبُّوا الدَّهْرَ فَاِنَّ الدَّهْرَ هُوَ اللّٰهُ تَعَالٰى অর্থাৎ তোমরা কালকে গালমন্দ করো না। কেননা কালের নিয়ন্তা আল্লাহ তা'আলাই। হাদীস দুটির মর্ম হলো, কাল নিজে কিছু নয়, সে নিজে কিছু করতে পারে না। বরং কাল আল্লাহর সৃষ্ট বিষয় এবং আল্লাহ তা'আলাই এর নিয়ন্তা। অতএব, তোমরা কালের অভিযোগ করো না, কালকে গালমন্দ করো না। অতএব, কসমকারী ব্যক্তি যখন دهر শব্দ نكره রূপে ব্যবহার করে তখন এর দ্বারা কি পরিমাণ সময় উদ্দেশ্য হবে তা জানা নেই। পরিমাণের বিবেচনায় সময়কে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। ১. অতি অল্প সময়। ২. মধ্যম পরিমাণ সময়। ৩. দীর্ঘ সময় বা অনন্ত কাল। হ্যাঁ-বোধক বাক্যে دهر শব্দ نكره রূপে ব্যবহৃত হলে উপরিউক্ত তিন প্রকার সময়ের কোন প্রকার উদ্দেশ্য হবে- তা অজানা। অতএব, এ বিষয়ে নীরব থাকাটা সর্বাধিক উত্তম।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রকাশ থাকে যে, হেদায়ার মতন هُوَ الصَّحِيْحُ বলে বর্ণিত রেওয়ায়েতের পরিপন্থি অন্য একটি রেওয়ায়েতের অশুদ্ধতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। সে রেওয়ায়েতটি হলো এই যে, বিশর ইবনে ওয়ালীদ ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম আবূ হানীফার (র.) -এর মতে دهر শব্দ نَكِرَه ও مَعْرِفَه রূপে ব্যবহার হওয়ার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই এটা শুদ্ধ নয়। বরং বিশুদ্ধ বর্ণনা হলো এই যে, دهر শব্দ ال যোগে ব্যবহৃত হলে সকলের মতে এর অর্থ হলো সর্বদা বা সার্বক্ষণিকতা, অনন্ততা। কিন্তু نَكِرَه রূপে ব্যবহৃত হলে, এর কি অর্থ হবে এ বিষয়ে ইমাম আবূ হানীফা (র.) নীরব থেকেছেন। এ মতানুসারে মাসআলার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ পূর্বে গত হয়েছে।

وَلَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُهُ أَيَّامًا الخ : ايام . شهور . سنين এ শব্দগুলো দুভাবে ব্যবহার হতে পারে। ১. نكره রূপে, ২. معره রূপে, বা ال যোগে। যদি نكره রূপে ব্যবহার হয়, তাহলে এটা যেহেতু অনির্দিষ্ট অর্থ জ্ঞাপক বহুবচন শব্দ তাই সে বহুবচনের সর্বনিম্ন পরিমাণই বুঝাবে। আর তাহলো তিন সংখ্যা। অতএব, কেউ যদি কসম করে বলে لَا يُكَلِّمُ اَيَّامًا তাহলে তিন দিনের জন্য কসম হবে। যদি বলে لَا يُكَلِّمُ شُهُوْرًا তাহলে তিন মাসের জন্য কসম হবে। যদি বলে لَا يُكَلِّمُ سِنِيْنَ তাহলে তিন বৎসরের জন্য কসম হবে। আর যদি ايام . شهور ইত্যাদি শব্দ معرفه রূপে তথা ال যোগে ব্যবহৃত হয়। তাহলে কি অর্থ হবে এ নিয়ে মতভেদ হয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে الايام দ্বারা দশ দিন, الشهور দ্বারা দশ মাস ও السنين দ্বারা দশ বৎসর উদ্দেশ্য হবে। সাহেবাইনের মতে الايام দ্বারা এক সপ্তাহ, الشهور দ্বারা বারো মাস বা এক বৎসর السنين দ্বারা সারা জীবন উদ্দেশ্য হবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর দলিল হলো اَلْاَيَّامُ . اَلشُّهُوْرُ . اَلسِّنِيْنُ শব্দ গুলো جمع এবং معرفه; অতএব, এগুলো দ্বারা উদ্দেশ্য সেই সর্বোচ্চ সংখ্যা, যা বহুবচনের শব্দ দ্বারা বুঝানো যেতে পারে। আমরা দেখতে পাই যে, আরবগণ ايام শব্দ দ্বারা সর্বোচ্চ দশ দিন বুঝিয়ে থাকেন। কেননা তারা এরূপ বলেন যে, ثَلَاثَةُ اَيَّامٍ (তিন দিন), خَمْسَةُ اَيَّامٍ (পাঁচ দিন) عَشْرَةُ اَيَّامٍ (দশ দিন)। এগার দিন হলে আর ايام বহুবচন ব্যবহার করেন না, তখন বলেন, اَحَدَ عَشَرَ يَوْمًا এগার দিন। شهر এবং سنه -এর ক্ষেত্রে একই কথা। অতএব اَلْاَيَّامُ . اَلشُّهُوْرُ . اَلسِّنِيْنُ ইত্যাদি বহুবচন مَعْرِفَه শব্দগুলো দ্বারা যথাক্রমে দশ দিন, দশ মাস ও দশ বৎসর উদ্দেশ্য হবে। যেহেতু দশই হলো এসব শব্দ দ্বারা বুঝানোর মতো সর্বোচ্চ সংখ্যা।

আর সাহেবাইনের দলিল হলো— শব্দগুলো যেহেতু معرفه তাই একটি নির্দিষ্ট প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ পরিমাণ উদ্দেশ্য হবে। আর দিনের ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ পরিমাণ হলো ৭দিন। কেননা ৭দিনে এক সপ্তাহ। মাসের ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ পরিমাণ হলো বারো মাস, যেহেতু বার মাসে এক বৎসর। অতএব, الايام দ্বারা উদ্দেশ্য হবে এক সপ্তাহ; الشهور দ্বারা উদ্দেশ্য হবে এক বৎসর। আর বৎসরের ক্ষেত্রে যেহেতু কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ প্রচলিত বা প্রসিদ্ধ নেই, তাই السنين দ্বারা উদ্দেশ্য হবে সারা জীবন।

وَكَذَا الْجَوَابُ عِنْدَ ... এ বাক্যে উল্লিখিত الجمع শব্দ الجمعة -এর বহুবচন। অর্থ হলো— সপ্তাহ। اَلْجُمَعُ শব্দের হুকুমও اَلْاَيَّامُ . اَلشُّهُوْرُ ইত্যাদির অনুরূপ। অর্থাৎ কেউ যদি কসম করে لَا يُكَلِّمُ الْجُمَعَ তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে দশ জুমা বা দশ সপ্তাহ উদ্দেশ্য হবে। সাহেবাইনের মতে সারা জীবন উদ্দেশ্য হবে।

وَمَنْ قَالَ لِعَبْدِهِ اِنْ خَدَمْتَنِي : কেউ যদি তার দাসকে সম্বোধন করে বলে– "اِنْ خَدَمْتَنِيْ اَيَّامًا كَثِيْرَةً فَاَنْتَ حُرٌّ" তুমি যদি অনেক দিন পর্যন্ত আমার খেদমত কর, তাহলে তুমি আজাদ। তাহলে এ ক্ষেত্রে অনেক দিন দ্বারা কি উদ্দেশ্য হবে এ ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর বক্তব্য হলো, দশ দিন উদ্দেশ্য হবে। কারণ দশ দিন হলো এমন সর্বোচ্চ সংখ্যা, যা ايام শব্দ দ্বারা বুঝানো যায়। সাহেবাইনের বক্তব্য হলো ৭ দিন। কারণ দিনের সর্বোচ্চ পরিমাণ হলো ৭দিন। এর উপরের সংখ্যার দিনগুলো মূলত পুনরাবৃত্তি হয়ে থাকে। অর্থাৎ তাদের মতে দিন উর্ধ্বে ৭ম পর্যন্ত হতে পারে। ৮ম দিনটি মূলত নতুন কিছু নয়, বরং ৮ম দিনটি ১ম দিনের পুনরাবৃত্তি। অতএব, ايام দ্বারা সর্বোচ্চ পরিমাণ ৬ দিনই উদ্দেশ্য হবে উপরিউক্ত কথাটি যদি ফার্সিতে, উর্দূতে কিংবা বাংলায় বলা হয় এভাবে যে তুমি যদি অনেক দিন আমার খেদমত কর তাহলে তুমি আজাদ। তাহলে এর দ্বারা ৭দিন বা এক সপ্তাহই উদ্দেশ্য হবে। দশ দিন নয়। কারণ এসব ভাষায় দিন শব্দটি একবচন ব্যবহার হয়ে থাকে। আরবির মতো বহুবচন ব্যবহার হয় না।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ الْيَمِيْنِ فِىْ الْعِتْقِ وَالطَّلَاقِ

وَمَنْ قَالَ لِامْرَاتِه اِذَا وَلَدْتِ وَلَدًا فَاَنْتِ طَالِقٌ فَوَلَدَتْ وَلَدًا مَيِّتًا طَلَقَتْ، وَكَذٰلِكَ اِذَا قَالَ لِاَمَتِه اِذَا وَلَدْتِ وَلَدًا فَاَنْتِ حُرَّةٌ لِاَنَّ الْمَوْجُوْدَ مَوْلُوْدٌ فَيَكُوْنُ وَلَدًا حَقِيْقَةً وَيُسَمّٰى بِه فِي الْعُرْفِ، وَيُعْتَبَرُ وَلَدًا فِي الشَّرْعِ حَتّٰى تَنْقَضِيَ بِهِ الْعِدَّةُ، وَالدَّمُ بَعْدَهٗ نِفَاسٌ وَاُمُّهٗ اُمُّ وَلَدٍ لَهٗ فَتَحَقَّقَ الشَّرْطُ وَهُوَ وِلَادَةُ الْوَلَدِ وَلَوْ قَالَ اِذَا وَلَدْتِ وَلَدًا فَهُوَ حُرٌّ فَوَلَدَتْ وَلَدًا مَيِّتًا ثُمَّ اٰخَرَ حَيًّا عَتَقَ الْحَيُّ وَحْدَهٗ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ، وَقَالَا : لَا يُعْتَقُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا لِاَنَّ الشَّرْطَ قَدْ تَحَقَّقَ بِوِلَادَةِ الْمَيِّتِ عَلٰى مَا بَيَّنَّا فَتَنْحَلُّ الْيَمِيْنُ لَا اِلٰى جَزَاءٍ لِاَنَّ الْمَيِّتَ لَيْسَ بِمَحَلٍّ لِلْحُرِّيَّةِ وَهِيَ الْجَزَاءُ . وَلِاَبِيْ حَنِيْفَةَ اَنَّ مُطْلَقَ اِسْمِ الْوَلَدِ مُقَيَّدٌ بِوَصْفِ الْحَيَاةِ لِاَنَّهٗ قَصَدَ اِثْبَاتَ الْحُرِّيَّةِ جَزَاءً وَهِيَ قُوَّةٌ حُكْمِيَّةٌ تَظْهَرُ فِيْ دَفْعِ تَسَلُّطِ الْغَيْرِ وَلَا تَثْبُتُ فِي الْمَيِّتِ فَيَتَقَيَّدُ بِوَصْفِ الْحَيَاةِ فَصَارَ كَمَا اِذَا قَالَ اِذَا وَلَدْتِ وَلَدًا حَيًّا، بِخِلَافِ جَزَاءِ الطَّلَاقِ وَحُرِّيَّةِ الْاُمِّ لِاَنَّهٗ لَا يَصْلُحُ مُقَيِّدًا

পরিচ্ছেদ : মুক্তি দান ও তালাক সম্পর্কিত কসম

অনুবাদ : কেউ যদি নিজ স্ত্রীকে বলে তুমি যদি সন্তান প্রসব কর তাহলে তুমি তালাক। অতঃপর সে একটি মৃত সন্তান প্রসব করল। তাহলে সে তালাক হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে যদি নিজ দাসীকে বলে যদি তুমি সন্তান প্রসব কর তাহলে তুমি আজাদ। কেননা যে শিশুর জন্ম হয়েছে সে প্রকৃত অর্থেই সন্তান এবং জনসাধারণেও তাকে সন্তান বলা হয়। আর শরিয়তও এটাকে সন্তান বলে বিবেচনা করে। এ কারণেই এর দ্বারা ইদ্দত সম্পন্ন হয়। এবং প্রসবোত্তর নির্গত রক্ত নেফাস বলে গণ্য হয়। আর ঐ সন্তানের মাতাকে মনিবের উম্মে ওয়ালাদ বলে বিবেচনা করা হয়। সুতরাং (মৃত সন্তান জন্ম দানের) মাধ্যমে শর্ত বাস্তবায়িত হবে। আর তা হলো সন্তান প্রসব করা।

যদি বলে যে, যখন তুমি কোনো সন্তান প্রসব করবে, তখন ঐ সন্তান আজাদ। অতঃপর (প্রথমে) একাধিক মৃত সন্তান প্রসব করল এবং পরবর্তীতে একটি জীবিত সন্তান প্রসব করল, এমতাবস্থায় ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে শুধু জীবিত সন্তানটি আজাদ হবে। আর সাহেবাইনের মতে দুটি সন্তানের কোনটিই আযাদ হবে না। কেননা মৃত সন্তান প্রসবের মাধ্যমে শর্ত পূর্ণ হয়েছে। সুতরাং ফলাফল ছাড়াই কসম শেষ হয়ে যাবে। কেননা মৃত সন্তান আজাদ হওয়ার পাত্র নয়। আর তাই ছিল কসমের ফলাফল।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল এই যে, এখানে সাধারণভাবে ব্যবহৃত সন্তান শব্দটি প্রাণ গুণের সাথে বিশিষ্ট। কেননা এখানে কসমের ফলাফল রূপে মুক্তি সাব্যস্ত করার ইচ্ছা করেছে। আর এটা (মুক্তি) হলো একটি বিধানগত শক্তি। যা অন্যের হস্তক্ষেপ রোধ করার ক্ষেত্রে প্রকাশ পায়। আর এ গুণ মৃতের মাঝে সাব্যস্ত হতে পারে না। সুতরাং তা প্রাণ গুণের সাথে বিশিষ্ট। তাই বিষয়টি এমনই হলো যেন সে বলল 'যদি তুমি জীবিত সন্তান প্রসব কর।' পক্ষান্তরে তালাক ও মাতার মুক্তির ফলাফলের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা যেহেতু এই ফলাফলটি সন্তানের জীবিত হওয়া না হওয়ার সাথে সম্পৃক্ত নয়। সেহেতু তা জীবিত থাকার গুণের শর্ত আরোপকারী হওয়ার যোগ্য নয়।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, তোমার যদি একটি সন্তান হয়, তাহলে তুমি তালাক। অথবা কোনো ব্যক্তি তার বাঁদীকে বলল, তোমার যদি একটি সন্তান হয়, তাহলে তুমি আজাদ। এমতাবস্থায় এদের জীবিত সন্তান হলে যে হুকুম, মৃত সন্তান হলেও সে একই হুকুম। আর তা হলো স্ত্রী তালাক হয়ে যাওয়া এবং বাঁদী আজাদ হয়ে যাওয়া।

জীবিত বাচ্চাকে সন্তান বা وَلَد বলা হয়, এতে কারো সন্দেহ নেই। তবে মৃত বাচ্চাকে وَلَد বলা যায় কি না এ ব্যাপারে কারো সন্দেহ হতে পারে। তাই মুসান্নিফ (র.) বলেন, মৃত বাচ্চাকে হাকীকত, শরিয়ত ও উরফ তিন বিচারেই وَلَد বলা যায়। হাকীকত বা প্রকৃতির বিচারে এটা সন্তান বা وَلَد হওয়া সুস্পষ্ট। উরফে তথা জনসাধারণেও একে সন্তানই বলা হয়। কারণ মানুষ এটাই বলে থাকে যে, অমুকের একটি মৃত বাচ্চা হয়েছে। আর শরিয়তেও মৃত বাচ্চা কে সন্তান বা وَلَد হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। কেননা মৃত বাচ্চাকে যদি وَلَد বলে গণ্য করা না হতো, তাহলে এটা প্রসব করার মাধ্যমে ইদ্দত শেষ হতো না। তেমনিভাবে মৃত বচ্চা প্রসবোত্তর রক্ত কে নেফাস হিসাবে গণ্য করা হয়। মৃত বাচ্চা প্রসবকারিণী বাঁদীকে মালিকের উম্মে ওয়ালাদ হিসাবে গণ্য করা হয়। মৃত বাচ্চা সন্তান বা وَلَد না হলে সে উম্মে ওয়ালাদ হতো না। বরং অন্যান্য বাঁদীদের মতোই সাধারণ বাঁদীই থেকে যেত।

মোটকথা, মৃত বাচ্চা প্রসব করার মাধ্যমেও যেহেতু সন্তান প্রসবের শর্ত বাস্তবায়িত হয়ে যায়। তাই জাযাও বাস্তবায়িত হবে। অর্থাৎ স্ত্রী তালাক হবে এবং বাঁদী আজাদ হয়ে যাবে।

وَلَوْ قَالَ إِذَا وَلَدْتِ وَلَدًا فَهُوَ : কোনো ব্যক্তি তার বাঁদীকে সম্বোধন করে বলল, তোমার যদি একটি সন্তান হয়, তাহলে সে আজাদ। এমতাবস্থায় বাঁদী একটি মৃত সন্তান, তারপর একটি জীবিত সন্তান প্রসব করল এ ক্ষেত্রে কি হুকুম এ নিয়ে ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও সাহেবাইনের মাঝে মতপার্থক্য হয়েছে। সাহেবাইনের মতে একটি সন্তানও আজাদ হবে না। বরং ইয়ামীনটি জাযা ব্যতীতই নিঃশেষ হয়ে যাবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে জীবিত সন্তানটি আজাদ হবে।

সাহেবাইনের দলিল হলো, ব্যক্তি বলেছিল তোমার যদি একটি সন্তান হয় তাহলে আজাদ। একটি সন্তান তার হয়ে গেছে মৃত সন্তান প্রসবের মাধ্যমে। অতএব মৃত সন্তানটিই আজাদ হওয়ার কথা। কিন্তু আজাদীর বিষয়টি যেহেতু কোনো মৃতের জন্য সাব্যস্ত হতে পারে না। তাই মৃত সন্তান আজাদ হবে না। আর এই মৃত সন্তান জন্মের মাধ্যমে যেহেতু ইয়ামীন শেষ হয়ে গেছে। তাই পরে আরেকটি জীবিত বাচ্চা জন্ম হলেও সে আজাদ হবে না। অতএব, তার ইয়ামীনটি নিষ্ফল ইয়ামীনে পরিণত হলো। ইয়ামীন নিষ্ফল হওয়ার আরেকটি দৃষ্টান্ত হলো, যেমন কেউ তার দাসকে লক্ষ্য করে বলল, তুমি যদি ঘরে প্রবেশ কর তাহলে তুমি আজাদ। অতঃপর সঙ্গে সঙ্গেই সে তাকে অন্যের কাছে বিক্রি করে দিল। তারপর দাস ঘরে প্রবেশ করল। এমতাবস্থায় ঘরে প্রবেশ তো হলো, কিন্তু সে আজাদ হলো না।

ইমাম আবূ হানীফার (র.) -এর দলিল হলো– إِذَا وَلَدْتِ وَلَدًا فَهُوَ حُرٌّ এ বাক্যে وَلَد শব্দটি আপনা থেকেই জীবিত হওয়ার শর্তে শর্তযুক্ত। অতএব, উপরিউক্ত কথাটি إِذَا وَلَدْتِ وَلَدًا فَهُوَ حُرٌّ -এর স্থলাভিষিক্ত। তাই মৃত বাচ্চা প্রসবের মাধ্যমে ইয়ামীন শেষ হবে না। বরং যখন জীবিত বাচ্চা প্রসব হবে তখনই ইয়ামীন কার্যকরী হয়ে সম্পন্ন হবে এবং বাচ্চা আজাদ হবে।

বাকি থাকল, وَلَد শব্দটি জীবিত হওয়ার শাথে শর্তযুক্ত হবে কেন? এ প্রশ্নের জবাব হলো এই যে, উপরিউক্ত বাক্যে সন্তান প্রসবের শর্তের সাথে যে জাযাটি যুক্ত করা হয়েছে সেটা হলো আজাদ হওয়া। আর আজাদ হওয়ার বিষয়টি শুধু মাত্র জীবিতের জন্যই হয়ে থাকে। মৃতের জন্য আজাদি হতে পারে না। এমতাবস্থায় সন্তান কে জীবিত হওয়ার শর্তে শর্তযুক্ত করা না হলে আকেল বালেগ ব্যক্তির কথা অহেতুক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে যা কাম্য নয়। তাই জীবিত হওয়ার শর্ত শর্তযুক্ত করা হয়েছে।

পূর্বে আলোচিত মাসআলাটি এ মাসআলার বিপরীত। কারণ সেখানে জাযাটি ছিল স্ত্রী তালাক হওয়া বা বাঁদী আজাদ হওয়া, এর জন্য সন্তান জীবিত হওয়া জরুরি নয়।

https://e-ilm.weebly.com/

وَإِذَا قَالَ أَوَّلُ عَبْدٍ اشْتَرِيْهِ فَهُوَ حُرٌّ فَاشْتَرَى عَبْدًا عَتَقَ لِأَنَّ الْأَوَّلَ اِسْمٌ لِفَرْدٍ سَابِقٍ فَإِنْ اشْتَرَى عَبْدَيْنِ مَعًا ثُمَّ أٰخَرَ لَمْ يُعْتَقْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ لِانْعِدَامِ التَّفَرُّدِ فِي الْأَوَّلَيْنِ وَالسَّبْقِ فِي الثَّالِثِ فَانْعَدَمَتْ الْأَوَّلِيَّةُ وَإِنْ قَالَ أَوَّلُ عَبْدٍ اشْتَرِيْهِ وَحْدَهُ فَهُوَ حُرٌّ عَتَقَ الثَّالِثُ لِأَنَّهُ يُرَادُ بِهِ التَّفَرُّدُ فِي حَالَةِ الشِّرَاءِ لِأَنَّ وَحْدَهُ لِلْحَالِ لُغَةً وَالثَّالِثُ سَابِقٌ فِي هٰذَا الْوَصْفِ وَإِنْ قَالَ أٰخِرُ عَبْدٍ اشْتَرِيْهِ فَهُوَ حُرٌّ فَاشْتَرَى عَبْدًا ثُمَّ مَاتَ لَمْ يُعْتَقْ لِأَنَّ الْأٰخِرَ اِسْمٌ لِفَرْدٍ لَاحِقٍ وَلَا سَابِقَ لَهُ فَلَا يَكُوْنُ لَاحِقًا وَلَوْ اشْتَرَى عَبْدًا ثُمَّ عَبْدًا ثُمَّ مَاتَ عَتَقَ الْأٰخِرُ لِأَنَّهُ فَرْدٌ لَاحِقٌ فَاتَّصَفَ بِالْأٰخِرِيَّةِ وَيُعْتَقُ يَوْمَ اِشْتَرَاهُ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ حَتّٰى يُعْتَبَرَ مِنْ جَمِيْعِ الْمَالِ. وَقَالَا : يُعْتَقُ يَوْمَ مَاتَ حَتّٰى يُعْتَبَرَ مِنَ الثُّلُثِ لِأَنَّ الْأٰخِرِيَّةَ لَا تَثْبُتُ إِلَّا بِعَدَمِ شِرَاءِ غَيْرِهِ بَعْدَهُ وَذٰلِكَ يَتَحَقَّقُ بِالْمَوْتِ فَكَانَ الشَّرْطُ مُتَحَقِّقًا عِنْدَ الْمَوْتِ فَيُقْتَصَرُ عَلَيْهِ . وَلِأَبِيْ حَنِيْفَةَ أَنَّ الْمَوْتَ مُعَرِّفٌ فَأَمَّا اتِّصَافُهُ بِالْأٰخِرِيَّةِ فَمِنْ وَقْتِ الشِّرَاءِ فَيَثْبُتُ مُسْتَنِدًا

অনুবাদ : আর যদি বলে প্রথম যে গোলামটি আমি খারিদ করব, সে আজাদ। অতঃপর সে একটি গোলাম ক্রয় করল। তখন উক্ত গোলাম আজাদ হয়ে যাবে। কেননা প্রথম শব্দের অর্থ হলো একটি পূর্ববর্তী বস্তু যাতে অন্য বস্তু অংশীদার নয়। **যদি একসাথে দুটি গোলাম খরিদ করে অতঃপর অন্য একটি গোলাম খরিদ করে তাহলে তাদের একটিও আজাদ হবে না।** কেননা প্রথম দুটিতে একত্ব নেই। আর তৃতীয়টিতে পূর্ববর্তীতা নেই। অতএব, প্রথম হওয়ার শর্ত বিলুপ্ত হয়েছে।

আর যদি বলে, প্রথম যে গোলামটি এককভাবে খরিদ করব সে আজাদ। তাহলে তৃতীয় গোলামটি আজাদ হয়ে যাবে। কেননা এর অর্থ হলো, ক্রয়ের অবস্থার এককত্ব। কারণ وحدة শব্দটি আভিধানিকভাবে অবস্থার অর্থে ব্যবহার হয়। আর তৃতীয় গোলামটি এ গুণের ক্ষেত্রে অগ্রবর্তী।

আর যদি বলে, শেষ যে গোলামটি খরিদ করব, সে আজাদ। অতঃপর সে একটি গোলাম খরিদ করল এবং মনিব মারা গেল, তাহলে গোলামটি আজাদ হবে না। কেননা শেষ বলা হয় ঐ বস্তুকে যা কোনো বিষয়ে পরবর্তী হয়। অথচ এখানে ক্রয়ের ক্ষেত্রে গোলামটির কোনো পূর্ববর্তী নেই। সুতরাং সে পরবর্তী হবে না। **আর যদি একটি গোলাম খরিদ করার পর আরেকটি খরিদ করে, অতঃপর মারা যায়, তাহলে শেষেরটি আজাদ হবে।** কেননা এটি হচ্ছে ক্রয়ের ক্ষেত্রে পরবর্তী। সুতরাং সে শেষত্ব গুণ সম্পন্ন হয়েছে। **আর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে ক্রয়ের দিন আজাদ হবে। ফলে সমগ্র মাল হতে তার মুক্তি বিবেচিত হবে। সাহেবাইন বলেন, মনিবের মৃত্যুর দিন আজাদ হবে।** ফলে এক তৃতীয়াংশ মাল হতে মুক্তি বিবেচিত হবে। কেননা গোলামটির মাঝে শেষত্ব সাব্যস্ত হবে না তারপরে অন্য গোলাম ক্রয় না করা পর্যন্ত। আর সেটা মৃত্যুর পরই সাব্যস্ত হবে। সুতরাং শর্তটি মৃত্যুর সময় সম্পন্ন হবে এবং মৃত্যু কালের সাথে মুক্তির বিষয়টি সীমাবদ্ধ হবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল এই যে, মৃত্যু হচ্ছে সর্বশেষত্বের পরিচায়ক। আর গোলামের সর্বশেষত্ব গুণ বিশিষ্ট হওয়ার বিষয়টি সম্পৃক্ততার ভিত্তিতে ক্রয়ের সময় কাল হতেই সাব্যস্ত হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কেউ বলল, আমি সর্বপ্রথম যে দাসটি খরিদ করব, যে আজাদ। অতঃপর সে একটি দাস খরিদ করল, তাহলে এ ক্রয়কৃত দাসটি আজাদ হয়ে যাবে। কারণ ব্যক্তি আজাদ হওয়ার বিষয়টিকে দুইশর্তে শর্তযুক্ত করেছিল। ১. প্রথম হওয়া, ২. একটি হওয়া। একটি দাস খরিদ করা অবস্থায় শর্ত দুটোই পাওয়া গেছে তাই দাস আজাদ হয়ে যাবে।

যদি পূর্বোক্ত কথা বলার পর ব্যক্তি এক সাথে দুটি দাস খরিদ করে অতঃপর তৃতীয় আরেকটি দাস খরিদ করে তাহলে কোনোটি আজাদ হবে না। কারণ একসাথে খরিদ করা দাস দুটির মধ্যে শর্তের একাংশ অনুপস্থিত, অর্থাৎ এক হওয়ার শর্ত পাওয়া যায়নি, যেহেতু তারা দুজন। আর তৃতীয় দাসের মধ্যে শর্তের অন্য অংশ অনুপস্থিত। অর্থাৎ প্রথম হওয়া। কারণ সে তো তৃতীয়।

কিন্তু ব্যক্তি যদি বলে, أَوَّلُ عَبْدٍ اِشْتَرِيْتُهُ وَحْدَهُ فَهُوَ حُرٌّ যে দাসটিকে আমি সর্বপ্রথম একাকী অবস্থায় কিনব সে আজাদ। তাহলে তৃতীয় দাসটি আজাদ হয়ে যাবে। কারণ وحده শব্দ দ্বারা বুঝানো হয়েছে, কেনার সময় যে দাস একা হবে সে আজাদ। এ শর্ত তৃতীয় দাসের মধ্যে বিদ্যমান। কারণ তাকে একাই কেনা হয়েছে। এবং সে হিসাবে সে প্রথমও তাই সে আজাদ হয়ে যাবে।

وَإِنْ قَالَ آخِرُ عَبْدٍ أَشْتَرِيهِ الخ : কোনো ব্যক্তি বলল, আমার সর্বশেষ যে দাসটি কিনব, সে আজাদ। অতঃপর সে একটি দাস কিনে মারা গেল, এমতাবস্থায় দাসটি আজাদ হবে না। কারণ শেষ এমন ব্যক্তিকে বলা হয়, যার পূর্বে আরেকজন থাকে। এখানে যেহেতু তার পূর্বে অন্য কোনো দাস কেনা হয়নি, তাই তাকে শেষ বলা যায় না। তাছাড়া সে হলো প্রথম, সে প্রথম সে কখানো শেষ হতে পারে না। কারণ প্রথম ও শেষ উভয়গুণে গুণান্বিত একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই পক্ষে সম্ভব ও বাস্তব هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ।

উপরিউক্ত কথা বলার পর যদি পরপর দুটি দাস কিনে ব্যক্তি মারা যায়, তাহলে দ্বিতীয় দাসটি আজাদ হবে। কারণ সেই হলো, সর্বশেষ ক্রয়কৃত দাস। যেহেতু তার পূর্বে আরেকটি দাস ক্রয় করা হয়েছিল, যে ছিল প্রথম। এ পর্যন্ত আলোচনায় কারো দ্বিমত নেই।

দ্বিমত হয়েছে এ ব্যাপারে যে, দাসটিকে কখন থেকে আজাদ মনে করা হবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, দাসটিকে যেদিন ক্রয় করা হয়েছিল সেদিন হতে আজাদ মনে করা হবে। ফলে মনিবের পূর্ণ সম্পদ হতেই সে আজাদ হবে। সাহেবাইন বলেন, মনিবের মৃত্যুর দিন হতে তথা মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত হতে তাকে আজাদ মনে করা হবে। এবং সম্পদের এক তৃতীয়াংশ দ্বারা সে আজাদ হবে।

সাহেবাইনের দলিল হলো- সর্বশেষ ক্রয়কৃত হওয়ার শর্তটি বাস্তবায়িত হয় তার পরে আর কোনো দাস ক্রয় না করার মাধ্যমে। আর এটা নিশ্চিত হয়েছে মনিবের মৃত্যুর মাধ্যমে। কেননা মনিবের মৃত্যু না হলে যে কোনো সময় আরেক দাস ক্রয় করার সম্ভাবনা ছিল।

অতএব, আজাদ মূল শর্তটি মৃত্যুর সময় হতেই পাওয়া গেছে। তাই সময় হতেই তাকে আজাদ মনে করা হবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, দাসটিকে যখন ক্রয় করা হয়েছে, তখন থেকেই সে সর্বশেষ হওয়ার গুণে গুণান্বিত। তবে সেটা আমাদের জন্য ছিল না। মনিবের মৃত্যু আমাদেরকে সে বিষয়টি জানিয়ে দিয়েছে মাত্র। অতএব, আজাদ হওয়ার মূল শর্ত যেহেতু ক্রয় করার সময়েই বাস্তবায়িত হয়ে গেছে। তাই তখন হতেই তাকে আজাদ মনে করা হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

وعلى هذا الْخِلاف تعْلِيْقُ الطَّلَقَاتِ الثَّلَاثِ بِهِ، وَفَائِدَتُهُ تَظْهَرُ فِيْ جرَيَانِ الْاِرْثِ وَعَدمِهِ

وَمَنْ قَالَ كُلُّ عَبْدٍ بَشَّرَنِي بِوِلَادَةِ فُلَانَةَ فَهُوَ حُرٌّ فَبَشَّرَهُ ثَلَاثَةٌ مُتَفَرِّقِيْنَ عتق الْاَوَّلُ لِاَنَّ الْبِشَارَةَ اِسْمٌ لِخَبَرٍ يُغَيِّرُ بَشَرَةَ الْوَجْهِ، وَيُشْتَرطُ كَوْنُهُ سَارًّا بِالْعُرْفِ، وَهٰذَا اِنَّمَا يَتَحَقَّقُ مِنَ الْاَوَّلِ وَاِنْ بَشَّرُوْهُ مَعًا عَتَقُوْا لِاَنَّهَا تَحَقَّقَتْ مِنَ الْكُلِّ وَلَوْ قَالَ اِنِ اشْتَرَيْتُ فُلَانًا فَهُوَ حُرٌّ فَاشْتَرَاهُ يَنْوِيْ بِهِ كَفَّارَةَ يَمِيْنِهِ لَمْ يَجُزْ لِاَنَّ الشَّرْطَ قِرَانُ النِّيَّةِ بِعِلَّةِ الْعِتْقِ وَهِيَ الْيَمِيْنُ، فَاَمَّا الشِّرَاءُ فَشَرْطُهُ وَاِنِ اشْتَرٰى اَبَاهُ يَنْوِيْ عَنْ كَفَّارَةِ يَمِيْنِهِ اَجْزَاهُ عِنْدَنَا خِلَافًا لِزُفَرَ وَالشَّافِعِيِّ . لَهُمَا اَنَّ الشِّرَاءَ شَرْطُ الْعِتْقِ، فَاَمَّا الْعِلَّةُ فَهِيَ الْقَرَابَةُ وَهٰذَا لِاَنَّ الشِّرَاءَ اِثْبَاتُ الْمِلْكِ وَالْاِعْتَاقُ اِزَالَتُهُ وَبَيْنَهُمَا مُنَافَاةٌ . وَلَنَا اَنَّ شِرَاءَ الْقَرِيْبِ اِعْتَاقٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ" ﴿لَنْ يَجْزِيَ وَلَدٌ وَالِدَهُ اِلَّا اَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوْكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ﴾ جَعَلَ نَفْسَ الشِّرَاءِ اِعْتَاقًا لِاَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ غَيْرُهُ وَصَارَ نَظِيْرُ قَوْلِهِ سَقَاهُ فَاَرْوَاهُ

অনুবাদ : একই মতপার্থক্য রয়েছে, সর্বশেষ গুণের সাথে তালাক সম্পৃক্ত করার বিষয়েও, এই মতপার্থক্যের ফলাফল প্রকাশ পাবে মিরাশ পাওয়া না পাওয়ার ক্ষেত্রে।

কেউ যদি বলে, যেকোনো গোলাম আমাকে অমুকের সন্তান জন্মদানের সুসংবাদ প্রদান করবে, সে আজাদ হবে। অতঃপর পৃথক পৃথকভাবে তিনজন গোলাম তাকে সুসংবাদ দান করল। তাহলে প্রথম গোলামটি শুধু আজাদ হবে। কেননা সুসংবাদ হচ্ছে, এমন সংবাদ যা চেহারার ভাব পরিবর্তন ঘটায় এবং প্রচলনে তা আনন্দদায়ক হওয়া শর্ত। এবং তা কেবল প্রথম গোলামের ক্ষেত্রে সাব্যস্ত হয়।

আর যদি তারা এক সাথে তাকে সংবাদ দান করে তাহলে সকলেই আজাদ হয়ে যাবে। কেননা সুসংবাদ দানের কর্ম সকলের থেকেই বাস্তবায়িত হয়েছে।

যদি সে বলে, যদি আমি অমুক গোলামটি খরিদ করি তাহলে সে আজাদ। অতঃপর সে তাকে কসমের কাফফারা আদায়ের নিয়তে খরিদ করল তাহলে কাফফারা আদায় হবে না। কেননা কাফফারা আদায় হওয়ার শর্ত হলো কাফফারা আদায়ের নিয়ত মুক্তির কারণের সাথে সংলগ্ন হওয়া। আর তাহলো কসম। ক্রয় করা হলো তার জন্য শর্ত। **যদি কসমের কাফফারা আদায়ের নিয়তে নিজ পিতাকে খরিদ করে তাহলে আমাদের মতে তা কাফফারা হিসাবে জায়েজ হবে।** ইমাম যুফার ও ইমাম শাফেয়ী (র.) ভিন্ন মত পোষণ করেন।

তাদের দলিল এই যে, ক্রয় হলো মুক্তির শর্ত। আর মুক্তির কারণ হলো আত্মীয়তা, এটা এ কারণে যে, ক্রয় অর্থ মালিকানা সাব্যস্তকরণ এবং মুক্তিদান অর্থ মালিকানা রহিতকরণ। আর উভয়ের মধ্যে বৈপরীত্য রয়েছে। আমাদের দলিল এই যে, আত্মীয়কে ক্রয় করার অর্থই হলো তাকে মুক্তি দেওয়া। কেননা নবী করীম ﷺ বলেছেন, কোনো সন্তান তার পিতার প্রতিদান দিতে পারে না, তবে যদি তাকে গোলাম অবস্থায় পায় আর খরিদ করে ও আজাদ করে। এখানে নবী করীম ﷺ স্বয়ং ক্রয়কেই মুক্তিদান সাব্যস্ত করেছেন। কেননা তিনি মুক্তির জন্য ক্রয় ছাড়া অন্য কিছুর শর্ত আরোপ করেননি। সুতরাং এমনই হলো, যেন বলা হলো سَقَاهُ فَاَرْوَاهُ সে পান করিয়েছে এবং তৃপ্ত করেছে।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কোনো ব্যক্তি এরূপ বলল যে, সর্বশেষ যে স্ত্রীকে আমি বিবাহ করব সে তিন তালাক। অতঃপর পরপর দুজন স্ত্রীকে বিবাহ করল। দ্বিতীয় স্ত্রী বিবাহ হতে তিন হায়েজ অতিক্রান্ত হওয়ার পর স্বামী মারা গেল। এমতাবস্থায় দ্বিতীয় স্ত্রী তালাক প্রাপ্ত হবে। তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে তালাক প্রাপ্ত হবে বিবাহের সময় হতে। এবং ইদ্দতকাল অতিক্রান্ত হওয়ার পর স্বামীর মৃত্যু হওয়ার কারণে স্ত্রী মিরাশ থেকে বঞ্চিত হবে। আর সাহেবাইনের মতে তালাক হবে স্বামীর মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে। তাই স্বামী زوج فار বলে গণ্য হবে এবং স্ত্রী মিরাশের মধ্যে অংশ পাবে।

وَمَنْ قَالَ كُلُّ عَبْدٍ بَشَّرَنِي الخ : اَلْبِشَارَةُ শব্দটি بَشَرَةٌ হতে গৃহীত। بَشَرَةٌ শব্দের অর্থ হলো ত্বক। بِشَارَةٌ এমন সংবাদকে বলা হয়, যা শুনে শ্রোতার চেহারার ত্বকে পরিবর্তন সৃষ্টি হয়। এটা সুসংবাদও হতে পারে দুঃসংবাদও হতে পারে। তবে জনসাধারণ্যে কেবল সুসংবাদকেই بِشَارَة বলা হয়।

وَلَوْ قَالَ اِنْ اشْتَرَيْتُ فُلَانًا الخ : মাসআলাটির সারমর্ম এই যে, কোনো ব্যক্তি নির্দিষ্ট একজন দাসকে লক্ষ্য করে বলল. আমি যদি তাকে খরিদ করি তাহলে সে আজাদ। অতঃপর সে তাকে খরিদ করল, কসমের কাফফারা আদায়ের নিয়তে। এমতাবস্থায় তার কাফফারা আদায় হবে না। কারণ এ ক্ষেত্রে শর্ত হলো আজাদির ইল্লতের সাথে নিয়ত মিলিত হওয়া। আজাদির ইল্লত হলো কসম। কিন্তু কসমের সাথে নিয়ত হয় নাই, বিধায় কাফফারা আদায় হবে না। যদি কসমের সাথে নিয়ত মিলিত হতো, তাহলে কাফফারা আদায় হয়ে যেত, এখানে নিয়ত মিলিত হয়েছে ক্রয় করার সাথে, যা কিনা আজাদির জন্য শর্ত স্বরূপ। ইল্লত নয়। যখন সে কসম করেছিল আর্থাৎ إِنِ اشْتَرَيْتُهُ فَهُوَ حُرٌّ বলেছিল তখন যদি কাফফারা আদায়ের নিয়ত করত, তাহলে অবশ্যই আদায় হয়ে যেত। কিন্তু এখন হবে; বরং এখন সে আজাদ হবে পূর্ববর্তী ইয়ামীনের কারণে। অর্থাৎ সে যে বলেছিল, আমি যদি তাকে ক্রয় করি তাহলে সে আজাদ, তাই ক্রয় করার সাথে সাথে সে আজাদ হয়ে যাবে ইয়ামীনের জাযা স্বরূপ।

অনুরূপভাবে যদি কোনো ব্যক্তি নিজের কসমের কাফফারা আদায়ের নিয়তে আপন পিতাকে ক্রয় করে, তাহলে ইমাম যুফার, শাফেয়ী, মালেক ও আবূ হানীফা (র.) -এর প্রথম কওল অনুযায়ী কাফফারা আদায় হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর দ্বিতীয় কওল মুতাবেক কাফফারা আদায় হয়ে যাবে। প্রথমোক্ত মতের পক্ষে দলিল হলো এই যে, পিতা আজাদ হওয়ার ইল্লত হলো কারাবাত বা আত্মীয়তা। যা অনেক পূর্ব থেকেই হয়ে আছে। ক্রয় করা হলো আজাদির জন্য শর্তস্বরূপ। নিয়ত মিলিত হয়েছে শর্তের সাথে, ইল্লতের সাথে নয়। তাই কাফফারা আদায় হবে না। বরং নিকটাত্মীয়কে ক্রয় করলে আজাদ হয়ে যাওয়ার নিয়মানুসারে পিতা স্বাভাবিক ভাবে আজাদ হয়ে যাবে। কাফফারা স্বরূপ নয়।

দ্বিতীয় মতের পক্ষ্যে দলিল হলো এই যে, পিতাকে ক্রয় করাই তার আজাদির ইল্লত। কেননা হাদীস শরীফে ক্রয়কে ইল্লত সাব্যস্ত করা হয়েছে। لَنْ يَجْزِىَ وَلَدٌ وَالِدَهُ إِلَّا اَنْ يَجِدَهُ مَحْمَلُ فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ কোনো সন্তান তার পিতাকে উপযুক্ত বদলা দিতে পারে না। হ্যাঁ, তবে যদি সন্তান নিজ পিতাকে কারো দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ দেখে তাকে ক্রয় করে আজাদ করে দেয়, তাহলে...... অতএব, ক্রয় করাই যেহেতু ইল্লত, এবং এর সাথে কাফফারা আদায়ের নিয়তও মিলিত হয়েছে, তাই কাফফারা আদায় হয়ে যাবে।

প্রশ্ন হতে পারে যে, ক্রয় করাকে আজাদির ইল্লত বানানো হয়েছে এটা কিরূপে বুঝে আসল? এর উত্তর হলো এই যে, হাদীসে বর্ণিত فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ বাক্যটি আরবিদের কথা سَقَاهُ فَأَرْوَاهُ -এর অনুরূপ। سَقَاهُ فَأَرْوَاهُ -এর অর্থ হলো, সে তাকে পানি পান করাল এবং তৃপ্ত করল। এখানে চিন্তা করলে দেখা যায়, পানি পান করানোটাই মূলত তৃপ্তি করা, পানি পান করালেই তৃপ্তি অর্জন হয়। তদ্রূপ পিতাকে কিনলেই পিতা আজাদ হয়ে যায়। তার আজাদির জন্য ভিন্ন কিছু করতে হয় না। অতএব, বলা যায়, পিতাকে ক্রয় করাই হলো তাকে আজাদ করা। অতএব, এর সাথে যদি কাফফারা আদায়ের নিয়ত যুক্ত হয়, তাহলে পূর্ব বর্ণিত উসূল মোতাবেক কাফফারা আদায় হয়ে যাওয়াই অধিক যুক্তি যুক্ত।

https://e-ilm.weebly.com/

وَلَوْ اشْتَرَى أُمَّ وَلَدِهِ لَمْ يُجْزِهُ وَمَعْنَى هٰذِهِ الْمَسْأَلَةِ اَنْ يَقُولَ لِاَمَةٍ قَدْ اِسْتَوْلَدَهَا بِالنِّكَاحِ : اِنْ اِشْتَرَيْتُكِ فَاَنْتِ حُرَّةٌ عَنْ كَفَّارَةِ يَمِيْنِي ثُمَّ اِشْتَرَاهَا فَاِنَّهَا تُعْتَقُ لِوُجُوْدِ الشَّرْطِ وَلَا يَجْزِيْهِ عَنِ الْكَفَّارَةِ لِاَنَّ حُرِّيَّتَهَا مُسْتَحَقَّةٌ بِالْاِسْتِيْلَادِ فَلَا تُضَافُ اِلَى الْيَمِيْنِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، بِخِلَافِ مَا اِذَا قَالَ لِقِنَّةٍ اِنْ اِشْتَرَيْتُكِ فَاَنْتِ حُرَّةٌ عَنْ كَفَّارَةِ يَمِيْنِ حَيْثُ يَجْزِيْهِ عَنْهَا اِذَا اِشْتَرَاهَا لِاَنَّ حُرِّيَّتَهَا غَيْرُ مُسْتَحَقَّةٍ بِجِهَةٍ اُخْرٰى فَلَمْ تَخْتَلَّ الْاِضَافَةُ اِلَى الْيَمِيْنِ وَقَدْ قَارَنَتْهُ النِّيَّةُ

অনুবাদ : যদি সে তার উম্মে ওয়ালাদকে খরিদ করে, তাহলে তা যথেষ্ট হবে না। এ মাসআলার অর্থ এই যে, কেউ বিবাহের মাধ্যমে যে দাসীর গর্ভে সন্তান উৎপাদন করেছে, তাকে বলল, যদি তোমাকে খরিদ করি, তাহলে আমার পূর্ববর্তী একটি কসমের কাফফারা হিসাবে তুমি আজাদ। অতঃপর সে তাকে ক্রয় করল। তাহলে শর্ত বিদ্যমান হওয়ার কারণে সে আজাদ হয়ে যাবে। কিন্তু কাফফারা হিসাবে বিবেচিত হবে না। কেননা সন্তান উৎপাদনের ভিত্তিতেই সে মুক্তির অধিকারিণী হয়েছে। সুতরাং মুক্তির বিষয়টি সর্বোতভাবে কসমের সাথে সম্পৃক্ত হবে না।

পক্ষান্তরে যদি কোনো দাসীকে বলে যে, যদি আমি তোমাকে খরিদ করি তাহলে তুমি আমার পূর্ববর্তী কসমের কাফফারা রূপে আজাদ হয়ে যাবে। তাহলে যখন সে তা খরিদ করবে তখন কাফফারা হিসাবেই আজাদ হয়ে যাবে। কেননা এখানে অন্য কোনো দিক থেকে তার মুক্তি অনিবার্য হয়নি। তাই কসমের সাথে মুক্তির সম্বন্ধ করার ক্ষেত্রে কোনো ত্রুটি হবে না। আর কাফফারার নিয়তও ক্রয়ের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কেউ অন্য ব্যক্তির বাঁদী বিবাহ করল এবং এ বাঁদীর উদরে তার সন্তান হলো। এমতাবস্থায় ব্যক্তি বলল, আমি যদি কখনো তোমাকে ক্রয় করি তাহলে তুমি আমার কসমের কাফফারা হিসাবে আজাদ হয়ে যাবে। এরপর এক সময় সে উক্ত বাঁদীকে ক্রয় করল। এর ফলে বাঁদী আজাদ হয়ে যাবে। কিন্তু কাফফারা আদায় হবে না। কারণ এখানে তার আজাদ হওয়ার ইল্লত হলো ইস্তিলাদ তথা বাঁদীর উদরে ক্রেতার বাচ্চা জন্ম হওয়া। যা পূর্বেই হয়েছিল। এবং এর সাথে যেহেতু নিয়ত মিলিত হয়নি, তাই কাফফারা আদায় হবে না। নিয়ত মিলিত হয়েছে ক্রয় করার সাথে, যা শর্ত স্বরূপ; ইল্লত নয়।

পক্ষান্তরে যদি কেউ কোনো সাধারণ বাঁদীকে লক্ষ্য করে বলে, আমি যদি তোমাকে ক্রয় করি তাহলে তুমি আমার কসমের কাফফারা হিসাবে আজাদ হবে। এরপর তাকে ক্রয় করে, তাহলে কাফফারা আদায় হয়ে যাবে। কারণ এক্ষেত্রে বাঁদীর আজাদির ইল্লত হলো ক্রয় করা। আর এর সাথে কাফফারা আদায়ের নিয়ত ও মিলিত হয়েছে তাই তার কাফফারা আদায় হয়ে যাবে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَمَنْ قَالَ اِنْ تَسَرَّيْتُ جَارِيَةً فَهِيَ حُرَّةٌ فَتَسَرَّى جَارِيَةً كَانَتْ فِيْ مِلْكِهِ عَتَقَتْ لِاَنَّ الْيَمِيْنَ اِنْعَقَدَتْ فِيْ حَقِّهَا لِمُصَادَفَتِهَا الْمِلْكَ وَهٰذَا لِاَنَّ الْجَارِيَةَ مُنَكَّرَةٌ فِيْ هٰذَا الشَّرْطِ فَتَتَنَاوَلُ كُلَّ جَارِيَةٍ عَلَى الْاِنْفِرَادِ وَاِنْ اشْتَرٰى جَارِيَةً فَتَسَرَّاهَا لَمْ تُعْتَقْ خِلَافًا لِزُفَرَ فَاِنَّهُ يَقُوْلُ : التَّسَرِّيْ لَا يَصِحُّ اِلَّا فِيْ الْمِلْكِ فَكَانَ ذِكْرُهُ ذِكْرَ الْمِلْكِ وَصَارَ كَمَا اِذَا قَالَ لِاَجْنَبِيَّةٍ اِنْ طَلَّقْتُكِ فَعَبْدِيْ حُرٌّ يَصِيْرُ التَّزَوُّجُ مَذْكُوْرًا . وَلَنَا اَنَّ الْمِلْكَ يَصِيْرُ مَذْكُوْرًا ضَرُوْرَةَ صِحَّةِ التَّسَرِّيْ وَهُوَ شَرْطٌ فَيَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهِ وَلَا يَظْهَرُ فِيْ حَقِّ صِحَّةِ الْجَزَاءِ وَهُوَ الْحُرِّيَّةُ، وَفِيْ مَسْاَلَةِ الطَّلَاقِ اِنَّمَا يَظْهَرُ فِيْ حَقِّ الشَّرْطِ دُوْنَ الْجَزَاءِ، حَتّٰى لَوْ قَالَ لَهَا اِنْ طَلَّقْتُكِ فَاَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَهَا وَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً لَا تَطْلُقُ ثَلَاثًا فَهٰذِهِ وِزَانُ مَسْاَلَتِنَا .

অনুবাদ : কেউ যদি বলে, আমি কোনো দাসীকে যদি উপপত্নী হিসেবে গ্রহণ করি তাহলে সে আজাদ। অতঃপর সে নিজের মালিকানার কোনো দাসীকে উপপত্নীরূপে গ্রহণ করল, তাহলে আজাদ হয়ে যাবে। কেননা এই দাসীর ক্ষেত্রে কসম সংঘটিত হয়েছে। কারণ কসম বা শর্তায়ন মালিকানার সাথে যুক্ত হয়েছে। এটা একারণে যে, এই শর্তায়নের ক্ষেত্রে দাসী শব্দটি অনিষ্টতা জ্ঞাপক। সুতরাং আলাদাভাবে প্রতিটি দাসীকে অন্তর্ভুক্ত করবে। আর যদি কোনো দাসীকে ক্রয় করার পর উপপত্নী বানায় তাহলে উক্ত কসমের আওতায় সে আজাদ হবে না। ইমাম যুফার (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি বলেন, মালিকানা ছাড়া উপপত্নী গ্রহণ বৈধ নয়। সুতরাং উপপত্নী গ্রহণের কথা উল্লেখ করা মানেই মালিকানার কথা উল্লেখ করা। সুতরাং এমনই হলো, যেন কোনো পর নারীকে বলল, যদি তোমাকে তালাক প্রদান করি, তাহলে আমার গোলাম আজাদ। এখানে বিবাহ করার বিষয়টি অনিষ্টরূপে উল্লেখিত ধরা হয়। আমাদের দলিল এই যে, উপপত্নীত্বের বৈধতার কারণে মালিকানা উল্লেখিত রয়েছে বলে ধরা হয়। আর এটা বৈধতার শর্ত। সুতরাং অনিবার্যতার সীমা পর্যন্ত এটা সীমিত থাকবে। ফলে কসমের পরিণতি তথা মুক্তির ক্ষেত্রে তা প্রকাশ পাবে না। পক্ষান্তরে তালাকের ক্ষেত্রে বিবাহগত মালিকানা প্রকাশ পায় শর্তের ক্ষেত্রে, جزاء বা পরিণতির ক্ষেত্রে নয়। এমনকি যদি সে ঐ স্ত্রী লোকটিকে বলে, যদি তোমাকে তালাক দেই, তাহলে তুমি তিন তালাক। অতঃপর সে তাকে বিবাহ করল এবং তালাক দিল। তাহলে তিন তালাক হবে না। সুতরাং এটা হলো আমাদের পূর্ববর্তী মাসআলার সমতুল্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কেউ বলল, আমি যদি কোনো বাঁদীর সাথে সহবাস করি, তাহলে সে আজাদ। অতঃপর সে তার মালিকানাধীন একটি বাঁদীর সাথে সহবাস করল। ফলে বাঁদীটি আজাদ হয়ে যাবে। কারণ এ বাঁদীটি তার মালিকানায় থাকার কারণে এর সাথে কসমের সম্পর্ক হয়েছিল। এবার যখন শর্ত (সহবাস) বাস্তবায়িত হলো, তখন জাযাও (আজাদি) বাস্তবায়িত হবে। মালিকানাধীন উক্ত বাঁদীর সাথে কসমের সম্পর্ক হওয়ার কারণ হলো, ব্যক্তির কথায় جارية শব্দটি نكرة ছিল। যা

https://e-ilm.weebly.com/

মালিকানাধীন যে কোনো বাঁদীকেই অন্তর্ভুক্ত করে। সে হিসেবে এও যেহেতু মালিকানাধীন একজন বাঁদী। তার এর সাথে ও কসমের সম্পর্ক হয়েছে।

পক্ষান্তরে যদি উপরিউক্ত কথা বলার পরে একটি বাঁদী কিনে এনে তার সাথে সহবাস করে তাহলে সে আজাদ হবে না। কারণ কসম করার সময় যেহেতু এ বাঁদীটি তার মালিকানায় ছিল না। তাই এর সাথে কসমের সম্পর্ক হয়নি, বিধায় এর সাথে সহবাস হলেও আজাদ হবে না। তবে এ মাসআলায় ইমাম যুফার (র.) মতানৈক্য করেছেন। তিনি বলেছেন, এ নতুন ক্রয়কৃত বাঁদীর সাথে সহবাস হলে সেও আজাদ হয়ে যাবে। কারণ ব্যক্তি যখন বলেছিল إِنْ تَسَرَّيْتُ جَارِيَةً "যদি আমি কোনো বাঁদীর সাথে সহবাস করি" তখন তার কথার ভিতরে আরেকটি শব্দ উহ্য ছিল। তা হলো ملكت। অতএব, কেমন যেন বলেছিল- إِنْ مَلَكْتُ وَتَسَرَّيْتُ جَارِيَةً যদি আমি কোনো বাঁদীর মালিক হই এবং তার সাথে সহবাস করি..... । তার একথা যেহেতু নতুন বাঁদীকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। তাই তার সাথেও কসমের সম্পর্ক হয়েছে। যার ফলে সে এখন শর্ত (সহবাস) বাস্তবায়িত হওয়ার পর আজাদ হয়ে যাবে।

বাকি থাকল ملكت শব্দটি কেন উহ্য থাকবে এ প্রশ্ন। এর উত্তর হলো এই যে, تسرى বাঁদীর সাথে সহবাস -এর জন্য পূর্বশর্ত হলো বাঁদীর মালিক হওয়া। মালিকানা অর্জন করা ছাড়া তাসরী কল্পনা করা যায় না। সে হিসেবে تسريت -এর পূর্বে ملكت উহ্য থাকবে। এ কথাটির নজির হলো যেমন কোনো ব্যক্তি অপরিচিত নারীকে লক্ষ্য করে বলল, إِنْ طَلَّقْتُكِ فَعَبْدِي حُرٌّ আমি যদি তোমাকে তালাক দেই তাহলে আমার দাস মুক্ত। এ কথাটির মধ্যে طلقت -এর تزوجت উহ্য আছে। কেননা বিবাহ করা ব্যতীত তালাক দেওয়ার কল্পনা করা যায় না।

ইমাম যুফার (র.) -এর দলিলের জবাবে আমাদের পক্ষ হতে বলা হয়, মালিকানার বিষয়টি মেনে নিতে হয় তাসাররী সহীহ হওয়ার জরুরতের ভিত্তিতে। অতএব এটা জরুরি পর্যন্তই সীমিত থাকবে। অর্থাৎ শর্ত (তাসাররী) পর্যন্ত সে আছর করবে। জাযার (আজাদ হওয়া) মধ্যে কোনো আছর করতে পারবে না। তালাকের মাসআলার মধ্যেও জাযার মধ্যে কোনো আছর করে না। যেমন, কেউ যদি বলে, إِنْ طَلَّقْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا অতঃপর যদি বিবাহ করে তাকে তালাক দেয়, তাহলে তিন তালাক হয় না।

https://e-ilm.weebly.com/

وَمَنْ قَالَ كُلُّ مَمْلُوْكٍ لِّيْ حُرٌّ تُعْتَقُ أُمَّهَاتُ اَوْلَادِهِ وَمُدَبَّرُوْهُ وَعَبِيْدُهُ لِوُجُوْدِ الْاِضَافَةِ الْمُطْلَقَةِ فِيْ هٰؤُلَاءِ، اِذِ الْمِلْكُ ثَابِتٌ فِيهِمْ رَقَبَةً وَيَدًا وَلَا يُعْتَقُ مُكَاتَبُوْهُ اِلَّا اَنْ يَنْوِيَهُمْ لِاَنَّ الْمِلْكَ غَيْرُ ثَابِتٍ يَدًا وَلِهٰذَا لَا يَمْلِكُ اَكْسَابَهُ وَلَا يَحِلُّ لَهُ وَطْئُ الْمُكَاتَبَةِ. بِخِلَافِ اُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرَةِ فَاخْتَلَّتِ الْاِضَافَةُ فَلَا بُدَّ مِنَ النِّيَّةِ وَمَنْ قَالَ لِنِسْوَةٍ لَهُ هٰذِهِ طَالِقٌ اَوْ هٰذِهِ وَهٰذِهِ طَلُقَتِ الْاَخِيْرَةُ وَلَهُ الْخِيَارُ فِي الْاَوَّلِيَيْنِ لِاَنَّ كَلِمَةَ اَوْ لِاِثْبَاتِ اَحَدِ الْمَذْكُوْرَيْنِ وَقَدْ اَدْخَلَهَا بَيْنَ الْاَوَّلِيَيْنِ ثُمَّ عَطَفَ الثَّالِثَةَ عَلَى الْمُطْلَقَةِ لِاَنَّ الْعَطْفَ لِلْمُشَارَكَةِ فِي الْحُكْمِ فَيَخْتَصُّ بِمَحَلِّهِ فَصَارَ كَمَا اِذَا قَالَ اِحْدَاكُمَا طَالِقٌ وَهٰذِهِ وَكَذَا اِذَا قَالَ لِعَبِيْدِهِ هٰذَا حُرٌّ اَوْ هٰذَا وَهٰذَا عَتَقَ الْاَخِيْرُ وَلَهُ الْخِيَارُ فِي الْاَوَّلَيْنِ لِمَا بَيَّنَّا.

অনুবাদ : কেউ যদি বলে আমার মলিকানাধীন সমস্ত গোলাম আজাদ। তাহলে তার উম্মে ওয়ালাদ, মুদাব্বার, এবং দাস-দাসী সকলেই আজাদ হয়ে যাবে। কেননা এদের সকলের ক্ষেত্রে পূর্ণ মালিকানার সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে। কারণ তাদের উপর সত্তাগত ও কর্তৃত্বগত মালিকানা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। **আর তার মুকাতাব গোলামগণ নিয়ত ছাড়া আজাদ হবে না।** কেননা তার উপর কর্তৃত্বগত মালিকানা বিদ্যমান নেই। এ কারণেই মনিব তার উপার্জনাদির মালিক হয় না এবং মুকাতাব দাসীর সাথে সহবাস বৈধ নয়। উম্মে ওয়ালাদ ও মুদাব্বার দাসীর বিষয়টি ভিন্ন। সুতরাং মুকাতাবের ক্ষেত্রে মালিকানার সম্পর্ক ভিন্ন হয়ে গেল। ফলে নিয়ত জরুরি।

কেউ যদি তার স্ত্রীদের সম্পর্কে বলে, এটি অথবা এটি আর এটি তালাক। তাহলে সর্বশেষটি তালাক হয়ে যাবে। আর প্রথম দুটির ব্যাপারে তার নির্ধারণের এখতিয়ার রয়েছে। কেননা অথবা শব্দটির দাবি হচ্ছে দুটির একটি সাব্যস্ত করা। এবং অথবা অব্যয়টি প্রথম দুজনের মাঝে ব্যবহৃত হয়েছে। অতঃপর তৃতীয়টিকে তালাক প্রাপ্তার সাথে যুক্ত করা হয়েছে। কেননা আর অব্যয়ের অর্থ হচ্ছে, সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে অভিন্নতা। অতএব, সিদ্ধান্তের পাত্রের সাথে যুক্ততা নির্ধারিত হয়ে যাবে। সুতরাং বিষয়টি এমন হলো যেন সে বলল, তোমাদের দুজনের একজন এবং এটি তালাক। **তদ্রূপ যদি সে তার গোলামদের সম্পর্কে বলে, এটি কিংবা এটি এবং এটি আজাদ তাহলে** আমাদের পূর্ব বর্ণিত কারণে **তৃতীয় গোলামটি আজাদ হয়ে যাবে এবং প্রথম দুজনের ব্যাপারে তার এখতিয়ার থাকবে।**

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কেউ যদি বলে আমার মালিকাধীন সবাই আজাদ, তাহলে তার সাধারণ দাসদাসী, মুদাব্বার ও উম্মে ওয়ালাদগণ আজাদ হবে। কারণ এরা পূর্ণাঙ্গ মামলূক। মুকাতাব অন্তর্ভুক্ত হবে না। কারণ সে পূর্ণাঙ্গ মামলূক নয়। কেননা সে তার উপার্জিত সম্পদের মালিক নিজেই হয়ে থাকে। মুকাতাবা দাসীর সাথে সহবাস করা মনিবের জন্য জায়েজ হয় না। মোটকথা, মুকাতাব-মুকাতাবা পূর্ণাঙ্গ মামলূক না হওয়ার কারণে كُلُّ مَمْلُوْكٍ-এর আওতায় পড়বে না। হ্যাঁ, যদি মনিব মুকাতাবকে বুঝানোর নিয়ত করে থাকে, তাহলে সেও অন্তর্ভুক্ত হবে।

وَمَنْ قَالَ لِنِسْوَةٍ لَهُ هٰذِهِ طَالِقٌ الخ : উপরিউক্ত মাসআলার সারমর্ম হলো, যে দুই স্ত্রীর মাঝে أو ব্যবহার করা হয়েছে, তাদের মধ্য হতে একজনকে তালাকপ্রাপ্তা হিসেবে নির্ধারণ করার এখতিয়ার থাকবে স্বামীর। কেননা أو ব্যবহার করাই হয় দুই বস্তুর মাঝে অনির্দিষ্টতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। তবে তৃতীয় স্ত্রী যাকে و এর পরে উল্লেখ করা হয়েছে সে অবশ্যই তালাক হয়ে যাবে। কারণ و এর মধ্যমে তৃতীয় জনকে আ'তফ করা হয়েছে পূর্বের তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীর উপর। আর মা'তূফ ও মা'তূফ আলাইহির হুকুম অভিন্ন হয়ে থাকে। সে হিসাবে তৃতীয়জন তালাক প্রাপ্ত হবে নিঃসন্দেহে।

কেউ যদি কয়েকজন দাসকে লক্ষ্য করে বলে هذا حُرٌّ اَوْ هذا وهذا, তাহলে এর হুকুমও পূর্বরূপ। অর্থাৎ তৃতীয় দাস আজাদ হয়ে যাবে; প্রথম দুজনের মধ্যে হতে একজনকে নির্ধারণের বিষয়ে মনিবের এখতিয়ার থাকবে।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ الْيَمِيْنِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالتَّزَوُّجِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ

وَمَنْ حلفَ لَا يَبِيْعُ اَوْ لَا يَشْتَرِيْ اَوْ لَا يُؤَاجِرُ فَوَكَّلَ مَنْ فعَلَ ذٰلِكَ لَمْ يَحْنَثْ لِاَنَّ الْعَقْدَ وُجِدَ لَه مِنَ الْعَاقِدِ حَتّٰى كَانَتْ الْحُقُوْقُ عَلَيْهِ، وَلِهٰذَا لَوْ كَانَ الْعَاقِدُ هُوَ الْحَالِفُ يَحْنَثُ فِيْ يَمِيْنِهِ فَلَمْ يُوْجَدْ مَا هُوَ الشَّرْطُ وَهُوَ الْعَقْدُ مِنَ الْاٰمِرِ، وَاِنَّمَا الثَّابِتُ لَه حُكْمُ الْعَقْدِ اِلَّا اَنْ يَنْوِيَ ذٰلِكَ لِاَنَّ فِيْهِ تَشْدِيْدًا اَوْ يَكُوْنَ الْحَالِفُ ذَا سُلْطَانٍ لَا يَتَوَلّٰى الْعَقْدَ بِنَفْسِهِ لِاَنَّه يَمْنَعُ نَفْسَه عَمَّا يَعْتَادُه - وَمَنْ حَلَفَ لَا يَتَزَوَّجُ اَوْ لَا يُطَلِّقُ اَوْ لَا يُعْتِقُ فَوَكَّلَ بِذٰلِكَ حَنِثَ لِاَنَّ الْوَكِيْلَ فِيْ هٰذَا سَفِيرٌ وَمُعَبِّرٌ وَلِهٰذَا لَا يُضِيْفُه اِلٰى نَفْسِهِ بَلْ اِلَى الْاٰمِرِ، وَحُقُوْقُ الْعَقْدِ تَرْجِعُ اِلَى الْاٰمِرِ لَا اِلَيْهِ وَلَوْ قَالَ عَنَيْتُ اَنْ لَا اَتَكَلَّمَ بِهٖ لَمْ يُدَيَّنْ فِي الْقَضَاءِ خَاصَّةً وَسَنُشِيرُ اِلَى الْمَعْنٰى فِي الْفَرْقِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى -

পরিচ্ছেদ : ক্রয় বিক্রয়, বিবাহ ও অন্যান্য বিষয়ের কসম

অনুবাদ : কেউ যদি কসম করে যে ক্রয় করবে না, কিংবা বিক্রয় করবে না, কিংবা ভাড়া নেবে না। অতঃপর ঐ কাজে অন্য কাউকে উকিল নিযুক্ত করল, যে একাজ সম্পাদন করে নেয়, তাহলে কসম ভঙ্গ হবে না। কেননা চুক্তি সংঘটিত হয়েছে চুক্তিকারী উকিলের দ্বারা। এজন্য যাবতীয় দায় দায়িত্ব তার উপরেই অর্পিত হয়। আর এ কারণেই কসমকারী যদি স্বয়ং চুক্তিকারী হয় তাহলে তার কসম ভেঙ্গে যাবে। সুতরাং আদেশ দাতার পক্ষ থেকে চুক্তি করণের শর্ত পাওয়া যায়নি। অবশ্য তার অনুকূলে চুক্তির হুকুম সাব্যস্ত হবে। তবে যদি সে তা নিয়ত করে তাহলে সেটাও কসমের আওতাভুক্ত হবে। কেননা তাতে প্রবলতা রয়েছে– অথবা যদি কসমকারী কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তি হয়, যে নিজে চুক্তি করে না। কেননা কসমের মাধ্যমে মানুষ নিজেকে অভ্যস্ত বিষয় থেকে বিরত রাখে।

কেউ যদি কসম করে যে বিবাহ করবে না কিংবা তালাক দিবে না কিংবা আজাদ করবে না। অতঃপর এ ব্যাপারে কাউকে উকিল নিযুক্ত করল তাহলে কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা এ ক্ষেত্রে উকিল হচ্ছে নিছক দূত এবং অন্যের বক্তব্য উচ্চারণকারী একারণেই উকিল এসব কর্মকে নিজের দিকে সম্বন্ধ করে না এবং চুক্তির দায় দায়িত্বসমূহ আদেশদাতার দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়। উকিলের দিকে নয়। যদি বলে যে, এ কসমের দ্বারা আমার উদ্দেশ্য ছিল ঐ শব্দগুলো আমি নিজে উচ্চারণ করব না। তাহলে বিশেষভাবে বিচারের ক্ষেত্রে তাকে সত্য বলে গ্রহণ করা হবে না। ইনশাআল্লাহ পার্থক্য বর্ণনাকালে মূল কারণের দিকে আমরা ইঙ্গিত করব।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কেনা, বেচা, ভাড়া দেওয়া ইত্যাদি কাজ না করার কসম করে উকিল দ্বারা করালে মুয়াক্কেল কসম ভঙ্গকারী হবে না। কারণ এসব আকদ উকিলের দিকেই সম্বন্ধ করা হয়। মুয়াক্কেলের দিকে নয়। তবে দুটি সুরত ব্যতিক্রম।

১. কসম করার সময় এমন নিয়ত থাকে যে, উকিল দ্বারাও করাবে না, তাহলে উকিল দ্বারা করানোর সুরতেও কসম ভঙ্গকারী হয়ে যাবে।

২. কসমকারী ব্যক্তি যদি এমন কেউ হয়, যে সাধারণত এসব কাজ উকিল দ্বারাই করিয়ে থাকে। নিজে করে না। যেমন রাষ্ট্রপতি প্রমুখ। এমতাবস্থায় উকিল দ্বারা করালেও কসম ভঙ্গকারী হয়ে যাবে। কেননা কসম দ্বারা উদ্দেশ্য হলো অভ্যাস ভুক্ত কাজ কর্ম হতে বিরত থাকা। বাদশাহ প্রমুখের অভ্যাসই যেহেতু উকিল দ্বারা করানো তাই এটাই কসমের অন্তর্ভুক্ত হবে।

وَمَنْ حَلَفَ لَا يَتَزَوَّجُ اَوْ لَا يُطَلِّقُ الخ : বিবাহ করা, তালাক দেওয়া, আজাদ করা ইত্যাদি কাজ না করার কসম করার পরে উকিল দ্বারা করালে মুওয়াক্কেল কসম ভঙ্গকারী হয়ে যাবে। কারণ এসব আকদের সমন্ধ স্বয়ং মুওয়াক্কেলের দিকে হয়ে থাকে। উকিল শুধু দূত এবং দুভাষীর মতো। অতএব এজাতীয় উকিল কর্তৃক সম্পাদিত হলে মূল মুওয়াক্কেল কর্তৃকই সম্পাদিত হয়েছে। তাই সে কসম ভঙ্গকারী হয়ে যাবে। যেসব কাজ উকিলের দ্বারা সম্পাদিত হলেও মুওয়াক্কেলের দিকে সমন্ধ করা হয়ে থাকে তন্মধ্য হতে কিতাবে তিনটি উল্লেখ আছে। যথা বিবাহ, তালাক ও ই'তাক এজাতীয় আরো কিছু কাজ হলো মুকাতাব বানানো, হেবা করা, সদকা করা, ঋণ দেওয়া, ঋণ নেওয়া, আমানত রাখা, আমানত গ্রহণ করা ইত্যাদি।

কসমকারী ব্যক্তি যদি বলে কসম দ্বারা আমার উদ্দেশ্য ছিল, তালাক, ই'তাক ইত্যাদি শব্দ মুখে উচ্চারণ না করার কসম করা, তাহলে তাকে পার্থিক বিচারে সত্যায়ন করা হবে না। অর্থাৎ এমন বলা যাবে না যে, সে যেহেতু তালাক ইত্যাদি মুখে উচ্চারণ করে নাই তাই সে কসম ভঙ্গকারী হয়নি। বরং ফয়সালা এটাই হবে যে, সে হানেস হয়ে গেছে। তবে আল্লাহর কাছে তার বক্তব্য গ্রাহ্য হতে পারে। কারণ তিনি অন্তরের নিয়ত সম্পর্কে অবগত আছেন। আমরা মানুষের অন্তর সম্পর্কে অবগত নই, তাই কসমকারীর কথাটি প্রচলিত অর্থেই গ্রহণ করব এবং সে অনুযায়ী ফয়সালা করাই আমাদের দায়িত্ব।

وَسَنُشِيْرُ اِلَى الْمَعْنٰى فِي الْفَرْقِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى এই ইবারত বলে মুসান্নিফ যেদিকে ইঙ্গিত করেছেন তা হলো আগত মাসআলায় উল্লিখিত নিম্নোক্ত ইবারত।

وَوَجْهُ الْفَرْقِ اَنَّ الطَّلَاقَ لَيْسَ اِلَّا تَكَلُّمًا بِكَلَامٍ يُفْضِيْ ....

https://e-ilm.weebly.com/

وَلَوْ حَلَفَ لَا يَضْرِبُ عَبْدَهُ اَوْ لَا يَذْبَحُ شَاتَهُ فَاَمَرَ غَيْرَهُ فَفَعَلَ يَحْنَثُ فِيْ يَمِيْنِهِ لِاَنَّ الْمَالِكَ لَهُ وِلَايَةُ ضَرْبِ عَبْدِهِ وَذَبْحِ شَاتِهِ فَيَمْلِكُ تَوْلِيَتَهُ غَيْرَهُ ثُمَّ مَنْفَعَتُهُ رَاجِعَةٌ اِلَى الْاٰمِرِ فَيُجْعَلُ هُوَ مُبَاشِرًا اِذْ لَا حُقُوْقَ لَهُ تَرْجِعُ اِلَى الْمَاْمُوْرِ وَلَوْ قَالَ عَنَيْتُ اَنْ لَا اَتَوَلّٰى ذٰلِكَ بِنَفْسِيْ دِيْنَ فِي الْقَضَاءِ بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الطَّلَاقِ وَغَيْرِهِ . وَوَجْهُ الْفَرْقِ اَنَّ الطَّلَاقَ لَيْسَ اِلَّا تَكَلُّمًا بِكَلَامٍ يُفْضِيْ اِلَى وُقُوْعِ الطَّلَاقِ عَلَيْهَا، وَالْاَمْرُ بِذٰلِكَ مِثْلُ التَّكَلُّمِ بِهِ وَاللَّفْظُ يَنْتَظِمُهُمَا، فَاِذَا نَوَى التَّكَلُّمَ بِهِ فَقَدْ نَوَى الْخُصُوْصَ فِي الْعَامِّ فَيَدِيْنُ دِيَانَةً لَا قَضَاءً. اَمَّا الذَّبْحُ وَالضَّرْبُ فَفِعْلٌ حِسِّيٌّ يُعْرَفُ بِاَثَرِهِ، وَالنِّسْبَةُ اِلَى الْاٰمِرِ بِالتَّسْبِيْبِ مَجَازٌ، فَاِذَا نَوَى الْفِعْلَ بِنَفْسِهِ فَقَدْ نَوَى الْحَقِيْقَةَ فَيُصَدَّقُ دِيَانَةً وَقَضَاءً ـ

অনুবাদ : আর যদি কসম করে যে, সে তার গোলামকে প্রহার করবে না। কিংবা সে তার বকরি জবাই করবে না। অতঃপর অন্যকে আদেশ করল। আর সে তা করল, তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে।

কেননা নিজের গোলামকে প্রহার করার এবং নিজের বকরি জবাই করার অধিকার মালিকের রয়েছে। সুতরাং এ বিষয়ে অন্যকে দায়িত্ব প্রদানের অধিকার তার আছে। অতঃপর এ কাজের সুফলও তার দিকেই ফিরে আসে। সুতরাং তাকেই কর্ম সম্পাদনকারী বলে গণ্য করা হবে। কেননা এখানে এমন কোনো দায়-দায়িত্ব নেই যা আদেশ প্রাপ্ত ব্যক্তির দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়। **আর যদি কসমকারী বলে যে, আমার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, এসব কাজ আমি নিজে করব না। তাহলে বিচারের ক্ষেত্রেও তার কথা গ্রহণ করা হবে।**

কিন্তু পূর্ব বর্ণিত তালাক ও অন্যান্য বিষয়গুলোর হুকুম ভিন্ন, পার্থক্যের কারণ এই যে, তালাক অর্থই হচ্ছে এমন কথা উচ্চারণ করা যা স্ত্রীর উপর তালাক সাব্যস্ত হওয়া পর্যন্ত পৌছায়। আর তালাক প্রদানের আদেশ করা তালাকের শব্দ উচ্চরণ করার সমতুল্য। আর কসমের উচ্চারিত বক্তব্য নিজে উচ্চারণ ও আদেশ দান উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। সুতরাং যখন সে নিজে উচ্চারণের দিকটি নিয়ত করল, তখন সে ব্যাপক অর্থ সম্পন্ন শব্দ দ্বারা বিশেষ অর্থের নিয়ত করল। সুতরাং দিয়ানতের দিক থেকে তা বিশ্বাস করা হবে, আইনের ক্ষেত্রে নয়।

পক্ষান্তরে প্রহার ও জবাই হলো প্রত্যক্ষ ব্যাপার যা পরিণতির দ্বারা জানা যায়। এক্ষেত্রে আদেশ দাতার দিকে কর্মটির সম্বন্ধ হচ্ছে কারণ হিসাবে রূপক অর্থে। সুতরাং সে যখন কর্মটি নিজে না করার নিয়তের কথা বলল, তখন সে উচ্চারিত বক্তব্যের প্রকৃত অর্থেরই নিয়ত করল। সুতরাং দিয়ানত এবং আইন উভয় বিবেচনায়, তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কেউ কসম করল দাসকে প্রহার করবে না, বকরি জবাই করবে না। অতঃপর উকিলের মারফত কাজগুলো করাল। এর ফলে কসমকারী মুওয়াক্কেল কসম ভঙ্গকারী হয়ে যাবে কারণ পূর্বে বলা হয়েছে, এসব কাজ উকিলের মাধ্যমে সম্পাদিত

https://e-ilm.weebly.com/

হলেও মূলত মুওয়াক্কেলের দিকেই সম্বন্ধ হয়ে থাকে। অতএব, উকিল করেছে মানে মুওয়াক্কেল নিজেই করেছে তাই সে কসম ভঙ্গকারী হয়ে যাবে।

কিন্তু মুওয়াক্কেল যদি দাবি করে যে, কসম দ্বারা আমার উদ্দেশ্য ছিল, আমি নিজে মারব না, তাহলে তাকে তার দাবিতে সত্যবাদী সাব্যস্ত করা হবে পার্থিব বিচারেও, আল্লাহর কাছেও। ফলে উকিলের মাধ্যমে কাজ করানোর কারণে সে কসম ভঙ্গকারী হবে না।

এ মাসআলাটি পূর্ব বর্ণিত মাসআলার বিপরীত, অর্থাৎ বিবাহ তালাক ই'তাকের বিপরীত। কেননা সেখানে ব্যক্তিকে তার দাবিতে পার্থিব বিচারে সত্যায়ন করা হয়নি। এখানে পার্থিব বিচারেও সত্যায়ন করা হয়েছে। তাই উভয় মাসআলার মধ্যকার পার্থক্য স্পষ্ট করার উদ্দেশ্যে মুসান্নিফ বলেন- وَوَجْهُ الْفَرْقِ .... الخ পার্থক্যের সারমর্ম হলো এই যে, বিবাহ তালাক, ই'তাক ইত্যাদি কাজগুলোই কেবলই কিছু কথা মাত্র। যেসব কথার মাধ্যমে বিভিন্ন হুকুম বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। যেমন তালাক দ্বারা স্ত্রী হারাম হয়ে যায়। বিবাহ করলাম বলার দ্বারা বেগানা মহিলা হালাল হয়ে যায়। ই'তাক দ্বারা গোলাম আজাদ হয়ে যায় ইত্যাদি। মোটকথা বিবাহ, তালাক ই'তাক কোনো ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য কাজ নয়, বরং কিছু কথা মাত্র। আর এসব বিষয়ের আদেশও এক প্রকার কথা। সে হিসাবে কেউ যখন বলে, আমি তালাক দিব না, তখন এ শব্দটি তালাক দেওয়া এবং তালাকের আদেশ করা উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করে। এমতাবস্থায় ব্যক্তি যদি একাংশের নিয়ত করে অর্থাৎ শুধু নিজে তালাক দেওয়া বুঝানো তার উদ্দেশ্য হয়, তাহলে সে যেন لَفْظٌ عَامٌ (ব্যাপক শব্দ) বলে مَعْنًى خَاصٌ (আংশিক অর্থ) বুঝানোর উদ্দেশ্য করল। এটাকে পরিভাষায় مَجَازٌ বলা হয়। যা সাধারণ ব্যবহারের পরিপন্থি। ব্যক্তির দাবি এ সাধারণ ব্যবহারের পরিপন্থি হওয়ার কারণেই পার্থিব বিচারে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। পক্ষান্তরে আলোচ্য মাসআলা দাসকে প্রহার করা, বকরি জবাই করা এগুলো কেবল কোনো কথা না। বরং এগুলো فِعْلٌ حِسِّيٌّ (ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য কাজ) আর এ সকল কাজের আদেশ হলো কথা। সে হিসাবে কেউ যখন বলে لَا اَذْبَحُ আমি জবাই করব না। তখন তা শুধু জবাই করার কাজই বুঝিয়ে থাকে, আদেশ করা বুঝায় না। কখনো বুঝালে তা مَجَازٌ বা রূপকার্থে বুঝিয়ে থাকে। এমতাবস্থায় কসমকারী ব্যক্তি যদি দাবি করে যে, আমি প্রহার করব না, জবাই করব না বলে নিজে প্রহার করব না, নিজে জবাই করব না, একথা বুঝানো উদ্দেশ্য ছিল। তাহলে সে শব্দের مَعْنًى حَقِيْقِيٌّ (প্রকৃত অর্থ) গ্রহণ করেছে। যা সাধারণ ব্যবহারে একান্ত অনুকূল। তার দাবি সাধারণ অবস্থা বা সাধারণ ব্যবহারের অনুকূল হওয়ার কারণে পার্থিব বিচারেরও গ্রাহ্য হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَمَنْ حلف لَا يَضْرِبُ وَلَدَهُ فَأَمَرَ إِنْسَانًا فَضَرَبَهُ لَمْ يَحْنَثْ فِيْ يَمِيْنِهِ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ ضَرْبِ الْوَلَدِ عَائِدَةٌ إِلَيْهِ وهُوَ التَّأَدُّبُ وَالتَّثَقُّفُ فَلَمْ يَنْسِبْ فِعْلُهُ إِلَى الْآمِرِ، بِخِلَافِ الْأَمْرِ بِضَرْبِ الْعَبْدِ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ الْإِئْتِمَارِ بِأَمْرِهِ عَائِدَةٌ إِلَى الْآمِرِ فَيُضَافُ الْفِعْلُ إِلَيْهِ وَمَنْ قَالَ لِغَيْرِهِ إِنْ بِعْتُ لَكَ هٰذَا الثَّوْبَ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ فَدَسَّ الْمَحْلُوْفُ عَلَيْهِ ثَوْبَهُ فِيْ ثِيَابِ الْحَالِفِ فَبَاعَهُ وَلَمْ يَعْلَمْ لَمْ يَحْنَثْ لِأَنَّ حَرْفَ اللَّامِ دَخَلَ عَلَى الْبَيْعِ فَيَقْتَضِيْ اِخْتِصَاصَهُ بِهِ، وَذٰلِكَ بِأَنْ يَفْعَلَهُ بِأَمْرِهِ إِذِ الْبَيْعُ تَجْرِيْ فِيْهِ النِّيَابَةُ وَلَمْ تُوجَدْ، بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ إِنْ بِعْتُ ثَوْبًا لَكَ حَيْثُ يَحْنَثُ إِذَا بَاعَ ثَوْبًا مَمْلُوكًا لَهُ، سَوَاءٌ كَانَ بِأَمْرِهِ أَوْ بِغَيْرِ أَمْرِهِ عَلِمَ بِذٰلِكَ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ، لِأَنَّ حَرْفَ اللَّامِ دَخَلَ عَلَى الْعَيْنِ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ فَيَقْتَضِي الْاِخْتِصَاصَ بِهِ، وَذٰلِكَ بِأَنْ يَكُونَ مَمْلُوْكًا لَهُ، وَنَظِيْرُهُ الصِّيَاغَةُ وَالْخِيَاطَةُ وَكُلُّ مَا تَجْرِيْ فِيْهِ النِّيَابَةُ، بِخِلَافِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَضَرْبِ الْغُلَامِ لِأَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ النِّيَابَةَ فَلَا يَفْتَرِقُ الْحُكْمُ فِيْهِ فِي الْوَجْهَيْنِ -

অনুবাদ : কেউ যদি কসম করে যে, সে নিজ সন্তানকে প্রহার করবে না। অতঃপর সে অন্য এক জনকে আদেশ করল, তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। কেননা সন্তানকে প্রহার করার সুফল আর তা হলো আদব ও শিষ্টাচার সন্তানের দিকেই প্রত্যাবর্তিত হয়। সুতরাং এক্ষেত্রে আদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তির কর্মটি আদেশদাতার দিকে সম্পৃক্ত হবে না। পক্ষান্তরে গোলামকে প্রহারের বিষয়টি ভিন্ন কেননা এক্ষেত্রে প্রহারে সুফল হচ্ছে আদেশ দাতার প্রতি গোলামের অনুগত হওয়া। সুতরাং আদেশ দাতার দিকেই কর্মটির সম্বন্ধ হবে।

কেউ যদি অন্যকে বলে যে, যদি আমি এ কাপড়টি তোমার পক্ষে বিক্রি করি, তাহলে তার নিজের স্ত্রী তালাক। অতঃপর যার সাথে কসম করা হয়েছে, সে তার কাপড়কে কসমকারীর কাপড়ের সাথে মিলিয়ে ফেলল আর কসমকারী তা না জেনে বিক্রি করল, তাহলে কসম ভঙ্গ হবে না। কেননা এখানে পক্ষে শব্দটি বিক্রির সাথে সংশ্লিষ্ট। আর দাবি হচ্ছে বিক্রয়, কর্মকে ঐ ব্যক্তির সাথে বিশিষ্ট করা। আর তা হবে তার আদেশে বিক্রয় করা দ্বারা। কেননা বিক্রয় কর্মে প্রতিনিধিত্বর অবকাশ রয়েছে। আর এখানে তা পাওয়া যায়নি।

পক্ষান্তরে যদি বলে, যদি আমি তোমার কোনো কাপড় বিক্রি করি তাহলে তার মালিকানার কোনো কাপড় বিক্রি করার ফলে কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। তার আদেশে করুক কিংবা তার আদেশ ছাড়াই করুক। বিষয়টি তার জানা মতে হোক, বা না জেনে হোক। কেননা এখানে উক্ত ব্যক্তির কাপড় বিক্রয় বুঝানো হয়েছে। আর এর দাবি হলো ব্যক্তিটির সাথে কাপড়ের বিশিষ্টতা থাকা। আর তা প্রতিষ্ঠিত হয় তার মালিকানা ভুক্ত থাকা দ্বারা।

বিক্রয়ের নজির হলো রং করা, সেলাই করা সহ এমন সকল মুআমালা, যাতে অন্যের প্রতিনিধিত্বের অবকাশ রয়েছে। পক্ষান্তরে আহার করা পান করা এবং আপন সন্তানকে প্রহার করার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা এগুলোতে প্রতিনিধিত্বের অবকাশ নেই। সুতরাং এ সকল ক্ষেত্রে উভয় অবস্থায় হুকুম ভিন্ন হবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

নিজ সন্তানকে প্রহার করবে না বলে কসম করার পর যদি অন্য কারো মাধ্যমে সন্তানকে প্রহার করায় তাহলে কসমকারী কসম ভঙ্গকারী হবে না। কারণ সন্তানকে প্রহার করার উপকারিতা সন্তানের সাথেই সম্পৃক্ত। প্রহারের ফলে সন্তান সভ্য হবে, ভদ্র হবে ইত্যাদি। একারণে আদিষ্ট ব্যক্তির প্রহারটি আদেশকারীর প্রহার বলে গণ্য হবে না। ফলে সে কসম ভঙ্গকারীও হবে না। পূর্বালোচিত মাসআলাটি ছিল এর বিপরীত। কারণ গোলামকে প্রহার করার উপকারিতা গোলামের সাথেই সম্পৃক্ত নয়। বরং তা মনিবের সাথে সম্পৃক্ত। কেননা গোলাম প্রহারিত হলে সে মনিবকে ভয় পায়, মনিবের কথা মানে, তার আরোপিত দায়িত্ব, কাজ-কর্ম যথাভাবে আঞ্জাম দেয়, তাই সে ক্ষেত্রে আদিষ্ট ব্যক্তির প্রহারটি আদেশকারীর প্রহার বলে গণ্য হয়। এবং একারণে সে কসম ভঙ্গকারী হয়ে যায়।

قوله وَمَنْ قَالَ لِغَيْرِهِ إِنْ بِعْتُ لَكَ الخ : কোনো ব্যক্তি কসম করে আরবিতে বলল اِنْ بِعْتُ لَكَ هٰذَا الثَّوْبَ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ আমি যদি তোমার পক্ষ হতে এই কাপড়টি বিক্রি করি তাহলে আমার স্ত্রী তালাক। অতঃপর مَحْلُوفٌ عَلَيْهِ (যাকে লক্ষ্য করে কসমকারী ব্যক্তি কসম করেছে) ঐ নির্দিষ্ট কাপড়টি কসমকারী ব্যক্তির অন্যান্য কাপড়ের সাথে মিলিয়ে কাপড় বিক্রি করে দিল। এমতাবস্থায় সে নির্দিষ্ট কাপড়টি (যে কাপড়ের ব্যাপারে কসম ছিল) বিক্রি হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও কসমকারী কসম ভঙ্গকারী হবে না। এ হলো এক মাসআলা,

দ্বিতীয় মাসআলা কোনো ব্যক্তি কসম করে বলল– اِنْ بِعْتُ ثَوْبًا لَكَ فَامْرَأَتِي طَالِقٌ আমি যদি তোমার কাপড়টি বিক্রি করি তাহলে তার নিজের স্ত্রী তালাক। এরপর مَحْلُوفٌ عَلَيْهِ নির্দিষ্ট কাপড়টি কসমকারীর কিছু কাপড়ের সাথে মিলিয়ে রাখল। অতঃপর কসমকারী ব্যক্তি সবগুলো বিক্রি করে দিল। এমতাবস্থায় সবগুলো কাপড়ের সাথে সেই কাপড়টি (যে কাপড়ের ব্যাপারে কসম করা হয়েছিল) বিক্রি হয়ে যাওয়ার কারণে কসমকারী ব্যক্তি হানেস হয়ে যাবে। মোটকথা, উভয় মাসআলার নির্দিষ্ট কাপড়টি বিক্রি কসমকারীর অজ্ঞান্তে বিক্রি হয়েছে। কিন্তু এর ফলে প্রথম মাসআলায় সে কসম ভঙ্গকারী হয় না। দ্বিতীয় মাসআলায় কসম ভঙ্গকারী হয়ে যায়। মাসআলা দুটির পার্থক্য বুঝার পূর্বে কসমকারীর বাক্য দুটির প্রতি লক্ষ্য করা উচিত। প্রথম মাসআলার বাক্যটি ছিল اِنْ بِعْتُ لَكَ هٰذَا الثَّوْبَ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ দ্বিতীয় মাসআলার বাক্যটি ছিল اِنْ بِعْتُ ثَوْبًا لَكَ فَامْرَأَتِي طَالِقٌ প্রথম বাক্যে لَكَ শব্দটি بِعْتُ ক্রিয়ার পরে উল্লেখ আছে। আর দ্বিতীয় বাক্যে لَكَ উল্লেখ আছে ثَوْبًا শব্দের পরে। এই لَكَ শব্দটির ব্যবহার স্থানগত তারতম্যের কারণে মাসআলা দুটিতে পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে।

এ পর্যায়ে ل (حَرْفِ جَرّ) সম্পর্কিত এ কায়দা আমাদের জানা থাকা দরকার। তা হলো এই যে, ل কখনো مِلْك বা মালিকানা অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন– اَلْمَالُ لِزَيْدٍ আবার কখনো تَعْلِيل (কারণে) বা উদ্দেশ্য বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন فَعَلْتُ هٰذَا لِمَرْضَاتِكَ আমি এ কাজটি করেছি তোমার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে। দুটি অর্থের একটি অর্থ তখনই নেওয়া যায় যখন তার পক্ষে কোনো প্রাধান্য দানকারী কারণ থাকে কিংবা যখন অপর অর্থটি গ্রহণ করা অসম্ভব হয়ে থাকে। তারপর আরো দুটি মূলনীতি সম্পর্কে জানা থাকা আবশ্যক। ১. বাক্যের শব্দগত কাঠামো ঠিক রেখে বাক্যের অর্থ উপলব্ধি করা উত্তম বাক্যের কাঠামো পরিবর্তন করার তুলনায় ২. যেসব কাজে প্রতিনিধিত্ব চলে (যেমন ক্রয়-বিক্রয়) সেসব কাজ মানুষ কখনো নিজের জন্য করে, আবার কখনো অন্যের জন্যও করে বা অন্যের প্রতিনিধি হিসাবেও করে। পক্ষান্তরে যেসব কাজে প্রতিনিধিত্ব চলে না। (যেমন খাওয়া পান করা) সেসব কাজ মানুষ কেবল নিজের জন্যই করে। কখনো অন্যের পক্ষ হতে করে না।

https://e-ilm.weebly.com/

সম্পর্কিত কায়দা ও পরবর্তী মূলনীতি দুটির আলোকে কসমকারীর বাক্য দুটির প্রতি আবার লক্ষ্য করলে দেখব প্রথম বাক্যে ل অব্যয়টি بِعْتُ ক্রিয়ার সাথে মিলে আছে। তাই প্রথম মূলনীতির আলোকে বাক্যটির অর্থ হবে তোমার জন্য বিক্রি করি। আর দ্বিতীয় মূলনীতির আলোকেও এ অর্থ সঠিক। কেননা বিক্রি এমন কাজ যাতে প্রতিনিধিত্ব চলে একজন অপর জনের পক্ষ হতে করতে পারে। এতএব, এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, এ বাক্যে ل অব্যয়টি تَعْلِيل -এর অর্থে অর্থাৎ তোমার কারণে বিক্রি করা। আর তোমার কারণে বিক্রি করার মর্ম হলো। তোমার নির্দেশের কারণে বিক্রি করা। অতএব, বলা যায় بِعْتُ لَكَ -এর অর্থ হলো بِعْتُ لِأَمْرِكَ আর আলোচ্য মাসআলায় যেহেতু কসমকারী ব্যক্তি مَحْلُوْفٌ عَلَيْهِ -এর নির্দেশে বিক্রি করে নাই, তাই হিনসের শর্ত পাওয়া যায় নিই। যার ফলে সে কসম ভঙ্গকারী হবে না।

পক্ষান্তরে দ্বিতীয় মাসআলায় ل অব্যয়টি ثَوْبًا -এর পরে উল্লেখ আছে। তাই পূর্বোক্ত মূলনীতির আলোকে বাক্যের অর্থ হবে তোমার কাপড়টি যদি আমি বিক্রি করি। (তোমার নির্দেশে হোক, বা নির্দেশ ছাড়া হোক, জেনে হোক বা না জেনে হোক) অর্থাৎ এ বাক্যে ل অব্যয় مِلْكٌ বা মলিকানা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর আলোচ্য মাসআলায় যেহেতু কসমকারী ব্যক্তি مَحْلُوْفٌ عَلَيْهِ -এর কাপড় বিক্রি করে দিয়েছে (যদিও তা অজান্তে ও নির্দেশ ছাড়া) তাই হিনসের শর্ত পাওয়া গেছে, অতএব সে কসম ভঙ্গকারী হয়ে যাবে।

সংক্ষেপে বলা যায়, প্রথম কসমটি ছিল আমি যদি তোমার কারণে তথা তোমার নির্দেশের কারণে কাপড়টি বিক্রি করি তাহলে আমার স্ত্রী তালাক। অতঃপর নির্দেশ ক্রমে কাপড় বিক্রি পাওয়া যায়নি। বিধায় কসমকারী ব্যক্তি কসম ভঙ্গকারী হবে না। দ্বিতীয় মাসআলায় কসমটি ছিল আমি যদি তোমার কাপড় তথা তোমার মালিকানাধীন কাপড় বিক্রি করি তাহলে আমার স্ত্রী তালাক। অতঃপর কসমকারী কর্তৃক مَحْلُوْفٌ عَلَيْهِ -এর মালিকানাধীন কাপড় বিক্রি করার বিষয়টি পাওয়া গেছে, তাই কসমকারী এ সুরতে কসম ভঙ্গকারী হয়ে যাবে। ক্রয়-বিক্রয়ের মতো আরো যে সকল কাজে প্রতিনিধিত্ব চলে সেসব কাজের ক্ষেত্রে ل অব্যয় আগ পিছ করার মাধ্যমে এ ধরনের পার্থাক্য সৃষ্টি হবে।

পক্ষান্তরে যে সকল কাজে প্রতিনিধিত্ব চলে না (যে. পানাহার ইত্যাদি) সে সকল কাজের ক্ষেত্রে ل অব্যয় আগ পিছ করার কারণে পূর্বোক্ত পার্থক্য সৃষ্টি হবে না। বরং সেক্ষেত্রে ل সর্বদা মলিকানার অর্থ প্রদান করবে। যেমন– إِنْ أَكَلْتُ طَعَامًا لَكَ ও إِنْ أَكَلْتُ لَكَ طَعَامًا উভয় বাক্যের অর্থ হবে এক। অর্থাৎ আমি যদি তোমার খাবার তথা তোমার মালিকনাধীন খাবার খাই তাহলে এমতাবস্থায় حَالِفٌ কর্তৃক مَحْلُوْفٌ عَلَيْهِ -এর খাবার খাওয়া বাস্তবায়িত হলেই حَالِفٌ কসম ভঙ্গকারী হয়ে যাবে। নির্দেশ ও জানার কোনো প্রয়োজন হবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

وَمَنْ قَالَ هٰذَا الْعَبْدُ حُرٌّ إِنْ بِعْتُهُ فَبَاعَهُ عَلٰى اَنَّهُ بِالْخِيَارِ عَتَقَ لِوُجُوْدِ الشَّرْطِ وَهُوَ الْبَيْعُ وَالْمِلْكُ فِيْهِ قَائِمٌ فَيَنْزِلُ الْجَزَاءُ وَكَذٰلِكَ لَوْ قَالَ الْمُشْتَرِيْ إِنْ اِشْتَرَيْتُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَاشْتَرَاهُ عَلٰى اَنَّهُ بِالْخِيَارِ عَتَقَ اَيْضًا لِاَنَّ الشَّرْطَ قَدْ تَحَقَّقَ وَهُوَ الشِّرَاءُ وَالْمِلْكُ قَائِمٌ فِيْهِ، وَهٰذَا عَلٰى اَصْلِهِمَا ظَاهِرٌ، وَكَذَا عَلٰى اَصْلِهِ لِاَنَّ هٰذَا الْعِتْقَ بِتَعْلِيْقِهِ وَالْمُعَلَّقُ كَالْمُنْجِزِ، وَلَوْ نَجَزَ الْعِتْقَ يَثْبُتُ الْمِلْكُ سَابِقًا عَلَيْهِ فَكَذَا هٰذَا ـ

অনুবাদ : কেউ যদি কসম করে যে, যদি এই গোলামটি বিক্রি করি তাহলে সে আজাদ। অতঃপর সে তাকে ইচ্ছাধিকারের শর্তে বিক্রি করল তাহলে আজাদ হয়ে যাবে। কেননা মুক্তির শর্ত অর্থাৎ বিক্রয় সাব্যস্ত হয়েছে। এবং গোলামটিতে তার মালিকানা বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং তার পরিণতি সাব্যস্ত হবে। **তদ্রূপ যদি ক্রেতা বলে যে, যদি আমি তাকে খরিদ করি তাহলে সে আজাদ। অতঃপর সে তাকে ইচ্ছাধিকারের শর্তে খরিদ করল তাহলে আজাদ হয়ে যাবে।** কেননা মুক্তির শর্ত অর্থাৎ ক্রয় সাব্যস্ত হয়েছে। আর গোলামের মাঝে তার মালিকানা বিদ্যমান রয়েছে। সাহেবাইনের মূলনীতি অনুযায়ী মালিকানা বিদ্যমান থাকা তো পরিষ্কার। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মূলনীতি অনুসারেও তাই। কেননা এই মুক্তিটি তার শর্তায়নের কারণে সাব্যস্ত হয়েছে। আর (অস্তিত্বের ব্যাপারে) শর্তায়িত বিষয় অশর্তায়িত বিষয়েরই মতো। এমতাবস্থায় যদি তাৎক্ষণিক আজাদ করে তাহলে মুক্তি দানের সংলগ্ন পূর্বে মালিকানা সাব্যস্ত হয়ে যাবে। সুতরাং এখানেও তাই হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কেউ বলল, আমি যদি এ দাসটি বিক্র করি তাহলে সে আজাদ। অতঃপর খিয়ারে শর্ত সাপেক্ষ বিক্রয় করল। এমতাবস্থায় সকলের মতে দাস আজাদ হয়ে যাবে। কারণ আজাদ হওয়ার জন্য যে শর্ত ছিল তাকে বিক্রয় করা তা পাওয়া গেছে এবং দাসের উপর মনিবের মালিকানাও বহাল আছে। কেননা বিক্রেতার তরফে খিয়ার থাকলে বিক্রীত পণ্য বিক্রেতার মালিকানা হতে বের হয় না। বরং তার মালিকানাই থাকে খিয়ারের মুদ্দত শেষ হওয়া পর্যন্ত। মোটকথা দাস যেহেতু তার মালিকানায় আছে এবং আজাদি শর্তও পাওয়া গেছে, তাই আজাদ হয়ে যাবে কিন্তু যদি খিয়ারে শর্ত ছাড়া সাধারণভাবে বিক্রি করে তাহলে আজাদ হবে না। কারণ তখন মনিবের মালিকানা থাকবে না। কসমটি তখন নিষ্ফল কসমে পরিণত হবে। অনুরূপভাবে কেউ বলল আমি যদি এ দাসটি ক্রয় করি তাহলে সে আজাদ। অতঃপর খিয়ারের শর্ত সাপেক্ষে ক্রয় করল। এমতাবস্থায়ও সে আজাদ হয়ে যাবে। খিয়ারে শর্তের ক্ষেত্রে সাহেবাইনের যে উসূল রয়েছে সে অনুযায়ী আজাদ হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটি স্পষ্ট। সাহেবাইনের উসূল হলো, ক্রেতার তরফে খিয়ার থাকলে ক্রয়কৃত পণ্য তার মালিকানায় প্রবেশ করতে কোনো বাধা নেই। অতএব, যখন দাসের উপর তার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হলো এবং আজাদির শর্ত (ক্রয় করা) ও পাওয়া গেল তখন অবশ্যই সে আজাদ হয়ে যাবে। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর উসূল হলো– ক্রেতার খিয়াব থাকলে ক্রয়কৃত পণ্য তার মালিকানায় প্রবেশ করে না। এ হিসাবে দাস আজাদ না হওয়ার কথা। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মতেও গোলাম আজাদ হয়ে যাবে। কারণ ব্যক্তি আজাদিকে مُعَلَّق (শর্তযুক্ত) করেছে ক্রয়ের সাথে। আর مُعَلَّق বিষয় مُنْجَز (কার্যকরী) বিষয়ের মতোই। তাই কেমন যেন ব্যক্তি তাকে ক্রয় করার সময় একথা বলেছে যে, আমি এ দাসকে আজাদ করে দিলাম। ফলে সে আজাদ হয়ে যাবে। আজাদ হওয়ার পূর্বে ক্রেতার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে এবং খিয়ারে শর্ত বাতিল হয়ে যাবে। মোটকথা যেহেতু সে আজাদিকে ক্রয় -এর সাথে শর্তায়িত করেছিল আর শর্ত (ক্রয়) পাওয়া গেছে, তাই সে আজাদ হয়ে যাবে। যেমনিভাবে শর্তায়িত করা ছাড়াই যদি ব্যক্তি দাসকে ক্রয় করার সময় তাৎক্ষণিকভাবে আজাদ করত তাহলে আজাদ হয়ে যেত।

পক্ষান্তরে যদি এমন বলে যে, আমি যদি এ দাসের মালিক হই, তাহলে সে আজাদ অতঃপর খিয়ারে শর্তের সাথে ক্রয় করে, তাহলে আজাদ হবে না। কারণ ক্রেতার খিয়ার থাকার কারণে তার মালিকানা পাওয়া যায় নি, যা ছিল আজাদির জন্য শর্ত, তাই সে আজাদ হবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

وَمَنْ قَالَ اِنْ لَمْ اَبِعْ هٰذَا الْعَبْدَ اَوْ هٰذِهِ الْاَمَةَ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ فَاَعْتَقَ اَوْ دَبَّرَ طُلِّقَتْ اِمْرَأَتُهُ لِاَنَّ الشَّرْطَ قَدْ تَحَقَّقَ وَهُوَ عَدَمُ الْبَيْعِ لِفَوَاتِ مَحَلِّيَّةِ الْبَيْعِ ـ وَاِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا تَزَوَّجْتَ عَلَيَّ فَقَالَ كُلُّ اِمْرَاَةٍ لِيْ طَالِقٌ ثَلَاثًا طُلِّقَتْ هٰذِهِ الَّتِي حَلَّفَتْهُ فِي الْقَضَاءِ وَعَنْ اَبِيْ يُوْسُفَ اَنَّهَا لَا تَطْلُقُ لِاَنَّهُ اَخْرَجَهُ جَوَابًا فَيَنْطَبِقُ عَلَيْهِ، وَلِاَنَّ غَرْضَهُ اِرْضَاؤُهَا وَهُوَ بِطَلَاقِ غَيْرِهَا فَيَتَقَيَّدُ بِهٖ . وَجْهُ الظَّاهِرِ عُمُوْمُ الْكَلَامِ وَقَدْ زَادَ عَلٰى حَرْفِ الْجَوَابِ فَيُجْعَلُ مُبْتَدِئًا، وَقَدْ يَكُوْنُ غَرَضُهُ اِيْحَاشُهَا حِيْنَ اِعْتَرَضَتْ عَلَيْهِ فِيْمَا اَحَلَّهُ الشَّرْعُ وَمَعَ التَّرَدُّدِ لَا يَصْلُحُ مُقَيِّدًا، وَاِنْ نَوٰى غَيْرَهَا يُصَدَّقُ دِيَانَةً لَا قَضَاءً لِاَنَّهُ تَخْصِيْصُ الْعَامِّ ـ

অনুবাদ : যদি কেউ বলে যে, যদি এই গোলামটি কিংবা এই দাসীটি আমি বিক্রি না করি তাহলে তার (নিজের স্ত্রী তালাক। অতঃপর সে উক্ত দাস বা দাসীকে সে আজাদ করে দিল কিংবা মুদাব্বার ঘোষণা করল তাহলে তার স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে। কেননা বিক্রির পাত্রত্ব বিলুপ্ত হওয়ার কারণে বিক্রি না করার শর্ত বাস্তবায়িত হয়ে গেছে।

স্ত্রী যদি স্বামীকে বলে যে, তুমি আমার বর্তমানে অন্য বিবাহ করেছ। তখন স্বামী বলল আমার প্রতিটি স্ত্রী তিন তালাক। তাহলে বিচারগত দিক থেকে এই স্ত্রীটিও যে তাকে হলফ করিয়েছে তালাক হয়ে যাবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, সে তালাক হবে না। সে তার বক্তব্যকে কথার প্রতিউত্তররূপে উচ্চারণ করেছে। অতএব, সেটা উক্ত কথার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। তাছাড়া স্বামীর উদ্দেশ্য হলো, অন্য স্ত্রীকে তালাক প্রদানের মাধ্যমে তাকে সন্তুষ্ট করা। সুতরাং তার বক্তব্য অন্যদের তালাকের সাথে বিশিষ্ট হবে।

আর যাহিরে রেওয়াতের কারণ হলো বক্তব্যের ব্যাপকতা। তদুপরি সে মূল বক্তব্যের সাথে অতিরিক্ত শব্দ যোগ করেছে। সুতরাং সেটিকে স্বতন্ত্র বক্তব্য গণ্য করা হবে।

তাছাড়া তার উদ্দেশ্য হতে পারে উক্ত স্ত্রীকে বিপদে ফেলা। কেননা আল্লাহ তার জন্য যা হালাল করেছেন তাতে সে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে। আর অর্থ গত দ্বিধার কারণে তা বিশিষ্ট অর্থে প্রয়োগ হতে পারে না।

যদি সে অন্য স্ত্রীর নিয়ত করে থাকে, তাহলে দিয়ানতের ক্ষেত্রে তাকে বিশ্বাস করা হবে। কিন্তু পার্থিব বিচারের ক্ষেত্রে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা এতে ব্যাপক শব্দকে বিশিষ্ট করা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিউক্ত ইবারতে দুটি মাসআলা আলোচিত হয়েছে।

১. কেউ যদি এরূপ বলে যে, আমি যদি এ দাস বা দাসীকে বিক্রি না করি, তাহলে আমার স্ত্রী তালাক। অতঃপর সে উক্ত দাস বা দাসীকে আজাদ করে দেয়, কিংবা মুদাব্বার বানিয়ে দেয়, তাহলে তার স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে। কারণ তালাক হওয়ার জন্য শর্ত করেছিল তাকে বিক্রি না করা এ শর্ত পাওয়া গেছে। যেহেতু আজাদ করার পর বা মুদাব্বার বানানোর পর দাস দাসী বিক্রির উপযুক্ত থাকে না, বিক্রি করা যায় না। অতএব, যখন শর্ত পাওয়া গেল, তখন জাযাও পাওয়া যাবে, অর্থাৎ দাসী আজাদ হয়ে যাবে।

https://e-ilm.weebly.com/

২. কোনো স্ত্রী নিজ স্বামীকে বলল, আপনি কি আমাকে রেখে অন্য কোনো নারীকে বিবাহ করেছেন? উত্তরে স্বামী বলল- كُلُّ اِمْرَأَةٍ لِيْ طَالِقٌ ثَلَاثًا আমার যত স্ত্রী আছে সব তিন তালাক। এমতাবস্থায় কি হুকুম এ নিয়ে দুরকম মত বর্ণিত হয়েছে।

ক. জাহেরুর রেওয়ায়েত অনুসারে ব্যক্তির সকল স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে। যে স্ত্রীকে তাকে প্রশ্ন করে কসম করতে উদ্বুদ্ধ করেছে সেও তালাক হয়ে যাবে।

খ. ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, এ স্ত্রী তালাক হবে না। এছাড়া অন্যান্য স্ত্রী তালাক হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর কথার দুটি কারণ- **এক.** স্বামী তার কথাটি বলেছেন স্ত্রীর প্রশ্নের জবাবে, অতএব প্রশ্ন যাদের সম্পর্কে ছিল জবাবও কেবল তাদের সম্পর্কেই হবে, এটাই স্বাভাবিক। অর্থাৎ প্রশ্ন ছিল অন্য স্ত্রী সম্পর্কে, তাই জবাবও অন্য স্ত্রী সম্পর্কেই প্রযোজ্য হবে। অন্য স্ত্রী তালাক হবে, এ স্ত্রী নয়। **দুই.** উক্ত কথা দ্বারা স্বামীর উদ্দেশ্য হলো উপস্থিত স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করা। আর এটা তখনই হতে পারে যখন কেবল অন্য স্ত্রী তালাক হয়, তাই কেবল অন্য স্ত্রী তালাক হবে। এ স্ত্রীও যদি তালাক হয়ে যায়, তাহলে তো তাকে সন্তুষ্ট করা হলো না। বরং ক্রোধান্বিত করা হলো, যা কিনা স্বামীর উদ্দেশ্যর পরিপন্থি।

জাহিরে রেওয়ায়েতে যা বলা হয়েছে তার কারণ হলো এই যে, ব্যক্তির (كُلُّ اِمْرَأَةٍ لِيْ) কথাটি عَامٌ বা ব্যাপক। যা সকল স্ত্রীকে অন্তর্ভুক্ত করে। অতএব, কথাটিকে ব্যাপক অর্থেই গ্রহণ করতে হবে। ফলে তার সকল স্ত্রীই তালাক হয়ে যাবে। যদি শুধু অন্যান্য স্ত্রী তালাক হয়, উপস্থিত স্ত্রী তালাক না হয়, তাহলে কথার ব্যাপকতা নষ্ট হয়, অথচ এমন করা কাম্য নয়। যেহেতু এর পিছনে কোনো (مُخَصِّص) উপযুক্ত কারণ নেই। বাকি থাকল ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিলের জবাব। তাঁর প্রথম দলিল ছিল, স্বামীর কথাটি প্রশ্নের জবাব। আমরা বলব না এটা প্রশ্নের জবাব নয় কেননা প্রশ্নের জবাব হলো এতটুকু বলা যথেষ্ট ছিল اِنْ نَكَحْتُ فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا। যদি আমি অন্য কাউকে বিবাহ করে থাকি তাহলে সে তিন তালাক। কিন্তু স্বামী বলেছেন। আমার যত স্ত্রী আছে সবাই তিন তালাক, এর দ্বারা বুঝা যায়। এটা জবাব নয়। বরং নতুন কথা বা পৃথক কথা। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দ্বিতীয় দলিল ছিল, স্বামী কথাটি বলেছেন স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করার জন্য। এর জবাবে আমরা বলব, স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করার জন্য বলেছেন এটা নিশ্চিত নয়। বরং এরূপ সম্ভাবনাও আছে যে, স্বামীর জন্য আল্লাহ তা'আলা যা বৈধ করেছেন (চার বিবাহ করা) তা নিয়ে স্ত্রী আপত্তি করার কারণে তাকে ভয় দেখানোর উদ্দেশ্য স্বামী একথা বলেছে। অতএব, স্বামীর উদ্দেশ্য দুরকম হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় এর দ্বারা কথার ব্যাপকতা নষ্ট করা যাবে না। বরং তা ব্যাপক অর্থেই গ্রহণ করতে হবে। তবে স্বামী যদি বলে যে, আমার উদ্দেশ্য ছিল উপস্থিত স্ত্রী ছাড়া কেবল অন্য স্ত্রীকে তালাক দেওয়া তাহলে তার কথা আল্লাহর কাছে গ্রাহ্য হতে পারে। কারণ সে তার শব্দের পূর্ণ অর্থের কিছু অংশ বাদ দিয়ে কিছু অংশ গ্রহণ করেছে এবং বাক্যটি এরকম অর্থেরও সম্ভাবনা রাখে। কিন্তু পার্থিব বিচারে তার কথা গ্রাহ্য হবে, যেহেতু তা সাধারণ ব্যবহারের পরিপন্থি এবং এর দ্বারা তার প্রতি শৈথিল্য ও হয়ে থাকে।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ الْيَمِيْنِ فِي الْحَجِّ وَالصَّلٰوةِ وَالصَّوْمِ

وَمَنْ قَالَ وَهُوَ فِي الْكَعْبَةِ اَوْ فِيْ غَيْرِهَا عَلَيَّ الْمَشْيُ اِلٰى بَيْتِ اللّٰهِ تَعَالٰى اَوْ اِلَى الْكَعْبَةِ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ اَوْ عُمْرَةٌ مَاشِيًا وَاِنْ شَاءَ رَكِبَ وَاَهْرَاقَ دَمًا وَفِي الْقِيَاسِ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ لِاَنَّهُ الْتَزَمَ مَا لَيْسَ بِقُرْبَةٍ وَاجِبَةٍ وَلَا مَقْصُوْدَةٍ فِي الْاَصْلِ. مَأْثُوْرٌ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ . وَلِاَنَّ النَّاسَ تَعَارَفُوْا اِيْجَابَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِهٰذَا اللَّفْظِ فَصَارَ كَمَا اِذَا قَالَ عَلَيَّ زِيَارَةُ الْبَيْتِ مَاشِيًا فَيَلْزَمُهُ مَاشِيًا، وَاِنْ شَاءَ رَكِبَ وَاَرَاقَ دَمًا، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي الْمَنَاسِكِ ـ

পরিচ্ছেদ : হজ, নামাজ ও রোজা ইত্যাদির কসম প্রসঙ্গ

অনুবাদ : হজ, নামাজ, রোজা ইত্যাদি কসম প্রসঙ্গে ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, কা'বা শরীফে বা অন্যত্র অবস্থান করা অবস্থায় কেউ যদি বলে আমি মানত করলাম যে, বাইতুলায় কিংবা গমন করব। তাহলে তার উপর পদব্রজে একটি হজ অথবা ওমরা আদায় করা ওয়াজিব হবে। তবে ইচ্ছা করলে সওয়ারীর উপর আরোহণ করতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে একটি দম (জরিমানা স্বরূপ কুরবানি) দিতে হবে। কিয়াস অনুযায়ী এই মান্নত দ্বারা কিছুই ওয়াজিব হবে না। কেননা সে নিজের উপর এমন বিষয়ের বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছে, যা কোনো ওয়াজিব ইবাদত নয় এবং মূলত উদ্দেশ্যগতও নয়।

আমাদের এ সিদ্ধান্ত হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া এ ধরনের বক্তব্য দ্বারা নিজের উপর হজ বা ওমরা ওয়াজিব করার প্রচলন জনসাধারণের মাঝে রয়েছে। সুতরাং সে যেন বলল, আমার উপর পদব্রজে বাইতুল্লাহর যিয়ারত করা ওয়াজিব। সুতরাং পদব্রজে গমন করা তার উপর আবশ্যক হবে। তবে ইচ্ছা করলে আরোহণ করতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে একটি দম (জরিমানা স্বরূপ কুরবানি) দিতে হবে। এ মাসআলাটি হজ পর্বে আমরা আলোচনা করেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কেউ যদি বলে, বাইতুল্লাহ কিংবা কা'বা শরীফের দিকে হেঁটে যাওয়া আমার উপর ওয়াজিব, তাহলে তার কথার বাহ্যিক অর্থ অনুযায়ী কা'বা অভিমুখে কিছু পথ (কায়েক মাইল) হেঁটে গেলেই ওয়াজিব আদায় হয়ে যাওয়া উচিত। ওয়াজিব কিন্তু আদায় হবে না বা হয় না, কারণ জনসাধারণের নিকট কাবার দিকে হেঁটে যাওয়া বলতে হেঁটে যাওয়া বুঝানো হয় না, বুঝানো হয় হজ করা বা ওমরা করা। সেহেতু হজ বা ওমরা আদায় করা তার উপর ওয়াজিব হবে। এবং হজ বা ওমরা আদায়ের জন্য তাকে হেঁটে যেতে হবে। হেঁটে যেতে অক্ষম হলে সওয়ার হয়ে যাওয়াও জায়েজ আছে, তবে এজন্য তাকে দম জরিমানা স্বরূপ কুরবানি দিতে হবে। কিয়াসের দাবি ছিল দম (জরিমানা স্বরূপ কুরবানি) ওয়াজিব না হওয়া কেননা পায়ে হেঁটে যাওয়া কোনো মাকসুদ ইবাদত নয়। কিন্তু আমরা এক্ষেত্রে কিয়াস পরিত্যাগ করে হযরত

https://e-ilm.weebly.com/

আলী (রা.) হতে বর্ণিত হুকুম অনুসরণ করেছি। ইমাম মুহাম্মদ (র.) কিতাবুল আছারে বর্ণনা করেছেন, কেউ যদি বাইতুল্লাহর অভিমুখে হেঁটে যাওয়া নিজের উপর অবধারিত করার পর কিছু পথ হেঁটে যায়, অতঃপর কিছু পথ সওয়ার হয়ে যায়, তাহলে ইবরাহীম নাখয়ী (র.) বলেছেন, সে ফিরে এসে যেখান থেকে সওয়ার হয়েছিল, সেখান থেকে পুনরায় হেঁটে যাবে। রেওয়াতটি উদ্ধৃত করার পর ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেছেন, কিন্তু আমরা ইবরাহীম নাখয়ীর এমত গ্রহণ করি না। আমরা গ্রহণ করি হযরত আলী (রা.)-এর কথা। তিনি বলেছেন যদি সে সওয়ার হয়ে গমন করে তাহলে একটি ছাগ পাঠাবে ছাগটি জবাই করে সদকা করে দেওয়া হবে। তা থেকে সে নিজে খেতে পারবে না। হজ ওমরা আদায় করবে। এটাই তার জন্য যথেষ্ট। অন্য কিছু তার উপর ওয়াজিব নয়। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মাযহাবও তাই। ইমাম বায়হাকী (র.) নিজ সনদে ইমাম শাফেয়ী (র.) হতে বর্ণনা করেছেন– حَدَّثَنَا ابْنِ عُلَيَّةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ আব্দুর রাজ্জাক নিজ সনদে ইবরাহীম নাখয়ী হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি হযরত আলী (রা.) হতে তিনি ইরশাদ করেছেন, উপরিউক্ত ব্যক্তি পায়ে হেঁটে যাবে। অক্ষম হলে ছওয়ার হয়ে যাবে এবং একটি হাদী প্রেরণ করবে। উপরিউক্ত সনদ দুটির সকল রাবী আলেম ও সেকাহ বা নির্ভরযোগ্য। কিন্তু হাসান এবং ইবরাহীম নাখয়ী (র.) হযরত আলী (রা.) হতে হাদীস শুনেন নি। তথাপি এ বিষয়টি আমাদের জন্য ক্ষতিকর নয়। এ বিষয়ে হযরত ওকবা ইবনে আমের (রা.)-এর হাদীসও বর্ণিত আছে। তিনি বলেন আমার বোন মান্নত করেছিল বাইতুল্লাহ শরীফে হেঁটে যাবে। তারপর সে হেঁটে যেতে অক্ষম হলো তখন হুজুর ﷺ বললেন, হেঁটে যাও এবং সওয়ার হয়ে যাও। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসটি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতেও বর্ণিত আছে। সে রেওয়ায়েতে একথা ও আছে যে, সে একটি হাদী প্রেরণ করবে। এ হাদীসটি তাখরীজ করেছে আবূ ইয়া'লা, ত্বহাবী ও বায়হাকী (র.) ইমাম আহমদ নিজ মুসনাদে, তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী ও ইমাম ইবনে মাজাহ নিজ নিজ সুনানেও তাখরীজ করেছেন। হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.)-এর হাদীসে আছে হুজুর ﷺ তার এক ভাষণে আমাদেরকে সদকা করতে আদেশ করেছেন, মুছলা করতে নিষেধ করেছেন। তিনি এও বলেছেন যে, পায়ে হেঁটে হজে যাওয়ার নিয়ত করাও মুছলার শামিল। যে ব্যক্তি পায়ে হেঁটে হজে যাওয়ার নিয়ত করে, তার কর্তব্য হবে একটি কুরবানি দিয়ে দেওয়া এবং সওয়ার হয়ে হজে যাওয়া। –(মুস্তাদরাকে হাকেম)।

https://e-ilm.weebly.com/

وَلَوْ قَالَ عَلَيَّ الْخُرُوْجُ اَوِ الذَّهَابُ اِلٰى بَيْتِ اللّٰهِ تَعَالٰى فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِاَنَّ اِلْتِزَامَ الْحَجِّ اَوِ الْعُمْرَةِ بِهٰذَا اللَّفْظِ غَيْرُ مُتَعَارَفٍ وَلَوْ قَالَ : عَلَيَّ الْمَشْيُ اِلَى الْحَرَمِ اَوْ اِلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَهٰذَا عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ فِيْ قَوْلِهِ عَلَيَّ الْمَشْيُ اِلَى الْحَرَمِ حِجَّةٌ اَوْ عُمْرَةٌ وَلَوْ قَالَ اِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَهُوَ عَلٰى هٰذَا الْاِخْتِلَافِ. لَهُمَا اَنَّ الْحَرَمَ شَامِلٌ عَلَى الْبَيْتِ، وَكَذَا الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ فَصَارَ ذِكْرُهُ كَذِكْرِهِ، بِخِلَافِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِاَنَّهُمَا مُنْفَصِلَانِ عَنْهُ . وَلَهُ اَنَّ اِلْتِزَامَ الْاِحْرَامِ بِهٰذِهِ الْعِبَارَةِ غَيْرُ مُتَعَارَفٍ وَلَا يُمْكِنُ اِيْجَابُهُ بِاعْتِبَارِ حَقِيْقَةِ اللَّفْظِ فَامْتَنَعَ اَصْلًا -

অনুবাদ : আর যদি বলে, আমার উপর বাইতুল্লাহর দিকে রওয়ানা হওয়া বা গমন করা আবশ্যক। তাহলে তার উপর কোনো কিছু ওয়াজিব হবে না। কেননা এ শব্দ দ্বারাও হজ ওমরার মানত করার প্রচলন নেই।

আর যদি বলে, আমি হারামে কিংবা সাফা মারওয়ায় পদব্রজে গমন করার মানত করলাম। তাহলে তার উপর কোনো কিছু ওয়াজিব হবে না। এ হলো ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মত। আর ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.) বলেন, হারামের দিকে পদব্রজে যাওয়া উল্লেখের ক্ষেত্রে একটি হজ বা ওমরা ওয়াজিব হবে। আর যদি মুসজিদুল হারামের দিকে যাওয়ার কথা বলে তাহলে এতেও এ মতপার্থক্য রয়েছে।

সাহেবাইনের দলিল এই যে, হারাম শব্দটি বাইতুল্লাহকে নিকটবর্তী হওয়ার কারণে অন্তর্ভুক্ত করে। তেমনি মসজিদুল হারাম বাইতুল্লাহকে অন্তর্ভুক্ত করে। সুতরাং হারামের উল্লেখ বাইতুল্লাহর উল্লেখের সমতুল্য। কিন্তু সাফা মারওয়ার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা এ দুটি বাইতুল্লাহ থেকে বিচ্ছিন্ন। ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর দলিল হলো এ ধরনের বক্তব্য দ্বারা ইহরামের বাধ্যবাধকতা গ্রহণ প্রচলিত নেই। আর শব্দের প্রকৃত অর্থের বিচারে তা আবশ্যকীয় করা সম্ভব নয়। সুতরাং সর্বদিক দিয়েই তা অগ্রহণীয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

عَلَى الْخُرُوْجِ اَوِ الذَّهَابِ اِلٰى بَيْتِ اللّٰهِ বললে হজ ও ওমরা ওয়াজিব হবে না। কারণ উপরিউক্ত শব্দ আভিধানিকভাবে হজ ওমরা বুঝায় না, জন সাধারণেও হজ ওমরার অর্থে ব্যবহার করা হয়। তাই উপরিউক্ত করণে এসব শব্দে হজ ওমরা ওয়াজিব হবে না।

عَلَى الْمَشْيِ اِلَى الصفا وَالْمَرْوَةِ বললে কারো মতে কিছু ওয়াজিব হবে না উপরিউক্ত কারণে। عَلَى الْمَشْيِ اِلَى الْحَرَمِ اَوْ اِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ বললে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে কিছু ওয়াজিব হবে না। কারণ এসব শব্দ আভিধানিকভাবেও হজ বুঝায় না, জনসাধারণেও এর দ্বারা হজ ওমরা বুঝানোর প্রচলন নেই। সাহেবাইনের মতে হজ ওমরা ওয়াজিব হবে। কারণ মসজিদে হারাম বাইতুল্লাহকে অন্তর্ভুক্ত করে। তাই মসজিদে হারামের কথা বলা বা বাইতুল্লাহর কথা বলা একরকম। আর বাইতুল্লাহর কথা বললে যেহেতু হজ ওমরা ওয়াজিব হয়, সেহেতু মসজিদে হারাম বলার দ্বারাও হজ ওমরা ওয়াজিব হবে।

ফায়দা : চলা শব্দটি ইহরাম বাধার অর্থের জন্য গঠন করা হয়নি, উরফ বা জনসাধারণে ইহরাম বাধার অর্থে ব্যবহার হয় না, তাই এ শব্দের মাধ্যমে ইহরাম ওয়াজিব করা অসম্ভব।

https://e-ilm.weebly.com/

وَمَنْ قَالَ عَبْدِيْ حُرٌّ اِنْ لَمْ اَحُجَّ الْعَامَ، وَقَالَ : حَجَجْتُ وَشَهِدَ شَاهِدَانِ اَنَّهُ ضَحّٰى الْعَامَ بِالْكُوْفَةِ لَمْ يُعْتَقْ عَبْدُهُ، وَهٰذَا عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ وَاَبِيْ يُوْسُفَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ : يُعْتَقُ لِاَنَّ هٰذِهِ شَهَادَةٌ قَامَتْ عَلٰى اَمْرٍ مَعْلُوْمٍ وَهُوَ التَّضْحِيَةُ، وَمِنْ ضَرُوْرَتِهِ اِنْتِفَاءُ الْحَجِّ فَيَتَحَقَّقُ الشَّرْطُ . وَلَهُمَا اَنَّهَا قَامَتْ عَلَى النَّفْيِ لِاَنَّ الْمَقْصُوْدَ مِنْهَا نَفْيُ الْحَجِّ لَا اِثْبَاتُ التَّضْحِيَةِ لِاَنَّهُ لَا مَطَالِبَ لَهَا فَصَارَ كَمَا اِذَا شَهِدُوْا اَنَّهُ لَمْ يَحُجَّ الْعَامَ . غَايَةُ الْاَمْرِ اَنَّ هٰذَا النَّفْيَ مِمَّا يُحِيْطُ عِلْمُ الشَّاهِدِ بِهِ وَلٰكِنَّهُ لَا يُمَيِّزُ بَيْنَ نَفْيٍ وَنَفْيٍ تَيْسِيْرًا ـ

অনুবাদ : কেউ যদি বলে যে, যদি আমি এ বছর হজ না করি তাহলে আমার গোলাম আজাদ। অতঃপর সে বলে যে, আমি হজ করেছি। অথচ দুজন সাক্ষী সাক্ষ্য দান করে যে, এ বছর সে কূফায় কুরবানি করেছে। এমতাবস্থায় ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে গোলাম আজাদ হবে না। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে আজাদ হয়ে যাবে। কেননা এটা হচ্ছে একটি প্রকাশ্য বিষয়ে প্রদত্ত সাক্ষ্য। অর্থাৎ এ বছর কূফায় কুরবানি করা। আর এর অনিবার্য পরিণতি হজ না করা। সুতরাং শর্ত বিদ্যমান হয়ে যাবে। সাহেবাইনের দলিল এই যে, একটি নেতিবাচক বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করা হয়েছে। কেননা এর উদ্দেশ্য কূফায় কুরবানি সাব্যস্ত করা নয়, বরং হজের দাবি প্রত্যাখ্যান করা। কুরবানির বিষয়ে কেউ দাবিদার নেই। সুতরাং এমনই হলো যেন তারা সাক্ষ্য দিল সে হজ করেনি।

বেশির চেয়ে বেশি এই বলা যায় যে, এ নাবাচক বিষয়টি এমন, যা সাক্ষ্যদাতার জ্ঞানের আওতাভুক্ত। কিন্তু সহজীকরণের প্রেক্ষিতে দুই নাবাচক বিষয়ের মাঝে পার্থক্য করা হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

এক ব্যক্তি বলল, আমি যদি এ বছর হজ না করি তাহলে আমার দাস আজাদ। অতঃপর সে দাবি করল আমি হজ করেছি। কিন্তু দুজন সাক্ষী সাক্ষ্য দিল এ ব্যক্তি এ বছর কূফা নগরীতে কুরবানি করেছে। এমতাবস্থায় ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মত হলো তার দাস আজাদ হবে না। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে আজাদ হয়ে যাবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো– জানার যোগ্য একটি বিষয়ে (কুরবানি করা) দুজন সাক্ষ্য সাক্ষী দিয়েছে যে, এ ব্যক্তি কূফায় কুরবানি করেছে আর কূফায় কুরবানি করা থেকে আবশ্যকীয়ভাবে প্রমাণিত হয় যে সে হজ করেনি। আর হজ না করা ছিল আজাদির জন্য শর্ত। অতএব, যখন শর্ত (হজ না করা) পাওয়া গেল তখন জাযাও পাওয়া যাবে, অর্থাৎ দাস আজাদ হয়ে যাবে। ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল হলো সাক্ষী দুজন সাক্ষ্য দিয়েছে একটি নেতিবাচক বিষয়ে, অর্থাৎ তাদের সাক্ষ্যের উদ্দেশ্য হলো ব্যক্তির হজ না করা প্রমাণিত করা। কূফায় কুরবানি করার বিষয়টি প্রমাণ করা উদ্দেশ্য নয়। যেহেতু কুরবানির ব্যাপারে কোনো বিতর্ক নেই। অতএব, কেমন যেন সাক্ষীরা এটা বলল যে, এ লোক হজ করেনি। আর নেতিবাচক সাক্ষ্য গ্রহণীয় নয় বিধায় তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না। এমতাবস্থায় ব্যক্তির দাবি বহাল থাকবে। ফলে দাস আজাদ হওয়া থেকে বঞ্চিত হবে।

غاية الامر এই ইবারতটি একটি প্রশ্নের জবাব। প্রশ্নটি এই যে, নেতিবাচক বিষয়ে সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয় কথাটি সঠিক নয়। বরং কথা হলো এই যে, নেতিবাচক বিষয় দুধরনের হয়।

১. জানার যোগ্য, ২. জানার অযোগ্য। তন্মধ্যে প্রথম প্রকারের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। আর দ্বিতীয় প্রকারের সাক্ষ্য অগ্রহণ যোগ্য আলোচ্য ক্ষেত্রে নেতিবাচক বিষয়টি জানার যোগ্য অর্থাৎ কুরবানি করা। অতএব, এ সাক্ষ্য নেতিবাচক হলেও গ্রহণযোগ্য হওয়া উচিত ছিল মূলনীতির আলোকে। এর উত্তরে বলা হয়েছে এরকম পার্থক্য করতে গেলে কার্যত অনেক জটিলতা দেখা দিবে। তাই জটিলতা এড়ানোর জন্য বা মানুষের সহজ সাধ্যতার প্রতি খেয়াল রেখে উপরিউক্ত পার্থক্য তুলে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ জানারযোগ্য বিষয়ে নেতিবাচক সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য আর জানার অযোগ্য বিষয়ে নেতিবাচক সাক্ষ্য অগ্রহণযোগ্য। এ ধরনের পার্থক্য করা হয় না।

https://e-ilm.weebly.com/

وَمَنْ حَلَفَ لَا يَصُوْمُ فَنَوَى الصَّوْمَ وَصَامَ سَاعَةً ثُمَّ اَفْطَرَ مِنْ يَوْمِهِ حَنِثَ لِوُجُوْدِ الشَّرْطِ اِذِ الصَّوْمُ هُوَ الْاِمْسَاكُ عَنِ الْمُفْطِرَاتِ عَلٰى قَصْدِ التَّقَرُّبِ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَصُوْمُ يَوْمًا اَوْ صَوْمًا فَصَامَ سَاعَةً ثُمَّ اَفْطَرَ لَا يَحْنَثُ لِاَنَّهُ يُرَادُ بِهِ الصَّوْمُ التَّامُّ الْمُعْتَبَرُ شَرْعًا وَذٰلِكَ بِاِنْهَائِهِ اِلٰى اٰخِرِ الْيَوْمِ، وَالْيَوْمُ صَرِيْحٌ فِيْ تَقْدِيرِ الْمُدَّةِ بِهِ وَلَوْ حَلَفَ لَا يُصَلِّي فَقَامَ وَقَرَاَ وَرَكَعَ لَمْ يَحْنَثْ، وَاِنْ سَجَدَ مَعَ ذٰلِكَ ثُمَّ قَطَعَ حَنِثَ وَالْقِيَاسُ اَنْ يَحْنَثَ بِالِافْتِتَاحِ اِعْتِبَارًا بِالشُّرُوْعِ فِي الصَّوْمِ . وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ اَنَّ الصَّلَاةَ عِبَارَةٌ عَنِ الْاَرْكَانِ الْمُخْتَلِفَةِ، فَمَا لَمْ يَاْتِ بِجَمِيْعِهَا لَا يُسَمّٰى صَلَاةً، بِخِلَافِ الصَّوْمِ لِاَنَّهُ رُكْنٌ وَاحِدٌ وَهُوَ الْاِمْسَاكُ وَيَتَكَرَّرُ فِي الْجُزْءِ الثَّانِي (وَلَوْ حَلَفَ لَا يُصَلِّيْ صَلَاةً لَا يَحْنَثُ مَا لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ) لِاَنَّهُ يُرَادُ بِهِ الصَّلَاةُ الْمُعْتَبَرَةُ شَرْعًا وَاَقَلُّهَا رَكْعَتَانِ لِلنَّهْيِ عَنِ الْبُتَيْرَاءِ ـ

অনুবাদ : কেউ যদি কসম করে যে, সে রোজা রাখবে না। অতঃপর রোজার নিয়ত করে এবং কিছু সময় পানাহার থেকে বিরত থাকে। এরপর সেদিনই রোজা ভঙ্গ করে তাহলে কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা যেহেতু রোজার অর্থ হচ্ছে ছওয়াবের নিয়তে রোজা ভঙ্গকারী বিষয়াদি থেকে বিরত থাকা সেহেতু কসমের শর্ত বিদ্যমান হয়ে গেছে। **আর যদি কসম করে যে, একদিন রোজা রাখবে না, বা একটি রোজা রাখবে না। অতঃপর কিছু সময় রোজা রেখে তা ভঙ্গ করে ফেলে তাহলে কসম ভঙ্গ হবে না।**

কেননা এ বক্তব্য দ্বারা উদ্দেশ্য হলো একটি পূর্ণ রোজা যা শরিয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য। আর তা হবে দিনের শেষ পর্যন্ত পূর্ণ করার দ্বারা। তাছাড়া মেয়াদ নির্ধারণের ক্ষেত্রে দিন শব্দটি প্রত্যক্ষ।

যদি কসম করে যে নামাজ পড়বে না। অতঃপর কিয়াম, কেরাত ও রুকূ' আদায় করল। তাহলে কসম ভঙ্গ হবে না। কিন্তু যদি সেই সাথে সেজদা করে, তারপর নামাজ ভঙ্গ করে তাহলে কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে।

রোজা শুরু করার সাথে তুলনা করলে কিয়াসের দাবি হলো নামাজ শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে কসম ভেঙ্গে যাওয়া। কিন্তু সূক্ষ্ম কিয়াসের কারণ এই যে, নামাজ হলো বিভিন্ন রোকনের সমষ্টি। সুতরাং সবকটি রোকন আদায় না করা পর্যন্ত নামাজ বলা হবে না। পক্ষান্তরে রোজার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা রোজা হচ্ছে একটি মাত্র রোকন, অর্থাৎ বিরত থাকা যা রোজা শুরু করার দ্বিতীয় মুহূর্তে পুনরাবৃত্ত হতে থাকে। **আর যদি কসম করে যে, একটি নামাজ পড়বে না, তাহলে দুই রাকাত না পড়া পর্যন্ত কসম ভঙ্গ হবে না।**

কেননা এ বক্তব্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে শরিয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নামাজ। আর তার সর্বনিম্ন পরিমাণ হচ্ছে দুরাকাত। কারণ এক রাকাত নামাজ পড়া সম্পর্কে হাদীসে নিষেধ এসেছে।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আমি রোজা রাখব না, এরকম কসম করার পর কিছু সময় রোজা রেখে ভেঙ্গে ফেললেও কসম ভঙ্গকারী হবে। কারণ রোজা রাখা পাওয়া গেছে। রোজার অর্থ হলো ছওয়াব হাসিলের নিয়তে পানাহার ও স্ত্রী মিলন হতে বিরত থাকা। এ বিষয়টি কিছুক্ষণের জন্য হলেও রোজা রেখেছে বলা যায়। অতএব, হিনসের শর্ত বাস্তবায়িত হওয়ার কারণে সে কসম ভঙ্গকারী হয়ে যাবে।

পক্ষান্তরে যদি বলে لَا أَصُوْمُ يَوْمًا আমি একদিন রোজা রাখব না অথবা لَا أَصُوْمُ صَوْمًا আমি একটি রোজাও রাখব না, অতঃপর কিছু সময় রোজা রেখে ইফতার করে ফেলে তাহলে সে কসম ভঙ্গকারী হবে না। কেননা একদিন রোজা বা পূর্ণ এক রোজা পাওয়া যায়নি। অর্থাৎ হিনসের শর্ত পাওয়া যায়নি, তাই কসম ভঙ্গকারী হবে না।

وَلَوْ حَلَفَ لَا يُصَلِّي فَقَامَ الخ : নামাজ পড়বে না বলে কসম করার পর কিয়াম করল, কেরাত পড়ল, রুকূ' করল তারপর নামাজ ছেড়ে দিল এর দ্বারা কসম ভঙ্গকারী হবে না যদি সেজদা করে তাহলে কসম ভঙ্গকারী হয়ে যাবে। কেননা নামাজ কতগুলো কাজের সমষ্টি সেজদা পর্যন্ত না পৌঁছলে সবগুলো কাজ পাওয়া যায় না বলে নামাজ বাস্তবায়িত হয় না। তাই সে কসম ভঙ্গকারী হবে না। রোজা তার বিপরীত। কেননা রোজার রুকন মাত্র একটি। তা হলো পানাহার ও স্ত্রীসঙ্গম হতে বিরত থাকা। রোজা আরম্ভ করলেই এটা বাস্তবায়িত হয়ে যায়, বিধায় এক মুহূর্তের বিরতি দ্বারাও রোজা না রাখার কসমকারী হানেস হয়। যদি বলে لَا أُصَلِّى صَلٰوةً আমি একটি নামাজ পড়ব না তাহলে পূর্ণ দুরাকাত না পড়া পর্যন্ত কসম ভঙ্গকারী হবে না। কেননা শরিয়তের দৃষ্টিতে এক নামাজের নিম্ন পরিমাণ হলো দুরাকাত। এক রাকাতকে এক নামাজ বলা যায় না। যেহেতু এক রাকাত নামাজ পড়ার ব্যাপারেও হাদীসে নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে।

ফায়দা : আল্লামা ইবনে আব্দুল বার (র.) তামহীদ নামক গ্রন্থে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, হুজুর ﷺ বুতাইরা নামাজ তথা বিজোড় বা এক রাকাত নামাজ পড়তে নিষেধ করেছেন। আল মুগরিব গ্রন্থকার বলেছেন, اَلْبُتَيْرَاءُ শব্দটি اَلْبَتْرَاءُ শব্দটির تَصْغِيْر ক্ষুদ্রতা জ্ঞাপক শব্দরূপ اَلْبُتَيْرَاءُ শব্দটি اَلْأَبْتَرُ -এর স্ত্রী লিঙ্গ। যার মূল অর্থ হলো লেজকাটা। পরবর্তীতে যে কোনো অপূর্ণ বস্তু বুঝানোর জন্যই শব্দটি ব্যবহার হতে থাকে। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর এক অভিমত অনুসারে এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের এক বর্ণনা অনুসারে لَايُصَلِّى صَلٰوةً বলে কসম করার পর এক রাকাত পড়লেও কসমকারী ব্যক্তি হানেস হয়ে যাবে। কেননা এক রাকাতও তাদের নিকট নামাজ বলে পরিগণিত হয়। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অন্য অভিমত ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর অন্য বর্ণনা অনুযায়ী নামাজ আরম্ভ করলেই ব্যক্তি কসম ভঙ্গকারী হয়ে যাবে। আরেক বর্ণনা অনুযায়ী সহীহ শুদ্ধরূপে নামাজ সমাপ্ত না করা পর্যন্ত যে হানেস হবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ الْيَمِيْنِ فِيْ لُبْسِ الثِّيَابِ وَالْحُلِيِّ وَغَيْرِ ذٰلِكَ

وَمَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : اِنْ لَبِسْتُ مِنْ غَزْلِكِ فَهُوَ هَدْيٌ فَاشْتَرٰى قُطْنًا فَغَزَلَتْهُ وَنَسَجَتْهُ فَلَبِسَهُ فَهُوَ هَدْيٌ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ وَقَالَا : لَيْسَ عَلَيْهِ اَنْ يُهْدِيَ حَتّٰى تَغْزِلَ مِنْ قُطْنٍ مَلَكَهُ يَوْمَ حَلَفَ وَمَعْنَى الْهَدْيِ التَّصَدُّقُ بِهِ بِمَكَّةَ لِاَنَّهُ اِسْمٌ لِمَا يُهْدٰى اِلَيْهَا . لَهُمَا اَنَّ النَّذْرَ اِنَّمَا يَصِحُّ فِي الْمِلْكِ اَوْ مُضَافًا اِلٰى سَبَبِ الْمِلْكِ وَلَمْ يُوجَدْ لِاَنَّ اللُّبْسَ وَغَزْلَ الْمَرْاَةِ لَيْسَا مِنْ اَسْبَابِ مِلْكِهِ . وَلَهُ اَنَّ غَزْلَ الْمَرْاَةِ عَادَةً يَكُوْنُ مِنْ قُطْنِ الزَّوْجِ وَالْمُعْتَادُ هُوَ الْمُرَادُ وَذٰلِكَ سَبَبٌ لِمِلْكِهِ، وَلِهٰذَا يَحْنَثُ اِذَا غَزَلَتْ مِنْ قُطْنٍ مَمْلُوْكٍ لَهُ وَقْتَ النَّذْرِ لِاَنَّ الْقُطْنَ لَمْ يَصِرْ مَذْكُوْرًا ـ

পরিচ্ছেদ : বস্ত্র বা অলংকার পরিধান ও অন্যান্য বিষয়ের কসম

অনুবাদ : কেউ তার স্ত্রীকে বলল, যদি আমি তোমার নিজের কাটা সুতার বস্ত্র পরিধান করি তাহলে তা মক্কায় ফকিরদের উপর সদকা হবে। অতঃপর স্বামী তুলা ক্রয় করল আর স্ত্রী তা থেকে সুতা কেটে কাপড় বয়ন করল। আর স্বামী তা পরিধান করল। তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তা মক্কার ফকিরদের উপর সদকা করতে হবে। সাহেবাইন বলেন' কসম করার দিন স্বামীর মালিকানাধীন ছিল, এমন তুলা দ্বারা সূতা কাটা না হলে স্বামীকে ঐ বস্ত্র সদকা করতে হবে না। হাদী অর্থ মক্কায় সদকা করা। কেননা হাদী ঐ বস্তুর নাম যা সদকা স্বরূপ মক্কায় পাঠানো হয়। সাহেবাইনের দলিল হলো এই যে, মানত শুধু মালিকানাধীন বিষয়ে কিংবা মালিকানার কারণের দিকে সম্পর্কিত বিষয়ে দুরস্ত হয়। আর তা এখানে পাওয়া যায়নি। কেননা পরিধান করা এবং স্ত্রী সুতা কাটা (ও বয়ন করা) তার মালিকানার কারণ নয়। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল এই যে, স্ত্রীর সুতা কাটা (ও বয়ন করা) সাধারণতঃ স্বামীর মালিকানাধীন তুলা দ্বারাই হয়ে থাকে। আর যে বিষয়ে প্রচলিত থাকে, কসমে তাই উদ্দেশ্য হয়। আর এটা স্বামীর মালিকানার কারণ। এজন্যই তো কসমের সময়ের মালিকানাধীন তুলা দ্বারা সুতা কাটলে কসম ভঙ্গ হয়ে যায়। অথচ কসমের বক্তব্যে তুলার উল্লেখ নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কয়েকটি শব্দের ব্যাখ্যা : ثِيَابٌ এটা ثَوْبٌ-এর বহুবচন। অর্থ কাপড়। حُلِيٌّ এটি حَلْيٌ-এর বহুবচন। অর্থ হলো অলংকার। তথা স্বর্ণ, রূপা বা অন্য কোনো মূল্যবান ধাতু দ্বারা নির্মিত বস্তু যা সাজ সজ্জার উদ্দেশ্যে পরিধান করা হয়,

هَدْيٌ এমন সদকা যা মক্কায় প্রেরণ করা হয়। তা পশু হলে মক্কায় নিয়ে জবাই করা শর্ত। কাপড় হলে মক্কার ফকির মিসকিন কে দিয়ে দিতে হয়। ভূমি বা কোনো স্থাবর সম্পদ হলে তার মূল্য দেওয়া শর্ত।

https://e-ilm.weebly.com/

মাসআলার ব্যাখ্যা : কেউ তার স্ত্রীকে সম্বোধন করে বলল إِنْ لَبِسْتُ مِنْ غَزْلِكِ فَهُوَ هَدْيٌ। আমি যদি তোমার হাতে তৈরি সুতার কাপড় পরিধান করি তাহলে তা হাদি (মক্কায় সদকা করা হবে) অতঃপর সে তুলা কিনে আনল স্ত্রী তা দ্বারা সুতা বানাল এবং কাপড় বুনল। অতঃপর সেই কাপড় স্বামী পরিধান করল। এমতাবস্থায় ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে কাপড়টি হাদী হবে। অর্থাৎ কাপড়টি মক্কার ফকির মিসকিনদের মাঝে সদকা করে দিতে হবে। সাহেবাইনের মতে কসম করার দিন তার মালিকানায় যে তুলা ছিল তা দ্বারা বয়নকৃত কাপড় পরিধান করলেই কেবল হাদী হবে, পরে ক্রয়কৃত তুলা দ্বারা নির্মিত কাপড় পরিধান করলে তা হাদি হবে না বা সদকা করা ওয়াজিব হবে না।

সাহেবাইনের দলিল : নযর বা মানত সহীহ হয় নিজের মালিকানাধীন বিষয়ে অথবা মালিকানা অর্জনে কোনো سَبَب বা উপায়ের দিকে সম্বন্ধ করলে। যেমন কেউ বলল, আমি এ কাজটি করলে আমার গোলাম আজাদ। এ নযরটি সহীহ হবে। কারণ গোলাম তার মালিকানাধীন বিষয়। অথবা বলল আমি যদি তাকে ক্রয় করি তাহলে সে আজাদ। এটা সহীহ হবে। কারণ মালিকানা লাভের একটি উপায় বা سَبَب হলো ক্রয় করা। সেদিকে সম্বন্ধ করেই সে নযর করেছে। কিন্তু আলোচ্য মাসআলায় কাপড় বয়ন করা ও কাপড় পরিধান করা কোনোটিই মালিকানা নয়। মালিকানার সবব বা উপায়ও নয়। তাই পরে ক্রয়-কৃত তুলার ক্ষেত্রে কসমই সহীহ হবে না। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো– কসমের ভিত্তি হলো পরিবেশ প্রচলনের উপর। আর প্রচলিত এটাই যে, স্ত্রী সাধারণত স্বামী তুলা দ্বারাই কাপড় বয়ন করে থাকে। সে হিসাবে স্বামী যেন এটাই বলল– আমার তুলা দ্বারা তুমি যে কাপড় বুনবে, তা পরিধান করলে......। অতএব তার কথার মধ্যে মালিকানার কথা স্পষ্ট উল্লেখ না থাকলেও মূলত আছে, যা পরিবেশ প্রচলন দ্বারা বুঝা যায়। তাই কসম সম্পাদিত হবে, সহীহ হবে। অতঃপর মালিকানাভুক্ত তুলা দুধরনে হতে পারে

এক. যে তুলা কসম করার সময়ই তার মালিকানায় ছিল।

দুই. যা পরে ক্রয় করেছে।

উভয় সুরতে যেহেতু তার মালিকানা রয়েছে তাই তার যে কোনো প্রকার তুলা দ্বারা বয়নকৃত কাপড় পরিধান করলেই সে কসম ভঙ্গকারী হয়ে যাবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর কথা অধিক যুক্তি যুক্ত। কারণ কসম করার সময় তার মালিকানায় যে তুলা ছিল তা দ্বারা নির্মিত কাপড় পরিধান করলে সাহেবাইনের মতেও উপরিউক্ত কসম হতে ব্যক্তি কসম ভঙ্গকারী হয়ে যায়। অথচ এক্ষেত্রেও মালিকানার কথা উল্লেখ নেই। উল্লেখ আছে শুধু কাপড় বয়ন ও পরিধানের কথা। তা সত্ত্বেও সাহেবাইন কসম হওয়া ও হানেস হওয়ার কথা বলেন। এর দ্বারা বুঝা যায়, এ পরিবেশ প্রচলন হতে তারা মালিকানার বিষয়টি ধরে নিয়েছেন। যেমন ইমাম আবূ হানীফা (র.) ধরে নিয়েছেন। পার্থক্য হলো সাহেবাইন শুধু মওজুদ তুলার ক্ষেত্রে মালিকানা বুঝেছেন আর ইমাম সাহেব মওজুদ উপরে ক্রয়কৃত উভয়ের ক্ষেত্রে মালিকানা বুঝেছেন এটাই বাস্তব ও যুক্তিযুক্ত।

https://e-ilm.weebly.com/

وَمَنْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ حُلِيًّا فَلَبِسَ خَاتَمَ فِضَّةٍ لَمْ يَحْنَثْ لِاَنَّهُ لَيْسَ بِحُلِيٍّ عُرْفًا وَلَا شَرْعًا حَتّٰى أُبِيْحَ اِسْتِعْمَالُهُ لِلرِّجَالِ وَالتَّخَتُّمُ بِهٖ لِقَصْدِ الْخَتْمِ وَاِنْ كَانَ مِنْ ذَهَبٍ حَنِثَ لِاَنَّهُ حُلِيٌّ وَلِهٰذَا لَا يَحِلُّ اِسْتِعْمَالُهُ لِلرِّجَالِ . وَلَوْ لَبِسَ عِقْدَ لُؤْلُؤٍ غَيْرِ مُرَصَّعٍ لَمْ يَحْنَثْ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ، وَقَالَا يَحْنَثُ لِاَنَّهُ حُلِيٌّ حَقِيْقَةً حَتّٰى سُمِّيَ بِهٖ فِي الْقُرْاٰنِ . وَلَهُ اَنَّهُ لَا يَتَحَلّٰى بِهٖ عُرْفًا اِلَّا مُرَصَّعًا، وَمَبْنَى الْاَيْمَانِ عَلَى الْعُرْفِ . وَقِيْلَ هٰذَا اِخْتِلَافُ عَصْرٍ وَزَمَانٍ ، وَيُفْتٰى بِقَوْلِهِمَا لِاَنَّ التَّحَلِّيَ بِهٖ عَلَى الْاِنْفِرَادِ مُعْتَادٌ .

অনুবাদ : কেউ যদি কসম করে যে, অলংকার পরিধান করবে না, অতঃপর রূপার আংটি পরিধান করল তাহলে কসম ভঙ্গ হবে না। কেননা লোক প্রচলনে এবং শরিয়তের দৃষ্টিতে (এটা) অলংকার নয়। এ কারণেই পুরুষদের জন্য তা পরা এর মোহর করার উদ্দেশ্যে তা ব্যবহার করা বৈধ। **কিন্তু স্বর্ণের আংটি হলে কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে।** কেননা এটা অলংকার একারণেই পুরুষদের জন্য তা ব্যবহার করা বৈধ নয়।

যদি (স্বর্ণ বা রূপা) খচিত না করে শুধু মুক্তার মালা পরিধান করে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে কসম ভঙ্গ হবে না। সাহেবাইন (র.) বলেন, ভঙ্গ হয়ে যাবে। কারণ প্রকৃত অর্থে এটা অলংকার কুরআন মাজীদেও মুক্তার মালাকে অলংকার বলা হয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) দলিল হলো এই যে, জনসাধারণে (স্বর্ণ, রূপা) খচিত না করে শুধু মুক্তাকে অলংকাররূপে ব্যবহার করা হয় না। আর কসমের ভিত্তি হলো প্রচলনের উপর। কোনো কোনো মতে এই মতপার্থক্য হচ্ছে যুগ ও কালের পার্থক্য। সাহেবাইনের মতামত অনুসারে ফতোয়া দেওয়া হয়। কেননা মুক্তাকে আলাদাভাবেও অলংকার রূপে ব্যবহারের প্রচলন রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

অলংকার পরিধান করবে না বলে কসম করার পর রূপার আংটি পরিধান করলে কসম ভঙ্গকারী হবে না। যেহেতু শরিয়তের দৃষ্টিতে এবং সামাজিক দৃষ্টিতে রূপার আংটিকে অলংকার মনে করা হয় না। স্বর্ণের আংটি পড়লে হানেস হবে। কারণ স্বর্ণের আংটিকে অলংকার মনে করা হয়। একারণেই তা পরিধান করা পুরুষের জন্য হারাম করা হয়েছে। পক্ষান্তরে রূপার আংটি, তা পুরুষের জন্যও হালাল।

মুক্তার হার পরিধান করলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে কসম ভঙ্গকারী হবে না। যদি তা স্বর্ণ খচিত না থাকে। সাহেবাইনের মতে কসম বঙ্গকারী হয়ে যাবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো জনসাধারণ স্বর্ণ খচিত মুক্তার হারকেই অলংকার হিসাবে ব্যবহার করে থাকে। আর কসমের সম্পর্ক যেহেতু উরফ বা পরিবেশ প্রচলের সাথে তাই শুধু মুক্তার হারকে অলংকার বলা হবে না এবং এটা পরিধান করলে ও কসম ভঙ্গকারী হবে না। সাহেবাইন বলেন স্বর্ণ খচিত হওয়া আবশ্যক নয়। শুধু মুক্তাই অলংকার। কুরআনেও একে অলংকার বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। মাশায়েখগণ বলেন, এ মতভেদটি মূলত সময়কালগত পার্থক্যের উপর নির্ভরশীল। এ যুগে যেহেতু শুধু মুক্তার মালা বা হার অলংকার রূপে ব্যবহৃত হয়, তাই সাহেবাইনের মতানুসারে ফতোয়া হওয়া আবশ্যক।

https://e-ilm.weebly.com/

وَمَنْ حَلَفَ لَا يَنَامُ عَلٰى فِرَاشٍ فَنَامَ عَلَيْهِ وَفَوْقَهُ قِرَامٌ حَنِثَ لِاَنَّهُ تَبَعُ الْفِرَاشِ فَيُعَدُّ نَائِمًا عَلَيْهِ وَاِنْ جَعَلَ فَوْقَهُ فِرَاشًا اٰخَرَ فَنَامَ عَلَيْهِ لَا يَحْنَثُ لِاَنَّ مِثْلَ الشَّيْءِ لَا يَكُوْنُ تَبَعًا لَهُ فَيَنْقَطِعُ النِّسْبَةَ عَنِ الْاَوَّلِ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَجْلِسُ عَلَى الْاَرْضِ فَجَلَسَ عَلٰى بِسَاطٍ اَوْ حَصِيْرٍ لَمْ يَحْنَثْ لِاَنَّهُ لَا يُسَمّٰى جَالِسًا عَلَى الْاَرْضِ، بِخِلَافِ مَا اِذَا حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْاَرْضِ لِبَاسُهُ لِاَنَّهُ تَبَعٌ لَهُ فَلَا يُعْتَبَرُ حَائِلًا وَاِنْ حَلَفَ لَا يَجْلِسُ عَلٰى سَرِيْرٍ فَجَلَسَ عَلٰى سَرِيْرٍ فَوْقَهُ بِسَاطٌ اَوْ حَصِيْرٌ حَنِثَ لِاَنَّهُ يُعَدُّ جَالِسًا عَلَيْهِ، وَالْجُلُوسُ عَلَى السَّرِيرِ فِي الْعَادَةِ كَذٰلِكَ، بِخِلَافِ مَا اِذَا جَعَلَ فَوْقَهُ سَرِيْرًا اٰخَرَ لِاَنَّهُ مِثْلُ الْاَوَّلِ فَقَطَعَ النِّسْبَةَ عَنْهُ ـ

অনুবাদ : কেউ যদি কসম করে যে, সে একটি বিশেষ বিছানায় ঘুমাবে না। অতঃপর সে বিছানার উপরে চাদর বিছিয়ে ঘুমাল, এর ফলে কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা চাদর বিছানার অনুবর্তী বস্তু। সুতরাং তাকে বিছানার উপর শয়নকারীই গণ্য করা হবে। **আর যদি ঐ বিছানার উপর অন্য একটি বিছানা পেতে নেয় এবং তাতে ঘুমায় তাহলে কসম ভঙ্গ হবে না।** কেননা সমতুল্য বস্তু অনুবর্তী হিসাবে গণ্য হয় না। তাই প্রথম বিছানার সাথে সম্পর্ক কর্তিত হয়ে যাবে। **যদি কসম করে যে, জমিনে বসবে না। অতঃপর বিছানা কিংবা চাটাইয়ের উপর বসল, তাহলে কসম ভঙ্গ হবে না।** কেননা (এভাবে বসলে) জমিনে উপবেশনকারী বলা যায় না। পক্ষান্তরে যদি তার ও জমিনের মাঝে শুধু পোশাক আড়াল হয়, তাহলে বিষয়টি ভিন্ন হবে। কেননা পোশাক তার অনুবর্তী। তাই এটাকে আড়াল বলে গণ্য করা হবে না। **যদি কসম করে যে, এই খাটের উপর বসবে না। অতঃপর তার উপর বিছানা বা চাটাই থাকা অবস্থায় বসল, তাহলে কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে।** কেননা (এভাবে বসলে) তাকে খাটে উপবেশনকারী বলে গণ্য করা হয়। আর খাটের উপর সাধারণত এভাবেই বসা হয়। পক্ষান্তরে যদি খাটের উপর আরেকটি খাট পেতে তার উপর বসে তাহলে কসম ভঙ্গ হবে না। কেননা এটা প্রথমটার সমতুল্য। সুতরাং প্রথম খাট হতে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ : بِخِلَافِ مَا اِذَا جَعَلَ فَوْقَهُ سَرِيْرًا الخ : যদি একটি খাটের উপর অন্য আরেকটি খাট রেখে তার উপর বসে তাহলে এটাই বলা হবে যে, সে দ্বিতীয় খাটের উপর বসেছে। প্রথম খাটের উপর বসেছে এমন বলা হবে না। যদি কসম করে জমিনের উপর দিয়ে চলবে না, অতঃপর মোজা বা জুতা পায় দিয়ে কিংবা ইটের উপর দিয়ে হেঁটে যায়, তাহলে কসম ভঙ্গকারী হয়ে যাবে। যদি ফরশের উপর দিয়ে হাটে তাহলে কসম ভঙ্গকারী হবে না। কেউ বলল, আমি যদি তোমার বিছানায় শয়ন করি, তাহলে আমার গোলাম আজাদ। অতঃপর সে উক্ত বিছানায় শয়ন করল, কিন্তু শরীরের কিছু অংশ বাহিরে থাকল। এমতাবস্থায় যদি তার শরীরের বেশি অংশ বিছানার উপর থাকে, তাহলে কসম ভঙ্গকারী হবে। অন্যথায় কসম ভঙ্গকারী হবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ الْيَمِيْنِ فِيْ الْقَتْلِ وَالضَّرْبِ وَغَيْرِهِ

পরিচ্ছেদ : হত্যা করা, প্রহার করা ইত্যাদি সম্পর্কিত কসম প্রসঙ্গ

আলোচ্য প্রসঙ্গে একটি মূলনীতি হলো এই যে, যেসব বিষয় জীবিত-মৃত উভয়ের ক্ষেত্রে বরাবর, অর্থাৎ যে সব বিষয়ে, জীবিত ও মৃত উভয়ের এক রকম হুকুম হয়, সেসব বিষয়ের কসম জীবন-মরণ দুই অবস্থাতেই কার্যকরী হবে। আর যেসব বিষয় শুধু জীবিতদের সাথে সম্পৃক্ত যেমন স্বাদ, সুখ, বেদনা ইত্যাদি সেসব বিষয়ের কসম জীবদ্দশাতেই কার্যকরী হবে।

وَمَنْ قَالَ اِنْ ضَرَبْتُكَ فَعَبْدِيْ حُرٌّ فَمَاتَ فَضَرَبَهُ فَهُوَ عَلَى الْحَيٰوةِ لِاَنَّ الضَّرْبَ اِسْمٌ لِفِعْلٍ مُؤْلِمٍ يَتَّصِلُ بِالْبَدَنِ، وَالْإِيلَامُ لَا يَتَحَقَّقُ فِي الْمَيِّتِ، وَمَنْ يُعَذَّبُ فِي الْقَبْرِ تُوضَعُ فِيْهِ الْحَيٰوةُ فِيْ قَوْلِ الْعَامَّةِ وَكَذٰلِكَ الْكِسْوَةُ لِاَنَّهُ يُرَادُ بِهِ التَّمْلِيكُ عِنْدَ الْاِطْلَاقِ، وَمِنْهُ الْكِسْوَةُ فِي الْكَفَّارَةِ وَهُوَ مِنَ الْمَيِّتِ لَا يَتَحَقَّقُ اِلَّا اَنْ يَنْوِيَ بِهِ السَّتْرَ، وَقِيْلَ بِالْفَارِسِيَّةِ يَنْصَرِفُ اِلَى اللُّبْسِ وَكَذَا الْكَلَامُ وَالدُّخُوْلُ لِاَنَّ الْمَقْصُوْدَ مِنَ الْكَلَامِ الْاِفْهَامُ وَالْمَوْتُ يُنَافِيْهِ، وَالْمُرَادُ مِنَ الدُّخُوْلِ عَلَيْهِ زِيَارَتُهُ وَبَعْدَ الْمَوْتِ يُزَارُ قَبْرُهُ لَا هُوَ وَلَوْ قَالَ : اِنْ غَسَّلْتُكَ فَعَبْدِيْ حُرٌّ فَغَسَّلَهُ بَعْدَ مَا مَاتَ يَحْنَثُ لِاَنَّ الْغُسْلَ هُوَ الْاِسَالَةُ وَمَعْنَاهُ التَّطْهِيرُ وَيَتَحَقَّقُ ذٰلِكَ فِي الْمَيِّتِ۔

অনুবাদ : কেউ যদি বলে যে, "যদি আমি তোমাকে প্রহার করি তাহলে আমার গোলাম আজাদ।" তাহলে এটা সম্বোধিত ব্যক্তির জীবদ্দশার সাথে সীমাবদ্ধ হবে। কেননা প্রহার বলা হয় ব্যথাদায়ক কাজকে যা শরীরের সঙ্গে যুক্ত হয়। আর মৃতের ক্ষেত্রে ব্যথাদান পাওয়া যায় না। কবরে যাদেরকে শাস্তি দেওয়া হয় তাদের দেহে প্রাণস্থাপন করা হয় আধিকাংশ আলেমের মতে। তদ্রূপ পোশাক পরিধান করানোর কসম সম্পর্কেও একই কথা। কেননা সাধারণভাবে বলা হলে তা দ্বারা মালিকানাসহ পরিধান করানো উদ্দেশ্য হয়। কাফফারায় পোশাক পরিধান করানো কথাটা এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। আর মৃতের ক্ষেত্রে মালিকানা সাব্যস্ত হয় না। তবে যদি শরীর ঢেকে দেওয়ার নিয়ত করে থাকে, তাহলে মৃতের ক্ষেত্রেও কসম ভঙ্গ হবে। কেউ কেউ বলেছেন, ফার্সি ভাষায় কসমটি কেবল পরিধান করানোর সাথে সম্পৃক্ত হবে। (মালিকানাসহ হওয়া শর্ত নয়)। তদ্রূপ কথা বলা ও প্রবেশ করা সম্পর্কেও একই হুকুম। কেননা কথা বলার উদ্দেশ্য হলো বুঝানো। আর মৃত্যু তার পরিপন্থি। প্রবেশের অর্থ হলো তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা। আর মৃত্যুর পর তার কবর যিয়ারত করা যায় কিন্তু তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা যায় না।

কেউ যদি বলে, যদি আমি তোমাকে গোসল করাই, তাহলে আমার গোলাম আজাদ। অতঃপর যদি সে তাকে তার মৃত্যুর পরে গোসল করায় তাহলে সে কসম ভঙ্গকারী তথা গোলাম আজাদ হয়ে যাবে। কেননা গোসল করানোর অর্থ হলো পানি প্রবাহিত করা এর উদ্দেশ্য হলো পবিত্র করা। এ বিষয়টি মৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রেও হয়ে থাকে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَمَنْ حَلَفَ لَا يَضْرِبُ اِمْرَأَتَهُ فَمَدَّ شَعْرَهَا اَوْ خَنَقَهَا اَوْ عَضَّهَا حَنِثَ لِاَنَّهُ اِسْمٌ لِفِعْلٍ مُؤْلِمٍ وَقَدْ تَحَقَّقَ الْاِيْلَامُ، وَقِيْلَ لَا يَحْنَثُ فِيْ حَالِ الْمُلَاعَبَةِ لِاَنَّهُ يُسَمَّى مُمَازَحَةً لَا ضَرْبًا ـ

অনুবাদ : কোনো ব্যক্তি কসম করল, সে তার স্ত্রীকে মারবে না। অতঃপর স্ত্রীর চুল ধরে টান দিল, তার গলায় চাপা দিল অথবা কামড় দিল। এর ফলে সে কসম ভঙ্গকারী হয়ে যাবে। কেননা প্রহার করা একটি কষ্টদায়ক কাজের নাম। (উপরিউক্ত কাজগুলোর মাঝে) এটি পাওয়া গেছে। তবে, কেউ কেউ বলেছেন, এসব কাজ যদি আনন্দের সময়ে করা হয় তাহলে কসম ভঙ্গকারী হবে না। কারণ তখন সেগুলো মার হয় না; বরং মনোরঞ্জন হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

اِنْ ضَرَبْتُكَ فَعَبْدِيْ حُرٌّ এমন কসম করার পর সম্বোধিত ব্যক্তিকে তার মৃত্যুর পর প্রহার করা হলে কসম ভঙ্গকারী (তথা গোলাম আজাদ) হবে না। কারণ মৃত্যুর পরে প্রহার মূলত প্রহার বলে গণ্য নয়। কাপড় পরিধান করানোর কসম করার পর যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে মৃত্যুর পরে কাপড় পরিধান করানো হয় তাহলেও কসম ভঙ্গকারী হবে না। কারণ আরবিতে كِسْوَةٌ শব্দ দ্বারা কাপড়ের মালিক বানানো বুঝানো হয়। মৃত্যুর পরে যেহেতু কেউ মালিক হতে পারে না তাই মৃত্যুর পরে কাপড় দেওয়া হলেও মালিক বানানো গেল না। তাই কসম ভঙ্গকারী হবে না।

কথা বলবে না, বা কাছে যাবে না এরূপ কসম করার পর যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার সাথে কথা বলা হয় বা তার কাছে যাওয়া হয়, তাহলেও কসম ভঙ্গকারী হবে না। কারণ কথা বলা দ্বারা উদ্দেশ্য তাকে কোনো বিষয় বুঝানো এটা মৃত্যুর পর হতে পারে না। মৃতকে কিছু বুঝানো যায় না। অতএব মৃত্যুর পর কথা বলা হলে তা কথা হবে না। অনুরূপভাবে কাছে যাওয়া, এটাও সম্ভব নয় যেটা সম্ভব সেটা হলো তার লাশের কাছে যাওয়া বা তার কবরের কাছে যাওয়া। এতএব, কাছে গেলও যেহেতু তার কাছে যাওয়া হয়নি, তাই কসম ভঙ্গকারী হবে না।

ফায়দা : মৃত্যুর পর কারো সাথে কথা বলা যায় না বা কাউকে কিছু বুঝানো যায় না। একথার উপর প্রশ্ন হতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বদর যুদ্ধে নিহত কাফেরদের নাম ধরে ধরে ডাক দিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তোমাদের প্রভু তোমাদের সাথে যে শাস্তির ওয়াদা করেছিলেন, তা বাস্তবে পেয়েছ তো? সাহাবীগণ প্রশ্ন করলেন হে আল্লাহর নবী! এরা কি আপনার কথা শুনতে পাচ্ছে? নবীজি ﷺ বললেন, তোমাদের চেয়েও অধিক শুনতে পাচ্ছে। এ ঘটনা দ্বারা বুঝা যায়, মৃতের সাথে কথা বলা যায় এবং মৃত ব্যক্তিকে কিছু বুঝানোও যায়। এর উত্তর হলো এটা ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর একটি মু'জিযা, কাফেরদের সেই শ্রবণ ছিল আখেরাতের শ্রবণ, দুনিয়ার শ্রবণকে এর সাথে তুলনা করা যাবে না।

اِنْ غَسَلْتُكَ فَعَبْدِيْ حُرٌّ فَغَسَلَهُ الخ : মৃত্যুর ক্ষেত্রে গোসলের অর্থ ও উদ্দেশ্য ঠিক সেভাবেই পাওয়া যায় যেভাবে জীবিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে পাওয়া যায়। এ কারণেই মৃতকে গোসল দেওয়া এবং তাকে পাক করা শরিয়তের পক্ষ হতে জীবিতের উপর ওয়াজিব করে দেওয়া হয়েছে। মৃতকে গোসল না দিয়ে তার জানাযা পড়া হলে শুদ্ধ হয় না।

কেউ নিজ স্ত্রীকে সম্বোধন করে বলল, আমি যদি তোমার সাথে সহবাস করি বা তোমাকে চুম্বন করি, তাহলে তুমি আজাদ; তাহলে তার কসমটি জীবদ্দশায় মধ্যে সীমিত থাকবে। স্ত্রীর মৃত্যুর পরে যদি তার সাথে এসব করা হয় তাহলে সে কসম ভঙ্গকারী হবে না। কারণ স্ত্রীর সাথে এসব কাজের উদ্দেশ্য হয় শাহওয়াত পূরণ করা বা যৌনবাসনা চরিতার্থ করা, যা জীবিত অবস্থা ছাড়া হয় না।

وَمَنْ حَلَفَ لَا يَضْرِبُ امْرَأَتَهُ الخ : জামে সগীরের ব্যাখ্যাগ্রন্থে ফখরুল ইসলাম বাযেদাবী (র.) বলেছেন, স্ত্রীর সাথে আমোদ-প্রমোদের সময় যদি স্বামীর মাথার আঘাতে স্ত্রীর নাক ভেঙ্গে যায় এবং রক্ত প্রবাহিত হয়ে পড়ে, তাহলেও সে কসম ভঙ্গকারী হবে না। কারণ তখনকার এরূপ আচরণ প্রহার বলে গণ্য নয়। -(বেনায়া)

https://e-ilm.weebly.com/

وَمَنْ قَالَ : اِنْ لَمْ اَقْتُلْ فُلَانًا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ وَفُلَانٌ مَيِّتٌ وَهُوَ عَالِمٌ بِهِ حَنِثَ لِاَنَّهُ عَقَدَ يَمِيْنَهُ عَلٰى حَيٰوةٍ يُحْدِثُهَا اللّٰهُ فِيْهِ وَهُوَ مُتَصَوَّرٌ فَيَنْعَقِدُ ثُمَّ يَحْنَثُ لِلْعَجْزِ الْعَادِيِّ وَاِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ لَا يَحْنَثُ لِاَنَّهُ عَقَدَ يَمِيْنَهُ عَلٰى حَيٰوةٍ كَانَتْ فِيْهِ وَلَا يُتَصَوَّرُ فَيَصِيْرُ قِيَاسَ مَسْاَلَةِ الْكُوْزِ عَلَى الْاِخْتِلَافِ، وَلَيْسَ فِيْ تِلْكَ الْمَسْاَلَةِ تَفْصِيْلُ الْعِلْمِ وَهُوَ الصَّحِيْحُ ـ

অনুবাদ : কেউ কসম করে বলল, যদি আমি অমুককে হত্যা না করি, তাহলে তার স্ত্রী তালাক। অথচ অমুক তখন মারা গেছে এবং কসমকারী সে সম্পর্কে অবগতও আছে। তাহলে সে কসম ভঙ্গকারী (তথা স্ত্রী তালাক) হয়ে যাবে। কেননা সে তার কসমটি সম্পৃক্ত করেছে এমন এক আয়ুর সাথে যা আল্লাহ তা'আলা মৃত ব্যক্তির মাঝে সৃষ্টি করেছেন এবং এ বিষয়টি অনুধাবনযোগ্যও। তাই তার কসম শুদ্ধ হবে। অতঃপর সে কসম ভঙ্গকারী হয়ে যাবে। কসম পূরণ করতে প্রাকৃতিকভাবে অক্ষম হওয়ার কারণে। **আর যদি কসমকারী ব্যক্তি কসম করার সময় অমুকের মৃত্যু সম্পর্কে অবগত না থাকে, তাহলে সে কসম ভঙ্গকারী (তথা স্ত্রী তালাক) হবে না।** কেননা তখন সে কসমকে সম্পৃক্ত করেছে এমন আয়ুর সাথে যা তার মধ্যে ছিল। এবং কসম টি পূর্ণ করা এখন অনুধাবনযোগ্য নয়। অতএব, এ মাসআলাটি مَسْاَلَةِ الْكُوْزِ জগের মাসআলার অনুরূপ হয়ে যাবে। মতভেদ সাপেক্ষে। তবে সে মাসআলায় (জগের মাসআলায়) জানা- না জানার দ্বারা পার্থক্য সৃষ্টি হয় না। এটা বিশুদ্ধ কথা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কোনো ব্যক্তি মারা গেছে একথা জানা অবস্থায় কেউ কসম করল, "আমি যদি তাকে হত্যা না করি তাহলে আমার স্ত্রী তালাক।" এ ব্যক্তি কসম করার পর কসম ভঙ্গকারী (তথা স্ত্রী তালাক) হয়ে যাবে। কারণ সে কসম করেছে মৃতের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা যে স্থায়ী জীবন সৃষ্টি করেছেন তা নাশ করার জন্য। কিন্তু পরে তা করতে অক্ষম হয়েছে। তাই সে কসম ভঙ্গকারী (তথা স্ত্রী তালাক) হয়ে যাবে।

কিন্তু লোকটি জীবিত আছে মনে করে যদি কেউ উপরিউক্ত কসম করে তাহলে সে কসম ভঙ্গকারী (তথা স্ত্রী তালাক) হবে না। কারণ সে কসম করেছে পার্থিব জীবন নাশ করার ব্যাপারে। অথচ তার পার্থিব জীবন তখন অবশিষ্ট নেই। বিধায় এ কসম হতে মুক্ত হওয়ার কল্পনা করা যায় না। অতএব, তার হিনস বা কসম ভঙ্গকারী হওয়াও কল্পনা করা যাবে না। এ মতটি ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে এ সুরতেও কসমকারী ব্যক্তি হানেস হয়ে যাবে প্রথম সুরতের মতো। এ মতভেদের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে فَيَصِيْرُ قِيَاسَ مَسْاَلَةِ الْكُوْزِ বলে। আলোচ্য মাসআলার ইখতেলাফ এবং কুযের মাসআলার ইখতেলাফ উভয়ই মূলত ইমাম ত্রয়ের একটি উসূলী ইখতেলাফ বা মূলনীতিগত ইখতেলাফের উপর নির্ভরশীল। তাই প্রথমে উসূলী এখতেলাফটি জেনে নেওয়া আবশ্যক। তাহলো এই যে, ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মাদ (র.)-এর মতে কোনো কসম সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত হলো কসমটি এমন হওয়া যে তার থেকে স্বাভাবিকভাবে মুক্ত হওয়া যায়। কিংবা যার বাস্তবায়ন সম্ভব হয়। যদি কসম এমন বিষয়ে হয় যার বাস্তবায়ন

https://e-ilm.weebly.com/

অসম্ভব তাহলে কসম সহীহ হয় এবং সে কারণে ব্যক্তি কসম ভঙ্গকারীও হয় না। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে কসম সহীহ হওয়ার জন্য তার বাস্তবায়ন সম্ভব হওয়া শর্ত নয়। এতে, কোনো অসম্ভব বিষয়ে কসম করলেও তার মতে তা শুদ্ধ হবে এবং সে কারণে ব্যক্তি কসম ভঙ্গকারী হয়ে যাবে।

এরই উদাহরণ হলো مَسْئَلَةُ الْكُوزِ তথা জগের মাসআলা। যার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ : একটি খালি জগ লক্ষ্য করে কেউ যদি বলে আমি যদি এ জগের পানি টুকু পান না করি তাহলে আমার স্ত্রী তালাক। এ ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মাদ (র.)-এর মতে কসমকরী কসম ভঙ্গকারী (তথা স্ত্রী তালাক) হবে না। কারণ এটি এমন একটি কসম যার বাস্তবায়ন অসম্ভব। জগে যেহেতু পানিই নেই, তাই পান করার কল্পনা করা যায় না। তাই কসমই সহীহ হবে না। কসম ভঙ্গকারী হওয়া তো দূরের কথা। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ (রা.)-এর মতে ব্যক্তির কসম সহীহ হবে এবং অক্ষমতার কারণে সে কসম ভঙ্গকারী (তথা স্ত্রী তালাক) হবে। যেহেতু তার মতে বাস্তবায়ন সম্ভব হওয়া শর্ত নয়। অসম্ভব বিষয়ের কসমও তার মতে সহীহ এবং এর কারণে কসমকারী হানেস হয়।

কিতাবে আলোচ্য মৃত ব্যক্তিকে হত্যা করা সম্পর্কিত কসমের মাসআলাটিও অনুরূপ। ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মাদ (র.)-এর মতে মৃত ব্যক্তি কে হত্যা করা যেহেতু সম্ভব নয়, তাই এ সম্পর্কিত কসমটাই সহীহ নয়। অতএব, তা থেকে কসম ভঙ্গকারী হওয়ার প্রশ্ন নেই। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে মৃত ব্যক্তিকে হত্যা করা অসম্ভব হলেও এ সম্পর্কিত কসমটি সহীহ হয়ে গেছে এবং ব্যক্তি তার অক্ষমতার কারণে কসম ভঙ্গকারী হবে।

وَلَيْسَ فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ تَفْصِيلُ الْعِلْمِ وَهُوَ الصَّحِيحُ জগে পানি নেই, এটা জেনেই কসম করা হোক বা না জেনেই কসম করা হোক উভয় অবস্থায় এক হুকুম। তরফাইনের মতে কসম ভঙ্গকারী হবে না। ইমাম আবূ ইউসূফ (রা.) -এর মতে কসম ভঙ্গকারী হবে এ বর্ণনা বিশুদ্ধ।

এ মাসআলায় মাশায়েখ ইরাকের পক্ষ হতে আরেকটি বর্ণনা পাওয়া যায় যা শুদ্ধ নয়। বর্ণনাটি হলো জগে পানি নেই। কেউ না জেনে কসম করলেই কেবল তরফাইনের কসম ভঙ্গকারী হবে না। জেনে কসম করলে তরফাইনের মতেও কসম ভঙ্গকারী হয়ে যাবে। এ বর্ণনা টি ইমাম ফখরুল ইসলাম বাযদাবী (র.) জামে সগীরের ব্যাখ্যা গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ الْيَمِيْنِ فِيْ تَقَاضِى الدَّرَاهِمِ

قَالَ وَمَنْ حلف لَيَقْضِيَنَّ دَيْنَهُ اِلَى قَرِيْبٍ فَهُوَ عَلَى مَا دُوْنَ الشَّهْرِ، وَاِنْ قَالَ اِلَى بَعِيْدٍ فَهُوَ أَكْثَرُ مِنَ الشَّهْرِ لِاَنَّ مَا دُوْنَهُ يُعَدُّ قَرِيْبًا، وَالشَّهْرُ وَمَا زَادَ عَلَيْهِ يُعَدُّ بَعِيْدًا، وَلِهٰذَا يُقَالُ عِنْدَ بُعْدِ الْعَهْدِ مَا لَقِيْتُك مُنْذُ شَهْرٍ وَمَنْ حَلَفَ لَيَقْضِيَنَّ فُلَانًا دَيْنَهُ الْيَوْمَ فَقَضَاهُ ثُمَّ وَجَدَ فُلَانٌ بَعْضَهَا زُيُوْفًا اَوْ نَبَهْرَجَةً اَوْ مُسْتَحَقَّةً لَمْ يَحْنَثْ الْحَالِفُ لِاَنَّ الزِّيَافَةَ عَيْبٌ وَالْعَيْبُ لَا يُعْدِمُ الْجِنْسَ، وَلِهٰذَا لَوْ تَجَوَّزَ بِهِ صَارَ مُسْتَوْفِيًا، فَوُجِدَ شَرْطُ الْبِرِّ وَقَبْضُ الْمُسْتَحَقَّةِ صَحِيْحٌ وَلَا يَرْتَفِعُ بِرَدِّهِ الْبِرُّ الْمُتَحَقِّقُ وَاِنْ وَجَدَهَا رَصَاصًا اَوْ سَتُّوقَةً حَنِثَ لِاَنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ جِنْسِ الدَّرَاهِمِ حَتّٰى لَا يَجُوْزَ التَّجَوُّزُ بِهِمَا فِي الصَّرْفِ وَالسَّلَمِ وَاِنْ بَاعَهُ بِهَا عَبْدًا وَقَبَضَهُ بَرَّ فِيْ يَمِيْنِهِ لِاَنَّ قَضَاءَ الدَّيْنِ طَرِيْقُهُ الْمُقَاصَّةُ وَقَدْ تَحَقَّقَتْ بِمُجَرَّدِ الْبَيْعِ فَكَاَنَّهُ شَرْطُ الْقَبْضِ لِيَتَقَرَّرَ بِهِ وَاِنْ وَهَبَهَا لَهُ يَعْنِي الدَّيْنَ لَمْ يَبَرَّ لِعَدَمِ الْمُقَاصَّةِ لِاَنَّ الْقَضَاءَ فِعْلُهُ، وَالْهِبَةُ إِسْقَاطٌ مِنْ صَاحِبِ الدَّيْنِ۔

পরিচ্ছেদ : দিরহাম পরিশোধ করা সম্পর্কে কসম খাওয়া

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেছেন, **কেউ যদি কসম করে যে, অতিসত্বর তার ঋণ পরিশোধ করবে, তাহলে এক মাসের ভিতরে পরিশোধ করতে হবে। আর যদি বলে বিলম্বে আদায় করবে, তাহলে এক মাসের বেশি কাল উদ্দেশ্য হবে।** কেননা এক মাসের কম সময়কে নিকটতম সময় মনে করা হয়। একমাস ও তার চেয়ে অধিক কালকে দূরবর্তী বলে গণ্য করা হয়। এ কারণেই দীর্ঘদিন পরে সাক্ষাৎ হলে আরবগণ বলে থাকেন– مَا لَقِيْتُك مُنْذُ شَهْرٍ আমি তোমাকে মাসব্যাপী দেখিনি, অর্থাৎ বহু দিন হলো সাক্ষাৎ নেই।

কেউ কসম করল, সে আজ অমুকের ঋণ পরিশোধ করবে। অতঃপর তা পরিশোধ করে দিল, কিন্তু অমুক ব্যক্তি (পাওনাদার) তাতে কিছু মুদ্রা পেল খোঁটা, অথবা অচল, অথবা এমন যে তাতে তৃতীয় ব্যক্তি হক দাবি করে। এমতাবস্থায় কসমকারী হানেস হবে না। কেননা খোঁটা হওয়া এটি একটি দোষ। এর ফলে জিনস (মূল বস্তুসত্তা) বিলুপ্ত হয়ে যায় না। এ কারণে পাওনাদার যদি তা মেনে নেয় তাহলে সে ঋণ উসুলকারী বলে গণ্য হয়। অতএব, কসম পূর্ণ হওয়ার শর্ত পাওয়া গেল। তৃতীয় ব্যক্তির দাবিপূর্ণ দিরহামগুলো কবজা করা সহীহ আছে। পরে সেগুলো ফেরত দেওয়ার কারণে কসমের পূর্ণতা বাতিল হবে না। যা পূর্বেই বাস্তবায়িত হয়ে গেছে।

পরিশোধকৃত মুদ্রাগুলো যদি তামার হয়, কিংবা দুপিঠে রূপার নিকেল কৃত তামা হয়, তাহলে কসমকারী কসম ভঙ্গকারী হয়ে যাবে। কারণ তামার মুদ্রা এবং নিকেলকৃত তামা দিরহামের জিনসের আওতায় পড়ে না। এ কারণেই বাইয়ে সরফ ও বাইয়ে সালামের ক্ষেত্রে এগুলো গ্রহণ করা জায়েজ হয় না। **যদি কসমকারী ব্যক্তি ঋণের পরিবর্তে নিজের একটি গোলাম পাওনাদারের কাছে বিক্রি করে দেয় এবং সে এটাকে কবৃজ করে নেয়, তাহলেও**

https://e-ilm.weebly.com/

তার কসম পূর্ণ হয়ে যাবে। কেননা ঋণ পরিশোধের একটি পদ্ধতি হলো আদান-প্রদান। এটা পাওয়া গেছে শুধু বিক্রি করার দ্বারাই। এতএব, কাবজকারীর শর্তটি আরোপ করা হয়েছে কেবলই দৃঢ়তার জন্য। পাওনাদার যদি ঋণী ব্যক্তিকে ঋণটা হেবা করে দেয়, তাহলে সে কসম ভঙ্গকারী হয়ে যাবে। যেহেতু আদান-প্রদান পাওয়া যায়নি। কেননা ঋণ পরিশোধ করা হলো ঋণী ব্যক্তির কাজ। আর হেবা করার অর্থ হলো ঋণটা মওকুফ করে দেওয়া পাওনাদারের পক্ষ থেকে। (দুটি ভিন্ন ভিন্ন কাজ)।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

অধ্যায়ের শিরোনামে (بَابُ الْيَمِيْنِ فِيْ تَقَاضِي الدَّرَاهِمِ) শুধু দিরহাম উল্লেখ আছে দীনার উল্লেখ করা হলো না। এর কারণ হলো দীনারের তুলনায় দিরহামের প্রচলন বেশি হওয়া। যে কারণে মহরানার পরিমাণ ও চুরির নেসাব ও দিরহাম দ্বারা ঠিক করা হয়েছে।

تقاضي শব্দটি إِسْتِيْفَاء শব্দের সমার্থক। অর্থাৎ আদায় করা, উসুল করা। এ অধ্যায়ে قضى শব্দটি আদায় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন কুরআনে উল্লেখ রয়েছে- فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ যখন নামাজ আদায় করে নেওয়া হয়....।

زيوف : وَمَنْ حَلَفَ لَيَقْضِيَنَّ فُلَانًا دَيْنَهُ الخ এরূপ মুদ্রাকে বলা হয় যা বাইতুল মাল ও ব্যাংকে গ্রহণ করা হয় না কিন্তু ব্যবসায়ীরা তা গ্রহণ করে।

نبهرجة এরূপ মুদ্রা কে বলা হয়, যা বেশি দোষযুক্ত হওয়ার কারণে ব্যবসায়ীরাও গ্রহণ করতে চায় না। مُسْتَحِقَّةٌ দ্বারা এমন মুদ্রা উদ্দেশ্য যে মুদ্রা সম্পর্কে তৃতীয় ব্যক্তি দাবি করে যে, এগুলো আমার এবং সে তা প্রমাণিতও করে দেয়।

رصاص, তামা বা পিতলের তৈরি মুদ্রা।

ستوقة শব্দের س এ যবরসহ পড়তে হয়, শব্দটি মূলত ফার্সি। পরবর্তীতে আরবিতে ব্যবহৃত হয়ে গেছে।

ستوقة শব্দের অর্থ হলো তিন স্তর বিশিষ্ট। যে মুদ্রা তামার তৈরি, কিন্তু তার দু পিঠেই রূপা লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে এরূপ মুদ্রাকে ستوقة বলা হয়। رصاص এবং ستوقة যেহেতু মূলত মুদ্রা নয়, তাই بيع صرف ও بيع سلم -এর ক্ষেত্রে তার আদান-প্রদান জায়েজ নেই। মুদ্রার ক্রয়-বিক্রয়কে بيع صرف বলা হয়। এর জন্য শর্ত হলো ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়েই পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বে নিজ নিজ প্রাপ্য বুঝে নিতে হবে। অর্থাৎ আদান-প্রদান চূড়ান্তরূপে সমাপ্ত করতে হবে। এখন যদি এক পক্ষ হতে رصاص বা ستوقة দিয়ে দেওয়া হয় এবং অপর পক্ষ তা নিয়ে নেয়, তাহলে তা জায়েজ হবে না। কেননা এ رصاص বা ستوقة মুদ্রা নয়। অতএব, একপক্ষ থেকে মুদ্রা দেওয়া হলো অপর পক্ষ হতে দেওয়া হলো না, একপক্ষ নিজের প্রাপ্য বুঝে নিল, অপর পক্ষ তার প্রাপ্য বুঝে পেল না। এ কারণে بيع صرف নাজায়েজ হবে। بيع سلم বলা হয়, ক্রেতা কর্তৃক মুদ্রা নগদ পরিশোধ করা। বিক্রেতার পক্ষ হতে নির্দিষ্ট মেয়াদে পণ্য পরিশোধ করা। যেমন ক্রেতা নগদ ৫০০/= টাকা দিয়ে বলল, এর বিনিময়ে এক মাসের মধ্যে আমাকে তুমি পাঁচমণ ধান দিয়ে দিবে বিক্রেতাও রাজি হলো। এ রকম বিক্রয়ের ক্ষেত্রে শর্ত হলো মূল্যটা নগদ হতে হবে। এখন যদি بيع سلم -এর মূল্য বাবদ رصاص বা ستوقة পরিশোধ করা হয়, তাহলে এগুলো যেহেতু প্রকৃত পক্ষে মুদ্রা নয়, তাই ক্রয়-বিক্রয় বাতেল বলে গণ্য হবে

وَمَنْ حلف لَا يَقْبِضُ دَيْنَهُ دِرْهَمًا دُوْنَ دِرْهَمٍ فَقَبَضَ بَعْضَهُ لَمْ يَحْنَثْ حَتّٰى يَقْبِضَ جَمِيْعَهُ لِاَنَّ الشَّرْطَ قَبْضُ الْكُلِّ وَلٰكِنَّهُ بِوَصْفِ التَّفَرُّقِ، اَلَا يُرٰى اَنَّهُ اَضَافَ الْقَبْضَ اِلٰى دَيْنٍ مُعَرَّفٍ مُضَافٍ اِلَيْهِ فَيَنْصَرِفُ اِلٰى كُلِّهٖ فَلَا يَحْنَثُ اِلَّا بِهٖ فَاِنْ قَبَضَ دَيْنَهُ فِيْ وَزْنَيْنِ لَمْ يَتَشَاغَلْ بَيْنَهُمَا اِلَّا بِعَمَلِ الْوَزْنِ لَمْ يَحْنَثْ وَلَيْسَ ذٰلِكَ بِتَفْرِيْقٍ لِاَنَّهُ قَدْ يَتَعَذَّرُ قَبْضُ الْكُلِّ دُفْعَةً وَاحِدَةً عَادَةً فَيَصِيْرُ هٰذَا الْقَدْرُ مُسْتَثْنًى مِنْهُ وَمَنْ قَالَ : اِنْ كَانَ لِيْ اِلَّا مِائَةُ دِرْهَمٍ فَامْرَاَتُهُ طَالِقٌ فَلَا يَمْلِكُ اِلَّا خَمْسِيْنَ دِرْهَمًا لَمْ يَحْنَثْ لِاَنَّ الْمَقْصُوْدَ مِنْهُ عُرْفًا نَفْيُ مَا زَادَ عَلَى الْمِائَةِ وَلِاَنَّ اِسْتِثْنَاءَ الْمِائَةِ اسْتِثْنَاؤُهَا بِجَمِيْعِ اَجْزَائِهَا وَكَذٰلِكَ لَوْ قَالَ غَيْرَ مِائَةٍ اَوْ سِوٰى مِائَةٍ لِاَنَّ كُلَّ ذٰلِكَ اَدَاةُ الْاِسْتِثْنَاءِ ـ

অনুবাদ : কেউ শপথ করল, আমি আমার ঋণের এক দিরহাম রেখে এক দিরহাম গ্রহণ করব না। (অর্থাৎ ভেঙ্গে ভেঙ্গে গ্রহণ করব না। অতঃপর যদি সে আংশিক ঋণ গ্রহণ করে তাহলে ও কসম ভঙ্গকারী হবে না। যতক্ষণ না সে পূর্ণ ঋণ ভেঙ্গে ভেঙ্গে গ্রহণ করবে।

কেননা শর্ত হলো পূর্ণ ঋণ গ্রহণ ভেঙ্গে ভেঙ্গে হওয়ার অবস্থা সাপেক্ষে। লক্ষণীয় যে, قبض (কবজা) করা বা গ্রহণ করার বিষয়টিকে সে دين (ঋণ) শব্দের সাথে সম্পৃক্ত করেছে। আর دين শব্দটি তার (কসমকারী) দিকে সম্বন্ধ হওয়ার কারণে معرفه বা নির্দিষ্ট হয়ে আছে। অতএব, পূর্ণ ঋণ উদ্দেশ্য হবে। এবং পূর্ণ ঋণ কবজা করা ব্যতীত কসম ভঙ্গকারী হবে না।

যদি সে তার ঋণটা দু বার ওজন করার মাধ্যমে গ্রহণ করে এবং দুবার ওজন করার ফাঁকে অন্য কোনো কাজে লিপ্ত না হয় কেবল ওজন করার কাজেই মগ্ন থাকে তাহলে সে কসম ভঙ্গকারী হবে না এবং দুবার ওজন করে গ্রহণ করাটা ভেঙ্গে ভেঙ্গে গ্রহণ বলে বিবেচিত হবে না। কেননা প্রায়ই এরূপ হতে দেখা যায় যে, পূর্ণ ঋণ এক বারে (মেপে) গ্রহণ করা অসম্ভব হয়ে যায়। তাই এতুটুকু ব্যাপারে ব্যতিক্রম হিসেবে পরিগণিত হবে।

কেউ বলল, আমার কাছে একশ দিরহাম ছাড়া কিছু থাকলে, তার স্ত্রী তালাক। অতঃপর দেখা গেল সে শুধু পঞ্চাশ দিরহামের মালিক। সে কসম ভঙ্গকারী (তথা স্ত্রী তালাক) হবে না। কেননা পরিবেশে এরূপ বলার দ্বারা উদ্দেশ্য হয় একশর উপরের সংখ্যাকে অস্বীকার করা এবং এ কারণেও যে একশকে বাদ দেওয়ার দ্বারা একশর সকল অংশকেও বাদ দেওয়া হয়। **যদি বলে غير مائة বা سوى مائة তাহলেও অনুরূপ হুকুম হবে।** কারণ এ সকলগুলোই ব্যতিক্রম জ্ঞাপক অব্যয়।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কোনো ব্যক্তি কসম করল, সে তার পাওনা ভেঙ্গে ভেঙ্গে গ্রহণ করবে না, পুরোটা এক সাথে গ্রহণ করবে। অতঃপর সে কিছু অংশ গ্রহণ করল। এর কারণে সে কসম ভঙ্গকারী হবে না, পূর্ণ ঋণ গ্রহণ করার পর কসম ভঙ্গকারী হবে। কেননা কসম ভঙ্গকারী হওয়ার জন্য শর্ত করা হয়েছে ঋণ কবজ করা, পূর্ণ ঋণ ভেঙ্গে ভেঙ্গে কবজ করার পরই এ শর্ত বাস্তবায়িত হবে। তখনই কসম ভঙ্গকারী হবে। উপরিউক্ত কসমের যদি পূর্ণ ঋণ এক সাথেই কবজ করে, তবে তার মুদ্রাগুলো দুবারে ওজন করে দেওয়া হয় অর্থাৎ একবার কিছু মুদ্রা ওজন করা হয় তারপর অবশিষ্ট মুদ্রাগুলো ওজন করে দেওয়া হয় এবং ইতিমধ্যে অন্য কোনো কাজে লিপ্ত না হয়, তাহলে একে ভেঙ্গে ভেঙ্গে গ্রহণ করা বলা হবে না এবং কসমকারী ব্যক্তিও কসম ভঙ্গকারী হবে না। কিয়াসের দাবি ছিল কসম ভঙ্গকারী হয়ে যাওয়া। যেহেতু সে দুবারে গ্রহণ করেছে। কিন্তু প্রায় সময় এমন হয় যে, পূর্ণ ঋণ এক ওজনে গ্রহণ করা সম্ভব হয় না পরিমাণে বেশি হওয়ার কারণে, তখন দুই, তিনবার ওজন করেই গ্রহণ করতে হয়। এ কারণে এ ধরনের ভেঙ্গে ভেঙ্গে গ্রহণ করাকে একত্রে গ্রহণ বলেই সাব্যস্ত করা হয়েছে।

اِنْ كَانَ لِي اِلَّا مِائَةُ دِرْهَمٍ الخ : আমার কাছে একশ দিরহাম ছাড়া আর কিছু পাওয়া গেলে আমার স্ত্রী তালাক। এ রকম কসম করার পর যদি কসমকারীর কাছে পঞ্চাশ দিরহাম পাওয়া যায় তাহলে সে কসম ভঙ্গকারী (তথা স্ত্রী তালাক) হবে না। কারণ কসম ভঙ্গকারী হওয়ার শর্ত হলো একশ দিরহামের বেশি পাওয়া। কিন্তু তা পাওয়া যায়নি; বরং একশ দিরহামের কম পাওয়া গেছে, তাই সে কসম ভঙ্গকারী হবে না। নিরানব্বই দিরহাম পাওয়া গেলেও কসম ভঙ্গকারী হবে না। একশ এক দিরহাম পাওয়া গেলে সে কসম ভঙ্গকারী (তথ স্ত্রী তালাক) হয়ে যাবে। কারণ একশ কে ইস্তিসনা করার দ্বারা একশর সকল অংশ অর্থাৎ একশ হতে নিম্নের সকল সংখ্যাই ইস্তিসনা হয়ে গেছে।

اِنْ كَانَ لِيْ اِلَّا مِائَةٌ – الا শব্দের স্থানে যদি غَيْرُ বা سِوَى শব্দ ব্যবহার করা হয়, তাহলেও একই হুকুম হবে। অর্থাৎ اِلَّا مِائَةٌ বলার যে হুকুম, غَيْرُ مِائَةٍ বা سِوَى مِائَةٍ বলারও একই হুকুম। কেননা اِلَّا. غَيْرُ. سِوَى সবকটি শব্দই ব্যতিক্রম জ্ঞাপক অব্যয়।

https://e-ilm.weebly.com/

مَسَائِلُ مُتَفَرِّقَةٌ

وَاِذَا حَلَفَ لَا يَفْعَلُ كَذَا تَرَكَهُ اَبَدًا لِاَنَّهُ نَفَى الْفِعْلَ مُطْلَقًا فَعَمَّ الْاِمْتِنَاعُ ضَرُوْرَةَ عُمُوْمِ النَّفْيِ وَاِنْ حَلَفَ لَيَفْعَلَنَّ كَذَا فَفَعَلَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً بَرَّ فِيْ يَمِيْنِهِ لِاَنَّ الْمُلْتَزَمَ فِعْلٌ وَاحِدٌ غَيْرُ عَيْنٍ، اِذِ الْمَقَامُ مَقَامُ الْاِثْبَاتِ فَيَبَرُّ بِاَيِّ فِعْلٍ فَعَلَهُ، وَاِنَّمَا يَحْنَثُ بِوُقُوْعِ الْيَاسِ عَنْهُ وَذٰلِكَ بِمَوْتِهِ اَوْ بِفَوْتِ مَحَلِّ الْفِعْلِ وَاِذَا اِسْتَحْلَفَ الْوَالِي رَجُلًا لِيُعْلِمَنَّهُ بِكُلِّ دَاعِرٍ دَخَلَ الْبَلَدَ فَهٰذَا عَلٰى حَالِ وِلَايَتِهِ خَاصَّةً لِاَنَّ الْمَقْصُوْدَ مِنْهُ دَفْعُ شَرِّهِ اَوْ شَرِّ غَيْرِهِ بِزَجْرِهِ فَلَا يُفِيْدُ فَائِدَتَهُ بَعْدَ زَوَالِ سَلْطَنَتِهِ، وَالزَّوَالُ بِالْمَوْتِ وَكَذَا بِالْعَزْلِ اِلٰى ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ ـ

বিবিধ মাস'আলা

অনুবাদ : কেউ যদি কসম করে যে আমি অমুক কাজটি করব না। তাহলে কাজটি চিরতরে ত্যাগ করতে হবে। কারণ সে কাজ না করার কথাটি শর্তমুক্তভাবে বলেছে। তাই এটা ব্যাপকভাবে নিষিদ্ধ হয়ে যাবে, না করাটি ব্যাপক হওয়ার কারণে।

কেউ কসম করল যে, সে অমুক কাজটি অবশ্যই করবে। অতঃপর সে ঐ কাজ একবার করল, এর দ্বারা তার কসম পূর্ণ হয়ে যাবে। কেননা সে তার নিজের উপর অনির্দিষ্টভাবে একটি কাজ আবশ্যক করেছে। কারণ স্থানটি ইতিবাচক স্থানে। তাই কাজটি একবার সম্পাদন করলেই কসম থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। তবে কাজটি করার ব্যাপারে আশা না থাকলে বা করার সুযোগ শেষ হয়ে গেল কসম ভঙ্গকারী হয়ে যাবে। এটি কর্তার মৃত্যুর মাধ্যমে হতে পারে কিংবা যে পাত্রে কাজটি করা হতো, সে পাত্র শেষ হয়ে যাওয়ার কারণেও হতে পারে।

যদি বর্তমান শাসনকর্তা কাউকে এ মর্মে শপথ করায় যে, দেশে কোনো দুষ্কৃতিকারী প্রবেশ করলে সে সম্পর্কে শাসনকর্তাকে অবগত করবে, তাহলে এ কসম ততদিন কার্যকরী থাকবে যতদিন উক্ত শাসক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকেন। কেননা এ কসমের উদ্দেশ্য হলো দুষ্কৃতিকারীকে শাস্তি দেওয়ার মাধ্যমে তার ও অন্যের ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়া। অতএব, এ শাসক ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাকে অবগত করায় কোনো লাভ নেই। ক্ষমতাচ্যুত হবে মরে গেলে অথবা পদহারা হলে জাহেরুর রেওয়ায়াহ অনুযায়ী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

مَسَائِلُ مُتَفَرِّقَةٌ বাক্যটির মূলরূপ হলো هٰذِهِ مَسَائِلُ مُتَفَرِّقَةٌ মুবতাদা ও খবর নিয়ে গঠিত جمله اسميه خبرية। মুসান্নেফগণের একটি রীতি হলো বিভিন্ন বিষয়ক অধ্যায়ের পর কিতাবের অন্তে مَسَائِلُ مُتَفَرِّقَةٌ শিরোনামে একটি অংশ লেখে থাকেন। এ অংশে সাধারণত ঐ সকল মাসআলাগুলো-ই উল্লেখ করা হয়, যেগুলো পূর্বের অধ্যায়সমূহের সাথে কিছুটা সম্পর্কশীল ছিল, কিন্তু কোনো অধ্যায়ে সেগুলো উল্লেখ করা হয়নি। এ নিয়ম অনুযায়ীই মুসান্নেফ (র.) كتاب الايمان -এর শেষ প্রান্তে বক্ষমান শিরোনাম مَسَائِلُ مُتَفَرِّقَةٌ উল্লেখ করেছেন।

وَاِنْ حَلَفَ لَيَفْعَلَنَّ كَذَا فَفَعَلَهُ : যেমন কেউ বলল, আমি এ চাটাইতে নামাজ পড়ব। তারপর যদি ফরজ, সুন্নত বা নফল যে কোনো প্রকার একটি নামাজ উক্ত চাটাইয়ের উপর আদায় করে নেয়, তাহলেই তার কসম পূর্ণ হয়ে গেল। আর যদি নামাজ পড়ার পূর্বে সে নিজেই মরে যায় কিংবা চাটাইটি পুড়ে যায় বা অন্য কোনো উপায়ে ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলেই সে কসম ভঙ্গকারী হয়ে যাবে।

وَاِذَا اسْتَحْلَفَ الْوَالِي رَجُلًا لِيُعْلِمَنَّهُ : لِيُعْلِمَنَّهُ শব্দটি الإعْلَامُ হতে উৎপন্ন। অর্থ- অবগত করা, জানানো। داعر শব্দটি اسم فاعل -এর واحد مذكر -এর সীগাহ, الدعر মাসদার হতে। অর্থ- অনর্থ সৃষ্টি করা।

ইমাম আবূ ইউসুফ (রা.) হতে বর্ণিত আছে। শাসক ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পরেও তাকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অবগত করতে হবে। এক উক্তি অনুযায়ী এটা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মত এক বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এরও অভিমত।

https://e-ilm.weebly.com/

وَمَنْ حَلَفَ اَنْ يَهَبَ عَبْدَهٗ لِفُلَانٍ فَوَهَبَهٗ وَلَمْ يَقْبَلْ بَرَّ فِيْ يَمِيْنِهٖ خِلَافًا لِزُفَرَ فَاِنَّهٗ يَعْتَبِرُهٗ بِالْبَيْعِ لِاَنَّهٗ تَمْلِيْكٌ مِثْلُهٗ. وَلَنَا اَنَّهٗ عَقْدُ تَبَرُّعٍ فَيَتِمُّ بِالْمُتَبَرِّعِ وَلِهٰذَا يُقَالُ وُهِبَ وَلَمْ يَقْبَلْ، وَلِاَنَّ الْمَقْصُوْدَ اِظْهَارُ السَّمَاحَةِ وَذٰلِكَ يَتِمُّ بِهٖ، اَمَّا الْبَيْعُ فَمُعَاوَضَةٌ فَاقْتَضَى الْفِعْلَ مِنَ الْجَانِبَيْنِ وَمَنْ حَلَفَ لَا يَشُمُّ رَيْحَانًا فَشَمَّ وَرْدًا اَوْ يَاسَمِيْنًا لَا يَحْنَثُ لِاَنَّهٗ اسْمٌ لِمَا لَا سَاقَ لَهٗ وَلَهُمَا سَاقٌ ـ

অনুবাদ : কেউ শপথ করল, যে তার গোলামটি অমুককে দান করে দিবে। অতঃপর দান করে দিল। কিন্তু অমুক তা কবুল করল না। এমতাবস্থায় সে কসম হতে মুক্ত হয়ে যাবে। তবে এতে ইমাম যুফার (রা.) দ্বিমত করেন। তিনি দানকে বিক্রয়ের সাথে তুলনা করেন। যেহেতু দানও এক প্রকারের মালিকানা হস্তান্তর, বিক্রয়ের মতো। আমাদের কথা হলো অনুগ্রহমূলক একটি কাজ। তাই এটা শুধু অনুগ্রহকারীর মাধ্যমেই সম্পন্ন হতে পারে। এ কারণে বলা হয়ে থাকে وُهِبَ فَلَمْ يَقْبَلْ; সে দান করেছিল কিন্তু গ্রহীতা তা গ্রহণ করেনি। তা ছাড়া দানের উদ্দেশ্য হলো বদান্যতা প্রকাশ করা। এটি দাতার মাধ্যমেই পূর্ণ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে ক্রয়-বিক্রয় হলো একটি দ্বিপাক্ষিক আদান-প্রদান। তাই সেটা দুই পক্ষ হতে সম্পাদন হওয়ারই দাবি রাখে।

যে ব্যক্তি কসম করল, রাইহান (এক প্রকার সুঘ্রাণযুক্ত উদ্ভিদ)-এর ঘ্রাণ নিবে না। অতঃপর ওয়ারদ (গোলাপ) কিংবা ইয়াসমীন (জুঁইফুল)-এর ঘ্রাণ নিল, সে কসম ভঙ্গকারী হবে না। কেননা রাইহান এক প্রকার উদ্ভিদ যার কাণ্ড নেই। আর গোলাপ ও চামেলীর কাণ্ড আছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

দানকারী ব্যক্তি দান করলেই তা দান হয়ে যায়। গ্রহীতা গ্রহণ করলে মালিক হবে, গ্রহণ না করলে সে মালিক হবে না। কিন্তু দানকারীর পক্ষ হতে তা দান বলে গণ্য হবে। তাই গ্রহীতা গ্রহণ না করলেও দাতা তার কসম থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। সে কসম ভঙ্গকারী হবে না। দ্বিমত করেছেন ইমাম যুফার (র.) তার মতে গ্রহীতা গ্রহণ না করলে কসমকারী হানেস হয়ে যাবে। আল কাফী নামক গ্রন্থে আছে, উপরিউক্ত অবস্থায় যদি গ্রহীতা অনুপস্থিত থাকে, তাহলে তার মতে দাতা কসম ভঙ্গকারী হবে না। গ্রহীতা যদি উপস্থিত থাকে, তাহলে দাতা কসম ভঙ্গকারী হয়ে যাবে। এটা ইমাম আহমদ (র.)-এরও মত। এক উক্তি অনুযায়ী ইমাম শাফী (র.)-এরও মত। ই'আরা, সদকা, ইকরার, অসিয়ত ইত্যাদির ব্যাপারে হেবার অনুরূপ মতানৈক্য রয়েছে।

قَوْلُهٗ : وَمَنْ حَلَفَ لَا يَشُمُّ رَيْحَانًا الخ : অভিধানে সুঘ্রাণ যুক্ত যে কোনো উদ্ভিদকেই রাইহান বলা হয়। এ হিসেবে রাইহান শব্দ গোলাপকেও অন্তর্ভুক্ত করে।

এটাই ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর মাযহাব। কিন্তু ফকীহগণের পরিভাষায় রাইহান হলো এমন উদ্ভিদ যার পাতা ও কাণ্ড উভয়তে সুঘ্রাণ আছে। যেমন আস নামক উদ্ভিদ (চিরহরিৎ এক প্রকার গুল্ম) আর ওয়ারদ বলা হয় এমন উদ্ভিদ কে, যার শুধু পাতায় ঘ্রাণ থাকে। যেমন ইয়সমীন বা জুঁই। (المغرب) জামে সগীরের ব্যাখ্যা গ্রন্থে আল্লামা ফখরুল ইসলাম বাযদাবী (র.) বলেছেন, রাইহান এমন উদ্ভিদ যা কাণ্ডের উপর দাঁড়িয়ে থাকে না। কিন্তু তার সুঘ্রাণ আছে। পক্ষান্তরে ওয়ারদ ও ইয়াসমীনের কাণ্ড আছে। একথাই গ্রহণ করেছেন হেদায়া গ্রন্থকার ও সদরুশ শহীদ (র.) তথাপি মাসআলাটি মূলত উরফের উপর নির্ভরশীল। যে উরফে রাইহান বলতে যা বুঝানো হয় তার ঘ্রাণ নিলেই সে উরফের কসমকারী ব্যক্তি হানেস হবে। যাকে রাইহান বলা হয় না, তার ঘ্রাণ নিলে কসম ভঙ্গকারী হবে না কাণ্ড থাকুক, চাই না থাকুক। পাতা- কাণ্ড উভয়ই সুঘ্রাণ যুক্ত হোক, চাই না হোক।

https://e-ilm.weebly.com/

وَلَوْ حَلَفَ لَا يَشْتَرِيْ بَنَفْسَجًا وَلَا نِيَّةَ لَهُ فَهُوَ عَلَى دُهْنِهِ اِعْتِبَارًا لِلْعُرْفِ وَلِهٰذَا يُسَمّٰى بَائِعُهُ بَائِعَ الْبَنَفْسَجِ وَالشِّرَاءُ يَبْنِي عَلَيْهِ وَقِيْلَ فِيْ عُرْفِنَا يَقَعُ عَلَى الْوَرَقِ وَاِنْ حَلَفَ عَلَى الْوَرْدِ فَالْيَمِيْنُ عَلَى الْوَرَقِ لِاَنَّهُ حَقِيْقَةٌ فِيْهِ وَالْعُرْفُ مُقَرِّرٌ لَهُ، وَفِي الْبَنَفْسَجِ قَاضٍ عَلَيْهِ ـ

অনুবাদ : কেউ যদি কসম করে যে, সে বানাফসাজ (ভায়োলেট ফুল) কিনবে না এবং তার কোনো নিয়ত না থাকে তাহলে বানাফসাজের তেল কেনার উপর কসমটি প্রযোজ্য হবে, উরফের প্রতি লক্ষ্য রেখে! এ কারণেই বানাফসাজের তেল বিক্রেতাকে বানাফসাজ বিক্রেতা বলা হয়। ক্রয়ের বিষয়টিও এর অনুরূপ হবে। কেউ কেউ বলেছেন, আমাদের সমাজে বানাফসাজের পাপড়ির উপর প্রযোজ্য হবে। যদি কসম করে ওয়ারদ (গোলাপ) কিনবে না তাহলে কসমটি ওয়ারদের পাপড়ির উপর প্রযোজ্য হবে। কারণ এটিই ওয়ারদ শব্দের প্রকৃত অর্থ। সমাজ একে সমর্থন করে। আর বনাফসাজের ক্ষেত্রে সমাজ প্রচলিত প্রকৃত অর্থের বিপরীতে ফয়সালা করে। (অর্থাৎ তেল বুঝায়)।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পরিবেশ প্রচলনের প্রতি লক্ষ্য রেখেই কসম-ইয়ামীনের অর্থ বা উদ্দেশ্য নিরূপণ করা হয়। আর প্রচলিত উরফে যেহেতু বানাফসাজ বলে বানাফসাজের তেল বুঝানো হয়, তাই কসমটি তেলের অর্থেই প্রযোজ্য হবে। বানাফসাজ ফুলের পাপড়ি অর্থে নয়। ফকীহ আবুল লাইস (র.) বলেছেন, আমাদের পরিবেশে উপরিউক্ত কসমের পর বানাফসাজের তেল কিনলে কসম ভঙ্গকারী হবে না। তবে কসম করার সময় তেল উদ্দেশ্য হলে তেল কিনার দ্বারা কসম ভঙ্গকারী হবে। শব্দের আসল অর্থ কে গ্রহণ করে ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-ও বলেছেন তেল কিনলে কসম ভঙ্গকারী হবে না। ওয়ারদ শব্দটি তার প্রকৃত অর্থ তথা পাপড়ি অর্থেই প্রযোজ্য হবে। কারণ উরফও এটাকে সমর্থন করে। সর্বোপরি কথা হলো, যে শব্দ সে উরফে যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, সে অর্থেই কসম প্রযোজ্য হবে।

ফায়দা :

১. যদি কেউ বলে, মানুষকে প্রহার করব, বা অনুগ্রহ করব। কিংবা প্রহার করব না। তাহলে তা নারী-পুরুষ উভয়ের উপর প্রযোজ্য হবে। আরো সেসব শব্দ ইসমে জিনসরূপে ব্যবহৃত হয়, সে সকল শব্দ সংশ্লিষ্ট জিনসের নারী পুরুষ উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করবে।

২. কেউ কসম করল, সে কোনো নারীকে বিবাহ করবে না, অতঃপর লোক তাকে কোনো নারীর সাথে বিবাহ করিয়ে দিল এবং তার মুখ থেকে সম্মতি জ্ঞাপন শব্দ বের করিয়ে নিল। তাহলে কসমকারী কসম ভঙ্গকারী হয়ে যাবে। কিন্তু যদি সম্মতিটা লিখে প্রকাশ করে বা কোনো কাজের মাধ্যমে প্রকাশ করে যেমন স্ত্রীর মহরানা পরিশোধ করে দিল, তাহলে কসম ভঙ্গকারী হবে না। এর উপরই ফতোয়া।

৩. প্রথমে তৃতীয় ব্যক্তি কাউকে বিবাহ করিয়ে দিল। অতঃপর সে কসম করে বলল, আমি বিবাহ করব না। তারপর তৃতীয় ব্যক্তির করানো বিবাহের অনুমতি দিল এতে সে কসম ভঙ্গকারী হবে না এটা সর্বসম্মত মাসআলা।

৪. যদি কেউ কসম, করে বলে, যে নারীই আমার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে, সেই তালাক অতঃপর তৃতীয় ব্যক্তির করানো বিবাহকে কোনো কাজের দ্বারা অনুমোদন করে, তাহলে সে কসম ভঙ্গকারী হবে না।

৫. কেউ যদি এমন কসম করে যে, আমি অমুকের বাড়িতে যাব না। তাহলে অমুকের নিজবাড়ি, ভাড়া বাড়ি, ধার নেওয়া বাড়ির উপর উক্ত কসম প্রযোজ্য হবে। কেননা উরফে বাড়ি বলতে থাকার জায়গা বুঝানো হয়। তবে শর্ত হলো,

https://e-ilm.weebly.com/

অমুক ব্যক্তিটি অন্যের অনুগামী হিসেবে না থাকতে হবে। যেমন, স্ত্রী স্বামীর অনুগামী হয়ে বাড়িতে বাস করে। এখন কেউ যদি স্ত্রী সম্পর্কে কসম করে যে, তার ঘরে যাবে না। অতঃপর স্ত্রী যে ঘরে থাকে সে ঘরে যায়, তাহলে সে কসম ভঙ্গকারী হবে না। কারণ সেটি মূলত স্ত্রীর ঘর নয়, স্বামীর ঘর। স্বামীর অনুগামী হিসেবে স্ত্রী থাকে। -[আন নাহর]

৬. কেউ কসম করে বলল, আমার কাছে কোনো মাল নেই। অথচ তখন সে এমন কোনো দরিদ্র ব্যক্তির কাছে টাকা পায়, যাকে আদালতের পক্ষ হতে মুফলিস বা দেউলিয়া বলে ঘোষণা করা হয়েছে। কিংবা কোনো ধনী ব্যক্তির কাছে টাকা পায় তথাপি সে কসম ভঙ্গকারী হবে না। তার হাতে নগদ কিছু না থাকার কারণে।

৭. যায়েদ খালেদকে লক্ষ্য করে বলল, আল্লাহর কসম, এ কাজটি তুমি অবশ্যই করবে। এর দ্বারা যদি খালেদকে কসম করানো উদ্দেশ্য হয়, তাহলে যায়েদ কসমকারী বলে গণ্য হবে না। অন্যথায় যায়েদ কসমকারী বলে গণ্য হবে। এমন কি খালেদ যদি উক্ত কাজটি না করে তাহলে যায়েদ কসম ভঙ্গকারী হবে।

৮. যায়েদ খালেদকে বলল, আমি তোমাকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, তুমি এ কাজটি করবে। এর দ্বারা কসমকারী বলে গণ্য হবে। শর্ত হলো খালেদকে কসম করানো তার উদ্দেশ্য না হতে হবে।

৯. যায়েদ খালেদকে বলল, তোমার উপর আল্লাহর আহ্‌দ, তুমি একাজ করবে। খালেদ বলল, ঠিক আছে। এর ফলে খালেদ কসমকারী বলে গণ্য হবে।

১০. কেউ কসম করে বলল, আমি যায়েদের নিকট যে বাড়িটি ভাড়া দিয়েছি, সে বাড়িতে যায়েদকে রাখব না। অতঃপর সে যায়েদকে বলল, তুমি চলে যাও। এর দ্বারা তার কসম পূর্ণ হয়ে গেল।

১১. কসম করল, আজ নিজের মাল নিজের করজদারের কাছে রাখবে না। অতঃপর তাকে কাজির দরবারে হাজির করে তার থেকে কসম নিল অর্থাৎ সে কসম করে বলল, আমার কাছে তার কোনো মাল নেই। এভাবে কসমকারী ব্যক্তি নিজ কসমে সত্যবাদী থাকবে।

১২. যায়েদ খালেদের কাছে কোনো কিছুর দাবি করে বসল, আর খালেদ কসম করে বলল, আমার নিকট সে কিছুই পাবে না। কিন্তু যায়েদ সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারা পাওনা প্রমাণিত করে দিল। এতে করে খালেদ তার কসমে মিথ্যাবাদী হবে। এমন কি যদি স্ত্রী তালাক হওয়ার কসম করে থাকে, তাহলে খালেদের স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে। এর উপরই ফতোয়া।

১৩. কেউ কসম করে বলল, আমি অমুকের জমিতে ফসল করব না, অতঃপর অমুকের ও আরেকজনের যৌথ জমিতে ফসল করল। এর দ্বারা সে কসম ভঙ্গকারী হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যদি শপথ করে যে, অমুকের ঘরে যাবে না। অতঃপর অমুকের ও আরেকজনের যৌথ ঘরে প্রবেশ করে, তাহলে কসম ভঙ্গকারী হবে না। শর্ত হলো অমুক ঐ ঘরে না থাকতে হবে।

১৪. যদি এরূপ শপথ করে যে, আমার স্ত্রী যায়েদের বিবাহে যাবে না। কিন্তু স্ত্রী যায়েদের বিবাহের পূর্বেই চলে গেল এবং সেখানে থাকতে লাগল। এর মধ্যে বিবাহের কাজও সম্পন্ন হলো এতে কসমকারী ব্যক্তি কসম ভঙ্গকারী হবে না।

১৫. কসম করে বলল, আমি যায়েদের কাছে যাব অতঃপর তার বাড়িতে বা দোকানে গেল, তার সাথে সাক্ষাৎ হোক অথবা না হোক সে কসম ভঙ্গকারী হবে না। আর যদি না যায়, ইতিমধ্যে দুজনের কোনো একজন মারা যায় তাহলে কসমকারী ব্যক্তি কসম ভঙ্গকারী হয়ে যাবে।

১৬. স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, যখন ইচ্ছা হয়, তখনই তুমি বাইরে যেত পার, তোমার জন্য অনুমতি আছে। এমতাবস্থায় পরবর্তীতে আর অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন নেই। তবে কোনো সময় যদি স্বামী নিষেধ করে দেয়, তাহলে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে তা শুদ্ধ হবে এবং এর উপরই ফতোয়া।

১৭. কেউ যদি এ মর্মে কসম করে যে, সে ছওয়ার হবে না। তাহলে কসমটি ঐসব যানবাহনের সাথে সম্পৃক্ত হবে, যেসব যানবাহনে সে এলাকায় ছওয়ার হওয়ার প্রচলন আছে। অতএব, যদি সে মানুষের পিঠে ছওয়ার হয় কিংবা গরু গাধার পিঠে সওয়ার হয় তাহলে ভারতীয় সমাজিক পরিবেশে সে কসম ভঙ্গকারী হবে না। হাতি, পালকি অথবা রেলগাড়িতে সওয়ার হলে কসম ভঙ্গকারী হয়ে যাবে।

https://e-ilm.weebly.com/

১৮. খাওয়ার অর্থ হলো চর্বনযোগ্য কোনো বস্তু মুখের মাধ্যমে কণ্ঠনালীর নিচে প্রেরণ করা। চিবানো হোক বা না হোক। আর পান করার অর্থ হলো চিবানোর যোগ্য নয় এরূপ বস্তুকে কণ্ঠনালীর নিচে প্রেরণ করা। যদি কেউ বলে আমি এ গাছ থেকে কিছু খাব না। তাহলে কসমটি গাছের ফলের উপর প্রযোজ্য হবে। গাছের যদি ফল না থাকে তাহলের গাছের মূল্যের উপর প্রযোজ্য হবে। অতএব, যদি গাছ বিক্রির টাকা দিয়ে কোনো কিছু ক্রয় করে খায় তাহলে কসম ভঙ্গকারী হয়ে যাবে। গাছের পাতা বা ছাল খেলে কসম ভঙ্গকারী হবে না।

১৯. কেউ বলল, আমি বকরি হতে কিছু খাব না। কসমটি বকরির গোশতের সাথে সম্পৃক্ত হবে। বকরির দুধ পান করলে কসম ভঙ্গকারী হবে না।

এ ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো এই- যে বস্তুর কসম করা হয় সে বস্তুর সাথে যদি এমন কোনো গুণ বা অবস্থা থাকে, যে গুণ বা অবস্থাটি কসমের কারণ হতে পারে, তাহলে ঐ গুণ বা অবস্থার সাথেই কসমের সম্পৃক্ততা সীমিত থাকবে। ঐ বস্তুটি মারিফা হোক বা নাকিরা হোক। অতঃপর যখন ঐ বস্তু হতে গুণ বা অবস্থাটি শেষ হয়ে যাবে, তখন কসমের প্রভাবও শেষ হয়ে যাবে। যেমন- কেউ কসম করল, আমি আধাপাকা খেজুর খাব না। এক্ষেত্রে আধাপাকা হওয়ার গুণ বা অবস্থাটিই মুখ্য হবে। (কেননা অনেকের কাছে এ অবস্থাটি খুব লোভনীয়।) অতএব, খেজুরগুলো পূর্ণরূপে পাকার পর যদি খায় তাহলে কসম ভঙ্গকারী হবে না।

আর যদি বস্তুর মাঝে এমন কোনো গুণ থাকে যা কসমের কারণ হওয়ার উপযুক্ত নয়, তাহলে শব্দটি نكرة হলে তা লক্ষণীয়। শব্দটি معرفة হলে উক্ত গুণ লক্ষণীয় হবে না। কিন্তু মুজতাবা নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে- কেউ যদি কসম করে বলে, আমি এ পাগলের সাথে কথা বলব না অথবা আমি এ কাফেরের সাথে কথা বলব না। অতঃপর পাগল সুস্থ হয়ে গেল বা কাফের মুসলমান হয়ে গেল, তারপর যদি কসমকারী এদের সাথে কথা বলে, তাহলে কসম ভঙ্গকারী হবে না। কারণ পাগল হওয়া ও কাফের হওয়া, এ দুটি অবস্থা কসমের কারণ হওয়ার উপযুক্ত।

২০. শূকরের গোশত কূফাবাসীদের কাছে গোশত বলে গণ্য হয়। আমি (আশরাফুল হিদায়ার গ্রন্থকার) বলব, আমাদের দেশেও অনুরূপ হুকুম হওয়া উচিত।

২১. কেউ কসম করল, আমি এ গাধার কিছু খাব না। তাহলে এ কসমটির প্রয়োগস্থল হবে সেই অর্থ যা গাধা ভাড়া দিয়ে অর্জিত হয়ে থাকে।

২২. গরুর গোশত খাব না বলে কসম করলে কসমটি মহিষের গোশ্তকে অন্তর্ভুক্ত করবে না। অনুরূপভাবে কাচা গোশ্ত খেলেও কসম ভঙ্গকারী হবে না। এটাই বিশুদ্ধ মত।

২৩. আমি অমুক মহিলার রুটি খাব না বললে, রুটির খামির তৈরি কারিণী ও খামির দ্বারা রুটি প্রস্তুতকারিণী মহিলার উপর কসমটির কোনো প্রভাব পড়বে না। কসমটি কার্যকরী হবে শুধু ঐ মহিলার উপর, যে রুটি হাতে করে (সেকার উদ্দেশ্যে) এনে চুল্লিতে ঢুকায়।

২৪. কেউ কসম করল খাবার খাব না। অতঃপর ক্ষুধার জালায় অস্থির হয়ে মৃত জন্তু খেয়ে ফেলল। এর ফলে সে কসম ভঙ্গকারী হবে না। -[আল বাদায়ে]

২৫. কেউ কসম করল তেল খাবে না, তারপর যদি তেল দিয়ে বানানো ছাতু খায়, তাহলে দেখতে হবে ছাতুতে তেলের পরিমাণ কতটুকু। যদি ছাতুতে তেলের পরিমাণ এত বেশি হয় যে, তা নিংড়ালে টপকে পড়ে তাহলে কসমকারী কসম ভঙ্গকারী হয়ে যাবে। অন্যথায় কসম ভঙ্গকারী হবে না। -[আল জাওহার]

২৬. ইমাম মুহাম্মদ (রা.)-এর মতে ব্যঞ্জন বলতে ঐসব কিছুই উদ্দেশ্য হবে, যা দ্বারা সাধারণত রুটি বা ভাত খাওয়া হয়। এর উপরই ফতোয়া। -[আল বাহরু]

২৭. কেউ শপথ করল, আমি দুধ পান করব না, তারপর দুধ দিয়ে ক্ষীর পাক করে খেল। এর ফলে সে কসম ভঙ্গকারী হবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

২৮. কেউ শপথ করল, আমি অমুক ব্যক্তি কে দেখব না। তারপর অমুক ব্যক্তির হাত, পা, তালু, ইত্যাদি দেখলে কসম ভঙ্গকারী হবে না। যদি মাথা, পেঠ বা পিঠ দেখে তাহলে কসম ভঙ্গকারী হয়ে যাবে।

২৯. তাকে স্পর্শ করব না বলে কসম করার পর যদি তার হাত- পা স্পর্শ করে কসম ভঙ্গকারী হয়ে যাবে।

৩০. যায়েদ যদি খালেদকে বলে, আমি তোমাকে আল্লাহর কসম দিচ্ছি, তুমি এ কাজ করবে না। খালেদ বলল, হ্যাঁ এমতাবস্থায় বিশুদ্ধ মত হলো সে কসমকারী বলে গণ্য হবে। এটাই প্রসিদ্ধ মত; কিন্তু তাতারখানিয়া নামক গ্রন্থে এর বিপরীত মতকে বিশুদ্ধ বলা হয়েছে।

৩১. এ মাসআলায় মূলনীতি হলো এই যে, কসমকারী ব্যক্তি যদি لفظ عام (ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ) বলে معنى خاص (বিশেষ অর্থ বা আংশিক অর্থ) গ্রহণ করে, তাহলে তা সর্বসম্মতমত অনুসারে دِيَانَةً (বান্দা ও আল্লাহর মাঝে) শুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু قضاء (পার্থিব বিচারে) তা গ্রহণযোগ্য হবে না। এর উপরই ফতোয়া।

৩২. বাদী বিবাদীকে কসম করাল, কিন্তু বিবাদী বাদীর ইচ্ছার বিপরীতে নিজের ইচ্ছা বা নিয়ত অনুযায়ী কসম করল। এমতাবস্থায় কসমটি বাদীর নিয়ত মুতাবেক অর্থেই গৃহীত হবে। শর্ত হলো বাদী জালেম না হতে হবে। অন্যথায় কসম মজলুমের নিয়ত অনুসারেই হবে।

৩৩. কসম করল আমি কথা বলব না, অতঃপর নামাজের মধ্যে কুরআন তেলাওয়াত করলে বা তাসবীহ পড়লে কারো মতেই কসম ভঙ্গকারী হবে না। নামাজের বাইরে পড়লে জাহেরুর রেওয়ায়েত অনুযায়ী কসম ভঙ্গকারী হয়ে যাবে। اَلْبَحْرُ الرَّائِقُ নামক গ্রন্থে এ মতটিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। فَتْحُ الْقَدِيْرِ নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে কোনো অবস্থাতেই (নামাজের ভিতরে বা বাইরে) কসম ভঙ্গকারী হবে না। এ মতটি প্রণিধানযোগ্য। এর বিপরীত মতকে প্রাধান্য দেওয়া সঠিক নয়। যেহেতু উরফ দ্বিতীয় মতকে সমর্থন করে।

৩৪. কেউ শপথ করল, আমি অমুক কিতাব বা অমুক সূরাটি পাঠ করব না। অতঃপর কিতাব বা সূরার উপর দৃষ্টি করে তা অনুধাবন করলে কসম ভঙ্গকারী হবে না। এর উপরই ফতোয়া প্রদান করা উচিত।– [আল ওয়াকিয়াত]

৩৫. কেউ শপথ করল, আমি যত দিন বুখারায় আছি, ততদিন এ কাজটি করব না। অতঃপর বুখারা ত্যাগ করার কিছু দিন পরে পুনরায় বুখারায় আগমন করল এবং ঐ কাজটি করল। এর ফলে কসম ভঙ্গকারী হবে না।

৩৬. কেউ শপথ করল, আমি তোমাকে হাকিমের কাছে নিয়ে যাব এবং কসম করা। এ শুনে প্রতিপক্ষ দাবি মেনে নিল। ফলে উক্ত কসম শেষ হয়ে যাবে।

৩৭. মাসপয়লা বলা দ্বারা মাসের প্রথম রাত ও দিন উদ্দেশ্য হবে। মাসের শুরু বললে প্রথম অর্ধেকের কম ও মাসের শেষ বললে পনের পরবর্তী সময় বুঝাবে।

৩৮. গরমকাল বললে, যখন থেকে শীতের কাপড় খুলে ফেলা হয় তখন হতে শুরু করে পুনরায় যখন শীতের কাপড় পরিধান করা হয়, তখন পর্যন্ত বুঝাবে। শীতকাল বললে এর বিপরীত বুঝাবে। –[আল বাদায়ে']

৩৯. কেউ কসম করল, নিজ স্ত্রী বা ভাই-বন্ধুদের সাথে কথা বলবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত সকলের সাথে কথা না বলবে, ততক্ষণ কসম ভঙ্গকারী হবে না।

৪০. কেউ নিজ স্ত্রীকে বলল, যদি তুমি নামাজ ছাড়, তাহলে তোমাকে তালাক। অতঃপর স্ত্রী কোনো নামাজ কাজা পড়ল। প্রসিদ্ধ মতানুসারে তালাক হয়ে যাবে।

৪১. কেউ কসম করল, আমি নামাজ যথাসময় হতে বিলম্বিত করব না। অতঃপর ঘুমিয়ে গেল এবং পরে কাজা আদায় করল। আল্লামা বাকালীর মতে কসম ভঙ্গকারী হবে না। কেননা হাদীসে আছে এটা তার ওয়াক্ত। আমি (আশরাফুল হিদায়া গ্রন্থকার) বলব, এ হুকুম হওয়ার জন্য শর্ত হলো ঘুম থেকে জেগে সাথে সাথেই নামাজ আদায় করা, অন্য কাজে লিপ্ত হওয়ার পূর্বে।

https://e-ilm.weebly.com/

৪২. কেউ কসম করল, আজ আমি পেশাব করার কারণে অজু করব না। অতঃপর পেশাব করল। এরপর তার নাক হতে রক্ত পড়ল। পরে অজু করল। কসম ভঙ্গকারী হয়ে যাবে। এ মাসআলার মূলনীতি হলো দুটি হদস একত্র হওয়ার পর যখন পবিত্রতা অর্জন করা হয়, তখন পবিত্রতাটি উভয় হদসের পক্ষ হতে হয়ে থাকে।

৪৩. কেউ কসম করল, আমি তাকে হাজার বার মারব, অথবা এত মারব যে, সে মরে যায়। এ কসমের অর্থ হবে খুব বেশি প্রহার করা।

৪৪. যদি কসম করে আমি তাকে এত মারব যে, সে অজ্ঞান হয়ে যাবে অথবা অনুরোধ করতে শুরু করে অথবা কাঁদতে শুরু করে, তাহলে কসমটি তার প্রকৃত অর্থে প্রযোজ্য হবে।

৪৫. কেউ এ মর্মে কসম করল যে, আজ আমি তোমার টাকা আদায় করে দিব। অতঃপর আদায় করার জন্য টাকা নিয়ে এলো। কিন্তু পাওনাদারকে পাওয়া গেল না। এমতাবস্থায় টাকাগুলো কাজির কাছে দিয়ে দিবে। যদি কাজির কাছে দিতে না পারে, তাহলে কসম ভঙ্গকারী হয়ে যাবে। এর উপরই ফতোয়া প্রদান করা উচিত। যদি পাওনাদারের সাথে সাক্ষাৎ হওয়ার তার কাছে দিয়ে দেওয়া হয়, কিন্তু সে নিতে অস্বীকার করে, তাহলে পাওনাদারের এমন নিকটবর্তী স্থানে রেখে দিবে, ইচ্ছা করলে যেখানে থেকে সে হাত বাড়িয়ে নিতে পারে। এরূপ করাতে তার কসম পূর্ণ হবে। অন্যথায় কসম ভঙ্গকারী হয়ে যাবে।

৪৬. কেউ কসম করল, আগামীকাল আমি আমার পাওনাদারের পাওনা পরিশোধ করে দিব। অতঃপর আজই তা পরিশোধ করে দিল। অথবা কসম করল আগামীকাল তাকে হত্যা করব। কিন্তু আজই সে মরে গেল, অথবা কসম করল, এ রুটিগুলো আগামীকাল খাবো তারপর আজই খেয়ে নিল। এ সকল অবস্থায় কসমকারী ব্যক্তি কসম ভঙ্গকারী হবে না। -[আত-তাবয়ীন]

৪৭. কেউ কসম করল যায়েদের ঋণ আদায় করে দিব। অতঃপর ঋণ আদায়ের জন্য খালেদকে উকিল নির্ধারণ করল। অথবা যায়েদকে খালেদের কাছে হাজির করে দিল (আদায় করার জামিন বানিয়ে দিল) এতে কসম পূর্ণ হয়ে যাবে। তবে খালেদ যদি তার বলা ছাড়া নিজের পক্ষ হতে আদায় করে দেয় তাহলে কসমকারী হানেস হয়ে যাবে।

৪৮. কেউ কসম করে বলল, যদি প্রত্যহ তোমাকে (স্ত্রী) এক টাকা করে না দেই, তাহলে তুমি তালাক। এরপর কোনো দিন সন্ধ্যা বেলায় এক রুপি দেয়, কোনো দিন এশার সময় একরুপি দেয়, এমতাবস্থায় সে হানেস হবে না। যদি একদিন ব্যাঘাত হয়ে যায়, অর্থাৎ পূর্ণ চব্বিশ ঘণ্টার ভিতরে এর রুপি না দেয়, তাহলে কসম ভঙ্গকারী তথা স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে।

৫২. কেউ বলল, যদি আমার কাছে মাল থাকে, অথবা বলল, যদি আমি মালের মালিক হই তাহলে আমার স্ত্রী তালাক। অথচ তার কাছে ঘর বাড়ি জমি-জমা ও অন্যান্য আসবাবপত্র থাকে, তবু সে হানেস হবে না। যদি এগুলো ব্যবসার জন্য না হয়। আমি (আশরাফুল হিদায়ার গ্রন্থকার) বলব, আমাদের পরিবেশে এসব আসবাবপত্রকে মাল বলে বুঝানো হয়। অতএব, ভেবে-চিন্তে ফাতোয়া প্রদান করা কর্তব্য।

https://e-ilm.weebly.com/

كِتَابُ الْحُدُوْدِ

قَالَ : الْحَدُّ لُغَةً : هُوَ الْمَنْعُ، وَمِنْهُ الْحَدَّادُ لِلْبَوَّابِ . وَفِي الشَّرِيعَةِ : هُوَ الْعُقُوبَةُ الْمُقَدَّرَةُ حَقًّا لِلّٰهِ تَعَالٰى حَتّٰى لَا يُسَمّٰى الْقِصَاصُ حَدًّا لِاَنَّهُ حَقُّ الْعَبْدِ وَلَا التَّعْزِيرُ لِعَدَمِ التَّقْدِيرِ . وَالْمَقْصِدُ الْاَصْلِيُّ مِنْ شَرْعِهِ الِانْزِجَارُ عَمَّا يَتَضَرَّرُ بِهِ الْعِبَادُ، وَالطَّهَارَةُ لَيْسَتْ اَصْلِيَّةً فِيْهِ بِدَلِيْلِ شَرْعِهِ فِيْ حَقِّ الْكَافِرِ قَالَ الزِّنَا يَثْبُتُ بِالْبَيِّنَةِ وَالْاِقْرَارِ وَالْمُرَادُ ثُبُوتُهُ عِنْدَ الْاِمَامِ لِاَنَّ الْبَيِّنَةَ دَلِيْلٌ ظَاهِرٌ، وَكَذَا الْاِقْرَارُ لِاَنَّ الصِّدْقَ فِيْهِ مُرَجَّحٌ لَا سِيَّمَا فِيْمَا يَتَعَلَّقُ بِثُبُوتِهِ مَضَرَّةٌ وَمَعَرَّةٌ، وَالْوُصُوْلُ اِلَى الْعِلْمِ الْقَطْعِيِّ مُتَعَذِّرٌ، فَيُكْتَفٰى بِالظَّاهِرِ۔

অধ্যায় : হুদূদ (শাস্তি)

অনুবাদ : হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, আভিধানে হদ্দ অর্থ রোধ করা। এ কারণেই দ্বাররক্ষীকে حَدَّادٌ বলা হয়। শরিয়তের পরিভাষায় হদ্দ অর্থ আল্লাহর হক্করূপে নির্ধারিত শাস্তি। এ জন্যই কিসাসকে হদ্দ বলা হয় না। কেননা তা বান্দার হক। তদ্রূপ সাধারণ শাস্তিকেও হদ্দ বলা হয় না। কেননা তাতে নির্ধারিত পরিমাণ নেই।

শরিয়তে হদ্দ প্রবর্তনের মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষ যা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়,তা থেকে নিবৃত্তি। গুনাহ থেকে পবিত্রতা লাভ হদ্দের মূলগত বিষয় নয়। প্রমাণ এই যে, কাফেরের ক্ষেত্রেও তা প্রবর্তিত।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, **জেনা সাক্ষ্য প্রমাণ ও স্বীকারোক্তি দ্বারা সাব্যস্ত হয়,** অর্থাৎ শাসকের নিকট সাব্যস্ত হয়। কেননা সাক্ষ্য হচ্ছে প্রকাশ্য প্রমাণ, তদ্রূপ স্বীকারোক্তিও। কেননা সত্যবাদিতার দিকটিই তাতে প্রবল। বিশেষত যা সাব্যস্ত হওয়ার সাথে ক্ষতি ও কলঙ্কের সম্পর্কে রয়েছে। আর নিশ্চিত জ্ঞান অর্জন যেহেতু দুঃসাধ্য সেহেতু বাহ্যিক প্রমাণকেই যথেষ্ট ধরা হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

জ্ঞাতব্য যে, আমাদের (ফুকাহায়ে কেরাম) মতে অপরাধীকে যখন শাস্তি দেওয়া হয়। তখন তার এই শাস্তি তাকে গুনাহ থেকে পবিত্র করে না; বরং সে পবিত্র হয় তওবা দ্বারা। এ ব্যাপারে ওলামাগণ ঐকমত্য পোষণ করেন যে, তওবার দ্বারা আইনগত শাস্তি স্থগিত হয় না। যদি প্রশ্ন করা হয় যে, হাদীস দ্বারা তো শাস্তির মাধ্যমে গুনাহ থেকে পবিত্র হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত। তবে এর উত্তর এই যে, হাদীসে যাদের সম্পর্কে শাস্তি প্রয়োগের কথা বলা হয়েছে, তারা নিজেরা নিজেদের অপরাধ থেকে আল্লাহর কাছে তওবা করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে সেখানে রাসূল ﷺ থেকে সুস্পষ্ট ইরশাদ রয়েছে, لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً (সে বড় মাপের তওবা করেছে)। দলিলের দিক থেকে এ মতটি বেশি শক্তিশালী।

জ্ঞাতব্য : অতঃপর গ্রন্থকার সাক্ষ্য ও স্বীকারোক্তি সম্পর্কীয় বিস্তারিত আলোচনা করার লক্ষ্যে বলেন–

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ فَالْبَيِّنَةُ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَةٌ مِنَ الشُّهُوْدِ عَلٰى رَجُلٍ اَوْ اِمْرَاَةٍ بِالزِّنَا لِقَوْلِهِ تَعَالٰى ﴿فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِنْكُمْ﴾ وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : ثُمَّ لَمْ يَاْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِلَّذِي قَذَفَ اِمْرَاَتَهُ اِئْتِ بِاَرْبَعَةٍ يَشْهَدُوْنَ عَلٰى صِدْقِ مَقَالَتِكَ وَلِاَنَّ فِيْ اِشْتِرَاطِ الْاَرْبَعَةِ يَتَحَقَّقُ مَعْنَى السَّتْرِ وَهُوَ مَنْدُوْبٌ اِلَيْهِ وَالْاِشَاعَةُ ضِدُّهُ وَاِذَا شَهِدُوْا يَسْاَلُهُمُ الْاِمَامُ عَنِ الزِّنَا مَا هُوَ وَكَيْفَ هُوَ وَاَيْنَ زَنٰى وَمَتٰى زَنٰى وَبِمَنْ زَنٰى؟ لِاَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اِسْتَفْسَرَ مَاعِزًا عَنِ الْكَيْفِيَّةِ وَعَنِ الْمَزْنِيَّةِ. وَلِاَنَّ الْاِحْتِيَاطَ فِيْ ذٰلِكَ وَاجِبٌ لِاَنَّهُ عَسَاهُ غَيْرُ الْفِعْلِ فِي الْفَرْجِ عَنَاهُ اَوْ زَنٰى فِيْ دَارِ الْحَرْبِ اَوْ فِي الْمُتَقَادِمِ مِنَ الزَّمَانِ اَوْ كَانَتْ لَهُ شُبْهَةٌ لَا يَعْرِفُهَا هُوَ وَلَا الشُّهُوْدُ كَوَطْءِ جَارِيَةِ الْاِبْنِ فَيُسْتَقْصٰى فِيْ ذٰلِكَ اِحْتِيَاطًا لِلدَّرْءِ فَاِذَا بَيَّنُوا ذٰلِكَ وَقَالُوْا رَاَيْنَاهُ وَطِئَهَا فِيْ فَرْجِهَا كَالْمِيْلِ فِي الْمُكْحُلَةِ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, এখানে সাক্ষ্য অর্থ হলো, চারজন সাক্ষী কোনো পুরুষ বা নারীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের সাক্ষ্য প্রদান করবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِنْكُمْ অর্থাৎ তোমাদের মধ্য হতে চারজনকে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে তলব কর। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন- ثُمَّ لَمْ يَاْتُوا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ অতঃপর যদি তারা চারজন সাক্ষী পেশ করতে সক্ষম না হয়। আর আপন স্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপনকারী ব্যক্তিকে রাসূল ﷺ বলেছেন, اِئْتِ بِاَرْبَعَةٍ يَشْهَدُوْنَ عَلٰى صِدْقِ مَقَالَتِكَ এমন চারজন লোক পেশ কর, যারা তোমার বক্তব্যের সত্যতার সাক্ষ্য প্রদান করবে।

তাছাড়া চারজন সাক্ষী নির্ধারণের মাঝে গোপনীয়তার অর্থ পাওয়া যায়। আর এ বিষয়ে গোপনীয়তাই মোস্তাহাব।[১] আর ঘটনা প্রকাশ করা হলো তার বিপরীত।

যখন তারা সাক্ষ্য প্রদান করবে তখন শাসক তাদের জিজ্ঞাসা করবেন, জেনা কাকে বলে? কোথায় জেনা করেছে? কবে জেনা করেছে এবং কার সাথে জেনা করেছে? কেননা নবী করীম ﷺ মা'য়েয (রা.) কে জেনার অবস্থা এবং জেনার পাত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছেন। আর এ ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক। কেননা হতে পারে যে, গুপ্তাঙ্গ জেনা ছাড়া অন্য কিছু সে উদ্দেশ্য করেছে। কিংবা হয়তো দারুল হারবে জেনা করেছে অথবা অনেক আগে জেনা করেছে। কিংবা জেনার পাত্রীর ব্যাপারে তার (হালাল হওয়ার) সন্দেহ ছিল। অর্থাৎ সে কিংবা সাক্ষীরা পাত্রীটিকে চিনতে পারেনি। যেমন পুত্রের দাসীর সাথে সঙ্গম করা। সুতরাং হদ্দ রহিত করার চেষ্টা হিসেবে এ বিষয়ে বিশদ জিজ্ঞাসা করা হবে।

যখন তারা এসব বর্ণনা করবে এবং বলবে যে, আমরা তাকে তার গুপ্তাঙ্গে এমন ভাবে সংঙ্গম করতে দেখেছি যেমন সুরমাদানিতে শলাকা।

১. জ্ঞাতব্য : এ মর্মে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) এবং ইবনে ওমর (রা.) -এর সূত্রে হাদীস রয়েছে যে, যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দোষ গোপন রাখবে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া ও আখেরাতে তার দোষ গোপন রাখবেন। -[তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী]

https://e-ilm.weebly.com/

وَسَأَلَ الْقَاضِيْ عَنْهُمْ فَعُدِّلُوْا فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ حَكَمَ بِشَهَادَتِهِمْ وَلَمْ يَكْتَفِ بِظَاهِرِ الْعَدَالَةِ فِي الْحُدُوْدِ إِحْتِيَالًا لِلدَّرْءِ. ﴿قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اِدْرَءُوْا الْحُدُوْدَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ بِخِلَافِ سَائِرِ الْحُقُوْقِ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ . وَتَعْدِيْلُ السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ نُبَيِّنُهُ فِي الشَّهَادَاتِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى . قَالَ فِي الْاَصْلِ : يَحْبِسُهُ حَتّٰى يَسْأَلَ عَنِ الشُّهُوْدِ لِلْاِتِّهَامِ بِالْجِنَايَةِ وَقَدْ حَبَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا بِالتُّهْمَةِ، بِخِلَافِ الدُّيُوْنِ حَيْثُ لَا يُحْبَسُ فِيْهَا قَبْلَ ظُهُوْرِ الْعَدَالَةِ، وَسَيَأْتِيْكَ الْفَرْقُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى .

অনুবাদ : আর কাজি সাক্ষীদের সম্পর্কে তদন্ত করবেন এবং প্রকাশ্যে ও গোপনে তাদের সততার পক্ষে মতামত আসবে, তখন কাজি তাদের সাক্ষ্য অনুযায়ী রায় প্রদান করবেন। হদ্দের ক্ষেত্রে কাজী সাক্ষীদের বাহ্যিক ন্যায়পরায়ণতাকে যথেষ্ট মনে করবেন না, যাতে হদ্দ রহিত করার বাহানা মিলে যায়। নবী করীম ﷺ বলেছেন, اِدْرَءُوْا الْحُدُوْدَ مَا اسْتَطَعْتُمْ অর্থাৎ তোমরা যতদূর সম্ভব হদ্দকে রহিত কর। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে অন্য সকল 'হক' -এর বিষয়টি ভিন্ন। সেখানে বাহ্যিক ন্যায়পরায়ণতাকেই যথেষ্ট মনে করা হয়। গোপনে ও প্রকাশ্যে ন্যায়পরায়ণতার বিষয়টি ইনশাআল্লাহ সাক্ষ্য অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করব। মাবসূত গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেছেন, সাক্ষীদের সম্পর্কে খোঁজ খবর নেওয়া পর্যন্ত অপরাধের অভিযোগের ভিত্তিতে কাজি বিবাদীকে আটক রাখবেন। কেননা নবী করীম ﷺ অভিযোগের ভিত্তিতে একজন লোককে আটক করে রেখেছিলেন। –[আবূ দাউদ]

পক্ষান্তরে যাবতীয় ঋণ খেলাপি অভিযোগে সাক্ষীদের ন্যায়পরায়ণতা প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে (বিবাদীকে) আটক করা হবে না। পার্থক্যের কারণ ইনশাআল্লাহ পরে বলা হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

فَيَسْتَقْصِى فِيْ ذٰلِكَ اِحْتِيَاطًا لِلدَّرْءِ : (সুতরাং হদ্দ রহিত করার চেষ্টা হিসেবে এ বিষয়ে বিশদ জিজ্ঞাসা করা হবে) এ কথাটির ব্যাখ্যা এই যে, সাক্ষীরা যে ব্যক্তি সম্পর্কে জেনার সাক্ষ্য দিল, হতে পারে তারা জেনার সংজ্ঞা পুরোপুরিভাবে জানে না। যেমন– এক ব্যক্তি কোনো এক অপরিচিতা মহিলাকে চুমো খেল। পরে সে এটিকে ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ মনে করে বিষণ্ন মনে নবীজির দরবারে উপস্থিত হয়ে আরজ করল, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমার উপর হদ্দ প্রয়োগ করুন। অথচ তার থেকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ সংঘটিত হয়নি। এমনিভাবে দারুল হারবে জেনা করলে হদ্দ সাব্যস্ত হয় না। ঠিক তেমনিভাবে যদি সাক্ষীরা কারো বিরুদ্ধে জেনার সাক্ষ্য দেয় যা দ্বারা বুঝা যায় যে ঘটনাটি অনেক পূর্বের। তবে এর দ্বারাও জেনা প্রমাণিত হবে না। কেননা সাক্ষীরা যখন এ বিষয়টি কাজী সাহেবকে অবহিত করতে এবং সাক্ষ্য দিতে বিলম্ব করল, এর দ্বারা নিজেরাও শরিয়তের বিচারে ফাসিক সাব্যস্ত হলো। ফলে তারা সাক্ষ্য দেওয়ার উপযুক্ত রইল না। কিংবা এমনও হতে পারে যে, লোকটি যে মহিলার সাথে ঐ আচরণ করল সে তার স্ত্রী কিংবা দাসী না হওয়ার কারণে সে নিজে এবং সাক্ষীরা এটাকে জেনা ধারণা করল। অথচ শরিয়তের দৃষ্টিতে এখানে এমন কোনো কিছু রয়েছে যার ফলে হদ্দ রহিত হয়ে যায়। তাই এসব কিছু জিজ্ঞাসা করে নিতে হবে, যেন ভুলপন্থায় হদ্দ প্রয়োগ না হয়ে যায়।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ وَالْإِقْرَارُ اَنْ يُقِرَّ الْبَالِغُ الْعَاقِلُ عَلٰى نَفْسِهٖ بِالزِّنَاءِ اَرْبَعَ مَرَّاتٍ فِيْ اَرْبَعَةِ مَجَالِسَ مِنْ مَجَالِسِ الْمُقِرِّ، كَمَا اَقَرَّ رَدَّهُ الْقَاضِيْ فَاشْتِرَاطُ الْبُلُوْغِ وَالْعَقْلِ لِاَنَّ قَوْلَ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُوْنِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ اَوْ هُوَ غَيْرُ مُوْجِبٍ لِلْحَدِّ . وَاشْتِرَاطُ الْاَرْبَعِ مَذْهَبُنَا، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ يَكْتَفِيْ بِالْإِقْرَارِ مَرَّةً وَاحِدَةً اعْتِبَارًا بِسَائِرِ الْحُقُوْقِ، وَهٰذَا لِاَنَّهٗ مُظْهِرٌ، وَتَكْرَارُ الْإِقْرَارِ لَا يُفِيْدُ زِيَادَةَ الظُّهُوْرِ بِخِلَافِ زِيَادَةِ الْعَدَدِ فِي الشَّهَادَةِ . وَلَنَا حَدِيْثُ مَاعِزٍ ﴿فَاِنَّهٗ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اَخَّرَ الْاِقَامَةَ اِلٰى اَنْ تَمَّ الْاِقْرَارُ مِنْهُ اَرْبَعَ مَرَّاتٍ فِيْ اَرْبَعَةِ مَجَالِسَ﴾ فَلَوْ ظَهَرَ بِمَا دُوْنَهَا لَمَا اَخَّرَهَا لِثُبُوْتِ الْوُجُوْبِ وَلِاَنَّ الشَّهَادَةَ اِخْتَصَّتْ فِيْهِ بِزِيَادَةِ الْعَدَدِ، فَكَذَا الْإِقْرَارُ اِعْظَامًا لِاَمْرِ الزِّنَاءِ وَتَحْقِيْقًا لِمَعْنَى السَّتْرِ، وَلَا بُدَّ مِنْ اِخْتِلَافِ الْمَجَالِسِ لِمَا رَوَيْنَا، وَلِاَنَّ لِاتِّحَادِ الْمَجْلِسِ اَثَرًا فِيْ جَمْعِ الْمُتَفَرِّقَاتِ؛ فَعِنْدَهٗ يَتَحَقَّقُ شُبْهَةُ الْاِتِّحَادِ فِي الْإِقْرَارِ، وَالْإِقْرَارُ قَائِمٌ بِالْمُقِرِّ فَيُعْتَبَرُ اِخْتِلَافُ مَجْلِسِهٖ دُوْنَ مَجْلِسِ الْقَاضِيْ . فَالْاِخْتِلَافُ بِاَنْ يَرُدَّهُ الْقَاضِيْ كُلَّمَا اَقَرَّ فَيَذْهَبَ حَيْثُ لَا يَرَاهُ ثُمَّ يَجِيْءَ فَيُقِرَّ، هُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ اَبِيْ حَنِيْفَةَ؛ لِاَنَّهٗ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ طَرَدَ مَاعِزًا فِيْ كُلِّ مَرَّةٍ حَتّٰى تَوَارٰى بِحِيْطَانِ الْمَدِيْنَةِ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, স্বীকারোক্তির অর্থ এই যে, সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি পৃথক পৃথক চারটি মজলিসে চারবার নিজের বিরুদ্ধে জেনার অপরাধ স্বীকার করবে। যখনই সে স্বীকার করবে, কাজি তার স্বীকারোক্তি প্রত্যাখ্যান করবেন।

প্রাপ্ত বয়স্ক ও সুস্থ মস্তিষ্ক হওয়ার শর্ত এজন্য যে, বালক ও বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তির বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। অথবা এ কারণে যে, তাদের স্বীকারোক্তি হদ্দ ওয়াজিবকারী নয়।

আর চারবার স্বীকারোক্তির শর্ত হচ্ছে আমাদের মাযহাব অনুযায়ী। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতে একবার স্বীকারোক্তিই যথেষ্ট হবে। এটা তিনি বলেছেন অন্য সকল হকের উপর কিয়াস করে। এই কিয়াসের কারণ এই যে, স্বীকারোক্তি হচ্ছে ঘটনা প্রকাশকারী। আর স্বীকারোক্তির পুনরাবৃত্তি ঘটনার প্রকাশ বৃদ্ধি করে না। আর সাক্ষীর সংখ্যা এর বিপরীত। (এতে ঘটনার প্রকাশকে দৃঢ় করা হয়)।

আমাদের দলিল (বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত) হযরত মা'য়েয (রা.) সম্পর্কিত হাদীস। সেখানে তার পক্ষ হতে চার মজলিসে চারবার স্বীকারোক্তি পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত নবী করীম ﷺ হদ্দ কায়েম করা বিলম্বিত করেছেন। কেননা চারের কমে যদি ঘটনার প্রকাশ সাব্যস্ত হতো তাহলে হদ্দ ওয়াজিব হওয়া প্রমাণিত হওয়ার পর কিছুতেই তিনি হদ্দ বিলম্বিত করতেন না। তাছাড়া সাক্ষীর সংখ্যা চারে উন্নীত করার বিষয়টি জেনার সাথে বিশিষ্ট হয়েছে। সুতরাং জেনার গুরুতরতা প্রকাশের জন্য এবং গোপনীয়তার দিকটি সাব্যস্ত করার জন্য স্বীকারোক্তির সংখ্যাও চারে উন্নীত করা হবে। আমাদের বর্ণিত হাদীসের কারণে স্বীকারোক্তিকারীর মজলিসের ভিন্নতা জরুরি।

তাছাড়া বিক্ষিপ্ত বিষয়গুলোকে একত্র করার ক্ষেত্রে মজলিসের অভিন্নতার ভূমিকা ও প্রভাব রয়েছে। সুতরাং মজলিসের অভিন্নতার ক্ষেত্রে স্বীকারোক্তির অভিন্নতার বাহ্যিক সন্দেহ সাব্যস্ত হয়।

https://e-ilm.weebly.com/

আর স্বীকারোক্তি যেহেতু স্বীকারোক্তিকারীর সাথে সংশ্লিষ্ট, সেহেতু তার মজলিসের বিভিন্নতার দিকটিই বিবেচ্য হবে। কাজির মজলিস নয়। মজলিসের বিভিন্নতার রূপ এই যে, যখন সে স্বীকারোক্তি করবে তখন কাজি তা প্রত্যাখ্যান করবেন। অতঃপর সে কাজির চোখের আড়ালে গিয়ে ফিরে আসবে এবং স্বীকারোক্তি করবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) হতে এটাই বর্ণিত হয়েছে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত মা'য়েয (রা.) কে প্রত্যেকবার সরিয়ে দিয়েছেন। এমন কি তিনি মদিনার দেয়ালগুলোর পিছনে আড়াল হয়ে যান (আবার ফিরে আসেন)।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

لِأَنَّهُ طَرَدَ مَاعِزًا فِيْ كُلِّ مَرَّةٍ حَتَّى تَوَارَى بِحِيْطَانِ الْمَدِيْنَةِ (কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত মা'য়েয (রা.) কে প্রত্যেকবার সরিয়ে দিয়েছেন, এমনকি তিনি মদিনার দেয়ালগুলোর পিছনে আড়াল হয়ে যান (আবার ফিরে আসেন) হযরত মা'য়েয (রা.) রাসূল ﷺ -এর কাছে গিয়ে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি জেনা করেছি। আপনি আমাকে পবিত্র করুন। নবীজী একথা শুনে তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তখন হযরত মা'য়েয (রা.) অপর দিকে এসে পুনরায় একই আরজ করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আবার মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তৃতীয় আরেক দিক থেকে এসে তিনি এই আরজ করলে নবীজী ﷺ এবারও মুখ ফিরিয়ে নিলেন। চতুর্থবার অন্য একদিক থেকে এসে হযরত মা'য়েয পবিত্র করার আবেদন করলে রাসূল ﷺ বললেন, তুমি হয়তো তাকে শুধু চুমো খেয়েছ। কিংবা তুমি তাকে শুধুই জড়িয়ে ধরেছ। তিনি বললেন, জি-না, তিনি সুস্পষ্টভাবে জেনারই স্বীকারোক্তি করলেন। তখন নবী করীম ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি উন্মাদ? অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, নবী করীম ﷺ বাড়িতে তার খোঁজ নিতে লোক পাঠালেন যে তার মস্তিষ্কে কোনো ত্রুটি কিংবা অস্বাভাবিকতা তারা লক্ষ্য করে কি না? তারা না সূচক উত্তর দিলেন। এরপর নবী করীম ﷺ খোঁজ নিলেন যে, সে বিবাহিত কি না? জানতে পারলেন যে, তিনি বিবাহিত। তখন নবী করীম ﷺ তাকে (রজম) পাথর মেরে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনায় রয়েছে যে, যখন হযরত মা'য়েজ (রা.) চারবার স্বীকারোক্তি করলেন, তখন তাকে রজম করা হলো। -[বুখারী মুসলিম]

আর হযরত জাবের (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসেও এমনই উল্লেখ রয়েছে। -[বুখারী ও মুসলিম]

আর হযরত জাবের বিন সামুরা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে, হযরত মা'য়েয (রা.) দু'বার স্বীকারোক্তি করেন। নবী করীম ﷺ তা প্রত্যাখ্যান করেন। পুনরায় তিনি দু'বার স্বীকারোক্তি করেন। এভাবে চারবার স্বীকারোক্তির পর নবী করীম ﷺ প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড দেন। -(আবূ দাউদ, নাসাঈ, মুসলিম)।

হযরত বুরায়দা (রা.)-এর বর্ণনায় চার দিনে চারবার স্বীকারোক্তির কথা উল্লেখ রয়েছে, যা ইমাম মুসলিম (র.) বর্ণনা করেছেন। এ ঘটনাটিই হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসে এভাবে রয়েছে যে, হযরত মা'য়েয (রা.) চতুর্থবার স্বীকারোক্তি করার পর নবী করীম ﷺ তাকে বন্দি করে রেখে অন্যান্য বিষয় জিজ্ঞাসাবাদ করেন। হযরত ইসহাক এবং ইবনে আবী শায়বাহ তা বর্ণনা করেন।

আর হযরত গামেদিয়্যাহ (রা.)-এর ঘটনায় বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি নিজে নবী করীম ﷺ এর কাছে চারবার জেনার স্বীকারোক্তি করলেন। প্রতিবারই নবী করীম ﷺ তা প্রত্যাখ্যান করলেন। তখন হযরত গামেদিয়্যাহ (রা.) আরজ করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ! তবে কি আপনি আমাকে হযরত মা'য়েয (রা.)-এর মতোই ফিরিয়ে দিতে চান? -[মুসলিম]

চারবার স্বীকারোক্তির পর নবী করীম ﷺ বললেন, এখন যাও; তোমার গর্ভের সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর এসো। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর পুনরায় তিনি এসে নবী করীম ﷺ কে জানালেন। নবী করীম ﷺ তাকে বললেন, তুমি ফিরে যাও। এর দুধ ছাড়ানোর পর এসো। হযরত গামেদিয়্যাহ (রা.) শিশুর দুধ ছাড়ানোর পর আবার আসলেন। শিশুটি তখন তার হাতেই ধরা ছিল এবং সে একটি রুটির টুকরা খাচ্ছিল। হযরত গামেদিয়্যাহ (রা.) বললেন, হুজুর! এই যে শিশুটি। এখন সে রুটি খেতে অভ্যস্ত। তাই এখন আমি তাকে স্তন্যদান থেকে মুক্ত। নবী করীম ﷺ তখন তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এখন শিশুটির প্রতিপালন কে করবে? অতএব, যতদিন সে তার নিজ প্রয়োজন নিজে পুরণ করতে না পারবে, ততদিন তুমি অপেক্ষা কর। এই মুহূর্তে এক সাহাবী আরজ করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি এ শিশুর লালন-পালন করব। নবী করীম ﷺ তখন তাকে রজম করার (পাথর নিক্ষেপ করে হত্যার) হুকুম দিলেন। যখন তাকে পাথর নিক্ষেপ করা হচ্ছিল খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা.) অনুচিত কিছু একটা করে তাকে একটি পাথর নিক্ষেপ করলেন। যাতে তার মাথা ফেটে রক্ত ঝরতে লাগল। হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা.) এর এমন আচরণে রাসূল ﷺ অত্যন্ত রাগান্বিত হলেন এবং বললেন, সে এমন তওবা করেছে যে, মদিনাবাসী সত্তরজন ব্যক্তির মাঝে যদি তা বণ্টন করে দেওয়া হয়, তবুও সবার জন্য তা যথেষ্ট হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ فَاِذَا تَمَّ اِقْرَارُهٗ اَرْبَعَ مَرَّاتٍ سَأَلَهُ عَنِ الزِّنَاءِ مَا هُوَ وَكَيْفَ هُوَ وَاَيْنَ زَنٰى وَبِمَنْ زَنٰى، فَاِذَا بَيَّنَ ذٰلِكَ لَزِمَهُ الْحَدُّ لِتَمَامِ الْحُجَّةِ، وَمَعْنَى السُّؤَالِ عَنْ هٰذِهِ الْاَشْيَاءِ بَيَّنَّاهُ فِي الشَّهَادَةِ، وَلَمْ يَذْكُرِ السُّؤَالَ فِيْهِ عَنِ الزَّمَانِ، وَذَكَرَهُ فِي الشَّهَادَةِ لِاَنَّ تَقَادُمَ الْعَهْدِ يَمْنَعُ الشَّهَادَةَ دُوْنَ الْاِقْرَارِ . وَقِيْلَ لَوْ سَأَلَهُ جَازَ لِجَوَازِ اَنَّهُ زَنٰى فِيْ صِبَاهُ فَاِنْ رَجَعَ الْمُقِرُّ عَنْ اِقْرَارِهٖ قَبْلَ اِقَامَةِ الْحَدِّ اَوْ فِيْ وَسَطِهٖ قُبِلَ رُجُوْعُهٗ وَخُلِّيَ سَبِيْلُهٗ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ اَبِيْ لَيْلٰى يُقِيْمُ عَلَيْهِ الْحَدَّ لِاَنَّهٗ وَجَبَ الْحَدُّ بِاِقْرَارِهٖ فَلَا يَبْطُلُ بِرُجُوْعِهٖ وَاِنْكَارِهٖ كَمَا اِذَا وَجَبَ بِالشَّهَادَةِ وَصَارَ كَالْقِصَاصِ وَحَدِّ الْقَذْفِ وَلَنَا اَنَّ الرُّجُوْعَ خَبَرٌ مُحْتَمِلٌ لِلصِّدْقِ كَالْاِقْرَارِ وَلَيْسَ أَحَدٌ يُكَذِّبُهٗ فِيْهِ فَتَتَحَقَّقُ الشُّبْهَةُ فِي الْاِقْرَارِ . بِخِلَافِ مَا فِيْهِ حَقُّ الْعَبْدِ وَهُوَ الْقِصَاصُ وَحَدُّ الْقَذْفِ لِوُجُوْدِ مَنْ يُكَذِّبُهٗ، وَلَا كَذٰلِكَ مَا هُوَ خَالِصُ حَقِّ الشَّرْعِ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যখন তার স্বীকারোক্তি চার দফা সম্পন্ন হবে, তখন কাজি তাকে জেনার হাকীকত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন যে, জেনা কি ও কাকে বলে? কোথায় সে জেনা করেছে এবং কার সাথে জেনা করেছে? যখন সে তা বয়ান করবে তখন তার উপর হদ্দ সাব্যস্ত হয়ে যাবে।

কেননা প্রমাণ পূর্ণ হয়ে গেছে। আর এসকল বিষয়ে বিশদ জিজ্ঞাসাবাদের কারণ আমরা জেনার সাক্ষ্য প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছি। জেনার স্বীকারোক্তি প্রসঙ্গে ইমাম কুদূরী (র.) জেনার সময় সম্পর্কিত প্রশ্নের কথা উল্লেখ করেননি। কিন্তু জেনার সাক্ষ্য প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। কেননা অনেক আগের অতীত সাক্ষ্য গ্রহণকে বাধা দেয়, স্বীকারোক্তিকে নয়। কেউ কেউ বলেন, কাজী তাকে সময় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে পারেন। কেননা হতে পারে যে, সে শৈশবে জেনা করেছিল।

যদি হদ্দ জারি করার পূর্বে কিংবা মাঝে সে তার স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে নেয়, তাহলে তার প্রত্যাহার গ্রহণ করা হবে এবং তার পথ ছেড়ে দেওয়া হবে।

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, এবং ইবনে আবী লায়লারও এই মত যে, এ অবস্থায়ও তার উপর হদ্দ কায়েম করা হবে। কেননা তার স্বীকারোক্তির কারণে হদ্দ ওয়াজিব হয়ে গেছে। সুতরাং তার প্রত্যাহার বা অস্বীকারের কারণে তা বাতিল হবে না। যেমন সাক্ষ্য দ্বারা ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে। এটা কিসাস ও অপবাদ আরোপ জনিত হদ্দের মতো।

আমাদের দলিল এই যে, প্রত্যাহার করাও একটি সংবাদ, যা সত্যতার সম্ভাবনা রাখে। যেমন স্বীকারোক্তি (একটি সংবাদ ছিল)। আর প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে তাকে মিথ্যা সাব্যস্তকারী কোনো পক্ষ নেই। সুতরাং স্বীকারোক্তির ব্যাপারে সন্দেহ সাব্যস্ত হয়ে যাবে।

পক্ষান্তরে বান্দার হক সংশ্লিষ্ট কিসাস ও অপবাদজনিত হদ্দের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা সেখানে তাকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী প্রতিপক্ষ রয়েছে। কিন্তু হদ্দে জেনার মতো শরিয়তের নিরেট হকের ক্ষেত্রে এমন কোনো পক্ষ নেই।

https://e-ilm.weebly.com/

وَيُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ اَنْ يُلَقِّنَ الْمُقِرَّ الرُّجُوْعَ فَيَقُوْلَ لَهُ : لَعَلَّكَ لَمَسْتَ اَوْ قَبَّلْتَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِمَاعِزٍ لَعَلَّكَ لَمَسْتَهَا اَوْ قَبَّلْتَهَا قَالَ فِي الْاَصْلِ : وَيَنْبَغِيْ اَنْ يَقُوْلَ لَهُ الْإِمَامُ : لَعَلَّكَ تَزَوَّجْتَهَا اَوْ وَطِئْتَهَا بِشُبْهَةٍ، وَهٰذَا قَرِيبٌ مِنَ الْاَوَّلِ فِي الْمَعْنٰى ـ

অনুবাদ : শাসকের জন্য উত্তম হবে স্বীকারোক্তিকারীকে প্রত্যাহারের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করে এরূপ বলা যে, হয়তো তুমি শুধু স্পর্শ করেছ কিংবা চুম্বন করেছ।

কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত মা'য়েয (রা.) কে বলেছিলেন, হয়তো তুমি স্পর্শ করেছ, অথবা তাকে চুম্বন করেছ। মাবসূত কিতাবে ইমাম মুহাম্মদ (রা.) বলেছেন, শাসকের এরূপ বলা উচিত যে, সম্ভবত তুমি তাকে বিবাহ করেছ কিংবা সন্দেহবশত সহবাস করেছ। অবশ্য অর্থগত দিক থেকে এটা প্রথমটার নিকটবর্তী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শাসকের এসব বলার পর স্বীকারোক্তিকারী যদি হ্যাঁ বলে তবে হদ্দ বাতিল হয়ে যাবে। অর্থাৎ এটা তার স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার বলে গণ্য হবে। স্মর্তব্য যে, যে জেনার কারণে হদ্দ ওয়াজিব হয় তা এমন যে, জেনাকারী সুস্থমস্তিষ্ক ও বাকশক্তি সম্পন্ন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি হতে হবে। এবং (অবস্থা এমন হবে যে) তার পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ কামোত্তেজনার সাথে এমন মহিলার যৌনাঙ্গে প্রবিষ্ট হবে যে মহিলা কামভাব জাগ্রত হওয়ার বয়সে উপনীত হয়েছে কিংবা সে বিগত যৌবনা। অথবা মহিলা তার স্ত্রী কিংবা দাসী নয়। অথবা এমন ক্ষেত্র না হতে হবে যে, জেনাকারী তা নিজের জন্য বৈধ মনে করতে পারে। যেমন-পিতা হারাম জেনেও পুত্রের দাসীর সঙ্গে জেনা করলে শরিয়তে হদ্দ ওয়াজিব হয় না। ঘটনাটি ইসলামি রাষ্ট্রে সংঘটিত হতে হবে। পুরুষ মহিলাকে জেনার প্রতি আকৃষ্ট করুক অথবা মহিলা পুরুষকে তার সাথে জেনায় লিপ্ত হওয়ার সুযোগ দিক। উভয় অবস্থায় (পুরুষ-মহিলা) উভয়ের উপর হদ্দ প্রয়োগ হবে।

আরও স্মর্তব্য যে, অন্ধের দ্বারা যদি এমন অপকর্ম ঘটে এবং সে তা স্বীকার করে, তবে তার উপরও হদ্দ প্রয়োগ করা হবে। আর যে তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল তার উপর হদ্দ প্রয়োগ হবে না। যদি জেনাকারী বোবা হয়, তবে কোনো অবস্থাতেই তার উপর হদ্দ প্রয়োগ হবে না। যদি পুরুষ শুয়ে মহিলাকে যৌন চাহিদা পুরা করার সুযোগ দেয়। অথবা মহিলা পুরুষের পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ (সুপারি) নিজ যোনিতে প্রবেশ করায় তবে (উভয়াবস্থায়) উভয়ের উপর হদ্দ প্রয়োগ হবে। জেনাকারী যদি দাবি করে যে এ মহিলা আমার স্ত্রী (যদিও সে অন্যের স্ত্রী হয়), তবুও তার উপর থেকে হদ্দ রহিত করা হবে না। যদি কেউ কোনো মহিলার সাথে জেনা করার পর তাকে বিবাহ করে অথবা (দাসী হলে) তাকে কিনে ফেলে তবুও বিশুদ্ধতম মতানুসারে তার উপর থেকে হদ্দ রহিত হবে না। কেননা জেনা করার সময় মহিলাটি তার জন্য হালাল সাব্যস্ত হওয়ার কোনো দলিল ছিল না।

https://e-ilm.weebly.com/

فَصْلٌ فِيْ كَيْفِيَّةِ الْحَدِّ وَإِقَامَتِهِ

وَإِذَا وَجَبَ الْحَدُّ وَكَانَ الزَّانِيْ مُحْصَنًا رَجَمَهُ بِالْحِجَارَةِ حَتّٰى يَمُوْتَ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ رَجَمَ مَاعِزًا وَقَدْ أُحْصِنَ ﴿وَقَالَ فِي الْحَدِيْثِ الْمَعْرُوْفِ وَزِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ﴾ وَعَلٰى هٰذَا اجْمَاعُ الصَّحَابَةِ قَالَ وَيُخْرِجُهُ إِلٰى أَرْضٍ فَضَاءٍ وَيَبْتَدِئُ الشُّهُوْدُ بِرَجْمِهِ ثُمَّ الْإِمَامُ ثُمَّ النَّاسُ كَذَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، وَلِأَنَّ الشَّاهِدَ قَدْ يَتَجَاسَرُ عَلَى الْأَدَاءِ ثُمَّ يَسْتَعْظِمُ الْمُبَاشَرَةَ فَيَرْجِعُ فَكَانَ فِيْ بِدَايَتِهِ اِحْتِيَالٌ لِلدَّرْءِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللّٰهُ : لَا تُشْتَرَطُ بِدَايَتُهُ اِعْتِبَارًا بِالْجَلْدِ . قُلْنَا : كُلُّ اَحَدٍ لَا يُحْسِنُ الْجَلْدَ فَرُبَّمَا يَقَعُ مُهْلِكًا وَالْإِهْلَاكُ غَيْرُ مُسْتَحَقٍّ، وَلَا كَذٰلِكَ الرَّجْمُ لِأَنَّهُ اِتْلَافٌ ـ

অনুচ্ছেদ : হদ্দ ও তা প্রতিষ্ঠা করার বিবরণ

অনুবাদ : হদ্দ যখন ওয়াজিব হয় আর জেনাকারী 'মুহসান' হয় তবে তার উপর প্রস্তর নিক্ষেপ করবে, যতক্ষণ না তার মৃত্যু হয়। কেননা নবী করীম ﷺ হযরত মা'য়েয (রা.) কে রজম করেছিলেন। আর তিনি 'মুহসান' ছিলেন। তাছাড়া প্রসিদ্ধ হাদীসে তিনি বলেছেন- وَزِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ যদি মুহসান অবস্থায় জেনা করে (তবে তার খুন হালাল হবে)। এর উপর সাহাবায়ে কেরামের ইজমা রয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, **তাকে খোলামাঠে নিয়ে যাওয়া হবে। আর সাক্ষীগণ প্রস্তর নিক্ষেপ শুরু করবে এরপর শাসক ও তারপর সাধারণ লোক।** হযরত আলী (রা.) থেকে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

কেননা সাক্ষী কখনো সাক্ষ্য প্রদানের দুঃসাহস করে ফেলে, পরে প্রস্তর নিক্ষেপের বিষয়টি গুরুতর মনে করে এবং সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে। সুতরাং তাকে দিয়ে প্রস্তর নিক্ষেপের বিষয়টি শুরু করার মধ্যে হদ্দ রহিত করার সুকৌশল রয়েছে। ইমাম শাফেয়ী (র.) বেত্রাঘাতের উপর কিয়াস করে বলেন, সাক্ষীর দ্বারা প্রস্তরাঘাত শুরু করা শর্ত নয়। আমাদের দলিল এই যে, সকলেই নিয়ম সম্মতভাবে বেত্রাঘাত করতে সক্ষম নয়। তাই তা প্রাণঘাতী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অথচ প্রাণনাশ তার প্রাপ্য নয়। আর প্রস্তর নিক্ষেপের বিষয়টি এমন নয়। কারণ এর উদ্দেশ্যই হলো প্রাণনাশ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

স্মর্তব্য যে, হযরত মা'য়েয (রা.) কে নবী করীম ﷺ -এর রজম করার ঘটনাটি সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম ও হাদীসের চার সুনান গ্রন্থে مشهور (মশহুর) হিসেবে বর্ণিত রয়েছে।
এ প্রসঙ্গে আরও একটি হাদীস- এক মুসলমানের খুন কেবল তিনটির যে কোনো একটি কারণে হালাল হয়-

ক. যে মুসলমান 'মুহসান' অবস্থায় জেনা করল, তাকে রজম করা হবে।

খ. যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বের হলো। অর্থাৎ সে ছিনতাই ও ডাকাতি করে। তাকে হত্যা কিংবা শূলে চড়ানো হবে। অথবা তাকে দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে।

গ. ঐ মুসলমান যে অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করেছে। কিসাস হিসেবে তাকেও হত্যা করা হবে। ইমাম আবূ দাউদ (র.) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এ ছাড়া সহীহ বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর সূত্রে এ প্রসঙ্গে হাদীস সুপ্রসিদ্ধ।

https://e-ilm.weebly.com/

فَإِنْ اِمْتَنَعَ الشُّهُوْدُ مِنَ الْاِبْتِدَاءِ سَقَطَ الْحَدُّ لِاَنَّهُ دَلَالَةُ الرُّجُوْعِ، وَكَذَا اِذَا مَاتُوْا اَوْ غَابُوْا فِيْ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لِفَوَاتِ الشَّرْطِ وَاِنْ كَانَ مُقِرًّا اِبْتَدَأَ الْاِمَامُ ثُمَّ النَّاسُ كَذَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ . وَرَمٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَامِدِيَّةَ بِحَصَاةٍ مِثْلِ الْحِمَّصَةِ وَكَانَتْ قَدْ اِعْتَرَفَتْ بِالزِّنَاءِ وَيُغَسَّلُ وَيُكَفَّنُ وَيُصَلّٰى عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِيْ مَاعِزٍ اِصْنَعُوْا بِهِ كَمَا تَصْنَعُوْنَ بِمَوْتَاكُمْ وَلِاَنَّهُ قُتِلَ بِحَقٍّ فَلَا يَسْقُطُ الْغُسْلُ كَالْمَقْتُوْلِ قِصَاصًا " وَصَلَّى النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى الْغَامِدِيَّةِ بَعْدَمَا رُجِمَتْ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, সাক্ষীগণ যদি শুরু করা থেকে বিরত থাকে, তাহলে হদ্দ রহিত হয়ে যাবে। কেননা এটা সাক্ষ্য প্রত্যাহারের প্রমাণ । অদ্রূপ জাহিরি রেওয়ায়েত অনুযায়ী (হদ্দ রহিত হবে) যদি তারা মারা যায় কিংবা গায়েব হয়ে যায়, শর্তের অবিদ্যমানতার কারণে ।

আর যদি জেনাকারী স্বীকারোক্তিকারী হয়, তাহলে প্রথমে শাসক শুরু করবেন, অতঃপর সাধারণ লোকেরা। হযরত আলী (রা.) হতে এরূপ বর্ণিত রয়েছে । রাসূলুল্লাহ ﷺ গামেদিয়্যাহ মহিলাকে চানাবুট আকারের একটি পাথর কণা নিক্ষেপ করে রজম আরম্ভ করেছিলেন । আর সে জেনার স্বীকারোক্তি করেছিল ।

রজমকৃত ব্যক্তিকে গোসল কাফন ও জানাযা দেওয়া হবে। কেননা নবী করীম ﷺ হযরত মা'য়েয (রা.) সম্পর্কে বলেছেন- اِصْنَعُوْا بِهِ كَمَا تَصْنَعُوْنَ بِمَوْتَاكُمْ অর্থাৎ তোমরা নিজেদের মৃতদের সাথে যে আচরণ কর, তার সাথেও অনুরূপ আচরণ কর ।

আর এ কারণেও যে, একটি 'হক' এর বিপরীতে সে নিহত হয়েছে । সুতরাং গোসল (দাফন-কাফন) রহিত হবে না, যেমন কিসাসরূপে নিহত ব্যক্তির ক্ষেত্রে । আর নবী করীম ﷺ রজমের পর গামেদিয়্যাহ মহিলার উপর জানাযা পড়েছিলেন ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

জ্ঞাতব্য : ইমাম শা'বী (র.) বর্ণনা করেন যে, হযরত আলী (রা.) কাছে শুরাহা নিজের জেনার কথা স্বীকার করলে হযরত আলী (রা.) বলেন, যদি এই মহিলার জেনার ব্যাপারে কোনো সাক্ষী থাকত অর্থাৎ তার জেনা যদি সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হতো তবে তার সাক্ষীই প্রথম রজমকারী হতো । কিন্তু মহিলা যেহেতু নিজেই স্বীকার করেছে তাই (শাসক হিসেবে) আমিই প্রথম তাকে পাথর নিক্ষেপকারী হব । তখন তিনি একটি পথর নিক্ষেপ করলেন । অতঃপর অন্যান্যরা পাথর নিক্ষেপ করল । আর আমিও পাথর নিক্ষেপকারীদের একজন ছিলাম । -[আহমদ]

ইবনে আবী লায়লা বর্ণনা করেন যে, হযরত আলী (রা.)-এর কাছে জেনা যদি সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হতো তবে তিনি সাক্ষীদেরকে প্রথমে পাথর নিক্ষেপের হুকুম দিতেন । এরপর তিনি নিজে পাথর মারতেন । অতঃপর অন্যান্যরা পাথর মারত । আর যদি জেনাকারীর স্বীকারোক্তি দ্বারা জেনা সাব্যস্ত হতো তবে তিনি নিজে আগে পাথর মারতেন । পরে অন্যান্যরা পাথর মারত । -[ইবনে আবী শাইবা কর্তৃক বর্ণিত]

মুসান্নিফ (র.) হযরত গামেদিয়্যাহ (রা.) এর পাথর নিক্ষেপ প্রসঙ্গে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, তা ইমাম আবূ দাউদ ইমাম নাসাঈ ও বাযযার (র.) বর্ণনা করেছেন । কোনো কোনো বর্ণনায় অতিরিক্ত এ কথাও রয়েছে যে, তোমরা তাকে চেহারা ছাড়া বাকি অংশে পাথর মার । বাহ্যতদৃষ্টিতে এর কারণ এই বুঝা যায় যে, মৃত অবস্থায় তার চেহারা যেন বিকৃত ও বিভৎস না দেখা যায় ।

https://e-ilm.weebly.com/

وَاِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْصَنًا وَكَانَ حُرًّا فَحَدُّهُ مِائَةُ جَلْدَةٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ اِلَّا اَنَّهُ اِنْتَسَخَ فِيْ حَقِّ الْمُحْصَنِ فَبَقِيَ فِيْ حَقِّ غَيْرِهِ مَعْمُوْلًا بِهِ. قَالَ يَاْمُرُ الْاِمَامُ بِضَرْبِهِ بِسَوْطٍ لَا ثَمَرَةَ لَهُ ضَرْبًا مُتَوَسِّطًا لِاَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ لَمَّا اَرَادَ اَنْ يُقِيْمَ الْحَدَّ كَسَرَ ثَمَرَتَهُ. وَالْمُتَوَسِّطُ بَيْنَ الْمُبَرِّحِ وَغَيْرِ الْمُؤْلِمِ لِاِفْضَاءِ الْاَوَّلِ اِلَى الْهَلَاكِ وَخُلُوِّ الثَّانِيْ عَنِ الْمَقْصُوْدِ وَهُوَ الْاِنْزِجَارُ ـ

অনুবাদ : আর যদি জেনাকারী ব্যক্তিটি মুহসান না হয় এবং স্বাধীন হয় তাহলে হদ্দ হবে একশ দোররা। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ অর্থাৎ ব্যভিচারকারিণী ও ব্যভিচারকারী তাদের প্রত্যেককে একশটি দোররা মার। তবে মুহসানের ক্ষেত্রে আয়াতটি রহিত হয়েছে। সুতরাং অন্যের ক্ষেত্রে তা কার্যকর থাকবে।

শাসক তাকে এমন একটি চাবুক দ্বারা যাতে গিট নেই মধ্যম ধরনের আঘাত করার আদেশ দিবেন। কেননা হযরত আলী (রা.) যখন হদ্দ কায়েমের ইচ্ছা করেছিলেন তখন চাবুকের গিট ভেঙে নিয়েছিলেন। মধ্যম অর্থ যখমকারীও হবে না এবং এমনও হবে না যাতে ব্যথা পাওয়া যায় না। কেননা প্রথমটি প্রাণনাশে পরিণতকারী। আর দ্বিতীয়টি উদ্দেশ্য সিদ্ধিকারী নয়। আর তা হলো এ ধরনের কাজ থেকে বিরত রাখা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

لان عليا (رضـ) বলে যা বুঝানো উদ্দেশ্য তা সুস্পষ্ট। অর্থাৎ এমন চাবুক কিংবা বেত দিয়ে আঘাত করা যাবে না যাতে গিট কিংবা শাখা রয়েছে। কেননা হযরত আলী (রা.) বিশেষভাবে লক্ষ্য করে বেতের গিটগুলো ভেঙ্গে দিয়েছিলেন এবং তিনি জোরে আঘাত করতে নিষেধ করতেন।

জ্ঞাতব্য যে, এ প্রসঙ্গে ইবনে আবী শাইবা (র.) হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, বেত্রাঘাতের সময় বেতের গিটগুলো ভেঙ্গে ফেলার হুকুম দেওয়া হতো। এরপর বেতের ঐ অংশটুকু দুই ইটের মাঝে রেখে ছেচে দেওয়া হতো যেন নরম হয়ে যায়। হযরত হাসান (রা.) কে জিজ্ঞেস করা হলো, এ কাজটি কার জমানায় করা হতো? তিনি বললেন, হযরত ওমর (রা.)-এর জমানায়। মুরসাল সনদে রাসূল ﷺ থেকেও এমনই বর্ণিত রয়েছে। এ হাদীসটি ইমাম মালেক, আব্দুর রাজ্জাক এবং ইবনে আবী শাইবা (র.)ও বর্ণনা করেছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

وَتُنْزَعُ عَنْهُ ثِيَابُهُ مَعْنَاهُ دُوْنَ الْإِزَارِ لِاَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالتَّجْرِيْدِ فِي الْحُدُوْدِ، وَلِاَنَّ التَّجْرِيدَ اَبْلَغُ فِيْ اِيْصَالِ الْاَلَمِ إِلَيْهِ . وَهٰذَا الْحَدُّ مَبْنَاهُ عَلَى الشِّدَّةِ فِي الضَّرْبِ وَفِيْ نَزْعِ الْإِزَارِ كَشْفُ الْعَوْرَةِ فَلْيَتَوَقَّاهُ وَيُفَرَّقُ الضَّرْبُ عَلٰى اَعْضَائِهِ لِاَنَّ الْجَمْعَ فِيْ عُضْوٍ وَاحِدٍ قَدْ يُفْضِيْ اِلَى التَّلَفِ وَالْحَدُّ زَاجِرٌ لَا مُتْلِفٌ قَالَ اِلَّا رَأْسَهُ وَوَجْهَهُ وَفَرْجَهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِلَّذِي اَمَرَهُ بِضَرْبِ الْحَدِّ اتَّقِ الْوَجْهَ وَالْمَذَاكِيرَ وَلِاَنَّ الْفَرْجَ مَقْتَلٌ وَالرَّأْسَ مَجْمَعُ الْحَوَاسِّ، وَكَذَا الْوَجْهُ وَهُوَ مَجْمَعُ الْمَحَاسِنِ اَيْضًا فَلَا يُؤْمَنُ فَوَاتُ شَيْءٍ مِنْهَا بِالضَّرْبِ وَذٰلِكَ اِهْلَاكٌ مَعْنًى فَلَا يُشْرَعُ حَدًّا ـ

অনুবাদ : আর তার দেহ থেকে কাপড় চোপড় খুলে ফেলা হবে। অর্থাৎ ইজার (তহবন্দ) ছাড়া অন্য কাপড়। কেননা হযরত আলী (রা.) হদ্দ কায়েমের ক্ষেত্রে পোশাক খুলে ফেলার আদেশ করতেন। আর এই কারণে যে, বস্ত্রমুক্ত করাটা আসামীর দেহে ব্যথা পৌছানোর জন্য অধিক কার্যকর। আর এই হদ্দ এর ভিত্তি হলো প্রহারে কঠোরতার উপর। পক্ষান্তরে ইজার খুলে ফেলার অর্থ গুপ্তাঙ্গ প্রকাশ করা। সুতরাং সেটা পরিহার করতে হবে। **প্রহারকে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে বিক্ষিপ্ত করতে হবে।** কেননা সকল আঘাত এক অঙ্গে বর্ষণ মৃত্যু পর্যন্ত গড়াতে পারে। অথচ হদ্দ হচ্ছে শাসনকারী, বিনষ্টকারী নয়।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, **তবে তার মাথায়, চেহারায় ও লজ্জাস্থানে প্রহার করবে না।** কেননা নবী করীম ﷺ যাকে হদ্দ মারার আদেশ দিয়েছিলেন, তাকে বলেছিলেন, اِتَّقِ الْوَجْهَ وَالْمَذَاكِيرَ তার চেহারা ও লজ্জাস্থান পরিহার কর। তাছাড়া এই কারণে যে, লজ্জাস্থানে আঘাতও প্রাণঘাতী। আর মাথা সকল অনুভূতির কেন্দ্র। মুখমণ্ডলও তাই। তদুপরি তা সৌন্দর্যের কেন্দ্র। আর প্রহারের কারণে অনুভূতি ও সৌন্দর্য নিরাপদ থাকে না। আর গুণগতভাবে এটা প্রাণনাশের সমতুল্য। সুতরাং তা হদ্দ রূপে শরিয়ত অনুমোদিত হতে পারে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَتُنْزَعُ عَنْهُ ثِيَابُهُ دُوْنَ الْإِزَارِ "অর্থাৎ ইজার (তহবন্দ) ছাড়া অন্য সব কাপড় তার দেহ থেকে খুলে ফেলা হবে" একথা এজন্যই বলা হলো যে, হযরত আলী (রা.) হদ্দ কায়েমের সময় এসব কাপড় খুলে ফেলার নির্দেশ দিতেন যেন গায়ে ব্যথা লাগে। তবে তার সতর যেহেতু খোলা যাবে না তাই তার ইজার (তহবন্দ) খোলার আদেশ দেওয়া যাবে না।

জ্ঞাতব্য : হদ্দ প্রসঙ্গে আব্দুর রাজ্জাক (র.) হযরত আলী (রা.) থেকে এক হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, তার কাছে এক ব্যক্তিকে হদ্দ প্রতিষ্ঠা করার জন্য নিয়ে আসা হলো। লোকটির গায়ে তখন কাতানী কম্বল জড়ানো ছিল। তিনি এ অবস্থায়ই তার উপর হদ্দ কায়েম করেন।

এ হাদীস সম্পর্কে বলা হয় যে, এটি জেনার হদ্দ ছিল না; বরং শরাব পান বা চুরি জাতীয় অপরাধের হদ্দ ছিল। "اَلْحَدُّ زَاجِرٌ لَا مُتْلِفٌ" হদ্দ কায়েমের উদ্দেশ্য যেহেতু শাসন বিনষ্ট নয়। অতএব, প্রহারকে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে বিক্ষিপ্ত করতে হবে। কেননা সকল আঘাত এক অঙ্গে বর্ষণ মৃত্যু ঘটাতে পারে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ رحِمَهُ اللّٰهُ : يُضْرَبُ الرَّأسَ اَيْضًا رَجَعَ اِلَيْهِ، وَاِنَّمَا يُضْرَبُ سَوْطًا لِقَوْلِ اَبِيْ بَكْرٍ : اِضْرِبُوْا الرَّأْسَ فَاِنَّ فِيْهِ شَيْطَانًا . قُلْنَا : تَاْوِيْلُهٗ اَنَّهٗ قَالَ ذٰلِكَ فِيْمَنْ اُبِيْحَ قَتْلُهٗ . وَيُقَالُ : اِنَّهٗ وَرَدَ فِيْ حَرْبِيٍّ كَانَ مِنْ دُعَاةِ الْكَفَرَةِ وَالْاِهْلَاكُ فِيْهِ مُسْتَحَقٌّ وَيُضْرَبُ فِي الْحُدُوْدِ كُلِّهَا قَائِمًا غَيْرَ مَمْدُوْدٍ لِقَوْلِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : يُضْرَبُ الرِّجَالُ فِي الْحُدُوْدِ قِيَامًا وَالنِّسَاءُ قُعُوْدًا، وَلِاَنَّ مَبْنٰى اِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى التَّشْهِيْرِ، وَالْقِيَامُ اَبْلَغُ فِيْهِ . ثُمَّ قَوْلُهٗ : غَيْرَ مَمْدُوْدٍ، فَقَدْ قِيْلَ الْمَدُّ اَنْ يُلْقٰى عَلَى الْاَرْضِ وَيُمَدَّ كَمَا يُفْعَلُ فِيْ زَمَانِنَا، وَقِيْلَ اَنْ يَمُدَّ السَّوْطَ فَيَرْفَعَهُ الضَّارِبُ فَوْقَ رَأْسِهِ، وَقِيْلَ اَنْ يَمُدَّهٗ بَعْدَ الضَّرْبِ، وَذٰلِكَ كُلُّهٗ لَا يُفْعَلُ لِاَنَّهٗ زِيَادَةٌ عَلَى الْمُسْتَحَقِّ وَاِنْ كَانَ عَبْدًا جَلَدَهٗ خَمْسِيْنَ جَلْدَةً لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنٰتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ نَزَلَتْ فِي الْاِمَاءِ.

অনুবাদ : ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) পরবর্তীতে মত পরিবর্তন করে বলেছেন, মাথায়ও প্রহার করা যাবে। মাথায় অন্তত একটি চাবুক মারার কারণ এই যে, হযরত আবূ বকর (রা.) বলেছেন, মাথায় প্রহার কর; কেননা তাতে শয়তান রয়েছে। এর ব্যাখ্যারূপে আমাদের বক্তব্য এই যে, তিনি এটা ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে বলেছিলেন, যাকে কতল করা বৈধ ছিল। কোনো কোনো মতে এ নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল কুফরি প্রচারকারী এক হারবী সম্পর্কে। আর প্রাণনাশ তো তার প্রাপ্য।

সকল হদ্দের ক্ষেত্রেই দাঁড়ানো অবস্থায় প্রহার করা হবে, তাকে টেনে রাখা হবে না। কেননা হযরত আলী (রা.) বলেছেন, হদ্দসমূহের ক্ষেত্রে পুরুষদের দাঁড়ানো অবস্থায় এবং স্ত্রীলোকদের বসা অবস্থায় প্রহার করা হবে। তাছাড়া এই কারণে যে, হদ্দ কায়েম করার ভিত্তি হলো প্রচারের উপর। আর দাঁড়ানো অবস্থা প্রচারের জন্য অধিক সহায়ক।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর বক্তব্য 'টেনে রাখা হবে না' -এর ব্যাখ্যায় কেউ কেউ বলেছেন যে, টানা অর্থ মাটিতে লম্বা করে শোয়ানো। যেমন আমাদের যুগে ধরা হয়। আর কেউ কেউ বলেছেন যে, এর অর্থ হলো চাবুক টেনে ধরে মাথার উপর তুলে প্রহারকারীর আঘাত করা। আবার কেউ কেউ বলেছেন, আঘাত করার পর (শরীরে) চাবুকের টান দেওয়া এসব আচরণ কোনোটিই করা যাবে না। কেননা তা প্রাপ্য শাস্তির অতিরিক্ত।

জ্ঞাতব্য, হদ্দ প্রয়োগের উল্লিখিত বিস্তারিত আলোচনা স্বাধীন পুরুষ ও মহিলা জেনাকারীর ব্যাপারে ছিল।

আর যদি (অপরাধকারী) গোলাম হয় তাহলে তাকে পঞ্চাশ ঘা চাবুক লাগানো হবে। কেননা দাসীদের সম্পর্কে এই আয়াত নাজিল হয়েছে– فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنٰتِ مِنَ الْعَذَابِ অর্থাৎ তাদের উপর ঐ শাস্তির অর্ধেক হবে, যা স্বাধীন নারীদের উপর হয়ে থাকে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَلِاَنَّ الرِّقَّ مُنَقِّصٌ لِلنِّعْمَةِ فَيَكُوْنُ مُنَقِّصًا لِلْعُقُوْبَةِ لِاَنَّ الْجِنَايَةَ عِنْدَ تَوَافُرِ النِّعَمِ اَفْحَشُ فَيَكُوْنُ اَدْعٰى اِلَى التَّغْلِيْظِ وَالرَّجُلُ وَالْمَرْاَةُ فِيْ ذٰلِكَ سَوَاءٌ؛ لِاَنَّ النُّصُوْصَ تَشْمَلُهُمَا غَيْرَ اَنَّ الْمَرْاَةَ لَا يُنْزَعُ مِنْ ثِيَابِهَا اِلَّا الْفَرْوُ وَالْحَشْوُ لِاَنَّ فِيْ تَجْرِيْدِهَا كَشْفَ الْعَوْرَةِ وَالْفَرْوُ وَالْحَشْوُ يَمْنَعَانِ وُصُوْلَ الْاَلَمِ اِلَى الْمَضْرُوْبِ وَالسَّتْرُ حَاصِلٌ بِدُوْنِهِمَا فَيُنْزَعَانِ وَتُضْرَبُ جَالِسَةً لِمَا رَوَيْنَا، وَلِاَنَّهُ اَسْتَرُ لَهَا وَاِنْ حُفِرَ لَهَا فِي الرَّجْمِ جَازَ؛ لِاَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حَفَرَ لِلْغَامِدِيَّةِ اِلٰى ثُنْدُوَتِهَا، وَحَفَرَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ لِشُرَاحَةَ الْهَمْدَانِيَّةِ وَاِنْ تَرَكَ لَا يَضُرُّهُ ـ

অনুবাদ : তাছাড়া এই কারণে যে, দাসত্ব নিয়ামতকে হ্রাস করে সুতরাং শাস্তিকেও হ্রাস করবে। কেননা নিয়ামতের পূর্ণতার সময় অপরাধ অধিক গুরুতর হয়। সুতরাং সেই অপরাধ কঠোরতর শাস্তির কারণ হবে :

হদ্দের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ সমান হবে। কেননা শরিয়তের নির্দেশসমূহ উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। **তবে স্ত্রীলোকের জন্য চমড়ার পোশাক ও তুলা ভর্তি কাপড় ব্যতীত অন্য পোশাক খোলা যাবে না।**

কেননা তার পোশাক খোলা দ্বারা তার গুপ্তাঙ্গ প্রকাশ করা হয়। আর চামড়া ও তুলা ভর্তি পোশাক প্রহৃতার শরীরে ব্যথা পৌছার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয় এবং এ পোশাক ছাড়াও সতর রক্ষা হয়। সুতরাং সেগুলো খুলে ফেলা হবে। **স্ত্রী লোককে উপবিষ্ট অবস্থায় প্রহার করা হবে।** এর প্রমাণ আমাদের বর্ণিত হযরত আলী (রা.) এর হাদীস। তাছাড়া এটি হলো সতরের জন্য অধিক সহায়ক।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, **রজমের ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকের জন্য যদি গর্ত খনন করা হয় তবে তা জায়েজ।** কেননা নবী করীম ﷺ গামেদী মহিলা (রা.) এর জন্য বুক পর্যন্ত গর্ত খনন করেছিলেন। তদ্রূপ হযরত আলী (রা.) শারাহা হামদানী মহিলার জন্য গর্ত খনন করেছিলেন। তবে না করলেও দোষের কিছু নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

"لِاَنَّ الْجِنَايَةَ عِنْدَ تَوَافُرِ النِّعَمِ" স্বাধীন মানুষের উপর আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত থাকে অসংখ্য অফুরন্ত। তাই তার অপরাধের শাস্তিও হবে কঠোরতর। তার ব্যভিচারের ক্ষেত্রে শরিয়ত তাকে একশত দোররা মারার হুকুম প্রদান করে। অপরদিকে গোলাম আল্লাহর বহু নিয়ামত থেকে বঞ্চিত থাকে, তাই তার ব্যভিচারের ক্ষেত্রে শরিয়ত কেবল পঞ্চাশ দোররা মারার আদেশ দেয়।

আরও লক্ষণীয় যে, একজন স্বাধীন পুরুষের বেলায় শরিয়ত কর্তৃক এক সাথে চারজন স্ত্রী রাখার অনুমতি রয়েছে। এরপরও যদি সে ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তবে তার শাস্তি কঠোরতর হওয়াই যুক্তিযুক্ত। অন্যদিকে শরিয়ত গোলামকে একসঙ্গে কেবল দুই স্ত্রী রাখার অনুমতি দেয়। আর তাও তার মনিবের খেদমত থেকে ফারেগ হলে এবং মনিব তাকে বিশ্রামের অনুমতি দিলে তবেই সে তার স্বামীর সান্নিধ্যে আসতে পারে, এসব কারণে শরিয়ত কর্তৃক গোলাম ও দাসীর উপর শাস্তি লঘু করা হয়েছে। অর্থাৎ স্বাধীন ব্যক্তির তুলনায় সে অর্ধেক শাস্তির উপযুক্ত হবে। তবে প্রস্তরাঘাতে হত্যার বিষয়টি এর ব্যতিক্রম। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে যেহেতু ভাগাভাগি বা অর্ধেক হয় না, তাই ব্যভিচারী গোলাম বিবাহিত হোক বা অবিবাহিত, সর্বাবস্থায় তাকে চাবুক লাগানো হবে। রজম করা হবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

لِاَنَّهٗ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمْ يَأْمُرْ بِذٰلِكَ وَهِيَ مَسْتُوْرَةٌ بِثِيَابِهَا. وَالْحَفْرُ اَحْسَنُ: لِاَنَّهٗ اَسْتَرُ وَيُحْفَرُ اِلَى الصَّدْرِ لِمَا رَوَيْنَا وَلَا يُحْفَرُ لِلرَّجُلِ لِاَنَّهٗ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَا حَفَرَهٗ لِمَاعِزٍ، وَلِاَنَّ مَبْنَى الْاِقَامَةِ عَلَى التَّشْهِيْرِ فِي الرِّجَالِ. وَالرَّبْطُ وَالْاِمْسَاكُ غَيْرُ مَشْرُوْعٍ - وَلَا يُقِيْمُ الْمَوْلَى الْحَدَّ عَلٰى عَبْدِهٖ اِلَّا بِاِذْنِ الْاِمَامِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَهٗ اَنْ يُقِيْمَهٗ لِاَنَّ لَهٗ وِلَايَةً مُطْلَقَةً عَلَيْهِ كَالْاِمَامِ. بَلْ اَوْلٰى لِاَنَّهٗ يَمْلِكُ مِنَ التَّصَرُّفِ فِيْهِ مَا لَا يَمْلِكُهُ الْاِمَامُ فَصَارَ كَالتَّعْزِيْرِ. وَلَنَا قَوْلُهٗ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ﴿اَرْبَعٌ اِلَى الْوُلَاةِ فَذَكَرَ مِنْهَا الْحُدُوْدَ﴾ وَلِاَنَّ الْحَدَّ حَقُّ اللّٰهِ تَعَالٰى لِاَنَّ الْمَقْصِدَ مِنْهَا اِخْلَاءُ الْعَالَمِ عَنِ الْفَسَادِ، وَلِهٰذَا لَا يَسْقُطُ بِاِسْقَاطِ الْعَبْدِ فَيَسْتَوْفِيْهِ مَنْ هُوَ نَائِبٌ عَنِ الشَّرْعِ وَهُوَ الْاِمَامُ اَوْ نَائِبُهٗ،

অনুবাদ : কেননা নবী করীম ﷺ তা করার আদেশ দেননি। তাছাড়া সে তো তার পোশাক দ্বারাই আবৃত রয়েছে, তবে গর্ত করাই উত্তম। কেননা এতে তার সতর অধিক ঢাকা হয়।

আর আমাদের বর্ণিত উপরিউক্ত (গামেদিয়্যাহ মহিলা সম্পর্কিত) হাদীসের আলোকে বুক পর্যন্ত গর্ত করা সঙ্গত। **আর পুরুষের জন্য গর্ত করা হবে না।** কেননা নবী করীম ﷺ হযরত মা'য়েয (রা.) এর জন্য গর্ত খনন করেননি। তাছাড়া পুরুষের ক্ষেত্রে হদ্দ কায়েমের ভিত্তি হলো প্রচারের উপর। আর বেঁধে রাখা বা ধরে রাখা শরিয়ত সম্মত নয়।

শাসকের অনুমতি ছাড়া মনিব তার গোলামের উপর হদ্দ কায়েম করতে পারে না। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, সে তা করতে পারে। কেননা শাসকের ন্যায় তারও নিজ গোলামের উপর পূর্ণ অভিভাবকত্ব রয়েছে। বরং শাসকের চেয়ে অধিক রয়েছে। কারণ মনিব গোলামের বিষয়ে এমন সকল ব্যবহার করতে পারে, যা শাসক পারে না। সুতরাং এটি সাধারণ শাস্তির মতো হলো। আমাদের দলিল হলো নবী করীম ﷺ এর বাণী, চারটি বিষয় কায়েম করার অধিকার শাসকের উপর ন্যস্ত। তন্মধ্যে হদ্দের কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া এই কারণে যে, হদ্দ হলো আল্লাহর হক। কেননা এর উদ্দেশ্য হলো পৃথিবীকে ফাসাদ থেকে মুক্ত করা। এ কারণেই তা বান্দার মাফ করার দ্বারা মাফ হয় না। সুতরাং শরিয়তের যিনি প্রতিনিধি তিনিই তা উসুল করবেন। আর তিনি হলেন শাসক কিংবা তার স্থলবর্তী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ : وَالرَّبْطُ وَالْاِمْسَاكُ غَيْرُ مَشْرُوْعٍ : স্মর্তব্য যে, যদি বেঁধে রাখা বা ধরে রাখা ছাড়া রজম করা সম্ভব না হয় অথচ তার জেনা সাক্ষী দ্বারা প্রমাণিত হয়, তবে তাকে বাধা কিংবা ধরে রাখা জায়েজ। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন যে, যখন রাসূলে কারীম ﷺ হযরত মা'য়েয (রা.) কে রজম করার আদেশ দিলেন, তখন আমরা তাকে জান্নাতুল বাকীতে রজম করেছি। আল্লাহর শপথ তখন আমরা তাকে বাধি নাই এবং তার জন্য গর্তও খনন করি নাই। আর তিনি তখন দাঁড়িয়েই ছিলেন। তবে হযরত মা'য়েজ (রা.) এর রজম প্রসঙ্গে হযরত বুরাইদা (রা.) ও হযরত আবূ যার (রা.) এর বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে, তার জন্য গর্ত খনন করা হয়েছিল। কিন্তু আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) -এর বর্ণিত হাদীসের প্রাধান্য দিয়েছেন। গর্ত খননের বিষয়টিকে তার দৃঢ়তার সাথে অস্বীকার করাই এর প্রমাণ। তা ছাড়া গর্ত যদি খনন করাই হতো তবে তিনি চলে যেতে চেষ্টা করতেন না।

https://e-ilm.weebly.com/

قَوْلُهُ : وَلَا يُقِيْمُ الْمَوْلٰى الْحَدَّ عَلٰى عَبْدِهٖ اِلَّا بِاِذْنِ الْاِمَامِ الخ : আহনাফের মতে যদি কোনো ব্যক্তির গোলাম ব্যভিচার করে তবে মুনিব নিজে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করতে পারে না। বরং তখনকার শাসকের উপরই এর দায়িত্ব ন্যস্ত। তবে শাসক যদি মনিবকে অনুমতি দেয় তবে সে হদ্দ কায়েম করতে পারে। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.) ইমাম মালেক (র.) ও ইমাম আহমদ (র.)-এর মতামত হলো শাসকের মতো মনিবেরও নিজ গোলামের উপর হদ্দ কায়েমের অধিকার রয়েছে। তবে এ কাজ শাসক করাই উত্তম। ইমাম শাফেয়ী (র.) ও ইমাম মালেক (র.) নিজেদের দাবির সপক্ষে বিভিন্ন হাদীস পেশ করেছেন। তন্মধ্যে একটি হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। হাদীসটি এমন, এক বিবাহিত বাঁদী জেনা করলে রাসূল ﷺ-এর কাছে এর শাস্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো, রাসূল ﷺ বললেন, সে যদি জেনা করে থাকে তবে তাকে বেত্রাঘাত কর। পুনরায় যদি সে একাজ করে তবে আবার তাকে বেত্রাঘাত কর। আবারও যদি সে এমন কাজে লিপ্ত হয় তবে তাকে আবার বেত্রাঘাত কর। চতুর্থ বার যদি সে ঘৃণ্য কাজে লিপ্ত হয় তবে তাকে বিক্রি করে ফেল। যদিও সামান্য কিছু চুলের (তুচ্ছ জিনিসের) বিনিময়ে হয়। ইমাম বুখারী (র.) ও ইমাম মুসলিম (র.) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

দ্বিতীয় হাদীসটি হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত : একবার তিনি খুতবা দিচ্ছিলেন। তখন তিনি একথাও বললেন, তোমাদের বাঁদিদের মধ্যে কেউ জেনায় লিপ্ত হলে সে বিবাহিতা হোক বা না হোক সর্বাবস্থায় তার উপর হদ্দ কায়েম কর। (তাকে শাস্তি দাও)

তিনি আরও বলেন নবী করীম ﷺ-এর কোনো বাঁদি একবার ব্যভিচারে লিপ্ত হলো, তখন নবী করীম ﷺ আমাকে তার শাস্তির হুকুম দিলেন। আমি যখন তাকে বেত্রাঘাতের জন্য তার কাছে গেলাম, আমি বুঝতে পারলাম যে মাত্র কিছুদিন আগে তার সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে। আর সে এখনও তার নেফাসে রয়েছে। আমি তখন ভয় পেয়ে গেলাম যে, এখন তাকে চাবুক মারলে সে মরে যাওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কা রয়েছে। তাই আমি ফিরে এসে রাসূল ﷺ কে এ অবস্থা বর্ণনা করলাম। রাসূল ﷺ বললেন, (তুমি তাকে চাবুক না মেরে) খুব ভালো করেছে। ইমাম তিরমিযী এ হাদীসটি বর্ণনা করেন।

তাদের দাবির সপক্ষে তৃতীয় হাদীসটি হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : যখন তোমাদের কারো বাঁদি জেনা করে, তখন সে যেন পবিত্র কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী তাকে দোররা মারে। পুনরায় সে জেনা করলে পুনরায় সে যেন তাকে শাস্তি দেয়। আবার সে এ ঘৃণ্য কাজে লিপ্ত হলে আবার তাকে শাস্তি দাও। আবার করলে তাকে বিক্রি করে ফেল। ইমাম আবূ দাঊদ এ হাদীস বর্ণনা করেন। ইমাম আবূ হানীফা (র.) এ সকল হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ হলো– এমন অবস্থায় তোমরা বিষয়টি শাসকের সামনে পেশ কর। এরপর শাসক যদি তোমাদের অনুমতি দেন তবে তোমরা হদ্দ কয়েম কর। হযরত আলী (রা.) এর বর্ণিত হাদীস থেকে এমনই বুঝা যায়। অর্থাৎ রাসূলে কারীম ﷺ তাকে অনুমতি দিলে তিনি তা পালন করতে প্রস্তুত হন।

আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) বলেন, এ ব্যাখ্যা অন্যান্য ইমামদের কাছে গ্রহণীয় নয়। কেননা বিভিন্ন হাদীস দ্বারা এ বিষয়টি সুস্পষ্ট যে, শরিয়ত এ বিষয়ে গোলামদের মালিককে নিজ প্রতিনিধি সাব্যস্ত করেছে। অতএব, এর বিপক্ষে অন্য কোনো হাদীস এবং প্রমাণ না পাওয়া গেলে এগুলোর জাহেরী অর্থের উপর আমল করা হবে।

পরবর্তী যুগের হানাফী মাযহাবের ফকীহগণের এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, রাসূল ﷺ-এর সাহাবীগণ সকলেই ছিলেন আদালত ও ইনসাফের মূর্ত-প্রতীক। শরিয়তের প্রতিটি বিষয়ের বাস্তবায়ন ও আমলের ক্ষেত্রে সকল হক্ব ও সীমারেখার প্রতি পূর্ণ দৃষ্টি রাখতেন তারা। তাই তাদের রাসূল ﷺ-এর নায়েব বা প্রতিনিধি হওয়ার ব্যাপারে কারো কোনো সন্দেহ বা প্রশ্নের অবকাশ নেই। কিন্তু ভেবে দেখার বিষয় হলো যে, সাহাবীদের মতো (বর্তমান যুগের) সকল মানুষকেই উক্ত বিষয়ে শাসক এর প্রতিনিধি মেনে নেওয়া সম্ভব কি না? নিজ গোলামের উপর হদ্দ কায়েম করতে গিয়ে তারা শরিয়তের সীমা বজায় রাখতে পারবে কিনা? নাকি তাদের উপর জুলুম করে বসবে? বিশেষ করে গোলামের প্রতি যখন তার অসন্তুষ্টি বেশি থাকে। অথচ হদ্দ কায়েম করার অর্থ হচ্ছে শুধুমাত্র আল্লাহর হক প্রতিষ্ঠা করা। এ ক্ষেত্রে আক্রোশ বা ক্রোধ প্রকাশের কোনো সুযোগ নেই। তাই আশঙ্কা থেকেই যায় যে, এ গুরুদায়িত্ব শাসকের পরিবর্তে ব্যাপকভাবে মনিবদের হাতে ন্যস্ত হলে সমাজে এসলাহ বা শান্তির পরিবর্তে ফাসাদ বা বিপর্যয়-বিশৃঙ্খলাই দেখা দিবে। তাই এ দায়িত্ব শাসকের হাতে থাকাই উত্তম ও শ্রেয়। অতএব, হানাফী মাযহাবের আলেমগণ সতর্কতার খাতিরে এ দায়িত্ব শাসকের বলে মনে করেন।

https://e-ilm.weebly.com/

بِخِلَافِ التَّعْزِيرِ لِاَنَّهُ حَقُّ الْعَبْدِ وَلِهٰذَا يُعَزَّرُ الصَّبِيُّ، وَحَقُّ الشَّرْعِ مَوْضُوْعٌ عَنْهُ قَالَ وَاِحْصَانُ الرَّجْمِ اَنْ يَكُوْنَ حُرًّا عَاقِلًا بَالِغًا مُسْلِمًا قَدْ تَزَوَّجَ اِمْرَاَةً نِكَاحًا صَحِيْحًا وَدَخَلَ بِهَا وَهُمَا عَلٰى صِفَةِ الْاِحْصَانِ فَالْعَقْلُ وَالْبُلُوْغُ شَرْطٌ لِاَهْلِيَّةِ الْعُقُوْبَةِ اِذْ لَا خِطَابَ دُوْنَهُمَا، وَمَا وَرَاءَهُمَا يُشْتَرَطُ لِتَكَامُلِ الْجِنَايَةِ بِوَاسِطَةِ تَكَامُلِ النِّعْمَةِ اِذْ كُفْرَانُ النِّعْمَةِ يَتَغَلَّظُ عِنْدَ تَكَثُّرِهَا، وَهٰذِهِ الْاَشْيَاءُ مِنْ جَلَائِلِ النِّعَمِ . وَقَدْ شُرِعَ الرَّجْمُ بِالزِّنَاءِ عِنْدَ اِسْتِجْمَاعِهَا فَيُنَاطُ بِهِ . بِخِلَافِ الشَّرَفِ وَالْعِلْمِ؛ لِاَنَّ الشَّرْعَ مَا وَرَدَ بِاِعْتِبَارِهِمَا وَنَصْبُ الشَّرْعِ بِالرَّأْيِ مُتَعَذِّرٌ، وَلِاَنَّ الْحُرِّيَّةَ مُمَكِّنَةٌ مِنَ النِّكَاحِ الصَّحِيْحِ وَالنِّكَاحُ الصَّحِيْحُ مُمَكِّنٌ مِنَ الْوَطْءِ الْحَلَالِ، وَالْاِصَابَةُ شِبَعٌ بِالْحَلَالِ، وَالْاِسْلَامُ يُمَكِّنُهُ مِنْ نِكَاحِ الْمُسْلِمَةِ وَيُؤَكِّدُ اِعْتِقَادَ الْحُرْمَةِ فَيَكُوْنُ الْكُلُّ مَزْجَرَةً عَنِ الزِّنَاءِ . وَالْجِنَايَةُ بَعْدَ تَوَفُّرِ الزَّوَاجِرِ اَغْلَظُ وَالشَّافِعِيُّ يُخَالِفُنَا فِيْ اِشْتِرَاطِ الْاِسْلَامِ وَكَذَا اَبُوْ يُوْسُفَ

অনুবাদ : সাধারণ শাস্তির বিষয়টি ভিন্ন। কেননা তা বান্দার হক। এ কারণেই বালককেও শাস্তি প্রদান করা যায় অথচ শরিয়তের হক তার উপর অপ্রযোজ্য।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, **রজমের ক্ষেত্রে মুহসান হওয়ার অর্থ হলো স্বাধীন হওয়া, সুস্থমস্তিষ্ক হওয়া, প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া এবং মুসলমান হওয়া যে বিশুদ্ধ বিবাহ সম্পন্ন করেছে এবং যে মুহসান অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছে।**

সুস্থমস্তিষ্ক ও প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া শাস্তিযোগ্য হওয়ার শর্ত। কেননা এ দুটি ছাড়া শরিয়তের সম্বোধন আরোপিত হয় না। এ ছাড়া অন্যান্য শর্ত হলো নিয়ামতের পূর্ণতার মাধ্যমে অপরাধ পূর্ণতার জন্য। কেননা নিয়ামতের আধিক্যের সময় নিয়ামতের প্রতি অকৃজ্ঞতা গুরুতর হয়। আর উপরিউক্ত বিষয়গুলো হচ্ছে বড় বড় নিয়ামতের অন্তর্ভুক্ত। আর শরিয়ত এ সকল শর্ত সাব্যস্ত হওয়ার সময় জেনার কারণে রজম অনুমোদন করেছে। সুতরাং শুধু এগুলোর সাথেই তা সম্পৃক্ত হবে। মর্যাদা ও ইলমের নিয়ামতের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা এ দুটোকে বিবেচনা করার ব্যাপারে শরিয়তের বাণী আসেনি। আর নিজস্ব মতামতে শরিয়তে নির্ধারণ সম্ভব নয়।

তাছাড়া স্বাধীন অবস্থা বিশুদ্ধ বিবাহ করার সামর্থ্য সৃষ্টি করে। আর বিশুদ্ধ বিবাহ সহবাসের সামর্থ্য সৃষ্টি করে। আর সহবাস হালাল পথে তৃপ্তি দান করে।

আর ইসলাম তাকে মুসলিম নারী বিবাহ করার সক্ষমতা দান করে। আর জেনা হারাম হওয়ার বিশ্বাসকে দৃঢ়তা দান করে। সুতরাং এ সমস্ত শর্তগুলোর বিদ্যমানতা জেনা থেকে দূরে থাকার কারণ। আর প্রতিবন্ধকতা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান থাকার কারণে অপরাধ গুরুতর হয়। ইমাম শাফেয়ী (র.) ইসলামের শর্ত আরোপের ব্যাপারে আমাদের সাথে ভিন্নমত পোষণ করেন। এক বর্ণনা মতে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ও তার সাথে রয়েছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

فِيْ رِوَايَةٍ لَهُمَا مَا رُوِيَ" ﴿اَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ رَجَمَ يَهُوْدِيَّيْنِ قَدْ زَنَيَا﴾ قُلْنَا : كَانَ ذٰلِكَ بِحُكْمِ التَّوْرَاةِ ثُمَّ نُسِخَ، يُؤَيِّدُهُ ﴿قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَنْ اَشْرَكَ بِاللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ﴾. وَالْمُعْتَبَرُ فِي الدُّخُوْلِ اِيْلَاجٌ فِي الْقُبُلِ عَلٰى وَجْهٍ يُوْجِبُ الْغُسْلَ . وَشَرْطُ صِفَةِ الْاِحْصَانِ فِيْهِمَا عِنْدَ الدُّخُوْلِ، حَتّٰى لَوْ دَخَلَ بِالْمَنْكُوْحَةِ الْكَافِرَةِ اَوِ الْمَمْلُوْكَةِ اَوِ الْمَجْنُوْنَةِ اَوِ الصَّبِيَّةِ لَا يَكُوْنُ مُحْصَنًا، وَكَذَا اِذَا كَانَ الزَّوْجُ مَوْصُوْفًا بِاِحْدٰى هٰذِهِ الصِّفَاتِ وَهِيَ حُرَّةٌ مُسْلِمَةٌ عَاقِلَةٌ بَالِغَةٌ؛ لِاَنَّ النِّعْمَةَ بِذٰلِكَ تَتَكَامَلُ اِذِ الطَّبْعُ يَنْفِرُ عَنْ صُحْبَةِ الْمَجْنُوْنَةِ، وَقَلَّمَا يَرْغَبُ فِي الصَّبِيَّةِ لِقِلَّةِ رَغْبَتِهَا فِيْهِ وَفِي الْمَنْكُوْحَةِ الْمَمْلُوْكَةِ حَذَرًا عَنْ رِقِّ الْوَلَدِ وَلَا اِيْتِلَافَ مَعَ الْاِخْتِلَافِ فِي الدِّيْنِ . وَاَبُوْ يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ يُخَالِفُ فِي الْكَافِرَةِ، وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا ذَكَرْنَاهُ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا تُحْصِنُ الْمُسْلِمَ الْيَهُوْدِيَّةُ وَلَا النَّصْرَانِيَّةُ وَلَا الْحُرَّ الْاَمَةُ وَلَا الْحُرَّةَ الْعَبْدُ ـ

অনুবাদ : তাদের দলিল হলো বর্ণিত হাদীস যে, নবী করীম ﷺ জেনাকারী দুই ইহুদি (নর-নারী) কে রজম করেছেন। আমাদের জবাব এই যে, সেটা তাওরাতের বিধান মোতাবেক ছিল। অতঃপর তা রহিত হয়ে গেছে। নবী করীম ﷺ এর নিম্নোক্ত বাণী তা সমর্থন করে, مَنْ اَشْرَكَ بِاللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ অর্থাৎ যে আল্লাহর সাথে শরিক করে সে মুহসান নয়।

আর সহবাসের গ্রহণযোগ্য অবস্থা হলো 'সম্মুখস্থ' গুপ্তাঙ্গে পুরুষাঙ্গ এতদূর প্রবেশ করানো, যাতে গোসল ওয়াজিব হয়। ইমাম কুদূরী (র.) সহবাসের সময় উভয়ের মধ্যে ইহসান গুণ বিদ্যমান থাকার শর্ত আরোপ করেছেন। সুতরাং যদি কাফের স্ত্রীর সাথে কিংবা দাসীর সাথে অথবা বিকৃত মস্তিষ্ক স্ত্রীর সাথে বা নাবালিকা স্ত্রীর সাথে সহবাস করে তাহলে স্বামী মুহসান হবে না। তদ্রূপ স্বামীর মাঝে যদি এ সকল অবস্থার কোনো একটি বিদ্যমান থাকে আর স্ত্রী স্বাধীনা, মুসলিমা, সুস্থমস্তিষ্কা ও প্রাপ্তবয়স্কা হয় তাহলেও মুহসান হবে না। কেননা এ সকল শর্ত বিদ্যমান থাকা অবস্থায় (সহবাসের) নিয়ামত পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। কারণ বিকৃত মস্তিষ্ক স্ত্রীর সাথে সঙ্গমে রুচি সায় দেয় না। তদ্রূপ বালিকার যৌন চাহিদা না থাকার কারণে তার প্রতি আকর্ষণ কমই হয়ে থাকে। তদ্রূপ সন্তানের দাসত্বের আশঙ্কায় দাসী স্ত্রীর প্রতিও আগ্রহ কম হয়ে থাকে। আর ধর্মের ভিন্নতার ক্ষেত্রে অন্তরঙ্গতার অভাব হয়ে থাকে। কাফের স্ত্রীর ব্যাপারে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) আমাদের সাথে ভিন্ন মত পোষণ করেন। আমাদের এইমাত্র উল্লিখিত বক্তব্য হলো তার বিপক্ষে দলিল।

আর এক দলিল নবী করীম ﷺ -এর এ বাণী- لَا تُحْصِنُ الْمُسْلِمَ الْيَهُوْدِيَّةُ وَلَا النَّصْرَانِيَّةُ وَلَا الْحُرَّ الْاَمَةُ وَلَا الْحُرَّةَ الْعَبْدُ 'ইহুদি স্ত্রী এবং খ্রিস্টান স্ত্রী-মুসলিম স্বামী তদ্রূপ দাসী স্ত্রী স্বাধীন স্বামীকে এবং দাস স্বামী স্বাধীনা স্ত্রীকে মুহসান বানাতে পারবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

জ্ঞাতব্য যে, ইমাম আবূ হানীফা (রা.) এর পক্ষে দলিল স্বরূপ আরও একটি হাদীস পাওয়া যায়। যা ইবনে আবী শাইবা (র.) হযরত কা'ব বিন মালেক (রা.) থেকে রেওয়ায়েত করেন। তিনি এক ইহুদি মহিলাকে বিবাহ করতে চাইলে রাসূল ﷺ তাকে বললেন, তুমি তাকে বিবাহ কর না। কেননা সে তোমাকে মুহসান বানাতে পারবে না। মুহসানকে একত্রে বেত্রাঘাত ও রজম করা যাবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ وَلَا يُجْمَعُ فِي الْمُحْصَنِ بَيْنَ الرَّجْمِ وَالْجَلْدِ لِاَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمْ يَجْمَعْ، وَلِاَنَّ الْجَلْدَ يَعْرَى عَنِ الْمَقْصُوْدِ مَعَ الرَّجْمِ؛ لِاَنَّ زَجْرَ غَيْرِهِ يَحْصُلُ بِالرَّجْمِ إِذْ هُوَ فِي الْعُقُوْبَةِ اَقْصَاهَا وَزَجْرُهُ لَا يَحْصُلُ بَعْدَ هَلَاكِهِ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, মুহসানকে একত্রে বেত্রাঘাত ও রজম করা যাবে না। কেননা নবী করীম ﷺ দু'টি শাস্তিকে একত্র করেননি। তাছাড়া এই কারণে যে, রজমের সাথে বেত্রাঘাত উদ্দেশ্যহীন হয়ে পড়ে। কেননা অন্যকে সতর্ক করার উদ্দেশ্য তো সর্বোচ্চ শাস্তি হিসেবে রজম দ্বারাই অর্জিত হচ্ছে। পক্ষান্তরে রজম দ্বারা মৃত্যু হওয়ার পর তার নিজের সতর্ক হওয়ার প্রশ্নই উঠে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قوله قَالَ وَلَا يُجْمَعُ فِي الْمُحْصَنِ بَيْنَ الرَّجْمِ وَالْجَلْدِالخ : অর্থাৎ জেনাকারীকে যখন শাস্তি স্বরূপ রজম করা হয় তখন এ শাস্তির সাথে তাকে বেত্রাঘাতও করা যাবে না। কেননা রজম শাস্তি হিসেবে সর্বোচ্চ শাস্তি। তাই এর সাথে বেত্রাঘাত উদ্দেশ্যহীন। এর কারণ হলো, কাউকে শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্য অন্যকে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত রাখা। আর তা রজম দ্বারাই অর্জিত হচ্ছে।

ইমাম মালেক (র.) এবং শাফেয়ী (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। এক বর্ণনা মতে ইমাম আহমদ (র.)ও তাদের সাথে রয়েছেন। তাদের মতে বেত্রাঘাত ও রজম একত্র করা যাবে। তাদের দলিল হযরত উবাদাহ ইবনে সামিত (রা.)-এর বর্ণিত ঐ হাদীস যাতে বেত্রাঘাত ও নির্বাসন (উভয় শাস্তি) একত্র করার কথা উল্লেখ রয়েছে। এমনিভাবে অন্য এক বর্ণনায় বেত্রাঘাত ও রজম একত্র করার কথা উল্লেখ রয়েছে। আহনাফ-এর পক্ষ থেকে এর উত্তরে বলা হয় যে, হযরত উবাদা (রা.) এর হাদীস আল্লাহ তা'আলার বাণী "جَعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا" -এর বয়ান।

আহনাফ এর দলিল পূর্বে বর্ণিত গামেদিয়্যাহ মহিলার রজম সম্পর্কিত হাদীস। রাসূল ﷺ তাকে শুধু রজম করার আদেশ দিয়েছিলেন। এমনিভাবে হযরত মা'য়েয (রা.)-এর রজম সম্পর্কিত হাদীসেও শুধু রজমের কথা উল্লেখ রয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ وَلَا يُجْمَعُ فِي الْبِكْرِ بَيْنَ الْجَلْدِ وَالنَّفْيِ وَالشَّافِعِيُّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا حَدًّا ﴿لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اَلْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ﴾ وَلِأَنَّ فِيْهِ حَسْمَ بَابِ الزِّنَا لِقِلَّةِ الْمَعَارِفِ. وَلَنَا قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿فَاجْلِدُوا﴾ جَعَلَ الْجَلْدَ كُلَّ الْمُوْجَبِ رُجُوْعًا اِلَى حَرْفِ الْفَاءِ وَاِلَى كَوْنِهِ كُلَّ الْمَذْكُوْرِ، وَلِأَنَّ فِي التَّغْرِيْبِ فَتْحَ بَابِ الزِّنَا لِانْعِدَامِ الْاِسْتِحْيَاءِ مِنَ الْعَشِيْرَةِ ثُمَّ فِيْهِ قَطْعُ مَوَادِّ الْبَقَاءِ، فَرُبَّمَا تَتَّخِذُ زِنَاهَا مَكْسَبَةً وَهُوَ مِنْ أَقْبَحِ وُجُوْهِ الزِّنَا، وَهٰذِهِ الْجِهَةُ مُرَجِّحَةٌ لِقَوْلِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ : كَفٰى بِالنَّفْيِ فِتْنَةً، وَالْحَدِيْثُ مَنْسُوْخٌ كَشَطْرِهِ، وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ﴿الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَرَجْمٌ بِالْحِجَارَةِ﴾

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, আবিবাহিতের ক্ষেত্রে বেত্রাঘাত ও নির্বাসন একত্র করা যাবে না। আর ইমাম শাফেয়ী (র.) হদ্দরূপে উভয় শাস্তি একত্র করার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। কেননা নবী করীম ﷺ বলেছেন, اَلْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ অর্থাৎ কুমারের সাথে কুমারীর ব্যভিচারে একশ দোররা ও এক বছরের নির্বাসন। তাছাড়া এই কারণে যে, এতে পরিচয় স্বল্পতার কারণে ব্যভিচারের সুযোগ বন্ধ করা হয়।

আমাদের দলিল হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী। فَاجْلِدُوْا এখানে ف অব্যয়টির ব্যাকরণগত দাবির ভিত্তিতে বলা যায় যে, বেত্রাঘাতকেই আল্লাহ তা'আলা সমগ্র ওয়াজিব শাস্তি নির্ধারণ করেছেন। কিংবা এই জন্য যে, এটাই হচ্ছে (শাস্তির ক্ষেত্রে) সমগ্র উল্লেখকৃত বিষয়।

তাছাড়া এ কারণে যে, আত্মীয় স্বজনের লজ্জা, ভয় না থাকার কারণে নির্বাসন দ্বারা জেনার দরজা খোলে দেওয়া হয়। তদুপরি এতে জীবিকার পথ রুদ্ধ করা হয়। ফলে হয়তো জেনাকেই সে উপার্জনের মাধ্যম রূপে গ্রহণ করবে। আর সেটা জেনার নিকৃষ্ট স্তর। আর হযরত আলী (রা.) এর নিম্নোক্ত বাণী সম্ভাবনার এই দিককেই প্রবলতা দান করে। كَفٰى بِالنَّفْيِ فِتْنَةً অর্থাৎ ফেতনা হিসেবে নির্বাসনই যথেষ্ট। আর আলোচ্য হাদীসটি তার অপরাংশের ন্যায় রহিত হয়ে গেছে। সে অংশটি হলো, الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَرَجْمٌ بِالْحِجَارَةِ অর্থাৎ বিবাহিতের সাথে বিবাহিতার ব্যভিচারের শাস্তি হলো একশ বেত্রাঘাত এবং প্রস্তর দ্বারা রজম।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(জ্ঞাতব্য, হযরত হযরত ইবনে ওমর (রা.) এর থেকে বর্ণিত রয়েছে, রাসূল ﷺ বেত্রাঘাত করার পর নির্বাসন দিয়েছেন। তেমনিভাবে হযরত আবূ বকর (রা.) এবং হযরত ওমর (রা.) সম্পর্কেও এমন বর্ণিত রয়েছে (তারা বেত্রাঘাত করার পর নির্বাসন দিয়েছেন)

আইম্মায়ে আহনাফ ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মাঝে এ বিষয়ে মতভেদের সারকথা হলো এই যে, ইমাম শাফেয়ী (র.) এর মতে অবিবাহিতের জেনার শাস্তির ক্ষেত্রে বেত্রাঘাতের সাথে নির্বাসন হদ্দ এর অংশ। আর আহনাফ এর মতে নির্বাসন হদ্দ এর অংশ নয় বরং এটা সাধারণ শাস্তি ও শাসন। শাসক উপকার মনে করলে তা দিতে পারেন।

https://e-ilm.weebly.com/

وَقَدْ عُرِفَ طَرِيْقُهُ فِيْ مَوْضِعِهِ. قَالَ اِلَّا اَنْ يَرَى الْاِمَامُ فِيْ ذٰلِكَ مَصْلَحَةً فَيُغَرِّبَهُ عَلٰى قَدْرِ مَا يَرٰى وَذٰلِكَ تَعْزِيْرٌ وَسِيَاسَةٌ؛ لِاَنَّهُ قَدْ يُفِيْدُ فِيْ بَعْضِ الْاَحْوَالِ فَيَكُوْنُ الرَّاْيُ فِيْهِ اِلَى الْاِمَامِ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ النَّفْيُ الْمَرْوِيُّ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ وَاِذَا زَنٰى الْمَرِيْضُ وَحَدُّهُ الرَّجْمُ رُجِمَ؛ لِاَنَّ الْاِتْلَافَ مُسْتَحَقٌّ فَلَا يَمْتَنِعُ بِسَبَبِ الْمَرَضِ وَاِنْ كَانَ حَدُّهُ الْجَلْدَ لَمْ يُجْلَدْ حَتّٰى يَبْرَاَ كَيْلَا يُفْضِيَ اِلَى الْهَلَاكِ وَلِهٰذَا لَا يُقَامُ الْقَطْعُ عِنْدَ شِدَّةِ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ ـ

অনুবাদ : আর আলোচ্য হাদীস রহিত হওয়ার বিষয়টি যথাস্থানে (নাসিখ-মানসূখ বিষয়ক শাস্ত্রে) আলোচিত হয়েছে। **তবে শাসক যদি নির্বাসনে উপকার মনে করেন তবে যে মেয়াদ উপযুক্ত বিবেচিত হয় সে মেয়াদের জন্য ব্যভিচারীকে নির্বাসন দিতে পারেন।** এটা (হদ্দ নয় বরং) সাধারণ শাস্তি ও শাসন। কেননা ক্ষেত্র বিশেষে এটি উপকারী হতে পারে। সুতরাং এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত শাসকের মতের উপর নির্ভর করবে। কোনো কোনো সহাবীর পক্ষ থেকে বর্ণিত নির্বাসন বিষয়ক হাদীস এই ব্যাখ্যার উপর প্রযোজ্য হবে।

অসুস্থ ব্যক্তি যদি জেনা করে আর তার হদ্দ যদি রজম হয় তাহলে তাকে রজম করা হবে। কেননা প্রাণনাশই হলো তার প্রাপ্য, সুতরাং অসুস্থতার কারণে শাস্তি স্থগিত হবে না। **আর যদি তার হদ্দ বেত্রাঘাত হয় তাহলে আরোগ্য লাভ পর্যন্ত বেত্রাঘাত করা হবে না।** যাতে তা প্রাণনাশ না ঘটায়। এ কারণেই চুরির ক্ষেত্রে প্রচণ্ড গরমে ও প্রচণ্ড শীতে হস্ত কর্তন করা হয় না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَاِذَا زَنَى الْمَرِيْضُ وَحَدُّهُ الرَّجْمُ رُجِمَ الخ

সারকথা : রজমের উদ্দেশ্য যেহেতু প্রাণনাশ, তাই অপরাধী এ ধরনের শাস্তি প্রাপ্য হলে অসুস্থাবস্থায়ও তাকে রজম করা হবে। অন্যদিকে বেত্রাঘাতের উদ্দেশ্য সাবধান ও সতর্ক করা। অতএব, যদি তাকে অসুস্থ অবস্থায় বেত্রাঘাত করা হয় তবে তার মৃত্যুর আশঙ্কা থেকে যায়। অথচ তার মৃত্যু কাম্য নয়; বরং সতর্ক করা ও বিরত রাখা কাম্য।

https://e-ilm.weebly.com/

وَاِذَا زَنَتِ الْحَامِلُ لَمْ تُحَدَّ حَتّٰى تَضَعَ حَمْلَهَا كَيْلَا يُؤَدِّيَ اِلٰى هَلَاكِ الْوَلَدِ وَهُوَ نَفْسٌ مُحْتَرَمَةٌ وَاِنْ كَانَ حَدُّهَا الْجَلْدَ لَمْ تُجْلَدْ حَتّٰى تَتَعَالٰى مِنْ نِفَاسِهَا اَيْ تَرْتَفِعَ يُرِيْدُ بِهٖ تَخْرُجَ مِنْهُ ؛ لِاَنَّ النِّفَاسَ نَوْعُ مَرَضٍ فَيُؤَخَّرُ اِلٰى زَمَانِ الْبُرْءِ . بِخِلَافِ الرَّجْمِ ؛ لِاَنَّ التَّاْخِيْرَ لِاَجْلِ الْوَلَدِ وَقَدْ اِنْفَصَلَ . وَعَنْ اَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ اَنَّهٗ يُؤَخَّرُ اِلٰى اَنْ يَسْتَغْنِيَ وَلَدُهَا عَنْهَا اِذَا لَمْ يَكُنْ اَحَدٌ يَقُوْمُ بِتَرْبِيَتِهٖ ؛ لِاَنَّ فِي التَّاْخِيْرِ صِيَانَةَ الْوَلَدِ عَنِ الضَّيَاعِ، وَقَدْ رُوِيَ ﴿اَنَّهٗ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ لِلْغَامِدِيَّةِ بَعْدَمَا وَضَعَتْ اِرْجِعِي حَتّٰى يَسْتَغْنِيَ وَلَدُكِ﴾ ثُمَّ الْحُبْلٰى تُحْبَسُ اِلٰى اَنْ تَلِدَ اِنْ كَانَ الْحَدُّ ثَابِتًا بِالْبَيِّنَةِ كَيْ لَا تَهْرُبَ، بِخِلَافِ الْاِقْرَارِ؛ لِاَنَّ الرُّجُوْعَ عَنْهُ عَامِلٌ فَلَا يُفِيْدُ الْحَبْسُ ـ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ ـ

অনুবাদ : গর্ভবতী যদি জেনা করে তাহলে প্রসবের পূর্বে হদ্দ কায়েম করা হবে না। যাতে তা সন্তানের মৃত্যুর কারণ না হয়ে দাঁড়ায়। কেননা সেটাতো সম্মানযোগ্য প্রাণ। **আর যদি তার হদ্দ হয় বেত্রাঘাত তাহলে নেফাস থেকে পবিত্র হওয়া পর্যন্ত বেত্রাঘাত করা হবে না।** কেননা নেফাস এক ধরনের অসুস্থতা। সুতরাং আরোগ্য লাভের সময় পর্যন্ত বিলম্বিত করা হবে। রজমের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা সেখানে বিলম্বের কারণ সন্তান। আর সেটা তো দেহচ্যুত হয়ে গেছে। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, সন্তান তার উপর নির্ভরশীলতা মুক্ত হওয়া পর্যন্ত বিলম্বিত করা হবে, যদি তার প্রতিপালনের দায়িত্ব গ্রহণের মতো কেউ না থাকে। কেননা এই বিলম্বে জীবন নাশ থেকে সন্তানকে রক্ষা করার বিষয় রয়েছে।

আরো বর্ণিত রয়েছে যে, প্রসবের পর গামেদিয়্যাহ মহিলা (রা.) কে নবী করীম ﷺ বলেছিলেন, ফিরে যাও এবং তোমার সন্তান তোমার উপর নির্ভরশীলতা থেকে মুক্ত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কর। আর হদ্দ যদি সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হয় তাহলে গর্ভবতীকে প্রসব পর্যন্ত আটক রাখা হবে যাতে সে পালিয়ে না যায়। স্বীকারোক্তির বিষয়টি ভিন্ন। কেননা স্বীকারোক্তিতে প্রত্যাহারের বিষয়টি কার্যকর। সুতরাং আটক রাখা অর্থহীন। আল্লাহই অধিক অবগত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

জ্ঞাতব্য, অসুস্থ জেনাকারীর শাস্তি বেত্রাঘাত, যদি তার আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা থাকে। জমহুর ফকীহগণের মতে আরোগ্য লাভের সময় পর্যন্ত তার শাস্তি বিলম্বিত করা হবে। তবে ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে তার শাস্তি বিলম্বিত করা হবে না। বরং অসুস্থাবস্থায়ই তাকে বেত্রাঘাত করা হবে। যেমন জন্মগত দুর্বল ব্যক্তির শাস্তি বিলম্বিত করা হয় না। যদিও বেত্রাঘাত সহ্য করার মতো তার শারিরীক শক্তি না থাকে। আইম্মায়ে আহনাফ, ইমাম শাফেয়ী (র.) ইমাম আহমদ (র.) এর মতে এমন (জন্মগত দুর্বল) ব্যক্তিকে সরু চিকন শত শাখার বেত একত্রিত করে একবার এমনভাবে আঘাত করা হবে যেন সবগুলো শাখার আঘাত একসাথে তার গায়ে লেগে যায়। এ শাস্তির দলিল হযরত সাইদ ইবনে সা'দ ইবনে উবাদা (রা.)-এর বর্ণিত হাদীস। তিনি বর্ণনা করেন, আমাদের মহল্লায় এক জন্মগত দুর্বল ব্যক্তি ছিল। সে এক মহিলার সাথে জেনা করে ফেলল। আমি এ ঘটনা নবী করীম ﷺ -এর কাছে বর্ণনা করলাম। নবীজী তাকে হদ্দ মারতে বললেন। লোকেরা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! সে এত দুর্বল যে এমন শাস্তি সে সহ্য করতে পারবে না। তখন নবীজী ﷺ শত সরু শাখার এক গোছা বেত একত্রিত করে একবার তাকে আঘাত করতে বললেন। তখন এমনই করা হলো। এ হাদীস ইমাম আহমদ (র.), ইমাম নাসয়ী (র.), ইমাম ইবনে মাজাহ (র.) ও ইমাম শাফেয়ী (র.) বর্ণনা করেন

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ الْوَطْيِ الَّذِي يُوجِبُ الْحَدَّ وَالَّذِى لَا يُوْجِبُهُ

قَالَ الْوَطْئُ الْمُوْجِبُ لِلْحَدِّ هُوَ الزِّنَاء وَاِنَّهُ فِيْ عُرْفِ الشَّرْعِ وَاللِّسَانِ : وَطْئُ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ فِي الْقُبُلِ فِيْ غَيْرِ الْمِلْكِ، وَشُبْهَةِ الْمِلْكِ لِاَنَّهُ فِعْلٌ مَحْظُوْرٌ، وَالْحُرْمَةُ عَلَى الْاِطْلَاقِ عِنْدَ التَّعَرِّي عَنِ الْمِلْكِ وَشُبْهَتِهِ، يُؤَيِّدُ ذٰلِكَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ "﴿اِدْرَءُوْا الْحُدُوْدَ بِالشُّبُهَاتِ﴾" ثُمَّ الشُّبْهَةُ نَوْعَانِ : شُبْهَةٌ فِي الْفِعْلِ وَتُسَمّٰى شُبْهَةَ اِشْتِبَاهٍ، وَشُبْهَةٌ فِي الْمَحَلِّ وَتُسَمّٰى شُبْهَةً حُكْمِيَّةً . فَالْاُوْلٰى تَتَحَقَّقُ فِيْ حَقِّ مَنْ اِشْتَبَهَ عَلَيْهِ؛ لِاَنَّ مَعْنَاهُ اَنْ يُظَنَّ غَيْرُ الدَّلِيْلِ دَلِيلًا وَلَا بُدَّ مِنَ الظَّنِّ لِيَتَحَقَّقَ الْاِشْتِبَاهُ . وَالثَّانِيَةُ تَتَحَقَّقُ بِقِيَامِ الدَّلِيْلِ النَّافِي لِلْحُرْمَةِ فِيْ ذَاتِهِ وَلَا تَتَوَقَّفُ عَلٰى ظَنِّ الْجَانِي وَاعْتِقَادِهِ . وَالْحَدُّ يَسْقُطُ بِالنَّوْعَيْنِ لِاِطْلَاقِ الْحَدِيْثِ . وَالنَّسَبُ يَثْبُتُ فِي الثَّانِيَةِ اِذَا ادَّعٰى الْوَلَدَ، وَلَا يَثْبُتُ فِي الْاُوْلٰى وَاِنْ اِدَّعَاهُ لِاَنَّ الْفِعْلَ تَمَحَّضَ زِنَاءً فِي الْاُوْلٰى؛ وَاِنَّمَا يَسْقُطُ الْحَدُّ لِاَمْرٍ رَاجِعٍ اِلَيْهِ وَهُوَ اِشْتِبَاهُ الْاَمْرِ عَلَيْهِ وَلَمْ يَتَمَحَّضْ فِي الثَّانِيَةِ

পরিচ্ছেদ : যে সঙ্গম হদ্দ ওয়াজিব করে এবং যেটি করে না

অনুবাদ : হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, **জেনা বা ব্যভিচার হচ্ছে হদ্দ ওয়াজিবকারী সঙ্গম**। আর অভিধানে ও শরিয়তের পরিভাষায় জেনা অর্থ মালিকানামুক্ত বা মালিকানার সন্দেহমুক্ত ক্ষেত্রে সম্মুখস্থ গুপ্তাঙ্গে পুরুষ কর্তৃক স্ত্রীলোকের সাথে যৌন সঙ্গম। কেননা এটা নিষিদ্ধ কর্ম। (সুতরাং হদ্দ ওয়াজিব হওয়ার জন্য তাতে পূর্ণতা আবশ্যক)। আর হারামত্বের পূর্ণতা হবে মালিকানা এবং মালিকানার সন্দেহ থেকে মুক্ত হওয়ার সময়। নবী করীম ﷺ -এর নিম্নোক্ত বাণী এটাকে সমর্থন করে, اِدْرَءُوْا الْحُدُوْدَ بِالشُّبُهَاتِ অর্থাৎ সন্দেহের কারণে হদ্দ রহিত করে দাও। আর সন্দেহের ক্ষেত্র দু'টি। প্রথমতঃ ব্যভিচার কর্মে সন্দেহ। এটাকে مشبهة اشتباه (বা হারামত্বের দ্বিধাজনিত সন্দেহ বলা হয়) দ্বিতীয়তঃ ব্যভিচারের পাত্রীতে [বা পাত্রে] সন্দেহ। এটাকে شُبْهَةٌ حُكْمِيَّةٌ (বা অধিকার জনিত সন্দেহ) বলা হয়।

প্রথমটি ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে সাব্যস্ত হবে, যে প্রমাণগত দ্বিধায় পড়েছে। অর্থাৎ অপ্রমাণকে প্রমাণ ভেবে নিয়েছে। অবশ্য এই দ্বিধা সাব্যস্ত হওয়ার জন্য প্রবল ধারণা বিদ্যমান হওয়া আবশ্যক।

দ্বিতীয়টি সাব্যস্ত হবে স্বকীয়ভাবে হারামত্ব নাকচকারী প্রমাণ বিদ্যমান থাকা দ্বারা। সেটা অপরাধকারীর ধারণার ও বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল হবে না। উভয় ক্ষেত্রেই হদ্দ রহিত হয়ে যায়। কেননা এ বিষয়ক হাদীসটি ব্যাপক।

আর সঙ্গমকারী যদি সন্তানের পিতৃত্ব দাবি করে, তাহলে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে নসব সাব্যস্ত হবে। কিন্তু প্রথম ক্ষেত্রে দাবি করলেও হবে না। কেননা প্রথম ক্ষেত্রে বিষয়টি খালেস জেনা, তবে হদ্দ রহিত হচ্ছে লোকটির সাথে সংশ্লিষ্ট একটি কারণে। আর সেটা হলো তার দৃষ্টিতে কথাটার হারামত্বের অস্পষ্টতা। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তা খালেস জেনা নয়।

https://e-ilm.weebly.com/

فَشُبْهَةُ الْفِعْلِ فِيْ ثَمَانِيَةِ مَوَاضِعَ : جَارِيَةُ اَبِيْهِ وَاُمِّهِ وَزَوْجَتِهِ، وَالْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ، وَبَائِنًا بِالطَّلَاقِ عَلٰى مَالٍ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ، وَاُمُّ وَلَدٍ اَعْتَقَهَا مَوْلَاهَا وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ، وَجَارِيَةُ الْمَوْلٰى فِي حَقِّ الْعَبْدِ، وَالْجَارِيَةُ الْمَرْهُوْنَةُ فِي حَقِّ الْمُرْتَهِنِ فِيْ رِوَايَةِ كِتَابِ الْحُدُوْدِ. فَفِيْ هٰذِهِ الْمَوَاضِعِ لَا حَدَّ عَلَيْهِ اِذَا قَالَ : ظَنَنْتُ اَنَّهَا تَحِلُّ لِي . وَلَوْ قَالَ عَلِمْتُ اَنَّهَا عَلَيَّ حَرَامٌ وَجَبَ الْحَدُّ . وَالشُّبْهَةُ فِي الْمَحَلِّ في سِتَّةِ مَوَاضِعَ : جَارِيَةُ اِبْنِهِ، وَالْمُطَلَّقَةُ طَلَاقًا بَائِنًا بِالْكِنَايَاتِ، وَالْجَارِيَةُ الْمَبِيْعَةُ فِيْ حَقِّ الْبَائِعِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ وَالْمَمْهُوْرَةُ فِي حَقِّ الزَّوْجِ قَبْلَ الْقَبْضِ، وَالْمُشْتَرِكَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ، وَالْمَرْهُوْنَةُ فِيْ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ فِيْ رِوَايَةِ كِتَابِ الرَّهْنِ . فَفِيْ هٰذِهِ الْمَوَاضِعِ لَا يَجِبُ الْحَدُّ وَاِنْ قَالَ عَلِمْت اَنَّهَا عَلَيَّ حَرَامٌ . ثُمَّ الشُّبْهَةُ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَثْبُتُ بِالْعَقْدِ وَاِنْ كَانَ مُتَّفَقًا عَلٰى تَحْرِيْمِهِ وَهُوَ عَالِمٌ بِهِ، وَعِنْدَ الْبَاقِينَ لَا تَثْبُتُ اِذَا عَلِمَ بِتَحْرِيْمِهِ، وَيَظْهَرُ ذٰلِكَ فِيْ نِكَاحِ الْمَحَارِمِ عَلٰى مَا يَاْتِيْكَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى ـ

অনুবাদ : ব্যভিচার কর্মে সন্দেহ হওয়ার ক্ষেত্র আটটি। যথা-পিতার (দাদার যত উর্ধ্বতন হোক) দাসী, মাতার দাসী, স্ত্রীর দাসী, ইদ্দত অবস্থায় তিন তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী, অর্থের বিনিময়ে প্রদত্ত তালাকের মাধ্যমে বায়েন তালাক প্রাপ্তা ইদ্দতরত স্ত্রী, মালিকের আজাদকৃত ইদ্দতরত অবস্থার উম্মে ওয়ালাদ, গোলামের জন্য মনিবের দাসী এবং কিতাবুল হুদূদের বর্ণনা মতে বন্ধক গ্রহণকারীর জন্য বন্ধকী দাসী।

এ সকল ক্ষেত্রে লোকটি যদি বলে, আমার প্রবল ধারণা ছিল যে, পাত্রীটি আমার জন্য হালাল, তা হলে তার উপর হদ্দ সাব্যস্ত হবে না। আর যদি বলে যে, আমি জানতাম পাত্রীটি আমার জন্য হারাম, তাহলে হদ্দ সাব্যস্ত হবে। পাত্রীতে সন্দেহ সাব্যস্ত হবে ছয়টি ক্ষেত্রে। যথা পুত্রের দাসী, অস্পষ্ট শব্দে প্রদত্ত বায়েন তালাক দ্বারা তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী, বিক্রেতার জন্য দখল হস্তান্তরের পূর্বে বিক্রিতা দাসী, স্বামীর জন্য বিবাহের মহর রূপে সাব্যস্ত দাসী স্ত্রী কর্তৃক দখল বুঝে নেওয়ার পূর্বে, দু'জনের শরীকানার দাসী এবং কিতাবুর রিহন -এর বর্ণনা মতে বন্ধক গ্রহণকারীর জন্য বন্ধকী দাসী। এ সকল ক্ষেত্রে লোকটি যদি বলে যে, আমি জানতাম, পাত্রীটি আমার জন্য হারাম, তবুও তার উপর হদ্দ ওয়াজিব হবে না।

ইমাম আবূ হানীফা (রা.) এর মতে আরো এক প্রকার সন্দেহ রয়েছে, যা বৈবাহিক আকদের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়। এমনকি যদিও আকদটির হারামত্ব সর্বসম্মত হয় এবং হারামত্ব সম্পর্কে লোকটি অবগত হয়। অন্যদের মতে লোকটি যদি আকদের হারামত্ব সম্পর্কে অবহিত থাকে তাহলে সন্দেহ সাব্যস্ত হবে না। এই মতপার্থক্যের ফলাফল মাহরামকে বিবাহ করার ক্ষেত্রে প্রকাশ পাবে। যার বিবরণ ইনশাআল্লাহ আসছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উল্লিখিত অংশটুকুতে কয়েকটি বিষয় বর্ণনা করা হলো। প্রথমতঃ শরিয়তের দৃষ্টিতে জেনা কি? তা বর্ণনা করে বলা হলো যে, জেনা বা ব্যভিচার হচ্ছে হদ্দ ওয়াজিবকারী সঙ্গম। এরপর বলা হলো যে, সহবাসে যদি বৈধতার কোনো প্রকার সন্দেহ দেখা যায়, চাই তা মালিকানা সাব্যস্ত হওয়ার সন্দেহ কিংবা বৈবাহিক সম্পর্কের সন্দেহ উভয় অবস্থায় জেনা সাব্যস্ত হবে না এবং জেনার হদ্দ ওয়াজিব হবে না। তারপর সন্দেহের ক্ষেত্রগুলো বর্ণনা করে কর্মে সন্দেহের সবগুলো দিক ও ব্যভিচারের পাত্র-পাত্রীতে সন্দেহের ক্ষেত্রগুলোও বিস্তারিত আলোচনা করা হলো। আরও বলা হয়েছে যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে আরেক প্রকার সন্দেহ রয়েছে যা বৈবাহিক আকদের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়, হিদায়া গ্রন্থকার তা পৃথকভাবে আলোচনা করেননি।

https://e-ilm.weebly.com/

إِذَا عَرَفْنَا هٰذَا وَمَنْ طَلَّقَ اِمْرَاَتَهٗ ثَلَاثًا ثُمَّ وَطِئَهَا فِي الْعِدَّةِ وَقَالَ عَلِمْتُ اَنَّهَا عَلَيَّ حَرَامٌ حُدَّ لِزَوَالِ الْمِلْكِ الْمُحَلَّلِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَتَكُوْنُ الشُّبْهَةُ مُنْتَفِيَةً وَقَدْ نَطَقَ الْكِتَابُ بِانْتِفَاءِ الْحِلِّ وَعَلٰى ذٰلِكَ الْاِجْمَاعُ، وَلَا يُعْتَبَرُ قَوْلُ الْمُخَالِفِ فِيْهِ؛ لِاَنَّهٗ خِلَافٌ لَا اِخْتِلَافٌ، وَلَوْ قَالَ : ظَنَنْتُ اَنَّهَا تَحِلُّ لِيْ لَا يُحَدُّ لِاَنَّ الظَّنَّ فِيْ مَوْضِعِهٖ لِاَنَّ اَثَرَ الْمِلْكِ قَائِمٌ فِي حَقِّ النَّسَبِ وَالْحَبْسِ وَالنَّفَقَةِ فَاعْتُبِرَ ظَنُّهٗ فِيْ اِسْقَاطِ الْحَدِّ، وَاُمُّ الْوَلَدِ اِذَا اَعْتَقَهَا مَوْلَاهَا وَالْمُخْتَلِعَةُ وَالْمُطَلَّقَةُ عَلٰى مَالٍ بِمَنْزِلَةِ الْمُطَلَّقَةِ الثَّلَاثَ لِثُبُوْتِ الْحُرْمَةِ بِالْاِجْمَاعِ وَقِيَامِ بَعْضِ الْاٰثَارِ فِي الْعِدَّةِ وَلَوْ قَالَ لَهَا : اَنْتِ خَلِيَّةٌ اَوْ بَرِيَّةٌ اَوْ اَمْرُكِ بِيَدِكِ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا ثُمَّ وَطِئَهَا فِي الْعِدَّةِ وَقَالَ : عَلِمْتُ اَنَّهَا عَلَيَّ حَرَامٌ لَمْ يُحَدَّ لِاخْتِلَافِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ فِيْهِ؛ فَمِنْ مَذْهَبِ عُمَرَ اَنَّهَا تَطْلِيْقَةٌ رَجْعِيَّةٌ،

অনুবাদ : সন্দেহের উভয় প্রকার যখন আমরা জানলাম। কেউ যদি স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদান করে, অতঃপর ইদ্দতের মধ্যে তার সাথে সহবাস করে আর বলে যে, আমি জানতাম যে, সে আমার জন্য হারাম। তাহলে তার উপর হদ্দ কার্যকর হবে। কেননা হালালকারী মালিকানা সর্বোতভাবে রহিত হয়ে গেছে। সুতরাং সন্দেহের সম্ভাবনা নাকচ হয়ে যাবে। আর কিতাবুল্লাহ এ ক্ষেত্রে হালালত্ব নাকচ হওয়ার স্পষ্ট ঘোষণা প্রদান করেছে এবং এর উপর ইজমা রয়েছে। এ ক্ষেত্রে বিরোধীর মত বিবেচ্য হবে না। কেননা এটা মতভিন্নতা নয় বরং বিরোধিতা। আর যদি বলে যে, আমি ধারণা করেছিলাম যে, সে আমার জন্য হালাল তাহলে হদ্দ জারি হবে না। কেননা ধারণাটি যথাস্থানে হয়েছে। এজন্য যে নসবের ক্ষেত্রে, গৃহত্যাগের নিষিদ্ধতার ক্ষেত্রে এবং নফ্কাহ (ভরণ পোষণ) ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে বিবাহগত মালিকানার জের অব্যাহত রয়েছে। সুতরাং হদ্দ রহিত করার পর্যায়ে তার ধারণা বিবেচ্য হবে।

মনিবের আজাদকৃত উম্মে ওয়ালাদ, খোলাকৃত স্ত্রী, অর্থের বিনিময়ে তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী তিন তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীর পর্যায়ভুক্ত হবে। কেননা এ সকল ক্ষেত্রে সর্বসম্মতিক্রমে হারামত্ব সাব্যস্ত হয়েছে। আবার ইদ্দতের অবস্থায় বিবাহগত মালিকানার কিছু চিহ্ন বিদ্যমান রয়েছে।

আর যদি স্বামী তার স্ত্রীকে [এভাবে প্রচ্ছন্ন তালাকের শব্দ] বলে, তুমি মুক্ত কিংবা তোমার বিষয় তোমার হাতে, আর তখন স্ত্রীও আত্ম-স্বাধীনতা গ্রহণ করল, অতঃপর ইদ্দতের অবস্থায় তার সাথে সহবাস করল আর বলল যে, আমি জানতাম যে, সে আমার জন্য হারাম। তবুও হদ্দ জারি করা হবে না। কেননা প্রচ্ছন্ন তালাকের বিষয়ে সাহাবা কেরামের মতভিন্নতা রয়েছে। হযরত ওমর (রা.) -এর মতে সেটি তালাকে রজয়ী।

https://e-ilm.weebly.com/

وَكَذَا الْجَوَابُ فِي سَائِرِ الْكِنَايَاتِ وَكَذَا إِذَا نَوَى ثَلَاثًا لِقِيَامِ الْاِخْتِلَافِ مَعَ ذٰلِكَ وَلَا حَدَّ عَلَى مَنْ وَطِئَ جَارِيَةَ وَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ وَإِنْ قَالَ : عَلِمْتُ أَنَّهَا عَلَيَّ حَرَامٌ لِأَنَّ الشُّبْهَةَ حُكْمِيَّةٌ لِأَنَّهَا نَشَأَتْ عَنْ دَلِيْلٍ وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ "﴿أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيْكَ﴾" وَالْاُبُوَّةُ قَائِمَةٌ فِيْ حَقِّ الْجَدِّ . قَالَ وَيَثْبُتُ النَّسَبُ مِنْهُ وَعَلَيْهِ قِيمَةُ الْجَارِيَةِ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ وَإِذَا وَطِئَ جَارِيَةَ أَبِيْهِ أَوْ أُمِّهِ أَوْ زَوْجَتِهِ وَقَالَ ظَنَنْتُ أَنَّهَا تَحِلُّ لِي فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى قَاذِفِهِ، وَإِنْ قَالَ : عَلِمْتُ أَنَّهَا عَلَيَّ حَرَامٌ حُدَّ، وَكَذَا الْعَبْدُ إِذَا وَطِئَ جَارِيَةَ مَوْلَاهُ لِأَنَّ بَيْنَ هٰؤُلَاءِ اِنْبِسَاطًا فِي الْاِنْتِفَاعِ فَظَنُّهُ فِي الْاِسْتِمْتَاعِ مُحْتَمَلٌ فَكَانَ شُبْهَةَ اِشْتِبَاهٍ إِلَّا أَنَّهُ زِنَاءٌ حَقِيْقَةً فَلَا يُحَدُّ قَاذِفُهُ، وَكَذَا إِذَا قَالَتِ الْجَارِيَةُ : ظَنَنْتُ أَنَّهُ يَحِلُّ لِيْ وَالْفَحْلُ لَمْ يَدَّعِ فِي الظَّاهِرِ لِأَنَّ الْفِعْلَ وَاحِدٌ ـ

অনুবাদ : অন্য সকল অস্পষ্ট শব্দের ক্ষেত্রে একই সিদ্ধান্ত। তদ্রূপ একই সিদ্ধান্ত হবে যদি [এই সকল প্রচ্ছন্ন শব্দ দ্বারা] তিন তালাকের নিয়ত করে থাকে। কেননা এ বিষয়েও মতভিন্নতা রয়েছে।

কেউ যদি সন্তানের বা সন্তানের সন্তানের দাসীর সাথে সহবাস করে, তাহলে তার উপর হদ্দ জারি হবে না। যদিও সে বলে যে, আমি জানতাম যে, সে আমার জন্য হারাম। শরিয়তের হুকুম অনুযায়ী এই সন্দেহটি যেহেতু সৃষ্টি হয়েছে দলিলের উপর ভিত্তি করে, তা হলো নবী করীম ﷺ এর হাদীস أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيْكَ তুমি ও তোমার সম্পদ তোমার পিতার। আর দাদার ক্ষেত্রেও পিতৃত্বের গুণগত দিক বিদ্যমান রয়েছে। আর তার সাথে নসব সাব্যস্ত হবে এবং তার জিম্মায় দাসীর মূল্য ওয়াজিব হবে। বিষয়টি ইতঃপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি।

যদি পিতার কিংবা মাতার অথবা স্ত্রীর দাসীর সাথে সঙ্গম করে আর বলে যে, আমার ধারণা ছিল যে, সে আমার জন্য হালাল, তাহলে তার উপর হদ্দ জারি হবে না। এবং তার বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপকারীর উপরও হদ্দুল কযফ [অপবাদ জনিত হদ্দ] জারি হবে না। আর যদি বলে যে, আমি জানতাম সে আমার জন্য হারাম, তাহলে তার উপর হদ্দ জারি হবে। তদ্রূপ একই সিদ্ধান্ত হবে যদি গোলাম মনিবের দাসীর সাথে সঙ্গম করে।

কেননা এদের মাঝে উপকার গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রশস্ততা রয়েছে। সুতরাং উপভোগের বৈধতাও সম্ভাবনা যুক্ত। কেননা এটা অস্পষ্টতা জনিত সন্দেহ। তবে যেহেতু প্রকৃতপক্ষে এটি জেনা সেহেতু তার নামে অপবাদ আরোপকারীর উপর হদ্দুল কাযফ জারি হবে না।

তদ্রূপ দাসী যদি বলে যে, আমি ধারণা করেছিলাম সে আমার জন্য হালাল। আর পুরুষটি হালালত্বের দাবি না করলেও জাহিরে রেওয়ায়েত মতে তার উপর হদ্দ জারি হবে না। কেননা ব্যভিচার কাজটি অভিন্ন। সুতরাং একজনের ক্ষেত্রে রহিত হলে অপরজনের ক্ষেত্রেও রহিত হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَلَا حَدَّ عَلَى مَنْ وَطِئَ جَارِيَةَ وَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ : যেহেতু [দলিল ভিত্তিক] সন্দেহের দ্বারা হদ্দ রহিত হয়, সেহেতু পিতা কিংবা পিতার পিতা যদি সন্তানের দাসী অথবা সন্তানের সন্তানের দাসীর সঙ্গে সহবাস করে তাহলে তার উপর হদ্দ জারি হবে না। কেননা এ ক্ষেত্রে বৈধতার দাবি দলিল নির্ভর। আর তা হলো নবী করীম ﷺ এর হাদীস أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيْكَ অর্থাৎ তুমি ও তোমার সম্পদ তোমার পিতার।

وَإِنْ وطِئَ جارِيَةَ أَخِيْهِ أَوْ عَمِّهِ وَقَالَ : ظَنَنْتُ أَنَّهَا تَحِلُّ لِيْ حُدَّ لِأَنَّهُ لَا انْبِسَاطَ فِي الْمَالِ فِيْمَا بَيْنَهُمَا وَكَذَا سَائِرُ الْمَحَارِمِ سِوَى الْوِلَادِ لِمَا بَيَّنَّا . وَمَنْ زُفَّتْ إِلَيْهِ غَيْرُ امْرَأَتِهِ وَقَالَتِ النِّسَاءُ : إِنَّهَا زَوْجَتُكَ فَوَطِئَهَا لَا حَدَّ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ الْمَهْرُ قَضَى بِذٰلِكَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَبِالْعِدَّةِ، وَلِأَنَّهُ اعْتَمَدَ دَلِيْلًا وَهُوَ الْإِخْبَارُ فِيْ مَوْضِعِ الِاشْتِبَاهِ، إِذِ الْإِنْسَانُ لَا يُمَيِّزُ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَبَيْنَ غَيْرِهَا فِيْ أَوَّلِ الْوَهْلَةِ فَصَارَ كَالْمَغْرُوْرِ، وَلَا يُحَدُّ قَاذِفُهُ إِلَّا فِيْ رِوَايَةٍ عَنْ أَبِيْ يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ لِأَنَّ الْمِلْكَ مُنْعَدِمٌ حَقِيْقَةً وَمَنْ وَجَدَ امْرَأَةً عَلٰى فِرَاشِهِ فَوَطِئَهَا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ لِأَنَّهُ لَا اشْتِبَاهَ بَعْدَ طُوْلِ الصُّحْبَةِ فَلَمْ يَكُنِ الظَّنُّ مُسْتَنِدًا إِلٰى دَلِيْلٍ، وَهٰذَا لِأَنَّهُ قَدْ يَنَامُ عَلٰى فِرَاشِهَا غَيْرُهَا مِنَ الْمَحَارِمِ الَّتِي فِيْ بَيْتِهَا، وَكَذَا إِذَا كَانَ أَعْمٰى لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ التَّمْيِيزُ بِالسُّؤَالِ وَغَيْرِهِ، إِلَّا إِنْ كَانَ دَعَاهَا فَأَجَابَتْهُ أَجْنَبِيَّةٌ وَقَالَتْ : أَنَا زَوْجَتُكَ فَوَاقَعَهَا لِأَنَّ الْإِخْبَارَ دَلِيْلٌ -

অনুবাদ : যদি নিজের ভাইয়ের বা চাচার দাসীর সাথে হালালত্বের ধারণার ভিত্তিতে সঙ্গম করে, তাহলে তার উপর হদ্দ জারি করা হবে।

কেননা তাদের সাথে সম্পদ ব্যবহারে প্রশস্ততা নেই। 'জন্ম সূত্র' ছাড়া অন্য সকল মাহরামের ক্ষেত্রে একই সিদ্ধান্ত হবে। কারণ সেটাই যা আমরা বর্ণনা করেছি- (আর্থাৎ পরস্পর-সম্পদ ব্যবহারে অপ্রশস্ততা)

যদি করো বাসর ঘরে স্ত্রী ছাড়া অন্য কোনো রমণীকে তুলে দিয়ে স্ত্রীলোকেরা বলে যে, এ তোমার বধু, ফলে সে তার সঙ্গে সহবাস করল। এমতাবস্থায় হদ্দ জারি হবে না। তার উপর মহর ধার্য হবে। এ ক্ষেত্রে হযরত আলী (রা.) মহর ধার্যের এবং সেই সাথে ইদ্দত পালনের ফয়সালা করেছেন। তাছাড়া এই কারণে যে, সে একটি প্রমাণের উপর নির্ভর করেছে। আর সেটা হলো অস্পষ্টতার ক্ষেত্রে প্রদত্ত সংবাদ। কেননা মানুষের প্রথম মুহূর্তেই নববধু ও অন্য রমণীর মাঝে পার্থক্য করে উঠতে পারে না। সুতরাং সে [বিবাহগত বা দেহসত্তাগত মালিকানার ভরসায় সহবাসকারী] ধোকাপ্রাপ্ত ব্যক্তির মতো হলো। আর তার নামে অপবাদ আরোপকারীর উপর হদ্দুল কযফ জারি হবে না। তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) হতে প্রাপ্ত এক বর্ণনা মতে জারি হবে। কেননা প্রকৃত পক্ষে এ ক্ষেত্রে মালিকানা রহিত।

কেউ যদি নিজের শয্যায় কোনো স্ত্রীলোককে পেয়ে সঙ্গম করে তাহলে তার উপর হদ্দ জারি হবে। কেননা দীর্ঘ সংস্পর্শের পর অস্পষ্টতার অবকাশ নেই। সুতরাং তার ভুল ধারণাটি প্রমাণ নির্ভর নয়।

এটা একারণে যে, স্ত্রীর শয্যায় বাড়ির অন্যান্য মাহরামের মধ্যে কেউ ঘুমিয়ে থাকতে পারে। একই সিদ্ধান্ত হবে যদি সহবাসকারী অন্ধ হয়। কেননা জিজ্ঞাসাবাদ বা অন্য কোনো উপায়ে পার্থক্য করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল।

তবে যদি আপন স্ত্রীকে আহ্বান করে আর অন্য কোনো স্ত্রী লোক ধরা দিয়ে বলে আমি তোমার স্ত্রী, ফলে সে তার সাথে সঙ্গম করল তাহলে হদ্দ জারি হবে না। কেননা প্রদত্ত সংবাদ প্রমাণ রূপে বিবেচ্য।

https://e-ilm.weebly.com/

وَمَنْ تَزَوَّجَ اِمْرَاَةً لَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا فَوَطِئَهَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ وَلٰكِنْ يُوجَعُ عُقُوْبَةً اِذَا كَانَ عَلِمَ بِذٰلِكَ . وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَالشَّافِعِيُّ : عَلَيْهِ الْحَدُّ اِذَا كَانَ عَالِمًا بِذٰلِكَ؛ لِاَنَّهُ عَقْدٌ لَمْ يُصَادِفْ مَحَلَّهُ فَيَلْغُوْ كَمَا اِذَا اُضِيْفَ اِلَى الذُّكُوْرِ، وَهٰذَا لِاَنَّ مَحَلَّ التَّصَرُّفِ مَا يَكُوْنُ مَحَلًّا لِحُكْمِهِ، وَحُكْمُهُ الْحِلُّ وَهِيَ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ . وَلِاَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ اَنَّ الْعَقْدَ صَادَفَ مَحَلَّهُ لِاَنَّ مَحَلَّ التَّصَرُّفِ مَا يَقْبَلُ مَقْصُوْدَهُ، وَالْاُنْثٰى مِنْ بَنَاتِ آدَمَ قَابِلَةٌ لِلتَّوَالُدِ وَهُوَ الْمَقْصُوْدُ، فَكَانَ يَنْبَغِي اَنْ يَنْعَقِدَ فِيْ حَقِّ جَمِيْعِ الْاَحْكَامِ اِلَّا اَنَّهُ تَقَاعَدَ عَنْ اِفَادَةِ حَقِيْقَةِ الْحِلِّ فَيُوْرِثُ الشُّبْهَةَ لِاَنَّ الشُّبْهَةَ مَا يُشْبِهُ الثَّابِتَ لَا نَفْسَ الثَّابِتِ، اِلَّا اَنَّهُ اِرْتَكَبَ جَرِيْمَةً وَلَيْسَ فِيْهَا حَدٌّ مُقَدَّرٌ فَيُعَزَّرُ ـ

অনুবাদ : কেউ যদি এমন নারীকে বিবাহ করে যাকে বিবাহ করা তার জন্য হালাল নয়, অতঃপর তার সঙ্গে সহবাস করে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তার উপর হদ্দ জারি করা হবে না। তবে যদি সে হারাম হওয়া সম্পর্কে অবগত থাকে, তাহলে তাকে কঠোর শাস্তি প্রদান করা হবে।

ইমাম আবূ ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, তার উপর হদ্দ জারি হবে, যদি সে এ বিষয়ে অবগত থাকে। কেননা এটা এমন এক বিবাহ চুক্তি, যা যথাস্থানে যুক্ত হয়নি, সুতরাং তা অকার্যকর হবে। যেমন কোনো পুরুষের দিকে আকদ সম্বন্ধিত হলে তা অকার্যকর হয়।

যথাস্থানে না হওয়ার কারণ এই যে, সেটাই হবে কার্যক্ষেত্রের যথাপাত্র যা কার্যের ফল বা বিধান গ্রহণের পাত্র হতে পারে। এখানে কার্যক্ষেত্রের ফল হচ্ছে সঙ্গম বৈধতা, অথচ স্ত্রীলোকটি মাহরামের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর দলিল এই যে, বিবাহ চুক্তি যথাস্থানে যুক্ত হয়েছে। কেননা সেটাই কার্যক্ষেত্রের যথাপাত্র যা কার্যের উদ্দেশ্যকে গ্রহণ করে। আর আদম কন্যা প্রজননে সক্ষম, যা বিবাহের উদ্দেশ্য। সুতরাং সকল বিধানের ক্ষেত্রেই-বিবাহ চুক্তিটি সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। কিন্তু শরিয়তের হারাম করার কারণে প্রকৃত হালালত্ব সংশোধনে তা ব্যর্থ হয়েছে। সুতরাং চুক্তিটি সন্দেহ জন্ম দিয়েছে। কেননা সন্দেহযুক্ত অর্থই হলো যা স্বয়ং সাব্যস্ত নয় কিন্তু সাব্যস্তের সদৃশ।

কিন্তু সে একটি অপরাধ করেছে যার জন্য নির্ধারিত কোনো হদ্দ নেই। সুতরাং তার উপর ভিন্নভাবে শাস্তির বিধান করা হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

জ্ঞাতব্য যে, আল খুলাসাহ এবং জামিউর রুমূয কিতাবদ্বয়ে উল্লেখ রয়েছে যে, মাহরাম নারীকে বিবাহ করে তার সাথে সহবাস করলে, সাহেবাইনের মতের উপর ফতোয়া হবে। অর্থাৎ তার উপর হদ্দ জারি করা হবে।

কিন্তু ভাষ্য কিতাবসমূহে ইমাম আবূ হানীফা (রা.)-এর এ মতকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এদিক বিবেচনা করে কুদূরী গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, এ ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (রা.) এর মতের উপর ফতোয়া দেওয়াই উত্তম। কেউ কেউ বলেন, তার শাস্তি হত্যা হওয়া উচিত।

এর সপক্ষে দলিল, হযরত আনাস (রা.) এর হাদীস। তিনি বলেন যে, রাসূল ﷺ আমার মামা আবূ বুরদা বিন নিয়াজ এর হাতে ঝাণ্ডা দিয়ে বললেন যাও, যে ব্যক্তি নিজ পিতার স্ত্রী [সৎ মা] কে বিবাহ করে তার মাথা কেটে আন। ইমাম তিরমিযী ও অন্যান্যরা এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

স্ত্রী ছাড়া অন্য রমণীর কিংবা নিজ দাসীর গুহ্যদ্বারে সঙ্গম করলে এমন শাস্তির কথা 'দুরার' ও অন্যান্য কিতাবে উল্লেখ রয়েছে। অতএব, মা-বোন কিংবা অন্য কোনো মাহরাম নারীর সাথে এমন নির্লজ্জ কাজের তো এমন শাস্তিই যুক্তিযুক্ত।

https://e-ilm.weebly.com/

ইমাম শাফেয়ী (র.) বর্ণিত হাদীসটি রাষ্ট্রীয় শাসনের ক্ষেত্রে কিংবা এটাকে হালাল বিশ্বাসকারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মতে আমাদের উপরে বর্ণিত কারণে তাকে শাস্তি প্রদান করা হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যদি কেউ নিজ গোলাম কিংবা দাসী অথবা স্ত্রীর সাথে [যদি ও ফাসেদ বিবাহ হয়] গুহ্যদ্বারে সঙ্গম করে তবে সকল ইমামগণের ঐকমত্যে তার উপর কোনো হদ্দ ওয়াজিব হবে না। তবে এ কাজ অবশ্যই হারাম। আর স্ত্রী ছাড়া অন্য কারো সাথে গুহ্যদ্বারে সহবাস করে তবে তার উপর অবশ্যই শাস্তি ওয়াজিব হবে। কেননা কাজটি শরিয়ত, সুস্থ বিবেক এবং রুচি বিবর্জিত ঘৃণ্য ও অরুচিকর কাজ। এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের ঐকমত্য রয়েছে। হযরত সাঈদ বিন ইয়াসার (রা.) বর্ণনা করেন যে, হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর কাছে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, হযরত! আমরা দাসী ক্রয় করে তার সাথ তাহমীয করি। এ ব্যাপারে শরিয়ত কি বলে? তিনি জিজ্ঞাসা করলেন তা কি? বলা হলো যে, তা হলো গুহ্যদ্বারে সঙ্গম করা। তিনি আশ্চর্য হয়ে বললেন, মুসলমান কি এমন কাজ করতে পারে? –[নাসায়ী শরীফ]

হযরত নাফে' (র.) কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, আপনি নাকি হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, মহিলাদের গুহ্যদ্বারে সঙ্গম করা জায়েজ? হযরত নাফে! (র.) তখন বললেন, আল্লাহর কসম! ওরা আমার উপর অপবাদ দিয়েছে। [নাসায়ী শরীফ]

হযরত আবূ বকর (রা.) সমকামী দুজনকে দেওয়াল ধ্বসিয়ে হত্যা করেন। হযরত ওমর (রা.) এমন দু'জনকে তরবারি দিয়ে হত্যা করে আগুনে পুড়িয়ে মারার আদেশ দেন। ইমাম বায়হাকী (র.) নিজ মুরসাল রেওয়ায়েতে এমন দুজনকে পুড়িয়ে মারার ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের ঐকমত্য বর্ণনা করেন।

https://e-ilm.weebly.com/

وَلَوْ غزا مَنْ له وِلَايَةُ الْإِقَامَةِ بِنَفْسِهِ كَالْخَلِيْفَةِ وَاَمِيْرِ مِصْرٍ يُقِيْمُ الْحَدَّ عَلٰى مَنْ زَنٰى فِيْ مُعَسْكَرِهٖ لِاَنَّهٗ تَحْتَ يَدِهٖ، بِخِلَافِ اَمِيْرِ الْعَسْكَرِ وَالسَّرِيَّةِ لِاَنَّهٗ لَمْ تُفَوَّضْ اِلَيْهِمَا الْاِقَامَةُ.

وَاِذَا دخَل حرْبِيٌّ دَارَنَا بِاَمَانٍ فَزَنٰى بِذِمِّيَّةٍ اَوْ زَنٰى ذِمِّيٌّ بِحَرْبِيَّةٍ يُحَدُّ الذِّمِّيُّ وَالذِّمِّيَّةُ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ، وَلَا يُحَدُّ الْحَرْبِيُّ وَالْحَرْبِيَّةُ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ فِي الذِّمِّيِّ يَعْنِيْ اِذَا زَنٰى بِحَرْبِيَّةٍ، فَاَمَّا اِذَا زَنٰى الْحَرْبِيُّ بِذِمِّيَّةٍ لَا يُحَدَّانِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ وَهُوَ قَوْلُ اَبِيْ يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ اَوَّلًا وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ : يُحَدُّوْنَ كُلُّهُمْ وَهُوَ قَوْلُهُ الْاٰخَرُ.

অনুবাদ : নিজে হদ্দ কায়েমের ক্ষমতাধিকারী কেউ যদি বাহিনী সহ অভিযানে বের হয়, যেমন স্বয়ং খলিফা কিংবা শহরের শাসক; তাহলে তার বাহিনীর কেউ জেনা করলে তিনি তার উপর হদ্দ কায়েম করবেন। কেননা সে তার কর্তৃত্বাধীন রয়েছে। পক্ষান্তরে, বাহিনী প্রধান কিংবা সৈন্যদল প্রধান তা পারবে না। কেননা তাদের হাতে হদ্দ কায়েম করার ক্ষমতা অর্পণ করা হয়নি।

কোনো হারবি যদি নিরাপত্তা নিয়ে আমাদের দারুল ইসলামে আসে এবং কোনো জিম্মি নারীর সাথে জেনা করে কিংবা কোনো জিম্মি যদি নিরাপত্তা গ্রহণকারিণী কোনো হারবিয়ার সাথে জেনা করে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মতে জিম্মি ও জিম্মিয়াকে হদ্দ কায়েম করা হবে। কিন্তু হারবি ও হারবিয়ার হদ্দ কায়েম করা হবে না। জিম্মির ব্যাপারে ইমাম মুহাম্মদ (রা.)-এরও এই অভিমত, অর্থাৎ সে যদি হারবিয়ার সাথে জেনা করে।

পক্ষান্তরে হারবি যদি জিম্মি নারীর সাথে জেনা করে তাহলে ইমাম মুহাম্মদ (রা.)-এর মতে তাদের উপর হদ্দ কায়েম হবে না। প্রথম দিকে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এরও এই অভিমত ছিল।

আর ইমাম আবূ ইউসুফ (রা.) বলেন, সকলের উপরই [সর্বাবস্থায়] হদ্দ কায়েম করা হবে। এ হলো তার শেষ মতামত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

হিদায়া গ্রন্থকারের কথা থেকে বুঝা যায় যে, বাহিনী প্রধান কিংবা সৈন্যদল প্রধানকে শাসকের পক্ষ থেকে যদি হদ্দ কায়েমের অনুমতি দেওয়া হয় তবে তারা তা করতে পারবেন।

আহনাফ-এর বর্ণিত হাদীস لا يقام الحدود فى دار الحرب সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন যে, হাদীসটি মারফূ' নয়। বরং এটি হযরত জায়েদ বিন সাবিত (রা.) এর অভিমত।

আমাদরে দাবির পক্ষে আরো একটি দলিল এই যে, হযরত ওমর (রা.) নিজ 'আমেল' [গভর্নর] দের চিঠির মাধ্যমে জানিয়েছেন যে, দারুল হরবে কোনো মুসলমানের উপর হদ্দ কায়েম করবে না। ইবনে আবী শায়বা এটি বর্ণনা করেন। আর হযরত ওমর (রা.) এর এ আদেশ যেহেতু সাহাবায়ে কেরামের পরামর্শক্রমে ছিল। সেহেতু তা ভিন্ন এক হাদীস এর পর্যায়ভুক্ত; শুধু তা-ই নয়, বরং সাহাবা কেরামের ইজমা হিসেবে তা ভিন্ন এক দলিল। ইবনে আবী শাইবা হযরত আবূ দারদা (রা.) থেকেও এমন এক বর্ণনা করেছেন। হযরত বুসর বিন আরতাত (রা.) এর বর্ণিত এক হাদীসে রয়েছে যে, নবী করীম ﷺ বলতেন, জিহাদে চোরের হাত কাটা যাবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

لِاَبِيْ يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ اَنَّ الْمُسْتَاْمَنَ اِلْتَزَمَ اَحْكَامَنَا مُدَّةَ مُقَامِهٖ فِيْ دَارِنَا فِي الْمُعَامَلَاتِ، كَمَا اَنَّ الذِّمِّيَّ اِلْتَزَمَهَا مُدَّةَ عُمْرِهٖ وَلِهٰذَا يُحَدُّ حَدَّ الْقَذْفِ وَيُقْتَلُ قِصَاصًا، بِخِلَافِ حَدِّ الشُّرْبِ لِاَنَّهٗ يَعْتَقِدُ اِبَاحَتَهٗ . وَلَهُمَا اَنَّهٗ مَا دَخَلَ لِلْقَرَارِ بَلْ لِحَاجَةٍ كَالتِّجَارَةِ وَنَحْوِهَا فَلَمْ يَصِرْ مِنْ اَهْلِ دَارِنَا وَلِهٰذَا يُمَكَّنُ مِنَ الرُّجُوْعِ اِلٰى دَارِ الْحَرْبِ وَلَا يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ وَلَا الذِّمِّيُّ بِهٖ، وَاِنَّمَا اِلْتَزَمَ مِنَ الْحُكْمِ مَا يَرْجِعُ اِلٰى تَحْصِيْلِ مَقْصُوْدِهٖ وَهُوَ حُقُوْقُ الْعِبَادِ؛ لِاَنَّهٗ لَمَّا طَمِعَ فِي الْاِنْصَافِ يَلْتَزِمُ الْاِنْتِصَافَ، وَالْقِصَاصُ وَحَدُّ الْقَذْفِ مِنْ حُقُوْقِهِمْ، اَمَّا حَدُّ الزِّنَاءِ فَمَحْضُ حَقِّ الشَّرْعِ .وَلِمُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ وَهُوَ الْفَرْقُ اَنَّ الْاَصْلَ فِي بَابِ الزِّنَا فِعْلُ الرَّجُلِ وَالْمَرْاَةُ تَابِعَةٌ لَهٗ عَلٰى مَا نَذْكُرُهٗ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى . فَامْتِنَاعُ الْحَدِّ فِيْ حَقِّ الْاَصْلِ يُوْجِبُ اِمْتِنَاعَهٗ فِيْ حَقِّ التَّبَعِ، اَمَّا الِامْتِنَاعُ فِيْ حَقِّ التَّبَعِ لَا يُوْجِبُ الِامْتِنَاعَ فِيْ حَقِّ الْاَصْلِ .

অনুবাদ : ইমাম আবূ ইউসুফ (রা.)-এর দলিল এই যে, নিরাপত্তা গ্রহণকারী হারবি আমাদের দারুল ইসলামে অবস্থান কাল পর্যন্ত কার্যকরী বিষয়ে আমাদের যাবতীয় আহকাম ও বিধানসমূহ পালনের বাধ্যবাধকতা গ্রহণ করেছে। যেমন জিম্মি সারা জীবনের জন্য ঐ বাধ্যবাধকতা গ্রহণ করেছে। একারণেই তার উপর হদ্দুল কযফ (অপবাদের হদ্দ) প্রয়োগ করা হয় এবং কিসাসের ভিত্তিতে কতল করা হয়। মদপানের হদ্দের বিষয়টি অবশ্য ভিন্ন। কেননা সে এর বৈধতায় বিশ্বাসী।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর দলিল এই যে, সে স্থায়ী বসবাসের জন্য প্রবেশ করেনি। বরং ব্যবসা ইত্যাদি সাময়িক প্রয়োজনে প্রবেশ করেছে। সুতরাং সে দারুল ইসলামভুক্ত হয়নি। এ কারণেই সে দারুল হরবে ফিরে যেতে সক্ষম। এবং তাকে হত্যার কারণে মুসলমান বা জিম্মিকে কিসাস স্বরূপ হত্যা করা হয় না। কেননা সে ঐ সমস্ত বিধানের দায় গ্রহণ করেছে, যা তার উদ্দেশ্য সাধনের সাথে সম্পৃক্ত। আর সেগুলো হচ্ছে বান্দার হকসমূহ। কেননা সে যখন অনুকূল ইনসাফের আশা করছে তখন প্রতিকূল ইনসাফেরও দায় গ্রহণ করবে। আর কিসাস ও হদ্দুল কযফ হচ্ছে বান্দার হক। পক্ষান্তরে জেনার হদ্দ হচ্ছে শরিয়তের হক।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর দলিল হলো [জিম্মি ও জিম্মিয়ার মাঝে] পার্থক্য থাকা। কেননা জেনার ক্ষেত্রে মূল হচ্ছে পুরুষের ক্রিয়া-কাণ্ড, স্ত্রী লোকটি তার অনুগামী মাত্র। যা আমরা অচিরেই আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। সুতরাং মূলের ক্ষেত্রে হদ্দ রহিত হওয়া অনুগামীর ক্ষেত্রে রহিত হওয়া দাবি করে। পক্ষান্তরে অনুগামীর ক্ষেত্রে রহিত হওয়া মূলের ক্ষেত্রে রহিত হওয়া দাবি করে না।

https://e-ilm.weebly.com/

نَظِيْرُهُ إِذَا زَنَى الْبَالِغُ بِصَبِيَّةٍ أَوْ مَجْنُوْنَةٍ وَتَمْكِيْنُ الْبَالِغَةِ مِنَ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُوْنِ وَلِأَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ فِيْهِ أَنَّ فِعْلَ الْحَرْبِيِّ الْمُسْتَأْمَنِ زِنَاءٌ لِأَنَّهُ مُخَاطَبٌ بِالْحُرُمَاتِ عَلٰى مَا هُوَ الصَّحِيْحُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُخَاطَبًا بِالشَّرَائِعِ عَلٰى أَصْلِنَا وَالتَّمْكِيْنُ مِنْ فِعْلٍ هُوَ زِنَاءٌ مُوْجِبٌ لِلْحَدِّ عَلَيْهَا، بِخِلَافِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُوْنِ لِأَنَّهُمَا لَا يُخَاطَبَانِ، وَنَظِيْرُ هٰذَا الْاِخْتِلَافِ إِذَا زَنَى الْمُكْرَهُ بِالْمُطَاوِعَةِ تُحَدُّ الْمُطَاوِعَةُ عِنْدَهُ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ لَا تُحَدُّ قَالَ وَإِذَا زَنَى الصَّبِيُّ أَوِ الْمَجْنُوْنُ بِامْرَأَةٍ طَاوَعَتْهُ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهَا وَقَالَ زُفَرُ وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى : يَجِبُ الْحَدُّ عَلَيْهَا، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِيْ يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَإِنْ زَنَى صَحِيْحٌ بِمَجْنُوْنَةٍ أَوْ صَغِيْرَةٍ يُجَامَعُ مِثْلُهَا حُدَّ الرَّجُلُ خَاصَّةً وَهٰذَا بِالْإِجْمَاعِ .

এর উদাহরণ হলো প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি যদি বালিকা কিংবা বিকৃত মস্তিষ্ক নারীর সাথে জেনা করে [তবে পুরুষের উপর হদ্দ কায়েম করা হবে ।] এবং প্রাপ্ত বয়স্কা যদি বালককে অথবা-বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তিকে সুযোগ দান করে [তবে কারো উপর হদ্দ কায়েম করা হয় না] ।

হারবি সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর দলিল এই যে, নিরাপত্তা প্রাপ্ত হারবির কর্মটি জেনা [রূপেই বিবেচ্য] । কেননা বিশুদ্ধ মতে সে যাবতীয় আদেশ নিষেধ গ্রহণের সম্বোধন পাত্র, যদিও আমাদের মূলনীতি অনুযায়ী বিধানসমূহ পালনের সম্বোধন পাত্র সে নয় । আর নিজের সাথে জেনা করার সুযোগ দান স্ত্রীলোকটির উপর হদ্দ ওয়াজিবকারী বিষয় । বালক ও বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তির বিষয়টি ভিন্ন । কেননা তারা শরিয়তের সম্বোধন পাত্র নয় ।

এই মতপার্থক্যের উদাহরণ এই যে, বল প্রয়োগকৃত ব্যক্তি যখন ইচ্ছুক নারীর সাথে জেনা করে তখন ইমাম আবূ হানীফা (রা.)-এর মতে ইচ্ছুক নারীর উপর হদ্দ জারি হয় । কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে তার উপর হদ্দ জারি হয় না ।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, **নিজেই উৎসাহ দান করেছেন এমন কোনো নারীর সাথে যদি বালক বা বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তি জেনা করে তাহলে তার উপর এবং উক্ত নারীর উপর হদ্দ ওয়াজিব হবে না।** ইমাম যুফার (র.) ও ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, উক্ত নারীর উপর হদ্দ ওয়াজিব হবে । ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকেও এরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে ।

আর যদি সুস্থ মস্তিষ্ক কোনো ব্যক্তি বিকৃত মস্তিষ্ক কোনো নারীর সাথে কিংবা অনুরূপ বালিকা যাকে সঙ্গম করা যেতে পারে, তার সাথে জেনা করে তাহলে শুধু পুরুষটির উপর হদ্দ কায়েম করা হবে। এ সিদ্ধান্ত সর্বসম্মত ।

https://e-ilm.weebly.com/

لَهُمَا اَنَّ الْعُذْرَ مِنْ جَانِبِهَا لَا يُوْجِبُ سُقُوْطَ الْحَدِّ مِنْ جَانِبِهِ فَكَذَا الْعُذْرُ مِنْ جَانِبِهِ، وَهٰذَا لِاَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مُؤَاخَذٌ بِفِعْلِهِ . وَلَنَا اَنَّ فِعْلَ الزِّنَاءِ يَتَحَقَّقُ مِنْهُ، وَاِنَّمَا هِيَ مَحَلُّ الْفِعْلِ وَلِهٰذَا يُسَمَّى هُوَ وَاطِئًا وَزَانِيًا وَالْمَرْاَةُ مَوْطُوْءَةً وَمَزْنِيًّا بِهَا، اِلَّا اَنَّهَا سُمِّيَتْ زَانِيَةً مَجَازًا تَسْمِيَةً لِلْمَفْعُوْلِ بِاسْمِ الْفَاعِلِ كَالرَّاضِيَةِ فِيْ مَعْنَى الْمَرْضِيَّةِ، اَوْ لِكَوْنِهَا مُسَبِّبَةً بِالتَّمْكِيْنِ فَيَتَعَلَّقُ الْحَدُّ فِيْ حَقِّهَا بِالتَّمْكِيْنِ مِنْ قَبِيْحِ الزِّنَا وَهُوَ فِعْلُ مَنْ هُوَ مُخَاطَبٌ بِالْكَفِّ عَنْهُ وَمُؤْثَمٌ عَلَى مُبَاشَرَتِهِ، وَفِعْلُ الصَّبِيِّ لَيْسَ بِهٰذِهِ الصِّفَةِ فَلَا يُنَاطُ بِهِ الْحَدُّ قَالَ وَمَنْ اَكْرَهَهُ السُّلْطَانُ حَتّٰى زَنٰى فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَكَانَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ يَقُوْلُ اَوَّلًا يُحَدُّ، وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ لِاَنَّ الزِّنَاءَ مِنَ الرَّجُلِ لَا يَكُوْنُ اِلَّا بَعْدَ اِنْتِشَارِ الْاٰلَةِ وَذٰلِكَ دَلِيْلُ الطَّوَاعِيَةِ . ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ فَقَالَ : لَا حَدَّ عَلَيْهِ لِاَنَّ سَبَبَهُ الْمُلْجِئَ قَائِمٌ ظَاهِرًا، وَالْاِنْتِشَارُ دَلِيْلٌ مُتَرَدِّدٌ لِاَنَّهُ قَدْ يَكُوْنُ غَيْرَ قَصْدٍ لِاَنَّ الْاِنْتِشَارَ قَدْ يَكُوْنُ طَبْعًا لَا طَوْعًا كَمَا فِي النَّائِمِ فَاَوْرَثَ شُبْهَةً،

অনুবাদ : ইমাম যুফার (র.) ও ইমাম শাফেয়ী (রা.) এর দলিল এই যে, নারীর পক্ষ থেকে বিদ্যমান ওজর পুরুষের উপর থেকে হদ্দ রহিত হওয়া সাব্যস্ত করে না। তদ্রূপ পুরুষের পক্ষ হতে বিদ্যমান ওজর নারীর উপর থেকে হদ্দ রহিত হওয়া সাব্যস্ত করে না। এটা এ জন্য যে, উভয়ের প্রত্যেকে স্ব-স্ব কর্মের জন্য দায়ী।

আমাদের দলিল এই যে, জেনার কর্মটি পুরুষ থেকে সম্পন্ন হয়ে থাকে। আর নারী নিছক ব্যভিচার কর্মের স্থল। এ কারণেই পুরুষকে وَاطِئٌ [সহবাসকারী], زَانِىْ [জেনাকারী] পক্ষান্তরে স্ত্রী লোকটিকে مَوْطُوْءَةٌ [যার সাথে সহবাস করা হয়েছে] বলা হয় এবং مَزْنِىْ بِهَا [যার সাথে জেনা করা হয়েছে] বলা হয়। অবশ্য কর্মকারকের জন্য কর্তৃকারকের শব্দ প্রয়োগের ভিত্তিতে রূপক অর্থে নারীকেও زَانِيَةٌ [জেনাকারিণী] বলা হয়। যেমন مرضية অর্থে رَاضِيَة শব্দের প্রয়োগ কিংবা এই ভিত্তিতে যে, সুযোগ দানের মাধ্যমে সে জেনার কারণ হয়েছে। সুতরাং তার ক্ষেত্রে হদ্দ সম্পৃক্ত হবে জেনার ঘৃণ্য কাজের সুযোগ দানের কারণে। আর জেনা হচ্ছে এমন ব্যক্তির কর্ম যে তা থেকে বিরত থাকার সম্বোধন পাত্র এবং তা সম্পন্ন করার কারণে সে গুনাহগার হয়। অথচ বালকের [তদ্রূপ বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তির] কর্ম অনুরূপ গুণযুক্ত নয়। সুতরাং উক্ত কর্মের সাথে হদ্দ সম্পৃক্ত হবে না।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, **কেউ যদি সুলতানের (শাসকের) বল প্রয়োগের ফলে বাধ্য হয়ে জেনা করে তাহলে তার উপর হদ্দ জারি করা হবে না।**

প্রথম দিকে ইমাম আবূ হানীফা (র.) হদ্দ কায়েমের পক্ষে মত প্রকাশ করেছিলেন। ইমাম যুফার (রা.)-এরও এ অভিমত। কেননা লিঙ্গ উত্থান ছাড়া পুরুষের পক্ষ থেকে জেনা সম্পন্ন হতে পারে না। আর তা স্বেচ্ছা প্রণোদিত হওয়ার প্রমাণ। অতঃপর তিনি সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে হদ্দ কায়েম না হওয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন। কেননা বাধ্যকারী কারণ প্রকাশ্যরূপে বিদ্যমান রয়েছে।

পক্ষান্তরে লিঙ্গ উত্থান হচ্ছে দ্বিধাপূর্ণ প্রমাণ। কেননা অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রকৃতিগত কারণেও তা হতে পারে। যেমন ঘুমন্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে। সুতরাং বিষয়টি সন্দেহের উদ্রেক করে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَإِنْ أَكْرَهَهُ غَيْرُ السُّلْطَانِ حُدَّ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ، وَقَالَا : لَا يُحَدُّ لِأَنَّ الْإِكْرَاهَ عِنْدَهُمَا قَدْ يَتَحَقَّقُ مِنْ غَيْرِ السُّلْطَانِ؛ لِأَنَّ الْمُؤَثِّرَ خَوْفُ الْهَلَاكِ وَأَنَّهُ يَتَحَقَّقُ مِنْ غَيْرِهِ. وَلَهُ أَنَّ الْإِكْرَاهَ مِنْ غَيْرِهِ لَا يَدُوْمُ إِلَّا نَادِرًا لِتَمَكُّنِهِ مِنَ الْإِسْتِعَانَةِ بِالسُّلْطَانِ أَوْ بِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِيْنَ، وَيُمْكِنُهُ دَفْعُهُ بِنَفْسِهِ بِالسِّلَاحِ، وَالنَّادِرُ لَا حُكْمَ لَهُ فَلَا يَسْقُطُ بِهِ الْحَدُّ، بِخِلَافِ السُّلْطَانِ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ الْإِسْتِعَانَةُ بِغَيْرِهِ وَلَا الْخُرُوْجُ بِالسِّلَاحِ عَلَيْهِ فَافْتَرَقَا

وَمَنْ أَقَرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فِيْ مَجَالِسَ مُخْتَلِفَةٍ أَنَّهُ زَنٰى بِفُلَانَةٍ وَقَالَتْ هِيَ : تَزَوَّجَنِي أَوْ أَقَرَّتْ بِالزِّنَاءِ وَقَالَ الرَّجُلُ تَزَوَّجْتُهَا فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ الْمَهْرُ فِيْ ذٰلِكَ لِأَنَّ دَعْوَى النِّكَاحِ يَحْتَمِلُ الصِّدْقَ وَهُوَ يَقُوْمُ بِالطَّرَفَيْنِ فَأَوْرَثَ شُبْهَةً، وَإِذَا سَقَطَ الْحَدُّ وَجَبَ الْمَهْرُ تَعْظِيْمًا لِخَطَرِ الْبُضْعِ ـ

অনুবাদ : সুলতান ছাড়া অন্য কোনো ক্ষমতাবান ব্যক্তি যদি বল প্রয়োগ করে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তার উপর হদ্দ জারি হবে। সাহেবাইন বলেন, হদ্দ জারি হবে না। কেননা তাদের মতে সুলতান ছাড়া অন্যদের থেকেও বল প্রয়োগ হতে পারে। কারণ মূল ভূমিকা হলো প্রাণনাশের আশঙ্কা। আর তা সুলতান ছাড়া অন্যদের দ্বারাও সাব্যস্ত হতে পারে।

ইমাম আবূ হানীফা (রা.)-এর দলিল এই যে, অন্য কারো থেকে বল প্রয়োগ স্থায়ী হওয়া অতি বিরল। কেননা সুলতানের সাহায্য গ্রহণ কিংবা মুসলমানদের জামাত থেকে সাহায্য গ্রহণ করা তার পক্ষে সম্ভব। তদ্রূপ নিজের পক্ষেও অস্ত্রের সাহায্যে তাকে প্রতিরোধ করা সম্ভব। আর বিরল অবস্থার উপর কোনো হুকুম হয় না। সুতরাং তা দ্বারা হদ্দ রহিত হবে না। আর সুলতানের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা অন্য কারো কাছ থেকে সাহায্য গ্রহণ কিংবা নিজে তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ সম্ভব নয়। সুতরাং বিষয় দু'টি পার্থক্য পূর্ণ হয়ে গেল।

কেউ যদি বিভিন্ন মজলিসে চারবার স্বীকারোক্তি করে যে, সে অমুক নারীর সাথে জেনা করেছে, অথচ স্ত্রীলোকটি বলে যে, সে আমাকে বিবাহ করেছে। কিংবা স্ত্রীলোকটি জেনার কথা স্বীকার করে আর লোকটি বলে যে, আমি তাকে বিবাহ করেছি, তাহলে তার উপর এবং উক্ত নারীর উপর হদ্দ সাব্যস্ত হবে না। বরং উভয় অবস্থায় তার উপর মহর ওয়াজিব হবে।

কেননা বিবাহের দাবিটার সত্যতার সম্ভাবনা রয়েছে। আর তা উভয় পক্ষ দ্বারা সম্পন্ন হয়। সুতরাং দাবিটা সন্দেহের উদ্রেক করেছে। আর হদ্দ যখন রহিত হলো তখন উপভোগ অঙ্গের মর্যাদা প্রকাশের জন্য মহর ওয়াজিব হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَمَنْ زَنٰى بِجَارِيَةٍ فَقَتَلَهَا فَاِنَّهُ يُحَدُّ وَعَلَيْهِ الْقِيْمَةُ مَعْنَاهُ : قَتَلَهَا بِفِعْلِ الزِّنَاءِ لِاَنَّهُ جَنٰى جِنَايَتَيْنِ فَيُوَفَّرُ عَلٰى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حُكْمَهُ . وَعَنْ اَبِيْ يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ اَنَّهُ لَا يُحَدُّ لِاَنَّ تَقَرُّرَ ضِمَانِ الْقِيْمَةِ سَبَبٌ لِمِلْكِ الْاَمَةِ فَصَارَ كَمَا اِذَا اِشْتَرَاهَا بَعْدَ مَا زَنٰى بِهَا وَهُوَ عَلٰى هٰذَا الْاِخْتِلَافِ، وَاعْتِرَاضُ سَبَبِ الْمِلْكِ قَبْلَ اقَامَةِ الْحَدِّ يُوجِبُ سُقُوطَهُ، كَمَا إِذَا مَلَكَ الْمَسْرُوْقَ قَبْلَ الْقَطْعِ . وَلَهُمَا اَنَّهُ ضَمَانُ قَتْلٍ فَلَا يُوْجِبُ الْمِلْكَ لِاَنَّهُ ضَمَانُ دَمٍ، وَلَوْ كَانَ يُوْجِبُهُ فَاِنَّمَا يُوْجِبُهُ فِي الْعَيْنِ كَمَا فِيْ هِبَةِ الْمَسْرُوْقِ لَا فِيْ مَنَافِعِ الْبُضْعِ لِاَنَّهَا اُسْتُوْفِيَتْ وَالْمِلْكُ يَثْبُتُ مُسْتَنِدًا فَلَا يَظْهَرُ فِي الْمُسْتَوْفٰى لِكَوْنِهَا مَعْدُوْمَةً، وَهٰذَا بِخِلَافِ مَا اِذَا زَنٰى بِهَا فَاَذْهَبَ عَيْنَهَا حَيْثُ تَجِبُ عَلَيْهِ قِيْمَتُهَا، وَيَسْقُطُ الْحَدُّ لِاَنَّ الْمِلْكَ هُنَالِكَ يَثْبُتُ فِي الْجُثَّةِ الْعَمْيَاءِ وَهِيَ عَيْنٌ فَاَوْرَثَتْ شُبْهَةً .

অনুবাদ : কেউ যদি কোনো দাসীকে ধর্ষণ করে, অতঃপর তাকে হত্যা করে ফেলে, তাহলে তার উপর হদ্দ কায়েম করা হবে। এবং তার উপর দাসীটির মূল্য ওয়াজিব হবে।

এ কথার অর্থ এই যে, ধর্ষণ কর্ম দ্বারা হত্যা করেছে। হদ্দ ও মূল্যের ক্ষতিপূরণ দুটো সাব্যস্ত হওয়ার কারণ এই যে, সে দু'টি অপরাধ করেছে। সুতরাং প্রত্যেকটির বিধান পূর্ণ মাত্রায় কার্যকর হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, হদ্দ কায়েম করা হবে না। কেননা ধর্ষকের উপর মূল্যের ক্ষতিপূরণ সাব্যস্ত হওয়াটা দাসীর মালিকানা লাভের কারণ। সুতরাং জেনা করার পর দাসীটিকে খরিদ করে নেওয়ার মতো হলো। অবশ্য এ ক্ষেত্রে এই মতপার্থক্য রয়েছে।

আর হদ্দ কায়েমের পূর্বে মালিকানার কারণ বিদ্যমান হওয়া হদ্দ রহিত করে। যেমন যদি হাত কর্তনের পূর্বে চোর চুরিকৃত মালের মলিক হয়ে যায়।

তারফাইনের দলিল এই যে, এটা হচ্ছে হত্যার ক্ষতিপূরণ। সুতরাং তা মালিকানা সাব্যস্ত করবে না। কেননা এটা রক্তের ক্ষতিপূরণ। আর যদি মেনে নেওয়া হয় যে, তা মালিকানা সাব্যস্ত করে, তাহলে বক্তব্য এই যে, এটা দেহ সত্তার মালিকানা সাব্যস্ত করে। যেমন চুরিকৃত বস্তু হেবা করার ক্ষেত্রে এবং উপভোগ অঙ্গের ভোগ মালিকানা সাব্যস্ত করে না। কেননা ভোগ তো উসুল হয়ে গেছে এবং অস্তিত্বহীন হয়ে গেছে। অথচ মালিকানা সাব্যস্ত হবে দাসীর সত্তার উপর ভিত্তি করে। সুতরাং অস্তিত্বহীন হওয়াব কারণে উসুলকৃত ভোগের ক্ষেত্রে মালিকানা প্রকাশ পাবে না।

পক্ষান্তরে ধর্ষণের কারণে যদি চক্ষু [বা অন্য কোনো অঙ্গ] নষ্ট হয় তাহলে তার মূল্য সাব্যস্ত হবে। এবং হদ্দ রহিত হয়ে যাবে। কেননা সেখানে মালিকানা সাব্যস্ত হয় অন্ধ হয়ে যাওয়া চক্ষু পিণ্ডের মাঝে যা একটি সত্তাবিশেষ। সুতরাং তা মালিকানার সন্দেহ সৃষ্টি করে।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ وَكُلُّ شَيْءٍ صنعهُ الْإِمَامُ الَّذِي لَيْسَ فَوْقَهُ امامٌ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ إِلَّا الْقِصَاصَ فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ بِهِ وَبِالْأَمْوَالِ لِأَنَّ الْحُدُوْدَ حَقُّ اللّٰهِ تَعَالَى وَإِقَامَتُهَا إِلَيْهِ لَا إِلَى غَيْرِهِ وَلَا يُمْكِنُهُ أَنْ يُقِيْمَ عَلَى نَفْسِهِ لِأَنَّهُ لَا يُفِيْدُ. بِخِلَافِ حُقُوْقِ الْعِبَادِ لِأَنَّهُ يَسْتَوْفِيْهِ وَلِيُّ الْحَقِّ أَمَّا بِتَمْكِيْنِهِ أَوْ بِالْإِسْتِعَانَةِ بِمَنْعَةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْقِصَاصُ وَالْأَمْوَالُ مِنْهَا . وَأَمَّا حَدُّ الْقَذْفِ قَالُوْا الْمُغَلَّبُ فِيْهِ حَقُّ الشَّرْعِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ سَائِرِ الْحُدُوْدِ الَّتِي هِيَ حَقُّ اللّٰهِ تَعَالَى ـ

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যে শাসকের উপর আর কোনো শাসক নেই। সে শাসক যা কিছু করবেন, সে জন্য তার উপর কোনো হদ্দ জারি হবে না অবশ্য কিসাস জারি হবে।

অর্থাৎ কিসাস গ্রহণ করা হবে এবং মালের হকও আদায় করতে হবে। কেননা হদ্দ হলো আল্লাহর হক আর হদ্দ কায়েম করার কর্তৃত্ব তাঁর, অন্য কারো নয়। আর নিজের উপর হদ্দ কায়েম করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং হদ্দ ওয়াজিব করার কোনো কায়দা নেই। বান্দার হকসমূহের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা হক উসুল করার ওয়ালী বা অভিভাবক তা উসুল করবে। হয় খলিফার নিজের উপর ক্ষমতা প্রদানের মাধ্যমে কিংবা মুসলমানদের শক্তি সাহায্য গ্রহণের মাধ্যমে। আর কিসাস ও মালের দায় হল বান্দার হকের অন্তর্ভুক্ত।

আর হদ্দুল কযফ সম্পর্কে ফকীহগণ বলেছেন যে, তাতে শরিয়তের হক প্রধান। সুতরাং তার হুকুমও অন্য সকল হদ্দের ন্যায় হবে, যেগুলো আল্লাহর হক।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

এই অনুচ্ছেদের সাথে সম্পৃক্ত কতিপয় জরুরি মাসআলা :

১. জেনা যদি স্বীকারোক্তি দ্বারা সাব্যস্ত হয় তবে স্বীকারোক্তি সুস্পষ্ট ভাষায় হতে হবে।

২. স্বীকারোক্তির সময় নেশাগ্রস্ত না হতে হবে।

৩. স্বীকারোক্তিকারীকে অপরজন মিথ্যাবাদী দাবি না করতে হবে। কিংবা তার স্বীকারোক্তি মিথ্যা প্রমাণিত না হতে হবে। যেমন তার পুরুষাঙ্গ কর্তিত প্রমাণিত হওয়া, কিংবা স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে যৌনাঙ্গে বাড়ন্ত হাড় জনিত রোগ প্রমাণিত হওয়া [যা যৌন মিলনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক]। যে দুজনার ব্যাপারে জেনার অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে, তাদের কোনো একজন বোবা হওয়া [কারণ সে হয়তো এমন কোনো কথা বলত যা দ্বারা তার হদ্দ রহিত হয়ে যায়]। তবে জেনা যদি সাক্ষ্য দ্বারা প্রামাণিত হয়, তবে হদ্দ কায়েমের ক্ষেত্রে এগুলো প্রতিবন্ধক হবে না।

৪. স্বীকারোক্তিকারী যদি তার স্বীকারোক্তি প্রত্যাখ্যান করে অর্থাৎ সে যদি বলে যে, আমি মিথ্যা বলেছি, কিংবা হদ্দ লাগানোর সময় সে যদি পালিয়ে যায়, অথবা স্বীকারোক্তিকারী স্বীকারোক্তি করেনি বলে দাবি করে, তবে এগুলো তার স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার বলে বিবেচিত হবে। একবার নিজের মুহসান হওয়ার স্বীকারোক্তির পর যদি তা প্রত্যাখ্যান করে তবে তা স্বীকৃত হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

৫. এমনিভাবে ঐ সমস্ত হদ্দ এর ক্ষেত্রেও যেগুলোতে কেবল আল্লাহর হক রয়েছে, বান্দার কোনো হক নেই। যেমন মদপানের হদ্দ কিংবা চুরির হদ্দ। অর্থাৎ এ সকল হদ্দ এর ক্ষেত্রে স্বীকারোক্তির পর প্রত্যাখ্যান করলে তা স্বীকৃত হবে।

৬. শাসকের পক্ষ থেকে কারো ব্যাপারে রজমের ফয়সালা হওয়ার পর জেলখানায় যদি কেউ তার চোখ নষ্ট করে দেয়। কিংবা তাকে হত্যা করে ফেলে তবে তার উপর কিসাস জারি হবে না। অথবা দিয়ত [চোখের মূল্য] সাব্যস্ত হবে না। তবে হ্যাঁ রজমের রায় হওয়ার পূর্বে যদি এ অপরাধ সংঘটিত হয় তখন অনিচ্ছাসত্ত্বেও হলে দিয়ত সাব্যস্ত হবে। আর ইচ্ছাকৃত হলে কিসাস জারি হবে।

৭. জেনাকারী অসুস্থ হলে এবং তার শাস্তি বেত্রাঘাত হলে তখন যদি তার রোগমুক্তির সম্ভাবনা না থাকে তবে সুস্থতার অপেক্ষা না করে ঐ অবস্থায় তাকে বেত্রাঘাত করা হবে।

৮. রজমের ক্ষেত্রে মুহসান সাব্যস্ত হওয়ার জন্য যে সমস্ত বিষয় আবশ্যকীয় :

ক. জেনাকারী স্বাধীন ব্যক্তি হওয়া।

খ. সুস্থ মস্তিষ্ক হওয়া।

গ. প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া।

ঘ. মুসলমান হওয়া।

ঙ. কোনো মুহসানা নারীর সঙ্গে বিশুদ্ধ বিবাহের মাধ্যমে সহবাস সম্পন্ন করা।

চ. সহবাসের সময় [স্বামী-স্ত্রী] উভয়ের মধ্যে ইহসান গুণ বিদ্যমান থাকা।

৯. ব্যভিচারকারী ও ব্যভিচারকারিণী উভয়ের কেউ হলাল হওয়ার ধারণা প্রকাশ করলে দু'জনের কারো উপর হদ্দ জারি হবে না। পুনরায় যদি তারা উভয়ে স্বীকার করে বলে যে, আমরা একে অপরের জন্য হারাম হওয়ার বিষয়টি জানতাম। তবে তাদের উপর হদ্দ জারি করা হবে।

১০. হস্ত-মৈথুন হারাম। কারো এমন অপরাধের ব্যাপারে শাসক অবহিত হলে তিনি তাকে শাস্তি দেবেন। তবে যদি কেউ তার স্ত্রী কিংবা দাসীকে নিজ পুরুষাঙ্গ মর্দন করতে দেয় এবং এর ফলে তার বীর্যপাত হয়। তবে এমন কাজ মাকরূহ। কিন্তু এজন্য তার উপর কোনো শাস্তি হবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الزِّنَاءِ وَالرُّجُوْعِ عَنْهَا

وَإِذَا شَهِدَ الشُّهُوْدُ بِحَدٍّ مُتَقَادِمٍ لَمْ يَمْنَعْهُمْ عَنْ إِقَامَتِهِ بُعْدُهُمْ عَنِ الْإِمَامِ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمْ إِلَّا فِيْ حَدِّ الْقَذْفِ خَاصَّةً وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَإِذَا شَهِدَ عَلَيْهِ الشُّهُوْدُ بِسَرِقَةٍ أَوْ بِشُرْبِ خَمْرٍ أَوْ بِزِنَاءٍ بَعْدَ حِيْنٍ لَمْ يُؤْخَذْ بِهِ وَضَمِنَ السَّرِقَةَ وَالْأَصْلُ أَنَّ الْحُدُوْدَ الْخَالِصَةَ حَقًّا لِلّٰهِ تَعَالٰى تَبْطُلُ بِالتَّقَادُمِ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللّٰهُ، هُوَ يَعْتَبِرُهَا بِحُقُوْقِ الْعِبَادِ وَبِالْإِقْرَارِ فَالتَّأْخِيرُ إِنْ كَانَ لِاخْتِيَارِ السَّتْرِ فَالْإِقْدَامُ عَلَى الْأَدَاءِ بَعْدَ ذٰلِكَ الَّذِي هُوَ إِحْدَى الْحُجَّتَيْنِ. وَلَنَا أَنَّ الشَّاهِدَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْحِسْبَتَيْنِ مِنْ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ وَالسَّتْرِ، لِضَغِيْنَةٍ هَيَّجَتْهُ أَوْ لِعَدَاوَةٍ حَرَّكَتْهُ فَيُتَّهَمُ فِيْهَا وَإِنْ كَانَ التَّأْخِيرُ لَا لِلسَّتْرِ يَصِيْرُ فَاسِقًا آثِمًا فَتَيَقَّنَّا بِالْمَانِعِ، بِخِلَافِ الْإِقْرَارِ

পরিচ্ছেদ : জেনা সম্পর্কে সাক্ষ্য এবং তা প্রত্যাহার

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, সাক্ষীরা যদি বেশ পূর্বের হদ্দ সম্পর্কে সাক্ষ্য দান করে, অথচ শাসক থেকে দূরে অবস্থান তাদের সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক ছিল না। তাহলে শুধু হদ্দুল কযফ ছাড়া অন্য কোনো হদ্দে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না।

জামে সগীর গ্রন্থে রয়েছে, যদি সাক্ষীগণ দীর্ঘ সময় পরে তার বিরুদ্ধে চুরি কিংবা মদপান কিংবা জেনা সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করে তাহলে ঐ সাক্ষী গ্রহণ করা হবে না। তবে চোরকে চুরির মালের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

এ সম্পর্কিত মূলনীতি এই যে, খালেছ আল্লাহর হক রূপে সাব্যস্ত হদ্দসমূহ দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার কারণে বাতিল হয়ে যায়। ইমাম শাফেয়ী (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি এগুলোকে বান্দার হকসমূহ এবং স্বীকারোক্তির উপর কিয়াস করেন যা দু দলিলের একটি।

আমাদের দলিল এই যে, সাক্ষী সাক্ষ্য প্রদান কিংবা মুসলমানের দোষ গোপন করা এ দুই নেক কর্মের মাঝে ইচ্ছাধিকার প্রাপ্ত ছিল। এখন বিলম্ব যদি দোষ গোপন করার দিকটি গ্রহণের কারণে হয়ে থাকে, তাহলে এরপর সাক্ষ্য প্রদানে অগ্রসর হওয়ার কারণ হবে শুধু বিদ্বেষ ও শত্রুতা, যা তাকে ক্ষিপ্ত করেছে। সুতরাং সাক্ষ্যের ব্যাপারে সে সন্দেহযুক্ত হয়ে পড়বে। আর যদি বিলম্ব দোষ গোপন ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে হয়, তাহলে সে ফাসেক ও গুনাহগার হবে। সুতরাং সাক্ষ্য গ্রহণের প্রতিবন্ধকতার ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত হয়ে গেলাম। স্বীকারোক্তির বিষয়টি ভিন্ন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

এ মাসআলার সারসংক্ষেপ এই যে, কোনো প্রতিবন্ধক ছাড়া বেশ পূর্বের সাক্ষ্য দান হদ্দ-এর ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয়। তবে চুরি মালের ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে এমন সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য। অর্থাৎ চোরকে চুরির মালের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

হদ্দ-এর ক্ষেত্রে বেশ পূর্বের সাক্ষ্যও নিকটতর সাক্ষ্যের, বিষয়টি ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে। যেমন– মদপানের ক্ষেত্রে সাক্ষ্য অনেক পূর্বের বলে গণ্য হবে। যদি মদের দুর্গন্ধ মুখ থেকে দূর হওয়ার পর সাক্ষ্য দেওয়া হয়। এমনিভাবে বিশুদ্ধতম মতানুসারে জেনা ও চুরির সাক্ষ্য বেশ পূর্বের বলে গণ্য হবে, যদি সাক্ষ্য প্রদানে বিনা প্রতিবন্ধকতায় এক মাস বিলম্ব হয়। সে হিসেবে কোনো কোনো ফকীহ-এর মতে একমাস পর জেনার সাক্ষ্য দিলে সাক্ষীদের উপর হদ্দুল কযফ জারি করা হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

لِاَنَّ الْاِنْسَانَ لا يُعَادِيْ نَفْسَهٗ، فَحَدُّ الزِّنَاءِ وَشُرْبِ الْخَمْرِ وَالسَّرِقَةِ خَالِصُ حَقِّ اللّٰهِ تَعَالٰى حَتّٰى يَصِحَّ الرُّجُوْعُ عَنْهَا بَعْدَ الْاِقْرَارِ فَيَكُوْنَ التَّقَادُمُ فِيْهِ مَانِعًا، وَحَدُّ الْقَذْفِ فِيْهِ حَقُّ الْعَبْدِ لِمَا فِيْهِ مِنْ دَفْعِ الْعَارِ عَنْهُ، وَلِهٰذَا لَا يَصِحُّ رُجُوْعُهٗ بَعْدَ الْاِقْرَارِ، وَالتَّقَادُمُ غَيْرُ مَانِعٍ فِيْ حُقُوْقِ الْعِبَادِ، لِاَنَّ الدَّعْوٰى فِيْهِ شَرْطٌ فَيُحْمَلُ تَاْخِيْرُهُمْ عَلٰى اِنْعِدَامِ الدَّعْوٰى فَلَا يُوْجِبُ تَفْسِيْقَهُمْ. بِخِلَافِ حَدِّ السَّرِقَةِ لِاَنَّ الدَّعْوٰى لَيْسَتْ بِشَرْطٍ لِلْحَدِّ لِاَنَّهٗ خَالِصُ حَقِّ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلٰى مَا مَرَّ، وَاِنَّمَا شُرِطَتْ لِلْمَالِ، وَلِاَنَّ الْحُكْمَ يُدَارُ عَلٰى كَوْنِ الْحَدِّ حَقًّا لِلّٰهِ تَعَالٰى فَلَا يُعْتَبَرُ وُجُوْدُ التُّهْمَةِ فِيْ كُلِّ فَرْدٍ، وَلِاَنَّ السَّرِقَةَ تُقَامُ عَلَى الْاِسْتِسْرَارِ عَلٰى غِرَّةٍ عَنِ الْمَالِكِ فَيَجِبُ عَلَى الشَّاهِدِ اِعْلَامُهٗ وبِالْكِتْمَانِ يَصِيْرُ فَاسِقًا اٰثِمًا، ثُمَّ التَّقَادُمُ كَمَا يَمْنَعُ قَبُوْلَ الشَّهَادَةِ فِي الْاِبْتِدَاءِ يَمْنَعُ الْاِقَامَةَ بَعْدَ الْقَضَاءِ عِنْدَنَا خِلَافًا لِزُفَرَ حَتّٰى لَوْ هَرَبَ بَعْدَ مَا ضُرِبَ بَعْضَ الْحَدِّ ثُمَّ اُخِذَ بَعْدَ مَا تَقَادَمَ الزَّمَانُ لَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ لِاَنَّ الْاِمْضَاءَ مِنَ الْقَضَاءِ فِيْ بَابِ الْحُدُوْدِ وَاخْتَلَفُوْا فِيْ حَدِّ التَّقَادُمِ، وَاَشَارَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ اِلٰى سِتَّةِ اَشْهُرٍ، فَاِنَّهٗ قَالَ بَعْدَ حِيْنٍ، وَهٰكَذَا اَشَارَ الطَّحَاوِيُّ،

কেননা মানুষ নিজের সাথে শত্রুতা করতে পারে না। আর জেনা, মদপান ও চুরির হদ্দ হচ্ছে খালেছ আল্লাহর হক। এ কারণেই স্বীকারোক্তির পরও তা প্রত্যাহার করা যায়। সুতরাং এ ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়া প্রতিবন্ধক হবে। পক্ষান্তরে হদ্দুল কযফের মাঝে বান্দার হক রয়েছে। কেননা এর মাধ্যমে বান্দার কলঙ্ক মোচন হয়। এ কারণেই স্বীকারোক্তির পর এ ক্ষেত্রে তা প্রত্যাহার করা যায় না। আর বান্দার হক সন্দেহের ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়া প্রতিবন্ধক নয়। কেননা দাবি উত্থাপন শর্ত। সুতরাং সাক্ষীদের বিলম্ব দাবির অনুপস্থিতির কারণে হতে পারে। তাই বিলম্ব তাদেরকে ফাসেক সাব্যস্ত করে না। চুরির হদ্দের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা পিছনের বর্ণনা মতে যেহেতু এটা খালেছ আল্লাহর হক, সেহেতু এ ক্ষেত্রে দাবি উত্থাপন শর্ত নয়। বরং দাবি উত্থাপনের শর্ত এসেছে অর্থ সম্পর্কের কারণে। হদ্দটি আল্লাহর হুকুম হওয়ার উপরই হুকুম আবর্তিত হবে। সুতরাং প্রত্যেক সাক্ষীর ক্ষেত্রে উক্ত অভিযোগ বিদ্যমান থাকার বিষয় বিবেচনা করা হবে না।

তাছাড়া চুরি যেহেতু মালিকের বেখবরিতে গোপনে সংঘটিত হয়, সেহেতু সাক্ষীদের কর্তব্য হলো সেটা জানিয়ে দেওয়া। গোপন করা দ্বারা সে বরং ফাসিক ও গুনাগার হবে।

আর দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়া প্রাথমিক অবস্থায় সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্যতা নষ্ট করে। আমাদের মতে তেমনি তা বিচারের ফয়সালার পর হদ্দ প্রয়োগের পথও রুদ্ধ করে। ইমাম যুফার (র.) ভিন্ন মত পোষণ করেন। এমন কি যদি কিছু হদ্দ প্রয়োগের পর সে পালিয়ে যায়, অতঃপর দীর্ঘ সময় পার হওয়ার পর সে ধরা পড়ে তখন তার উপর হদ্দ কায়েম হবে না। কেননা হদ্দের ক্ষেত্রে প্রয়োগও বিচারের অংশ।

দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পরিমাণ সম্পর্কে মতপার্থক্য রয়েছে। জামে'সগীর গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মদ (র.) بعد حين বলে ছয়মাসের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। ইমাম ত্বহাবী (র.)-ও অনুরূপ ইঙ্গিত করেছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

وَابُوْ حَنِيْفَة لَمْ يُقَدِّرْ فِيْ ذٰلِكَ وَفَوَّضَهُ اِلٰى رَأْيِ الْقَاضِيْ فِيْ كُلِّ عَصْرٍ . وَعَنْ مُحَمَّدٍ اَنَّهُ قَدَّرَهُ بِشَهْرٍ؛ لِاَنَّ ما دُوْنَهُ عاجِلٌ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ اَبِيْ حَنِيْفَةَ وَاَبِيْ يُوْسُفَ وَهُوَ الْاَصَحُّ. وَهٰذَا اِذا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْقَاضِيْ وَبَيْنَهُمْ مَسِيْرَةُ شَهْرٍ، اَمَّا اِذا كَانَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ؛ لِاَنَّ الْمَانِعَ بُعْدُهُمْ عَنِ الْاِمَامِ فَلَا تَتَحَقَّقُ التُّهْمَةُ . وَالتَّقَادُمُ فِيْ حَدِّ الشُّرْبِ كَذٰلِكَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ، وَعِنْدَهُمَا يُقَدَّرُ بِزَوَالِ الرَّائِحَةِ عَلٰى مَا يَاْتِيْ فِيْ بَابِهِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَاِذا شَهِدُوْا عَلٰى رَجُلٍ اَنَّهُ زَنٰى بِفُلَانَةٍ وَفُلَانَةُ غَائِبَةٌ فَاِنَّهُ يُحَدُّ، وَاِنْ شَهِدُوْا اَنَّهُ سَرَقَ مِنْ فُلَانٍ وَهُوَ غَائِبٌ لَمْ يُقْطَعْ وَالْفَرْقُ اَنَّ بِالْغَيْبَةِ تَنْعَدِمُ الدَّعْوٰى وَهِيَ شَرْطٌ فِي السَّرِقَةِ دُوْنَ الزِّنَا، وَبِالْحُضُوْرِ يُتَوَهَّمُ دَعْوَى الشُّبْهَةِ وَلَا مُعْتَبَرَ بِالْمَوْهُوْمِ وَاِنْ شَهِدُوا اَنَّهُ زَنٰى بِاِمْرَاَةٍ لَا يَعْرِفُوْنَهَا لَمْ يُحَدَّ لِاحْتِمَالِ اَنَّهَا اِمْرَاَتُهُ اَوْ اَمَتُهُ بَلْ هُوَ الظَّاهِرُ وَاِنْ اَقَرَّ بِذٰلِكَ حُدَّ؛ لِاَنَّهُ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ اَمَتُهُ اَوْ اِمْرَاَتُهُ ـ

অনুবাদ : ইমাম আবূ হানীফা (র.) এ ক্ষেত্রে সময় নির্ধারণ না করে প্রত্যেক যুগের কাজির বিবেচনার উপর বিষয়টি অর্পণ করেছেন। ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি একমাস নির্ধারণ করেছেন। কেননা এর চেয়ে কম সময়কে নিকটবর্তী গণ্য করা হয়। ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে, এবং এ-ই বিশুদ্ধতম।

এ সিদ্ধান্ত হবে তখন, যখন কাজি ও সাক্ষীদের মাঝে একমাসের দূরত্ব না হয়। আর যদি ঐ পরিমাণ দূরত্ব হয় তাহলে একমাসের পরেও তাদের এ সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। কেননা এখানে প্রতিবন্ধক হচ্ছে শাসক থেকে তাদের দূরত্ব। সুতরাং শত্রুতার অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধে আসবে না। মদপানের হদ্দ কায়েম করার ব্যাপারে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পরিমাণ ইমাম মুহাম্মদ (রা)-এর মতে অনুরূপ।

আর শায়খাইনের মতে গন্ধ দূর হওয়া দ্বারা তা নির্ধারণ করা হবে। মদপানের হদ্দ অধ্যায়ে ইনশাআল্লাহ বিষয়টি আসছে। **আর যদি সাক্ষীগণ কোনো লোকের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করে যে, সে অমুক নারীর সাথে জেনা করেছে। অথচ সে নারী অনুপস্থিত রয়েছে। তাহলে হদ্দ কায়েম করা হবে। পক্ষান্তরে যদি সাক্ষ্য প্রদান করে যে, সে অমুকের মাল চুরি করেছে অথচ অমুক অনুপস্থিত রয়েছে। তাহলে হাত কাটা হবে না।**

পার্থক্যের কারণ এই যে, অনুপস্থিতির কারণে দাবি উত্থাপনের অনুপস্থিতি হয়, আর দাবি উত্থাপন চুরির সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে শর্ত রয়েছে, জেনার ক্ষেত্রে শর্ত নয়। অবশ্য কথিত স্ত্রীলোকটির উপস্থিতিতে সন্দেহের দাবি করার ধারণা রয়েছে। কিন্তু নিছক ধারণা বিবেচ্য নয়।

যদি তারা সাক্ষ্য দেয় যে, সে এমন এক স্ত্রীলোকের সঙ্গে জেনা করেছে যাকে তারা চিনে না, তাহলে হদ্দ কায়েম করা হবে না। কেননা সে নারী তার স্ত্রী বা দাসী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বরং তা-ই তো স্বাভাবিক। **তবে সে যদি [অপরিচিতা নারীর সাথে] জেনার কথা স্বীকার করে তাহলে হদ্দ কায়েম করা হবে।** কেননা তার নিজের কাছে তো তার দাসী বা স্ত্রীর পরিচয় গোপন থাকতে পারে না।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

বর্ণিত মাসআলাটির সার সংক্ষেপ এই যে, বেশ পূর্বের হদ্দ সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান ও স্বীকারোক্তি প্রসঙ্গে ইমামগণের মতপার্থক্য নিম্নরূপ :

১. ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) এর মতে হদ্দ সম্পর্কে এমন সাক্ষ্য গ্রহণীয় নয়, তবে মদপানের স্বীকারোক্তি ছাড়া অন্য সকল স্বীকারোক্তি গ্রহণীয়।

২. ইমাম মুহাম্মদ বিন হাসান শায়বানী (র)-এর মতে সাক্ষ্য গ্রহণীয় নয়। কিন্তু মদপানের স্বীকারোক্তি সহ সকল স্বাকীরোক্তি গ্রহণীয়।

৩. ইমাম ইবনে আবী লায়লা (র.) বলেন, বেশ পূর্বের হদ্দ সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান ও স্বীকারোক্তি উভয়টি গ্রহণীয় নয়।

৪. ইমাম শাফেয়ী (র.), ইমাম মালেক (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে সাক্ষ্য ও স্বীকারোক্তি দু'টিই গ্রহণীয়। সাক্ষ্য যদি কোনো লোকের বিরুদ্ধে কোনো অনুপস্থিত নারীর সাথে জেনা সম্পর্কীয় হয় তবে হদ্দ কায়েম হবে। পক্ষান্তরে অনুপস্থিত ব্যক্তির মাল চুরি করার ব্যাপারে কারো বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করলে হাত কাটা হবে না।

وَاِذَا شَهِدُوا عَلٰى رَجُلٍ الخ : এখানে বলা হচ্ছে যে, সাক্ষ্য দ্বারা জেনা সাব্যস্ত হওয়ার জন্য মহিলার উপস্থিতি শর্ত নয়। বরং সাক্ষীদের [পুরুষ ও মহিলাকে] ভালো ভাবে চেনাই যথেষ্ট।

এখানে এমন প্রশ্ন উত্থাপনের সুযোগ নেই যে, পরবর্তীতে তো মহিলার পুরুষটির সাথে বিবাহের দাবিও হতে পারে। যা হদ্দকে রহিত করে দেবে। কেননা এটা হচ্ছে সন্দেহের সন্দেহ যা বিবেচ্য নয়।

قَوْلُهٗ وَاِنْ شَهِدُوا اَنَّهٗ زَنٰى بِامْرَأَةٍ الخ : সন্দেহের কারণে সকল হদ্দ-ই রহিত হয়ে যায়। এখানেও মহিলা তার স্ত্রী কিংবা দাসী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা তার জন্য হালাল। অতএব হদ্দ কায়েম হবে না। তবে হ্যাঁ, সে যদি মহিলা অপরিচিতা হওয়ার কথা স্বীকার করে তবে জেনা সুস্পষ্ট হওয়ার কারণে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَاِنْ شَهِدَ اِثْنَانِ اَنَّهُ زَنٰى بِفُلَانَةٍ فَاسْتَكْرَهَهَا وَاٰخَرَانِ اَنَّهَا طَاوَعَتْهُ دُرِئَ الْحَدُّ عَنْهُمَا جَمِيْعًا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ (رحـ) وَقَالَا يُحَدُّ الرَّجُلُ خَاصَّةً لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى الْمُوْجِبِ وَتَفَرَّدَ اَحَدُهُمَا بِزِيَادَةِ جِنَايَةٍ وَهُوَ الْاِكْرَاهُ بِخِلَافِ جَانِبِهَا لِاَنَّ طَوَاعِيَتَهَا شَرْطُ تَحَقُّقِ الْمُوْجِبِ فِىْ حَقِّهَا وَلَمْ يَثْبُتْ لِاخْتِلَافِهِمَا وَلَهُ اَنَّهُ اِخْتَلَفَ الْمَشْهُوْدُ عَلَيْهِ لِاَنَّ الزِّنَاءَ فِعْلٌ وَاحِدٌ يَقُوْمُ بِهِمَا وَلِاَنَّ شَاهِدَىِ الطَّوَاعِيَةِ صَارَا قَاذِفَيْنِ لَهُمَا وَاِنَّمَا يَسْقُطُ الْحَدُّ عَنْهُمَا بِشَهَادَةِ شَاهِدَىِ الْاِكْرَاهِ لِاَنَّ زِنَاءَهَا مُكْرَهَةً يُسْقِطُ اِحْصَانَهَا فَصَارَا خَصْمَيْنِ فِىْ ذٰلِكَ وَاِنْ شَهِدَ اِثْنَانِ اَنَّهُ زَنٰى بِامْرَاَةٍ بِالْكُوْفَةِ وَاٰخَرَانِ اَنَّهُ زَنٰى بِهَا بِالْبَصْرَةِ دُرِئَ الْحَدُّ عَنْهُمَا لِاَنَّ الْمَشْهُوْدَ بِهِ فِعْلُ الزِّنَاءِ وَقَدْ اِخْتَلَفَ بِاخْتِلَافِ الْمَكَانِ وَلَمْ يَتِمَّ عَلٰى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصَابُ الشَّهَادَةِ وَلَا يُحَدُّ الشُّهُوْدُ خِلَافًا لِزُفَرَ (رحـ) لِشُبْهَةِ الْاِتِّحَادِ نَظْرًا اِلَى اتِّحَادِ الصُّوْرَةِ وَالْمَرْاَةِ ـ

অনুবাদ : যদি দু'জন লোক সাক্ষ্য দেয় যে, সে অমুক স্ত্রী লোকের সাথে বলপূর্বক জেনা করেছে, আর অপর দু'জন সাক্ষ্য দেয় যে, স্ত্রী লোকটি তাকে স্বেচ্ছায় সুযোগ দিয়েছে। তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে উভয়ের থেকেই হদ্দ রহিত হয়ে যাবে। এটা ইমাম যুফার (র.)-এর অভিমত।

সাহেবাইন (র.) বলেন, শুধু পুরুষটির উপর হদ্দ কায়েম করা হবে। কেননা উভয়টি হদ্দ ওয়াজিবকারী মূল বিষয়ে একমত হয়েছে। শুধু একজন অতিরিক্ত অপরাধের ব্যাপারে আলাদা মত প্রকাশ করেছে। আর তা হচ্ছে বল প্রয়োগ।

স্ত্রী লোকটির বিষয় ভিন্ন। কেননা তার ক্ষেত্রে হদ্দ সাব্যস্ত হওয়ার জন্য শর্ত হলো তার সম্মতি। যা উভয় সাক্ষী দলের ভিন্ন মতের কারণে সাব্যস্ত হয়নি।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল এই যে, এখানে সাক্ষ্যের বিষয় ভিন্ন হয়েছে। কেননা জেনা এমন কর্ম যা উভয় দ্বারা সম্পন্ন হয়। (সুতরাং তা দুই বিপরীত গুণযুক্ত হতে পারে না।) তাই কোনো পক্ষেরই সাক্ষীর নেসাব পূর্ণ হয়নি।) তাছাড়া স্ত্রী লোকটির সম্মতির সাক্ষ্যদানকারীর উপর থেকে অপবাদের হদ্দ রহিত হয়ে যাবে, বল প্রয়োগের সাক্ষ্যদানকারীদের সাক্ষ্যের কারণে। কেননা বল প্রয়োগের জেনা তার মুহছান হওয়া রহিত করে দেয়।

আর যদি দু'জন লোক সাক্ষ্য দেয় যে, সে একজন স্ত্রী লোকের সাথে কুফায় জেনা করেছে। আর অপর দু'জন সাক্ষ্য দেয় যে, সে তার সাথে বসরায় জেনা করেছে। তাহলে নারী-পুরুষ উভয় থেকে হদ্দ রহিত হয়ে যাবে। কেননা সাক্ষ্যের বিষয় হচ্ছে ব্যাভিচার কর্ম আর স্থান ভিন্নতার কারণে ব্যাভিচার কর্মটি ভিন্ন হয়ে গেল। সুতরাং দু'টি কোনো ক্ষেত্রেই সাক্ষীর নেসাব পূর্ণ হয়নি।

অবশ্য সাক্ষীদের উপর হদ্দে কযফও প্রয়োগ করা হবে না। তবে ইমাম যুফার (র.) এর বিপরীত মত পোষণ করেন। কেননা স্ত্রী লোকটির অভিন্নতা ও দৃশ্যগত অভিন্নতার কারণে, ব্যাভিচার কর্মের অভিন্নতার সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

একজন পুরুষ একজন মহিলার সাথে জেনা করেছে এমর্মে চারজন সাক্ষী সম্মতিতে সংঘটিত হয়েছে। অপর দু'জন বলল, জেনায় মহিলার সম্মতি ছিল না, জোরপূর্বক তার সাথে এমনটি করা হয়েছে। এমতাবস্থায় ইমাম আবূ হানীফা ইমাম যুফার ইমাম মালেক ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ (র.)-এর মত হলো স্ত্রী পুরুষ উভয়ের উপর থেকে হদ্দ রহিত হয়ে যাবে। সাহেবাইন বলেন, পুরুষটির উপর হদ্দ ওয়াজিব হবে। স্ত্রী লোকটির উপর হদ্দ ওয়াজিব হবে না।

সাহেবাইনের দলিল : হদ্দ ওয়াজিব হওয়ার মূল কারণ হচ্ছে স্বেচ্ছায় জেনা করা। এ কারণটি পুরুষের ক্ষেত্রে চারজন সাক্ষীর সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। তবে দু'জন সাক্ষী আরো একটি অতিরিক্ত অপরাধের সাক্ষ্য দিয়েছে। তা হলো এই যে, সে স্ত্রী লোকের উপর বল প্রয়োগ করেছে। যাই হোক, পুরুষটি নিজ ইচ্ছায় জেনা করেছে, এ বিষয়ে যেহেতু চার সাক্ষী একমত, তাই তার উপর হদ্দ কায়েম করা হবে।

পক্ষান্তরে স্ত্রী লোকটির ক্ষেত্রে চারজন সাক্ষী একমত হতে পারেনি। দু'জন বলেছে, জেনার ব্যাপারে স্ত্রী লোক সম্মত ছিল। অপর দু'জন বলেছে, সে অসম্মত ছিল, তার সাথে জোরপূর্বক জেনা করা হয়েছে। অতএব, স্ত্রী লোকটির ক্ষেত্রে সাক্ষীর নেসাব চারজন পূর্ণ হলো না, তাই তার উপর হদ্দ ওয়াজিব হবে না।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও তার মতাবলম্বীদের দলিল ১. জেনার ব্যাপারে মহিলা সম্মত ছিল কি ছিল না এ বিষয়ে সাক্ষীদের মাঝে মতানৈক্য হওয়ার কারণে মহিলার পক্ষে জেনা সাব্যস্ত হবে না। কেননা জেনা এমন মর্মে যা একজনের মাধ্যমে তা সংঘটিত হতে পারে না। সুতরাং মহিলার পক্ষে জেনা সাব্যস্ত হবে না, আর পুরুষের পক্ষে তা সাব্যস্ত হয়ে যাবে এমনটি হতে পারে না। সুতরাং মহিলার উপর থেকে যেমন হদ্দ রহিত হয়ে যাবে, তেমনই পুরুষের উপর থেকেও তা রহিত হয়ে যাবে। দলিল ২. জেনার ব্যাপারে মহিলা সম্মত ছিল বলে, যে দু'জন সাক্ষী সাক্ষ্য দিয়েছে, সে দু'জন সাক্ষীর জেনা সম্পর্কিত সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ তারা মহিলার বিরুদ্ধে অপবাদ দেওয়ার কারণে তার প্রতিপক্ষ হয়ে গেছে। আর এটা স্বীকৃত বিষয় যে, কারো বিরুদ্ধে তার প্রতিপক্ষের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হয় না। অতএব, যখন দু'জনের সাক্ষ্যই বাতিল হয়ে গেল তখন বাকি থাকল মাত্র দু'জন সাক্ষী। আর দু'জনের সাক্ষ্য দ্বারা জেনা প্রমাণিত হয় না। বিধায় স্ত্রী পুরুষ কারো উপরই হদ্দ ওয়াজিব হবে না।

যে দু'জন সাক্ষী মহিলার সম্মতির কথা বলার কারণে অপবাদদাতা সাব্যস্ত হয়েছে, তাদের উপর অপবাদের হদ্দও কার্যকারী হবে না। এর কারণ হলো, অপর দু'জন সাক্ষীর জেনা সম্পর্কিত সাক্ষ্যের দ্বারা সংশ্লিষ্ট মহিলার ইহসান নষ্ট হয়ে গেছে। অর্থাৎ সে মুহসান থাকে নি। তাই তার অপবাদদাতার উপর হদ্দে কযফ (অপবাদের শাস্তি) বর্তাবে না। কেননা হদ্দে কযফ ওয়াজিব হওয়ার জন্য মহিলা মুহসান হওয়া শর্ত।

قَوْلُهُ : وَاِنْ شَهِدَ اِثْنَانِ اَنَّهُ زَنٰى بِامْرَأَةٍ بِالْكُوْفَةِ الخ : দু'জন সাক্ষী বলল, অমুক পুরুষ অমুক মহিলার সাথে জেনা করেছে কুফা নগরে; অপর দু'জন সাক্ষী বলল জেনা করেছে বসরা নগরে। সাক্ষীদের এই মতপার্থক্যের কারণে পুরুষ-মহিলা উভয় থেকে হদ্দ রহিদ হয়ে যাবে। কেননা সাক্ষীদের বক্তব্য অনুযায়ী দু'টি ব্যভিচার কর্ম সংঘটিত হয়েছে একটি কুফায় অপরটি বসরায়। আর প্রত্যেকটির ব্যাপারে দু'জন করে সাক্ষী। কিন্তু দু'জন সাক্ষীর সাক্ষ্য দ্বারা যেহেতু জেনা প্রমাণিত হয় না, তাই কোনো ঘটনার কারণেই কারো উপর হদ্দ জারি হবে না।

অবশ্য সাক্ষীদাতাদের উপরও হদ্দে কযফ প্রয়োগ করা হবে না। কারণ সাক্ষ্যদানের উপযুক্ত চারজন ব্যক্তি একই পুরুষ মহিলার ব্যাপারে একই কাজের সাক্ষ্যদান করেছে। এতে সাক্ষ্যের বিষয়টি এক ও অভিন্ন হওয়ার সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে এ সন্দেহের কারণে সাক্ষীদের উপর হদ্দে কযফ জারি করা যাবে না। মোটকথা আলোচ্য মাসআলায় ভিন্নতা ও অভিন্নতা দুরকম সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। প্রথম সন্দেহের কারণে পুরুষ মহিলার উপর থেকে জেনার হদ্দ রহিত হয়ে যাবে। আর দ্বিতীয় সন্দেহের কারণে সাক্ষীদের উপর থেকে হদ্দে কযফ রহিত হয়ে যাবে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَإِنْ اِخْتَلَفُوْا فِيْ بَيْتٍ وَاحِدٍ حُدَّ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ مَعْنَاهُ أَنْ يَشْهَدَ كُلُّ اِثْنَيْنِ عَلَى الزِّنَاءِ فِيْ زَاوِيَةٍ وَهٰذَا اسْتِحْسَانٌ وَالقِيَاسُ أَنْ لَّايُحَدَّ لِاِخْتِلَافِ الْمَكَانِ حَقِيْقَةً وَجْهُ الاِسْتِحْسَانِ أَنَّ التَّوْفِيْقَ مُمْكِنٌ بِأَنْ يَكُوْنَ اِبْتِدَاءُ الفِعْلِ فِيْ زَاوِيَةٍ وَالاِنْتِهَاءُ فِيْ زَاوِيَةٍ أُخْرٰى بِالاِضْطِرَابِ أَوْ لِأَنَّ الوَاقِعَ فِيْ وَسْطِ البَيْتِ فَيَحْسِبُهُ مَنْ فِي الْمُقَدَّمِ فِي الْمُقَدَّمِ وَمَنْ فِيْ الْمُؤَخَّرِ فِي الْمُؤَخَّرِ فَيَشْهَدُ بِحَسْبِ مَا عِنْدَه وَإِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ أَنَّهُ زَنٰى بِاِمْرَأَةٍ بِالنُّخَيْلَةِ عِنْدَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَأَرْبَعَةٌ أَنَّهُ زَنٰى بِهَا عِنْدَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ بِدَيْرِ هِنْدَ دُرِئَ الْحَدُّ عَنْهُمْ جَمِيْعًا أَمَّا عَنْهُمَا فَلِأَنَّا تَيَقَّنَّا بِكِذْبِ أَحَدِ الفَرِيْقَيْنِ مِنْ غَيْرِ عَيْنٍ وَأَمَّا عَنِ الشُّهُوْدِ فَلِاِحْتِمَالِ صِدْقِ كُلِّ فَرِيْقٍ وَإِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى اِمْرَأَةٍ بِالزِّنَاءِ وَهِيَ بِكْرٌ دُرِئَ الْحَدُّ عَنْهُمَا وَعَنْهُمْ لِأَنَّ الزِّنَاءَ لَا يَتَحَقَّقُ مَعَ بَقَاءِ البَكَارَةِ وَمَعْنَى المَسْأَلَةِ أَنَّ النِّسَاءَ نَظَرْنَ إِلَيْهَا فَقُلْنَ إِنَّهَا بِكْرٌ وَشَهَادَتُهُنَّ حُجَّةٌ فِيْ اِسْقَاطِ الحَدِّ وَلَيْسَ بِحُجَّةٍ فِيْ اِيْجَابِهِ فَلِهٰذَا سَقَطَ الْحَدُّ عَنْهُمَا وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ ـ

অনুবাদ : আর যদি একই ঘরের বিভিন্ন স্থানের ক্ষেত্রে সাক্ষীরা ভিন্ন মত করে, তাহলে নারী ও পুরুষ উভয়ের উপর হদ্দ কায়েম করা হবে। এর অর্থ এই যে, প্রতি দু'জন সাক্ষী একটি ঘরের ভিন্ন ভিন্ন কোনো জেনা সংঘটিত হওয়ার সাক্ষ্য প্রদান করেছে। এটা হলো সূক্ষ্ম কিয়াসের দাবি। কিয়াসের দাবি হলো হদ্দ প্রয়োগ না করা। কেননা প্রকৃতপক্ষে স্থান ভিন্ন হয়েছে।

সূক্ষ্ম কিয়াসের কারণ এই যে, উভয় সাক্ষ্যের মাঝে এভাবে সমন্বয় করা সম্ভব যে, জেনা শুরু হয়েছিল এক কোণে, কিন্তু জড়াজড়িও গড়াগড়ির কারণে তা শেষ হয়েছে গিয়ে অন্য কোণে। কিংবা ঘটনা ঘরের মধ্যস্থানে হয়েছে, কিন্তু যারা সামনের দিকে ছিল তারা সামনের দিকে ধারণা করেছে আর যারা পিছনের দিকে ছিল তারা পিছনের দিকে ধারণা করেছে। এভাবে প্রতি দু'জনই নিজ ধারণা অনুযায়ী সাক্ষ্য প্রদান করেছে।

আর যদি চারজন সাক্ষ্য দেয় যে, সে সূর্যোদয়ের সময় নুখায়লা নামক স্থানে একজনের স্ত্রী লোকের সাথে জেনা করেছে। আর চারজন সাক্ষ্য দেয় যে, সে সূর্যোদয়ের সময় তার সাথে দাইরহিন্দ নামক স্থানে জেনা করেছে। তাহলে সবার উপর থেকে হদ্দ রহিত হয়ে যাবে। স্ত্রী পুরুষ উভয় থেকে রহিত হওয়ার কারণ এই যে, অনির্ধারিতভাবে দুই দল সাক্ষীর একটি দলের মিথ্যাবাদিতা সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত। আর সাক্ষীদের থেকে হদ্দ রহিত হওয়ার কারণ, প্রত্যক দলের সত্যবাদিতার সম্ভাবনা রয়েছে।

যদি চারজন সাক্ষী কোনো স্ত্রী লোকের বিরুদ্ধে জেনার সাক্ষ্য দেয় অথচ প্রমাণিত হলো যে, স্ত্রী লোকটি কুমারী, তাহলে উভয় থেকে এবং সাক্ষীদের থেকে হদ্দ রহিত হয়ে যাবে।

কেননা কুমারিত্ব বিদ্যমান থাকা অবস্থায় জেনা সম্পন্ন হতে পারে না। মাসআলাটি স্বরূপ এই যে, স্ত্রী লোকেরা তার গুপ্তাঙ্গ দেখে তাকে কুমারী হওয়ার রায় দিল। আর হদ্দ রহিত হওয়ার ক্ষেত্রে স্ত্রী লোকদের সাক্ষ্য প্রমাণরূপে গৃহীত হয়, যদিও তা হদ্দ সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে প্রমাণ হতে পারে না। একারণেই স্ত্রী পুরুষ উভয় থেকে হদ্দ রহিত হয়ে যাবে। কিন্তু সাক্ষীদের উপর হদ্দ কায়েম হবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

প্রকাশ থাকে যে, আলোচ্য মাসআলায় ঘর বলতে ছোট ঘর উদ্দেশ্য। ঘরের ক্ষেত্রে সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না।

কিয়াসের দাবি অনুযায়ী এ মাসআলাটি পূর্বোক্ত মাসআলার অনুরূপ হওয়া উচিত ছিল। কেননা এখানেও সাক্ষীদের বক্তব্যের মাঝে প্রকৃত পক্ষেই স্থান ভিন্নতার বিষয়টি উল্লেখ হয়েছে। সে হিসাবে সাক্ষ্যের বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন নেসাব না হওয়ার কারণে এবং সাক্ষীর নেসাব পূর্ণ না হওয়ার কারণে জেনার হদ্দ রহিত হয়ে যাওয়ার কথা। ইমাম যুফার ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ী (র.) এমতই পোষণ করেন। কিন্তু ইস্তিহসানের আলোকে হানাফীগণ বলেছেন। হদ্দ কায়েম করা হবে।

যদি এমন আপত্তি করা হয় যে, আলোচ্য মাসআলাতে হদ্দ কায়েম করার জন্য কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে। অথচ শরিয়তের হদ্দ রহিত করার জন্য কৌশল অবলম্বন করতে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। তাহলে আমরা বলব, হদ্দ কায়েম করার জন্য কৌশল অবলম্বন করা হয়নি। বরং সাক্ষ্য কবুল করার জন্য কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে। তাছাড়া সাক্ষ্য একটি হুজ্জত। যতদূর সম্ভব এটাকে বিশুদ্ধ করার চেষ্টা করা বর্তব্য তাই এখানে সাক্ষ্য কবুল করার জন্য চেষ্টা করা হয়েছে। তবে এর দ্বারা হদ্দও ওয়াজিব হয়ে গেছে।

قَوْلُهُ : وَاِنْ شَهِدَ اَرْبَعَةٌ اَنَّهُ زَنٰى بِامْرَاَةٍ بِالنُّخَيْلَةِ الخ : নুখাইলা ও দাইরহিন্দ, কূফা নগরীর নিকটবর্তী দু'টি স্থানের নাম। আলোচ্য মাসআলায় জেনাকারী স্ত্রী পুরুষ ও সাক্ষীদের সকলের উপর থেকে হদ্দ রহিত হয়ে যাবে।

জেনাকারী স্ত্রী পুরুষের উপর থেকে হদ্দ রহিত হওয়ার কারণ এই যে, দুই দল সাক্ষীর মাঝে যে কোনো একদল সাক্ষী মিথ্যাবাদী নিশ্চিতরূপে। কেননা একই ব্যক্তির মাধ্যমে এক সময়ে দুই স্থানে জেনা সংঘটিত হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু কোন দলটি মিথ্যাবাদী তা অনির্দিষ্ট। অতএব, সকল সাক্ষীদের মাঝে মিথ্যাবাদিতার সন্দেহ সৃষ্টি হয়ে গেল। একারণে তাদের সাক্ষ্যের দ্বারা হদ্দ কায়েম করা যাবে না। পাশাপাশি তারা সত্যবাদী হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে এবং তাদের পরিপূর্ণ অর্থাৎ চারজন, একারণে তাদের উপর থেকেও হদ্দে কযফ রহিত হয়ে যাবে। ইমাম যুফার (র.)-এর মতে সাক্ষীদের উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে।

قَوْلُهُ : وَاِنْ شَهِدَ اَرْبَعَةٌ عَلٰى اِمْرَاَةٍ بِالزِّنَاءِ الخ : আলোচ্য মাসআলায় স্ত্রী পুরুষ থেকে হদ্দে জেনা রহিত হয়ে যাবে। এটা আহনাফের মত। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ (র.) ও এমত পোষণ করেন। তবে ইমাম মালেক (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। তার মতে স্ত্রী পুরুষের হদ্দে জেনা প্রয়োগ করা হবে। তিনি বলেন, হদ্দ বিষয়ে নারীদের সাক্ষ্যের কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। অতএব, তাদের কথার দ্বারা হদ্দ রহিত হবে না। বরং চার সাক্ষীর সাক্ষ্য মোতাবেক হদ্দ কায়েম করা হবে।

অন্যান্য ইমামগণ বলেন, হদ্দ সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে নারীদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু হদ্দ রহিত করার ক্ষেত্রে নারীদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। অতএব, নারীদের কথার উপর ভিত্তি করে হদ্দে জেনা রহিত হয়ে যাবে, কিন্তু তাদের কথার উপর ভিত্তি করে হদ্দে কযফ সাব্যস্ত হবে না। অতএব, আলোচ্য অবস্থায় স্ত্রী পুরুষ ও সাক্ষীবর্গ সকলের উপর থেকে হদ্দ রহিত হয়ে যাবে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَاِنْ شَهِدَ اَرْبَعَةٌ عَلٰى رَجُلٍ بِالزِّنَاءِ وَهُمْ عُمْيَانٌ او مَحْدُوْدُوْنَ فِىْ قَذْفٍ اَوْ اَحَدُهُمْ عَبْدٌ اَوْ مَحْدُوْدٌ فِىْ قَذْفٍ فَاِنَّهُمْ يُحَدُّوْنَ وَلَا يُحَدُّ الْمَشْهُوْدُ عَلَيْهِ لِاَنَّهُ لَا يَثْبُتُ بِشَهَادَتِهِمُ الْمَالُ فَكَيْفَ يَثْبُتُ الْحَدُّ وَهُمْ لَيْسُوْا مِنْ اَهْلِ اَدَاءِ الشَّهَادَةِ وَالْعَبْدُ لَيْسَ بِاَهْلٍ لِلتَّحَمُّلِ وَالْاَدَاءِ فَلَمْ يَثْبُتْ شُبْهَةُ الزِّنَاءِ لِاَنَّ الزِّنَاءَ يَثْبُتُ بِالْاَدَاءِ وَاِنْ شَهِدُوْا بِذٰلِكَ وَهُمْ فُسَّاقٌ اَوْ ظَهَرَ اَنَّهُمْ فُسَّاقٌ لَمْ يُحَدُّوْا لِاَنَّ الْفَاسِقَ مِنْ اَهْلِ الْاَدَاءِ وَالتَّحَمُّلِ وَاِنْ كَانَ فِىْ اَدَائِهِ نَوْعُ قُصُوْرٍ لِتُهْمَةِ الْفِسْقِ وَلِهٰذَا لَوْ قَضٰى الْقَاضِىْ بِشَهَادَةِ فَاسِقٍ يَنْفُذُ عِنْدَنَا فَيَثْبُتُ بِشَهَادَتِهِمْ شُبْهَةُ الزِّنَاءِ وَبِاِعْتِبَارِ قُصُوْرٍ فِىْ الْاَدَاءِ لِتُهْمَةِ الْفِسْقِ يَثْبُتُ شُبْهَةُ عَدَمِ الزِّنَاءِ فَلِهٰذَا اِمْتَنَعَ الْحَدَّانِ وَسَيَاْتِىْ فِيْهِ خِلَافُ الشَّافِعِىِّ (رحـ) بِنَاءً عَلٰى اَصْلِهِ اَنَّ الْفَاسِقَ لَيْسَ مِنْ اَهْلِ الشَّهَادَةِ فَهُوَ كَالْعَبْدِ عِنْدَهُ ـ

অনুবাদ : যদি চার জন সাক্ষী কোনো লোকের বিরুদ্ধে জেনার সাক্ষ্য প্রদান করে আর তারা অন্ধ কিংবা হদ্দে কযফ প্রাপ্ত হয় কিংবা তাদের একজন গোলাম হয় অথবা হদ্দে কযফ প্রাপ্ত হয়, তাহলে তাদের উপর হদ্দ কায়েম করা হবে। যার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে তার উপর হদ্দ কায়েম করা হবে না।

কেননা এদের সাক্ষ্য দ্বারা অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ই সাব্যস্ত হয় না, হদ্দ সাব্যস্ত হবে কিরূপে? আর যেহেতু এরা (সাক্ষ্য ধারণে সক্ষম হলেও শাসকের সামনে) সাক্ষ্য প্রদানের উপযুক্ত নয় আর গোলাম যেহেতু সাক্ষ্য ধারণ ও প্রদান কোনোটারই উপযুক্ত নয় সেহেতু জেনার সন্দেহ (পর্যন্ত) সাব্যস্ত হয়নি। কেননা জেনা সাব্যস্ত হয় সাক্ষ্য প্রদানের মাধ্যমে। (সুতরাং তাদের উপর অপবাদ আরোপের হদ্দ কায়েম করা হবে)

যদি তারা ফাসেক প্রমাণিত অবস্থায় জেনার সাক্ষ্য প্রদান করে কিংবা (সাক্ষ্য প্রদানের পর) প্রকাশ পায় যে, তারা ফাসেক তাহলে তাদের উপর হদ্দ কায়েম করা হবে না। কেননা ফাসেক ব্যক্তি সাক্ষ্য ধারণ ও সাক্ষ্য প্রদান দুটোরই উপযুক্ত। যদিও ফাসেক হওয়ার অভিযোগের কারণে তাদের সাক্ষ্য প্রদানের কিছুটা ত্রুটি রয়েছে।

একারণেই কাজি যদি ফাসেক লোকের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে কোনো ফয়সালা করেন তাহলে আমাদের মতে তা কার্যকর হয়। সুতরাং তাদের সাক্ষ্য দ্বারা জেনার সন্দেহ সাব্যস্ত হবে। আবার ফাসেক হওয়ার অভিযোগের কারণে সাক্ষ্য প্রদানের ত্রুটি বিবেচনায় জেনা সংঘটিত না হওয়ার সন্দেহও সাব্যস্ত হবে, সুতরাং জেনার হদ্দ এবং অপবাদ আরোপের হদ্দ উভয়ই রহিত হয়ে যাবে।

এক্ষেত্রে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর ভিন্নমত সামনে আসছে। যার ভিত্তি হলো তার এ মূলনীতির উপর যে, ফাসেক এ বিষয়ে গোলামের মতো।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সাক্ষ্যদানের উপযুক্ত চারজন সাক্ষীর সাক্ষ্য দ্বারা জেনা প্রমাণিত হয়। আর আলোচ্য মাসআলায় সকল সাক্ষী অন্ধ কিংবা হদ্দে কযফ প্রাপ্ত হওয়ার কারণে তারা কাজির সামনে সাক্ষ্য দানের উপযুক্ত নয়। অথবা সাক্ষীদের মাঝে একজন গোলাম সাক্ষীর নেসাব পূর্ণ হয়নি। কারণ গোলাম সাক্ষী হওয়ারই উপযুক্ত নয়। কিংবা চার সাক্ষীর মাঝে কোনো একজন হদ্দে কযফ প্রাপ্ত হওয়াতে সাক্ষীর নেসাব অর্থাৎ চারজন পূর্ণ হয়নি। একারণে এদের সাক্ষ্য দ্বারা জেনার সন্দেহও প্রমাণিত হয় না। কিন্তু তারা যেহেতু একজনের জেনার অপবাদ দিয়েছে তাই তাদের উপর অপবাদের শাস্তি প্রয়োগ করা হবে। যদি অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তি তা দাবি করে।

قوله : وانْ شَهِدُوْا بِذٰلِكَ وَهُمْ فُسَّاقٌ اَوْ ظَهَرَ الخ : প্রকাশ থাকে যে, আহনাফের মতে ফাসেক ব্যক্তি সাক্ষ্য ধারণ ও সাক্ষ্য প্রদান উভয়ের উপযুক্ত। তবে তাদের সাক্ষ্য প্রদান আদেল ব্যক্তির সাক্ষ্য প্রদানের সমান নয়। বরং ফাসেকের সাক্ষ্য প্রদানের বিষয়টি ত্রুটিযুক্ত। আর এ ত্রুটির কারণে জেনা প্রমাণিত হওয়ার বিষয়টি সন্দেহ যুক্ত হয়ে যায়। তাই স্ত্রী পুরুষের উপর হদ্দে জেনা প্রয়োগ করা যাবে না। অপর দিকে সাক্ষীদের উপরও হদ্দে কযফ প্রয়োগ হবে না। কারণ তারা সাক্ষ্যদানের উপযুক্ত এবং তাদের নেসাবও পরিপূর্ণ অর্থাৎ চারজন। এই বিবেচনায় তারা সত্যবাদী হওয়ার এবং বাস্তবেই জেনা সংঘটিত হওয়ারও সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে বিধায় তাদের উপর হদ্দে কযফ প্রয়োগ করা হবে না। মোটকথা, আলোচ্য পরিস্থিতিতে জেনা সংঘটিত হওয়া এবং না হওয়ার দু'রকম সম্ভাবনা রয়েছে দ্বিতীয় সম্ভাবনার বিবেচনায় হদ্দে জেনা রহিত হবে।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে ফাসেক গোলামের সমতুল্য। একারণে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। ফলে তাদের উপর হদ্দে কযফ প্রয়োগ করা হবে। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ও এক বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম মালেক (র.)-এর মতও তাই।

https://e-ilm.weebly.com/

وَإِنْ نَقَصَ عَدَدُ الْمَشْهُودِ عَنْ أَرْبَعَةٍ حُدُّوْا لِأَنَّهُمْ قَذَفَةٌ إِذْ لَاحِسْبَةَ عِنْدَ نُقْصَانِ الْعَدَدِ وَخُرُوْجِ الشَّهَادَةِ عَنِ الْقَذْفِ بِاعْتِبَارِهَا وَإِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلٰى رَجُلٍ بِالزِّنَاءِ فَضُرِبَ بِشَهَادَتِهِم ثُمَّ وُجِدَ أَحَدُهُمْ عَبْدًا أَوْ مَحْدُوْدًا فِي قَذْفٍ فَإِنَّهُمْ يُحَدُّوْنَ لِأَنَّهُمْ قَذَفَةٌ إِذْ الشُّهُوْدُ ثَلٰثَةٌ ـ

অনুবাদ : সাক্ষীদের সংখ্যা যদি চারের কম হয় তাহলে তাদের হদ্দে কযফ কার্যকর হবে। কারণ (আইনত) তারা অপবাদ আরোপকারী। কেননা সংখ্যার অপূর্ণতার সময় সাক্ষ্যদান কোনো ছওয়াবের কাজ নয়। আর ছওয়াবের দিক বিবেচনার কারণেই সাক্ষ্য প্রদান অপবাদ আরোপ হতে পৃথক।

চারজন যদি কোনো লোকের বিরুদ্ধে জেনার সাক্ষ্য প্রদান করে, অতঃপর তাদের সাক্ষ্যের উপর ভিত্তি করে তার উপর হদ্দ কায়েম করা হয়, অতঃপর দেখা গেল যে, তাদের একজন গোলাম কিংবা হদ্দে কযফপ্রাপ্ত, তাহলে তাদের উপর হদ্দে কযফ প্রয়োগ করা হবে। কেননা তারা অপবাদ আরোপকারী। কারণ প্রকৃত পক্ষে সাক্ষী তিন জনই রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সাক্ষীর সংখ্যা চারের কম হলে তাদের উপর হদ্দে কযফ প্রয়োগ করা হবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- فَإِنْ لَمْ يَأْتُوْا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمَانِيْنَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ـ

অর্থাৎ যদি তারা চারজন সাক্ষী হাজির করতে না পারে তাহলে তাদেরকে আশিটি করে বেত্রাঘাত কর। এবং কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করো না। ইমাম বায়যাবী (র.) বলেন, আলোচ্য মাসআলায় সাক্ষীদের উপর হদ্দে কযফ প্রয়োগের ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই, তবে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর এক উক্তি অনুযায়ী হদ্দে কযফ প্রয়োগ করা হবে না।

শাহাদত এবং কযফ তথা সাক্ষ্য এবং অপবাদ এ দু'ইয়ের মাঝে পার্থক্য ছওয়াব কামনা থাকা এবং না থাকা। অর্থাৎ অপবাদের দ্বারা ছওয়াব অর্জন আশা করা হয়না। কিন্তু সাক্ষ্যের দ্বারা ছওয়াব অর্জনের আশা করা হয়। কেননা সাক্ষ্য দানের উপযুক্ততা থাকাকালে সাক্ষী ব্যক্তি দু'ভাবে ছওয়াব অর্জন করতে পারে-

এক. মানুষের দোষ গোপন করার মাধ্যমে।

দুই. সাক্ষ্য দানের মাধ্যমে। আলোচ্য মাসআলায় যখন সাক্ষীরা সাক্ষ্য দিল, তখন বুঝা গেল তারা দোষ গোপন করার মাধ্যমে ছওয়াব অর্জন করতে চায়নি। আবার তাদের প্রদত্ত সাক্ষ্যের মাধ্যমেও ছওয়াব অর্জন সম্ভব নয়। যেহেতু তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হচ্ছে না, নেসাব পূর্ণ না হওয়ার কারণে। অতএব, যখন তাদের মধ্যে ছওয়াব অর্জনের কোনো সুযোগই থাকছে না, তখন তাদের কর্মটিকে সাক্ষ্য এবং তাদেরকে সাক্ষী বলা যাচ্ছে না। ফলে তাদেরকে অপবাদ আরোপকারী বলা আবশ্যকীয় হয়ে গেল। অতএব, তাদের উপর হদ্দে কযফ তথা অপবাদের শাস্তি প্রয়োগ করা হবে।

قذفة শব্দটি قاذف-এর বহুবচন। যেমন سرقة শব্দ سارق-এর বহুবচন। ফাসেক ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য (যেমন হানাফীগণ বলেন) এর দলিল হলো আল্লাহর বাণী- اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوْا কোনো ফাসেক ব্যক্তি যদি কোনো সংবাদ নিয়ে আসে তাহলে তোমরা যাচাই কর। প্রকাশ থাকে যে, সংবাদ গ্রহণ করার পরই যাচাই করা হয়।

قوله : وَإِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلٰى رَجُلٍ بِالزِّنَاءِ فَضُرِبَ الخ : সাক্ষীর নেসাব হলো চারজন। ফলে একজন গোলাম কিংবা হদ্দে কযফপ্রাপ্ত হওয়ার কারণে নেসাব অপূর্ণ হয়ে গেল। অতএব এ সাক্ষ্য আর সাক্ষ্য থাকেনি; বরং অপবাদ হয়ে গেছে, তাই সকল সাক্ষীর উপর হদ্দে কযফ প্রয়োগ করা হবে। গোলাম এবং হদ্দে কযফপ্রাপ্ত ব্যক্তির উপরও হদ্দ প্রয়োগ করা হবে। সাক্ষীদের কোনো একজন অন্ধ হলেও অনুরূপ হুকুম।

https://e-ilm.weebly.com/

وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ وَلاَ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ اَرْشُ الضَّرْبِ وَاِنْ رُجِمَ فَدِيَتُه عَلَى بَيْتِ الْمَالِ وَهٰذَا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَقَالاَ اَرْشُ الضَّرْبِ اَيْضًا عَلَى بَيْتِ الْمَالِ قَالَ الْعَبْدُ الضَّعِيْفُ عَصَمَهُ اللّٰهُ مَعْنَاهُ اِذَا كَانَ جَرْحُهُ وَعَلَى هٰذَا الْخِلَافِ اِذَا مَاتَ مِنَ الضَّرْبِ وَعَلَى هٰذَا اِذَا رَجَعَ الشُّهُوْدُ لَايَضْمَنُوْنَ عِنْدَهٗ وَعِنْدَهُمَا يَضْمَنُوْنَ لَهُمَا اَنَّ الْوَاجِبَ بِشَهَادَتِهِمْ مُطْلَقُ الضَّرْبِ اِذِ الْاِحْتِرَازُ عَنِ الْجَرْحِ خَارِجٌ عَنِ الْوُسْعِ فَيَنْتَظِمُ الْجَارِحُ وَغَيْرُهٗ فَيُضَافُ اِلَى شَهَادَتِهِمْ فَيَضْمَنُوْنَ بِالرُّجُوْعِ وَعِنْدَ عَدَمِ الرُّجُوْعِ يَجِبُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ لِاَنَّهٗ يَنْتَقِلُ فِعْلُ الْجَلَّادِ اِلَى الْقَاضِيْ وَهُوَ عَامِلٌ لِلْمُسْلِمِيْنَ فَتَجِبُ الْغَرَامَةُ فِيْ مَالِهِمْ فَصَارَ كَالرَّجْمِ وَالْقِصَاصِ وَلِاَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) اَنَّ الْوَاجِبَ هُوْ الْجَلْدُ وَهُوَ ضَرْبٌ مُؤْلِمٌ غَيْرُ جَارِحٍ وَلَا مُهْلِكٍ فَلَا يَقَعُ جَارِحًا ظَاهِرًا اِلَّا لِمَعْنًى فِيْ الضَّارِبِ وَهُوَ قِلَّةُ هِدَايَتِهِ فَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ اِلَّا اَنَّهٗ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الضَّمَانُ فِى الصَّحِيْحِ كَيْلَا يَمْتَنِعَ النَّاسُ عَنِ الْاِقَامَةِ مَخَافَةَ الْغَرَامَةِ ـ

অনুবাদ : তাদের উপর কিংবা বাইতুল মালের উপর অবশ্য প্রহারের ক্ষতিপূরণ সাব্যস্ত হবে না। আর যদি রজম হয়ে থাকে তাহলে তার দিয়ত বাইতুল মালের উপর অবশ্য সাব্যস্ত হবে।

এ হলো ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মত। পক্ষান্তরে সাহেবাইন (র) বলেন, প্রহারের ক্ষতিপূরণ ও বাইতুল মালের উপর সাব্যস্ত হবে। অধম বান্দা (আল্লাহ তাকে রক্ষা করুন) বলে, এর অর্থ এই যে, প্রহারের কারণে যদি জখম হয়। একই মতভিন্নতা রয়েছে, যদি বেত্রাঘাতের কারণে মৃত্যু ঘটে যায়। এই মতভিন্নতার ভিত্তিতেই যদি (বেত্রাঘাতের দ্বারা জখম বা মৃত্যু হওয়ার পর) সাক্ষীরা সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তাদের উপর ক্ষতিপূরণ সাব্যস্ত করা হবে না। আর সাহেবাইনের মতে তাদের উপর ক্ষতিপূরণ সাব্যস্ত করা হবে।

সাহেবাইনের দলিল এই যে, তাদের সাক্ষ্য দ্বারা নিঃশর্ত বেত্রাঘাত অবশ্য সাব্যস্ত হয়েছে। কেননা জখম পরিহার করে প্রহার করা সাধ্যাতীত। সুতরাং জখমকারী ও জখমহীন উভয় প্রকার প্রহারই অন্তর্ভুক্ত হবে। ফলে জখম বা মৃত্যু তাদের সাক্ষ্যের সাথেই সম্বন্ধিত হবে। এর প্রত্যাহারের কারণে তারা দায় বহনকারী হবে। আর প্রত্যাহার না করার কারণে বাইতুল মালের উপর দায় সাব্যস্ত হবে। কেননা জল্লাদের কর্ম কাজির সাথে সম্পর্কিত। যিনি মুসলমানদের জন্য কর্মরত। সুতরাং তাদের অর্থের মধ্যেই ক্ষতিপূরণ সাব্যস্ত হবে, যেমন রজম ও কেসাসের বেলায়।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল এই যে, (তাদের সাক্ষ্য দ্বারা) শুধু বেত্রাঘাত সাব্যস্ত হয়েছে। আর তা হলো ব্যথা সৃষ্টিকারী প্রহার, জখম সৃষ্টিকারী বা প্রাণঘাতী নয়, সুতরাং বাহ্যত: ঐ বেত্রাঘাত জখম সৃষ্টিকারী হবে না। প্রহারকারীর মাঝে নিহিত কোনো কারণ ছাড়া। আর তা হলো তার অভিজ্ঞতার স্বল্পতা। সুতরাং তা তার মধ্যেই সীমিত থাকবে। (সাক্ষীদের মাঝে সম্প্রসারিত হবে না) তবে বিশুদ্ধ মতে প্রহারকারীর উপরও ক্ষতিপূরণ সাব্যস্ত হবে না। যাতে ক্ষতিপূরণের ভয়ে মানুষ হদ্দ কায়েম করা থেকে বিরত না হয়ে পড়ে।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিউক্ত ইবারতে ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও সাহেবাইনের মতবিরোধ পূর্ণ তিনটি মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে।

১. কারো ব্যাপারে চারজন সাক্ষী জেনার সাক্ষ্য দানের পর তাকে বেত্রাঘাত করা হলো। তারপর দেখা গেলে সাক্ষীদের একজন গোলাম কিংবা হদ্দে কযফপ্রাপ্ত। এমতাবস্থায় সাক্ষীদের উপর হদ্দে কযফ প্রয়োগ করা হবে। কিন্তু তাদের উপর বেত্রাঘাতে ক্ষতিপূরণ দেওয়া আবশ্যক হবে না। বাইতুল মালের পক্ষ থেকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া আবশ্যক হবে না। হ্যাঁ, যদি সাক্ষ্যের ভিত্তিতে রজম করা হয়ে থাকে, তাহলে মৃতের দিয়ত পরিশোধ করা বাইতুল মালের উপর আবশ্যক হবে। এই হলো ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মাযহাব। সাহেবাইনের মাযহাব হলো রজমের সুরতে যেমন বাইতুল মালের উপর দিয়ত ওয়াজিব হবে। তেমনি বেত্রাঘাতের সুরতেও বাইতুল মালের উপর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে। (বেত্রাঘাত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো জখমকারী বেত্রাঘাত।) বেত্রাঘাত দ্বারা যদি জখম না হয়ে থাকে, তাহলে কারো মতেই ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না।

২. চারজন সাক্ষীর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে কাউকে জেনার হদ্দ স্বরূপ বেত্রাঘাত করা হলো এবং বেত্রাঘাতের কারণে সে মারা গেল। তারপর প্রতীয়মান হলো, সাক্ষীদের কেউ গোলাম কিংবা হদ্দে কযফপ্রাপ্ত কিংবা অন্ধ, এমতাবস্থায় ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে কিছু ওয়াজিব হবে না। সাহেবাইনের মতে বেত্রাঘাতে নিহত ব্যক্তির দিয়ত বাইতুল মালের উপর ওয়াজিব হবে।

৩. চারজন সাক্ষীর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে কাউকে বেত্রাঘাত করা হলো। এর ফলে সে জখমিত হলো কিংবা মারা গেল। অতঃপর সাক্ষীরা নিজ নিজ সাক্ষ্য হতে রুজু করল।

এমতাবস্থায় ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে সাক্ষীদের উপর কোনো ক্ষতিপূরণ বা দিয়ত ওয়াজিব হবে না। সাহেবাইনের মতে, বেত্রাঘাতকৃত ব্যক্তির যদি জখম হয়ে থাকে তাহলে এর ক্ষতিপূরণ, আর মরে গেলে তার দিয়ত পরিশোধ করা সাক্ষীদের উপর ওয়াজিব। ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর মতে ক্ষতিপূরণ ও দিয়ত পরিশোধ করা হাকিমের উপর ওয়াজিব হবে। শেষোক্ত মাসআলায় সাহেবাইনের দলিল হলো এই যে, সাক্ষীদের সাক্ষ্য দ্বারা বেত্রাঘাত সাব্যস্ত হয়েছে সাধারণভাবে, অতএব বেত্রাঘাত জখমকারী হোক বা জখমকারী নাই হোক উভয়ের দায়ভার সাক্ষীদের উপর বর্তাবে। এরূপ বলা যাবে না যে, সাক্ষ্য দ্বারা নিছক বেত্রাঘাত সাব্যস্ত হয়েছে, জখম বা মৃত্যু সাব্যস্ত হয়নি। তাই জখম ও মৃত্যুর দায় তার সাক্ষীদের উপর বর্তাবে না। কেননা জখমের আশঙ্কা এড়িয়ে বেত্রাঘাত প্রয়োগ করা বেত্রাঘাতকারীর ক্ষমতার বাইরে। অতএব, বেত্রাঘাতের পরে সাক্ষীরা রুজু করলে যেমন এর দায়ভার সাক্ষীদের উপর বর্তায়, তেমনি বেত্রাঘাতের কারণে ব্যক্তি জখম হলে বা মৃত্যুবরণ করলেও এর দায়ভার সাক্ষীদের উপরই বর্তাবে। কারণ জখম ও মৃত্যু বেত্রাঘাতের কারণে ঘটেছে, আর বেত্রাঘাত ঘটেছে তাদের সাক্ষ্যের কারণে, অতএব এখন তারা সাক্ষ্য হতে রুজু করলে সব কিছুর দায়ভার তাদেরকেই বহন করতে হবে।

সাক্ষীরা যদি রুজু না করে বরং তাদেরকেই গোলাম বা অন্ধ কিংবা হদ্দে কযফপ্রাপ্ত প্রমাণিত হয়, তাহলে জখমের ক্ষতিপূরণ এবং মৃত্যু হলে তার দিয়ত বাইতুল মালের উপর ওয়াজিব হবে, সাক্ষীদের উপর নয়, যেহেতু তারা রুজু করেনি। কেননা তখন মূলত জখম ও মৃত্যুর ব্যাপারটি কাজির দিকে সম্বন্ধিত হয়। যেহেতু সে সাক্ষ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে ভুল করেছে। আর কাজি যেহেতু জনগণের কর্মী, সেহেতু তা গিয়ে পড়বে জনগণের উপর। আর জনগণের সম্পদ হলো বাইতুল মাল। অতএব, কাজির ভুল বশত: যে ক্ষতি হয়েছে, তার ক্ষতিপূরণ বাইতুলমাল হতে পরিশোধ করা হবে।

আলোচ্য মাসআলায় ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো এই যে, সাক্ষীদের সাক্ষ্য দ্বারা নিছক জাল্লাদ বা বেত্রাঘাত সাব্যস্ত হয়েছে। যার অর্থ হলো ব্যথা সৃষ্টিকারী প্রহার জখমকারী বা প্রাণ হরণকারী নয়। অতএব, যদি বেত্রাঘাতের ফলে জখম কিংবা মৃত্যু ঘটে, তাহলে তা সাক্ষীদের দিকে সম্বন্ধিত হবে না। বরং জখম ও মৃত্যু মূলত সম্বন্ধিত হবে জাল্লাদের দিকে। কেননা বেত্রাঘাত প্রয়োগের ক্ষেত্রে তার অনভিজ্ঞতার কারণে জখম সৃষ্টি হয়ে থাকে।

কিংবা বেত্রাঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে থাকে। অতএব, এই জখমের ক্ষতিপূরণ ও মৃত্যু হলে তার দিয়ত সাক্ষীদের উপর বর্তাবে না, বরং কিয়াস অনুযায়ী তা জল্লাদের উপর বর্তায়। কিন্তু ইস্তিহসানের দাবি মোতাবেক তা জাল্লাদের উপরও ওয়াজিব হবে না। কেননা জাল্লাদের উপর ক্ষতিপূরণ কিংবা দিয়ত ওয়াজিব হলে পরবর্তী আর কেউ জল্লাদ প্রয়োগ তথা হদ্দ কায়েম করার জন্য প্রস্তুত হবে না, জরিমানার ভয়ে। অতএব আলোচ্য অবস্থায় ক্ষতিপূরণ বা দিয়ত কারো উপরেই ওয়াজিব হবে না।

মানতে উল্লিখিত (في الصحيح) বিশুদ্ধ মতানুসারে বলার মাধ্যমে ফখরুল ইসলাম রচিত মাবসূত কিতাবের একটি বর্ণনা হতে ইহতেরায করা উদ্দেশ্য। কেননা বর্ণনা মোতাবেক আলোচ্য মাসআলায় জল্লাদের উপরে জখমের ক্ষতি পূরণ ও মৃত্যু হলে দিয়ত ওয়াজিব হবে। কারণ হিসাবে বলা হয়েছে, জল্লাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব ছিল প্রহার করা। জখম করা কিংবা মৃত্যু ঘটানোর অধিকার তাকে দেওয়া হয়নি। অতএব জখম ও মৃত্যু ঘটানো তার বাড়াবাড়ি বলে গণ্য হবে এবং এ কারণেই তাকে এর ক্ষতিপূরণ বা দিয়ত পরিশোধ করতে হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَإِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلٰى شَهَادَةِ أَرْبَعَةٍ عَلٰى رَجُلٍ بِالزِّنَاءِ لَمْ يُحَدَّ لِمَا فِيْهَا مِنْ زِيَادَةِ الشُّبْهَةِ وَلَا ضَرُوْرَةَ إِلٰى تَحَمُّلِهَا فَإِنْ جَاءَ الْأَوَّلُوْنَ فَشَهِدُوْا عَلَى الْمُعَايَنَةِ فِيْ ذٰلِكَ الْمَكَانِ لَمْ يُحَدَّ أَيْضًا مَعْنَاه شَهِدُوْا عَلٰى ذٰلِكَ الزِّنَاءِ بِعَيْنِهِ لِأَنَّ شَهَادَتَهُمْ قَدْ رُدَّتْ مِنْ وَجْهٍ بِرَدِّ شَهَادَةِ الْفُرُوْعِ فِيْ عَيْنِ هٰذِهِ الْحَادِثَةِ إِذْهُمْ قَائِمُوْنَ مَقَامَهُمْ فِي الْأَمْرِ وَالتَّحْمِيْلِ وَلَا يُحَدُّ الشُّهُوْدُ لِأَنَّ عَدَدَهُمْ مُتَكَامِلٌ وَامْتِنَاعُ الْحَدِّ عَنِ الْمَشْهُوْدِ عَلَيْهِ لِنَوْعِ شُبْهَةٍ وَهِيَ كَافِيَةٌ لِدَرْءِ الْحَدِّ لَا لِإِيْجَابِهِ ـ

অনুবাদ : চারজন লোক যদি এমর্মে সাক্ষ্য প্রদান করে যে, অন্য চারজন লোক কারো বিরুদ্ধে জেনার সাক্ষ্য প্রদান করেছে, তাহলে ঐ লোকটির উপর হদ্দ জারি করা হবে না। কেননা সাক্ষীর উপর এই দ্বিতীয় সাক্ষীতে অতিরিক্ত সন্দেহ রয়েছে। আর অতিরিক্ত সন্দেহ করার কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই।

এরপর যদি প্রথম দল এসে উক্ত স্থানে ব্যভিচার কর্ম অবলোকনের সাক্ষ্য প্রদান করে তাহলেও হদ্দ কায়েম করা হবে না। উক্ত স্থানে এর অর্থ হলো হুবহু পূর্ব বর্ণিত জেনার সাক্ষ্য প্রদান করা। কেননা একই ঘটনার ব্যাপারে অনুবর্তীদের সাক্ষ্য রদ করার মধ্য দিয়ে এক হিসাবে তাদের সাক্ষ্যও রদ করা হয়ে গেছে। কেননা সাক্ষ্য ও সাক্ষ্য ধারণের ক্ষেত্রে তারা মূল সাক্ষীদের স্থলবর্তী।

তবে মূল সাক্ষী ও অনুবর্তী সাক্ষীদের উপর হদ্দ কায়েম করা হবে না। কেননা তাদের সংখ্যা পূর্ণ রয়েছে। আর যার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করা হয়েছে তার থেকে হদ্দ রহিত হওয়ার কারণ এক ধরনের সন্দেহের উপস্থিতি। (অর্থাৎ অনুবর্তীদের ক্ষেত্রে সাক্ষ্য ধারণের ব্যাপারে সন্দেহ বরং মূল সাক্ষীদের ব্যাপারে সাক্ষ্য রদ্দ করে দেওয়ার সন্দেহ)। আর এই সন্দেহ জেনার হদ্দ প্রতিহত করে দেওয়ার জন্য তো যথেষ্ট। কিন্তু সাক্ষীদের উপর হদ্দে কযফ সাব্যস্ত করার করা জন্য যথেষ্ট নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আলোচ্য মাসআলাটির সুরত এই হবে যে, কেউ জেনা করেছে এ ব্যাপারে চারজন সাক্ষী ছিল এরা নিজদের সাক্ষ্য দানের উপর অন্য চারজন লোককে সাক্ষী বানাল। অতঃপর দ্বিতীয় চার সাক্ষী প্রথম চার সাক্ষীর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে জেনার সাক্ষ্য দিল। এমতাবস্থায় এ সাক্ষ্যের ভিত্তিতে ঐ ব্যক্তিকে হদ্দ লাগানো হবে না, যার ব্যাপারে জেনার সাক্ষ্য প্রদান করা হলো। কেননা এখানে এরূপ সন্দেহ রয়েছে যে, না জানি আসল সাক্ষীরা কি বলেছিল হতে পারে তারা এমন কিছু বলেছিল যার দ্বারা হদ্দ ওয়াজিব হতো না। কিংবা তারা হয়তো সঠিক বলেছিল, এরা তাতে রদ বদল করেছে। এভাবে এ সাক্ষ্যতে সন্দেহ সৃষ্টি হয়ে থাকে। অতএব, এমন সন্দেহপূর্ণ সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না। বরং তা প্রত্যাখ্যাত হবে। আর এই সাক্ষীদের সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হওয়ার মাধ্যমে প্রথম সাক্ষীদের সাক্ষ্যও প্রত্যাখ্যাত হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ : فَإِنْ جَاءَ الْأَوَّلُوْنَ فَشَهِدُوْا عَلَى الْمُعَايَنَةِ الخ : আলোচ্য মাসআলায় সাক্ষীরা দুই স্তর হওয়ার কারণে সাক্ষ্যের মাঝে সন্দেহ জেগেছে। এ সন্দেহের কারণে হদ্দে জেনা রহিত হয়ে যাবে। কিন্তু এর উপর ভিত্তি করে সাক্ষীদেরকে অপবাদ আরোপকারী বলা যাবে না এবং তাদের উপরে হদ্দও কায়েম করা যাবে না। কেননা তাদের সাক্ষ্য দানের যোগ্যতা রয়েছে এবং তাদের নেসাবও পূর্ণ আছে। অতএব, শুধু সন্দেহের উপর ভর করে হদ্দ কায়েম করা যাবে। যেমন সন্দেহের উপর ভর করে হদ্দ রহিত করা যায়।

প্রশ্ন হতে পারে যে, মূল সাক্ষীর অনুপস্থিতিতে অনুবর্তী সাক্ষ্য দ্বারা অর্থ সম্পদ বিষয় দাবি-দাওয়া প্রমাণিত হয়ে থাকে অতএব জেনা প্রমাণিত হবে না কেন? এর উত্তর যে, অর্থ বিষয়ক দাবি-দাওয়া সন্দেহের সাথেও প্রমাণিত বা সাব্যস্ত হতে পারে। কিন্তু কখনো সামান্যতম সন্দেহের সাথে সাব্যস্ত হতে পারে না। একারণে অনুবর্তী সাক্ষীর সাক্ষ্য দ্বারা অর্থ সম্পদ সাব্যস্ত হলেও জেনা বা জেনার হদ্দ সাব্যস্ত হবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

وإذَا شَهِدَ اَرْبَعَةٌ عَلٰى رَجُلٍ بِالزِّنَاءِ فَرُجِمَ فَكُلَّمَا رَجَعَ وَاحِدٌ حُدَّ الرَّاجِعُ وَحْدَهُ وَغَرِمَ رُبْعَ الدِّيَةِ
اَمَّا الغَرَامَةُ فَلِاَنَّهُ بَقِيَ مَنْ يَبْقٰى بِشَهَادَتِهِ ثَلٰثَةُ اَرْبَاعِ الْحَقِّ فَيَكُوْنُ الفَائِتُ بِشَهَادَةِ
الرَّاجِعِ رُبْعَ الحَقِّ وَقَالَ الشَّافِعُ (رحـ) يَجِبُ القَتْلُ دُوْنَ المَالِ بِنَاءً عَلٰى اَصْلِهِ فِيْ شُهُوْدِ
القِصَاصِ وسَنُبَيِّنُهُ فِيْ الدِّيَاتِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَاَمَّا الحَدُّ فَمَذْهَبُ عُلَمَائِنَا الثَّلٰثَةِ
(رحـ) وقَالَ زُفَرُ (رحـ) لَايُحَدُّ لِاَنَّهُ اِنْ كَانَ الرَّاجِعُ قَاذِفُ حَيٍّ فَقَدْ بَطَلَ بِالمَوْتِ واِنْ
كَانَ قَاذِفُ مَيِّتٍ فَهُوَ مَرْجُوْمٌ بِحُكْمِ القَاضِيْ فَيُوْرِثُ ذٰلِكَ شُبْهَةً ولَنَا اَنَّ الشَّهَادَةَ اِنَّمَا
تَنْقَلِبُ قَذْفًا بالرُّجُوْعِ لِاَنَّ بِهِ تَفْسُخُ شَهَادَتُهُ فَجُعِلَ لِلْحَالِ قَذْفًا لِلْمَيِّتِ وَقَدْ اِنْفَسَخَتِ
الحُجَّةُ فَيَنْفَسِخُ مَا يُبْتَنٰى عَلَيْهِ وَهُوَ القَضَاءُ فِيْ حَقِّهِ فَلَا يُوْرِثُ الشُّبْهَةَ بِخِلَافِ مَا اِذَا
قَذَفَهُ غَيْرُهُ لِاَنَّهُ غَيْرُ مُحْصَنٍ فِيْ حَقِّ غَيْرِهِ لِقِيَامِ القَضَاءِ فِيْ حَقِّهِ ـ

অনুবাদ : চারজন যখন কারো বিরুদ্ধে জেনার সাক্ষ্য প্রদান করে এবং তাকে রজম করা হয়, তখন পরবর্তীতে যখনই একজন সাক্ষী সাক্ষ্য প্রত্যাহার করবে তখনই তার উপর হদ্দে কযফ প্রয়োগ করা হবে এবং সে দিয়তের এক চতুর্থাংশের দণ্ড বহন করবে।

অর্থ দণ্ডের কারণ এই যে, যারা নিজেদের সাক্ষ্যে অটল রয়েছে তাদের সাক্ষ্যের কারণে হকের তিন চতুর্থাংশ বহাল রয়েছে। সুতরাং প্রত্যাহারকারীর সাক্ষ্যের কারণে হকের এক চতুর্থাংশ নষ্ট হবে।

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, অর্থ দণ্ড নয়; বরং প্রত্যাহারকারীর মৃত্যুদণ্ড সাব্যস্ত হবে। এর ভিত্তি হচ্ছে কেসাসের সাক্ষীদের ব্যাপারে তার গৃহীত নীতির উপর। ইনশাআল্লাহ দিয়াত অধ্যায়ে আমরা তা আলোচনা করব।

আর প্রত্যাহারকারীর উপর হদ্দে কযফ প্রয়োগ হচ্ছে আমাদের তিন ইমামের মাযহাব। পক্ষান্তরে ইমাম যুফার (র.) বলেন, হদ্দ প্রয়োগ করা হবে না। কেননা প্রত্যাহারকারী যদি জীবিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপকারী হয়, তাহলে তার হদ্দ মৃত্যুর কারণে বাতিল হয়ে গেছে। (হদ্দে কযফের ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার প্রযোজ্য নয়)

আর যদি মৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপকারী হয়, তাহলে যেহেতু সে কাজির রায় অনুসারে রজমকৃত হয়েছে। সেহেতু তা (মুহছান হওয়া রহিত করলেও) সন্দেহ উদ্রেককারী হবে। (আর সন্দেহ দ্বারা হদ্দ বাতিল হয়ে যায়।)

আমাদের দলিল এই যে, প্রত্যাহারের কারণে সাক্ষ্যটি অপবাদে রূপান্তরিত হচ্ছে। কেননা এতে সাক্ষ্যগুণ রহিত হয়ে যায়। সুতরাং তাৎক্ষণিকভাবে মৃতের নামে অপবাদ আরোপ সাব্যস্ত করা হবে। আর যেহেতু সাক্ষ্য বা দলিল রহিত হয়ে গেছে সেহেতু প্রত্যাহারকারীর ক্ষেত্রে সাক্ষ্য ও দলিলের উপর ভিত্তিকৃত আদালতের রায় রহিত হয়ে যাবে। সুতরাং এই রায় (অপবাদ আরোপকৃত ব্যক্তির ইহসান বিলুপ্তির) সন্দেহ উদ্রেক করবে না।

পক্ষান্তরে অন্য কারো পক্ষ হতে তার নামে অপবাদ আরোপের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা অন্যের ব্যাপারে যেহেতু আদালতের রায় বহাল রয়েছে, সেহেতু অন্যের ক্ষেত্রে রজমকৃত লোকটি মুহসান নয়।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মুহসান ব্যক্তির বিরুদ্ধে জেনার অভিযোগ এনে সাক্ষ্য দিয়ে তাকে রজমের মাধ্যমে হত্যা করা হলে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে কোনো অর্থদণ্ড কবুল করা হবে না বরং তাকেও হত্যা করা হবে।

আমাদের ইমামত্রয় বলেছেন, প্রত্যেক সাক্ষীর নিকট থেকে গোটা দিয়তের এক চতুর্থাংশ করে উসুল করা হবে এবং তার উপর হদ্দে কযফও প্রয়োগ করা হবে। ইমাম যুফার (র.) বলেছেন হদ্দ লাগানো হবে না।

ইমাম যুফার (র.)-এর দলিল হিসাবে বলা হয়, কেউ যদি কোনো মুহসান মুসলমানের জীবদ্দশায় তার উপর জেনার অপবাদ আরোপ করে, তাহলে তার উপর হদ্দে কযফ প্রয়োগ করা হয়, আলোচ্য অবস্থায় যার বিরুদ্ধে জেনার সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে, তাকে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করা হয়ে গেছে এখন যদি সাক্ষীরা তাদের সাক্ষ্য হতে ফিরে আসে। তাহলে এই সাক্ষ্য পরিবর্তন হয়ে অপবাদে রূপান্তরিত হতে পারে না, কারণ যদি এ সাক্ষ্যকে নিহত ব্যক্তির জীবদ্দশাতেই তার বিরুদ্ধে জেনার অপবাদ বলে ধরে নেওয়া হয়, তাহলেও তার মৃত্যুর মাধ্যমে অপবাদ আরোপকারী উপর থেকে অপবাদের শাস্তি রহিত হয়ে গেছে। কেননা হদ্দে বা অপবাদের শাস্তি মিরাশের ন্যায় একজন হতে অন্যজনে স্থানান্তরিত হয় না।

আর যদি উক্ত সাক্ষ্যকে ঐ ব্যক্তির মৃত্যুর পরে তার বিরুদ্ধে জেনার অপবাদ বলে ধরা হয়, তাহলে ব্যক্তিটি যেহেতু কাজির নির্দেশ ক্রমে জেনাকারী হিসাবে প্রস্তর নিক্ষেপে নিহত হয়েছে, সেহেতু জেনাকারীকে জেনাকারী বললে সেটা অপবাদ হবে না। কিন্তু সাক্ষীরা তাদের সাক্ষ্য হতে রুজু করার কারণে প্রকৃতপক্ষে জেনা সাব্যস্ত হয়নি এবং ঐ লোকটি জেনাকারী হয়নি। তথাপি কাজি কর্তৃক জেনার হুকুম জারি করার কারণে এক ধরনের সন্দেহ অবশ্যই সৃষ্টি হয়েছে। এ সন্দেহের কারণেই সাক্ষীদের উপর থেকে হদ্দে কযফ রহিত হয়ে যাবে। আমাদের দলিল এই যে, কাজি প্রস্তর নিক্ষেপের হুকুম তখনই জারি করেছিল যখন সাক্ষীদের নেসাব তার কাছে পূর্ণ ছিল। এরপর যখন একজন সাক্ষী তার সাক্ষ্য হতে রুজু করল, তখন কাজির হুকুমও বাতিল হয়ে গেল। কেননা কাজির হুকুমের ভিত্তি ছিল চারজন সাক্ষীর সাক্ষ্যের উপর। এখন যেহেতু সাক্ষী চারজন নেই সেহেতু কাজির হুকুমও নেই। অতএব, রুজুকারীর সাক্ষী নিজের বক্তব্য অনুযায়ী ঐ ব্যক্তির উপর অপবাদ লাগাল, যার ব্যাপারে কাজির রজম সম্পর্কিত হুকুম বাতিল হয়ে গেছে। অতএব, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে, সে একজন নির্দোষ মুহসান ব্যক্তির বিরুদ্ধে জেনার অপবাদ আরোপ করেছে। হ্যাঁ, তবে যদি সাক্ষীরা ছাড়া অন্য কেউ তার বিরুদ্ধে জেনার অপবাদ আরোপ করে, তাহলে তার সম্পর্কে কাজির হুকুম বহাল থাকবে এবং এ কারণে সাক্ষীদের উপর হদ্দে কযফ প্রয়োগ করা হবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

فَإِنْ لَمْ يُحَدَّ الْمَشْهُوْدُ عَلَيْهِ حَتّٰى رَجَعَ وَاحِدٌ مِنْهُم حُدُّوْا جَمِيْعًا وَسَقَطَ الْحَدُّ عَنِ الْمَشْهُوْدِ عَلَيْهِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ (رحـ) حُدَّ الرَّاجِعُ خَاصَّةً لِاَنَّ الشَّهَادَةَ تَاَكَّدَتْ بِالْقَضَاءِ فَلَا يَنْفَسِخُ اِلَّا فِىْ حَقِّ الرَّاجِعِ كَمَا اِذَا رَجَعَ بَعْدَ الْاِمْضَاءِ وَلَهُمَا اَنَّ الْاِمْضَاءَ مِنْ الْقَضَاءِ فَصَارَ كَمَا اِذَا رَجَعَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ قَبْلَ الْقَضَاءِ وَلِهٰذَا سَقَطَ الْحَدُّ عَنِ الْمَشْهُوْدِ عَلَيْهِ وَلَوْ رَجَعَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ قَبْلَ الْقَضَاءِ حُدُّوْا جَمِيْعًا وَقَالَ زُفَرُ (رحـ) يُحَدُّ الرَّاجِعُ خَاصَّةً لِاَنَّهٗ لَايُصَدَّقُ عَلٰى غَيْرِهٖ وَلَنَا اَنَّ كَلَامَهُمْ قَذْفٌ فِىْ الْاَصْلِ وَاِنَّمَا يَصِيْرُ شَهَادَةً بِاتِّصَالِ الْقَضَاءِ بِهٖ فَاِذَا لَمْ يَتَّصِلْ بَقِىَ قَذْفًا فَيُحَدُّوْنَ ـ

অনুবাদ : আর যার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে, তার উপর হদ্দ প্রয়োগের পূর্বেই যদি কোনো একজন সাক্ষী সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তাহলে সবার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে এবং যার রিদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে তার থেকে হদ্দ রহিত হয়ে যাবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, শুধু প্রত্যাহারকারীর উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে। কেননা আদালতের ফয়সালার কারণে সাক্ষ্যটি দৃঢ়তা লাভ করেছে। সুতরাং শুধু প্রত্যাহারকারীর ক্ষেত্রেই সাক্ষ্য রহিত হবে। (অন্যান্য সাক্ষ্যের উপর তা প্রভাব ফেলবে না।) যেমন আদালতের রায় কার্যকর হওয়ার পর যদি কোনো সাক্ষী তার সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে। শাইখানের দলিল এই যে, হদ্দ কার্যকর করাও আদালতের ফয়সালার অংশভুক্ত। সুতরাং এটা আদালতের রায় ঘোষণার পূর্বে প্রত্যাহার করার মতোই হলো। একারণেই যার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে সে ব্যক্তি হতে হদ্দ রহিত হয়ে যায়। যদি রায় ঘোষণার পূর্বে কোনো একজন তার সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তাহলে (তিন ইমামের মতে) সকল সাক্ষীর উপরই হদ্দ প্রয়োগ করা হবে। আর ইমাম যুফার (র.) বলেন, শুধু প্রত্যাহারকারীর উপরে হদ্দ প্রয়োগ করা হবে। কেননা অন্যদের ব্যাপারে তাকে বিশ্বাসযোগ্য মনে করা যায় না।

আমাদের দলিল এই যে, তাদের বক্তব্য মূলত অপবাদ। আদালতে রায় সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে তা সাক্ষ্যের মর্যাদা লাভ করে থাকে। সুতরাং আদালতের রায় যখন যুক্ত হলো না তখন অপবাদ রূপেই বিবেচনা থাকবে। ফলে তাদের সকলের উপর হদ্দ কার্যকর হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

জেনে রাখা উচিত যে, সাক্ষ্য প্রত্যাহার করার তিনটি সুরত হতে পারে–

১. কাজির রায় ঘোষণা ও তা বাস্তবায়নের পরে সাক্ষ্য প্রত্যাহার করা

২. রায় ঘোষণার পরে বাস্তবায়নের পূর্বে সাক্ষ্য প্রত্যাহার করা।

৩. রায় ঘোষণা ও বাস্তবায়ন উভয়ের পূর্বেই সাক্ষ্য প্রত্যাহার করা।

এ তিন সুরতের মধ্য হতে প্রথমটি ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে।

আলোচ্য মাসআলায় দ্বিতীয় সুরতের হুকুম বর্ণিত হবে। রায় ঘোষণার পরে এবং তা বাস্তবায়নের পূর্বে যদি কোনো একজন সাক্ষী তার সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তাহলে সকল সাক্ষীকে হদ্দে কযফ লাগানো হবে। আর যার বিরুদ্ধে জেনার

https://e-ilm.weebly.com/

সাক্ষ্য প্রদান করা হয়েছিল, তার থেকে জেনার হদ্দ রহিত হয়ে যাবে। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মত এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর শেষ উক্তি। ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম যুফার (র.) বলেন, শুধু প্রত্যাহারকারী সাক্ষীকে হদ্দে কযফ লাগানো হবে। সকল সাক্ষীকে নয়। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) প্রথমে তাই বলতেন। আর ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন, প্রত্যাহারকারীর উপরও হদ্দ প্রয়োগ করা হবে না।

ইমাম মুহাম্মদ ও যুফার (র.)-এর দলিল হলো এই যে, সাক্ষ্যটি কাজির রায়ের মাধ্যমে শক্তিশালী মজবুত হয়ে গেছে। অতএব, এটা কেবল প্রত্যাহার কারীর ক্ষেত্রেই বাতিল হবে, অন্যান্য সাক্ষীদের ক্ষেত্রে বাতিল হবে না। অতএব, শুধু প্রত্যাহার কারীকেই হদ্দ প্রয়োগ করা হবে, অন্যদেরকে নয়। যেমনটি হয়ে থাকে রায় বাস্তবায়নের পূর্বে প্রত্যাহার করলে।

শায়খান তথা ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল হলো এই যে, রায় বাস্তবায়ন রায় ঘোষণারই অন্তর্ভুক্ত। একারণেই কাজির উপস্থিতি ব্যতীত বাস্তবায়ন করা যায় না। অতএব, রায় বাস্তবায়নের পূর্বে সাক্ষ্য প্রত্যাহারকে রায় ঘোষণার পূর্বে সাক্ষ্য প্রত্যাহারের মতোই মনে করা হবে। আর রায় ঘোষণার পূর্বে একজন সাক্ষী সাক্ষ্য প্রত্যাহার করলে সকল সাক্ষীকেই হদ্দ লাগানো হয়। অতএব, আলোচ্য সুরতেও সকল সাক্ষীকে হদ্দ লাগাতে হবে।

মোটকথা, পূর্বোক্ত তিন সুরতের মধ্যে হতে দ্বিতীয় বা মধ্যবর্তী সুরতটিকে ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম যুফার (র.) কিয়াস করেন প্রথম সুরতের সাথে। আর ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) কিয়াস করেন তৃতীয় সুরতের সাথে। শায়খানের কিয়াসকে সমর্থন করে আরো একটি বিষয়, তা হলো যার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে, তার থেকে হদ্দ রহিত হয়ে যাওয়া। যেমন রায় ঘোষণার পূর্বে সাক্ষ্য প্রত্যাহার করলে হদ্দ রহিত হয়ে যায়। এর দ্বারা বুঝা গেল দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সুরতের হুকুম এক।

যদি রায় ঘোষণার পূর্বেই একজন সাক্ষী তার সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে, তাহলে সকল সাক্ষীকে হদ্দ লাগানো হবে। এটা ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মত। ইমাম যুফার (র.) বলেন, শুধু প্রত্যাহারকারীকে হদ্দ লাগানো হবে। ইমাম যুফার (র.)-এর দলিল হলো প্রত্যাহারকারী সাক্ষী তার নিজের বিরুদ্ধে হুজ্জত হতে পারে। অন্যান্য সাক্ষীদের বিরুদ্ধে সে হুজ্জত নয়। অর্থাৎ তাকে অন্যান্য সাক্ষীদের বিরুদ্ধে বিশ্বাস করা যায় না। অতএব, তার প্রত্যাহারের কারণে তাকেই শুধু হদ্দ লাগানো হবে, অন্যদেরকে নয়।

তিন ইমামের দলিল হলো এ সাক্ষীদের বক্তব্যটি মূলত : অপবাদ, এর সাথে কাজির রায় সম্পৃক্ত হলে সাক্ষ্যের মর্যাদায় উন্নীত হয়। কিন্তু আলোচ্য সুরতে যেহেতু এর সাথে কাজির রায় সম্পৃক্ত হয়নি, সেহেতু এটা অপবাদই থেকে যাবে এবং একারণে সকল অপবাদ আরোপকারী (সাক্ষী)-কে হদ্দে কযফ প্রয়োগ করা হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

فَإِنْ كَانُوْا خَمْسَةً فَرَجَعَ أَحَدُهُمْ فَلا شَيْءَ عَلَيْهِمْ لِأَنَّهُ بَقِيَ مَنْ يَبْقَى بِشَهَادَتِهِ كُلُّ الحَقِّ وهُوَ شَهَادَةُ الأَرْبَعِ فَإِنْ رَجَعَ أخَرُ حُدَّ أَوْ غَرِمَا رُبْعَ الدِّيَةِ أَمَّا الحَدُّ فَلِمَا ذَكَرْنَا وأَمَّا الغَرَامَةُ فَلِأَنَّهُ بَقِيَ مَنْ يَبْقَى بِشَهَادَتِهِ ثَلٰثَةُ أَرْبَاعِ الحَقِّ والمُعْتَبَرُ بَقَاءُ مَنْ بَقِيَ لَا رُجُوْعُ مَنْ رَجَعَ عَلَى مَا عُرِفَ ـ

অনুবাদ : সাক্ষী যদি পাঁচজন হয়, এবং তাদের একজন সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে, তাহলে তাদের উপর কোনো কিছুই হবে না।

কেননা যাদের সাক্ষ্যের দ্বারা পূর্ণ হক বহাল থাকে অর্থাৎ চারজন সাক্ষী তারা বিদ্যমান রয়েছে। এরপর যদি আরেকজন প্রত্যাহার করে তাহলে প্রত্যাহারকারী উভয়ের উপর হদ্দ কায়েম করা হবে এবং উভয়ের উপর দিয়তের এক চতুর্থাংশের দায় আরোপ করা হবে। হদ্দ প্রয়োগের কারণ তো আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

অর্থদণ্ডের কারণ এই যে, যারা অবশিষ্ট রয়েছে তাদের দ্বারা 'হক' -এর তিন চতুর্থাংশ বহাল রয়েছে। আর যারা বহাল রয়েছে তাদের বহাল থাকাই বিবেচ্য, যারা প্রত্যাহার করেছে, তাদের প্রত্যাহার বিবেচ্য নয়। যেমন পূর্বে (كتاب الشهادات সাক্ষ্য পর্বে) আলোচিত হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যদি পাঁচ ব্যক্তির সাক্ষ্যের ভিত্তিতে কাউকে রজম করা হয়, অতঃপর একজন সাক্ষী তার সাক্ষ্য প্রত্যাহাব করে তাহলে প্রত্যাহারকারী ও অন্যান্য সাক্ষীদের কারো উপরই কোনো হদ্দ বা দিয়ত কিছুই ওয়াজিব হবে না. এটা আহনাফ, ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর অভি মত। বিশুদ্ধতম বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতও তাই। এ হুকুমের কারণ এই যে, একজন সাক্ষী তার সাক্ষ্য প্রত্যাহার করার পরেও চারজন সাক্ষী অবশিষ্ট রয়েছে, যাদের দ্বারা পূর্ণ হক অবশিষ্ট থাকতে পারে।

যদি পরবর্তী সময়ে আরেকজন সাক্ষী তার সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে, তাহলে প্রথম প্রত্যাহারকারী ও দ্বিতীয় প্রত্যাহারকারী উভয়কে হদ্দ লাগানো হবে এবং উভয়ের উপর এক চতুর্থাংশ দিয়তের দায় বর্তাবে। এটা আহনাফের অভিমত। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন, যদি সাক্ষীদ্বয় একথা বলে যে, আমরা ইচ্ছাকৃত মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছিলাম, তাহলে তাদের উপর কেসাস ওয়াজিব। আর যদি বলে আমরা ভুলবশত মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছিলাম, তাহলে দিয়তের এক চতুর্থাংশ পরিশোধ করা ওয়াজিব হবে।

আহনাফের মতে প্রত্যাহারকারী সাক্ষীদ্বয়ের উপর হদ্দ কায়েম করা হবে, এর কারণ হলো প্রত্যাহারের মাধ্যমে তাদের পূর্বে প্রদত্ত সাক্ষ্যটি অপবাদে রূপান্তরিত হয়েছে। তাই তাদের উপর অপবাদের হদ্দ লাগানো হবে। আর দিয়তের এক চতুর্থাংশ ওয়াজিব হওয়ার কারণ হলো এই যে, তাদের প্রত্যাহারের পর আরো তিনজন সাক্ষী বাকি আছে। যাদের দ্বারা তিন চতুর্থাংশ হক অবশিষ্ট থাকবে। অতএব, নষ্ট হলো মাত্র এক চতুর্থাংশ। অতএব এই এক চতুর্থাংশই প্রত্যাহারকারী সাক্ষীদ্বয়ের উপরে ওয়াজিব হবে। এক বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে দিয়তের দুই পঞ্চমাংশ পরিশোধ করা সাক্ষীর উপরে ওয়াজিব হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَاِنْ شَهِدَ اَرْبَعَةٌ عَلٰى رَجُلٍ بِالزِّنَاءِ فَزَكُّوْا فَرُجِمَ فَاِذَا الشُّهُوْدُ مَجُوْسٌ اَوْ عَبِيْدٌ فَالدِّيَةُ عَلَى الْمُزَكِّيْنَ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) مَعْنَاهُ اِذَا رَجَعُوْا عَنِ التَّزْكِيَةِ وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ (رحـ) هُوَ عَلٰى بَيْتِ الْمَالِ وَقِيْلَ هٰذَا اِذَا قَالُوْا تَعَمَّدْنَا التَّزْكِيَةَ مَعَ عِلْمِنَا بِحَالِهِم لَهُمَا اَنَّهُمْ اَثْنَوْا عَلَى الشُّهُوْدِ خَيْرًا فَصَارَ كَمَا اِذَا اَثْنَوْا عَلَى الْمَشْهُوْدِ عَلَيْهِ خَيْرًا بِاَنْ شَهِدُوْا عَلٰى اِحْصَانِهٖ وَلَهٗ اَنَّ الشَّهَادَةَ اِنَّمَا تَصِيْرُ حُجَّةً عَامِلَةً بِالتَّزْكِيَةِ فَكَانَتِ التَّزْكِيَةُ فِىْ مَعْنٰى عِلَّةِ الْعِلَّةِ فَيُضَافُ الْحُكْمُ اِلَيْهَا بِخِلَافِ شُهُوْدِ الْاِحْصَانِ لِاَنَّهٗ مَحْضُ الشَّرْطِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا اِذَا شَهِدُوْا بِلَفْظَةِ الشَّهَادَةِ اَوْ اَخْبَرُوْا وَهٰذَا اِذَا اَخْبَرُوْا بِالْحُرِّيَّةِ وَالْاِسْلَامِ اَمَّا اِذَا قَالُوْا هُمْ عُدُوْلٌ وَظَهَرُوْا عَبِيْدًا لَايَضْمَنُوْنَ لِاَنَّ الْعَبْدَ قَدْ يَكُوْنُ عَدْلًا وَلَا ضَمَانَ عَلَى الشُّهُوْدِ لِاَنَّهٗ لَمْ يَقَعْ كَلَامُهُمْ شَهَادَةً وَلَا يُحَدُّوْنَ حَدَّ الْقَذْفِ لِاَنَّهُمْ قَذَفُوْا حَيًّا وَقَدْ مَاتَ فَلَا يُوْرَثُ عَنْهُ ـ

অনুবাদ : আর যদি চারজন লোক কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে জেনার সাক্ষ্য প্রদান করে এবং তাদের সম্পর্কে সাফাই সাক্ষ্য দেওয়া হয়, এরপর রজম কার্যকর হয়। কিন্তু পরে জানা গেল যে, সাক্ষীরা অগ্নিপূজক বা গোলাম, তাহলে সাফাই সাক্ষ্যদাতাদের উপর দিয়ত ওয়াজিব হবে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে।

এর উদ্দেশ্য এই যে, তারা যদি তাদের সাফাই সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়। আর ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, এই ক্ষতিপূরণ বাইতুল মালের উপরে আসবে। আর কেউ কেউ বলেছেন– এটা হবে তখন, যখন তারা বলে যে, আমরা তাদের অবস্থা জানা সত্ত্বেও ইচ্ছাকৃতভাবে সাফাই সাক্ষ্য দিয়েছি। সাহেবাইনের দলিল এই যে, তারা সাক্ষীদের উত্তম প্রশংসা করেছে। সুতরাং এটা যার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে, তার প্রশংসা করার অর্থাৎ তার মুহসান হওয়ার সাক্ষ্য প্রদানের মতো হলো।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল এই যে, সাফাইয়ের কারণেই সাক্ষ্যটি কার্যকর প্রমাণ হয়ে থাকে, সুতরাং সাফাই হলো 'কারণের কারণ' -এর সমার্থক। সুতরাং হুকুমটিকে এর দিকে সম্পৃক্ত করা হবে। মুহসান হওয়ার সাক্ষ্য দানের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা মুহসান হওয়া রজমের বিধানের জন্য শর্তমাত্র। সাক্ষ্য শব্দ ব্যবহার করা এবং সাধারণভাবে খবর দেওয়ার মাঝে পার্থক্য নেই।

আর এ (সাফাইকারীদের উপর ক্ষতিপূরণ সাব্যস্ত হওয়ার) বিষয়টি তখন হবে, যখন তারা সাক্ষীদের স্বাধীন হওয়ার কিংবা মুসলমান হওয়ার খবর প্রদান করবে। পক্ষান্তরে যদি তারা বলে যে, সাক্ষীরা ন্যায়পরায়ণ; আর দেখা গেল যে, তারা গোলাম, তাহলে তাদের উপর ক্ষতি পূরণ সাব্যস্ত করা হবে না। কেননা গোলাম ন্যায়পরায়ণ হতে পারে। সাক্ষীদের উপর কোনো ক্ষতিপূরণ আসবে না। কেননা তাদের বক্তব্য সাক্ষ্য রূপে গণ্য হয়নি।

তদ্রূপ তাদের উপর হদ্দে কযফ জারি করা হবে না। কেননা তার নামে অপবাদ আরোপ করেছে জীবিত অবস্থায়, এরপর সে মৃত্যুবরণ করেছে, সুতরাং তার পক্ষ থেকে কেউ হদ্দে কযফ দাবি করার উত্তরাধিকারী হবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যদি চারজন সাক্ষী কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে জেনার সাক্ষ্য প্রদান করে এবং আর কিছু লোক এসব সাক্ষীর পক্ষে সাফাই সাক্ষ্য প্রদান করে, যার ফলে সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হয় এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করা হয়, তারপর প্রকাশ পায় যে, সাক্ষীরা গোলাম কিংবা অমুসলিম, তাহলে এই হত্যাকৃত ব্যক্তির দিয়তের দায়ভার কার উপর বর্তাবে। এ ক্ষেত্রে তিন সুরত।

১. সাক্ষীরা গোলাম কিংবা অমুসলিম একথা জানা থাকা সত্ত্বেও যদি সাফাই সাক্ষীরা ইচ্ছাকৃতভাবে মূল সাক্ষীরা স্বাধীন বা মুসলিম হওয়ার সাক্ষ্য দিয়ে থাকে, তাহলে দিয়তের দায় ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে সাফায়ী সাক্ষীদের উপর বর্তাবে। সাহেবাইনের মতে বাইতুল মালের উপর বর্তাবে।

২. সাফাই সাক্ষীরা যদি ভুলবশত অবাস্তব সাক্ষ্য দিয়ে থাকে, তাহলে সর্ব সম্মতিক্রমে দিয়তের দায় বাইতুল মালের উপর বর্তাবে।

৩. সাফাই সাক্ষীরা যদি এমন সাক্ষ্য দেয় যে, মূল সাক্ষীরা আদেল বা ন্যায়পরায়ণ, তাহলে কারো উপর দিয়তে ওয়াজিব হবে না।

প্রথমোক্ত সুরতে অর্থাৎ মূল সাক্ষীরা গোলাম বা অমুসলিম এটা জেনে শুনে যখন সাফাই সাক্ষীরা অবাস্তব সাক্ষ্য দেয়, তখন সাহেবাইন বলেছেন, দিয়ত বাইতুল মালের উপর, আর ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেছেন, দিয়ত সাফাই সাক্ষীদের উপর। এক্ষেত্রে সাহেবাইনের দলিল হলো এই যে, সাফাই সাক্ষীরা মূল সাক্ষীদের ভালো হওয়ার সাক্ষ্য প্রদান করেছে। অতএব, এটা অভিযুক্ত ব্যক্তির ব্যাপারে মুহসান হওয়ার সাক্ষ্য দানের মতোই হলো। অতএব, অভিযুক্ত ব্যক্তি মুহসান হওয়ার সাক্ষ্য দিলে যেমন সাক্ষীর উপর দিয়ত আসে না, তেমনি মূল সাক্ষীরা ভালো হওয়ার সাক্ষ্যদানের কারণে এদের উপর দিয়ত আসবে না।

আর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো– সাফাই সাক্ষীদের সাক্ষ্যের কারণে মূল সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হয়েছে। অতএব, রজমের বিষয়টি সাফাই সাক্ষীদের সাক্ষ্যের সাথেই সম্বন্ধিত হবে। পরবর্তীতে যখন তাদের সাক্ষ্য মিথ্যা বা অবাস্তব প্রমাণিত হলো তখন এটা সাক্ষ্য প্রত্যাহার করার মতোই হয়ে গেল। আর রজমের পর সাক্ষ্য প্রত্যাহার করলে যেমন সাক্ষীদের উপর দিয়তের দায় বর্তায়, তেমনি আলোচ্য মাসআলায় সাফাই সাক্ষীদের উপর দিয়তের দায় বর্তাবে।

মূল সাক্ষীদের উপর কোনো অর্থদণ্ড আসবে না এবং তাদের উপর হদ্দে কযফও প্রয়োগ করা হবে না। অর্থদণ্ড না আসার কারণ হলো তাদের সাক্ষ্যটির সাথে কাযা বা রায় ঘোষণা সম্পৃক্ত হয়নি। বিধায় সেটা সাক্ষ্য হিসাবেই পরিগণিত হবে না। অতএব, সে কারণে কোনো অর্থদণ্ডও বর্তাবে না। আর হদ্দে কযফ না আসার কারণ হলো যার বিরুদ্ধে অপবাদ দিয়েছিল তার মৃত্যু হয়ে যাওয়া, কেননা মৃত্যুর দ্বারা হদ্দে কযফ বাতিল হয়ে যায়। এতে উত্তরাধিকার জারি হয় না। উল্লেখ্য যে, পূর্ব বর্ণিত মতানৈক্য পূর্ণ সুরতটিকে ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর মতামত সাহেবাইনের মতের অনুরূপ। কিন্তু রাজেহ বা প্রাধান্যযোগ্য মত হলো ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মত।

সাফায়ী সাক্ষীরা মূল সাক্ষীদের প্রশংসা করার জন্য শাহাদাত বা সাক্ষ্য শব্দ ব্যবহার করুক কিংবা তারা স্বাধীন, তারা মুসলিম তারা ন্যায়পরায়ণ এ জাতীয় সংবাদ সূচক শব্দই ব্যবহার করুক উভয়ের হুকুম এক। অর্থাৎ তা সাক্ষ্য বলে বিবেচিত হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَاِذَا شَهِدَ اَرْبَعَةٌ عَلٰى رَجُلٍ بِالزِّنَاءِ فَاَمَرَ الْقَاضِىْ بِرَجْمِهٖ فَضَرَبَ رَجُلٌ عُنُقَهٗ ثُمَّ وُجِدَ الشُّهُوْدُ عَبِيْدًا فَعَلَى الْقَاتِلِ الدِّيَةُ وَفِى الْقِيَاسِ يَجِبُ الْقِصَاصُ لِاَنَّهٗ قَتَلَ نَفْسًا مَعْصُوْمَةً بِغَيْرِ حَقٍّ وَجْهُ الْاِسْتِحْسَانِ اَنَّ الْقَضَاءَ صَحِيْحٌ ظَاهِرًا وَقْتَ الْقَتْلِ فَاَوْرَثَ شُبْهَةً بِخِلَافِ مَا اِذَا قَتَلَهٗ قَبْلَ الْقَضَاءِ لِاَنَّ الشَّهَادَةَ لَمْ تَصِرْ حُجَّةً بَعْدُ وَلِاَنَّهٗ ظَنَّهٗ مُبَاحَ الدَّمِ مُعْتَمِدًا عَلٰى دَلِيْلٍ مُبِيْحٍ فَصَارَ كَمَا اِذَا ظَنَّهٗ حَرْبِيًّا وَعَلَيْهِ عَلَامَتُهُمْ وَيَجِبُ الدِّيَةُ فِىْ مَا لِهٖ لِاَنَّهٗ عَمْدٌ وَالْعَوَاقِلُ لَاتَعْقِلُ الْعَمْدَ وَيَجِبُ ذٰلِكَ فِىْ ثَلٰثِ سِنِيْنَ لِاَنَّهٗ وَجَبَ بِنَفْسِ الْقَتْلِ ـ

অনুবাদ : চারজন লোক যদি কারো বিরুদ্ধে জেনার সাক্ষ্য প্রদান করে, আর কাজি তাকে রজম করার আদেশ জারি করেন আর কোনো লোক তাকে কতল করে ফেলে। অতঃপর দেখা গেল যে, সাক্ষীরা গোলাম তাহলে হত্যাকারীর উপর দিয়ত আসবে।

কিয়াসের দাবি কেসাস ওয়াজিব হওয়া। কেননা সে একটি নিরপরাধ প্রাণকে বিনা অধিকারে হত্যা করেছে। সূক্ষ্ম কিয়াসের কারণ এই যে, প্রকাশিত প্রমাণের ভিত্তিতে আদালতের ফায়সালা সঠিক ছিল। সুতরাং (হত্যার বৈধতার) সন্দেহ উদ্রেক করেছে। পক্ষান্তরে যদি ফয়সালার পূর্বে হত্যা করে থাকে, তাহলে বিষয়টি ভিন্ন হবে।

(কেননা সাক্ষ্য) তখনো প্রমাণরূপে সাব্যস্ত হয়নি। তাছাড়া আরেকটি কারণ এই যে, বৈধতা দানকারী দলিলের উপর নির্ভর করে হত্যাকারী তাকে খুন করা বৈধ মনে করেছিল। সুতরাং এটা কারো গায়ে হারবীদের আলামত দেখে তাকে হারবী ধারণা করে হত্যা করার মতো হলো। হত্যাকারীর সম্পদ থেকেই দিয়ত আদায় করা ওয়াজিব হবে। কেননা তা ইচ্ছাকৃত হত্যা। আর আকেলা বা নিকটাত্মীয়রা ইচ্ছাকৃত হত্যার দায় বহন করে না। আর এ দিয়ত তিন বছর সময়কালের মধ্যে আদায় করা ওয়াজিব। কেননা এ দিয়ত মূল হত্যার বিনিময়ে ওয়াজিব হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কারো বিরুদ্ধে চারজন সাক্ষী জেনার সাক্ষ্য দানের পর কাজি তার ব্যাপারে রজমের ফয়সালা করল। অতঃপর কেউ তাকে হত্যা করল। এমতাবস্থায় কিয়াসের দাবি অনুসারে হত্যাকারীর উপর কেসাস ওয়াজিব হওয়ার কথা। কিন্তু ইস্তিহসান বা সূক্ষ্ম কিয়াস অনুসারে দিয়াত ওয়াজিব করা হয়েছে। এই সূক্ষ্ম কিয়াসের দু'টি কারণ বর্ণনা করা হয়েছে।

১. কাজির পক্ষ থেকে রজমের ফয়সালা হতে সৃষ্ট সন্দেহ। সন্দেহের কারণ হদ্দ রহিত হয়ে যায়। যেমন নিকাহে ফাসেদ হেতু সৃষ্ট সন্দেহের কারণে জেনার হদ্দ রহিত হয়ে যায়।

২. সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সম্পর্কে মুবাহুদদাম হওয়ার ধারণা। অর্থাৎ রজম সম্পর্কিত কাজির ফয়সালাটি হত্যা বৈধকারী একটি দলিল। এ দলিলের ভিত্তিতে হত্যাকারী ব্যক্তি ধারণা করেছে যে, তাকে হত্যা করা জায়েজ। এরূপ ধারণার কারণেও হদ্দ কেসাস রহিত হয়ে যায়। যেমন কারো গায়ে হারবীর আলামত বিদ্যমান ছিল। এ দেখে কোনো মুসলমান ব্যক্তি তাকে হারবী জ্ঞান করে হত্যা করে ফেলল। পরে জানা গেল নিহত ব্যক্তিটি হারবী ছিল না। মুসলমান ছিল। তাহলে কেসাস ওয়াজিব হয় না। কারণ হলো দলিলে মুবীহ তথা হত্যা বৈধকারী দলিল থেকে সৃষ্ট ধারণা। আলোচ্য মাসআলায় দিয়তটি হত্যাকারী নিজের সম্পদ হতে পরিশোধ করবে তিন বৎসরের মধ্যে। এর কারণ হলো হত্যাটি ইচ্ছাকৃত হত্যা। ইচ্ছাকৃত হত্যার দিয়ত পরিশোধের সময়সীমা হলো তিন বৎসর এবং তা আকেলা বা বংশীয় আত্মীয় স্বজনের উপর বর্তায় না। বরং হত্যাকারী নিজেকেই সে দিয়ত পরিশোধ করতে হয়।

https://e-ilm.weebly.com/

وَإِنْ رُجِم ثُمَّ وُجِدُوْا عَبِيْدًا فَالدِّيَةُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَّهُ امْتَثَلَ أَمْرَ الْإِمَامِ فَنُقِلَ فِعْلُهُ إِلَيْهِ وَلَوْ بَاشَرَهُ بِنَفْسِهِ يَجِبُ الدِّيَةُ فِيْ بَيْتِ الْمَالِ لِمَا ذَكَرْنَا كَذَا هٰذَا بِخِلَافِ مَا إِذَا ضَرَبَ عُنُقَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتَمِرْ أَمْرَهُ وَإِذَا شَهِدُوْا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَاءِ وَقَالُوْا تَعَمَّدْنَا النَّظْرَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُم لِأَنَّهُ يُبَاحُ النَّظْرُ لَهُمْ ضَرُوْرَةَ تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ فَأَشْبَهَ الطَّبِيْبَ وَالْقَابِلَةَ ـ

অনুবাদ : আর যদি ঐ লোককে রজম করা হয়, অতঃপর দেখা গেল যে, সাক্ষীরা গোলাম, তাহলে দিয়ত বাইতুল মালের উপর ওয়াজিব হবে। কেননা সে শাসকের আদেশ পালন করেছে। সুতরাং তার কর্মটি শাসকের দিকে সম্পর্কিত হবে। আর শাসক নিজে যদি সে রজম সম্পন্ন করতেন তাহলে আমাদের পূর্বোল্লিখিত কারণে বাইতুল মাল হতে দিয়ত ওয়াজিব হতো। সুতরাং এখানেও তাই হবে। পক্ষান্তরে (অন্য উপায়ে) হত্যা করার বিষয়টি ভিন্ন, কেননা সে শাসকের আদেশ পালন করেনি।

যদি চরজন লোক কারো বিরুদ্ধে জেনার সাক্ষ্য প্রদান করে এবং বলে যে, আমরা ইচ্ছাকৃত অবলোকন করেছি, তাহলে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। কেননা সাক্ষ্য ধারণ করার প্রয়োজনে তাদের জন্য অবলোকন করা বৈধ হবে। সুতরাং এক্ষেত্রে তারা চিকিৎসক ও ধাত্রীর সদৃশ হলো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَإِنْ رُجِمَ শব্দটি পূর্ববর্তী মাসআলায় বর্ণিত فَضَرَبَهُ رَجُلٌ عُنُقَهُ -এর উপরে عطف হয়েছে। মাবসূত সারাখসীতে এ স্থলে وَإِنْ كَانَ هٰذَا الرَّجُلُ قَتَلَهُ رَجْمًا শব্দ রয়েছে। অর্থাৎ এ মাসআলাটি হুবহু পূর্ববর্ণিত মাসআলার অনুরূপ। পার্থক্য কেবল এতটুকু যে, পূর্বোক্ত মাসআলায় রজমের ফয়সালার পর কেউ তাকে হত্যা করেছিল গর্দানে আঘাত করে। আর এ মাসআলায় রজমের ফায়সালার পর কেউ রজমের মাধ্যমেই হত্যা করেছে। এ হত্যার হুকুম হলো এই যে, এ হত্যাটি কাজির দিকে সম্বন্ধিত হবে। কেননা কাজি যেমন ফয়সালা করেছিল, হত্যাকারী তেমনভাবেই হত্যা করেছে অর্থাৎ রজম করেছে। অতএব রজমটি কেমন যেন কাজি নিজে সম্পন্ন করেছে। সুতরাং কাজি নিজে রজম সম্পন্ন করার পর যদি সাক্ষীরা গোলাম বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে যেমন দিয়ত বাইতুল মালের উপর ওয়াজিব হয়, তেমনিভাবে অন্য কেউ রজম করলেও এর দিয়ত বাইতুল মালের উপরই ওয়াজিব হবে। কেননা এ অন্য ব্যক্তি কাজির ফয়সালাই বাস্তবায়ন করেছে।

পূর্বোক্ত মাসআলাটি এ মাসআলা হতে ভিন্ন। কারণ সেখানে হত্যাকারী ব্যক্তি কাজির সিদ্ধান্ত তথা রজম বাস্তবায়ন করেনি। বরং সে অন্য উপায় হত্যা করেছে। একারণে সে হত্যার সম্বন্ধ তার দিকেই হবে। কাজির দিকে নয়। অতএব দিয়তও হত্যাকারীর উপরই ওয়াজিব হবে কাজির পক্ষ হতে বাইতুল মালের উপর ওয়াজিব হবে না।

قَوْلُهُ : وَإِذَا شَهِدُوْا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَاءِ الخ : সাক্ষীরা যদি বলে যে, সাক্ষ্য ধারণের প্রয়োজনে আমরা ইচ্ছাকৃতভাবে জেনাকারী পুরুষ ও নারীর যৌনাঙ্গ প্রত্যক্ষ করেছি, তাহলেও তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। কারণ এ দেখার কারণে তারা ফাসেক হয়নি। বরং তাদের দেখাটি জায়েজ হয়েছে, যেমন চিকিৎসক ও ধাত্রী মহিলার জন্য অন্যের যৌনাঙ্গ প্রত্যঙ্গ করা প্রয়োজন বশতঃ জায়েজ হয়ে থাকে। আহনাফের মতো ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর অনুরূপ মতামত পোষণ করেন। পক্ষান্তরে যদি সাক্ষীরা বলে যে, আমরা তাদের যৌনাঙ্গ প্রত্যক্ষ করেছি মনোবাসনা পূরণ করার জন্য, তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে তারা ফাসেক বলে গণ্য হবে এবং তাদের সাক্ষ্য অগ্রাহ্য বিবেচিত হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

وإذا شهد اربعة على رجل بالزناء فانكر الاحصان وله امرأة قد ولدت منه فانه يرجم معناه ان ينكر الدخول بعد وجود سائر الشرائط لان الحكم بثبات النسب منه حكم بالدخول عليه ولهذا لو طلقها يعقب الرجعة والاحصان يثبت بمثله فان لم تكن ولدت منه وشهد عليه بالاحصان رجل وامرأتان رجم خلافا لزفر والشافعي (رحـ) فالشافعي مر على اصله ان شهادتهن غير مقبولة في غير الاموال وزفر (رحـ) يقول انه شرط في معنى العلة لان الجناية يتغلظ عنده فيضاف الحكم اليه فاشبه حقيقة العلة فلا تقبل شهادة النساء فيه فصار كما اذا شهد ذميان على ذمي زنى عبده المسلم انه اعتقه قبل الزناء فلا تقبل لما ذكرنا ولنا ان الاحصان عبارة عن الخصال الحميدة وانها مانعة من الزناء على ما ذكرنا فلا يكون في معنى العلة وصار كما اذا شهدوا به في غير هذه الحالة

অনুবাদ : যদি চারজন লোক কারো বিরুদ্ধে জেনার সাক্ষ্য প্রদান করে, আর সে (জেনাকারী) নিজের মুহসান হওয়া অস্বীকার করে, অথচ তার স্ত্রী রয়েছে এবং ঐ স্ত্রী তার ঔরসে সন্তান প্রসব করেছে তাহলে তাকে রজম করা হবে।

মাসআলাটির অর্থ এই যে, ইহসান তথা মুহসান হওয়ার সকল শর্ত বিদ্যমান হওয়া অবস্থায় সে স্ত্রী সহবাসের কথা অস্বীকার করেছে। কেননা তার থেকে নসব সাব্যস্ত হওয়ার অর্থ হলো তার প্রতি সহবাসের হুকুম সাব্যস্ত হওয়া। একারণেই যদি সে তাকে তালাক প্রদান করে তাহলে রাজয়ী তালাক সাব্যস্ত হয়। আর এরূপ দলিল দ্বারা মুহসান হওয়া সাব্যস্ত হয়ে যায়।

আর যদি ঐ লোকের ঔরসে স্ত্রী কোনো সন্তান প্রসব না করে থাকে, কিন্তু একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা তার ব্যাপারে মুহসান হওয়ার সাক্ষ্য প্রদান করে, তাহলেও তাকে রজম করা হবে।

ইমাম যুফার ও ইমাম শাফেয়ী (র.) ভিন্ন মত পোষণ করেন। এ ক্ষেত্রে ইমাম শাফেয়ী (র.) নিজস্ব এ মূলনীতি অনুসরণ করেছেন যে, অর্থ সংক্রান্ত বিষয় ছাড়া স্ত্রী লোকদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।

আর ইমাম যুফার ও ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন যে, ইহসান হলো কারণ বা হেতুর সমার্থক একটি শর্ত। কেননা ইহসান অবস্থায় অপরাধটি গুরুতর হয়। সুতরাং রজমের হুকুমটি তার সাথে সম্পৃক্ত হবে। আর তা প্রকৃত কারণ বা হেতুর সদৃশ্য হবে। সুতরাং (জেনার ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি) এক্ষেত্রেও স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না তাই বিষয়টি এমন হলো যে, দু'জন জিম্মি এমন একজন জিম্মির বিরুদ্ধে যার মুসলিম গোলাম জেনা করেছিল, এই সাক্ষ্য দিল যে, জেনা করার আগেই সে তাকে আজাদ করে দিয়েছিল। এ অবস্থায় আমাদের পূর্ব বর্ণিত কারণে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না।

আমাদের দলিল এই যে, ইহসান হলো কতিপয় উত্তম গুণের সমষ্টি। যা ব্যভিচার কর্ম হতে বাধা দান করে। যেমন পূর্বে আলোচনা করেছি। তাই এটি কারণ বা হেতুর সমার্থক হতে পারে না। সুতরাং এমনই হলো যেন তারা এই পরিস্থিতি ছাড়া সাধারণ অবস্থায় তার বিবাহের এবং সহবাসের সাক্ষ্য প্রদান করল।

https://e-ilm.weebly.com/

بِخِلَافِ مَا ذُكِرَ لِاَنَّ الْعِتْقَ يَثْبُتُ بِشَهَادَتِهِمَا وَاِنَّمَا لَا يَثْبُتُ بِسَبْقِ التَّارِيْخِ لِاَنَّهُ يُنْكِرُهُ الْمُسْلِمُ اَوْ يَتَضَرَّرُ بِهِ الْمُسْلِمُ فَاِنْ رَجَعَ شُهُوْدُ الْاِحْصَانِ لَا يَضْمَنُوْنَ عِنْدَنَا خِلَافًا لِزُفَرَ وَهُوَ فَرْعُ مَا تَقَدَّمَ ـ

ইমাম যুফার (র.)-এর উল্লিখিত সাদৃশ্যের বিষয়টি ভিন্ন, কেননা স্বাধীনতার বিষয়টি তাদের সাক্ষ্য দ্বারা সাব্যস্ত হয়। কিন্তু এখানে সাব্যস্ত হচ্ছে না, পিছনের তারিখ হওয়ার কারণে। কেননা মুসলমান এই পিছন তারিখ অস্বীকার করছে কিংবা এটা দ্বারা মুসলমান ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। (আর সে ক্ষেত্রে মুসলমানের বিপক্ষে কাফেরের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।) **যদি মুহসান হওয়ার সাক্ষ্যদানকারীরা সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে, তাহলে আমাদের মতে তারা ক্ষতিপূরণের দায় বহন করবে না।**

ইমাম যুফার (র.) ভিন্ন মত পোষণ করেন। মূলত এটা পূর্ববর্তী মাসআলার অনুবর্তী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ব্যক্তির দিকে তার স্ত্রীর প্রসবকৃত সন্তানের নসব সাব্যস্ত হওয়ার মাধ্যমে এটাও সাব্যস্ত হয়ে যায় যে, সে স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছে। অতএব, সে তা তা অস্বীকার করলেও তার কথা শুনা হবে না। বরং সে মুহসান বলেই গণ্য হবে।

قَوْلُهُ : فَاِنْ لَمْ تَكُنْ وَلَدَتْ مِنْهُ وَشَهِدَ عَلَيْهِ بِالْاِحْصَانِ الخ : যদি ঐ ব্যক্তির ঔরসে স্ত্রীর কোনো সন্তান না হয়ে থাকে, কিন্তু এক পুরুষ ও দু'জন মহিলা সাক্ষ্য প্রদান করে যে, সে মুহসান তাহলে তাকে রজম করা হবে। দ্বিমত পোষণ করেন ইমাম যুফার, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মাযহাবের এক মূলনীতির ভিত্তিতে এমন ব্যক্ত করেছেন। মূলনীতিটি হলো অর্থ সম্পদ ব্যতীত অন্য কোনো বিষয়ে (যেমন হুদূদ, কিসাস) নারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। সে হিসাবে কোনো পুরুষ মুহসান হওয়া না হওয়ার ব্যাপারেও নারীর সাক্ষ্য তার মতে গ্রহণযোগ্য নয়।

ইমাম যুফার (র.)-এর দলিল হলো, ইহসান হলো একটি শর্ত, যা ইল্লতের সমার্থক। কেননা মুহসান হওয়ার ফলে জেনার শাস্তি কঠিন হয়ে যায়। অর্থাৎ বেত্রাঘাত হতে রজমে উন্নীত হয়। আর মহিলাদের সাক্ষ্য যেহেতু হুকুম তথা রজমের মূল ইল্লতের সমার্থক বিষয় তথা মুহসান হয় না হওয়ার ব্যাপারেও গ্রহণযোগ্য নয়।

ইমাম যুফার (র.) এ মাসআলাটিকে অন্য একটি মাসআলার সাথে তুলনা করেছেন। মাসআলাটি হলো এই যে, দু'জন জিম্মি ব্যক্তি সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, অমুক জিম্মি তার একজন মুসলিম গোলামকে আজাদ করেছে। তবে আজাদ হওয়ার পর সে মুসলিম গোলাম জেনা করেছে। এ সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হয় না। কেননা এ সাক্ষ্য গ্রহণ করা হলে মুসলিম গোলামের শাস্তি রজমে উন্নীত হবে

আমাদের দলিল হলো এই যে, ইহসান হলো কতগুলো সৎগুণের সমন্বয়। যা মানুষকে ব্যভিচারে লিপ্ত হতে বাধা দেয়। বিধায় এটি ইল্লতের (জেনার) সমার্থক নয়। অতএব, জেনার পরবর্তী অবস্থা সাধারণ অবস্থায় যদি কারো ইহসানের ব্যাপারে একজন পুরুষও দু'জন মহিলা সাক্ষ্য প্রদান করে অর্থাৎ একথা বলে যে, অমুক পুরুষ লোকটি অমুক নারীকে বিবাহ করেছে এবং তার সাথে সহবাস করেছে, তাহলে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হয়। সুতরাং এখানেও তা গ্রহণযোগ্য হবে।

মোটকথা, আমাদের দলিল হলো সাধারণ অবস্থায় যেমন ইহসানের ব্যাপারে একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হয়, তেমনি জেনার পরবর্তী অবস্থায় ও গ্রহণযোগ্য হবে এবং এর ফলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে রজম করা হবে। ইমাম যুফার (র.) -এর দলিলের জবাবে বলা হয়, দুই জিম্মির সাক্ষ্য দ্বারা মুসলিম গোলামের আজাদি সাব্যস্ত হবে না। কেননা এ বিষয়টা মুসলিম ব্যক্তি অস্বীকার করছে অথবা এর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। অর্থাৎ তার শাস্তি রজমে উন্নীত হচ্ছে, আর মুসলমান যা অস্বীকার করে কিংব যা দ্বারা মুসলমানের ক্ষতি হয়, এমন বিষয়ে জিম্মির সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হয় না। কিন্তু নারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হয়। অতএব, নারীকে জিম্মির সাথে তুলনা করা সঠিক নয়।

মুহসান হওয়ার সাক্ষ্য প্রদানকারী যদি সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে, তাহলে আমাদের মতে তাদের উপর কোনো ক্ষতিপূরণের দায় বর্তাবে না। ইমাম যুফার (র.)-এর মতে বর্তাবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) হতে দু'রকম মতই বর্ণিত আছে। এ মতভেদটির ভিত্তি হলো পূর্ববর্তী মতভেদের উপর। অর্থাৎ আমাদের মাতে ইহসান হলো রজমের জন্য শর্ত স্বরূপ, ইল্লত নয়। অতএব, এর সাথে ক্ষতিপূরণের কোনো সম্পর্ক নেই। ইমাম যুফার (র.)-এর মতে ইহসান ইল্লতের পর্যায়ভুক্ত। বিধায় এর সাথে ক্ষতিপূরণের সম্পর্ক হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ حَدِّ الشُّرْبِ

وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَأُخِذَ وَرِيْحُهَا مَوْجُوْدَةٌ اَوْ جَاءُوْا بِهِ سَكْرَانَ فَشَهِدَ الشُّهُوْدُ عَلَيْهِ بِذٰلِكَ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ، وَكَذٰلِكَ اِذَا اَقَرَّ وَرِيْحُهَا مَوْجُوْدَةٌ لِاَنَّ جِنَايَةَ الشُّرْبِ قَدْ ظَهَرَتْ وَلَمْ يَتَقَادَمِ الْعَهْدُ. وَالْاَصْلُ فِيْهِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوْهُ، فَاِنْ عَادَ فَاجْلِدُوْهُ ـ

পরিচ্ছেদ : মদ্যপানের হদ্দ (শাস্তি)

অনুবাদ : কেউ যদি মদ পান করে এবং (মুখে) মদের গন্ধ বিদ্যমান অবস্থায় পাকড়াও হয়, কিংবা মাতাল অবস্থায় তাকে হাজির করা হয় এরপর সাক্ষীগণ তার বিরুদ্ধে মদ পান করেছে মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করে, তাহলে তার উপর হদ্দ কার্যকর হবে। একই বিধান কার্যকর হবে যদি গন্ধ বিদ্যমান অবস্থায় সে নিজে মদ পানের কথা স্বীকার করে।

কেননা মদ পানের অপরাধ প্রকাশিত হয়েছে আর বিষয়টি পুরোনো হয়ে যায়নি। মদপানের শাস্তি বিধানের দলিল হলো রাসূল ﷺ -এর নিম্নোক্ত বাণী : وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوْهُ فَاِنْ عَادَ فَاجْلِدُوْهُ ـ

অর্থাৎ কেউ যদি মদপান করে তাহলে তাকে তোমরা (নির্ধারিত পরিমাণে) বেত্রাঘাত কর। যদি সে পুনঃ পান করে তাহলে তাকে আবার বেত্রাঘাত কর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কেউ যদি মুখে মদের দুর্গন্ধ বিদ্যমান থাকা অবস্থায় ধৃত হয় এবং সাক্ষীরা সে মদপান করেছে বলে সাক্ষ্য দেয়, তাহলে তাকে মদপানের হদ্দ লাগানো হবে। অথবা যদি মুখে গন্ধ থাকা অবস্থায় মদপানকারী ব্যক্তি মদপানের কথা নিজে স্বীকার করে, তাহলে তাকে মদ পানের হদ্দ লাগানো হবে। মদ পানের হদ্দ প্রয়োগের জন্য পানকারী মাতাল হওয়া শর্ত নয়; বরং এক ফোটা পান করেছে প্রমাণিত হলেও তাকে হদ্দ লাগানো যায়।

মুখে গন্ধ থাকা অবস্থায় ধৃত হলে কিংবা মাতাল অবস্থায় কাজির দরবারে হাজির করা হলে কিংবা মুখে গন্ধ থাকা অবস্থায় পানকারী নিজে স্বীকার করলে তার উপর মদ পানের হদ্দ কায়েম করা হবে, এর কারণ হলো, তার থেকে মদ পানের অপরাধ প্রকাশিত হয়েছে এবং অপরাধটি এখানো পুরাতন হয়ে যায়নি। যদি অপরাধ পুরাতন হয়ে যায়, অর্থাৎ যদি অপরাধ সংঘটিত হওয়া থেকে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর সাক্ষীরা সাক্ষ্য দেয়, তাহলে সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হয় না। হদ্দে কযফ এটার ব্যতিক্রম। হদ্দে কযফের ক্ষেত্রে বহুদিন পরেও সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হয়।

মদ পানকারীর উপর হদ্দ প্রয়োগের বিষয়ে মৌলিক দলিল হলো, রাসূল ﷺ -এর এই হাদীস-

وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوْهُ فَاِنْ عَادَ فَاجْلِدُوْهُ .... الخ

কেউ যদি মদপান করে তাহলে তোমরা তাকে বেত্রাঘাত কর। যদি আবার পান করে, তাহলে আবার বেত্রাঘাত কর। যদি তৃতীয় বার পান করে, তাহলেও তোমরা তাকে বেত্রাঘাত কর। যদি চতুর্থবার পান করে তাহলে তাকে হত্যা কর। এ হাদীসটি ইবনে হিব্বান, হাকেম, শাফেয়ী, দারেমী, আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ (র.) প্রমুখ ইমামগণ নিজ নিজ কিতাবে বর্ণনা করেছেন।

হাদীসে যে বলা হয়েছে, চতুর্থবার পান করলে তাকে হত্যা কর এর অর্থ হলো যদি সে মদপান করাকে হালাল জ্ঞান করে তা পান করে, তাহলে তাকে হত্যা কর। কারণ এমতাবস্থায় সে হারামকে হালাল জ্ঞান করার কারণে মুরতাদ হয়ে গেছে। তাই তাকে হত্যা করা ওয়াজিব। একথাটি সহীহ ইবনে হিব্বানে স্পষ্ট উল্লেখ আছে। ইবনে হিব্বান উক্ত হাদীস বর্ণনা করার পর বলেছেন- مَعْنَاهُ اِذْ اَسْتَحَلَّ وَلَمْ يَقْبَلِ التَّحْرِيْمَ অর্থাৎ (তাকে হত্যা কর) যদি সে মদ পান হালাল মনে করে এবং হারাম হওয়াকে গ্রহণ না করে।

এ বিষয়টি ইমাম আবূ দাউদ কর্তৃক কুবাইসাহ ইবনে যুওয়াইব (রা.) হতে একটি হাদীস দ্বারাও প্রতীয়মান হয়। হাদীসটি এই যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, কেউ মদ পান করলে তাকে বেত্রাঘাত কর। আবার পান করলে আবার বেত্রাঘাত কর। আবার পান করলে আবার বেত্রাঘাত কর। আবার পান করলে হত্যা কর। অতঃপর এক মদপানকারীকে আনা হলো। তিনি তাকে বেত্রাঘাত করলেন। আবার আনা হলো, তিনি বেত্রাঘাত করলেন, আবার আনা হলো, তিনি বেত্রাঘাত করলেন। আবার আনা হলো এবারও তিনি বেত্রাঘাত করলেন। হত্যা করলেন না। মোটকথা, পূর্ববর্তী সকল আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, চতুর্থবার মদ পান করলে হত্যা করা হবে না, যদি সে তা হালাল মনে না করে। হালাল মনে করলে মুরতাদ হয়ে যাওয়ার কারণে তাকে হত্যা করা হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

فَاِنْ اَقَرَّ بَعْدَ ذَهَابِ رَائِحَتِهَا لَمْ يُحَدَّ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ وَاَبِيْ يُوْسُفَ (رحـ) . وَقَالَ مُحَمَّدٌ (رحـ) : يُحَدُّ وَكَذٰلِكَ اِذَا شَهِدُوْا عَلَيْهِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رِيْحُهَا عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ وَاَبِيْ يُوْسُفَ (رحـ) . وَقَالَ مُحَمَّدٌ (رحـ) : يُحَدُّ، فَالتَّقَادُمُ يَمْنَعُ قَبُوْلَ الشَّهَادَةِ بِالْاِتِّفَاقِ، غَيْرَ اَنَّهُ مُقَدَّرٌ بِالزَّمَانِ عِنْدَهُ اِعْتِبَارًا بِحَدِّ الزِّنَا، وَهٰذَا لِاَنَّ التَّاْخِيْرَ يَتَحَقَّقُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ وَالرَّائِحَةُ قَدْ تَكُوْنُ مِنْ غَيْرِهِ، كَمَا قِيلَ : شعر : يَقُوْلُوْنَ لِيْ اِنْكَهْ شَرِبْتَ مُدَامَةً ✻ فَقُلْتُ لَهُمْ لَا بَلْ اَكَلْتُ السَّفَرْجَلَا، وَعِنْدَهُمَا يُقَدَّرُ بِزَوَالِ الرَّائِحَةِ لِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ : فَاِنْ وَجَدْتُمْ رَائِحَةَ الْخَمْرِ فَاجْلِدُوْهُ . وَلِاَنَّ قِيَامَ الْاَثَرِ مِنْ اَقْوٰى دَلَالَةٍ عَلَى الشُّرْبِ، وَاِنَّمَا يُصَارُ اِلَى التَّقْدِيْرِ بِالزَّمَانِ عِنْدَ تَعَذُّرِ اِعْتِبَارِهِ، وَالتَّمْيِيْزُ بَيْنَ الرَّوَائِحِ مُمْكِنٌ لِلْمُسْتَدِلِّ، وَاِنَّمَا تَشْتَبِهُ عَلَى الْجُهَّالِ . وَاَمَّا الْاِقْرَارُ فَالتَّقَادُمُ لَا يُبْطِلُهُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ (رحـ) كَمَا فِي حَدِّ الزِّنَاء عَلٰى مَا مَرَّ تَقْرِيْرُهُ . وَعِنْدَهُمَا لَا يُقَامُ الْحَدُّ اِلَّا عِنْدَ قِيَامِ الرَّائِحَةِ، لِاَنَّ حَدَّ الشُّرْبِ ثَبَتَ بِاِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ، وَلَا اِجْمَاعَ اِلَّا بِرَاْيِ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) وَقَدْ شَرَطَ قِيَامَ الرَّائِحَةِ عَلٰى مَا رَوَيْنَا ـ

অনুবাদ : যদি মুখের দুর্গন্ধ চলে যাওয়ার পর স্বীকার করে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) এর মতে হদ্দ প্রয়োগ করা হবে না। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, হদ্দ প্রয়োগ করা হবে। দুর্গন্ধ চলে যাওয়ার পর যদি তার বিরুদ্ধে মদপানের সাক্ষ্য প্রদান করা হয়, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) এর মত অনুরূপ (অর্থাৎ হদ্দ প্রয়োগ করা হবে না)। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, হদ্দ কায়েম করা হবে।

মোটকথা, বিলম্বতা সকলের মতেই সাক্ষ্যের গ্রহণযোগ্যতাকে প্রতিরোধ করে। তবে ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর মতে এই বিলম্বতা একটি নির্দিষ্ট সময়ের সাথে আবদ্ধ (এ ক্ষেত্রে একমাস)। জেনার হদ্দের উপর কিয়াস করে। আর তা এ জন্য যে, কালাতিক্রান্তি দ্বারা বিলম্ব সাব্যস্ত হয়। কিন্তু অন্য কারণেও মুখে মদ সদৃশ গন্ধ হতে পারে। যেমন কবিতায় আছে- يَقُولُونَ لِي اِنْكَهْ شَرِبْتَ مُدَامَةً ✻ فَقُلْتُ لَهُمْ لَا بَلْ أَكَلْتُ السَّفَرْجَلَا

অর্থ : লোকেরা বলে- মনে হয় তুমি মদ গিলেছ, মুখ হা করে শ্বাস ছাড় দেখি! আমি বলি- না; বরং আমি নাশপাতি খেয়েছি, তাই এ গন্ধ আসে। পক্ষান্তরে শাইখাইনের মতে বিলম্বতা নির্ধারিত হবে গন্ধ বিলুপ্তির মাধ্যমে। কেননা এ প্রসঙ্গে হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেছেন, فَاِنْ وَجَدْتُمْ رَائِحَةَ الْخَمْرِ فَاجْلِدُوْهُ অর্থাৎ তোমরা যদি মদের গন্ধ পাও তাহলে তাকে বেত্রাঘাত কর। তাছাড়া এজন্য যে, মদের আলামত বিদ্যমান থাকা মদপানের অধিকতর মজবুত প্রমাণ। সুতরাং আলামত ও গন্ধ বিবেচনা করা দুষ্কর হলেই শুধু সময় দ্বারা বিলম্বতা নির্ধারণের দিকে যাওয়া যাবে। আর বিভিন্ন গন্ধের মাঝে পার্থক্য নিরূপণ করা অভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে (সহজেই) সম্ভব। অনভিজ্ঞদের ক্ষেত্রেই শুধু তা অস্পষ্ট হতে পারে। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে বিলম্বতার কারণে স্বীকারোক্তি বাতিল হয় না। যেমন জেনার হদ্দের ব্যাপারে। যেমন পূর্বে তার কারণ বলা হয়েছে।

পক্ষান্তরে শাইখাইনের মতে গন্ধের বিদ্যমানতা ছাড়া হদ্দ প্রয়োগ করা হবে না। কেননা মদপানের হদ্দ সাব্যস্ত হয়েছে সাহাবায়ে কেরামের ইজমা দ্বারা। আর হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) এর মতামত ছাড়া ইজমা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। অথচ আমাদের পূর্ব বর্ণিত রেওয়ায়েত অনুসারে হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) হদ্দ কার্যকর করার জন্য গন্ধ বিদ্যমান থাকার শর্ত আরোপ করেছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কেউ যদি মদপানের কথা স্বীকার করে মুখের গন্ধ চলে যাওয়ার পর, কিংবা কারো ব্যাপারে যদি সাক্ষীরা সাক্ষ্য দেয় যে, সে মদপান করেছে অথচ তার মুখে গন্ধ নেই, তাহলে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে কি-না এ ব্যাপারে ইমামত্রয়ের মাঝে মতভেদ রয়েছে। উপরে উল্লিখিত উভয় সুরতে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে হদ্দ কায়েম করা হবে না। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে হদ্দ প্রয়োগ করা হবে।

প্রথম সুরতে অর্থাৎ মুখ থেকে মদের দুর্গন্ধ চলে যাওয়ার পর যদি ব্যক্তি নিজে মদ পানের কথা স্বীকার করে তাহলে ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর মতে তাকে হদ্দ লাগানো হবে না। কারণ তিনি মদপান সম্পর্কিত স্বীকারোক্তিকে জেনার স্বীকারোক্তির সাথে কিয়াস করেন। তাই তিনি বলেন, জেনার স্বীকারোক্তি যেমন কাল বিলম্ব করার দ্বারা বাতিল হয় না, তদ্রূপ মদপানের স্বীকারোক্তিরও কাল বিলম্ব করার দ্বারা বাতিল হবে না। বরং মুখের দুর্গন্ধ চলে যাওয়ার পরেও যদি কেউ মদপানের কথা স্বীকার করে, তাহলে তাকে হদ্দ লাগানো হবে। যেমন কেউ যদি বহুদিন অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর জেনার কথা স্বীকার করে তখনও তাকে হদ্দ লাগানো হয়।

ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (র.) এর মতে মুখের গন্ধ চলে যাওয়ার পর মদপানের কথা স্বীকার করলে তাকে হদ্দ লাগানো হবে না। এক্ষেত্রে তাদের দলিল হলো মদপানে হদ্দ সাব্যস্ত হয়েছে সাহাবায়ে কেরামের ইজমা দ্বারা। আর হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) এর মতামত ছাড়া ইজমা হতে পারে না। পাশাপাশি হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) এর অভি মত হলো মুখে মদের গন্ধ বিদ্যমান থাকা হদ্দ কায়েম করার জন্য শর্ত। অতএব, মুখে মদের গন্ধ বিদ্যমান না থাকলে স্বীকারোক্তি সত্ত্বেও তাকে হদ্দ লাগানো হবে না। মদপান সম্পর্কিত স্বীকারোক্তি জেনার স্বীকারোক্তির মতো নয়।

মোটকথা, ইমাম মুহাম্মদ (র.) মদ পানের স্বীকারোক্তিকে জেনার স্বীকারোক্তির সাথে কিয়াস করেন এবং হদ্দ প্রয়োগের কথা বলেন। শাইখাইন কিয়াস করেন না; বরং ইবনে মাসউদের উক্তির দিকে লক্ষ্য করে বলেন মুগের গন্ধ চলে গেলে স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। ফলে হদ্দ প্রয়োগ হবে না।

উল্লেখ্য যে, এই স্বীকারোক্তির সুরত সম্পর্কিত আলোচনা কিতাবের মতনে শাহাদত সম্পর্কিত আলোচনার পরে উল্লেখ আছে।

প্রথম সুরত অর্থাৎ মদপানকারী ব্যক্তির মুখ থেকে মদের দুর্গন্ধ চলে যাওয়ার পর যদি সাক্ষীরা এ মর্মে সাক্ষ্য দেয় যে, সে মদ পান করেছে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে তাকে হদ্দ লাগানো হবে না। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে হদ্দ লাগানো হবে।

এ সুরতটিকে ইমাম মুহাম্মদ (র.) জেনার মাসআলার সাথে কিয়াস করেছেন। তাই তার মতে অপরাধ সংঘটিত হওয়া থেকে একমাসের ভিতরে যদি সাক্ষীরা সাক্ষ্য প্রদান করে, তাহলে সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। এবং হদ্দ লাগানো হবে। যেমন জেনার ক্ষেত্রে একমাসের ভিতরে সাক্ষ্য প্রদান করা হলে সে সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হয় এবং এর ভিত্তিতে হদ্দ প্রয়োগ করা হয়। তেমনি মদপানের ক্ষেত্রেও একমাসের ভিতের সাক্ষ্য প্রদান করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে এবং হদ্দ লাগানো হবে। যদিও তার মুখে মদের দুর্গন্ধ না থাকে। কেননা মদের দুর্গন্ধের মতো দুর্গন্ধ অন্য কিছু খাওয়ার ফলেও সৃষ্টি হতে পারে। যেমন কবি বলেছেন, তারা আমাকে বলে মনে হয় তুমি মদ পান করেছ, শ্বাস ফেল দেখি! আমি বলি না; আমি বরং নাশপাতি খেয়েছি। বুঝা গেল নাশপাতি খেলেও মুখে মদের অনুরূপ গন্ধ সৃষ্টি হতে পারে। অতএব, গন্ধ অবিশিষ্ট থাকা বা না থাকার বিষয়টি তত নির্ভরযোগ্য নয়। তাই একটি সময়সীমা নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন। আর তা হলো একমাস, জেনার সাক্ষের উপর কিয়াস করে। অতএব একমাসের ভিতরে সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া গেলে তা গ্রহণযোগ্য হবে এবং এর ভিত্তিতে হদ্দ লাগানো হবে, যদিও মদ পানকারীর মুখে তখন মদের দুর্গন্ধ অবশিষ্ট না থাকে।

শাইখাইন বলেছেন, মদ্যপায়ীর মুখে মদের দুর্গন্ধ না থাকলে শুধু সাক্ষীদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে হদ্দ লাগানো যাবে না।

দলিল ১. فَإِنْ وَجَدْتُمْ رَائِحَةَ الْخَمْرِ فَاجْلِدُوهُ

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেছেন, তোমরা যদি (মদ পানকারীর মুখে) মদের গন্ধ পাও তাহলে তাকে বেত্রাঘাত কর। অন্য এক বর্ণনায় আছে, জনৈক ব্যক্তি তার ভাতিজাকে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর কাছে নিয়ে এলো। হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বললেন, তোমরা তার মুখ শুকে দেখ। লোকেরা তার মুখ শুকে মদের গন্ধ পেল তখন হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) তাকে কারাগারে পাঠালেন এবং পরের দিন কারাগার হতে বের করে তাকে হদ্দ লাগালেন।

এসব রেওয়ায়েত হতে প্রমাণিত হয়, সাক্ষ্যের উপর ভিত্তি করে হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না।

দলিল ২. মুখে মদের গন্ধ বিদ্যমান থাকা মদপানের ব্যাপারে একটি শক্তিশালী দলিল; অতএব এর উপর নির্ভর করা উচিত।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেছেন, মদের গন্ধের মতো গন্ধ অন্য কিছুর দ্বারাও সৃষ্টি হতে পারে, অতএব গন্ধের উপর ততটা নির্ভর করা যায় না। এর জবাব হলো, মদের গন্ধ ও অন্য কিছুর গন্ধের মাঝে তফাৎ করা অভিজ্ঞ লোকদের পক্ষে একেবারেই সহজ ও সম্ভব। আনাড়ি লোকদের পক্ষে যদিও তা কঠিন হয়ে থাকে। অতএব, গন্ধের উপর নির্ভর করার ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই।

https://e-ilm.weebly.com/

فَاِنْ اَخَذَهُ الشُّهُوْدُ وَرِيْحُهَا يُوْجَدُ مِنْهُ اَوْ سَكْرَانُ فَذَهَبُوْا بِهٖ مِنْ مِصْرٍ اِلٰى مِصْرٍ فِيْهِ الْاِمَامُ فَانْقَطَعَ ذٰلِكَ قَبْلَ اَنْ يَنْتَهُوْا بِهٖ حُدَّ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيْعًا لِاَنَّ هٰذَا عُذْرٌ كَبُعْدِ الْمَسَافَةِ فِيْ حَدِّ الزِّنَا وَالشَّاهِدُ لَا يُتَّهَمُ بِهٖ فِيْ مِثْلِهٖ . وَمَنْ سَكِرَ مِنَ النَّبِيْذِ حُدَّ لِمَا رُوِيَ اَنَّ عُمَرَ اَقَامَ الْحَدَّ عَلٰى اَعْرَابِيٍّ سَكِرَ مِنَ النَّبِيْذِ. وَسَنُبَيِّنُ الْكَلَامَ فِي حَدِّ السُّكْرِ وَمِقْدَارِ حَدِّهٖ الْمُسْتَحَقِّ عَلَيْهِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى ـ

অনুবাদ : যদি এমন হয় যে, সাক্ষীরা তাকে গন্ধসহ বা মাতাল অবস্থায় পাকড়াও করল এবং এক শহর হতে অন্য শহর যেখানে হদ্দ প্রয়োগকারী শাসক রয়েছেন সেখানে নিয়ে গেল; কিন্তু সেখানে পৌঁছার পূর্বেই গন্ধ দূর হয়ে গেল, তাহলে তাদের সকলের মতেই হদ্দ কায়েম করা হবে।

কেননা এটা ওজর রূপে বিবেচতি হবে। যেমন জেনার হদ্দের ক্ষেত্রে স্থানগত দূরত্বের বিষয়টি (ওজর রূপে বিবেচিত হয়)। আর এ ধরনের অবস্থায় সাক্ষীকে অভিযুক্ত করা যায় না। **নাবীয পান করে যদি কেউ নেশাগ্রস্ত হয় তাহলে তার উপর হদ্দ কায়েম করা হবে।** কেননা (ইমাম দারাকুতনী সংকলিত সুনানে) বর্ণিত হয়েছে যে, নাবীয পান করে নেশাগ্রস্ত জনৈক বেদুইনকে হযরত ওমর (রা.) হদ্দ প্রয়োগ করেছিলেন। নেশার হদ্দ ও প্রযোজ্য হদ্দের পরিমাণ নিয়ে বিশদ আলোচনা করব, ইনশাআল্লাহ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কোনো মদ্যপায়ী ব্যক্তিকে মাতাল অবস্থায় কিংবা মুখে গন্ধ থাকাবস্থায় সাক্ষীরা পাকড়াও করল। কিন্তু যেখানে পাকড়াও করেছে সেখানে শাসক না থাকায় অন্য কোনো শহরে নিয়ে গেল, যেখানে শাসক রয়েছে। এ শহরটি পাকড়াও করার স্থান হতে বেশ দূরে হওয়ার কারণে ওখানে পৌঁছতে পৌঁছতে মদ্যপায়ীর মুখ হতে মদের গন্ধ চলে গেল, এমতাবস্থায় সকল ইমাম এ ব্যাপারে একমত যে, তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে।

কারণ এ ক্ষেত্রে সাক্ষ্য প্রদানে বিলম্ব হওয়ার পিছনে একটি যুক্তিযুক্ত ওজর আছে। আর তা হলো কাজির শহরটি অনেক দূরে হওয়া। অতএব, সাক্ষীদেরকে অভিযুক্ত করা যাবে না। বরং তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে এবং এর ভিত্তিতে হদ্দ প্রয়োগ করা হবে। যেমনটি জেনার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

বিলম্বিত সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হওয়া না হওয়ার বিষয়ে মূলনীতি হলো এই যে, সাক্ষ্য প্রদান বিলম্ব হওয়ার পিছনে যদি কোনো যুক্তি সঙ্গত ওজর থাকে যেমন রাস্তা নিরাপদ না হওয়া, রাস্তা দীর্ঘ হওয়া, সাক্ষীরা অসুস্থ থাকা ইত্যাদি। তাহলে বিলম্বে সাক্ষ্য প্রদান করলেও তা গৃহীত হবে এবং এর ভিত্তিতে হদ্দ প্রয়োগ করা হবে। আর যদি বিলম্ব করার পিছনে যুক্তিসঙ্গত কোনো ওজর না থাকে তাহলে সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। বরং সাক্ষ্য বিলম্বিত হওয়ার কারণে হদ্দ রহিত হয়ে যাবে।

উপযুক্ত কারণে সাক্ষ্য প্রদান করতে বিলম্ব হলে তা গ্রহণযোগ্য হয় এর দলিল হলো এই যে, একবার কিছু লোক হযরত ওসমান (রা.) এর কাছে এসে সাক্ষ্য দিল যে, হযরত উকবা (রা.) মদপান করেছেন। তিনি তখন কুফায় ছিলেন। হযরত ওসমান (রা.) তাকে মদীনায় তলব করলেন। মদীনায় আসার পর তাকে হদ্দ লাগালেন অথচ তখন তার মুখে মদের গন্ধ বিদ্যমান ছিল না। এর দ্বারা বুঝা যায়, কাজির শহর দূরে হওয়ার কারণে সাক্ষ্য প্রদানে বিলম্ব হলে সে সাক্ষ্য গৃহীত হয় এবং হদ্দ প্রয়োগ করা হয়। সাক্ষীদেরকে অভিযুক্ত করা হয় না।

কেউ যদি নাবীয পান করে নেশাগ্রস্ত হয় তাহলে তাকেও হদ্দ লাগানো হবে। কেননা সুনানে দারাকুতনীতে বর্ণিত আছে যে, একবার এক বেদুইন নাবীয পান করে নেশাগ্রস্ত হওয়ার কারণে হযরত ওমর (রা.) তাকে হদ্দ লাগিয়েছেন। এর দ্বারা বুঝা যায়, নেশা সৃষ্টিকারী নাবীযও হদ্দ প্রয়োগকে আবশ্যক করে।

নাবীয (نبيذ) শব্দটি فعيل ওজনে। نبذ ধাতু হতে গৃহীত। যার অর্থ হলো রেখে দেওয়া, ফেলে দেওয়া, নিক্ষেপ করা। অতএব نبيذ শব্দটি যেহেতু منبوذ এর সমার্থক, তাই তার অর্থ হলো ফেলে রাখা বা ফেলে দেওয়া বস্তু। এখানে উদ্দেশ্য হলো খেজুর কিশমিশ মধু গম, যব, কাউন, চাল ইত্যাদি দ্বারা তৈরি পানীয়। এসব বস্তুর নাবীয বা পানীয় পান করা জায়েজ আছে, যদি তা নেশা সৃষ্টি না করে, যদি নেশা সৃষ্টি করে তাহলে তা পান করা হারাম।

https://e-ilm.weebly.com/

وَلَا حَدَّ عَلَى مَنْ وُجِدَ مِنْهُ رَائِحَةُ الْخَمْرِ اَوْ تَقَيَّاهَا لِاَنَّ الرَّائِحَةَ مُحْتَمَلَةٌ، وَكَذَا الشُّرْبُ قَدْ يَقَعُ عَنْ اِكْرَاهٍ اَوْ اِضْطِرَارٍ وَلَا يُحَدُّ السَّكْرَانُ حَتَّى يُعْلَمَ اَنَّهُ سَكِرَ مِنَ النَّبِيْذِ وَشَرِبَهُ طَوْعًا لِاَنَّ السُّكْرَ مِنَ الْمُبَاحِ لَا يُوْجِبُ الْحَدَّ كَالْبَنْجِ وَلَبَنِ الرِّمَاكِ، وَكَذَا شُرْبُ الْمُكْرَهِ لَا يُوْجِبُ الْحَدَّ ـ وَلَا يُحَدُّ حَتَّى يَزُوْلَ عَنْهُ السُّكْرُ تَحْصِيْلًا لِمَقْصُوْدِ الْاِنْزِجَارِ. وَحَدُّ الْخَمْرِ وَالسُّكْرِ فِي الْحُرِّ ثَمَانُوْنَ سَوْطًا لِاِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ يُفَرَّقُ عَلٰى بَدَنِهٖ كَمَا فِي حَدِّ الزِّنَا عَلٰى مَا مَرَّ ثُمَّ يُجَرَّدُ فِي الْمَشْهُوْرِ مِنَ الرِّوَايَةِ . وَعَنْ مُحَمَّدٍ اَنَّهُ لَا يُجَرَّدُ اِظْهَارًا لِلتَّخْفِيْفِ لِاَنَّهُ لَمْ يَرِدْ بِهٖ نَصٌّ. وَوَجْهُ الْمَشْهُوْرِ اَنَّا اَظْهَرْنَا التَّخْفِيْفَ مَرَّةً فَلَا يُعْتَبَرُ ثَانِيًا ـ

অনুবাদ : যার মুখে মদের গন্ধ পাওয়া যায় কিংবা যে মদ বমন করেছে (কিন্তু তাকে মদ পান করতে দেখা যায় নি) তার উপর হদ্দ সাব্যস্ত হবে না। কেননা মুখের গন্ধটি সম্ভাবনাপূর্ণ (অর্থাৎ মদ ছাড়া অন্য কিছুর গন্ধও হতে পারে)। তদ্রূপ মদপানের কাজটিও জোরপূর্বক ও অনন্যোপায় অবস্থায়ও হতে পারে। **সুতরাং নেশাগ্রস্ত ব্যক্তির উপর ততক্ষণ হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না, যতক্ষণ না জানা যায় যে, সে নাবীয (ও মদ) দ্বারা নেশাগ্রস্ত হয়েছে এবং তা স্বেচ্ছায় পান করেছে।**

কেননা অনুমোদনযোগ্য দ্রব্য দ্বারা নেশা হলে তা হদ্দ সাব্যস্ত করে না। যেমন ভাং ও ঘোটকীর দুধ। তদ্রূপ বলপূর্বক মদপান দ্বারা হদ্দ সাব্যস্ত হয় না। (কেননা এখানে স্বেচ্ছা গ্রহণের দিক অনুপস্থিত)।

নেশা কেটে যাওয়ার পূর্বে হদ্দ কার্যকর করা হবে না। যাতে (সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির) সাবধান হওয়ার উদ্দেশ্যটি অর্জন হয়। **স্বাধীন ব্যক্তির ক্ষেত্রে মদ ও অন্যান্য নেশার হদ্দ হলো আশি দোররা** কেননা এ বিষয়ে সাহাবায়ে কেরামের ইজমা অনুষ্ঠিত হয়েছে। **জেনার হদ্দের মতো শরীরের বিভিন্ন স্থানে বেত্রাঘাত করা হবে। জেনার হদ্দ প্রসঙ্গে এটা আলোচিত হয়েছে।** প্রসিদ্ধ বর্ণনা মতে (সতর রক্ষা করে) তাকে বস্ত্রমুক্ত করে নেওয়া হবে।

আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে শাস্তির লঘুতা প্রকাশার্থে তাকে বস্ত্রমুক্ত করবে না। কেননা মদপানের হদ্দ সম্পর্কে শরিয়তের প্রকাশ্য নস (বাণী প্রমাণ) নেই। প্রসিদ্ধ বর্ণনার দলিল এই যে, (বেত্রাঘাতের সংখ্যা একশ থেকে আশিতে হ্রাস করে) একবার আমরা লঘুতা সাব্যস্ত করেছি। সুতরাং দ্বিতীয় বার লঘুতা সাব্যস্ত করা বিবেচ্য নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কারো উপর মদপানের হদ্দ কার্যকরী হওয়ার জন্য শর্ত হলো, হারাম বস্তু পান করে নেশাগ্রস্ত হওয়া এবং তা স্বেচ্ছায় পান করা। অতএব কারো মুখে মদের গন্ধ পাওয়া গেলেই তাকে হদ্দ লাগানো যাবে না। কারণ এ গন্ধটি অন্য কিছু খাওয়ার দ্বারা সৃষ্টি হওয়ারও সম্ভাবনা আছে। অনুরূপভাবে কাউকে যদি নেশাগ্রস্ত অবস্থায় পাওয়া যায়, তাহলেই তাকে হদ্দ লাগানো যাবে না। কেননা হতে পারে যে, সে কোনো হালাল বস্তু যেমন ঘোটকীর (মাদী ঘোড়া) দুধ পান করার পর নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। অনুরূপভাবে কাউকে মদ বমি করতে দেখা গেলেও তাকে হদ্দ লাগানো যাবে না। কারণ এমন হওয়ার সম্ভাবনা আছে যে, সে অন্যের চাপের মুখে বাধ্য হয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও মদপান করেছে।

https://e-ilm.weebly.com/

মোটকথা, যতক্ষণ জানা না যাবে যে, সে ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো হারাম বস্তু পান করে নেশাগ্রস্ত হয়েছে, ততক্ষণ তাকে হদ্দ লাগানো যাবে না।

وَلَا يُحَدُّ حَتّٰى يَزُوْلَ عَنْهُ السُّكْرُ الخ : মদ্যপায়ী ব্যক্তি নেশাগ্রস্ত থাকা অবস্থায় তাকে হদ্দ লাগানো হবে না ; বরং নেশা কেটে যাওয়ার পর তাকে হদ্দ লাগাতে হবে। কেননা হদ্দের উদ্দেশ্য হলো অপরাধী ব্যক্তি যেন সাবধান হয়। যদি নেশাগ্রস্ত অবস্থায় হদ্দ লাগানো হয়, তাহলে সে হদ্দের যন্ত্রণা অনুভব করতে পারবে না এবং সাবধানও হবে না। হদ্দের উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। তাই সিদ্ধান্ত হলো, নেশা কেটে যাওয়ার পূর্বে হদ্দ কার্যকর করা হবে না।

সুনানে বায়হাকীতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমর (রা.) নেশাগ্রস্ত লোকদের আটকিয়ে রাখতেন। অতঃপর যখন তাদের নেশা কেটে গিয়ে জ্ঞান ফিরত, তখন তিনি হদ্দ প্রয়োগ করতেন। অনুরূপ মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বাতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আলী (রা.)-এর কাছে রমজান মাসে এক নাজ্জাশীকে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ধরে আনা হলো। হযরত আলী (রা.) তখন তাকে ছেড়ে দিলেন পরে যখন তার হুঁশ ফিরল তখন তিনি আশি দোররা লাগালেন।

মদ পান করলে হদ্দ ওয়াজিব হয়। তা পরিমাণে বেশি হোক বা কম হোক। এমনকি একফোটা হলেও, আর অন্য কোনো নেশা জাতীয় বস্তু পান করে নেশাগ্রস্ত হয়ে গেলে হদ্দ ওয়াজিব হয়। উভয় হদ্দের পমিাণ হলো আশি দোররা। এটি আহনাফের মত, এক বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) এরও অভিমত। আশি দোররার পরিমাণটি হযরত ওমর (রা.) এর শাসনকালে সাহাবাগণের ইজামা দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে।

আশিটি দোররা অভিযুক্ত ব্যক্তির শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে ছড়িয়ে ছিটিয়ে লাগাতে হবে। এ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা فَصْلٌ فِيْ كَيْفِيَّةِ الْحَدِّ শিরোনামে পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে।

অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হদ্দ লাগানোর সময় তার গায়ের কাপড় খুলে নিতে হবে। লুঙ্গি পায়জামা খোলা যাবে না, সতর রক্ষার স্বার্থে। এটিই প্রসিদ্ধ মত। তবে ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেছেন, গায়ের কাপড় খুলতে হবে না। কেননা এ সম্পর্কে কুরআন-হাদীসে কোনো নস বা স্পষ্ট দলিল বিদ্যমান নেই। ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)ও এ মতই পোষণ করেন। কাপড় না খোলার আরেকটি কারণ হলো এই যে, এতে করে শাস্তিটা কিছু লঘু বা হালকা হয়।

আর প্রসিদ্ধ মতের পক্ষে কারণ হলো মদপানের শাস্তি জেনার শাস্তি হতে বিশ বেত কমিয়ে আশি বেত করা হয়েছে। লঘুতার জন্য এটাই যথেষ্ট। কাপড় না খুলে আরও লঘু করার কোনো প্রয়োজন নেই।

https://e-ilm.weebly.com/

وَاِنْ كَانَ عَبْدًا فَحَدُّهٗ اَرْبَعُوْنَ سَوْطًا لِاَنَّ الرِّقَّ مُنَصِّفٌ عَلٰى مَا عُرِفَ. وَمَنْ اَقَرَّ بِشُرْبِ الْخَمْرِ اَوِالسَّكَرِ ثُمَّ رَجَعَ لَمْ يُحَدَّ لِاَنَّهٗ خَالِصُ حَقِّ اللّٰهِ تَعَالٰى. وَيَثْبُتُ الشُّرْبُ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ وَ يَثْبُتُ بِالْاِقْرَارِ مَرَّةً وَاحِدَةً وَعَنْ اَبِيْ يُوْسُفَ (رحـ) اَنَّهٗ يُشْتَرَطُ الْاِقْرَارُ مَرَّتَيْنِ وَهُوَ نَظِيْرُ الِاخْتِلَافِ فِي السَّرِقَةِ، وَسَنُبَيِّنُهَا هُنَاكَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ۔

অনুবাদ : দাসের ক্ষেত্রে হদ্দের পরিমাণ হলো চল্লিশ দোররা। কেননা বিধি মতে দাসত্ব (শাস্তি) অর্ধেক করে দেয়। **কেউ যদি মদপান বা অন্য নেশার কথা স্বীকার করে পরবর্তীতে স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে নেয় তাহলে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করতে হবে না।** কেননা এটা নিরেট আল্লাহর হক। **দু'জন সাক্ষীর সাক্ষ্য দ্বারা মদপান সাব্যস্ত হবে। আর একবার স্বীকারের মাধ্যমেও সাব্যস্ত হবে।** ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে প্রাপ্ত একটি বর্ণনা মতে তিনি দু'বার স্বীকারোক্তি করার শর্তারোপ করেছেন। এটা চুরির অপরাধের ক্ষেত্রে মতভিন্নতার সদৃশ। বিষয়টি আমরা সামনে আলোচনা করব। ইনশাআল্লাহ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

গোলাম যদি মদপানের অভিযোগে অভিযুক্ত সাব্যস্ত হয়, তাহলে তার হদ্দ হবে স্বাধীন মানুষের হদ্দের অর্ধেক অর্থাৎ চল্লিশ দোররা। কেননা গোলাম হওয়ার কারণে শাস্তি অর্ধেক হয়ে যায়। এ বিষয়টি فَصْلٌ فِى كَيْفِيَّةِ الْحُدُوْدِ নামক পরিচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

মতনে السكر শব্দটি س ও ك অক্ষরে যবর যোগে পড়তে হবে। এর অর্থ হলো এমন নাবীযে তামার যাতে বুদ বুদ এসেছে কিন্তু তা পাকানো হয়নি। শব্দটি السكر (পেশ যোগে) নয়। কেননা এর অর্থ হলো নেশাগ্রস্ততা, মাতলামি যা পান করা যায় না। প্রশ্ন হয় যে, স্বীকার করার পর স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করা সম্পর্কিত যে হুকুম বর্ণিত হয়েছে তা তো সকল নেশাজাতীয় দ্রব্যের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, এমতাবস্থায় শুধু سكر তথা নাবীযে তামারের কথা উল্লেখ করার হেতু কি?

এর উত্তর হলো তদীয় অঞ্চলে সাকার ছিল সর্বাধিক প্রচলিত নেশাদ্রব্য। তাই সাকারের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যথায় স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করার হুকুম অবশ্যই মদ ও সকল নেশাদ্রব্যের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

মদ পান করার কথা স্বীকার করে যদি সেই স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়, তাহলে তা সহীহ হবে। পূর্ব স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে তাকে হদ্দ লাগানো যাবে না। কেননা মদ্যপানের শাস্তিটি নিরেট আল্লাহর হক। এতে কোনো মানুষের হক জড়িত নয়। তাই স্বীকারোক্তি প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে তাকে ভেটো দেওয়ার মতো প্রতিপক্ষ নেই। বিধায় তার প্রত্যাহার সহীহ হবে এবং সে শাস্তি হতে বেঁচে যাবে।

দু'জন সাক্ষীর সাক্ষ্য দ্বারা এবং নিজ মুখে একবার স্বীকার করার দ্বারা মদপানের অপরাধ সাব্যস্ত হয়ে থাকে এটা ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মুহাম্মদ (র.) ও অধিকাংশ আলেমের মতামত। ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম যুফার (র.) হতে বর্ণিত আছে দুবার স্বীকার করা শর্ত। তারা স্বীকারোক্তিকে সাক্ষ্যের সাথে কিয়াস করেছেন। তাই বলেছেন, সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে যেমন দু'জন সাক্ষী থাকা শর্ত, তেমনি স্বীকারোক্তির ক্ষেত্রে দু'বার স্বীকার করা শর্ত। এ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা চুরির অপরাধ সম্পর্কিত অধ্যায়ে আসবে। ইনশাআল্লাহ।

https://e-ilm.weebly.com/

وَلَا تُقْبَلُ فِيْهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ لِاَنَّ فِيْهَا شُبْهَةَ الْبَدَلِيَّةِ وَتُهْمَةَ الضَّلَالِ وَالنِّسْيَانِ . وَالسَّكْرَانُ الَّذِي يُحَدُّ هُوَ الَّذِي لَا يَعْقِلُ مَنْطِقًا لَا قَلِيلًا وَلَا كَثِيرًا وَلَا يَعْقِلُ الرَّجُلَ مِنَ الْمَرْاَةِ قَالَ الْعَبْدُ الضَّعِيْفُ وَهٰذَا عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ، وَقَالَا : هُوَ الَّذِي يَهْذِي وَيَخْتَلِطُ كَلَامُهُ لِاَنَّهُ هُوَ السَّكْرَانُ فِي الْعُرْفِ، وَاِلَيْهِ مَالَ اَكْثَرُ الْمَشَايِخِ . وَلَهُ اَنَّهُ يُؤْخَذُ فِيْ اَسْبَابِ الْحُدُوْدِ بِاَقْصَاهَا دَرْءًا لِلْحَدِّ . وَنِهَايَةُ السَّكْرَانِ يَغْلِبُ السُّرُوْرُ عَلَى الْعَقْلِ فَيَسْلُبُهُ التَّمْيِيْزَ بَيْنَ شَيْءٍ وَشَيْءٍ، وَمَا دُوْنَ ذٰلِكَ لَا يَعْرٰى عَنْ شُبْهَةِ الصَّحْوِ، وَالْمُعْتَبَرُ فِي الْقَدَحِ الْمُسْكِرُ فِيْ حَقِّ الْحُرْمَةِ مَا قَالَاهُ بِالْاِجْمَاعِ اَخْذًا بِالْاِحْتِيَاطِ وَالشَّافِعِيُّ" يَعْتَبِرُ ظُهُوْرَ اَثَرِهِ فِيْ مِشْيَتِهِ وَحَرَكَاتِهِ وَاَطْرَافِهِ وَهٰذَا مِمَّا يَتَفَاوَتُ فَلَا مَعْنٰى لِاِعْتِبَارِهِ ـ

অনুবাদ : মদপানের ক্ষেত্রে পুরুষ লোকের সাথে স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা স্ত্রীলোকদের সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে (পুরুষের) বিকল্প হওয়া তার সন্দেহ রয়েছে। তদুপরি বিভ্রান্তি বিস্মৃতির তোহমত রয়েছে।

যে নেশাগ্রস্তের উপর হদ্দ প্রয়োগ হয় সে হচ্ছে ঐ ব্যক্তি, যে অল্প-বিস্তর কোনো কথাই বুঝে না এবং স্ত্রী-পুরুষের মাঝে পার্থক্য করতে পারে না।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, এ হলো ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মত। পক্ষান্তরে সাহেবাইন বলেন, যে নেশাগ্রস্তের উপর হদ্দ প্রয়োগ হয় সে হলো যে প্রলাপ বকে এবং যার কথা গুলিয়ে যায়। কেননা পরিভাষায় তাকেই মাতাল বলে। অধিকাংশ মাশায়েখ সাহেবাইনের মতকে সমর্থন করেছেন।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর দলিল এই যে, হদ্দ-শাস্তি যথাসম্ভব রোধ করার মূলনীতির আলোকে হদ্দ এর অনুষঙ্গগুলোর ক্ষেত্রে চূড়ান্ত পর্যায়ই বিবেচ্য হবে আর নেশাগ্রস্ততার চূড়ান্ত পর্যায় হচ্ছে বুদ্ধির উপর তরলতার এমন প্রবলতা যা দুটি জিনিসের মাঝে পার্থক্য নিরূপণের ক্ষমতা রহিত করে। এর চেয়ে নিম্ন পর্যায়টি হুশ বিদ্যমান থাকার সম্ভাবনা মুক্ত নয়। তবে হারামের বিধান সাব্যস্ত হওয়ার জন্য নেশাগ্রস্ততার ঐ পর্যায়ই সর্বসম্মতিক্রমে বিবেচ্য যা সাহেবাইন বলেছেন। এর কারণ হলো সতর্কতার দিকটি গ্রহণ করা।

ইমাম শাফেয়ী (র.) হাঁটা-চলা ও অঙ্গ সঞ্চালনের ক্ষেত্রে নেশার প্রভাব প্রকাশ পাওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করেন। কিন্তু এটা মানুষভেদে বিভিন্ন হয়ে থাকে। সুতরাং মানদণ্ডরূপে এটাতে বিবেচনার অর্থ নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মদপান সাব্যস্ত হওয়ার বিষয়ে পুরুষের সাথে নারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা এ সাক্ষ্যের দ্বারা একটি হদ্দ প্রমাণিত হবে। আর হদ্দ সামান্যতম সন্দেহের কারণে রহিত হয়ে যায়। অথচ নারী সাক্ষী হওয়ার ক্ষেত্রে দুটি সন্দেহ সৃষ্টি হয়ে থাকে। এক. নারী পুরুষের বিকল্প হওয়ার সন্দেহ। দুই. বিভ্রান্তি ও ভুলে যাওয়ার সন্দেহ।

এ বিষয় দু'টি কুরআনের একটি আয়াত হতে গৃহীত। আয়াতটি হলো-

وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَاِنْ لَمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ...............

https://e-ilm.weebly.com/

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা পুরুষ সাক্ষী না থাকাকালে নারীকে সাক্ষী বানাতে বলেছেন। আর কোনো বস্তু না থাকাকালে যে বস্তু দ্বারা তার কাজ চালানো হয়, সে বস্তু বিকল্পই হয়ে থাকে। যেমন পানি না থাকলে মাটি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা যায়। তাই মাটি হলো পানির বিকল্প। অতএব, নারীও পুরুষের বিকল্প হওয়ার সন্দেহ জাগে।

আয়াতের পরবর্তী অংশে আছে-

اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰهُمَا فَتُذَكِّرَ.... এর দ্বারা বুঝা যায়, নারীর ক্ষেত্রে বিভ্রান্ত হওয়া ও ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। মোটকথা, স্ত্রীলোকের সাক্ষ্যের মাঝে এসব সন্দেহ সম্ভাবনা থাকার কারণে হদ্দ প্রমাণের ক্ষেত্রে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।

উপরিউক্ত বিষয়টিতে সকল ইমাম একমত। এতে কারো কোনো দ্বিমত নেই।

وَالسَّكْرَانُ الَّذِي يُحَدُّ هُوَ الَّذِي لَا يَعْقِلُ مَنْطِقًا الخ الخ : নেশাগ্রস্ত ব্যক্তিকে হদ্দ লাগানোর জন্য কতটুকু বা কি পরিমাণ নেশাগ্রস্ততা বিদ্যমান থাকা আবশ্যক, এ নিয়ে ইমামগণের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মতে নেশাকারী ব্যক্তি যদি এ পরিমাণ নেশাগ্রস্ত হয় যে, সে কোনো কথাই বুঝতে পারে না, কম কথা বেশি কথা কিছুই বুঝে না, পুরুষ মহিলার মাঝে তফাৎ করতে পারে না। আসমান জমিন একাকার মনে করে তাকে হদ্দ লাগানো হবে।

ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি নেশাকারী প্রলাপ বকতে থাকে এবং তার কথাবার্তা গুলিয়ে যায়, এলোমেলো হয়ে যায়, তাহলেই তাকে হদ্দ লাগানো হবে। ইমাম মালেক, শাফেয়ী, আহমদ, আবূ সাওর ও অধিকাংশ মাশায়েখ এ মতই পোষণ করেন।

তাদের দলিল স্বরূপ বলা হয়, নেশাগ্রস্ত হওয়ার বিষয়টি ওরফের উপর নির্ভরশীল, আর যে ব্যক্তি প্রলাপ বকে এবং যার কথাবার্তা গুলিয়ে যায়, তাকে ওরফে মাতাল বা নেশাগ্রস্ত বলে আখ্যায়িত করা হয়। অতএব, তাকে হদ্দ লাগানো হবে। বিশর ইবনে ওয়ালীদ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন– আমি ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম কি পরিমাণ নেশাগ্রস্ত হলে কাউকে হদ্দ লাগানো যাবে? তিনি উত্তরে বলেছিলেন, তাকে সূরা কাফিরুন পড়তে বলা হবে। যদি পড়তে না পারে তাহলে সে নেশাগ্রস্ত বলে গণ্য হবে। কেননা যে ব্যক্তি সূরা কাফিরুন পড়তে অক্ষম হয়, আল্লাহ তা'আলা তাকে সাকরান বা মাতাল বলেছেন।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর দলিল হলো এই যে, হদ্দের অনুষঙ্গগুলোর চূড়ান্ত পর্যায় কর্তব্য হয়ে থাকে হদ্দ রহিত করার উদ্দেশ্যে। যেমন জেনার হদ্দ সাব্যস্ত হওয়ার জন্য সুরমাদানির ভিতের সুরমাশলা ঢুকে থাকা বা দোয়াতের ভিতরে কলম ঢুকে থাকার অবস্থায় প্রত্যক্ষ করা শর্ত লাগানো হয়েছে। চুরির হদ্দ সাব্যস্ত হওয়ার জন্য পূর্ণ সংরক্ষিত স্থান হতে নিয়ে যাওয়ার শর্ত লাগানো হয়েছে। তেমনি মদপানের হদ্দ সাব্যস্ত হওয়ার জন্যও চূড়ান্ত পর্যায়ে মাতাল হওয়ার শর্ত লাগানো হবে। আর চূড়ান্ত পর্যায়ে মাতাল হওয়ার আলামত হলো কোনো কথা বুঝতে না পারা, নারী পুরুষের মাঝে তফাৎ করতে না পারা। অতএব, যদি কেউ খাবার ছাড়া অন্য কোনো নেশাদ্রব্য গ্রহণের পর উপরিউক্ত পর্যায়ে মাতাল না হয়, তাহলে তাকে হদ্দ লাগানো যাবে না। কেননা এ পরিমাণ মাতাল না হলে সে অসম্পূর্ণ মাতাল। আর এই অসম্পূর্ণতার মাঝে মাতাল না হওয়ার সন্দেহ জড়িত থাকে। বিধায় তার উপর থেকে হদ্দ রহিত হয়ে যাবে।

কিন্তু খাম্‌র বা মদ পান করে যদি কেউ সামান্য মাতাল হয় কিংবা একেবারেই মাতাল না হয় তাহলেও তাকে হদ্দ লাগানো হবে। কেননা খাম্‌র বা মদ হারাম। এটা পান করলে হদ্দ ওয়াজিব হয়ে যায়। মাতাল হওয়া শর্ত নয়।

খাম্‌র ছাড়া অন্যান্য পানীয় কতটুকু নেশা সৃষ্টি করলে তা হারাম বলে পরিগণিত হবে। সে ব্যাপারে সাহেবাইনের কথার উপর সকল ইমাম একমত। অর্থাৎ খাম্‌র ব্যতীত অন্য কোনো পানীয় পান করলে যদি পানকারী ব্যক্তির কথা-বার্তা গুলিয়ে যেতে থাকে তাহলে সকল ইমামের মতে উক্ত পানীয় হারাম বলে সাব্যস্ত হবে। এ ক্ষেত্রে সকল ইমাম সাহেবাইনের কথায় ঐক্যমত্য পোষণ করেছেন। কারণ এতে সতর্কতা নিহিত রয়েছে।

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন, নেশাকারীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে এবং তার হাঁটা-চলায় যদি নেশার ভাব প্রকাশ পায় তাহলেই সে নেশাগ্রস্ত বলে বিবেচিত হবে এবং তাকে হদ্দ লাগানো হবে। কিন্তু তার এ মতটি প্রশ্নবিদ্ধ। কেননা হাঁটা-চলায় নেশার প্রভাব পড়ার বিষয়টি ব্যক্তির পার্থক্যের কারণে পার্থক্য হয়ে থাকে। কিছু লোক এমনও আছে, যারা নেশাগ্রস্ত না হলেও হেলে-দুলে হাঁটে। আর কিছু লোক এমন শক্তিশালী হয় যে, নেশাগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও সুস্থ মানুষের মতো স্বাভাবিকভাবে হেঁটে চলে যায়। অতএব, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ও হাঁটা চলায় নেশার প্রভাব প্রকাশিত হওয়ার বিষয়টি বিবেচনায় আনা যুক্তিযুক্ত নয়।

https://e-ilm.weebly.com/

وَلَا يُحَدُّ السَّكْرَانُ بِاِقْرَارِهٖ عَلٰى نَفْسِهٖ لِزِيَادَةِ اِحْتِمَالِ الْكَذِبِ فِيْ اِقْرَارِهٖ فَيُحْتَالُ لِدَرْئِهٖ لِاَنَّهٗ خَالِصُ حَقِّ اللّٰهِ تَعَالٰى . بِخِلَافِ حَدِّ الْقَذْفِ لِاَنَّ فِيْهِ حَقَّ الْعَبْدِ وَالسَّكْرَانُ فِيْهِ كَالصَّاحِيْ عُقُوْبَةً عَلَيْهِ كَمَا فِيْ سَائِرِ تَصَرُّفَاتِهٖ، وَلَوْ اِرْتَدَّ السَّكْرَانُ لَا تَبِيْنُ مِنْهُ امْرَاَتُهٗ لِاَنَّ الْكُفْرَ مِنْ بَابِ الْاِعْتِقَادِ فَلَا يَتَحَقَّقُ مَعَ السُّكْرِ وَهٰذَا قَوْلُ اَبِيْ حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَفِيْ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ تَكُوْنُ رِدَّةً ـ

অনুবাদ : নেশাগ্রস্ত ব্যক্তির আত্মবিপক্ষ নিজের বিরুদ্ধে স্বীকারোক্তি দ্বারা তার উপর হদ্দ সাব্যস্ত হয় না। কেননা এ অবস্থায় তার স্বীকারোক্তিতে মিথ্যার সম্ভাবনা অধিক। সুতরাং হদ্দ রহিত করার জন্য সেটাকে অজুহাতরূপে গ্রহণ করা হবে। কেননা এটা নিরেট আল্লাহর হক।

পক্ষান্তরে কাযফ বা অপবাদ আরোপের হদ্দ প্রসঙ্গটি ভিন্ন। কেননা এতে বান্দার হক রয়েছে। আর বান্দার হকের ক্ষেত্রে শাস্তিরূপে মাতালকে সুস্থ ব্যক্তির সমপর্যায়ে গণ্য করা হয়। যেমন তার যাবতীয় কার্যে হয়ে থাকে।

নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি ধর্মত্যাগ করে মুরতাদ হলে তার ক্ষেত্রে স্ত্রী বিচ্ছেদ সাব্যস্ত হবে না।

কেননা কুফরি হচ্ছে আকীদা সংশ্লিষ্ট বিষয়। সুতরাং নেশাগ্রস্ততা অবস্থায় তা সাব্যস্ত হবে না। এটা ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর অভিমত। পক্ষান্তরে যাহিরে রেওয়ায়েত অনুযায়ী এটা ধর্মত্যাগ বলে সাব্যস্ত হবে। (সুতরাং স্ত্রী বিচ্ছেদও সাব্যস্ত হবে)।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কেউ যদি মাতাল অবস্থায় এমন কোনো বিষয়ে স্বীকারোক্তি উচ্চারণ করে, যা নিরেট আল্লাহর হক যেমন জেনার হদ্দ, মদ্যপানের হদ্দ ইত্যাদি তাহলে তার এ স্বীকারোক্তির উপর ভিত্তি করে হদ্দ লাগানো হবে না। কেননা স্বীকারোক্তি হলো একটি খবর। যাতে মিথ্যার সম্ভাবনা থাকে। তদুপরি যখন এটা কোনো মাতাল ব্যক্তির মুখ থেকে উচ্চারিত হয়, তখন আরো বেশি মিথ্যা হওয়ার সম্ভাবনা। তাই মিথ্যার সম্ভাবনাকে অজুহাত বানিয়ে হদ্দ রহিত করে দেওয়া হবে। কেননা হদ্দ রহিত করার জন্য অজুহাত বা বাহানা গ্রহণ করতে হয়। হদ্দ সাব্যস্ত করার জন্য বাহানা গ্রহণ করা যায় না।

পক্ষান্তরে যদি এমন কোনো বিষয়ে স্বীকারোক্তি উচ্চারণ করে যার মধ্যে বান্দার হক রয়েছে, যেমন হদ্দে কযফ, তাহলে তার স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য হবে। যেমনিভাবে এ ব্যাপারে সুস্থ মানুষের স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য হয়। হদ্দে কাযফের ব্যাপারে মাতাল ব্যক্তির কথা গ্রহণযোগ্য হওয়ার বিষয়টি সাহাবাদের ইজমা বা ঐকমত্য দ্বারা প্রমাণিত। কেননা সাহাবাগণ বলেছেন, কেউ যখন মাতাল হয় তখন সে প্রলাপ বকে আর যে প্রলাপ বকে সে অপবাদ আরোপ করে। আর অপবাদ আরোপকারীর শাস্তি হলো আশি দোররা।

মাতালের কথা দ্বারা হদ্দে কযফ ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে এটি সাহাবাদের পক্ষ হতে ইজমা। অতএব, বান্দার হক সংশ্লিষ্ট থাকার কারণে যখন মাতালের কথার দ্বারা হদ্দে কযফ ওয়াজিব হয়ে গেল, তখন তার কথা দ্বারা বান্দার অন্যান্য হকও সাব্যস্ত হওয়া উচিত। তাই কেসাস, তালাক, ইতাক ইত্যাদি বিষয়েও মাতালের কথা গ্রহণযোগ্য হবে।

মাতাল অবস্থায় যদি কেউ মুরতাদ হয়ে যায়, তাহলে তার কি হুকুম এ নিয়ে দু'রকম বর্ণনা রয়েছে।

এক. ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর মতে সে মুরতাদ বলে গণ্য হবে না এবং তার স্ত্রীও বিচ্ছিন্ন হবে না। এটি ইস্তিহসানের দাবি। কেননা মুরতাদ হওয়া বা কাফের হওয়া একটি আকীদাগত ব্যাপার। আর মাতাল অবস্থায় কোনো আকীদা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। অতএব, মাতাল ব্যক্তি কাফের মুরতাদ বলে গণ্য হবে না এবং তার স্ত্রীও তালাক হবে না।

দুই. জাহিরে রেওয়ায়েত অনুসারে মাতাল ব্যক্তি মুরতাদ কাফের বলে গণ্য হবে এবং তার স্ত্রীও তালাক হয়ে যাবে। এটিই কিয়াসের দাবি।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ

وَاِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ رَجُلًا مُحْصَنًا اَوْ اِمْرَاَةً مُحْصَنَةً بِصَرِيْحِ الزِّنَاءِ وَطَالَبَ الْمَقْذُوْفُ بِالْحَدِّ حَدَّهُ الْحَاكِمُ ثَمَانِيْنَ سَوْطًا اِنْ كَانَ حُرًّا لِقَوْلِهِ تَعَالٰى ﴿وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ اِلٰى اَنْ قَالَ ﴿فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمَانِيْنَ جَلْدَةً﴾ اَلْاٰيَةَ، وَالْمُرَادُ الرَّمْيُ بِالزِّنَا بِالْاِجْمَاعِ، وَفِي النَّصِّ اِشَارَةٌ اِلَيْهِ وَهُوَ اشْتِرَاطُ اَرْبَعَةٍ مِنَ الشُّهَدَاءِ اِذْ هُوَ مُخْتَصٌّ بِالزِّنَاءِ وَيُشْتَرَطُ مُطَالَبَةُ الْمَقْذُوْفِ لِاَنَّ فِيْهِ حَقَّهُ مِنْ حَيْثُ دَفْعِ الْعَارِ وَاِحْصَانِ الْمَقْذُوْفِ لِمَا تَلَوْنَا .

পরিচ্ছেদ : অপবাদের হদ্দ

অনুবাদ : কোনো মানুষ যদি ইহসান সম্পন্ন কোনো পুরুষ বা স্ত্রীলোককে সরাসরি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করে আর অপবাদ আরোপিত ব্যক্তি হদ্দ প্রয়োগের দাবি জানায় এবং যদি অপবাদ আরোপকারী ব্যক্তি স্বাধীন লোক হয়, তাহলে অপবাদ আরোপকারীর উপর শাসক হদ্দ হিসাবে আশিটি দোররা লাগাবেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمَانِيْنَ جَلْدَةً

"যারা ইহসান সতী-সাধ্বী নারীর বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ করে অতঃপর চারজন সাক্ষী পেশ করতে না পারে, তাদেরকে আশিটি দোররা লাগাও"

অপবাদ আরোপের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, জেনার অপবাদ আরোপ করা। এটা ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। তাছাড়া চারজন সাক্ষীর শর্তারোপের মাধ্যমে আয়াতের মধ্যে সেদিকে ইঙ্গিতও করা হয়েছে। কেননা চার সাক্ষীর বিষয়টি জেনার সাথেই বিশিষ্ট।

অপবাদ আরোপিত ব্যক্তির পক্ষ থেকে দাবি উত্থাপনের শর্ত রয়েছে। কেননা অপবাদ অপনোদনের দিক থেকে হদ্দ প্রয়োগ হচ্ছে তার নিজের হক। আর অপবাদ আরোপিত ব্যক্তির মুহসান হওয়ার দলিল তেলাওয়াতকৃত আয়াত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

اَلْقَذْفُ -এর আভিধানিক অর্থ হলো নিক্ষেপ করা। ফকীহগণের পরিভাষায় قَذْفٌ -এর অর্থ হলো কোনো মুহসান ব্যক্তিকে ব্যভিচারের দোষে দোষী করা। এটি একটি কবীরা গুনাহ। হাদীস শরীফে একে ধ্বংসাত্মক গুনাহসমূহের মাঝে গণ্য করা হয়েছে। একদা হুজুর ﷺ ইরশাদ করলেন, "তোমরা ধ্বংসাত্মক বিষয়সমূহ হতে বেঁচে থাক। প্রশ্ন করা হলো হুজুর! সেগুলো কী কী? তিনি জবাব দিলেন- আল্লাহর সাথে শরিক করা। অর্থাৎ কাউকে আল্লাহর অংশীদার সাব্যস্ত করা, জাদু করা, অবৈধভাবে কাউকে হত্যা করা, সুদ খাওয়া, অনাথের সম্পদ গ্রাস করা, জেহাদের ময়দান হতে পালিয়ে যাওয়া, সতী-সাধবী মুমিন নারীকে ব্যভিচারের অপবাদ দেওয়া।" –(বুখারী ও মুসলিম)

হযরত বেলাল ইবনে উমাইয়্যা (রা.) যখন দাবি করেছিলেন যে, তার স্ত্রীর সাথে শরীক ইবনে সাহমা জেনা করেছে, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন– তুমি তোমার দাবির পক্ষে সাক্ষী উপস্থিত কর, অন্যথায় তোমার পিঠে হদ্দ প্রয়োগ করা হবে। –(বুখারী)

https://e-ilm.weebly.com/

যখন হযরত আয়েশা (রা.) এর নির্দোষ হওয়া সম্পর্কে কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হলো, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে নববীর মিম্বরে আরোহণ করে আয়াতগুলো পাঠ করে শুনালেন। অতঃপর মিম্বার হতে নেমে হাসসান বিন সাবেত, মিসতাহ ইবনে উসামাহ ও হামনা বিনতে জাহাশকে হদ্দে কযফ লাগানোর জন্য নির্দেশ দেন।

মোটকথা ইসলামি শরিয়তে ব্যভিচারের অপবাদ আরোপকারীর উপর হদ্দ প্রয়োগের বিধান রয়েছে। আর এটা কুরআন সুন্নাহ উভয় দ্বারা প্রমাণিত এবং নবী ও সাহাবীগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

মাসআলার ব্যাখ্যা : কেউ যদি সতী-সাধবী কোনো নারী বা পুরুষের ব্যাপারে জেনার অপবাদ আরোপ করে সুস্পষ্ট শব্দে এরূপ বলে যে, হে ব্যভিচারী! হে ব্যভিচারিণী! ইত্যাদি, তাহলে এটা অপবাদ বলে গণ্য হবে এবং এ কারণে তাকে হদ্দে কযফ হিসেবে আশিটি বেত্রাঘাত করা হবে। তবে এ ক্ষেত্রে কয়েকটি শর্ত অনুসরণ করতে হবে।

১. অপবাদকারী ব্যক্তিটি শাস্তি গ্রহণের উপযুক্ত হতে হবে। যদি সে শিশু কিংবা পাগল হয় তাহলে হদ্দ প্রয়োগ হবে না।

২. অপবাদটি صَرِيْح তথা স্পষ্ট শব্দে হতে হবে। كِنَايَة বা ইঙ্গিতে হলে হবে না। অতএব একজন লোক যদি আরেকজনকে লক্ষ্য করে বলে যে, হে ব্যভিচারী! তা শুনে তৃতীয় ব্যক্তি বলল- হ্যাঁ, তুমি সত্য বলেছ, এমতাবস্থায় তৃতীয় ব্যক্তিকে হদ্দ লাগানো যাবে না। কারণ সে স্পষ্ট শব্দে ব্যভিচারের কথা বলেনি।

৩. অপবাদ আরোপিত ব্যক্তির পক্ষ থেকে অপবাদ আরোপকারীর উপর হদ্দ প্রয়োগের দাবি তুলতে হবে। দাবি না করলে সে তার নিজের হক ছেড়ে দিয়েছে মনে করা হবে। ফলে হদ্দ প্রয়োগ করা হবে না।

৪. অপবাদ আরোপকারী স্বাধীন হতে হবে। যদি সে গোলাম বা বাঁদী হয় তাহলে তার শাস্তি আশি দোররা হবে না; বরং তার শাস্তি হবে চল্লিশ দোররা।

এ শর্তগুলোর মধ্য হতে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পঞ্চম শর্তটি কিতাবের মতনে উল্লেখ আছে। আর এসব বিষয়ের দলিলরূপে উল্লেখ করা হয়েছে কুরআনের এ আয়াতকে وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ الخ

উপরিউক্ত আয়াতে يَرْمُوْنَ শব্দ দ্বারা জেনার অপবাদ আরোপ উদ্দেশ্য। এর দলিল হলো আলেমগণের ইজমা। তাছাড়া আয়াতের মধ্যে এদিকে ইঙ্গিতও রয়েছে। কেননা আয়াতে বলা হয়েছে, চারজন সাক্ষী আনতে অক্ষম হলে তাদেরকে হদ্দ লাগাও। চারজন সাক্ষীর প্রয়োজন কেবল জেনার অভিযোগ প্রমাণের জন্যই হয়ে থাকে। এর দ্বারা বুঝা যায়, জেনার অপবাদই আয়াতের আলোচ্য বিষয়।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ وَيُفَرَّقُ عَلَى أَعْضَائِهِ لِمَا مَرَّ فِي حَدِّ الزِّنَاءِ وَلَا يُجَرَّدُ مِنْ ثِيَابِهِ لِأَنَّ سَبَبَهُ غَيْرُ مَقْطُوْعٍ فَلَا يُقَامُ عَلَى الشِّدَّةِ، بِخِلَافِ حَدِّ الزِّنَاءِ غَيْرَ أَنَّهُ يُنْزَعُ عَنْهُ الْفَرْوُ وَالْحَشْوُ لِأَنَّ ذٰلِكَ يَمْنَعُ إِيْصَالَ الْأَلَمِ بِهِ وَإِنْ كَانَ الْقَاذِفُ عَبْدًا جُلِدَ أَرْبَعِيْنَ سَوْطًا لِمَكَانِ الرِّقِّ . وَالْإِحْصَانُ أَنْ يَكُوْنَ الْمَقْذُوْفُ حُرًّا عَاقِلًا بَالِغًا مُسْلِمًا عَفِيْفًا عَنْ فِعْلِ الزِّنَاءِ أَمَّا الْحُرِّيَّةُ فَلِأَنَّهُ يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْإِحْصَانِ، قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ أَيْ الْحَرَائِرِ، وَالْعَقْلُ وَالْبُلُوْغُ لِأَنَّ الْعَارَ لَا يَلْحَقُ بِالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُوْنِ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ فِعْلِ الزِّنَاءِ مِنْهُمَا، وَالْإِسْلَامُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ﴿مَنْ أَشْرَكَ بِاللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ﴾ وَالْعِفَّةُ لِأَنَّ غَيْرَ الْعَفِيْفِ لَا يَلْحَقُهُ الْعَارُ، وَكَذَا الْقَاذِفُ صَادِقٌ فِيْهِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, **তার বিভিন্ন অঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে বেত্রাঘাত করা হবে।** এর কারণ জেনার হদ্দ সম্পর্কিত আলোচনায় অতিবাহিত হয়েছে। **তবে তাকে বস্ত্রমুক্ত করা হবে না।** কেননা আলোচ্য হদ্দ এর কারণ সুনিশ্চিত নয়। সুতরাং পূর্ণ কঠোরতার সাথে তা প্রয়োগ করা হবে না।

জেনার হদ্দ প্রয়োগের বিষয়টি ভিন্ন। (কেননা তা সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে বা স্বীকারোক্তির মাধ্যমে সুনিশ্চিত হয়ে থাকে)। **তবে চামড়া ও তুলা ভর্তি কাপড় চোপড় খুলে ফেলা হবে।** কেননা তাতে বেত্রাঘাতের ব্যথা পৌঁছাতে বাধা প্রদান করে।

অপবাদ আরোপকারী ব্যক্তিটি যদি গোলাম হয়, তাহলে তাকে চল্লিশ দোররা লাগাতে হবে। কারণ হলো দাসত্বের বিদ্যমানতা। **ইহসান -এর অর্থ হলো অপবাদ আরোপিত ব্যক্তির স্বাধীন, সুস্থমস্তিষ্ক, প্রাপ্তবয়স্ক, মুসলিম হওয়া এবং ব্যভিচার হতে পবিত্র হওয়া।**

স্বাধীন হওয়ার শর্ত এজন্য যে, (কুরআনে) স্বাধীন ব্যক্তির উপর ইহসান শব্দ প্রযুক্ত হয়েছে। যেমন- فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ দাসীদের উপর মুহসান নারীদের তথা স্বাধীন নারীদের অর্ধেক শাস্তি সাব্যস্ত হবে।

সুস্থ মস্তিষ্ক ও প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার শর্ত এ জন্য যে, অপবাদজনিত কলঙ্ক শিশু ও পাগলকে স্পর্শ করে না। কেননা (শরিয়তের দৃষ্টিতে) তাদের দ্বারা ব্যভিচার কর্ম সম্পন্ন হয় না। মুসলিম হওয়ার শর্ত এ জন্য যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, مَنْ أَشْرَكَ بِاللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ - যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করে সে মুহসান নয়।

চারিত্রিক শুচিতার শর্ত এ জন্য যে, চরিত্রহীন ব্যক্তির কলঙ্ক স্পর্শ হয় না। তাছাড়া অপবাদ আরোপকারী ব্যক্তি তার বক্তব্যে সত্যবাদী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

অপবাদ আরোপকারীর উপর হদ্দ প্রয়োগ করা কালে আশিটি বেত তার শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে ছড়িয়ে ছিটিয়ে লাগাতে হবে এর কারণ হলো, যদি এক অঙ্গে সবগুলো বেত প্রয়োগ করা হয় তাহলে মারা যাওয়ার বা অঙ্গটি নষ্ট হয়ে যাওয়ার

https://e-ilm.weebly.com/

প্রবল আশঙ্কা থাকে। চেহারা, মাথা ও লজ্জাস্থানে আঘাত করা যাবে না হদ্দ প্রয়োগের সময় অপবাদ আরোপকারীর গায়ের বস্ত্র খুলা হবে না, যাতে করে শাস্তিটা লাঘব হয়। জেনার হদ্দের ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তির গায়ের কাপড় খুলে নিতে হয়। দুয়ের মধ্যে পার্থক্য করার কারণ হলো, জেনার অপরাধী সাক্ষীদের সাক্ষ্য দ্বারা কিংবা ব্যক্তির স্বীকারোক্তি দ্বারা সুনিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয়ে থাকে। তাই এর শাস্তি কঠোরতার সাথে প্রয়োগ করার প্রয়োজন থাকে বিধায় গায়ের কাপড় খুলে হদ্দ লাগানো হয়। পক্ষান্তরে হদ্দে কযফের বিষয়টি সুনিশ্চিত হয় না, কেননা কেউ যখন কারো ব্যাপারে জেনার অভিযোগ উত্থাপন করে, অতঃপর চারজন সাক্ষী হাজির করতে না পারায় তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হয় তখন এ ব্যক্তিটি প্রকৃত পক্ষেই অপবাদ আরোপকারী এমনটি আমরা নিশ্চিত বলতে পারি না। কারণ হতে পারে সে আসলে সত্যবাদী। কিন্তু সাক্ষী হওয়ার জন্য যেসব শর্ত শরিয়তে রয়েছে, সেসব শর্ত বিদ্যমান না থাকায় চারজন সাক্ষী সে হাজির করতে পারেনি। ফলে সে পার্থিব বিচারে মিথ্যাবাদী অপবাদ আরোপকারী বলে সাব্যস্ত হয়েছে এবং তার উপর হদ্দ প্রয়োগের সিদ্ধান্ত হয়েছে। কিন্তু আসলে সে মিথ্যাবাদী নয়, সত্যবাদী। তাই তার শাস্তিটি পূর্ণ কঠোরতার সাথে প্রয়োগ করা হবে না; বরং লাঘব করা হবে। এ উদ্দেশ্যেই তাকে বস্ত্রমুক্ত করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

হ্যাঁ, তবে যদি তার গায়ে চামড়া কিংবা তুলা ভর্তি জেকেট ইত্যাদি পরিহিত থাকে, তাহলে সেগুলো খুলে নিতে হবে, অন্যথায় বেত্রাঘাতের যন্ত্রণাই সে অনুভব করতে পারবে না এবং হদ্দ প্রয়োগ অনর্থক বা অহেতুক বলে সাব্যস্ত হবে।

وَإِنْ كَانَ الْقَاذِفُ عَبْدًا جُلِدَ أَرْبَعِيْنَ الخ : অপবাদ আরোপকারী যদি দাস বা দাসী হয়, তাহলে তার হদ্দের পরিমাণ হবে চল্লিশ দোররা। এর কারণ হলো দাসত্ব হদ্দকে অর্ধেক করে দেওয়া; যা পূর্বেও আলোচিত হয়েছে।

হদ্দে কযফ সম্পর্কিত আয়াতে বলা হয়েছে, যারা মুহসান নারীকে অপবাদ আরোপ করে.........

মুহসান ব্যক্তির গুণটিকে বলা হয় ইহসান। এই ইহসান এর মর্ম কি? এ বিষয় আলোকপাত করার উদ্দেশ্য গ্রন্থকার বলেন- وَالْإِحْصَانُ أَنْ يَكُوْنَ .... الخ ইহসান হলো পাঁচটি গুণের সমন্বয়। যার মাঝে এই পাঁচটি গুণ পাওয়া যায় তাকে মুহসান বলা হয়। গুণ পাঁচটির বিবরণ দলিলসহ নিম্নরূপ :

১. স্বাধীন হওয়া। দলিল হলো- فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ তাদের (বাঁদিদের) শাস্তি হলো মুহসান নারীদের তথা স্বাধীনা নারীদের শাস্তির অর্ধেক। অতএব, মুহসান হওয়ার জন্য স্বাধীন হওয়া শর্ত। এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুহসান বলে স্বাধীন বুঝিয়েছেন।

২. আকেল হওয়া তথা সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন হওয়া।

৩. বালেগ হওয়া তথা প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া। এ শর্তদুটির কারণ হলো, পাগল এবং শিশুর ক্ষেত্রে অপবাদ গ্রহণযোগ্য নয়। অপবাদের কলঙ্কে তারা লজ্জিত হয় না। কারণ শরিয়তের দৃষ্টি শিশু ও পাগল কর্তৃক ব্যভিচার সম্পন্ন হয় না।

৪. মুসলমান হওয়া এ শর্তটি এ জন্য যে, হুজুর ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করে সে মুহসান নয়। অতএব, মুহসান হওয়ার জন্য মুসলমান হওয়া শর্ত। উপরিউক্ত হাদীসটি হযরত ইবনে ওমর (রা.) এর সূত্রে ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ্ বর্ণনা করেছেন।

৫. আফীফ হওয়া তথা ব্যভিচারের দোষ হতে পবিত্র হওয়া। কেননা ব্যভিচার দোষে দুষ্ট ব্যক্তিকে অপবাদের কলঙ্ক স্পর্শ করে না। এরূপ ব্যক্তিকে যে অপবাদ আরোপ করে সে তার বক্তব্যে সত্যবাদী হয়ে থাকে বিধায় তাকে হদ্দ প্রয়োগ করা হয় না; মোটকথা, উপরিউক্ত পাঁচটি গুণে গুণান্বিত হওয়াকে ইহসান বলে। গুণান্বিত ব্যক্তিকে মুহসান বলা হয়।

https://e-ilm.weebly.com/

وَمَنْ نَفَى نَسَبَ غَيْرِهِ فَقَالَ لَسْتَ لِأَبِيْكَ فَإِنَّهُ يُحَدُّ وَهٰذَا إِذَا كَانَتْ أُمُّهُ حُرَّةً مُسْلِمَةً، لِأَنَّهُ فِي الْحَقِيْقَةِ قَذْفٌ لِأُمِّهِ لِأَنَّ النَّسَبَ إِنَّمَا يُنْفَى عَنِ الزَّانِيْ لَا عَنْ غَيْرِهِ . وَمَنْ قَالَ لِغَيْرِهِ فِيْ غَضَبٍ لَسْتَ بِابْنِ فُلَانٍ لِأَبِيْهِ الَّذِيْ يُدْعٰى لَهُ يُحَدُّ، وَلَوْ قَالَ فِيْ غَيْرِ غَضَبٍ لَا يُحَدُّ لِأَنَّ عِنْدَ الْغَضَبِ يُرَادُ بِهِ حَقِيْقَتُهُ سَبًّا لَهُ، وَفِيْ غَيْرِهِ يُرَادُ بِهِ الْمُعَاتَبَةُ بِنَفْيِ مُشَابَهَتِهِ أَبَاهُ فِيْ أَسْبَابِ الْمُرُوْءَةِ. وَلَوْ قَالَ لَسْتَ بِابْنِ فُلَانٍ يَعْنِيْ جَدَّهُ لَمْ يُحَدَّ لِأَنَّهُ صَادِقٌ فِيْ كَلَامِهِ. وَلَوْ نَسَبَهُ إِلٰى جَدِّهِ لَا يُحَدُّ أَيْضًا لِأَنَّهُ قَدْ يُنْسَبُ إِلَيْهِ مَجَازًا.

অনুবাদ : কেউ যদি অন্য কারো বংশ পরিচয় অস্বীকার করে বলে যে, তুমি তোমার পিতার সন্তান নও তাহলে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে। এটা তখনই হবে, যখন অপবাদ আরোপিত ব্যক্তির মাতা স্বাধীনা মুসলিমা হয়। কেননা এটা প্রকৃত পক্ষে তার মাতার প্রতি অপবাদের নামান্তর। কেননা ব্যভিচারী থেকেই বংশ পরিচয় রহিত করা হয়। অন্য কারো থেকে নয়।

কেউ যদি ক্রোধের সময় কাউকে তার স্বীকৃত পিতার নাম নিয়ে বলে তুমি অমুকের পুত্র নও, তাহলে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে। পক্ষান্তরে ক্রোধ মুক্ত অবস্থায় বললে হদ্দ প্রয়োগ করা হবে না। কেননা ক্রোধের সময় এ ধরনের কথা দ্বারা প্রকৃতই তাকে গালি দেওয়া উদ্দেশ্য হয়। পক্ষান্তরে ক্রোধমুক্ত অবস্থায় উদ্দেশ্য হয় সদগুণাবলির ক্ষেত্রে পিতার সাথে তার সাদৃশ্য নাকচ করে তাকে তিরস্কার করা।

যদি কেউ কারো দাদার নাম নিয়ে বলে যে তুমি অমুকের পুত্র নও, তাহলে হদ্দ সাব্যস্ত হবে না। কেননা সে তার বক্তব্যে সত্যবাদী। অদ্রূপ যদি কেউ কাউকে তার দাদার সাথে সম্পৃক্ত করে (অর্থাৎ এরূপ বলে যে, তুমি তোমার দাদার ছেলে) তাহলেও হদ্দ সাব্যস্ত হবে না। কেননা রূপকভাবে ব্যক্তিকে দাদার সাথে সম্পৃক্ত করা যায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কেউ যদি অন্যের সম্পর্কে এমন বলে যে, তুমি তোমার পিতার সন্তান নও তাহলে প্রকৃত পক্ষে এটা তার মাতার উপর অপবাদ। কেমন যেন একথাই বলল যে, তোমার মাতা কারো সাথে ব্যভিচার কর্মে লিপ্ত হয়েছিল তুমি সেই কর্মের ফসল। অতএব, তুমি তোমার পিতার সন্তান নও; বরং তুমি সেই ব্যক্তির বীর্যে ভূমিষ্ট হয়েছ, যে তোমার মাতার সাথে জেনা করেছিল।

قَوْلُهُ وَمَنْ قَالَ لِغَيْرِهِ فِيْ غَضَبٍ لَسْتَ الخ : কেউ যদি রাগান্বিত অবস্থায় কাউকে লক্ষ্য করে বলে যে, তুমি তোমার (স্বীকৃত) পিতার সন্তান নও, তাহলে তাকে হদ্দে কযফ লাগানো হবে। কেননা ব্যক্তিটি রাগান্বিত অবস্থায় কথাটি বলছে। এর দ্বারা বুঝা যায়, কথাটি সে প্রকৃত অর্থেই ব্যবহার করেছে। আর একথা প্রকৃত অর্থে ব্যবহার করার অর্থই হলো সম্বোধিত ব্যক্তির মাতার উপর জেনার অপবাদ আরোপ করা। অতএব, কথক ব্যক্তিটি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপকারী বলে সাব্যস্ত হবে এবং তার উপর হদ্দে কযফ প্রয়োগ করা হবে।

কিন্তু যদি রাগ ব্যতীত স্বাভাবিক অবস্থায় কেউ কাউকে একথা বলে তাহলে এর প্রকৃত অর্থ উদ্দেশ্য হয় না; বরং 'তুমি তোমার পিতার সন্তান নও' এর দ্বারা উদ্দেশ্য তুমি তোমার পিতার মতো ভালো মানুষ নও। সদগুণাবলিতে তুমি তোমার পিতার মতো নও আর এটা কোনো অপবাদ নয়। তাই তাকে অপবাদের হদ্দ লাগানো হবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

وَلَوْ قَالَ لَهُ يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ وَاُمُّهُ مَيِّتَةٌ مُحْصَنَةٌ فَطَالَبَ الِابْنُ بِحَدِّهِ حُدَّ الْقَاذِفُ لِاَنَّهُ قَذَفَ مُحْصَنَةً بَعْدَ مَوْتِهَا وَلَا يُطَالِبُ بِحَدِّ الْقَذْفِ لِلْمَيِّتِ اِلَّا مَنْ يَقَعُ الْقَدْحُ فِيْ نَسَبِهِ بِقَذْفِهِ وَهُوَ الْوَالِدُ وَالْوَلَدُ لِاَنَّ الْعَارَ يَلْتَحِقُ بِهِ لِمَكَانِ الْجُزْئِيَّةِ فَيَكُوْنُ الْقَذْفُ مُتَنَاوِلًا لَهُ مَعْنًى. وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ يَثْبُتُ حَقُّ الْمُطَالَبَةِ لِكُلِّ وَارِثٍ لِاَنَّ حَدَّ الْقَذْفِ يُوْرَثُ عِنْدَهُ عَلٰى مَا نُبَيِّنُ، وَعِنْدَنَا وِلَايَةُ الْمُطَالَبَةِ لَيْسَتْ بِطَرِيْقِ الْإِرْثِ بَلْ لِمَا ذَكَرْنَاهُ، وَلِهٰذَا يَثْبُتُ عِنْدَنَا لِلْمَحْرُوْمِ عَنِ الْمِيْرَاثِ بِالْقَتْلِ، وَيَثْبُتُ لِوَلَدِ الْبِنْتِ كَمَا يَثْبُتُ لِوَلَدِ الْاِبْنِ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ، وَيَثْبُتُ لِوَلَدِ الْوَلَدِ حَالَ قِيَامِ الْوَلَدِ خِلَافًا لِزُفَرَ.

অনুবাদ : যদি কেউ তাকে লক্ষ্য করে বলে হে ব্যভিচারিণীর পুত্র, আর তার মাতা মৃতা ও মুহসানা হয় এবং পুত্র অপবাদ আরোপকারীর বিরুদ্ধে হদ্দ দাবি করে তাহলে অপবাদ আরোপকারীর উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে। কেননা সে একজন মুহসিনা নারীকে তার মৃত্যুর পর অপবাদ দিয়েছে।

মৃতের স্বপক্ষে অপবাদ জনিত হদ্দ এমন ব্যক্তিই শুধু দাবি করতে পারে, অপবাদের কারণে যার বংশ পরিচয় কলঙ্ক যুক্ত নয়। অর্থাৎ মৃতের পিতা ও সন্তান। কেননা মৃতের সঙ্গে অংশত্বের সম্পর্ক বিদ্যমান হওয়ার কারণে উভয়ের সাথে কলঙ্কযুক্ত হয়। সুতরাং অন্তর্নিহিতভাবে এ অপবাদ তাকেও অন্তর্ভুক্ত করে।

ইমাম শাফেয়ী (র.) এর মতে হদ্দ দাবি করার অধিকার প্রত্যেক ওয়ারিশের জন্য সাব্যস্ত হয়, কেননা এ মর্মে সামনে আমাদের বর্ণনা আসছে যে, ইমাম শাফেয়ী (র.) এর মতে অপবাদ জনিত হদ্দের ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার সাব্যস্ত হয়।

আমাদের মতে হদ্দ দাবি করার অধিকার উত্তরাধিকার সূত্রে নয়; বরং কলঙ্ক জনিত যে কারণ বর্ণনা করেছি, সেই সূত্রে। এ কারণেই আমাদের মতে হত্যার অপবাদকে মিরাশ থেকে বঞ্চিত ব্যক্তির পক্ষেও আলোচ্য হদ্দ দাবি করার অধিকার সাব্যস্ত হয়।

এ অধিকার মৃতের পুত্রের সন্তানের পক্ষে যেমন সর্বসম্মতিমে সাব্যস্ত হয়, তেমনি কন্যার সন্তানদের পক্ষেও সাব্যস্ত হয়। তবে ইমাম মুহাম্মদ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন।

মৃতের সন্তান বিদ্যমান থাকা অবস্থায়ও সন্তানের সন্তানের পক্ষে আলোচ্য অধিকার সাব্যস্ত। ইমাম যুফার (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

[পূর্ব পৃষ্ঠার পর]

وَلَوْ قَالَتْ لَسْتَ بِابْنِ فُلَانٍ الخ কেউ যদি অন্যকে বলে যে, তুমি অমুকের ছেলে নও অর্থাৎ দাদার ছেলে নও তাহলে তার একথার কারণে কোনো হদ্দ ওয়াজিব হবে না। কেননা সে তার বক্তব্যে সত্যবাদী। কারণ যাকে একথাটি বলা হয়েছে সে দাদার ছেলে নয়; বরং সে তার পিতার ছেলে। তদ্রূপ বিপরীত দিকটিও। অর্থাৎ যদি কেউ কাউকে তার দাদার সাথে সম্বন্ধিত করে বলে যে, তুমি অমুকের ছেলে অর্থাৎ দাদার ছেলে, তাহলেও হদ্দ ওয়াজিব হবে না। কারণ কোনো

https://e-ilm.weebly.com/

ব্যক্তির দাদার সাথে সম্বন্ধিত করা জায়েজ আছে রূপকার্থে। যেমন আল্লাহ তা'আলা মানবজাতিকে সম্বোধন করে বলেছেন- يبنى ادم হে আদম সন্তানেরা। অনুরূপ রাসূলুল্লাহ ﷺ ও নিজেকে দাদার সাথে সম্বন্ধ করে বলেছেন- انا ابن عبد المطلب - আমি আবদুল মুত্তালিবের পুত্র। অতএব, এ ধরনের কথা কোনো অপবাদ নয়। তাই কোনো শাস্তিও সাব্যস্ত হবে না।

وَلَوْ قَالَ لَهُ يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ وَأُمُّهُ مَيِّتَةٌ الخ : কেউ যদি কাউকে সম্বোধন করে বলে যে, হে ব্যভিচারিণীর পুত্র! তখন যদি তার মাতা মৃত হয় এবং সে মুহসানা হয়, তাহলে ছেলে হদ্দ দাবি করতে পারবে এবং অপবাদ আরোপকারীকে হদ্দ লাগানো হবে। কেননা এ ব্যক্তি মূলত একজন মৃত মুহসানা নারীকে অপবাদ দিয়েছে। অতএব, তার উপর হদ্দ ওয়াজিব হবে; তবে এ হদ্দের দাবি কে করবে? এ নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। আহনাফের মতে উক্ত মৃত মহিলাকে অপবাদ দেওয়ার কারণে তার যে সব জীবিত আত্মীয়ের বংশে কলঙ্ক লাগে কেবল তারাই হদ্দ দাবি করতে পারবে। তারা হলো দু'শ্রেণি-

এক. উক্ত মহিলার পিতা, দাদা, পরদাদা প্রমুখ।

দুই. উক্ত মহিলার সন্তান, সন্তানের সন্তান প্রমুখ।

এ দু'শ্রেণির লোকেরা হদ্দ দাবি করতে পারবে। কারণ মহিলাকে অপবাদ দেওয়ার কারণে মহিলার পিতা, দাদা ছেলে মেয়ে প্রমুখের বংশ মর্যাদা কলঙ্কিত হয়। তাই মহিলাকে অপবাদ দেওয়া, এসব আত্মীয়কে অপবাদ দেওয়ারই শামিল। অতএব, তাদের হদ্দ দাবি করার অধিকার থাকবে।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে হদ্দে কযফের মধ্যে মিরাশ তথা উত্তরাধিকার জারি হয়ে থাকে। তবে তিনি বলেন, অপবাদ আরোপিত মৃত মহিলার যেকোনো ওয়ারিশ হদ্দ দাবি করতে পারবে। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতের পক্ষে দলিল প্রমাণ সামনে আলোচিত হবে।

আহনাফের মতে যেহেতু হদ্দের দাবিটি উত্তরাধিকারের ভিত্তিতে নয়; বরং বংশের কলঙ্ক লেপন করার কারণে, সেহেতু মিরাশ হতে বঞ্চিত ছেলে বা পিতাও হদ্দের দাবি উত্থাপন করতে পারবে।

আহনাফের মতে হদ্দ দাবি করার আলোচ্য অধিকার মৃতের ছেলে পক্ষের সন্তানদের জন্য যেমন সাব্যস্ত হয়, তেমনি মৃত ব্যক্তির মেয়ের ঘরের সন্তানদের জন্যও সাব্যস্ত হবে। তবে এ বিষয়ে ইমাম মুহাম্মদ (র.) মতভেদ করেছেন। তার মতে কেবল মৃতের ছেলের সন্তানদের জন্যই এ অধিকার। মেয়ের সন্তানদের জন্য নয়।

মৃত ব্যক্তির সন্তান জীবিত থাকাবস্থায় সন্তানের সন্তানরা হদ্দ দাবি করতে পারবে কি-না এ নিয়েও মতভেদ রয়েছে। ইমাম যুফার (র.)-এর মতে সন্তানের জীবদ্দশায় সন্তানের সন্তানরা হদ্দ দাবি করতে পারবে না। অন্যান্য ইমামগণের মতে সন্তানের উপস্থিতিতেও সন্তানের সন্তান হদ্দ দাবি করতে পারবে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَإِذَا كَانَ الْمَقْذُوْفُ مُحْصَنًا جَازَ لِابْنِهِ الْكَافِرِ وَالْعَبْدِ اَنْ يُطَالِبَ بِالْحَدِّ خِلَافًا لِزُفَرَ. هُوَ يَقُوْلُ : الْقَذْفُ يَتَنَاوَلُهُ مَعْنًى لِرُجُوْعِ الْعَارِ اِلَيْهِ، وَلَيْسَ طَرِيْقُهُ الْإِرْثَ عِنْدَنَا فَصَارَ كَمَا اِذَا كَانَ مُتَنَاوِلًا لَهُ صُوْرَةً وَمَعْنًى. وَلَنَا اَنَّهُ عَيَّرَهُ بِقَذْفِ مُحْصَنٍ فَيَأْخُذُهُ بِالْحَدِّ، وَهٰذَا لِاَنَّ الْاِحْصَانَ فِي الَّذِيْ يُنْسَبُ اِلَى الزِّنَا شَرْطٌ لِيَقَعَ تَعْيِيْرًا عَلَى الْكَمَالِ ثُمَّ يَرْجِعُ هٰذَا التَّعْيِيْرُ الْكَامِلُ اِلٰى وَلَدِهِ، وَالْكُفْرُ لَا يُنَافِيْ اَهْلِيَّةَ الْاِسْتِحْقَاقِ، بِخِلَافِ اِذَا تَنَاوَلَ الْقَذْفُ نَفْسَهُ لِاَنَّهُ لَمْ يُوْجَدِ التَّعْيِيْرُ عَلَى الْكَمَالِ لِفَقْدِ الْاِحْصَانِ فِي الْمَنْسُوْبِ اِلَى الزِّنَاءِ وَلَيْسَ لِلْعَبْدِ اَنْ يُطَالِبَ مَوْلَاهُ بِقَذْفِ اُمِّهِ الْحُرَّةِ، وَلَا لِلِابْنِ اَنْ يُطَالِبَ اَبَاهُ بِقَذْفِ اُمِّهِ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ لِاَنَّ الْمَوْلٰى لَا يُعَاقَبُ بِسَبَبِ عَبْدِهِ، وَكَذَا الْاَبُ بِسَبَبِ اِبْنِهِ، وَلِهٰذَا لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ وَلَا السَّيِّدُ بِعَبْدِهِ، وَلَوْ كَانَ لَهَا اِبْنٌ مِنْ غَيْرِهِ لَهُ اَنْ يُطَالِبَ لِتَحَقُّقِ السَّبَبِ وَانْعِدَامِ الْمَانِعِ .

অনুবাদ : অপবাদ আরোপিত ব্যক্তি যদি মুহসান হয়, তাহলে তার কাফের পুত্র ও দাস পুত্রের জন্য হদ্দ দাবি করার অধিকার রয়েছে। ইমাম যুফার (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি বলেন, উক্ত অপবাদ অন্তর্নিহিতভাবে পুত্রকে অন্তর্ভুক্ত করে। কেননা কলঙ্ক তাকে স্পর্শ করে। আর আমাদের মতে এ অধিকার উত্তরাধিকার সূত্রে নয়। সুতরাং এরূপ হলো যে, যখন দৃশ্যত ও অন্তর্নিহিত উভয়ভাবেই অপবাদ তাকে অন্তর্ভুক্ত করে।

আমাদের দলিল এই যে, অপবাদ আরোপকারী ব্যক্তি মুহসান ব্যক্তিকে অপবাদ আরোপ করার মাধ্যমে তার পুত্রকে লজ্জা দিয়েছে। অতএব, হদ্দের মাধ্যেমে সে তার থেকে শোধ করে নিতে পারবে। এর অন্তর্নিহিত কারণ এই যে, যার প্রতি জেনার অপবাদ আরোপ করা হয়, তার ক্ষেত্রে মুহসান হওয়ার শর্ত লাগানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে লজ্জাদান পূর্ণ মাত্রায় হওয়া। অতঃপর এই পূর্ণ লজ্জাদান তার সন্তানকেও স্পর্শ করবে। (সুতরাং সে হদ্দের দাবিদার হতে পারবে।)

কুফ্র অধিকার লাভের যোগ্যতার জন্য প্রতিবন্ধক নয়। পক্ষান্তরে স্বয়ং কাফের বা দাসের বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপিত হওয়ার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা এখানে ব্যভিচারে অভিযুক্ত ব্যক্তির মাঝে ইহসান না থাকার কারণে পূর্ণমাত্রায় লজ্জাদান সাব্যস্ত হয়নি।

দাস তার মনিবের বিরুদ্ধে তার স্বাধীন মা কে অপবাদ আরোপ করার কারণে হদ্দ দাবি করতে পারবে না। তদ্রূপ পুত্র তার পিতার বিরুদ্ধে তার স্বাধীন মুসলিম মা কে অপবাদ আরোপ করার কারণে হদ্দ দাবি করতে পারবে না।

কেননা দাসের অনুকূলে মনিবকে এবং পুত্রের অনুকূলে পিতাকে শাস্তি প্রদানের অবকাশ নেই। এ কারণেই সন্তানকে বা দাসকে হত্যা করার কারণে অপবাদের কারণে কিয়াস করেন। ফলে তিনি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, মৃত মাতা পিতাকে জেনার অপবাদ দেওয়া হলে, কাফের পুত্র বা দাস পুত্র এর হদ্দ দাবি করতে পারবে না

অন্যান্য ইমামগণের মতে কাফের ও দাস পুত্র হদ্দ দাবি করতে পারবে। তাদের দলিল হলো, যাকে অপবাদ দেওয়া হয়েছে সে মুহসান ছিল বিধায় হদ্দ ওয়াজিব হবে। অতঃপর এ অপবাদের কারণে কাফের পুত্র বা দাস পুত্রও লজ্জিত হয়, তাই তার অধিকার থাকবে হদ্দ দাবি করার। কাফের হওয়ার কারণে বা দাস হওয়ার কারণে সে এ অধিকার হতে বঞ্চিত হবে না। সরাসরি যাকে অপবাদ দেওয়া হয় তার জন্য মুহসান হওয়া শর্ত, যাতে তার ক্ষেত্রে লজ্জাদানের বিষয় পরিপূর্ণরূপে পাওয়া যায়। আলোচ্য সুরতে মৃতব্যক্তির মধ্যে এ শর্ত বিদ্যমান আছে। তাই লজ্জদানের বিষয়টি পরিপূর্ণরূপেই পাওয়া গেছে। এখন এ পরিপূর্ণ লজ্জাটি তার পুত্র পর্যন্ত প্রসারিত হবে।

আর যদি অন্য স্বামীর ঔরসজাত কোনো পুত্র স্ত্রীলোকটির থাকে, তাহলে সে হদ্দ দাবি করতে পারবে। কেননা হদ্দের কারণ সাব্যস্ত হয়েছে এবং হদ্দ প্রয়োগের প্রতিবন্ধক অনুপস্থিত রয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কোনো মৃত মুহসান ব্যক্তিকে অপবাদ দেওয়া হলে তার কাফের পুত্র বা গোলাম পুত্র হদ্দ দাবি করতে পারবে কি-না এ নিয়ে ইমামগণের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে।

ইমাম যুফার (র.)-এর মতে কাফের পুত্র ও গোলাম পুত্র হদ্দ দাবি করতে পারবে না। তার যুক্তি হলো পুত্রের জন্য হদ্দ দাবি করার যে অধিকার সাব্যস্ত হয় তার মূল কারণ হলো, মাতা-পিতার আরোপিত অপবাদ অন্তর্নিহিতভাবে পুত্রকেও অন্তর্ভুক্ত করে। অতএব অন্তর্নিহিতভাবে অন্তর্ভুক্ত করার এ সুরতেটিকে বাহ্যিক ও অন্তর্নিহিত উভয়ভাবে অন্তর্ভুক্ত করার সুরতের সাথে কিয়াস করা হবে। বাহ্যিক ও অন্তর্নিহিত উভয়ভাবে অন্তর্ভুক্ত করার মর্ম হলো, তাকে সরাসরি অপবাদ দেওয়া আর কাফের পুত্র বা কাফের দাসকে সরাসরি জেনার অপবাদ দিলে হদ্দ ওয়াজিব হয় না, তার মাঝে ইহসান না থাকার কারণে। অতএব, বাহ্যিক ও অন্তর্নিহিতভাবে অপবাদ দেওয়ার সুরতে যেমন সে হদ্দ দাবি করতে পারবে না, তেমনি শুধু অন্তর্নিহিতভাবে অপবাদ দেওয়ার সুরতেও সে হদ্দের দাবি করতে পারবে না।

মোটকথা, ইমাম যুফার (র.) কাফের পুত্র ও দাস পুত্রের মাতা-পিতার উপর আরোপিত অপবাদকে সরাসরি কাফের বা দাসের উপর অপবাদের সাথে কিয়াস করেন। ফলে তিনি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, মৃত মাতা-পিতাকে জেনার অপবাদ দেওয়া হলে, কাফের পুত্র বা দাসপুত্র এর হদ্দ দাবি করতে পারবে না।

অন্যান্য ইমামগণের মতে কাফের ও দাসপুত্র হদ্দ দাবি করতে পারবে।

তাদের দলিল হলো এই যে, যাকে অপবাদ দেওয়া হয়েছে, সে মুহসান ছিল। বিধায় হদ্দ ওয়াজিব হবে। অতঃপর এ অপবাদের কারণে কাফের পুত্র বা দাস পুত্রও লজ্জিত হয়। তাই তার অধিকার থাকবে হদ্দ দাবি করার। কাফের হওয়ার কারণে বা দাস হওয়ার কারণে সে এ অধিকার হতে বঞ্চিত হবে না।

সরাসরি যাকে অপবাদ দেওয়া হয় তার জন্য মুহসান হওয়া শর্ত। যাতে তার ক্ষেত্রে লজ্জাদানের বিষয় পরিপূর্ণরূপে পাওয়া যায়। আলোচ্য সুরতেও মৃতব্যক্তির মধ্যে এশর্ত বিদ্যমান আছে। তাই লজ্জাদানের বিষয়টি পরিপূর্ণরূপেই পাওয়া গেছে। এখন এ পরিপূর্ণ লজ্জাটি তার পুত্র পর্যন্ত প্রসারিত হবে। প্রসারিত হওয়ার জন্য ইহসান শর্ত নয়। অতএব কাফের ও দাস পুত্র মুহসান না হওয়া সত্ত্বেও তার মাতা কিংবা পিতার উপর আরোপিত অপবাদের হদ্দ দাবি করতে পারবে।

কিন্তু যদি তার নিজের উপর অপবাদ আরোপ করা হয়, তাহলে সে হদ্দ দাবি করতে পারবে না। কেননা সে কাফের বা গোলাম হওয়ার কারণে তার মাঝে ইহসান বিদ্যমান নেই। যা কিনা হদ্দ ওয়াজিব হওয়ার শর্ত।

وَلَيْسَ لِلْعَبْدِ اَنْ يُطَالِبَ مَوْلَاهُ الخ : কোনো মনিব যদি তার গোলামের মৃতা স্বাধীন মা কে অপবাদ দেয়। অর্থাৎ এমন বলে যে, হে ব্যভিচারিণীর পুত্র! কিংবা কোনো পিতা যদি তার সন্তানের স্বাধীন মুসলিম মা কে অপবাদ দেয় অর্থাৎ এমন বলে যে, হে ব্যভিচারিণীর পুত্র! তাহলে এ গোলাম বা পুত্র তার মৃত মায়ের উপর আরোপিত অপবাদের হদ্দ দাবি করতে পারবে না। কারণ এখানে অপবাদ আরোপকারী ব্যক্তিটি মনিব কিংবা পিতা। আর ইসলামি শরিয়তে গোলামের দাবিতে মনিবকে এবং সন্তানের দাবিতে পিতাকে শাস্তি দেওয়ার বিধান নেই। এটা ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) এর অভিমত।

এক বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম মালেক (র.)-এর অভিমতও তাই। কিন্তু প্রসিদ্ধ বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম মালেক (র.)-এর মত হলো- ছেলে পিতার বিরুদ্ধে হদ্দ দাবি করতে পারবে। আবূ ছাওর ও ইবনুল মনুযির এমতই পোষণ করেন।

সন্তানের অনুকূলে পিতাকে শাস্তি দেওয়া যায় না। এর আরেকটি নমুনা হলো এই যে, কোনো পিতা যদি তার সন্তানকে হত্যা করে তাহলে এ কারণে তার উপর কিসাস সাব্যস্ত করা হয় না।

কারণ কুরআনুল কারীমে মাতা-পিতাকে সম্মান করার জন্য সন্তানকে আদেশ করা হয়েছে। কষ্ট দিতে এবং অসন্তুষ্ট করতে নিষেধ করা হয়েছে। তাছাড়া সন্তানের জন্য মাতা-পিতা হতে এবং গোলামের জন্য তার মনিব হতে কিসাস নেওয়া যাবে না। এ কথাটিও একাধিক হাদীসে বর্ণিত। যেমন- হযরত ওমর (রা.)-এর সূত্রে ইবনে মাজাহ শরীফে আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, لَا يُقَادُ مَمْلُوْكٌ مِنْ مَالِكٍ وَلَا وَلَدٌ مِنْ وَالِدِهٖ অর্থাৎ মনিব হতে গোলামের কিসাস নেওয়া যাবে না এবং পিতা হতে সন্তানের কিসাস নেওয়া যাবে না।

হ্যাঁ, তবে যদি অপবাদ আরোপিত মহিলার এমন একটি সন্তান থাকে, যে সন্তানটি অপবাদ আরোপকারী স্বামীর ঔরসজাত নয়; বরং অন্য স্বামীর ঔরসে তার জন্ম, তাহলে সন্তান ইচ্ছা করলে তার মায়ের উপর আরোপিত অপবাদের হদ্দ দাবি করতে পারবে। কারণ মহিলার এই স্বামী যে তাকে অপবাদ দিয়েছে, সে ঐ সন্তানের পিতা নয়। অতএব তার বিরুদ্ধে মহিলার অন্য স্বামীর ঔরসজাত সে সন্তানের হদ্দ দাবি করার অধিকার আছে। মোটকথা, হদ্দ দাবি করার কারণ তথা অপবাদ পাওয়া গেছে এবং হদ্দ দাবি করার পথে যখন কোনো প্রতিবন্ধক নেই, তখন হদ্দ দাবি করা সম্পূর্ণ বৈধ হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَمَنْ قَذَفَ غَيْرَهُ فَمَاتَ الْمَقْذُوْفُ بَطَلَ الْحَدُّ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا يَبْطُلُ وَلَوْ مَاتَ بَعْدَمَا أُقِيْمَ بَعْضُ الْحَدِّ بَطَلَ الْبَاقِي عِنْدَنَا خِلَافًا لَهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ يُوْرَثُ عِنْدَهُ وَعِنْدَنَا لَا يُوْرَثُ، وَلَا خِلَافَ أَنَّ فِيْهِ حَقَّ الشَّرْعِ وَحَقَّ الْعَبْدِ فَإِنَّهُ شُرِعَ لِدَفْعِ الْعَارِ عَنِ الْمَقْذُوْفِ وَهُوَ الَّذِي يَنْتَفِعُ بِهِ عَلَى الْخُصُوْصِ، فَمِنْ هٰذَا الْوَجْهِ حَقُّ الْعَبْدِ، ثُمَّ إِنَّهُ شُرِعَ زَاجِرًا وَمِنْهُ سُمِّيَ حَدًّا، وَالْمَقْصُوْدُ مِنْ شَرْعِ الزَّاجِرِ إِخْلَاءُ الْعَالَمِ عَنِ الْفَسَادِ، وَهٰذَا اٰيَةُ حَقِّ الشَّرْعِ وَبِكُلِّ ذٰلِكَ تَشْهَدُ الْأَحْكَامُ .وَإِذَا تَعَارَضَتْ الْجِهَتَانِ، فَالشَّافِعِيُّ مَالَ إِلَى تَغْلِيْبِ حَقِّ الْعَبْدِ تَقْدِيْمًا لِحَقِّ الْعَبْدِ بِاعْتِبَارِ حَاجَتِهِ وَغِنَاءِ الشَّرْعِ، وَنَحْنُ صِرْنَا إِلَى تَغْلِيْبِ حَقِّ الشَّرْعِ لِأَنَّ مَا لِلْعَبْدِ مِنَ الْحَقِّ يَتَوَلَّاهُ مَوْلَاهُ فَيَصِيْرُ حَقُّ الْعَبْدِ مَرْعِيًّا بِهِ، وَلَا كَذٰلِكَ عَكْسُهُ لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لِلْعَبْدِ فِيْ اِسْتِيفَاءِ حُقُوْقِ الشَّرْعِ إِلَّا نِيَابَةً عَنْهُ، وَهٰذَا هُوَ الْأَصْلُ الْمَشْهُوْرُ الَّذِي يَتَخَرَّجُ عَلَيْهِ الْفُرُوْعُ الْمُخْتَلَفُ فِيْهَا مِنْهَا الْإِرْثُ،

অনুবাদ : কেউ যদি কারো প্রতি অপবাদ আরোপ করে অতঃপর অপবাদ আরোপিত ব্যক্তি মারা যায়, তাহলে হদ্দ বাতিল হয়ে যাবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, বাতিল হবে না। আংশিক হদ্দ কার্যকর করার পর যদি মৃত্যুবরণ করে তাহলে আমাদের মতে অবশিষ্ট হদ্দ বাতিল হয়ে যাবে। আর ইমাম শাফেয়ী (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। ভিন্নমত পোষণের ভিত্তি এই যে, আলোচ্য হদ্দের ক্ষেত্রে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে উত্তরাধিকার কার্যকর হয়। আর আমাদের মতে তাতে উত্তরাধিকার কার্যকর হয় না।

অবশ্য এতে দ্বিমত নেই যে, আলোচ্য হদ্দের ক্ষেত্রে শরিয়তের হক ও বান্দার হক দুটোই রয়েছে। কেননা অপবাদ আরোপিত ব্যক্তি হতে কলঙ্ক লজ্জা অপনোদনের জন্যই শরিয়ত হদ্দে কযফ অনুমোদন করেছে এবং তা থেকে সে-ই এককভাবে লাভবান হচ্ছে। সুতরাং এদিক থেকে এটা বান্দার হক। অপরদিকে এটাকে অপবাদের প্রবণতারোধকারী হিসেবে প্রবর্তন করা হয়েছে। এর কারণেই এর নামকরণ হয়েছে হদ্দ বা রোধকারী। আর শরিয়তে হদ্দ প্রবর্তনের উদ্দেশ্য হচ্ছে পৃথিবীকে ফাসাদ মুক্ত করা।

আর এটা শরিয়তের বা আল্লাহর হক হওয়ার আলামত। হদ্দে কযফ সংশ্লিষ্ট আহকাম উভয় দিকেই প্রমাণ করে।

এমতাবস্থায় হক্কুল্লাহ ও হক্কুল ইবাদ এ দুটি দিক যখন পরস্পরে বিপরীতমুখী হলো তখন ইমাম শাফেয়ী (র.) বান্দার হককে অগ্রবর্তী করার উদ্দেশ্যে হক্কুল ইবাদের দিকটিকে প্রাধান্য দান করেছেন। কেননা বান্দা প্রয়োজনমুখী আর শরিয়ত প্রয়োজনমুক্ত।

পক্ষান্তরে আমরা শরিয়তের হককে প্রাধান্য দান করেছি। কেননা বান্দার যে হক রয়েছে ,তার দায়িত্ব তার মাওলা আল্লাহ গ্রহণ করেন। সুতরাং বান্দার হক বিবেচিতই থাকবে। বিপরীত ক্ষেত্রে আল্লাহর হক রক্ষিত হবে না। কেননা প্রতিনিধিত্ব ছাড়া অন্য কোনো সূত্রে শরিয়তের হক উসুল করার অধিকার বান্দার নেই।

এটা সেই সুপ্রসিদ্ধ মূলনীতি, যার উপর ভিত্তি করে আমাদের ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মাঝে মতানৈক্যপূর্ণ বহু মাসআলা আহরিত হয়। তন্মধ্যে একটি হলো উত্তরাধিকার।

https://e-ilm.weebly.com/

اِذِ الْإِرْثُ يَجْرِيْ فِيْ حُقُوْقِ الْعِبَادِ لَا فِيْ حُقُوْقِ الشَّرْعِ . وَمِنْهَا الْعَفْوُ فَاِنَّهُ لَا يَصِحُّ عَفْوُ الْمَقْذُوْفِ عِنْدَنَا وَيَصِحُّ عِنْدَهُ . وَمِنْهَا اَنَّهُ لَا يَجُوزُ الاِعْتِيَاضُ عَنْهُ وَيَجْرِيْ فِيْهِ التَّدَاخُلُ وَعِنْدَهُ لَا يَجْرِيْ . وَعَنْ اَبِيْ يُوْسُفَ فِي الْعَفْوِ مِثْلُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ؛ وَمِنْ اَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ : اِنَّ الْغَالِبَ حَقُّ الْعَبْدِ وَخَرَّجَ الْاَحْكَامَ، وَالْاَوَّلُ اَظْهَرُ .

অনুবাদ : কেননা বান্দার হকসমূহের ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার সাব্যস্ত হয় না। অপরটি এই যে, যার নামে অপবাদ আরোপ করা হয়েছে, আমাদের মতে সে তা নিজের হক হিসেবে মাফ করে দিতে পারে না। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে পারে।

আরেকটি এই যে, হদ্দে কযফের বিনিময় গ্রহণ করা যায় না। আর তাতে একীভূত করণের অবকাশ রয়েছে। পক্ষান্তরে তার মতে সে অবকাশ নেই।

হদ্দে কযফ ক্ষমা করা সম্পর্কে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) হতে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অনুরূপ একটি মত বর্ণিত রয়েছে। আমাদের কোনো মাশায়েখ বলেছেন যে, তাতে বান্দার হক প্রবল এবং সেই ভিত্তিতে বিভিন্ন আহকাম আহরণ করেছেন। কিন্তু প্রথমোক্ত মতটি অধিক প্রকাশিত বা স্পষ্ট।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিউক্ত ইবারতে দুটি মাসআলা আলোচিত হয়েছে।

মাসআলা– ১. কেউ কাউকে জেনার অপবাদ দিল। অতঃপর অপবাদ আরোপিত ব্যক্তিটি মারা গেল, এমতাবস্থায় হদ্দ বাতিল হয়ে যাবে কি-না এ নিয়ে আহনাফ ও ইমাম শাফেয়ী (র.) এর মাঝে মতভেদ রয়েছে। আহনাফের মত হলো, অপবাদ আরোপিত ব্যক্তির মৃত্যুর কারণে হদ্দ বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে হদ্দ বাতিল হবে না। বরং মৃতের উত্তরাধিকারীগণ হদ্দ উসূল করতে পারবেন।

মাসআলা– ২. অপবাদ আরোপকারীর উপর আংশিক হদ্দ কায়েম করার পর যদি অপবাদ আরোপিত ব্যক্তি মারা যায়, তাহলেও আহনাফের মতে অবশিষ্ট হদ্দ বাতিল হয়ে যাবে। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে অবশিষ্ট হদ্দ বাতিল হবে না।

উভয় মাসআলায় মতপার্থক্যের ভিত্তি হলো ইমাম শাফেয়ী (র.) ও আমাদের মাঝে মতভেদপূর্ণ একটি মূলনীতির উপর। আর তা হলো এই যে, আমাদের (আহনাফের) মতে হদ্দে কযফের ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার জারি হয় ।

আমাদের মতে যেহেতু উত্তরাধিকার জারি হয় না। তাই আমরা বলি, অপবাদ আরোপিত ব্যক্তি মারা গেলে হদ্দ বাতিল হয়ে যাবে। কারণ হদ্দের হকদার ছিল সে-ই তার মৃত্যুর পর এ হক তার উত্তরাধিকারীদের হক হিসেবে গণ্য হবে না। অতএব মূল হকদার তথা অপবাদ আরোপিত ব্যক্তি মারা যাওয়ার পর হদ্দ দাবি করার অধিকার কারো নেই। তাই আহনাফের মতে অপবাদ আরোপিত ব্যক্তি মারা গেলে হদ্দ বাতিল হয়ে যায়।

পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে হদ্দ কযফের ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার জারি হয়, অর্থাৎ অপবাদ আরোপিত ব্যক্তির মৃত্যুর পর হদ্দ দাবি করার অধিকার তার উত্তরাধিকারীদের জন্য সাব্যস্ত হয়।

সেই ভিত্তিতে তিনি বলেন, অপবাদ আরোপিত ব্যক্তি যদি হদ্দ উসূল করার আগে মারা যায়, কিংবা আংশিক হদ্দ উসূল করার পর মারা যায়, তাহলে পূর্ণ হদ্দ বা অবশিষ্ট হদ্দ উসূল করার অধিকার তার উত্তরাধিকারীদের জন্য সাব্যস্ত হবে। অতএব, তার মতে অপবাদ আরোপিত ব্যক্তি মরে গেলে হদ্দ বাতিল হবে না; বরং তার উত্তরাধিকারীরা সেই হদ্দ দাবি করে তা উসূল করতে পারবে।'

উপরে বর্ণিত মতভেদপূর্ণ মূলনীতিটি ব্যাখা করার উদ্দেশ্যে মুসান্নিফ (র.) বলেন, এ ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই যে, হদ্দে কযফের মধ্যে আল্লাহ বা শরিয়তের হক এবং বান্দার হক উভয়ই বিদ্যমান আছে।

হদ্দে কযফ যে বান্দার হক, এর আলামত হলো এই যে, হদ্দে কযফের মাধ্যমে বান্দাদের ইজ্জত আবরু হেফাজত হয়। বান্দার চরিত্রে অবৈধভাবে কেউ কলঙ্ক লেপন করলে হদ্দে কযফের মাধ্যমে তা দূরীভূত করা হয়। এর দ্বারা প্রতীয়মান যে, বান্দার হকের হেফাজতের জন্যই হদ্দে কযফের নিয়ম চালু করেছে।

https://e-ilm.weebly.com/

পাশাপাশি হদ্দে কযফের দ্বারা মানবসমাজ ভীত হয়, সাবধান হয়। এ কারণে একে হদ্দ বলেও নাম রাখা হয়েছে। কেননা হদ্দ অর্থ সাবধানকারী এবং হদ্দে কযফ চালু করার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো দুনিয়াকে ফেৎনা ফ্যাসাদ হতে মুক্ত রাখা। যা কিনা আল্লাহর হক।

মোটকথা, হদ্দে কযফের মধ্যে আল্লাহর হক ও বান্দার হক উভয় নিহিত রয়েছে। এ বিষয়ে ইমামগণ একমত। কারো কোনো দ্বিমত নেই। কিন্তু মতপার্থক্য হয়েছে এ ব্যাপারে যে, যখন হক দুটির মাঝে বিরোধ দেখা যায় তখন কোনটিকে প্রাধান্য দেওয়া হবে। এখানে আরো একটি কথা স্মরণ রাখা দরকার যে, বান্দার হক ও আল্লাহর হকের মাঝে বেশ কিছু বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য রয়েছে। তন্মধ্য হতে কিছু নিম্নে পেশ করা হলো–

১. বান্দার হকের মধ্যে উত্তরাধিকার জারি হয়। আর আল্লাহর হকের মধ্যে জারি হয় না।
২. বান্দার হক বান্দা ইচ্ছা করলে ক্ষমা করে দিতে পারে আল্লাহর হক বান্দা ক্ষমা করতে পারে না।
৩. বান্দার হকের বিনিময় গ্রহণ করা যায়। আল্লাহর হকের বিনিময় গ্রহণ করা যায় না।
৪. বান্দার হকের তাদাখুল জারি হয় না অর্থাৎ একাধিক হককে একীভূত করা যায় না, আল্লাহর হকে তাদাখুল জারি হয়।

যাই হোক, আল্লাহর হক ও বান্দার হক উভয়দিক একত্র হওয়া অবস্থায় ইমাম শাফেয়ী (র.) বান্দার হককে প্রাধান্য দেন। আর আহনাফ আল্লাহর হককে প্রাধান্য দেন।

অতএব, হদ্দে কযফের মধ্যে বান্দার হকের দিকটিকে ইমাম শাফেয়ী (র.) প্রাধান্য দান করেন বিধায় তিনি বলেন, অপবাদ আরোপিত ব্যক্তি মরে গেলেও তার হক বাতিল হবে না। বরং তাতে উত্তরাধিকার জারি হবে, যেমন বান্দার অন্যান্য হকের মধ্যে উত্তরাধিকারীরা হদ্দ দাবি করতে পারবে এবং তা উসুল করতে পারবে।

আর আহনাফ যেহেতু আল্লাহর হকের দিকটিকে প্রাধান্য দেন সেহেতু তারা বলেন, হদ্দে কযফের মধ্যে উত্তরাধিকার জারি হবে না; বরং অপবাদ আরোপিত ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলেই তা বাতিল হয়ে যাবে। মৃতের উত্তরাধিকারীগণ হদ্দ দাবি করার অধিকার পাবে না। কেননা আল্লাহর হকের মধ্যে মিরাশ বা উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় না।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, পূর্ব বর্ণিত মতভেদপূর্ণ মূলনীতিটি একটি প্রসিদ্ধ মূলনীতি। যার উপর ভিত্তি করে আহনাফ ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মাঝে একাধিক মাসআলায় মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে। তন্মধ্যে একটি উত্তরাধিকারের মাসআলা। অর্থাৎ হদ্দে কযফের ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার জারি হবে কিনা এ সম্পর্কিত মাসআলা। যা নিয়ে আমাদের আলোচনা চলছে। দ্বিতীয়টি হলো হদ্দে কযফ ক্ষমা করা যাবে কি-না সে সম্পর্কিত মাসআলা। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে ক্ষমা করা যাবে। যেহেতু তার মতে সেটা বান্দার হক। আহনাফের মতে ক্ষমা করা যাবে না। কারণ তারা আল্লাহর হকের দিককে প্রাধান্য দেন।

তৃতীয়টি হলো হদ্দে কযফের বিনিময় গ্রহণ সম্পর্কিত মাসআলা। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে বিনিময় গ্রহণ জায়েজ হবে। কারণ সেটা বান্দার হক। আমাদের মতে জায়েজ হবে না। যেহেতু আমরা একে আল্লাহর হক মনে করি।

চতুর্থ মাসআলা হলো- তাদাখুল জারি হওয়া সম্পর্কিত মাসআলা। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে হদ্দে কযফের মধ্যে তাদাখুল সহীহ হবে না। অর্থাৎ কেউ যদি কাউকে একাধিকবার অপবাদ আরোপ করে কিংবা কেউ যদি একাধিক ব্যক্তিকে অপবাদ আরোপ করে, তাহলে এই অপবাদ আরোপকারীর উপর প্রতিটি অপবাদের জন্য পৃথক পৃথক হদ্দ কায়েম করা হবে। সবগুলো অপবাদের শাস্তি স্বরূপ একটি হদ্দ কায়েম করলে চলবে না। এটা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে। কারণ তার মতে এটি বান্দার হক। তাই প্রত্যেকটি হকের ক্ষতিপূরণ পৃথক পৃথক হবে। এতে তাদাখুল বা একীভূতকরণ শুদ্ধ হবে না।

পক্ষান্তরে আহনাফের মতে তাদাখুল সহীহ হবে। অর্থাৎ সবগুলো অপবাদের শাস্তি স্বরূপ একটি হদ্দ তার উপর কায়েম করাই যথেষ্ট।

কেননা আহনাফের মতে এটি আল্লাহর হক। আর আল্লাহর হকের ক্ষেত্রে তাদাখুল জারি হয়ে থাকে।

মোটকথা, মূলনীতিতে মতপার্থক্য হওয়ার কারণে এসব শাখাগত মাসআলায়ও মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে।

বাকি থাকল এ প্রসঙ্গে যে, ইমাম শাফেয়ী (র.) কেন বান্দার হকের দিকটিকে প্রাধান্য দেন আর আহনাফ কেন আল্লাহর হকের দিকটিকে প্রাধান্য দেন? এ সম্পর্কে কথা হলো- ইমাম শাফেয়ী (র.) মনে করেন, বান্দা তার হকের মুহতাজ বা মুখাপেক্ষী। হক উসুল না হলে সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ বা শরিয়ত হকের মুহতাজ নয়। হক উসুল না হলে তাতে আল্লাহর কোনো ক্ষতি হবে না। এ জন্য বান্দার হকের প্রতি লক্ষ্য রাখাই উত্তম। তাই তিনি বান্দার হককে প্রাধান্য দেন। ইমাম মালেক ও আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)ও তাই করেন।

আহনাফ মনে করেন, আল্লাহর হক অগ্রবর্তী। কেননা বান্দার যে হক আছে, তার ব্যবস্থা তার মাওলা স্বয়ং আল্লাহই করাবেন। এ জন্য বান্দার হক কখনো নষ্ট হবে না। পক্ষান্তরে আল্লাহর হক উসুল করার অধিকার কোনো বান্দার নেই। তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো প্রতিনিধি থাকলে ভিন্ন কথা। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে কোনো প্রতিনিধি নেই। অতএব, এক্ষেত্রে আল্লাহর হককে প্রাধান্য দেওয়া অধিক যুক্তিযুক্ত। তাই আহনাফ হদ্দে কযফের মধ্যে আল্লাহর হকের দিককে প্রাধান্য দিয়েছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

وَمَنْ اَقَرَّ بِالْقَذْفِ ثُمَّ رَجَعَ لَمْ يُقْبَلْ رُجُوْعُهُ لِاَنَّ لِلْمَقْذُوْفِ فِيْهِ حَقًّا فَيُكَذِّبُهُ فِي الرُّجُوْعِ، بِخِلَافِ مَا هُوَ خَالِصُ حَقِّ اللّٰهِ لِاَنَّهُ لَا مُكَذِّبَ لَهُ فِيْهِ . وَمَنْ قَالَ لِعَرَبِيٍّ يَا نَبَطِيُّ لَمْ يُحَدَّ لِاَنَّهُ يُرَادُ بِهِ التَّشْبِيْهُ فِي الْاَخْلَاقِ اَوْ عَدَمِ الْفَصَاحَةِ، وَكَذَا اِذَا قَالَ لَسْتَ بِعَرَبِيٍّ لِمَا قُلْنَا .

অনুবাদ : যে ব্যক্তি অপবাদ আরোপের কথা স্বীকার করে, অতঃপর স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে নেয়, তার প্রত্যাহার গ্রহণ করা হবে না। কেননা তাতে অপবাদ আরোপিত ব্যক্তির হক রয়েছে। সুতরাং প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে এই হকওয়ালা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে। **পক্ষান্তরে নিরেট আল্লাহর হকের বিষয়টি ভিন্ন।** কেননা সেখানে তাকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী কোনো পক্ষ নেই।

কেউ যদি কোনো আরবকে বলে, হে নাবতী! তাহলে তার উপর হদ্দে কযফ আসবে না। কেননা এর দ্বারা চারিত্রিক বা ভাষা দুর্বলতাগত সাদৃশ্য উদ্দেশ্য হয় থাকে। তদ্রূপ যদি বলে, তুমি আরব নও। (তাহলেও হদ্দ আসবে না) আমাদের পূর্ব বর্ণিত কারণে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কেউ এ মর্মে স্বীকারোক্তি দিল যে, সে অমুক ব্যক্তির উপর জেনার অপবাদ আরোপ করেছে। তারপর সে স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করল অর্থাৎ এমন বলল যে, আমি অপবাদ আরোপের বিষয় স্বীকার করিনি। তাহলে তার এই প্রত্যাহার গ্রহণযোগ্য হবে না; বরং পূর্বের কৃত স্বীকারোক্তিই বহাল থাকবে এবং সে কারণে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ হবে।

কিন্তু স্বীকারোক্তিটি যদি এমন কোনো বিষয়ে হয় যা খালেছ আল্লাহর হক, যেমন হদ্দে জেনা, হদ্দে শুরব ইত্যাদি, তাহলে স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার গ্রহণযোগ্য হবে। অর্থাৎ কেউ যদি একথা স্বীকার করে যে, সে জেনা করেছে, তারপর আবার বলে যে, না আমি জেনা করিনি। তাহলে তার এ 'করিনি' কথা গ্রহণযোগ্য হবে এবং তার উপর হদ্দ রহিত হয়ে যাবে। এমনিভাবে কেউ যদি বলে যে, সে মদপান করেছে, তারপর আবার বলে যে, না আমি মদপান করিনি, তাহলে তার এ 'করিনি; কথাটি গ্রহণযোগ্য হবে এবং তার উপর হতে হদ্দ রহিত হয়ে যাবে।

মোটকথা, অপবাদ আরোপের কথা স্বীকার করার পর তা প্রত্যাহার গ্রহণযোগ্য হয়। মদপান জেনা, ইত্যাদির বিষয়ে স্বীকার করার পর তা প্রত্যাহার করলে, প্রত্যাহার গ্রহণযোগ্য হয়। এই পার্থক্যের কারণ হলো এই যে, অপবাদের ক্ষেত্রে বান্দার হক জড়িত আছে। তাই কারো উপর অপবাদ দেওয়ার কথা স্বীকার করলে তার জন্য হদ্দ দাবি করার হক বা অধিকার সাব্যস্ত হয়। অতএব, পরবর্তী সময়ে যখন স্বীকারকারী ব্যক্তি তার স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করতে যায়, তখন সেই হকদার ব্যক্তি থেকে অপবাদ দেওয়া হয়েছে তার প্রতিপক্ষ হিসাবে তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। বিধায় তার প্রত্যাহার গ্রহণযোগ্য হয় না।

পক্ষান্তরে আল্লাহর হক তথা জেনা, মদ পান ইত্যাদি বিষয়ক স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করার সময় কেউ তার প্রতিপক্ষ হয় না এবং তাকে কেউ মিথ্যা প্রতিপন্নও করে না। বিধায় তার প্রত্যাহার গ্রহণযোগ্য হয়।

কেউ চুরির অপরাধ স্বীকার করে, অতঃপর তা প্রত্যাহার করে নেয়, তার প্রত্যাহার গ্রহণযোগ্য হবে এবং এর ফলে তার হাত কাটার শাস্তি বা হদ্দ রহিত হয়ে যাবে। কিন্তু যে মাল-সম্পদ সে চুরি করেছে বলে প্রথমে স্বীকার করেছিল তা পরিশোধ করতে হবে। কেননা হদ্দ ছিল আল্লাহর হক, তাই তা রহিত হয়ে গেছে; কিন্তু চুরাইকৃত সম্পদ হলো বান্দার হক, তাই এটা রহিত হবে না। এটা তাকে পরিশোধ করতে হবে।

وَمَنْ قَالَ لِعَرَبِيٍّ يَا نَبَطِيُّ : نبطى শব্দটি نبط এর দিকে মানসূব। (সম্বন্ধ জ্ঞাপক) نَبَط -এর অর্থ হলো ইরাকে বসবাসকারী সম্প্রদায় বিশেষ। ফকীহ আবুল লাইস বলেছেন, নাবতী অর্থ হলো অনারবি লোক।

যদি কেউ কোনো আরবি মানুষকে নাবতী বলে সম্বোধন করে, তাহলে এর ফলে তার উপর হদ্দ আসবে না। কারণ এটা কযফ বা অপবাদ নয়; বরং এ কথার অর্থ হলো তুমি স্বভাব চরিত্রের দিক থেকে ইরাকি মানুষ। কিংবা ভাষাগত বিবেচনায় তুমি ইরাকি লোকের মতো। অনুরূপ যদি কেউ কোনো আবরকে বলে তুমি আরব নও। তাহলেও হদ্দ আসবে না। কেননা এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তাকে অনারবি মানুষের সাথে সাদৃশ্য দেওয়া। অপবাদ উদ্দেশ্য নয়। বিধায় হদ্দ আসবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

وَمَنْ قَالَ لِرَجُلٍ يَا ابْنَ مَاءِ السَّمَاءِ فَلَيْسَ بِقَاذِفٍ لِاَنَّهُ يُرَادُ بِهِ التَّشْبِيْهُ فِي الْجُوْدِ وَالسَّمَاحَةِ وَالصَّفَاءِ، لِاَنَّ مَاءَ السَّمَاءِ لُقِّبَ بِهِ لِصَفَائِهِ وَسَخَائِهِ وَاِنْ نَسَبَهُ اِلَى عَمِّهِ اَوْ خَالِهِ اَوْ اِلَى زَوْجِ اُمِّهِ فَلَيْسَ بِقَذْفٍ لِاَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ هٰؤُلَاءِ يُسَمّٰى اَبًا. اَمَّا الْاَوَّلُ فَلِقَوْلِهِ تَعَالٰى ﴿نَعْبُدُ اِلٰهَكَ وَاِلٰهَ اٰبَائِكَ اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمَاعِيْلَ وَاِسْحَاقَ﴾ وَاِسْمَاعِيْلُ كَانَ عَمًّا لَهُ. وَالثَّانِيْ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ﴿اَلْخَالُ اَبٌ﴾ وَالثَّالِثُ لِلتَّرْبِيَةِ .

অনুবাদ : কেউ যদি কাউকে বলে, হে মেঘের পুত্র! তাহলে সে অপবাদ আরোপকারী নয়। কেননা এর উদ্দেশ্য হলো- বদান্যতা, দানশীলতা, পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে তুলনা করা। কেননা কাউকে মেঘের পুত্র উপাধি দান করা হয় তার বদান্যতা ও পরিচ্ছন্নতার কারণে।

কেউ যদি কাউকে চাচা, মামা কিংবা তার সৎপিতার দিকে সম্বন্ধ করে, তাহলে সে অপবাদ আরোপকারী নয়। কেননা এদের সকলকে পিতৃতুল্য বা পিতা বলা যায়। প্রথমটির দলিল হলো- আল্লাহর এ বাণী-

نَعْبُدُ اِلٰهَكَ وَاِلٰهَ اٰبَائِكَ اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمَاعِيْلَ وَاِسْحَاقَ

অর্থাৎ আমরা আপনার (ইয়াকূব আ.) প্রভুর এবং আপনার পিতৃপুরুষের তথা ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের প্রভুর ইবাদত করব। অথচ ইসমাইল (আ.) ছিলেন তার (ইয়াকূব আ.) চাচা। দ্বিতীয়টির প্রমাণ হলো, নবী করীম ﷺ এর বাণী اَلْخَالُ اَبٌ মামা পিতার তুল্য। আর তৃতীয়জন প্রতিপালনগত কারণে পিতা বলা হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কাউকে মেঘের পুত্র বললে, এটা তার প্রতি অপবাদ নয়; বরং বদান্যতা ও দানশীলতার বিষয়ে প্রশংসা। কেননা অতীতে কিছু লোককে বিভিন্ন উন্নত গুণের কারণে এ উপাধি দেওয়া হয়েছিল। যেমন- নুমান ইবনুল মুনযিরের উপাধি ছিল- اِبْنُ مَاءِ السَّمَاءِ মেঘের পুত্র, তার অতিশয় দানশীলতার কারণে। কেননা অতি দানশীল ব্যক্তি মেঘ সদৃশ্য। মেঘ যেমন নিজ পানি দ্বারা গোটা জমিনকে সিঞ্চিত করে, তেমনি দানশীল মানুষ তার সম্পদ দ্বারা সবাইকে উপকৃত করে। মুনযিরের মাতার উপাধি ছিল مَاءُ السَّمَاءِ মেঘ তার সৌন্দর্যের কারণে। মেঘের পানি যেমন পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর হয়, সেও তেমনি পরিচ্ছন্নও সুন্দরী ছিল।

মোটকথা, মেঘ বা মেঘের পুত্র, এ জাতীয় বাক্য দ্বারা কাউকে কোনো ভালো গুণের ক্ষেত্রে মেঘমালার সাথে তুলনা করা উদ্দেশ্য হয়, যা প্রকৃতপক্ষে প্রশংসার নামান্তর। অপবাদ নয়। বিধায় এসব কথার কারণে কাউকে অপবাদ আরোপকারী আখ্যা দেওয়া যাবে না।

وَاِنْ نَسَبَهُ اِلَى عَمِّهِ اَوْ خَالِهِ : কেউ যদি কাউকে তার চাচার নাম নিয়ে বলে যে, তুমি তার পুত্র কিংবা মামার নাম নিয়ে বলে যে, তুমি তার পুত্র, অথবা কারো সৎ পিতার নাম নিয়ে বলে যে, তুমি তার সন্তান, তাহলে তার একথা অপবাদ বলে গণ্য হবে না। তার উপর কোনো শাস্তি প্রয়োগ হবে না।

কারণ ব্যক্তির চাচা, মামা ও সৎ পিতাকে ব্যক্তির পিতা বলে আখ্যা দেওয়া জায়েজ আছে। যেমন- বর্ণিত আয়াতে হযরত ইসমাঈল (আ.) কে হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর পিতার সারিতে উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ ইসমাঈল (আ.) ছিলেন হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর চাচা। হাদীসে আছে নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন- عَمُّ الرَّجُلِ صِنْوُ اَبِيْهِ ব্যক্তির চাচা তার পিতার তুল্য। নবী করীম ﷺ মামাকে পিতা বলেছেন- اَلْخَالُ اَبٌ মামা পিতার তুল্য। অন্য হাদীসে আছে اَلْخَالُ وَالِدُ مَنْ لَا وَالِدَ لَهُ- যার পিতা নেই, তার মামাই তার পিতা। আর সৎ পিতা যেহেতু তার খোরপোষ বহন করেছেন, পিতার মতোই লালন-পালন করেছেন, তত্ত্বাবধান করেছেন, সে হিসাবে সৎ পিতাকেও পিতা বলা যায়। অতএব, কাউকে এর সন্তান বলে অভিহিত করলে তা সঠিক হবে। অপবাদ বলে গণ্য হবে না। কোনো শাস্তিও হবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

وَمَنْ قَالَ لِغَيْرِهٖ زَنَأْتَ فِي الْجَبَلِ وَقَالَ عَنَيْتُ صُعُوْدَ الْجَبَلِ حُدَّ، وَهٰذَا عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ وَاَبِيْ يُوْسُفَ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ : لَا يُحَدُّ لِاَنَّ الْمَهْمُوْزَ مِنْهُ لِلصُّعُوْدِ حَقِيْقَةً قَالَتْ اِمْرَاَةٌ مِنَ الْعَرَبِ : وَارْقَ اِلَى الْخَيْرَاتِ زَنَاءً فِي الْجَبَلِ وَذِكْرُ الْجَبَلِ يُقَرِّرُهُ مُرَادًا. وَلَهُمَا اَنَّهُ يُسْتَعْمَلُ فِي الْفَاحِشَةِ مَهْمُوْزًا اَيْضًا لِاَنَّ مِنَ الْعَرَبِ مَنْ يَهْمِزُ الْمُلَيَّنَ كَمَا يُلَيِّنُ الْمَهْمُوْزَ، وَحَالَةُ الْغَضَبِ وَالسِّبَابِ تُعَيِّنُ الْفَاحِشَةَ مُرَادًا بِمَنْزِلَةِ مَا اِذَا قَالَ يَا زَانِيْ اَوْ قَالَ زَنَأْتَ، وَذِكْرُ الْجَبَلِ اِنَّمَا يُعَيِّنُ الصُّعُوْدَ مُرَادًا اِذَا كَانَ مَقْرُوْنًا بِكَلِمَةِ عَلٰى اِذْ هُوَ لِلْمُسْتَعْمَلِ فِيْهِ، وَلَوْ قَالَ زَنَأْتَ عَلَى الْجَبَلِ لَا يُحَدُّ لِمَا قُلْنَا، وَقِيْلَ يُحَدُّ لِلْمَعْنَى الَّذِي ذَكَرْنَاهُ . وَمَنْ قَالَ لِاٰخَرَ يَا زَانِيْ فَقَالَ لَا بَلْ اَنْتَ فَاِنَّهُمَا يُحَدَّانِ لِاَنَّ مَعْنَاهُ لَا بَلْ اَنْتَ زَانٍ، اِذْ هِيَ كَلِمَةُ عَطْفٍ يُسْتَدْرَكُ بِهَا الْغَلَطُ فَيَصِيْرُ الْخَبَرُ الْمَذْكُوْرُ فِي الْاَوَّلِ مَذْكُوْرًا فِي الثَّانِي .

অনুবাদ : কেউ যদি কাউকে বলে زَنَأْتَ فِي الْجَبَلِ আর বলে আমি পর্বতারোহণ বুঝিয়েছি, তাহলে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মত। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, হদ্দ কায়েম করা হবে না।

কেননা হামযাযুক্ত زَنَأْتَ শব্দটি প্রকৃত অর্থে আরোহণ বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। জনৈকা আরব বলেন وَارْقَ اِلَى الْخَيْرَاتِ زَنَاءً فِي الْجَبَلِ - অর্থা কল্যাণের পানে আরোহণ কর, পর্বতারোহণের ন্যায়। শায়খাইনের যুক্তি এই যে, হামযাযুক্ত অবস্থায় ও এটা ব্যভিচারের অর্থে ব্যবহার করা হয়। কেননা আরব হামযাকে লীন এবং লীনকে হামযায় রূপান্তরিত রূপে উচ্চারণ করে থাকে।

আর ক্রোধ ও গাল মন্দের সময় খারাপ অর্থটাই উদ্দেশ্যরূপে নির্ধারিত হয়। যেমন শুধু يا زاني বা زنأت বলার ক্ষেত্রে। আর جبل শব্দের উল্লেখ আরোহণের অর্থকে নির্ধারিত করবে, যদি তার পূর্বে على অব্যয় যুক্ত হয়। কেননা এ ক্ষেত্রে এ অব্যয়টি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

যদি زَنَأْتَ عَلَى الْجَبَلِ তাহলে কেউ কেউ বলেছেন, আমাদের বর্ণিত কারণে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে না। আর কেউ কেউ বলেন, আমাদের বর্ণিত অর্থের কারণে হদ্দ প্রয়োগ করা হবে।

কেউ যদি অন্যজনকে বলে, হে ব্যভিচারী! আর অন্যজনও উত্তরে বলে- না; বরং তুমি। তাহলে উভয়ের উপর হদ্দ কায়েম করা হবে। কেননা এর অর্থ হলো, বরং তুমি ব্যভিচারী। যেহেতু بَلْ শব্দটি আতফের অব্যয়। যা দ্বারা ভুল শুধরানো হয়ে থাকে। তাই প্রথম বাক্যে উল্লিখিত বিধেয়টি দ্বিতীয় বাক্যেও উল্লেখ থাকবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কেউ যদি কাউকে সম্বোধন করে আরবিতে বলে যে, زَنَأْتَ فِي الْجَبَلِ তাহলে এটা অপবাদ হবে কি-না এবং এর কারণে হদ্দ আসবে কি-না, এ নিয়ে ইমামগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে।

ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতানুসারে কথাটি অপবাদ বলে গণ্য হবে এবং এ কারণে তার উপর হদ্দ আসবে; এটি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) এবং এক বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমত।

https://e-ilm.weebly.com/

ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, তার একথা অপবাদ বলে গণ্য হবে না এবং হদ্দও আসবে না। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো এই যে, زنأت (হামযাযোগে) শব্দটি زنأ মাসদার বা ক্রিয়ামূল হতে উৎপন্ন। এর প্রকৃত অর্থ হলো- আরোহণ করা। আর কথক নিজেই যখন বলছে যে, আমি আমার এ বাক্য দ্বারা পাহাড়ে আরোহণ করা বুঝিয়েছি, তখন সে শব্দের معنى حقيقى বা প্রকৃত অর্থই গ্রহণ করেছে। তাছাড়া زنأت ক্রিয়ার পরে কর্ম হিসাবে الجبل পাহাড় শব্দও সংযুক্ত হয়েছে। এর দ্বারা নিশ্চিত বুঝা যায় যে, পাহাড়ে আরোহণ অর্থেই সে শব্দটি ব্যবহার করেছে। অতএব, তার এ কথা অপবাদ বলে গণ্য হবে না এবং তার উপর কোনো হদ্দও আসবে না زنأ শব্দটি যে আরোহণের অর্থে ব্যবহার হয়, এর প্রমাণ স্বরূপ ইমাম মুহাম্মদ (র.) এক আরবীয় নারীর পংক্তি উদ্ধৃত করেছেন।

وَارْقَ اِلَى الْخَيْرَاتِ زَنْأً الْجَبَلِ তুমি কল্যাণের পানে আরোহণ কর, পাহাড়ে আরোহণ করার ন্যায়। এ পংক্তিতে আরবীয় নারী زنأ শব্দটি আরোহণ অর্থে ব্যবহার করেছেন। বুঝা গেল আরোহণ করা زنأ শব্দের প্রকৃত অর্থ। বিধায় আলোচ্য বাক্যটি অপবাদ বলে গণ্য হবে না।

ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল হলো زنأ শব্দটি আরোহণের অর্থে যেমন ব্যবহৃত হয়, তেমনি ব্যভিচারের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। কেননা আরবগণ হামযাকে লীনের হরফ দ্বারা আর লীনের হরফ (ى ـ و) কে হামযা দ্বারা প্রায়ই পরিবর্তন করে থাকেন। সে হিসেবে زنأت শব্দ زنيت -এর সমার্থক। যার অর্থ হলো- তুমি জেনা করেছ। তাছাড়া কথাটি যদি রাগের অবস্থায় বলে তাহলে তো খারাপ অর্থটিই উদ্দেশ্য হিসেবে নির্ধারিত হয়ে যায়। অতএব, زنأت في الجبل বলাটা শুধু زنأت কিংবা يا زانى বলারই হুকুমে। তাই زنأت এবং يا زانى বললে যেমন হদ্দ ওয়াজিব হয়, তেমনি زنأت في الجبل বলার দ্বারাও হদ্দ ওয়াজিব হবে।

শায়খাইনের পক্ষ হতে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিলের জবাবে বলা হয়, زنأت শব্দটি যখন আরোহণের অর্থে ব্যবহার করা হয়, তখন তার صله বা সংযুক্তিপদরূপে على অব্যয় ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ বাক্যটি এরূপ হয় যে, زنأت على الجبل আমি পাহাড়ে আরোহণ করেছি। অথচ আলোচ্য মাসআলার বাক্যটিতে على নেই, আছে فى। বাক্যটি হলো زنأت في الجبل। অতএব, এর অর্থ হলো তুমি পাহাড়ে জেনা করেছ যা সুস্পষ্ট অপবাদ।

আরেকটি মাসআলা :

কেউ যদি কাউকে আরবিতে বলে, زنأت على الجبل তাহলে তার কি হুকুম? কতিপয় ফকীহের মতে হদ্দ ওয়াজিব হবে না। কারণ এ বাক্যে زنأت শব্দের সাথে على অব্যয় যুক্ত আছে। ফলে এর অর্থ হিসেবে আরোহণ করা নির্ধারিত হয়েছে। বাক্যের অর্থ হলো- তুমি পাহাড়ে আরোহণ করেছ। অতএব, এটা কোনো অপবাদ নয়। বিধায় কোনো হদ্দ আসবে না।

এর বিপরীতে কোনো কোনো ফকীহ মনে করেন, হদ্দ আসবে। কারণ زنأت শব্দের মাঝে দুটি অর্থের সম্ভাবনা আছে। ১. আরোহণ করা, ২. ব্যভিচার করা। কিন্তু শব্দটি যখন রাগের অবস্থায় বলা হয় তখন তার মন্দ অর্থটিই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। সে হিসেবে আলোচ্য বাক্যটির অর্থ হলো তুমি পাহাড়ে ব্যভিচার করেছ। যা একটি অপবাদ। অতএব, তার উপর হদ্দ আসবে।

قوله : وَمَنْ قَالَ لِآخَرَ يَا زَانِي فَقَالَ لَا بَلْ أَنْتَ الخ : কেউ কাউকে বলল- يا زانى হে ব্যভিচারী। সে আবার প্রতিউত্তরে বলল, لَا بَلْ أَنْتَ না; বরং তুমি। এমতাবস্থায় এরা উভয়েই অপবাদ আরোপকারী হিসেবে সাব্যস্ত হবে এবং উভয়ের উপর হদ্দ আসবে। কারণ প্রথমজন যে অপবাদ আরোপকারী, তা সুস্পষ্ট। যেহেতু সে একজনকে হে ব্যভিচারী বলে সম্বোধন করেছে। দ্বিতীয়জনও অপবাদ আরোপকারী। কেননা সে বলেছে لا بل انت এখানে সে لا ব্যবহার করেছে। যার বৈশিষ্ট্য হলো ভুল শুধরানো। তথা পূর্বের কথা থেকে সরে এসে নতুন কথা বলা, যার ফলে بل এর পূর্বের বাক্যের বিধেয়টি সংশ্লিষ্ট উদ্দেশ্য হতে সরে এসে পরের বাক্যের উদ্দেশ্যের সাথে যুক্ত হবে। যেমন جَاءَنِيْ زَيْدٌ بَلْ عَمْرٌو এর প্রকৃতরূপ جَاءَنِيْ زَيْدٌ بَلْ عَمْرٌو جَاءَنِيْ অর্থ হলো- আমার নিকট যায়েদ এসেছে, না বরং আমর এসেছে। তদ্রূপ দ্বিতীয় ব্যক্তির কথা لا بل انت এর প্রকৃতরূপ হলো, لَا بَلْ اَنْتَ زَانٍ না; বরং তুমি ব্যভিচারী। অতএব, সেও অপবাদ আরোপকারী হলো। তাই আলোচ্য সুরতে উভয়ের উপর হদ্দে কযফ প্রয়োগ করা হবে, পরস্পর একে অপরকে অপবাদ দেওয়ার কারণে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَمَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ يَا زَانِيَةُ فَقَالَتْ لَا بَلْ اَنْتَ حُدَّتْ الْمَرْأَةُ وَلَا لِعَانَ لِاَنَّهُمَا قَاذِفَانِ وَقَذْفُهُ يُوْجِبُ اللِّعَانَ وَقَذْفُهَا الْحَدَّ، وَفِي الْبِدَايَةِ بِالْحَدِّ اِبْطَالُ اللِّعَانِ؛ لِاَنَّ الْمَحْدُوْدَ فِي الْقَذْفِ لَيْسَ بِاَهْلٍ لَهُ وَلَا اِبْطَالَ فِيْ عَكْسِهِ اَصْلًا فَيُحْتَالُ لِلدَّرْءِ، اِذِ اللِّعَانُ فِيْ مَعْنَى الْحَدِّ وَلَوْ قَالَتْ زَنَيْتُ بِكَ فَلَا حَدَّ وَلَا لِعَانَ مَعْنَاهُ قَالَتْ بَعْدَمَا قَالَ لَهَا يَا زَانِيَةُ لِوُقُوْعِ الشَّكِّ فِيْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِاَنَّهُ يَحْتَمِلُ اَنَّهَا اَرَادَتْ الزِّنَا قَبْلَ النِّكَاحِ فَيَجِبُ الْحَدُّ دُوْنَ اللِّعَانِ لِتَصْدِيْقِهَا اِيَّاهُ وَانْعِدَامِهِ مِنْهُ، وَيَحْتَمِلُ اَنَّهَا اَرَادَتْ زِنَائِىْ مَا كَانَ مَعَكَ بَعْدَ النِّكَاحِ لِاَنِّيْ مَا مَكَّنْتُ اَحَدًا غَيْرَكَ .وَهُوَ الْمُرَادُ فِي مِثْلِ هٰذِهِ الْحَالَةِ، وَعَلٰى هٰذَا الِاعْتِبَارِ يَجِبُ اللِّعَانُ دُوْنَ الْحَدِّ عَلَى الْمَرْأَةِ لِوُجُوْدِ الْقَذْفِ مِنْهُ وَعَدَمِهِ مِنْهَا فَجَاءَ مَا قُلْنَا .

অনুবাদ : কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে, হে ব্যভিচারিণী। আর উত্তরে সে স্বামীকে বলে যে, না; বরং তুমি। তাহলে স্ত্রীর উপর হদ্দে কযফ আসবে। লি'আন সাব্যস্ত হবে না। কেননা এখানে উভয়ই অপবাদ আরোপকারী। আর স্বামীর অপবাদ আরোপ দ্বারা লি'আন সাব্যস্ত হয়। এবং স্ত্রীর অপবাদ আরোপ দ্বারা হদ্দ সাব্যস্ত হয়। আর প্রথমে স্ত্রীর উপর হদ্দে কযফ সাব্যস্ত হওয়ার দ্বারা লি'আন বাতিল হয়। কেননা হদ্দে কযফ প্রাপ্ত ব্যক্তি লি'আনের যোগ্য নয়। পক্ষান্তরে বিপরীত দিকে কিছুই বাতিল হয় না (অর্থাৎ প্রথমে লি'আন হলে এর দ্বারা হদ্দে কযফ বাতিল হয়ে যায় না) অতএব, (লি'আন) রোধ করার জন্য কৌশল অবলম্বন করা হবে। কেননা লি'আন হদ্দে জেনার সমার্থক।

আর যদি (স্বামীর কথার উত্তরে) বলে, তোমার সাথে ব্যভিচার করেছি, তাহলে হদ্দ আসবে না, লি'আনও সাব্যস্ত হবে না। কেননা উভয়ের বিষয়ে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে।

কারণ হতে পারে স্ত্রী বিবাহের পূর্ববর্তী জেনার কথা বুঝিয়েছেন। তখন তার উপর হদ্দ ওয়াজিব হবে। লি'আন সাব্যস্ত হবে না। কেননা সে স্বামীর বক্তব্যকে সত্যায়িত করেছে। কিন্তু স্বামীর পক্ষ হতে স্ত্রীর সত্যায়ন পাওয়া যায়নি।

পক্ষান্তরে এমন সম্ভাবনাও রয়েছে যে, স্ত্রীর কথার উদ্দেশ্য হলো, আমার জেনা হচ্ছে সেটাই যেটা বিবাহের পর তোমার সাথে হয়েছে। কেননা তুমি ছাড়া অন্য কাউকে আমি সুযোগ দান করিনি। আর ধরনের ক্ষেত্রে এটাই উদ্দেশ্য হওয়ার কথা।

এদিক বিবেচনায় লি'আন সাব্যস্ত হয়। স্ত্রীর উপর হদ্দ সাব্যস্ত হয় না। কেননা স্বামীর পক্ষ থেকে অপবাদ আরোপ হয়েছে। স্ত্রীর পক্ষ থেকে হয়নি। সুতরাং তাই হুকুম হবে, যা আমরা বলেছি। (অর্থাৎ হদ্দ ও লি'আন কিছুই ওয়াজিব হবে না)।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, হে ব্যভিচারিণী! উত্তরে স্ত্রীও বলল-না; বরং তুমি। অর্থাৎ তুমি ব্যভিচারী : এমতাবস্থায় স্বামী স্ত্রী উভয়ই অপবাদ আরোপকারী বলে সাব্যস্ত হবে। তবে দু'জনের অপবাদের ফলাফল দু'রকম। স্ত্রীর উপর স্বামীর অপবাদ দ্বারা লি'আন ওয়াজিব হয়। আর স্বামীর উপর স্ত্রীর অপবাদ দ্বারা হদ্দ ওয়াজিব হয়।

https://e-ilm.weebly.com/

এখানে মনে রাখা দরকার যে, লি'আনও হদ্দের সমপর্যায়ভুক্ত এক বিষয়; কেননা কোনো স্বামী যখন তার স্ত্রীকে জেনার অপবাদ দেয়, অতঃপর চারজন সাক্ষী পেশ করতে না পারে তখনই লি'আন করতে হয়। এবং এ লি'আনটি স্বামীর পক্ষে কযফের স্থলাভিষিক্ত আর স্ত্রীর পক্ষে হদ্দে জেনার স্থলাভিষিক্ত হয়।

অতএব, আলোচ্য সুরতে যখন হদ্দ ও লি'আন (যা হদ্দেরই স্থলাভিষিক্ত) একত্র হয়ে গেল, তখন আমরা যে কোনো একটিকে রহিত করার চেষ্টা করি। যদি স্ত্রীকে প্রথমে হদ্দ লাগানো হয়, তাহলে লি'আন রহিত হয়ে যায়। কেননা হদ্দ প্রাপ্ত ব্যক্তি লি'আনের উপযুক্ত থাকে না। কারণ লি'আন এক প্রকার সাক্ষ্য, যার জন্য হদ্দ প্রাপ্ত না হওয়া শর্ত। মোটকথা, স্ত্রীর উপর প্রথমে হদ্দ লাগানো হলে লি'আন রহিত হয়; পক্ষান্তরে প্রথমে লি'আন করা হলে স্ত্রীর উপর হতে হদ্দে কযফ রহিত হয় না; বরং তখন লি'আন ও হদ্দ উভয়ই বহাল থাকে। অতএব, আমরা সে সুরত-ই অবলম্বন করব, যে সুরতে একটি রহিত হয়। আর তা হলো স্ত্রীকে প্রথমে হদ্দ লাগানো। তাই আলোচ্য সুরতে শুধুই হদ্দ সাব্যস্ত হবে, লি'আন সাব্যস্ত হবে না।

وَلَوْ قَالَتْ زَنَيْتُ بِكَ فَلَا حَدَّ الخ : কোনো স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, হে ব্যভিচারিণী। উত্তরে স্ত্রী বলল, তোমার সাথে জেনা করেছি এমতাবস্থায় কি হুকুম? এ নিয়ে একাধিক মতামত রয়েছে।

ইমাম মালেক (র.)-এর মত হলো স্বামীর উপর লি'আন ওয়াজিব হবে। কারণ সে তার স্ত্রীকে জেনার অপবাদ দিয়েছে এবং স্ত্রী সেটা মেনে নেয়নি। অতএব, কিয়াস অনুসারে তার উরপ লি'আান ওয়াজিব হবে।

আহনাফ ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর মত হলো, হদ্দ ও লি'আন কোনোটিই ওয়াজিব হবে না। তাদের দলিল হলো ইস্তিহসান।

ইস্তিহসানের বিবরণ এই যে, আলোচ্য মাসআলায় হদ্দ ও লি'আন উভয়টির ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। কেননা স্বামীর কথায় স্ত্রী যে বলেছে, আমি তোমার সাথে জেনা করেছি, কথাটির দু'রকম অর্থ হতে পারে–

১. আমি তোমার সাথে জেনা করেছি বিবাহের পূর্বে। যদি এ অর্থ গ্রহণ করা হয়, তাহলে স্ত্রীর উপর হদ্দ ওয়াজিব হয়। কেননা সে জেনার অভিযোগ স্বীকার করে নিয়েছে।

২. আমি তোমার সাথে জেনা করেছি বিবাহের পর। যদি এ অর্থ গ্রহণ করা হয়, তাহলে স্ত্রীর উপর হদ্দ ওয়াজিব হয়; কেননা স্বামী নিজ স্ত্রীর উপর হদ্দ ওয়াজিব হয় না; বরং স্বামীর উপর লি'আন ওয়াজিব হয়। কেননা স্বামী নিজ স্ত্রীকে জেনার অপবাদ দিয়েছে এবং স্ত্রী তা প্রত্যাখান করেছে। মোটকথা, স্ত্রীর প্রতিউত্তরের দু'টি অর্থ গ্রহণ করা যেতে পারে। এক অর্থ অনুযায়ী স্ত্রীর উপর হদ্দ ওয়াজিব হয়। স্বামীর উপর কিছুই ওয়াজিব হয় না। অন্য অর্থ অনুযায়ী স্বামীর উপরে লি'আন ওয়াজিব হয়। স্ত্রীর উপর কিছু ওয়াজিব হয় না। তাই আহনাফ ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) মনে করেন লি'আন ও হদ্দের মাঝে সংশয় হওয়াতে কোনোটিই ওয়াজিব হবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

وَمَنْ اَقَرَّ بِوَلَدٍ ثُمَّ نَفَاهُ فَاِنَّهُ يُلَاعَنُ لِاَنَّ النَّسَبَ لَزِمَهُ بِاِقْرَارِهِ وَبِالنَّفْيِ بَعْدَهُ صَارَ قَاذِفًا فَيُلَاعَنُ وَاِنْ نَفَاهُ ثُمَّ اَقَرَّ بِهِ حُدَّ لِاَنَّهُ لَمَّا اَكْذَبَ نَفْسَهُ بَطَلَ اللِّعَانُ لِاَنَّهُ حَدٌّ ضَرُوْرِيٌّ صُيِّرَ اِلَيْهِ ضَرُوْرَةَ التَّكَاذُبِ، وَالْاَصْلُ فِيْهِ حَدُّ الْقَذْفِ . فَاِذَا بَطَلَ التَّكَاذُبُ يُصَارُ اِلَى الْاَصْلِ، وَالْوَلَدُ وَلَدُهُ فِي الْوَجْهَيْنِ لِاِقْرَارِهِ بِهِ سَابِقًا اَوْ لَاحِقًا، وَاللِّعَانُ يَصِحُّ بِدُوْنِ قَطْعِ النَّسَبِ كَمَا يَصِحُّ بِدُوْنِ الْوَلَدِ .

অনুবাদ : কেউ যদি কোনো সন্তানের পিতৃত্ব স্বীকার করে অতঃপর তা অস্বীকার করে তাহলে লি'আন সাব্যস্ত হয়ে গেছে। এরপর অস্বীকার করার দ্বারা সে স্ত্রীর প্রতি অপবাদ আরোপকারী হবে। সুতরাং তাকে লি'আন করতে হবে।

আর যদি প্রথমে অস্বীকার করে, পরে স্বীকার করে নেয়, তাহলে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে। কেননা সে যখন নিজেকে মিথ্যা সাব্যস্ত করল, তখন লি'আন বাতিল হয়ে গেল। কেননা লি'আন হচ্ছে জরুরি পরিস্থিতির জন্য নির্ধারিত হদ্দ। পরস্পরের প্রতি মিথ্যাচারের দাবির অনিবার্য কারণে তা গ্রহণ করা হয়। কিন্তু (স্বামী নিজের মিথ্যাচার স্বীকার করার মাধ্যমে) পারস্পরিক মিথ্যাচার দাবি বাতিল হয়ে গেল, তখন মূল হদ্দের দিকে প্রত্যাবর্তন করা হবে। **আর উভয় অবস্থাতে সন্তান তারই হবে।** কেননা আগে বা পরে তার স্বীকারোক্তি রয়েছে। আর বংশ পরিচয় ছিন্ন করা ছাড়াও লি'আন হতে পারে, যেমন হতে পারে সন্তানের উপস্থিতি ছাড়াও।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আলোচ্য মাসআলার সুরতটি এই যে, কারো স্ত্রী সন্তান প্রসব করল। স্ত্রীর স্বামী সন্তানের পিতৃত্ব স্বীকার করে নিল অর্থাৎ এমন বলল যে, সন্তানটি আমার কিংবা বলল এটি আমার সন্তান। তারপর সে সন্তান অস্বীকার করল। অর্থাৎ এমন বলল যে, এ সন্তান আমার নয়। এমতাবস্থায় এ ব্যক্তির (স্বামীর) উপর লি'আন ওয়াজিব হবে। কেননা প্রথমে সন্তানের পিতৃত্ব স্বীকার দ্বারা তার সাথে সন্তানের বংশ পরিচয় সাব্যস্ত হয়ে গেছে। এরপর তা অস্বীকার করার দ্বারা সে নিজ স্ত্রীর প্রতি অপবাদ আরোপকারী বলে সাব্যস্ত হয়েছে। তাই তার উপর লি'আন ওয়াজিব। আর যদি স্ত্রীর সন্তান প্রসবের পর, স্বামী সন্তানের পিতৃত্ব প্রথমে অস্বীকার করে, তারপর আবার পিতৃত্ব স্বীকার করে নেয়, তাহলে স্বামীর উপর হদ্দে কযফ ওয়াজিব হবে।

কারণ প্রথমে যখন সে সন্তান অস্বীকার করেছিল, তখন তার উপর লি'আন ওয়াজিব ছিল। কিন্তু পরে আবার স্বীকার করে নেওয়ার দ্বারা সে নিজেকে নিজের পূর্বের দাবিতে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করল। অর্থাৎ কেমন যেন সে এটাই বলল যে, আমি আমার স্ত্রীর ব্যাপারে জেনার মিথ্যা অভিযোগ করেছিলাম। অতএব, তার উপর মিথ্যা অভিযোগে শাস্তি তথা হদ্দে কযফ প্রয়োগ করা হবে।

প্রশ্ন হতে পারে যে, স্ত্রীর উপর স্বামীর অভিযোগের কারণে লি'আন ওয়াজিব হয়ে থাকে, এখানে আবার হদ্দ ওয়াজিব হবে কেন?

এর উত্তর হলো এই যে, অপবাদের ক্ষেত্রে মূলত হদ্দই ওয়াজিব হয়। কিংবা বলা যায়, অপবাদের মূল শাস্তি হলো হদ্দ। কিন্তু কখনো কখনো জরুরি পরিস্থিতিতে হদ্দ প্রয়োগ সম্ভব না হওয়ায় লি'আনের আশ্রয় নিতে হয়। যেমন- স্বামী যখন নিজ স্ত্রীর বিরুদ্ধে জেনার অভিযোগ উত্থাপন করে এবং স্ত্রী তা অস্বীকার করে বা স্বামীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে থাকে। স্বামীও নিজ দাবির পক্ষে উপযুক্ত সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করতে পারে, তখন হদ্দ ওয়াজিব হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায় না, বিধায় বাধ্য হয়ে লি'আনের সুরত অবলম্বন করতে হয়। কিন্তু আলোচ্য মাসআলা যেহেতু স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে না; বরং স্বামী নিজেই নিজেকে তার অভিযোগে মিথ্যাবাদী বলে মেনে নিয়েছে, তখন তার সেই জরুরি পরিস্থিতিটি থাকছে না। যে পরিস্থিতিতে লি'আনের আশ্রয় নিতে হয়; বরং এক পক্ষ তথা স্বামীর মিথ্যাবাদী হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে যায়। অতএব, আমরা এখন অপবাদের মূল শাস্তির দিকে যাব, আর তা হলো হদ্দ।

আলোচ্য মাসআলায় স্বামীর উপর লি'আন ওয়াজিব হোক কিংবা হদ্দ ওয়াজিব হোক, উভয় সুরতে সন্তানের বংশ পরিচয় তার সাথেই সম্পৃক্ত হবে। অর্থাৎ সন্তানটি তার সন্তান বলেই গণ্য হবে। কারণ সে আগে বা পরে একবার সন্তানের পিতৃত্ব স্বীকার করেছে। অতএব, তা লি'আন বা হদ্দ প্রয়োগের কারণে বাতিল হবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

وَإِنْ قَالَ لَيْسَ بِابْنِيْ وَلَا بِابْنِكَ فَلَا حَدَّ وَلَا لِعَانَ لِأَنَّهُ أَنْكَرَ الْوِلَادَةَ وَبِهِ لَا يَصِيْرُ قَاذِفًا.

وَمَنْ قَذَفَ امْرَأَةً وَمَعَهَا أَوْلَادٌ لَمْ يُعْرَفْ لَهُمْ أَبٌ أَوْ قَذَفَ الْمُلَاعَنَةَ بِوَلَدٍ وَالْوَلَدُ حَيٌّ أَوْ قَذَفَهَا بَعْدَ مَوْتِ الْوَلَدِ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ لِقِيَامِ أَمَارَةِ الزِّنَاءِ مِنْهَا وَهِيَ وِلَادَةُ وَلَدٍ لَا أَبَ لَهُ فَفَاتَتْ الْعِفَّةُ نَظَرًا إِلَيْهَا وَهِيَ شَرْطُ الْإِحْصَانِ وَلَوْ قَذَفَ امْرَأَةً لَاعَنَتْ بِغَيْرِ وَلَدٍ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ لِانْعِدَامِ أَمَارَةِ الزِّنَا.

অনুবাদ : কেউ যদি স্ত্রীকে সম্বোধন করে বলে, এটা আমার পুত্র নয়, তোমারও পুত্র নয়। তাহলে হদ্দে কযফ ও লি'আন কিছুই ওয়াজিব হবে না। কেননা সে সন্তানের প্রসব অস্বীকার করেছে। আর তা দ্বারা অপবাদ আরোপকারী সাব্যস্ত হয় না।

কেউ যদি কোনো স্ত্রীলোকের নামে অপবাদ আরোপ করে এমন অবস্থায় যে, মহিলার সাথে সন্তানাদি রয়েছে, যাদের পিতার পরিচয় নেই, কিংবা সন্তানের ব্যাপারে লি'আনকারীকে অপবাদ দিল এমন অবস্থায় যে, সন্তানটি জীবিত রয়েছে, কিংবা সন্তানের মৃত্যুর পর তাকে অপবাদ দিল, তাহলে ঐ লোকের উপর হদ্দে কযফ আসবে না। কেননা তার থেকে ব্যভিচারের চিহ্ন রয়েছে। আর তা হলো সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া যার পিতৃ পরিচয় নেই। কাজেই এই দৃষ্টিকোণে তার পবিত্রতা বিনষ্ট হয়ে গেছে। আর তা ছিল ইহসানের জন্য শর্ত। আর যদি সে স্বীয় স্ত্রীকে অপবাদ আরোপ করে। সে সন্তান বিহীন লে'আন করেছে। তবে তার উপর হদ্দ আসবে। ব্যভিচারের নিদর্শন বিদ্যমান না থাকার কারণে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে, এ সন্তান আমারও নয়, তোমারও নয়। তাহলে লি'আন বা হদ্দ কিছুই ওয়াজিব হবে না। কেননা সে তার কথার দ্বারা স্ত্রীর সন্তান প্রসবকে অস্বীকার করেছে। অতএব, এমনটি কল্পনা করা যেতে পারে না যে, সন্তানটি স্ত্রীর জেনার কারণে হয়েছে। কারণ স্বামীর কথা অনুযায়ী স্ত্রীর সন্তানই হয় নাই জেনার মাধ্যমেই কি বা সৎ উপায়েই কি! মোটকথা, স্বামী তার স্ত্রীকে জেনার অপবাদ দেয়নি। তাই লি'আন বা হদ্দ কিছুই ওয়াজিব হবে না।

وَمَنْ قَذَفَ امْرَأَةً وَمَعَهَا أَوْلَادٌ الخ : আলোচ্য মাসআলায় একজন নারীর চার অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। তিনটি অবস্থা এমন, যে অবস্থায় কেউ তাকে অপবাদ দিলে তার উপর হদ্দে কযফ আসে না। আর একটি অবস্থা এমন, যে অবস্থায় অপবাদ দিলে হদ্দ আসে।

কোন নারীকে অপবাদ দিলে হদ্দ আসে না? এমন তিনটি অবস্থা হলো এই-

১. নারীর সন্তান আছে, কিন্তু সন্তানের পিতার পরিচয় নেই
২. নারী লি'আন করেছে সন্তানের কারণে এবং তার সন্তান জীবিত আছে।
৩. নারী লি'আন করেছে সন্তানের কারণে কিন্তু সে সন্তান মৃত্যুবরণ করেছে।

এ তিন অবস্থায় কেউ যদি উক্ত নারীকে জেনার অপবাদ দেয়, তাহলে তার উপরে হদ্দ আসবে না। কেননা হদ্দ আসার জন্য শর্ত হলো, অপবাদ আরোপিত ব্যক্তি মুহসান হওয়া। উপরিউক্ত অবস্থা তিনটিতে এ শর্ত বিদ্যমান নেই। কারণ নারীর উপর জেনার আলামত স্পষ্ট। আর তা হলো পিতা ছাড়া সন্তান ও সন্তানসহ লি'আন।

চতুর্থ অবস্থা, যে অবস্থায় অপবাদ দিলে হদ্দ আসে তা হলো- নারী লি'আন করেছে কিন্তু তার কোনো সন্তান নেই, এমতাবস্থায় কেউ তাকে জেনার অপবাদ দিলে তার উপর হদ্দে কযফ প্রয়োগ হবে। কারণ উক্ত সুরতে নারীর পক্ষে জেনার কোনো আলামত নেই। অতএব, তার ইহসান অবশিষ্ট আছে, সে মুহসান। আর মুহসান নারীকে অপবাদ দিলে হদ্দ হওয়াই শরিয়তের আইন

https://e-ilm.weebly.com/

فَقَالَ وَمَنْ وَطِئَ وَطْئًا حَرَامًا فِيْ غَيْرِ مِلْكِهِ لَمْ يُحَدَّ قَاذِفُهُ لِفَوَاتِ الْعِفَّةِ وَهِيَ شَرْطُ الْإِحْصَانِ، وَلِاَنَّ الْقَاذِفَ صَادِقٌ، وَالْاَصْلُ فِيْهِ اَنَّ مَنْ وَطِئَ وَطْئًا حَرَامًا لِعَيْنِهِ لَا يَجِبُ الْحَدُّ بِقَذْفِهِ؛ لِاَنَّ الزِّنَا هُوَ الْوَطْءُ الْمُحَرَّمُ لِعَيْنِهِ، وَاِنْ كَانَ مُحَرَّمًا لِغَيْرِهِ يُحَدُّ لِاَنَّهُ لَيْسَ بِزِنًا فَالْوَطْءُ فِيْ غَيْرِ الْمِلْكِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ اَوْ مِنْ وَجْهٍ حَرَامٌ لِعَيْنِهِ وَكَذَا الْوَطْءُ فِي الْمِلْكِ، وَالْحُرْمَةُ مُؤَبَّدَةٌ، فَاِنْ كَانَتِ الْحُرْمَةُ مُؤَقَّتَةً فَالْحُرْمَةُ لِغَيْرِهِ، وَاَبُوْ حَنِيْفَةَ يَشْتَرِطُ اَنْ تَكُوْنَ الْحُرْمَةُ الْمُؤَبَّدَةُ ثَابِتَةً بِالْاِجْمَاعِ، اَوْ بِالْحَدِيْثِ الْمَشْهُوْرِ لِتَكُوْنَ ثَابِتَةً مِنْ غَيْرِ تَرَدُّدٍ

অনুবাদ : গ্রন্থকার বলেন, কেউ যদি আপন মালিকানার বাইরে হারামভাবে যৌন সঙ্গম করে, তাহলে তার প্রতি অপবাদ আরোপকারীর হদ্দে কযফ আসবে না। কেননা ইহসান বা সতীত্ব বিলুপ্ত হয়েছে। আর সেটা হচ্ছে মুহসান হওয়ার শর্ত। তাছাড়া অভিযোগকারীর বক্তব্য সত্য।

এ ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো, যে ব্যক্তি এমন যৌন সঙ্গম করে যা সত্তাগতভাবে হারাম তার প্রতি অপবাদ আরোপ করার দ্বারা হদ্দে কযফ আসে না। কেননা সত্তাগতভাবে হারাম সঙ্গমকেই জেনা বলে। আর যদি পরোক্ষভাবে হারাম হয়, তাহলে হদ্দে কযফ আসবে। কেননা এটা জেনা নয়।

অতএব পূর্ণ বা আংশিক মালিকানাহীন ক্ষেত্রে সঙ্গম সত্তাগতভাবেই হারাম। তদ্রূপ হুকুম, স্থায়ী হারামত্ব সম্পন্ন মালিকানায় সঙ্গমের। কিন্তু হারামত্ব যদি সাময়িক হয় যেমন- হায়যের অবস্থা, তাহলে এই সঙ্গম হবে পরোক্ষ কারণে হারাম। তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.) শর্ত আরোপ করেন যে, স্থায়ী হারামত্ব ইজমা দ্বারা কিংবা মাশহুর হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হবে। যাতে বিষয়টি নির্দ্বিধায় প্রমাণিত হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিউক্ত মতনে একটি মাসআলা ও সে সম্পর্কিত একটি মূলনীতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মাসআলাটি এই যে, কোনো ব্যক্তি নিজের মালিকানাহীন ক্ষেত্রে (স্ত্রী ও দাসী ছাড়া ও অন্য মহিলা) যৌন সঙ্গম করল। এরপর অন্য একজন তাকে জেনার অপবাদ দিল, এমতাবস্থায় অপবাদ আরোপকারীর উপর হদ্দ আসবে না। কেননা হদ্দ আসার জন্য শর্ত হলো অপবাদ আরোপিত ব্যক্তি মুহসান হওয়া। আলোচ্য মাসআলায় অভিযুক্ত ব্যক্তি যেহেতু হারাম যৌন সঙ্গম করেছে, তাই তার ইহসান বিলুপ্ত হয়ে গেছে। ফলে তার অপবাদ আরোপকারীর হদ্দ আসবে না।

তাছাড়া আরেকটি কথা হলো, হদ্দ ওয়াজিব হয় মিথ্যা কথা বলার দ্বারা। এখানে তো অপবাদ আরোপকারী সত্য বলেছে। অতএব, তার উপর হদ্দ আসবে কিভাবে?

হদ্দ আসা না আসা সম্পর্কিত মূলনীতিটি হলো এই যে, সত্তাগতভাবে হারাম এমন সঙ্গমের পর অপবাদ দিলে হদ্দ আসে না। পরোক্ষভাবে হারাম সঙ্গমের পর অপবাদ দিলে হদ্দ আসে। কারণ প্রথমটি জেনা, দ্বিতীয়টি জেনা নয়।

তাহলে এখন জানতে হয়, কোনো সঙ্গমটি সত্তাগতভাবে হারাম আর কোনোটি পরোক্ষভাবে হারাম। এ সম্পর্কিত কথা হলো এই যে-

https://e-ilm.weebly.com/

১. সম্পূর্ণ মালিকানাহীন পাত্রে যদি সঙ্গম করে, যেমন স্ত্রীও নয় বাদীও নয় এমন মহিলার সাথে।

২. আংশিক মালিকানাহীন ক্ষেত্রে যদি সঙ্গম করে যেমন শরীকানা বাঁদী।

৩. মালিকানাধীন কিন্তু চিরস্থায়ীভাবে হারাম এমন ক্ষেত্রে যদি সঙ্গম করে। যেমন খরিদদারের পিতা সঙ্গম করেছেন এরূপ বাঁদী।

তাহলে উক্ত সঙ্গম সত্তাগতভাবে হারাম বলে বিবেচিত হবে, যার অপর নাম জেনা। অতএব, এ ধরনের সঙ্গমের পর অপবাদ দেওয়া হলে অপবাদদাতার উপর হদ্দ আসবে না।

পক্ষান্তরে সঙ্গমটি যদি সাময়িকভাবে হারাম হয়, তাহলে সেটিই হলো পরোক্ষভাবে হারাম সঙ্গম। যেমন হায়েয অবস্থায় বা নেফাস অবস্থায় নিজ স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করা। এ ধরনের সঙ্গমের পর অপবাদ দেওয়া হলে হদ্দ আসবে। কেননা এ সঙ্গমটি প্রকৃত অর্থে জেনা নয়।

কোনো পুরুষের জন্য কোনো মহিলা চিরস্থায়ীভাবে হারাম হওয়ার বিষয়টি প্রমাণ করার জন্য ইমাম আবূ হানীফা (র.) ইজমা তথা মাশহুর হাদীসের শর্তারোপ করেছেন। যাতে করে হারাম হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত ও সন্দেহ মুক্ত হয় এবং নির্দ্বিধায় হদ্দ প্রয়োগ করা যায়।

ইজমা দ্বারা হারাম হওয়ার নমুনা হলো, যে মহিলার সাথে ব্যক্তির পিতা সঙ্গম করেছে ক্রয় সূত্রে বা বিবাহ সূত্রে। অতঃপর ব্যক্তি উক্ত মহিলাকে খরিদ করে তার সাথে সঙ্গম করল, এটি ইজমা দ্বারা প্রমাণিত হারাম সঙ্গম। এ কারণে নির্দ্বিধায় তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে। মাশহুর হাদীস দ্বারা হারাম হওয়ার নমুনা হলো সাক্ষী ছাড়া বিবাহিতা স্ত্রী। এর হারামত্ব প্রমাণকারী মাশহুর হাদীসটি হলো– لَا نِكَاحَ إِلَّا بِشُهُوْدٍ

অর্থাৎ সাক্ষী ছাড়া বিবাহ হয় না। অতএব, এমন মহিলার সাথে সঙ্গম করার পর অপবাদ দেওয়া হলে অপবাদ দাতার উপর হদ্দ আসবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

وَبَيَانُهُ أَنَّ مَنْ قَذَفَ رَجُلًا وَطِئَ جَارِيَةً مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ لِانْعِدَامِ الْمِلْكِ مِنْ وَجْهٍ وَكَذَا إِذَا قَذَفَ اِمْرَأَةً زَنَتْ فِي نَصْرَانِيَّتِهَا لِتَحَقُّقِ الزِّنَا مِنْهَا شَرْعًا لِانْعِدَامِ الْمِلْكِ وَلِهٰذَا وَجَبَ عَلَيْهَا الْحَدُّ . وَلَوْ قَذَفَ رَجُلًا أَتَى أَمَتَهُ وَهِيَ مَجُوْسِيَّةٌ أَوْ اِمْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ أَوْ مُكَاتَبَةٌ لَهُ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ لِأَنَّ الْحُرْمَةَ مَعَ قِيَامِ الْمِلْكِ وَهِيَ مُؤَقَّتَةٌ فَكَانَتِ الْحُرْمَةُ لِغَيْرِهِ فَلَمْ يَكُنْ زِنَاءً . وَعَنْ أَبِي يُوْسُفَ أَنَّ وَطْءَ الْمُكَاتَبَةِ يُسْقِطُ الْإِحْصَانَ، وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ لِأَنَّ الْمِلْكَ زَائِلٌ فِي حَقِّ الْوَطْءِ وَلِهٰذَا يَلْزَمُهُ الْعُقْرُ بِالْوَطْءِ، وَنَحْنُ نَقُوْلُ مِلْكُ الذَّاتِ بَاقٍ وَالْحُرْمَةُ لِغَيْرِهِ إِذْ هِيَ مُؤَقَّتَةٌ . وَلَوْ قَذَفَ رَجُلًا وَطِئَ أَمَتَهُ وَهِيَ أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ لَا يُحَدُّ لِأَنَّ الْحُرْمَةَ مُؤَبَّدَةٌ وَهٰذَا هُوَ الصَّحِيْحُ .

অনুবাদ : এ আলোকে বিশদ বিবরণ এই যে, নিজের ও অন্যের মাঝে মালিকানাধীন দাসীর সাথে সঙ্গমকারী ব্যক্তিকে যদি কেউ অপবাদ দেয়, তাহলে তার উপর হদ্দে কযফ আসবে না। কেননা একদিক দিয়ে মালিকানা অবিদ্যমান। **তদ্রূপ হুকুম- যদি এমন লোককে অপবাদ দেয়, যে খ্রিস্টান অবস্থায় জেনা করেছে।** কেননা ব্যভিচারকারী মালিকানা না থাকার কারণে শরিয়ত অনুযায়ী তার দ্বারা জেনা সংঘটিত হয়েছে। এ কারণেই উক্ত জেনার কারণে তার উপর হদ্দ ওয়াজিব হয়।

কেউ যদি এমন লোককে অপবাদ দেয়, যে নিজের অগ্নিপূজক দাসীর সাথে কিংবা হায়েযগ্রস্ত স্ত্রীর সাথে কিংবা মুকাতাব দাসীর সাথে সহবাস করেছে, তাহলে অপবাদ আরোপকারীর উপর হদ আসবে। কেননা এখানে মালিকানা বিদ্যমান অবস্থায় সাময়িক হারামত্ব রয়েছে। সুতরাং এটা হবে পরোক্ষ কারণে হারাম, যা জেনা বলে গণ্য নয়।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) হতে বর্ণিত রয়েছে, মুকাতাব দাসীর সাথে সঙ্গম ইহসান নষ্ট করে দেয়। এটা ইমাম যুফার (র.) এরও অভিমত। কেননা সহবাসের ক্ষেত্রে মালিকানা বিলুপ্ত হয়েছে। এ কারণেই সহবাসের কারণে তার উপর অর্থ বিনিময় আবশ্যক হয়। আমাদের বক্তব্য এই যে, সত্তাগত মালিকানা এখনো বিদ্যমান রয়েছে। আর সাময়িক হওয়ার কারণে হারামত্বটি পরোক্ষ।

যদি একদিকে দাসী অন্যদিকে দুধবোন এমন নারীর সাথে সঙ্গমকারী লোককে কেউ অপবাদ দেয়, তাহলে অপবাদদাতার উপর হদ্দ আসবে না। কেননা এক্ষেত্রে হুরমতটি চিরস্থায়ী এবং এটাই বিশুদ্ধ অভিমত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিউক্ত মতনে পূর্ববর্ণিত উসূল বা মূলনীতির আলোকে একাধিক শাখা মাসআলা আলোচিত হয়েছে।

১. কোনো ব্যক্তি তার মাঝে ও অন্য একজনের মাঝে শরীকানাধীন বাঁদীর সাথে সঙ্গম করল। অতঃপর এক ব্যক্তি তাকে জেনার অপবাদ দিল, এই অপবাদদাতার উপর হদ্দে কযফ আসবে না। কারণ উক্ত বাঁদীর সাথে তার সঙ্গমটি জেনাই হয়েছে। কেননা বাঁদীটি তার একক মালিকানাধীন নয়। আংশিকতার মালিকানা, আংশিক অন্যের মালিকানা। এমতাবস্থায় অন্যের মালিকানায় যে সঙ্গমটুকু হয়েছে তা অবশ্যই জেনা এবং এই জেনার দ্বারা তার ইহসান বিলুপ্ত হয়ে গেছে। বিধায় তাকে অপবাদ দেওয়ার দ্বারা অপবাদ দাতার উপর হদ্দ আসবে। কেননা অপবাদের হদ্দ আসার জন্য শর্ত হলো অপবাদ আরোপিত ব্যক্তি মুহসান হওয়া।

তাছাড়া অপবাদদাতা ব্যক্তিটি তার বক্তব্যে সত্যবাদীও বটে। কেননা অভিযুক্ত নিজ মালিকানায় যে সঙ্গমটুকু করেছে সেটা বৈধ হলেও অপর শরিকের মালিকানায়, যা করেছে তা সত্তাগত হারাম সঙ্গম। আর সত্তাগত হারাম সঙ্গমকেই জেনা বলা হয়। আর এটাও জানা কথা যে, হদ্দ আসে মিথ্যা বলার কারণে সত্য বলার কারণে হদ্দ আসে না।

https://e-ilm.weebly.com/

২. কোনো ব্যক্তি যদি খ্রিস্টান বা অন্যধর্মে থাকাবস্থায় জেনা করে অতঃপর ইসলাম গ্রহণ করে এবং ইসলাম গ্রহণের পর কেউ তাকে জেনার অপবাদ দেয়, তাহলেও অপবাদ দাতার উপর হদ্দ আসবে। কারণ অন্য ধর্মে থাকাবস্থায় যে জেনা করেছে, তা মালিকানাহীন পাত্রে হওয়ার কারণে ইসলামের দৃষ্টিতেও জেনা বলে গণ্য। আর দুনিয়ার সকল ধর্মেই জেনা হারাম। অমুসলিমের এহেন সঙ্গম জেনা বলেই ধরা হয়, বিধায় অমুসলিমের উপরও হদ্দ প্রযোজ্য হয়। মোটকথা, সে যেহেতু জেনা করেছে, তাই তাকে জেনার অপবাদ দিলে অপবাদদাতার উপর হদ্দ আসবে না।

৩. কেউ যদি নিজের অগ্নিপূজক বাঁদীর সাথে সঙ্গম করে কিংবা ঋতুকালে নিজ স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করে কিংবা নিজের মুকাতাব বাঁদীর সাথে সঙ্গম করে এবং একারণে যদি তাকে কেউ জেনার অপবাদ দেয়, তাহলে তার উপর হদ্দ আসবে। কারণ উপরিউক্ত সঙ্গমগুলো মালিকানাধীন পাত্রে হয়েছে। বিধায় সেগুলো সত্তাগতভাবে হারাম নয়; বরং সাময়িকভাবে হারাম। আর সাময়িকভাবে হারাম এমন সঙ্গমকে জেনা বলা হয় না। অতএব, যে ব্যক্তি তাকে জেনার অপবাদ দিল সে মিথ্যাবাদী তাই তার উপর হদ্দে কযফ আসবে।

তবে মুকাতাব বাঁদীর সাথে সঙ্গমের বিষয়টি নিয়ে ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম যুফার (র.) মতভেদ করেছেন। তারা বলেন, মুকাতাব বাঁদীর সাথে সঙ্গমকারীকে অপবাদ দিলে অপবাদদাতার উপর হদ্দ আসবে না। কারণ মুকাতাব বাঁদীর সাথে সঙ্গম করলে এর দ্বারা ব্যক্তির ইহসান বিলুপ্ত হয়ে যায়। কারণ হিসেবে বলেন, মুকাতাব বাঁদীর উপর মালিকের সত্তাগত মালিকানা থাকলেও সঙ্গম বিষয়ে মালিকানা থাকে না, অর্থাৎ তার সাথে সঙ্গম করার অধিকার মনিবের থাকে না। এর প্রমাণ হলো এই যে, মুকাতাব বাঁদীর সাথে সঙ্গম করলে মনিবের উপর মহরে মিসাল ওয়াজিব হয়। যদি সঙ্গমের অধিকার থাকত তাহলে মহরে মিসাল ওয়াজিব হতো না। যেমন সাধারণ বাঁদীর সাথে সঙ্গম করলে মহরে মিসাল ওয়াজিব হয় না। অতএব, বুঝা গেল মুকাতাব বাঁদীর সাথে যে সঙ্গম হয়, তা মালিকানাধীন পাত্রে সঙ্গম। বিধায় এ সঙ্গমের দ্বারা সঙ্গমকারীর ইহসান বিলুপ্ত হবে। আর যার ইহসান বিলুপ্ত হয়, তাকে অপবাদ দিলে হদ্দ আসে না।

মুকাতাব বাঁদীর সাথে সঙ্গম করলে মনিবের ইহসান বাতিল হবে না, এ বিষয়ে আমাদের যুক্তি হলো এই যে, মুকাতাব বাঁদীটি সত্তাগতভাবে এখনো মনিবের মালিকানাধীন চুক্তি কিতাবতের চুক্তি কারণে তার সাথে সঙ্গম করা হারাম হয়েছে। যদি সে বাঁদী বদলে কিতাবত পরিশোধ করতে অক্ষম হয় এবং সাধারণ দাসত্বে ফিরে আসে, তাহলেই হুরমত রহিত হয়ে যাবে এবং তার সাথে সঙ্গম করা মনিবের জন্য হালাল হয়ে যাবে। অতএব, প্রমাণিত হলো যে, মুকাতাব বাঁদীর সাথে যে সঙ্গম হয়, তা সত্তাগত হারাম সঙ্গম নয়; বরং তা সাময়িকভাবে হারাম সঙ্গম। আর পূর্বেই বলা হয়েছে সাময়িক হারাম সঙ্গম করাকে জেনা বলা হয় না। অতএব, এহেন সঙ্গমের ফলে ব্যক্তির ইহসান বিলুপ্ত হবে না। বিধায় কেউ তাকে অপবাদ দিলে, তার উপর হদ্দে কযফ আসবে।

وَلَوْ قَذَفَ رَجُلًا وَطِئَ اَمَتَهُ الخ : কোনো ব্যক্তি নিজের এমন বাদীর সাথে সঙ্গম করল, যে বাঁদীটি তার দুধবোন। অতঃপর কেউ তাকে জেনার অপবাদ দিল। এই অপবাদদাতার উপর হদ্দে কযফ আসবে কি-না এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে।

বিশুদ্ধ মতামত হলো হদ্দ আসবে না। কেননা ব্যক্তি যার সাথে সঙ্গম করেছে, সে তার মালিকানাধীন হলেও রেযায়ী বোন হওয়ার কারণে স্থায়ীভাবে হারাম। অতএব, তার সাথে সঙ্গমটি জেনা বলে গণ্য হবে, এর দ্বারা ইহসান বাতিল হয়ে যাবে। ফলে তাকে অপবাদ দেওয়ার কারণে হদ্দ আসবে না।

মুসান্নিফ (র.) এর এ মতটি وَهُوَ الصَّحِيْحُ বলে ব্যক্ত করেছেন। এর থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় আরেকটি বিপরীত মতের দিকে। আর তা হলো, ইমাম কারখী (র.) এর মত। তিনি বলেন, আলোচ্য অবস্থায় অপবাদ দাতার উপর হতে হদ্দ রহিত হবে না। কারণ তিনি বাঁদীর রেযায়ী বোনকে স্ত্রীর সাথে কিয়াস করেছেন। বলেছেন, উভয়ের ক্ষেত্রে মালিকানা এবং হুরমত একত্রিত আছে। অতএব, ঋতুবর্তী স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করলে যেমন ইহসান বিনষ্ট হয় না, তেমনি মালিকানাধীন রেযায়ী বোনের সাথে সঙ্গম করলেও ইহসান বিনষ্ট হবে না। অতএব, তাকে অপবাদ দেওয়া হলে অপবাদ দাতার উপর হদ্দে কযফ আসবে। যেমন ঋতুবর্তী স্ত্রীর সাথে সঙ্গমকারীকে অপবাদ দিলে হদ্দ আসে।

কিন্তু ইমাম কারখীর এ মতটি সহীহ নয়। কারণ তার কিয়াসটি শুদ্ধ নয়। কেননা তিনি যার সাথে যাকে কিয়াস করেছেন তাদের পরস্পরে সামঞ্জস্য নেই। তিনি রেযায়ী বোনকে কিয়াস করেছেন ঋতুবর্তী স্ত্রীর সাথে অথচ ঋতুবর্তী স্ত্রীর ক্ষেত্রে হুরমতটি একান্তই সাময়িক। পক্ষান্তরে রেযায়ী বোনের ক্ষেত্রে হুরমতটি চিরস্থায়ী। অতএব, বলা যায়, তিনি অস্থায়ী হুরমতের সাথে স্থায়ী হুরমতকে কিয়াস করেছেন। যাকে বলা হয়, قِيَاسٌ مع الفارق বা অসামঞ্জস্যপূর্ণ কিয়াস। আর এ জাতীয় কিয়াস ফাসেদ বা অশুদ্ধ হওয়া সুপ্রসিদ্ধ। অতএব, এর উপর প্রতিষ্ঠিত মতটিও অশুদ্ধ বলে বিবেচিত হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَلَوْ قَذَفَ مُكَاتَبًا مَاتَ وَتَرَكَ وَفَاءً لَا حَدَّ عَلَيْهِ لِتَمَكُّنِ الشُّبْهَةِ فِي الْحُرِّيَّةِ لِمَكَانِ اِخْتِلَافِ الصَّحَابَةِ (رض) . وَلَوْ قَذَفَ مَجُوْسِيًّا تَزَوَّجَ بِأُمِّهِ ثُمَّ اَسْلَمَ يُحَدُّ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ . وَقَالَا : لَا حَدَّ عَلَيْهِ وَهٰذَا بِنَاءٌ عَلٰى اَنَّ تَزَوُّجَ الْمَجُوْسِيِّ بِالْمَحَارِمِ لَهُ حُكْمُ الصِّحَّةِ فِيْمَا بَيْنَهُمْ عِنْدَهُ خِلَافًا لَهُمَا. وَقَدْ مَرَّ فِي النِّكَاحِ .

অনুবাদ : যদি কেউ মুকাতাব গোলামকে অপবাদ দেয় এবং সে চুক্তি পরিমাণ সম্পদ রেখে মারা যায় তাহলে অপবাদদাতার উপর হদ্দ আসবে না। কেননা সাহাবায়ে কেরামের মতপার্থক্যের কারণে তার স্বাধীন হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে।

যদি কেউ এমন এক অগ্নিপূজক ব্যক্তিকে অপবাদ দেয় যে নিজের মাকে বিয়ে করেছে, অতঃপর ইসলাম গ্রহণ করেছে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মতে অপবাদ দাতার উপর হদ্দ আসবে। সাহেবাইন (র.) বলেন, হদ্দ আসবে না। এই মতপার্থক্যের ভিত্তি এই যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মতে মাহরামের সাথে অগ্নিপূজকের বিবাহের বৈধতা রয়েছে তাদের নিজেদের মাঝে। কিন্তু সাহেবাইন ভিন্ন মত পোষণ করেন। বিষয়টি মুশরিকদের বিবাহ প্রসঙ্গে পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলাটির সুরত জামে সাগীর গ্রন্থে এভাবে বর্ণিত আছে যে, জনৈক গোলাম তার মনিবের সাথে কিতাবতের চুক্তি করার পরে মারা গেছে, তবে মারা যাওয়ার সময় সে এ পরিমাণ সম্পদ রেখে গেছে, যা দ্বারা তার বদলে কিতাবত আদায় হতে পারে। তার গোলামের মৃত্যুর পর তার রেখে যাওয়া সম্পদ হতে প্রথমে তার বদলে কিতাবত আদায় করা হলো। তারপর অবিশিষ্ট সম্পদ তার আত্মীয় স্বজনের মাঝে তথা ওয়ারিশগণের মাঝে বন্টন করে দেওয়া হলো। অতঃপর মৃত মুকাতাব গোলামকে কেউ জেনার অপবাদ দিল, এমতাবস্থায় অপবাদ আরোপকারীর উপর হদ্দ আসবে না।

কারণ এ লোকটি মৃত্যুবরণ করার সময় গোলাম ছিল না-কি স্বাধীন ছিল, তা নিশ্চিত বলা যায় না। যদি বলা হয় যে, গোলাম ছিল, তাহলে হদ্দ আসে না। আর যদি বলা হয়, মৃত্যুর সময় স্বাধীন ছিল তাহলে হদ্দ আসে। কিন্তু আলোচ্য মাসআলায় কোনো দিক নিশ্চিত নয়। কেননা এ ব্যাপারে স্বয়ং সাহাবীগণের মাঝে মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে। হযরত আলী (রা.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) প্রমুখের মতে আলোচ্য মুকাতাব ব্যক্তি স্বাধীন অবস্থায় মারা গেছে। হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.)-এর মতে সে গোলাম অবস্থায় মারা গেছে।

মোটকথা হলো, আলোচ্য মুকাতাব মৃত্যুর সময় গোলাম বা স্বাধীন হওয়ার বিষয়ে সাহাবীদের মতানৈক্য রয়েছে। এ কারণে তার স্বাধীন হওয়ার ব্যাপারে সংশয় সৃষ্টি হয়েছে। এ সংশয়ের কারণে অপবাদ দাতার উপর হতে হদ্দ রহিত হয়ে যাবে। কেননা সন্দেহপূর্ণ অনুষঙ্গ দ্বারা হদ্দ প্রমাণিত হয় না।

وَلَوْ قَذَفَ مَجُوسِيًّا تَزَوَّجَ الخ : কোনো অগ্নিপূজক ব্যক্তি নিজ মাতাকে বিবাহ করল, অতঃপর মুসলমান হলো। এরপর কেউ তাকে অপবাদ দিল। এমতাবস্থায়, ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মতে অপবাদ দাতার উপর হদ্দে কযফ প্রয়োগ করা হবে। সাহেবাইনের মতে হদ্দে কযফ প্রয়োগ করা হবে না।

এ মতানৈক্যটির ভিত্তি অন্য একটি মতানৈক্যের উপর। তা হলো এই যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, অগ্নিপূজক নিজ মাহরামের সাথে যে বিবাহ করে থাকে, তা তাদের সমাজে বৈধ। অতএব, বৈধ পদ্ধতিতে সঙ্গম হওয়ার পর যখন কেউ তাকে জেনার অপবাদ দেয় তখন তার উপর হদ্দ আসাই স্বাভাবিক। অতএব, আলোচ্য মাসআলায় হদ্দ আসবে। সাহেবাইন বলেন, অগ্নিপূজকরা মাহরামের সাথে যে বিবাহ করে থাকে, তা বিবাহ বলে গণ্য নয়। অতএব, উক্ত বিবাহের পরে যে সঙ্গম হয়, তা হারাম সঙ্গম যার অপর নামই জেনা। অতএব, যদি তাকে জেনার অপবাদ দেওয়া হয় তাহলে বাস্তব কথাই বলা হয়। বিধায় এ বাস্তব কথা যে বলে তার উপর হদ্দ আসবে না। এ প্রসঙ্গটি মুশরিকের বিবাহ সম্পর্কিত আলোচনায় পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَإِذَا دَخَلَ الْحَرْبِيُّ دَارَنَا بِاَمَانٍ فَقَذَفَ مُسْلِمًا حُدَّ لِاَنَّ فِيْهِ حَقَّ الْعَبْدِ وَقَدْ اِلْتَزَمَ اِيفَاءَ حُقُوْقِ الْعِبَادِ، وَلِاَنَّهُ طَمَعَ فِيْ اَنْ لَا يُؤْذِيَ فَيَكُوْنُ مُلْتَزِمًا اَنْ لَا يُؤْذِيَ وَمُوْجِبُ اَذَاهُ الْحَدُّ وَاِذَا حُدَّ الْمُسْلِمُ فِيْ قَذْفٍ سَقَطَتْ شَهَادَتُهُ وَاِنْ تَابَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : تُقْبَلُ اِذَا تَابَ وَهِيَ تُعْرَفُ فِي الشَّهَادَاتِ وَاِذَا حُدَّ الْكَافِرُ فِيْ قَذْفٍ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ عَلٰى اَهْلِ الذِّمَّةِ لِاَنَّ لَهُ الشَّهَادَةَ عَلٰى جِنْسِهِ فَتُرَدُّ تَتِمَّةً لِحَدِّهِ فَاِنْ اَسْلَمَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ عَلَيْهِمْ وَعَلَى الْمُسْلِمِيْنَ لِاَنَّ هٰذِهِ شَهَادَةٌ اِسْتَفَادَهَا بَعْدَ الْاِسْلَامِ فَلَمْ تَدْخُلْ تَحْتَ الرَّدِّ، بِخِلَافِ الْعَبْدِ اِذَا حُدَّ حَدَّ الْقَذْفِ ثُمَّ اُعْتِقَ حَيْثُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لِاَنَّهُ لَا شَهَادَةَ لَهُ اَصْلًا فِيْ حَالِ الرِّقِّ فَكَانَ رَدُّ شَهَادَتِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ مِنْ تَمَامِ حَدِّهِ .

অনুবাদ : হারবী যদি আমাদের দারুল ইসলামে নিরাপত্তা নিয়ে প্রবেশ করে আর কোনো মুসলমানের প্রতি অপবাদ আরোপ করে তাহলে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে। কেননা এতে বান্দার হক রয়েছে। আর সে বান্দার হকসমূহ আদায় করার বাধ্যবাধকতা গ্রহণ করেছে। তাছাড়া নিরাপত্তা গ্রহণের মাধ্যমে সে আশা করেছে যে, কারো পক্ষ হতে তাকে কষ্ট দেওয়া হবে না। সুতরাং সেও অন্য কাউকে কষ্ট না দেওয়ার এবং কষ্টদানের অনিবার্য পরিণতি ভোগের বাধ্যবাধকতা গ্রহণকারী হবে।

মুসলমান যখন অপবাদ আরোপের কারণে হদ্দ প্রাপ্ত হয়, তখন তওবা করা সত্ত্বেও তার সাক্ষ্যদানের যোগ্যতা রহিত হয়ে যায়। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, তওবা করলে তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। সাক্ষ্যদান পর্বে বিষয়টি আলোচিত হয়েছে।

কাফের যদি অপবাদের হদ্দ প্রাপ্ত হয় তাহলে কোনো জিম্মির বিপক্ষে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা আপন সম্প্রদায় কারো বিপক্ষে সাক্ষ্যদানের যোগ্যতা তার ছিল। সুতরাং হদ্দে কযফের পূর্ণতা বিধানের জন্য তা রদ করা হবে।

এরপর যদি সে ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে মুসলিম অমুসলিম সবার বিপক্ষে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা এ সাক্ষ্যদান যোগ্যতা সে ইসলাম গ্রহণের পর অর্জন করেছে। সুতরাং তা পূর্ববর্তী রদের আওতায় আসবে না। পক্ষান্তরে হদ্দে কযফ ভোগ করার পর মুক্তিপ্রাপ্ত গোলামের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না। কেননা দাসত্বের অবস্থায় মোটেই তার সাক্ষ্যদান ক্ষমতা ছিল না। সুতরাং পরবর্তী সাক্ষ্যদান ক্ষমতা রদ করাই হবে তার হদ্দ ভোগের পূর্ণতা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কোনো কাফের নিরাপত্তা নিয়ে দারুল ইসলাম বা ইসলামি শরিয়ত শাসিত কোনো রাষ্ট্রে প্রবেশ করল। অতঃপর সে কোনো মুসলমানের প্রতি জেনার অপবাদ আরোপ করল। এমতাবস্থায় চার ইমাম এ বিষয়ে একমত যে, উক্ত কাফের ব্যক্তির উপর হদ্দে কযফ প্রয়োগ করা হবে। কারণ–

১. হদ্দে কযফের সাথে বান্দার হক জড়িত আছে। কেননা কযফ বা অপবাদের দ্বারা ব্যক্তির মান-মর্যাদা, দেহ, মন সবকিছুই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই বান্দার হক উসূল করার ক্ষেত্রে কেন ছাড় দেওয়া হবে? অতএব, অপবাদের হদ্দ প্রয়োগ করা হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

উল্লেখ্য যে, যে সব হক নিছক আল্লাহর হক বলে পরিগণিত সেগুলো উসূলের ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া যায়। যেমন- চুরি, জেনা মদপানের শাস্তি।

২. হারবী ব্যক্তি মুসলিম দেশে প্রবেশ করার মাধ্যমে আশা করেছে যে, কেউ তাকে কষ্ট দিবে না। এর জন্য অপরিহার্য হলো তার পক্ষ থেকেও কাউকে কষ্ট না দেওয়া। অতঃপর সে যখন কষ্ট দিল অর্থাৎ অপবাদ দিল তখন এর অনিবার্য শাস্তিও তাকে ভোগ করতে হবে। অর্থাৎ হদ্দে কযফ প্রয়োগ করা হবে।

وَإِذَا حُدَّ الْمُسْلِمُ فِي قَذْفٍ : কোনো মুসলমানকে যখন অপবাদের কারণে হদ্দ প্রয়োগ করা হয়, তখন তার সাক্ষী হওয়ার ক্ষমতা রহিত হয়ে যায়। তওবা করলেও সে ক্ষমতা ফিরে আসবে না। ইমাম শাফেয়ী (র.) এর মতে তওবা করার দ্বারা সাক্ষ্য দানের ক্ষমতা ফিরে আসবে। এটা ইমাম মালেক, লাইছ ও উসমান আল বাত্তী (র.) এরও মতামত। উপরিউক্ত মতপার্থক্যটি শাহাদাত সম্পর্কিত অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

وَإِذَا حُدَّ الْكَافِرُ فِي قَذْفٍ لَمْ الخ : উপরিউক্ত ইবারতে দুটি মাসআলা আলোচিত হয়েছে-

১. হদ্দে কযফ প্রাপ্ত কাফের ব্যক্তির মাসআলা।

২. হদ্দে কযফ প্রাপ্ত গোলামের মাসআলা।

১. কোনো কাফের যদি কারো উপর অপবাদ আরোপের দায়ে হদ্দ প্রাপ্ত হয়, তাহলে কাফের সম্প্রদায়ের মাঝে তার যে সাক্ষ্যদানের ক্ষমতা ছিল তা রহিত হয়ে যাবে। অর্থাৎ কাফের সমাজে কারো বিরুদ্ধে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। যেমন কোনো মুসলমান ব্যক্তি হদ্দে কযফ প্রাপ্ত হলে মুসলমান সমাজে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হয় না। এই সাক্ষ্যদানের যোগ্যতা হারানোর বিষয়টিও তার হদ্দ বা শাস্তির অংশ বিশেষ। কেননা অপবাদের শাস্তি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمَانِيْنَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا

অর্থাৎ তাদেরকে (অপবাদ আরোপকারীদেরকে আশিটি দোররা লাগাও এবং কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করো না। কিন্তু যদি এই হদ্দ প্রাপ্ত কাফের ব্যক্তিটি কখনো ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে তখন তার সাক্ষ্য মুসলিম অমুসলিম সকলের বিপক্ষেই গ্রহণযোগ্য হবে। এ ক্ষমতাটি অর্জন হবে তার ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে। অতএব, এর সাথে পূর্ববর্তী হদ্দের কোনো সম্পর্ক থাকবে না; বরং কাফের অবস্থায় হদ্দ ভোগের কারণে যে সাক্ষ্যদান ক্ষমতা বাতিল হয়েছে সেটি ভিন্ন এবং ইসলাম গ্রহণের মাধ্যেমে তার যে সাক্ষ্যদান ক্ষমতা অর্জন হয়েছে এটি ভিন্ন বলে বিবেচিত হবে। ইসলাম পরবর্তী অর্জিত যোগ্যতায় ইসলাম পূর্ব হদ্দের কোনো প্রভাব পড়বে না।

২. কোনো গোলাম যদি গোলাম থাকাবস্থায় হদ্দে কযফ প্রাপ্ত হয়, অতঃপর সে আজাদ হয়, তাহলে আজাদ হওয়ার পর তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না।

কেননা গোলাম থাকাকালে তার সাক্ষ্যদানের ক্ষমতাই ছিল না। অথচ হদ্দের অংশ হিসেবে সাক্ষ্য দান ক্ষমতা বাতিল হওয়া আবশ্যক ছিল। তাই যখন সে আজাদ হলো এবং সাক্ষ্যদান ক্ষমতা অর্জন হলো তখনই এ ক্ষমতা বাতিল হবে পূর্ববর্তী হদ্দের অংশ বা সমাপ্তি হিসেবে। যদি তার যোগ্যতা বাতিল না করা হয়, তাহলে তার হদ্দ অপূর্ণ থেকে যাবে। অতএব, তার হদ্দ পূর্ণ করার স্বার্থে আজাদ হওয়ার মাধ্যমে অর্জিত সাক্ষ্যদান ক্ষমতা পূর্ববর্তী হদ্দের অংশ হিসেবে বাতিল বলে গণ্য হবে।

মোটকথা, কাফের ও গোলামের মাঝে পার্থক্য হলো, কাফের কাফের থাকাবস্থায় তার সাক্ষ্যদানের ক্ষমতা থাকে এবং হদ্দের দ্বারা সেই ক্ষমতা বাতিল হয়ে যায় এবং হদ্দ পরিপূর্ণ হয়ে যায়। তাই ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে তার যে নতুন ক্ষমতা অর্জন হয়, তা অক্ষুণ্ন থাকে।

পক্ষান্তরে গোলাম গোলাম থাকাবস্থায় তার সাক্ষ্যদানের কোনো ক্ষমতা থাকে না। বিধায় তা বাতিলও করা যায় না। ফলে তার হদ্দটি অপূর্ণ থেকে যায়। তাই আজাদ হওয়ার পর যোগ্যতা অর্জন হওয়া মাত্রই তা বাতিল বলে গণ্য হয়, পূর্ববর্তী হদ্দের পরিসমাপ্তি হিসেবে।

https://e-ilm.weebly.com/

فَإِنْ ضُرِبَ سَوْطًا فِيْ قَذْفٍ ثُمَّ اَسْلَمَ ثُمَّ ضُرِبَ مَا بَقِيَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ لِاَنَّ رَدَّ الشَّهَادَةِ مُتَمِّمٌ لِلْحَدِّ فَيَكُوْنُ صِفَةً لَه وَالْمُقَامُ بَعْدَ الْإِسْلَامِ بَعْضُ الْحَدِّ فَلَا يَكُوْنُ رَدُّ الشَّهَادَةِ صِفَةً لَه. وَعَنْ اَبِيْ يُوْسُفَ اَنَّه تُرَدُّ شَهَادَتُهُ اِذِ الْاَقَلُّ تَابِعٌ لِلْاَكْثَرِ، وَالْأَوَّلُ اَصَحُّ . قَالَ وَمَنْ زَنٰى اَوْ شَرِبَ اَوْ قَذَفَ غَيْرَ مَرَّةٍ فَحُدَّ فَهُوَ لِذٰلِكَ كُلِّهِ اَمَّا الْاَوَّلَانِ فَلِاَنَّ الْمَقْصَدَ مِنْ اِقَامَةِ الْحَدِّ حَقًّا لِلّٰهِ تَعَالٰى اَلْاِنْزِجَارُ، وَاحْتِمَالُ حُصُوْلِهِ بِالْاَوَّلِ قَائِمٌ فَتَتَمَكَّنُ شُبْهَةُ فَوَاتِ الْمَقْصُوْدِ فِي الثَّانِي، وَهٰذَا بِخِلَافِ مَا اِذَا زَنٰى وَقَذَفَ وَسَرَقَ وَشَرِبَ، لِاَنَّ الْمَقْصُوْدَ مِنْ كُلِّ جِنْسٍ غَيْرُ الْمَقْصُوْدِ مِنَ الْاٰخَرِ فَلَا يَتَدَاخَلُ . وَاَمَّا الْقَذْفُ فَالْمُغَلَّبُ فِيْهِ عِنْدَنَا حَقُّ اللّٰهِ فَيَكُوْنُ مُلْحَقًا بِهِمَا .وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : اِنِ اخْتَلَفَ الْمَقْذُوْفُ اَوِ الْمَقْذُوْفُ بِهِ وَهُوَ الزِّنَاءُ لَا يَتَدَاخَلُ، لِاَنَّ الْمُغَلَّبَ فِيْهِ حَقُّ الْعَبْدِ عِنْدَهٗ .

অনুবাদ : হদ্দে কযফের একটি দোররা লাগানোর পর যদি সে ইসলাম গ্রহণ করে নেয় এবং অবশিষ্ট দোররাগুলো পরে লাগানো হয়, তাহলে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা সাক্ষ্যদানের যোগ্যতা রদ্দ হচ্ছে হদ্দের পূর্ণতা দানকারী। সুতরাং সেটা হদ্দ সম্পর্কিত বিষয় হবে। আর ইসলাম গ্রহণের পর হদ্দের অংশ বিশেষ কার্যকর হয়েছে। সুতরাং সাক্ষ্য রদ ঐ হদ্দের সম্পৃক্ত গুণ হবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) হতে বর্ণিত রয়েছে যে, তার সাক্ষ্যদান যোগ্যতা রদ করা হবে। কেননা অল্প অংশ অধিক অংশের অনুগামী হয়। প্রথমোক্ত মতটি অধিকতর বিশুদ্ধ।

গ্রন্থকার বলেন, কেউ যদি একাধিক বার অপবাদ আরোপ করে কিংবা ব্যভিচার করে কিংবা মদ পান করে অতঃপর হদ্দ ভোগ করে, তাহলে একই হদ্দ সবকটির জন্য যথেষ্ট হবে।

অপর দুটির (অর্থাৎ ব্যভিচার ও মদ পানের) ক্ষেত্রে কারণ এই যে, আল্লাহর হক হিসেবে হদ্দ কায়েমের উদ্দেশ্য হচ্ছে শাসন ও সতর্কীকরণ। আর প্রথম হদ্দ দ্বারা তা অর্জিত হওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যমান। সুতরাং দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যহীন হওয়ার সন্দেহ বিদ্যমান।

আর একই ব্যক্তি যদি জেনা করে, অপবাদ দেয়, চুরি করে এবং মদ পান করে তবে তার ব্যাপারটি ভিন্ন। কেননা প্রত্যেক শ্রেণির হদ্দের উদ্দেশ্য অপর হদ্দ হতে ভিন্ন। সুতরাং সেগুলো পরস্পর একীভূত হবে না। আর অপবাদ আরোপের বিষয়টিতে যেহেতু আমাদের মতে আল্লাহর প্রধান, সেহেতু সেটা অন্য দুটির সাথে সংযুক্ত হবে।

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, অপবাদ আরোপকৃত ব্যক্তি কিংবা অপবাদের বিষয় যদি ভিন্ন হয় তাহলে একীভূত হবেনা। কেননা তার মতে এতে বান্দার হক প্রধান।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কোনো কাফের ব্যক্তি কারো উপর অপবাদ আরোপ করল, অতঃপর এই অপবাদের হদ্দ স্বরূপ তার উপর আশি দোররা লাগানো আরম্ভ হলো কিন্তু একটি দোররা লাগানো মাত্রই সে কাফের মুসলমান হয়ে গেল। অবশিষ্ট উনাশি দোররা লাগানো হলো মুসলমান হওয়ার পর। এমতাবস্থায় তার সাক্ষ্যদান ক্ষমতা বাতিল হবে কি? এ নিয়ে ইমামগণের মাঝে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মত হলো তার সাক্ষ্যদান ক্ষমতা বাতিল হবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) হতে বর্ণিত আছে– তার সাক্ষ্যদান ক্ষমতা বাতিল হবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর যুক্তি হলো এই যে, সাক্ষ্যদান ক্ষমতা বাতিল হওয়ার বিষয়টি হলো হদ্দের পরিসমাপ্তি। অতএব, এটি (পূর্ণাঙ্গ) হদ্দের গুণ হিসাবে বিবেচ্য হবে। আর আলোচ্য মাসআলায় ইসলাম গ্রহণের পর যতটুকু কায়েম করা হয়েছে। তা পূর্ণ হদ্দ নয়; বরং হদ্দের অংশবিশেষ। তাই সাক্ষ্যদান ক্ষমতা বাতিল করণের বিষয়টিকে এর সাথে সম্পৃক্ত করা যাবে না। ইসলাম গ্রহণের পর কায়েমকৃত দোররাগুলো যদি পূর্ণ হদ্দ হতো, তাহলে সাক্ষ্য বাতিলের বিষয়টি পরিসমাপ্তি হিসাবে এর সাথে সংযুক্ত হতো। মোটকথা, ইসলাম গ্রহণের পরে যেহেতু পূর্ণ হদ্দ লাগানো হয়নি, তাই সাক্ষ্য রদ এর সাথে সম্পৃক্ত হবে। কেননা সাক্ষ্য রদ সম্পৃক্ত হয় (পূর্ণ) হদ্দের সাথে। হদ্দের অংশের সাথে নয়।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) এর যুক্তি হলো, হদ্দের অল্প অংশ (১ দোররা) কায়েম করা হয়েছে ইসলাম গ্রহণের পূর্বে অধিকাংশ (উনআশি দোররা) কায়েম করা হয়েছে ইসলাম গ্রহণের পর। আর কোনো কিছু অল্প অংশ বেশি অংশের অনুগামী হয়ে থাকে। তাই কেমন যেন পূর্ণ হদ্দই ইসলামের পর কায়েম করা হয়েছে। অতএব, সাক্ষ্য রদ এর সাথে সম্পৃক্ত হবে। তবে বর্ণিত মত দুটির মাঝে প্রথমটি অধিকতর বিশুদ্ধ।

وَمَنْ زَنَى أَوْ شَرِبَ أَوْ قَذَفَ : উপরিউক্ত ইবারতে প্রধানত দু'টি মাসআলা আলোচিত হয়েছে।

১. কারো দ্বারা যদি একাধিক অপবাদ, কিংবা একাধিক ব্যভিচার কিংবা একাধিকবার মদপান সংঘটিত হয়, তাহলে কী হুকুম।

২. একজনের মাধ্যমে যদি অপবাদ, ব্যভিচার, চুরি, মদপান সবকটি বা কয়েকটি অপরাধ সংঘটিত হয়, তাহলে তার কী হুকুম?

মাসআলা দু'টির বিস্তারিত বিবরণ-

১. যদি কোনো ব্যক্তি অন্যের প্রতি একাধিক অপবাদ আরোপ করে কিংবা একাধিকবার ব্যভিচার করে কিংবা একাধিকবার মদপান করে, অতঃপর তাকে হদ্দ লাগানো হয়, তাহলে একটি হদ্দ এক জাতীয় একাধিক অপরাধের জন্য যথেষ্ট হবে। অর্থাৎ কেউ যদি তিনবার জেনা করে এবং তাকে হদ্দ লাগানো হয়, তাহলে একটি হদ্দই তিন জেনার শাস্তি বলে গণ্য হবে। পৃথক তিন বার হদ্দ প্রয়োগের প্রয়োজন নেই। অনুরূপ একাধিক বার মদ পানের জন্য একটি হদ্দ যথেষ্ট হবে। একাধিক অপবাদের জন্যও একটি হদ্দ যথেষ্ট হবে।

এ হলো ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ, মুহাম্মদ, মালেক, সুফিয়ান সাওরী, ইবনে আবি লাইলা, শা'বী যুহরী, নাখয়ী, কাতাদাহ, হাম্মাদ, আউস, আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) এর মাযাহব। এক বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম শাফেয়ী (র.)এর মতও তাই। তবে অপবাদের বিষয়ে ইমাম শাফেয়ী (র.) প্রমুখ এর নিকট তাফসীল রয়েছে, যা সামনে আসবে।

দলিল : শেষোক্ত দু'টি জেনা ও মদ্য পান একাধিকবার সংঘটিত হওয়ার পর একটি হদ্দ যথেষ্ট হওয়ার কারণ হলো– জেনা ও মদপানের হদ্দ মূলত আল্লাহর হক এবং এ হদ্দের উদ্দেশ্য হলো, অপরাধীকে সাবধান করা, সতর্ক করা। যেন ভবিষ্যতে আর অপরাধ না করে। আর উদ্দেশ্যটি একবার হদ্দ লাগানোর দ্বারাই অর্জিত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকে। সে হিসেবে দ্বিতীয়বার হদ্দ লাগানো হলে তা উদ্দেশ্য বা ফায়দাবিহীন হদ্দ। কিংবা তা ফায়দাহীন হওয়ার সন্দেহ

https://e-ilm.weebly.com/

রয়েছে অবশ্যই। আর এটি একটি সর্বসম্মত বিষয় যে, সন্দেহের দ্বারা হদ্দ বাতিল হয়ে যায়। তাই একজাতীয় কয়েকটি অপরাধ সংঘটিত হলে প্রথম হদ্দটি ফায়দা জনক হওয়া নিশ্চিত এবং অবশিষ্টগুলো রহিত হয়ে যাবে।

আর হদ্দে কযফ সম্পর্কে কথা হলো, আমাদের মতে হদ্দে কযফের মধ্যে আল্লাহর হক প্রধান। সে হিসেবে এটাও জেনা ও মদ পানের হুকুম ও দলিলের আওতাভুক্ত। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.) এর নিকট হদ্দে কযফের মধ্যে বান্দার হক প্রধান। তাই তিনি বলেন, যদি মাকযূফ ও মাকযূফবিহি এক ও অভিন্ন হয়, তাহলে এক হদ্দই যথেষ্ট। আর যদি মাকযূফ মাযূফবিহি ভিন্ন ভিন্ন হয়, তাহলে এক হদ্দ যথেষ্ট হবে না। বরং ভিন্ন ভিন্ন একাধিক হদ্দ প্রয়োগ করা আবশ্যক হবে।

মাকযূফ যাকে অপবাদ দেওয়া হয়। অর্থাৎ অপবাদ আরোপিত ব্যক্তি। মাকযূফবিহি যে বিষয়ে অপবাদ দেওয়া হয়। যেমন- জেনা। মাকযূফ ও মাকযূফবিহি এক হওয়ার সুরত হলো- যেমন কোনো ব্যক্তি যায়েদকে অপবাদ দিল যে, তুমি অমুক নারীর সাথে জেনা করেছ একবার বা একাধিকবার। এখানে অপবাদ আরোপিত ব্যক্তি একজন যায়েদ। এক নারীর সাথে জেনা করেছে। তাই মাকযূফবিহিও একটি এমতাবস্থায় এক হদ্দ যথেষ্ট।

মাকযূফ ভিন্ন হওয়ার সুরত হলো- যেমন কেউ অপবাদ দিল যায়েদ ও আমর জেনা করেছে। এখানে দু'জনকে অপবাদ দেওয়া হয়েছে। মাকযূফ ভিন্ন ভিন্ন। তাই হদ্দও ভিন্ন ভিন্ন হবে।

মাকযূফ অভিন্ন, কিন্তু মাকযূফবিহি ভিন্ন ভিন্ন, এর সুরত হলো- কেউ যায়েদকে অপবাদ দিল যে, তুমি অমুক অমুক নারীর সাথে জেনা করেছ।

এখানে যাকে অপবাদ দেওয়া হয়েছে সে একজন অর্থাৎ যায়েদ। তাই মাকযূফ অভিন্ন। কিন্তু দু'জন নারীর সাথে জেনার কথা বলা হয়েছে। তাই মাকযূফবিহি ভিন্ন ভিন্ন। অর্থাৎ দু'টি জেনা। এ ক্ষেত্রেও ইমাম শাফেয়ী (র.) এর মতে ভিন্ন ভিন্ন দু'টি হদ্দ প্রয়োগ করতে হবে। এক হদ্দ যথেষ্ট হবে না।

মোটকথা, ইমাম শাফেয়ী (র.) এর মতে মাকযূফ ও মাকযূফবিহি ভিন্ন হলে হদ্দও ভিন্ন ভিন্ন হবে।

অন্যান্য ইমামগণের মতে তখনও এক হদ্দই যথেষ্ট হবে।

২. যদি কারো দ্বারা জেনা, অপবাদ, চুরি, মদ পান এ জাতীয় একাধিক অপরাধ সংঘটিত হয়, তাহলে প্রত্যেক অপরাধের জন্য পৃথক হদ্দ প্রয়োগ করা হবে।

কেননা এ অপরাধগুলো ভিন্ন ভিন্ন এবং প্রত্যেক অপরাধের হদ্দের উদ্দেশ্যও ভিন্ন ভিন্ন। যেমন- ব্যভিচারের হদ্দের উদ্দেশ্য হলো- বংশ পরিচয় সংরক্ষণ করা। অপবাদের হদ্দের উদ্দেশ্য হলো- মানুষের সম্ভ্রম হেফাজত করা। চুরির হদ্দের উদ্দেশ্য হলো- মানুষের ধন-সম্পদের নিরাপত্তা বিধান করা। মদ পানের হদ্দের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, মানুষের বুদ্ধি-বিবেককে ক্ষয়-ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করা। অতএব, এক হদ্দের দ্বারা অন্য হদ্দের উদ্দেশ্য হাসিল হতে পারে না, বিধায় এ ক্ষেত্রে একাধিক হদ্দ প্রয়োগ করা হবে। যেমন- কারো দ্বারা জেনা ও মদ পান দু'টি অপরাধ সংঘটিত হলো। তার উপর দু'টি হদ্দ কার্যকর হবে। কারো দ্বারা মদপান, জেনা ও চুরি তিনটি অপরাধ সংঘটিত হলো। তার উপর তিনটি হদ্দ কার্যকর হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

فَصْلٌ فِي التَّعْزِيْرِ

وَمَنْ قَذَفَ عَبْدًا اَوْ اَمَةً اَوْ اُمَّ وَلَدٍ اَوْ كَافِرًا بِالزِّنَاءِ عُزِّرَ لِاَنَّهُ جِنَايَةُ قَذْفٍ، وَقَدْ اِمْتَنَعَ وُجُوْبُ الْحَدِّ لِفَقْدِ الْاِحْصَانِ فَوَجَبَ التَّعْزِيْرُ وَكَذَا اِذَا قَذَفَ مُسْلِمًا بِغَيْرِ الزِّنَاءِ فَقَالَ يَا فَاسِقُ اَوْ يَا كَافِرُ اَوْ يَا خَبِيْثُ اَوْ يَا سَارِقُ لِاَنَّهُ اٰذَاهُ وَاَلْحَقَ الشَّيْنَ بِهٖ، وَلَا مَدْخَلَ لِلْقِيَاسِ فِي الْحُدُوْدِ فَوَجَبَ التَّعْزِيْرُ، اِلَّا اَنَّهُ يَبْلُغُ بِالتَّعْزِيْرِ غَايَتَهُ فِي الْجِنَايَةِ الْاُوْلٰى لِاَنَّهُ مِنْ جِنْسِ مَا يَجِبُ بِهِ الْحَدُّ. وَفِي الْوَجْهِ الثَّانِيَةِ : اَلرَّاْيُ اِلَى الْاِمَامِ وَلَوْ قَالَ يَا حِمَارُ اَوْ يَا خِنْزِيْرُ لَمْ يُعَزَّرْ لِاَنَّهُ مَا اَلْحَقَ الشَّيْنَ بِهٖ لِلتَّيَقُّنِ بِنَفْيِهٖ. وَقِيْلَ فِيْ عُرْفِنَا يُعَزَّرُ لِاَنَّهُ يُعَدُّ سَبًّا، وَقِيْلَ اِنْ كَانَ الْمَسْبُوْبُ مِنَ الْاَشْرَافِ كَالْفُقَهَاءِ وَالْعَلَوِيَّةِ يُعَزَّرُ لِاَنَّهُ يَلْحَقُهُمُ الْوَحْشَةُ بِذٰلِكَ، وَاِنْ كَانَ مِنَ الْعَامَّةِ لَا يُعَزَّرُ، وَهٰذَا اَحْسَنُ.

অনুচ্ছেদ : সাধারণ শাস্তির বিধান

অনুবাদ : কেউ যদি কোনো দাস বা দাসীকে কিংবা উম্মেওয়ালাদকে কিংবা কোনো কাফেরকে জেনার অপবাদ দেয় তাহলে তাকে শাস্তি দান করা হবে। কেননা এটা হলো অপবাদ আরোপের অপরাধ শুধু ইহসানের গুণ না থাকার কারণে হদ্দ সাব্যস্তকরণ রহিত হয়েছে। সুতরাং সাধারণ শাস্তি অবশ্য সাব্যস্ত হবে।

তদ্রূপ যদি কোনো মুসলমানকে জেনা ছাড়া অন্য কোনো অপবাদ আরোপ করে, যেমন বলল, হে ফাসেক কিংবা হে কাফের। কিংবা হে খবীস, কিংবা হে চোর। কেননা এ কথা বলে সে তাকে কষ্ট দিয়েছে এবং তার ব্যক্তিত্বে কলঙ্ক আরোপ করেছে। আর হদ্দ সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে কিয়াসের কোনো দখল নেই। সুতরাং এ সকল ক্ষেত্রে সাধারণ শস্তিদান সাব্যস্ত হবে।

তবে প্রথম অপবাদটির ক্ষেত্রে (অর্থাৎ ইহসানবিহীন লোককে জেনার অপবাদের (ক্ষেত্রে) চরম পর্যায়ের তা'যীর করা হবে। কেননা তা ঐ শ্রেণির অপরাধ যা দ্বারা হদ্দ সাব্যস্ত হয়। আর দ্বিতীয় অপরাধের ক্ষেত্রে শাস্তি শাসকের বিবেচনাধীন।

আর যদি বলে হে গর্দভ! কিংবা হে শূকর! তাহলে তা'যীর করা হবে না। কেননা এর দ্বারা তার চরিত্রে কলঙ্ক লাগেনি। কথাটির অবাস্তবতা নিশ্চিত হওয়ার কারণে। কেউ কেউ বলেন, আমাদের পরিবেশ যেহেতু এটাকে গালি মনে করা হয়, সেহেতু তা'যীর করা হবে।

আর কেউ কেউ বলেন, যাকে গালি দেওয়া হয়েছে, তিনি যদি বিশেষ মর্যাদা সম্পন্ন হন, যেমন ফকীহ আলেম ও সৈয়দ, তাহলে শাস্তি প্রদান করা হবে। কেননা এ ধরনের কথায় তাদেরকে অস্বস্তিকর অবস্থায় ফেলা হয়। আর যদি সাধারণ স্তরের লোক হয়, তাহলে শাস্তি প্রদান করা হবে না। এই ব্যাখ্যাই উত্তম।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

اَلتَّعْزِيْرُ শব্দটি (ع - ز - ر) ধাতু হতে উৎপন্ন। অর্থ হলো– তিরস্কার করা, ধমক দেওয়া, শাস্তি দেওয়া ইত্যাদি। যেসব অপরাধের শাস্তি কুরআন সুন্নাহ হতে নির্ধারিত করা হয়নি; বরং ইমাম বা কাজির উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তারা সেগুলো ব্যক্তি, অবস্থা ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে নির্ধারণ করে থাকেন। এ জাতীয় শাস্তিকে শরিয়তের পরিভাষায় তা'যীর বলা হয়।

https://e-ilm.weebly.com/

তা'যীর কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত একটি বিষয়। যেমন- কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- وَالّٰتِى تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ -অর্থাৎ তোমরা যাদের অবাধ্যতার ভয় কর, তাদের উপদেশ দাও, বিছানা ত্যাগ কর এবং তাদের প্রহার কর। -[সূরা নিসা, আয়াত নং ৩৪]

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে- لَا تَرْفَعْ عَصَاكَ عَنْ أَهْلِكَ তুমি নিজ পরিবার পরিজন হতে শাসনের দণ্ড উঠিয়ে নিও না। বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে তা'যীর করেছিলেন, অন্য কে মুখান্নাস বলার কারণে। তা'যীর বিষয়ে সাহাবায়ে কেরামের ইজমাও প্রতিষ্ঠিত আছে।

শামসুল আইম্মাহ সারাখসী হতে বর্ণিত আছে যে, তা'যীরের কোনো সীমা বা পরিমাণ নির্ধারিত নেই। বরং এর ধারণা পরিমাণ সবই শাসকের বিবেচনার উপর সমর্পিত। তা'যীরের উদ্দেশ্য হলো সাবধান করা। মানুষের অবস্থা ভেদে এর ধরনও বিভিন্ন হতে পারে। কিছু লোকের ক্ষেত্রে মুখের কথাই যথেষ্ট হয়ে থাকে। কাউকে চপেটাঘাতের প্রয়োজন হয়। কাউকে আরো কিছু করার প্রয়োজন হয়। শাসক তার বিচক্ষণতার আলোকে যখন যে ব্যবস্থা প্রয়োজন তখন তাই গ্রহণ করবেন।

وَكَذَا إِذَا قَذَفَ مُسْلِمًا بِغَيْرِ الخ : কেউ যদি কোনো মুসলমানকে বলে, হে ফাসেক! হে কাফের! হে খবীস! হে চোর! হে নাসরানী! হে লুতী! হে সুদখোর! হে ঘোষখোর! হে মদ্যপায়ী! হে দায়ূস! হে ফাজের! হে বদমাশ! হে মুনাফিক ইত্যাদি, তাহলে তাকে তা'যীর করা হবে।

কারণ এসব কথার মাধ্যমে তাকে কষ্ট দেওয়া হয় এবং তাকে কলঙ্কিত করা হয়। এই হিসাবে এসব কথার প্রায়শ্চিত্ত হওয়া উচিত। কিন্তু এসব কথা বা অপরাধের কোনো শাস্তি কুরআন সুন্নাহতে নির্ধারিত নেই। অপর দিকে হদ্দ নির্ধারণের বিষয়ে কিয়াসেরও কোনো দখল নেই। তাই বলতে হয়, এসব অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত তা'যীর ছাড়া ভিন্ন কিছু নয়।

পূর্বেই বলা হয়েছে, ব্যক্তি, অপরাধ, পরিবেশ বিবেচনা করে তা'যীরের ধরন ও পরিমাণ বিভিন্ন হতে পারে। সে অনুযায়ী কেউ যদি এহসানবিহীন ব্যক্তিকে জেনার অপবাদ দেয়, তাহলে তার শাস্তিটি কঠিন হবে। কেননা জেনার অপবাদ একটি কঠিন অপরাধ। যার দ্বারা হদ্দ সাব্যস্ত হয়ে থাকে। এখানে অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তি মুহসান না হওয়ার কারণে হদ্দ আসছে না। কিন্তু এতে মূল অপরাধের ভয়াবহতা হ্রাস পায়নি। অতএব, এর তা'যীর অন্যান্য তা'যীর অপেক্ষা কঠিন হওয়াই সমীচীন।

তবে হে কাফের! হে ফাসেক! হে চোর ইত্যাদি বলার তা'যীর শাসকের বিবেচনাধীন। তিনি যাকে সে পরিমাণ সঙ্গত মনে করেন তা'যীর করবেন।

قوله وَلَوْ قَالَ يَا حِمَارُ أَوْ يَا خِنْزِيرُ الخ :যদি কেউ অন্যকে বলে হে গাধা! হে গরু! হে শূকর! হে কুকুর! হে বিড়াল! ইত্যাদি তাহলে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে না। কেননা এ কথাগুলো যাকে বলা হলে সে যে মানুষ, তা চোখেই দেখা যাচ্ছে। তাই এসব কথার কথা মিথ্যাবাদী হওয়া সুনিশ্চিত। অতএব, তার কথার দ্বারা যাকে বলা হয়েছে তার চরিত্রে কোনো কলঙ্ক আসবে না বিধায় কথককে শাস্তি দেওয়া হবে না।

আল্লামা হিন্দাওয়ানী (র.) বলেছেন, এসব কথাকে আমাদের পরিবেশে গালি মনে করা হয়। অতএব, কেউ কাউকে এসব কথা বললে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে।

কতিপয় ফকীহ বলেছেন, বিষয়টি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। পূর্বোক্ত ধরনের কথা যদি কোনো আলেম ফকীহ বা সৈয়দ বংশীয় লোককে বলা হয়, তাহলে কথককে শাস্তি প্রদান করা হবে। কেননা এ শ্রেণির লোকদেরকে এরূপ কথা বলে চরম বিব্রতকর পরিস্থিতির শিকার করা হয়ে থাকে। বিধায় এর শাস্তি হবে। সাধারণ লোককে বলা হলে, তেমন কিছু মনে করা হয় না। তাই এ ক্ষেত্রে শাস্তি হবে না। গ্রন্থকার বলেন, ব্যাখ্যা সাপেক্ষ মতটিই সর্বোত্তম।

তাহলে পূর্বোক্ত মাসআলায় তিনটি মাযহাব হলো। ১. কোনো অবস্থাতেই তা'যীর করা হবে না। এটা জাহেরুর রেওয়ায়েত। ২. সর্বাবস্থায় তা'যীর করা হবে। এটা হিন্দাওয়ানীর মত। ৩. সম্ভ্রান্ত শ্রেণির তা'যীর হবে। সাধারণ ক্ষেত্রে তা'যীর হবে না। এটা গ্রন্থকারের পছন্দনীয় মত।

https://e-ilm.weebly.com/

وَالتَّعْزِيْرُ اَكْثَرُهُ تِسْعَةٌ وَّثَلَاثُوْنَ سَوْطًا وَاَقَلُّهُ ثَلَاثُ جَلَدَاتٍ. وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ : يَبْلُغُ التَّعْزِيْرُ خَمْسَةً وَّسَبْعِيْنَ سَوْطًا. وَالْاَصْلُ فِيْهِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ﴿مَنْ بَلَغَ حَدًّا فِيْ غَيْرِ حَدٍّ فَهُوَ مِنَ الْمُعْتَدِيْنَ﴾ وَاِذَا تَعَذَّرَ تَبْلِيْغُهُ حَدًّا فَاَبُوْ حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٌ نَظَرَا اِلَى اَدْنَى الْحَدِّ وَهُوَ حَدُّ الْعَبْدِ فِي الْقَذْفِ فَصَرَفَاهُ اِلَيْهِ وَذٰلِكَ اَرْبَعُوْنَ سَوْطًا فَنَقَصَا مِنْهُ سَوْطًا. وَاَبُوْ يُوْسُفَ اِعْتَبَرَ اَقَلَّ الْحَدِّ فِي الْاَحْرَارِ اِذِ الْاَصْلُ هُوَ الْحُرِّيَّةُ ثُمَّ نَقَصَ سَوْطًا فِيْ رِوَايَةٍ عَنْهُ، وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ وَهُوَ الْقِيَاسُ، وَفِيْ هٰذِهِ الرِّوَايَةِ نَقَصَ خَمْسَةً وَهُوَ مَاْثُوْرٌ عَنْ عَلِيٍّ فَقَلَّدَهُ ثُمَّ قَدَّرَ الْاَدْنٰى فِي الْكِتَابِ بِثَلَاثِ جَلَدَاتٍ لِاَنَّ مَا دُوْنَهَا لَا يَقَعُ بِهِ الزَّجْرُ، وَذَكَرَ مَشَايِخُنَا اَنَّ اَدْنَاهُ عَلٰى مَا يَرَاهُ الْاِمَامُ فَيُقَدِّرُ بِقَدْرِ مَا يَعْلَمُ اَنَّهُ يَنْزَجِرُ لِاَنَّهُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ النَّاسِ.

অনুবাদ : তা'যীরের সর্বোচ্চ পরিমাণ হলো উনচল্লিশটি বেত্রাঘাত। আর সর্বনিম্ন পরিমাণ হলো তিনটি বেত্রাঘাত। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, তা'যীর পঁচাত্তরটি বেত্রাঘাত পর্যন্ত হতে পারে। এ বিষয়ের মূলভিত্তি হলো নবী করীম ﷺ -এর বাণী- مَنْ بَلَغَ حَدًّا فِيْ غَيْرِ حَدٍّ فَهُوَ مِنَ الْمُعْتَدِيْنَ অর্থাৎ হদ্দের ক্ষেত্র ছাড়া যে ব্যক্তি হদ্দের পরিমাণে উপনীত হয় সে সীমালঙ্ঘনকারী।

যব যখন হদ্দের পরিমাণে উপনীত হওয়া অসম্ভব হলো তখন ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) লক্ষ্য করলেন সর্বনিম্ন হদ্দের প্রতি। আর তা হলো গোলামের উপর প্রয়োগযোগ্য হদ্দে কযফ (৪০ বেত)। সুতরাং হাদীসকে তার সে দিকেই ফিরিয়েছেন। যার পরিমাণ হলো চল্লিশ দোররা। অতঃপর তা হতে একটি দোররা হ্রাস করেছেন।

পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) স্বাধীন লোকদের সর্বনিম্ন হদ্দ বিবেচনা করেছেন। কেননা স্বাধীন হওয়াই (মানুষের ক্ষেত্রে) মূল অবস্থা অতঃপর এক বর্ণনা অনুযায়ী তা হতে এক দোররা হ্রাস করেছেন এবং এটা ইমাম যুফার (র.)-এরও অভিমত। কিয়াসের দাবিও এটা।

পক্ষান্তরে আলোচ্য বর্ণনায় পাঁচটি দোররা হ্রাস করা হয়েছে। এটা হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে। তাই তিনি তার অনুসরণ করেছেন। অতঃপর এ গ্রন্থে বলা হয়েছে তা'যীরের নিম্ন পরিমাণ তিনটি বেত্রাঘাত। কেননা এর চেয়ে কমে সতর্কীকরণ হয় না। আমাদের মাশায়েখগণ উল্লেখ করেছেন যে, তা'যীরের সর্বনিম্ন পরিমাণ নির্ধারিত হবে শাসকের বিবেচনা অনুযায়ী। তিনি যে পরিমাণ দ্বারা সতর্কীকরণ সম্পন্ন হবে বলে মনে করবেন। সে পরিমাণই নির্ধারণ করবেন। কেননা মানুষের ভিন্নতার কারণে তা ভিন্ন হয়ে থাকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিউক্ত মতনে তা'যীরের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন পরিমাণ ইমামগণের মাঝে মতভেদ ও দালায়েল সহ আলোচিত হয়েছে।

সর্বোচ্চ পরিমাণ প্রসঙ্গ : তা'যীরের সর্বোচ্চ পরিমাণ নিয়ে ইমামগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে।

১. ইমাম আবূ হানীফা ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে সর্বোচ্চ পরিমাণ উনচল্লিশ দোররা।
২. ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম যুফার (র.)-এর মতে সর্বোচ্চ পরিমাণ পঁচাত্তর দোররা।
৩. ইমাম মালেক (র.)-এর মতে সর্বোচ্চ পরিমাণের কোনো সীমা নির্ধারিত নেই। ইমাম ইচ্ছা করলে এবং উপযুক্ত মনে করলে হদ্দের সীমাও অতিক্রম করতে পারবে।

প্রথম মাযহাবের দলিল : নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন- مَنْ بَلَغَ حَدًّا فِيْ غَيْرِ حَدٍّ فَهُوَ مِنَ الْمُعْتَدِيْنَ অর্থাৎ যে ব্যক্তি হদ্দের ক্ষেত্র ছাড়া হদ্দের সীমায় উপনীত হয় সে সীমালঙ্ঘনকারী।

https://e-ilm.weebly.com/

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় তা'যীর কখনো হদ্দের সীমায় উন্নীত হতে পারে না। তাই ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.) লক্ষ্য করলেন সর্বনিম্ন হদ্দ কোনটি? দেখা গেল সর্বনিম্ন হদ্দ হলো গোলামের হদ্দে কযফ। অর্থাৎ কোনো গোলাম কারো উপর জেনার অপবাদ দিলে গোলামের উপর যে হদ্দ আসে, তাই সর্বনিম্ন হদ্দ। যার পরিমাণ হলো চল্লিশ দোররা। তাই এর থেকে এক দোররা কমিয়ে উনচল্লিশ দোররা নির্ধারণ করলেন তা'যীরের সর্বোচ্চ পরিমাণ, যাতে তা'যীর হদ্দের সীমায় উন্নীত না হয়, বর্ণিত হাদীসের আলোকে।

দ্বিতীয় মাযহাবের দলিল : مَنْ بَلَغَ حَدًّا فِيْ غَيْرِ حَدٍّ فَهُوَ مِنَ الْمُعْتَدِيْنَ ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) লক্ষ্য করলেন, স্বাধীন মানুষের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন হদ্দ কোনটি? কেননা স্বাধীন হওয়াই মানুষর প্রকৃত অবস্থা। তো দেখা গেল স্বাধীন মানুষের সর্বনিম্ন হদ্দ হলো হদ্দে কযফ, যার পরিমাণ হলো আশি দোররা। তাই তিনি আশি দোররা হতে এক দোররা কমিয়ে মত পেশ করলেন তা'যীয়ের সর্বোচ্চ পরিমাণ হবে উনাশি দোররা। এটা কিয়াসের দাবি। কেননা হদীসের আলোকে হদ্দ ও তা'যীরের মাঝে পার্থক্য হওয়া কাম্য। আর এ পার্থক্য এক দোরা কমালেই হয়ে যায়। সে হিসাবে ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম যুফারের এক রেওয়ায়েত হলো উনাশি দোররা।

পরে দেখতে পেলেন হযরত আলী (রা.) হতে পঁচাত্তর দোরা বর্ণিত আছে। তখন তিনি উক্ত রেওয়ায়েতের অনুসরণ করে পঁচাত্তর দোররার মতো পেশ করেন।

তৃতীয় মাযহাবের দলিল : ইমাম মালেক (র.) দলিল পেশ করেন মুসনাদে আহমদ ও বায়হাকীতে বর্ণিত একটি হাদীস দ্বারা হাদীসটি এই যে, মা'আন ইবনে যায়েদাহ নামক জনৈক ব্যক্তি বাইতুল মালের সীল-মোহরের আদলে একটি সীল বানিয়ে সেটি বাইতুল মালের রক্ষীকে দেখিয়ে বাইতুল মাল হতে অনেক সম্পদ বের করে নিয়ে যায়। অতঃপর এ সংবাদ হযরত ওমর (রা.) পর্যন্ত পৌঁছলে তিনি তাকে একশত বেত্রাঘাত করেন এবং বন্দী করে রাখেন। পুনরায় তাকে একশত বেত্রাঘাত করেন।

মুসনাদে আহমদে আরো বর্ণিত আছে যে, জনৈক নাজ্জাশী কবি রমজান মাসে মদপান করেছে। হযরত আলী (রা.) তাকে মদ পানের দায়ে আশি দোররা লাগান এবং রমজানে রোজা ভঙ্গের দায়ে বিশ দোররা লাগান।

এসব রেওয়ায়েত দ্বারা বুঝা যায়, হদ্দের কোনো সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারিত নেই।

আহনাফের পক্ষ হতে ইমাম মালেকের দলিলের জবাব : প্রথম হাদীসটি সম্পর্কে বলব যে, মা'আন ইবনে যায়েদাহ কয়েকটি অপরাধ করেছিল। যেমন প্রথমত সে সরকারি সীল নকল করেছে। দ্বিতীয়ত বাইতুল মাল হতে সম্পদ নিয়ে গেছে অন্যায়ভাবে। তৃতীয়ত সে এই অপকর্মের দ্বার খুলেছে। তাই হযরত ওমর (রা.) তার একাধিক অপরাধের প্রতি লক্ষ্য করে তাকে একাধিক তা'যীর করেছেন। দ্বিতীয় হাদীসটির জবাবে বলব, নাজ্জাশী কবিকে হযরত আলী (রা.) আশি দোররা লাগিয়েছিলেন মদপানের কারণে। আর বিশ দোররা লাগিয়েছিলেন তা'যীর স্বরূপ।

তা'যীরের নিম্নসীমা প্রসঙ্গ : তা'যীরের নিম্নসীমা সম্পর্কেও একাধিক বর্ণনা রয়েছে–

১. তিনটি বেত্রাঘাত এটি কুদূরীর রেওয়ায়েত।

২. শাসকের বিবেচনায় সম্পত্তি। তিনি যুতটুকু উপযুক্ত মনে করেন, ততটুকুই করতে পারেন। এটি ইমাম আবূ হানীফা (র.) হতে এক বর্ণনা। যা মাশায়েখগণ জামে সাগীরের ব্যাখ্যা গ্রন্থসমূহে উল্লেখ করেছেন।

৩. ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) হতে বর্ণিত আছে অপরাধের গুরুত্ব ও লঘুত্ব বিবেচনা করে তা'যীর নির্ধারিত হবে। সমশ্রেণির হদ্দের নিকটবর্তী হবে।

প্রথম মতের পক্ষে যুক্তি হলো এই যে, তা'যীরের উদ্দেশ্য হলো সতর্কীকরণ। আর তিন বেতের কমে সাধারণত সতর্কীকরণ হয় না। তাই তা'যীরের নিম্ন পরিমাণ তিন বেত্রাঘাত নির্ধারিত হবে।

দ্বিতীয় মতের পক্ষে যুক্তি হলো এই যে সমাজের মানুষ নানা ধরনের হয়ে থাকে। কেউ অল্পেই সাবধান হয়ে যায়। কেউ অনেক কিছুতেও সাবধান হয় না। বিধায় বিষয়টি শাসকের বিবেচনার উপর সমর্পণ করাই ভালো। তিনি যখন যার ক্ষেত্রে যতটুকু করা উপযুক্ত মনে করেন, তখন তার ক্ষেত্রে ততটুকুই করবেন। যাতে তা'যীরের প্রকৃত উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হয়।

তৃতীয় মতের পক্ষে বলা যায়, তা'যীর হলো অপরাধ দমনের জন্য। অতএব অপরাধের ভয়াবহতার আধিক্য ও স্বল্পতার দিকে লক্ষ্য রেখেই তা'যীর হওয়া উচিত। অপরাধটি যদি এমন কোনো অপরাধের সমশ্রেণির হয়, যার জন্য হদ্দ আছে, তাহলে উক্ত অপরাধের তা'যীরটি সেই হদ্দের কাছাকাছি হবে। যেমন– জেনার হদ্দ আছে একশত দোররা। এখন অন্যায়ভাবে চুমু দেওয়ার তা'যীরটিও একশত দোররার কাছাকাছি হবে। যেহেতু জেনা ও চুমু এক ধারাবাহিকতার অপরাধ। অর্থাৎ উভয়ই যৌনতা সংক্রান্ত অপরাধ। উল্লেখ্য যে, তৃতীয় মতটি দ্বিতীয় মতেরই প্রায় অনুরূপ।

https://e-ilm.weebly.com/

وَعَنْ اَبِيْ يُوْسُفَ اَنَّهُ عَلٰى قَدْرِ عِظَمِ الْجُرْمِ وَصِغَرِهٖ، وَعَنْهُ اَنْ يُقَرَّبَ كُلُّ نَوْعٍ مِنْ بَابِهٖ؛ فَيُقَرَّبُ اللَّمْسُ وَالْقُبْلَةُ مِنْ حَدِّ الزِّنَا، وَالْقَذْفُ بِغَيْرِ الزِّنَاءِ مِنْ حَدِّ الْقَذْفِ. قَالَ وَاِنْ رَاَى الْاِمَامُ اَنْ يَضُمَّ اِلَى الضَّرْبِ فِي التَّعْزِيْرِ الْحَبْسَ فَعَلَ لِاَنَّهُ صَلُحَ تَعْزِيْرًا وَقَدْ وَرَدَ الشَّرْعُ بِهٖ فِي الْجُمْلَةِ حَتّٰى جَازَ اَنْ يَكْتَفِيَ بِهٖ فَجَازَ اَنْ يُضَمَّ اِلَيْهِ، وَلِهٰذَا لَمْ يُشْرَعْ فِي التَّعْزِيْرِ بِالتُّهْمَةِ قَبْلَ ثُبُوْتِهٖ كَمَا شُرِعَ فِي الْحَدِّ لِاَنَّهُ مِنَ التَّعْزِيْرِ قَالَ وَاَشَدُّ الضَّرْبِ التَّعْزِيْرُ لِاَنَّهُ جَرَى التَّخْفِيْفُ فِيْهِ مِنْ حَيْثُ الْعَدَدِ فَلَا يُخَفَّفُ مِنْ حَيْثُ الْوَصْفِ كَيْ لَا يُؤَدِّيَ اِلٰى فَوَاتِ الْمَقْصُوْدِ، وَلِهٰذَا لَمْ يُخَفَّفْ مِنْ حَيْثُ التَّفْرِيْقِ عَلَى الْاَعْضَاءِ قَالَ ثُمَّ حَدُّ الزِّنَا لِاَنَّهُ ثَابِتٌ بِالْكِتَابِ، وَحَدُّ الشُّرْبِ ثَبَتَ بِقَوْلِ الصَّحَابَةِ، وَلِاَنَّهُ اَعْظَمُ جِنَايَةً حَتّٰى شُرِعَ فِيْهِ الرَّجْمُ ثُمَّ حَدُّ الشُّرْبِ لِاَنَّ سَبَبَهُ مُتَيَقَّنٌ بِهٖ ثُمَّ حَدُّ الْقَذْفِ لِاَنَّ سَبَبَهُ مُحْتَمِلٌ لِاحْتِمَالِ كَوْنِهٖ صَادِقًا وَلِاَنَّهُ جَرَى فِيْهِ التَّغْلِيْظُ مِنْ حَيْثُ رَدِّ الشَّهَادَةِ فَلَا يُغَلَّظُ مِنْ حَيْثُ الْوَصْفِ.

অনুবাদ : ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, অপরাধের গুরুত্ব ও লঘুত্ব অনুযায়ী তা'যীরের পরিমাণ নির্ধারণ করা হবে। তার থেকে আরেকটি বর্ণনা আছে যে, প্রতিটি অপরাধের শাস্তি সেই শ্রেণির হদ্দের নিকটবর্তী হবে। সুতরাং স্পর্শ, চুম্বন ইত্যাদির শাস্তি জেনার হদ্দের নিকটবর্তী হবে এবং জেনা ছাড়া অন্য অপবাদের শাস্তি হদ্দে কযফের নিকটবর্তী হবে।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, শাসক যদি তা'যীরের ক্ষেত্রে প্রহারের সাথে সাথে জেলে দেওয়া সঙ্গত মনে করেন, তাহলে তাও করতে পারেন। কেননা এককভাবেও এটা তা'যীর হওয়ার যোগ্য এবং সামগ্রিকভাবে এর পক্ষে শরিয়তের অনুমোদন রয়েছে। এমন কি শুধু জেলে দেওয়ার উপর ক্ষান্ত থাকাও জায়েজ আছে। সুতরাং প্রহারের সাথে সেটাকে যুক্ত করাও জায়েজ। আর যেহেতু আটকাবস্থা এককভাবে শাস্তি হওয়ার যোগ্য সেহেতু যে অপরাধে তা'যীর সাব্যস্ত হয়, সেটা প্রমাণিত হওয়ার পূর্বে আটক রাখা যায় না। হদ্দের ক্ষেত্রে যেমন প্রমাণিত হওয়ার পূর্বে আটক রাখা যায়। কেননা এটা তা'যীর বা সাধারণ শাস্তি হওয়ার যোগ্য।

গ্রন্থকার বলেন, **সর্বাধিক শক্ত প্রহার হবে তা'যীরের প্রহার।** কেননা তা'যীরের ক্ষেত্রে সংখ্যার দিক থেকে শিথিলতা করা হয়েছে। সুতরাং গুণগত দিক থেকে শিথিলতা করা হবে না। যেন তা'যীরের উদ্দেশ্যই হারিয়ে না যায়। এ কারণেই বিভিন্ন অঙ্গে প্রহার বিক্ষিপ্ত করার মাধ্যমেও লঘুতা আনা হয়নি। –[তা'যীরের ক্ষেত্রে]

অতঃপর অপেক্ষাকৃত প্রহার হলো জেনার হদ্দ। কেননা জেনার হদ্দ কুরআন দ্বারা প্রমাণিত। পক্ষান্তরে মদপানের হদ্দ সাব্যস্ত হয়েছে সাহাবায়ে কেরামের উক্তি দ্বারা। তাছাড়া এটা হলো গুরুতর অপরাধ। এ কারণে শরিয়ত কর্তৃক এতে রজমও প্রবর্তিত হয়েছে।

অতঃপর অপেক্ষাকৃত শক্ত প্রহার হলো মদ পানের হদ্দ। কেননা এর কারণ নিশ্চিত। **অতঃপর অপেক্ষাকৃত শক্ত প্রহার হলো হদ্দে কযফ।** কেননা এর কারণটি সন্দেহপূর্ণ অপবাদদাতা সত্যবাদী হওয়ার সম্ভাবনা থাকার কারণে। তাছাড়া এ ক্ষেত্রে সাক্ষ্যদান যোগ্যতা রদ্দ করার মাধ্যমে কঠোরতা করা হয়েছে। সুতরাং প্রহারের গুণগত দিক থেকে কঠোরতা করা হবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শাসক যদি ভালো মনে করেন তাহলে তা'যীর হিসেবে প্রহারের পাশাপাশি জেলেও দিতে পারেন। জেলে দেওয়ার বিষয়টি শরিয়তে অনুমোদিত আছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে শুধু জেলেই শাস্তি হয়ে থাকে। তাই একে অন্য শাস্তির সাথে মিলানোও জায়েজ হবে।

বর্ণিত আছে, একবার রাসূল ﷺ জনৈক ব্যক্তিকে অপরাধী হওয়ার সম্ভাবনায় বন্দি করেছিলেন। পরে তাকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। জেল একটি পূর্ণাঙ্গ শাস্তি। এর প্রমাণ হলো এই যে, তা'যীরের অপরাধীকে তার অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার পূর্বে জেল দেওয়া যায় না। কারণ তা'যীরের অপরাধীকে অপরাধ প্রমাণের পূর্বে জেলে দিলে, অপরাধ প্রমাণ করা ছাড়াই শাস্তি দেওয়া হয়ে যায়। যা শরিয়তে জায়েজ নেই।

পক্ষান্তরে হদ্দের অপরাধী ব্যক্তিকে তার অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার পূর্বে জেলে দেওয়া যায়। কেননা তার শাস্তি হলো হদ্দ, জেল দেওয়া হলে তাকে অপরাধ প্রমাণের পূর্বে শাস্তি দেওয়া হয় না।

وَأَشَدُّ الضَّرْبِ التَّعْزِيْرُ الخ : শরিয়ত নির্ধারিত সকল হদ্দ ও তা'যীরের প্রহার সমান কঠোর বা সমান হালকা নয়। কতগুলোর প্রহার কঠিন আর কতগুলোর প্রহার তুলনামূলক হালকা। উপরিউক্ত ইবারতে এ প্রসঙ্গে আলোচনা আরম্ভ হয়েছে।

তাই গ্রন্থকার বলেন, সর্বাধিক শক্ত ও কঠোর হবে তা'যীরের প্রহার। তারপর হদ্দে জেনার প্রহার। তারপর হদ্দে শুরবের প্রহার। তারপর হদ্দে কযফের প্রহার।

তা'যীরের প্রহার সর্বাধিক কঠোর বা শক্ত হওয়ার কারণ হলো, তা'যীরের বিষয়টিকে সংখ্যাগত দিক থেকে হালাকা করে রাখা হয়েছে। অর্থাৎ তা'যীরের প্রহার সংখ্যার সর্বাধিক স্বল্প। এখন যদি গুণগতভাবেও হালকা করে দেওয়া হয়, তাহলে তা'যীরের উদ্দেশ্যই ব্যাহত হবে। এ কারণে গুণগতভাবে হালাকা করা যাবে না। বরং তিন বেত বা পাঁচ বেত কিংবা দশ বেত, যতটুকুও লাগানো হয়, শক্ত করে লাগিয়ে দেওয়া হবে।

যেন অপরাধী ব্যক্তি সাবধান হয়ে যায়। এ উদ্দেশ্যেই সবগুলো বেত শরীরের এক স্থানে লাগানোর বিধান রয়েছে। অল্প কয়েকটি বেত যদি বিক্ষিপ্ত করে লাগানো হয়, তাহলেও সতর্কীকরণ ব্যাহত হবে। তাই একস্থানে লাগাতে হবে।

ثُمَّ حَدُّ الزِّنَا لِأَنَّهُ الخ : তা'যীরের প্রহারের পর তুলনামূলক শক্ত প্রহার হলো, হদ্দে জেনার প্রহার। এ ক্ষেত্রে অনুসৃত বিষয় হলো, দলিলের মজবুতি ও দুর্বলতা। যে হদ্দের দলিল শক্তিশালী, সে হদ্দও কঠোর। যে হদ্দের দলিল তুলনামূলক দুর্বল, সে হদ্দও তুলনামূলক দুর্বল।

সে হিসেবে জেনার হদ্দ যেহেতু কুরআন দ্বারা প্রমাণিত, সেহেতু তার প্রহারও শক্ত হবে। তাছাড়া এ হদ্দের কারণটিও অনেক গুরুতর অপরাধ। যে কারণে তার শাস্তি হিসাবে রজমও রয়েছে।

অতঃপর তুলনামূলক কম কঠোর হলো মদ পানের হদ্দ। কেননা সেটা তুলনামূলক দুর্বল দলিল দ্বারা প্রমাণিত। অর্থাৎ সাহাবীদের ইজমা দ্বারা।

তারও অপেক্ষা কম কঠোর হলো হদ্দে কযফ। কারণ হদ্দে কযফের অনুসঙ্গটি সন্দেহপূর্ণ থাকে, অপবাদদাতা সত্যবাদী হওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যমান হওয়ার কারণে। তাছাড়া হদ্দে কযফের অংশ হিসাবে সাক্ষ্যদান ক্ষমতাও রহিত হয়ে যায়। এদিক বিবেচনায় তার মাঝে এক প্রকার কঠোরতা আছে। বিধায় প্রহারটা তত কঠোর করা হবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

وَمَنْ حَدَّهُ الْإِمَامُ أَوْ عَزَّرَهُ فَمَاتَ فَدَمُهُ هَدَرٌ لِأَنَّهُ فَعَلَ مَا فَعَلَ بِأَمْرِ الشَّرْعِ، وَفِعْلُ الْمَأْمُوْرِ لَا يَتَقَيَّدُ بِشَرْطِ السَّلَامَةِ كَالْفَصَّادِ وَالْبَزَّاغِ، بِخِلَافِ الزَّوْجِ إِذَا عَزَّرَ زَوْجَتَهُ لِأَنَّهُ مُطْلَقٌ فِيْهِ، وَالْإِطْلَاقَاتُ يَتَقَيَّدُ بِشَرْطِ السَّلَامَةِ كَالْمُرُوْرِ فِي الطَّرِيْقِ .وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : تَجِبُ الدِّيَةُ فِيْ بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَّ الْإِتْلَافَ خَطَأٌ فِيْهِ، إِذِ التَّعْزِيْرُ لِلتَّأْدِيْبِ غَيْرَ أَنَّهُ تَجِبُ الدِّيَةُ فِيْ بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَّ نَفْعَ عَمَلِهِ يَرْجِعُ إِلَى عَامَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ فَيَكُوْنُ الْغُرْمُ فِيْ مَالِهِمْ . قُلْنَا لَمَّا اسْتَوْفَى حَقَّ اللّٰهِ تَعَالَى بِأَمْرِهِ صَارَ كَأَنَّ اللّٰهَ أَمَاتَهُ مِنْ غَيْرِ وَاسِطَةٍ فَلَا يَجِبُ الضَّمَانُ.

অনুবাদ : শাসক যার উপর হদ্দ কায়েম করেন কিংবা যাকে তা'যীর করেন এবং এর ফলে সে মারা যায় তার খুন মাফ (দণ্ডহীন)। কেননা তিনি যা করেছেন শরিয়তের আদেশে করেছেন। আর আদিষ্ট ব্যক্তির কর্ম নিরাপত্তার শর্তে শর্তায়িত নয়। যেমন রক্ত মোক্ষণকারীও অশ্ব চিকিৎসাকারী। পক্ষান্তরে স্বামীকর্তৃক স্ত্রীকে তা'যীর করার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা সে আদিষ্ট নয়। বরং ইচ্ছাধিকার প্রাপ্ত। আর ইচ্ছাধিকারপূর্ণ কাজ নিরাপত্তার শর্তে শর্তায়িত। যেমন রাস্তায় চলাচলের ক্ষেত্রে চলার সময় যদি কিছু নষ্ট করে ফেলে তাহলে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়।

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, বাইতুল মাল হতে দিয়ত আদায় করা ওয়াজিব। কেননা এ ক্ষেত্রে প্রাণনাশ করা হলো ভুল। কারণ তা'যীর হচ্ছে শাসনের জন্য। তবে দিয়াতের দায় বাইতুল মালের উপর হওয়ার কারণ হলো এই যে, তার কর্মের সুফল সাধারণ মুসলমানদের দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়। সুতরাং ক্ষতিপূরণ তাদের মাল থেকেই হবে। আমাদের বক্তব্য এই যে, তিনি আল্লাহর আদেশে আল্লাহর হক উসূল করেছেন। সুতরাং বিষয়টি এমন হলো, যেন আল্লাহ তা'আলা মাধ্যম ছাড়া স্বয়ং তাকে মেরেছেন। সুতরাং ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শরয়ী বিধান মতে শাসক যদি কারো উপর হদ্দ বা তা'যীর প্রয়োগ করে এবং হদ্দ বা তা'যীর ভোগ করতে গিয়ে লোকটি মারা যায় তাহলে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে কি না? এ নিয়ে ইমামগণের মতভেদ রয়েছে।

১. আহনাফ, ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) এর মতামত হলো– হদ্দ বা তা'যীর কায়েম করার সময় ব্যক্তি মারা গেলে কারো উপর কোনো ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব নয়।

২. ইমাম শাফেয়ী (র.) এর মত হলো, দিয়াত ওয়াজিব হবে এবং এর দায় বর্তাবে এক বর্ণনা অনুযায়ী ইমামের আকেলার উপর। আরেক বর্ণনা অনুযায়ী বাইতুল মালের উপর।

দলিল : ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব না হওয়ার বিষয়ে আহনাফ ও তাদের সমমনা ইমামগণের দলিল হলো এই যে, কাজি বা শাসক যা করেছে তা শরিয়তের আদেশক্রমে করেছে। আর কেউ যখন কোনো কাজ যথার্থ কর্তৃপক্ষের আদেশক্রমে করে, তখন সে উক্ত কাজ করার ক্ষেত্রে এ শর্তে আবদ্ধ হয় না যে, কাজের ক্ষেত্রটি নিরাপদ থাকতে হবে। যেমন কোনো ঘোড়ার মালিক যদি ঘোড়া-চিকিৎসককে আদেশ করে ঘোড়ার পায়ে শিঙ্গা লাগানোর জন্য এবং চিকিৎসক কর্তৃক শিঙ্গা লাগাতে গিয়ে যদি ঘোড়া মারা যায় তাহলে এর জন্য চিকিৎসক দায়ী হয় না। তদ্রূপ এখানেও কাজি আল্লাহ কর্তৃক আদিষ্ট হয়েছে হদ্দ লাগানোর জন্য। অতএব হদ্দ লাগাতে গিয়ে আক্রান্ত ব্যক্তি মারা গেলে কাজি দায়ী হবে না। তথা কোনো দিয়াত ওয়াজিব হবে না।

পক্ষান্তরে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর তা'যীর করার সময় যদি স্ত্রী মারা যায়, তাহলে স্বামীর উপর স্ত্রীর দিয়ত ওয়াজিব হবে। কেননা স্বামী এ ব্যাপারে আদিষ্ট ছিল। সে তার নিজ ইচ্ছায় কাজটি করেছে। তাই ক্ষেত্র নিরাপদ থাকা শর্ত। যেমন রাস্তায় চলার সময় পথিকের দ্বারা যদি কারো কোনো ক্ষতি হয়, তাহলে এর ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। দিয়ত ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর যুক্তি হলো এই যে, হদ্দ ও তা'যীর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো শাসন করা। প্রাণনাশ করে দেওয়াটা অবশ্যই ভুল। তবে এ ভুলের মাশুল বাইতুল মালের উপর বর্তাবে। কারণ কাজির কাজটি ছিল সাধারণ মুসলমানের কল্যাণের জন্য। অতএব, এর দায় সাধারণ মুসলমানের সম্পদের উপরই আরোপিত হবে। আর তা হলো বাইতুল মাল।

ইমাম শাফেয়ী (র.) এর জবাবে আহনাফ ও অন্যান্য ইমামদের পক্ষ হতে বলা হয়, কাজী যখন আল্লাহর হুকুমে আল্লাহর হক উসূল করেছে, তখন কেমন যেন আল্লাহ-ই তাকে মেরেছেন। আর আল্লাহ যাকে মারেন তার দিয়াত কারো উপর ওয়াজিব হয় না।

https://e-ilm.weebly.com/

كِتَابُ السَّرِقَةِ

السَّرِقَةُ فِي اللُّغَةِ اَخْذُ الشَّيْءِ مِنَ الْغَيْرِ عَلٰى سَبِيْلِ الْخُفْيَةِ وَالِاسْتِسْرَارِ، وَمِنْهُ اِسْتِرَاقُ السَّمْعِ، قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى ﴿اِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ﴾ وَقَدْ زِيْدَتْ عَلَيْهِ اَوْصَافٌ فِي الشَّرِيْعَةِ عَلٰى مَا يَاْتِيْكَ بَيَانُهُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى . وَالْمَعْنَى اللُّغَوِيُّ مُرَاعًى فِيْهَا اِبْتِدَاءً وَانْتِهَاءً اَوْ اِبْتِدَاءً لَا غَيْرَ، كَمَا اِذَا نَقَبَ الْجِدَارَ عَلَى الِاسْتِسْرَارِ وَاَخَذَ الْمَالَ مِنَ الْمَالِكِ مُكَابَرَةً عَلَى الْجِهَارِ . وَفِي الْكُبْرٰى : اَعْنِيْ قَطْعَ الطَّرِيْقِ مُسَارَقَةُ عَيْنِ الْاِمَامِ لِاَنَّهُ هُوَ الْمُتَصَدِّيْ لِحِفْظِ الطَّرِيْقِ بِاَعْوَانِهِ . وَفِي الصُّغْرٰى : مُسَارَقَةُ عَيْنِ الْمَالِكِ اَوْ مَنْ يَقُوْمُ مَقَامَهُ . قَالَ وَاِذَا سَرَقَ الْعَاقِلُ الْبَالِغُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ اَوْ مَا يَبْلُغُ قِيْمَتُهُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ مَضْرُوْبَةً مِنْ حِرْزٍ لَا شُبْهَةَ فِيْهِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَطْعُ وَالْاَصْلُ فِيْهِ قَوْلُهُ تَعَالٰى ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا﴾ الْاٰيَة وَلَا بُدَّ مِنْ اِعْتِبَارِ الْعَقْلِ وَالْبُلُوْغِ لِاَنَّ الْجِنَايَةَ لَا تَتَحَقَّقُ دُوْنَهُمَا وَالْقَطْعُ جَزَاءُ الْجِنَايَةِ، وَلَا بُدَّ مِنَ التَّقْدِيْرِ بِالْمَالِ الْخَطِيْرِ لِاَنَّ الرَّغَبَاتِ تَفْتُرُ فِي الْحَقِيْرِ، وَكَذَا اَخْذُهُ لَا يَخْفٰى فَلَا يَتَحَقَّقُ رُكْنُهُ وَلَا حِكْمَةُ الزَّجْرِ لِاَنَّهَا فِيْمَا يَغْلِبُ، وَالتَّقْدِيْرُ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ مَذْهَبُنَا .

অধ্যায় : চুরি

অনুবাদ : অভিধানে سَرِقَةٌ (চুরি) অর্থ গোপনে ও সন্তর্পণে অন্যের থেকে কোনো জিনিস নিয়ে নেওয়া। তা থেকেই اِسْتِرَاقُ السَّمْعِ-শব্দের ব্যবহার। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন اِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ তবে যারা গোপনে শ্রবণ করে। এই অভিধানিক অর্থের সাথে শরিয়ত কয়েকটি গুণ অতিরিক্ত যোগ করেছে, যার বিবরণ ইনশা-আল্লাহ সামনে আসবে।

এই আভিধানিক অর্থটি শরয়ী চুরির মধ্যে প্রথমে ও শেষে কিংবা শুধু প্রথমে বিবেচ্য হয়। যেমন– কেউ গোপনে সিঁধ কেটে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করল। অতঃপর প্রকাশ্যে জোর খাটিয়ে মালিকের কাছ থেকে মালামাল নিয়ে গেল। বড় চুরি তথা রাহাজানিতে শাসকের দৃষ্টি এড়ানো হয়। কেননা শাসকই হচ্ছেন নিজ সহকারীদের মাধ্যমে পথের নিরাপত্তা বিধানের জিম্মাদার। পক্ষান্তরে ছোট চুরিতে মালিকের কিংবা তার স্থলাবর্তী ব্যক্তির দৃষ্টি এড়ানো হয়। গ্রন্থকার বলেন, **কোনো সুস্থ মস্তিষ্ক প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি যখন টাকশালের নির্মিত দশ দিরহাম বা ঐ মূল্যের সমপরিমাণ কোনো দ্রব্য, এমন সুরক্ষিত স্থান হতে চুরি করে যার সুরক্ষায় কোনো সন্দেহ নেই। তখন তার হস্ত কর্তন ওয়াজিব হয়ে যায়।** এ বিষয়ে মূল দলিল হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী–

"পুরুষ চোর ও স্ত্রী চোরের হস্ত কর্তন করো"। তবে সুস্থ মস্তিষ্ক ও প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার বিষয় বিবেচনা করা আবশ্যক। কেননা এ দুটির বিদ্যমান ছাড়া অপরাধ সাব্যস্ত হয় না। আর হস্ত কর্তন হলো অপরাধের প্রতিফল।

https://e-ilm.weebly.com/

তদ্রূপ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ মাল নির্ধারণ করা জরুরি। কেননা তুচ্ছ মালের ব্যাপারে আগ্রহ নিস্তেজ থাকে। তদ্রূপ তা হরণ করার বিষয়টি গোপন করা হয় না। ফলে চুরি কর্মটির মূল স্তম্ভ অস্তিত্ব লাভ করে না এবং সতর্কীকরণের হিকমতও সাব্যস্ত হয় না। কেননা যে অপরাধ সচরাচর ঘটে সে ক্ষেত্রেই সতর্কীকরণের হেকমত রয়েছে। দশ দিরহাম নির্ধারণ করা হলো আমাদের মাযহাব।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ব অধ্যায়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য : মানুষের প্রাণের মূল্য সম্পদের মূল্য অপেক্ষা অধিক। তাই প্রথমে আলোচনা করা হয়েছে সেসব শাস্তি সম্পর্কে যেগুলো প্রাণের নিরাপত্তার সাথে সম্পৃক্ত। অতঃপর এ অধ্যায় হতে শুরু হচ্ছে সেসব শাস্তির আলোচনা, যেগুলো মানুষের মালের সাথে সম্পৃক্ত।

السرقة-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক ধারণা : السرقة -(س এ যবর ও ر তে যের যোগে) শব্দটি মাসদার বা ক্রিয়ামূল। বাবে ضرب হতে ব্যবহৃত হয়। ক্রিয়ারূপ হলো سرق يسرق।

অভিধানে এর অর্থ হলো, গোপনে ও সন্তর্পণে অন্যের নিকট হতে কিছু নিয়ে যাওয়া। এ সামঞ্জস্য থেকেই গোপনে অন্যের কথা শুনা বুঝানোর জন্য ও আরবি ভাষায় إِسْتِرَاقُ السَّمْعِ শব্দ ব্যবহার করা হয়। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন إِلا مَنْ اِسْتَرَقَ السَّمْعَ তবে যারা (শয়তানরা) গোপনে (ফেরেশতাদের) কথা শুনে আসে। এই إِسْتِرَاقُ শব্দটির ক্রিয়ামূল হলো (س - ر - ق)। যার অর্থ হলো চুরি করা। কেননা যে অন্যের কথা গোপনে শুনে নেয়, সে মূলত কথাই চুরি করে।

চুরির পারিভাষিক সংজ্ঞা :

اَخْذُ مُكَلَّفٍ خُفْيَةً قَدْرَ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ مَضْرُوْبَةً مُحْرَزَةً بِمَكَانٍ اَوْ حَافِظٍ-

অর্থাৎ কোনো স্থানে সংরক্ষিত বা রক্ষক দ্বারা রক্ষিত সম্পদ হতে দশ দিরহাম পরিমাণ সম্পদ মুকাল্লাফ ব্যক্তি কর্তৃক গোপনে নিয়ে যাওয়া।

এ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসবে ইনশা আল্লাহ! চুরির আভিধানিক অর্থটি পারিভাষিক চুরির মধ্যে শুরু শেষ উভয় দিকে বিদ্যমান থাকে। কিংবা শুধু শুরুতে বিদ্যমান থাকে, শেষ দিকে বিদ্যমান থাকে না। চুরির আভিধানিক অর্থ তথা গোপনীয়তা, শুরু ও শেষ উভয় দিকে বিদ্যমান থাকার দৃষ্টান্ত হলো, যেমন কেউ অন্যের গৃহে রাতের বেলায় সিঁধ কেটে প্রবেশ করল। অতঃপর গৃহবাসী ঘুমন্ত থাকা অবস্থায় মালামাল নিয়ে বেরিয়ে এলো। তাহলে এ ক্ষেত্রে কাজের শুরু ও শেষ সবটুকুই গোপনে সম্পন্ন হলো। আর কেবল শুরুতে বিদ্যমান থাকার দৃষ্টান্ত হলো, যেমন কেউ অন্যের গৃহে সিঁধ কেটে প্রবেশ করল অতঃপর গৃহবাসী জাগ্রত হয়ে পড়ল; কিন্তু চোর তাদের থেকে জোরপূর্বক মালামাল হাতিয়ে নিয়ে চলে গেল। এক্ষেত্রে শুরুটা হয়েছিল গোপনে। কিন্তু শেষটা হয়েছে প্রকাশ্যে। প্রশ্ন উত্থাপিত হয় রাহাজানি নিয়ে। কেননা সেখানে শুরু শেষ পুরোটাই প্রকাশ্যে হয়ে থাকে। কোথাও কোনো গোপনীয়তা নেই।

প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার উদ্দেশ্যে গ্রন্থকার বলেন, বড় চুরিতে তথা রাহাজানিতেও গোপনীয়তা আছে। কেননা তাতে শাসকের দৃষ্টি এড়ানো হয়। আর ছোট চুরিতে মালিকের বা মালিকের স্থলাবর্তী (যেমন– ভাড়াটে) আমানতদার প্রমুখের দৃষ্টি এড়ানো হয়।

মোটকথা, ছোট চুরি কিংবা, বড় চুরি উভয় ক্ষেত্রেই গোপনীয়তা বা দৃষ্টি এড়ানোর বিষয়টি বিদ্যমান থাকবেই।

https://e-ilm.weebly.com/

وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ (رحـ) التَّقْدِيْرُ بِرُبْعِ دِيْنَارٍ . وَعِنْدَ مَالِكٍ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ . لَهُمَا اَنَّ الْقَطْعَ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ اِلَّا فِيْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ، وَاَقَلُّ مَا نُقِلَ فِيْ تَقْدِيْرِهٖ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ، وَالْاَخْذُ بِالْاَقَلِّ الْمُتَيَقَّنِ بِهٖ اَوْلٰى، غَيْرَ اَنَّ الشَّافِعِيَّ رَحِمَهُ اللّٰهُ يَقُوْلُ : «كَانَتْ قِيْمَةُ الدِّيْنَارِ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا» وَالثَّلَاثَةُ رُبْعُهَا . وَلَنَا اَنَّ الْاَخْذَ بِالْاَكْثَرِ فِيْ هٰذَا الْبَابِ اَوْلٰى اِحْتِيَالًا لِدَرْءِ الْحَدِّ . وَهٰذَا لِاَنَّ فِي الْاَقَلِّ شُبْهَةَ عَدَمِ الْجِنَايَةِ وَهِيَ دَارِئَةٌ لِلْحَدِّ، وَقَدْ تَاَيَّدَ ذٰلِكَ بِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ «لَا قَطْعَ اِلَّا فِيْ دِيْنَارٍ اَوْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ» وَاِسْمُ الدَّرَاهِمِ يَطْلُقُ عَلَى الْمَضْرُوْبَةِ عُرْفًا فَهٰذَا يُبَيِّنُ لَكَ اشْتِرَاطَ الْمَضْرُوْبِ كَمَا قَالَ فِي الْكِتَابِ وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ، وَهُوَ الْاَصَحُّ رِعَايَةً لِكَمَالِ الْجِنَايَةِ، حَتّٰى لَوْ سَرَقَ عَشَرَةً تِبْرًا قِيْمَتُهَا اَنْقَصُ مِنْ عَشَرَةٍ مَضْرُوْبَةٍ لَا يَجِبُ الْقَطْعُ، وَالْمُعْتَبَرُ وَزْنُ سَبْعَةِ مَثَاقِيْلَ لِاَنَّهُ الْمُتَعَارَفُ فِيْ عَامَّةِ الْبِلَادِ . وَقَوْلُهٗ اَوْ مَا يَبْلُغُ قِيْمَتُهٗ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ اِشَارَةٌ اِلٰى اَنَّ غَيْرَ الدَّرَاهِمِ يُعْتَبَرُ قِيْمَتُهٗ بِهَا وَاِنْ كَانَ ذَهَبًا، وَلَا بُدَّ مِنْ حِرْزٍ لَا شُبْهَةَ فِيْهِ لِاَنَّ الشُّبْهَةَ دَارِئَةٌ، وَسَنُبَيِّنُهٗ مِنْ بَعْدُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى.

অনুবাদ : ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে এক চতুর্থাংশ দিনার নির্ধারণ করা হবে। আর ইমাম মালেক (র.) এর মতে তিন দিরহাম নির্ধারণ করা হবে।

উভয়ের দলিল এই যে, নবী করীম ﷺ-এর যুগে ঢালের মূল্য পরিমাণ ক্ষেত্র ব্যতীত কর্তন সাব্যস্ত হয়নি। আর তার মূল্য নির্ধারণ প্রসঙ্গে সর্বনিম্ন যে পরিমাণ বর্ণিত হয়েছে, তা হলো তিন দিরহাম। আর সুনিশ্চিত হিসাবে সর্বনিম্ন পরিমাণটি গ্রহণ করাই উত্তম। তবে ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, রাসূল ﷺ-এর যুগে একদীনার ছিল বার দিরহামের সমান; সুতরাং তিন দিরহাম হচ্ছে একচতুর্থাংশ দীনারের সমান।

আমাদের দলিল এই যে, হদ্দ রোধ করার প্রয়াস হিসাবে এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ পরিমাণ গ্রহণ করাই উত্তম। এর কারণ এই যে, নিম্নতম পরিমাণের ক্ষেত্রে অপরাধ না হওয়ার সন্দেহ বিদ্যমান। আর সন্দেহ হদ্দ রোধ করে। আর এটা নবী ﷺ-এর নিম্নোক্ত বাণী দ্বারাও প্রমাণিত। "অর্থাৎ এক দীনার কিংবা দশ দিরহামের কমে হস্ত কর্তন নেই"।

আর লোক প্রচলনে টাকশালে নির্মিত মুদ্রার উপরই দিরহাম নামটি প্রযুক্ত হয়। এ থেকেই কুদূরী কিতাবের বক্তব্যে টাকশাল নির্মিত হওয়ার শর্তারোপের কারণ তোমার সামনেই স্পষ্ট হয়ে যায়। এটাই হলো জাহিরে রেওয়ায়েত। আর এটাই বিশুদ্ধ অভিমত। কেননা এতে অপরাধের পূর্ণতার দিকটি বিবেচিত হয়েছে। সুতরাং কেউ যদি দশটি রৌপ্য খণ্ড চুরি করে, যার মূল্য টাকশালে নির্মিত দশ দিরহাম অপেক্ষা কম, তাহলে হস্ত কর্তন ওয়াজিব হবে না।

আর দিরহামের পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে সাত মিছকালের ওজনই বিবেচ্য। কারণ অধিকাংশ দেশে এটাই প্রচলিত। আর গ্রন্থকারের বক্তব্য "কিংবা দশ দিরহামের মূল্যের সমপরিমাণ" দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দিরহাম ছাড়া অন্যান্য দ্রব্যের মূল্য নিরূপণের ক্ষেত্রে দিরহামই বিবেচ্য হবে, যদিও তা স্বর্ণ হয়। স্থানটি এমন সুরক্ষিত হওয়া প্রয়োজন, যার সুরক্ষায় কোনো সন্দেহ নেই। কেননা সন্দেহ হচ্ছে হদ্দ প্রতিহতকারী। পরবর্তীতে এবিষয়টি আলোচনা করব ইনশা আল্লাহ।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিউক্ত ইবারতে মূলত দুটি বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে।

১. সে চুরির পরিণতিতে চোরের হাতকাটা ওয়াজিব হয়, সে চুরি বাস্তবায়িত হওয়ার জন্য কী কী শর্ত রয়েছে?

২. আরোপিত শর্তসমূহের উপর দলিল– প্রমাণ।

প্রথম বিষয়টির উপর আলোকপাত করে গ্রন্থকার (র.) বলেন, যখন কোনো সুস্থ মস্তিষ্ক, প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি সংশয় মুক্ত সুরক্ষিত স্থান হতে টাকশাল নির্মিত দশ দিরহাম বা তার সমপরিমাণ মূল্যের দ্রব্য চুরি করে, তখন তার হাত কাটা ওয়াজিব হয়ে যায়।

গ্রন্থকারের বক্তব্যের সারমর্ম হলো–

হদ্দ ওয়াজিবকারী চুরি বাস্তবায়নের জন্য ৪টি শর্ত– ১. চোর সুস্থ মস্তিষ্ক হতে হবে। পাগল হতে পারবে না। ২. প্রাপ্ত বয়স্ক হতে হবে। শিশু হওয়া যাবে না। ৩. চুরির পরিমাণ টাকশাল নির্মিত দশ দিরহাম বা তার সমমূল্যের দ্রব্য হতে হবে। কম হলে হবে না। ৪. সংশয়মুক্ত সুরক্ষিত স্থান হতে চুরি করতে হবে। অরক্ষিত স্থান হতে কিংবা সন্দেহপূর্ণ রক্ষিত স্থান হতে চুরি করলে হাত কাটা হবে না।

এসব শর্ত সাপেক্ষে চুরি সংঘটিত হলে, শরয়ী বিধান মতে চোরের হাত কেটে দেওয়া ওয়াজিব। হাত কাটা ওয়াজিব হওয়ার দলিল হলো, আল্লাহর বাণী وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا অর্থাৎ তোমরা পুরুষ চোর ও স্ত্রী চোরের হাত কেটে দাও।

আরোপিত শর্ত সমূহের দলিল। (দ্বিতীয় প্রসঙ্গ) প্রথম ও দ্বিতীয় শর্ত অর্থাৎ সুস্থ মস্তিষ্ক ও প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার শর্ত এজন্য আরোপ করা হয়েছে যে, এদুটি বিষয় ছাড়া অপরাধ বাস্তবায়িত হয় না। আর অপরাধ বাস্তবায়িত না হলে অপরাধের শাস্তিও বাস্তবায়িত হবে না।

সুস্থমস্তিষ্ক ও প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া ছাড়া অপরাধ বাস্তবায়িত না হওয়ার দলিল হলো, রাসূল ﷺ এর হাদীস– رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتّٰى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتّٰى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتّٰى يَعْقِلَ – অর্থাৎ তিন ব্যক্তি হতে (শরিয়তের) কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। ১. ঘুমন্ত ব্যক্তি জাগ্রত না হওয়া পর্যন্ত। ২. শিশু প্রাপ্ত বয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত। ৩. পাগল সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত।

তৃতীয় শর্ত অর্থাৎ টাকশাল নির্মিত দশ দিরহাম কিংবা এর সমপরিমাণ মূল্যের দ্রব্য চুরি করা এশর্তটি আরোপের কারণ হলো, চুরির মালটি এমন একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে পরিমিত হওয়া আবশ্যক, যার প্রতি মানুষের আকর্ষণ থাকে। তাই অল্প মাল হলে হবে না। কারণ অল্প মালের প্রতি মানুষের আকর্ষণ বা আগ্রহ কম হয়ে থাকে। এবং অল্প মাল নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি গোপনেও হয় না। বিধায় চুরির মূল শর্ত তথা গোপনে হওয়ার শর্তটিই তখন পাওয়া যায় না। তাই এশর্ত আরোপ করা হলো যে, চুরির মাল উল্লেখযোগ্য পরিমাণ হতে হবে। অতি অল্প কিছু চুরি করলে হাত কাটা হবে না। তবে সে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ কতটুকু, এ নিয়ে ইমামগণের মাঝে মতভেদ হয়েছে। কিতাবে তিনটি মত উল্লেখ রয়েছে। কম চুরি করলে হানাফীগণের মতে চোরের হাত কাটা হবে না। ইমাম মালেক (র.)

২. ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে এক চতুর্থাংশ দীনার বা এক দীনারের চার ভাগের এক ভাগ। এর মতে তিন দিরহাম।

মাযহাবত্রয়ের দলিল : ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ী (র.) এর দলিল হলো, রাসূল ﷺ -এর যুগে ঢালের মূল্য পরিমাণ সম্পদ চুরি করলে হাত কাটা হতো। এর কম চুরি করলে হাত টাকা হতো না। এখন দেখতে হয় ঢালের মূল্য কত ছিল। এ সম্পর্কিত বিভিন্ন রকম রেওয়ায়েত পাওয়া যায়। কিছু রেওয়ায়েত দ্বারা বুঝা যায় দশ দিরহাম। কিছু রেওয়ায়েত দ্বারা বুঝা যায় পাঁচ দিরহাম। কিছু রেওয়ায়েত দ্বারা বুঝা যায় তিন দিরহাম। এসব পরিমাণ হতে ইমামদ্বয় সর্বনিম্ন পরিমাণটি গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ তিন দিরহাম। একাধিক সংখ্যা বর্ণিত থাকা অবস্থায় নিম্ন সংখ্যাটি নিশ্চিত হওয়ার কারণেই তারা একে প্রাধান্য দিয়েছেন। তাই ইমাম মালেক (র.) স্পষ্টতই বলেছেন তিন দিরহাম। আর ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন, একচতুর্থাংশ দীনার। কারণ একদীনারের সমান হতো বার দিরহাম। সে হিসাবে তিন দিরহাম হলো এক দীনারের চার ভাগের এক ভাগ। মোট এক চতুর্থাংশ দীনারও তিন দিরহাম একই কথা। ঢালের মূল্য সম্পর্কিত হাদীস। ১- হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, একবার নবী করীম ﷺ এক লোকের হাত কর্তন করেছিলেন, তিন দিরহাম মূল্যের একটি ঢাল চুরি করার কারণে। অনুরূপ হাদীস হযরত আয়েশা (রা.) এর হতে বর্ণিত আছে। হযরত ইবনে ওমর ও আয়েশা (রা.) এর হাদীসের কোনো কোনো বর্ণনায় এক চতুর্থাংশ দীনার, কোনো বর্ণনায় পাঁচ দিরহাম ও কোনো কোনো বর্ণনায় দশ দিরহামের কথাও উল্লেখ আছে।

https://e-ilm.weebly.com/

আহনাফের দলিল : চুরির শাস্তি হিসাবে চোরের হাত কেটে দেওয়া একটি হদ্দ। আর হদ্দের ক্ষেত্রে দুটি মূলনীতি রয়েছে

১. যথাসম্ভব হদ্দ রোধ করার চেষ্টা করা।

২. সন্দেহের কারণে হদ্দ রহিত হয়ে যাওয়া।

অপরদিকে ঢালের মূল্য সম্পর্কে তিন দিরহাম, পাঁচ দিরহাম, দশ দিরহাম ইত্যাদি রেওয়ায়েত রয়েছে। তাই ইমাম আবূ হানীফা (র.) দশ দিরহামের রেওয়ায়েতকে গ্রহণ করলেন, যথাসম্ভব হদ্দ প্রতিহত করার স্বার্থে এবং হদ্দকে সন্দেহমুক্ত করার স্বার্থে। কেননা নিম্ন সংখ্যাগুলো গ্রহণ করা হলে হদ্দের পরিমাণ বেড়ে যাবে। এবং নিম্ন সংখ্যাগুলোতে চুরি বাস্তবায়িত না হওয়ারও সন্দেহ থাকে। অথচ সামান্যতম সন্দেহের দ্বারা হদ্দ বাতিল হয়ে যায়। তাই ইমাম আবূ হানীফা (র.) সর্বোচ্চ সংখ্যা দশ দিরহামকে প্রাধান্য দিয়েছেন। ঢালের মূল্য দশ দিরহাম সম্পর্কিত অনেক হাদীসই বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে কিছু হাদীস নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

১. হযরত উম্মে আইমান (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, চোরের হাত কাটা যাবে না, তবে একটি ঢালের মূল্যের কারণে (কাটা যাবে)। আর সে যুগে একটি ঢালের মূল্য ছিল, এক দীনার বা দশ দিরহাম। এ হাদীসটি ইমাম নাসায়ী, তাবারানী, ত্বহাবী, হাকেম প্রমুখ বর্ণনা করেছেন।

২. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ যে ঢালটির কারণে হাত কেটে ছিলেন, সেটির মূল্য ছিল দশ দিরহাম। এ হাদীস ইমাম ত্বহাবী, আবূ দাউদ ও হাকেম বর্ণনা করেছেন।

৩. আমর ইবনে শু'আইব তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে- এ সনদে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগে ঢালের মূল্য ছিল দশ দিরহাম। এ হাদীসটি ইমাম নাসায়ী (র.) বর্ণনা করেছেন। মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বাতেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

৪. মুসনাদে আহমদে মারফূ'রূপে বর্ণিত আছে যে, দশ দিরহামের কম চুরি করলে চোরের হাত কাটা যাবে না।

৫. তাবারানী আওসাতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর সূত্রে হযরত নবী করীম ﷺ হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি ইরশাদ করেছেন। দশ দিরহামের নিচে চোরের হাত কাটতে নেই।

দশ দিরহাম সম্পর্কে এরকম আরো বহু রেওয়ায়েত হাদীসের গ্রন্থসমূহে বিদ্যমান রয়েছে।

ইমাম মালেক ও শাফেয়ী (র.)-এর দলিলের জবাব :

১. ইমামদ্বয় তাদের মাযহাবের দলিল স্বরূপ হযরত আয়েশা ও ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত যে হাদীসটি পেশ করেন সে হাদীসটি মুযতারাব। কেননা কোনো কোনো বর্ণনা অনুযায়ী সে হাদীসে ঢালের মূল্য পাঁচ দিরহাম উল্লেখ আছে। কোনো কোনো বর্ণনা অনুযায়ী এক চতুর্থাংশ দীনার। অন্য বর্ণনায় অর্ধ দীনার। আবার কিছু বর্ণনায় তিন দিরহামও আছে।

এহেন ইযতিরাবের কারণে আমরা রেওয়ায়েতটি তরক করে দশ দিরহামের রেওয়ায়েত গ্রহণ করেছি।

২. নিম্ন সংখ্যাগুলোতে সন্দেহ রয়েছে। তাই আমরা সন্দেহ বর্জন করে সুনিশ্চিত তথা দশ দিরহামকে প্রাধান্য দিয়েছি।

৩. এটি একটি স্বীকৃত বিষয় যে, ভুলবশত হদ্দ প্রয়োগ করা অপেক্ষা ভুলবশত ক্ষমা করে দেওয়া উত্তম। অতএব, দশ দিরহামের কম চুরি করার পর যদি হদ্দ প্রয়োগ করা না হয় , তাহলে এই হলো যে, হদ্দ ওয়াজিব হওয়া সত্ত্বেও শাসক তা ভুলক্রমে রহিত করে দিল। যদি নিম্নসংখ্যার রেওয়ায়েতগুলো সঠিক হয়ে থাকে। আর যদি সঠিক না হয়ে থাকে,তাহলে তো হদ্দ ওয়াজিব না হওয়া সত্ত্বেও ভুলবশত হদ্দ প্রয়োগ করে দিল। দুটি অবস্থার মধ্যে প্রথমটি দ্বিতীয়টি অপেক্ষা বহুগুণে উত্তম। যেমনটি হতে পারে দশ দিরহামের রেওয়ায়েতকে প্রাধান্য দিলেই। তাই আহনাফ দশ দিরহামের রেওয়ায়েতকে অন্যান্য নিম্ন সংখ্যার রেওয়ায়েতের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন এবং চুরির নেসাব দশ দিরহাম হওয়ার প্রবক্তা হয়েছেন। চুরির নেসাব আহনাফের মতে দশ দিরহাম। দশ দিরহামের কম চুরি করলে হাতকাটা হবে না। এশর্তটির সাথে সংশ্লিষ্ট আরেকটি শাখা শর্ত হলো, দিরহামগুলো টাকশাল নির্মিত হতে হবে।

এ শর্ত আরোপের কারণ হলো এই, জনসাধারণের পরিভাষায় দিরহাম বলতে টাকশাল নির্মিত মুদ্রাকেই বুঝানো হয়। তাছাড়া টাকশাল নির্মিত মুদ্রা সাধারণ রূপা হতে উন্নত মানের হয়ে থাকে। তাই এ শর্ত এটে দেওয়া হয়েছে যথাসম্ভব হদ্দকে রোধ করা উদ্দেশ্যে।

দিরহামের হিসাবের ক্ষেত্রে সাত মিছকালের হিসাব গ্রহণযোগ্য হবে। কারণ এ হিসাব অধিকাংশ দেশে প্রচলিত ছিল। চুরির মাল দিরহাম ছাড়া অন্য কিছু হলে তা দিরহামের মূল্য দ্বারা হিসাব করে নিত । এমনকি তা স্বর্ণ হলেও। অতএব, কেউ যদি এ পরিমাণ স্বর্ণ চুরি করে যার মূল্য দশ দিরহাম বা এর চেয়ে বেশি, তাহলে তার হাত কাটা হবে। যদি কম হয় তাহলে কাটা হবে না।

চতুর্থ শর্ত তথা সন্দেহ মুক্ত সুরক্ষিত স্থান হতে চুরি হওয়ার শর্ত এজন্য আরোপ করা হয়েছে যে, স্থানটি সুরক্ষিত হওয়ার ব্যাপারে যদি সন্দেহ থাকে, তাহলে উক্ত সন্দেহের কারণে হদ্দ রহিত হয়ে যাবে। এ বিষয়টি সম্পর্কে আরো বিবরণ সামনে আসবে, ইনশা-আল্লাহ ।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ وَالْعَبْدُ وَالْحُرُّ فِى الْقَطْعِ سَوَاءٌ لِاَنَّ النَّصَّ لَمْ يُفَصِّلْ، وَلِاَنَّ التَّنْصِيْفَ مُتَعَذِّرٌ فَيَتَكَامَلُ صِيَانَةً لِاَمْوَالِ النَّاسِ . وَيَجِبُ الْقَطْعُ بِاِقْرَارِهٖ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَهٰذَا عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ . وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ : لَا يُقْطَعُ اِلَّا بِالْاِقْرَارِ مَرَّتَيْنِ وَرُوِيَ عَنْهُ اَنَّهُمَا فِيْ مَجْلِسَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ لِاَنَّهٗ اِحْدَى الْحُجَّتَيْنِ فَيُعْتَبَرُ بِالْاُخْرٰى وَهِيَ الْبَيِّنَةُ كَذٰلِكَ اِعْتَبَرْنَا فِي الزِّنَا. وَلَهُمَا اَنَّ السَّرِقَةَ قَدْ ظَهَرَتْ بِالْاِقْرَارِ مَرَّةً فَيُكْتَفٰى بِهٖ كَمَا فِي الْقِصَاصِ وَحَدِّ الْقَذْفِ وَلَا اِعْتِبَارَ بِالشَّهَادَةِ لِاَنَّ الزِّيَادَةَ تُفِيْدُ فِيْهَا تَقْلِيْلَ تُهْمَةِ الْكَذِبِ وَلَا تُفِيْدُ فِي الْاِقْرَارِ شَيْئًا لِاَنَّهٗ لَا تُهْمَةَ وَبَابُ الرُّجُوْعِ فِيْ حَقِّ الْحَدِّ لَا يَنْسَدُّ بِالتَّكْرَارِ وَالرُّجُوْعُ فِيْ حَقِّ الْمَالِ لَا يَصِحُّ اَصْلًا لِاَنَّ صَاحِبَ الْمَالِ يُكَذِّبُهٗ، وَاشْتِرَاطُ الزِّيَادَةِ فِي الزِّنَا بِخِلَافِ الْقِيَاسِ فَيَقْتَصِرُ عَلٰى مَوْرِدِ الشَّرْعِ .

অনুবাদ : গ্রন্থকার (র.) বলেন, **হস্ত কর্তনের ক্ষেত্রে দাস ও স্বাধীন ব্যক্তি সমান।** কেননা আয়াত কোনো পার্থক্য নির্দেশ করেনি। আরো একটি কারণ এই যে, হস্ত কর্তনের ক্ষেত্রে অর্ধেকীকরণ সম্ভব নয়। সুতরাং মানুষের সম্পদ সংরক্ষণ কল্পে পূর্ণ হস্ত কর্তন সাব্যস্ত হবে।

ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে একবারের স্বীকারোক্তি দ্বারাই হস্ত কর্তন ওয়াজিব হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, দুই বার স্বীকারোক্তি করা ছাড়া হস্ত কর্তন করা হবে না। তার থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, দুই স্বীকারোক্তি ভিন্ন ভিন্ন দুই মজলিসে হতে হবে। কেননা স্বীকারোক্তি হলো দুই প্রমাণের একটি। অপরটি হলো সাক্ষ্য ভিত্তিক প্রমাণ। সুতরাং প্রথমটিকে দ্বিতীয়টির উপরে কিয়াস করা হবে। জেনার হদ্দের ক্ষেত্রেও এটা আমরা বিবেচনা করেছি। তরফাইনের যুক্তি এই যে, একবারের স্বীকারোক্তি দ্বারাই চুরির অপরাধ সাব্যস্ত হয়ে গেছে। সুতরাং তাই যথেষ্ট হবে। যেমন কিসাস ও হদ্দে কযফের ক্ষেত্রে সাক্ষ্যের উপর এটাকে কিয়াস করার অবকাশ নেই কেননা। প্রথম দ্বিতীয় সাক্ষীদের সংখ্যাধিক্য মিথ্যা হওয়ার তোহমত হ্রাস করে। কিন্তু স্বীকারোক্তি ক্ষেত্রে এর কোনো সুফল নেই। কেননা তাতে মিথ্যার তোহমত নেই। আর পুনরোক্তি দ্বারা হদ্দের ক্ষেত্রে স্বীকারোক্তির প্রত্যাহারের সুযোগ বন্ধ হয় না।

পক্ষান্তরে মালের ক্ষেত্রে (এমনকি একবারের স্বীকারোক্তিও) প্রত্যাহার করা মোটেও সহীহ নয়। কেননা মালের মালিক তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে।

আর জেনার ক্ষেত্রে যে অতিরিক্ত সংখ্যায় স্বীকারোক্তির শর্তারোপ করা হয়েছে, তা কিয়াস পরিপন্থি। তাই সেটা শরিয়ত নির্ধারণের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

বিভিন্ন হদ্দর ক্ষেত্রে দাস ও স্বাধীন ব্যক্তির মাঝে পার্থক্য বিদ্যমান থাকে। অর্থাৎ গোলামের হদ্দ স্বাধীন ব্যক্তির হদ্দের অর্ধেক হয়ে থাকে। কিন্তু চুরির শাস্তি হাত কাটার ক্ষেত্রে সেরূপ হবে না। এক্ষেত্রে পার্থক্য না হওয়ার পেছনে গ্রন্থকার তিনটি কারণ উল্লেখ করেছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

চুরির হদ্দ সম্পর্কিত আয়াতে গোলাম ও স্বাধীনের মাঝে কোনো পার্থক্য করা হয়নি। বরং আয়াতে ব্যাপক শব্দ السارق والسارقة উল্লেখ আছে। যা স্বাধীনও গোলাম উভয়কে সমানভাবে অন্তর্ভুক্ত করে। ১. হাত কাটার ক্ষেত্রে যদি স্বাধীন ও দাসের মাঝে পার্থক্য করতে হয়, তাহলে স্বাধীন ব্যক্তির পূর্ণ হাত কাটতে হবে। আর গোলামের অর্ধেক হাত কাটতে হবে। আর অর্ধেক হাত কাটা সম্ভব নয়।

৩. অর্ধেক হাত কাটা সম্ভব না হওয়ার কারণে যদি হাত কাটা না হয়, তাহলে মানুষের সম্পদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে। তাই মানুষের সম্পদের হেফাজতের উদ্দেশ্যে পূর্ণ হাতই কর্তন করা হবে।

قوله : وَيَجِبُ الْقَطْعُ بِإِقْرَارِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً الخ : স্বীকারোক্তির মাধ্যমে চুরির অপরাধ সাব্যস্ত হওয়ার জন্য কতবার স্বীকারোক্তি করা প্রয়োজন, এ নিয়ে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। এক্ষেত্রে দুটি মত বর্ণিত হয়েছে।

১. ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মুহাম্মদ, ইমাম মালেক (র.) ও অধিকাংশ আলেমের মত হলো, একবার স্বীকার করলেই চুরির অপরাধ প্রমাণিত হয়ে যায়, এবং হাত কাটা ওয়াজিব হয়ে যায়।

২. ইমাম আবূ ইউসুফ, ইমাম আহমদ, ইবনে আবি লাইলা, ইমাম যুফার (র.) প্রমুখের মতে চুরির অপরাধ প্রমাণিত হবে দুইবার স্বীকার করার মাধ্যমে। একবার স্বীকারোক্তি দ্বারা চুরি প্রমাণিত হবে না এবং হাত কাটা যাবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) এর পক্ষ হতে জামে সাগীরের ব্যাখ্যা গ্রন্থে এমনও বর্ণিত আছে যে, দুটি স্বীকারোক্তি ভিন্ন ভিন্ন দুটি মজলিসে হতে হবে।

দলিল : ইমাম আবূ ইউসুফ ও তার অনুরূপ মতাবলম্বীদের দলিল হলো–

১. আবূ দাউদ শরীফে বর্ণিত আছে হযরত উমাইয়্যাহ আল মাখযূমী (রা.)-এর সূত্রে, একবার নবী করীম ﷺ -এর কাছে একটি চোর আনা হলো এবং সে চুরির কথা স্বীকার করল। কিন্তু তার কাছে কোনো মাল পাওয়া গেল না। তখন নবী করীম ﷺ তাকে লক্ষ্য করে বললেন, আমার মনে হয় না তুমি চুরি করেছ। লোকটি বলল, হ্যাঁ অবশ্যই আমি চুরি করেছি। এভাবে সে দুইবার অথবা তিনবার স্বীকার করল। তারপর তার হাত কাটার বিষয়ে নির্দেশ হলো এবং হাত কেটে দেওয়া হলো।

২. ত্বহাবী শরীফে বর্ণিত আছে যে, জনৈক ব্যক্তি হযরত আলী (রা.) এর নিকট সে চুরি করেছে বলে দুইবার স্বীকারোক্তি প্রদান করল। তখন হযরত আলী (রা.) বললেন, তুমি তোমার নিজের বিরুদ্ধে দুই বার সাক্ষ্য দিলে। অতঃপর তার হাত কেটে দেওয়ার আদেশ করলেন। ফলে তার হাত কেটে গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হলো।

৩. স্বীকারোক্তি হলো এক প্রকার দলিল, আরেক প্রকার দলিল হলো সাক্ষী। তাই এক প্রকার দলিলকে অপর প্রকারের উপর কিয়াস করা হবে। অতএব, সাক্ষীর দ্বারা চুরি প্রমাণিত হতে হলে যেমন দুজন সাক্ষীর প্রয়োজন হয়, তেমনি স্বীকারোক্তি দ্বারা প্রমাণিত হতে দু'বার স্বীকার করা আবশ্যক। এধরনের কিয়াস জেনার ক্ষেত্রেও করা হয়েছে। কেননা সাক্ষীর মাধ্যমে জেনা প্রমাণিত হতে হলে যেমন চারজন সাক্ষীর প্রয়োজন হয়, তেমনি স্বীকারোক্তি দ্বারা প্রমাণিত হতে হলে চারবার স্বীকার করা আবশ্যক হয়। অতএব, জেনার ক্ষেত্রে যেমন স্বীকারোক্তিকে সাক্ষীর উপর কিয়াস করা হয়েছে, তেমনি চুরির ক্ষেত্রে স্বীকারোক্তিকে সাক্ষীর উপর কিয়াস করা হবে। তাই দুইবার স্বীকারোক্তি ব্যতীত চুরি প্রমাণিত হবে না। হাতও কাটা যাবে না।

ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মুহাম্মদ (র.) ও তাদের অনুরূপ মত পোষণকারীদের দলিল :

ত্বহাবী শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণিত আছে যে, একবার নবী করীম ﷺ -এর কাছে এক চোরকে হাজির করা হলো। সাহাবীগণ বললেন– হুজুর সে চুরি করেছে। নবী করীম ﷺ বললেন, আমার মনে হয় না সে চুরি করেছে। লোকটি বলল, হে আল্লাহর রাসূল, অবশ্যই আমি চুরি করেছি। তখন হুজুর ﷺ বললেন, তাকে নিয়ে হাত কেটে দাও এবং রক্ত বন্ধ করে দাও।

২. একবার স্বীকার করার দ্বারাই চুরির কথা জানা হয়ে যায়। অতএব, একবার স্বীকারোক্তির উপরই ক্ষান্ত থাকা হবে। দ্বিতীয়বার স্বীকারোক্তির প্রয়োজন নেই। যেমন কিসাস ও হদ্দে কযফ প্রমাণিত হওয়ার জন্য একবার স্বীকারোক্তি করাকেই যথেষ্ট মনে করা হয়। দুবারের প্রয়োজন হয় না। চুরির ক্ষেত্রেও তেমনি হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিলের জবাব : হযরত আবূ উমাইয়্যাহ আল মাখযূমী (রা.) হতে বর্ণিত হাদীসটির জবাব হলো, এ হাদীস হতে দুবার স্বীকার করা শর্ত হওয়ার বিষয়টি প্রতীয়মান হয় না। বরং হাদীস থেকে এতটুকু প্রতীয়মান হয় যে, হদ্দ কার্যকর করার ক্ষেত্রে নবী করীম ﷺ সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। কিংবা স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করার জন্য তাকে উৎসাহিত করেছেন এবং এটি আমাদের নিকটও মোস্তাহাব বলে স্বীকৃত।

অনুরূপ হযরত আলী (রা.)-এর হাদীস থেকেও এটা প্রতীয়মান হয় না যে, দুবার স্বীকারোক্তি শর্ত। বরং তিনি স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করার জন্য উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে বলেছেন– তুমি তোমার নিজের বিরুদ্ধে দুবার সাক্ষ্য দিলে?

স্বীকারোক্তিকে সাক্ষীর উপর কিয়াস করার জবাব হলো, এটা ফায়দাহীন কিয়াস। কেননা সাক্ষীদের সংখ্যা বৃদ্ধি হলে একটি ফায়দা হাসিল হয়। তা হলো এই যে, সাক্ষীর সংখ্যাধিক্যের কারণে সাক্ষীরা মিথ্যাবাদী হওয়ার কিংবা দাবিদার মিথ্যাবাদী হওয়ার সম্ভাবনা কমে আসে। পক্ষান্তরে স্বীকারোক্তি একাধিক বার হলে এর দ্বারা কোনো ফায়দা নেই। কেননা স্বীকারোক্তির ক্ষেত্রে তাকে মিথ্যাবাদী আখ্যা দেওয়ার মতো কোনো প্রতিপক্ষই নেই। অতএব, যখন কোনো প্রতিপক্ষই নেই, তখন কোনো তোহমতও নেই। আর তখন তোহমত হ্রাস করার প্রশ্নও নেই।

জেনার স্বীকারোক্তির সাথে চুরির স্বীকারোক্তিকে কিয়াস করা যাবে না। কারণ জেনার ক্ষেত্রেও মূলত একবারের স্বীকারোক্তিই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু যেখানে খেলাফে কিয়াস (নিয়ম পরিপন্থি) চারবার স্বীকারোক্তি শর্ত হওয়ার বিষয়টি নস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। তাই সেটা সেখানেই সীমিত থাকবে। অন্য কোনো বিধানকে এর সাথে কিয়াস করা যাবে না।

আরেকটি কথা হলো এই যে, চোরের সাথে দুটি হক সম্পৃক্ত। একটি আল্লাহর হক, অপরটি বান্দার হক। অর্থাৎ যার মাল চুরি করেছে তার মাল ফেরত পাওয়ার হক। এদুটি হকের দিকে লক্ষ্য করলেও বুঝা যায় যে, একাধিক বার স্বীকারোক্তি দ্বারা কোনো ফায়দা নেই।

কেননা আল্লাহর হক হিসাবে স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করা জায়েজ। একবার স্বীকার করার পর প্রত্যাহার করা যেমন জায়েজ আছে। তেমনি দুবার, তিনবার, বহুবার স্বীকার করার পরও প্রত্যাহার জায়েজ আছে। দুবার স্বীকার করার ফলে প্রত্যাহারের দরজা বন্ধ হয়ে যায় না। একবার স্বীকারের পরও প্রত্যাহারের দরজা খোলা থাকে, দুইবারের পরও প্রত্যাহারের দরজা খোলা থাকে। অতএব, দুবার স্বীকার করার কোনো ফায়দা নেই।

অপর দিকে বান্দার হকের দিকে তাকালে দেখা যায়, একবার স্বীকার করার দ্বারাই তা সাব্যস্ত হয়ে যায়। এর থেকে রুজু করা জায়েজ হয় না। কেননা একবার স্বীকার করার পর যদি স্বীকারকারী তার স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করতে চায়, তাহলে তার প্রতিপক্ষ অর্থাৎ যার হক সাব্যস্ত হয়েছে, সে তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে। একবার স্বীকার করার পর প্রত্যাহার করা যায় না। দুইবার স্বীকার করার পরও প্রত্যাহার করা যায় না।

মোটকথা, চুরির স্বীকারোক্তির সাথে দুটি হক সম্পৃক্ত। আল্লাহর হক ও বান্দার হক। উভয় হকের বিবেচনায় একবার ও একাধিকবার স্বীকারোক্তি বরাবর। তাই আহনাফ বলেন, দুবার স্বীকারোক্তির প্রয়োজন নেই। একবার স্বীকারোক্তিই যথেষ্ট।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ وَيَجِبُ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ لِتَحَقُّقِ الظُّهُوْرِ كَمَا فِيْ سَائِرِ الْحُقُوْقِ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَسْأَلَهُمَا الْإِمَامُ عَنْ كَيْفِيَّةِ السَّرِقَةِ وَمَاهِيَّتِهَا وَزَمَانِهَا وَمَكَانِهَا لِزِيَادَةِ الِاحْتِيَاطِ كَمَا مَرَّ فِي الْحُدُوْدِ، وَيَحْبِسُهُ اِلَى اَنْ يَسْأَلَ عَنِ الشُّهُوْدِ لِلتُّهْمَةِ . قَالَ وَاِذَا اِشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ فِيْ سَرِقَةٍ فَاَصَابَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ قُطِعَ، وَاِنْ اَصَابَهُ اَقَلُّ لَا يُقْطَعُ لِاَنَّ الْمُوْجِبَ سَرِقَةُ النِّصَابِ وَيَجِبُ عَلٰى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِجِنَايَتِهِ فَيُعْتَبَرُ كَمَالُ النِّصَابِ فِيْ حَقِّهِ

অনুবাদ : আর ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, দুজন সাক্ষীর সাক্ষ্য দ্বারাই হস্ত কর্তন সাব্যস্ত হয়ে যাবে। কেননা এতেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়, যেমন অন্যান্য হকের ক্ষেত্রেও হয়ে থাকে।

শাসকের কর্তব্য হলো, তাদেরকে চুরির ধরন ও প্রকৃতি সম্পর্কে এবং চুরির সময়কাল ও স্থান সম্পর্কে প্রশ্ন করা। অধিকতর সতর্কতার উদ্দেশ্যে হদ্দ সংক্রান্ত আলোচনায় যেমন বলা হয়েছে।

আর তার উপর তোহমত থাকার কারণে সাক্ষীদের সম্পর্কে রিপোর্ট পাওয়া পর্যন্ত তাকে আটকে রাখবে।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কোনো চুরি কর্মে যদি একদল লোক অংশ গ্রহণ করে এবং প্রত্যেকেই দশ দিরহাম করে ভাগ পায়, তাহলে তাদের সকলের হাত কর্তন করা হবে। আর যদি দশ দিরহামের কম পায় তাহলে কর্তন করা হবে না। কেননা হস্ত কর্তন সাব্যস্তকারী বিষয়টি হলো নেসাব পরিমাণ চুরি। আর প্রত্যেকের বিরুদ্ধে তার কৃত অপরাধের কারণে হস্ত কর্তন সাব্যস্ত হবে। অতএব, প্রত্যেকের ক্ষেত্রে নেসাবের পূর্ণতা বিবেচ্য হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ইতিপূর্বে এক প্রকার প্রমাণ তথা স্বীকারোক্তি সম্পর্কে আলোচনা ছিল। এখান থেকে দ্বিতীয় প্রকারের প্রমাণ তথা সাক্ষী সম্বন্ধে আলোচনা শুরু হচ্ছে।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, দু'জন সাক্ষীর সাক্ষ্য দ্বারা হাত কাটা সাব্যস্ত হয়। এ মাসআলায় ইমামগণ একমত। অতএব, কারো ব্যাপারে যদি দু'জন সাক্ষী সাক্ষ্য প্রদান করে যে অমুক চুরি করেছে, তাহলে শাসকের দায়িত্বে দুটি কাজ বর্তায়। ১. সাক্ষীদেরকে যাচাই করা। ২. যাচাই কার্য শেষ হওয়া পর্যন্ত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আটকে রাখা।

সাক্ষীদের যাচাই কাজটি দু'পর্বে বিভক্ত। প্রথমে শাসক সাক্ষীদেরকে কয়েকটি বিষয়ে প্রশ্ন করবে। চুরির ধরন ও চুরির প্রকৃতি সম্পর্কে প্রশ্ন করবে। এ প্রশ্নের দ্বারা এমন কোনো সুরত বেরিয়ে আসতে পারে, যে সুরতে হাত কাটা ওয়াজিব হয় না। যেমন চুরির ধরন বর্ণনা করতে গিয়ে সাক্ষীরা বলল, সে অমুকের ঘরে সিঁধ কেটেছে এবং সেখান দিয়ে হাত ঢুকিয়ে ঘর থেকে মালপত্র বের করে নিয়ে চলে গেছে। এমতাবস্থায় তার হাতকাটা ওয়াজিব হবে না। তদ্রূপ চুরির প্রকৃতি সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে যদি সাক্ষীরা এমন কোনো মালের কথা বলে যা দ্রুত নষ্ট হয়, কিংবা যে মালে চোর নিজেও শরিক আছে, কিংবা যে মালের মূল্য দশ দিরহামের কম। তাহলেও হাত কাটা ওয়াজিব হবে না।

চুরির সময় ও স্থান সম্পর্কেও প্রশ্ন করবে। এতেও এমন কোনো সুরত বের হতে পারে যে, হাতকাটা ওয়াজিব হয় না। যেমন সাক্ষীরা বলল, সে দশ বছর আগে চুরি করেছিল। এমতাবস্থায় ঘটনা অনেক দিনের পুরান হওয়ার কারণে হদ্দ আসবে না। কিংবা বলল, সে দারুল হরবে চুরি করেছে, কিংবা বলল, সে খোলা মাঠ থেকে চুরি করেছে, তাহলে হাতকাটা ওয়াজিব হবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

দ্বিতীয় পর্যায়ে, সাক্ষীরা আদেল বা যোগ্য কিনা, সেটাও শাসক যাচাই করবেন। এ সকল যাচাই দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হদ্দ কার্যকর করার ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করা।

সাক্ষীদের কার্য সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত শাসক অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আটকে রাখবেন। এই আটকাদেশটি হবে সে অভিযুক্ত হওয়ার কারণে তা'যীর স্বরূপ। তারপর যদি সত্যিই অভিযোগ প্রমাণিত হয়ে যায়। তাহলে হদ্দ কার্যকর করবে। অন্যথায় ছেড়ে দিবে।

وَإِذَا اشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ فِي سَرِقَةِ الخ : কয়েকজন মিলে যদি একটি চুরিকর্ম সম্পন্ন করে, তাহলে কি হুকুম এ বিষয়ে উক্ত ইবারতে আলোকপাত করা হয়েছে। কয়েকজন মিলে চুরি করলে তিনটি সুরত হতে পারে।

১. সকল সদস্য যা পেয়েছে সব মিলেও যদি দশ দিরহামের কম হয়, তাহলে কারো হাত কাটা হবে না। যেহেতু নেসাব পূর্ণ হয়নি।

২. প্রত্যেকে যদি দশ দিরহামের বেশি ভাগে পায় তাহলেও সকলের হস্তকর্তন করা হবে।

৩. প্রত্যেকে দশ দিরহাম পায়নি, তবে সকলের সব মিলালে দশ দিরহাম বা তার চেয়ে বেশি হয়।

প্রথম ও দ্বিতীয় সুরতের হুকুম নিয়ে ইমামগণের মতভেদ নেই। তৃতীয় সুরতের হুকুম নিয়ে ইমামগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে।

১. আহনাফ, ইমাম শাফেয়ী, সুফিয়ান ছাওরী (র.) প্রমুখ ইমামের মতে প্রত্যেকের ভাগে দশ দিরহাম না পড়লে হাত কাটা হবে না।

২. ইমাম মালেক, আহমদ ইবনে হাম্বল, আবূ ছাওর প্রমুখ ইমামের মতে প্রত্যেকের ভাগে দশ দিরহাম না পড়লেও হাত কেটে দেওয়া হবে। যদি চুরিকৃত গোটামালের সমষ্টি দশ দিরহাম হয়।

ইমাম মালেক (র.) বলেন, নেসাব পরিমাণ মাল চুরি হলেই হাত কাটা ওয়াজিব। চুরি কয়জন মিলে করেছে সেটা দেখার বিষয় নয়। একজন করলে যে হুকুম, কয়েকজন মিলে করলেও একই হুকুম। যেমন অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা হলে কিসাস ওয়াজিব হয়। হত্যাকারী কয়জন, সেটা দেখা হয় না। দশ জন মিলেও যদি একজনকে হত্যা করে, তাহলে একজনের মোকাবিলায় দশজনকেই হত্যা করা হয়। তদ্রূপ এখানেও নেসাব পরিমাণ সম্পদ চুরি হলেই হাত কাটা হবে। চোরের সংখ্যা যতই হোক না কেন। এক ও একাধিকের মাঝে কোনো তফাৎ নেই।

আমরা বলি, প্রত্যেকের হাত কাটতে হবে তার নিজের অপরাধের কারণে। একজনের অপরাধে অন্যজনের হাত কাটা যাবে না। আর হাত কাটার অপরাধ হলো দশ দিরহাম পরিমাণ চুরি করা। যা প্রত্যেক সদস্যের ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত হয়নি। অর্থাৎ প্রত্যেক চোর দশ দিরহাম চুরি করেনি। অতএব, কারো হাত কাটা যাবে না। প্রত্যেকে দশ দিরহাম না পাওয়া অবস্থায় যদি হাত কাটা হয়, তাহলে প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তার ও অন্যের যৌথ অপরাধের মোকাবিলায় শাস্তি দেওয়া হবে। যা শরিয়তে জায়েজ নেই।

ইমাম মালেক (র.) এর কিয়াসের জবাব : ইমাম মালেক (র.) চুরিকে কিসাসের উপর কিয়াস করেছেন। কিয়াসটি সঠিক নয়। কেননা হত্যার ক্ষেত্রেই প্রত্যেক ব্যক্তির ভূমিকাই এক একটি পূর্ণাঙ্গ অপরাধ। কারণ যেখানে প্রত্যেকের আঘাতের মাঝে প্রাণ হরণের ক্ষমতা বিদ্যমান থাকে। তাই প্রত্যেকের ক্রিয়াকে ভিন্ন ভিন্ন জেনায়াত বা অপরাধ বিবেচনা করা হয় এবং প্রত্যেককে নিজ অপরাধের দায়ে হত্যা করা হয়।

পক্ষান্তরে চুরির ক্ষেত্রে প্রত্যেকের কাজ পৃথক অপরাধ নয়। বরং এখানে অপরাধটি হলো দশ দিরহাম চুরি। যা কোনো একজনের মাধ্যমে সংঘটিত হয়নি। বিধায় চুরিকে হত্যাকাণ্ডের সাথে কিয়াস করা যাবে না। বরং চুরির ক্ষেত্রে প্রত্যেকের পক্ষে পৃথক ভাবে হাতকাটার কারণ তথা দশ দিরহাম চুরি বিদ্যমান আছে কিনা তা বিবেচনা করতে হবে। যদি প্রত্যেকের পক্ষে এই কারণ বিদ্যমান থাকে, তাহলে প্রত্যেকের হাত কেটে দেওয়া হবে। যদি বিদ্যমান না থাকে তাহলে কাটা যাবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ مَا يُقْطَعُ فِيْهِ وَمَالَا يُقْطَعُ

وَلَا قَطْعَ فِيْمَا يُوْجَدُ تَافِهًا مُبَاحًا فِيْ دَارِ الْإِسْلَامِ كَالْخَشَبِ وَالْحَشِيْشِ وَالْقَصَبِ وَالسَّمَكِ وَالطَّيْرِ وَالصَّيْدِ وَالزِّرْنِيْخِ وَالْمَغَرَةِ وَالنُّوْرَةِ وَالْأَصْلُ فِيْهِ حَدِيْثُ ﴿عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَتِ الْيَدُ لَا تُقْطَعُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ﴾. اَيِ الْحَقِيْرِ، وَمَا يُوْجَدُ جِنْسُهُ مُبَاحًا، فِي الْأَصْلِ بِصُوْرَتِهِ غَيْرُ مَرْغُوْبٍ فِيْهِ حَقِيْرٌ تَقِلُّ الرَّغَبَاتُ فِيْهِ وَالطِّبَاعُ لَا تَضِنُّ بِهِ، فَقَلَّمَا يُوْجَدُ اَخْذُهُ عَلَى كُرْهٍ مِنَ الْمَالِكِ فَلَا حَاجَةَ اِلَى شَرْعِ الزَّاجِرِ، وَلِهٰذَا لَمْ يَجِبِ الْقَطْعُ فِي سَرِقَةِ مَا دُوْنَ النِّصَابِ وَلِاَنَّ الْحِرْزَ فِيْهَا نَاقِصٌ؛ اَلَا يُرٰى اَنَّ الْخَشَبَ يُلْقٰى عَلَى الْأَبْوَابِ وَاِنَّمَا يُدْخَلُ فِي الدَّارِ لِلْعِمَارَةِ لَا لِلْاِحْرَازِ وَالطَّيْرُ يَطِيْرُ وَالصَّيْدُ يَفِرُّ وَكَذَا الشَّرِكَةُ الْعَامَّةُ الَّتِي كَانَتْ فِيْهِ وَهُوَ عَلٰى تِلْكَ الصِّفَةِ تُوْرِثُ الشُّبْهَةَ، وَالْحَدُّ يَنْدَرِئُ بِهَا. وَيَدْخُلُ فِي السَّمَكِ الْمَالِحُ وَالطَّرِيُّ، وَفِي الطَّيْرِ الدَّجَاجُ وَالْبَطُّ وَالْحَمَامُ لِمَا ذَكَرْنَا وَلِاِطْلَاقِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ﴿لَا قَطْعَ فِي الطَّيْرِ﴾ وَعَنْ اَبِيْ يُوْسُفَ اَنَّهُ يَجِبُ الْقَطْعُ فِيْ كُلِّ شَيْءٍ اِلَّا الطِّيْنَ وَالتُّرَابَ وَالسِّرْقِيْنَ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا ذَكَرْنَا ـ

পরিচ্ছেদ : যে বিষয়ে কর্তন হবে আর যে বিষয়ে কর্তন হবে না

অনুবাদ : যে সব বস্তুকে দারুল ইসলামে নগণ্য ও মুবাহ (সকলের জন্য বৈধ) মনে করা হয়, তাতে হস্ত কর্তন হবে না। যেমন লাকড়ি, ঘাস, বাঁশ, মাছ, পাখি, বিভিন্ন শিকার, হরিতাল, লালমাটি, চুন ইত্যাদি।

এ ক্ষেত্রে মূলভিত্তি হলো হযরত আয়েশা (রা.) -এর হাদীস। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ -এর যুগে সাধারণ তুচ্ছ বস্তুর জন্য হস্ত কর্তন করা হতো না। আর যে জিনিস স্বরূপে মূলত বিনামূল্যে বৈধরূপে পাওয়া যায় এবং যা আগ্রহের বিষয় নয়, সেগুলো তুচ্ছ রূপে গণ্য। কেননা এসবে সাধারণত মানুষের চাহিদা থাকে না এবং দিতে কার্পণ্যও করে না।

ফলে এসকল জিনিস মালিকের নিকট থেকে জোরপূর্বক নেওয়া খুব কমই হয়। সুতরাং শাসনমূলক বিধান প্রবর্তনের কোনো প্রয়োজন নেই। একারণেই তো নেসাবের কম পরিমাণ চুরির ক্ষেত্রে হস্ত কর্তন ওয়াজিব হয়নি।

তাছাড়া আলোচ্য জিনিসগুলোর ক্ষেত্রে সংরক্ষণ ত্রুটিপূর্ণ থাকে। তুমি কি দেখ না যে, লাকড়ি দরজার বাইরে ফেলে রাখা হয়। বাড়ির ভিতরে আনা হয় নির্মাণ কাজের জন্য। সংরক্ষণের জন্য নয়।

আর পাখিতো উড়ে যায় এবং শিকার পালিয়ে যায়। তদ্রূপ এর মাঝে যে গণমালিকানা রয়েছে তা এই গুণগত অবস্থায় সন্দেহ উদ্রেক করে। আর সন্দেহ হদ্দ প্রতিহতকারী। মাছের ক্ষেত্রে শুষ্ক ও তাজা সবই অন্তর্ভুক্ত হবে। আর পাখির মধ্যে মোরগ, হাঁস, কবুতর অন্তর্ভুক্ত হবে, আমাদের পূর্বোল্লিখিত কারণে। তাছাড়া নবী করীম ﷺ এর হাদীস ও নিঃশর্তরূপে বর্ণিত হয়েছে। যেমন– لَا قَطْعَ فِي الطَّيْرِ পাখির মধ্যে কর্তন নেই।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) হতে বর্ণিত রয়েছে যে, সব কিছুতেই হস্ত কর্তন ওয়াজিব হবে। কাদা, মাটিও গোবর ব্যতীত। এটা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এরও অভিমত কিন্তু তার বিপক্ষে প্রমাণ হচ্ছে যা আমরা বর্ণনা করেছি।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বসামঞ্জস্য : ইতিপূর্বে গ্রন্থকার السرقة -এর সংজ্ঞা ও শর্ত শরায়েত নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাই এ অনুচ্ছেদে তিনি السرقة -এর ক্ষেত্র নিয়ে আলোচনা করবেন। অর্থাৎ কোন কোন সম্পদে السرقة সংঘটিত হয়, আর কোন কোন সম্পদে হয় না।

গ্রন্থকার বলেন, দারুল ইসলামে বা ইসলামি রাষ্ট্রে যে সব বস্তুকে নগণ্যও সকলের জন্য মুবাহ মনে করা হয়, সেসব বস্তু চুরি করলে হাতকাটা যাবে না। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করেছেন, লাকড়ি, ঘাস বাঁশ, মাটি, চুন ইত্যাদির নাম।

অতঃপর তিনি নিজ বক্তব্যের পক্ষে নকলীও আকলী দলিল পেশ করেছেন।

নকলী দলিল : হযরত আয়েশা (রা)-এর হাদীস। তিনি বলেছেন– নবী করীম ﷺ -এর যুগে সাধারণ বিষয় বস্তুর জন্য হাত কাটা হতো না।

সাধারণ বস্তুর পরিচয় দিতে গিয়ে মুসান্নিফ (র.) বলেন, যেসব বস্তু স্বরূপে মুবাহ অবস্থায় পাওয়া যায় এবং যার দিকে মানুষের আকর্ষণ থাকে না। "স্বরূপে" বলে কাষ্ঠনির্মিত পাত্র, দরজা ইত্যাদিকে বাদ দিয়েছেন। কেননা পাত্র দরজা ইত্যাদি মূলত কাঠ বা লাকড়ি হলেও তার উপর বিশেষ ক্রিয়াকর্মের কারণে মূল্যবান বস্তুতে পরিণত হয়েছে। একারণে এগুলো চুরি করলে হাত কাটা হবে। "যার প্রতি মানুষের আকর্ষণ থাকে না" বলে গ্রন্থকার স্বর্ণ-রৌপ্য, মণিমুক্তা, জহরত ইত্যাদিকে বাদ দিয়েছেন। কেননা এগুলোর প্রতি মানুষের আকর্ষণ থাকার কারণে এগুলো নগণ্য বস্তুর আওতায় পড়ে না।

আকলী দলিল : উপরিউক্ত ধরনের বস্তুসমূহের প্রতি মানুষের আকর্ষণ কম থাকে এবং মানুষ সেগুলো কাউকে দিতে সাধারণত কার্পণ্য করে না। তাই এগুলো কারো নিকট হতে জোর পূর্বক ছিনিয়েও নেওয়া হয় না, এ কারণে এ জাতীয় বস্তুর ক্ষেত্রে কঠিন কোনো বিধান জারি করার প্রয়োজন নেই।

সাধারণ বস্তুর ক্ষেত্রে বিধান জারির প্রয়োজন হয় না -এ কথার সমর্থকরূপে বলেছেন, তাই নেসাব পরিমাণ অপেক্ষা কম মাল চুরি করলে হাত কাটা হয় না। কারণ নেসাবের কম মাল তুচ্ছ বস্তুর আওতায় পড়ে।

আরেকটি কারণ হলো, তুচ্ছ বস্তু সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ত্রুটি থাকে। অথচ হাত কাটার জন্য শর্ত হলো, সংরক্ষিত স্থান হতে চুরি হওয়া। অতএব, তুচ্ছ বস্তুসমূহ যেহেতু সংরক্ষিত থাকে না, তাই সেগুলো চুরির কারণে হাত কাটা যাবে না।

উপরিউক্ত জিনিসগুলো অরক্ষিত হওয়ার সমর্থনে তিনি বলেন– লাকড়ি মানুষেরা বাড়ি-ঘরের বাহিরে ফেলে রাখে। কখনো এগুলো ঘরের ভিতরে আনলেও আনা হয় নির্মাণ কাজের উদ্দেশ্যে। সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ঘরের ভিতরে আনা হয় না। এর দ্বারা বুঝা যায়, লাকড়ি ইত্যাদি অরক্ষিত বস্তু। আর অরক্ষিত বস্তু চুরি করলে হাত কাটা যায় না।

হাত না কাটার আরেকটি কারণ হলো, উপরিউক্ত জিনিস সমূহে হাদীসের দ্বারা গণ মালিকানা প্রতিষ্ঠিত আছে। তাই সেসব বস্তু কেউ কারো সংগ্রহ থেকে নিয়ে গেলে তা আপাত দৃষ্টিতে চুরি বলে ধরা হয়। কিন্তু তাতে চোরের জন্য বৈধ হওয়ার সন্দেহ থেকে যায়, সেই গণমালিকানার কারণে। আর সন্দেহ মাত্রই হদ্দ বাতিল করে দেয়। বিধায় উপরিউক্ত শ্রেণির জিনিস চুরি করার ফলে চোরের হাত কাটা যাবে না।

পাখি ও অন্যান্য শিকার চুরি করলেও হাত কাটা যাবে না। কারণ এগুলো অসংরক্ষিত। অসংরক্ষিত হওয়ার যুক্তি হলো পাখি উড়ে চলে যায়। শিকার পালিয়ে যায়। উড়ে যাওয়া, পালিয়ে যাওয়া উভয়ই সংরক্ষণের পরিপন্থি বিষয়। এ পর্যন্ত আকলী দলিল সমাপ্ত।

কুদূরীর মতনে উল্লিখিত الطير শব্দের ব্যাপকতার অধীনে মোরগ– মুরগি, হাঁস, কবুতর ইত্যাদি রয়েছে। আর السمك শব্দের ব্যাপকতা লোনা, তাজা, শুকনা সর্ব প্রকার মাছকেই অন্তর্ভুক্ত করে। এ প্রসঙ্গে মুসান্নিফ (র.) একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। এ হাদীসটি মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা ও মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক নামক হাদীস গ্রন্থে হযরত ওসমান (রা.) -এর সূত্রে বর্ণিত আছে যে, لَاقَطْعَ فِى الطَّيْرِ পাখিতে হাত কাটা নেই। হাদীসটির الطير শব্দটি ব্যাপক। অতএব, হাঁস, মুরগি সবই এর আওতাভুক্ত।

সবশেষে মুসান্নিফ (র.) ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) হতে বর্ণিত মাসআলায় দ্বিমত পোষণ করেছেন। তিনি নাকি বলেছেন, কাদা, মাটিও গোবর ছাড়া যে কোনো বস্তু চুরির দায়ে হাতকাটা যাবে। কিন্তু আমাদের বর্ণিত দলিল প্রমাণের আলোকে তার এমত গ্রহণযোগ্য নয়।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ : وَلَا قَطْعَ فِيمَا يَتَسَارَعُ اِلَيْهِ الْفَسَادُ كَاللَّبَنِ وَاللَّحْمِ وَالْفَوَاكِهِ الرَّطْبَةِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ﴿لَا قَطْعَ فِيْ ثَمَرٍ وَلَا فِيْ كَثَرٍ﴾ وَالْكَثَرُ الْجُمَّارُ، وَقِيْلَ اَلْوَدِيُّ . وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ﴿لَا قَطْعَ فِي الطَّعَامِ﴾ وَالْمُرَادُ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ مَا يَتَسَارَعُ اِلَيْهِ الْفَسَادُ كَالْمُهَيَّا لِلْاَكْلِ مِنْهُ وَمَا فِيْ مَعْنَاهُ كَاللَّحْمِ وَالثَّمَرِ لِاَنَّهُ يُقْطَعُ فِي الْحِنْطَةِ وَالسُّكَّرِ اِجْمَاعًا . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يُقْطَعُ فِيْهَا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ﴿لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ فَإِذَا اٰوَاهُ الْجَرِينُ اَوِ الْجِرَانُ قُطِعَ﴾ قُلْنَا : اَخْرَجَهُ عَنْ وِفَاقِ الْعَادَةِ، وَالَّذِي يُؤْوِيهِ الْجَرِينُ فِي عَادَتِهِمْ هُوَ الْيَابِسُ مِنَ الثَّمَرِ وَفِيْهِ الْقَطْعُ.

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, দুধ, গোশ্‌ত, কাঁচা ফল ইত্যাদি শীঘ্র পচনশীল বস্তুর ক্ষেত্রে হস্ত কর্তন নেই। কেননা নবী করীম ﷺ বলেছেন, لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا فِي كَثَرٍ ফল ও কাছারের মধ্যে হস্ত কর্তন নেই। কাছার শব্দের অর্থ হলো গাছের মাথি। কোনো কোনো মতে খেজুর বৃক্ষের চারা। নবী করীম ﷺ আরো বলেছেন, لَا قَطْعَ فِي الطَّعَامِ খাদ্য বস্তুর মধ্যে হস্ত কর্তন নেই। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে (আল্লাহ ভালো জানেন) যা দ্রুত পঁচনশীল। যেমন আহারের জন্য তৈরি খাবার এবং যা কিছু এর পর্যায়ভুক্ত। যেমন গোশত ও ফলমূল। এ ব্যাখ্যার কারণ হলো, সর্বসম্মতিক্রমে গম ও চিনির ক্ষেত্রে হস্ত কর্তন কার্যকর হয়।

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন, এ সকল বস্তুতেও হস্ত কর্তন করা হবে। কেননা নবী করীম ﷺ বলেছেন–

لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ فَإِذَا اٰوَاهُ الْجَرِينُ اَوِ الْجِرَانُ قُطِعَ

অর্থাৎ ফলও মাথির মধ্যে কর্তন নেই, তবে গোলায় উঠিয়ে রাখার পর কর্তন করা হবে।

আমরা বলব, দ্বিতীয় অংশটি তিনি তখনকার প্রচলন হিসাবে বলেছেন। কেননা শুকনো ফলই গোলায় উঠানোর প্রচলন ছিল। আর তাতে হস্ত কর্তন বিধেয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

দুধ, গোশ্‌ত ও ফল চুরি করলে হাত কাটা হবে কিনা– এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। গ্রন্থকার দুটি মত উল্লেখ করেছেন-

১. দুধ, গোশত, ফল ইত্যাদি দ্রুত পঁচনশীল বস্তু চুরি করলে হাত কাটা হবে না। এ মতটি ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও তার বিশিষ্ট শাগরিদ ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর।

২. উল্লিখিত বস্তু চুরি করার কারণে হাত কাটা হবে। এ মত পোষণ করেন ইমাম আবূ ইউসুফ (র.), ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)।

দলিল : ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.) নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করেন।

১. তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী ইবনে মাজাহ, মুস্তাদরাকে হাকেম অন্যান্য কিতাবে হযরত রাফে, ইবনে খাদীজ (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন– لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا فِي كَثَرٍ ফল ও গাছের মাথিতে হস্ত কর্তন নেই।

https://e-ilm.weebly.com/

শাইখ হাফেজ ইবনে হাজার (র.) বলেছেন, হাদীসটির সনদ সহীহ। ত্বহাবী (র.) বলেছেন, এ হাদীসটি আলেমগণের কাছে গৃহীত ও সমাদৃত। ইবনুল আরাবী বলেছেন, এ হাদীস সম্পর্কে কেউ কোনো আপত্তি করলে তা শ্রবণযোগ্য নয়। মোটকথা হাদীসটি সহীহ এবং মশহুর।

২. اَنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لَا قَطْعَ فِىْ الطَّعَامِ নবী করীম ﷺ বলেছেন, খাদ্যদ্রব্যে হস্ত কর্তন নেই। এ হাদীসটি উল্লিখিত শব্দে গরীব। (নসবুর রায়াহ, যাইলায়ী) তবে মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বাতে হাদীসটি এভাবে বর্ণিত আছে যে,

حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ اَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ وَعَمْرٍو عَنِ الْحَسَنِ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُتِىَ بِرَجُلٍ سَرَقَ طَعَامًا فَلَمْ يَقْطَعْ ـ

অর্থাৎ নবী করীম ﷺ এর নিকট একলোককে আনা হলো, যে খাদ্য চুরি করেছে। নবী করীম ﷺ তার হাত কাটেননি। মুসান্নাফে আবদুর রাযযাকে উক্ত হাদীসের পর এতটুকুও উল্লেখ আছে, قَالَ سُفْيَانُ هُوَ الطَّعَامُ الَّذِىْ يَفْسُدُ لَيْسَ لَهٗ بَقَاءٌ كَالثَّرِيْدِ وَاللَّحْمِ অর্থাৎ সুফিয়ান বলেছেন, হাদীসে উল্লিখিত খাদ্য দ্বারা এমন খাদ্য বুঝানো হয়েছে, যা বেশি সময় থাকে না। নষ্ট হয়ে যায়। যেমন সারীদ ও গোশ্‌ত ইত্যাদি।

গ্রন্থকার (র.) ও হাদীসটি এ অর্থেই গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেছেন, উদ্দেশ্য হলো যেসব খাদ্য দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়। যেমন– আহারের জন্য তৈরি খাবার ও যা কিছু এর পর্যায়ভুক্ত। যেমন– গোশ্‌ত ও ফলমূল। এ রকম ব্যাখার কারণ দর্শাতে গিয়ে তিনি বলেছেন, কেননা আমরা দেখতে পাই যে, গম বা চিনি চুরি করলে সর্বসম্মতিক্রমে হাত কাটা হয়। এতে বুঝা যায়, হাদীসে উল্লিখিত طعام (খাদ্য) শব্দটি ব্যাপক অর্থে প্রযোজ্য নয়। তাই এর দ্বারা দ্রুত পচনশীল খাদ্য বুঝানোই উদ্দেশ্য হবে।

ইমাম শাফেয়ী (র.) ও তার সমমতাবলম্বীগণ দলিল পেশ করেন নবী করীম ﷺ -এর হাদীস দ্বারা তিনি ইরশাদ করেন,

لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ فَاِذَا اٰوَاهُ الْجَرِيْنُ اَوِ الْجِرَانُ قُطِعَ

ফল ও গাছের মাথিতে হস্ত কর্তন নেই, তবে গোলায় উঠানোর পর কর্তন করা হবে। হাদীসটি আবূ দাউদ নাসায়ী ও অন্যান্য কিতাবে বর্ণিত আছে। আহনাফের পক্ষ থেকে জবাব :

১. যে ফল গোলায় উঠানো হয় তা শুকনো হয়ে থাকে। আর শুকনো ফল চুরি করলে হাত কাটার কথা আমরাও বলি।

২. ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হাদীসটি لَا قَطْعَ فِيْ ثَمَرٍ وَلَا فِيْ كَثَرٍ -এর সাথে সাংঘর্ষিক। আর হুদূদের ক্ষেত্রে সে হাদীসই অগ্রাধিকার যোগ্য হয়, যা দ্বারা হদ্দ রহিত হয়। সে হিসাবে لَا قَطْعَ فِيْ ثَمَرٍ وَلَا فِيْ كَثَرٍ হাদীসটিই প্রাধান্য পায়।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ وَلاَ قَطْعَ فِي الْفَاكِهَةِ عَلَى الشَّجَرِ وَالزَّرْعِ الَّذِي لَمْ يُحْصَدْ لِعَدَمِ الإِحْرَازِ فِيْهَا . وَلاَ قَطْعَ فِي الْأَشْرِبَةِ الْمُطْرِبَةِ لِاَنَّ السَّارِقَ يَتَاَوَّلُ فِيْ تَنَاوُلِهَا الإِرَاقَةَ، وَلِاَنَّ بَعْضَهَا لَيْسَ بِمَالٍ، وَفِيْ مَالِيَّةِ بَعْضِهَا اِخْتِلاَفُ فَتَتَحَقَّقُ شُبْهَةُ عَدَمِ الْمَالِيَّةِ قَالَ وَلاَ فِي الطُّنْبُوْرِ لِاَنَّهُ مِنْ الْمَعَازِفِ وَلاَ فِي سَرِقَةِ الْمُصْحَفِ وَاِنْ كَانَ عَلَيْهِ حِلْيَةٌ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رحـ) : يُقْطَعُ لِاَنَّهُ مَالٌ مُتَقَوِّمٌ حَتّٰى يَجُوْزَ بَيْعُهُ . وَعَنْ اَبِيْ يُوْسُفَ (رحـ) مِثْلُهُ . وَعَنْهُ اَيْضًا اَنَّهُ يُقْطَعُ اِذَا بَلَغَتِ الْحِلْيَةُ نِصَابًا لِاَنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ الْمُصْحَفِ فَتُعْتَبَرُ بِانْفِرَادِهَا. وَوَجْهُ الظَّاهِرِ اَنَّ الْاَخِذَ يَتَاَوَّلُ فِيْ أَخْذِهِ الْقِرَاءَةَ وَالنَّظَرَ فِيْهِ، وَلِاَنَّهُ لاَ مَالِيَّةَ لَهُ عَلٰى اِعْتِبَارِ الْمَكْتُوْبِ وَاِحْرَازُهُ لِاَجْلِهِ لاَ لِلْجِلْدِ وَالْاَوْرَاقِ وَالْحِلْيَةِ وَاِنَّمَا هِيَ تَوَابِعُ وَلاَ مُعْتَبَرَ بِالتَّبَعِ، كَمَنْ سَرَقَ اٰنِيَةً فِيْهَا خَمْرٌ وَقِيْمَةُ الْاٰنِيَةِ تَرْبُوْ عَلَى النِّصَابِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, গাছে বিদ্যমান ফল এবং ক্ষেতে অকর্তিত ফসল চুরিতে হস্ত কর্তন নেই। কেননা এ ক্ষেত্রে সংরক্ষণের বিদ্যমানতা নেই। আর নেশামূলক পানীয় চুরিতে হস্ত কর্তন নেই।

কেননা চোর সেগুলো ফেলে দেওয়ার জন্য নিয়েছে বলে ব্যাখ্যা দিতে পারে। তাছাড়া এর কোনো কোনোটি তো মালরূপে গণ্য নয়। আর কোনোটির বিষয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। সুতরাং মাল না হওয়ার সন্দেহ বিদ্যমান।

আর তম্বুরা চুরিতে হস্ত কর্তন নেই। কেননা এটা বাদ্যযন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। **কুরআন মাজীদ চুরিতে হস্তকর্তন নেই। যদিও তা স্বর্ণখচিত হয়।**

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, হস্ত কর্তন সাব্যস্ত হবে। কেননা এটা অর্থমূল্য সম্পন্ন সম্পদ। এজন্যই তো তা বিক্রি করা জায়েজ।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) হতেও এরূপ বর্ণিত আছে। তার পক্ষ থেকে এরূপও বর্ণিত আছে যে, মণ্ডিত নকশা যদি নেসাব পরিমাণ হয়, তাহলে কর্তন সাব্যস্ত হবে। কেননা তা কুরআন শরীফভুক্ত নয়। সুতরাং সেটাকে আলাদা বিবেচনা করা হবে। জাহিরে রেওয়ায়েতের কারণ এই যে, হরণকারী তা নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে দেখার ও পড়ার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে পারে। তাছাড়া লেখা হিসাবে এর কোনো অর্থমূল্য নেই। লেখা বিষয়ের জন্যই এটা সংরক্ষণ করা হয়। বাঁধাই, কাগজ কিংবা অলংকারের জন্য তা সংরক্ষণ করা হয় না। কেননা এগুলো হচ্ছে অনুবর্তী জিনিস। আর অনুবর্তী জিনিস বিবেচ্য নয়। যেমন কেউ মদপূর্ণ পাত্র চুরি করলে যার মূল্য নেসাব অপেক্ষা অধিক। (হাত কাটা হয় না, পাত্রটি মদের অনুবর্তী জিনিস হওয়ার কারণে।)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিউক্ত ইবারতে দুটি মাসআলা বর্ণিত হয়েছে।

১. গাছের ফল ও ক্ষেতের ফসল চুরি করলে চোরের হাত কাটা হবে না। কারণ হাত কাটার জন্য শর্ত হলো সংরক্ষিত স্থান হতে চুরি করা। গাছ ও ক্ষেত সংরক্ষিত স্থান নয়। অতএব, গাছ হতে ফল ও ক্ষেত হতে ফসল চুরি করলে চোরের হাত কাটা হবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

২. নেশাজাত পানীয় চুরি করলেও হাত কাটা যাবে না। কারণ নেশাজাত দ্রব্য যে চুরি করে তার এমন ব্যাখ্যা দেওয়ার সুযোগ আছে যে, আমি তা চুরি করিনি। বরং অসৎকাজের পথ রোধ করার জন্য আমি তার মাদক দ্রব্য নিয়ে ফেলে দিয়েছি। এরকম ব্যাখ্যা দিলে হাত কাটা যায় না।

আরেকটি কারণ হলো এই যে, নেশাজাত দ্রব্য অনেক আলেমের মতে মালই নয়। যেমন– ইমামত্রয়ের মতে নেশাজাত যেকোনো দ্রব্য খামর বা মদের অন্তর্ভুক্ত। আর আহনাফের মতে নেশাজাত দ্রব্যটি যদি মিষ্ট হয় তাহলে দ্রুত পচনশীল বস্তুর আওতাভুক্ত। আর যদি তিক্ত হয়, তাহলে দুই অবস্থা। হয়তো তা খামর হবে, তাহলে এটা অসম্পদ, মূল্যহীন অথবা খামর হবে না, সাধারণ নেশাদ্রব্য হবে। এমতাবস্থায় এটা মাল হওয়ার ব্যাপারে আলেমগণের মতবিরোধ রয়েছে।

মোটকথা, নেশাজাত দ্রব্য হয়তো অসম্পদ কিংবা সম্পদ হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ যুক্ত। অতএব, এটা চুরি করলে হাত কাটা যাবে না। কেননা হাত কাটার জন্য এমন সম্পদ চুরি করা শর্ত, যার একটি মূল্যমান থাকে সর্বসম্মতিক্রমে।

وَلَا فِي الطُّنْبُوْرِ لِاَنَّهٗ مِنَ الْمَعَازِفِ : উপরিউক্ত ইবারতে দুটি মাসআলা আলোচিত হয়েছে।

১. তাম্বুর চুরি করলে হাত কাটা হবে না। তাম্বুর কাষ্ঠ নির্মিত এক প্রকার বাদ্যযন্ত্রের নাম। এটা চুরি করলে হাত কাটা যায় না। অনুরূপভাবে যে কোনো অবৈধ বিনোদনের মাধ্যমের ক্ষেত্রেও একই কথা। অর্থাৎ ঢোল, বেহালা, সারিন্দা, তবলা সব কিছুর একই হুকুম।

২. কুরআন শরীফ চুরি করলে হাত কাটা যাবে কিনা? এ মাসআলায় তিন রকম মত বর্ণিত হয়েছে।

এক. কুরআন শরীফ চুরি করলে হাত কাটা হবে না। যদিও সে কুরআন স্বর্ণ খচিত হয়। এটা আহনাফের মাযহাব জাহিরে রেওয়ায়েত মুতাবেক।

দুই. কুরআনের গায়ে খচিত স্বর্ণ-রোপার পরিমাণ যদি নেসাব পরিমাণ হয়, তাহলে হাত কাটা হবে। এ মতটি ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) হতে বর্ণিত।

তিন. কুরআন শরীফ চুরি করলে হাত কাটা হবে। এটা ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মত। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) হতে এ সকল মত বর্ণিত আছে।

দলিল : ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল এই যে, কুরআন শরীফ একটি অর্থ মূল সম্পন্ন বস্তু। এটা কেনা-বেচা করা হয়। অতএব, অন্য সব মূল্যবান বস্তু চুরি করলে যেমন হাত কাটা হয়, তেমনি কুরআন শরীফ চুরি করলেও হাত কাটা হবে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল হলো কুরআন শরীফের গায়ে যে স্বর্ণ-রৌপ্য খচিত থাকে, তা কুরআন শরীফের অন্তর্গত জিনিস নয়। অতএব, সে সব অলংকারকে পৃথকভাবে বিবেচনা করতে হবে। অতএব, কুরআনের গায়ে খচিত না হলে যে হুকুম হতো, কুরআনের গায়ে লাগানোর পরও সে হুকুমেই হবে। তাই খচিত স্বর্ণ রৌপ্যের পরিমাণ দশ দিরহাম বা এর চেয়ে বেশি হয়, তাহলে চোরের হাত কাটা হবে। জাহিরে রেওয়ায়েতের দলিল হলো এই যে, কুরআন হরণকারী ব্যক্তি এরকম ব্যাখা দিতে পারে যে, আমি চুরি করিনি, আমি কুরআন শরীফটি দেখার জন্য নিয়েছিলাম কিংবা পড়ার জন্য নিয়েছিলাম। তা ছাড়া কুরআন শরীফ লিখিত গ্রন্থ হওয়ার বিচেনায় এটা কোনো মাল নয়। যদিও কাগজ, বাইণ্ডিং ও অলংকারগুলো মাল; কিন্তু এগুলো মাল হলেও কুরআন যা মাল নয় তার অনুবর্তী বস্তু। অনুবর্তী বস্তু বিবেচ্য হয় না। তাই কুরআন মাল না হওয়ার কারণে চোরের হাত কাটা হবে না।

অনুবর্তী জিনিস যে বিবেচ্য হয় না এর নজির হলো কেউ মদ ভর্তি একটি পাত্র চুরি করল, পাত্রটির মূল্য দশ দিরহামের বেশি। এমতাবস্থায় চোরের হাত কাটা হয় না। কেননা পাত্রটি মাল হলে তা মদের অনুবর্তী। আর মদ মাল নয়। তাই মদের সাথে অনুবর্তী সম্পদ পাত্র চুরি করা সত্ত্বেও চোরের হাত কাটা হয় না। অনুরূপভাবে কুরআন যা মাল নয়, তার সাথে তার অনুবর্তী স্বর্ণ চুরি করা হলেও চোরের হাত কাটা যাবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

وَلا قَطْعَ فِيْ اَبْوَابِ الْمَسْجِدِ لِعَدَمِ الْاِحْرَازِ فصَارَ كَبَابِ الدَّارِ بَلْ اَوْلَى، لِاَنَّهُ يُحَرَّزُ بِبَابِ الدَّارِ مَا فِيْهَا وَلَا يُحَرَّزُ بِبَابِ الْمَسْجِدِ مَا فِيْهِ حَتّٰى لَا يَجِبُ الْقَطْعُ بِسَرِقَةِ مَتَاعِهِ . قَالَ وَلَا الصَّلِيْبِ مِنَ الذَّهَبِ وَلَا الشِّطْرَنْجِ وَلَا النَّرْدِ لِاَنَّهُ يَتَاَوَّلُ مَنْ اَخَذَهَا الْكَسْرَ نَهْيًا عَنِ الْمُنْكَرِ، بِخِلَافِ الدِّرْهَمِ الَّذِيْ عَلَيْهِ التِّمْثَالُ لِاَنَّهُ مَا اُعِدَّ لِلْعِبَادَةِ فَلَا تَثْبُتُ شُبْهَةُ اِبَاحَةِ الْكَسْرِ . وَعَنْ اَبِيْ يُوْسُفَ اَنَّهُ اِنْ كَانَ الصَّلِيْبُ فِي الْمُصَلّٰى لَا يُقْطَعُ لِعَدَمِ الْحِرْزِ، وَاِنْ كَانَ فِيْ بَيْتٍ اٰخَرَ يُقْطَعُ لِكَمَالِ الْمَالِيَّةِ وَالْحِرْزِ .

অনুবাদ : আর মসজিদের দরজাগুলোর ক্ষেত্রেও হস্ত কর্তন হবে না। কেননা এখানে সংরক্ষণ নেই। সুতরাং সেগুলো বাড়ির দরজার মতো হলো; বরং এর চেয়ে বেশি হলো। কেননা বাড়ির দরজা দ্বারা তো ভিতরের জিনিস হেফাজত করা উদ্দেশ্য হয়। কিন্তু মসজিদের দরজা দ্বারা ভিতরের জিনিস হেফাজতও উদ্দেশ্য হয় না। এজন্যই মসজিদের সামান চুরি করলে হাতকাটা যায় না।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, **স্বর্ণের ক্রুশ, দাবা ও বিলিয়ার্ড খেলার সামগ্রী চুরিতে হস্ত কর্তন নেই।** কেননা সে অন্যায় কর্মে বাধা দেওয়ার জন্য এগুলো ভেঙ্গে ফেলার উদ্দেশ্যে নিয়েছে বলে বিকল্প ব্যাখ্যা দিতে পারে। মূর্তির অংকন সম্বলিত দিরহামের বিষয়টি ভিন্ন, কেননা সেটা পূজার জন্য তৈরি হয়নি। সুতরাং এক্ষেত্রে ভেঙ্গে ফেলার বৈধতায় সন্দেহ সাব্যস্ত হবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) হতে বর্ণিত রয়েছে যে, ক্রুশ যদি প্রার্থনার স্থানে থাকে, তাহলে সংরক্ষিত না হওয়ার কারণে কর্তন করা হবে না। পক্ষান্তরে যদি অন্য কোনো ঘরে থাকে, তাহলে পূর্ণ সম্পদগত ও সংরক্ষণগত দিকের বিবেচনায় হস্ত কর্তন সাব্যস্ত হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মসজিদে হারাম বা যে কোনো মসজিদের দরজা চুরি করলে হাত কাটা হবে কি-না, এ মাসআলাতে ইমামদের মতভেদ রয়েছে।

আহনাফের মত হলো, মসজিদের দরজা চুরি করলে হাত কাটা হবে না।

কারণ মসজিদের দরজা সংরক্ষিত মাল নয়। আর সংরক্ষিত নয় এমন কিছু চুরি করলে চোরের হাত কাটা হয় না, এটা স্বীকৃত কথা। যেমন বাড়ি ঘরের দরজা চুরি করলেও হাত কাটা হয় না। তা অসংরক্ষিত হওয়ার কারণে। অতএব, অসংরক্ষিত হওয়ার দিক থেকে ঘরের দরজা আর মসজিদের দরজা সমান। দুটির কোনোটির চুরি দ্বারাই হস্ত কর্তন ওয়াজিব হয় না।

আরেক বিবেচনায় ঘরের দরজা অপেক্ষা মসজিদের দরজা এগিয়ে। কেননা ঘরের দরজা নিজে সংরক্ষিত না হলেও তা দ্বারা ঘরের ভিতরের মালপত্র সংরক্ষণ উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে মসজিদের দরজা দ্বারা তাও উদ্দেশ্য হয় না। এর প্রমাণ হলো মসজিদের জিনিস চুরি করলে হাত কাটা হয় না। যদি মসজিদের দরজা দ্বারা মসজিদের মালামাল সংরক্ষণ উদ্দেশ্য হতো, তাহলে মসজিদের দরজা চুরি করলেও হাত কাটা হতো।

https://e-ilm.weebly.com/

ইমাম শাফেয়ী, আবূ ছাওর, ইবনুল মুনযির প্রমুখ ফকীহগণ বলেছেন, দরজা চুরি করলে হাতকাটা হবে। কেননা দরজার মতো জিনিস সংরক্ষিত হয়ে থাকে। বিধায় দরজাও সংরক্ষিত বলে গণ্য হবে।

ইমাম ফখরুল ইসলাম বাযদাবী (র.) বলেছেন, কোনো চোর যদি মসজিদের দরজা চুরিতে অভ্যস্ত হয়ে যায়, তাহলে তাকে কঠিনভাবে তাযীর করা হবে। জেলে আটকে রাখা হবে। যতক্ষণ না সে তওবা করে।

وَلَا الصَّلِيبِ مِنَ الذَّهَبِ : صَلِيب অর্থ ক্রুশ। তিন শাখা বিশিষ্ট একটি বস্তু। যা কাঠ দ্বারাই সাধারণত বানানো হয়। কখনো স্বর্ণ রৌপ্যও অন্যান্য ধাতব বস্তু দ্বারাও বানিয়ে থাকে, এটি খ্রিস্টানদের পূজনীয় বস্তু । যার আকৃতি এই ✢

شِطْرَنْجٌ শব্দটির ش হরফে যের, ط হরফে সাকিন, ر হরফে যবর ও ن হরফে সাকিন। قِرْطَعْبٌ শব্দের সমরূপ। অর্থ হলো দাবার গুটি, দাবার সামগ্রী। نَرْدٌ শব্দটি ن ও ر উভয় হরফে যবর । পাশা খেলার সামগ্রী। এসব বস্তু চুরি করলে হাত কাটা হবে না। কারণ চোর এরকম ব্যাখ্যা দিতে পারে যে, গুনাহের কাজে বাঁধা দানের উদ্দেশ্যে ভেঙ্গে ফেলার জন্য আমি এগুলো নিয়েছি। তাই তার হাত কাটা যাবে না। ইমাম শাফেয়ী (র.) ও আবুল খাত্তাব নামক জনৈক ফকীহ বলেছেন এগুলো চুরি করলেও চোরের হাত কাটা হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, ক্রুশ যদি উপাসনালয়ে থাকে তাহলে সেখান থেকে চুরি করলে হাত কাটা হবে না। কারণ উপাসনালয় সংরক্ষিত স্থান নয়। যে কেউ সেখানে প্রবেশের অধিকার রাখে। পক্ষান্তরে যদি ক্রুশটি কারো ঘরে থাকে, তাহলে হাত কাটা হবে। কেননা ঘর সংরক্ষিত স্থান। এবং জিনিসটিও একটি মাল। অতএব, হস্ত কর্তনের শর্ত বিদ্যমান আছে। বিধায় হস্ত কর্তন করা হবে।

দিরহামের উপর যদি ফটো অংকিত থাকে, তাহলে তার হুকুম ভিন্ন। কারণ সে ফটো পূজার জন্য বানানো হয় না। তাই সেটা চুরি করে খারাপ কাজে বাঁধা দেওয়ার ব্যাখ্যা করার সুযোগ নেই। অতএব, এরকম দিরহাম নেসাব পরিমাণ চুরি করলে হাত কেটে দেওয়া হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَلَا قَطْعَ عَلَى سَارِقِ الصَّبِيِّ الْحُرِّ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ حُلِيٌّ لِاَنَّ الْحُرَّ لَيْسَ بِمَالٍ وَمَا عَلَيْهِ مِنَ الْحُلِيِّ تَبَعٌ لَهُ، وَلِاَنَّهُ يَتَاَوَّلُ فِيْ اَخْذِهِ الصَّبِيَّ اِسْكَاتَهُ اَوْ حَمْلَهُ اِلَى مُرْضِعَتِهِ . وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ (رحـ) : يُقْطَعُ اِذَا كَانَ عَلَيْهِ حُلِيٌّ هُوَ نِصَابٌ لِاَنَّهُ يَجِبُ الْقَطْعُ بِسَرِقَتِهِ وَحْدَهُ فَكَذَا مَعَ غَيْرِهِ، وَعَلَى هٰذَا اِذَا سَرَقَ اِنَاءَ فِضَّةٍ فِيْهِ نَبِيْذٌ اَوْ ثَرِيْدٌ . وَالْخِلَافُ فِي الصَّبِيِّ لَا يَمْشِي وَلَا يَتَكَلَّمُ كَيْ لَا يَكُوْنَ فِيْ يَدِ نَفْسِهِ . وَلَا قَطْعَ فِيْ سَرِقَةِ الْعَبْدِ الْكَبِيرِ لِاَنَّهُ غَصْبٌ اَوْ خِدَاعٌ وَيُقْطَعُ فِيْ سَرِقَةِ الْعَبْدِ الصَّغِيرِ لِتَحَقُّقِهَا بِحَدِّهَا اِلَّا اِذَا كَانَ يُعَبِّرُ عَنْ نَفْسِهِ لِاَنَّهُ هُوَ وَالْبَالِغُ سَوَاءٌ فِيْ اِعْتِبَارِ يَدِهِ . وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ (رحـ) : لَا يُقْطَعُ وَاِنْ كَانَ صَغِيْرًا لَا يَعْقِلُ وَلَا يَتَكَلَّمُ اِسْتِحْسَانًا لِاَنَّهُ اٰدَمِيٌّ مِنْ وَجْهٍ مَالٌ مِنْ وَجْهٍ، وَلَهُمَا اَنَّهُ مَالٌ مُطْلَقٌ لِكَوْنِهِ مُنْتَفَعًا بِهِ اَوْ بِعَرْضِ اَنْ يَصِيْرَ مُنْتَفَعًا بِهِ اِلَّا اَنَّهُ اِنْضَمَّ اِلَيْهِ مَعْنَى الْاٰدَمِيَّةِ .

অনুবাদ : স্বাধীন ছেলে-মেয়ে চুরি করাতে হস্তকর্তন নেই। যদিও তাদের গায়ে অলংকার থাকে। কেননা স্বাধীন মানুষ মাল নয়। আর তার গায়ে বিদ্যমান অলংকার তার অনুবর্তী।

তাছাড়া সে তাকে তুলে নেওয়ার ব্যাপারে কান্না থামানো কিংবা স্তন্য দানকারিণির কাছে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে পারে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, যদি তার গায়ে নেসাব পরিমাণ অলংকার থাকে, তাহলে হস্ত কর্তন করা হবে। কেননা তা আলাদা চুরি করলে হস্ত কর্তন সাব্যস্ত হতো। সুতরাং অন্য কিছুর সাথে চুরি করলেও একই হুকুম হবে। এই একই মতপার্থক্য রয়েছে যদি এমন রূপার পাত্র চুরি করে যাতে নাবীয কিংবা ছারীদ থাকে। মতপার্থক্য হচ্ছে এমন শিশুর ক্ষেত্রে, যে হাটতে পারে না এবং কথা বলতে পারে না। যাতে সে তার নিজের নিয়ন্ত্রণে না হয়।

বড় গোলাম চুরি করায় হস্ত কর্তন নেই। কেননা এটা হচ্ছে বলপূর্বক কিংবা প্রতারণামূলক অপহরণ। **তবে অল্পবয়স্ক গোলাম চুরি করলে হস্ত কর্তন হবে।** কেননা এক্ষেত্রে চুরির পূর্ণ সংজ্ঞা সাব্যস্ত হয়। তবে যদি সে নিজের কথা প্রকাশ করে বলতে পারে তাহলে হস্ত কর্তন হবে না। কেননা আত্মনিয়ন্ত্রণের বিষয়টি বিবেচ্য হওয়ার ক্ষেত্রে সেও বয়স্ক গোলামের পর্যায়ভুক্ত।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, গোলাম যদি এত ছোটও হয় যে, সে কিছু বুঝে না এবং কথা বলতে পারে না, তবুও সূক্ষ্ম কিয়াসের দাবি অনুসারে হস্ত কর্তন সাব্যস্ত হবে না। কেননা এক হিসাবে সে মানুষ। অন্য হিসাবে সে সম্পদ।

আর তরফাইনের দলিল এই যে, গোলাম হচ্ছে নিরঙ্কুশ মাল। কেননা সে এখনই উপকারযোগ্য কিংবা উপকারযোগ্য হওয়ার সম্ভাবনা পূর্ণ। তবে তার সাথে মানব সত্তার সংযোগ ঘটেছে।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ : وَلَا قَطْعَ عَلَى سَارِقِ الصَّبِيِّ الْحُرِّ الخ :

উপরোল্লিখিত ইবারতে দুটি মাসআলা আলোচিত হয়েছে। উভয় মাসআলা মতানৈক্যপূর্ণ।

১. স্বাধীন শিশু চুরি করলে চোরের হাত কাটা হবে কি-না? এ মাসআলায় দুটি মত :

এক. স্বাধীন শিশু চুরি করলে চোরের হাত কাটা হবে না। যদি শিশুর পরিধানে অতি উন্নত মূল্যবান কাপড় কিংবা অলংকার থাকে। এমত পোষণ করেন ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মুহাম্মদ (র.), ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ, সুফিয়ান সাওরী, আবূ সাওর ইবনুল মুনযির (র.) প্রমুখ।

দুই. স্বাধীন শিশু চুরি করলে চোরের হাত কাটা হবে। এমত পোষণ করেন ইমাম আবূ ইউসুফ, ইমাম মালেক, শা'আবী ও হাসান বসরী (র.)।

দলিল : প্রথম মতটি যারা পোষণ করেন তাদের দলিল হলো স্বাধীন শিশু মাল নয়। অতএব, তাকে চুরি করার কারণে হাত কাটা যাবে না। কারণ চোরের হাত কাটার জন্য চুরিকৃত বস্তু মাল হওয়া শর্ত। আর শিশুর পরিধানে যে মূল্যবান পোষাক কিংবা অলংকার ছিল সেগুলো শিশুর অনুবর্তী বস্তু। পিছনেও বলা হয়েছে, অনুবর্তী বস্তু বিবেচ্য হয় না। তাই নেসাব পরিমাণ মূল্যের কাপড় বা অলংকারসহ শিশু চুরি করলেও চোরের হাত কাটা যাবে না।

আরেকটি দলিল হলো, শিশুকে যে হরণ করেছে তার এরকম ব্যাখ্যা দেওয়ার সুযোগ থাকে যে, আমি তাকে নিয়ে ছিলাম কান্না থামানোর জন্য অথবা আমি তাকে নিয়েছিলাম তার স্তন্য দানকারিণীর কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য।

যারা দ্বিতীয় মত পোষণ করেন তারা বলেন, শিশু অবুঝ হওয়ার কারণে সে গোলামের শ্রেণিভুক্ত। তাই শিশু গোলাম চুরি করলে যেমন হাত কাটা হয়, তেমনি স্বাধীন শিশু চুরি করলেও হাত কাটা হবে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, শিশুর গায়ের অলংকারের মূল্য নেসাব পরিমাণ হলে চোরের হাত কেটে দেওয়া হবে। কেননা নেসাব পরিমাণ মূল্যের অলংকার পৃথকভাবে চুরি করলে হাত কাটা হয়। তাই শিশুর গায়ে থাকা অবস্থায় চুরি করলেও হাত কাটা হবে। অর্থাৎ একক অবস্থায় বস্তুর যে হুকুম অন্যের সাথেও একই হুকুম, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে। পূর্বোল্লিখিত কুরআন চুরির মাসআলায়ও তিনি এমনটিই বলেছেন। উল্লেখ্য যে, এই মতভেদ কেবল এমন শিশুর ক্ষেত্রে, যে শিশু এখনো নিজের নিয়ন্ত্রণ নিজে লাভ করেনি। তাই তাকে হরণ করা চুরির আওতাভুক্ত। পক্ষান্তরে যদি শিশুটি হাটতে পারে কথা বলতে পারে এবং নিজের পরিচয় দিতে পারে তাহলে তাকে হরণ করা চুরির আওতাভুক্ত নয়। বরং তা প্রবঞ্চনা বলে গণ্য হবে এবং সে কারণে তার অপহরণকারীর হাত কাটা হবে না। সকল ইমাম এ ব্যাপারে একমত। এসুরতে কোনো মতভেদ নেই। মতভেদ হলো অবুঝ শিশুর ক্ষেত্রে।

নাবীয কিংবা সারীদ ভর্তি পাত্র চুরি করলে চোরের হাত কাটা হবে কি-না? এমাসআলায়ও দুটি মত।

এক. পাত্রটির মূল্য যদি নেসাব পরিমাণ হয় তাহলে হাত কাটা হবে। এটি ইমাম আবূ ইউসুফ, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর মত।

দুই. পাত্রের মূল্য নেসাব পরিমাণ হলেও হাত কাটা হবে না। এটি ইমাম আযম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ ও (র.)-এর অভিমত।

দলিল : প্রথম মতের দলিল হলো পাত্রটির মূল্যে যেহেতু নেসাব পরিমাণ, সেহেতু শুধু পাত্রটি চুরি করলে অবশ্যই হাত কাটা হতো। অতএব, অন্য কিছুর সাথে চুরি করলে হাত কাটা হবে। কেননা একক অবস্থায়ও অন্যের সাথে অবস্থায় কোনো বস্তুর হুকুম একই রকম। যেমন পূর্বেও বলা হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, নাবীয বা সারীদ ভর্তি পাত্র চুরির ক্ষেত্রে প্রধান উদ্দেশ্য হলো নাবীয ও সারীদ। যা চুরি করলে চোরের হাত কাটা যায় না। আর পাত্রটি হলো অনুবর্তী বস্তু। তাই সেটা বিবেচ্য হবে না মূল্য যতই হোক না কেন। কথাটা এভাবেও বলা যায় যে, আসল বা প্রধান বস্তুর দায়ে যখন চোরের হাত কাটা যাচ্ছে না, তখন অনুবর্তী বস্তুর দায়ে হাত কাটার কল্পনাও করা যায় না।

وَلَا قَطْعَ فِي سَرِقَةِ الْعَبْدِ الْكَبِيرِ الخ : উপরিউক্ত মতনে দুটি মাসআলা আলোচিত হয়েছে। প্রথম মাসআলাটি ইত্তিফাকী বা ঐকমত্যপূর্ণ। দ্বিতীয় মাসআলাটি ইখতিলাফী বা মতভেদ পূর্ণ।

প্রথম মাসআলা : কেউ যদি অন্যের বয়স্ক গোলাম চুরি করে নিয়ে যায়, তাহলে তার হাত কাটা হবে না। এ ব্যাপারে সকল ইমামগণ একমত। কারণ বয়স্ক গোলাম নিয়ে যাওয়া মূলত চুরি নয়। তা হলো প্রতারণা মূলক কিংবা জোর পূর্বক অপহরণ। অপহরণকারীর হাত কাটা যায় না।

ছোট গোলাম যদি বুঝমান হয়ে নিজের কথা নিজে প্রকাশ করতে পারে, তাহলে সেও বড় গোলামের হুকুমে। অর্থাৎ তার অপহরণকারীরও হাত কাটা যাবে না। কেননা বড় গোলামের মতোই এই ছোট গোলামের আত্মনিয়ন্ত্রণ রয়েছে। এ হিসাবে সেও বড় গোলামের শ্রেণিভুক্ত হয়ে গেছে।

দ্বিতীয় মাসআলা : কিছু বুঝে না, কথা বলতে পারে না, এমন ছোট গোলাম চুরি করলে হাত কাটা হবে কি- না? এ মাসআলায় ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর সাথে মতভেদ করেছেন। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেছেন, এমন ছোট গোলাম চুরি করলে হাত কাটা হবে না। ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, হাত কাটা হবে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল হলো ইস্তিহসান বা সূক্ষ্ম কিয়াস। তিনি বলেন, এ ছোট গোলামটি ক্রয়-বিক্রয় ও হেবার যোগ্য তার মাঝে মিরাশ জারি হয়। এদিক বিবেচনায় সে একটি মাল বা সম্পদ। আবার সে মানুষের ঔরসে জন্ম নিয়েছে, সে হিসাবে সে মানুষ। তাই তার সম্পদ বা মাল হওয়ার বিষয়টি নিরঙ্কুশ নয়; বরং তার মাল হওয়ার ব্যাপারে সংশয় দেখা দিয়েছে। আর সংশয় মাত্রই হদ্দ বাতিল করে দেয়। অতএব, মাল কি মাল নয় এরকম সংশয়যুক্ত সত্তা চুরি করার কারণে চোরের হাত কাটা যাবে না।

ইমাম আবূ হানীফাও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো, এ ছোট গোলামটি নিরঙ্কুশ মাল বা একটি সম্পদ। সম্পদ হওয়ার বিষয়ে কোনো সংশয় বা সন্দেহ নেই। কারণ তার দ্বারা এখনই উপকৃত হওয়া যায়। অথবা এখন উপকৃত হওয়া না গেলেও ভবিষ্যতে তার দ্বারা উপকৃত হওয়া যাবে; সে যোগ্যতা তার মধ্যে বিদ্যমান আছে। আর মাল উহাকেই বলে যার দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়। অতএব, ছোট গোলাম মাল হওয়ার ব্যাপারে কোনো সংশয় নেই। সে নিরেট সম্পদ। অতএব, তাকে চুরি করলে হাত কাটা হবে। তবে এ সম্পদটির সাথে অতিরিক্ত একটি গুণ সংযুক্ত হয়েছে। সেটি হলো মানবতা। এই গুণ সংযুক্তির কারণে তার সম্পদ হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো ত্রুটি সৃষ্টি করবে না।

মোটকথা, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ছোট গোলামকে নিরঙ্কুশ মাল মনে করেন না, তাই এর চুরিকে চুরি হিসাবে বিবেচনা করেন না। পক্ষান্তরে তরফাইন ছোট গোলামকে রিঙ্কুশ মাল মনে করেন। তাই এর চুরি কে চুরি হিসাবে গণ্য করেন এবং চোরের হাত কাটার নির্দেশ দেন।

https://e-ilm.weebly.com/

وَلَا قَطْعَ فِي الدَّفَاتِرِ كُلِّهَا لِاَنَّ الْمَقْصُوْدَ مَا فِيْهَا وَذٰلِكَ لَيْسَ بِمَالٍ اِلَّا فِيْ دَفَاتِرِ الْحِسَابِ لِاَنَّ مَا فِيْهَا لَا يُقْصَدُ بِالْاَخْذِ فَكَانَ الْمَقْصُوْدُ هُوَ الْكَوَاغِدُ . قَالَ وَلَا فِيْ سَرِقَةِ كَلْبٍ وَلَا فَهْدٍ لِاَنَّ مِنْ جِنْسِهَا يُوجَدُ مُبَاحُ الْاَصْلِ غَيْرُ مَرْغُوْبٍ فِيْهِ وَلِاَنَّ الْاِخْتِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ ظَاهِرٌ فِيْ مَالِيَّةِ الْكَلْبِ فَاَوْرَثَ شُبْهَةً .

অনুবাদ : আর বই-পত্র বা খাতা-পত্র জাতীয় জিনিস চুরিতে হস্ত কর্তন নেই।

কেননা এগুলো চুরির উদ্দেশ্য হচ্ছে ভিতরের (লেখা) বিষয়সমূহ। আর তা মাল নয়। **তবে হিসাবের খাতা-পত্রে কর্তন হবে।** কেননা তাতে অঙ্কিত লেখাসমূহ নেওয়া উদ্দেশ্য নয়; সুতরাং কাগজই উদ্দেশ্য হবে।

গ্রন্থকার বলেন, কুকুর বা চিতা চুরি করাতে হস্ত কর্তন নেই। কেননা এ জাতীয় প্রাণী মুবাহ রূপে পাওয়া যায়। এগুলো মানুষের আগ্রহের বিষয় নয়। তা ছাড়া কুকুরের সম্পদগুণ সম্পর্কে আলেমগণের সুস্পষ্ট মতবিরোধ রয়েছে। ফলে তা সন্দেহের উদ্রেক করে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

دفاتر শব্দটি دفتر -এর বহুবচন। অর্থ হলো– বই পুস্তক, খাতা ইত্যাদি। বর্ণিত মাসআলার সারমর্ম এই যে, যে সকল বই-পুস্তক বা খাতা চুরি দ্বারা তাতে সংরক্ষিত জ্ঞান-বিজ্ঞান উদ্দেশ্য হয়, সেসব বই পুস্তক বা খাতা চুরির কারণে হাত কাটা হয় না। আর যেসব বই পুস্তক বা খাতা চুরি দ্বারা তাতে রক্ষিত জ্ঞান-বিজ্ঞান উদ্দেশ্য হয় না; বরং কাগজ চুরি করা উদ্দেশ্য হয়, সেসব বই-পুস্তক ও খাতা চুরির কারণে হাত কাটা হয়। অতএব, তাফসীর, হাদীস, ফিক্‌হ, সাহিত্য, কাব্য, কারো বয়ান, বক্তব্য ইত্যাদি লিখিত খাতা বা পুস্তক চুরি করলে হাত কাটা হবে না। কারণ এসব পুস্তক বা খাতা চুরি করার ক্ষেত্রে জ্ঞানই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। যা কোনো মাল নয়। আর মাল নয় এমন বস্তু চুরি করলে হাত কাটা হয় না। পক্ষান্তরে যদি কোর্ট-কাচারীতে, অফিস-আদালতে ব্যবহৃত খাতা চুরি করা হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে কোনো জ্ঞান-বিজ্ঞান হাতিয়ে নেওয়া উদ্দেশ্য হয় না; বরং কাগজ চুরি করা উদ্দেশ্য হয়। আর কাগজ যেহেতু মাল, তাই যদি চুরিকৃত কাগজের মূল্য নেসাব পরিমাণ হয়, তাহলে চোরের হাত কর্তন করা হবে। কেননা নেসাব পরিমাণ মাল চুরি করলে চোরের হাত কেটে দেওয়াই শরিয়তের বিধান।

قَالَ وَلَا فِيْ سَرِقَةِ كَلْبٍ : কুকুর , চিতা জাতীয় প্রাণী চুরি করলে হাত কাটা হবে। কারণ এটা চুরির সংজ্ঞায় পড়ে না। চুরির সংজ্ঞায় বলা হয়েছিল অর্থমূল্য সম্পন্ন বস্তুর কথা। কুকুর ও চিতা অর্থমূল্য সম্পন্ন নয়; বরং এগুলো নগণ্য বস্তু। মুবাহ বস্তু। এগুলোর প্রতি মানুষের আগ্রহ নেই। তাই মানুষ এগুলো সামনে পেয়ে ধরে না; বরং তাড়িয়ে দেয়। অতএব, এসব জীব চুরির কারণে চোরের হাত কাটা যাবে না।

তা ছাড়া কুকুর, চিতা ইত্যাদির মাল হওয়া নিয়ে আলেমগণের মাঝে মতবিরোধ আছে। ইমাম মালেক, শাফেয়ী, আহমদ (র.) প্রমুখের মতে কুকুরের কোনো অর্থ মূল্য নেই। এর ক্রয়- বিক্রয় বাতিল। কেউ যদি কুকুর বিক্রি করে অর্থ সংগ্রহ করে, তাহলে সে অসম্পদের মোকাবিলায় অর্থ কামলা, যা সম্পূর্ণ হারাম। অপর দিকে ইবরাহীম নাখয়ী, আতা, আবূ হানীফা ও সাহেবাইনের মতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিকারী কুকুর বিক্রি করা জায়েজ আছে।

যাই হোক আলেমগেণর এহেন মতানৈক্যের কারণে কুকুরের অর্থমূল্য ও সম্পদ হওয়ার বিষয়টি সংশয় যুক্ত হয়ে গেছে। আর সংশয় মাত্রই হদ্দ বাতিল করে দেয়। অতএব, কুকুর, চিতা, চুরি করার কারণে কারো হাত কাটা যাবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

وَلَا قَطْعَ فِي دُفٍّ وَلَا طَبْلٍ وَلَا بَرْبَطٍ وَلَا مِزْمَارٍ لِاَنَّ عِنْدَهُمَا لَا قِيْمَةَ لَهَا وَعِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ اٰخِذُهَا يَتَاَوَّلُ الْكَسْرَ فِيْهَا . وَيُقْطَعُ فِي السَّاجِ وَالْقَنَا وَالْاَبَنُوْسِ وَالصَّنْدَلِ لِاَنَّهَا اَمْوَالٌ مُحَرَّزَةٌ لِكَوْنِهَا عَزِيْزَةً عِنْدَ النَّاسِ وَلَا تُوْجَدُ بِصُوْرَتِهَا مُبَاحَةً فِيْ دَارِ الْاِسْلَامِ .

অনুবাদ : ঢোল, তবলা, সারিন্দা, বিউগল (যাবতীয় সংগীতযন্ত্র) চুরি করাতে হস্তকর্তন নেই। কেননা সাহেবাইনের মতে এগুলোর (আইনত) কোনো মূল্য নেই। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.) মতে এগুলো যে নিবে সে ব্যাখ্যা হিসাবে ভেঙ্গে ফেলার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে পারে।

শালকাঠ, বর্শাদণ্ড তৈরির কাঠ, আবলুস কাঠ, চন্দন কাঠ চুরির ক্ষেত্রে হস্ত কর্তন করা হবে। কেননা এগুলো মানুষের নিকট মূল্যবান হওয়ার কারণে সংরক্ষিত সম্পদরূপে গণ্য এবং দারুল ইসলামে এগুলো স্বরূপে মুবাহ অবস্থায় পাওয়া যায় না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

دَفٌّ শব্দটি د হরফে যবর দিয়ে এবং পেশ দিয়ে। দুই ভাবেই পড়া যায়। ف হরফটি তাশদীদ যুক্ত। এর বহুবচন হয় دُفُوْفٌ। অর্থ হলো ঢোলের মতো এক প্রকার বাদ্য যন্ত্র। [সচিত্র দ্রষ্টব্য মু'জামুল ওয়াসীত]।

بَرْبَطٌ- শব্দের উভয় ب যবর বিশিষ্ট। মাঝখানের ر হরফ সাকিন। কাঠের তৈরি একপ্রকার বাদ্য, সারিন্দা। مِزْمَار এর বহুবচন مَزَامِيْر অর্থ- বিউগল, বাঁশি।

মাসআলার সারমর্ম : ঢোল, তবলা, সারিন্দা, বিউগল, বেহালা ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র চুরি করলে চোরের হাত কাটা হবে না। কারণ- ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মতে এসব বস্তুর কোনো মূল্যমান নেই। তাই এগুলো সম্পদের আওতাভুক্ত নয়। আর অসম্পদ চুরি করলে হাত কাটা হয় না। ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে যদিও এগুলোর মূল্যমান আছে, তথাপি চোরের হাত কাটা যাবে না। কারণ চোরের এমন ব্যাখ্যা দেওয়ার অবকাশ আছে যে, এগুলো আমি ভেঙ্গে ফেলার জন্য নিয়েছি, গুনাহের কাজে বাঁধা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। মোটকথা, ইল্লাত বা কারণের ক্ষেত্রে ভিন্নতা সত্ত্বেও হুকুমের ক্ষেত্রে তিন ইমাম একমত যে, বাদ্যযন্ত্র চুরি করার দরুণ চোরের হাত কাটা হবে না।

وَيُقْطَعُ فِي السَّاجِ وَالْقَنَا الخ : اَلسَّاجُ - অতি মজবুত কাঠ। সুলম্ব বৃক্ষ। বড় বড় পাতা। বাংলা নাম সেগুন। কেবল ভারত উপমহাদেশেই জন্মে। তবে এখান থেকে সারা বিশ্বে এ কাঠ সরবরাহ হয়ে থাকে।

القنا - قَنَاةٌ এর বহুবচন। অর্থ– বর্শার দণ্ড।

الْاَبَنُوْس হামযায় মদ ও ب হরফে যবর যোগে কিংবা ب হরফকে সাকিন করে। কখনো কখনো হামযায়ে মদ ছাড়াও পড়া হয়। এক প্রকার অতিশক্ত কাঠ। রং কাল। খুব মূল্যবান। সাধারণত গরম দেশে জন্মে। الصندل ভারতবর্ষে জন্মে এক প্রকার সুগন্ধি কাঠ। বর্ণ লাল ও হলুদ। কোনটি সাদাও হয়। সাদাফুল ও সবুজ দানা হয়। একাঠ হৃদরোগের প্রতিষেধক হিসাবেও ব্যবহার হয়। অতি মূল্যবান ও আকর্ষণীয়।

মাসআলার সারমর্ম : সেগুন, চন্দন, আবলুস ইত্যাদি কাঠ ও বর্শার দণ্ড চুরি করলে চোরের হাত কাটা হবে। কারণ এসব কাঠ মুবাহ নয়। বরং অতি মূল্যবান এবং সংরক্ষিত সম্পদরূপে পরিগণিত।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ وَيُقْطَعُ فِي الْفُصُوْصِ الْخُضْرِ وَالْيَاقُوْتِ وَالزَّبَرْجَدِ لِأَنَّهَا مِنْ أَعَزِّ الْأَمْوَالِ وَأَنْفَسِهَا وَلَا تُوْجَدُ مُبَاحَةَ الْأَصْلِ بِصُوْرَتِهَا فِيْ دَارِ الْإِسْلَامِ غَيْرَ مَرْغُوْبٍ فِيْهَا فَصَارَتْ كَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ . وَإِذَا اتَّخَذَ مِنَ الْخَشَبِ أَوَانِيَ وَأَبْوَابَ قُطِعَ فِيْهَا لِأَنَّهُ بِالصَّنْعَةِ الْتَحَقَ بِالْأَمْوَالِ النَّفِيْسَةِ؛ أَلَا تَرٰى أَنَّهَا تُحَرَّزُ بِخِلَافِ الْحَصِيْرِ لِأَنَّ الصَّنْعَةَ فِيْهِ لَمْ تَغْلِبْ عَلَى الْجِنْسِ حَتّٰى يُبْسَطُ فِيْ غَيْرِ الْحِرْزِ، وَفِي الْحُصُرِ الْبَغْدَادِيَّةِ قَالُوْا يَجِبُ الْقَطْعُ فِيْ سَرِقَتِهَا لِغَلَبَةِ الصَّنْعَةِ عَلَى الْأَصْلِ وَإِنَّمَا يَجِبُ الْقَطْعُ فِيْ غَيْرِ الْمُرَكَّبِ، وَإِنَّمَا يَجِبُ إِذَا كَانَ خَفِيْفًا لَا يَثْقُلُ عَلَى الْوَاحِدِ حَمْلُهُ لِأَنَّ الثَّقِيْلَ مِنْهُ لَا يُرْغَبُ فِيْ سَرِقَتِهِ وَلَا قَطْعَ عَلٰى خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ لِقُصُوْرٍ فِي الْحِرْزِ وَلَا مُنْتَهِبٍ وَلَا مُخْتَلِسٍ لِأَنَّهُ يُجَاهِرُ بِفِعْلِهِ، كَيْفَ وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ «لَا قَطْعَ فِيْ مُخْتَلِسٍ وَلَا مُنْتَهِبٍ وَلَا خَائِنٍ»

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, সুবজ পাথর, ইয়াকুত ও পান্না চুরিতে হস্ত কর্তন হবে। কেননা এগুলো অতি মূল্যবান সম্পদরূপে বিবেচ্য এবং দারুল ইসলামে স্বরূপে মুবাহ অবস্থায় ও অনাগ্রহের জিনিস হিসাবে পাওয়া যায় না। তাই এগুলো স্বর্ণ ও রৌপ্যের সমতুল্য।

কাঠ দ্বারা যদি পাত্র ও দরজা বানানো হয়, তাহলে সেগুলো চুরি করার অপরাধে কর্তন সাব্যস্ত হবে। কেননা কারিগরির ফলে এগুলো মূল্যবান দ্রব্যের সাথে মিলিত হয়ে গেছে। তুমি কি দেখ না যে, এগুলো সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। আর চাটাইর হুকুম ভিন্ন। কেননা কারিগরির কাজ তার সত্তার উপর প্রবল হয়নি। এ কারণেই অরক্ষিত স্থানে তা বিছিয়ে রাখা হয়। বাগদাদী পাটি সম্পর্কে আলেমগণ বলেছেন যে, তা চুরি করলে হস্ত কর্তন সাব্যস্ত হবে। কেননা তার মূল সত্তার উপর কারিগরির দিক প্রবল হয়েছে। দরজা যদি ঘরে যুক্ত না হয় (বরং ঘরের ভিতরে সংরক্ষিত থাকে) তদুপরি যদি তা এমন হালকা হয় যে, একজন তা উঠিয়ে নেওয়া কষ্টকর হয় না, তাহলেই শুধু হস্ত কর্তন সাব্যস্ত হবে। কেননা ভারি হলে চুরি করার আগ্রহ থাকে না।

আমানতের মাল আত্মসাৎকারী নারী-পুরুষের হাত কাটা হবে না। কেননা এতে সংরক্ষণ ত্রুটিপূর্ণ। **তদ্রূপ ছিনতাইকারী ও চকিতে হরণকারীর হস্ত কর্তন করা হবে না।**

কেননা সে তার কাজ প্রকাশ্যে সম্পন্ন করে। আর এটি কিভাবে হতে পারে? যখন রাসূল ﷺ নিজেই বলেছেন- لَا قَطْعَ فِيْ مُخْتَلِسٍ وَلَا مُنْتَهِبٍ وَلَا خَائِنٍ -অর্থাৎ চকিতে হরণকারী, ছিনতাইকারী ও আত্মসাৎকারীর ক্ষেত্রে হস্ত কর্তন নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

اَلْفُصُوْصُ الْخُضْرُ - ফিরোযাজ ও যুমুররুদ পাথরের তৈরি সবুজ বস্তু।

اَلْيَاقُوْتُ-এর বহুবচন হলো يَوَاقِيْتُ অর্থ- শক্ত, স্বচ্ছ এক প্রকার দামি পাথর। বর্ণ বিভিন্ন হয়ে থাকে। লাল বর্ণের ইয়াকুত সর্বাধিক মূল্যবান।

اَلزَّبَرْجَدُ -ز- ب- ج তিন হরফে যবর। ر হরফটি সাকিন। এর বহুবচন হলো- زَبَارِجُ। সবুজ ইয়াকুতের সদৃশ এক প্রকার সবুজ স্বচ্ছ পাথর। সুদর্শন বস্তু হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এসব পাথর মানুষের কাছে অতি মূল্যবান। যেখানে সেখানে মুবাহ অবস্থায় পড়েও থাকে না। মানুষ একে অতিযত্নে সংরক্ষণ করে। বিধায় এগুলো সোনা-রূপার পর্যায়ভুক্ত।

https://e-ilm.weebly.com/

অতএব, কেউ যদি এসব পাথর চুরি করে এবং চুরিকৃত পাথরের মূল্য দশ দিরহাম বা তার চেয়ে বেশি হয়, তাহলে চোরের হাত কেটে দেওয়া হবে।

وَإِذَا اتُّخِذَ مِنَ الْخَشَبِ : উপরিউক্ত ইবারতে চারটি মাসআলা আলোচনা করা হয়েছে।

১. সাধারণ কাঠ চুরি করলে হাত কাটা হয় না; কিন্তু যদি এই সাধারণ কাঠ দ্বারা পাত্র বানানো হয়, কিংবা দরজা বানানো হয়, তাহলে তা চুরি করার কারণে হাত কাটা হবে না। কেননা কাঠটি আগে তুচ্ছ মুবাহ বস্তুর অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু কারিগরের মেহনতের ফলে এখন তা মূল্যবান বস্তুতে পরিণত হয়েছে। তাই এটা চুরি করলে চোরের হাত কাটা যাবে।

২. বিভিন্ন ঘাস বা পাতা দিয়ে যে চাটাই তৈরি করা হয়, তা চুরি করলে হাত কাটা হবে না। কেননা চাটাইয়ের ক্ষেত্রে কারিগরের মেহনত তাকে মূল অবস্থা হতে তেমন সরাতে পারেনি। তাই ঘাস- পাতাগুলো চাটাই হওয়ার আগে যেমন অরক্ষিত ছিল, চাটাই হওয়ার পরেও তেমনি অরিক্ষিত থেকে যায়। অরক্ষিত স্থানে চাটাই বিছিয়ে রাখা হয়, ফেলে রাখা হয়। মোটকথা, তার সংরক্ষণে ত্রুটি থাকে এবং তা নগণ্য বস্তু বলে গণ্য হয়। বিধায় এটা চুরি করলে হাত কাটা হবে না।

৩. বাগদী চাটাই (আমাদের দেশের উন্নতমানের শীতল পাটি) চুরি করলে হাত কাটা হবে। কারণ এই পাটির মূল ধাতু যদিও তুচ্ছ বস্তু তথাপি তাতে কারিগর এত মেহনত করে যে, এটা তার মূল অবস্থা ত্যাগ করে মূল্যবান সম্পদের আওতায় চলে আসে। অর্থাৎ বাগদাদী পাটিটা সাধারণ পাটির মতো সাধারণ থাকে না; বরং অসাধারণ সম্পদের রূপ পরিগ্রহ করে নেয়। তাই এটা চুরি করলে চোরের হাত কাটা হবে।

৪. দরজা বানানোর পর যদিও ঘরে লাগানো না হয়; বরং ঘরের ভিতরে সংরক্ষিত অবস্থায় থাকে, তাহলে সেটা চুরি করলে হাত কাটা হবে। শর্ত হলো; দরজাটি এমন হালকা হতে হবে যে, একজনে তা বহন করে নিয়ে যেতে পারে। ভারি হলে হাত কাটা হবে না। আর ঘরে লাগানো দরজা চুরি করলে হাত কাটা যাবে না, এটাতো পূর্বেই বলা হয়েছে। লাগানো দরজা চুরি করলে হাত না কাটার কারণ হলো তা সংরক্ষিত হয় না। লাগানো হয়নি এমন দরজা চুরি করলে হাত কাটা হয় এর কারণ হলো এটা সংরক্ষিত হয়। হাত কাটার জন্য দরজাটি হালকা হওয়ার যে শর্ত আরোপ করা হয়েছে তা প্রশ্নবিদ্ধ। কেননা ভারি হওয়ার কারণে চুরি করার ক্ষেত্রে অনাগ্রহ সৃষ্টি হয় বটে; কিন্তু এর ফলে দরজাটির মাল হওয়া ও সংরক্ষিত হওয়ার মধ্যে কোনো ধরনের কমতি আসে না। অতএব, দরজাটি যখন মাল এবং সংরক্ষিত, তখন তা চুরি করলে হাত কাটা হবে তা হালকা হোক, চাই ভারি হোক। তাছাড়া চুরি করার অনাগ্রহ হলে চুরি করবেই বা কেন।
এ কারণেই উক্ত মাসআলাটি জামে সাগীর, মাবসূত, মুখতাসারুল কুদূরী, মুখতাসার কারখী ইত্যাদি কিতাবে নিঃশর্তরূপে উল্লেখ আছে। হালকা ও ভারি হওয়ার মাঝে ব্যবধান করা হয়নি।

وَلَا قَطْعَ عَلَى خَائِنٍ : خائن শব্দটি পুংলিঙ্গ। স্ত্রীলিঙ্গ হলো خائنة। اسم فاعل -এর واحد مذكر ও واحد مؤنث বাবে خان- يخون ফে'ল বাবে نَصَرَ হতে ব্যবহৃত। অর্থ হলো– আমানতের মাল আত্মসাৎ করা।

مُنْتَهِب শব্দটি اَلْإِنْتِهَابُ -ক্রিয়ামূল হতে নির্গত اِسْمُ فَاعِلٍ -এর واحد مذكر : الانتهابا। অর্থ হলো, কারো নিকট হতে প্রকাশ্যে জোরপূর্বক কিছু নিয়ে যাওয়া। এক শব্দে ছিনতাই করা।

مُخْتَلِس- শব্দটি اَلْإِخْتِلَاسُ - মাসদার হতে اسم فاعل -এর واحد مزكر : اَلْإِخْتِلَاسُ শব্দের অর্থ হলো কারো কাছ থেকে হঠাৎ তড়িগড়ি কিছু নিয়ে যাওয়া। এক কথায় চকিতে হরণ করা।

মাসআলার সারমর্ম : খেয়ানতকারী, ছিনতাইকারী ও চকিতে হরণকারীর হাত কাটা যাবে না। কারণ খেয়ানতকারী যে মাল আত্মসাৎ করে তা সংরক্ষিত হয় না। আর ছিনতাইকারী ও চকিতে হরণকারী প্রকাশ্যে কাজ সম্পন্ন করে। অতএব খেয়ানত, ছিনতাই, চকিতে হরণ কোনোটিই চুরির সংজ্ঞায় পড়ে না। কেননা চুরির জন্য শর্ত হলো সংরক্ষিত স্থান হতে গোপনে হতে হবে। অথচ খেয়ানত হয় অসংরক্ষিত মালে, আর ছিনতাই ও চকিতে হরণ সংঘটিত হয় প্রকাশ্যে। তাই এগুলো চুরি নয় এবং এগুলোর সাথে জড়িত ব্যক্তির হাত কাটা যাবে না।

তা ছাড়া নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন– لَا قَطْعَ فِي مُخْتَلِسٍ وَلَا مُنْتَهِبٍ وَلَا خَائِنٍ অর্থাৎ খেয়ানতকারী, ছিনতাইকারী ও অতর্কিতে হরণকারীর ক্ষেত্রে হাত কাটা নেই।

এ হাদীসটি হযরত জাবের ও আনাস (রা.)-এর সূত্রে তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ সহ অনেক হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য মাসআলায় ইমামগণের মাঝে কোনো মতভেদ নেই।

https://e-ilm.weebly.com/

وَلَا قَطْعَ عَلَى النَّبَّاشِ وَهٰذَا عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ (رحـ) وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ وَالشَّافِعِيُّ (رحـ) : عَلَيْهِ الْقَطْعُ لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ﴿مَنْ نَبَشَ قَطَعْنَاهُ﴾ وَلِاَنَّهٗ مَالٌ مُتَقَوَّمٌ مُحْرَزٌ يُحْرَزُ مِثْلُهٗ فَيُقْطَعُ فِيْهِ . وَلَهُمَا قَوْلُهٗ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ﴿لَا قَطْعَ عَلَى الْمُخْتَفِيْ﴾ وَهُوَ النَّبَّاشُ بِلُغَةِ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ، وَلِاَنَّ الشُّبْهَةَ تَمَكَّنَتْ فِي الْمِلْكِ لِاَنَّهٗ لَا مِلْكَ لِلْمَيِّتِ حَقِيْقَةً وَلَا لِلْوَارِثِ لِتَقَدُّمِ حَاجَةِ الْمَيِّتِ، وَقَدْ تَمَكَّنَ الْخَلَلُ فِي الْمَقْصُوْدِ وَهُوَ الْاِنْزِجَارُ لِاَنَّ الْجِنَايَةَ فِي نَفْسِهَا نَادِرَةُ الْوُجُوْدِ وَمَا رَوَاهُ غَيْرُ مَرْفُوعٍ اَوْ هُوَ مَحْمُوْلٌ عَلَى السِّيَاسَةِ، وَاِنْ كَانَ الْقَبْرُ فِيْ بَيْتٍ مُقْفَلٍ فَهُوَ عَلَى الْخِلَافِ فِي الصَّحِيْحِ لِمَا قُلْنَا وَكَذَا اِذَا سَرَقَ مِنْ تَابُوتٍ فِي الْقَافِلَةِ وَفِيْهِ الْمَيِّتُ لِمَا بَيَّنَّاهُ .

অনুবাদ : কাফন চোরের হস্ত কর্তন নেই। এটা ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর অভিমত। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে হস্ত কর্তন সাব্যস্ত হবে। কেননা নবী করীম ﷺ বলেছেন, مَنْ نَبَشَ قَطَعْنَاهُ -যে কাফন চুরি করবে, আমরা তার হাত কেটে দেব। কেননা এটা অর্থ- মূল্য সম্পন্ন মাল যা তার উপযোগী রক্ষা ব্যবস্থা দ্বারা সুরক্ষিত। সুতরাং এক্ষেত্রে তার হস্ত কর্তন করা হবে। তরফাইনের দলিল হলো, নবী করীম ﷺ বলেছেন, لَا قَطْعَ عَلَى الْمُخْتَفِي - কাফন চোরের হস্ত কর্তন নেই। মদিনাবাসীদের পরিভাষায় কাফন চোরকে مُخْتَفِي বলা হয়। তাছাড়া এ কারণে যে, মালিকানার বিষয়ে সন্দেহ সাব্যস্ত হয়েছে। কেননা প্রকৃত পক্ষে মৃত ব্যক্তির মালিকানা নেই। আবার ওয়ারিশদেরও মালিকানা নেই। কারণ মৃত ব্যক্তির প্রয়োজন অগ্রবর্তী। তাছাড়া হদ্দের মূল উদ্দেশ্য শাসনের ক্ষেত্রে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়েছে। কেননা নিজস্ব প্রকৃতিতে অপরাধটির অস্তিত্ব বিরল। আর তারা যে হাদীস বর্ণনা করেছেন তা মারফূ' নয়। কিংবা তা শাসনের মাসলাহাতের উপর প্রযোজ্য। আর কবর যদি তালাবদ্ধ ঘরে থাকে, তাহলেও বিশুদ্ধ মতে আমাদের উল্লেখকৃত একই কারণে একই মতপার্থক্য হবে। তদ্রূপ যদি কাফেলায় বিদ্যমান কফিন হতে কাফন চুরি করে এবং তাতে মৃতদেহ বিদ্যমান থাকে তাহলেও আমাদের বর্ণিত কারণে একই মতপার্থক্য হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিউক্ত ইবারতে তিনটি মাসআলা আলোচিত হয়েছে। মাসআলা তিনটিতেই একই ধরনের মতানৈক্য।

প্রথম মাসআলা : কাফন চোরের হাত কাটা হবে কিনা। দু'রকম মতামত রয়েছে।

১. ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মুহাম্মদ, সুফিয়ান সাওরী, আওযায়ী, যুহরী, মাকহুল ও হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এর মতে কাফন চোরের হাত কাটা হবে না।

২. ইমাম আবূ ইউসুফ, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) সহ অন্যান্যের মত হলো কাফন চোরের হাত কাটা হবে।

ইমাম আবূ ইউসুফ ও তার সমমনা আলেমগণের দলিল হলো বায়হাকীতে বর্ণিত হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.) -এর হাদীস : مَنْ نَبَشَ قَطَعْنَاهُ - যে ব্যক্তি কাফন চুরি করবে আমরা তার হাত কেটে দেব। তাছাড়া কাফন একটি সম্পদ

https://e-ilm.weebly.com/

এবং তা সংরক্ষিত। কাফন সংরক্ষণ করার জন্য কবরই যথেষ্ট। যেমন গরু সংরক্ষণের জন্য গোয়াল যথেষ্ট গোয়াল থেকে গরু চুরি করলে হাত কাটা হয়। যেহেতু গোয়ালই গরুর সংরক্ষণ ক্ষেত্র। তেমনি কবরই কাফনের সংরক্ষণ ক্ষেত্র। তাই কবর হতে কাফন চুরি করলে হাত কাটা হবে।

ইমাম আবূ হানীফা, মুহাম্মদ (র.)-এর প্রমুখের দলিল :

১. নবী করীম ﷺ -এর বাণী لاقطع على المختفى কাফন চোরের ক্ষেত্রে হাত কাটা নেই।

২. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ليس على النباش قطع -কাফন চোরের ক্ষেত্রে হাত কাটা নেই। এ হাদীসটি ইবনে আবি শাইবা বর্ণনা করেছেন।

৩. কাফনের কাপড় কারো মালিকানা কি-না এ নিয়ে সন্দেহ আছে। কেননা মৃত ব্যক্তি এর মালিক নয়। কারণ মৃতের কোনো মালিকানা হয় না। আবার ওয়ারিশদের মালিকানাও নয়। কারণ কাফনের প্রয়োজনীয়তা মৃতেরই বেশি। অতএব, কাফনের মালিকানা নিয়ে সন্দেহ প্রবল হয়ে গেছে। তাই এটা চুরি করলে হাত কাটা হবে না।

৪. হদ্দের উদ্দেশ্য ও এখানে পরিপূর্ণ উপস্থিত নেই। কেননা হদ্দের উদ্দেশ্য হলো সতর্কীকরণ। এটা এমন ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে, যা প্রায়ই সংঘটিত হয়। পক্ষান্তরে কাফন চুরির কাজটি খুব কমই সংঘটিত হয়। কারণ কাফন একটি নিম্নমানের বস্তু, মানুষের প্রকৃতি সেদিকে আকৃষ্ট হয় না; বরং সুস্থ প্রকৃতি কাফনের কাপড়কে ঘৃণা করে থাকে। অতএব, যে কাজ প্রায় ঘটেই না, সে কাজ হতে মানুষকে চোরের হাত কেটে সতর্ক করার প্রয়োজন নেই।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ও প্রমুখের দলিলের জবাব :

১. من نبش قطعناه হাদীসটি মারফূ নয়; বরং হাদীসটি মুনকার। ইমাম বায়হাকী হাদীসটি উল্লেখপূর্বক হাদীসটির দুর্বলতার কথা স্পষ্ট বলে দিয়েছেন। কারণ হাদীসটির সনদে বিশর ইবনে হাযেমের ন্যায় মাজহুল বা অজ্ঞাত রাবী বিদ্যমান আছে।

২. হাদীসটি সিয়াসতের উপর প্রযোজ্য। অর্থাৎ হাদীসে বর্ণিত কথাটি কোনো শরয়ী বিধান নয়; বরং প্রশাসনিক প্রয়োজনীয়তা সংশ্লিষ্ট বিষয়। অতএব, কোনো শাসক যদি পরিবেশ পরিস্থিতি বিবেচনা করে কাফন চোরের হাত কাটা সমীচীন মনে করে, তাহলে বিশেষ ক্ষমতা বলে সে তা করতে পারবে। কিন্তু এটা শরয়ী বিধানরূপে সর্বত্র কার্যকর করা যাবে না।

আলোচ্য হাদীসটির পূর্বাপর বক্তব্যও আমাদের এ ব্যাখাকে সমর্থন করে। হাদীসের পূর্বের অংশে এরকম من غرق غرقناه ومن حرق حرقناه - কেউ যদি কাউকে পানিতে ডুবিয়ে হত্যা করে তাহলে আমিও তাকে পানিতে ডুবাব, কেউ যদি কাউকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করে তাহলে আমিও তাকে আগুনে পুড়াব।

লক্ষণীয় যে, পানিতে ডুবানো ও আগুনে পড়ানোর কাজ দুটিকে নবী করীম ﷺ নিজের দিকে সম্বন্ধ করেছেন। এর দ্বারাই বুঝা যায়, এটি সিয়াসত বা প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত ছিল। যদি এটা শরয়ী কিসাস হতো তাহলো ডুবানো ও পুড়ানোর সম্বন্ধ হতো নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশদের দিকে। কারণ কিসাস গ্রহণ করা তাদের অধিকার এবং তারাই সেটা গ্রহণ করে থাকে।

দ্বিতীয় মাসআলা : কোনো কবর যদি তালাবদ্ধ ঘরের ভিতরে হয় এবং সেই কবর হতে কাফন চুরি হয়, তাহলে চোরের হাত কাটা হবে কি-না? এ বিষয়ে ইমামদের মতানৈক্য প্রথম মাসআলার অনুরূপ এবং দলিলও প্রথম মাসআলার অনুরূপ। "বিশুদ্ধ বর্ণনা অনুসারে" একথা বলে একটি বর্ণনা হতে বিমুখতা বুঝানো উদ্দেশ্য যে, বর্ণনায় কতিপয় মাশায়েখ বলেছেন– কাফন চোরের হাত কাটা হবে। কারণ এ বর্ণনাটি বিশুদ্ধ নয়। আল্লামা সারাখসী (র.) তার মাবসূতে উল্লেখ করেছেন والاصح عندى انه لا يقطع আমার মতে বিশুদ্ধ কথা হলো এই যে, কাফন চোরের হাত কাটা হবে না।

তৃতীয় মাসআলা : কোনো কাফেলায় বিদ্যমান ফকিন হতে যদি লাশ রেখে কাফন চুরি করে নিয়ে যাওয়া হয়, তাহলে চোরের হাত কাটা হবে কি-না- এ মাসআলায়ও ইমামগণের মতামত ও প্রমাণসমূহ পূর্ববর্তী মাসআলা দুটির অনুরূপ। কোনো পার্থক্য নেই।

https://e-ilm.weebly.com/

وَلا يُقْطَعُ السَّارِقُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِاَنَّهُ مَالُ الْعَامَّةِ وَهُوَ مِنْهُمْ . قَالَ وَلَا مِنْ مَالٍ لِلسَّارِقِ فِيْهِ شَرِكَةٌ لِمَا قُلْنَا . وَمَنْ لَهُ عَلَى اٰخَرَ دَرَاهِمُ فَسَرَقَ مِنْهُ مِثْلَهَا لَمْ يُقْطَعْ لِاَنَّهُ اِسْتِيفَاءٌ لِحَقِّهِ، وَالْحَالُّ وَالْمُؤَجَّلُ فِيْهِ سَوَاءٌ اِسْتِحْسَانًا لِاَنَّ التَّأْجِيْلَ لِتَاْخِيْرِ الْمُطَالَبَةِ، وَكَذَا اِذَا سَرَقَ زِيَادَةً عَلَى حَقِّهِ لِاَنَّهُ بِمِقْدَارِ حَقِّهِ يَصِيْرُ شَرِيكًا فِيْهِ ـ

অনুবাদ : বাইতুল মাল থেকে কেউ চুরি করলে হস্ত কর্তন করা হবে না। কেননা এটা জনসাধারণের মাল, আর সেও তাদেরই একজন। **তদ্রূপ এমন মাল চুরি করলে যাতে চোরের অংশ রয়েছে, তাতে হস্ত কর্তন করা হবে না।** কারণ তাই যা আমরা বর্ণনা করেছি। **যে ব্যক্তির অন্য কারো কাছে কিছু দিরহাম পাওনা রয়েছে, সে যদি ঐ ব্যক্তির নিকট থেকে ঐ পরিমাণ চুরি করে, তাহলে তার হস্ত কর্তন করা হবে না।** কেননা এটা হলো নিজের মাল উশূল করা। আর সূক্ষ্ম কিয়াস মোতাবেক এক্ষেত্রে নগদ পাওনা ও মেয়াদি পাওনা সমান। কেননা মেয়াদ নির্ধারণের উদ্দেশ্য হচ্ছে তাগাদা বিলম্বিত হওয়া। তদ্রূপ নিজের পাওনা হকের বেশি নিলেও কর্তন করা হবে না। কেননা নিজের হক পরিমাণ মাল দ্বারা সে তাতে অংশীদার সাব্যস্ত হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

বাইতুল মাল হতে চুরি করলে চোরের হাত কাটা হবে না। এ মত পোষণ করেন আহনাফ, ইমাম শাফেয়ী, আহমদ ইবনে হাম্বল, ইবরাহীম নাখয়ী (র.)ও প্রমুখ ফকীগণ। পক্ষান্তরে ইমাম মালেক ও কতিপয় ফকীহ মনে করেন, বাইতুল মাল হতে চুরি করলেও হাত কাটা হবে। কারণ সে সংরক্ষিত মাল চুরি করেছে, তাই সে কুরআনের নির্দেশের আওতায় পড়ে। অতএব, হাত কেটে দেওয়া হবে।

কিন্তু প্রথমোক্ত মাযহাবের দলিল হলো, বাইতুল মালের তাবৎ সম্পদের মালিক জনগণ। চোরও জনগণের একজন। সে হিসাবে চোর যা চুরি করেছে তার মধ্যে চোরের মালিকানা থাকার সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। আর সন্দেহ মাত্রই হদ্দ বাতিল করে দেয়। অতএব, তার হাত কাটা যাবে না। এ মতের পক্ষে বেশ কিছু হাদীসও রয়েছে।

হাদীস-১

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) اَنَّ عَبْدًا مِنْ رَقِيْقِ الْخُمُسِ سَرَقَ مِنَ الْخُمُسِ فَرُفِعَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَقْطَعْهُ وَقَالَ مَالُ اللّٰهِ سَرَقَ بَعْضُهُ بَعْضًا

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত যে, গনিমতের খুমুস হতে প্রাপ্ত এক গোলাম খুমুস হতে চুরি করল। ঘটনাটি নবী করীম ﷺ কে জানানো হলো। তিনি চোরের হাত কাটলেন না। তিনি বললেন, আল্লাহর সম্পদের একাংশ অন্য অংশকে চুরি করেছে।-(ইবনে মাজাহ)।

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) فِيْمَنْ سَرَقَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ قَالَ اَرْسِلْهُ فَمَا مِنْ اَحَدٍ اِلَّا وَلَهُ فِيْ هٰذَا الْمَالِ حَقٌّ ـ

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। বাইতুল মাল হতে চুরি করেছে এক ব্যক্তি সম্পর্কে তিনি বলেছেন,তাকে ছেড়ে দাও। বাইতুল মালের মধ্যে সকলের হক রয়েছে। বাইতুল মাল হতে চুরি করলে যেমন হাত কাটা হয় না, তেমনি যৌথ শরিকানা ভুক্ত মাল হতে চুরি করলেও হাত কাটা হয় না। কেননা তাতেও চোরের অংশ থাকার কারণে মালিকানার সন্দেহ সৃষ্টি হয় এবং এর ফলে হদ্দ বাতিল হয়ে যায়।

وَمَنْ لَهُ عَلَى اٰخَرَ دَرَاهِمُ فَسَرَقَ : উদাহরণ স্বরূপ কেউ কারো কাছে পঞ্চাশ দিরহাম পায়। এমতাবস্থায় যদি সে (পাওনাদার তার (দেনাদার) কাছ থেকে পঞ্চাশ দিরহাম চুরি করে নিয়ে আসে, তাহলে এই চুরির দায়ে হাত কাটা যাবে না। কেননা এটা চুরি নয়; বরং সে নিজের পাওনা উসুল করেছে।

যদি পাওনা অপেক্ষা বেশি চুরি করে, যেমন- ষাট দিরহাম চুরি করল, তাহলেও হাত কাটা হবে না। কারণ পঞ্চাশ দিরহাম পাওনা হওয়ার মাধ্যমে অতিরিক্তটার মধ্যেও তার মালিকানার সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। আর সন্দেহ মাত্রই হদ্দ রোধ করে দেয়। বর্ণিত হুকুমের ক্ষেত্রে বাকি পাওনা ও নগদ পাওনা উভয়ই সমান; কারণ নগদ পাওনা যেমন- পাওনাদারের মালিকানা, বাকি, পাওনাও তেমনি ভাবে পাওনাদারের মালিকানা। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে বাকি পাওনাটা তৎক্ষণাৎ তাগাদা করা যায় না। মেয়াদ শেষ হওয়ার পর তাগাদা করতে হয়। কিন্তু এর ফলে তার মালিকানায় কোনো কমতি আসে না। অতএব, নগদ পাওনা ও মেয়াদি পাওনার হুকুম এক ও অভিন্ন।

https://e-ilm.weebly.com/

وَإِنْ سَرَقَ مِنْهُ عُرُوْضًا قُطِعَ لِاَنَّهُ لَيْسَ لَهُ وِلَايَةُ الْاِسْتِيفَاءِ مِنْهُ اِلَّا بَيْعًا بِالتَّرَاضِي. وَعَنْ اَبِيْ يُوْسُفَ اَنَّهُ لَا يُقْطَعُ لِاَنَّ لَهُ اَنْ يَاْخُذَهُ عِنْدَ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ قَضَاءً مِنْ حَقِّهِ اَوْ رَهْنًا مِنْ حَقِّهِ . قُلْنَا : هٰذَا قَوْلٌ لَا يَسْتَنِدُ اِلَى دَلِيْلٍ ظَاهِرٍ فَلَا يُعْتَبَرُ بِدُوْنِ اِتِّصَالِ الدَّعْوٰى بِهِ، حَتّٰى لَوْ اِدَّعٰى ذٰلِكَ دُرِئَ عَنْهُ الْحَدُّ لِاَنَّهُ ظَنٌّ فِيْ مَوْضِعِ الْخِلَافِ، وَلَوْ كَانَ حَقُّهُ دَرَاهِمَ فَسَرَقَ مِنْهُ دَنَانِيْرَ قِيْلَ يُقْطَعُ لِاَنَّهُ لَيْسَ لَهُ حَقُّ الْاَخْذِ، وَقِيْلَ لَا يُقْطَعُ لِاَنَّ النُّقُوْدَ جِنْسٌ وَاحِدٌ

অনুবাদ : কিন্তু যদি সে তার কাছ থেকে (দিরহামের পরিবর্তে) কোনো দ্রব্য চুরি করে তাহলে কর্তন করা হবে। কেননা পারস্পরিক সম্মতিতে বিক্রয় ছাড়া তার তা গ্রহণ করার অধিকার নেই।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) হতে বর্ণিত রয়েছে যে, কর্তন করা হবে না।

কেননা কোনো কোনো আলিমের মতে তার নিজের হক উশূল করার জন্য কিংবা হকের পরিবর্তে বন্ধক রাখার জন্য দ্রব্য গ্রহণ করার অধিকার তার রয়েছে।

আমাদের বক্তব্য এই যে, এটা এমন সিদ্ধান্ত যা সুস্পষ্ট কোনো দলিল নির্ভর নয়। সুতরাং ঐ দলিলের সাথে তার দাবি যুক্ত হওয়া ছাড়া তা বিবেচ্য হবে না। অবশ্য সে যদি তা দাবি করে তাহলে হদ্দ রহিত হবে। কেননা সে মতপার্থক্যপূর্ণ ক্ষেত্রে নিজস্ব ধারণা পোষণ করেছে।

আর যদি এমন হয়, যে তার পাওনা হক ছিল দিরহাম। কিন্তু সে চুরি করেছে দীনার তাহলে কোনো কোনো মতে কর্তন করা হবে। কেননা তা নেওয়ার অধিকার তার নেই। আবার কোনো কোনো মতে কর্তন করা হবে না। কেননা সকল মুদ্রা একই শ্রেণিভুক্ত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কেউ কারো কাছে পেত দিরহাম কিন্তু চুরি করল কোনো দ্রব্য এমতাবস্থায় হাতকাটা হবে কি না? এ নিয়ে ইমামগণের মাঝে দ্বিমত রয়েছে।

ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.) -এর মতে হাত কাটা হবে। কেননা পাওনাদারের মালিকানা হলো দিরহাম, তাই তার অধিকার আছে দেনাদার হতে দিরহাম আদায় করার। দ্রব্য উশূল করার অধিকার নেই।

দিরহামের পরিবর্তে দ্রব্য উসুল করতে হলে দুজনের পরস্পরে ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হতে হবে। দিরহামের পরিবর্তে যে দ্রব্য উশুল করার অধিকার নেই। এর প্রমাণ হলো, দেনাদার যদি পরিশোধ বাবদ পাওনাদারকে দিরহাম ছাড়া কোনো দ্রব্য দিতে চায়, তাহলে পাওনাদার তা নিতে বাধ্য নয়। কারণ এটা তার হক নয়। তার হক হলো দিরহাম। তাই দিরহাম দেওয়া হলে পাওনাদার তা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। কারণ এটাই তার পাওনা বা হক। মোটকথা, পাওনাদারের হক ছিল দিরহাম, তাই যদি সে দিরহাম ছাড়া অন্য কোনো দ্রব্য দেনাদার হতে চুরি করে, তাহলে তা চুরি বলেই গণ্য হবে এবং তার হাত কাটা হবে। কেননা দেনাদারের দ্রব্যের মাঝে পাওনাদারের কোনো হকই নেই।

https://e-ilm.weebly.com/

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, পাওনাদার যদি দেনাদার হতে দিরহাম ছাড়া অন্য কিছুও চুরি করে, তাহলেও হাত কাটা হবে না। কেননা কতিপয় আলেম যেমন ইমাম শাফেয়ী, ইবনে আবী লাইলা প্রমুখের মতে পাওনাদারের এ অধিকার আছে যে, সে দেনাদার হতে নিজের হক ছাড়া অন্য কোনো দ্রব্যও গ্রহণ করতে পারে, পাওনা উসুল বাবদ কিংবা বন্ধক বাবদ। অর্থাৎ পাওনাদার ব্যক্তি যদি পাওনা দিরহাম নিয়ে, দেনাদারের বাড়ি থেকে ধান, গম বা অন্য কোনো দ্রব্য নিয়ে আসে, তাহলে তা কতিপয় আলেমের মতে জায়েজ। অতএব, আলেমগণের মতবিরোধের কারণে বিষয়টি চুরি হওয়ার ক্ষেত্রে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। আর সন্দেহ মাত্রই হদ্দ বাতিল করে দেয়। বিধায় আলোচ্য পাওনাদার ব্যক্তির হাত কাটা হবে না।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিলের জবাবে বলা হয়, পাওনাদারের অধিকার আছে পাওনা ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে যাওয়ার– এ কথাটির পিছনে কোনো দলিল নেই।

কেননা দেনা পাওনার ক্ষেত্রে প্রকৃত কিয়াসের দাবিতো হলো এই যে, পাওনাদার ব্যক্তি তার পাওনার সমজাত বস্তুও দেনাদার হতে তার অনুমতি ছাড়া নিতে পারবে না। কারণ পাওনা বা হক দিরহাম দীনার ইত্যাদি গুণাগুণের সাথে সম্পৃক্ত একটি বিষয়। দিরহাম দীনারের সত্তার সাথে তার হক সম্পৃক্ত নয়। তাই তো দেনাদার পাওনাদার হতে যে দিরহাম গুলো নিয়েছিল, হুবহু সে দিরহাম গুলো পরিশোধ করতে হয় না। বরং যে কোনো দিরহাম দিলেই ঋণ পরিশোধ হয়ে যায়। পাওনাদারের হক যদি দিরহাম দীনারের সত্তার সাথে সম্পৃক্ত হতো তাহলে যে দিরহাম নিয়েছিল সে দিরহামই পরিশোধ করতে হতো। মোটকথা, পাওনাদারের হক দিরহাম দীনারের সত্তার সাথে সম্পৃক্ত নয়। তাই পাওনার সমজাত বস্তুও দেনাদার হতে নিয়ে যাওয়ার অধিকার নেই এটা হলো প্রকৃত কিয়াসের দাবি। কিন্তু আমরা এ কিয়াসের দাবি এড়িয়ে যাই সমজাত বস্তুর ক্ষেত্রে কারণ সমজাত বস্তু সমূহের পরস্পরে পার্থক্য খুবই কম। তাই পাওনার সমজাত বস্তু চুরি করলে আমরা একে চুরি বলি না। বলি যে, সে নিজের পাওনাই উসুল করেছে।

কিন্তু যদি পাওনার অসমজাত বস্তু চুরি করে তাহলে আমরা প্রকৃত কিয়াসের দাবি এড়াতে পারি না। কারণ অসমজাত বস্তুর মাঝে পার্থক্য বিস্তর। অতএব, দিরহাম পাওনা থাকা অবস্থায় দেনাদারের গোয়াল থেকে গরু নিয়ে গেলে আমরা একথা বলতে পারি না যে, সে তার নিজের পাওনা উসুল করেছে। বরং এটাই বলতে হয় যে, সে চুরি করেছে। অতএব, তার হাত কেটে দিতে হবে।

হ্যাঁ, যদি সে নিজের এহেন কর্মের সাথে– এমন দাবিও করে বসে যে, আমি তার গরু চুরি করে আনিনি। বরং গরু এনেছি আমার পাওনা উসুল বাবদ। কিংবা বলে যে, গরু এনেছি বন্ধক বাবদ, যেদিন সে আমার পাওনা দিরহাম পরিশোধ করবে সে দিন তার গরু দিয়ে দেব। তাহলে অবশ্যই তার হাত কাটা হবে না কারণ তখন সে মতানৈক্য পূর্ণ একটি বিষয়ে একটি মত গ্রহণ করেছেন নিজ ধারণা অনুযায়ী। যা সন্দেহ সৃষ্টি করা মুক্ত নয়, বিধায়ে তার থেকে হদ্দ রহিত হয়ে যাবে।

দিরহাম পাওনা অবস্থায় যদি দীনার চুরি করে তাহলে কারো কারো মতে হাত কাটা হবে। তারা মনে করেন দীনার দিরহামের অসমজাত বস্তু। তাই তার কাজটি চুরি বলে গণ্য। আবার কারো কারো মতে হাত কাটা হবে না। তারা মনে করেন, দীনার দিরহামের সমজাত বস্তু। কেননা দিরহাম দীনার উভয়ই মুদ্রা। আর সকল মুদ্রা একশ্রেণির বা সমজাতীয়। তাই তার কাজটি চুরি নয় বরং পাওনা উসুল। অতএব, তার হাত কাটা হবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

وَمَنْ سَرَقَ عَيْنًا فَقُطِعَ فِيْهَا فَرَدَّهَا ثُمَّ عَادَ فَسَرَقَهَا وَهِيَ بِحَالِهَا لَمْ يُقْطَعْ وَالْقِيَاسُ اَنْ يُقْطَعَ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ اَبِيْ يُوْسُفَ (رحـ) وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ (رحـ)، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ﴿فَإِنْ عَادَ فَاقْطَعُوْهُ﴾ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ، وَلِاَنَّ الثَّانِيَةَ مُتَكَامِلَةٌ كَالْاُوْلٰى بَلْ اَقْبَحُ لِتَقَدُّمِ الزَّاجِرِ، وَصَارَ كَمَا اِذَا بَاعَهُ الْمَالِكُ مِنَ السَّارِقِ ثُمَّ اشْتَرَاهُ مِنْهُ ثُمَّ كَانَتِ السَّرِقَةُ. وَلَنَا اَنَّ الْقَطْعَ اَوْجَبَ سُقُوْطَ عِصْمَةِ الْمَحَلِّ عَلٰى مَا يُعْرَفُ مِنْ بَعْدُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى، وَبِالرَّدِّ إِلَى الْمَالِكِ اِنْ عَادَتْ حَقِيْقَةُ الْعِصْمَةِ بَقِيَتْ شُبْهَةُ السُّقُوْطِ نَظَرًا اِلَى اتِّحَادِ الْمِلْكِ وَالْمَحَلِّ، وَقِيَامُ الْمُوْجِبِ وَهُوَ الْقَطْعُ فِيْهِ، بِخِلَافِ مَا ذُكِرَ لِاَنَّ الْمِلْكَ قَدْ اِخْتَلَفَ بِاخْتِلَافِ سَبَبِهِ، وَلِاَنَّ تَكْرَارَ الْجِنَايَةِ مِنْهُ نَادِرٌ لِتَحَمُّلِهِ مَشَقَّةَ الزَّاجِرِ فَتُعَرَّى الْاِقَامَةُ عَنِ الْمَقْصُوْدِ وَهُوَ تَقْلِيْلُ الْجِنَايَةِ، وَصَارَ كَمَا اِذَا قَذَفَ الْمَحْدُوْدُ فِي الْقَذْفِ الْمَقْذُوْفَ الْاَوَّلَ.

অনুবাদ : কোনো বস্তু চুরি করার কারণে যদি কারো হাত কাটা যায়, এর পর সে চুরির মাল ফেরত দেয়। অতঃপর একই মাল দ্বিতীয় বার চুরি করে, অথচ ঐ মাল পূর্বের অবস্থায় বিদ্যমান রয়েছে, তাহলে পুনরায় হস্তকর্তন করা হবে না। কিন্তু কিয়াসের দাবি হলো, হস্ত কর্তন করা হবে। এটা ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) হতে বর্ণিত হয়েছে এবং ইমাম শাফেয়ী (র.)-এরও এই মত। কেননা নবী করীম ﷺ বলেছেন- فَإِنْ عَادَ فَاقْطَعُوْهُ যদি সে পুনরায় চুরি করে তাহলে পুনরায় তার হস্ত কর্তন কর। এতে কোনো পার্থক্য করা হয়নি। তাছাড়া এজন্য যে, প্রথমটির মতো দ্বিতীয় অপরাধটিও পূর্ণতা সম্পন্ন; বরং তা অধিকতর মন্দ। কেননা এর পূর্বে সতর্ক করা হয়েছে।

আর বিষয়টি এমন হলো, যেন মালিক জিনিসটি চোরের কাছে বিক্রি করার পর তার কাছ থেকে আবার খরিদ করল এরপর চুরির ঘটনা ঘটল।

আমাদের দলিল এই যে, হস্ত কর্তন সম্পদসত্তার সুরক্ষা গুণের বিলুপ্তি অনিবার্য করে। এ সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা পরে জানা যাবে ইন-শাআল্লাহ। অবশ্য মালিকের কাছে বস্তুটি ফেরত দেওয়ার ফলে তার সুরক্ষা যদিও পূর্ণ লাভ হয়ে থাকে কিন্তু মালিকানায় অভিন্নতা এবং সম্পদ পাত্রের অভিন্নতা এবং সুরক্ষার বিলুপ্তি সাব্যস্তকারী তথা কর্তন বিদ্যমান থাকার দিকে লক্ষ্য করে বলা যায় যে, সুরক্ষা বিলুপ্তির সন্দেহ বিদ্যমান রয়েছে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বিক্রয়ের যে মাসআলা উল্লেখ করেছেন সেটা ভিন্ন । কেননা মালিকানার কারণ পরিবর্তিত হওয়ায় বস্তুও পরিবর্তিত হয়েছে। তাছাড়া কর্তিত হস্ত ব্যক্তি থেকে পুনঃ অপরাধ সংঘটন বিরল। কেননা সে শাসনের কষ্ট বরদাশ্‌ত করেছে। সুতরাং হদ্দ প্রয়োগ অপরাধের পরিমাণ হ্রাস করার মূল উদ্দেশ্য থেকে খালি হয়ে যাবে। তাই বিষয়টি এমন হলো, যেন হদ্দে কাযাফপ্রাপ্ত ব্যক্তি যাকে প্রথমে অপবাদ দিয়েছিল, তাকেই পুনরায় অপবাদ দিল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিউক্ত ইবারতে একটি মতভেদপূর্ণ মাসআলা আলোচিত হয়েছে। মাসআলাটি হলো, কেউ কারো নিকট হতে কোনো বস্তু চুরি করল, চুরির দায়ে হাত কাটা হলো। বস্তুটি মালিকের নিকট ফিরিয়ে দেওয়া হলো, তারপর সেই চোর বস্তুটি পুনরায় চুরি করল এবং বস্তুটি তখনও আগের মতোই আছে। এমতাবস্থায় পুনরায় চোরের হাত কাটা হবে কি না? ইমামগণ এ বিষয়ে দু'ধরনের মত প্রকাশ করেছেন-

https://e-ilm.weebly.com/

১. ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.) বলেন, পুনরায় চোরের হাত কাটা হবে না।

২. ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমামত্রয় বলেন, পুনরায় চোরের হাত কাটা হবে।

ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমামত্রয়ের দলিল হলো–

নবী করীম ﷺ এর বাণী فَإِنْ عَادَ فَاقْطَعُوْهُ যদি চোর পুনরায় চুরি করে তাহলে পুনরায় কর্তন কর। এ হাদীসটির পূর্ণরূপ এই–

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِىِّ صلى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسلم قَالَ إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ فَاقْطَعُوْا يَدَهُ فَإِنْ عَادَ فَاقْطَعُوْا رِجْلَهُ فَإِنْ عَادَ فَاقْطَعُوْا يَدَهُ فَإِنْ عَادَ فَاقْطَعُوْا رِجْلَهُ ـ

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, যখন কোনো চোর চুরি করে তখন তোমরা তার হাত কেটে দাও। যদি পুনরায় চুরি করে তাহলে তার পা কেটে দাও। যদি আবার চুরি করে তাহলে অপর হাত কেটে দাও। যদি চতুর্থবার চুরি করে তাহলে অপর পা কেটে দাও।

এ হাদীসে বলা হয়েছে পুনরায় চুরি করলে পুনরায় কর্তন কর। চুরির মাল পরিবর্তন হওয়া বা না হওয়ার মাঝে কোনোরূপ পার্থক্য করা ব্যতীতই। অতএব, চুরির মালটি আগের মতো থাকলেও কর্তন করা হবে।

তাছাড়া আরেকটি কারণ হলো এই যে, দ্বিতীয় চুরিটি প্রথম চুরির মতোই একটি পূর্ণাঙ্গ অপরাধ। বরং প্রথমটির তুলনায় দ্বিতীয়টি বেশি মারাত্মক। কেননা অতীতে একবার শাস্তি প্রাপ্ত হওয়ার দ্বারা সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সে সতর্ক না হয়ে পুনরায় অপরাধে লিপ্ত হয়েছে। অতএব, এবার কর্তন করা আগের চেয়েও বেশি জরুরি। এ বিষয়টির নজির হলো যেমন কোনো ব্যক্তি কারো কাছে একটি জিনিস বিক্রি করল। অতঃপর জিনিসটি ক্রেতার নিকট হতে পুনরায় বিক্রেতা ক্রয় করে নিল। অতঃপর সে (প্রথম ক্রেতা) তার (প্রথম বিক্রেতা) নিকট হতে জিনিসটি চুরি করে নিল। এমতাবস্থায় এটাকে চুরি বলেই গণ্য করা হবে এবং হস্ত কর্তন করা হবে। তদ্রূপ আলোচ্য মাসআলায়ও হস্ত কর্তন করা হবে।

ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.) এর দলিল হলো, চোরের হাত কর্তন হওয়ার মাধ্যমে চুরিকৃত মালের সুরক্ষা বাতিল হয়ে যায়। (এ প্রসঙ্গটি সামনে বিস্তারিত আলোচিত হবে) তারপর মালটি মালিকের হাতে ফিরে যাওয়ার মাধ্যমে পুনরায় সুরক্ষার গুণ ফিরে আসে। কিন্তু মাল এক হওয়া, মালিক এক হওয়া ও চোরের হাত কাটা অবস্থার দিকে লক্ষ্য করলে মনে হয় মালটির সুরক্ষাগুণ অনুপস্থিত। কিংবা মালটি সুরক্ষিত হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ জাগে। আর সন্দেহ মাত্রই হদ্দ রহিত করে দেয়। অতএব, চুরির মাল অপরিবর্তিত থাকা অবস্থায় পুনরায় চুরি করলে পুনরায় হাত কাটা হবে না।

আরেকটি কারণ হলো এই যে, হদ্দ কায়েম করার উদ্দেশ্য হলো অপরাধ কমানো। আর কোনো ব্যক্তি একবার হাত কাটার শাস্তি ভোগ করলে পুনরায় অপরাধ খুব কমই করে থাকে। অতএব, যে অপরাধ এমনিতেই কম সংঘটিত হয় সে অপরাধ হতে সাবধান করার জন্য হাত কেটে হদ্দ কায়েমের প্রয়োজন নেই। অন্যথায় হদ্দটি ফায়দাহীন হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

আলোচ্য মাসআলাটির নজির হলো, যেমন কোনো ব্যক্তি কাউকে একটি ব্যভিচারের অপবাদ দিল। ফলে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হলো। তারপর আবার এই হদ্দ প্রাপ্ত ব্যক্তি সেই ব্যক্তিকে অপবাদ দিল। এমতাবস্থায় অপবাদ দাতার উপর পুনরায় অপবাদের হদ্দ কায়েম করা হয় না। অতএব, তেমনিভাবে আলোচ্য মাসআলায়ও চোরের উপর হদ্দ কায়েম করা হবে না।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) আলোচ্য মাসআলার যে নজির পেশ করেছেন ক্রয়, বিক্রয়ের সুরত দ্বারা -এর জবাব হলো এই যে, ক্রয়-বিক্রয়ের সুরতটি আমাদের আলোচ্য মাসআলার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কারণ সেখানে মালিকানার উপায় ভিন্ন হওয়ার দ্বারা বা পরিবর্তন হওয়ার দ্বারা বস্তু পরিবর্তন হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে আলোচ্য মাসআলায় এ ধরনের কোনো পরিবর্তন নেই। বিধায় এখানে বস্তুকে অপরিবর্তনীয় বলেই গণ্য করা হবে।

মালিকানার উপায় পরিবর্তন হলে যে বস্তু পরিবর্তন হয়ে যায়, এর দলিল হলো নবী করীম ﷺ -এর বাণী যা তিনি হযরত বারীরা (রা.) কে লক্ষ্য করে উচ্চারণ করেছিলেন لَكِ صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ এ গোশ্‌ত তোমার জন্য সদকা, আমাদের জন্য হাদিয়া। মোটকথা, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) কর্তৃক পেশকৃত নজিরটি সঠিক নয়।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ فَإِنْ تَغَيَّرَتْ عَنْ حَالِهَا مِثْلُ اَنْ يَكُوْنَ غَزْلًا فَسَرَقَهُ وَقُطِعَ فَرَدَّهُ ثُمَّ نُسِجَ فَعَادَ فَسَرَقَهُ قُطِعَ لِاَنَّ الْعَيْنَ قَدْ تَبَدَّلَتْ وَلِهٰذَا يَمْلِكُهُ الْغَاصِبُ بِهِ، وَهٰذَا هُوَ عَلَامَةُ التَّبَدُّلِ فِيْ كُلِّ مَحَلٍّ، وَاِذَا تَبَدَّلَتْ اِنْتَفَتِ الشُّبْهَةُ النَّاشِئَةُ مِنْ اِتِّحَادِ الْمَحَلِّ، وَالْقَطْعُ فِيْهِ فَوَجَبَ الْقَطْعُ ثَانِيًا.

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, **যদি বস্তুটি তার পূর্ব অবস্থা হতে পরিবর্তন হয়ে যায়, যেমন সুতা ছিল সেটা চুরি করল, ফলে তার হস্ত কর্তন করা হলো। আর চুরির মাল ফেরত দিল, অতঃপর মালিক তা দ্বারা বস্ত্র বয়ন করল এবং সে তা আবার চুরি করল তাহলে তার হস্ত কর্তন করা হবে।** কেননা বস্তুটির সত্তা পরিবর্তিত হয়েছে। একারণেই তো গসবকারী (ছিনতাইকারী) ঐ সুতা দ্বারা বস্ত্র বয়ন করে ফেললে সে তার মালিক হয়ে যায় এবং যে কোনো ক্ষেত্রে এটাই হলো বস্তুসত্তা পরবর্তিত হওয়ার আলামত। আর যখন বস্তুসত্তা পরিবর্তন হয়ে গেল তখন সম্পদপাত্রের অভিন্নতা ও ঐ পাত্রের বিপরীতে কর্তন সাব্যস্ত হওয়া থেকে উদ্ভূত সন্দেহ নাকোচ হয়ে গেল। সুতরাং দ্বিতীয়বার কর্তন সাব্যস্ত হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আলোচ্য মাসআলাটি পূর্ববর্তী মাসআলার পরিসমাপ্তি। পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে যে, চুরির মালটি অপরিবর্তিত থাকা অবস্থায় পুনরায় চুরি করলে কর্তন সাব্যস্ত হবে। এখানে বলা হচ্ছে চুরির মালটি পরিবর্তিত হয়ে যাওয়ার পর যদি পুনরায় চুরি করে তাহলে কর্তন সাব্যস্ত হবে। যেমন মালটি সুতা থাকা অবস্থায় প্রথমবার চুরি করেছিল এবং এর ফলে তার হাত কাটা হয়েছিল। এর পর সুতাটা মালিকের হাতে ফিরিয়ে দিলে মালিক সেই সুতা দ্বারা কাপড় বানাল। তারপর আবার সেই চোর উক্ত কাপড় চুরি করল। এমতাবস্থায় দ্বিতীয়বার চুরির কারণে শাস্তি স্বরূপ কর্তন সাব্যস্ত হবে।

কেননা মালটি সুতা হতে পরিবর্তন হয়ে কাপড়ে পরিণত হয়েছে। এর ফলে বস্তুটির সত্তাই পরিবর্তন হয়ে গেছে এবং অন্য একটি নতুন পৃথক বস্তুর হুকুমে চলে গেছে। সুতরাং একবার এক বস্তু চুরি করে হাত কাটার পর দ্বিতীয়বার অন্য বস্তু চুরি করলে যেমন পুনরায় কর্তন সাব্যস্ত হয়, তেমনি এখানেও দ্বিতীয়বার কর্তন সাব্যস্ত হবে।

সুতাকে বস্ত্রে পরিণত করা হলে তা যে ভিন্ন বস্তু হয়ে যায়, এর প্রমাণ হলো গসবের মাসআলা। অর্থাৎ যদি কারো নিকট হতে সুতা গসব করে নিয়ে তা দ্বারা কাপড় তৈরি করে ফেলে, তাহলে তা গসবকারীর মালিকানা হয়ে যায়। সে কাপড়ে সুতার মালিকের হক থাকে না। এর দ্বারাই বুঝা যায়, কাপড় বানানোর ফলে বস্তু পরিবর্তন হয়ে যায়। যদি পরিবর্তন না হতো ভিন্ন বস্তু না হতো, তাহলে সুতার মালিকই উক্ত কাপড়ের হকদার হতো।

অতএব, আলোচ্য মাসআলায় যখন মালটি পরিবর্তন হয়ে যায় এবং ভিন্ন বস্তুতে পরিণত হয়, তখন মাল এক হওয়া এবং সেই মালের কারণে একবার হাত কাটা যাওয়া হতে যে মাল সুরক্ষিত না হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছিল, তা দূরীভূত হয়ে যাবে। আর সন্দেহ দূরীভূত হলেই পুনরায় হদ্দ সাবেত হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

فَصْلٌ فِي الْحِرْزِ وَالْأَخْذِ مِنْهُ

وَمَنْ سَرَقَ مِنْ اَبَوَيْهِ اَوْ وَلَدِهٖ اَوْ ذِي رِحْمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ لَمْ يُقْطَعْ فَالْاَوَّلُ وَهُوَ الْوِلَادُ لِلْبُسُوْطَةِ فِي الْمَالِ وَفِي الدُّخُوْلِ فِي الْحِرْزِ . وَالثَّانِيْ لِلْمَعْنَى الثَّانِيْ، وَلِهٰذَا اَبَاحَ الشَّرْعُ النَّظَرَ اِلٰى مَوَاضِعِ الزِّيْنَةِ الظَّاهِرَةِ مِنْهَا، بِخِلَافِ الصَّدِيْقَيْنِ لِاَنَّهٗ عَادَاهُ بِالسَّرِقَةِ . وَفِي الثَّانِي خِلَافُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللّٰهُ لِاَنَّهٗ اَلْحَقَهَا بِالْقَرَابَةِ الْبَعِيْدَةِ، وَقَدْ بَيَّنَّاهُ فِي الْعَتَاقِ -

পরিচ্ছেদ : সংরক্ষিত (বস্তু) ও তা নিয়ে যাওয়া প্রসঙ্গে

অনুবাদ : কেউ যদি তার মাতা-পিতা থেকে কিংবা সন্তান থেকে কিংবা মাহরাম আত্মীয় থেকে কিছু চুরি করে তাহলে তার হস্ত কর্তন করা হবে না। প্রথম ক্ষেত্রে অর্থাৎ জন্মসূত্রের সম্পর্কের ক্ষেত্রে কারণ হলো, সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে পরস্পর শিথিলতা এবং সুরক্ষিত স্থানে অবাধ প্রবেশাধিকার।

আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দ্বিতীয় কারণে। আর এজন্যই শরিয়ত মাহরাম আত্মীয়দের প্রকাশ্য সৌন্দর্যের স্থান গুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করার অনুমতি দিয়েছে। দুই বন্ধুর বিষয়টি ভিন্ন। কেননা চুরি করার মাধ্যমে সে তার প্রতি শত্রুতা পোষণ করেছে।

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে (মাহরামের মাল চুরির ক্ষেত্রে) ইমাম শাফেয়ী (র.) ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। কেননা মাহরাম আত্মীয়তাকে দূর আত্মীয়তার সাথে যুক্ত করেছেন। এই মতভেদ আমরা দাসমুক্তি প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ব সামঞ্জস্য : আগের পরিচ্ছেদে আলোচনা হয়েছে যে সকল বিষয়ে হাত কাটা হয় এবং যে সকল বিষয়ে হাত কাটা হয় না সম্পর্কে। আর হাতকাটা সাব্যস্ত হওয়ার জন্য শর্ত হলো সংরক্ষিত বস্তু চুরি করা। তাই বর্তমান পরিচ্ছেদে সংরক্ষিত বস্তু বা স্থান সম্পর্কে আলোচনা হবে।

اَلْحِرْزُ- শব্দটি حَرِيْزٌ -এর অর্থে। অর্থাৎ সংরক্ষিত। যেমন বলা হয়ে থাকে, مَوْضَعٌ حَرِيْزٌ - সংরক্ষিত স্থান।

অর্থাৎ যে স্থানে কোনো কিছু সংরক্ষণ করা হয়। শরিয়তের পরিভাষায় حرز বলতে এমন স্থান বুঝানো উদ্দেশ্য হয়, যে স্থানে ধন সম্পদ সংরক্ষণ করা হয়। যেমন– ঘর, তাঁবু, দোকান ইত্যাদি।

বর্ণিত মাসআলার সারমর্ম:

১. সন্তান যদি পিতা-মাতার সম্পদ হতে চুরি করে কিংবা দাদা-দাদীর সম্পদ হতে চুরি করে তাহলে সন্তানের হাত কাটা হবে না। তদ্রূপ যদি পিতা-মাতা, দাদা-দাদী সন্তানের সম্পদ হতে চুরি করে তাহলেও তাদের হাত কাটা হবে না, দুটি কারণে।

https://e-ilm.weebly.com/

এক. পিতা-মাতা, দাদা-দাদী, ছেলে-মেয়ে ও নাতি-নাতনীর পরস্পর একে অপরের সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে শিথিলতা থাকে। একে অপরের সম্পদ ব্যবহার করে থাকে।

দুই. উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ একে অপরের সংরক্ষিত স্থানে অবাধে যাতায়াত করতে পারে।

এ মাসআলায় ইমাম মালেক আবূ ছাওর প্রমুখের দ্বিমত রয়েছে। তারা বলেছেন, উপরোল্লিখিত ব্যক্তিবর্গের একজন অপর জনের সম্পদ হতে চুরি করলে হাত কেটে দেওয়া হবে।

২. কেউ যদি মাহরাম আত্মীয়ের সম্পদ হতে চুরি করে তাহলে আহনাফের মতে হাত কাটা হবে না। ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতে হাত কাটা হবে।

আহনাফের মতে হাত না কাটার কারণ হলো এই মাহরাম আত্মীয়গণ একে অপরের সংরক্ষণস্থলে অবাধে যাতায়াত করে থাকে। একারণেই শরিয়ত মাহরাম আত্মীয়ের প্রকাশ্য সৌন্দর্যস্থান সমূহ দেখা বৈধ করেছে। যেমন হাত-পা ইত্যাদি।

মাহরাম আত্মীয়রা হলেন, ভাই, বোন, চাচা, মামা, ফুফু ইত্যাদি।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে হাত কাটা হবে। এর কারণ হলো এই যে, তিনি মাহরাম আত্মীয়কে দূর আত্মীয়ের সাথে তুলনা করেন। তাই তিনি বলেন, দূর আত্মীয়ের সম্পদ হতে চুরি করলে যেমন হাত কাটা হয়, তেমনি মাহরাম আত্মীয়ের সম্পদ হতে চুরি করলেও হাত কাটা হবে।

আহনাফের বর্ণিত কারণের উপর একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে, সংরক্ষিত স্থানে অবাধে যাতায়াতের কারণে যদি হাত কাটা রহিত হয়ে যায়, তাহলে এক বন্ধুর সম্পদ হতে অপর বন্ধু চুরি করলেও হাত না কাটা উচিত। কেননা তারাও একে অপরের সংরক্ষণস্থলে যাতায়াত করে থাকে। অথচ বন্ধুর সম্পদ হতে চুরি করার দায়ে বন্ধুর হাত কাটা হয়।

গ্রন্থকার এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বলেন, বন্ধু যখন বন্ধুর সম্পদ হতে চুরি করে তখন বন্ধুত্ব থাকে না। বরং শত্রু হয়ে যায়। তাই হাত কাটা হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَلَوْ سَرَقَ مِنْ بَيْتِ ذِيْ رَحِمٍ مَحْرَمٍ مَتَاعَ غَيْرِهِ يَنْبَغِيْ اَنْ لَا يُقْطَعَ، وَلَوْ سَرَقَ مَالَهُ مِنْ بَيْتِ غَيْرِهِ يُقْطَعُ اِعْتِبَارًا لِلْحِرْزِ وَعَدَمِهِ وَاِنْ سَرَقَ مِنْ اُمِّهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ قُطِعَ وَعَنْ اَبِيْ يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنَّهُ لَا يُقْطَعُ لِاَنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ اِسْتِيْذَانٍ وَحِشْمَةٍ، بِخِلَافِ الْاُخْتِ مِنَ الرَّضَاعَةِ لِانْعِدَامِ هٰذَا الْمَعْنٰى فِيْهَا عَادَةً .وَجْهُ الظَّاهِرِ اَنَّهُ لَا قَرَابَةَ وَالْمَحْرَمِيَّةُ بِدُوْنِهَا لَا تُحْتَرَمُ كَمَا اِذَا ثَبَتَتْ بِالزِّنَا وَالتَّقْبِيْلِ عَنْ شَهْوَةٍ، وَاَقْرَبُ مِنْ ذٰلِكَ الْاُخْتُ مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَهٰذَا لِاَنَّ الرَّضَاعَ قَلَّمَا يَشْتَهِرُ فَلَا بُسُوْطَةَ تَحَرُّزًا عَنْ مَوْقِفِ التُّهْمَةِ بِخِلَافِ النَّسَبِ .

وَاِذَا سَرَقَ اَحَدُ الزَّوْجَيْنِ مِنَ الْاٰخَرِ اَوِ الْعَبْدُ مِنْ سَيِّدِهِ اَوْ مِنْ اِمْرَاَةِ سَيِّدِهِ اَوْ مِنْ زَوْجِ سَيِّدَتِهِ لَمْ يُقْطَعْ لِوُجُوْدِ الْاِذْنِ بِالدُّخُوْلِ عَادَةً، وَاِنْ سَرَقَ اَحَدُ الزَّوْجَيْنِ مِنْ حِرْزِ الْاٰخَرِ خَاصَّةً لَا يَسْكُنَانِ فِيْهِ فَكَذٰلِكَ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللّٰهُ لِبُسُوْطَةٍ بَيْنَهُمَا فِي الْاَمْوَالِ عَادَةً وَدَلَالَةً وَهُوَ نَظِيْرُ الْخِلَافِ فِي الشَّهَادَةِ .

অনুবাদ : মাহরামের ঘর থেকে যদি অন্য কারো মাল চুরি করে তাহলে কর্তন সাব্যস্ত না হওয়ারই কথা। পক্ষান্তরে অন্যের ঘর থেকে মাহরামের মাল চুরি করলে কর্তন সাব্যস্ত হবে। এটা হলো সংরক্ষিত থাকা-না থাকার বিবেচনায়।

যদি দুধ মায়ের মাল চুরি করে তাহলে হাত কাটা হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) হতে বর্ণিত রয়েছে যে, হাতকাটা হবে না। কেননা যে বিনা অনুমতিতে নিঃসংকোচে তার কাছে যাওয়া-আসা করে। দুধ বোনের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা তার ক্ষেত্রে সচরাচর এ অবস্থা হয় না।

যাহিরে রেওয়ায়েতের কারণ এই যে, এখানে রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়তা বিদ্যমান নেই। আর এটা ছাড়া মাহরাম সম্পর্কের মর্যাদা সাধারণত ততটা রক্ষা হয় না। যেমন জেনার কারণে কিংবা যৌন চাহিদাসহ চুমু দেওয়ার কারণে ঘটিত সম্পর্কে আর এর চেয়েও নিকটতম মাহরাম হচ্ছে দুধ বোন।

তার দুধ সম্পর্কের বিষয়টি বিবেচনায় না আনার কারণ এই যে, এটা বিশেষ প্রচার লাভ করেনা। ফলে তোহমতের অবস্থান হতে সরে থাকার জন্য সেখানে খোলা-মেলা মেলামেশা হয় না কিন্তু নসব ও রক্ত সম্পর্কের বিষয়টি ভিন্ন।

স্বামী-স্ত্রী যদি পরস্পরের মাল চুরি করে, কিংবা গোলাম যদি তার মনিবের কিংবা মনিবের স্ত্রীর কিংবা মালিকার স্বামীর মাল চুরি করে, তাহলে তার হস্ত কর্তন করা হবে না। কেননা এ সকল ক্ষেত্রে সাধারণত আসা-যাওয়ার অবাধ অনুমতি থাকে। স্বামী-স্ত্রীর একজন যদি অপর জনের বিশেষ সুরক্ষিত স্থান হতে চুরি করে, যেখানে তারা একসাথে বসবাস করেনা, তাহলেও আমাদের মতে একই হুকুম। ইমাম শাফেয়ী (র) ভিন্নমত পোষণ করেন। কেননা অভ্যাসগত ও বিবাহ সম্পর্কের প্রমাণগত দিক থেকে উভয়ের মাঝে খোলামেলা মেলামেশা রয়েছে। এটা স্বামী-স্ত্রীর একের পক্ষে অন্যের সাক্ষ্যদান প্রসঙ্গে মতপার্থক্যের সদৃশ।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কোনো ব্যক্তির জন্য তার মাহরামের সংরক্ষণ স্থলে যাওয়ার আসার অনুমতি থাকে। বিধায় কারো মাহরাম আত্মীয়ের ঘর তার জন্য সংরক্ষিত স্থান নয়। তাই মাহরামের ঘর থেকে অন্যের মাল চুরি করলেও হাত কাটা হবে না। কারণ হাতাকাটার জন্য শর্ত হলো সংরক্ষিত স্থান হতে চুরি করা।

পক্ষান্তরে যদি মাহরাম আত্মীয়ের মাল অন্যের ঘর হতে চুরি করে তাহলে হাত কাটা হবে। কেননা অন্যের ঘর তার জন্য হিরয বা সংরক্ষিত স্থান। অতএব, সংরক্ষিত স্থান হতে চুরি করার শর্ত বিদ্যমান হয়েছে। বিধায় তার হাত কাটা হবে।

قَوْلُهُ : وَإِنْ سَرَقَ مِنْ أُمِّهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ الخ : কেউ যদি নিজ দুধ মায়ের মাল চুরি করে তাহলে যাহিরে রেওয়ায়েত হলো তার হাত কর্তন করা হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) হতে বর্ণিত আছে, হাত কাটা হবে না।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল হলো, ব্যক্তি তার দুধ মায়ের কাছে বিনা অনুমতিতে অবাধে যাওয়া-আসা করতে পারে। অতএব, দুধ মায়ের ঘর তার জন্য হিরয তথা সংরক্ষিত স্থান নয়। তাই সেখান থেকে চুরি করার দায়ে হাত কাটা যাবে না। কিন্তু দুধ বোনের মাল চুরি করলে হাত কাটা হবে। কারণ দুধ বোনের কাছে দুধ ভাই ততবেশি অবাধে যাতায়াত করে না। অর্থাৎ ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে দুধ বোনের উপর দুধ মা কে কিয়াস করা চলবেনা। উভয়ের হুকুম ভিন্ন ভিন্ন।

যাহিরে রেওয়ায়েতের দলিল হলো এই যে, দুধ মায়ের সাথে ব্যক্তির হুরমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দুধ পান করার কারণে। রক্তের সম্পর্কের কারণে নয়। আর যে সব হুরমত রক্তসম্পর্ক ছাড়া অন্য কোনো ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয় যেসব হুরমতের মর্যাদা ততটা রক্ষা করা হয় না। যেমন কেউ যদি কোনো মহিলার সাথে জেনা করে কিংবা যৌন চাহিদাসহ চুমা দেয়, তাহলে উক্ত মহিলার মা ও মেয়ে জেনাকারী বা চুম্বনকারী পুরুষের জন্য হারাম হয়ে যায়। তথাপি যদি এই পুরুষ উক্ত মা কিংবা মেয়ের ঘর থেকে চুরি করে তাহলে হাত কেটে দেওয়া হয়। অথচ সে যার ঘর হতে চুরি করেছে, তার সাথে হুরমত প্রতিষ্ঠিত আছে। অতএব, বুঝা গেল রক্তসম্পর্ক ছাড়া অন্য কারণে প্রতিষ্ঠিত হুরমতের ততটা মর্যাদা নেই।

অনুরূপভাবে ব্যক্তি ও তার দুধ বোনের মাঝে হুরমত থাকে। কিন্তু দুধবোনের ঘর থেকে চুরি করলে সর্ব সম্মতিক্রমে হাত কেটে দেওয়া হয়। তাহলে বুঝা গেল এক্ষেত্রেও হুরমতের মর্যাদা ততটা রক্ষা করা হয়নি। আরো লক্ষণীয় যে, দুধ বোনের ঘর হতে চুরি করলে যেমন হাত কাটা হয়, তেমনি জেনার মাধ্যমে হারাম হয়েছে এমন ব্যক্তির ঘর হতে চুরি করলেও হাত কেটে দেওয়া হয়। অতএব, দুধ মার ঘর হতে চুরি করলেও হাত কেটে দেওয়া হবে। কেননা দুধ বোনের সাথে দুধ মায়ের সামঞ্জস্য বেশি, ঐ ব্যক্তির তুলনায়, যার সাথে হুরমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জেনার মাধ্যমে। কারণ দুধ বোন ও দুধমা উভয়ের হুরমতের কারণ এক তথা দুধ পান। আর ঐ মহিলার হুরমতের কারণ ভিন্ন অর্থাৎ জেনা। তাহলে, জেনার মাধ্যমে হারাম ব্যক্তি কে যখন দুধ বোনের হুকুমের আওতাভুক্তকারী হলো, তখন দুধ মাকে দুধ বোনের হুকুমের আওতায় অবশ্যই আনা যাবে। কথাটা এভাবেও বলা যায় যে, জেনার মাধ্যমে হারাম ব্যক্তিকে যখন দুধ বোনের সাথে কিয়াস করা গেল তখন দুধ মাকে অবশ্যই দুধ বোনের সাথে কিয়াস করা যাবে। কেননা প্রথম দুজনের হুরমতের তরিকা ভিন্ন। আর দ্বিতীয় দুজনের হুরমতের তরিকা অভিন্ন। অতএব, দুধ বোনের মাল চুরি করলে যেমন সর্বসম্মতিক্রমে হাত কেটে দেওয়া হয়, তেমনি দুধ মায়ের মাল চুরি করলেও হাত কেটে দেওয়া হবে।

রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়তা ও দুধ সম্পর্কের আত্মীয়তার মাঝে এরূপ পার্থক্যের কারণ কি যে, রক্ত সম্পর্কের মা বোনের মাল চুরি করলে হাত কাটা হয় না আর দুধ মাও দুধ বোনের মাল চুরি করলে হাত কেটে দেওয়া হয়।

এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে মুসান্নিফ (র.) বলেন, রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়তাটি লোকসমাজে অতি প্রসিদ্ধ থাকে। সবাই জানে অমুক অমুকের মা, সে তার ছেলে, এ তার ভাই, ও তার বোন ইত্যাদি। এবং একারণে এসব আত্মীয়ের সাথে

https://e-ilm.weebly.com/

মেলামেশাও অধিক হয় কোনোরূপ তোহমতের আশঙ্কা না থাকার কারণে । পক্ষান্তরে দুধ পান সম্পর্কিত আত্মীয়তাটি তত প্রসিদ্ধি লাভ করে না । এ কারণেই তোহমতের আশঙ্কা থাকে এবং সেহেতু তাদের সাথে ব্যক্তি ততটা মেলামেশা করেনা । কিংবা বলা যায়– ব্যক্তির আপন মা, আপন বোন সকলের কাছে পরিচিত থাকে । তাই ব্যক্তিও মা ও বোনের কাছে সংকোচ বিহীন যাতায়াত করে থাকে । কোনো অপবাদের সম্ভাবনা না থাকার কারণে । পক্ষান্তরে দুধ মা, দুধবোন তত পরিচিত হয় না । তাই ব্যক্তিও তাদের কাছে নিঃসংকোচ যাতায়াত করে না, অপবাদের আশঙ্কা থাকার কারণে । এ বাস্তবধর্মী পার্থক্যের দিকে লক্ষ্য করেই রক্ত সম্পর্কে ও দুধ সম্পর্কের মাঝে পার্থক্য করা হয়েছে ।

قَوْلُهُ : وَاِذَا سَرَقَ اَحَدُ الزَّوْجَيْنِ مِنَ الْاٰخَرِ اَوْ الْعَبْدُ الخ : উপরিউক্ত ইবারতে তিনটি মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে ।

১. স্বামী-স্ত্রী একে অপরের মাল চুরি করলে হাত কাটা হবে না । কারণ স্বামীর মাল স্ত্রীর পক্ষে এবং স্ত্রীর মাল স্বামীর পক্ষে হিরয তথা সংরক্ষিত নয় ।

২. দাস-দাসী যদি নিজ মালিকের মাল চুরি করে, অথবা মালিকের স্ত্রীর মাল চুরি করে অথবা মালিকের স্বামীর মাল চুরি করে তাহলে দাস-দাসীর হাত কাটা হবে না । কারণ দাস-দাসী এসব লোকের ঘরে অবাধে যাতায়াত করে থাকে । বিধায় তাদের গৃহ দাস-দাসীর জন্য হিরয বা সংরক্ষিত নয় । তাই সেখান থেকে চুরি করার দায়ে হাত কাটা যাবে না । হাদীসে বর্ণিত আছে, একবার আবদুল্লাহ ইবনে উমাইর নামক জনৈক ব্যক্তি হযরত ওমর (রা.) এর নিকট এসে অভিযোগ করে বলল, আমার গোলাম চুরি করেছে । তাই তার হাত কেটে দিন । হযরত ওমর (রা) প্রশ্ন করলেন, সে কি চুরি করেছে? লোকটি উত্তর করল, আমার স্ত্রীর আয়না চুরি করেছে, যার মূল্য হলো ষাট দিরহাম । তখন হযরত ওমর (রা.) বললেন, তাকে ছেড়ে দাও, তার হাত কাটা হবে না । কেননা তোমার গোলাম তোমার মালই চুরি করেছে । এ ধরনের মত হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতেও বর্ণিত আছে । কোনো সাহাবীর মত এর বিপরীত পাওয়া যায়নি । অতএব, মাসআলাটির উপর ইজমা প্রতিষ্ঠিত হলো ।

৩. স্বামী কিংবা স্ত্রীর মাল যদি এমন কোনো বিশেষ ঘরে সংরক্ষিত থাকে, যেখানে স্বামী-স্ত্রী বাস করে না, অর্থাৎ আবাসস্থল ছাড়া অন্য কোথাও যদি স্বামী অথবা স্ত্রীর মালামাল সংরক্ষিত থাকে এবং যেখান থেকে অপরজন চুরি করে তাহলেও আমাদের মতে হাত কাটা হবে না ।

কারণ স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরে যাতায়াত, মেলামেশা অবাধ ও অকৃত্রিম । তাছাড়া স্ত্রী যখন নিজেকে স্বামীর জন্য ব্যয় করে দিয়েছে, তখন তার অন্যান্য সম্পদ তো উত্তম ব্যয় হয়ে গেছে । অপর দিকে স্বামীর মালের মাঝেও স্ত্রীর হক রয়েছে । এমন কি তারা একে অপরের ওয়ারিশ হয়ে রয়েছে । পিতা-পুত্রের মতো অনিবার্যরূপে । অতএব, তাদের একজনের সম্পদ অপরজনের সম্পদের মতোই । অতএব, চুরি করলে হাত কাটা হবেনা ।

তবে ইমাম শাফেয়ী (র) এ মাসআলায় মতবিরোধ করেছেন । এ ক্ষেত্রে ইমাম শাফেয়ী (র.) এর পক্ষ হতে তিন ধরনের মত বর্ণিত আছে । ১. হাত কাটা হবে । ২. হাতকাটা হবে না । ৩. স্বামীর সম্পদ হতে চুরি করলে হাত কাটা হবে না, স্বামীর উপর স্ত্রীর খোরপোষ ওয়াজিব হওয়ার কারণে । স্ত্রীর সম্পদ হতে স্বামী চুরি করলে হাত কাটা হবে । কেননা স্ত্রীর সম্পদে স্বামীর কোনো হক নেই ।

মুসান্নেফ (র.) বলেন, আহনাফ ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মধ্যকার হাতকাটা সম্পর্কিত মতভেদ টি, স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের সাক্ষ্য সম্পর্কিত মতভেদের অনুরূপ । কেননা যদি স্বামী-স্ত্রী একে অপরের পক্ষে সাক্ষ্য দেয় তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবে কিনা- এ নিয়ে আহনাফ ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মাঝে মতপার্থক্য হয়েছে । আহনাফ বলেন, স্বামীর পক্ষে স্ত্রীর সাক্ষ্য কিংবা স্ত্রীর পক্ষে স্বামীর সাক্ষ্য কোনোটিই গ্রহণযোগ্য নয়, তাদের পরস্পরে স্বার্থ জড়িত থাকার কারণে । পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর এক উক্তি অনুসারে তাদের একজনের সাক্ষ্য অপরজনের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হয় । অতএব, হাতকাটা সম্পর্কিত মতভেদ ও সাক্ষ্য গ্রহণ সম্পর্কিত মতভেদ সাদৃশ হলো ।

https://e-ilm.weebly.com/

وَلَوْ سَرَقَ الْمَوْلَى مِنْ مُكَاتَبِهِ لَمْ يُقْطَعْ لِاَنَّ لَهُ فِيْ اَكْسَابِهِ حَقًّا وَكَذٰلِكَ السَّارِقُ مِنَ الْمَغْنَمِ لِاَنَّ لَهُ فِيْهِ نَصِيْبًا، وَهُوَ مَاْثُوْرٌ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ دَرْءًا وَتَعْلِيْلًا . وَقَالَ وَالْحِرْزُ عَلٰى نَوْعَيْنِ حِرْزٌ لِمَعْنًى فِيْهِ كَالْبُيُوْتِ وَالدُّوْرِ . وَحِرْزٌ بِالْحَافِظِ قَالَ الْعَبْدُ الضَّعِيْفُ : الْحِرْزُ لَابُدَّ مِنْهُ لِاَنَّ الِاسْتِسْرَارَ لَا يَتَحَقَّقُ دُوْنَهُ، ثُمَّ هُوَ قَدْ يَكُوْنُ بِالْمَكَانِ وَهُوَ الْمَكَانُ الْمُعَدُّ لِاِحْرَازِ الْاَمْتِعَةِ كَالدُّوْرِ وَالْبُيُوْتِ وَالصُّنْدُوْقِ وَالْحَانُوْتِ، وَقَدْ يَكُوْنُ بِالْحَافِظِ كَمَنْ جَلَسَ فِي الطَّرِيْقِ اَوْ فِي الْمَسْجِدِ وَعِنْدَهُ مَتَاعُهُ فَهُوَ مُحَرَّزٌ بِهِ، وَقَدْ ﴿قَطَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَقَ رِدَاءَ صَفْوَانَ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ وَهُوَ نَائِمٌ فِي الْمَسْجِدِ﴾

অনুবাদ : আর মনিব যদি তার মুকাতাব গোলামের মাল চুরি করে তাহলে হাত কাটা হবে না। কেননা তার উপার্জনে মনিবের হক রয়েছে। গনিমতের মাল হতে চুরি করারও একই হুকুম। কেননা উক্ত মালে তার হিসসা রয়েছে। হদ্দ রহিতকরণ ও তার কারণ দুটিই হযরত আলী (র.) হতে বর্ণিত রয়েছে।

সংরক্ষণ দুই প্রকার । একটা হলো নিজস্ব গুণগত সংরক্ষণ। যেমন বাড়ি, ঘর ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত : হেফাজতকারী নির্ধারণের মাধ্যমে সংরক্ষণ। হেদায়া গ্রন্থকার বলেন, সংরক্ষণ বিদ্যমান থাকা অপরিহার্য। কেননা এছাড়া গোপনে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। আবার এই সংরক্ষণ স্থান দ্বারা হতে হবে। অর্থাৎ এমন স্থান, যা সামান পত্র সংরক্ষণের জন্য তৈরি করা হয়েছে। যেমন ঘর-বাড়ি বাক্স ও দোকান ইত্যাদি।

আর কখনো হেফাজতকারী দ্বারা হতে পারে। যেমন কেউ সামান পাশে রেখে রাস্তায় কিংবা মসজিদে বসে রয়েছে। তখন ঐ সামান তার দ্বারা সংরক্ষিত হবে। আর মসজিদে ঘুমন্ত অবস্থায় হযরত সাফওয়ান (রা.)-এর মাথার নীচে থেকে যে ব্যক্তি চাদর চুরি করেছিল রাসূল ﷺ তার হস্ত কর্তন করেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিউক্ত ইবারতে দুটি মাসআলা আলোচিত হয়েছে।

১. কোনো মনিব যদি নিজ মুকাতাব গোলামের সম্পদ চুরি করে, তাহলে মনিবের হাত কাটা হবে না। কেননা মুকাতাব গোলাম, বদলে কিতাবত সম্পূর্ণ আদায় করা পর্যন্ত মনিবের গোলামই থেকে যায়। আর গোলাম ও গোলামের সম্পদ সবই মনিবের হক। অতএব, মনিব যদি গোলামের সম্পদ নিয়ে যায়, তাহলে সেটা চুরিই হয় না, বরং নিজের সম্পদই নেওয়া হয়। অতএব, হাতকাটার কোনো যৌক্তিকতা নেই।

২. গনিমতের মালে যার হিসসা আছে, এরূপ ব্যক্তি যদি গনিমতের মাল চুরি করে তাহলে হাত কাটা যাবে না। কেননা এ মালে তার হিসসা থাকার কারণে মালিকানার সন্দেহর সৃষ্টি রয়েছে। আর সন্দেহ মাত্রই হদ্দ রোধ করে।

গনিমতের মাল চুরি করলে হাত না কাটার সিদ্ধান্ত ও তার কারণ উভয়ই হযরত আলী (র.) হতে বর্ণিত আছে। মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাকে বর্ণনাটি এভাবে এসেছে-

عن ابن عُبَيْد ابن الْاَبْرص وهو زيد بن دثار قال اُتِىَ علىٌّ برجلٍ سرق من الْمُغْنَم فقال له فيه نصيبٌ وهو خائنٌ فلم يقطعه وكان قد سرق مغفرًا ـ

https://e-ilm.weebly.com/

যায়দ ইবনে দিছার বলেন, হযরত আলী (রা.)-এর নিকট একটি লোক হাজির করা হলো, যে গনিমতের মালে চুরি করেছে। হযরত আলী (রা.) বললেন, এ মালে তারও অংশ রয়েছে। অতএব, সে খেয়ানতকারী। তাই তিনি তার হাত কাটেননি। সে একটি শিরস্ত্রাণ চুরি করেছিল। হাদীস দারাকুতনীও বর্ণনা করেছেন। এ বিষয়ে আরেকটি মারফূ' হাদীস ইবনে মাজাহ শরীফে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে–

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) اَنَّ عَبْدًا مِنْ رَقِيْقِ الْخُمُسِ سَرَقَ مِنَ الْخُمُسِ فَرُفِعَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَقْطَعْهُ وَقَالَ مَالُ اللّٰهِ سَرَقَ بَعْضُهُ بَعْضًا ـ

অর্থাৎ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার গনিমতের পঞ্চমাংশের আওতাভুক্ত একটি গোলাম গনিমতের পঞ্চমাংশের কিছু মাল চুরি করল। বিষয়টি নবী করীম ﷺ কে জানানো হলো। কিন্তু তিনি তার হাত কাটলেন না। তিনি বললেন, আল্লাহর সম্পদের একাংশে অপরাংশ চুরি করেছে।

قَوْلُهُ : وَالْحِرْزُ عَلَى نَوْعَيْنِ حِرْزٌ لِمَعْنًى الخ : সকল ইমাম এ ব্যাপারে একমত যে, হাতকাটা ওয়াজিব হওয়ার জন্য হিরয বা সংরক্ষণ শর্ত। হেদায়া গ্রন্থকার এর ইল্লত বর্ণনা করে বলেন, কেননা হিরয বা সংরক্ষণ ব্যতীত গোপনে নিয়ে যাওয়া সাব্যস্ত হয় না। আর গোপনে নিয়ে যাওয়া সাব্যস্ত না হলে একে চুরি বলা যাবে না। হাতও কাটা হবে না।

হিরয বা সরক্ষণ দু প্রকার। ১. স্থান দ্বারা সংরক্ষণ। ২. সংরক্ষণকারী দ্বারা সংরক্ষণ।

স্থান দ্বারা সংরক্ষণের অর্থ হলো, মালামাল এমন স্থানে সংরক্ষিত হওয়া, যে স্থানকে বানানোই হয়েছে মালামাল সংরক্ষণের জন্য। যেমন, ঘর বাড়ি, দোকান, গোডাউন, বাক্স ইত্যাদি। সকল সম্পদের হিরয বা সংরক্ষণ স্থল এক ধরনের হওয়া জরুরি নয়। বরং সম্পদের মান অনুযায়ী একেক সম্পদের হিরয একেক রকম হয়। যেমন খাদ্যদ্রব্য, কাপড় বস্ত্র ও গৃহস্থালী সামান পত্রের হিরয হলো ঘর বাড়ি। ব্যবসার মালামালের হিরয হলো দোকান বা গোডাউন। গরু-ছাগলের হিরয হলো গোয়াল। ফসলের হিরয হলো গোলা। এসবই প্রথম প্রকারের হিরয। যদি এমন স্থান হতে সম্পদ নিয়ে যাওয়া হয় তাহলে তা চুরি বলে গণ্য হবে এবং হাত কাটা হবে।

সংরক্ষণকারী দ্বারা হিরয-এর অর্থ হলো, কোনো ব্যক্তি দ্বারা মালামাল হেফাজতকারী। যেমন কোনো ব্যক্তি মসজিদে বসে আছে, কিংবা রাস্তার পাশে বসে আছে নিজের মালগুলো পাশে রেখে এমতাবস্থায় তার এ মালগুলো সংরক্ষিত মাল বলে গণ্য হবে। চুরি করলে হাত কাটা হবে।

দ্বিতীয় প্রকার সংরক্ষণের পক্ষে গ্রন্থকার একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন–

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ صَفْوَانَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ طَافَ بِالْبَيْتِ فَصَلَّى ثُمَّ لَفَّ رِدَائَهُ مِنْ بُرْدٍ فَوَضَعَهُ تَحْتَ رَأْسِهِ فَنَامَ فَأَتَاهُ لُصٌّ فَاسَلَّهُ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ فَأَخَذَهُ فَاَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنَّ هٰذَا سَرَقَ رِدَائِيْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسَرَقْتَ رِدَاءَ هٰذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ اِذْهَبَا بِهِ فَاقْطَعَا يَدَهُ فَقَالَ صَفْوَانُ مَاكُنْتُ اُرِيْدُ اَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ فِيْ رِدَائِيْ فَلَوْلَا كَانَ قَبْلَ اَنْ تَأْتِيَنِيْ بِهِ ـ رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ ـ

আব্দুল্লাহ ইবনে সাফওয়ান নিজ পিতা সাফওয়ান হতে বর্ণনা করেন। তিনি বাইতুল্লাহর তওয়াফ করে নামাজ আদায় করেন। অতঃপর চাদরটি ভাজ করে মাথার নীচে রেখে ঘুমিয়ে পড়েন। এমতাবস্থায় একটি চোর এসে চাদরটি সরিয়ে ফেলে। সাফওয়ান (রা.) তাকে ধরে ফেললেন এবং তাকে নিয়ে নবী করীম ﷺ -এর দরবারে হাজির হলেন। বললেন, এ লোক আমার চাদর চুরি করেছে। নবী করীম ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি তার চাদর চুরি করেছে? সে বলল, হ্যাঁ। তখন নবী করীম ﷺ দুজন লোক কে লক্ষ্য করে বলেন, তোমরা তাকে নিয়ে যাও এবং তার হাত কেটে দাও। সাফওয়ান (রা.) বললেন, আমার চাদরের কারণে তার হাত কাটা যাবে এমনটি আমি চাইনি। হুজুর ﷺ বললেন, আমার কাছে নিয়ে আসার পূর্বে এমন হলো না কেন? –(আবূ দাউদ, নাসায়ী)।

এহাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূল ﷺ ব্যক্তির মাধ্যমে সংরক্ষণ কে মূল্যায়ন করেছেন।

মোটকথা চোরের হাত কর্তনের জন্য শর্ত হলো সংরক্ষিত মাল চুরি করা। আর মাল সংরক্ষিত হতে পারে দুই ভাবে। **এক.** স্থানের মাধ্যমে। **দুই.** ব্যক্তির মাধ্যমে, এ দুই পদ্ধতির যে কোনো পদ্ধতিতে সংরক্ষিত সম্পদ চুরি করলে চোরের হাত কাটা হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَفِي الْمُحرَزِ بِالْمَكَانِ لَا يُعْتَبَرُ الْإِحْرَازُ بِالْحَافِظِ هُوَ الصَّحِيْحُ لِاَنَّهُ مُحَرَّزٌ بِدُوْنِهِ وَهُوَ الْبَيْتُ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَابٌ اَوْ كَانَ وَهُوَ مَفْتُوْحٌ حَتّٰى يُقْطَعَ السَّارِقُ مِنْهُ، لِاَنَّ الْبِنَاءَ لِقَصْدِ الْاِحْرَازِ اِلَّا اَنَّهُ لَا يَجِبُ الْقَطْعُ اِلَّا بِالْاِخْرَاجِ مِنْهُ لِقِيَامِ يَدِهِ فِيْهِ قَبْلَهُ . بِخِلَافِ الْمُحَرَّزِ بِالْحَافِظِ حَيْثُ يَجِبُ الْقَطْعُ فِيْهِ، كَمَا اُخِذَ لِزَوَالِ يَدِ الْمَالِكِ بِمُجَرَّدِ الْاَخْذِ فَتَتِمُّ السَّرِقَةُ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ اَنْ يَكُوْنَ الْحَافِظُ مُسْتَيْقِظًا اَوْ نَائِمًا وَالْمَتَاعُ تَحْتَهُ اَوْ عِنْدَهُ هُوَ الصَّحِيْحُ لِاَنَّهُ لَمْ يُعَدُّ النَّائِمُ عِنْدَ مَتَاعِهِ حَافِظًا لَهُ فِي الْعَادَةِ .وَعَلٰى هٰذَا لَا يَضْمَنُ الْمُوْدَعُ وَالْمُسْتَعِيْرُ بِمِثْلِهِ لِاَنَّهُ لَيْسَ بِتَضْيِيْعٍ، بِخِلَافِ مَا اخْتَارَهُ فِي الْفَتَاوٰى .

অনুবাদ : স্থান দ্বারা সংরক্ষিত সম্পদের ক্ষেত্রে হেফাজতকারীর মাধ্যমে সংরক্ষণের বিষয়টি বিবেচ্য নয়। এটাই বিশুদ্ধ অভিমত। কেননা হেফাজতকারী ছাড়াই তা গৃহের মধ্যে সংরক্ষিত রয়েছে। যদিও যে গৃহের দরজা না থাকে বা দরজা থাকে কিন্তু খোলা থাকে। সুতরাং ঐ ঘর হতে চুরি করলে তার হাত কাটা হবে। কেননা গৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্যই হচ্ছে সংরক্ষণ করা। তবে ঐ ঘর হতে মাল বের করা ছাড়া হস্তকর্তন হবে না। কেননা বের করার পূর্ব পর্যন্ত মালের মধ্যে মালিকের নিয়ন্ত্রণ বিদ্যমান রয়েছে।

পক্ষান্তরে হেফাজতকারীর মাধ্যমে সংরক্ষিত জিনিসটির বিষয় ভিন্ন। সেখানে মাল হস্তগত করার মাত্র কর্তন সাব্যস্ত হবে। কেননা শুধু হস্তগত করা দ্বারাই মালিকের নিয়ন্ত্রণ বিলুপ্ত হয়ে যায়। সুতরাং চুরি সম্পন্ন হয়ে যায়।

হেফাজতকারী জাগ্রত হওয়া বা ঘুমন্ত হওয়া, তদ্রূপ সামান তার নীচে হওয়া কিংবা কাছে হওয়ার মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। আর এটাই বিশুদ্ধ অভিমত। কেননা সামানের নিকটে ঘুমিয়ে থাকা ব্যক্তিকে লোক প্রচলন অনুযায়ী সামানের হেফাজতকারী গণ্য করা হয়। একারণেই এধরনের অবস্থায় আমানত গ্রহীতা ও ধারে গ্রহীতার উপরে ক্ষতিপূরণ আসেনা। কেননা এটা (ইচ্ছাকৃত) মাল নষ্ট করা নয়। অবশ্য ফাতাওয়ায় গৃহীত মত এর বিপরীত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

স্থানের মাধ্যমে যে সম্পদ সংরক্ষিত হয় তা হেফাজতকারী দ্বারাও সংরক্ষিত হতে হবে এটা জরুরি নয়। কেননা স্থানের মাধ্যমে যে হেফাজত হয়ে থাকে সেটা শক্তিশালী। কারণ সেক্ষেত্রে মাল লুকানো থাকে। ব্যক্তির মাধ্যমে হেফাজত হলে মাল লুকানো থাকে। অতএব, প্রথম স্তরের সংরক্ষণ পাওয়া গেলে দ্বিতীয় স্তরের সংরক্ষণের প্রয়োজন নেই। অতএব, ঘর হতে চুরি করলে হাত কাটা সাব্যস্ত হবে। যদিও ঘরের দরজা না থাকে, কিংবা খোলা থাকে। যেহেতু ঘর বানানোই হয় সংরক্ষণের জন্য সেহেতু শুধু ঘরটাই সংরক্ষণ স্থল হিসাবে যথেষ্ট। তবে ঘর থেকে চুরি করার ক্ষেত্রে হাতকাটা বাব্যস্ত হয় ঘর হতে মাল বের করার পরে। বের করার পূর্ব পর্যন্ত হাত কাটা সাব্যস্ত হবে না। কেননা ঘর হতে মাল বের করার পূর্ব পর্যন্ত হিরয নষ্ট করা হয় নি। বরং তখনো পর্যন্ত মাল মালিকের নিয়ন্ত্রণেই থেকে যায়। ঘর হতে বের করে ফেললে হিরয নষ্ট করার হয়, মালিকের নিয়ন্ত্রণ বিলুপ্ত হয়। তাই তখনি হাত কাটা সাব্যস্ত হবে। পক্ষান্তরে ব্যক্তির মাধ্যমে সংরক্ষিত সম্পদ চোর হস্তগত করার সাথে সাথে মালিকের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যায়, হিরয বাতিল হয়ে পড়ে। তাই সে ক্ষেত্রে মাল চোরের হস্তে হলেই হাতকাটা সাব্যস্ত হয়ে যাবে।

সংরক্ষণকারী ব্যক্তি জাগ্রত হলে যেমন সংরক্ষণকারী বলে গণ্য তেমনি ঘুমন্ত হলে সংরক্ষণকারী বলে গণ্য হবে। কারণ মালামাল কাছে রেখে ঘুমিয়ে থাকলে লোক সমাজ তাকে হেফাজতকারী বলেই মনে করা হয়। অতএব, কোনো আমানতদার ব্যক্তি যদি আমানতকারীর সম্পদ কাছে রেখে ঘুমিয়ে যায় এবং যে সম্পদ চোরে নিয়ে যায় তাহলে এর ক্ষতিপূরণ দেওয়া আমানতদার ব্যক্তির উপর আবশ্যক নয়। কেননা মালের কাছে ঘুমিয়ে থাকা ইচ্ছাকৃত মাল নষ্ট করা করেনি। তবে ফাতাওয়ায় এর বিপরীত মত গ্রহণ করা হয়েছে। কেননা সেখানে শুয়ে ঘুমানোর সুরতে ক্ষতিপূরণ দেওয়া আবশ্যকে করা হয়েছে

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ وَمَنْ سَرَقَ شَيْئًا مِنْ حِرْزٍ اَوْ مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ وَصَاحِبُهُ عِنْدَهُ يَحْفَظُهُ قُطِعَ لِاَنَّهُ سَرَقَ مَالًا مُحَرَّزًا بِاَحَدِ الْحِرْزَيْنِ وَلَا قَطْعَ عَلَى مَنْ سَرَقَ مَالًا مِنْ حَمَّامٍ اَوْ مِنْ بَيْتٍ اُذِنَ لِلنَّاسِ فِي دُخُوْلِهِ لِوُجُودِ الْاِذْنِ عَادَةً اَوْ حَقِيْقَةً فِي الدُّخُولِ فَاخْتَلَّ الْحِرْزُ وَيَدْخُلُ فِيْ ذٰلِكَ حَوَانِيْتُ التُّجَّارِ وَالْخَانَاتُ، اِلَّا اِذَا سَرَقَ مِنْهَا لَيْلًا لِاَنَّهَا بُنِيَتْ لِاِحْرَازِ الْاَمْوَالِ، وَاِنَّمَا الْاِذْنُ يَخْتَصُّ بِالنَّهَارِ وَمَنْ سَرَقَ مِنَ الْمَسْجِدِ مَتَاعًا وَصَاحِبُهُ عِنْدَهُ قُطِعَ لِاَنَّهُ مُحَرَّزٌ بِالْحَافِظِ لِاَنَّ الْمَسْجِدَ مَا بُنِيَ لِاِحْرَازِ الْاَمْوَالِ فَلَمْ يَكُنِ الْمَالُ مُحَرَّزًا بِالْمَكَانِ، بِخِلَافِ الْحَمَّامِ وَالْبَيْتِ الَّذِي اُذِنَ لِلنَّاسِ فِي دُخُوْلِهِ حَيْثُ لَا يُقْطَعُ لِاَنَّهُ بُنِيَ لِلْاِحْرَازِ فَكَانَ الْمَكَانُ حِرْزًا فَلَا يُعْتَبَرُ الْاِحْرَازُ بِالْحَافِظِ -

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কেউ যদি সংরক্ষিত স্থান থেকে অথবা অরক্ষিত স্থান থেকে এমন অবস্থায় চুরি করে যে, মালিক সামানের কাছে থেকে তা হেফাজত করছে তাহলে কর্তন করা হবে। কেননা সে দুই সংরক্ষণের একটি দ্বারা সংরক্ষিত মাল চুরি করেছে।

যে ব্যক্তি হাম্মাম খানা থেকে, কিংবা মানুষের প্রবেশানুমতি রয়েছে এমন ঘর হতে মাল চুরি করে, তার হস্তকর্তন করা হবে না। কেননা প্রবেশের ব্যাপারে রীতিগত কিংবা প্রকৃত অনুমতি রয়েছে। ফলে সংরক্ষণে ত্রুটি হয়েছে।

ব্যবসায়ের দোকানঘর সমূহ এবং সরাইখানা সমূহ প্রবেশানুমতিপূর্ণ ঘরের অন্তর্ভুক্ত। তবে সেখান থেকে রাতের বেলায় চুরি করলে হস্ত কর্তন করা হবে। কোননা এগুলো আসবাব পত্র সংরক্ষণের জন্যই তৈরি করা হয়েছে। অনুমতি কেবল দিনের বেলার সাথে সীমাবদ্ধ।

কেউ যদি মসজিদ থেকে এমন মাল চুরি করে যার কাছে তার মালিক উপস্থিত আছে তাহলে তার হস্ত কর্তন করা হবে। কেননা যদিও মসজিদ মালামাল হেফাজতের জন্য তৈরি করা হয় নি। এদিক থেকে মাল স্থানের দ্বারা সংরক্ষিত নয়। কিন্তু হেফাজতকারীর উপস্থিতি দ্বারা তা সংরক্ষিত।

হাম্মামও প্রবেশানুমতি পূর্ণ অন্যান্য ঘরের বিষয়টি ভিন্ন। যেখানে কর্তন করা হবে না। কেননা এগুলো যেহেতু আসবাব হেফাজতের জন্য তৈরি, সেহেতু এগুলো সংরক্ষিত স্থান। সে কারণে হেফাজতকারীর উপস্থিতি দ্বারা সংরক্ষণের বিষয়টি বিবেচ্য হবে না। (তবে প্রবেশানুমতির কারণে কর্তন করা হবে না)।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আলোচ্য মাসআলাটি পূর্বের মাসআলা হতে উৎপন্ন। পূর্বে বলা হয়েছিল হিরয বা সংরক্ষণ দুই প্রকার। এক. স্থান দ্বারা সংরক্ষণ। দুই. হেফাজতকারী দ্বারা সংরক্ষণ। যে কোনো প্রকার হিরয হতে চুরি করলেই হাত কাটা হবে; সে হিসাবেই এখানে বলা হলো, কোনো মাল যদি মালিকের সাথে থাকে এবং যেখান থেকে চোর তা চুরি করে নেয় তাহলে হাত কাটা হবে। কেননা মালিকের সাথে থাকার দ্বারা তা দ্বিতীয় প্রকারের সংরক্ষিত সম্পদ। বিধায় তা চুরি করার কারণে হাত কাটা হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

قَوْلُهُ : وَلَا قَطْعَ عَلَى مَنْ سَرَقَ مَالًا الخ : যে সকল স্থানে রীতিগতভাবে কিংবা প্রকৃতরূপে মানুষজনের প্রবেশ করার অনুমতি থাকে যেসব স্থানে হিরয অসম্পূর্ণ। বিধায় সেখান থেকে চুরি করলে চোরের হাত কাটা যাবে না। যেমন– হাম্মাম খানা, সরাইখানা ও দোকানপাট। এসব স্থানে যে কারো জন্য প্রবেশের অনুমতি থাকে। তাই এগুলো পূর্ণাঙ্গ হিরয বলে গণ্য নয়। হ্যাঁ, তবে যদি এসব স্থান হতে রাতের বেলায় চুরি করে তাহলে আবার হাত কাটা হবে। কারণ রাতের বেলায় এগুলো পূর্ণাঙ্গ হিরয। কেননা মানুষজনের প্রবেশানুমতি শুধু দিনের বেলার সাথে সীমাবদ্ধ। রাতে সেখানে প্রবেশের ব্যাপক অনুমতি থাকে না। মোটকথা, উপরিউক্ত স্থানগুলো কখনো পূর্ণ হিরয, কখনো পূর্ণ হিরয নয়, যখন সেগুলো পূর্ণ হিরয তখন সেখান থেকে চুরি করলে হাত কাটা হবে। যখন পূর্ণ হিরয নয় তখন চুরি করলে হাত কাটা হবে না।

قَوْلُهُ : وَمَنْ سَرَقَ مِنَ الْمَسْجِدِ مَتَاعًا الخ : মসজিদ হতে মাল চুরি করলে চোরের হাত কাটা যায় না। কারণ মসজিদ যেহেতু মাল সংরক্ষণের জন্য বানানো হয়নি। তাই মসজিদ হিরয নয়। অতএব, মসজিদে রাখা মালামাল স্থানের দ্বারা সংরক্ষিত নয়। কিন্তু মালের মালিক পাশে থাকার কারণে তা হেফাজতকারী দ্বারা সংরক্ষিত। এ কারণে তা চুরির দায়ে হাত কাটা হবে। পক্ষান্তরে হাম্মামখানা ইত্যাদিতে মালিকের পাশে থাকাতে কোনো ফায়দা নেই। কারণ সেগুলো স্থানগতভাবেই হিরয। সেখানে রক্ষিত মালামাল স্থানের দ্বারাই রক্ষিত বলে গণ্য হয়, হেফাজতকারীর উপস্থিতির কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। কিন্তু সেখানে থেকেও চুরি করলে হাত কাটা হয় না। এর কারণ হলো সকলের জন্য সেখানে প্রবেশ করবে অনুমতি থাকা।

https://e-ilm.weebly.com/

وَلَا قَطْعَ عَلَى الضَّيْفِ إِذَا سَرَقَ مِمَّنْ أَضَافَهُ لِأَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يَبْقَ حِرْزًا فِيْ حَقِّهِ لِكَوْنِهِ مَأْذُونًا فِيْ دُخُولِهِ، وَلِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ أَهْلِ الدَّارِ فَيَكُوْنُ فِعْلُهُ خِيَانَةً لَا سَرِقَةً . وَمَنْ سَرَقَ سَرِقَةً فَلَمْ يُخْرِجْهَا مِنَ الدَّارِ لَمْ يُقْطَعْ لِأَنَّ الدَّارَ كُلَّهَا حِرْزٌ وَاحِدٌ فَلَا بُدَّ مِنَ الْإِخْرَاجِ مِنْهَا، وَلِأَنَّ الدَّارَ وَمَا فِيْهَا فِيْ يَدِ صَاحِبِهَا مَعْنًى فَتَتَمَكَّنُ شُبْهَةُ عَدَمِ الْأَخْذِ فَإِنْ كَانَتْ دَارٌ فِيْهَا مَقَاصِيْرُ فَأَخْرَجَهَا مِنَ الْمَقْصُوْرَةِ إِلَى صَحْنِ الدَّارِ قُطِعَ لِأَنَّ كُلَّ مَقْصُوْرَةٍ بِاعْتِبَارِ سَاكِنِهَا حِرْزٌ عَلَى حِدَةٍ وَإِنْ أَغَارَ إِنْسَانٌ مِنْ أَهْلِ الْمَقَاصِيْرِ عَلَى مَقْصُوْرَةٍ فَسَرَقَ مِنْهَا قُطِعَ لِمَا بَيَّنَّا .

অনুবাদ : মেহমান যদি মেজবানের কোনো মাল চুরি করে তাহলে তার হস্ত কর্তন করা হবে না। কেননা তার যেহেতু প্রবেশানুমতি রয়েছে, সেহেতু তার পক্ষে ঘরটি সংরক্ষিত থাকেনি। তাছাড়া যেহেতু সে সাময়িকভাবে ঘরের একজনের মতো হয়ে গেছে সেহেতু তার কার্যটি খেয়ানত বলে গণ্য হবে, চুরি নয়।

কেউ যদি কোনো কিছু চুরি করে এবং বাড়ি থেকে বের না করে, তাহলে তার হাত কাটা হবে না। কেননা পুরো বাড়ি হচ্ছে অভিন্ন সংরক্ষিত স্থান। সুতরাং (চুরি সাব্যস্ত হওয়ার জন্য) বাড়ি থেকে বের করে আনা অপরিহার্য।

তাছাড়া বাড়ি এবং বাড়িতে বিদ্যমান সবকিছুই গুণগতভাবে বাড়ির মালিকের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। সুতরাং না নেওয়ার সন্দেহ সাব্যস্ত হবে। **আর যদি একটি বাড়িতে বিভিন্ন প্রকোষ্ঠ থাকে, আর চোর একটি প্রকোষ্ঠ হতে মালামাল চুরি করে আঙ্গিনায় নিয়ে আসে, তাহলে হাত কাটা হবে।** কেননা প্রতিটি প্রকোষ্ঠ তার অধিবাসীদের বিচারে স্বতন্ত্র সংরক্ষিত স্থান রূপে গণ্য।

আর যদি বাড়ির প্রকোষ্ঠগুলোর কোনো একজন বাসিন্দা অন্য প্রকোষ্ঠে হানা দিয়ে, তা থেকে মালামাল চুরি করে, তাহলে তার হাত কাটা হবে। এর কারণ আমরা বর্ণনা করেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

হাত কাটার জন্য শর্ত হলো হিরয তথা সংরক্ষিত স্থান হতে চুরি করা। মেজবানের গৃহে প্রবেশের অনুমতি মেহমানের জন্য অবশ্যই থাকে। সে হিসাবে ঘরটি মেহমানের জন্য হিরয নয়। অতএব, এখান থেকে চুরি করার দায়ে হাত কাটা যাবে না। আরো একটি কারণ হলো, মেহমান সাময়িক ভাবে বাড়ির লোক হয়ে যায়। সেদিকে লক্ষ্য করলে এটাকে চুরিই বলা যায় না। খেয়ানত বলা যায়। আর খেয়ানতের দায়ে হাত কাটা হয় না।

قوله : وَمَنْ سَرَقَ سَرِقَةً فَلَمْ يُخْرِجْهَا الخ : উপরিউক্ত ইবারতে দুটি মাসআলা আলোচিত হয়েছে।

১. চোর যদি কোনো বাড়ি থেকে কিছু চুরি করে বাড়ির বাইরে আনার আগেই ধরা পড়ে যায়, তাহলে তার হাত কাটা হবে না। কারণ পূর্ণ বাড়িটা একটা হিরয বা সংরক্ষিত স্থান। আর হাত কাটার জন্য শর্ত হলো হিরয নষ্ট করা। বাড়ি হতে

মালামাল বের করে রাস্তায় আনার পূর্ব পর্যন্ত এ শর্ত পাওয়া যায় না। বিধায় হাত কাটা যাবে না। যখন মালামাল বাড়ি থেকে বের করে রাস্তায় বা মাঠে নিয়ে আসল, তখন সে হিরয লঙ্ঘন করল। তখন তার হাত কাটা হবে।

হাত না কাটার আরেক কারণ হলো, বাড়ি ও বাড়ির ভিতরে বিদ্যমান সবকিছু বাড়ির মালিকের নিয়ন্ত্রণে মনে করা হয়। সে হিসেবে চোর যতক্ষণ পর্যন্ত মালামাল বাড়ির বাইরে নেয় নি, ততক্ষণ পর্যন্ত তা মালিকের নিয়ন্ত্রণেই আছে বলে গণ্য হয়। এবং চোর কর্তৃক না নেওয়ার সন্দেহ বিদ্যমান থাকে। আর সন্দেহ মাত্রই হদ্দ রোধ করে দেয়। তাই এমতাবস্থায় চোরের হাত কাটা হবে না।

২. কোনো বাড়িতে যদি একাধিক প্রকোষ্ঠ বা একাধিক প্লট থাকে এবং প্রত্যেক প্রকোষ্ঠের অধিবাসী ভিন্ন ভিন্ন হয়, তাহলে প্রতিটি প্রকোষ্ঠ একটি বাড়ির পর্যায়ে বলে গণ্য করা হবে। অতএব, যদি চোর কোনো প্রকোষ্ঠ হতে মাল চুরি করে আঙ্গিনায় নিয়ে আসে তাহলেই হাত কাটা হবে। কারণ যদিও প্রকৃত পক্ষে মালামাল বাড়ির বাইরে নেওয়া হয় নি, তথাপি এক্ষেত্রে আঙ্গিনাই বাড়ির বাইর বলে গণ্য। কেননা আলোচ্য সুরতে প্রকোষ্ঠ কে বাড়ি হিসাবে ধরে নেওয়া হয়েছে। আর বাস্তবতাও এটাই। কেননা একটি বাড়ির একাধিক প্লটে যখন একাধিক পরিবার বাস করে তখন প্রত্যেক পরিবার নিজ নিজ প্লট কে পৃথক পৃথক বাড়িই মনে করে। এমনকি প্রত্যেক পরিবারের মালপত্র, নিজ নিজ প্লটেই সংরক্ষিত থাকে। অতএব, এক্ষেত্রে প্রকোষ্ঠ হতে বের করে আঙ্গিনায় নিলেই বাড়ির বাইরে নিয়ে যাওয়া বলে বিবেচনা করা হবে এবং হাত কেটে দেওয়া হবে। যদি এক প্রকোষ্ঠের অধিবাসী অন্য প্রকোষ্ঠ হতে চুরি করে, তাহলেও একই কারণে একই হুকুম। অর্থাৎ আঙ্গিনায় নিয়ে আসাটা বাড়ির বাহিরে নিয়ে যাওয়ার পর্যায়ে বিধায় হাত কাটা হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَإِذَا نَقَبَ اللِّصُّ الْبَيْتَ فَدَخَلَ وَأَخَذَ الْمَالَ وَنَاوَلَهُ آخَرَ خَارِجَ الْبَيْتِ فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِمَا لِأَنَّ الْأَوَّلَ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ الْإِخْرَاجُ لِاعْتِرَاضِ يَدٍ مُعْتَبَرَةٍ عَلَى الْمَالِ قَبْلَ خُرُوْجِهِ . وَالثَّانِي لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ هَتْكُ الْحِرْزِ فَلَمْ تَتِمَّ السَّرِقَةُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ . وَعَنْ أَبِي يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ : إِنْ أَخْرَجَ الدَّاخِلُ يَدَهُ وَنَاوَلَهَا الْخَارِجَ فَالْقَطْعُ عَلَى الدَّاخِلِ، وَإِنْ أَدْخَلَ الْخَارِجُ يَدَهُ فَتَنَاوَلَهَا مِنْ يَدِ الدَّاخِلِ فَعَلَيْهِمَا الْقَطْعُ .وَهِيَ بِنَاءٌ عَلَى مَسْأَلَةٍ تَأْتِي بَعْدَ هٰذَا إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى . وَإِنْ أَلْقَاهُ فِي الطَّرِيْقِ وَخَرَجَ فَأَخَذَهُ قُطِعَ وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللّٰهُ : لَا يُقْطَعُ لِأَنَّ الْإِلْقَاءَ غَيْرُ مُوْجِبٍ لِلْقَطْعِ كَمَا لَوْ خَرَجَ وَلَمْ يَأْخُذْ، وَكَذَا الْأَخْذُ مِنَ السِّكَّةِ كَمَا لَوْ أَخَذَهُ غَيْرُهُ .وَلَنَا أَنَّ الرَّمْيَ حِيْلَةٌ يَعْتَادُهَا السُّرَّاقُ لِتَعَذُّرِ الْخُرُوْجِ مَعَ الْمَتَاعِ، أَوْ لِيَتَفَرَّغَ لِقِتَالِ صَاحِبِ الدَّارِ أَوْ لِلْفِرَارِ وَلَمْ تَعْتَرِضْ عَلَيْهِ يَدٌ مُعْتَبَرَةٌ فَاعْتُبِرَ الْكُلُّ فِعْلًا وَاحِدًا، فَإِذَا خَرَجَ وَلَمْ يَأْخُذْهُ فَهُوَ مُضَيِّعٌ لَا سَارِقٌ .

অনুবাদ : **চোর যদি বাড়িতে সিঁধ কেটে ভিতরে প্রবেশ পূর্বক মালামাল হস্তগত করে, অতঃপর বাইরে অপেক্ষমান অন্য একজন কে তা ধরিয়ে দেয়, তাহলে দুজনের কারো হস্ত কর্তন করা হবে না।** কেননা প্রথমজনের পক্ষ হতে মাল বের করা পাওয়া যায় নি। কারণ ঘর থেকে তার বের হওয়ার পূর্বে মালামালের উপর আরেকটি বিবেচ্য হাতের নিয়ন্ত্রণ বিদ্যমান হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় জনের পক্ষ থেকে সংরক্ষণ ভঙ্গ করার অপরাধ পাওয়া যায় নি। সুতরাং দুজনের কারো ক্ষেত্রেই চুরি কর্ম পূর্ণতা লাভ করে নি।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) হতে বর্ণিত রয়েছে যে, প্রবেশকারী ব্যক্তি যদি তার হাত বের করে বাইরে অপেক্ষমান ব্যক্তিকে মালামাল হস্তান্তর করে তাহলে প্রবেশকারীর হস্ত কর্তন হবে। আর যদি বাইরে অপেক্ষমান ব্যক্তিটি হাত ঢুকিয়ে প্রবেশকারীর হাত থেকে মালামাল গ্রহণ করে তাহলে উভয়ের হস্ত কর্তন হবে।

এর ভিত্তি হচ্ছে সেই মাসআলাটি যা পরবর্তীতে আসছে ইনশাআল্লাহ। **আর যদি সে ভিতর থেকে মালামাল রাস্তায় ফেলে দেয় অতঃপর বের হয়ে তা নিয়ে নেয় তাহলে তার হস্ত কর্তন করা হবে।** ইমাম যুফার (র.) বলেন, কর্তন করা হবে না।

কেননা বাইরে নিক্ষেপ হস্তকর্তন সাব্যস্তকারী অপরাধ নয়। যেমন বাইরে এসে মালামাল না ধরলে। তদ্রূপ রাস্তা থেকে মালামাল তুলে নেওয়া কর্তন সাব্যস্তকারী অপরাধ নয়। যেমন অন্য কেউ তা তুলে নিলে। আমাদের দলিল এই যে, বাইরে নিক্ষেপ করা চোরদের একটি অভ্যস্ত কৌশল। কেননা মালামাল সহ বের হয়ে আসা কঠিন। কিংবা তাতে বাড়ির মালিকের সাথে মোকাবিলা করা বা পলায়ন করা সহজ হয় আর মাঝখানে অন্য হাতের নিয়ন্ত্রণ সাব্যস্ত হয় নি। সুতরাং সমগ্র কর্মকে অভিন্ন কর্ম সাব্যস্ত করা হবে। পক্ষান্তরে যদি বের হয়ে মাল না নেয় তাহলে সে চোর হলো না, বরং মাল নষ্টকারী হলো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিউক্ত মতনে চুরি কর্মের দুটি প্রক্রিয়া ও তার হুকুম আলোচিত হয়েছে।

প্রথম প্রক্রিয়া : একজন সিঁধ কেটে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করল এবং মালামাল সংগ্রহ করে ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা আরেক জনের হাতে তুলে দিল।

https://e-ilm.weebly.com/

এ প্রক্রিয়ায় চুরি করলে তার কি হুকুম– এ নিয়ে তিন রকম মতামত পাওয়া যায়।

১. আহনাফের মতে ঘরের ভিতরে প্রবেশকারী ও বাইরে অবস্থানকারী দুজনের কারো হাত কাটা হবে না।

২. ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) হতে বর্ণিত আছে, ভিতরে প্রবেশকারীটি নিজের হাতে ঘর থেকে বের করে বাইরে অবস্থানকারীর হাতে মালামাল তুলে দেয়, তাহলে ভিতরে প্রবেশকারীর হাত কাটা হবে। আর যদি বাইরে অবস্থানকারী ব্যক্তিটি নিজের হাত ঘরের ভিতর ঢুকিয়ে প্রবেশকারীর হাত থেকে মালামাল ধরে আনে, তাহলে উভয়ের হাত কাটা হবে।

৩. ইমাম মালেক (র.) বলেন, ভিতরে ও বাইরে অবস্থানকারী দুজন যদি পরস্পর সহায়ক হয়, তাহলে উভয়ের হাত কাটা হবে। আর যদি প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন হয়, তাহলে হাত কাটা হবে না।

গ্রন্থকার (র.) প্রথমোক্ত মতের দলিল বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, দুজনের কারো হাত কাটা হবে না। কারণ বর্ণিত প্রক্রিয়ায় কারো মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ চুরি সংঘটিত হয়নি। পূর্ণাঙ্গ চুরি সংঘটিত হয় দু'টির কাজের মাধ্যমে। এক. হিরয ভঙ্গ করা। দুই. মালামাল বের করে নিয়ে আসা। আলোচ্য প্রক্রিয়ায় ঘরের ভিতরে প্রবেশকারীর মাধ্যমে প্রথমাংশ সংঘটিত হয়েছে। অর্থাৎ তার দ্বারা কেবল হিরয ভঙ্গ হয়েছে।

দ্বিতীয়াংশ অর্থাৎ মালামাল বের করে নিয়ে আসার কাজটি তার দ্বারা সংঘটিত হয়নি। কেননা যে ঘর থেকে বের হওয়ার পূর্বেই মালামাল অন্যের হাতে চলে গেছে। অতএব, যখন তার দ্বারা পূর্ণাঙ্গ চুরি কর্ম সংঘটিত হয়নি। তখন তার হাতও কাটা যাবে না। আর বাইরে অবস্থানকারীর দ্বারা চুরি কর্মের প্রথমাংশই সংঘটিত হয়নি। অর্থাৎ তার দ্বারা হিরয ভঙ্গ হয়নি। কারণ সে ঘরে ঢুকেনি। অতএব, তার দ্বারা যেহেতু পূর্ণাঙ্গ চুরি কর্ম ঘটেনি। তাই তার হাতও কর্তন করা যাবে না। অতএব, আলোচ্য প্রক্রিয়ার হুকুম এই হলো যে, দুজনের একজনের, ও হাত কাটা হবে না।

দ্বিতীয় প্রক্রিয়া : চোর ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে মাল পত্র সংগ্রহ করে সেগুলো ঘরের বাইরে ফেলে দিল। এরপর ঘর থেকে বের হয়ে মালপত্র উঠিয়ে নিয়ে চলে গেল। এ প্রক্রিয়ায় চুরি করার হুকুম সম্পর্কে দুটি মত বর্ণিত হয়েছে।

এক. হাত কাটা হবে। দুই. ইমাম যুফার (র.) -এর মতে হাত কাটা হবে না।

ইমাম যুফার (র.) -এর যুক্তি হলো, আলোচ্য সুরতে ব্যক্তিটির দ্বারা চুরি কর্ম সংঘটিত হয়; বরং ব্যক্তির দ্বারা সর্বমোট তিনটি কর্ম সংঘটিত হয়েছে।

১. ঘরে ঢুকে মালামাল সংগ্রহ করা। এটা পূর্ণাঙ্গ চুরি নয়; বরং চুরির একাংশ তথা হিরয ভঙ্গ করা। এর ফলে হাত কাটা যায় না।

২. মালামাল বাহিরে নিক্ষেপ করা। এটাও চুরি নয়। কেননা সে যদি মালামাল বাহিরে নিক্ষেপ করে চলে যায় তাহলে এ কারণে কেউ তার হাত কাটার কথা বলবে না। এর দ্বারা বুঝা যায় ঘরের মালপত্র বাইরে ফেলে দেওয়া কে চুরি বলে না। অতএব এ কারণেও তার হাত কাটা যাবে না।

৩. বাইর থেকে মালপত্র কুড়িয়ে নেওয়া। এটাও চুরি নয়। কেননা সে মালগুলো অন্য কেউ কুড়িয়ে নেয় তাহলে কেউ তার হাত কাটার কথা বলবে না। এর দ্বারা বুঝা যায়, অন্যের পড়ে থাকা জিনিস কুড়িয়ে নেওয়া চুরি নয়। অতএব, এই তৃতীয় কাজের দায়েও তার হাত কাটা যাবে না। মোটকথা, ইমাম যুফার (র.) ব্যক্তির ঘরে প্রবেশ করে মালামাল ধরা, বাহিরে নিক্ষেপ করা, অতঃপর সেগুলো কুড়িয়ে নেওয়া এ প্রত্যেকটিকে পৃথক কাজ হিসাবে বিবেচনা করেছেন। তাই তিনি বলেছেন, তিনটি কাজের কোনো একটি কাজকেও চুরি বলে অভিহিত করা যায় না। অতএব, তার হাত কাটার প্রশ্নই আসেনা।

আমাদের দলিল হলো উপরিউক্ত কাজটিকে পৃথক পৃথক বিবেচনা করা হবে না। বরং সবটুকু এক ও অভিন্ন কাজ। কেননা মালামাল বাইরে নিক্ষেপ করা এটা চোরদের অভ্যাস এবং কৌশল বিশেষ। এ কৌশল তারা অবলম্বন করে একাধিক উদ্দেশ্য। যেমন মালগুলো বাইরে ফেলে দিলে ঘর হতে বেরিয়ে আসা সহজ হয় অন্যথায় মালামাল নিয়ে একসাথে বেরিয়ে আসা অনেক সময় কঠিন হয়ে পড়ে। তদ্রূপ যদি বাড়ির মালিকের সাথে অল্প বেশি মোকাবিলা করার প্রয়োজন হয়, তাহলে মোকাবিলা করতেও সুবিধা হয়, পলায়ন করার পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে পলায়ন করাও সহজ হয়। অন্যথায় মালপত্র সাথে থাকলে পালায়ন করা ও মোকাবিলা উভয়ই কঠিন হয়ে পড়ে। মোটকথা এসকল হীন উদ্দেশ্যে চোরেরা মালপত্র ঘরের বাইরে ফেলে দেয়। অতএব, একে পৃথক কর্ম হিসাবে দেখার কোনো সুযোগ নেই। বরং তার সকল কর্মকে এক কর্ম হিসাবে বিবেচনা করা হবে এবং তাকে চুরি হিসাবেই গণ্য করে তার হাত কেটে দেওয়া হবে।

ইমাম যুফার (র.) বলেছিলেন, মালগুলো ঘরের বাইরে ফেলে দিয়ে যদি সে চলে যায়, তাহলে কেউ তাকে চুরি বলে না, এর দ্বারা বুঝা যায়– মালামাল ঘরের বাইরে নিক্ষেপ করা চুরি নয়।

এর জবাবে গ্রন্থকার বলেন, ঘরের বাইরে নিক্ষেপ করার পর যদি কুড়িয়ে না নেয়, তাহলে অবশ্যই তাকে চোর বলা হবে না। বরং তাকে বলা হবে মাল নষ্টকারী। কিন্তু যদি আবার কুড়িয়ে নেয়, তাহলে তো আগের মতো হলো না। অতএব, আগেরটাকে চুরি না বললেও এটাকে চুরিই বলা হবে। অতএব, ইমাম যুফার (র.) -এর তুলনা সঠিক নয়।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ وَكَذٰلِكَ اِنْ حَمَلَهُ عَلٰى حِمَارٍ فَسَاقَهُ وَاَخْرَجَهُ لِاَنَّ سَيْرَهُ مُضَافٌ اِلَيْهِ لِسَوْقِهِ. وَاِذَا دَخَلَ الْحِرْزَ جَمَاعَةٌ فَتَوَلّٰى بَعْضُهُمُ الْاَخْذَ قُطِعُوْا جَمِيْعًا قَالَ الْعَبْدُ الضَّعِيْفُ : هٰذَا اِسْتِحْسَانٌ وَالْقِيَاسُ اَنْ يُقْطَعَ الْحَامِلُ وَحْدَهُ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ رَحِمَهُ اللّٰهُ؛ لِاَنَّ الْاِخْرَاجَ وُجِدَ مِنْهُ فَتَمَّتِ السَّرِقَةُ بِهٖ . وَلَنَا اَنَّ الْاِخْرَاجَ مِنَ الْكُلِّ مَعْنًى لِلْمُعَاوَنَةِ كَمَا فِي السَّرِقَةِ الْكُبْرٰى، وَهٰذَا لِاَنَّ الْمُعْتَادَ فِيْمَا بَيْنَهُمْ اَنْ يَحْمِلَ الْبَعْضُ الْمَتَاعَ وَيَتَشَمَّرَ الْبَاقُوْنَ لِلدَّفْعِ، فَلَوْ امْتَنَعَ الْقَطْعُ لَاَدّٰى اِلٰى سَدِّ بَابِ الْحَدِّ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, **অদ্রূপ যদি গাধার পিঠে মাল বোঝাই করে তা হাঁকিয়ে নিয়ে যায়** (তাহলেও হাত কাটা হবে)। কেননা তার চালানোর কারণে গাধার চলা তার দিকেই সম্বন্ধিত হবে।

যদি একদল চোর কোনো সংরক্ষিত স্থানে প্রবেশ করে এবং তাদের মধ্য থেকে কোনো একজন যদি মাল নেওয়ার ভার গ্রহণ করে তাহলে সবার হাত কাটা হবে।

গ্রন্থকার বলেন, এটা সূক্ষ্ম কিয়াসের দাবি। পক্ষান্তরে কিয়াসের দাবি হলো, শুধু বহনকারীর হাতকাটা। যেমনটি ইমাম যুফার (র.) বলেন। কেননা তার থেকেই মাল বের করার অপরাধ পাওয়া গেছে । সুতরাং তার দ্বারাই সেটা কর্ম পূর্ণতা লাভ করেছে।

আমাদের দলিল এই যে, পারস্পরিক সহযোগিতার কারণে গুণগত তাকে বের করার অপরাধ সবার থেকেই পাওয়া গেছে। যেমন বড় চুরির (রাহাজানির) ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। এর কারণ এই যে, চোরদের অনুসৃত রীতি হলো, কেউ মালামাল উঠিয়ে নেয়, আর অন্যান্যরা তার প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত থাকে। এখন যদি হস্ত কর্তন রহিত হয়, তাহলে এর ফলে হদ্দের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ : قَالَ وَكَذٰلِكَ اِنْ حَمَلَهُ عَلٰى حِمَارٍ الخ : গাধার পিঠে মালামাল বোঝাই করে যেহেতু সে নিজেই গাধা চালিয়ে নিয়ে গেছে, সেহেতু বলতে হবে সে নিজেই মালামাল নিয়ে গেছে। অতএব, তার দ্বারা পূর্ণ চুরি কর্ম সংঘটিত হয়েছে বিধায় হাত কাটা হবে।

পক্ষান্তরে যদি গাধার পিঠে মালামাল দিয়ে চোর চলে যায়। এরপর গাধাটি বের হয়ে একা একা পথ চলে চোরের বাড়িতে পৌঁছে যায়, তাহলে চোরের হাত কাটা যাবে না। কেননা এ ক্ষেত্রে চোর গাধা চালিয়ে নেয়নি। অতএব, গাধার চলাকে চোরের দিকে সম্বন্ধ করা যায় না। এবং এটাও বলা যায় না যে, চোর মাল নিয়ে চলে গেছে।

قَوْلُهُ : وَاِذَا دَخَلَ الْحِرْزَ جَمَاعَةٌ فَتَوَلّٰى الخ : একদল চোর ঘরে প্রবেশ করার পর একজন দায়িত্ব নিল সে মালামাল সরাবে। বাকিরা দাঁড়িয়ে থাকল তার প্রতিরক্ষার জন্য। যদি বাড়ির মালিক জাগ্রত হয়ে যায়, তাহলে তারা তাকে প্রতিরোধ করবে। যেন চুরি কর্মটি পূর্ণাঙ্গরূপে সম্পন্ন হতে পারে। এমতাবস্থায় কি হুকুম– এ নিয়ে দুরকম মতামত রয়েছে–

১. সকলের হাত কাটা হবে। এটা আহনাফের মত ইমাম যুফার (র.) ছাড়া।

২. যে লোক মালামাল সরানোর দায়িত্ব নিয়েছিল শুধু তার হাত কাটা হবে। এটা ইমাম যুফার (র.) ও ইমাম ত্রয়ের অভিমত।

https://e-ilm.weebly.com/

দ্বিতীয় মতটির ভিত্তি হলো কিয়াস। তারা বলেন, মালপত্র ঘর থেকে বের করার কাজটি যে আঞ্জাম দিয়েছে, তার দ্বারাই চুরি সম্পন্ন হয়েছে। অতএব, তার হাতই কাটা হবে। অবশিষ্টরা ঘরে প্রবেশ করেছে, কিন্তু মাল বের করেনি। তাই তাদের দ্বারা পূর্ণ চুরি কর্ম সংঘটিত হয়নি। বিধায় তাদের হাত কাটা হবে না।

আহনাফের দলিল হলো– ইস্তিহসান বা সূক্ষ্ম কিয়াস। তারা বলেন, একজনের চুরি করা, বাকিরা পাহারা দেওয়া, এটা চোরদের চিরাচরিত অভ্যাস। যেমন ডাকাতদের অভ্যাস হলো কেউ কেউ ডাকাতি করে, বাকিরা তাদের প্রতি রক্ষায় থাকে। অতএব, ডাকাতির ক্ষেত্রে যেমন সবাইকে অপরাধী গণ্য করা হয়, তেমনি চুরির ক্ষেত্রেও সবাই কে অপরাধী সাব্যস্ত করা হবে। কেননা তারা পরস্পর একে অপরকে সাহায্য করেছে। সে হিসাবে তাদের সবার দ্বারা মাল সরানোর অপরাধ সংঘটিত হয়েছে। অতএব, তারা সকলেই চোর। সকলেরই হাত কাটা হবে।

আলোচ্য সুরতে যদি হাত না কাটা হয়, তাহলে হদ্দের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। বিধায় আহনাফ ইস্তিহসানের ভিত্তিতে সকলের হাত কাটার কথা বলেছেন। উপরিউক্ত চোরদলের মধ্যে যে মাল সরিয়েছে সে যদি অপ্রাপ্ত বয়স্ক হয় কিংবা পাগল হয়, তাহলে দলের কারো হাত কাটা যাবে না। এটা সর্বসম্মত। কারণ তখন চুরির বিষয়ে সন্দেহ সৃষ্টি হয়ে যায়।

যে মাল সরিয়েছে, সে ব্যতীত অন্য একজন সদস্য যদি পাগল কিংবা শিশু হয়, তাহলেও ইমাম আবূ ও ইমাম মুহাম্মাদ (র.) এর মতে কারো হাত কাটা যাবে না। একজনের কাজে সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ার কারণে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে শিশু ও পাগল ছাড়া অন্যদের হাত কেটে দেওয়া হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَمَنْ نَقَبَ الْبَيْتَ وَاَدْخَلَ يَدَهٗ فِيْهِ وَاَخَذَ شَيْئًا لَمْ يُقْطَعْ وَعَنْ اَبِيْ يُوْسُفَ فِي الْاِمْلَاءِ اَنَّهٗ يُقْطَعُ لِاَنَّهٗ اَخْرَجَ الْمَالَ مِنَ الْحِرْزِ وَهُوَ الْمَقْصُوْدُ فَلَا يُشْتَرَطُ الدُّخُوْلُ فِيْهِ، كَمَا اِذَا اَدْخَلَ يَدَهٗ فِيْ صُنْدُوْقِ الصَّيْرَفِيِّ فَاَخْرَجَ الْغِطْرِيْفِيَّ . وَلَنَا اَنَّ هَتْكَ الْحِرْزِ يُشْتَرَطُ فِيْهِ الْكَمَالُ تَحَرُّزًا عَنْ شُبْهَةِ الْعَدَمِ وَالْكَمَالِ فِي الدُّخُوْلِ، وَقَدْ اَمْكَنَ اِعْتِبَارُهٗ وَالدُّخُوْلُ هُوَ الْمُعْتَادُ . لِاَنَّ الْمُمْكِنَ فِيْهِ اِدْخَالُ الْيَدِ دُوْنَ الدُّخُوْلِ، وَبِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ حَمْلِ الْبَعْضِ الْمَتَاعَ لِاَنَّ ذٰلِكَ هُوَ الْمُعْتَادُ ـ

অনুবাদ : কেউ যদি ঘরে সিঁধ কেটে ভিতরে হাত ঢুকিয়ে দেয় এবং কোনো জিনিস হস্তগত করে তাহলে তার হাত কাটা হবে না।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) হতে ইমলায় বর্ণিত আছে তার হস্ত কর্তন করা হবে। কেননা যে সংরক্ষিত স্থান হতে মাল বের করে এনেছে। আর এটাই তো উদ্দেশ্য। সুতরাং এক্ষেত্রে প্রবেশের শর্ত আরোপ করা হবে না। যেমন পোদ্দারের সিন্দুকে হাত ঢুকিয়ে দিরহাম বের করে নিল। আমাদের দলিল এই যে, অবিদ্যমানতার সন্দেহ পরিহার করার লক্ষ্যে সংরক্ষণ ভঙ্গের পূর্ণতার শর্ত আরোপ করা হয়। এবং প্রবেশের মধ্যেই পূর্ণতা সম্পন্ন হয় আর তা বিবেচনা করাও সম্ভব। এবং প্রবেশই চুরি করার সাধারণ অবস্থা।

সিন্দুকের বিষয়টি ভিন্ন । কেননা তাতে কেবল হাত ঢুকানোই সম্ভব। প্রবেশ করা সম্ভব নয়। তদ্রূপ পূর্বে বর্ণিত (দলের একজন মালামাল নিয়ে যাওয়ার) বিষয়টিও ভিন্ন। কেননা সেটাই সাধারণ রীতি। (সুতরাং তা পূর্ণতার অর্থ রয়েছে।)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সিঁধ কেটে হাত ঢুকিয়ে ঘরের ভিতর হতে মালপত্র বের করে নিয়ে গেলে তার হুকুম সম্পর্কে দুধরনের মত পাওয়া যায়।

১. যাহিরে রেওয়ায়েত মতে হাত কাটা হবে না।

২. ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে হাত কাটা হবে।

ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর দলিল হলো সে সংরক্ষিত স্থান হতে মাল বের করে নিয়ে গেছে। চুরির অর্থ এটাই। ঘরে প্রশে করা মূল উদ্দেশ্য নয়। অতএব, ঘরে প্রবেশ না করেও তার থেকে চুরির মূল্য উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হয়েছে, তাই তার হাত কেটে দেওয়া হবে। যেমন কোনো চোর পোদ্দারের সিন্দুকে হাত দিয়ে যদি দিরহাম-দীনার চুরি করে নেয় তাহলে তার হাত কেটে দেওয়া হয়। অথচ সেখানে চোর প্রবেশ করে না। বুঝা গেল, চুরির জন্য প্রবেশ করা শর্ত নয়।

আমাদের দলিল হলো এই যে, হিরয ভঙ্গ করার বিষয়ে সন্দেহ মুক্ত হওয়ার জন্য পূর্ণাঙ্গ রূপে ভঙ্গ করার শর্ত। আর পূর্ণাঙ্গ রূপে হিরয ভঙ্গ হওয়ার জন্য ঘরের ভিতরে প্রবেশ করা শর্ত। আবার ঘরের ক্ষেত্রে প্রবেশ করাও সম্ভব। এমন কি স্বাভাবিক নিয়মও। বিধায় প্রবেশ করার বিষয়টি বিবেচ্য থাকবে। আলোচ্য সুরতে ব্যক্তি যেহেতু ঘরের ভিতরে প্রবেশ করেনি, তাই হিরয ভঙ্গ করা পাওয়া যায় নি। অতএব, তার হাত কাটা হবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

ইমাম আবু ইউসুফ (র.) যে, সিন্দুকের সাথে কিয়াস করেছেন তা ঠিক নয়; কারণ ঘর আর সিন্দুক একরকম নয়। সিন্দুকের মধ্যে শুধু হাত ঢুকানো সম্ভব। মানুষ প্রবেশ করা সম্ভব নয়। তাই সিন্দুকের ক্ষেত্রে হাত ঢুকালেই হিরয ভঙ্গ হওয়ার বিষয়টি পরিপূর্ণ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে ঘরে প্রবেশ করা সম্ভব এবং স্বাভাবিক। তাই সেখানে হিরয ভঙ্গ হওয়ার বিষয়টি পূর্ণাঙ্গ হতে হলে প্রবেশ করা আবশ্যক। হাত ঢুকালে হিরয ভঙ্গ হবে না।

পূর্ববর্তী মাসআলায়ও স্বাভাবিক রীতি হওয়ার ভিত্তিতে সবাইকে চোর সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং হাত কাটার কথা বলা হয়েছে।

মতনে উল্লিখিত الغطريفى শব্দের তাহকীক খলীফা রশীদের শাসনামলে খোরাসান অঞ্চলের এক গর্ভনর ছিলেন গিতরীফ ইবনে আতা আলকিন্দী নামে। তার দিকে সম্বন্ধ করে একপ্রকার দিরহামকে গিতরীফী দিরহাম বলা হতো। তৎকালে এ দিরহাম বোখারা অঞ্চলে সর্বাধিক মূল্যবান দিরহাম হিসাবে খ্যাত ছিল।

املاء শব্দের দ্বারা হযরত الامالى لابى يوسف বুঝানো হয়েছে। কিংবা ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর কোনো শাগরেদের কাছে সংরক্ষিত ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) হতে বর্ণিত মাসআলা মাসায়েলের লিখিত সংগ্রহ কে বুঝানো হয়েছে। যে যুগে মুহাদ্দিসও ফকীহগণ ছাত্রদের কে পড়ানোর সময় নিজের জ্ঞানভাণ্ডার তাদেরকে লিখিয়ে দিতেন। যেসব লিখিত সংগ্রহকে ইমলা ও আমালী বলা হয়।

https://e-ilm.weebly.com/

وَإِنْ طَرَّ صُرَّةً خَارِجَةً مِنَ الْكُمِّ لَمْ يُقْطَعْ، وَإِنْ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْكُمِّ يُقْطَعُ لِأَنَّ فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ الرِّبَاطَ مِنْ خَارِجٍ، فَبِالطَّرِّ يَتَحَقَّقُ الْأَخْذُ مِنَ الظَّاهِرِ فَلَا يُوْجَدُ هَتْكُ الْحِرْزِ . وَفِي الثَّانِيْ الرِّبَاطُ مِنْ دَاخِلٍ، فَبِالطَّرِّ يَتَحَقَّقُ الْأَخْذُ مِنَ الْحِرْزِ وَهُوَ الْكُمُّ، وَلَوْ كَانَ مَكَانَ الطَّرِّ حَلُّ الرِّبَاطِ، ثُمَّ الْأَخْذُ فِي الْوَجْهَيْنِ يَنْعَكِسُ الْجَوَابُ لِانْعِكَاسِ الْعِلَّةِ . وَعَنْ أَبِيْ يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ أَنَّهُ يُقْطَعُ عَلٰى كُلِّ حَالٍ لِأَنَّهُ مُحَرَّزٌ إِمَّا بِالْكُمِّ أَوْ بِصَاحِبِهِ . قُلْنَا : الْحِرْزُ هُوَ الْكُمُّ لِأَنَّهُ يَعْتَمِدُهُ، وَإِنَّمَا قَصْدُهُ قَطْعُ الْمَسَافَةِ أَوِ الْاِسْتِرَاحَةِ فَأَشْبَهَ الْجُوَالِقَ . وَإِنْ سَرَقَ مِنَ الْقِطَارِ بَعِيْرًا أَوْ حِمْلًا لَمْ يُقْطَعْ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُحَرَّزٍ مَقْصُوْدًا فَتَتَمَكَّنُ شُبْهَةُ الْعَدَمِ، وَهٰذَا لِأَنَّ السَّائِقَ وَالْقَائِدَ وَالرَّاكِبَ يَقْصِدُوْنَ قَطْعَ الْمَسَافَةِ وَنَقْلَ الْأَمْتِعَةِ دُوْنَ الْحِفْظِ . حَتّٰى لَوْ كَانَ مَعَ الْأَحْمَالِ مَنْ يَتْبَعُهَا لِلْحِفْظِ قَالُوْا يُقْطَعُ ـ

অনুবাদ : যদি আস্তিনের (বা কোমরের) বাইরে ঝুলে থাকা থলে কেটে নেয়, তাহলে হস্ত কর্তন করা হবে না। আর যদি আস্তিনের (বা কোমরের কিংবা পকেটের) ভিতরে হাত ঢুকিয়ে নেয়, তাহলে কর্তন করা হবে। কেননা প্রথম ক্ষেত্রে মুখ বাঁধার রশি বাইরের দিকে থাকে। সুতরাং থলে কাটার দ্বারা বাহির থেকে নেওয়া সাব্যস্ত হয়। কাজেই সংরক্ষণ ভঙ্গ করা সাব্যস্ত হয় না। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে মুখ বাঁধার রশি থাকে আস্তিনের ভিতরে। সুতরাং থলে কাটার দ্বারা সংরক্ষিত স্থান অর্থাৎ আস্তিন থেকে নেওয়া সাব্যস্ত হয়। আর যদি কাটার পরিবর্তে মুখের বাঁধন খুলে নেওয়া হয়, তাহলে কারণ বিপরীত হওয়ার দরুন উভয় ক্ষেত্রে হুকুম বিপরীত হয়ে যাবে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, সর্বাবস্থায় হস্ত কর্তন সাব্যস্ত হবে। কেননা মাল হয় আস্তিন দ্বারা কিংবা তার অধিকারী দ্বারা সংরক্ষিত ছিল। আমাদের দলিল এই যে, আস্তিনই হলো সংরক্ষিত স্থান। কেননা আস্তিন ওয়ালা মালের হেফাজতের জন্য আস্তিনের উপরই ভরসা করে থাকে। তার লক্ষ্য তো থাকে দূরত্ব অতিক্রম করা কিংবা বিশ্রাম করা। সুতরাং তা গোলার ভিতরে মালামাল রক্ষার সাদৃশ হলো।

যদি সারিবদ্ধ উট হতে একটি উট চুরি করে কিংবা (উটের উপর থেকে) একটি গাঠরি চুরি করে। তাহলে তার হাত কাটা হবে না। কেননা তা উদ্দেশ্য রূপে সংরক্ষিত নয়। সুতরাং সংরক্ষণ বিদ্যমান না থাকার সন্দেহ সাব্যস্ত হবে।

এর কারণ হচ্ছে, সামনের থেকে যে টেনে নেয়, কিংবা পিছন থেকে হাঁকিয়ে নেয় কিংবা সওয়ার হয়ে চলে তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো পথ অতিক্রম এবং মালামাল স্থানান্তর। হেফাজত উদ্দেশ্য নয়। তবে যদি মালামালের হেফাজতের জন্য কেউ পিছনে পিছনে চলে, তাহলে ফকীহগণ বলেন, হাত কাটা হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ব্যবসায়ী এবং মুসাফির ব্যক্তি দিরহাম-দীনারের থলে কোমরে বা আস্তিনে ঝুলিয়ে রাখত। এবং দিরহাম-দীনার হেফাজতের জন্য থলের উপর নির্ভর করত। এর দ্বারা ব্যক্তির উদ্দেশ্য হতো পথ অতিক্রম করা কিংবা বিশ্রাম করা। মোটকথা মানুষের উদ্দেশ্যই বিবেচনা করা হয়। অতএব, আস্তিন বা থলেই হিরয হিসাবে গণ্য হবে। মালটি থলে দ্বারা সংরক্ষিত বলেই গণ্য হবে। ব্যক্তি দ্বারা সংরক্ষিত বলে গণ্য হবে না। যেমন জন্তুর পিঠে মাল ভর্তি বস্তা চেপে দেওয়ার মাধ্যমে বস্তা হেফাজত উদ্দেশ্য হয় না। বরং মাল হেফাজত উদ্দেশ্য হয়। তাই বস্তা ভেদ করে কিছু করলে চোরের হাত কাটা হয়। কারণ তা সংরক্ষিত স্থান হতে চুরি করা হয়েছে। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, বস্তাই উক্তমালের সংরক্ষণ স্থল। পক্ষান্তরে যদি মাল ভর্তি বস্তাটাই চুরি করে নিয়ে যায়, তাহলে হাত কাটা হয় না। কারণ বস্তার কোনো সংরক্ষণকারী নেই। جوالق শব্দটি ج হরফে পেশ যোগে। একবচন। এর বহুবচন হলো جواليق - ج হরফে যবর যোগে।

قَوْلُهُ وَاِنْ سَرَقَ مِنَ الْقِطَارِ بَعِيرًا اَوْ حِمْلًا الخ : যদি উটের সারি হতে উট চুরি করা হয় কিংবা উটের উপর থেকে গাঠরি চুরি করা হয়। তাহলে আহনাফের মতে হাত কাটা হবে না।

ইমাম ত্রয়ের মতে যদি সায়েক বা কায়েদ কিংবা আরোহী ঘুমিয়ে না থাকে, তাহলে হাত কাটা হবে। কারণ তারা উটের সারিকে সায়েক, কায়েদ বা আরোহীর মাধ্যমে সংরক্ষিত সম্পদ বলে মনে করেন। তাই সেখান থেকে চুরি করলে তারা হাত কাটার কথা বলেন সায়েক, কায়েদ বা আরোহী যদি ঘুমিয়ে থাকে, তাহলে তারাও বলেন, চোরের হাত কাটা হবে না।

আহনাফের যুক্তি হলো, উটের সারি সংরক্ষিত সম্পদ নয়। কেননা উটের সাথে যে সায়েক, কায়েদ বা আরোহী থাকে, তার মূল উদ্দেশ্য হয় রাস্তা অতিক্রম এবং মালামাল স্থানান্তর করা। উটের সারি হেফাজত করা তাদের উদ্দেশ্য থাকে না।

বিধায় উটের সারি সংরক্ষিত সম্পদ নয়। আর অসংরক্ষিত সম্পদ চুরি করলে হাত কাটা যায় না। তবে যদি মালামাল সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে উটের সাথে কেউ থাকে, তাহলে অবশ্যই চোরের হাত কাটা হবে। কেননা তখন তা হেফাজত কারীর মাধ্যমে সংরক্ষিত সম্পদ।

https://e-ilm.weebly.com/

وَاِنْ شَقَّ الْحِمْلَ وَاَخَذَ مِنْهُ قُطِعَ لِاَنَّ الْجُوَالِقَ فِيْ مِثْلِ هٰذَا حِرْزٌ لِاَنَّهٗ يَقْصِدُ بِوَضْعِ الْاَمْتِعَةِ فِيْهِ صِيَانَتَهَا كَالْكُمِّ فَوُجِدَ الْاَخْذُ مِنَ الْحِرْزِ فَيُقْطَعُ وَاِنْ سَرَقَ جُوَالِقًا فِيْهِ مَتَاعٌ وَصَاحِبُهٗ يَحْفَظُهٗ اَوْ نَائِمٌ عَلَيْهِ قُطِعَ وَمَعْنَاهُ اِذَا كَانَ الْجُوَالِقُ فِيْ مَوْضِعٍ هُوَ لَيْسَ بِحِرْزٍ كَالطَّرِيْقِ وَنَحْوِهٖ حَتّٰى يَكُوْنَ مُحَرَّزًا بِصَاحِبِهٖ لِكَوْنِهٖ مُتَرَصِّدًا لِحِفْظِهٖ، وَهٰذَا لِاَنَّ الْمُعْتَبَرَ هُوَ الْحِفْظُ الْمُعْتَادُ وَالْجُلُوْسُ عِنْدَهٗ وَالنَّوْمُ عَلَيْهِ يُعَدُّ حِفْظًا عَادَةً وَكَذَا النَّوْمُ بِقُرْبٍ مِنْهُ عَلٰى مَا اخْتَرْنَاهُ مِنْ قَبْلُ . وَذُكِرَ فِيْ بَعْضِ النُّسَخِ، وَصَاحِبُهٗ نَائِمٌ عَلَيْهِ اَوْ حَيْثُ يَكُوْنُ حَافِظًا لَهٗ، وَهٰذَا يُؤَكِّدُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْقَوْلِ الْمُخْتَارِ ـ

অনুবাদ : যদি গাঠরি কেটে তা থেকে কিছু বের করে নেয়, তাহলে হস্ত কর্তন করা হবে। কেননা এ ধরনের অবস্থায় বস্তাটাই সংরক্ষণকারী রূপে গণ্য।

কারণ সামানের হেফাজতই হচ্ছে তাতে সামান রাখার উদ্দেশ্য। যেমন আস্তিনের বিষয়টি। সুতরাং সংরক্ষিত স্থান হতে চুরি বিদ্যমান হলো। ফলে হস্ত কর্তন করা হবে।

যদি সামান ভরা বস্তা চুরি করে এমন অবস্থায় যে, সামানের মালিক তা হেফাজত করছে কিংবা তার উপর ঘুমিয়ে রয়েছে, তাহলে হস্ত কর্তন করা হবে। অর্থাৎ বস্তা যদি রাস্তায় বা এ ধরনের অরক্ষিত স্থানে থাকে, তাহলে তা মালিকের হেফাজত দ্বারা সংরক্ষিত হবে। কেননা এ অবস্থায় মালিক হেফাজতের জন্য পাহারা দিচ্ছে। এর কারণ এই যে, রীতিসম্মত হেফাজতই হলো বিবেচ্য। আর সামানের কাছে বসে থাকা এবং তার উপর ঘুমিয়ে থাকাকে রীতি অনুযায়ী হেফাজত করা বলে ধরা হয়। তদ্রূপ ইতিপূর্বে আমরা যে মতামত গ্রহণ করেছি, সে হিসাবে কাছে ঘুমিয়ে থাকাও হেফাজত রূপে গণ্য।

জামে সাগীরের কোনো কোনো অনুলিপিতে রয়েছে, মালিক তার উপর কিংবা এমন স্থানে ঘুমিয়ে আছে যেখান থেকে তার হেফাজত করা যায়। এটা ঐ মতামতকেই জোরদার করে যেটাকে আমরা উত্তম মত বলে ইতিপূর্বে পেশ করে এসেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিউক্ত দুটি মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে।

১. যদি উটের পিঠে বহনকৃত গাঠরি ভেদ করে মালামাল নিয়ে যায়, তাহলে চোরের হাত কাটা হবে। কেননা গাঠরি বা বস্তা বন্দী মালামাল সংরক্ষিত মাল বলে গণ্য। কারণ মালামাল বস্তায় ভরার উদ্দেশ্যই হলো তা হেফাজত করা। তাই বস্তাটাই তার মধ্যকার মালামালের জন্য হিরয স্বরূপ। অতএব, বস্তা কেটে মাল চুরি করা হলে হিরয তথা সংরক্ষণ ভঙ্গ করে সংরক্ষিত মালামাল চুরি করা হলো সুতরাং এর দায়ে হাত কাটা হবে।

২. কেউ যদি রাস্তায়, মাঠে, কিংবা মসজিদে নিজের মাল ভর্তি বস্তা পাহারা দিতে থাকে অথবা বস্তাটির উপর কিংবা অদূরে ঘুমিয়ে থাকে। আর এ অবস্থায় কোনো চোর বস্তাটি চুরি করে নিয়ে যায়, তাহলে তার হাত কাটা হবে।

কেননা আলোচ্য সুরতে বস্তাটি সংরক্ষণকারী দ্বারা সংরক্ষিত ছিল। বস্তার উপর কিংবা অদূরে ঘুমিয়ে থাকাকে জনসাধারণ্যে সংরক্ষণ মনে করা। আর সাধারণ্যের মাঝে যা প্রচলিত থাকে, তাই বিবেচ্য হয়। যে হিসাবে বস্তাটির কাছে যেহেতু মালি বসা ছিল কিংবা ঘুমিয়ে ছিল, সেহেতু সংরক্ষিত সম্পদ ছিল। আর সংরক্ষণ ভঙ্গ করলে বা সংরক্ষিত সম্পদ চুরি করলে হাত কাটা হয়। তাই আলোচ্য সুরতেও হাত কাটা হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

فَصْلٌ فِيْ كَيْفِيَةِ الْقَطْعِ وَاِثْبَاتِهِ

قَالَ وَيُقْطَعُ يَمِيْنُ السَّارِقِ مِنَ الزَّنْدِ وَيُحْسَمُ فَالْقَطْعُ لِمَا تَلَوْنَاهُ مِنْ قَبْلُ، وَالْيَمِيْنُ بِقِرَاءَةِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَمِنَ الزَّنْدِ لِاَنَّ الِاسْمَ يَتَنَاوَلُ الْيَدَ اِلَى الْاِبِطِ، وَهٰذَا الْمَفْصِلُ : اَعْنِي الرُّسْغَ مُتَيَقَّنٌ بِهٖ، كَيْفَ وَقَدْ صَحَّ اَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اَمَرَ بِقَطْعِ يَدِ السَّارِقِ مِنَ الزَّنْدِ، وَالْحَسْمُ لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَاقْطَعُوْهُ وَاحْسِمُوْهُ وَلِاَنَّهٗ لَوْ لَمْ يُحْسَمْ يُفْضِيْ اِلَى التَّلَفِ وَالْحَدُّ زَاجِرٌ لَا مُتْلِفٌ ـ

অনুচ্ছেদ : হস্তকর্তন ও তার সাব্যস্তের পদ্ধতি সম্পর্কে

অনুবাদ : গ্রন্থকার বলেন, চোরের ডান হাত কব্জি পর্যন্ত কাটা হবে অতঃপর দাগিয়ে দেওয়া হবে। কর্তনের দলিল ইতিপূর্বে আমাদের উল্লেখকৃত আয়াত আর ডান হাত কাটার দলিল হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) এর কেরাতে প্রমাণিত।

কব্জি থেকে কর্তনের কারণ এই যে, يد (হাত) শব্দটি যদিও হাতের বগল পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত করে, কিন্তু কব্জি পর্যন্ত স্থানটি (সর্বনিম্ন হওয়ার কারণে) সুনিশ্চিত। তদুপরি রাসূল ﷺ চোরের হাত কব্জি পর্যন্ত কাটার আদেশ করেছেন। দাগিয়ে দেওয়ার কারণ হলো, নবী করীম ﷺ এর নিম্নোক্ত বাণী- فَاقْطَعُوْهُ وَاحْسِمُوْهُ তার হাত কেটে দাও এবং দাগিয়ে দাও। তাছাড়া দাগিয়ে দেওয়া না হলে প্রাণনাশ পর্যন্ত গড়াতে পারে। অথচ হদ্দ হলো সাবধানকারী: প্রাণনাশকারী নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিউক্ত ইবারতে চোরের শাস্তি সম্পর্কিত চারটি বিষয় প্রমাণসহ আলোচিত হয়েছে। বিষয় চারটি এই−

১. চোরের হাত কাটা হবে, ২. ডান হাত কাটা হবে, ৩. কব্জি পর্যন্ত কাটা হবে, ৪. হাত কাটার পর কর্তিত স্থান দাগিয়ে দেওয়া হবে।

১. চোরের হাত কাটা হবে। এর দলিল হলো, কুরআনের আয়াত− اَلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا তোমরা পুরুষ ও স্ত্রী চোরের হাত কেটে দাও। এ নির্দেশের কারণে চোরের হাত কাটা ওয়াজিব হয়েছে।

২. ডান হাত কাটা হবে। এর দলিল হলো, হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.)-এর কেরাত। তার কেরাত আছে, اَلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْمَانَهُمَا - তোমরা পুরুষ ও স্ত্রী চোরের ডান হাত কেটে দাও। এটি একটি মাশহুর কেরাত। যার দ্বারা উসূলে ফিকহের নিয়ম অনুযায়ী কিতাবুল্লাহর উপর সংযোগ করা জায়েজ হয়। অতএব, আমাদের কেরাত ও ইবনে মাসউদ (রা.)-এর কেরাত উভয়ের সমন্বয়ে চোরের শাস্তি হলো ডান হাত কেটে দেওয়া।

৩. কব্জি পর্যন্ত কাটা হবে। কেননা يد বা হাত শব্দটি আভিধানিকভাবে আঙুলের মাথা হতে বগল পর্যন্ত বুঝিয়ে থাকে। এর মধ্যে তিনটি স্তর বা পর্যায় রয়েছে−

https://e-ilm.weebly.com/

১. কব্জি পর্যন্ত, ২. কনুই পর্যন্ত, ৩. বগল পর্যন্ত। তাই চোরের শাস্তি সম্পর্কিত আয়াতে فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا বলে কোন স্তর বা কতটুকু বুঝানো হয়েছে, সে বিষয়টি অস্পষ্ট হয়ে গেল এবং বয়ান বা ব্যাখ্যার প্রয়োজন দেখা দিল। অতঃপর আমরা দেখতে পাই, কুরআনের ব্যাখ্যাকার স্বয়ং নবী করীম ﷺ এর ব্যাখ্যা পেশ করেছেন।

عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) قَالَ قَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَارِقًا مِنَ الْمَفْصَلِ.

মুজাহিদ সূত্রে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন- নবী করীম ﷺ এক চোরের হাত কেটেছেন কব্জি পর্যন্ত। (হাদীসটি ইবনে আদী আল কামেল নামক গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন,) অনুরূপ হাদীস ইমাম দারাকুতনী ও তার সুনানে উল্লেখ করেছেন।

রাসূলের পর সাহাবায়ে কেরামও এ হাদীসের উপর আমল করেছেন এবং কব্জি পর্যন্ত হাত কাটার ব্যাপারে সাহাবাগণের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

তাছাড়া আরেকটি যৌক্তিক কারণ হলো, হাত বলে বগল বা কনুই পর্যন্ত বুঝানো সম্ভব, কিন্তু কব্জি পর্যন্ত বুঝানো সুনিশ্চিত। তাই এই সুনিশ্চিত পরিমাণকেই হদ্দের বেলায় প্রাধান্য দেওয়া হবে। অতএব, নকলী ও আকলী দলিল দ্বারা প্রমাণিত হলো, চোরের ডান হাত কব্জি পর্যন্ত কর্তন করা হবে। এটাই জমহুর আলেমগণের অভিমত।

৪. হাত কাটার পর দাগিয়ে দেওয়া হবে। এর দলিল হলো নবী করীম ﷺ এর হাদীস−

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُتِيَ بِسَارِقٍ سَرَقَ شَمْلَةً فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ مَا اَخَالُهُ سَرَقَ قَالَ السَّارِقُ بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَاذْهَبُوْا بِهٖ وَاقْطَعُوْهُ ثُمَّ احْسِمُوْهُ-

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। একবার নবী করীম ﷺ -এর কাছে একজন চোরকে উপস্থিত করা হলো চোরটি পাগড়ি চুরি করেছিলেন। নবী করীম ﷺ বললেন, আমার মনে হয় যে সে চুরি করেছে। চোরটি বলল, হে নবী! অবশ্যই আমি চুরি করেছি। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, তোমরা তাকে নিয়ে যাও, তার হাত কেটে দাও এবং তা দাগিয়ে দাও। −(মুস্তাদরাকে হাকেম)

এছাড়া আরেকটি কারণ হলো, হাত কাটার পর যদি কর্তিত হাত গরম তেলে ডুবিয়ে কিংবা গরম লোহা দ্বারা দাগিয়ে না দেওয়া হয়, তাহলে অধিক পরিমাণ রক্ত ক্ষরণ হবে। যার ফলে লোকটির মৃত্যু ঘটতে পারে। অথচ হদ্দ কায়েম করে চোরের মৃত্যু ঘটানো উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য হলো, তাকে সাবধান করা। তাই তাকে মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্য কর্তিত হাত দাগিয়ে দিতে হবে যেন রক্ত ক্ষরণ হয়ে তার মৃত্যু না ঘটে। যেমন- প্রচণ্ড শীতের মৌসুম চলাকালে যদি কোনো চোরের উপর হদ্দ ওয়াজিব হয় তা তখন কার্যকর করা হয় না। কারণ তখন হাত কাটা হলে প্রচণ্ড শীতের দাপটে শরীরের তাপমাত্রা কমে গিয়ে লোকটি মারা যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাই তখন তাকে কারাগারে আটকে রাখা হয়। যখন শীতের মৌসুম শেষ হয়ে যায়, তখন হদ্দ কার্যকর করা হয়। অতএব, এই একই উদ্দেশ্যে দাগিয়ে দেওয়ার বিষয়টিও বিধিবদ্ধ হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

فَاِنْ سَرَقَ ثَانِيًا قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرٰى، فَاِنْ سَرَقَ ثَالِثًا لَمْ يُقْطَعْ وَخُلِّدَ فِي السِّجْنِ حَتّٰى يَتُوبَ وَهٰذَا اسْتِحْسَانٌ وَيُعَزَّرُ اَيْضًا. ذَكَرَهُ الْمَشَايِخُ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللّٰهُ : فِي الثَّالِثَةِ يُقْطَعُ يَدُهُ الْيُسْرٰى، وَفِي الرَّابِعَةِ تُقْطَعُ رِجْلُهُ الْيُمْنٰى لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ﴿مَنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوْهُ. فَاِنْ عَادَ فَاقْطَعُوْهُ. فَاِنْ عَادَ فَاقْطَعُوْهُ﴾ وَيُرْوٰى مُفَسَّرًا كَمَا هُوَ مَذْهَبُهٗ، وَلِاَنَّ الثَّالِثَةَ مِثْلُ الْاُوْلٰى فِي كَوْنِهَا جِنَايَةً بَلْ فَوْقَهَا فَتَكُوْنُ اَدْعٰى اِلٰى شَرْعِ الْحَدِّ. وَلَنَا قَوْلُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِيْهِ : اِنِّي لَاَسْتَحِيْ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى اَنْ لَا اَدَعَ لَهٗ يَدًا يَاْكُلُ بِهَا وَيَسْتَنْجِيْ بِهَا وَرِجْلًا يَمْشِيْ عَلَيْهَا، وَبِهٰذَا حَاجَّ بَقِيَّةَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ فَحَجَّهُمْ فَانْعَقَدَ اِجْمَاعًا، وَلِاَنَّهٗ اِهْلَاكٌ مَعْنًى لِمَا فِيْهِ مِنْ تَفْوِيْتِ جِنْسِ الْمَنْفَعَةِ وَالْحَدُّ زَاجِرٌ، وَلِاَنَّهٗ نَادِرُ الْوُجُوْدِ وَالزَّجْرُ فِيْمَا يَغْلِبُ وُقُوْعُهٗ بِخِلَافِ الْقِصَاصِ لِاَنَّهٗ حَقُّ الْعَبْدِ فَيُسْتَوْفٰى مَا اَمْكَنَ جَبْرًا لِحَقِّهٖ. وَالْحَدِيْثُ طَعَنَ فِيْهِ الطَّحَاوِيُّ رَحِمَهُ اللّٰهُ اَوْ نَحْمِلُهٗ عَلَى السِّيَاسَةِ ـ

অনুবাদ : যদি দ্বিতীয়বার চুরি করে তাহলে বাম পা কর্তন করা হবে। কিন্তু তৃতীয়বার চুরি করলে আর কর্তন করা হবে না; বরং তওবা করা পর্যন্ত জেলখানায় আটকে রাখা হবে। অধিক কর্তন না করা সূক্ষ্ম কিয়াসের দাবি। মাশায়েখগণ বলেছেন, সেই সাথে সাধারণ শাস্তিও দেওয়া হবে।

তৃতীয় দফা চুরির ক্ষেত্রে ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন, তার বাম হাত কাটা হবে চতুর্থ দফায় ডান পা কাটা হবে। কেননা রাসূল ﷺ বলেছেন– مَنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوْهُ فَاِنْ عَادَ فَاقْطَعُوْهُ فَاِنْ عَادَ فَاقْطَعُوْهُ

যে চুরি করে তার কর্তন কর, যদি আবার চুরি করে আবার কর্তন কর। যদি আবার চুরি করে আবার কর্তন কর। হাদীসটি সবিস্তারে বর্ণিত আছে। ইমাম শাফেয়ী (র.) এর মাযহাবের অনুরূপ।

তাছাড়া অপরাধের ক্ষেত্রে তৃতীয়টি প্রথমটিরই সমতুল্য; বরং তার চেয়েও অধিক। সুতরাং হদ্দ প্রবর্তনের জন্য তা অধিকতরযোগ্য। আমাদের দলিল হলো, এ সম্পর্কে হযরত আলী (রা.) এর বাণী–

اِنِّيْ لَاَسْتَحِيْ مِنَ اللّٰهِ اَنْ لَا اَدَعَ لَهٗ يَدًا يَاْكُلُ بِهَا وَيَسْتَنْجِيْ بِهَا وَ رِجْلًا يَمْشِيْ بِهَا ـ

অর্থাৎ এ বিষয়ে আমি আল্লাহকে লজ্জা করি যে, তার জন্য একটি হাতও রেখে দেবো না, যার দ্বারা সে আহার করবে এবং ইস্তিঞ্জা করবে, তদ্রূপ একটি পাও রেখে দেবো না, যার দ্বারা যে হাঁটা চলা করবে।

এই যুক্তি নিয়ে তিনি অন্যান্য সাহাবাদের সঙ্গে আলোচনা করেন। আর তারা এ যুক্তির গ্রহণ করেন। সুতরাং এর উপর ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। আর এরূপ করা গুণগত ভাবে ধ্বংস করার নামান্তর। কেননা এতে অঙ্গেও সমগ্রহ উপকার যোগ্যতা বিনষ্ট করা হয়। অথচ হদ্দের উদ্দশ্য হচ্ছে শাসন, ধ্বংস সাধন নয়। প্রয়োজন ঐ সকল ক্ষেত্রে, যা বরাচর ঘটে।

কিসাসের বিষয়টি ভিন্ন। (সেখানে অঙ্গের বদলে অঙ্গ কর্তন হতে থাকবে) কেননা এটা হলো বান্দার হক। সুতরাং বান্দার হক রক্ষা করার জন্য যতটা সম্ভব পূর্ণভাবে আদায় করেও নেওয়া হবে।

আর বর্ণিত হাদীসটির প্রামাণ্যতা সম্পর্কে ইমাম ত্বাহাবী (র) আপত্তি উথাপন করেছেন অথবা আমরা এটাকে প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড রূপে ধরে নিব ।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কোনো চোর যদি তৃতীয়বার, চতুর্থবার চুরি করে তাহলে তার শাস্তি কি হবে? এ নিয়ে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। আহনাফের মতে, তৃতীয়বার ও চতুর্থবার চুরি করলে কোনো অঙ্গ কর্তন করা হবে না। বরং জেলে আটকে রাখা হবে। সঠিক অর্থে তাওবা করলে, ভালো হয়ে গেলে ছেড়ে দেওয়া হবে। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে তৃতীয়বার চুরি করলে বাম হাত কাটা হবে এবং চতুর্থবার চুরি করলে ডান পা কেটে দেওয়া হবে।

ইমাম শাফেয়ী (র.) এর দলিল পর্ব :

দলিল ১. রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী- مَنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوْهُ، فَإِنْ عَادَ فَاقْطَعُوْهُ، فَإِنْ عَادَ فَاقْطَعُوْهُ যে ব্যক্তি চুরি করে, তোমরা তার কর্তন কর। পুনরায় চুরি করলে পুনরায় কর্তন কর। পুনরায় চুরি করলে পুনরায় কর্তন কর। উক্ত হাদীসটি ইমাম আবূ দাউদ তার সুনানে নিম্নরূপ বর্ণনা করেছেন-

عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ جِيْءَ بِسَارِقٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اُقْتُلُوْهُ فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّمَا سَرَقَ قَالَ اِقْطَعُوْهُ فَقُطِعَ ثُمَّ جِيْءَ بِهِ الثَّانِيَةَ فَقَالَ اُقْتُلُوْهُ فَقَالُوا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّمَا سَرَقَ قَالَ اقْطَعُوْهُ فَقُطِعَ ثُمَّ جِيْءَ بِهِ الثَّالِثَةَ فَقَالَ اُقْتُلُوْهُ فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّمَا سَرَقَ قَالَ اقْطَعُوْهُ فَقُطِعَ ثُمَّ جِيْءَ بِهِ الرَّابِعَةَ فَقَالَ اُقْتُلُوْهُ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّمَا سَرَقَ قَالَ اِقْطَعُوْهُ فَقُطِعَ ثُمَّ جِيْءَ بِهِ الْخَامِسَةَ فَقَالَ اُقْتُلُوْهُ قَالَ جَابِرٌ (رض) فَانْطَلَقْنَا فَقَتَلْنَاهُ ثُمَّ اجْتَرَرْنَاهُ فَأَلْقَيْنَاهُ فِي الْبِئْرِ وَرَمَيْنَا عَلَيْهِ الْحِجَارَةَ.

অর্থ : মুসআব ইবনে সাবেত, মুহাম্মদ ইবনুল মুনকাদির হতে তিনি হযরত জাবের (রা.) হতে। তিনি বলেন, একবার রাসূল ﷺ এর কাছে একটি চোর ধরে আনা হলো। তিনি ﷺ বললেন, তোমরা তাকে হত্যা কর। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সে তো চুরি করেছে। তখন তিনি ﷺ বললেন, তাহলে তোমরা তার কর্তন কর। কর্তন করা হলে চোরটিকে দ্বিতীয়বার ধরে আনা হলো। তিনি ﷺ বললেন, তোমরা তাকে হত্যা কর। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! ﷺ সে তো চুরি করেছে। তখন তিনি ﷺ বললেন, তাহলে তোমরা তার কর্তন কর। কর্তন করা হলো। চোরটিকে তৃতীয়বার ধরে আনা হলো। তিনি বললেন, তোমরা তাকে হত্যা কর। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সেতো চুরি করেছে। তখন তিনি বললেন, তাহলে তোমরা তার কর্তন কর। কর্তন করা হলো। চোরটিকে চতুর্থবার ধরে আনা হলো। তিনি ﷺ বললেন, তোমরা তাকে হত্যা কর। সাহাবীগণ বললেন, সে তো চুরি করেছে মাত্র। তখন তিনি ﷺ বললেন, তাহলে তোমরা তার কর্তন কর। কর্তন করা হলো। চোরটিকে পঞ্চমবার ধরে আনা হলো, তিনি ﷺ বললেন, তোমরা তাকে হত্যা কর। তাই আমরা চললাম অতঃপর তাকে হত্যা করলাম। তারপর টেনে নিয়ে একটি কূপে ফেলে দিলাম এবং তার উপর পাথর নিক্ষেপ করলাম।

উল্লেখ্য যে, এ হাদীসে দেখা গেল নবী করীম ﷺ তৃতীয় ও চতুর্থবার চোরের হাত-পা কর্তন করার আদেশ করেছেন এবং সে মতে কর্তন করাও হয়েছে। তাই ইমাম শাফেয়ী (র.) এ হাদীসের অনুরূপ মত পোষণ করে বলেন, তৃতীয়বার বাম হাত এবং চতুর্থবার ডান পা কর্তন করা হবে।

দলিল ২. তৃতীয়বার ও চতুর্থবারের চুরিটি অপরাধগত বিবেচনায়, প্রথমবারের চুরির মতোই। অর্থাৎ প্রথমবার যা করেছিল তা যেমন চুরি, তৃতীয়বার এবং চতুর্থবার যা করেছে তাও তেমনি চুরি। অতএব, চুরির অপরাধ হিসাবে প্রথমবার, দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার, চতুর্থবার সবগুলোই সমান। বরং প্রথমবারের তুলনায় পরবর্তীগুলো বেশি মারাত্মক। কারণ প্রথমবার চুরি করার সময় সে হয়তো চুরির শাস্তি সম্পর্কে জানত না। তাই চুরি করে ফেলেছিল। কিন্তু একবার চুরি করার পর যখন তার হাত কেটে দেওয়া হলো তখন সে শাস্তি সম্পর্কে জানতে পারল এবং তা ভোগও করল। এরপর যদি সে দ্বিতীয়বার চুরি করে তাহলে বুঝা যায়, আসলেই সে অত্যন্ত নির্লজ্জ ও নির্ভীক। তার পর আবার তৃতীয় দফা চুরি করলে তো আরো জঘন্য ব্যাপার। চতুর্থ দফা আরো ভয়াবহ।

অতএব, প্রথমবার ও দ্বিতীয়বার চুরির দায়ে যদি হাত পা কাটা যায়, তাহলে তৃতীয় ও চতুর্থবার চুরি করার কারণে হাত পা কাটা উত্তমরূপে বৈধ হওয়া আবশ্যক। তাই ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, তৃতীয়বার চুরি করলে বাম হাত ও চতুর্থবার চুরি করলে ডান পা কেটে দেওয়া হবে।

আহনাফের দলিল পর্ব :

দলিল ১. হযরত আলী (রা.) এর উক্তি-

إِنِّيْ لَأَسْتَحْيِيْ مِنَ اللّٰهِ أَنْ لَا أَدَعَ لَهُ يَدًا يَأْكُلُ بِهَا وَيَسْتَنْجِيْ بِهَا وَرِجْلًا يَمْشِيْ عَلَيْهَا ـ

https://e-ilm.weebly.com/

আমি আল্লাহকে এ বিষয়ে লজ্জা করি যে, আমি তার জন্য একটি হাত রেখে দেবো না, যা দ্বারা সে আহার করবে, ইস্তিঞ্জা করবে এবং একটি পা রেখে দেবো না যার উপর ভর করে সে হাটা চলা করবে।

এ আছারটি ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান (র.) কিতাবুল আছার নামক গ্রন্থে এভাবে বর্ণনা করেছেন-

اَخْبَرَنَا اَبُوْ حنِيْفَة الْاِمَامُ عنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّة عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ (رض) قَالَ اِذَا سَرَقَ السَّارِقُ قُطِعَتْ يَدُ الْيُمْنٰى فَاِنْ عَادَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرٰى فَاِنْ عَادَ ضَمَّنْتُهُ السِّجْنَ حَتّٰى يُحْدِثَ خَيْرًا اِنِّيْ اَسْتَحْيِيْ عَلَى اللّٰهِ اَنْ اَدَعَهُ لَيْسَ لَهُ يَدٌ يَأْكُلُ اَوْ يَسْتَنْجِيْ بِهَا وَرِجْلٌ يَمْشِيْ عَلَيْهَا.

অর্থ : ইমাম আবূ হানীফা (র.) আমর ইবনে মুররা হতে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে সালামাহ হতে তিনি হযরত আলী (রা.) হতে- তিনি বলেন, যখন কোনো চোর চুরি করে, তখন তার ডান হাত কেটে দিতে হবে। পুনরায় চুরি করলে তার বাম পা কেটে দিতে হবে। পুনরায় চুরি করলে তাকে কারাগারে আটকে রাখা হবে, যতক্ষণ না তার মাঝে ভালো হওয়ার লক্ষণ প্রকাশ পায়। আমি এ বিষয়ে আল্লাহকে লজ্জা করি যে, তাকে এমন বানিয়ে ছাড়ব যে, তার একটি হাতও নেই, যা দ্বারা সে খেতে পারে ইস্তেঞ্জা করতে পারে। একটি পাও নেই যার উপর ভর করে সে হাটতে পারে।!

এ হাদীসটি আব্দুর রায্যাক ইবনে আবী শায়বাহ ও সাঈদ ইবনে মানসূর সহ আরো অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ নিজ নিজ কিতাবে বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া অনুরূপ উক্তি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকেও বর্ণিত আছে। যেমন ইবনে আবী শায়বাহ বর্ণনা করেছেন-

اَنَّ نَجْدَةَ كَتَبَ اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) يَسْأَلُهُ عَنِ السَّارِقِ فَكَتَبَ اِلَيْهِ بِمِثْلِ قَوْلِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ.

অর্থাৎ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এর নিকট চোরের বিধান জিজ্ঞাসা করেন নাজদা পত্র পাঠাল। উত্তরে হযরত ইবনে আব্বাস (র.) হযরত আলী (রা.) এর অনুরূপ উক্তি লিখে পাঠালেন। ইবনে আবী শায়বায় আরো বর্ণনা করেছেন-

عَنْ مَكْحُوْلٍ اَنَّ عُمَرَ (رض) قَالَ اِذَا سَرَقَ فَاقْطَعُوْا يَدَهُ ثُمَّ اِنْ عَادَ فَاقْطَعُوْا رِجْلَهُ وَلَا تَقْطَعُوْا يَدَهُ الْاُخْرٰى وَذَرُوْهُ يَأْكُلُ بِهَا وَيَسْتَنْجِيْ بِهَا وَلٰكِنْ اِحْبِسُوْهُ عَنِ الْمُسْلِمِيْنَ.

মাকহুল হতে বর্ণিত যে, হযরত ওমর (রা.) বলেছেন, কেউ চুরি করলে, তোমরা তার হাত কেটে দাও। পুনরায় চুরি করলে তোমরা তার পা কেটে দাও। তার অন্য হাতটি কেটো না; বরং তার একটি হাত রেখে দাও, যেন সে এর দ্বারা আহার করতে পারে এবং ইস্তিঞ্জা করতে পারে। তবে তোমরা তাকে মুসলিম সমাজ হতে পৃথক করে জেলে আটকে রাখ। এসব সাহাবীদের উক্তি মোতাবেকে আহনাফ বলেন, তৃতীয়বার ও চতুর্থবার চুরি করলে হাত পা কর্তন করা হবে না।

দলিল ২. ইজমায়ে সাহাবা। হযরত ওমর (রা.) নিজ শাসনকালে একবার একটি চোরের শাস্তি নিয়ে সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করেন। ফলে সাহাবীগণ হযরত আলী (রা.)-এর মতে একমত হয়ে যান। এই ইজামায়ে সাহাবার বিষয়টি বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। যেমন-

১. ইবনে আবী শায়বাহ নিজ মুসান্নাফে উল্লেখ করেছেন-

عَنْ سِمَاكٍ عَنْ بَعْضِ اَصْحَابِهِ اَنَّ عُمَرَ (رض) اِسْتَشَارَهُمْ فِيْ سَارِقٍ فَاَجْمَعُوْا عَلٰى مِثْلِ قَوْلِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ.

কতিপয় উস্তাদ হতে বর্ণনা করেন যে, হযরত ওমর (রা.) তাদের (সাহাবীগণ) সাথে একটি চোরের বিষয়ে পরামর্শ করেন, তখন তারা হযরত আলী (রা.)-এর কথার উপর একমত পোষণ করেন।

২. সাঈদ ইবনে মনসূর বর্ণনা করেছেন এভাবে-

حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْشَرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ حَضَرْتُ عَلِيَّ بْنَ اَبِيْ طَالِبٍ (رض) وَقَدْ اُتِيَ بِرَجُلٍ مَقْطُوْعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ قَدْ سَرَقَ فَقَالَ لِاَصْحَابِهِ مَاتَرَوْنَ فِيْ هٰذَا قَالُوْا اقْطَعْهُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَ قَتَلْتُهُ اِذًا وَمَا عَلَيْهِ الْقَتْلُ بِاَيِّ شَيْءٍ يَأْكُلُ الطَّعَامَ؟ بِاَيِّ شَيْءٍ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلٰوةِ؟ بِاَيِّ شَيْءٍ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ؟ بِاَيِّ شَيْءٍ يَقِفُ عَلٰى حَاجَتِهِ؟ فَرَدَّهُ اِلَى السِّجْنِ اَيَّامًا ثُمَّ اَخْرَجَهُ فَاسْتَشَارَ اَصْحَابَهُ فَقَالُوْا مِثْلَ قَوْلِهِمُ الْاَوَّلِ - فَقَالَ لَهُمْ مِثْلَ مَا قَالَ الْاَوَّلَ فَجَلَدَهُ جَلْدًا شَدِيْدًا ثُمَّ اَرْسَلَهُ.

অর্থ : আবূ মা'শার সাঈদ হতে, তিনি নিজ পিতা আবূ সাঈদ আল মাকবুরী হতে, তিনি বলেন, আমি একবার হযরত আলী (রা.) এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম, ইতোমধ্যে একহাত একপা কাটা একটি লোক হাজির করা হলো, যে কিনা চুরি করেছে। অতপর হযরত আলী (র.) তার সাথিবর্গকে সম্বোধন করে বলেন, এ লোকটির ব্যাপারে তোমরা কী অভিমত দাও?

https://e-ilm.weebly.com/

তারা বলল, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি তার হাত কর্তন করুন। হযরত আলী (রা.) বললেন, তাহলে তো আমি তাকে হত্যাই করে ফেললাম অথচ হত্যা তার শাস্তি নয়। সে কীভাবে খানা খাবে, সে কীভাবে নামাজের জন্য ওজু করবে? সে ফরজ গোসল কীভাবে করবে, সে নিজের প্রয়োজন কীভাবে মিটাবে? এরপর তিনি তাকে কারাগারে পাঠিয়ে দিলেন কিছুদিন পর পুনরায় তাকে বের করে আনলেন। সাথিবর্গের নিকট আবার পরামর্শ চাইলেন। সাথিবর্গ এবারও পূর্বের মতোই পরামর্শ দিলেন এবং হযরত আলী (রা.)ও পূর্বের মতোই জবাব দিলেন। এরপর তিনি তাকে শক্ত পিটুনি লাগিয়ে ছেড়ে দিলেন।-(নসবুররায়াহ দ্রষ্টব্য)

দলিল ৩. তৃতীয়বার চুরির দায়ে যদি চোরের বাম হাত কর্তন করা হয়, তাহলে পরোক্ষভাবে তাকে হত্যা করা হয়। কেননা মানুষের দুটি হাত কেটে দিলে তার কোনো উপকার যোগ্যতা অবশিষ্ট থাকে না। এ কারণেই অন্যায়ভাবে কোনো গোলামের হস্তদ্বয় কর্তন করলে এর জরিমানা স্বরূপ পূর্ণ গোলামের মূল্য পরিশোধ করতে হয়। এর দ্বারা বুঝা যায় দুই হাত ধ্বংস করা ব্যক্তিকে ধ্বংস করার নামান্তর। আর চোরের শাস্তি তাকে হত্যা বা ধ্বংস করা নয়। বিধায় তার বাম হাত ও ডান পা কর্তন করা যাবে না।

দলিল ৪. প্রথমবার চুরির দায়ে ডান হাত দ্বিতীয় বার চুরির দায়ে বাম পা কাটার পরেও তৃতীয় বার চুরি করার অপরাধ মানুষের দ্বারা সংঘটিত হওয়া অত্যন্ত বিরল। সচরাচর এমনটা ঘটে না। অতএব, বিরল অপরাধের জন্য হদ্দ বৈধ করার প্রয়োজন নেই। হদ্দের বিধান যেসব অপরাধের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যেসব অপরাধ প্রায়ই সংঘটিত হয়। অতএব, কারোর উপর দু'বার হদ্দ কার্যকর করার পর তৃতীয়বার একই অপরাধ সংঘটিত হওয়া বিরল হওয়ার কারণে হদ্দ মাশরু বা বিধিবদ্ধ না হওয়াই যুক্তিযুক্ত।

ইমাম শাফেয়ী (র.) এর দলিলের জবাব :

১. ইমাম শাফেয়ী (র.) হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত যে হাদীসটি পেশ করেছেন, সেটি দলিল হওয়ার উপযুক্ত নয়। কেননা হাদীসটি মুনকার এবং হাদীসটির অন্যতম রাবী মুসআব ইবনে সাবেত শক্তিশালী রাবী নন। হাদীসটি সম্পর্কে এ মন্তব্য স্বয়ং ইমাম নাসায়ী (র.) করেছেন, তাছাড়া অন্যান্য মুহাদ্দিস ও হাদীসটি দুর্বল হওয়ার বিষয়ে নানারূপ মন্তব্য করেছেন। যেমন ইবনে আব্দুল বার বলেছেন, চোর হত্যা করা সম্পর্কিত হাদীস মুনকার। এর কোনো আসল বা ভিত্তি নেই। ইমাম ত্বহাবী (র.) বলেছেন, আমরা বহু অনুসন্ধানের পরেও এ সম্পর্কে কোনো সহীহ হাদীস পাইনি। আল্লামা খাত্তাবী (র.) বলেছেন, কোনো ইমাম চোর হত্যা করা জায়েজ করেছেন বলে আমার জানা নেই। ইমাম নাসায়ী (র.) একথাও বলেছেন, এ বিষয়ে কোনো সহীহ হাদীস আছে বলে আমি জানি না। মোটকথা মুহাদ্দিসগণের উক্তিসমূহের আলোকে এটাই প্রমাণিত হয় যে- তৃতীয়বার, চতুর্থবার হাত পা কাটা ও পঞ্চমবার হত্যা সম্পর্কিত হাদীসটি বিশুদ্ধ নয়। তাই এটা প্রমাণ হওয়ারও উপযুক্ত নয়।

জবাব ২. হাদীসটি যদি সহীহ বলে মেনে নেওয়া হয়, তাহলে হাদীসটি সিয়াসাতের উপর প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ বলা হবে, হাদীসে যা বলা হয়েছে তা কোনো শরয়ি দণ্ডবিধি নয়। বরং তা হলো শাসকের সাময়িক বিশেষ সিদ্ধান্ত। অতএব, যে কোনো চোর তৃতীয়বার চুরি করলেই তার বাম হাত কাটা যাবে না। বরং কোনো চোরের ক্ষেত্রে যদি শাসক মনে করে যে, তার বাম হাতও কেটে দেওয়া কর্তব্য অন্যথায় সে সংশোধন হবে না, তাহলে তা'যীর হিসাবে শাসক তা করতে পারবে। এমন কি তা'যীর হিসাবে শাসক তা করতে পারবে এমন কি তা'যীর হিসাবে হত্যাও করতে পারবে। এ জবাবটি সঠিক হওয়ার পক্ষে একটি করীনা বা দলিলও আছে, তা হলো এই যে, উক্ত হাদীসেই বলা আছে। পঞ্চমবার চুরি করার পর চোরটিকে হত্যা করা হয়েছে। এই চোরকে হত্যা করার বিষয়টি কোনো ইমামের মতেই শরয়ী হদ্দ নয়। বরং সকলেই বলেন, তা ছিল সিয়াসত তথা প্রশাসনিক সাময়িক বিশেষ সিদ্ধান্ত। অতএব, আমরা বলব, পঞ্চমবারের শাস্তিটি যেমন সিয়াসত ছিল, তেমনি চতুর্থ ও তৃতীয়বারের শাস্তিটিও সিয়াসত ছিল, শরয়ি হদ্দ বা সাধারণ দণ্ডবিধি নয়।

একটি প্রশ্ন ও তার জবাব :

প্রশ্নটি এই যে, আপনারা বলেছেন, চোরের চার হাত-পা কর্তন করা যাবে না। কারণ চারটি হাত-পা কেটে দেওয়া হলে তার উপকার যোগ্যতা সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ হয়ে যায়। অথচ দেখতে পাই, চার হাত পা কেটে দেওয়ার বিধান শরিয়তেই বিদ্যমান আছে। যেমন কেউ অন্যায়ভাবে কারো দুই হাত, দুই পা কেটে ফেলল, এমতাবস্থায় শরিয়তের বিধান হলো, যে ব্যক্তি এই জঘন্য অপরাধটি করেছে, তার চার হাত-পা কেটে দিতে হবে কিসাস হিসাবে।

জবাব : কিসাস হলো বান্দার হক। যা পরিপূর্ণ রূপে হেফাজত করা জরুরি এবং কিসাসের মধ্যে সমতা বজায় রাখা শর্ত। তাই কেউ যদি অন্যের চার হাত পা কেটে ফেলে, তাহলে তারও চার হাত পা কেটে দিতে হবে। অন্যথায় বান্দার হক আদায় হবে না। কিসাসের সমতাও বজায় থাকবে না। পক্ষান্তরে হদ্দ আল্লাহর হক। বান্দার হক নয়। অতএব, হদ্দকে কিসাসের সাথে তুলনা করা ঠিক হবে না। যদি হদ্দকে কিসাসের সাথে তুলনা করা হয়, তাহলে তা হবে قِيَاسٌ مَعَ الْفَارِقِ তথা অসামঞ্জস্য পূর্ণ তুলনা, যার কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। মুসান্নিফ (র.) بِخِلَافِ الْقِصَاصِ বলে এ প্রশ্নোত্তরের দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

وإذا كان السارق أشل اليد اليسرى أو أقطع أو مقطوع الرجل اليمنى لم يقطع لأن فيه تفويت جنس المنفعة بطشا أو مشيا، وكذا إذا كانت رجله اليمنى شلاء لما قلنا وكذا إذا كانت إبهامه اليسرى مقطوعة أو شلاء أو الإصبعان منها سوى الإبهام لأن قوام البطش بالإبهام فإن كانت أصبع واحدة سوى الإبهام مقطوعة أو شلاء قطع لأن فوات الواحدة لا يوجب خللا ظاهرا في البطش، بخلاف فوات الإصبعين لأنهما يتنزلان منزلة الإبهام في نقصان البطش .

অনুবাদ : চোরের বাম হাত যদি অবশ হয় কিংবা কর্তিত হয়। কিংবা ডান পা যদি কর্তিত হয়, তাহলে তার হস্তকর্তন করা হবে না। কেননা এতে ধরা বা চলার ক্ষেত্রে সমস্ত উপকার যোগ্যতা বিনষ্ট করা হয়। তদ্রূপ হুকুম যদি তার ডান পা অবশ হয়। আমাদের বর্ণিত কারণে।

তেমনি হস্তকর্তন করা হবে না যদি বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি কর্তিত হয় কিংবা অবশ হয় কিংবা বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি ছাড়া অন্য দু'টি আঙ্গুলি (অবশ বা কর্তিত হয়)। কেননা ধারণ শক্তি বৃদ্ধাঙ্গুলির উপর নির্ভরশীল।

আর বৃদ্ধাঙ্গুলি ছাড়া যদি একটি মাত্র আঙ্গুলি অবশ বা কর্তিত হয়, তাহলে হস্ত কর্তন করা হবে। কেননা এক আঙ্গুলি নষ্ট হওয়া বাহ্যত ধারণ শক্তির মাঝে কোনোত্রুটি সৃষ্টি করে না। দুই আঙ্গুল নষ্ট হওয়ার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা ধারণ শক্তির ক্ষুন্নতার ক্ষেত্রে দুটি আঙ্গুল বৃদ্ধাঙ্গুলির সমপর্যায়ে গণ্য হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিউক্ত ইবারতে কতকগুলো সুরত আলোচিত হয়েছে। এসব সুরতে চোরের হাত পা কর্তনের শাস্তি মওকুফ হয়ে যায়

১. চোরের বাম হাত যদি অবশ কিংবা কর্তিত হয়, তাহলে তার ডান হাত কাটা হবে না।

২. চোরের ডান পা যদি অবশ কিংবা কর্তিত হয় তাহলে তার বাম পা কাটা যাবে না।

৩. চোরের বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলিটি যদি অবশ কিংবা কর্তিত হয়, তাহলেও তার ডান হাত কাটা হবে না।

৪. চোরের বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি ব্যতীত অন্য দু'টি আঙ্গুলি যদি অবশ কিংবা কর্তিত হয়, তাহলেও তার ডান হাত কাটা হবে না।

এ সকল সুরতে শাস্তি রহিত হওয়ার কারণ হলো, ধরা ও চলার ক্ষমতা বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া। কেননা বাম হাত কিংবা বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি কিংবা দুই আঙ্গুলি অবশ অথবা কর্তিত থাকলে একহাত তার এমনিতেই ক্ষমতাহীন। এমতাবস্থায় যদি অপর হাতটিও কেটে ফেলা হয়, তাহলে তার কোনো কিছু ধরার ক্ষমতা একেবারেই শেষ হয়ে যায়। আর ডান পা কর্তিত কিংবা অবশ থাকা অবস্থায়, যদি তার বাম পাটিও কেটে দেওয়া হয়, তাহলে তার চলার ক্ষমতা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যায়। অতএব, উপরিউক্ত অবস্থাসমূহে চোরের হাত পা কাটা হবে না। ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন, উপরিউক্ত অবস্থাগুলোতেও চোরের শাস্তি রহিত হবে না। স্বাভাবিকভাবেই কার্যকর হবে।

ইমাম আহমদ (র.) হতে দু'রকম বর্ণনা রয়েছে। একটি বর্ণনা মতে তার মত আহনাফের মতের অনুরূপ, অপর বর্ণনা অনুযায়ী তার অভিমত শাফেয়ী ও মালেকের অভিমত সদৃশ্য।

কিছু গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা :

১. যে ব্যক্তিকে হদ্দ কার্যকর করার দায়িত্বে নিয়োগ করা হয়, তাকে হাদ্দাদ বলে। যে ব্যক্তি জালদ (বেত্রাঘাত) প্রয়োগ করে তাকে জাল্লাদ বলা হয়।

২. চোরের হাত কাটার পর তা দাগিয়ে দেওয়ার জন্য যে ফুটানো তেল প্রয়োজন হয় সেই তেলের মূল্য এবং হাদ্দাদের পারিশ্রমিক চোরের দায়িত্বে বর্তাবে। যে ব্যক্তি সাক্ষীদেরকে একত্র করবে, তার পারিশ্রমিক বাইতুল মাল থেকে বহন করা হবে। কেউ কেউ বলেছেন, বাদী-বিবাদীর মধ্যে যে মিথ্যাবাদী বা অন্যায়কারী বলে প্রমাণিত হবে, সেই তা বহন করবে। মতটি সর্বাধিক বিশুদ্ধ। (বাহ্‌রুর রায়েক)

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ وَاِذَا قَالَ الْحَاكِمُ لِلْحَدَّادِ اقْطَعْ يَمِيْنَ هٰذَا فِيْ سَرِقَةٍ سَرَقَهَا فَقَطَعَ يَسَارَهُ عَمْدًا اَوْ خَطَأً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى، وَقَالَا لَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي الْخَطَاِ وَيَضْمَنُ فِي الْعَمْدِ وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللّٰهُ : يَضْمَنُ فِي الْخَطَاِ اَيْضًا وَهُوَ الْقِيَاسُ، وَالْمُرَادُ بِالْخَطَاِ هُوَ الْخَطَأُ فِي الْاِجْتِهَادِ، وَاَمَّا الْخَطَأُ فِيْ مَعْرِفَةِ الْيَمِيْنِ وَالْيَسَارِ لَا يُجْعَلُ عَفْوًا. وَقِيْلَ يُجْعَلُ عُذْرًا اَيْضًا .لَهُ اَنَّهُ قَطَعَ يَدًا مَعْصُوْمَةً وَالْخَطَأُ فِيْ حَقِّ الْعِبَادِ غَيْرُ مَوْضُوْعٍ فَيَضْمَنُهَا . قُلْنَا اِنَّهُ اَخْطَاَ فِيْ اِجْتِهَادِهِ، اِذْ لَيْسَ فِي النَّصِّ تَعْيِيْنُ الْيَمِيْنِ، وَالْخَطَأُ فِي الْاِجْتِهَادِ مَوْضُوْعٌ . وَلَهُمَا اَنَّهُ قَطَعَ طَرَفًا مَعْصُوْمًا بِغَيْرِ حَقٍّ وَلَا تَاْوِيْلٍ لِاَنَّهُ تَعَمَّدَ الظُّلْمَ فَلَا يُعْفٰى وَاِنْ كَانَ فِي الْمُجْتَهَدَاتِ، وَكَانَ يَنْبَغِي اَنْ يَجِبَ الْقِصَاصُ اِلَّا اَنَّهُ امْتَنَعَ لِلشُّبْهَةِ . وَلِاَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ اَنَّهُ اَتْلَفَ وَاَخْلَفَ مِنْ جِنْسِهِ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ فَلَا يُعَدُّ اِتْلَافًا كَمَنْ شَهِدَ عَلٰى غَيْرِهِ بِبَيْعِ مَالِهِ بِمِثْلِ قِيْمَتِهِ ثُمَّ رَجَعَ،

অনুবাদ : গ্রন্থকার বলেন, শাসক যদি হদ্দ প্রয়োগকারীকে বলেন যে একটি কৃত চুরির অপরাধে তুমি এর ডান হাত কেটে ফেল। কিন্তু সে ইচ্ছাকৃতভাবে কিংবা ভুলক্রমে তার বাম হাত কেটে ফেলল, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তার উপর কোনো কিছু নেই। আর সাহেবাইন (র.) বলেন, ভুলক্রমে কর্তনের ক্ষেত্রে তার উপর কোনো দণ্ড আসবে না। কিন্তু ইচ্ছাকৃত কর্তনের সে ক্ষতিপূরণ দিবে।

ইমাম যুফার (র.) বলেন, ভুলের ক্ষেত্রেও ক্ষতিপূরণ দিবে। আর এটাই কিয়াসের দাবি। এখানে ভুল দ্বারা উদ্দেশ্য ইজতিহাদগত ভুল। পক্ষান্তরে ডান ও বাম চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে ভুল করা মার্জনাযোগ্য নয়। অবশ্য কারো কারো মতে এটাও ওজর হিসাবে গণ্য হবে। ইমাম যুফার (র.)-এর দলিল এই যে, একটি নিরপরাধ হাত সে কর্তন করেছে। আর বান্দার হকের ক্ষেত্রে ভুল মার্জনীয় নয়। সুতরাং তাকে কর্তিত হাতের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

আমাদর দলিল এই যে, যেহেতু কুরআনের বাণীতে ডান হাত নির্ধারিত নেই সেহেতু এটা তার ইজতিহাদগত ভুল। আর (শরিয়তের দৃষ্টিতে) ইজতিহাদগত ভুল মার্জনীয়।

সাহেবাইনের দলিল এই যে, সে নাহকভাবে একটি নিরপরাধ অঙ্গ কর্তন করেছে। (আর যেহেতু এটি ভুলক্রমে নয়, সেহেতু) বিকল্প ব্যাখ্যার অবকাশ নেই। কেননা ইচ্ছাকৃতভাবে জুলুম করেছে। সুতরাং তা মাফ করা হবে না। যদিও এটি ইজতিহাদযোগ্য ক্ষেত্রে হয়। অবশ্য তাতে কিসাস সাব্যস্ত হওয়ার কথা। কিন্তু সন্দেহের অবকাশ থাকার কারণে কিসাস রহিত হয়েছে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল এই যে, সে একটি অঙ্গ নষ্ট করেছে, কিন্তু তার সমগোত্রীয় এবং তার চেয়ে উত্তম একটি অঙ্গ (ডানহাত রেখে দিয়েছে। সুতরাং এটাকে নষ্ট করা গণ্য করা হবে না। যেমন কেউ অন্য একজনের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিল যে, সে তার কোনো মাল সমমূল্যে বিক্রি করেছে, এরপর সে সাক্ষ্য প্রত্যাহার করল।

https://e-ilm.weebly.com/

وَعَلٰى هٰذَا لَوْ قَطَعَهُ غَيْرُ الْحَدَّادِ لَا يَضْمَنُ اَيْضًا هُوَ الصَّحِيْحُ .وَلَوْ اَخْرَجَ السَّارِقُ يَسَارَهُ وَقَالَ هٰذِهٖ يَمِيْنِيْ لَا يَضْمَنُ بِالْاِتِّفَاقِ لِاَنَّ قَطْعَهُ بِاَمْرِهٖ . ثُمَّ فِي الْعَمْدِ عِنْدَهُ عَلَيْهِ ضَمَانُ الْمَالِ لِاَنَّهُ لَمْ يَقَعْ حَدًّا .وَفِي الْخَطَاِ كَذٰلِكَ عَلٰى هٰذِهِ الطَّرِيْقَةِ، وَعَلٰى طَرِيْقَةِ الْاِجْتِهَادِ لَا يَضْمَنُ . وَلَا يُقْطَعُ السَّارِقُ اِلَّا اَنْ يَحْضُرَ الْمَسْرُوْقُ مِنْهُ فَيُطَالِبُ بِالسَّرِقَةِ لِاَنَّ الْخُصُوْمَةَ شَرْطٌ لِظُهُوْرِهَا، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الشَّهَادَةِ وَالْاِقْرَارِ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ فِي الْاِقْرَارِ، لِاَنَّ الْجِنَايَةَ عَلٰى مَالِ الْغَيْرِ لَا تَظْهَرُ اِلَّا بِخُصُوْمَتِهٖ، وَكَذَا اذَا غَابَ عِنْدَ الْقَطْعِ عِنْدَنَا، لِاَنَّ الْاِسْتِيْفَاءَ مِنَ الْقَضَاءِ فِي بَابِ الْحُدُوْدِ

অনুবাদ : এই ভিত্তিতে বলা যায় যে, হদ্দ প্রয়োগকারী ছাড়া অন্য কেউ কর্তন করলেও ক্ষতিপূরণ আসবে না। এটাই বিশুদ্ধ মত। আর চোর যদি বাম হাত বের করে বলে যে, এটা আমার ডান হাত, তাহলে সর্বসম্মতিক্রমেই ক্ষতিপূরণ আসবে না। কেননা সে তার নির্দেশ ক্রমেই কর্তন করেছে। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মতে ইচ্ছাকৃত কর্তনের ক্ষেত্রে চোরের উপর চুরিকৃত মালের ক্ষতিপূরণ সাব্যস্ত হবে। কেননা বাম হাতের কর্তন হদ্দরূপে সম্পন্ন হয়নি। আর ভুলক্রমে কর্তনের ক্ষেত্রে (হদ্দরূপে কর্তিত হয়নি) এই দৃষ্টিকোণ থেকে (চোরের উপর) ক্ষতিপূরণ সাব্যস্ত হবে। পক্ষান্তরে ইজতিহাদগত ভুলের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ সাব্যস্ত হবে না।

যার মাল চুরি হয়েছে, তার উপস্থিতি এবং তার পক্ষ হতে চুরির অভিযোগ দায়ের ছাড়া চোরের হস্ত কর্তন করা হবে না। কেননা চুরির অপরাধ প্রকাশিত হওয়ার জন্য অভিযোগ উত্থাপন শর্ত। আর আমাদের নিকট সাক্ষ্য ও স্বীকারোক্তির মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। স্বীকারোক্তি দ্বারা প্রমাণিত চুরির ক্ষেত্রে ইমাম শাফেয়ী (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। কেননা অন্যের মালের ক্ষেত্রে অপরাধ সংঘটন ঐ মালের মালিকের অভিযোগ উত্থাপন ছাড়া প্রকাশিত হয় না। **তদ্রূপ আমাদের মতে কর্তনের সময় সে অনুপস্থিত থাকলে কর্তন সাব্যস্ত হবে না।** কেননা হদ্দ বিষয়ে হদ্দ কার্যকর করাটাও বিচারের আওতাভুক্ত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিউক্ত ইবারতে একটি মতভেদপূর্ণ মাসআলা আলোচিত হয়েছে হাকেম হদ্দ প্রয়োগকারীকে লক্ষ্য করে বলল, চুরির অপরাধে এ লোকটির ডান হাত কেটে দাও। হদ্দ প্রয়োগকারী (হাদ্দাদ) ভুলক্রমে কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে চোরের বাম হাত কেটে দিল। এমতাবস্থায় হাদ্দাদের উপর কোনো দিয়ত বা ক্ষতিপূরণ আসবে কি-না? ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে।

১. ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মতে হদ্দের উপর কোনো দিয়ত বা ক্ষতিপূরণ আসবে না। চোরের বামহাত ইচ্ছাকৃত কাটুক কিংবা ভুলক্রমে কাটুক।

২. সাহেবাইনের মতে ভুলক্রমে কেটে থাকলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। ইচ্ছাকৃত কাটলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

৩. ইমাম যুফার (র.) বলেন, ইচ্ছাকৃত কিংবা ভুলক্রমে যেভাবেই কেটে থাকুক, সর্বাবস্থায় ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

দলিল পর্ব : ইমাম যুফার (র.) এর দলিল হলো চোরের যে, হাতটি কর্তন করা ওয়াজিব হয়েছিল, সেটি হলো তার ডান হাত। বাম হাত নয়; বরং বাম হাতটি ছিল নিরাপদ। হাদ্দাদ এই নিরাপদ হাতটি অন্যায়ভাবে কর্তন করেছে। অতএব অবশ্যই বাম হাতের দিয়ত পরিশোধ করবে ক্ষমা করা যাবে না, কারণ বান্দার হক ক্ষমা হয় না।

https://e-ilm.weebly.com/

উক্ত দলিলের জবাব : আমরা বলব, হাদ্দাদ এ ক্ষেত্রে ইজতেহাদী ভুলের শিকার হয়েছে। সে মনে করেছে, কুরআনের আয়াতে ডান হাত কাটার কথা নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। শুধু হাত কাটতে বলা হয়েছে। অতএব, যে কোনো হাত কেটে দিলেই হলো এটি একটি ইজতিহাদী ভুল। আর ইজতিহাদী ভুল শরিয়তে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। বিধায় হাদ্দাদের কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। ইচ্ছাকৃত বাম হাত কাটলেও ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না, এর কারণ সামনে উল্লেখ করা হবে।

সাহেবাইনের দলিল : সাহেবাইন (র.) বলেন, হাদ্দাদ যখন ইচ্ছাকৃতভাবে চোরের বাম হাত কর্তন করল, তখন সে ইচ্ছাকৃত জুলুম করল। আর ইজতিহাদী বিষয়েও ইচ্ছাকৃত অপরাধ ক্ষমা করা হয় না। অতএব তার দিয়ত পরিশোধ করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে এ ক্ষেত্রে কিসাস ওয়াজিব হওয়ার কথা ছিল। কারণ সে ইচ্ছাকৃতভাবে একজনের নিরপরাধ একটি অঙ্গ কর্তন করেছে। এর শাস্তি স্বরূপ তারও সে অঙ্গটি কেটে দেওয়া-ই নিয়ম। কিন্তু কুরআনে যেহেতু ডান হাত কাটার কথা নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি; বরং সাধারণভাবে হাত কাটার কথা বলা আছে, তাই তার কাজটি বৈধ হওয়ার সন্দেহ দেখা দিয়েছে। এই সন্দেহের কারণে কিসাস রহিত হয়ে যাবে। কিন্তু দিয়ত পরিশোধ করতে হবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর দলিল হলো হাদ্দাদ ভুলক্রমে বা ইচ্ছাকৃতভাবে চোরের বাম হাত কর্তন করেছে ঠিক, কিন্তু তার চেয়েও উত্তম একটি হাত তথা ডান হাতটি রেখে দিয়েছে। কেননা বাম হাতটি কেটে ফেলার পর চুরির হদ্দ হিসাবে পুনরায় তার ডান হাত আর কাটা হবে না। তাহলে বুঝা যায়, বাম হাতটি কাটার কারণেই ডান হাতটি অক্ষত থাকছে। অন্যথায় হদ্দ হিসাবে ডান হাত কাটা পড়ত। অতএব, বাম হাতটি কেটে যেহেতু এর চেয়ে উত্তমটি রেখে দিয়েছে, সেহেতু ক্ষতিসাধন বলে গণ্য হবে না। বিধায় ক্ষতিপূরণও দিতে হবে না। যেমন কেউ যদি কারো ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয় যে, সে তার অমুক সম্পদটি অমুকের কাছে তার সমমূল্যে বিক্রি করেছে। অতঃপর উক্ত সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তাহলে তার উপর কোনো ক্ষতিপূরণ দেওয়া আবশ্যক হয় না। কারণ তার সাক্ষ্য মোতাবেক যদিও উক্ত সম্পদটি মালিকের হাত ছাড়া হয়, কিন্তু সাথে সাথে এর সমপরিমাণ মূল্য তার হাতে আসে। এ জন্যই সম্পদ হাত ছাড়া হওয়াটাকে ক্ষতিসাধন বলে গণ্য করা হয় না এবং সাক্ষ্যদাতার উপর কোনো ক্ষতিপূরণ দেওয়া আবশ্যক হয় না। অনুরূপভাবে আলোচ্য মাসআলায়ও যখন বাম হাতটি কাটার কারণে ডান হাতটি রয়ে গেল, তখন বাম হাত কাটাকে ক্ষতিসাধন বলে গণ্য করা হবে না এবং হাদ্দাদের উপর কোনো দিয়াত বা ক্ষতিপূরণ বর্তাবে না।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর দলিলের উপর ভিত্তি করে আরেকটি নতুন মাসআলা উদ্ভাবিত হয়। তা হলো এই যে, হাদ্দাদ ব্যতীত অন্য কেউ যদি চোরের বাম হাতটি কেটে ফেলে, তাহলে তার উপরও দিয়ত বা ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব না। কারণ সেক্ষেত্রেও এ কথা বলা যায় যে, বাম হাতটি কাটার কারণে তার ডান হাত অক্ষত থাকছে। বিধায় উত্তমটি রেখে দেওয়ার কারণে বাম হাত কাটার বিষয়টি ক্ষতিসাধন বলে গণ্য হবে না এবং দিয়তও ওয়াজিব হবে না।

একটি সর্বসম্মত মাসআলা : ইচ্ছাকৃতভাবে কিংবা ভুলক্রমে চোরের বাম হাত কেটে দেওয়া অবস্থায় সকল ইমাম এ ব্যাপারে একমত যে, চুরিকৃত মালামাল মালিকের ফেরত দেওয়া চোরের উপর আবশ্যক হবে। কেননা বাম হাত কাটার বিষয়টি হদ্দ নয়। যদি তা হদ্দ হতো তাহলে মাল ফেরত দিতে হতো না। কারণ হদ্দ কার্যকর হলে যেমান বাতিল হয়ে যায়। কিন্তু বাম হাত কাটা অবস্থায় যেহেতু হদ্দ কার্যকর হয়নি, তাই যেমান বহাল থাকবে অর্থাৎ চোরের পক্ষ থেকে চুরিকৃত মালামাল মালিকের হাতে ফেরত দিতে হবে।

আরেকটি সর্বসম্মত মাসআলা : শাসক যখন হাদ্দাদ কে আদেশ করল তুমি এ লোকের ডান হাতটি চুরির দায়ে কেটে দাও। তখন যদি চোর নিজের বাম হাতটি হাদ্দাদের সামনে বাড়িয়ে দিয়ে বলে যে, এটা আমার ডান হাত এবং হাদ্দাদ তা কেটে ফেলে তাহলে সকলেই বলেন, হাদ্দাদের উপর কোনো ক্ষতিপূরণ আবশ্যক হবে না। কারণ এ ক্ষেত্রে চোরের আদেশক্রমেই তার বাম হাত কাটা হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

قَوْلُهُ : وَلَا يُقْطَعُ السَّارِقُ اِلَّا اَنْ يَحْضُرَ الْمَسْرُوْقُ الخ : উপরিউক্ত মাসআলায় আহনাফের সাথে অন্যান্য ইমামগণ মতবিরোধ করেছেন।

১. আহনাফ বলেছেন, যার মাল চুরি করা হয়েছে সে উপস্থিত হয়ে শাস্তি দাবি না করলে চোরের হাত কাটা হবে না। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) ও একথা বলেন।

২. পক্ষান্তরে ইমাম মালেক আবূ সাওর ইবনুল মুনযির প্রমুখ বলেন, শাস্তি দাবি করা শর্ত নয়।

তাদের দলিল হলো, আয়াতে চোরের হাত কাটতে বলা হয়েছে। অভিযোগ দায়ের করা ও শাস্তি দাবি করার শর্ত লাগানো হয়নি। অতএব, অভিযোগ দায়ের ও শাস্তি দাবি করা ছাড়াই যদি চুরির অপবাদ প্রমাণিত হয়, তাহলে হাত কেটে দেওয়া হবে। যেমন জেনার অপরাধ প্রমাণিত হলেই হদ্দ প্রয়োগ করা হয়, কারো অভিযোগের অপেক্ষা করা হয় না।

আহনাফ, ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর দলিল হলো চুরি এমন একটি অপরাধ যা অন্যের সম্পদের উপর তার অনুমতি ছাড়া সংঘটিত হয়। এটা প্রকাশ পাওয়ার জন্য বা নিশ্চিত হওয়ার জন্য যার মাল তার পক্ষ থেকে অভিযোগ উত্থাপন শর্ত। কেননা যার মাল চুরি হয়েছে, সে যদি চুরির অভিযোগ না করে, তাহলে নানা রকম সম্ভাবনা থেকে যায়, বহু ধরনের সন্দেহ সৃষ্টি হয়। যেমন হতে পারে সে উক্ত মাল চোরের জন্য বৈধ করে দিয়েছে, তাই সে নিয়েছে। কিংবা মালিক হয়তো এ মাল মুসলমানদের জন্য ওয়াক্ফ করে রেখেছে কিংবা মালিক হয়তো চোরকে যে কোনো কারণে তার সংরক্ষণ স্থলে প্রবেশের অনুমতি দিয়েছিল অতঃপর সে ওখানে প্রবেশ করে মাল চুরি করেছে, ইত্যাদি সুরতে এটা চুরি বলে গণ্য হবে না। আর তার হাতও কাটা যাবে না। কিন্তু মালের মালিক যদি বলে, সে আমার সম্পদ চুরি করেছে, আমি তার শাস্তি দাবি করি, তাহলে কাজটি চুরি হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ থাকে না তখন নিঃসন্দেহে সংশয় মুক্তভাবে হদ্দ প্রয়োগ করা যায়। তাই আহনাফ এ শর্ত আরোপ করেছেন যে, চুরির অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার জন্য এবং চোরের হাত কাটার জন্য মালের মালিকের অভিযোগ উত্থাপন করা জরুরি। অভিযোগ উত্থাপন না করলে চোরের হাত কাটা হবে না।

ইমাম মালেক (র.) চুরি করাকে জেনার সাথে কিয়াস করেছেন। সেটা ঠিক হয়নি। কেননা মালিকের পক্ষ থেকে অনুমতি থাকলে মাল নিয়ে যাওয়া বৈধ। তা চুরি বলে গণ্য হয় না। পক্ষান্তরে যার সাথে যেনা করা হয়, তার পক্ষ থেকে অনুমতি থাকলেও জেনা বৈধ হয় না। জেনার হুরমতের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ থাকে না। তাই সে ক্ষেত্রে অভিযোগ দায়ের করার প্রয়োজন হয় না। চুরির বিষয়টি সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হোক, কিংবা চোরের নিজের স্বীকারোক্তি দ্বারা প্রমাণিত হোক উভয় অবস্থাতেই আহনাফের মতে পূর্বোক্ত শর্ত অর্থাৎ মালিকের অভিযোগ ছাড়া হাত কাটা হবে না। অতএব, সাক্ষ্য ও স্বীকারোক্তির মাঝে আহনাফের নিকট কোনো পার্থক্য নেই। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, স্বীকারোক্তির সুরতে মালিকের অভিযোগ আবশ্যক নয়। এটি ইমাম শাফেয়ীর পক্ষ হতে একটি বর্ণনা। কিন্তু বিশুদ্ধতম বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম শাফেয়ী (র.) এর মাযহাব আহনাফের অনুরূপ। অর্থাৎ তার মতেও সাক্ষ্য ও স্বীকারোক্তির মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। উভয় অবস্থাতেই চোরের হাত কাটার জন্য মালিকের পক্ষ হতে অভিযোগ উত্থাপন করা শর্ত। অভিযোগ না থাকলে কোনো অবস্থাতেই চোরের হাত কাটা যাবে না। কেননা চোর চুরির কথা স্বীকার করলেও মালিকের পক্ষ থেকে যদি অনুমতি থাকে, তাহলে তা চুরি না। অতএব, কাজটি চুরি কি চুরি না, এ ব্যাপারে সংশয়মুক্ত হওয়ার একমাত্র পন্থা হলো মালিকের পক্ষ থেকে অভিযোগ উত্থাপন। মালিক যদি অভিযোগ করে যে, সে আমার মাল চুরি করেছে, তাহলে তার কাজটি চুরি বলে নিশ্চিত হওয়া যাবে এবং সংশয়মুক্ত অবস্থায় হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে। অভিযোগ না থাকলে সংশয় থাকবে। আর এটা প্রসিদ্ধ কথা যে, সংশয় মাত্রই হদ্দ বাতিল করে দেয়।

হুদূদ কার্যকর করার ব্যাপারটিও কাযা তথা বিচারের মতো। অতএব, বিচার যেমন বাদীর উপস্থিতি ছাড়া হয় না। তেমনি তার উপস্থিতি ছাড়া হদ্দ কার্যকরও করা যায় না। তাই গ্রন্থকার বলেছেন, তার (মালিকের) অনুপস্থিতিতে চোরের হাত কাটা হবে না। কেননা হদ্দের ক্ষেত্রে ইস্তিফা (কার্যকর করা বা প্রয়োগ করা) কাযার মতো। তাই কাযার জন্য যেমন বাদী উপস্থিত থাকা শর্ত, তেমনি ইস্তিফা তথা হদ্দ কার্যকর করার জন্য বাদী উপস্থিত থাকা শর্ত।

https://e-ilm.weebly.com/

وَلِلْمُسْتَوْدَعِ وَالْغَاصِبِ وَصَاحِبِ الرِّبَا اَنْ يَقْطَعُوْا السَّارِقَ مِنْهُمْ وَلِرَبِّ الْوَدِيْعَةِ اَنْ يَقْطَعَهُ اَيْضًا، وَكَذَا الْمَغْصُوْبُ مِنْهُ .وَقَالَ زُفَرُ وَالشَّافِعِيُّ : لَا يُقْطَعُ بِخُصُوْمَةِ الْغَاصِبِ وَالْمُسْتَوْدَعِ، وَعَلٰى هٰذَا الْخِلَافِ الْمُسْتَعِيْرُ وَالْمُسْتَاْجِرُ وَالْمُضَارِبُ وَالْمُسْتَبْضِعُ وَالْقَابِضُ عَلٰى سَوْمِ الشِّرَاءِ وَالْمُرْتَهِنُ وَكُلُّ مَنْ لَهُ يَدٌ حَافِظَةٌ سِوَى الْمَالِكِ، وَيُقْطَعُ بِخُصُوْمَةِ الْمَالِكِ فِي السَّرِقَةِ مِنْ هٰؤُلَاءِ اِلَّا اَنَّ الرَّاهِنَ اِنَّمَا يُقْطَعُ بِخُصُوْمَتِهِ حَالَ قِيَامِ الرَّهْنِ بَعْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ لِاَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِي الْمُطَالَبَةِ بِالْعَيْنِ بِدُوْنِهِ . وَالشَّافِعِيُّ بَنَاهُ عَلٰى اَصْلِهِ اِذْ لَا خُصُوْمَةَ لِهٰؤُلَاءِ فِي الْاِسْتِرْدَادِ عِنْدَهُ . وَزُفَرُ يَقُوْلُ : وِلَايَةُ الْخُصُوْمَةِ فِيْ حَقِّ الْاِسْتِرْدَادِ ضَرُوْرَةُ الْحِفْظِ فَلَا تَظْهَرُ فِيْ حَقِّ الْقَطْعِ لِاَنَّ فِيْهِ تَفْوِيْتَ الصِّيَانَةِ . وَلَنَا اَنَّ السَّرِقَةَ مُوْجِبَةٌ لِلْقَطْعِ فِيْ نَفْسِهَا وَقَدْ ظَهَرَتْ عِنْدَ الْقَاضِيْ بِحُجَّةٍ شَرْعِيَّةٍ وَهِيَ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ عَقِيْبَ خُصُوْمَةٍ مُعْتَبَرَةٍ مُطْلَقًا اِذِ الْاِعْتِبَارُ لِحَاجَتِهِمْ اِلَى الْاِسْتِرْدَادِ فَيَسْتَوْفِي الْقَطْعَ ـ

অনুবাদ : আমানতের মাল হেফাজতকারী, অন্যের মাল হরণকারী। এবং সুদ গ্রহণকারী ব্যক্তির অধিকার রয়েছে, তাদের কাছ থেকে যে চুরি করেছে তার হস্ত কর্তনের দাবি করার। আমানতের মাল যে গচ্ছিত রেখেছে এবং যার কাছে থেকে মাল হরণ করা হয়েছে, তাদেরও অধিকার রয়েছে হস্ত কর্তনের দাবি করার।

ইমাম যুফার ও ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, আমানত হেফাজতকারী ও হরণকারী ব্যক্তির দাবি উত্থাপনের ভিত্তিতে হস্ত কর্তন করা হবে না। একই মতপার্থক্য রয়েছে ধারে মাল গ্রহণকারী, ভাড়ায় মাল গ্রহণকারী, মোদাববার ভিত্তিতে মাল গ্রহণকারী, লগ্নিতে মাল গ্রহণকারী, ক্রয় মূল্য নিরূপণের শর্তে পণ্য গ্রহণকারী বন্ধক গ্রহণকারী এবং এমন সকল ব্যক্তির ক্ষেত্রে, মালিক না হওয়া সত্ত্বেও যাদের জন্য হেফাজত ক্ষমতা সংরক্ষিত রয়েছে।

উপরোল্লিখিত লোকদের থেকে চুরি করার ক্ষেত্রে মালিকের অভিযোগ উত্থাপনের ভিত্তিতে হস্তকর্তন করা হবে। তবে বন্ধক প্রদানকারীর অভিযোগ উত্থাপনের ভিত্তিতে হস্তকর্তন করা হবে, ঋণ পরিশোধের পরও বন্ধকি মাল বন্ধক গ্রহণকারীর হাতে বিদ্যমান থাকা অবস্থায়। কেননা ঋণ পরিশোধ করা ব্যতীত মূল বন্ধকি মাল তার দাবি করার কোনো হক নেই।

ইমাম শাফেয়ী (র.) তার নিজস্ব মূলনীতির উপর তার উপরিউক্ত সিদ্ধান্তের ভিত্তি রেখেছেন। কেননা তার মতে উপরিউক্ত লোকদের মাল ফেরত পাওয়ার জন্য দাবি উত্থাপনের হক নেই। (এটা মূল মালিকের হক।)

ইমাম যুফার (র.) বলেন, মাল ফেরত পাওয়ার ক্ষেত্রে তাদের দাবি উত্থাপনের অধিকার হচ্ছে মাল হেফাজতের দায়িত্ব পালনের অনিবার্য কারণে। সুতরাং হস্তকর্তনের ক্ষেত্রে এই অধিকার প্রকাশ পাবে না। কেননা এতে মালের হেফাজত গুণ নষ্ট করা হয়।

আমাদের দলিল এই যে, চুরির অপরাধ নিজস্বভাবেই হস্তকর্তন সাব্যস্তকারী : আর তা একটি শরিয়তসম্মত প্রমাণের মাধ্যমে কাজির নিকট প্রকাশিত হয়েছে। আর সেই প্রমাণটি হচ্ছে নিঃশর্তরূপে সঠিক দাবি উত্থাপনের পর দু'জন ব্যক্তির সাক্ষ্য প্রদান। কেননা দাবি উত্থাপনের অধিকার বিবেচ্য হয়েছে, তাদের মাল ফেরত পাওয়ার প্রয়োজনের কারণে। সুতরাং (তাদের দাবি উত্থাপনের ভিত্তিতে) হস্তকর্তন সম্পন্ন করা হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَالْمَقْصُوْدُ مِنَ الْخُصُوْمَةِ اِحْيَاءُ حَقِّهِ وَسُقُوْطُ الْعِصْمَةِ ضَرُوْرَةُ الْاِسْتِيفَاءِ فَلَمْ يُعْتَبَرْ، وَلَا مُعْتَبَرَ بِشُبْهَةٍ مَوْهُوْمَةِ الْاِعْتِرَاضِ كَمَا اِذَا حَضَرَ الْمَالِكُ وَغَابَ الْمُؤْتَمَنُ فَاِنَّهُ يُقْطَعُ بِخُصُوْمَتِهِ فِيْ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَاِنْ كَانَتْ شُبْهَةُ الْاِذْنِ فِيْ دُخُوْلِ الْحِرْزِ ثَابِتَةً ـ

অনুবাদ : আর তাদের পক্ষ থেকে দাবি উত্থাপনের উদ্দেশ্য হচ্ছে, মালিকের অধিকার অক্ষুণ্ন রাখা। আর মালের হেফাজতগুণ রহিত হওয়ার বিষয়টি হচ্ছে হস্তকর্তন সম্পন্ন করার অনিবার্য ফল। সুতরাং এটাকে বিবেচনায় আনা হবে না।

আর দেখা দিতে পারে বলে কল্পিত সন্দেহের বিষয়টি বিবেচ্য নয়। যেমন- মালিক উপস্থিত হলো কিন্তু আমানতদার অনুপস্থিত থাকল। তখন যাহিরে রেওয়ায়েত অনুযায়ী মালিকের অভিযোগ উত্থাপনের ভিত্তিতে হস্তকর্তন করা হবে। অথচ সেখানে। (আমানতদারের পক্ষ হতে) সুরক্ষিত স্থানে প্রবেশের অনুমতির সন্দেহ বিদ্যমান আছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরোল্লিখিত ইবারতে ব্যবহৃত কিছু একক শব্দের ব্যাখ্যা :

১. اَلْمُسْتَوْدَعُ- اسم مفعول এর واحدمذكر এর সীগাহ, যার কাছে অদিয়ত বা আমানত রাখা হয়, আমানতদার ব্যক্তি।

২. غاصب শব্দটি اسم فاعل এর واحدمذكر -এর সীগাহ। গসবকারী, অন্যের সম্পদ জোরপূর্বক হরণকারী।

৩. اٰكِلُ الرِّبٰوا সুদ গ্রহণকারী।

৪. رَبُّ الْوَدِيْعَةِ- অদিয়া বা আমানতের মালিক। যে ব্যক্তি অন্যের কাছে আমানত রেখেছে।

৫. اَلْمَغْصُوْبُ مِنْهُ যার নিকট থেকে গসব করা হয়েছে কিংবা যার সম্পদ জোরপূর্বক হরণ করা হয়েছে।

৬. اَلْمُسْتَعِيْرُ শব্দটি اسم فاعل এর واحد مذكر এর সীগাহ। অর্থ- আরিয়ত গ্রহণকারী, ধার গ্রহীতা, কর্জ গ্রহীতা।

৭. اَلْمُسْتَاجِرُ শব্দটি اسم فاعل -এর واحد مذكر -এর সীগাহ। অর্থ- ভাড়ায় গ্রহণকারী, যে ব্যক্তি কারো থেকে কোনো বস্তু ভাড়া নেয়।

৮. اَلْمُضَارِبُ শব্দটি اسم فاعل এর واحد مذكر এর সীগাহ। অর্থ- মুদাববার চুক্তির ভিত্তিতে যে ব্যক্তি অন্যের সম্পদ গ্রহণ করে। কিংবা বলা যায়, অন্যের পূঁজিতে যে ব্যক্তি ব্যবসা করে এবং লভ্যাংশ গ্রহণ করে।

৯. اَلْمُسْتَبْضِعُ শব্দটি اسم فاعل এর واحد مذكر এর সীগাহ। অর্থ- লগ্নীতে মাল গ্রহণকারী, লগ্নী গ্রহীতা।

১০. اَلْقَابِضُ عَلٰى سَوْمِ الشِّرَاءِ অর্থাৎ- দাম দর চলাকালে যে হবো ক্রেতা পণ্য নিয়ে যায়।

১১. اَلْمُرْتَهِنُ শব্দটি اسم فاعل এর واحد مذكر এর সীগাহ অর্থ- বন্ধক গ্রহণকারী। যার কাছে বন্ধক রাখা হয়েছে।

১২. الراهنُ শব্দটি اسم فاعل এর واحد مذكر এর সীগাহ। অর্থ- বন্ধক দাতা, যে ব্যক্তি বন্ধক রেখেছে।

১৩. اَلْاِسْتِرْدَادُ শব্দটি باب استفعال-এর মাসদার। অর্থ- ফেরত চাওয়া, ফেরত নেওয়া।

১৪. اَلْمُؤْمَنُ যার কাছে আমানত রাখা হয়, আমানত হেফাজতকারী ব্যক্তি। তাকে مستودع এবং مودع ও বলা হয়।

মাসআলার সারসংক্ষেপ : আমানতদারের হাতে যে আমানতের মাল থাকে, সে মাল যদি কেউ চুরি করে নেয়, কিংবা অপহরণকারীর কাছে যে অপহৃত মাল থাকে, সে মাল যদি কেউ চুরি করে নেয়, কিংবা সুদ গ্রহণকারীর হাতে যে সুদের মাল থাকে, সে মাল যদি কেউ চুরি নেয়, তাহলে এই আমানতদার , অপহরণকারী ও সুদ গ্রহণকারী ব্যক্তি কাজির কাছে

https://e-ilm.weebly.com/

চোরের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করতে পারবে কিনা, কিংবা তাদের অভিযোগের ভিত্তিতে চোরের হাত কাটা হবে কিনা? এ নিয়ে ইমামগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে।

১. ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর মতে আমানতদার, অপহরণকারী ও সুদ গ্রহণকারী ব্যক্তি কাজির কাছে চোরের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করতে পারবে এবং তাদের অভিযোগের ভিত্তিতে চোরের হাত কাটা হবে।

২. ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম যুফার (র.) বলেন, সব লোকের অভিযোগের ভিত্তিতে চোরের হাত কাটা যাবে না। হুবহু এই মতপার্থক্য ধার গ্রহণকারী, মোদাববার ভিত্তিতে মাল গ্রহণকারী, ভাড়ায় গ্রহণকারী লগ্নীকারী মূল্য নিরূপণের উদ্দেশ্যে পণ্য গ্রহণকারী ও বন্ধক গ্রহণকারী প্রমুখের নিকট থেকে মাল চুরির ক্ষেত্রেও। অর্থাৎ উপরিউক্ত লোকদের নিকট হতে সংশ্লিষ্ট মাল চুরি করলে তাদের অভিযোগের ভিত্তিতে ইমামত্রয়ের মতে চোরের হাত কাটা যাবে । কাটা যাবে না ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম যুফার (র.)-এর মতে। উল্লেখ্য যে, এ মতভেদটি উপরিউক্ত নয় শ্রেণির লোকের মধ্যে সীমিত নয়। নয় শ্রেণির নাম কেবল উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা হয়েছে। উদ্দেশ্য হলো এমন ব্যক্তি, যে কোনো সম্পদের প্রকৃত মালিক নয়, কিন্তু সম্পদটি হেফাজত করার দায়িত্ব তার কাছে যেমন বন্ধক গ্রহীতা ব্যক্তি। সে বন্ধকি সম্পদের প্রকৃত মালিক নয়। কিন্তু বন্ধকি সম্পদটি হেফাজত করা তার দায়িত্ব। অনুরূপ ধার গ্রহীতা। ধারকরা সম্পদের প্রকৃত মালিক সে নয়। কিন্তু ধার করে আনা সম্পদটি হেফাজত করা তার দায়িত্বে। মোটকথা, সম্পদের মালিক নয়, কিন্তু হেফাজতের দায়িত্বশীল, এরূপ ব্যক্তির নিকট থেকে সম্পদ চুরি করলে, তাদের অভিযোগে চোরের হাত কাটা হবে কি-না এ নিয়েই ইমামগণের উপরিউক্ত মতভেদ।

দলিল ও জবাব পর্ব : প্রকাশ থাকে যে, আলোচ্য মাসআলায় ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম যুফার (র.) এর মতামত এক হলেও প্রত্যেকের দলিল ভিন্ন ভিংংংন্ন। ইমাম শাফেয়ী (র.) এর মতের ভিত্তি হলো, তার নিজস্ব আরেকটি মূলনীতি বা মতের উপর। সেই মূলনীতি বা মতটি হলো এই যে, উপরিউক্ত লোকদের সম্পদ যখন অন্য কারো হাতে চলে যায় এবং যার হাতে চলে গেছে সে যদি তা ফিরিয়ে দিতে অস্বীকার করে, তাহলে তা ফিরিয়ে আনার অধিকার উপরিউক্ত লোকদের নেই। অতএব, যখন তাদের ফিরিয়ে আনারই অধিকার নেই, তখন অভিযোগ করার অধিকার তো কোনো ক্রমেই থাকতে পারে না। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, তবে সে সম্পদের প্রকৃত মালিক যে, তার অধিকার আছে ফিরিয়ে আনার ও অভিযোগ করার।

ইমাম যুফার (র.) বলেন, হেফাজতের প্রয়োজনে সম্পদটি ফেরত চাওয়ার অধিকার উপরিউক্ত লোকদের আছে। কিন্তু এ অধিকারটি যেহেতু কেবল হেফাজতের প্রয়োজনে, সেহেতু তা হেফাজত পর্যন্তই সীমিত থাকবে। খুসূমত বা অভিযোগের ক্ষেত্রে সে অধিকার কাজে আসবে না। কেননা একটি স্বীকৃত মূলনীতি রয়েছে যে, জরুরতের ভিত্তিতে যা সাব্যস্ত হয়, তা জরুরত পর্যন্তই সীমিত থাকে। অতএব, হেফাজতের জরুরতের ভিত্তিতে যে অধিকার সাব্যস্ত হয়েছে, সে অধিকার খুসূমতের ক্ষেত্রে প্রকাশ পাবে না।

খুসূমতের অধিকার না থাকার আরো একটি কারণ হলো এই যে, উপরিউক্ত লোকেরা সম্পদ সংরক্ষণের জন্য আদিষ্ট। অথচ খুসূমত করলে সংরক্ষণ বিনষ্ট হয়। কেননা চোর যখন তাদের সম্পদ চুরি করে তখন সে সম্পদ মালিকের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া চোরের উপর অবধারিত হয়ে থাকে। কিন্তু যদি খুসূমত করা হয় এবং চোরের হাত কেটে দেওয়া হয় তাহলে আর সম্পদ ফিরিয়ে দিতে হয় না। এর দ্বারা বুঝা গেল, খুসূমত বা অভিযোগ দ্বারা সংরক্ষণ বিনষ্ট হয়। অভিযোগ না করলে সংরক্ষণ বহাল থাকে। আর উদ্দেশ্য যেহেতু সম্পদের সংরক্ষণ, তাই তাদের অভিযোগ গ্রহণযোগ্য হবে না। আমাদের তথা ইমামত্রয়ের দলিল হলো এই যে, চুরির অপরাধটি সত্তাগতভাবে হাত কাটাকে ওয়াজিব করে। তদুপরি সেটা কাজির দরবারে শরয়ী পদ্ধতি প্রকাশ পেয়েছে বা প্রমাণিত হয়েছে। শরয়ী পদ্ধতিতে প্রমাণিত হওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সাধারণ খুসূমতও তৎপরবর্তী দু'জন সাক্ষী দ্বারা প্রমাণিত হওয়া। আর এখানে তা হয়েছে। কেননা ইমামত্রয়ের মতে আমানতদার অপহরণকারী প্রমুখ ব্যক্তিদের জন্য যে খুসূমতের অধিকারটি সাব্যস্ত হয় তা কেবল হেফাজতের জরুরতের ভিত্তিতে নয়; বরং তাদের জন্য মুতলাক বেলায়েত বা সাধারণ অধিকার সাব্যস্ত হয়। অতএব, তাদের মালটি ফেরত চাওয়ার অধিকার থাকবে। আবার হাত কাটার জন্য খুসূমত করারও অধিকার থাকবে। ইমামত্রয় মনে করেন চুরিকৃত সম্পদটি পুনরায় নিজের দখলে বা আয়ত্বে আনা যা উপরিউক্ত লোকদের মূল উদ্দেশ্য। যা কি-না প্রকৃত মালিকেরও

https://e-ilm.weebly.com/

উদ্দেশ্য। সে হিসেবে উপরিউক্ত লোকেরা মালিকের মতোই হলো। অতএব, মালিকের যেমন হাতকাটার খুসূমত করার অধিকার আছে, তদ্রূপ উপরিউক্ত লোকদেরর হাত কাটার জন্য খুসূমত করার অধিকার থাকবে।

মোটকথা ইমাম যুফার (র.) উপরিউক্ত লোকদের অধিকারটি কেবল হেফাজতের জন্য খাস করেন। তাই তার মতে হাত কাটার জন্য খুসূমত করার অধিকার তাদের নেই। শুধু মালটি ফেরত চাওয়ার অধিকার আছে। পক্ষান্তরে ইমামত্রয় উপরিউক্ত লোকদের অধিকারটিকে হেফাজতের জরুরতের সাথে খাস করেন না; বরং তারা তাদের জন্য মালিকের মতো সাধারণ বেলায়েত সাব্যস্ত করেন। বিধায় তাদের মতে, মালিকের যেমন অধিকার থাকে মাল ফেরত চাওয়ার এবং হাত কাটার জন্য অভিযোগ করার, তেমনি উপরিউক্ত লোকদের অধিকার থাকবে মাল ফেরত চাওয়ার এবং হাত কাটার জন্য অভিযোগ দায়ের করার।

ইমাম যুফার (র.) এর দলিলের জবাব:

ইমাম যুফার (র.) বলেছিলেন, হাতকাটার খুসূমত করার অধিকার থাকলে সম্পদের সংরক্ষণ বিনষ্ট হয়, আমরা বলব, হাতকাটার খুসূমত করা হলে সম্পদেও সংরক্ষণ বিনষ্ট কথা ঠিক। কিন্তু এই বিনষ্টকরণটা সেখানে মাকসুদ বা উদ্দেশ্য হয় না; বরং সেখানে খুসূমত দ্বারা উদ্দেশ্য হয় চোরের হাত কাটার মাধ্যমে মালিকের হক জিন্দা করা। আর তার হক জিন্দা করতে গিয়ে অনিবার্যভাবে তার সম্পদের সংরক্ষণ বিনষ্ট হয়। অর্থাৎ হাতকাটা হলে মাল ফেরত দেওয়া হয় না। অতএব, এ বিষয়টি যেহেতু উদ্দেশ্য নয়; বরং অনুদ্দেশ্যরূপে অনিবার্যভাবে ঘটে যাচ্ছে, তাই এর দিকে লক্ষ্য করা যাবে না।

একটি প্রশ্নের উত্তর : কেউ বলতে পারে যে, উপরিউক্ত লোকদের অভিযোগের ভিত্তিতে মালিকের অনুপস্থিতিতে চোরের হাত কাটা যাবে না। কেননা মালিক এসে হয়তো এমন বলতে পারে যে, আমি তাকে মাল নেওয়ার অনুমতি দিয়ে ছিলাম তখন তো আর এটা চুরি থাকে না। হাত কাটবে কীসের ভিত্তিতে! এর উত্তরে বলা হবে, এ ধরনের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। কেননা এমন হলে তো মালিকের উপস্থিতিতেও হাত কাটা যাবে না। কারণ মালিক যখন হাত কাটার দাবি করে তখন সম্ভাবনা থেকে যায় যে, আমানতদার এসে হয়তো বলবে যে, এ চোরকে আমি গোডাউনে প্রবেশের অনুমতি দিয়েছিলাম। কিংবা বলবে, সে আমার বাড়িতে মেহমান হয়েছিল। তখনো এটা চুরি বলে গণ্য হবে না।

অতএব, ভবিষ্যত সম্ভাবনার কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। বর্তমানে বিদ্যমান কোনো সন্দেহের সম্ভাবনা যদি থাকে, তাহলে সেটা বিবেচ্য।

وَلَامُعْتَبَرَ بِشُبْهَةٍ مَوْهُوْمَةِ الْإِعْتِرَاضِ বলে মুসান্নিফ (র.) এ প্রশ্নোত্তরের দিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

উল্লেখ্য যে, ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিলের কোনো জবাব দেওয়া হয়নি। কারণ তার আলোচ্য মতটির দলিল বা ভিত্তি হলো তারই অন্য একটি মূলনীতি। জবাব দিতে হলে সেই মূলনীতি খণ্ডন করতে হবে। আর এটি একটি স্বতন্ত্র কাজ। যা আমাদের বর্তমান গ্রন্থের উদ্দেশ্য নয়। -অনুবাদক।

একটি সর্বসম্মত মাসআলা : উপরিউক্ত ব্যক্তিদের নিকট হতে মাল চুরি হওয়ার পর যদি প্রকৃত চোরের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে, তাহলে তার অভিযোগের ভিত্তিতে চোরের হাতকাটা যাবে। যেমন আমানত হেফাজতকারীর নিকট থেকে আমানতের মাল চুরি হয়ে গেল, অতঃপর আমানত যে রেখেছিল (প্রকৃত মালিক) সে এসে চোরের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করল তার অভিযোগের ভিত্তিতে চোরের হাতকাটা হবে। অপরহরণকারী, ধার গ্রহণকারী, লগ্নকারী, ভাড়ায় গ্রহণকারী সকলের ক্ষেত্রে একই মাসআলা। অর্থাৎ মূল মালিকের দাবিতে চোরের হাত কাটা হবে।

তবে বন্ধকদাতার ব্যাপারটি ভিন্ন। বন্ধক গ্রহণকারীর (مرتهن) নিকট থেকে যদি বন্ধকি সম্পদ চুরি হয়ে যায়, তাহলে বন্ধকদাতার (راهن) এর দাবিতে চোরের হাতকাটা যাবে না। কারণ বন্ধকি সম্পদের মাঝে বন্ধক দাতার অধিকার থাকে না, ঋণ পরিশোধ করা ব্যতীত। হ্যাঁ, যদি ঋণ পরিশোধ করার পরেও বন্ধকি সম্পদটি বন্ধক গ্রহীতার নিকট থেকে যায় এবং সে অবস্থায় তা চুরি হয়, তাহলে বন্ধক তার দাবিতে চোরের হাত কাটা যাবে। কারণ ঋণ পরিশোধ করার পর সম্পদটি তার মালিকানা হয়ে গেছে। তাই তার দাবি গ্রহণযোগ্য হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَإِنْ قُطِعَ سَارِقٌ بِسَرِقَةٍ فَسُرِقَتْ مِنْهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَا لِرَبِّ السَّرِقَةِ أَنْ يَقْطَعَ السَّارِقَ الثَّانِيَ لِأَنَّ الْمَالَ غَيْرُ مُتَقَوَّمٍ فِي حَقِّ السَّارِقِ حَتَّى لَا يَجِبَ عَلَيْهِ الضَّمَانُ بِالْهَلَاكِ فَلَمْ تَنْعَقِدْ مُوجِبَةً فِي نَفْسِهَا، وَلِلْأَوَّلِ وِلَايَةُ الْخُصُومَةِ فِي الْإِسْتِرْدَادِ فِي رِوَايَةٍ لِحَاجَتِهِ إِذِ الرَّدُّ وَاجِبٌ عَلَيْهِ وَلَوْ سَرَقَ الثَّانِي قَبْلَ أَنْ يُقْطَعَ الْأَوَّلُ أَوْ بَعْدَ مَا دُرِئَ الْحَدُّ بِشُبْهَةٍ يُقْطَعُ بِخُصُومَةِ الْأَوَّلِ لِأَنَّ سُقُوطَ التَّقَوُّمِ ضَرُورَةُ الْقَطْعِ وَلَمْ يُوجَدْ فَصَارَ كَالْغَصْبِ وَمَنْ سَرَقَ سَرِقَةً فَرَدَّهَا عَلَى الْمَالِكِ قَبْلَ الْإِرْتِفَاعِ إِلَى الْحَاكِمِ لَمْ يُقْطَعْ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يُقْطَعُ اِعْتِبَارًا بِمَا إِذَا رَدَّهُ بَعْدَ الْمُرَافَعَةِ . وَجْهُ الظَّاهِرِ أَنَّ الْخُصُومَةَ شَرْطٌ لِظُهُورِ السَّرِقَةِ، لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ إِنَّمَا جُعِلَتْ حُجَّةً ضَرُورَةَ قَطْعِ الْمُنَازَعَةِ وَقَدْ اِنْقَطَعَتِ الْخُصُومَةُ، بِخِلَافِ مَا بَعْدَ الْمُرَافَعَةِ لِانْتِهَاءِ الْخُصُومَةِ لِحُصُولِ مَقْصُودِهَا فَتَبْقَى تَقْدِيرًا -

অনুবাদ : কোনো চুরির অপরাধে যদি চোরের হস্তকর্তন করা হয়, আর চোরের কাছ থেকে যদি ঐ মাল চুরি হয়ে যায়, তাহলে তার কিংবা মূল মালিকের অধিকার নেই, দ্বিতীয় চোরের হস্তকর্তনের দাবি উথাপনের। কেননা দ্বিতীয় চোরের কাছে উক্ত মাল মূল্যসম্পন্ন নয়। এ কারণেই তা নষ্ট হয়ে গেলে তার উপর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না। সুতরাং দ্বিতীয় চুরিটি নিজস্বভাবে হস্তকর্তন সাব্যস্তকারীরূপে সংঘটিত হয়নি। একটি বর্ণনা মতে প্রথম চোরের মাল ফেরত দাবি করার অধিকার থাকবে। কেননা যেহেতু এই মাল মালিকের নিকট প্রত্যর্পণ করা তার উপর আবশ্যক। সেহেতু তার প্রয়োজন রয়েছে।

প্রথম চোরের হস্ত কর্তনের পূর্বে সন্দেহজনিত কারণে হস্ত কর্তন রহিত হওয়ার পর যদি দ্বিতীয় চোর উক্ত মাল চুরি করে তাহলে প্রথম চোরের অভিযোগ উথাপনের ভিত্তিতে তার হস্ত কর্তন করা হবে। কেননা উক্ত মালের মূল্যসম্পন্নতা রহিত হওয়ার কারণ ছিল হস্ত কর্তনের অনিবার্য ফল। আর হস্ত কর্তন এখানে সাব্যস্ত হয়নি। সুতরাং (প্রথম চোরের চুরিটি) গসব বা অপহরণের মতো হয়ে গেল।

চোর যদি চুরি করে এবং শাসকের নিকট অভিযোগ দায়েরের পূর্বেই চুরির মাল মালিকের নিকট ফিরিয়ে দেয়, তাহলে তার হস্ত কর্তন করা হবে না। অভিযোগ দায়েরের পর ফেরত দানের উপর কিয়াস করে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) হতে হস্ত কর্তনের অভিমত বর্ণিত হয়েছে। যাহিরে রেওয়ায়েতের কারণ এই যে, চুরির অপরাধ সাব্যস্ত হওয়ার জন্য অভিযোগ উথাপন হলো শর্ত। কেননা বিবাদ নিরসনের অনিবার্য প্রয়োজনেই সাক্ষ্যকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। আর এখানে (মালিকের নিকট ফেরত প্রদানের কারণ) বিবাদের নিরসন হয়ে গেছে। অভিযোগ দায়েরের পরে ফেরত দানের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা উদ্দেশ্য অর্জনের কারণে অভিযোগ উথাপন পূর্ণতা লাভ করেছে। সুতরাং কার্যত তা বিদ্যমান থাকবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আলোচ্য মাসআলার ব্যাখ্যা হলো, কোনো চোর চুরি করেছে, এরপরে তার হাত কাটা হয়েছে। অতঃপর তার চুরিকৃত সম্পদটি তার কাছ থেকে আরেক চোর চুরি করে নিল। এমতাবস্থায় প্রথম চোর ও মূল মালিক কারো অধিকার নেই দ্বিতীয় চোরের হাত কাটার জন্য অভিযোগ দায়ের করার।

প্রথম চোর দ্বিতীয় চোরের হস্ত কর্তন দাবি করতে না পারার কারণ হলো, উক্ত সম্পদটি প্রথম চোরের হাতে থাকা অবস্থায় متقوم বা মূল্যসম্পন্ন ছিল না। আর মূল্য সম্পন্ন নয় এমন বস্তু চুরি করলে তা শরয়ীভাবে চুরি বলে গণ্য হয় না। কেননা যে চুরির দায়ে হাত কাটা হয়, তার সংজ্ঞায় متقوم তথা মূল্যমান সম্পন্ন হওয়ার শর্ত রয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রথম চোরের নিকট থাকা সম্পদটি যে মূল্য সম্পন্ন নয়, এর প্রমাণ হলো- এটা চোরের হাতে ধ্বংস হয়ে গেলে মালিককে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হয় না। যদি তার মূল্যমান থাকতো, তাহলে অবশ্যই ক্ষতিপূরণ দিতে হতো। মোটকথা, প্রথম চোরের অভিযোগ দায়ের করতে না পারার এক কারণ হলো তার মাল মূল্যমান সম্পন্ন না হওয়া।

দ্বিতীয় আরেকটি কারণ হলো, উক্ত সম্পদের উপর প্রথম চোরের যে দখলটি ছিল, তা মালিক, আমানতদার, গসবকারী, ধার গ্রহণকারী প্রমুখের দখলের মতো নয়। অর্থাৎ প্রথম চোর উক্ত মালের মালিকও নয়, আবার সংরক্ষণের অধিকারীও নয়; বরং তৃতীয় এক প্রকারের দখলদার। আর চোরের হস্তকর্তন দাবি করার ক্ষেত্রে এই তৃতীয় প্রকার দখলদারের কোনো অধিকার নেই। আর মূল মালিক দ্বিতীয় চোরের হস্ত কর্তন দাবি করতে না পারার কারণ হলো, পূর্বোক্ত প্রথম কারণ। অর্থাৎ সম্পদটি মূল্যমান সম্পন্ন না হওয়া। কেননা যখন একবার তার অভিযোগে প্রথম চোরের হাত কাটা হয়েছে, তখন তার মালটি মাযমুন তথা ক্ষতিপূরণযোগ্য থাকেনি। এ জন্যই তো যদি চোরের হাতে সেটা ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে হয় না। এর দ্বারা বুঝা যায়, মালটি মূল মালিকের পক্ষেও মূল্য সম্পন্ন থাকেনি। মূল্য সম্পন্ন থাকলে অবশ্যই ক্ষতিপূরণ দিতে হতো। অতএব, প্রথম চোর যেমন হস্ত কর্তনের দাবি করতে পারে না সম্পদটি মূল্য সম্পন্ন না হওয়ার কারণে, তেমনি মূল মালিকও উক্ত কারণেই দ্বিতীয় চোরের হস্ত কর্তন দাবি করতে পারবে না। কেননা উক্ত চুরিটি সত্তাগতভাবেই হস্ত কর্তন সাব্যস্তকারীরূপে হয়নি।

তবে এক বর্ণনায় রয়েছে, প্রথম চোর সম্পদটি ফেরত চাইতে পারবে। কারণ সম্পদটি মূল মালিকের নিকট ফেরত দেওয়া প্রথম চোরের উপর ওয়াজিব বা অবশ্য কর্তব্য। তাই সে সম্পদটি ফেরত চাইতে পারবে। অন্য বর্ণনা অনুযায়ী ফেরত চাওয়ার অধিকার নেই। কারণ তার যে দখলটি ছিল তা শুদ্ধ দখল নয়। শুদ্ধ দখল বলতে বুঝানো হয়, তিন প্রকার দখলকে।

১. মালিকানা সূত্রে দখল ২.আমানত সূত্রে দখল ৩. জামানত সূত্রে দখল।

প্রথম চোরের দখলটি উক্ত তিন প্রকার দখলের কোনটিই নয়। তাই তার দখলটি শুদ্ধ দখল নয় এবং অশুদ্ধ দখল ফিরিয়ে আনারও অধিকার নেই।

২. কোনো চোর চুরি করেছে, কিন্তু এখনো তার হাত কাটা হয়নি, কিংবা কোনো সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ার কারণে হাতকাটা রহিত হয়ে গেছে। প্রথম চোরের নিকট থেকে তার চুরিকৃত সম্পদটি আরেক চোর চুরি করে নিল। এমতাবস্থায় প্রথম চোরের অভিযোগের ভিত্তিতে দ্বিতীয় চোরের হাত কাটা হবে। কেননা প্রথম চোরের হাত না কাটার কারণে চুরিকৃত সম্পদটি তার কাছে মূল্য সম্পন্ন রয়ে গেছে। ধ্বংস হলে এর ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। যদি হাত কাটা হতো, তাহলে মূল্যসম্পন্ন থাকতো না। কিন্তু হস্তকর্তন না হওয়া অবস্থায় যেহেতু সম্পদটি মূল্য সম্পন্ন রয়ে গেছে, সেহেতু প্রথম চোর এ ক্ষেত্রে গাসেব বা অপহরণকারী সমতুল্য। এ কারণে গাসেব যেমন হাত কাটার জন্য অভিযোগ দায়ের করতে পারে তেমনি প্রথম চোরও দায়ের করতে পারবে।

وَمَنْ سَرَقَ سَرِقَةً فَرَدَّهَا عَلَى الْمَالِكِ الخ : চোর চুরি করার পর তার ব্যাপারে কাজির দরবারে অভিযোগ উত্থাপিত হওয়ার পূর্বেই যদি চুরির মালটি মালিকের নিকট ফেরত দিয়ে দেয়, তাহলে চোরের হাত কাটা হবে কি-না, এ নিয়ে দু'রকম মতামত বর্ণিত হয়েছে।

১. যাহিরে রেওয়ায়েতের বর্ণনা অনুযায়ী হাত কাটা হবে না।

২. ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে হাত কাটা হবে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) এর যুক্তি হলো চোরের হস্তকর্তন আল্লাহর হক। এর জন্য মালিকের পক্ষ থেকে খুসূমত বা অভিযোগ দায়ের করার প্রয়োজন নেই। অতএব, অভিযোগের পর যেমন হাত কাটা হয়, তেমনি অভিযোগের পূর্বেও কাটা হবে। মোটকথা, তিনি অভিযোগ দায়েরের পূর্বের অবস্থাকে অভিযোগ দায়েরের পরের অবস্থার সাথে কিয়াস করেন।

যাহিরে রেওয়ায়েতের কারণ হলো এই যে, চুরি সাব্যস্ত হবে সাক্ষ্যের মাধ্যমে আর সাক্ষ্যের প্রয়োজন হবে, অভিযোগ দায়ের করলে। কিন্তু আলোচ্য সুরতে যখন অভিযোগই উত্থাপিত হয়নি, তখন সাক্ষ্যেরও প্রয়োজন থাকেনি। আর যখন সাক্ষ্য নেই, তখন চুরি প্রমাণিতই হবে না। অতএব হাত কাটার কল্পনা করা যায় না। যদি অভিযোগ উত্থাপিত হতো তাহলে সাক্ষ্যের প্রয়োজন দেখা দিতো এবং উপযুক্ত সাক্ষ্যের মাধ্যমে চুরি প্রমাণিত হলে চোরের হাত কাটা হতো। এখানে যেহেতু তেমনটি হয়নি, সেহেতু হাত কাটা হবে না।

কাজির কাছে অভিযোগ উত্থাপনের পরের অবস্থাটি ভিন্ন। অর্থাৎ কাজির নিকট অভিযোগ উত্থাপন হলে সাক্ষ্য গ্রহণ ও রায় প্রদানের পর যদি মাল ফেরত দেয়, কিংবা শুধু সাক্ষ্য গ্রহণের পর রায় প্রদানের পূর্বেই যদি মাল ফেরত দেয়, তাহলে চোরের হাত কাটা হবে। কেননা উপরিউক্ত অবস্থায় প্রণযোগ্য অভিযোগ এবং গ্রহণযোগ্য সাক্ষ্যের মাধ্যমে অপরাধটি প্রমাণিত হয়ে গেছে। তার সাক্ষ্যের মাধ্যমে অভিযোগের উদ্দেশ্য (মাল ফেরত) হাসিল হয়ে যাওয়ার কারণে অভিযোগের পূর্ণাঙ্গতায় পৌঁছেছে। আর কোনো বস্তু পূর্ণাঙ্গতায় পৌঁছলে তা বাতিল হয়ে যায় না; বরং তা আরো মজবুত হয়। তাই এ সুরতে খুসুমত বা অভিযোগ অর্থগতভাবে অবশিষ্ট আছে বিধায় চোরের হাত কাটা হবে। পক্ষান্তরে পূর্ব বর্ণিত অবস্থায় অভিযোগই ছিল না, তাই সেখানে হাত কাটা হয়নি। মোটকথা, অভিযোগ উত্থাপনের পূর্বের এবং পরের অবস্থা এক নয়। এতএব, একটিকে অপরটির উপর তথা পূর্বের অবস্থাকে পরের অবস্থার উপরে কিয়াস করা ঠিক হবে না। যেমন ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) করেছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

وَاِذَا قُضِيَ عَلٰى رَجُلٍ بِالْقَطْعِ فِيْ سَرِقَةٍ فَوُهِبَتْ لَهُ لَمْ يُقْطَعْ مَعْنَاهُ اِذَا سُلِّمَتْ اِلَيْهِ وَكَذٰلِكَ اِذَا بَاعَهَا الْمَالِكُ اِيَّاهُ وَقَالَ زُفَرُ وَالشَّافِعِيُّ : يُقْطَعُ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ اَبِيْ يُوْسُفَ، لِاَنَّ السَّرِقَةَ قَدْ تَمَّتْ اِنْعِقَادًا وَظُهُوْرًا، وَبِهٰذَا الْعَارِضِ لَمْ يَتَبَيَّنْ قِيَامُ الْمِلْكِ وَقْتَ السَّرِقَةِ فَلَا شُبْهَةَ. وَلَنَا اَنَّ الْاِمْضَاءَ مِنَ الْقَضَاءِ فِيْ هٰذَا الْبَابِ لِوُقُوْعِ الْاِسْتِغْنَاءِ عَنْهُ بِالْاِسْتِيْفَاءِ، اِذِ الْقَضَاءُ لِلْاِظْهَارِ وَالْقَطْعُ حَقُّ اللّٰهِ تَعَالٰى وَهُوَ ظَاهِرٌ عِنْدَهُ، وَاِذَا كَانَ كَذٰلِكَ يُشْتَرَطُ قِيَامُ الْخُصُوْمَةِ عِنْدَ الْاِسْتِيْفَاءِ وَصَارَ كَمَا اِذَا مَلَكَهَا مِنْهُ قَبْلَ الْقَضَاءِ . قَالَ وَكَذَا اِذَا نَقَصَتْ قِيْمَتُهَا مِنَ النِّصَابِ يَعْنِي قَبْلَ الْاِسْتِيفَاءِ بَعْدَ الْقَضَاءِ . وَعَنْ مُحَمَّدٍ اَنَّهُ يُقْطَعُ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ وَالشَّافِعِيِّ اِعْتِبَارًا بِالنُّقْصَانِ فِي الْعَيْنِ . وَلَنَا اَنَّ كَمَالَ النِّصَابِ لَمَّا كَانَ شَرْطًا يُشْتَرَطُ قِيَامُهُ عِنْدَ الْاِمْضَاءِ لِمَا ذَكَرْنَا، بِخِلَافِ النُّقْصَانِ فِي الْعَيْنِ لِاَنَّهُ مَضْمُوْنٌ عَلَيْهِ فَكَمُلَ النِّصَابُ عَيْنًا وَدَيْنًا، كَمَا اِذَا اُسْتُهْلِكَ كُلُّهُ، اَمَّا نُقْصَانُ السِّعْرِ فَغَيْرُ مَضْمُوْنٍ فَافْتَرَقَا .

অনুবাদ : চুরির অপরাধে কারো বিরুদ্ধে হস্ত কর্তনের ফয়সালা হওয়ার পর যদি (মালিকের পক্ষ হতে) উক্ত মাল চোরকে দান করে দেওয়া হয়, তাহলে আর হাত কাটা হবে না। অর্থাৎ দান করার পর তার হাতে তা অর্পণও করা হয়ে থাকে। তদ্রূপ যদি মালিক তা তার নিকট বিক্রি করে দেয়। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম যুফার (র.) বলেন, এ অবস্থায়ও হাত কাটা হবে। এটি ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকেও প্রাপ্ত একটি বর্ণনা। কেননা সংঘটিত হওয়া এবং প্রকাশ হওয়ার দিক দিয়ে চুরির অপরাধটি পূর্ণতা লাভ করেছে। আর উদ্ভূত পরিস্থিতি দ্বারা চুরি করার সময় মালিকানার বিদ্যমানতা সাব্যস্ত হয়নি। অতএব, কোনো সন্দেহ সৃষ্টি হয়নি।

আমাদের দলিল এই যে, হদ্দের ক্ষেত্রে ফয়সালা কার্যকর করা বিচারের অন্তর্ভুক্ত বিষয়। কেননা হক উসূল করার মাধ্যমেই কেবল বিচারের মুখাপেক্ষিতা সমাপ্ত হয়। কারণ বিচারের ফয়সালা কার্যকর করা বিচারের অন্তর্ভুক্ত বিষয়। কেননা হক সমাপ্ত হয়। কারণ বিচারের ফয়সালা হচ্ছে বিষয়টিকে প্রকাশ করার জন্য। আর কর্তন হচ্ছে আল্লাহর হক, আর আল্লাহর নিকট তো বিষয়টি আগ থেকেই প্রকাশিত।

যাই হোক, ফয়সালা কার্যকর করা যেহেতু বিচারের অন্তর্ভুক্ত বিষয়, সেহেতু ফয়সালা কার্যকর করার সময় পর্যন্ত অভিযোগ বিদ্যমান থাকা শর্ত। সুতরাং এটা ফয়সালার পূর্বেই মালিক হয়ে যাওয়ার মতো হলো।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, **তদ্রূপ যদি উক্ত মালের মূল্য নিসাব পরিমাণ হতে কম হয়ে যায়,** অর্থাৎ বিচারের পর কার্যকর করার পূর্বে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত রয়েছে, যে কর্তন করা হবে। এটা ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম যুফার (র.) এরও অভিমত। তারা মূল্য হ্রাস স্বয়ং মালহ্রাস পাওয়ার উপর কিয়াস করেন।

আমাদের দলিল এই যে, হস্ত কর্তনের জন্য নিসাবের পূর্ণতা যেহেতু শর্ত ছিল, সেহেতু কর্তন কার্যকর করার সময়ও তার বিদ্যমানতা শর্ত হবে।

পক্ষান্তরে স্বয়ং মালহ্রাস পাওয়ার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা নষ্ট হওয়া অংশটুকু ক্ষতিপূরণযোগ্য। সুতরাং স্বয়ং বস্তু এবং তার দেয় বিদ্যমান হওয়ায় নিসাব পূর্ণ রয়েছে। যেমন সম্পূর্ণ মাল নষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে মূল্যহ্রাসের বিষয়টি ক্ষতিপূরণযোগ্য না। সুতরাং অবস্থা দু'টি ভিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কোনো চোর কিছু চুরি করল, অতঃপর চুরিকৃত সম্পদটি মালিক চোরকে দান করে দিল এবং তার হাতে পৌঁছে দিল, কিংবা চুরি করার পর চোর উক্ত সম্পদটি মালিকের নিকট থেকে ক্রয় করে নিল। এমতাবস্থায় চোরের হাত কাটা হবে কি-না, এ নিয়ে ইমামদের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে।

১. আহনাফের মতে চোরের হাত কাটা হবে না।

২. ইমাম যুফার, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) এর মতে হাত কাটা হবে। এটা ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) এরও একটি অভিমত।

দলিল পর্ব :

ইমাম যুফার, ইমাম শাফেয়ী (র.) প্রমুখের দলিল হলো, আলোচ্য মাসআলায় চুরির অপরাধ পূর্ণাঙ্গরূপে সংঘটিত হয়েছে এবং তা কাজির নিকট প্রমাণিত হয়েছে। এর পরে দান করা হয়েছে কিংবা ক্রয় হয়েছে। এই দান বা ক্রয় দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় না যে, চুরি করার সময় চোর সে সম্পদের মালিক ছিল; বরং এটা প্রমাণিত হয় যে, চুরি করার সময় সে সম্পদের মালিক ছিল না। বিধায়, পরবর্তীতে দান বা ক্রয় করা সম্ভব হয়েছে। অতএব, এই দান বা ক্রয়ের কারণে তার চুরির অপরাধের বিষয়ে কোনো সন্দেহ সৃষ্টি হয় না; বরং তার চুরির অপরাধ সন্দেহাতীতভাবে বহাল আছে এবং তা উপযুক্ত প্রমাণ দ্বারা কাজির নিকট প্রমাণিতও হয়েছে। তাই তার হাত কাটা হবে।

আহনাফের দলিল হলো হদ্দ কার্যকর করা হদ্দ বিষয়ক বিচার বা ফয়সালার সমতুল্য। কেননা হদ্দ কার্যকর করার মাধ্যমেই বিচারের প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়। কার্যকর না হলে শুধু রায় ঘোষণার কোনো মূল্য নেই। বিশেষত চোরের হাত কাটার ক্ষেত্রে। কেননা চোরের হাতকাটা হলো আল্লাহ হক। আর রায় ঘোষণা হয়ে থাকে হক প্রকাশের জন্য মাত্র। আর আল্লাহর হক প্রকাশ করার কোনো দরকার নেই। কারণ আল্লাহ তা'আলা সর্ববিষয়ে অবগত হওয়ায় তার হক তার কাছে আগ থেকেই প্রকাশিত হয়ে আছে। অতএব, এখানে রায় কার্যকর করাটাই প্রধান বিষয়। অতএব, যখন যে কোনো হদ্দ বিশেষত চুরির হদ্দ কার্যকর করাটা বিচারকার্যেরই সমতুল্য তখন বিচার কার্যের সময় যেমনিভাবে অভিযোগ বিদ্যমান থাকা শর্ত, তেমনিভাবে কার্যকর করার সময়ও অভিযোগ বিদ্যমান থাকা শর্ত। আর আলোচ্য সুরতে যেহেতু হদ্দ কার্যকর করার পূর্বে অভিযোগ শেষ হয়ে গেছে, চোর চুরিকৃত সম্পদের মালিক হয়ে গেছে। সেহেতু আর হদ্দ কার্যকর করা হবে না। কেননা এখন অভিযোগ বিদ্যমান নেই। অতএব, হদ্দ কার্যকর করার পূর্বে মালিক হওয়াটা হুবহু বিচার কার্যের পূর্বে যদি চোর চুরিকৃত সম্পদের মালিক হয়ে যায়, তাহলে বিচারকার্য সংঘটিত হয় না। হদ্দ কার্যকর হওয়ার পূর্বে মালিক হয়ে যাওয়ার কারণেও হদ্দ কার্যকর করা হবে না।

وَكَذَا إِذَا نَقَصَتْ قِيمَتُهَا مِنَ النِّصَابِ : চুরির অপরাধের কারণে কাজির পক্ষ থেকে চোরের হাত কাটার রায় হলো। কিন্তু এ রায় বাস্তবায়নের পূর্বে চুরিকৃত সম্পদের মূল্যহ্রাস পেল এবং সম্পদটির মূল্য দশ দিরহামের নিচে গিয়ে ঠেকল এমতাবস্থায় হদ্দ কার্যকর হবে কি-না, এ নিয়ে ইমামগণের দ্বিমত রয়েছে।

১. আহনাফের মতে হদ্দ কার্যকর করা হবে না।

২. ইমাম মুহাম্মদ, ইমাম যুফার, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) এর মতে হদ্দ কার্যকর করা হবে।

দলিল পর্ব : ইমাম মুহাম্মদ, ইমাম যুফার প্রমুখ মূল্যহ্রাসের বিষয়কে সম্পদ হ্রাসের উপর কিয়াস করেন। তারা বলেন, কোনো চোর যদি দশ দিরহাম চুরি করে এবং তার বিরুদ্ধে হাত কাটার ফয়সালা হয়, অতঃপর একটি দিরহাম নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে সকলেই এ ব্যাপারে একমত যে, চোরের হাত কাটা হবে। দশ দিরহাম নষ্ট হয়ে যাওয়ায় চুরিকৃত সম্পদ নেসাবের চেয়ে কমে গেল। তা সত্ত্বেও চোরের হাত কাটা রহিত হওয়ার কথা কেউ বলেন না। তদ্রূপ চুরিকৃত সম্পদের মূল্য কমে যাওয়ার কারণে যদি সম্পদটির মূল্য দশ দিরহামের কমে গিয়ে দাঁড়ায় তাহলেও তার হাত কাটা হবে। হ্রাস

https://e-ilm.weebly.com/

পেয়ে নেসাব কমে গেলে যেমন হাত কাটা রহিত হয় না। তেমনি মূল্যহ্রাস পেয়ে নেসাব কমে গেলেও হাতকাটা রহিত হবে না। উদাহরণঃ যেমন কেউ একটি চাদর চুরি করল। যার মূল্য হলো দশ দিরহাম বা তার চেয়ে বেশি। অতঃপর এ অপরাধের কারণে তার হাত কাটার ফায়সালা করা হলো। কিন্তু ইতিমধ্যে কাপড়ের মূল্য কমে যাওয়ার কারণে চাদরটির মূল্য নয় দিরহাম কিংবা এর চেয়েও নিচে নেমে এলো। এমতাবস্থায় ইমাম মুহাম্মদ প্রমুখের মতে চোরের হাত কাটা হবে, যেমন চাদরটি একাংশ ছিড়ে গেলে হাত কাটা হতো।

আহনাফ তথা যাহিরে রেওয়ায়েতের দলিল হলো, হদ্দের ক্ষেত্রে কার্যকর করার বিষয়টি সে সম্পর্কিত বিচারের সমতুল্য, যেমন পূর্বে বলা হয়েছে। অতএব, বিচারের সময় তথা হাত কাটার ফয়সালা প্রদানের সময় যেমন নেসাব বাকি থাকা শর্ত, তেমনি বিচার কার্যকর করার সময়ও নেসাব বাকি থাকা শর্ত হবে। কারণ হদ্দ কার্যকর করা তৎসম্পর্কিত ফয়সালার পর্যায়ভুক্ত। কিন্তু আলোচ্য সুরতে যেহেতু হদ্দ কার্যকর করার পূর্বে সম্পদের মূল্য কমে গিয়ে নেসাবের নিচে দাড়িয়েছে, সেহেতু চোরের হাত কাটা হবে না। যেমন ফয়সালার পূর্বে সম্পদের মূল্য কমে নেসাবের নিচে চলে গেলে হাত কাটার ফয়সালা করা যায় না।

ইমাম মুহাম্মদ প্রমুখের দলিলের জবাব :

মূল্য হ্রাসকে সম্পদ হ্রাসের উপর কিয়াস করা ঠিক নয়। কেননা সম্পদ হ্রাস পেলে তার ক্ষতিপূরণ দেওয়া চোরের উপর আবশ্যক হয়। দশ দিরহাম চুরি করার পর এক দিরহাম নষ্ট হয়ে গেলেও চোরকে দশ দিরহামই পরিশোধ করতে হয়। সে হিসাবে সম্পদ হ্রাসের ক্ষেত্রে নেসাব বিদ্যমান থাকে, চুরি করা সময় তো বস্তুগতভাবেই নেসাবপূর্ণ থাকে। আর পরবর্তীতে ক্ষতিপূরণ আবশ্যক হওয়ার কারণে দাইন বা দেয় হিসাবে পূর্ণ থাকে। তাই তখন চোরের হাত কাটা হয়ে যায়।

পক্ষান্তরে সম্পদের মূল্য হ্রাসের সুরতে যে মূল্যটুকু কমে যায়, সেটুকুর ক্ষতিপূরণ নেই। দশ দিরহাম মূল্যের চাদর যদি নয় দিরহামের হয়ে যায়, তাহলে চোরকে নয় দিরহামই পরিশোধ করতে হয়। দশ দিরহাম পরিশোধ করতে হয় না। অতএব এ সুরতে চুরি করার সময় নেসাব পূর্ণ থাকলে হদ্দ কার্যকর করার সময় নেছাব পূর্ণ থাকেনি। অতএব, চোরের হাত কাটা হবে না। মোটকথা হলো সম্পদ হ্রাস পাওয়ার অবস্থায় যতটুকু হ্রাস পায় ততটুকুর ক্ষতিপূরণ দিতে হয়, তাই সে ক্ষেত্রে নেসাব পূর্ণ থাকে। আর মূল্য হ্রাস পাওয়া অবস্থায়, যতটুকু হ্রাস পায়, ততটুকুর ক্ষতিপূরণ দিতে হয় না, তাই এখানে নেসাব পূর্ণ থকে না। অতএব, অবস্থা দুটি দু'রকম হলো একটিকে অপরটির উপর তথা মূল্য হ্রাস কে সম্পদ হ্রাসের উপর কিয়াস করা যাবে না এবং উভয় অবস্থায় হাত কাটার কথা বলা ঠিক হবে না। যেমন বলেছেন, ইমাম মুহাম্মদ, যুফার, শাফেয়ী, মালেক ও আহমদ ইবনে হাম্বল প্রমুখ (র.)।

https://e-ilm.weebly.com/

وَاِذَا ادَّعَى السَّارِقُ اَنَّ الْعَيْنَ الْمَسْرُوْقَةَ مِلْكُهُ سَقَطَ الْقَطْعُ عَنْهُ وَاِنْ لَمْ يُقِمْ بَيِّنَةً مَعْنَاهُ بَعْدَمَا شَهِدَ الشَّاهِدَانِ بِالسَّرِقَةِ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا يَسْقُطُ بِمُجَرَّدِ الدَّعْوٰى لِاَنَّهُ لَا يَعْجِزُ عَنْهُ سَارِقٌ فَيُؤَدِّيْ اِلٰى سَدِّ بَابِ الْحَدِّ . وَلَنَا اَنَّ الشُّبْهَةَ دَارِئَةٌ وَتَتَحَقَّقُ بِمُجَرَّدِ الدَّعْوٰى لِلْاِحْتِمَالِ، وَلَا مُعْتَبَرَ بِمَا قَالَ بِدَلِيْلِ صِحَّةِ الرُّجُوْعِ بَعْدَ الْاِقْرَارِ . وَاِذَا اَقَرَّ رَجُلَانِ بِسَرِقَةٍ ثُمَّ قَالَ اَحَدُهُمَا هُوَ مَالِي لَمْ يُقْطَعَا لِاَنَّ الرُّجُوْعَ عَامِلٌ فِي حَقِّ الرَّاجِعِ وَمُوْرِثٌ لِلشُّبْهَةِ فِيْ حَقِّ الْاٰخَرِ، لِاَنَّ السَّرِقَةَ تَثْبُتُ بِاِقْرَارِهِمَا عَلَى الشَّرِكَةِ فَاِنْ سَرَقَا ثُمَّ غَابَ اَحَدُهُمَا وَشَهِدَ الشَّاهِدَانِ عَلٰى سَرِقَتِهِمَا قُطِعَ الْاٰخَرُ فِيْ قَوْلِ اَبِيْ حَنِيْفَةَ الْاٰخِرِ وَهُوَ قَوْلُهُمَا وَكَانَ يَقُوْلُ اَوَّلًا : لَا يُقْطَعُ، لِاَنَّهُ لَوْ حَضَرَ رُبَّمَا يَدَّعِي الشُّبْهَةَ . وَجْهُ قَوْلِهِ الْاٰخِرِ اَنَّ الْغَيْبَةَ تَمْنَعُ ثُبُوْتَ السَّرِقَةِ عَلَى الْغَائِبِ فَيَبْقٰى مَعْدُوْمًا وَالْمَعْدُوْمُ لَا يُوْرِثُ الشُّبْهَةَ وَلَا مُعْتَبَرَ بِتَوَهُّمِ حُدُوْثِ الشُّبْهَةِ عَلٰى مَا مَرَّ ـ

অনুবাদ : চোর যদি দাবি করে যে, চুরিকৃত বস্তুটি তার মালিকানা, তাহলে সাক্ষ্য পেশ করতে না পারলেও হস্ত কর্তন রহিত হয়ে যাবে। অর্থাৎ দু'জন সাক্ষী চুরি সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদানের পর যদি সে ঐ দাবি করে। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, শুধু দাবি করার কারণে হদ্দ রহিত হবে না। কেননা কোনো চোরই এমন দাবি করতে অক্ষম হবে না। ফলে হদ্দ কায়েম করার দরজাই বন্ধ হয়ে যাবে।

আমাদের দলিল এই যে, মালিকানায় সৃষ্ট সন্দেহ হদ্দকে রহিত করে। আর শুধু দাবি উত্থাপনের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়ে যায়। কেননা তার দাবি সত্য হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ইমাম শাফেয়ী (র.) যা বলেছেন তা গ্রহণযোগ্য নয়। প্রমাণ হলো চুরি সম্পর্কে স্বীকারোক্তির পর তা প্রত্যাহারের বৈধতা।

দু'জন লোক যদি একটি চুরির ব্যাপারে স্বীকারোক্তি করে অতঃপর তাদের একজন বলে যে, সেটা আমার মাল, তাহলে দু'জনের মধ্যে কারো হস্ত কর্তন হবে না। কেননা প্রত্যাহারকারীর ক্ষেত্রে স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার কার্যকর হবে আর অপরজনের ক্ষেত্রে তা সন্দেহ সৃষ্টি করবে। কারণ চুরির অপরাধে উভয়ের শরিক হওয়ার স্বীকারোক্তি দ্বারা তা সাব্যস্ত হয়েছিল।

দু'জন চুরি করার পর একজন যদি গায়েব হয়ে যায়, অতঃপর দু'জন সাক্ষী তাদের চুরি সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর পরবর্তী মত অনুযায়ী (উপস্থিত) অপরজনের হস্ত কর্তন করা হবে। এটাই সাহেবাইনের মত।

প্রথম দিকে তিনি কর্তন সাব্যস্ত না হওয়ার কথা বলতেন। কেননা গায়েব লোকটি যদি উপস্থিত থাকতো, তাহলে হয়তো সন্দেহ উদ্রেককারী কোনো দাবি পেশ করত।

তার পরবর্তী মতের কারণ এই যে, অনুপস্থিতি অনুপস্থিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে চুরির অপরাধ সাব্যস্ত করাকে বাধাগ্রস্ত করে। সুতরাং (আলোচ্য বিচারে) সে অস্তিত্বহীন বলে গণ্য হবে। আর অস্তিত্বহীন ব্যক্তি (উপস্থিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে) সন্দেহ উদ্রেককারী হতে পারে না। আর আগে বলা হয়েছে যে, সন্দেহ উদ্রেকের নিছক ধারণা বিবেচ্য নয়)।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কেউ কিছু চুরি করল এবং এ ব্যাপারে দু'জন সাক্ষীও প্রদান করল। এরপর চোর দাবি করে বসল যে, চুরিকৃত বস্তুটি তার মালিকানা। কিন্তু সে তার দাবির পক্ষে সাক্ষী পেশ করতে পারল না, এমতাবস্থায় তার হাত কাটা হবে কি-না এ বিষয়ে আহনাফ ও ইমাম শাফেয়ী (র.) এর মাঝে মতভেদ রয়েছে। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন, হাত কাটা হবে। আহনাফ বলেছেন, হাত কাটা হবে না।

দলিল পর্ব : ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, বস্তুটি আমার এমন দাবি সকল চোরই করতে পারবে। অতএব, যদি শুধু এতটুকু দাবির কারণে হাত কাটা রহিত হয়ে যায়, তাহলে কোনো চোরেরই হাত কাটা যাবে না। হাত কাটার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে।

আহনাফের দলিল : একটি স্বীকৃতি কথা হলো, সন্দেহ দ্বারা হদ্দ রহিত হয়ে যায়। অতএব, চোর যখন দাবি করে যে, বস্তুটি তার তখন শুধু উক্ত দাবির কারণেই মালিকানা নিয়ে সন্দেহ সৃষ্টি হয়ে যায়। কারণ চোরের কথাও সত্য হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাই তার হাতকাটা যাবে না। কেননা হাতকাটার জন্য শর্ত হলো সন্দেহাতীতভাবে চুরির অপরাধ প্রমাণিত হওয়া। আলোচ্য সুরতে তা হয়নি।

ইমাম শাফেয়ী (র.) এর দলিলের জবাব : ইমাম শাফেয়ী (র.) যে বলেছেন, বস্তুটি আমার এমন দাবি সকল চোরই করতে পারবে, তাই তা গ্রহণযোগ্য নয়। এ কথাটি সঠিক নয়। কারণ আমরা দেখতে পাই, চোর যদি চুরির বিষয়ে স্বীকারোক্তি করে অতঃপর তা প্রত্যাহার করে নেয়, তাহলে তার প্রত্যাহার গ্রহণযোগ্য হয়। অথচ সকল চোরই এমনটি করতে সক্ষম। অতএব, সকলেই করতে সক্ষম হওয়াটা অগ্রহণযোগ্যতার দলিল হতে পারে না।

وَإِذَا اَقَرَّ رَجُلَانِ بِسَرِقَةٍ ثُمَّ قَالَ أَحَدُهُمَا : দুজন চোর এ মর্মে স্বীকারোক্তি প্রদান করল যে, তারা দুজন যৌথভাবে একটি চুরির কাজ সম্পন্ন করেছে। অতঃপর হাত কাটার রায় ঘোষণার পূর্বে কিংবা রায় ঘোষণার পরে এবং কার্যকর করার পূর্ব দু'জনের একজন দাবি করে বলল যে, চুরিকৃত মালটি তার। এমতাবস্থায় দু'জনেরই হাত কাটা রহিত হয়ে যাবে। কারণ যে চোর সম্পদের মালিকানা দাবি করেছে, তার ক্ষেত্রে তার কথাটি স্বীকারোক্তি প্রত্যাহাররূপে গণ্য হবে। তাই তার হাত কাটা হবে না। আর অপরজনের ক্ষেত্রে প্রথমজনের দাবিটি সন্দেহ সৃষ্টি করবে। কেননা চুরির অপরাধটি সাব্যস্ত হয়েছিল যৌথভাবে তারপর যখন একজন থেকে তা প্রত্যাহার হয়ে গেল, তখন অপরজন থেকেও প্রত্যাহার হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। অতএব, এর কারণে দ্বিতীয়জনের অপরাধটিও সন্দেহমুক্ত থাকেনি আর সন্দেহ মুক্ত না হলে হদ্দ কায়েম করা যায় না। তাই দ্বিতীয়জনের হাত কাটা রহিত হয়ে যাবে।

ইমাম মালেক শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর মতে উপরিউক্ত মাসআলায় রায় ঘোষণার পর দাবি করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না; বরং তখন উভয়ের হাত কাটা হবে।

فَإِنْ سَرَقَا ثُمَّ غَابَ أَحَدُهُمَا وَشَهِدَ : দু'জন চোর মিলে একটি চুরির ঘটনা সংঘটিত করার পর একজন গায়েব হয়ে গেছে। অপরজন আছে। অতঃপর দুজন সাক্ষী তাদের চুরির অপরাধের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছে। এমতাবস্থায় উপস্থিত চোরের হাতকাটা হবে কি-না এ সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফা (র.) দু'রকম মত পেশ করেছেন।

একটি হলো প্রথম দিকের মত। তা হলো এই যে, এক চোর গায়েব থাকাবস্থায় উপস্থিত অপর চোরের হাত কাটা যাবে না। আরেকটি হলো পরবর্তী মত। সে মত অনুযায়ী উপস্থিত চোরের হাত কাটা যাবে। এটা সাহেবাইনের মত। এমনকি ইমাম মালেক শাফেয়ী ও আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) এরও মত। অতএব, মাসআলাটি সর্বসম্মত হয়ে গেল।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) তার প্রথম মতের পক্ষে কারণ হিসাবে বলতেন, এক চোর গায়েব থাকাবস্থায় অপর চোরের হাত কাটা হবে না। কেননা যদি গায়েব চোরটি উপস্থিত থাকতো তাহলে হয়তো এসে এমন কোনো দাবি পেশ করত, যা সন্দেহের উদ্রেক করে। আর তখন উভয়ের হস্ত কর্তন রহিত হয়ে যেত। অতএব, এখন যদি উপস্থিত চোরের হাত কাটা হয়, তাহলে তা হবে সন্দেহপূর্ণ অবস্থায় হাত কাটা, যা মোটেও জায়েজ নেই।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর পরবর্তী মতের দলিল হলো, অনুপস্থিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো ফয়সালা করা জায়েজ না হওয়ার কারণে, অনুপস্থিত চোরের অনুপস্থিতি তার ক্ষেত্রে চুরি সাব্যস্ত করার পথে প্রতিবন্ধক। অতএব, তার চুরিটি অস্তিত্বহীন বলে গণ্য হবে। আর অস্তিত্বহীন বিষয় অস্তিত্ব সম্পন্ন বিষয়ের মাঝে সন্দেহের উদ্রেক করতে পারে না। তাই উপস্থিত চোরের চুরিটি সন্দেহযুক্ত হবে না; বরং তা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হবে এবং তার হাত কাটা হবে। তাছাড়া পূর্বেও বলা হয়েছে যে, ভবিষ্যতে সৃষ্টি হতে পারে এরূপ সন্দেহের কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। অতএব, গায়েব চোর হাজির হলে কী দাবি করত আর কি সন্দেহ সৃষ্টি হতো, সেসব দেখার বিষয় নয়। বর্তমানে যদি কোনো সন্দেহ থাকে, তাহলে সেটা বিবেচ্য। কিন্তু আলোচ্য সুরতে উপস্থিত চোরের চুরির বিষয়ে যেহেতু কোনো সন্দেহ বর্তমানে নেই, তাই তার হাত কেটে দেওয়া হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَإِذَا أَقَرَّ الْعَبْدُ الْمَحْجُوْرُ عَلَيْهِ بِسَرِقَةِ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ بِعَيْنِهَا فَإِنَّهُ يُقْطَعُ وَتُرَدُّ السَّرِقَةُ إِلَى الْمَسْرُوْقِ مِنْهُ وَهٰذَا عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ . وَقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ يُقْطَعُ وَالْعَشَرَةُ لِلْمَوْلٰى . وَقَالَ مُحَمَّدٌ : لَا يُقْطَعُ وَالْعَشَرَةُ لِلْمَوْلٰى وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ (رحـ) . وَمَعْنَاهُ إِذَا كَذَّبَهُ الْمَوْلٰى ـ

অনুবাদ : নিষেধাজ্ঞা আরোপকৃত গোলাম যদি নির্দিষ্ট দশ দিরহাম চুরির কথা স্বীকার করে তাহলে তার হস্ত কর্তন করা হবে এবং চুরিকৃত দিরহাম মালিককে ফেরত দেওয়া হবে। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, হস্ত কর্তন করা হবে। তবে দিরহামগুলো মনিবের হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, কর্তন করা হবে না তবে দিরহামগুলো মনিবের হবে। এটা ইমাম যুফার (র.) এরও মত। মাসআলাটির অর্থ এই যে, যদি মনিব তার স্বীকারোক্তিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

এ মাসআলায় ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) এর মত ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) এর মতের অনুরূপ।

ইমাম ত্বাহাবী (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, আমি আমার উস্তায ইবনে আবি উমারকে মতনে বর্ণিত তিন মতই ইমাম আবূ হানীফা (র.) হতে বর্ণনা করতে শুনেছি। ইমাম মুহাম্মদ (র.) প্রথমে ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর প্রথম উক্তিটি গ্রহণ করেছিলেন।

তারপর তা থেকে রুজূ করে দ্বিতীয় উক্তি গ্রহণ করেছেন। যা ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) অবলম্বন করেছেন। তারপর পুনরায় তৃতীয় উক্তির দিকে রুজূ' করেছেন, যা ইমাম যুফার (র.) অবলম্বন করেছেন।

উপরিউক্ত সকল মতামত কেবল তখনই প্রযোজ্য, যখন গোলামের দাবিকে মনিব মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। অর্থাৎ মনিব একথা বলে, এ মাল আমার। তাহলেই তাকে দশ দিরহাম দিয়ে দেওয়া হবে এবং গোলামেরও হাত কাটা হবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

وَلَوْ اَقَرَّ بِسَرِقَةِ مَالٍ مُسْتَهْلَكٍ قُطِعَتْ يَدُهُ وَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ مَأْذُوْنًا لَهُ يُقْطَعُ فِي الْوَجْهَيْنِ وَقَالَ زُفَرُ : لَا يُقْطَعُ فِي الْوُجُوْهِ كُلِّهَا لِاَنَّ الْاَصْلَ عِنْدَهُ اَنَّ اِقْرَارَ الْعَبْدِ عَلٰى نَفْسِهِ بِالْحُدُوْدِ وَالْقِصَاصِ لَا يَصِحُّ لِاَنَّهُ يَرِدُ عَلٰى نَفْسِهِ وَطَرْفِهِ وَكُلُّ ذٰلِكَ مَالُ الْمَوْلٰى، وَالْاِقْرَارُ عَلَى الْغَيْرِ غَيْرُ مَقْبُوْلٍ اِلَّا اَنَّ الْمَاْذُوْنَ لَهُ يُؤَاخَذُ بِالضَّمَانِ وَالْمَالِ لِصِحَّةِ اِقْرَارِهِ بِهِ لِكَوْنِهِ مُسَلَّطًا عَلَيْهِ مِنْ جِهَتِهِ .وَالْمَحْجُوْرُ عَلَيْهِ لَا يَصِحُّ اِقْرَارُهُ بِالْمَالِ اَيْضًا. وَنَحْنُ نَقُوْلُ يَصِحُّ اِقْرَارُهُ مِنْ حَيْثُ اَنَّهُ اٰدَمِيٌّ ثُمَّ يَتَعَدّٰى اِلَى الْمَالِيَّةِ فَيَصِحُّ مِنْ حَيْثُ اَنَّهُ مَالٌ، وَلِاَنَّهُ لَا تُهْمَةَ فِيْ هٰذَا الْاِقْرَارِ لِمَا يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ مِنَ الْاَضْرَارِ، وَمِثْلُهُ مَقْبُوْلٌ عَلَى الْغَيْرِ. لِمُحَمَّدٍ فِي الْمَحْجُوْرِ عَلَيْهِ اَنَّ اِقْرَارَهُ بِالْمَالِ بَاطِلٌ، وَلِهٰذَا لَا يَصِحُّ مِنْهُ الْاِقْرَارُ بِالْغَصْبِ فَيَبْقٰى مَالُ الْمَوْلٰى، وَلَا قَطْعَ عَلَى الْعَبْدِ فِيْ سَرِقَةِ مَالِ الْمَوْلٰى . يُؤَيِّدُهُ اَنَّ الْمَالَ اَصْلٌ فِيْهَا وَالْقَطْعُ تَابِعٌ حَتّٰى تُسْمَعَ الْخُصُوْمَةُ فِيْهِ بِدُوْنِ الْقَطْعِ وَيَثْبُتُ الْمَالُ دُوْنَهُ،

অনুবাদ : আর যদি এমন মাল চুরি করার স্বীকারোক্তি করে যা নষ্ট হয়ে গেছে তাহলে তার হস্ত কর্তন করা হবে। আর যদি অনুমতিপ্রাপ্ত গোলাম হয়, তাহলে উভয় অবস্থাতেই হস্ত কর্তন করা হবে। ইমাম যুফার (র.) বলেন, এ কোনো ক্ষেত্রেই হস্ত কর্তন করা হবে না।

কেননা তার মূলনীতি এই যে, নিজের বিপক্ষে গোলামের হদ্দ কিসাস সংক্রান্ত স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা (হত্যার বিষয়ে) তার স্বীকারোক্তি তার দেহ সত্তার উপর এবং (চুরির বিষয়ে) তার অঙ্গের উপর পতিত হয় আর এ সবই হচ্ছে মনিবের মাল। অথচ অন্যের বিপক্ষে কৃত স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। তবে অনুমতি প্রাপ্ত গোলামের ক্ষেত্রে স্বয়ং মাল কিংবা তার ক্ষতিপূরণ সাব্যস্ত করা হবে। কেননা যেহেতু মনিবের পক্ষ হতে আত্মঅধিকার প্রদত্ত হয়েছে, সেহেতু মাল সম্পর্কে তার স্বীকারোক্তি বৈধ হবে। পক্ষান্তরে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত গোলামের মাল সম্পর্কিত স্বীকারোক্তিও বৈধ হবে না। আর আমাদের বক্তব্য হলো মানব সত্তা হিসাবে তার আত্ম-স্বীকারোক্তি বৈধ। অতঃপর তা তার সম্পদ সত্তার দিকে সম্প্রসারিত। সুতরাং সম্পদ সত্তা হিসাবে তার স্বীকারোক্তি বৈধ হবে।

তাছাড়া যেহেতু এতে তার নিজের ক্ষতিও রয়েছে, সেহেতু এই স্বীকারোক্তিতে তোহমতের অবকাশ নেই। আর এ ধরনের স্বীকারোক্তি অন্যের বিপক্ষেও গ্রহণযোগ্য। নিষেধাজ্ঞা আরোপকৃত গোলামের ক্ষেত্রে ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর দলিল এই যে, মাল সম্পর্কিত তার স্বীকারোক্তি বাতিল এ জন্যই তার পক্ষ থেকে গসব সম্পর্কিত স্বীকারোক্তি বৈধ হয় না। সুতরাং তা মনিবের মালরূপেই গণ্য হবে। আর মনিবের মাল চুরির ক্ষেত্রে গোলামের উপর হস্ত কর্তন সাব্যস্ত হয় না।

এ বিষয়টি ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর বক্তব্যকে সমর্থন করে যে, চুরির অপরাধের ক্ষেত্রে সম্পদ হলো প্রধান বিবেচ্য এবং হস্ত কর্তন হলো তার অনুগামী। এ কারণেই হস্ত কর্তন ব্যতিরেকে শুধু মাল সম্পর্কে দাবি উত্থাপন গ্রহণযোগ্য এবং হস্ত কর্তন ব্যতিরেকে মাল সাব্যস্ত হয়।

https://e-ilm.weebly.com/

وَفِيْ عَكْسِهِ لَا تُسْمَعُ وَلَا يَثْبُتُ، وَإِذَا بَطَلَ فِيْمَا هُوَ الْأَصْلُ بَطَلَ فِي التَّبَعِ، بِخِلَافِ الْمَأْذُوْنِ لِأَنَّ إِقْرَارَهُ بِالْمَالِ الَّذِي فِيْ يَدِهِ صَحِيْحٌ فَيَصِحُّ فِيْ حَقِّ الْقَطْعِ تَبَعًا . وَلِأَبِيْ يُوْسُفَ أَنَّهُ أَقَرَّ بِشَيْئَيْنِ : بِالْقَطْعِ وَهُوَ عَلٰى نَفْسِهِ فَيَصِحُّ عَلٰى مَا ذَكَرْنَاهُ . وَبِالْمَالِ وَهُوَ عَلَى الْمَوْلٰى فَلَا يَصِحُّ فِيْ حَقِّهِ فِيْهِ، وَالْقَطْعُ يُسْتَحَقُّ بِدُوْنِهِ؛ كَمَا إِذَا قَالَ الْحُرُّ الثَّوْبُ الَّذِي فِيْ يَدِ زَيْدٍ سَرَقْتُهُ مِنْ عَمْرٍو وَزَيْدٌ يَقُوْلُ هُوَ ثَوْبِيْ يُقْطَعُ يَدُ الْمُقِرِّ وَإِنْ كَانَ لَا يُصَدَّقُ فِيْ تَعْيِيْنِ الثَّوْبِ حَتّٰى لَا يُؤْخَذَ مِنْ زَيْدٍ . وَلِأَبِيْ حَنِيْفَةَ أَنَّ الْإِقْرَارَ بِالْقَطْعِ قَدْ صَحَّ مِنْهُ لِمَا بَيَّنَّا فَيَصِحُّ بِالْمَالِ بِنَاءً عَلَيْهِ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ يُلَاقِيْ حَالَةَ الْبَقَاءِ، وَالْمَالُ فِيْ حَالَةِ الْبَقَاءِ تَابِعٌ لِلْقَطْعِ حَتّٰى تَسْقُطَ عِصْمَةُ الْمَالِ بِاعْتِبَارِهِ وَيُسْتَوْفَى الْقَطْعُ بَعْدَ اسْتِهْلَاكِهِ. بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْحُرِّ لِأَنَّ الْقَطْعَ إِنَّمَا يَجِبُ بِالسَّرِقَةِ مِنَ الْمُوْدَعِ . أَمَّا لَا يَجِبُ بِسَرِقَةِ الْعَبْدِ مَالَ الْمَوْلٰى فَافْتَرَقَا وَلَوْ صَدَّقَهُ الْمَوْلٰى يُقْطَعُ فِي الْفُصُوْلِ كُلِّهَا لِزَوَالِ الْمَانِعِ .

অনুবাদ : অথচ বিপরীত ক্ষেত্রে দাবি উত্থাপন গ্রহণযোগ্য হয় এবং হস্ত কর্তন সাব্যস্ত হয় না। আর মূল বিষয়ে যখন স্বীকারোক্তি বাতিল গণ্য হবে, তখন অনুগামী বিষয়েও তা বাতিল হবে। অনুমতিপ্রাপ্ত গোলামের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা তার হাতে বিদ্যমান মাল সম্পর্কে তার স্বীকারোক্তি বৈধ। সুতরাং অনুগামী হিসাবে কর্তনের ক্ষেত্রেও তা বৈধ হবে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) এর দলিল এই যে, সে দুটি বিষয় স্বীকার করেছে। একটি হলো হস্ত কর্তনের সাব্যস্তি, এটা তার নিজের বিপক্ষে স্বীকারোক্তি। সুতরাং তা বৈধ হবে, যেমন আমরা উল্লেখ করে এসেছি। দ্বিতীয়টি হলো মাল সম্পর্কে স্বীকারোক্তি, এটা হলো মনিবের বিপক্ষে। সুতরাং মনিবের ক্ষেত্রে মাল সম্পর্কে তা বৈধ হবে না। আর মাল (সাব্যস্ত হওয়া) ছাড়া হস্ত কর্তন সাব্যস্ত হতে পারে। যেমন একজন স্বাধীন ব্যক্তি বলল, যায়েদের হাতে যে কাপড় রয়েছে, তা আমি আমরের কাছ থেকে চুরি করেছি। আর যায়েদ বলল যে, সেটা আমার কাপড়, এমতাবস্থায় স্বীকারোক্তিকারীর হাত কাটা হবে। যদিও কাপড় নির্দিষ্ট করার বিষয়ে তাকে সত্য বলে গণ্য করা হবে না। এবং যায়েদের নিকট থেকে কাপড় নিয়ে আমরকে দেওয়া হবে না।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর দলিল এই যে, আমাদের পূর্ব বর্ণিত কারণে তার হস্ত কর্তন সংক্রান্ত স্বীকারোক্তি বৈধ। সুতরাং তার উপর ভিত্তি করে মাল সংক্রান্ত স্বীকারোক্তিও গ্রহণযোগ্য হবে।

কেননা স্বীকারোক্তি বিদ্যমান অবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত হয়। আর বিদ্যমান অবস্থায় মাল হচ্ছে হস্ত কর্তনের অনুবর্তী। এ কারণেই হস্ত কর্তনের দিক বিবেচনা করে মালের নিরাপত্তা গুণ রহিত করা হয় এবং মাল নষ্ট হয়ে যাওয়ার পরেও হস্ত কর্তন কার্যকর করা হয়। স্বাধীন ব্যক্তির মাসআলাটি ভিন্ন। কেননা যার কাছে আমানত গচ্ছিত রাখা হয়েছে, তার থেকে মাল চুরি করার কারণেও হস্ত কর্তন সাব্যস্ত হয়। পক্ষান্তরে মনিবের মাল চুরি করার কারণে গোলামের হস্ত কর্তন সাব্যস্ত হয় না। অতএব, ক্ষেত্র দুটি ভিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। আর যদি মনিব তাকে সত্যায়ন করে তাহলে প্রতিবন্ধকতা বিদূরীত হওয়ার কারণে সবকটি অবস্থায় হস্ত কর্তন সাব্যস্ত হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

বর্তমান মতনের আলোচনা পূর্ববর্তী মতনের আলোচনার সাথে সম্পৃক্ত। পূর্ববর্তী মতনে একটি মাসআলায় ইমামত্রয়ের মতামত বর্ণিত হয়েছিল। বর্তমান মতনে আরো কিছু মতামত এবং সকল মতের দলিল বর্ণিত হয়েছে। কিছু দলিলের জবাবও দেওয়া হয়েছে। অতএব, পূর্ববর্তী ও বর্তমান উভয় মতন একত্রে সামনে রেখেই বুঝার চেষ্টা করা উচিত।

সে হিসাবে উভয় মতনের সারসংক্ষেপ নিম্নে পেশ করা হলো। এ আলোচনাটি হৃদয়ঙ্গম করার পর মূল কিতাবের প্রতি মনোযোগ দিলে, আশা করি কিতাবের বক্তব্য অনুধাবন করা কঠিন হবে না। ইনশাআল্লাহ।

আলোচ্য মতন দু'টিতে মূলত গোলামের চুরি করা সম্পর্কিত একটি মাসআলা আলোচিত হয়েছে। যে গোলামটি চুরি করেছে, তার দু'অবস্থা হতে পারে ১. হয়তো সে عَبْدٌ مَحْجُوْرٌ عَلَيْهِ নিষেধাজ্ঞা আরোপিত গোলাম হবে। ২. কিংবা عبد مأذون অনুমতিপ্রাপ্ত গোলাম। চুরিকৃত সম্পদটি দু'অবস্থা হতে পারে। ১. সম্পদটি হয়তো বিদ্যমান আছে। ২. কিংবা চুরিকৃত সম্পদটি ধ্বংস হয়ে গেছে। এই দুই অবস্থার সাথে প্রথম দুই অবস্থা মিলালে চার অবস্থা হবে। তারপর গোলাম যখন চুরির কথা স্বীকার করবে তখন মনিবের পক্ষ হতে দুরকম প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পেতে পারে।

১. মনিব হয় গোলামের স্বীকারোক্তিটিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে।

২. অথবা সত্য বলে মেনে নিবে। এই দুইকে পূর্বের চারের সাথে গুণ করলে (৪×২) মোট আটটি অবস্থা হবে। যে আটটি অবস্থার তাফসীল নিম্নরূপ :

১. নিষেধাজ্ঞা আরোপিত গোলাম চুরি করেছে, চুরির মাল বিদ্যমান আছে এবং মনিব মিথ্যা প্রতিপন্ন করে।

২. নিষেধাজ্ঞা আরোপিত গোলাম চুরি করেছে, চুরি মাল ধ্বংস হয়ে গেছে এবং মনিব মিথ্যা প্রতিপন্ন করে।

৩. অনুমতিপ্রাপ্ত গোলাম চুরি করেছে, মাল বিদ্যমান আছে, মনিব মিথ্যা প্রতিপন্ন করে।

৪. অনুমতিপ্রাপ্ত গোলাম চুরি করেছে, মাল ধ্বংস হয়ে গেছে, মনিব মিথ্যা প্রতিপন্ন করে।

৫. নিষেধাজ্ঞা আরোপিত গোলাম চুরি করেছে, চুরির মাল বিদ্যমান আছে। এবং মনিব গোলামের স্বীকারোক্তি সত্যায়ন করে।

৬. নিষেধাজ্ঞা আরোপিত গোলাম চুরি করেছে। চুরির মাল ধ্বংস হয়ে গেছে, মনিব সত্যায়ন করে।

৭. অনুমতি প্রাপ্ত গোলাম চুরি করেছে, মাল বিদ্যমান আছে, মনিব সত্যায়ন করে।

৮. অনুমতি প্রাপ্ত গোলাম চুরি করেছে, মাল ধ্বংস হয়ে গেছে, মনিব সত্যায়ন করে।

(নোট: উপরিউক্ত ৮টি অবস্থা মূলত দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথম চার অবস্থায় মনিব তাকযীব করে তথা গোলামের দাবি মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। দ্বিতীয় চার অবস্থায় মনিব গোলামের দাবিকে তাসদীক করে অর্থাৎ সত্য বলে মেনে নেয়।

প্রতি চার সুরত আবার দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথম দু'সুরতে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত গোলাম চুরি করেছে। দ্বিতীয় দু'সুরতে অনুমতি প্রাপ্ত গোলাম চুরি করেছে। এই প্রত্যেক দুই সূরত আবার দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথম সুরতে মাল বিদ্যমান আছে। দ্বিতীয় সুরতে মাল ধ্বংস হয়ে গেছে এ বিভক্তিটি বুঝে নিলে আট সুরত মনে রাখা সহজ হবে।)

উপরিউক্ত আট সুরতের মধ্য থেকে শেষোক্ত চার সুরত অর্থাৎ পঞ্চম সুরত হতে অষ্টম সুরত পর্যন্ত যে চার সুরতে মনিব গোলামের স্বীকারোক্তিকে তাসদীক করে তাকে সত্য বলে মেনে নেয়, সেই চার সুরতের হুকুম নিয়ে ইমামদের মাঝে কোনো মতভেদ নেই; বরং মনিব যখন গোলামের চুরি সংক্রান্ত স্বীকারোক্তি সত্য বলে মেনে নেয়, তখন সকল ইমাম এ ব্যাপারে একমত যে, গোলামের হাত কেটে দেওয়া হবে। এবং চুরির মাল যদি বিদ্যমান থেকে থাকে তাহলে তা মালের মালিকের নিকট ফিরিয়ে দেওয়া হবে। ধ্বংস হয়ে গেলে জরিমানা নেই।

অবশিষ্ট প্রথম চার সুরত অর্থাৎ যে চার সুরতে গোলামের স্বীকারোক্তিকে মনিব তাকযীব বা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, এই চার সুরতের হুকুমের ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম আবূ ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম যুফার (র.) এর মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। অতএব, সুরতসমূহের ধারাবাহিকতা অনুসারে ইমামগণের মতভেদ নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

১নং সুরতের হুকুম : এ সুরতের হুকুমটিই পূর্ববর্তী মতনে সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মতে চোরের হাত কাটা হবে এবং মাল ফিরিয়ে দেওয়া হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে গোলামের হাত কাটা হবে, কিন্তু মাল ফিরিয়ে দেওয়া হবে না; বরং গোলামের মনিবের কাছেই মাল থেকে যাবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেছেন, হাতও কাটা হবে না, মালও ফিরিয়ে দেওয়া হবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

২নং সুরতের হুকুম : ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম আবূ ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ তিন ইমামের মতেই গোলামের হাত কেটে দেওয়া হবে। মাল ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কারণে জরিমানা নেই।

৩নং ও ৪নং সুরতের হুকুম : তিন ইমামের মতে হাত কাটা হবে। মাল বিদ্যমান থাকলে ফিরিয়ে দিতে হবে। ধ্বংস হয়ে গেলে জরিমানা নেই।

ইমাম যুফার (র) এর মত : ইমাম যুফার (র.) এর মতে উপরিউক্ত চার সুরতের কোনো সুরতেই গোলামের হাত কাটা হবে না। প্রথম সুরতে মাল ফিরিয়ে দেওয়া হবে না, এ সুরতে ইমাম যুফার (র.) এর মাযহাব ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর মাযহাবের মতো। দ্বিতীয় সুরতে জরিমানা নেই। তৃতীয় সুরতে মাল ফিরিয়ে দিতে হবে। চতুর্থ সুরতে জরিমানা দিতে হবে।

(নোট: ইমাম যুফার (র.) এর মতে আট সুরতের কোনো সুরতেই হাত কাটা হবে না। তিন ইমামের মতে প্রথম সুরতে এখতেলাফ, দ্বিতীয় ও চতুর্থ সুরতে হাত কাটা হবে। পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম সুরতে হাত কাটা হবে না।

ইবারত নির্দেশিকা :

وَاِذَا اَقَرَّ الْعَبْدُ الْمَحْجُوْرُ عَلَيْهِ بِسَرِقَةِ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ بِعَيْنِهَا ـ

প্রথম সুরত সম্পর্কিত এখতেলাফ বর্ণিত হয়েছে। আর لو اقرّ بسرقة مالٍ مُسْتَهْلِكٍ الخ ইবারতে দ্বিতীয় সুরতের হুকুম বর্ণিত হয়েছে তিন ইমামের মতে এবং وَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ مَأْذُوْنًا ইবারতে তিন ইমামের মতানুসারে তৃতীয় ও চতুর্থ সুরতের হুকুম বর্ণিত হয়েছে। وَقَالَ زُفَرُ (رح) - বলে উপরিউক্ত চার সুরত সম্পর্কে ইমাম যুফার (র.)-এর মাযহাব বর্ণনা করা হয়েছে এবং لِاَنَّ الْاَصْلَ عِنْدَهٗ বলে ইমাম যুফার (র.) এর দলিল বর্ণিত হয়েছে। وَنَحْنُ نَقُوْلُ يَصِحُّ الخ হতে ইমাম যুফার (র.) এর বিপক্ষে, তিন ইমামের মতের দলিল বর্ণনা করা হয়েছে। لِمُحَمَّدٍ (رح) থেকে প্রথম সুরত সম্পর্কে ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর যে মাযহাব ছিল তার দলিল বর্ণিত হয়েছে। وَلَوْ قَالَ হতে ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর দলিলের সমর্থক মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে। وَلِاَبِيْ يُوْسُفَ হতে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) এর দলিল বর্ণনা করা হয়েছে।

كَمَا اِذَا كَانَ الْحُرُّ ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) এর একটি কিয়াস এবং وَلِاَبِيْ حَنِيْفَةَ - হতে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল। بِخِلَافِ مَسْاَلَةِ الْحُرِّ হতে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর কিয়াসের জবাব। وَلَوْصَدَّقَهُ الْمَوْلٰى - বলে শেষ চার সুরত তথা তাসদীকের চার সুরতের হুকুম ইল্লতসহ বর্ণনা করা হয়েছে।

দলিল পর্ব : প্রথম চার সুরতের হুকুম নিয়ে তিন ইমাম ও ইমাম যুফার (র.) এর মাঝে যে মতভেদ হয়েছে, তার দলিল প্রথমে উল্লেখ হলো মূল কিতাবের বিন্যাস অনুযায়ী।

ইমাম যুফার (র.) বলেছেন, প্রথম চার সুরতের কোনো সুরতেই গোলামের হাতকাটা হবে না। এ ক্ষেত্রে তার মতের ভিত্তি হলো তারই একটি মূলনীতি। মূলনীতিটি এই যে, গোলামের নিজের বিপক্ষে হদ্দ বা কিসাস সংক্রান্ত স্বীকারোক্তি শুদ্ধ নয়। কারণ গোলাম যদি কিসাসের স্বীকারোক্তি করে, তাহলে এটা তার দেহের উপর পতিত হবে। অর্থাৎ কিসাস বাস্তবায়ন কালে তার দেহ সত্তা ধ্বংস হবে। আর যদি সে হদ্দ স্বীকার করে তাহলে সেটা তাদের অঙ্গের উপর পতিত হবে। অর্থাৎ হদ্দ বাস্তবায়ন হলে তার অঙ্গ নষ্ট হবে। আর গোলামের দেহ ও অঙ্গ সবই মনিবের মালিকানা। সে হিসাবে গোলামের স্বীকারোক্তি মূলত মনিবের বিপক্ষে হলো। আর অন্যের বিপক্ষে কারো স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য হয় না। বিধায় এখানেও মনিবের বিপক্ষে গোলামের স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য হবে না। অতএব, তার হাত কাটা হবে না।

তবে চুরি স্বীকারকারী গোলামটি যদি অনুমতি প্রাপ্ত হয়, তাহলে চুরির মাল তার কাছ থেকে ফেরত নেওয়া হবে যদি তা বিদ্যমান থাকে, আর ধ্বংস হয়ে গেলে জরিমানা দিতে হবে। কারণ সে মালামাল সংক্রান্ত বিষয়ে নিজ মনিবের পক্ষ থেকে অনুমতিপ্রাপ্ত। তাই মাল সম্পর্কে তার স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য হবে এবং সে যা স্বীকার করেছে, তা তার কাছ থেকে উসূল করা হবে। গোলাম যদি অনুমতিপ্রাপ্ত না হয় বরং মাহজুর তথা নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়, তাহলে মাল সম্পর্কেও তার স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। দেহ সম্পর্কেও নয়। অতএব, ইমাম যুফার (র.)-এর মতে অনুমতিপ্রাপ্ত গোলামের স্বীকারোক্তি দ্বারা হদ্দ ওয়াজিব না হলেও মাল ওয়াজিব হয়। আর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত গোলামের স্বীকারোক্তি দ্বারা হদ্দ কিসাস মাল কিছুই ওয়াজিব হয় না

তিন ইমামের দলিল : তিন ইমামের মতে গোলামের স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য হবে এবং প্রথম চার সুরতের শেষ তিন সুরতে সবার মতেই হাত কাটা হবে। প্রথম সুরতে তাদের পরস্পরে মতানৈক্য হলেও অধিকাংশের মতে হাত কাটা হবে। এ ক্ষেত্রে ইমাম ত্রয়ের দলিল হলো এই যে, গোলামের মধ্যে দু'টি দিক রয়েছে। একদিকে থেকে মানুষ বা আদমের সন্তান তাকে খেতাব করা যায়। এদিক থেকে সে স্বাধীন মানুষের মতোই। কেননা উভয়ই মানুষ। আরেকটি দিক হলো সে মনিবের মাল বা সম্পদ।

https://e-ilm.weebly.com/

ইমামত্রয় বলেন, প্রথম দিকটির বিবেচনায় সে যেহেতু স্বাধীন মানুষের মতো, সেহেতু স্বাধীন মানুষের মতোই স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য হবে। অতঃপর এই গ্রহণযোগ্যতা তার মানবসত্তা হতে সম্পদ সত্তার দিকে সম্প্রসারিত হবে, ফলে সম্পদ হিসাবেও এখন তার স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা তার মানব সত্তাটি কখনো তার সম্পদসত্তা হতে পৃথক হতে পারে না।

মোটকথা, গোলাম মনিবের হিসাবে তার স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য না হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু মানবসত্তার অনুগামী হওয়ার কারণে সম্পদের স্বীকারোক্তিও এখন গ্রহণযোগ্য হয়।

তাছাড়া আরেকটি কারণ হলো এই যে, গোলাম যখন চুরির স্বীকারোক্তি করে, তখন এর দ্বারা মনিবের তুলনায় গোলাম নিজে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। কেননা মনিবের মাল নষ্ট হবে। আর গোলামের তো শরীরের অঙ্গ কাটা যাবে। এ কারণে এ ধরনের স্বীকারোক্তিতে মিথ্যাবাদীতার অবকাশ নেই। বিধায় এ স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য হবে। অন্যের বিরুদ্ধে হওয়া সত্ত্বেও যেমন কেউ যদি স্বীকার করে যে, সে অমুককে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করেছে, তাহলে সব ইমামই বলেন, তার স্বীকারোক্তি গ্রহণ্যযোগ্য হবে অথচ এ স্বীকারোক্তির কারণে অন্যদের ক্ষতি হয়। অর্থাৎ যারা তার কাছে ঋণ পেত তাদের ঋণ মওকুফ হয়ে যায়। তা সত্ত্বেও তার স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য হয় এবং কিসাস নেওয়া হয়। কারণ এ স্বীকারোক্তিতে অন্যের ক্ষতি থাকলেও স্বীকারোক্তিকারীর নিজের ক্ষতি অন্যদের মাল যাচ্ছে আর তার জান যাচ্ছে। তদ্রূপ আলোচ্য মাসআলায়ও গোলামের স্বীকারোক্তি দ্বারা মনিবের ক্ষতির তুলনায় গোলামের নিজের ক্ষতি অধিক হওয়ার কারণে তার স্বীকারোক্তিটি তোহমত হতে মুক্ত এবং গ্রহণযোগ্য। প্রথম সুরতের হুকুম নিয়ে ইমামত্রয়ের যে মতভেদ হয়েছে সে সম্পর্কিত দলিল: মূল দলিল বর্ণনা করার পূর্বে এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা আবশ্যক যে, ইমামত্রয়ের মাঝে যে মতভেদটি হয়েছে তার ভিত্তি মূলত একটি বিতর্কিত মূলনীতির উপর। বিতর্কিত মূলনীতিটি হলো এই যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মতে চোরের হস্ত কর্তন হলো আসল বা মূল শাস্তি। আর সম্পদ হলো হস্ত কর্তনের অনুগামী বিষয়। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে হস্তকর্তন ও সম্পদ উভয় আসল বা মূল। একটি অপরটির অনুগামী নয়। ইমাম মুহাম্মদ (র.) অনুগামী। এমতপার্থক্যের ক্ষেত্রেও ইমামগণের স্ব স্ব মতের পক্ষে দলিল বিদ্যমান আছে। আলোচনা দীর্ঘ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় সে প্রসঙ্গ এখানে আর টানা হলো না।

যাই হোক, ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেছিলেন, নিষেধাজ্ঞা আরোপিত গোলাম যদি নির্দিষ্ট দশ দিরহাম চুরির কথা স্বীকার করে, তাহলে তার হাতও কাটা হবে না এবং মালও ফিরিয়ে দেওয়া হবে না দশ দিরহাম মনিবের মালিকানায় থেকে যাবে।

এমতের পক্ষে তার দলিল হলো এই যে, গোলামটি মাহজুর বা নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হওয়ার কারণে অর্থ সম্পদ সম্পর্কে তার কোনো স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। একারণেই যে যদি গসব বা অপহরণ বিষয়ে স্বীকারোক্তি করে, তাহলেও তা গ্রহণযোগ্য হয় না। অতএব, যখন তার সম্পদ সম্পর্কে তার স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য হলো না, তখন ঐ স্বীকারকৃত দশদিরহাম মনিবের সম্পদ বলে গণ্য হবে। আর মনিবের সম্পদের জন্য গোলামের হাতকাটা হয় না। তাছাড়া ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর মূলনীতি (সম্পদ আসল ও হস্ত কর্তন তার অনুগামী) হিসাবে যখন সম্পদের ব্যাপারে গোলামের স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য হয় নি, তখন হাত কাটার ব্যাপারেও গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা আসলের ক্ষেত্রে যা গ্রহণযোগ্য হয়নি, অনুগামীর ক্ষেত্রে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। অতএব, গোলামের হাতও কাটা হবে না, মালও ফেরত দিতে হবে না। يريد বলে মুসান্নিফ (র.) এ বক্তব্যের দিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

সম্পদ আসল এবং হস্ত কর্তন তার অনুগামী এ বিষয়টির দলিল হলো এই যে, কেউ যদি হস্ত কর্তন ব্যতীত শুধু সম্পদের জন্য অভিযোগ দায়ের করে তাহলে তার অভিযোগ গ্রহণযোগ্য হয় এবং হস্তকর্তন ব্যতীতই তার জন্য সম্পদ সাব্যস্ত হয়। যেমন কেউ বলল, আমি শুধু আমার চুরি হয়ে যাওয়া মালগুলো ফেরত চাই, চোরের হাত কাটা হোক এটা আমি চাই না, তাহলে দাবি মোতাবেক তার মাল ফিরিয়ে দেওয়া হয়, চোরের হাত কাটা হয় না। পক্ষান্তরে যদি কেউ মাল ব্যতীত শুধু হস্ত কর্তন দাবি করে, তাহলে তার দাবি গ্রহণযোগ্য হয় না। এর দ্বারা বুঝা যায়, সম্পদ হলো আসল বা মূল। আর হস্ত কর্তন হলো সম্পদের অনুগামী। তাই ইমাম মুহাম্মদ (র.) উক্ত মূলনীতির ভিত্তিতে বলেছেন, মাল সম্পর্কে গোলামের স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় হস্ত কর্তন সম্পর্কে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, স্বীকারোক্তিকারী গোলামটি যদি অনুমতিপ্রাপ্ত হয়ে থাকে, তাহলে সম্পদের বিষয়ে তার স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য হবে এবং হস্ত কর্তন সাব্যস্ত হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেছিলেন, গোলামের হাত কাটা হবে, কিন্তু মাল ফিরিয়ে দেওয়া হবে না। বরং দশ দিরহাম মনিবের জন্য সাব্যস্ত হবে। এ ক্ষেত্রে তার দলিল হলো এই যে, গোলাম পৃথক পৃথক দু'টি বিষয়ের স্বীকারোক্তি প্রদান করেছে। একটি স্বীকারোক্তি হলো তার হস্ত কর্তন সম্পর্কে, এটা তার নিজের বিরুদ্ধে। গোলাম যেহেতু

https://e-ilm.weebly.com/

মানুষ সে স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য হবে, যেমন পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে। আরেকটি স্বীকারোক্তি করেছে সম্পদ সম্পর্কে। এটি তার মনিবের বিরুদ্ধে তাই এটি যোগ্য হবে না। অতএব, তার হাত কাটা হবে, মাল ফেরত দেওয়া হবে না।

মাল ব্যতীত হস্ত কর্তন সাব্যস্ত হতে পারে এর একটি নজির হলো এই যে, কোনো স্বাধীন ব্যক্তি বলল, যায়েদের কাছে যে কাপড়টি আছে আমি সেটি আমরের নিকট থেকে চুরি করেছিলাম। কিন্তু যায়েদ বলেছে, এটি আমার কাপড়। এমতাবস্থায় চুরির কথা স্বীকারকারী স্বাধীন লোকটির হাত কেটে দেওয়া হবে। কিন্তু কাপড় নির্ধারণের ব্যাপারে তার কথা সত্য বলে গ্রহণযোগ্য হবে না এবং কাপড়টি যায়েদ হতে নিয়ে আমরকে দেওয়া হবে না। তাহলে এখানে দেখা গেল, মাল সাব্যস্ত হওয়া ছাড়াও হস্ত কর্তন সাব্যস্ত হয়। তেমনিভাবে আলোচ্য মাসআলাতেও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে মাল সাব্যস্ত হবে না। কিন্তু হস্ত কর্তন সাব্যস্ত হবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর দলিল :

ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেছিলেন, গোলামের হাতও কাটা হবে, মালও ফিরিয়ে দেওয়া হবে। এ ক্ষেত্রে তার দলিল হলো এই যে, গোলাম একজন মানুষ। সে হিসেবে হাতকাটা সম্পর্কে তার স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য হবে। অতঃপর হাতকাটার অনুগামী হিসাবে মাল সম্পর্কিত তার স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা তার মতে হস্তকর্তন আসল মূল ; মাল তার অনুগামী। অতএব, গোলামের স্বীকারোক্তি যখন আসলের ব্যাপার গ্রহণযোগ্য হলো তখন অনুগামী বিষয়ের ক্ষেত্রেও গ্রহণযোগ্য হবে। বিধায় তার হাত কাটা হবে, মালও ফেরত দিতে হবে।

হস্ত কর্তন মূল, সম্পদ তার অনুগামী এবিষয়ের দলিল হলো এই যে, স্বীকারোক্তি বিদ্যমানতার অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত হয়। অর্থাৎ যে কোনো বিষয়ের স্বীকারোক্তি বিষয়টি ঘটার পরেই হয়ে থাকে। যে কাজ ঘটেছে, তা স্বীকার করা হয়। সংঘটিত হওয়ার পূর্বে কিসাস স্বীকার করা যায় না। আর চুরির পরবর্তী অবস্থায়, সম্পদ হাত কাটার অনুগামী হয়ে থাকে। এ কারণে হাত কাটা হলে সম্পদের জরিমানা বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেলেও হাত কাটা যায়। সম্পদ যদি আসল বা মূল হতো তাহলে সম্পদ ধ্বংস হয়ে যাওয়া অবস্থায় চোরের হাত কাটা যেত না। কারণ মূল না থাকলে শাখা থাকে কীরূপে? কিন্তু সম্পদ যেহেতু মূল নয়। সেহেতু তা ধ্বংস হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও হাত কাটা যায়। মোটকথা, ইমাম আবূ হানীফা (র.) চুরির পরবর্তী অবস্থায় কিংবা বলুন, চুরি সংঘটিত হওয়ার পরের সময়গুলোতে হাত কাটাকে মূল মনে করেন এবং সম্পদকে মনে করেন অনুগামী। তাই তার মতে হস্ত কর্তনের ক্ষেত্রে গোলামের স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য হওয়ার ফলে সম্পদের ক্ষেত্রেও তা গ্রহণযোগ্য হয়।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর কিয়াসের জবাব :

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) আলোচ্য মাসআলাকে কিয়াস করেছিলেন স্বাধীন ব্যক্তির চুরি সম্পর্কিত স্বীকারোক্তির মাসআলার সাথে। এর জবাবে বলা হয়েছে যে, মাসআলা দুটি এক নয়। অতএব, একটিকে অপরটির সাথে তুলনা করা যাবে না। মাসআলা দুটি এক না হওয়ার ব্যাখ্যা হলো, স্বাধীন ব্যক্তি যখন বলল, যায়েদের কাছে যে কাড়পটি আছে আমি তা আমরের নিকট হতে চুরি করেছিলাম তখন কাপড়টি আমরের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া ছাড়াই চোরের হাতকাটা যায়। কেননা হতে পারে কাপড়টি মূলত যায়েদের। চুরি করার সময় সেটি আমরের কাছে আমানত হিসাবে সংরক্ষিত ছিল আর পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে যে, আমানত সংরক্ষণকারীর নিকট থেকে চুরি করলে চোরের হাত কাটা হয়, মাল আমানত সংরক্ষণকারীর নিকট ফিরিয়ে দেওয়া ব্যতীতই। সে হিসাবে উক্ত কাপড়টি আমরের কাছে ফিরিয়ে না দিয়েও চোরের হাত কাটা হয়। পক্ষান্তরে আলোচ্য মাসআলায় যদি মনে করা হয় যে, সম্পদ ফিরিয়ে দেওয়া হবে না, মালিকের কাছে থেকে যাবে। তাহলে এটাই বলতে হবে যে, সম্পদটা মূলত গোলামের মনিবের। যার নিকট থেকে গোলাম তা চুরি করেছে তার কাছে এটা আমানত ছিল। তখন আমরা বলব, সম্পদ যদি মনিবের হয়ে থাকে, তাহলে তো গোলামের হাতও কাটা যাবে না। কেননা মনিবের সম্পদ চুরি করলে গোলামের হাত কাটা হয় না। অতএব, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) যা বললেন, শুধু হাত কাটা হবে, মাল ফিরিয়ে দেওয়া ব্যতীত তা সম্ভব হলো না।

মোটকথা, স্বাধীন ব্যক্তির মাসআলায় যার নিকট হতে চুরি হয়েছে তার কাছে মাল ফেরত দেওয়া ছাড়াই চোরের হাত কাটার সুযোগ আছে, যদি তাকে আমানত সংরক্ষণকারী হিসাবে ধরে নেওয়া হয়। পক্ষান্তরে আলোচ্য মাসআলায় যার নিকট থেকে চুরি হয়েছে, তার নিকট মাল ফিরিয়ে দেওয়া ব্যতীত চোরের হাত কাটার সুযোগ নেই। কেননা তাকে আমানতদার হিসাবে ধরা হলে মালটি মনিবের হয়ে যায়। আর মালটি মনিবের বলে সাব্যস্ত হলে তা চুরি করার দায়ে গোলামের (চোরের) হাত কাটা যায় না। অতএব, মাসআলা দুটির মাঝে পার্থক্য রয়েছে। বিধায় একটিকে অপরটির সাথে তুলনা করা যাবে না, যেমন ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) করেছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ وَاِذَا قُطِعَ السَّارِقُ وَالْعَيْنُ قَائِمَةٌ فِيْ يَدِهِ رُدَّتْ عَلٰى صَاحِبِهَا لِبَقَائِهَا عَلٰى مِلْكِهِ وَاِنْ كَانَتْ مُسْتَهْلَكَةً لَمْ يَضْمَنْ وَهٰذَا الْاِطْلَاقُ يَشْمَلُ الْهَلَاكَ وَالِاسْتِهْلَاكَ، وَهُوَ رِوَايَةُ اَبِيْ يُوْسُفَ عَنْ اَبِيْ حَنِيْفَةَ وَهُوَ الْمَشْهُوْرُ . وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْهُ اَنَّهُ يَضْمَنُ بِالِاسْتِهْلَاكِ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يَضْمَنُ فِيْهِمَا لِاَنَّهُمَا حَقَّانِ قَدْ اخْتَلَفَ سَبَبَاهُمَا فَلَا يَمْتَنِعَانِ فَالْقَطْعُ حَقُّ الشَّرْعِ وَسَبَبُهُ تَرْكُ الِانْتِهَاءِ عَمَّا نَهٰى عَنْهُ . وَالضَّمَانُ حَقُّ الْعَبْدِ وَسَبَبُهُ اَخْذُ الْمَالِ فَصَارَ كَاسْتِهْلَاكِ صَيْدٍ مَمْلُوْكٍ فِي الْحَرَمِ اَوْ شُرْبِ خَمْرٍ مَمْلُوْكَةٍ لِذِمِّيٍّ. وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ﴿لَا غُرْمَ عَلَى السَّارِقِ بَعْدَمَا قُطِعَتْ يَمِيْنُهُ﴾ وَلِاَنَّ وُجُوْبَ الضَّمَانِ يُنَافِي الْقَطْعَ لِاَنَّهُ يَتَمَلَّكُهُ بِاَدَاءِ الضَّمَانِ مُسْتَنِدًا اِلٰى وَقْتِ الْاَخْذِ، فَتَبَيَّنَ اَنَّهُ وَرَدَ عَلٰى مِلْكِهِ فَيَنْتَفِي الْقَطْعُ لِلشُّبْهَةِ وَمَا يُؤَدِّي اِلٰى اِنْتِفَائِهِ فَهُوَ الْمُنْتَفِي، وَلِاَنَّ الْمَحَلَّ لَا يَبْقٰى مَعْصُوْمًا حَقًّا لِلْعَبْدِ،

অনুবাদ : গ্রন্থকার বলেন, যদি চুরির মাল চোরের হাতে বিদ্যমান থাকা অবস্থায় তার হস্তকর্তন করা হয় তাহলে উক্ত মাল মালিকের কাছে প্রত্যার্পণ করা হবে। কেননা এখনো তার মালিকানায় বিদ্যমান রয়েছে। **আর যদি মাল বিনষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে সে তার ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে না।**

আর ইমাম কুদূরী (র.) এ সম্পর্কিত নিঃশর্ত এবারত নিজে নষ্ট হয়ে যাওয়া এবং নষ্ট করে ফেলা উভয় প্রকারকে অন্তর্ভুক্ত করে। এটি ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) এর সূত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর এক বর্ণনা। আর এটাই প্রসিদ্ধ মত। পক্ষান্তরে ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ (র.) বর্ণনা করেছেন যে, নষ্ট করে ফেলার কারণে ক্ষতিপূরণ দিবে। আর ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন যে, উভয় ক্ষেত্রেই ক্ষতিপূরণে প্রদান করব। কেননা হস্ত কর্তন এবং ক্ষতিপূরণ দুটি আলাদা হক। যাদের কারণও ভিন্ন ভিন্ন। সুতরাং একটি কারণে অন্যটি রহিত হবে না।

হস্ত কর্তন হচ্ছে শরিয়তের হক, আর তার কারণ হচ্ছে শরিয়ত যে কাজ নিষেধ করেছে, তা থেকে বিরত না থাকা। পক্ষান্তরে ক্ষতিপূরণ হচ্ছে বান্দার বিরত না থাকা। আর তার কারণ হলো মাল নেওয়া । সুতরাং এটা হারাম শরীফে কারো মালিকানাধীন শিকার হত্যা বা বিনষ্ট করার মতো হলো। কিংবা জিম্মির মালিকানাধীন মদ পান করার মতো হলো ।

আমাদের দলিল হলো নবী করীম ﷺ এর উক্তি :

لَا غُرْمَ عَلَى السَّارِقِ بَعْدَمَا قُطِعَتْ يَمِيْنُهُ

ডান হস্ত কর্তিত হওয়ার পর চোরের উপর কোনো ক্ষতিপূরণ নেই।

তাছাড়া এই কারণে যে, ক্ষতিপূরণের সাব্যস্তি হস্তকর্তনের পরিপন্থি। কেননা ক্ষতিপূরণ আদায়ের মাধ্যমে চুরি করার সময় কালের সাথে সম্পৃক্ত অবস্থায় সে উক্ত মালের মালিক হয়ে যায়। সুতরাং এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, তার মালিকানাধীন মালেই বিষয়টি ঘটেছে। অতএব, মালিকানার সন্দেহ জনিত কারণে কর্তন রহিত হয়ে যাবে। আর যা রহিত হওয়া পর্যন্ত পৌছায়, তা নিজেই রহিত হয়ে থাকে। তাছাড়া বান্দার হক হিসাবে চুরির ক্ষেত্রটি (তথা চুরির মালটি) নিরাপত্তাগুণ সম্পন্ন থাকতে পারে না।

https://e-ilm.weebly.com/

إِذْ لَوْ بَقِيَ لَكَانَ مُبَاحًا فِيْ نَفْسِهِ فَيَنْتَفِي الْقَطْعُ لِلشُّبْهَةِ فَيَصِيْرُ مُحَرَّمًا حَقًّا لِلشَّرْعِ كَالْمَيْتَةِ وَلَا ضَمَانَ فِيْهِ إِلَّا أَنَّ الْعِصْمَةَ لَا يَظْهَرُ سُقُوْطُهَا فِيْ حَقِّ الْإِسْتِهْلَاكِ لِأَنَّهُ فِعْلٌ أٰخَرُ غَيْرُ السَّرِقَةِ وَلَا ضَرُوْرَةَ فِيْ حَقِّهِ، وَكَذَا الشُّبْهَةُ تُعْتَبَرُ فِيْمَا هُوَ السَّبَبُ دُوْنَ غَيْرِهِ . وَوَجْهُ الْمَشْهُوْرِ أَنَّ الْإِسْتِهْلَاكَ إِتْمَامُ الْمَقْصُوْدِ فَتُعْتَبَرُ الشُّبْهَةُ فِيْهِ، وَكَذَا يَظْهَرُ سُقُوْطُ الْعِصْمَةِ فِيْ حَقِّ الضَّمَانِ لِأَنَّهُ مِنْ ضَرُوْرَاتِ سُقُوْطِهَا فِيْ حَقِّ الْهَلَاكِ لِانْتِفَاءِ الْمُمَاثَلَةِ .

অনুবাদ : কেননা যদি তা থাকে, তাহলে সত্তাগতভাবে তা হালাল হবে। ফলে হালাল হওয়ার সন্দেহ জনিত কারণে কর্তন রহিত হয়ে যাবে। সুতরাং শরিয়তের হক হিসাবে তা হারামগণ্য হবে। যেমন মৃত জন্তু হারাম। আর তাতে ক্ষতিপূরণ সাব্যস্ত হয় না।

তবে নষ্ট করার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা গুণ রহিত হওয়ার বিষয়টি প্রকাশ পাবে না। কেননা এটা চুরির অতিরিক্ত একটা কাজ। আর এর ক্ষেত্র (মালের নিরাপত্তাগুণ রহিত হওয়ার) প্রয়োজন নেই। তদ্রূপ সন্দেহ, এবিষয়টিকে হদ্দ অনিবার্যকারী কারণের ক্ষেত্রে বিবেচনায় আনা হয়। যাতে কারণ কে অকার্যকর করে হদ্দ রহিত করা যায়। অন্যক্ষেত্রে তা বিবেচনায় আনা হয় না।

প্রসিদ্ধ বর্ণনার কারণ এই যে, মাল নষ্টকরণ হলো (নিজের কাজ ব্যয় করার) উদ্দেশ্যকে পূর্ণতা দান। সুতরাং তাতে সন্দেহ বিবেচ্য হবে। তদ্রূপ ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রেই নিরাপত্তা গুণ রহিত হওয়ার বিষয়টি প্রকাশ পাবে। কারণ এটা বিনষ্ট হয়ে যাওয়া মালের ক্ষেত্রে নিরাপত্তাগুণ রহিত হওয়ার অনিবার্য দাবি। কেননা চুরিকৃত মাল ও তার ক্ষতিপূরণের মাঝে কোনো সাদৃশ্য নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিউক্ত ইবারতে চুরির মাল ফেরত দেওয়া ও তার ক্ষতিপূরণ দেওয়া প্রসঙ্গে একটি মতানৈক্যপূর্ণ মাসআলা আলোচিত হয়েছে। এ বিষয়ে কোনো মতভেদ নেই যে, চুরির মালটি চোরের হাতে বিদ্যমান থাকা অবস্থায় যদি চোরের হাতকাটা হয় তাহলে মালটিও তার মালিকের নিকট ফিরিয়ে দিতে হবে। কারণ মালটি তখনো মালিকের মালিকানায় থেকে যায়। তাই সেটা মালিকের নিকট ফিরে যাবে। কিন্তু যদি চুরির মালটি ধ্বংস হয়ে যায় কিংবা ধ্বংস করে ফেলা হয়, তাহলে এর ক্ষতিপূরণ দিতে হবে কিনা? এ নিয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদ হয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) হতে দু'রকম বর্ণনা পাওয়া যায়।

১. ইমাম আবূ ইউসুফ সূত্রে বর্ণিত আছে, ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মতানুসারে নষ্ট হয়ে গেলে বা নষ্ট করা হলে কোনো অবস্থাতেই ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না।

২. হাসান ইবনে যিয়াদের সূত্র বর্ণিত আছে, নষ্ট হয়ে গেলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না কিন্তু নষ্ট করা হলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

৩. ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন, উভয় অবস্থাতেই ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) তাই বলেন।

৪. ইমাম মালেক (র.) দুদিকেই লক্ষ্য করেছেন, তিনি বলেছেন, চোর গরিব হলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। ধনী হলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

দলিল পর্ব : ইমাম শাফেয়ী (র.) এর দলিল :

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, হাত কাটা এবং ক্ষতিপূরণ দেওয়া ভিন্ন ভিন্ন দুটি হক। প্রথমটি আল্লাহর হক আর দ্বিতীয়টি বান্দার হক। দুটির কারণও পৃথক পৃথক। হাত কাটা ওয়াজিব হয়, শরিয়ত কর্তৃক নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হওয়ার

https://e-ilm.weebly.com/

কারণে। আর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয় অন্যের মাল নিয়ে যাওয়ার কারণে। অতএব, উভয় হক পৃথক পৃথকভাবে আদায় করতে হবে। একটি আদায় করার দ্বারা অপরটি রহিত হয়ে যাবে না।

আলোচ্য মাসআলার নজির হিসাবে ইমাম শাফেয়ী (র.) আরো দুটি মাসআলা পেশ করেন

১. যেমন কোনো ব্যক্তি হেরেম শরীফে থাকা অবস্থায় অন্যের মালিকানাধীন কোনো শিকার মেরে ফেলল। এতে সে দুটি অপরাধ করল। প্রথমত শরিয়ত কর্তৃক নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হলো এটা আল্লাহর হক নষ্ট করা। দ্বিতীয়ত সে অন্যের সম্পদ নষ্ট করল। এটা বান্দার হক নষ্ট করা। দু'রকম হক নষ্ট করার কারণে দুটি পরিণতি তাকে ভোগ করতে হয়। নিষিদ্ধ কাজ করার কারণে দম দিতে হয়।

২. কেউ যদি জিম্মি ব্যক্তির মালিকানাধীন মদপান করে তাহলে তার দ্বারাও দুটি অপরাধ সংঘটিত হয়।

এক. হারাম কাজে লিপ্ত হওয়া অর্থাৎ মদ পান করা।

দুই. অন্যের মাল নষ্ট করা। এ কারণে তা দু'ধরনের পরিণতি ভোগ করতে হয়। মদ পানের হদ্দ ভোগ করতে হয় এবং জিম্মিকে মদের ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। অনুরূপভাবে আলোচ্য মাসআলাতেও দুরকম অপরাধের কারণে দু'রকম পরিণতিই চোর ভাগ করবে। হাতকাটা হবে, ক্ষতিপূরণও দিবে। একটির দ্বারা অপরটি রহিত হবে না।

আহনাফের দলিল :

১. নবী করীম ﷺ -এর বাণী لَا غُرْمَ عَلَى السَّارِقِ بَعْدَ مَا قُطِعَتْ يَمِيْنُهُ চোরের হাত কাটার পর তার উপর কোনো ক্ষতিপূরণ নেই। হাদীসটি কিছুটা শাব্দিক পরিবর্তনসহ ইমাম নাসায়ী, দারাকুতনী, তাবারানী, বাযযার প্রমুখ বর্ণনা করেছেন।

২. ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হওয়া হস্ত কর্তনের পরিপন্থি বিষয়। কেননা চোর যখন চুরিকৃত মালের ক্ষতিপূরণ দিয়ে দেয়, তখন চুরির সময় হতেই উক্ত মালের উপর তার মালিকানা সাব্যস্ত হয়ে যায়। বিধায় মাল নেওয়ার কাজটি তার মালিকানায়ই সংঘটিত হয়। অতএব, ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হলে এই মালিকানা জনিত সন্দেহের কারণে হদ্দ রহিত হয়ে যাওয়া আবশ্যক হয়। কিন্তু হদ্দ বা হস্তকর্তনের বিষয়টি সর্বসম্মতিক্রমে প্রমাণিত। তাই একে যে বস্তু রহিত করার দাবি করেন, সে নিজেই রহিত হয়ে যাবে। আর সে বস্তুটি হলো ক্ষতিপূরণ। অতএব, হস্তকর্তন হওয়া অবস্থায় ক্ষতিপূরণ রহিত হবে।

৩. চুরির মহলটি তথা চুরিকৃত সম্পদটি বান্দার হক হিসাবে মা'সূম নয়। অর্থাৎ নিরাপত্তাগুণ সম্পন্ন নয়; বরং তা আল্লাহর হক হিসাবে মাসূম বা নিরাপত্তাগুণ সম্পন্ন। আল্লাহর হকের কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে হয় না। তাই চোরের উপর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হব না।

চুরির মাল বান্দার হক হিসাবে মাসূম না হওয়ার কারণ হলো এই যে, যদি মালটি বান্দার হক হিসাবে মাসূম হয়, তাহলে সত্তাগতভাবে সেটি মুবাহ হয়ে যাবে। কেননা এস্তেকরা বা জরিপ দ্বারা এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, যে বস্তু বা সম্পদ বান্দার হক হিসাবে হারাম হয়, সে বস্তু সত্তাগতভাবে মুবাহ থাকে। যেমন– কারো পাত্রে সংরক্ষিত পানি অন্যের জন্য হারাম এটা বান্দার হক হিসাবে। যদি সংরক্ষণকারী তা সংরক্ষণ করতো তাহলে সেটা সবার জন্য মুবাহ ছিল। তদ্রূপ যদি চুরির মালকে বান্দার হক হিসাবে হারাম বলা হয়। তাহলে সেটা সত্তাগতভাবে মুবাহ হয়ে যাবে। আর মুবাহ বস্তুতে চুরি সংঘটিত হয় না। ফলে তার হাত কাটাও জায়েজ হয় না। কিন্তু যেহেতু চোরের হাত কাটার বিষয়টি সর্বসম্মত সেহেতু বুঝা যায়, সম্পদটি বান্দার হক হিসাবে হারাম ছিল না; বরং তা হারাম ছিল আল্লাহর হক হিসাবে। এদিক থেকে চুরির সম্পদ মৃত জন্তুর মতো হলো অর্থাৎ যেমন মৃত জন্তু খাওয়া হারাম আল্লাহর হক হিসাবে তদ্রূপ চুরির মালও হারাম আল্লাহর হক হিসাবে আর আল্লাহর হক হিসাবে যা হারাম হয়, তাতে কোনো ক্ষতিপূরণ আসে না। তাই চোরের হাত কাটা হলে মালের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর :

পূর্বের আলোচনা দ্বারা এটা আবশ্যক হয় যে, চুরির মাল ইচ্ছাকৃতভাবে নষ্ট করে ফেলা অবস্থায়ও ক্ষতিপূরণ না দেওয়া চাই। কেননা চুরির মাল বান্দার হক হিসাবে হারাম নয়; বরং তা আল্লাহর হক হিসাবে হারাম। আর আল্লাহর হক হিসাবে যা হারাম তাতে ক্ষতিপূরণ আসে না। অথচ হাসান ইবনে যিয়াদের বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে চুরির মাল নষ্ট করা অবস্থায় ক্ষতিপূরণ দিতে হয়।

উত্তর : মনে রাখতে হবে যে, চুরি একটি কাজ এবং চুরির মাল নষ্ট করা ভিন্ন আরেকটি কাজ। আর বান্দার হক হিসাবে সম্পদের নিরাপত্তা গুণ রহিত হওয়ার সে বিষয়টি চুরির ক্ষেত্রে মেনে নেওয়া হয়েছিল, সেটি ছিল হস্ত কর্তন সাব্যস্ত করা এবং ক্ষতিপূরণ রহিত করার জরুরতের ভিত্তিতে। এ জরুরত মাল নষ্ট করার ক্ষেত্রে নেই। তাই সে বিষয়টি এখানে আর মেনে নেওয়া হবে না। কেননা জরুরতের ভিত্তিতে যা মানা হয় বা সাব্যস্ত হয়, তা জরুরত পর্যন্ত সীমিত থাকে। জরুরতের ক্ষেত্র অতিক্রম করে অন্যত্র সম্প্রসারিত হয় না। অতএব سُقُوطُ عِصْمَت নিরাপত্তাগুণ রহিত হওয়ার বিষয়টি মাল নষ্ট করার ক্ষেত্রে বিবেচ্য হবে না। বিধায় ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

অনুরূপভাবে চুরির মাল মুবাহ হওয়ার সন্দেহটির মাল নষ্ট করার ক্ষেত্রে বিবেচ্য হবে না। কেননা এ সন্দেহটি হাত কাটার সব তথা চুরির ক্ষেত্রে বিচেনা করা হয়েছিল জরুরত বা বিশেষ প্রয়োজনের কারণে। অর্থাৎ হস্ত কর্তন সাব্যস্ত করা ও ক্ষতিপূরণ রহিত করার উদ্দেশ্য। মাল নষ্ট করার ক্ষেত্রে সে জরুরত বিদ্যমান নেই। অতএব, তা এখানে বিবেচ্য হবে না।

যাহিরে রেওয়ায়েতের দলিল :

যাহিরে রেওয়ায়েত অনুযায়ী ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মত ছিল চুরির মাল নষ্ট করা হলেও ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। এ মতের কারণ হিসাবে বলা হয় যে, মাল নষ্ট করার কাজটি চুরি কার্যেরই পূর্ণতা দান । অর্থাৎ চুরির উদ্দেশ্য তো এটাই হয় যে, সে তা নিজের কোনো প্রয়োজনে খরচ করবে। আর খরচ করার মাধ্যমেই তা নষ্ট হয়ে থাকে। এ হিসাবে খরচ করা বা নষ্ট করাটা ভিন্ন কোনো কাজ নয়। বরং খরচ করাটাও চুরির অন্তর্ভুক্ত। এতএব, "নিরাপত্তা গুণ রহিত হওয়া এবং মুবাহ হওয়ার সন্দেহ" বিষয় দুটি যেমন চুরির ক্ষেত্রে বিবেচ্য হয়েছিল, তেমনি মাল খরচ করা বা নষ্ট করার ক্ষেত্রেও বিবেচ্য হবে। ফলে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না।

চুরির মাল নষ্ট করার সুরতে ক্ষতিপূরণ রহিত করার উদ্দেশ্যে নিরাপত্তাগুণ বাতিল হওয়ার বিষয়টি বিবেচনায় আনা হয়েছে। এর কারণ হলো এই যে, যদি বিবেচনায় না আনা হয় তাহলে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয়ে যাবে। অথচ ক্ষতিপূরণের জন্য শর্ত হলো ক্ষতিপূরণ এবং যার ক্ষতিপূরণ উভয়ই পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়া। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে এ সাদৃশ্য অবিদ্যমান। কেননা চুরির মালটি (যার ক্ষতিপূরণ) কেবল নষ্ট করার সুরতে নিরাপত্তা গুণ সম্পন্ন ও ক্ষতিপূরণযোগ্য। আর ক্ষতিপূরণ হিসাবে যে মালটি দেওয়া হবে, সেটি নষ্ট হওয়া এবং নষ্ট করা উভয় অবস্থাতেই নিরাপত্তা গুণ সমৃদ্ধ এবং ক্ষতিপূরণ যোগ্য। অতএব, সাদৃশ্য না থাকার কারণে ক্ষতিপূরণ না দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। তাই এখানে ইসমত সাকেত হওয়া এবং সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ার বিষয় দুটিকে বিবেচনায় এনে ক্ষতিপূরণ রহিত করা হয়েছে যাহিরে রেওয়ায়েত মুতাবেক।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ وَمَنْ سَرَقَ سَرِقَاتٍ فَقُطِعَ فِيْ اِحْدَاهَا فَهُوَ لِجَمِيْعِهَا ، وَلَا يَضْمَنُ شَيْئًا عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ وَقَالَا : يَضْمَنُ كُلَّهَا اِلَّا الَّتِي قُطِعَ لَهَا وَمَعْنَى الْمَسْاَلَةِ اِذَا حَضَرَ اَحَدُهُمْ، فَاِنْ حَضَرُوْا جَمِيْعًا وَقُطِعَتْ يَدُهُ لِخُصُوْمَتِهِمْ لَا يَضْمَنُ شَيْئًا بِالْاِتِّفَاقِ فِي السَّرِقَاتِ كُلِّهَا .لَهُمَا اَنَّ الْحَاضِرَ لَيْسَ بِنَائِبٍ عَنِ الْغَائِبِ . وَلَا بُدَّ مِنَ الْخُصُوْمَةِ لِتَظْهَرَ السَّرِقَةُ فَلَمْ تَظْهَرْ السَّرِقَةُ مِنَ الْغَائِبَيْنِ فَلَمْ يَقَعْ الْقَطْعُ لَهَا فَبَقِيَتْ اَمْوَالُهُمْ مَعْصُوْمَةً . وَلَهُ اَنَّ الْوَاجِبَ بِالْكُلِّ قَطْعٌ وَاحِدٌ حَقًّا لِلّٰهِ تَعَالٰى لِاَنَّ مَبْنَى الْحُدُوْدِ عَلَى التَّدَاخُلِ وَالْخُصُوْمَةُ شَرْطٌ لِلظُّهُوْرِ عِنْدَ الْقَاضِيْ، فَاِذَا اسْتَوْفٰى فَالْمُسْتَوْفٰى كُلُّ الْوَاجِبِ؛ اَلَا يَرٰى اَنَّهُ يَرْجِعُ نَفْعُهُ اِلَى الْكُلِّ فَيَقَعُ عَنِ الْكُلِّ، وَعَلٰى هٰذَا الْخِلَافِ اِذَا كَانَتْ النُّصُبُ كُلُّهَا لِوَاحِدٍ فَخَاصَمَ فِي الْبَعْضِ -

অনুবাদ : গ্রন্থকার বলেন, কেউ যদি কয়েকটি চুরি করে, আর তন্মধ্যে একটি চুরির জন্য তার হস্ত কর্তন করা হয়, তাহলে তা সকল চুরির পরিবর্তেই গণ্য হবে। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে কোনো চুরিরই তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। আর সাহেবাইন বলেন, যে চুরির জন্য তার হস্ত কর্তন করা হয়েছে তাছাড়া অন্যসব চুরির মালের ক্ষতিপূরণ সে প্রদান করবে।

মাসআলাটির স্বরূপ এই যে, সকল চুরির বাদীদের মধ্য থেকে একজন শুধু উপস্থিত হয়েছে। পক্ষান্তরে সবাই যদি উপস্থিত হয়ে থাকে, এবং তাদের সকলের অভিযোগের কারণে তার হস্ত কর্তন করা হয়, তাহলে সর্বসম্মতিক্রমেই সবকটি চুরির কোনো মালেরই ক্ষতিপূরণ সে প্রদান করবে না।

সাহেবাইনের দলিল এই যে, উপস্থিত ব্যক্তি অনুপস্থিত ব্যক্তিদের প্রতিনিধি নয়। (যাতে তার অভিযোগ উত্থাপন সকলের পক্ষ থেকে অভিযোগ উত্থাপন হিসাবে ধরে নেওয়া যায়।) অথচ চুরির অপরাধ সাব্যস্ত হওয়ার জন্য অভিযোগ উত্থাপন অপরিহার্য। সুতরাং অনুপস্থিত ব্যক্তিদের পক্ষে চুরির অপরাধ সাব্যস্ত হয়নি। এবং ঐ সকল চুরির জন্য হস্ত কর্তন হয়নি। ফলে তাদের মাল নিরাপত্তা গুণসম্পন্ন থেকে যাবে। (আর নিরাপত্তাগুণ সম্পন্ন মালের ক্ষতিপূরণ দিতেই হয়।) ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর দলিল এই যে, আল্লাহর হক হিসাবে সকল চুরির জন্য একটি কর্তনই ওয়াজিব বা অবশ্য সাব্যস্ত। কেননা হদ্দ সমূহের ভিত্তি হলো তাদাখুল তথা একীভূত করণের উপর। আর অভিযোগ উত্থাপন হলো কাজির সামনে (চুরির অপরাধ) সাব্যস্ত হওয়ার জন্য শর্ত। পক্ষান্তরে অপরাধের হদ্দ হিসাবে যা ওয়াজিব হয়েছে, তা যখন উসূল ও কার্যকর করা হবে, তখন কার্যকরকৃত হদ্দটি সমগ্র অপরাধের অবশ্য সাব্যস্তি বলেই গণ্য হবে। (যেহেতু সবকটি চুরির মামলা তখন প্রকাশ পায়নি, যখন প্রকাশ পাবে, তখন বুঝা যাবে যে, কর্তন এগুলোর জন্যও হয়েছিল।)

তুমি কি লক্ষ্য করছ না যে, হদ্দের যে উপকারিতা (অপরাধ দমন) তা সবকটি অপরাধের সাথেই সম্পৃক্ত হচ্ছে। সুতরাং কর্তনও সবকটির পক্ষ থেকে সাব্যস্ত হবে।

একই মতপার্থক্য হবে, যদি সবকটি চুরির নেছাব পরিমাণ মালের মালিক এক ব্যক্তি হয় আর সে শুধু কোনো একটির জন্য অভিযোগ উত্থাপন করে।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিউক্ত ইবারতে মোট তিনটি মাসআলা আলোচিত হয়েছে। একটি মাসআলা এত্তেফাকী বা সর্বসম্মত। আর দুটি মাসআলা এখতেলাফী বা মতানৈক্য পূর্ণ ।

মাসআলা নং-১ (এত্তেফাকী) : যদি কোনো চোর একাধিক চুরি করে, এবং সবকটি চুরির মালের মালিক কাজির নিকট উপস্থিত হয়ে অভিযোগ দায়ের করে এবং সকলের অভিযোগের ভিত্তিতে চোরের হাত কাটা হয়, তাহলে এই হস্ত কর্তনটি সর্বসম্মতিক্রমে সবকটি চুরির শাস্তি হিসাবে পরিগণিত হবে। ফলে কোনো বাদীকেই তার মালের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। অর্থাৎ সকল বাদীদের ক্ষতিপূরণ রহিত হয়ে যাবে। (মতনে এ মাসআলা দ্বিতীয় স্তরে উল্লেখ করা হয়েছে। فَإِنْ حَضَرُوا جَمِيعًا শব্দে। মাসআলাটি এত্তেফাকী হওয়ার কারণে আমরা তা প্রথমে বর্ণনা করেছি।)

মাসআলা নং ২ (এখতেলাফী) : যা কিতাবের বর্ণনায় প্রথম।

কোনো চোর যদি একাধিকবার চুরি করে এবং কোনো একটি চুরির মালের মালিক (বাদী) কাজির নিকট উপস্থিত হয়ে অভিযোগ উত্থাপন করে এবং এর ফলে চোরের হাত কাটা হয়, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমামত্রয়ের মতে এ হস্ত কর্তনটি সকল চুরির পক্ষ থেকে গণ্য হবে। ফলে কোনো বাদীকেই চোরের পক্ষ থেকে তার মালের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না।

পক্ষান্তরে সাহেবাইনে মত হলো, যে চুরির অভিযোগের ভিত্তিতে হস্ত কর্তন হয়েছে, কেবল সেই চুরির পক্ষ থেকেই হস্ত কর্তনটি সাব্যস্ত হবে। সকল চুরির পক্ষ থেকে নয়। অতএব, অন্য সকল চুরির মালের মালিকদেরকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

দলিল পর্ব : সাহেবাইনের দলিল এই যে, উপস্থিত বাদী অনুপস্থিত বাদীদের প্রতিনিধি নয়। অতএব, তার অভিযোগটি অন্য বাদীদের অভিযোগ হিসাবে গণ্য হবে না। আর পূর্বেও বলা হয়েছে যে, অভিযোগ উত্থাপিত না হলে চুরির অপরাধ সাব্যস্ত হয় না। সে হিসাবে অনুপস্থিত বাদীরা যেহেতু অভিযোগ উত্থাপন করেনি, তাই তাদের পক্ষ থেকে অপরাধ সাব্যস্ত হবে না এবং হস্ত কর্তনও তাদের পক্ষ থেকে গণ্য হবে না। আর যেহেতু হস্ত কর্তন তাদের পক্ষে থেকে গণ্য হবে না, সেহেতু তাদের মাল নিরাপত্তাগুণ সম্পন্ন থাকবে। আর নিরাপত্তা সম্পন্ন মালের ক্ষতিপূরণ দেওয়া আবশ্যক হয়। তাই অনুপস্থিত বাদীদের মালের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। কেবল মাত্র যে বাদী অভিযোগ উত্থাপন করেছে, তার পক্ষ থেকে হস্ত কর্তন সাব্যস্ত হবে এবং কেবল তাকেই ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল এই যে, চোরের হস্তকর্তন ওয়াজিব হবে আল্লাহর হক হিসাবে। আর আল্লাহর হকের ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো তাদাখুল। অর্থাৎ একাধিক সবব বিদ্যমান হলে সকল সববরের মুসাববাবকে একীভূত করে দেওয়া। অতএব, আলোচ্য মাসআলা একাধিক চুরি বিদ্যমান হওয়ায় সবগুলোর হদ্দ হিসাবে একটি হস্ত কর্তনই যথেষ্ট হবে। একবার হস্তকর্তন করা হলে, এটা সবকটি চুরির শাস্তি বলে গণ্য হবে। আর অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার জন্য কাজির দরবারে অভিযোগ উত্থাপনের যে শর্ত ছিল তার সামগ্রিকভাবে পাওয়া গিয়েছে। অতএব, যখন হস্ত কর্তনটি সকল চুরির পক্ষ থেকে গণ্য হলো তখন আর কানো বাদীর সম্পদই নিরাপত্তা সম্পন্ন থাকে নি। বিধায়, তাদের কোনো মালেরই ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না।

মাসআলা নং- ৩ (এখতেলাফী) : মতনে এ মাসআলাটি وَعَلٰى هٰذَا الْخِلَافِ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কোনো চোর যদি একই মালিকের নিকট হতে একাধিকবার নেসাব পরিমাণ সম্পদ চুরি করে, অতঃপর উক্ত মালিক কোনো একবার চুরির জন্য অভিযোগ উত্থাপন করে এবং সেইবারের অভিযোগের ভিত্তিতে চোরের হাত কেটে দেওয়া হয়, তাহলে এই হস্ত কর্তনটি একাধিকবার চুরির শাস্তি স্বরূপ গণ্য হবে না-কি একবারের চুরির শাস্তিরূপে গণ্য হবে এ নিয়ে তিন ইমামের মাঝে পূর্ববর্তী মাসআলার অনুরূপ মতানৈক্য রয়েছে।

অর্থাৎ ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মতে হস্ত কর্তনটি পূর্ববর্তী সবকটি চুরির হদ্দ হিসাবে গণ্য হবে। ফলে বিভিন্ন বারের চুরিকৃত সকল মালের নিরাপত্তাগুণ রহিত হয়ে যাবে। যার ফলে কোনো মালেরই ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না।

পক্ষান্তরে সাহেবাইন বলেন, হস্ত কর্তনটি কেবল একবারের চুরির হদ্দ হিসাবে গণ্য হবে। যে বার চুরি করার পর মালিক অভিযোগ উত্থাপন করেছে, শুধু সেই বার চুরি করার শাস্তি। অতএব, এবারের চুরিকৃত মালের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। আর অন্যান্য বারের চুরির জন্য যেহেতু অভিযোগ উত্থাপিত হয়নি, সেহেতু হস্ত কর্তনটি: সেসব চুরির হদ্দরূপে গণ্য হবে না। ফলে ঐ সব বারের চুরিকৃত মালের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এ মাসআলায় উভয় মাযহাবের দলিল পূর্ববর্তী মাসআলায় বর্ণিত দলিলের অনুরূপ।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ مَا يُحْدِثُ السَّارِقُ فِي السَّرِقَةِ

وَمَنْ سَرَقَ ثَوْبًا فَشَقَّهُ فِي الدَّارِ بِنِصْفَيْنِ ثُمَّ أَخْرَجَهُ وَهُوَ يُسَاوِي عَشَرَةَ دَرَاهِمَ قُطِعَ وَعَنْ أَبِي يُوْسُفَ أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ لِأَنَّ لَهُ فِيْهِ سَبَبَ الْمِلْكِ وَهُوَ الْخَرْقُ الْفَاحِشُ فَإِنَّهُ يُوجِبُ الْقِيمَةَ وَتَمَلُّكَ الْمَضْمُوْنِ وَصَارَ كَالْمُشْتَرِي إِذَا سَرَقَ مَبِيْعًا فِيْهِ خِيَارٌ لِلْبَائِعِ وَلَهُمَا أَنَّ الْأَخْذَ وُضِعَ سَبَبًا لِلضَّمَانِ لَا لِلْمِلْكِ، وَإِنَّمَا الْمِلْكُ يُثْبَتُ ضَرُوْرَةَ أَدَاءِ الضَّمَانِ كَيْلَا يَجْتَمِعَ الْبَدَلَانِ فِي مِلْكِ وَاحِدٍ، وَمِثْلُهُ لَا يُوَرِّثُ الشُّبْهَةَ كَنَفْسِ الْأَخْذِ، وَكَمَا إِذَا سَرَقَ الْبَائِعُ مَعِيْبًا بَاعَهُ، بِخِلَافِ مَا ذَكَرَ: لِأَنَّ الْبَيْعَ مَوْضُوْعٌ لِإِفَادَةِ الْمِلْكِ، وَهٰذَا الْخِلَافُ فِيْمَا إِذَا اخْتَارَ تَضْمِيْنَ النُّقْصَانِ وَأَخْذَ الثَّوْبِ، فَإِنْ اخْتَارَ تَضْمِيْنَ الْقِيمَةِ وَتَرْكَ الثَّوْبِ عَلَيْهِ لَا يُقْطَعُ بِالْاِتِّفَاقِ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ مُسْتَنِدًا إِلَى وَقْتِ الْأَخْذِ فَصَارَ كَمَا إِذَا مَلَكَهُ بِالْهِبَةِ فَأَوْرَثَ شُبْهَةً، وَهٰذَا كُلُّهُ إِذَا كَانَ النُّقْصَانُ فَاحِشًا، فَإِنْ كَانَ يَسِيْرًا يُقْطَعُ بِالْاِتِّفَاقِ لِانْعِدَامِ سَبَبِ الْمِلْكِ إِذْ لَيْسَ لَهُ اخْتِيَارُ تَضْمِيْنِ كُلِّ الْقِيمَةِ.

পরিচ্ছেদ : চুরিকৃত মালের পরিবর্তন সাধন

অনুবাদ : কেউ যদি একটি কাপড় চুরি করে ঘরের ভিতরেই ছিঁড়ে দু' টুকরো করে ফেলে এরপর তা বের করে আনে আর অবস্থা এই যে, তা দশ দিরহামের সমমূল্য সম্পন্ন তাহলে তার হস্ত কর্তন হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) হতে একটি বর্ণনা রয়েছে যে, হাত কাটা হবে না। কেননা ঐ কাপড় তার অনুকূলে মালিকানার কারণ উদ্ভূত হয়েছে। আর তাহলো সম্পূর্ণ ছিঁড়ে ফেলা।

কেননা তা মূল্য ওয়াজিব করে এবং ক্ষতিপূরণ আদায়কৃত বস্তুটির মালিকানা সাব্যস্ত করে। এখানে সে ঐ ক্রেতার মতো হলো, যে বিক্রেতার ইচ্ছাধিকার সম্পন্ন বিক্রীতপণ্য চুরি করল।

তরফাইনের দলিল এই যে, এরূপভাবে বস্তুটির 'গ্রহণ' ক্ষতিপূরণ সাব্যস্ত হওয়ার কারণ হয়েছে, মালিকানা সাব্যস্ত হওয়ার কারণ হয়নি। মালিকানা সাব্যস্ত হয় ক্ষতিপূরণ আদায়ের অনিবার্য ফলরূপে। যাতে করে দুই বিনিময় এক মালিকানায় একত্রিত না হয়। আর এ ধরনের কর্ম (ক্ষতিপূরণ সাব্যস্তির কারণরূপে গণ্য 'গ্রহণ') সন্দেহ উদ্রককারী হতে পারে না। যেমন– (খুঁত সৃষ্টি করা ছাড়া) শুধু গ্রহণ করা এবং বিক্রয়কৃত দোষযুক্ত পণ্য বিক্রেতা কর্তৃক চুরি করা।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) যা উল্লেখ করেছেন, তা ভিন্ন। কেননা বিক্রয় মালিকানার ফল প্রদানের জন্যই (শরিয়ত কর্তৃক) অনুমোদিত হয়েছে।

এই মতপার্থক্য হলো ঐ সময়, যখন মালিক কাপড় এবং ক্ষতিপূরণের দিকটি বেছে নেবেন। পক্ষান্তরে যদি সে কাপড় বাদ দিয়ে তার মূল্য গ্রহণের দিকটি বেছে নেয় তাহলে সর্ব সম্মতিক্রমেই তার হাত কাটা হবে না। কেননা (মূল্য প্রদানের কারণে) তার মালিকানা সাব্যস্ত হবে। চুরি করে কাপড়টি নেওয়ার সময়ের সাথে সম্পৃক্ত হবে। সুতরাং এটা দানের মাধ্যমে মালিক হওয়ার মতো হলো। ফলে তা সন্দেহ উদ্রেক করেছে।

মতপার্থক্যের এই বিশদ বিবরণ তখনই হবে, যখন ক্ষতি গুরুতর হয়। পক্ষান্তরে ক্ষতি যদি অল্প হয়, তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে কর্তন করা হবে। কেননা এ অবস্থায় যেহেতু চোরের উপর সমগ্রমূল্যের দায় চাপানোর এখতিয়ার নেই, সেহেতু মালিকানার কারণও বিদ্যমান নেই।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিউক্ত ইবারতে একাধিক সুরত সম্পন্ন একটি মাসআলা আলোচিত হয়েছে। চোর যদি কারো ঘর থেকে একটি কাপড় চুরি করে তা ছিঁড়ে ফেলে, সে ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত সুরতসমূহ হতে পারে :

এক. কাপড়টি চুরি করে অক্ষত অবস্থায় ঘর থেকে বের করেছে তখন তার মূল্য ছিল দশ দিরহাম বা এর চেয়ে বেশি। কিন্তু ঘরের বাইরে এনে কাপড়টি ছিঁড়ে ফেলার কারণে তার মূল্য দশ দিরহামের নিচে নেমে এসেছে। এমতাবস্থায় সর্বসম্মতিক্রমে চোরের হাত কাটা হবে। কেননা এ সুরতে চুরি সংঘটিত হওয়া কালে নেসাব পূর্ণ ছিল।

দুই. কাপড়টি চুরি করে ঘরের ভিতরেই তা ছিঁড়ে ফেলেছে। ফলে তার মূল্য দশ দিরহাম অপেক্ষা কমে গেছে তারপর কাপড়টি ঘর থেকে বের করেছে। এমতাবস্থায় কারো মতেই হাত কাটা হবে না। কেননা চুরি সমাপ্ত হওয়া কালে অর্থাৎ ঘর থেকে বের করার সময় নেসাবপূর্ণ নেই।

তিন. কাপড়টি চুরি করে ঘরের ভিতরেই তা দ্বি-খণ্ডিত করেছে তারপর তা ঘর থেকে বের করেছে; কিন্তু তখনও তার মূল্য দশ দিরহাম বা তার চেয়ে বেশি আছে– এমতাবস্থায় চোরের হাত কাটা হবে কি-না, এ নিয়ে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ও তরফাইনের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে।

তরফাইন তথা ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে হাত কাটা হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে হাতকাটা হবে না।

দলিল পর্ব :

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) এর দলিল : চোর কর্তৃক কাপড়টি ছিঁড়ে ফেলার কারণে কাপড়ের মধ্যে চোরের মালিকানা সাব্যস্ত করার মতো একটি কারণ উদ্ভূত হয়েছে। কেননা কাপড় ছিঁড়ে ফেলার পর মালিকের অধিকার থাকে চোরের নিকট থেকে কাপড়টির মূল্য নিয়ে কাপড়টি তাকে দিয়ে দেওয়ার। আর যে বস্তুর মধ্যে চোরের মালিকানার কারণ সৃষ্টি হয়ে যায় সে বস্তুর কারণে চোরের হাত কাটা হয় না। অতএব, আলোচ্য সুরতেও যেহেতু চুরিকৃত কাপড়ের মধ্যে চোরের মালিকানার কারণ সৃষ্টি হয়ে গেছে, তাই তার হাত কাটা হবে না।

এ মাসআলার নজির আরেকটি মাসআলা হলো, কোনো বিক্রেতা নিজ খিয়ারসহ একটি পণ্য বিক্রি করল। অতঃপর খিয়ার শেষ হওয়ার আগেই ক্রেতা উক্ত পণ্যটি চুরি করল। এরপর বিক্রেতা বিক্রয় বাতিল করে দিল। এমতাবস্থায় চোরের (ক্রেতার) হাতকাটা হয় না। কারণ এক্ষেত্রে সে যে বস্তুটা চুরি করেছে, তার মধ্যে তার মালিকানার কারণ বিদ্যমান আছে অর্থাৎ ক্রয়ের চুক্তি। আর পূর্বেই বলা হয়েছে যে বস্তুর মধ্যে চোরের মালিকানার কারণ সৃষ্টি হয়, সে বস্তুর জন্য চোরের হাতকাটা হয় না। বিধায় উপরিউক্ত মাসআলা দুটির উভয়টিতে চুরিকৃত সম্পদের মধ্যে চোরের মালিকানার কারণ বিদ্যমান থাকার কারণে চোরের হাত কাটা হবে না।

তরফাইনের দলিল : তরফাইন বলেন, চোর কর্তৃক কাপড়টি ছিঁড়ে ফেলার দ্বারা তার মালিকানার কারণ উদ্ভূত হয়েছে– এ কথাটি গ্রহণযোগ্য নয়; বরং কাপড় ছিঁড়ে তা নিয়ে যাওয়াটা মূলত ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হওয়ার কারণ, মালিকানার কারণ নয়। তবে ক্ষতিপূরণ দিলে অনিবার্যরূপে (জরুরতের ভিত্তিতে) তার মালিকানাও হাসিল হয়ে যায়। কেননা চোরের পক্ষ হতে ক্ষতিপূরণ আদায়ের পরও যদি কাপড়টি তার মালিকানা না হয়ে আসল মালিকের মালিকানায় থেকে যায়, তাহলে দুই বিনিময় (কাপড় ও তার মূল্য) এক ব্যক্তি তথা আসল মালিকের মালিকানায় একত্র হয়ে যাওয়া আবশ্যক হয়। যা মোটেও শুদ্ধ নয়। তাই ক্ষতিপূরণ দেওয়ার পর অনিবার্যরূপে কাপড়টি চোরের মালিকানায় চলে যায়। মোটকথা কাপড় ছিঁড়ে ফেলার দ্বারা মালিকানার কারণ সৃষ্টি হয় না; বরং ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কারণ সৃষ্টি হয়। আর এ ধরনের কারণ চুরির বিষয়ে কোনো সন্দেহ সৃষ্টি করে না। অতএব, চোরের হাত কাটা হবে।

এ মাসআলার নজির ১. যদি চোর কাপড়টি না ছিঁড়ে অক্ষত অবস্থায় নিয়ে যায়, তাহলেও তার হাত কাটা হয়। অথচ সেক্ষেত্রে এই সম্ভাবনা থাকে যে, চোর যদি কাপড়টির মূল্য পরিশোধ করে দেয় তাহলে তা তার মালিকানার কারণ হয়ে

https://e-ilm.weebly.com/

যাবে; কিন্তু এই সন্দেহের কোনো মূল্যায়ন করা হয় না। হাত কেটে দেওয়া হয়। তদ্রূপ আলোচ্য মাসআলায়ও হাত কেটে দেওয়া হবে।

নজির-২. কেউ দোষযুক্ত একটি বস্তু বিক্রয় করেছে। এরপর সে তা ক্রেতার নিকট থেকে পুনরায় চুরি করেছে। এমতাবস্থায় চোরের (বিক্রেতার) হাত কেটে দেওয়া হয়। অথচ এক্ষেত্রে বিক্রয়কৃত দ্রব্যটি দোষযুক্ত হওয়ার কারণে দ্রব্যটি বিক্রেতার কাছে ফেরত দেওয়ার কারণ সৃষ্টি হয়ে আছে। তা সত্ত্বেও হাত কাটা হয়। অনুরূপ আলোচ্য মাসআলায়ও হাত কাটা হবে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর কিয়াসের জবাব :

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) চোর কর্তৃক কাপড় ছিঁড়ে নিয়ে যাওয়াকে ক্রেতার চুরির সাথে কিয়াস করেছিলেন। এর জবাবে বলা হচ্ছে যে, কিয়াসটি সহীহ নয়। কেননা ক্রেতার চুরির ক্ষেত্রে প্রকৃত পক্ষেই মালিকানার কারণ বিদ্যমান আছে, তা হলো ক্রয়। ক্রয়-বিক্রয়ের বিষয়টিকে মালিকানার কারণরূপেই মাশরূ' বা অনুমোদন করা হয়েছে। পক্ষান্তরে কাপড় ছিঁড়ে নিয়ে যাওয়াকে মালিকানা সৃষ্টির কারণরূপে অনুমোদন করা হয়নি। অতএব, একটিকে অপরটির সাথে তুলনা বা কিয়াস করা সঠিক নয়।

উপরিউক্ত এখতেলাফি মাসআলাটি প্রযোজ্য হওয়ার জন্য দুটি শর্ত :

শর্ত ১. মালিক কর্তৃক চোরের নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ এবং কাপড় উভয়টি গ্রহণের সুরতকে প্রাধান্য দেওয়া। অর্থাৎ চোর যখন কাপড়টি ছিঁড়ে ফেলে তখন মালিকের দুটি পথ অবলম্বন করার সুযোগ থাকে। একটি হলো, কাপড় ছিঁড়ার কারণে যে ক্ষতি হয়েছে সেই ক্ষতিপূরণ চোরের নিকট থেকে আদায় করার এবং কাপড়টি নিয়ে যাওয়া। অপরটি হলো, চোরের নিকট থেকে পূর্ণ কাপড়টির মূল্য আদায় করে নেওয়া এবং কাপড়টি চোরকে দিয়ে দেওয়া। কাপড়ের মালিক যদি প্রথমোক্ত পথটি অবলম্বন করে তাহলেই সে ক্ষেত্রে হাত কাটা-না কাটা সম্পর্কিত মতভেদ প্রযোজ্য হবে। পক্ষান্তরে কাপড়ের মালিক যদি দ্বিতীয় পথ অবলম্বন করে, তাহলে কারো মতেই চোরের হাত কাটা হবে না। কেননা চোর যখন কাপড়টির পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করবে, তখন সে কাপড়টির মালিক হয়ে যাবে এবং তার এই মালিকানা চুরি করার সময়ের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে সাব্যস্ত হবে। বিধায় এটি চুরির ব্যাপারে সন্দেহ উদ্রেক করবে। যেমন চুরিকৃত সম্পদ হেবার মাধ্যমে চোরের মালিকানায় চলে এলে সন্দেহের উদ্রেক হয় এবং এ সন্দেহের কারণে হাত কাটা হয় না। তেমনি আলোচ্য সুরতেও চুরির ব্যাপারে সন্দেহ উদ্রেক হওয়ার কারণে হাত কাটা হবে না।

শর্ত ২. উপরে বর্ণিত এখতেলাফি মাসআলাটি প্রযোজ্য হওয়ার জন্য ২য় শর্ত হলো, কাপড়ের ছিঁড়াটি গুরুতর হওয়া। অর্থাৎ কাপড়টি লম্বালম্বিভাবে ছিঁড়ে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলা। পক্ষান্তরে চোর যদি কাপড়টি অল্প ছিঁড়ে তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে চোরের হাত কাটা হবে। কেননা তখন কাপড়টি অল্প ছিঁড়ার কারণে তাকে পূর্ণ মূল্যের জামিন বা দেনাদার বানানো যায় না, ফলে সে ক্ষেত্রে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতেও মালিকানার কারণ বিদ্যমান হয় না। বিধায় সর্বসম্মতিক্রমে চোরের হাত কাটা হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَإِنْ سَرَقَ شَاةً فَذَبَحَهَا ثُمَّ أَخْرَجَهَا لَمْ يُقْطَعْ لِأَنَّ السَّرِقَةَ تَمَّتْ عَلَى اللَّحْمِ وَلَا قَطْعَ فِيْهِ .

وَمَنْ سَرَقَ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً يَجِبُ فِيْهِ الْقَطْعُ فَصَنَعَهُ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ قُطِعَ فِيْهِ وَيَرُدُّ الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيْرَ إِلَى الْمَسْرُوْقِ مِنْهُ، وَهٰذَا عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ وَقَالَا : لَا سَبِيْلَ لِلْمَسْرُوْقِ مِنْهُ عَلَيْهِمَا وَأَصْلُهُ فِي الْغَصْبِ فَهٰذِهِ صَنْعَةٌ مُتَقَوِّمَةٌ عِنْدَهُمَا خِلَافًا لَهُ، ثُمَّ وُجُوْبُ الْحَدِّ لَا يُشْكِلُ عَلَى قَوْلِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْهُ، وَقِيْلَ عَلَى قَوْلِهِمَا لَا يَجِبُ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ قَبْلَ الْقَطْعِ، وَقِيْلَ يَجِبُ؛ لِأَنَّهُ صَارَ بِالصَّنْعَةِ شَيْئًا آخَرَ فَلَمْ يَمْلِكْ عَيْنَهُ

অনুবাদ : যদি বকরি চুরি করার পর তা জবাই করে, তারপর তা বের করে আনে তাহলে হাত কাটা হবে না। কেননা চুরির অপরাধটি সম্পন্ন হয়েছে গোশতের উপর। আর গোশত চুরি করার কারণে হাত কাটা হয় না।

কেউ যদি এ পরিমাণ সোনা-রূপা চুরি করে যাতে হাত কাটা সাব্যস্ত হয়, অতঃপর সে তা দ্বারা দিরহাম কিংবা দীনার তৈরি করে, তাহলে হাত কাটা হবে। যার কাছ থেকে চুরি করা হয়েছে তার কাছে উক্ত দীনার দিরহাম ফিরিয়ে দিতে হবে। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত। আর সাহেবাইন (র.) বলেন, যার নিকট থেকে চুরি হয়েছে সে ব্যক্তি উক্ত দীনার দিরহাম পাওয়ার কোনো উপায় নেই।

এ মতপার্থক্যের মূলক্ষেত্র গসব বা বলপূর্বক হরণ। অর্থাৎ সাহেবাইনের মতে এটা হলো বস্তুর নতুন মূল্যমান সৃষ্টিকারী একটি কর্ম। ইমাম আবূ হানীফা (র.) ভিন্ন মত পোষণ করেন। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতানুসারে হদ্দ সাব্যস্ত হওয়ার বিষয়টি প্রশ্ন সাপেক্ষ নয়। কারণ চোর তো চুরির মালের মালিক হচ্ছে না।

কোনো কোনো ভাষ্য মতে, সাহেবাইনের মতানুযায়ী হাত কাটা সাব্যস্ত হবে না। কেননা হাত কাটার পূর্বেই চোর সেটার মালিক হয়ে গেছে। আবার কোনো কোনো ভাষ্যমতে হাতকাটা সাব্যস্ত হবে। কেননা কর্মগত হস্তক্ষেপের কারণে তা ভিন্ন বস্তুতে পরিণত হয়েছে। সুতরাং সে হুবহু চুরিকৃত বস্তুটির মালিক হয় নি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

"بَابُ مَا يُقْطَعُ فِيْهِ وَمَا لَا يُقْطَعُ" শিরোনামক পরিচ্ছেদে আলোচনা গত হয়েছে যে, গোশত দ্রুতপচনশীল একটি বস্তু। তাই এটা চুরি করলে শরয়ী চুরির আওতায় পড়ে না। বিধায় হাত কাটা হয় না। তবে আলোচ্য মাসআলায় অবশ্যই বকরির মূল্য পরিশোধ করতে হবে।

قوله : وَمَنْ سَرَقَ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً يَجِبُ الخ : কোনো চোর যদি কারো নিকট থেকে দশ দিরহাম পরিমাণ মূল্যের সোনা বা রূপা চুরি করে নিয়ে তা দ্বারা দিরহাম কিংবা দীনার তৈরি করে ফেলে, তাহলে এর কী হুকুম– এ নিয়ে ইমাম আবূ হানীফা ও সাহেবাইনের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে চোরের হাত কাটা হবে এবং দীনার-দিরহামগুলো সোনা-রূপার মালিকের কাছে ফেরত দেওয়া হবে। এটা ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এরও মত। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে দীনার-দিরহাম মালিকের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হবে না। হাত কাটার ব্যাপারে দুরকম

https://e-ilm.weebly.com/

বর্ণিত আছে। এ ইখতেলাফটি মূলত হয়েছিল গসবের ক্ষেত্রে। অর্থাৎ কেউ যদি কারো কাছ থেকে সোনা-রূপা গসব করে নিয়ে তা দ্বারা দীনার-দিরহাম বানিয়ে ফেলে, তাহলে এর দ্বারা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে মালিকের হক রহিত হয়ে যায় না; বরং দীনার-দিরহাম বানানোর পরেও তা মালিকের হক বলেই পরিগণিত হয়।

পক্ষান্তরে সাহেবাইনের মতে দীনার -দিরহাম বানানোর দ্বারা যেহেতু সোনা-রূপার নতুন মূল্যায়ন সৃষ্টি হয়, তাই এর দ্বারা প্রকৃত মালিকের হক রহিত হয়ে যায় এবং সেগুলো হরণকারীর মালিকানা হয়ে যায়। উক্ত গসবের মাসআলায় সৃষ্ট মতপার্থক্যের অনুরূপ মতপার্থক্য বক্ষমান চুরির মাসআলায়ও হয়েছে। ইমামগণ ঐ মাসআলার অনুরূপ মতামত এ মাসআলায়ও প্রকাশ করেছেন।

যাই হোক, আলোচ্য মাসআলায় ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে চোরের হাতকাটা হবে এবং দীনার দিরহাম ফিরিয়ে দেওয়া হবে। কারণ তার মতে সোনাকে দীনার এবং রূপাকে দিরহামে পরিণত করার দ্বারা চোর সেগুলোর মালিক হয়ে যায়নি; বরং সেগুলো মালিকেরই হক। তাই তার কাছে ফেরত দিতে হবে এবং নেসাব পরিমাণ সম্পদ চুরি করার কারণে তার হাতও কাটা হবে।

সাহেবাইন (র.) বলেন, দীনার বা দিরহামে পরিণত করা একটি কাজ। যার দ্বারা সোনা-রূপার নতুন মূল্যায়ন সৃষ্টি হয়। অতএব, এর ফলে মালিকের হক রহিত হয়ে যাবে। তাই সেগুলো মালিকের কাছে আর ফিরিয়ে দেওয়া হবে না।

এক বর্ণনা অনুযায়ী সাহেবাইনের মতে চোরের হাত কাটা হবে না। কারণ হাত কাটার পূর্বেই যেহেতু চুরির মালের উপর চোরের মালিকানা সাব্যস্ত হয়ে গেছে, তাই আর হাত কাটা হবে না। অন্য বর্ণনা অনুযায়ী হাত কাটা হবে। কারণ দীনার-দিরহাম বানানোর দ্বারা সোনা-রূপা অন্য বস্তু হয়ে যায় আর চোর সেই অন্য বস্তুর মালিক হয়। চুরিকৃত সোনা-রূপার মালিক সে হয় নাই, বিধায় তার হাত কাটা হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

فَإِنْ سَرَقَ ثَوْبًا فَصَبَغَهُ أَحْمَرَ قُطِعَ لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ الثَّوْبُ وَلَمْ يَضْمَنْ قِيمَةَ الثَّوْبِ، وَهٰذَا عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ وَأَبِيْ يُوْسُفَ . وَقَالَ مُحَمَّدٌ : يُؤْخَذُ مِنْهُ الثَّوْبُ وَيُعْطٰى مَا زَادَ الصَّبْغُ فِيْهِ اِعْتِبَارًا بِالْغَصْبِ، وَالْجَامِعُ بَيْنَهُمَا كَوْنُ الثَّوْبِ أَصْلًا قَائِمًا وَكَوْنُ الصَّبْغِ تَابِعًا. وَلَهُمَا أَنَّ الصَّبْغَ قَائِمٌ صُوْرَةً وَمَعْنًى، حَتّٰى لَوْ أَرَادَ أَخْذَهُ مَصْبُوْغًا يَضْمَنُ مَا زَادَ الصَّبْغُ فِيْهِ، وَحَقُّ الْمَالِكِ فِي الثَّوْبِ قَائِمٌ صُوْرَةً لَا مَعْنًى: أَلَا تَرٰى أَنَّهُ غَيْرُ مَضْمُوْنٍ عَلَى السَّارِقِ بِالْهَلَاكِ فَرَجَّحْنَا جَانِبَ السَّارِقِ، بِخِلَافِ الْغَصْبِ، لِأَنَّ حَقَّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَائِمٌ صُوْرَةً وَمَعْنًى فَاسْتَوَيَا مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ فَرَجَّحْنَا جَانِبَ الْمَالِكِ لِمَا ذَكَرْنَا وَإِنْ صَبَغَهُ أَسْوَدَ أُخِذَ مِنْهُ فِي الْمَذْهَبَيْنِ يَعْنِي عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ، وَعِنْدَ أَبِيْ يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ هٰذَا وَالْأَوَّلُ سَوَاءٌ لِأَنَّ السَّوَادَ زِيَادَةٌ عِنْدَهُ كَالْحُمْرَةِ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ زِيَادَةٌ أَيْضًا كَالْحُمْرَةِ وَلٰكِنَّهُ لَا يَقْطَعُ حَقَّ الْمَالِكِ، وَعِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ السَّوَادُ نُقْصَانٌ فَلَا يُوْجِبُ انْقِطَاعَ حَقِّ الْمَالِكِ .

অনুবাদ : যদি কেউ একটি কাপড় চুরি করে তা লাল রংয়ে রঞ্জিত করে তাহলে হাত কাটা হবে। আর কাপড় ফেরত নেওয়া হবে না এবং মূল্য প্রদানের দায়ও চাপানো হবে না। এ হলো ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর অভিমত। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, কাপড় তার থেকে ফেরত নেওয়া হবে এবং রঞ্জনের কারণে যতটুকু মূল্যবৃদ্ধি পেয়েছে, তা চোরকে দিয়ে দেওয়া হবে।

এটাকে তিনি গসবের পর রঞ্জিত করার উপর কিয়াস করেন। মাসআলা দুটির মাঝে যোগসূত্র এই যে, কাপড় হলো মূলবস্তু যা বিদ্যমান রয়েছে, আর রং হলো তার তাবে' বা অনুবর্তী বিষয়। শায়খায়নের দলিল হলো, এখানে রং দৃশ্যত যেমন বিদ্যমান রয়েছে, তেমনি গুণগতভাবেও বিদ্যমান রয়েছে। এ কারণেই তো মালিক যদি রঞ্জিত অবস্থায় উক্ত কাপড় ফেরত নিতে চায়, তাহলে রঞ্জনের কারণে যে পরিমাণ মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে, তার দায় তাকে বহন করতে হবে।

পক্ষান্তরে কাপড়ের মাঝে মালিকের অধিকার দৃশ্যত বিদ্যমান রয়েছে; কিন্তু গুণগতভাবে বিদ্যমান নেই। দেখুন না, বিনষ্ট হয়ে যাওয়া অবস্থায় চোরের উপর তার ক্ষতিপূরণ নেই। তাই আমরা চোরের দিকটিকে অগ্রাধিকার প্রদান করেছি।

গসব বা হরণের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা এখানে মালিক ও হরণকারী উভয়েরই হক দৃশ্যত ও গুণগতভাবে বিদ্যমান রয়েছে। ফলে এদিক থেকে উভয়ই সমান হয়ে গেল। তাই আমরা যে কারণ উল্লেখ করেছি, সে প্রেক্ষিতে মালিকের দিকটিকে অগ্রাধিকার প্রদান করেছি।

আর যদি কালো রংয়ে রঞ্জিত করে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) উভয়ের মতে কাপড় ফেরত নেওয়া হবে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে কালো ও লাল উভয় অবস্থায়ই সমান। কেননা তার মতে লাল রংয়ের মতো কালো রংও একটি অতিরিক্ত সংযোজন। ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর মতেও কালো রং লাল রংয়ের মতো অতিরিক্ত সংযোজন। কিন্তু তা মালিকের হক রহিত করে না। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে কালো রংয়ের রঞ্জন হচ্ছে একটি দোষ। ফলে তা মালিকের হক বিলুপ্তি সাব্যস্ত করে না।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কেউ যদি কারো থেকে একটি কাপড় চুরি করে নিয়ে তাতে লাল রং লাগিয়ে দেয় এবং এর দায়ে তার হাত কাটা হয়, তাহলে তার থেকে কাপড়টি ফিরিয়ে নেওয়া হবে কিনা? এ নিয়ে আমাদের ইমামত্রয়ের মাঝে মতভেদ হয়েছে।

ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর অভিমত হলো, চোরের কাছ থেকে কাপড় ফিরিয়ে নেওয়া হবে না। আর কাপড়ের মূল্য পরিশোধের দায়ও তার উপর চাপানো হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, কাপড়ে রং লাগানোর কারণে যে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে, তা চোরকে দিয়ে কাপড়টি তার থেকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল : ইমাম মুহাম্মদ (র.) আলোচ্য চুরির মাসআলাটিকে গসবের মাসআলার উপর কিয়াস করেন। অর্থাৎ কেউ যদি কারো থেকে একটি কাপড় গসব করে নিয়ে তাকে রঞ্জিত করে ফেলে, তাহলে সেক্ষেত্রে মাসআলা হলো, রঞ্জিত করার কারণে যে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে, গসবকারীকে তা প্রদান করত কাপড়টি মালিক নিয়ে যাবে। অনুরূপভাবে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে চুরির মাসআলাও রঞ্জিত করার কারণে যে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে তা চোরকে দিয়ে তার থেকে কাপরটি নিয়ে যাওয়া হবে। পরস্পর তুলনাকৃত মাসআলা দুটির মাঝে জামে বা যোগসূত্র হলো, উভয় মাসআলায় কাপড় একটি বিদ্যমান মূলবস্তু হওয়া এবং রং তার তাবে বা অনুবর্তী হওয়া। এ মাসআলায় ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) ইমাম মুহাম্মদ (র.) অনুরূপ মত পোষণ করেন।

শায়খায়নের দলিল : শায়খায়ন বলেন, আলোচ্য মাসআলায় চোরের হক তথা রংটি বাহ্যত এবং গুণগত উভয়ভাবে বিদ্যমান আছে। বাহ্যত বিদ্যমান থাকার অর্থ হলো তা চোখে দেখা যায়। আর গুণগত বিদ্যমান থাকার অর্থ হলো তার একটি মূল্য আছে। এ কারণেই কাপড়ের মালিক যদি এ রঞ্জিত কাপড়টি ফিরিয়ে নিতে চায়। তাহলে রং এর মূল্য দিয়ে নিতে হয়। পক্ষান্তরে কাপড়ের মালিকের হক কেবল বাহ্যত বিদ্যমান আছে, গুণগতভাবে বিদ্যমান নেই। বাহ্যত বিদ্যমান আছে, কারণ কাপড়টির অস্তিত্ব আছে, তা দেখা যায়, ধরা যায়। কিন্তু গুণগতভাবে তা বিদ্যমান নেই। কারণ কাপড়টি চোরের হাতে বিনষ্ট হয়ে যায়, তাহলে তাকে এর কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে হয় না। মোটকথা, মালিকের হক একদিক থেকে বিদ্যমান। আর চোরের হক দুই দিক থেকে বিদ্যমান, তাই চোরের দিকটিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর কিয়াসের জবাব : চুরির মাসআলাকে গসবের মাসআলার উপর কিয়াস করা ঠিক নয়। কারণ গসবের মাসআলায় গসবকারী এবং মালিক উভয়ের হক বাহ্যত এবং গুণগত উভয়ভাবে বিদ্যমান থাকে। সে হিসাবে উভয়ের দিক বরাবর। তথাপি কাপড়টি মূলবস্তু আর রং তার অনুবর্তী হওয়ার কারণে কাপড়ের মালিকের দিকটিকে সেখানে প্রাধান্য দেওয়া হয়। পক্ষান্তরে আলোচ্য চোরের মাসআলায় চোর ও মালিক উভয়ের হক বাহ্যত এবং গুণগত উভয়ভাবে বিদ্যমান থাকে না। চোরের হক উভয়ভাবে বিদ্যমান থাকে আর মালিকের হক কেবল বাহ্যত বিদ্যমান থাকে। অতএব, একটিকে অপরটির উপর তথা চোরের মাসআলাকে গাসেব বা হরণকারীর মাসআলার উপর কিয়াস করা যাবে না।

قَوْلُهُ : وَاِنْ صَبَغَهُ اَسْوَدَ اَخَذَ مِنْهُ فِي الْمَذْهَبَيْنِ الخ : চোর যদি কাপড় চুরি করার পর তা কালো রংয়ে রঞ্জিত করে, তাহলে তার কী হুকুম– এ নিয়েও ইমামত্রয়ের মাঝে মতভিন্নতা রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে কালো রং করার পর কাপড় চোরের নিকট থেকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে কালো রং করার পরও কাপড় নেওয়া হবে না। যেমন লাল রং করার পর নেওয়া যায় না।

দলিল পর্ব : ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেছেন– চোর যদি তার চুরিকৃত কাপড়টিতে কালো রং লাগায়, তাহলে কাপড়টি তার থেকে ফেরত নেওয়া যাবে না। যেমন লাল রঙ লাগালে ফেরত নেওয়া যায় না। কারণ তার মতে কালো রঙটি লাল রঙ এর মতোই একটি অতিরিক্ত সংযোজন। এর দ্বারা কাপড়ের মূল্যমান বৃদ্ধি পায়। যেমন লাল রংয়ের দ্বারা

https://e-ilm.weebly.com/

বৃদ্ধি পায়। অতএব, লাল রং লাগানো হলে যে দলিলের ভিত্তিতে যে হুকুম কালো রং লাগালেও তার মতে সেই দলিলের ভিত্তিতে সেই একই হুকুম।

আর লাল রং লাগানো সম্পর্কিত হুকুম ও দলিল পূর্ববর্তী মাসআলায় অতিবাহিত হয়েছে। অর্থাৎ চোরের হক বাহ্যত ও গুণগত উভয়টি বিদ্যমান থাকায়, মালিকের হকের উপর চোরের হক কে প্রাধান্য দিয়ে একথা বলা যে, কাপড়টি চোরের কাছ থেকে ফেরত নেওয়া হবে না এবং তার উপর মূল্য পরিশোধের দায়ভারও চাপানো হবে না।

ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতেও কালো রং লাল রংয়ের মতো একটি অতিরিক্ত সংযোজন। এর দ্বারা কাপড়ের মূল্যমান বৃদ্ধি পায়। কিন্তু তার মতে লাল রং লাগানো হলেও যেহেতু ফেরত নেওয়া হয়, সেহেতু কালো রং লাগালেও কাপড় ফেরত নেওয়া হবে। কারণও সেই একই কারণ। অর্থাৎ কাপড় হলো মূল বিদ্যমান বস্তু আর রঙ হলো কাপড়ের অনুবর্তী বিষয়। অতএব, মূল বস্তুর মালিকের দিককে প্রাধান্য দেওয়া আবশ্যক।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে কালো রং কোনো সংযোজন নয়; বরং কালো রং একটি দোষ। এর দ্বারা কাপড়ের মূল্যমান বৃদ্ধি পায় না। অতএব, কালো রং লাগানোর সুরতে চোরের হক গুণগতভাবে প্রতিষ্ঠিতই হয় না। কেবল বাহ্যত প্রতিষ্ঠিত হয়। আর মালিকের হকও বাহ্যত: প্রতিষ্ঠিত আছে। সে হিসাবে মালিকের হক ও চোরের হক বরাবর হয়ে গেল। কিন্তু মালিক মূলবস্তু তথা কাপড়ের মালিক হওয়ার কারণে তার দিকটিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে এবং একথা বলা হয়েছে যে, কাপড় ফেরত নিতে পারবে।

ফায়দা : পণ্ডিতগণ বলেছেন, ইমামত্রয়ের উপরিউক্ত মতভেদটি মূলত কোনো দলিল প্রমাণের কারণে সৃষ্ট নয়; বরং এই মতভেদের উৎস হলো স্থানকালের বৈচিত্র্য। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর সময়ে বনী উমাইয়্যা বংশের রাজত্ব ছিল; তখন লাল রং ছিল বেশ সমাদৃত। কালো রং ছিল দূষণীয়। তাই ইমাম আবূ হানীফা (র.) কালো রং-কে দোষ বলেই গণ্য করেছেন। অতিরিক্ত সংযোজন মনে করেননি। কিন্তু সাহেবাইনের জীবদ্দশায় আব্বাসী শাসকদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং তাদের কাছে কালো রং সমাদৃত হয়ে উঠেছিল। তাই সাহেবাইন (র.) কালো রং-কে অতিরিক্ত সংযোজন হিসাবে মূল্যায়ন করেছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ قَطْعِ الطَّرِيْقِ

পরিচ্ছেদ : রাহাজানি সম্পর্কে

রাহাজানি বা ডাকাতিকে سرقة كبرى (বড় চুরি) ও বলা হয়। চুরি বলার কারণ হলো, ডাকাত পথচারীদের ধন-সম্পদ শাসক ও তার লোকদের দৃষ্টির আড়ালে ছিনিয়ে নেয়। আর দৃষ্টির আড়ালে তথা গোপনে মাল নেওয়াকেই سرقة বা চুরি বলা হয়। বড় (চুরি) বলার কারণ হলো এই যে, ডাকাতির ক্ষতি চুরির ক্ষতির তুলনায় ব্যাপক হয়ে থাকে। কেননা ডাকাতির কারণে রাস্তার নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। সমাজবাসী নিশ্চিন্তে কোথাও যাতায়াত করতে পারে না। পাশাপাশি ডাকাতির শাস্তিটাও চুরির শাস্তির তুলনায় গুরুতর। কেননা ডাকাতের ডান হাত ও বাম পা উভয়ই কেটে ফেলা হয়। কখনো হত্যা করা হয়। আবার কখনো শূলে চড়ানো হয়। এসব বিবেচনায় ডাকাতিকে سرقة كبرى বা বড় চুরি বলে অভিহিত করা হয়।

রাহাজানি সংঘটিত হওয়ার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে। যেসব শর্তের অনুপস্থিতিতে রাহাজানি সংঘটিত হতে পারে না। শর্তগুলো নিম্নরূপ:

১. ডাকাত দলের হাতে এমন শক্তিবল থাকতে হবে, যার কারণে পথচারীগণ তাদের মোকাবিলা করতে অক্ষম হয়। চাই সেটা লাঠি, পাথর কিংবা অন্য কোনো অস্ত্রের কারণে অর্জিত হোক।

২. ডাকাতির ঘটনাটি শহরের বাইরে সংঘটিত হতে হবে। দূরে সংঘটিত হতে হবে। শরহে ত্বহাবীতে উল্লেখ আছে, শহর হতে সফর পরিমাণ দূরত্বে সংঘটিত হতে হবে।

৩. দারুল ইসলামে তথা ইসলামি রাষ্ট্রে সংঘটিত হতে হবে।

৪. লুণ্ঠিত মালের পরিমাণ চুরির নেসাবের সমান বা বেশি হতে হবে। ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র.)-এর এটাই মত। ইমাম মালেক (র.) বলেছেন, নেসাব পরিমাণের শর্ত নেই। ইমাম আবূ সাউর ও ইবনুল মুনযির (রা.)ও এ মত পোষণ করেন।

৫. ডাকাত দলের সকল সদস্য আক্রান্ত পথচারীদের অপরিচিত হতে হবে। ডাকাত দলের কোনো সদস্য যদি কোনো পথচারীর মাহরাম আত্মীয় হয় কিংবা শিশু হয় কিংবা পাগল হয়, তাহলে ডাকাত দলের উপর কর্তন সাব্যস্ত হবে না।

৬. ডাকাত দল তওবা করার পূর্বে ধৃত হতে হবে। তওবা করার পর ধৃত হলে তাদের উপর হদ্দ কার্যকর করা যাবে না। তবে কিসাস এবং লুণ্ঠিত সম্পদের ক্ষতিপূরণ রহিত হবে না। ডাকাতের শাস্তি সম্পর্কিত কুরআনের আয়াতটি হলো এই–

اِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْا اَوْ يُصَلَّبُوْا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ.

অর্থাৎ যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড করে বেড়ায় এটাই তাদের শাস্তি হলো, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলে চড়ানো হবে অথবা বিপরীত দিক হতে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদেরকে দেশ থেকে নির্বাসন করা হবে। এটাই তাদের পার্থিব জগতে লাঞ্ছনা স্বরূপ আর পরজগতে তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি। (সূরা মায়িদাহ– আয়াত নং ৩৩)।

https://e-ilm.weebly.com/

উপরিউক্ত আয়াতটি দস্যুদের সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে। ঘটনা এই যে, একবার উকল এবং উরায়না গোত্রের কিছু লোক মদিনায় এসেছিল। ইসলাম গ্রহণ করে তারা মদিনায়ই বাস করছিল। ইতোমধ্যে মদিনার আবহাওয়া তাদের কাছে প্রতিকূল হয়ে গেল। তারা জ্বর ও পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হলো। এ পরিস্থিতিতে নবী করীম ﷺ তাদেরকে আদেশ করলেন, মদিনার বইরে যেখানে সদকার উট রাখা আছে, তোমরা সেখানে চলে যাও এবং উটের দুধ ও উটের পেশাব পান কর। ইনশাআল্লাহ তোমরা আরোগ্য হবে। নবীজী ﷺ -এর নির্দেশ মোতাবেক তারা সেখানে চলে গেল এবং যা করতে বলা হয়েছিল তারা তাই করল। এর ফলে তারা আরোগ্যও লাভ করল। কিন্তু তারা ইসলাম ত্যাগ করল এবং নবীজী ﷺ -এর নিয়োজিত উট রক্ষকদের অত্যন্ত নির্মমভাবে হত্যা করে উট নিয়ে পালিয়ে গেল।

এ দুঃসংবাদ নবী করীম ﷺ -এর কর্ণগোচর হলে তিনি তাদের পিছু ধাওয়া করে লোক পাঠালেন। ধাওয়াকারীরা ডাকাত দলকে গ্রেফতার করে মদিনায় নিয়ে আসতে সক্ষম হলো। এরপর তাদের ডান হাত ও বাম পা কর্তন করা হলো। চোখ ফুটো করা হলো, মদিনার পার্শ্ববর্তী পাথুরে ভূমিতে ফেলে রাখা হলো এবং সেখানেই তারা কাতরাতে কাতরাতে প্রাণ হারাল। এঘটনার প্রেক্ষিতেই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ -এর কাছে এ আয়াতের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে হযরত জিবরাঈল (আ.) বলেছেন, যে হত্যা করেছে কিন্তু মাল লুণ্ঠন করেনি, তাকে হত্যা করা হবে। যে হত্যা করেছে এবং মালও লুণ্ঠন করেছে, তাকে শূলে চড়ানো হবে। যে ব্যক্তি শুধু মাল লুণ্ঠন করেছে, হত্যা করেনি, তার ডান হাত ও বাম পা কাটা হবে। আর যে হত্যা করেনি মালও লুণ্ঠন করেনি কেবল ত্রাস সৃষ্টি করেছে, তাকে নির্বাসিত করা যেতে পারে।

নির্বাসিত করার অর্থ কী? এ নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম শাফেয়ী, আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) ও কতিপয় আলেমের মতে নির্বাসিত করার অর্থ হলো এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে তাড়িয়ে দেওয়া। কিন্তু এ ক্ষেত্রে একটি সমস্যা হলো, সে অন্য অঞ্চলে গিয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে। তাই কেউ কেউ বলেছেন, নির্বাসিত করার অর্থ হলো দস্যুদেরকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া। একেক জনকে একেক এলাকায় পাঠিয়ে দেওয়া। যাতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে রাহাজানি করতে না পারে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে নির্বাসিত করার অর্থ হলো কারাগারে আবদ্ধ করা। কেননা কারাগারে আবদ্ধ করা হলে সেও দেশবাসী থেকে বিচ্ছিন্ন হলো এবং দেশবাসীও তার যন্ত্রণা হতে রক্ষা পেল।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ وَاِذَا خَرَجَ جَمَاعَةٌ مُمْتَنِعِيْنَ اَوْ وَاحِدٌ يَقْدِرُ عَلَى الْاِمْتِنَاعِ فَقَصَدُوْا قَطْعَ الطَّرِيْقِ فَاُخِذُوْا قَبْلَ اَنْ يَاْخُذُوْا مَالًا وَيَقْتُلُوْا نَفْسًا حَبَسَهُمُ الْاِمَامُ حَتّٰى يُحْدِثُوا تَوْبَةً وَاِنْ اَخَذُوْا مَالَ مُسْلِمٍ اَوْ ذِمِّيٍّ، وَالْمَاْخُوْذُ اِذَا قُسِّمَ عَلٰى جَمَاعَتِهِمْ اَصَابَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا اَوْ مَا تَبْلُغُ قِيْمَتُهُ ذٰلِكَ قَطَعَ الْاِمَامُ اَيْدِيَهُمْ وَاَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلَافٍ، وَاِنْ قَتَلُوا وَلَمْ يَاْخُذُوْا مَالًا قَتَلَهُمُ الْاِمَامُ حَدًّا وَالْاَصْلُ فِيْهِ قَوْلُهُ تَعَالٰى ﴿اِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ﴾ الْاٰيَةَ . وَالْمُرَادُ مِنْهُ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ التَّوْزِيْعُ عَلَى الْاَحْوَالِ وَهِيَ اَرْبَعَةٌ : هٰذِهِ الثَّلَاثَةُ الْمَذْكُوْرَةُ، وَالرَّابِعَةُ نَذْكُرُهَا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَلِاَنَّ الْجِنَايَاتِ تَتَفَاوَتُ عَلَى الْاَحْوَالِ فَاللَّائِقُ تَغَلُّظُ الْحُكْمِ بِتَغَلُّظِهَا . اَمَّا الْحَبْسُ فِي الْاُوْلٰى فَلِاَنَّهُ الْمُرَادُ بِالنَّفْيِ الْمَذْكُوْرِ لِاَنَّهُ نَفْيٌ عَنْ وَجْهِ الْاَرْضِ بِدَفْعِ شَرِّهِمْ عَنْ اَهْلِهَا، وَيُعَزَّرُوْنَ اَيْضًا لِمُبَاشَرَتِهِمْ مُنْكَرَ الْاِخَافَةِ . وَشَرْطُ الْقُدْرَةِ عَلَى الْاِمْتِنَاعِ؛ لِاَنَّ الْمُحَارَبَةَ لَا تَتَحَقَّقُ اِلَّا بِالْمَنَعَةِ. وَالْحَالَةُ الثَّانِيَةُ كَمَا بَيَّنَّاهَا لِمَا تَلَوْنَاهُ.

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কোনো দল বা ব্যক্তি যদি প্রতিরোধ শক্তিতে বলিয়ান হয়ে বের হয় এবং রাহাজানির উদ্যোগ নেয়, কিন্তু সম্পদ লুণ্ঠন ও মানুষ হত্যার পূর্বেই ধরা পড়ে যায়। তাহলে শাসক তাদের বন্দি করে রাখবেন। যতক্ষণ না তারা তওবা করে।

আর যদি তারা কোনো মুসলমান বা জিম্মির মাল লুণ্ঠন করে এবং লুণ্ঠিত মাল দলের সবার মাঝে বণ্টন করা হলে প্রত্যেকে দশ দিরহাম বা তার বেশি ভাগ পাবে কিংবা অন্য দ্রব্যের ক্ষেত্রে যদি তার মূল্য দশ দিরহামের সমান হয় তাহলে শাসক তাদের হাত পা বিপরীত দিক থেকে (ডান হাত-বাম পা) কর্তন করবেন। আর যদি তারা মাল লুণ্ঠন না করে মানুষ হত্যা করে থাকে তাহলে শাসক তাদেরকে হত্যা করবেন হদ্দ হিসাবে। এ ক্ষেত্রে মূল দলিল হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী :

اِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُقَتَّلُوْا اَوْ يُصَلَّبُوْا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ـ

অর্থাৎ যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং জমিনে ফ্যাসাদ সৃষ্টির অপচেষ্টা করে তাদের শাস্তি এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে কিংবা শূলে চড়ানো হবে কিংবা উল্টোভাবে তাদের হাত পা কেটে দেওয়া হবে। কিংবা তাদেরকে জমিন থেকে নির্বাসিত করা হবে। আলোচ্য আয়াতে (او অব্যয়টি দ্বারা) উদ্দেশ্য হচ্ছে– আল্লাহ ভালো জানেন, (বিধানের বিভিন্ন অংশকে) অপরাধের বিভিন্ন অবস্থার মোকাবিলায় বণ্টন করা। আর অপরাধের অবস্থা চারটি। উল্লিখিত এই তিনটি আর চতুর্থটি ইনশাআল্লাহ আমরা উল্লেখ করবো। তাছাড়া অপরাধ যেহেতু বিভিন্ন অবস্থায় তারতম্যপূর্ণ হয়ে থাকে, সেহেতু অপরাধের গুরুত্বের প্রেক্ষিতে বিধানও গুরুতর হওয়াই সমীচীন।

প্রথম প্রকার অপরাধের ক্ষেত্রে আটকের বিধান এজন্য যে, আয়াতে উল্লিখিত النفى বা নির্বাসন শব্দটি দ্বারা তাই বুঝানো হয়েছে। কেননা বন্দী করার অর্থ হলো এলাকাবাসীদের থেকে অপরাধীদের দুষ্কৃতি রোধ করার মাধ্যমে তাদেরকে এলাকা হতে নির্বাসিত করা। তাদেরকে দৈহিক শাসনও করা হবে। কেননা তারা ভীতি সৃষ্টির অপরাধ করেছে। আর প্রতিরোধ ক্ষমতার শর্তারোপ করার কারণ, প্রতিরোধ ক্ষমতা ছাড়া মুহারাবা তথা লড়াই সম্ভব হয় না। আর দ্বিতীয় অবস্থার বিধান, আমরা যেমন বর্ণনা করেছি তার দলিল আমাদের তেলাওয়াতকৃত আয়াত :

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উল্লিখিত ভাষ্যে "দল বা ব্যক্তি" কথাটি ব্যাপক। অতএব, মুসলিম, কাফের, জিম্মি, হরবী সকল শ্রেণির দস্যুই এর অন্তর্ভুক্ত

"প্রতিরোধ ক্ষমতায় বলীয়ান হওয়া" বলতে উদ্দেশ্য হলো, অন্যের আক্রমণ প্রতিহত করার মতো শক্তি সাহসের অধিকারী হওয়া। মাল লুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ড ঘটানোর পূর্বেই যদি দস্যুরা ধৃত হয়, তাহলে শাসক তাদেরকে কারাগারে আবদ্ধ রাখবে। এটা হবে তাদের পক্ষে কুরআন বর্ণিত নির্বাসিত করার বাস্তবায়ন স্বরূপ। এরপর যখন তারা তওবা করবে এবং তাদের মাঝে ভালো হওয়ার লক্ষণ প্রকাশ পাবে, তখন শাসক তাদেরকে মুক্তি দিবেন।

قوله : وَإِنْ اَخَذُوا مَالَ مُسْلِمٍ اَوْ ذِمِّيٍّ الخ : আয়াতে বলা হয়েছে, اَلَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে লড়াই করে। মূলত আয়াতে الله শব্দের পূর্বে একটি مضاف উহ্য আছে। তাই শব্দের আসল রূপটি হলো– اَلَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ وَرَسُوْلَهٗ "যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বন্ধুদের সাথে লড়াই করে"। আর আল্লাহ ও রাসূলের বন্ধু হলো মুমিন-মুসলিম লোকেরা। অতএব, আয়াতের মর্ম দাঁড়াল যারা মুমিনদের সাথে লড়াই করে। তাছাড়া তারা যখন আল্লাহর নির্দেশ উপেক্ষা করে দস্যুবৃত্তির উদ্দেশ্যে বের হয়, তখন কেমন যেন তারা আল্লাহর সাথে লড়াই করতেই শুরু করে। সে হিসাবে বলা হয়েছে– যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের সাথে লড়াই করে। আয়াতে উল্লিখিত او অব্যয়টির অর্থ নিয়ে আলেমদের একাধিক মত বর্ণিত রয়েছে।

১. ইমাম শাফেয়ী, লাইছ, ইসহাক, কাতাদাহ, আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) এই প্রমুখ আলেমদের মতে او অব্যয়টি توزيع তথা বন্টন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ আয়াতে বর্ণিত একেক প্রকার শাস্তি একেক প্রকার অপরাধের জন্য, একথা বুঝানোর জন্য او ব্যবহৃত হয়েছে। হানাফীগণের কাছেও এমতটি গ্রহণযোগ্য। মুসান্নিফ (র.) وَالْمُرَادُ مِنَ الْاٰيَةِ التَّوْزِيْعُ বলে এদিকেই ইশারা করেছেন।

এ মতের পক্ষে একটি রেওয়ায়েতও রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ আবূ বুরদা হেলাল ইবনে উমাইর আল আসলামীকে নির্বাসিত করেছিলেন। ইতোমধ্যে কিছু লোক ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে মদিনায় আগমন করছিল। আবূ বুরদার লোকেরা আগত লোকদেরকে লুট করল। অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আ.) তাদের শাস্তির বিধান নিয়ে অবতীর্ণ হলেন। তিনি জানালেন, যে ব্যক্তি হত্যা করবে এবং মাল লুণ্ঠন করবে, তাকে শূলে চড়ানো হবে। যে ব্যক্তি শুধু হত্যা করবে, মাল লুণ্ঠন করবে না তাকে হত্যা করা হবে। যে ব্যক্তি হত্যা করবে না শুধু মাল লুণ্ঠন করবে, তাকে ডান হাত ও বাম-পা কর্তন করা হবে। আর যে ব্যক্তি মুসলমান হয়ে আসবে, ইসলাম তার অতীত জীবনের অপরাধসমূহ নিঃশেষ করে দিবে। কোনো কোনো বর্ণনায় আছে, যে ব্যক্তি কেবল ত্রাস সৃষ্টি করেছে হত্যা করেনি, মালও লুণ্ঠন করেনি, তাকে নির্বাসিত করা হবে।

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, রাহাজানির অপরাধটি চার ধরনের হয়ে থাকে। আর কুরআনের আয়াতে বর্ণিত শাস্তিও চারটি। একেক প্রকার অপরাধের জন্য একেক প্রকার শাস্তি নির্ধারিত।

যুক্তির আলোকেও এমনটি হওয়া উচিত। কেননা রাহাজানি বিভিন্ন স্তরের হয়ে থাকে। কখনো কেবল ত্রাস সৃষ্টি করা হয়, কখনো শুধু মাল লুণ্ঠন করা হয়, কখনো শুধু হত্যা করা হয়, কখনো মাল লুণ্ঠন ও হত্যা উভয়ই করা হয়। এ অবস্থাগুলোর মাঝে কোনোটি বেশি গুরুতর। আবার কোনোটি অপেক্ষাকৃত কম গুরুতর। অতএব বেশি গুরুতর অপরাধটির শাস্তিও বেশি গুরুতর হওয়া উচিত। কম গুরুতর অপরাধটির শাস্তি কম গুরুতর হওয়া আবশ্যক। এ হিসাবে উপরে বর্ণিত হাদীসে যে একেক প্রকার অপরাধের জন্য একেক প্রকার শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে তা একান্তই যৌক্তিক।

অন্যথায় নিঃশর্তভাবে আয়াতের উপর আমল করতে গেলে কখনো গুরু অপরাধের শাস্তি লঘু হয়ে যাবে। আবার কখনো লঘু অপরাধের শাস্তি গুরুতর হয়ে যাবে। যা শরিয়ত ও যুক্তির বিবেচনায় সম্পূর্ণ অনুচিত।

রাহাজানির চারটি স্তর যেমন পূর্বেও আলোচিত হয়েছে। প্রথম স্তর হলো শুধু রাহাজানির উদ্যোগ নিয়ে বের হওয়া। মাল লুণ্ঠন ও হত্যার পূর্বেই ধৃত হওয়া। এ স্তরের শাস্তি হলো নির্বাসন। অর্থাৎ তওবা করার আগ পর্যন্ত কারাগারে আবদ্ধ রাখা এবং কিছু শারীরিক শাস্তি দেওয়া।

দ্বিতীয় স্তর হলো, হত্যা না করে শুধু মাল লুণ্ঠন করা। এ স্তরের শাস্তি হলো বিপরীত দিক থেকে হাত-পা কেটে দেওয়া। লুণ্ঠিত মাল যদি অক্ষুণ্ণ থাকে তাহলে তা ফিরিয়ে দেওয়া। ধ্বংস হয়ে গেলে ক্ষতিপূরণ নেই (তৃতীয় ও চতুর্থ স্তরের বিধান সামনে আসছে)।

ডাকাতি সংঘটিত হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট লোকদের প্রতিরোধ ক্ষমতায় বলীয়ান হওয়ার শর্তারোপ করা হয়েছে। কারণ প্রতিরোধ ক্ষমতা না থাকলে লড়াই বা ডাকাতি হতে পারে না। প্রতিরোধ ক্ষমতায় সমৃদ্ধ হওয়া ছাড়াই যেসব লোক মানুষের মাল লুণ্ঠনের জন্য জন্য রাস্তায় অবস্থান করে তাদেরকে ডাকাত বলা হবে না, তাদেরকে বলতে হবে সুযোগ সন্ধানী চোর।

https://e-ilm.weebly.com/

وَشَرْطٌ اَنْ يَكُوْنَ الْمَاْخُوْذُ مَالَ مُسْلِمٍ اَوْ ذِمِّيٍّ لِتَكُوْنَ الْعِصْمَةُ مُؤَبَّدَةً، وَلِهٰذَا لَوْ قَطَعَ الطَّرِيْقَ عَلَى الْمُسْتَاْمِنِ لَا يَجِبُ الْقَطْعُ . وَشَرْطُ كَمَالِ النِّصَابِ فِيْ حَقِّ كُلِّ وَاحِدٍ كَيْ لَا يُسْتَبَاحَ طَرَفُهٗ اِلَّا بِتَنَاوُلِهٖ مَالَهٗ خَطَرٌ، وَالْمُرَادُ قَطْعُ الْيَدِ الْيُمْنٰى وَالرِّجْلِ الْيُسْرٰى كَيْ لَا يُؤَدِّيَ اِلٰى تَفْوِيْتِ جِنْسِ الْمَنْفَعَةِ . وَالْحَالَةُ الثَّالِثَةُ كَمَا بَيَّنَّاهَا لِمَا تَلَوْنَاهُ وَيُقْتَلُوْنَ حَدًّا، حَتّٰى لَوْ عَفَا الْاَوْلِيَاءُ عَنْهُمْ لَا يُلْتَفَتُ اِلٰى عَفْوِهِمْ لِاَنَّهٗ حَقُّ الشَّرْعِ .

অনুবাদ : আর লুণ্ঠিত মাল কোনো মুসলমান বা জিম্মির হওয়া শর্ত, যাতে মালের নিরাপত্তাগুণটি স্থায়ী হয়। এ কারণেই (দারুল হরব থেকে) আগত নিরাপত্তা অর্জনকারী ব্যক্তির উপরে যদি রাহাজানি করে, তাহলে তাদের হাত-পা কর্তন ওয়াজিব হবে না।

লুণ্ঠনকারী দলের প্রত্যেকের ক্ষেত্রে নেসাব পূর্ণ হওয়ার শর্ত আরোপ করা হয়েছে। যাতে একটা গুরুত্বপূর্ণ পরিমাণ সম্পদ লুণ্ঠন করা ছাড়াই তার অঙ্গকে হালাল না করা হয়। আর আয়াতের উদ্দেশ্য হলো ডান হাত ও বাম পা কাটা যাতে কোনো অঙ্গের সমগ্র কল্যাণ রহিত না হয়।

আর তৃতীয় অবস্থার বিধান, আমরা যেমন বর্ণনা করেছি। তার দলিল হলো আমাদের তেলাওয়াতকৃত আয়াত। **তাদেরকে হদ্দরূপে কতল করা হবে। (কিসাস রূপে নয়।) সুতরাং নিহতদের অভিভাবক শ্রেণি তাদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করলেও সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করা হবে না।** কেননা এটা হলো শরিয়তের হক।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

লুণ্ঠিত সম্পদটি মুসলমান কিংবা জিম্মিদের সম্পদ হওয়া শর্ত। উদ্দেশ্য হলো সম্পদটি স্থায়ীভাবে নিরাপত্তাগুণ সম্পন্ন হওয়া। মুসলমান এবং জিম্মি ব্যতীত অন্যদের সম্পদ স্থায়ী নিরাপত্তাগুণ সম্পন্ন নয়। অতএব যদি কোনো ডাকাতদল মুস্তামিন তথা দারুল হরব থেকে আগত লোকের উপর ডাকাতি করে বসে, তাহলে তার উপর হদ্দ ওয়াজিব হবে না। কারণ মুস্তামিন ব্যক্তির সম্পদ স্থায়ী নিরাপত্তাগুণ সম্পন্ন নয়।

মাল লুণ্ঠনের অপরাধের দায়ে ডাকাত দলের হাত পা কাটার জন্য শর্ত হলো, লুণ্ঠিত মালের পরিমাণ এতটুকু হওয়া যে, ভাগ করার পর প্রত্যেক সদস্য দশ দিরহাম বা তার চেয়ে বেশি পায়। যদি প্রত্যেক সদস্য দশ দিরহাম পরিমাণ ভাগ না পায়, তাহলে তাদের হস্তপদ কর্তন করা যাবে না। এ শর্ত আরোপ করার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যাতে একটি গুরুত্বপূর্ণ বা মূল্যবান সম্পদের বিনিময়ে তাদের অঙ্গটি কর্তন হয়। যেমন তেমন জিনিসের দায়ে অঙ্গ নষ্ট না করা হয়। এটি আহনাফের পাশাপাশি ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর মাযহাব। ইমাম মালেক (র.) এরূপ শর্ত আরোপ করেন না। তার মতে লুণ্ঠিত গোটা সম্পদের পরিমাণ দশ দিরহাম হলেই ডাকাতদলের হস্তপদ কর্তন করা হবে।

হস্তপদ কর্তন দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ডান হাত ও বাম পা কর্তন করা। প্রকাশ থাকে যে, রাহাজানির মাধ্যমে একবার মাল লুণ্ঠনের শাস্তি, চুরির মাধ্যমে দুবার মাল লুণ্ঠনের অপরাধের শাস্তির সমান। রাহাজানির ভয়াবহতাই এই দ্বিগুণ শাস্তির কারণ। একহাত এক পা কর্তনের বিধান রাখা হয়েছে, দুই হাত কর্তনের বিধান রাখা হয়নি। যাতে হাতের দ্বারা অর্জনযোগ্য সমগ্রকল্যাণ বিনষ্ট না হয়ে যায়। অতএব, যদি ডাকাতের ডান হাতটি অবশ থাকে, তাহলে বাম হাত কর্তন করা হবে না। কেবল বাম পা কর্তন করা হবে। কেননা ডান হাত থাকা অবস্থায় বাম হাতটি কর্তন করা হলে হাতের সমগ্র কল্যাণ বিনষ্ট হয়ে যায়। রাহাজানির তৃতীয় স্তর হলো লুণ্ঠন না করে শুধু হত্যা করা। কিসাস হিসাবে নয়। কেননা ডাকাতের শাস্তিটা হলো শরিয়ত তথা আল্লাহর হক। তাই নিহত ব্যক্তিদের অভিভাবকরা তা ক্ষমা করতে পারবে না। আল্লাহর হক বান্দা ক্ষমা করতে পারে না। যদি কিসাস হিসাবে হত্যা করা হতো। তাহলে অভিভাবকদের ক্ষমা করা অধিকার থাকতো। কিন্তু তা হদ্দ হওয়ার কারণে অভিভাবকরা ক্ষমা করলেও সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করা হবে। এমনকি শাসক নিজেও ক্ষমা করতে পারবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

وَالرَّابِعَةُ إِذَا قَتَلُوْا وَاَخَذُوْا الْمَالَ فَالْإِمَامُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ قَطَعَ اَيْدِيَهُمْ وَاَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلَافٍ وَقَتَلَهُمْ اَوْصَلَبَهُمْ، وَإِنْ شَاءَ قَتَلَهُمْ، وَإِنْ شَاءَ صَلَبَهُمْ . وَقَالَ مُحَمَّدٌ : يُقْتَلُ اَوْ يُصْلَبُ وَلَا يُقْطَعُ لِاَنَّهُ جِنَايَةٌ وَاحِدَةٌ فَلَا تُوْجِبُ حَدَّيْنِ، وَلِاَنَّ مَا دُوْنَ النَّفْسِ يَدْخُلُ فِي النَّفْسِ فِيْ بَابِ الْحَدِّ كَحَدِّ السَّرِقَةِ وَالرَّجْمِ . وَلَهُمَا اَنَّ هٰذِهِ عُقُوْبَةٌ وَاحِدَةٌ تَغَلَّظَتْ لِتَغَلُّظِ سَبَبِهَا، وَهُوَ تَفْوِيتُ الْاَمْنِ عَلَى التَّنَاهِي بِالْقَتْلِ وَاَخْذِ الْمَالِ، وَلِهٰذَا كَانَ قَطْعُ الْيَدِ وَالرِّجْلِ مَعًا فِي الْكُبْرٰى حَدًّا وَاحِدًا وَإِنْ كَانَا فِي الصُّغْرٰى حَدَّيْنِ، وَالتَّدَاخُلُ فِي الْحُدُوْدِ لَا فِيْ حَدٍّ وَاحِدٍ .ثُمَّ ذُكِرَ فِي الْكِتَابِ التَّخْيِيْرُ بَيْنَ الصَّلْبِ وَتَرْكِهِ، وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ .وَعَنْ اَبِيْ يُوْسُفَ اَنَّهُ لَا يَتْرُكُهُ لِاَنَّهُ مَنْصُوْصٌ عَلَيْهِ، وَالْمَقْصُوْدُ التَّشْهِيرُ لِيَعْتَبِرَ بِهِ غَيْرُهُ . وَنَحْنُ نَقُوْلُ اَصْلُ التَّشْهِيْرِ بِالْقَتْلِ وَالْمُبَالَغَةِ بِالصَّلْبِ فَيُخَيَّرُ فِيْهِ .

অনুবাদ : রাহাজানির চতুর্থ স্তর এই যে, হত্যাও করল। আবার মালও লুণ্ঠন করল। এ অবস্থায় শাসকের এখতিয়ার রয়েছে। হয় তিনি তাদের হাত পা বিপরীতভাবে কর্তন করবেন। অতঃপর হত্যা করবেন কিংবা শূলে চড়াবেন। আর ইচ্ছা করলে শুধু হত্যা করবেন কিংবা ইচ্ছা করলে শুধু শূলে চড়াবেন।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, শাসক শুধু হত্যা করবেন কিংবা শূলে চড়াবেন। তার সাথে কর্তনযোগ্য করবেন না। কেননা রাহাজানি হলো একটি অপরাধ। সুতরাং তা দুটি হদ্দকে অনিবার্য করবে না। তা ছাড়া হদ্দের ক্ষেত্রে প্রাণদণ্ডের নিম্নবর্তী দণ্ড প্রাণদণ্ডের অর্ন্তভুক্ত হয়ে পড়ে। যেমন চুরির হদ্দ এবং রজম। শাইখানের দলিল এই যে, (দুটি মিলে) এটি একটি শাস্তি, যা গুরুতর হয়েছে শাস্তির কারণ গুরুতর হওয়ার ফলে। আর সেটা হলো লুণ্ঠনের মাধ্যমে চূড়ান্ত পর্যায়ে শান্তি ভঙ্গ করা। এ কারণেই বড় চুরি (ডাকাতি) তে যুগপৎ হস্তপদ কর্তনকে একই হদ্দ সাব্যস্ত করা হয়েছে। অথচ সাধারণ চুরিতে এটাকে দুটি হদ্দ বলে গণ্য করা হয়। আর বিভিন্ন হদ্দের মাঝে একীভূত করণ সম্পন্ন হয়ে থাকে। একটি হদ্দের বিভিন্ন অংশের মাঝে একীভূতকরণ হয় না।

কুদূরীতে শূলে চড়ানো এবং না চড়ানোর মাঝে এখতিয়ার প্রদানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এটা হলো জাহিরে রেওয়ায়েত।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, শূলে চড়ানো বাদ দেওয়া হবে না। কেননা এটা শরিয়তের নস দ্বারা প্রমাণিত বিষয়। এর উদ্দেশ্য হলো প্রচার করার। যেন তাকে দেখে অন্যরা শিক্ষাগ্রহণ করে।

আমরা বলি মূল প্রচারকার্যটি প্রাণদণ্ড কার্যকর করায় মাধ্যমে হয়ে থাকে। আর শূলে চড়ানোতে রয়েছে অতিরিক্ত প্রচার করা। সুতরাং এ ব্যাপারে এখতিয়ার প্রদান করা হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

রাহাজানির চতুর্থ স্তরটি হলো হত্যা এবং মাল লুণ্ঠন করা। এ স্তরের শাস্তি নিয়ে ইমামগণের মাঝে সামান্য মতানৈক্য রয়েছে :

এক. ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতানুসারে শাসকের এখতিয়ার থাকবে চার রকম শাস্তি দেওয়ার : ১. হাত-পা কেটে হত্যা করা। ২. হাত-পা কেটে শূলে চড়ানো। ৩. শুধু হত্যা করা। ৪. শুধু শূলে চড়ানো।

https://e-ilm.weebly.com/

দুররে মুখতার নামক গ্রন্থে আরো দুটি সুরত উল্লেখ করা হয়েছে :

১. হাত-পা কেটে হত্যা করা ও শূলে চড়ানো। অর্থাৎ তিনটি এক সাথে।

২. হত্যা করে শূলে চড়ানো। দুটি একসাথে। অতএব, রাহাজানির চতুর্থ স্তরের শাস্তির ক্ষেত্রে শাসক উল্লিখিত ছয় পন্থার যেকোনো পন্থা অবলম্বন করতে পারে।

দুই. ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, সর্বাবস্থায় শূলে চড়ানো বাধ্যতামূলক।

তিন. ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, শুধু হত্যা করা হবে অথবা শূলে চড়ানো হবে। হত্যা বা শূলে চড়ানোর সাথে হাত-পা কর্তন করা যাবে না।

দলিল পর্ব: হত্যা বা শূলে চড়ানোর সাথে হাত-পা কর্তনের শাস্তি একত্র হতে পারে না– এ কথার পক্ষে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল এই যে, ডাকাতি একটি মাত্র অপরাধ। আর হাত-পা কাটা ও হত্যা করা কিংবা শূলে চড়ানো একাধিক শাস্তি। একটি অপরাধের কারণে একাধিক শাস্তি ওয়াজিব হতে পারে না।

হত্যা করার শাস্তির সাথে যদি হাত-কর্তন ওয়াজিব হয়েও থাকে, তাহলেও তা পৃথকভাবে কার্যকর হবে না। কেননা কোথাও প্রাণদণ্ড (হত্যা) এবং এর চেয়ে ছোট কোনো হদ্দ ওয়াজিব হলে কিংবা সমমানের দুটি হদ্দ ওয়াজিব হলে সে ক্ষেত্রে তাদাখুল হয়ে যায়। অর্থাৎ একটি হদ্দ অপরটির মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে যায়। দুটি হদ্দ একীভূত হয়ে যায়। যেমন– কোনো চোর যদি জেনা করে তাহলে নিয়ম অনুযায়ী তার উপর মুহসান দুটি শাস্তি হওয়ার কথা। একটি হলো চুরির শাস্তি হাতকাটা, অপরটি হলো জেনার শাস্তি রজম। কিন্তু এক্ষেত্রে দুটি শাস্তি পৃথকভাবে কার্যকর করা হয় না; বরং তাদাখুল হয়ে যায়। কেবল রজম কার্যকর করা হয়।

অতএব, আলোচ্য ক্ষেত্রে এমনিভাবে তাদাখুল হয়ে যাবে। অর্থাৎ হাত-পা কর্তনের শাস্তিটি হত্যার সাথে একীভূত হয়ে যাবে। তাই কেবল হত্যা বা শূলে চড়ানো হবে। হাত-পা কর্তন করা হবে না।

শায়খায়নের মতে হাত-পা কর্তন হত্যা বা শূলে চড়ানোর সাথে যোগ হতে পারে। তাদের দলিল হলো এই যে, হাত-পা কর্তন ও হত্যা দুটি শাস্তি নয়; বরং দুটি মিলে একটি শাস্তি। দুটি শাস্তিকে মিলিয়ে একটি কঠিন শাস্তিতে পরিণত করা হয়েছে তার কারণটি ভয়াবহ হওয়ার কারণে। অর্থাৎ ডাকাত মাল লুণ্ঠন করে মানুষ হত্যা করে চরমভাবে শান্তি শৃঙ্খলা ভঙ্গ করেছে। এটি একটি ভয়াবহ অপরাধ। তাই তার শাস্তিও তুলনামূলক কঠিন হওয়া আবশ্যক। বিধায় তার শাস্তি হলো হাত-পা কর্তন ও হত্যা উভয়ের সমন্বয়ে গঠিত একটি শাস্তি।

অপরাধের ভয়াবহতার কারণে শাস্তিও ভয়াবহ হয় কিংবা দুটি মিলে একটি হয়ে যায়। এর আরেকটি দৃষ্টান্ত হলো– শুধু মাল লুণ্ঠনের মাধ্যমে রাহাজানির শাস্তি। অর্থাৎ কোনো ডাকাত যদি হত্যা না করে শুধু মাল লুণ্ঠন করে, তাহলে তার শাস্তি হলো ডান হাত ও বাম পা কেটে দেওয়া। অথচ চুরির ক্ষেত্রে এটি দু'বার চুরির শাস্তি। একবার চুরি করলে শুধু ডান হাত কাটা হয়। দ্বিতীয়বার চুরি করলে বাম পা কাটা হয়। কিন্তু ডাকাতি করে মাল লুণ্ঠন করলে, একবারেই ডান হাত ও বাম পা কেটে দেওয়া হয়। এটা কেবলই ডাকাতির অপরাধের ভয়াবহতার কারণে। অতএব, আলোচ্য ক্ষেত্রেও অপরাধের ভয়াবহতার প্রতি লক্ষ্য করে হাত-পা কর্তন ও হত্যা একটি শাস্তি বলে গণ্য হয়।

দলিলের জবাব : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেছিলেন, কোথাও দুটি হদ্দ ওয়াজিব হলে একটি অপরটির মাঝে তাদাখুল হয়ে যায়। এর জবাব হলো এই যে, শাস্তি যদি দুটি হতো তাহলে একটি অপরটির মধ্যে তাদাখুল হয়ে যেত। কিন্তু আমরা প্রমাণ করেছি যে, হাত-পা কর্তন ও হত্যা ডাকাতের ক্ষেত্রে দুটি হদ্দ; বরং উভয় মিলে একটি হদ্দ। আর এটি স্বীকৃত কথা যে, হদ্দের একাংশ অপরাংশের মাঝে তাদাখুল হতে পারে না। তাই এখানে ও তাদাখুল হবে না; বরং হাত-পা কর্তন ও হত্যা কিংবা শূলে চড়ানো সবই পৃথক পৃথকভাবে কার্যকর হবে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেছিলেন, সর্বাবস্থায় শূলে চড়ানো বাধ্যতামূলক। এর দলিল হলো এই যে, আয়াতে আছে– اَوْ يُصَلَّبُوْا। তাদেরকে শূলে চড়ানো হবে। অতএব, এ বিষয়টি পরিহার করা যাবে না। আর শূলে চড়ানোর উদ্দেশ্য হলো শাস্তিটি মানুষের মাঝে প্রচারিত হওয়া। যাতে তাকে দেখে অন্যান্যরা সবাই সতর্ক হয়ে যায়। শিক্ষা গ্রহণ করে। এ মাসআলায় ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) ও আবূ ইউসুফ (র.) অনুরূপ মত পোষণ করেন।

আর এক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.)-এর বক্তব্য হলো, মূল প্রচারটি হত্যাকাণ্ড কার্যকর করার মাধ্যমেই হয়ে যায়। সেটা দেখেই অন্যরা সতর্ক হয়ে যায়। শূলে চড়ানোর দ্বারা অতিরিক্ত প্রচার হয়। আর অতিরিক্ত বিষয়ে এখতিয়ার থাকাটাই নিয়ম। অতএব, শূলে চড়ানোর ব্যাপারটি এখতিয়ারাধীন থাকবে। বাধ্যতামূলক হবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

ثُمَّ قَالَ وَيُصْلَبُ حَيًّا وَيُبْعَجُ بَطْنُهُ بِرُمْحٍ اِلَى اَنْ يَمُوْتَ وَمِثْلُهُ عَنِ الْكَرْخِيِّ . وَعَنِ الطَّحَاوِيِّ اَنَّهُ يُقْتَلُ ثُمَّ يُصْلَبُ تَوَقِّيًا عَنِ الْمُثْلَةِ . وَجْهُ الْاَوَّلِ وَهُوَ الْاَصَحُّ اَنَّ الصَّلْبَ عَلَى هٰذَا الْوَجْهِ اَبْلَغُ فِي الرَّدْعِ وَهُوَ الْمَقْصُوْدُ بِهِ . قَالَ وَلَا يُصْلَبُ اَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ لِاَنَّهُ يَتَغَيَّرُ بَعْدَهَا فَيَتَاَذَّى النَّاسُ بِهِ . وَعَنْ اَبِي يُوْسُفَ اَنَّهُ يُتْرَكُ عَلَى خَشَبَةٍ حَتَّى يَتَقَطَّعَ فَيَسْقُطَ لِيَعْتَبِرَ بِهِ غَيْرُهُ . قُلْنَا : حَصَلَ الْاِعْتِبَارُ بِمَا ذَكَرْنَاهُ وَالنِّهَايَةُ غَيْرُ مَطْلُوْبَةٍ .

অনুবাদ : অতঃপর ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, তাকে জীবন্ত শূলে চড়ানো হবে এবং বর্শাঘাতে তার পেট ফেড়ে ফেলা হবে। মৃত্যু পর্যন্ত এভাবেই ফেলে রাখা হবে। ইমাম কারখী (র.) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে ইমাম ত্বহাবী (র.) বলেন: মুছলাহ (মৃত বা জীবিত দেহ বিকৃত করা) থেকে বাঁচার লক্ষ্যে প্রথমে হত্যা করা হবে। এরপর শূলে চড়ানো হবে।

প্রথমোক্ত মতের কারণ এই যে, এভাবে শূলে চড়ানো অপরাধ দমনের ক্ষেত্রে অধিক কার্যকর। আর শূলে চড়ানোর উদ্দেশ্যও তাই এবং এটাই বিশুদ্ধমত।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, তিন দিনের বেশি শূলে চড়িয়ে রাখা হবে না। কেননা এরপর লাশে পচন ধরবে এবং মানুষ সে কারণে কষ্ট পাবে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, তাকে এভাবেই শূল কাষ্ঠে রেখে দেওয়া হবে, যাতে টুকরা টুকরা হয়ে পড়ে যায়। আর যাতে তা দেখে অন্যরা শিক্ষা গ্রহণ করে। আমরা বলি যে, আমরা যে ব্যবস্থা উল্লেখ করেছি তাতেই শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়ে যায়। আর চরম অবস্থায় পৌঁছানো উদ্দেশ্য নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিউক্ত ইবারতে ডাকাতকে শূলে চড়ানোর পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে দুটি পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে :

১. ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ডাকাতকে জীবিত অবস্থায় শূলে চড়ানো হবে। অতঃপর বর্শা মেরে তার পেট ফেড়ে ফেলা হবে এবং সেখানেই সে মৃত্যুবরণ করবে।

এ মতটি ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) এবং আবুল হাসান কারখী (র.) হতে বর্ণিত আছে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) হতে এমনও বর্ণিত আছে যে, বর্শা দ্বারা ডাকাতের কণ্ঠনালীর গোড়ায় কিংবা বাম স্তনের নিচে আঘাত করা হবে যাতে সে রক্তাক্ত হয়ে মারা যায়।

২. ইমাম ত্বহাবী (র.) হতে বর্ণিত আছে, প্রথমে ডাকাতকে হত্যা কর হবে, হত্যা করার পর তাকে শূলে চড়ানো হবে।

এ মতটির পক্ষে যুক্তি হলো, শূলে চড়ানোর পর বর্শার আঘাতে হত্যা করা হলে মুছলা হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল থাকে। অর্থাৎ দেহ বিকৃত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অথচ হাদীসে মুছলা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অতএব, মুছলা এড়ানোর জন্য আগে হত্যা করে, তারপর শূলে চড়ানো হবে।

প্রথম মতের পক্ষে যুক্তি হলো এই যে, শূলে চড়িয়ে বর্শা মেরে হত্যা করাটা অপরাধ দমনের পক্ষে অধিক কার্যকর। আর অপরাধ দমনই আসল উদ্দেশ্য। অতএব, এ পন্থা অবলম্বন করাই বেশি যুক্তিযুক্ত। এবং এটা বিশুদ্ধতম অভিমত।

قوله : قَالَ وَلَا يُصْلَبُ اَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ الخ : উপরিউক্ত ইবারতে ডাকাতকে শূলে চড়িয়ে রাখার সময়সীমা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। একটি মত হলো, তিন দিন পর্যন্ত শূলে রাখা হবে। এর বেশি নয়। কারণ তিনদিন পর লাশে পচন ধরে যায়। এর ফলে মানুষের কষ্ট হয়। তাই তিন দিনের বেশি শূলে চড়িয়ে রাখা হবে না। আহনাফের অনুরূপ ইমাম শাফেয়ী (র.) ও এ মতটি পোষণ করেন।

দ্বিতীয় মতটি ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, শূলে রেখে দেওয়া হবে, যে পর্যন্ত না তার দেহ সেখান থেকে টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে যায়। যাতে করে অন্যরা তা দেখে শিক্ষা গ্রহণ করে সাবধান হয়। এক্ষেত্রে আমাদের জবাবী বক্তব্য হলো– শিক্ষা গ্রহণ করা ও সাবধান হওয়ার উদ্দেশ্যটি তিনদিন ঝুলিয়ে রাখার দ্বারাই অর্জিত হয়ে যায়। অতএব, অতিরিক্ত সময়ের প্রয়োজন নেই।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ وَاِذَا قُتِلَ الْقَاطِعُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيْ مَالٍ اَخَذَهُ اِعْتِبَارًا بِالسَّرِقَةِ الصُّغْرٰى وَقَدْ بَيَّنَّاهُ. فَاِنْ بَاشَرَ الْقَتْلَ اَحَدُهُمْ اَجْرَى الْحَدَّ عَلَيْهِمْ بِاَجْمَعِهِمْ لِاَنَّهُ جَزَاءُ الْمُحَارَبَةِ، وَهِيَ تَتَحَقَّقُ بِاَنْ يَكُوْنَ الْبَعْضُ رِدْءًا لِلْبَعْضِ حَتّٰى اِذَا زَلَّتْ اَقْدَامُهُمْ انْحَازُوْا اِلَيْهِمْ، وَاِنَّمَا الشَّرْطُ الْقَتْلُ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَقَدْ تَحَقَّقَ .

অনুবাদ : **ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ডাকাতকে হত্যা করার পর লুণ্ঠনকৃত মালের ব্যাপারে তার উপর কোনো দায় আরোপ করা হবে না,** সাধারণ চুরির উপর কিয়াস করে। আর তার কারণ আমরা পূর্বেই বর্ণনা করে এসেছি।

যদি মূল হত্যাকাণ্ড একজন করে থাকে, তাহলে তাদের সবার উপর হদ্দ কার্যকর করা হবে। কেননা এটা হলো লড়াই ও অস্ত্রধারণের শাস্তি, আর তা এভাবে সম্পন্ন হয় যে, একে অপরের সহায়ক হয়। এমনকি যখন তারা পিছপা হয়ে যায়, তখন সহায়করাও তাদের সাথে যোগ দেয়। (হদ্দ প্রয়োগের) শর্ত হলো তাদের কোনো একজন থেকে হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন হওয়া। আর সেটাতো হয়েছেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

চুরির মাসআলায় অতিবাহিত হয়েছে যে, চুরির দায়ে চোরের হস্তকর্তন করা হলে চুরিকৃত সম্পদ নিরাপত্তা গুণসম্পন্ন থাকে না। এ কারণে মাল বিনষ্ট হয়ে গিয়ে থাকলে এর ক্ষতিপূরণ দেওয়া চোরের উপর আবশ্যক হয় না। তদ্রূপ ডাকাতির ক্ষেত্রেও, ডাকাতের হাত-পা কর্তন করার পর লুণ্ঠিত সম্পদের নিরাপত্তাগুণ রহিত হয়ে যায়। তাই বিনষ্ট হওয়া মালের জেমান বা ক্ষতিপূরণ ডাকাতের উপর আবশ্যক নয়।

قَوْلُهُ : فَاِنْ بَاشَرَ الْقَتْلَ اَحَدُهُمْ اَجْرَى الْحَدَّ الخ : উপরিউক্ত ইবারতে বর্ণিত মাসআলার সারমর্ম এই যে, ডাকাত দলের একজন সদস্য যদি হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন করে, তাহলে সকল সদস্যের উপর হদ্দ কার্যকর হবে। এটাই আহনাফ, ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর মত।

এ মতের স্বপক্ষে দলিল হলো এই যে, সকল সদস্যের উপর যে শাস্তিটি কার্যকর হয়, তা মূলত রাহাজানির হদ্দ। আর রাহাজানি কেবল যে হত্যা করেছে তার দ্বারা সংঘটিত হয়নি; বরং রাহাজানি সংঘটিত হয়েছে সকল সদস্যের পারস্পরিক সহযোগিতায়। অতএব, এর শাস্তিও সকলের উপর বর্তাবে।

সকল সদস্যের পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে যে রাহাজানি সংঘটিত হয়ে থাকে তার প্রমাণ হলো, হত্যা ও লুণ্ঠনের কাজে সহযোগী সদস্যরা এগিয়ে এসে তাদের সাথে যোগ দেয় এবং তাদেরকে শক্তিশালী করে তুলে। অতঃপর লুণ্ঠিত সম্পদ সকলের মাঝে বণ্টিত হয়। এর দ্বারা প্রকাশ পায় যে, যে সদস্য সরাসরি হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন করে শুধু তার দ্বারাই রাহাজানি সম্পন্ন হয় না; বরং রাহাজানি সম্পন্ন হয় সকল সদস্যের সহযোগিতার মাধ্যমে। অতএব, রাহাজানির শাস্তিও সকলকেই ভোগ করতে হবে। তবে সকলের উপর হদ্দ কার্যকর হওয়ার জন্য শর্ত হলো। যেকোনো একজন দ্বারা হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়া। আলোচ্য সুরতে সেটি হয়েছে। বিধায় সকলের উপর হদ্দ কার্যকর হবে।

ইমাম শাফেয়ী (র.) মনে করেন, সে সদস্য হত্যাকাণ্ডটি সম্পন্ন করেছে কেবল তার উপরই হদ্দ কার্যকর হবে। অন্যদের উপর নয়। তিনি বলেন, হদ্দ হলো একটি কর্মের পরিণতি। জেনার হদ্দের মতো। অতএব, কর্মটি যে করেছে শাস্তিটি সেই ভোগ করবে।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ وَالْقَتْلُ وَإِنْ كَانَ بِعَصًا أَوْ بِحَجَرٍ أَوْ بِسَيْفٍ فَهُوَ سَوَاءٌ لِأَنَّهُ يَقَعُ قَطْعًا لِلطَّرِيْقِ بِقَطْعِ الْمَارَّةِ وَإِنْ لَمْ يَقْتُلِ الْقَاطِعُ وَلَمْ يَأْخُذْ مَالًا وَقَدْ جَرَحَ اُقْتُصَّ مِنْهُ فِيْمَا فِيْهِ الْقِصَاصُ، وَأُخِذَ الْأَرْشُ مِنْهُ فِيْمَا فِيْهِ الْأَرْشُ وَذٰلِكَ إِلَى الْأَوْلِيَاءِ لِأَنَّهُ لَا حَدَّ فِيْ هٰذِهِ الْجِنَايَةِ فَظَهَرَ حَقُّ الْعَبْدِ وَهُوَ مَا ذَكَرْنَاهُ فَيَسْتَوْفِيْهِ الْوَلِيُّ وَإِنْ أَخَذَ مَالًا ثُمَّ جَرَحَ قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ وَبَطَلَتْ الْجِرَاحَاتُ لِأَنَّهُ لَمَّا وَجَبَ الْحَدُّ حَقًّا لِلّٰهِ سَقَطَتْ عِصْمَةُ النَّفْسِ حَقًّا لِلْعَبْدِ كَمَا يَسْقُطُ عِصْمَةُ الْمَالِ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, হত্যাকাণ্ড লাঠি, পাথর ও তরবারি যা কিছু দ্বারাই হোক, তার হুকুম অভিন্ন। কেননা এই হদ্দ সাব্যস্ত হয় পথে পথচারীদের উপর রাহাজানি করবে এই অপরাধে।

ডাকাত যদি হত্যাকাণ্ড ও লুণ্ঠন কোনোটাই না করে থাকে বরং শুধু জখম করে থাকে, তাহলে কিসাসের ক্ষেত্রে তার থেকে কিসাস নেওয়া হবে এবং দিয়তের ক্ষেত্রে দিয়ত নেওয়া হবে। আর তা অভিভাবকদের এখতিয়ারে হবে। কেননা এ পর্যায়ের অপরাধে কোনো হদ্দ নেই। সুতরাং বান্দার হক তথা আমাদের উল্লেখকৃত কিসাস ও দিয়ত সাব্যস্ত হবে এবং অভিভাবক তা উসুল করবে।

আর যদি মাল লুণ্ঠন করার পর জখম করে, তাহলে তার হাত পা-কর্তন করা হবে আর জখমের দায় বাতিল হয়ে যাবে। কেননা যখন আল্লাহর হক হিসাবে হদ্দ আবশ্যিকরূপে সাব্যস্ত হলো, তখন বান্দার হক হিসাবে মালের নিরাপত্তার ন্যায় জানের নিরাপত্তা রহিত হয়ে যাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

রাহাজানির মধ্যে হত্যাকাণ্ড ঘটানোর দায়ে যে হদ্দ ওয়াজিব হয় সেটি মূলত হত্যাকাণ্ডের হদ্দ নয়। তাই হত্যাকাণ্ডটি কিসের দ্বারা ঘটানো হয়েছে তা দেখার বিষয় নয়। এর দ্বারা হুকুমের মধ্যেও কোনো পরিবর্তন আসবে না; বরং হদ্দটি মূলত রাহাজানির হদ্দ। এ কারণেই সকল সদস্যের উপর হদ্দ কার্যকর হয় এবং হত্যাকাণ্ড যেভাবেই ঘটানো হোক হুকুম একও অভিন্ন হবে।

قوله : وَإِنْ لَمْ يَقْتُلِ الْقَاطِعُ وَلَمْ يَأْخُذْ مَالًا الخ : উপরে বর্ণিত মাসআলার সারমর্ম হলো, ডাকাত যদি কাউকে হত্যা না করে এবং সম্পদও লুণ্ঠন না করে, বরং কোনো পথচারীকে আহত করে, তাহলে তার উপর কোনো হদ্দ আসবে না; বরং জখমটি কিসাস নেওয়ার মতো হলে কিসাস ওয়াজিব হবে। আর কিসাস নেওয়ার মতো না হলে দিয়ত ওয়াজিব হবে। এই কিসাস ও দিয়ত যেহেতু বান্দার হক, তাই তা আহত ব্যক্তির অভিভাবকগণ উসুল করবেন।

এ মাসআলায় ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) আহনাফের মতো উপরিউক্ত মতামত পোষণ করেন।

قوله : وَإِنْ أَخَذَ مَالًا ثُمَّ جَرَحَ قُطِعَتْ الخ : মাল লুণ্ঠন এবং জখমিকরণ এ দুটি বিষয় যখন একত্রিত হয়, তখন আহনাফের মতে মাল লুণ্ঠনের দায়ে হাত-পা কর্তন করা হবে হদ্দ হিসাবে। আর হদ্দ কার্যকর হওয়ার দ্বারা যেমন লুণ্ঠিত মালের নিরাপত্তা রহিত হয়ে যাবে, তেমনি বান্দার হক হিসাবে জানের নিরাপত্তা রহিত হয়ে যাবে। তাই লুণ্ঠিত মাল বিনষ্ট হয়ে থাকলে তার ক্ষতিপূরণ আবশ্যক হবে না এবং জখমের কিসাস বা দিয়তও ওয়াজিব হবে না। কারণ আহনাফের মতে হদ্দ এবং জেমান দুটি বিষয় একত্রিত হয় না। পক্ষান্তরে অন্যান্য ইমামদের মতে হদ্দ ও জেমান একত্র হতে পারে। তাই তাদের মতে, লুণ্ঠিত মালের ক্ষতিপূরণ এবং জখমের কিসাস বা দিয়ত ওয়াজিব হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَإِنْ أُخِذَ بَعْدَ مَا تَابَ وَقَدْ قَتَلَ عَمْدًا فَإِنْ شَاءَ الْأَوْلِيَاءُ قَتَلُوْهُ وَإِنْ شَاءُوْا عَفَوْا عَنْهُ لِأَنَّ الْحَدَّ فِيْ هٰذِهِ الْجِنَايَةِ لَا يُقَامُ بَعْدَ التَّوْبَةِ لِلْاِسْتِثْنَاءِ الْمَذْكُوْرِ فِي النَّصِّ، وَلِأَنَّ التَّوْبَةَ يَتَوَقَّفُ عَلٰى رَدِّ الْمَالِ وَلَا قَطْعَ فِيْ مِثْلِهِ، فَظَهَرَ حَقُّ الْعَبْدِ فِي النَّفْسِ وَالْمَالِ حَتّٰى يَسْتَوْفِيَ الْوَلِيُّ الْقِصَاصَ أَوْ يَعْفُوَ، وَيَجِبُ الضَّمَانُ إِذَا هَلَكَ فِيْ يَدِهِ أَوْ اِسْتَهْلَكَهُ

অনুবাদ : আর যদি ডাকাত ধৃত হয় তওবা করার পর কিন্তু অবস্থা এই যে, সে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। তাহলে অভিভাবকরা ইচ্ছা করলে তার হত্যা (কিসাসের) দাবি করতে পারে আবার ইচ্ছা করলে ক্ষমাও করে দিতে পারে।

কেননা এই অপরাধ কর্মে তওবার পর হদ্দ কায়েম করা হয় না। কারণ আয়াতে তওবার ব্যতিক্রম বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া তওবার গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করে লুণ্ঠিত মাল ফেরত দেওয়ার উপর। আর মাল ফেরত দেওয়ার পর কর্তন সাব্যস্ত হয় না। সুতরাং জানের এবং মালের ক্ষেত্রে বান্দার হক প্রকাশিত হবে এবং অভিভাবক কিসাস গ্রহণ করবে কিংবা ক্ষমা করে দিবে। আর লুণ্ঠিত মাল তার হাতে নষ্ট হোক, কিংবা সে নিজে নষ্ট করুক তার ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

বর্ণিত মাসআলাটির সারমর্ম এই যে, কোনো ডাকাত ডাকাতি করতে গিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে কিংবা হত্যাকাণ্ডের সাথে মালও লুণ্ঠন করেছে। অতঃপর সে তার কৃতকর্ম থেকে তওবা করেছে। কিন্তু তওবা করার পর সে শাসকের হাতে কাপড়াও হয়েছে। এমতাবস্থায় তার উপর হত্যা বা হাত-পা কর্তন ইত্যাদি হদ্দ কার্যকর হবে না। কারণ ডাকাতির অপরাধ থেকে তওবা করার পর তাকে শাস্তি না দেওয়ার নির্দেশ কুরআনের আয়াতে উল্লেখ আছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ يَسْعَوْنَ فِى الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُّقَتَّلُوْا ...... تَابُوْا مِنْ بَعْدُ الخ

অর্থাৎ ডাকাতের শাস্তির বিধান বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে, তবে যারা অপরাধ করার পর তওবা করে এবং সংশোধন হয়ে যায়, তারা ব্যতিক্রম।

অতএব, এ আয়াতের নির্দেশ অনুযায়ী ডাকাত তওবা করলে তার উপর হদ্দ কার্যকর করা যাবে না। তাছাড়া হদ্দ কার্যকর না হওয়ার আরেকটি হলো এই যে, ডাকাত যদি মাল লুণ্ঠন করে থাকে তাহলে মাল ফেরত দেওয়া। আর যখন সে পাকড়াও হওয়ার পূর্বেই লুণ্ঠিত মাল ফেরত দিয়ে দিল, তখন তার বিরুদ্ধে খুসূমাত বা অভিযোগ আর থাকল না। আর অভিযোগ না থাকলে হদ্দও আসবে না। কেননা হদ্দ আসার জন্য অভিযোগ দায়ের করা আবশ্যক। যেমন কোনো চোর যদি তার বিরুদ্ধে কাজির কাছে অভিযোগ দায়ের উত্থাপনের পূর্বেই চুরির মাল ফেরত দিয়ে দেয়, তাহলে খুসূমাত রহিত হয়ে যাওয়ার ফলে তার আর হাত কাটা হয় না। তেমনি ডাকাতও যদি পাকড়াও হওয়ার পূর্বে মাল ফেরত দিয়ে দেয়, তাহলে তার উপরও হদ্দ কার্যকর হবে না। কারণ মাল ফেরত দেওয়ার দ্বারা বুঝা যায় সে তওবা করেছে, আর তওবা করার পর ডাকাতের শাস্তি দেওয়া কুরআনের নির্দেশ মুতাবেক বৈধ নয়।

কিন্তু তখন আল্লাহর হক তথা হদ্দ রহিত হওয়ার সাথে সাথে বান্দার হক প্রকাশ পাবে। তাই ডাকাত যাকে হত্যা করেছিল, তার অভিভাবকগণ ইচ্ছা করলে তার থেকে কিসাস নিতে পারবে, ইচ্ছা করলে ক্ষমাও করে দিতে পারবে। লুণ্ঠিত মাল তার হাতে বিনষ্ট হয়ে থাকলে কিংবা সে নিজে তা নষ্ট করে থাকলে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَاِنْ كَانَ مِنَ الْقُطَّاعِ صَبِيٌّ اَوْ مَجْنُوْنٌ اَوْ ذُوْ رِحْمٍ محْرَمٍ مِن الْمَقْطُوْعِ عَلَيْهِ سَقَطَ الْحَدُّ عَنِ الْبَاقِينَ فَالْمَذْكُوْرُ فِي الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُوْنِ قَوْلُ اَبِيْ حَنِيْفَةَ وَزُفَرَ . وَعَنْ اَبِيْ يُوْسُفَ اَنَّهُ لَوْ بَاشَرَ الْعُقَلَاءُ يُحَدُّ الْبَاقُوْنَ وَعَلٰى هٰذَا السَّرِقَةُ الصُّغْرٰى . لَهُ اَنَّ الْمُبَاشِرَ اَصْلٌ، وَالرِّدْءُ تَابِعٌ وَلَا خَلَلَ فِيْ مُبَاشَرَةِ الْعَاقِلِ وَلَا اعْتِبَارَ بِالْخَلَلِ فِي التَّبَعِ، وَفِيْ عَكْسِهِ يَنْعَكِسُ الْمَعْنٰى وَالْحُكْمُ . وَلَهُمَا اَنَّهُ جِنَايَةٌ وَاحِدَةٌ قَامَتْ بِالْكُلِّ، فَاِذَا لَمْ يَقَعْ فِعْلُ بَعْضِهِمْ مُوجِبًا كَانَ فِعْلُ الْبَاقِينَ بَعْضَ الْعِلَّةِ وَبِهِ لَا يَثْبُتُ الْحُكْمُ فَصَارَ كَالْخَاطِئِ مَعَ الْعَامِدِ . وَاَمَّا ذُو الرَّحْمِ الْمَحْرَمِ فَقَدْ قِيْلَ تَاْوِيلُهُ اِذَا كَانَ الْمَالُ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْمَقْطُوْعِ عَلَيْهِمْ، وَالْاَصَحُّ اَنَّهُ مُطْلَقٌ لِاَنَّ الْجِنَايَةَ وَاحِدَةٌ عَلٰى مَا ذَكَرْنَاهُ فَالِامْتِنَاعُ فِيْ حَقِّ الْبَعْضِ يُوْجِبُ الْاِمْتِنَاعَ فِيْ حَقِّ الْبَاقِيْنَ، بِخِلَافِ مَا اِذَا كَانَ فِيهِمْ مُسْتَاْمَنٌ؛ لِاَنَّ الْاِمْتِنَاعَ فِيْ حَقِّهِ لِخَلَلٍ فِي الْعِصْمَةِ وَهُوَ يَخُصُّهُ، اَمَّا هُنَا الْاِمْتِنَاعُ لِخَلَلٍ فِي الْحِرْزِ، وَالْقَافِلَةُ حِرْزٌ وَاحِدٌ

অনুবাদ : ডাকাতদের মাঝে যদি কোনো বালক কিংবা পাগল কিংবা যার উপর ডাকাতি করা হয়েছে তার কোনো মাহরাম আত্মীয় থাকে, তাহলে অবশিষ্টদের থেকেও হদ্দ রহিত হয়ে যাবে। বালক ও পাগলের ক্ষেত্রে উল্লিখিত সিদ্ধান্ত হচ্ছে ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম যুফার (র.)-এর মত। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) হতে বর্ণিত রয়েছে যে, সুস্থ মস্তিষ্ক (ও প্রাপ্ত বয়স্করা) যদি প্রত্যক্ষভাবে ডাকাতি করে থাকে, তাহলে বালক ও পাগল ছাড়া অন্যান্যদের উপর হদ্দ কার্যকর করা হবে। সাধারণ চুরির ক্ষেত্রেও এই মতপার্থক্য।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল এই যে, প্রত্যক্ষ অপরাধকারী হলো মূখ্য আর সহায়ক হলো অনুগামী। সুস্থমস্তিষ্ক ব্যক্তির প্রত্যক্ষ অপরাধে কোনো বিঘ্ন নেই আর অনুগামীর মাঝে যে বিঘ্নতা রয়েছে, তা বিবেচ্য নয়। আর বিপরীত ক্ষেত্রে বিষয়টি ও সিদ্ধান্তটি বিপরীত হয়ে যাবে।

ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম যুফার (র.)-এর দলিল এই যে, এটা অভিন্ন অপরাধ, যেটা সকলের যোগসাজসে সম্পন্ন হয়েছে। সুতরাং একাংশের অপরাধ যখন হদ্দ সাব্যস্তকারী হলো না, তখন অবশিষ্টদের অপরাধ আংশিক হেতু হলো আর আংশিক হেতু দ্বারা হুকুম সাব্যস্ত হয় না। অতএব, এটা ইচ্ছাকৃতভাবে আঘাতকারীর সাথে ভুলক্রমে আঘাতকারীর অবস্থান করার মতো হয়ে গেল। মাহরাম আত্মীয় সম্পর্কে কেউ কেউ বলেছেন, এর ব্যাখ্যা হলো এই যে, এ সিদ্ধান্ত তখন হবে যখন লুণ্ঠিত মালের মাঝে লুণ্ঠনকৃত ব্যক্তির সাথে তার অংশীদারিত্ব হবে। তবে বিশুদ্ধমত এই যে, বিধানটি নিঃশর্ত। কেননা আমরা উল্লেখ করে এসেছি যে, অপরাধটি অভিন্ন। সুতরাং কারো ক্ষেত্রে হদ্দ রহিত হওয়া অবশিষ্টদের ক্ষেত্রেও তা রহিত হওয়াকে অনিবার্য করে।

লুণ্ঠিত ব্যক্তিদের মাঝে (দারুল হরব থেকে আগত) নিরাপত্তাশীল ব্যক্তি থাকলে বিষয়টি ভিন্ন হবে। কেননা তার ক্ষেত্রে হদ্দ রহিত হওয়ার কারণ হলো, তার (মালের) নিরাপত্তাগুণের অসম্পূর্ণতা। আর এটা তার সাথে বিশিষ্ট অবস্থা। পক্ষান্তরে আলোচ্য ক্ষেত্রে হদ্দ রহিত হওয়ার কারণ হলো সংরক্ষণের অসম্পূর্ণতা। কেননা সমগ্র কাফেলা একটি সংরক্ষিত স্থানতুল্য।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিউক্ত ইবারতে একটি মতভেদপূর্ণ মাসআলা আলোচিত হয়েছে। মাসআলাটি হলো, ডাকাত দলের মধ্যে যদি কোনো বালক (অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলে,) কিংবা পাগল থাকে কিংবা যাদের উপর ডাকাতি করা হয়েছে তাদের কোনো মাহরাম আত্মীয় থাকে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম যুফার (র.)-এর অভিমত হলো, গোটা ডাকাত দলের উপর থেকে হদ্দ রহিত হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, যদি সুস্থ মস্তিষ্ক ও প্রাপ্তবয়স্ক ডাকাতরা হত্যা ও লুণ্ঠন কাজটি প্রত্যক্ষভাবে সম্পন্ন করে থাকে, তাহলে শিশু ও পাগল ছাড়া অন্যদের উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে। আর যদি হত্যা ও লুণ্ঠন কাজ বালক কিংবা পাগলের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে সংঘটিত হয়, তাহলে সকলের উপর থেকে হদ্দ রহিত হয়ে যাবে।

দলিল পর্ব:

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) হতে বর্ণিত হলো, হত্যা ও লুণ্ঠন যদি সুস্থমস্তিষ্ক ও প্রাপ্ত বয়স্কদের দ্বারা সংঘটিত হয় তাহলে তাদের উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে। দলের মধ্যে বালক ও পাগলের উপস্থিতির কারণে হদ্দ রহিত হবে না।

এ ক্ষেত্রে তার দলিল হলো, যে ব্যক্তি সরাসরি হত্যা ও লুণ্ঠন সম্পন্ন করেছে, সে হলো আসল বা মূখ্য। আর তার সহযোগীরা হলো অনুগামী। যাদের মধ্যে পাগল বা শিশুও রয়েছে। এমতাবস্থায় মূখ্য ব্যক্তির মাঝে কোনো ত্রুটি নেই। যেহেতু সে সুস্থ মস্তিষ্ক এবং প্রাপ্তবয়স্ক। ত্রুটি আছে অনুগামীর মাঝে, কিন্তু অনুগামীর ত্রুটি বিবেচ্য নয়। অর্থাৎ অনুগামী ব্যক্তির ত্রুটির কারণে মূখ্য ব্যক্তির অপরাধে কোনো প্রভাব পড়ে না। অতএব, শিশুও পাগলের উপর হদ্দ না আসলেও সুস্থ মস্তিষ্ক ও প্রাপ্তবয়স্কদের উপর হদ্দ আসবে।

পক্ষান্তরে যদি সুরতটি বিপরীত হয়, তাহলে হুকুমও বিপরীত হয়ে যাবে। অর্থাৎ হত্যা ও লুণ্ঠন কর্মটি যদি সরাসরি বালক কিংবা পাগলের দ্বারা সম্পন্ন হয় আর প্রাপ্ত বয়স্ক সুস্থ লোকেরা সহযোগী থাকে, তাহলে সকলের উপর থেকে হদ্দ রহিত হয়ে যাবে। কেননা এক্ষেত্রে বালক এবং পাগল হয়েছে মূখ্য সুস্থ্য ও বয়স্ক হয়েছে অনুগামী। আর মূখ্যদের মধ্যে ত্রুটি রয়েছে। ফলে মূখ্যদের এ ত্রুটি অনুগামীদের উপর প্রভাব ফেলবে। অতএব, মূখ্য হতে হদ্দ রহিত হওয়ার কারণে অনুগামী হতেও হদ্দ রহিত হয়ে যাবে। মোটকথা তখন ডাকাত দলের সকল সদস্যের উপর থেকেই হদ্দ রহিত হয়ে যাবে।

ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম যুফার (র.) বলেছেন, হত্যা ও লুণ্ঠনকার্য সুস্থ ও প্রাপ্ত বয়স্কদের দ্বারা সম্পন্ন হওয়া এবং বালক ও পাগল সহযোগী থাকা অবস্থায়ও সকলের উপর থেকে হদ্দ রহিত হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে তাদের দলিল হলো এই যে, হত্যা ও লুণ্ঠন কাজ কিছু লোকের দ্বারা সম্পন্ন হলেও এটা শুধু তাদের অপরাধ নয়; বরং সকলের অপরাধ। কেননা রাহাজানির অপরাধ দলের সকল সদস্যের পারস্পরিক সহযোগিতার ফলেই সম্পন্ন হয়ে থাকে। অতঃপর যখন কিছু সদস্যের (বালক ও পাগল) অপরাধ দ্বারা হদ্দ ওয়াজিব না হয়, তখন অন্য সদস্যদের অপরাধের দ্বারাও হদ্দ ওয়াজিব হবে না। কেননা অন্য সদস্যদের অপরাধটি হদ্দ ওয়াজিবকারী ইল্লতের একাংশ মাত্র। আর আংশিক ইল্লতের দ্বারা কোনো হুকুম সাব্যস্ত হয় না। হুকুম সাব্যস্ত হতে হলে পূর্ণ ইল্লত আবশ্যক হয়।

মোটকথা বালক, পাগল ও সুস্থ লোক সকলের সম্মিলিত অপরাধটি ছিল একটি ইল্লত। যা দ্বারা হদ্দ ওয়াজিব হতো। কিন্তু বালক ও পাগলের অপরাধ হদ্দ ওয়াজিব করতে পারেনি। তাই ইল্লতের একাংশ বেকার হয়ে গেল। এর ফলে ইল্লতের অবশিষ্ট অংশও বেকার হয়ে যাবে। কারণ আংশিক ইল্লতের দ্বারা হুকুম সাব্যস্ত হয় না। অতএব, সকলের উপর থেকে হদ্দ রহিত হয়ে যাবে।

আলোচ্য মাসআলাটির অনুরূপ মাসআলা হলো, যদি একজন লোক ইচ্ছাকৃতভাবে তীর নিক্ষেপ করে এবং অপরজন ভুলক্রমে তীর নিক্ষেপ করে। অতঃপর উভয়ের তীর গিয়ে একসাথে তৃতীয় একজনের গায়ে বিদ্ধ হয় এবং এর ফলে সে মারা যায়, তাহলে কারো উপরই কিসাস আসে না। সাধারণ বিবেচনায়, যে লোকটি ইচ্ছাকৃতভাবে তীর মেরেছে, তার

https://e-ilm.weebly.com/

উপর কিসাস আসা উচিত ছিল। কিন্তু আক্রান্ত লোকটি যেহেতু নিহত হয়েছে দুটি তীরের আঘাতে এবং দুটি তীরের মধ্যে একটি তীর মারা হয়েছে ভুলক্রমে, সেহেতু ইল্লতের অর্ধেক অংশ কিসাস ওয়াজিব করছে না। রয়ে গেল বাকি অর্ধেক ইল্লত। আর অর্ধেক ইল্লতের উপর হুকুম সাব্যস্ত হয় না। তাই ইচ্ছাকৃত তীর নিক্ষেপকারীর উপরও কিসাস ওয়াজিব হয় না।

ডাকাত দলের মধ্যে যদি লুণ্ঠিত লোকদের কারো মাহরাম আত্মীয় থাকে, তাহলে সকলের উপর থেকে হদ্দ রহিত যায়- এ মাসআলাটির ব্যাখ্যায় ইমাম আবূ বকর রাযী (র.) বলেছেন, লুণ্ঠিত সম্পদটি যদি কাফেলার সকলের যৌথ সম্পদ হয় এবং লুণ্ঠনকারী ডাকাত দলের মধ্যে কাফেলার কারো মাহরাম আত্মীয় থাকে, তাহলে আত্মীয়ের সম্পদ আত্মীয় লুণ্ঠন করার কারণে সর্বপ্রথম লুণ্ঠনকারী আত্মীয়ের উপর থেকে হদ্দ রহিত হবে। অতঃপর এর প্রভাবে অন্যান্য ডাকাতের উপর থেকেও হদ্দ রহিত হবে। কেননা সম্পদ লুণ্ঠন সকলের সম্মিলিত একটি অপরাধ বা ইল্লত। যার কিছু অংশ হদ্দ ওয়াজিব করতে বাধাগ্রস্থ হয়েছে আত্মীয়তার কারণে। ফলে অবশিষ্টটুকুও আর হদ্দ ওয়াজিব করতে সক্ষম হবে না। কারণ আংশিক ইল্লত দ্বারা হুকুম সাব্যস্ত হয় না।

কিন্তু বিশুদ্ধ মত হলো লুণ্ঠিত সম্পদ কাফেলার সকলের মাঝে যৌথ হোক বা না হোক সর্বাবস্থায় এ হুকুম যে, লুণ্ঠনকারী ডাকাত দলের মধ্যে লুণ্ঠিত লোকদের কারো মাহরাম আত্মীয় থাকলে সকল ডাকাতের উপরে থেকেই হদ্দ রহিত হয়ে যাবে। কেননা লুণ্ঠিত সকলের সম্পদ ডাকাত দলের কাছে এক বস্তুতুল্য। অপরাধও সেক্ষেত্রে একটি। অতএব একজনের উপর থেকে হদ্দ রহিত হলে সকলের উপর থেকেই হদ্দ রহিত হয়ে যাবে। কারণ একটি অপরাধের একাংশ হদ্দ ওয়াজিব করবে না, অপরাংশ হদ্দ ওয়াজিব করবে এমনটি হতে পারে না।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর :

কেউ বলতে পারে যে, শুধু মুস্তামিন ব্যক্তির উপর ডাকাতি করা হলে হদ্দ ওয়াজিব হয় না, যেমন শুধু মাহরাম আত্মীয়ের উপর ডাকাতি করা হলে হদ্দ আসে না। অতঃপর যখন লুণ্ঠিত কাফেলার মধ্যে আত্মীয় থাকাকালে সকল ডাকাতের উপর থেকে হদ্দ রহিত হয়ে যায়, তখন লুণ্ঠিত কাফেলার মুস্তামিন থাকাকালেও সকল ডাকাতের উপর থেকে হদ্দ রহিত হওয়া উচিত।

এর উত্তর হলো এই যে, মুস্তামিন ব্যক্তির উপর ডাকাতি করা হলে হদ্দ রহিত হওয়ার কারণ হলো তার সম্পদের নিরাপত্তা গুণ না থাকা। যা কিনা শুধু তার সাথে বিশিষ্ট। কাফেলার অন্যদের মাঝে এ কারণটি নেই। বিধায় অন্যদের উপর যে ডাকাতি হয়েছে, তার দায়ে ডাকাতদের হাত কাটা হবে। পক্ষান্তরে আত্মীয়ের সুরতে ডাকাত দলের মধ্যে আত্মীয় থাকার সময় যে হদ্দ রহিত হয়, এর কারণ হলো সংরক্ষণের অসম্পূর্ণতা। কেননা আত্মীয়ের জন্য আত্মীয়ের মাল হিরয নয়। আর পুরা কাফেলাটি একটি হিরয। সে হিসাবে পুরা কাফেলাটি হিরয তথা সংরক্ষিত নয়। আর অসংরক্ষিত মাল লুণ্ঠনের দায়ে হদ্দ ওয়াজিব হয়। বিধায় তখন সকলের উপর থেকে হদ্দ রহিত হয়ে যায়।

https://e-ilm.weebly.com/

وَإِذَا سَقَطَ الْحَدُّ صَارَ الْقَتْلُ إِلَى الْأَوْلِيَاءِ لِظُهُوْرِ حَقِّ الْعَبْدِ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فَإِنْ شَاءُوْا قَتَلُوْا وَإِنْ شَاءُوْا عَفَوْا وَإِذَا قَطَعَ بَعْضُ الْقَافِلَةِ الطَّرِيْقَ عَلَى الْبَعْضِ لَمْ يَجِبِ الْحَدُّ لِأَنَّ الْحِرْزَ وَاحِدٌ فَصَارَتِ الْقَافِلَةُ كَدَارٍ وَاحِدَةٍ وَمَنْ قَطَعَ الطَّرِيْقَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فِي الْمِصْرِ أَوْ بَيْنَ الْكُوْفَةِ وَالْحِيْرَةِ فَلَيْسَ بِقَاطِعِ الطَّرِيْقِ اسْتِحْسَانًا . وَفِي الْقِيَاسِ يَكُوْنُ قَاطِعَ الطَّرِيْقِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ لِوُجُوْدِهِ حَقِيْقَةً . وَعَنْ أَبِيْ يُوْسُفَ أَنَّهُ يَجِبُ الْحَدُّ إِذَا كَانَ خَارِجَ الْمِصْرِ إِنْ كَانَ بِقُرْبِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْحَقُهُ الْغَوْثُ . وَعَنْهُ إِنْ قَاتَلُوْا نَهَارًا بِالسِّلَاحِ أَوْ لَيْلًا بِهِ أَوْ بِالْخَشَبِ فَهُمْ قُطَّاعُ الطَّرِيْقِ لِأَنَّ السِّلَاحَ لَا يَلْبَثُ وَالْغَوْثُ يُبْطِئُ بِاللَّيَالِي، وَنَحْنُ نَقُوْلُ : إِنَّ قَطْعَ الطَّرِيْقِ بِقَطْعِ الْمَارَّةِ وَلَا يَتَحَقَّقُ ذٰلِكَ فِي الْمِصْرِ وَيَقْرُبُ مِنْهُ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ لُحُوْقُ الْغَوْثِ، إِلَّا أَنَّهُمْ يُؤْخَذُوْنَ بِرَدِّ الْمَالِ أَيْضًا لَا لِلْحَقِّ إِلَى الْمُسْتَحِقِّ، وَيُؤَدَّبُوْنَ وَيُحْبَسُوْنَ لِارْتِكَابِهِمُ الْجِنَايَةَ، وَلَوْ قَتَلُوْا فَالْأَمْرُ فِيْهِ إِلَى الْأَوْلِيَاءِ لِمَا بَيَّنَّا

অনুবাদ : যখন হদ্দ রহিত হয়ে গেল, তখন হত্যার সিদ্ধান্ত অভিভাবকদের হাতে অর্পিত হবে। কেননা আমরা উল্লেখ করে এসেছি যে, তখন বান্দার হক প্রকাশিত হয়। **সুতরাং তারা ইচ্ছা করলে হত্যার দাবি উত্থাপন করবে কিংবা মাফ করে দিবে।**

যদি কাফেলার কিছু লোক অপর কিছু লোকের উপর ডাকাতি করে, তাহলে হদ্দ সাব্যস্ত হবে না। কেননা সংরক্ষণ অভিন্ন হওয়ার কারণে পুরো কাফেলা একটি বাড়ির সমতুল্য।

দিনে বা রাতে কেউ যদি শহরে ডাকাতি করে কিংবা 'কুফা' ও 'হিরা' এর মধ্যবর্তী স্থানে ডাকাতি করে তাহলে সে ডাকাত হবে না, ইস্তিহসান তথা সূক্ষ্ম কিয়াসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী। কিয়াসের দাবি এই যে, সে ডাকাত হিসাবে গণ্য হবে। কেননা প্রকৃত ডাকাতি অস্তিত্ব লাভ করেছে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, শহরের বাইরে যত নিকটবর্তী স্থানই হোক, হদ্দ সাব্যস্ত হবে। কেননা তার কাছে (যথা সময়ে) সাহায্য পৌঁছবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে আরেকটি বর্ণনা এই যে, যদি দিনের বেলায় অস্ত্রসহ কিংবা রাতের বেলায় অস্ত্র বা লাঠি সোটা নিয়ে লুণ্ঠন চালায়, তাহলে তাদেরকে ডাকাত বলে গণ্য করা হবে। কেননা অস্ত্র তো সাহায্য পৌঁছার অবকাশ দেবে না, আর রাতের বেলায় সাহায্য পৌঁছতে বিলম্ব হয়।

আমাদের বক্তব্য এই যে, রাহাজানি সম্পন্ন হয় পথিকদের লুণ্ঠন করা দ্বারা। আর শহর ও শহরের নিকটবর্তী স্থানে তা সম্পন্ন হতে পারে না। কেননা স্বাভাবিক অবস্থা হলো, সাহায্য পৌঁছে যাওয়া। তবে তাদেরকে পাকড়াও করা হবে মালামাল ফেরত দেওয়ার জন্য, হকদারদের নিকট তাদের হক পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে। আর অপরাধ সংঘটনের কারণে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে এবং আটক করা হবে। আর যদি এরূপ ক্ষেত্রে তারা হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে থাকে, তাহলে আমাদের বর্ণিত কারণে বিষয়টি অভিভাবকদের উপর ন্যাস্ত করা হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উক্ত ইবারত পূর্ববর্তী মাসআলার সমাপ্তি স্বরূপ। পূর্বের মাসআলায় বলা হয়েছিল ডাকাত দলের মাঝে বালক, পাগল কিংবা লুণ্ঠিতদের মাহরাম আত্মীয় থাকলে হদ্দ রহিত হয়ে যাবে। এখানে বলা হচ্ছে, হদ্দ, যা কিনা আল্লাহর হক ছিল, তা রহিত হয়ে যাওয়ার পর বান্দার হক প্রকাশ পাবে। অতএব, ডাকাত দল যে হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে এর কিসাস গ্রহণের দায়িত্ব অর্পিত হবে নিহত ব্যক্তির অভিভাবকদের হাতে। তারা ইচ্ছা করলে কিসাস গ্রহণ করতে পারবে, ইচ্ছা করলে ক্ষমাও করতে পারবে।

قَوْلُهُ : وَإِذَا قَطَعَ بَعْضُ الْقَافِلَةِ الطَّرِيْقَ الخ : একই কাফেলার কিছু লোক যদি অপর কিছু লোকের উপর ডাকাতি করে বসে, তাহলে ডাকাতির হদ্দ ওয়াজিব হবে না। কারণ এখানে হিরয ভঙ্গ করা হয়নি। কেননা পুরো কাফেলাটি একটি ঘরের মতো। সে হিসাবে ডাকাত তার নিজের বাসগৃহের ডাকাতি করেছে। আর ব্যক্তির বাসগৃহ তার জন্য হিরয নয়। অতএব, হদ্দ ওয়াজিব হবে না। চোরের ক্ষেত্রেও অনুরূপ। কোনো ব্যক্তি যে গৃহে বাস করে সে গৃহেই যদি সে চুরি করে, তাহলে হাত কাটা হয় না, হিরয্ না থাকার কারণে। আলোচ্য মাসআলায়ও তদ্রূপ।

তবে হদ্দ ওয়াজিব না হওয়ার কারণে বান্দার হক প্রকাশ পাবে। ডাকাতরা যদি কাফেলার কাউকে ইচ্ছাকৃত হত্যা করে থাকে, তাহলে নিহত ব্যক্তির অভিভাবক তার কিসাস গ্রহণ করতে পারবে। ইচ্ছা করলে ক্ষমাও করতে পারবে। লুণ্ঠিত সম্পদ অক্ষুণ্ন থাকলে তা ফিরিয়ে দিতে হবে। বিনষ্ট হয়ে গেলে কিংবা বিনষ্ট করলে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

قَوْلُهُ : وَمَنْ قَطَعَ الطَّرِيْقَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا الخ : "কুফা" ইরাকের একটি প্রসিদ্ধ নগরী। "হিরা" কারো মতে কুফা হতে মাইল খানিক দূরে অবস্থিত একটি নগরীর নাম। যা ছিল নুমান ইবনুল মুনযিরের বসতি এলাকা। পরবর্তীতে দুই নগরীর বসতি একসাথে মিলে যায়। ফলে হিরা অঞ্চল কুফা নগরীরই উপকণ্ঠে বলে পরিগণিত হয়।

মাসআলার সারমর্ম : কেউ যদি দিনের বেলায় কিংবা রাতের বেলায় শহরে অথবা কুফা ও হিরার মধ্যবর্তী কোনো স্থানে লুটতরাজ করে, তাহলে সে ডাকাত বলে গণ্য হবে কিনা। এ বিষয়টি সম্পর্কে দুরকম বিবেচনা রয়েছে। **এক.** ইস্তিহসান বা সূক্ষ্ম কিয়াসের বিবেচনা, এ বিবেচনায় এটা ডাকাতি বলে গণ্য নয়। **দুই.** কিয়াসের বিবেচনা। এ বিবেচনা অনুযায়ী সেটা ডাকাতি বলে গণ্য। কেননা ডাকাতির প্রকৃত মর্ম তথা জোড় পূর্বক মালামাল লুণ্ঠন করে নেওয়া সেখানে অস্তিত্ব লাভ করে।

এ বিষয়ে ফকীহগণের বেশ কয়েকটি মতামত বর্ণিত আছে। যেমন– ১. ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে উপরিউক্ত লুটতরাজটি ডাকাতি বলে গণ্য হবে। যা কিনা কিয়াসেরও দাবি।

২. ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) হতে একটি বর্ণনা হলো লুটতরাজটি যদি শহরের বাইরে সংঘটিত হয়, অতি নিকটবর্তী এলাকায় হলেও, তা ডাকাতি বলে গণ্য হবে এবং ডাকাতির হদ্দ ওয়াজিব হবে। কারণ শহরের বাইরে হওয়ার কারণে, যথাসময়ে সাহায্য না পৌঁছাই স্বাভাবিক। তাই সেখানে লুটতরাজ করা জনমানবহীন এলাকায় লুটতরাজ করার মতোই।

৩. ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) হতে আরেকটি মত এরূপ বর্ণিত আছে যে, যদি দিনের বেলায় শহরের ভিতরে অস্ত্রসহ লুটপাট করে তাহলে সে ডাকাত। অস্ত্র ছাড়া অন্য কিছুসহ হলে, যেমন– লাঠি, কাঠ, পাথর ইত্যাদি দ্বারা দিনের বেলায় শহরে লুট পাট করলে ডাকাত নয়। কিন্তু রাতের বেলায় লাঠি, পাথর ইত্যাদি দ্বারা হলেও সে ডাকাত বলে গণ্য হবে।

কারণ লুটেরাদের সাথে অস্ত্র থাকার কারণে সাহায্য পৌঁছতে পারবে না। ফলে ডাকাতি করে ফেলতে সক্ষম হবে। আর সময়টা যদি রাতের বেলা হয়, তাহলে তা সাহায্য পৌঁছলেও তা বিলম্বে পৌঁছবে। এ সুযোগে ডাকাতি সম্পন্ন হয়ে যাবে।

৪. আমাদের বক্তব্য (জাহিরে রেওয়ায়েত) হলো, আলোচ্য লুটতরাজ ডাকাতি বলে গণ্য নয়। কেননা ডাকাতি বলা হয় পথিকদের লুণ্ঠন করাকে। এটা শহরের ভিতরে এবং শহরের নিকটবর্তী এলাকায় সম্ভব নয়। কারণ শহরে বা শহরের অদূরে কেউ এ ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে সাধারণত তার কাছে সাহায্যকারীরা পৌঁছে যায়, তাকে উদ্ধার করে নেয়। ফলে ডাকাতি সংঘটিত হতে পারে না।

৫. ইমাম মালেক (র.) এর মতে, যে লুণ্ঠন এমনভাবে সংঘটিত হয় যে, আক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে সাহায্য লাভ করা সম্ভব হয় না, তাই ডাকাতি বলে গণ্য যেখানেই হোক না কেন।

যাই হোক, জাহিরে রেওয়ায়েত অনুযায়ী যেহেতু শহর বা শহরের অদূরে সংঘটিত লুটতরাজ ডাকাতি বলে গণ্য নয়, সেহেতু হদ্দ ওয়াজিব হবে না। আর হদ্দ ওয়াজিব না হওয়ার কারণে বান্দার হক প্রকাশ পাবে। তাই তাদেরকে পাকড়াও করে প্রথমে কিছু শাস্তি দেওয়া হবে অপরাধ সংঘটিত করার কারণে। অতঃপর লুণ্ঠিত মালামাল উদ্ধার করে হকদারের নিকট পৌঁছে দেওয়া হবে। আর তাদেরকে কারাগারে আবদ্ধ করা হবে। যদি কোনো হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে থাকে, তাহলে এর কিসাসের দায়িত্ব নিহত ব্যক্তির অভিভাবকদের উপর অর্পণ করা হবে। তারা ইচ্ছা করলে কিসাস গ্রহণ করবে, ইচ্ছা করলে ক্ষমা করে দিবে। ফতোয়া ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতের উপর।

https://e-ilm.weebly.com/

وَمَنْ خَنَقَ رَجُلًا حَتّٰى قَتَلَهُ فَالدِّيَةُ عَلٰى عَاقِلَتِهِ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ وَهِيَ مَسْاَلَةُ الْقَتْلِ بِالْمُثَقَّلِ، وَسَنُبَيِّنُ فِيْ بَابِ الدِّيَاتِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَاِنْ خَنَقَ فِي الْمِصْرِ غَيْرَ مَرَّةٍ قُتِلَ بِهٖ؛ لِاَنَّهُ صَارَ سَاعِيًا فِي الْاَرْضِ بِالْفَسَادِ فَيُدْفَعُ شَرُّهُ بِالْقَتْلِ، وَاللّٰهُ تَعَالٰى اَعْلَمُ .

অনুবাদ : কেউ যদি কাউকে গলাটিপে হত্যা করে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে দিয়ত আসবে হত্যাকারীর আকিলাহ-র উপর। এটা হলো (অস্ত্রছাড়া) ভারি কোনো বস্তু দ্বারা হত্যা করার অন্তর্ভুক্ত মাসআলা। দিয়ত অধ্যায়ে ইনশাআল্লাহ আমরা তা বর্ণনা করব।

যদি সে শহরের মধ্যে একাধিকবার গলাটিপে হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে থাকে, তাহলে এ কারণে তাকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হবে। কেননা সে জমিনে ফ্যাসাদ সৃষ্টির অপচেষ্টাকারী হয়েছে। সুতরাং হত্যার মাধ্যমে তার দুষ্কৃতি রোধ করা হবে। আল্লাহই অধিক অবগত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ : وَاِنْ خَنَقَ فِي الْمِصْرِ غَيْرَ مَرَّةٍ قُتِلَ الخ : خنق يخنق خنقا (باب نصر) গলাটিপে ধরা, শ্বাস রোধ করা। باب تفعيل হতেও একই অর্থে ব্যবহার হয়।

যে ব্যক্তি মানুষকে গলাটিপে হত্যা করে এবং এ অপরাধ একাধিকবার তার দ্বারা সংঘটিত হয়। সে ফেতনাকারী বা আল্লাহর জমিনে অনর্থ সৃষ্টিকারী বলে গণ্য হবে। ফলে তাকে সিয়াসত হিসাবে হত্যা করা হবে। যাতে মানুষ তার অনিষ্ট থেকে নিরাপত্তা লাভ করে।

https://e-ilm.weebly.com/

كِتَابُ السِّيَرِ

السِّيَرُ جَمْعُ سِيْرَةٍ، وَهِيَ الطَّرِيْقَةُ فِي الْأُمُوْرِ، وَفِى الشَّرْعِ تَخْتَصُّ بِسِيَرِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلَامُ فِيْ مغَازِيْه . قَالَ الْجِهَادُ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ إِذَا قَامَ بِهِ فَرِيْقٌ مِنَ النَّاسِ سَقَطَ عَنِ الْبَاقِيْنَ أَمَّا الْفَرْضِيَّةُ فَلِقَوْلِهِ تَعَالٰى ﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَافَّةً﴾ وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ﴿الْجِهَادُ مَاضٍ إِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ﴾ وَاَرَادَ بِهِ فَرْضًا بَاقِيًا، وَهُوَ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ؛ لِأَنَّهُ مَا فُرِضَ لِعَيْنِهِ إِذْ هُوَ إِفْسَادٌ فِيْ نَفْسِهِ، وَإِنَّمَا فُرِضَ لِإِعْزَازِ دِيْنِ اللّٰهِ وَدَفْعِ الشَّرِّ عَنِ الْعِبَادِ، فَإِذَا حَصَلَ الْمَقْصُوْدُ بِالْبَعْضِ سَقَطَ عَنِ الْبَاقِيْنَ كَصَلٰوةِ الْجَنَازَةِ وَرَدِّ السَّلَامِ ـ

অধ্যায় : জিহাদ

অনুবাদ : (জিহাদ সংক্রান্ত বিষয়াবলিকে ইসলামি ফিকহের পরিভাষায় سِيَرٌ সিয়ার বলা হয়) এটা سِيْرَةٌ (সীরাতুন)-এর বহুবচন, যার আভিধানিক অর্থ– কোনো বিষয়ের পথ। শরিয়তের পরিভাষায় এটি (জিহাদ ও) গাযওয়াসমূহে নবী ﷺ -এর অনুসৃত নীতি ও পন্থার সাথে বিশিষ্ট।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, **"জিহাদ হলো ফরজে কিফায়া। যদি লোকদের একদল তা পালন করে তাহলে অবশিষ্টদের থেকে তার ফরজ হওয়া রহিত হয়ে যায়।"** ফরজ হওয়ার প্রমাণ হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী–

وقاتلوا الْمُشْرِكِيْن كافَّةً كما يُقَاتِلُوْنَكُمْ كافَّة. (التَّوْبَةُ : الاية ٣٦)

"তোমরা সমগ্র মুশরিকদলকে হত্যা করো, যেমন তারা তোমাদের সমগ্র দলের বিরুদ্ধে লড়াই করে।"

এবং রাসূল ﷺ -এর বাণী– اَلْجِهَادُ مَاضٍ الى يَوْمِ الْقِيَامَةِ 'জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত কার্যকর বিধান।' এ কথা দ্বারা উদ্দেশ্য করেছেন যে তা ফরজ হিসেবে কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী থাকবে। জিহাদ হলো ফরজে কেফায়া। তার কারণ এই যে, এটাকে নিজস্ব গুণের কারণে ফরজ করা হয়নি। কেননা নিজস্ব সত্তাগত দৃষ্টিকোণে এটা হলো ফ্যাসাদ-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি। শুধু আল্লাহর দীনের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং বান্দাদের থেকে দুষ্কৃতি রোধ করার জন্য এটা (জিহাদ) কে ফরজ করা হয়েছে। সুতরাং কিছু লোকদের দ্বারা উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে গেলে অবশিষ্টদের থেকে তা রহিত হয়ে যাবে। যেমন সালাতে জানাযা এবং সালামের উত্তর (কিছু লোকের আদায় দ্বারা মজলিসের সকলে দায়িত্ব মুক্ত হয়)।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শব্দবিশ্লেষণ : سِيَرٌ (সিয়ার) শব্দটি سِيْرَةٌ (সীরাতুন)-এর বহুবচন, এর আভিধানিক অর্থ– কোনো বিষয়ে পথ, পন্থা, সুন্নত, মাযহাব, তরিকা ইত্যাদি। পরিভাষায় (قواعد الفقه) গ্রন্থকার এভাবে সংজ্ঞা পেশ করেছেন–

الدُّعَاءُ الى الدِّيْنِ الحقِّ وقتالُ من لم يَقْبَلْهُ حقيقةً او حُكْمًا باداء الجزية المُصَالحة .

অর্থ : জিহাদ/সিয়ার হলো দীনে হক ইসলামের প্রতি আহ্বান করা এবং যারা প্রত্যক্ষভাবে ইসলাম গ্রহণে অস্বীকার করে বা পরোক্ষভাবে কর আদায় বা সন্ধি রক্ষায় অসম্মতি প্রকাশ করে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা।

https://e-ilm.weebly.com/

কিতাবুস সিয়ার নামকরণের কারণ : কিতাবুল মাগাযীকে কিতাবুস সিয়ার নামে নামকরণ করার কারণ আল্লামা আইনী (র.) দুটি ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছেন।

এক. যেহেতু উক্ত অধ্যায়ে রাসূল ﷺ এবং সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর জিহাদে অনুসৃত নীতি ও পন্থা বর্ণনা করা হয়েছে তাই উক্ত অধ্যায়কে سِيرَة পথ, পন্থা, তরিকা অর্থে কিতাবুস সিয়ার নামে নামকরণ করা হয়েছে।

দুই. অথবা السِّيَرُ শব্দটি فِعْلَةٌ مِنَ السَّيْرِ যার অর্থ : পথ অতিক্রম করা। এ অর্থে জিহাদকে সিয়ার বলা হয় যেহেতু জিহাদের প্রথম কর্মই হলো শত্রুদের উদ্দেশ্যে পথ চলা, সামনে অগ্রসর হওয়া।

পূর্বাপর সম্পর্ক : কিতাবুস সিয়ার এবং পূর্বে আলোচিত কিতাবুল হুদূদ (كتاب الحدود) -এর মাঝে সম্পর্ক স্থাপন সম্পর্কে ব্যাখ্যাকারগণ দুটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

এক. যুদ্ধ-জিহাদ এবং শাস্তি প্রয়োগের মাধ্যমে পৃথিবীকে আল্লাহর নাফরমানি থেকে পবিত্র করা হয়। এদিকে লক্ষ্য করে উভয় অধ্যায়ের উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন। তাই অধ্যায়দ্বয়কে পাশাপাশি উল্লেখ করা হয়েছে। তবে কিতাবুল হুদূদ (শাস্তি প্রয়োগ অধ্যায়)-কে আগে উল্লেখ করা হয়েছে– কারণ হদ নাফরমানি থেকে পৃথিবীকে মুক্ত করার ন্যূনতম পন্থা আর জিহাদ উচ্চতম পন্থা। তাই تَرَقِّيْ مِنَ الْأَدْنٰى إِلَى الْأَعْلٰى (পর্যায়ক্রমে নিচু থেকে উঁচুতে উপনীত হওয়ার) ভিত্তিতে কিতাবুল হুদূদকে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

দুই. হদ-এর বিধান সাধারণত মুসলমানদের উপর প্রয়োগ করা হয়, আর জিহাদ সংঘটিত হয় কাফেরদের বিরুদ্ধে। তাই মুসলমানদের সাথে যা বিশিষ্ট তার আলোচনাকে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ : اَلْجِهَادُ مَاضٍ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ : উক্ত হাদীস ইমাম আবূ দাউদ (র.) তাঁর সুনানে হযরত আনাস (রা.) থেকে ভিন্ন শব্দে বর্ণনা করেছেন" اَلْجِهَادُ مَاضٍ مُنْذُ بَعَثَنِى اللّٰهُ إِلٰى أَنْ يُقَاتِلَ آخِرُ أُمَّتِى الدَّجَّالَ .

অর্থ : 'আমি প্রেরিত হওয়ার পর থেকে আমার উম্মতের শেষ দলটি দাজ্জালের সঙ্গে লড়াই করা পর্যন্ত জিহাদের বিধান কার্যকর থাকবে।' উক্ত হাদীস জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত কার্যকর বিধান এবং তা রহিত হবার নয়- একথার উপর প্রমাণ বহন করে। আর এ ব্যাপারে উম্মতের ইজমা (ঐকমত্য) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

قوله : أَمَّا الْفَرْضِيَّةُ فَلِقَوْلِهٖ تَعَالٰى وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ . ইসলামের প্রাথমিক যুগে রাসূল ﷺ জিহাদের আদিষ্ট ছিলেন না। তখন মুসলমানদের ধনবল, জনবল ও শক্তি একেবারে নগণ্য ছিল। তাই আল্লাহ তা'আলা হিকমতের সাথে জিহাদের বিধানকে প্রবর্তন করেছেন। প্রথমে কাফেরদের জুলুম-অত্যাচার নির্যাতনমূলক কর্মকাণ্ডকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে বলেছেন এবং ধৈর্যধারণের নির্দেশ দিয়েছেন–

وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ 'আপনি মুশরিকদেরকে উপেক্ষা করে চলুন' فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيْلَ 'সুতরাং আপনি পরম সৌন্দর্যের সাথে তাদেরকে ক্ষমা করুন।'

দ্বিতীয় পর্যায়ে হিকমত অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে রাসূল ﷺ -কে

(اُدْعُ إِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ أَحْسَنُ) النحل : الاية : ١٢٥

অর্থ : 'আপনি (হে নবী!) হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং উহাদের সাথে উত্তম পন্থায় তর্কের মাধ্যমে আপনার প্রতিপালকের পথে আহ্বান করুন।'

তৃতীয় পর্যায়ে : প্রতিরোধ, প্রতিহত করার জন্য (قتال) জিহাদের অনুমতি দেওয়া হয়েছে–

(أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُوْنَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوْا) الحج : الاية : ٣٩

অর্থ : যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হলো-যারা আক্রান্ত হয়েছে কারণ তাদের প্রতি জুলুম করা হয়েছে।

চতুর্থ পর্যায়ে : মুসলমানদেরকে সর্বাগ্রে যুদ্ধের সূচনা করার জোর নির্দেশ দিয়ে জিহাদকে এ উম্মতের জন্য ফরজ সাব্যস্ত করা হয়েছে।

* فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ التوبة : الاية : ٥
* وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَاتَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ الانفال : الاية : ٣٩
* كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ البقرة : الاية : ٢١٦

https://e-ilm.weebly.com/

তথা "কাফেরদের যেথায় সাক্ষাৎ পাও সেথায় হত্যা কর।" "আল্লাহর দীন জমিনে পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং ফিতনা-ফ্যাসাদ নির্মূল হওয়া পর্যন্ত তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর।" "তোমাদের উপর জিহাদকে ফরজ করা হয়েছে।" এ ধরনের বহু আয়াত দ্বারা জিহাদের বিধানকে শক্তিশালী/বলিষ্ঠ করা হয়েছে। জিহাদ ফরজ হওয়ার হুকুমটি কুরআনে কারীম, হাদীস এবং ইজমায়ে উম্মত দ্বারা সমর্থিত ও বলিষ্ঠ হওয়ার কারণে জিহাদ অস্বীকারকারী কাফের হয়ে যাবে।

قوله : وهو فرض على الكفاية : জিহাদের হুকুম বর্ণনার ক্ষেত্রে ফুকাহায়ে কেরামের (عبارة) ভাষ্যে বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।

* কেউ কেউ এভাবে ব্যক্ত করেছেন– الجهادُ واجبٌ على المسلمين فإذا النفيرُ فهو فرضٌ - জিহাদ মুসলমানদের উপর ওয়াজিব। তবে ব্যাপক আহ্বানে তা ফরজ হবে।

* কেউ কেউ এভাবে বর্ণনা করেছেন– الجهادُ قبلَ النفيرِ تطوّعٌ وبعد النفيرِ فرضُ عينٍ -ব্যাপক আহ্বানের পূর্বে হলে নফল হবে আর পরে হলে ফরজ সাব্যস্ত হবে।

* আর অধিকাংশ ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন– انه فرضٌ على كلِّ حالٍ غيرَ انه قبلَ النفيرِ كِفايةٌ "সর্বাবস্থায় জিহাদের হুকুম হলো ফরজ, তবে ব্যাপক আহ্বানের পূর্বে তা কিফায়া হিসেবে ফরজ আর ব্যাপক আহ্বানের পর তা ফরজে আইন।" জিহাদ ফরজ হওয়ার ব্যাপারে পূর্বে আমরা দলিল পেশ করেছি। মিরাজুদ দিরায়া গ্রন্থকার জিহাদ ফরজ এ ব্যাপারে উম্মতের ইজমা নকল করেছেন।

فرض على الكفاية -হওয়ার দলিল :

* সর্বাবস্থায় যদি জিহাদ ফরজে আইন বলা হয় তাহলে রাসূল ﷺ জিহাদে গমনকালে মদিনাতে কাউকে রেখে যেতেন না।

* দ্বিতীয়ত আল্লাহর বাণী–

لَا يَسْتَوِى القاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غيرُ أُوْلِى الضَّرَرِ والمُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ الى قوله فَضَّلَ اللّٰهُ المُجاهِدِيْنَ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ اَجْرًا عَظِيمًا

অর্থ : মুমিনদের মধ্যে যারা অক্ষম নয় অথচ ঘরে বসে থাকে আর যারা আল্লাহর পথে স্বীয় জান-মাল দ্বারা জিহাদ করে তারা সমান নয়। .... যারা জিহাদ করে তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা বিরাট প্রতিদানের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন তাদের উপর যারা ঘরে বসে থাকে। উক্ত আয়াতে কারীমায় মুজাহিদের মর্যাদা এবং শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করার দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ বহন করে (قَاعِدْ) যে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেনি তার জন্য জিহাদ ফরজ ছিলনা। অন্যথায় জিহাদে অংশ গ্রহণ না করায় সে গুনাহ গার হতো। অথচ আয়াতে لا يَسْتَوِىْ বলে উভয়ের মর্যাদা পার্থক্য নির্দেশ করা হয়েছে। যুদ্ধে যারা অংশ গ্রহণ করেনি তাদের অপরাধ বা গুনাহর কথা বলা হয়নি।

* তৃতীয়ত যদি জিহাদকে فرضُ عينٍ ধরা হয় তাহলে সকলে অনিবার্যভাবে জিহাদে অংশগ্রহণের কারণে মানুষের জীবিকা নির্বাহ অসম্ভব হয়ে পড়বে। তখন চাষাবাদ, ব্যবসা-বাণিজ্য সব কিছু বন্ধ হয়ে যাবে, যা মানশায়ে এলাহীর সম্পূর্ণ বিপরীত।

* মুসান্নেফ (গ্রন্থকার (র.) জিহাদ ফরজে কিফায়া হওয়ার আরেকটি চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন– "যেহেতু জিহাদে মূলত মানব হত্যা, রক্তপাত হয়, শহর-নগর ধ্বংস হয়, ভীষণভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হয় তাই সত্তাগতভাবে এতে ক্ষতি/খারাবি রয়েছে। এ সত্ত্বেও জিহাদকে ফরজ করা হয়েছে শুধু আল্লাহর দীনের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা এবং আল্লাহর বান্দাগণের থেকে কাফেরদের জুলুম-নির্যাতন ও দুষ্কৃতি প্রতিহত করার জন্য। আর এ উদ্দেশ্য যখন কিছু সংখ্যক লোকের দ্বারা সাধিত হয় তখন সকলের উপর ফরজে আইন হওয়ার প্রয়োজন নেই।

https://e-ilm.weebly.com/

فَإِنْ لَمْ يَقُمْ بِهِ أَحَدٌ اَثِمَ جَمِيْعُ النَّاسِ بِتَرْكِهِ لِأَنَّ الْوُجُوْبَ عَلَى الْكُلِّ، وَلِأَنَّ فِيْ اِشْتِغَالِ الْكُلِّ بِهِ قَطْعَ مَادَّةِ الْجِهَادِ مِنَ الْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ فَيَجِبُ عَلَى الْكِفَايَةِ إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ النَّفِيْرُ عَامًّا فَحِيْنَئِذٍ يَصِيْرُ مِنْ فُرُوْضِ الْأَعْيَانِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا﴾ الْآيَةَ . وَقَالَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ : اَلْجِهَادُ وَاجِبٌ إِلَّا أَنَّ الْمُسْلِمِيْنَ فِيْ سَعَةٍ حَتّٰى يُحْتَاجَ إِلَيْهِمْ، فَأَوَّلُ هٰذَا الْكَلَامِ إِشَارَةٌ إِلَى الْوُجُوْبِ عَلَى الْكِفَايَةِ وَاٰخِرُهُ إِلَى النَّفِيْرِ الْعَامِّ، وَهٰذَا لِأَنَّ الْمَقْصُوْدَ عِنْدَ ذٰلِكَ لَا يَتَحَصَّلُ إِلَّا بِإِقَامَةِ الْكُلِّ فَيُفْتَرَضُ عَلَى الْكُلِّ وَقِتَالُ الْكُفَّارِ وَاجِبٌ وَإِنْ لَمْ يَبْدُؤْا لِلْعُمُوْمَاتِ .

অনুবাদ : কিন্তু কেউ যদি তা পালন না করে তাহলে সকল মানুষ তা তরক করার কারণে গুনাহগার হবে। কেননা সকলেরই উপর তা ওয়াজিব। (জিহাদ ফরজে কিফায়া হওয়ার আরেকটি কারণ এই যে,) সকলে তাতে নিয়োজিত হওয়ার অর্থ হলো জিহাদের উপকরণ অশ্ব ও অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাওয়া। সুতরাং তা কিফায়া ভিত্তিক ওয়াজিব হবে। **তবে যদি ব্যাপকভাবে আহ্বান করা হয় তখন এটা ফরজে আইনের অন্তর্ভুক্ত হবে।** কেননা এ ধরনের পরিস্থিতির জন্য আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– তোমরা বের হয়ে পড় লঘু রণসম্ভার কিংবা গুরু রণসম্ভারসহ। (৯ : ৪১)

জামেউস সগীর কিতাবে ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেছেন, জিহাদ হলো ওয়াজিব তবে মুসলমানদের জন্য অবকাশ রয়েছে, যতক্ষণ না তাদের প্রয়োজন দেখা দেয়। তাঁর বক্তব্যের প্রথমাংশ ফরজে কিফায়া হওয়ার ইঙ্গিতবাহী এবং শেষাংশ ব্যাপক আহ্বানের ইঙ্গিতবাহী। কেননা ব্যাপক প্রয়োজনের সময় সকলের অংশগ্রহণ ছাড়া উদ্দেশ্য হাসিল হবে না। সুতরাং সকলের উপর তা ফরজ হবে। **যেহেতু আয়াত ও হাদীস নিঃশর্ত ও সাধারণ, সেহেতু কাফেররা সূচনা না করলেও (প্রয়োজন হওয়া মাত্র) তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা ফরজ।**

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শাব্দিক অর্থ : الكراع গোড়ালির উপরস্থ পায়ের গিটের নিম্নাংশ, পায়ের গোছার সরু অংশ, এখানে ঘোড়া বা বাহন অর্থে ব্যবহার হয়েছে। السِّلَاحُ শব্দটি একবচন, এর বহুবচন سُلْحَان ,سُلُح ,أَسْلِحَة অর্থ– অস্ত্র, হাতিয়ার।

قوله : وَلِأَنَّ فِىْ اِشْتِغَالِ الْكُلِّ بِهِ : উক্ত বক্তব্য দ্বারা গ্রন্থকার জিহাদ কিফায়া হিসেবে ফরজ হওয়ার একটি কারণ উল্লেখ করেছেন। জিহাদে সকলে নিয়োজিত হলে জীবন-জীবিকা নির্বাহ করা মানুষের জন্য কঠিন বা অসম্ভব হয়ে যাবে। সুতরাং কিছু মানুষের জন্য জরুরি জিহাদে নিয়োজিত হওয়া, আর অবশিষ্টদের উচিত হলো জীবিকা নির্বাহের জিনিসপত্র, চাষাবাদ, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং যুদ্ধের সরঞ্জামাদি সরবরাহ করা। ফলে যুদ্ধের সরঞ্জামাদির সংকট হওয়ার আশঙ্কাও থাকবে না। এসব বিষয়াবলির প্রতি লক্ষ্য করে শরিয়ত ফরজে কিফায়া হিসেবে জিহাদের বিধানকে প্রবর্তন করেছে।

قوله : إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ النَّفِيْرُ : উক্ত বাক্যাংশ পূর্বের বাক্য فَيَجِبُ عَلَى الْكِفَايَةِ -এর হুকুম থেকে ব্যতিক্রম। তথা যখন ব্যাপকভাবে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করা হয় তখন সকলের জন্য যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা ফরজে আইন হয়ে পড়ে। তাই দাস

https://e-ilm.weebly.com/

তার মনিবের অনুমতি ছাড়া, স্ত্রী তার স্বামীর অনুমতি ছাড়াই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে। চাই আহ্বায়ক ন্যায়পরায়ণ হোক কিংবা ফাসেক হোক। আয়াতে خفافا وثقالا দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, যুবক হোক কিংবা বৃদ্ধ হোক, দরিদ্র হোক কিংবা ধনী হোক, সুস্থ হোক কিংবা অসুস্থ হোক, পদব্রজে হোক কিংবা সাওয়ারিতে হোক, সকলে রণক্ষেত্রে বেরিয়ে পড়বে; অনুরূপভাবে পার্শ্ববর্তী এলাকাবাসীর উপর ফরজে কিফায়া হিসেবে যুদ্ধে শরিক হওয়া জরুরি। কোনো দেশবাসী যদি প্রতিরোধ করতে অক্ষম হয়ে পড়ে তাহলে পর্যায়ক্রমে সারা মুসলিম বিশ্বের উপর ঐ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে সহযোগিতা করা ফরজ হয়ে যাবে। (ফাতহুল কাদীর)

وقوله : وَقِتَالُ الْكُفَّارِ وَاجِبٌ وَاِنْ لَمْ يَبْدَؤُا : ইসলামের শাশ্বত বিধান মতে জিহাদের পূর্বে সর্বপ্রথম কাফেরদেরকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান করা হবে। এতে অস্বীকার করলে মুসলিম রাষ্ট্রের নিকট জিযিয়া (কর) প্রদান করার আহ্বান করা হবে। এরপরও যদি এ বিধান মেনে নিতে অপারগতা প্রকাশ করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা হবে। যদিও কাফেররা যুদ্ধের সূচনা না করে তারপরও সর্বাগ্রে মুসলমানরা যুদ্ধের সূচনা করবে। অনুরূপভাবে আশহুরে হারামেও যুদ্ধ করা বৈধ। গ্রন্থকার বলেন, এর কারণ হলো কুরআনের আয়াতসমূহ এবং হাদীসের ভাষ্যবলি নিঃশর্ত হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। এতে কোনো শর্ত যুক্ত করা হয়নি। যেমন–

فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْ تُمُوْهُمْ (التوبه-٥)

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَاتَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهُ لِلّٰهِ (انفال -٣٩)

الجهادُ مَاضٍ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (الحديث)

أُمِرْتُ اَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ - (الحديث)

অর্থ : "কাফেরদের যেথায় পাও সেথায় হত্যা কর।" "ফিতনা-ফ্যাসাদ নির্মূল হয়ে পূর্ণভাবে আল্লাহর দীন জমিনে প্রতিষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ কর।" "জিহাদ কেয়ামত পর্যন্ত কার্যকর বিধান।" "রাসূল ﷺ বলেছেন, মানুষ কালেমা তাওহীদ না বলা পর্যন্ত আমি যুদ্ধ করার আদিষ্ট হয়েছি।" এসব আয়াত ও হাদীস শর্তমুক্ত হওয়ার কারণে মুসলমানদের থেকে যুদ্ধ সূচনা হতে পারে। এ বিধানই স্থির সাব্যস্ত হয় এসব দলিল-প্রমাণের আলোকে। এদিকে ইঙ্গিত করেছেন গ্রন্থকার لِلْعُمُوْمَاتِ শব্দটি প্রয়োগ করে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَلَا يَجِبُ الْجِهَادُ عَلَى الصَّبِيِّ لِاَنَّ الصَّبِيَّ مَظِنَّةُ الْمَرْحَمَةِ وَلَا عَبْدٍ وَلَا امْرَاَةٍ لِتَقَدُّمِ حَقِّ الْمَوْلٰى وَالزَّوْجِ وَلَا اَعْمٰى وَلَا مُقْعَدٍ وَلَا اَقْطَعَ لِعَجْزِهِمْ، فَاِنْ هَجَمَ الْعَدُوُّ عَلٰى بَلَدٍ وَجَبَ عَلٰى جَمِيْعِ النَّاسِ الدَّفْعُ تَخْرُجُ الْمَرْاَةُ بِغَيْرِ اِذْنِ زَوْجِهَا وَالْعَبْدُ بِغَيْرِ اِذْنِ الْمَوْلٰى لِاَنَّهُ صَارَ فَرْضَ عَيْنٍ، وَمِلْكُ الْيَمِيْنِ وَرِقُّ النِّكَاحِ لَا يَظْهَرُ فِيْ حَقِّ فُرُوْضِ الْاَعْيَانِ كَمَا فِي الصَّلٰوةِ وَالصَّوْمِ، بِخِلَافِ مَا قَبْلَ النَّفِيْرِ؛ لِاَنَّ بِغَيْرِهِمَا مَقْنَعًا فَلَا ضَرُوْرَةَ اِلَى ابْطَالِ حَقِّ الْمَوْلٰى وَالزَّوْجِ. وَيُكْرَهُ الْجُعْلُ مَا دَامَ لِلْمُسْلِمِيْنَ فَيْءٌ لِاَنَّهُ يُشْبِهُ الْاَجْرَ، وَلَا ضَرُوْرَةَ اِلَيْهِ؛ لِاَنَّ مَالَ بَيْتِ الْمَالِ مُعَدٌّ لِنَوَائِبِ الْمُسْلِمِيْنَ. فَاِذَا لَمْ يَكُنْ فَلَا بَاْسَ بِاَنْ يُقَوِّيَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا لِاَنَّ فِيْهِ دَفْعَ الضَّرَرِ الْاَعْلٰى بِالْحَاقِ الْاَدْنٰى، يُؤَيِّدُهُ ﴿اَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اَخَذَ دُرُوْعًا مِنْ صَفْوَانَ﴾ وَعُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ كَانَ يُغْزِي الْاَعْزَبَ عَنْ ذِي الْحَلِيْلَةِ، وَيُعْطِي الشَّاخِصَ فَرَسَ الْقَاعِدِ .

অনুবাদ : অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকদের উপর জিহাদ ফরজ নয়। কেননা বালকরা হলো দয়ার পাত্র। দাস ও স্ত্রীলোকদের উপরও ফরজ নয়। কেননা মনিব ও স্বামীর হক অগ্রবর্তী। **অন্ধ, প্রতিবন্ধী ও কর্তিত অঙ্গ ব্যক্তির উপরও জিহাদ ফরজ নয়। কেননা তারা অক্ষম। কিন্তু শত্রু পক্ষ যদি কোনো শহরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তখন সকলের উপর প্রতিরোধ ওয়াজিব হয়ে যাবে। স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ছাড়া এবং দাস মনিবের অনুমতি ছাড়াই বের হয়ে পড়বে।** কেননা তখন তা ফরজে আইন হয়ে পড়েছে। আর ফরজে আইনের মোকাবিলায় দাসত্ব বন্ধন ও বিবাহ বন্ধন বিবেচিত হবে না। যেমন– সালাত ও সিয়ামের (নামাজ ও রোজার) ক্ষেত্রে। ব্যাপক প্রয়োজনের পূর্ববর্তী অবস্থাটি ভিন্ন। কেননা দাস ও স্ত্রীলোক ছাড়াও প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। সুতরাং মনিব ও স্বামীর হক বাতিল করার প্রয়োজন নেই।

মুজাহিদদের দেওয়ার জন্য লোকদের নিকট থেকে যুদ্ধকর নির্ধারণ করা মাকরূহ যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানদের (বায়তুলমালে) ফাই (যুদ্ধবিহীন প্রাপ্ত সম্পদ) এর মাল থাকে। কেননা এটা পারিশ্রমিকের সদৃশ। আর তার প্রয়োজন নেই। কেননা বায়তুল মাল তো মুসলমানদের যাবতীয় দুর্যোগ মোকাবিলা করার জন্যই।

যদি তা না থাকে তাহলে একে অপরকে শক্তি যোগানো দূষণীয় নয়। কেননা এত বড় ক্ষতি রোধ করার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষতি গ্রহণ করা হলো। এ সিদ্ধান্তের সমার্থক এই যে, রাসূল ﷺ সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া থেকে কিছু সংখ্যক বর্ম নিয়েছিলেন। এবং হযরত ওমর (রা) বিবাহিত ব্যক্তির পক্ষ থেকে (তার খরচে) অবিবাহিত যুবককে যুদ্ধে পাঠাতেন এবং ঘরে বসে থাকা ব্যক্তির ঘোড়া যুদ্ধে গমনকারীকে (সাময়িকভাবে) দান করতেন।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ كَمَا فِى الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ : গ্রন্থকার (র.) نفير عام তথা ব্যাপক আহ্বানকালে জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায় এ হুকুমকে সুস্পষ্ট করার জন্য জিহাদকে ঐ অবস্থায় নামাজ ও রোজার সঙ্গে তুলনা করেছেন। অর্থাৎ নামাজ রোজার ক্ষেত্রে যেমন স্ত্রী ও দাসকে স্বামী ও মনিবের নিকট অনুমতি গ্রহণ করতে হয় না তেমনি ব্যাপক আহ্বানকালে অনুমতি গ্রহণের প্রয়োজন নেই। এমনকি বাধা দিলেও তার বাধা উপেক্ষা করে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে হবে। কেননা ফরজে আইনের মোকাবিলায় দাসত্ব বন্ধন এবং বিবাহ বন্ধনের অধিকার বিবেচিত হবে না।

قَوْلُهُ : وَيُكْرَهُ الْجُعْلُ : جُعْلٌ বলা হয় যে সম্পদকে কর্মের বিনিময় হিসেবে কর্মচারীকে প্রদান করা হয়। তথা পারিশ্রমিক। এখানে উদ্দেশ্য হলো : ইমাম কর্তৃক মানুষের নিকট থেকে যুদ্ধ কর হিসেবে গৃহীত সম্পদ যা যোদ্ধাদের মাঝে বণ্টন করা হয় যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য।

জিহাদ যেহেতু হক্কুল্লাহর অন্তর্ভুক্ত তাই এধরনের ইবাদতের ক্ষেত্রে সরাসরি পারিশ্রমিক গ্রহণ করা হারাম। আর جعل তথা যুদ্ধ কর যদিও পারিশ্রমিক না তারপরও পারিশ্রমিকের সাথে তা সাদৃশ্য। তাই এ ধরনের আদান-প্রদান করা মাকরূহ। আর মাকরূহ একটি হারামের শাখা। সুতরাং যতটুকু সম্ভব এ ধরনের লেনদেন থেকে বিরত থাকা উচিত। বায়তুলমালে সঞ্চিত মালেফাই (তথা যুদ্ধবিহীন প্রাপ্ত সম্পদ) দ্বারা মুসলমানদের যাবতীয় দুর্যোগ মোকাবিলা করা হয়। যুদ্ধও একটি কঠিন মুহূর্ত মুসলমানদের জন্য। তাই মুজাহিদদের শক্তিশালী করার জন্য বায়তুলমাল থেকে এর ব্যয় বহন করা হবে। হ্যাঁ, বায়তুলমাল যদি অর্থ সঙ্কুলানে ব্যর্থ হয় তাহলে মুজাহিদদেরকে শক্তিশালী করার জন্য যুদ্ধ কর গ্রহণ করা যেতে পারে। কেননা কুফরের মতো বড় ক্ষতি প্রতিহত/প্রতিরোধ করার জন্য জাতীয় স্বার্থে বিশেষ মুহূর্তে যুদ্ধ কর -এর মতো ছোট ক্ষতি গ্রহণ করা যায়। এতে কোনো আপত্তি নেই।

قَوْلُهُ : يُرِيْدُ اَنَّ النَّبِىَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَخَذَ : এ বাক্য দ্বারা গ্রন্থকার (র.) পূর্বের সিদ্ধান্ত তথা ইমাম কর্তৃক যুদ্ধ কর নির্ধারণ বা যুদ্ধের জন্য যাবতীয় কার্যকলাপে ইমামের হস্তক্ষেপ করার বৈধতার সপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ রাসূল ﷺ -এর কর্ম সংক্রান্ত হাদীসটি বর্ণনা করছেন, উক্ত হাদীসটি ইমাম আবূ দাউদ ও ইমাম নাসায়ী (র.) তাঁর সুনান কিতাবে হযরত সাফওয়ান (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে হযরত ওমর (রা.)-এর কার্যকলাপকে সমার্থক যুক্তি হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ كَيْفِيَّةِ الْقِتَالِ

وَاِذَا دَخَلَ الْمُسْلِمُوْنَ دَارَ الْحَرْبِ فَحَاصَرُوْا مَدِيْنَةً اَوْ حِصْنًا دَعَوْهُمْ اِلَى الْاِسْلَامِ لِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا " ﴿اَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ مَا قَاتَلَ قَوْمًا حَتّٰى دَعَاهُمْ اِلَى الْاِسْلَامِ﴾ قَالَ فَاِنْ اَجَابُوْا كَفُّوْا عَنْ قِتَالِهِمْ لِحُصُوْلِ الْمَقْصُوْدِ، وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ﴾ اَلْحَدِيْثَ . وَاِنْ اِمْتَنَعُوْا دَعَوْهُمْ اِلٰى اَدَاءِ الْجِزْيَةِ بِهٖ اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اُمَرَاءَ الْجُيُوْشِ، وَلِاَنَّهٗ اَحَدُ مَا يَنْتَهِيْ بِهِ الْقِتَالُ عَلٰى مَا نَطَقَ بِهِ النَّصُّ، وَهٰذَا فِيْ حَقِّ مَنْ تُقْبَلُ مِنْهُ الْجِزْيَةُ، وَمَنْ لَا تُقْبَلُ مِنْهُ كَالْمُرْتَدِّيْنَ وَعَبَدَةِ الْاَوْثَانِ مِنَ الْعَرَبِ لَا فَائِدَةَ فِيْ دُعَائِهِمْ اِلٰى قَبُوْلِ الْجِزْيَةِ لِاَنَّهٗ لَا يُقْبَلُ مِنْهُمْ اِلَّا الْاِسْلَامُ، قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى ﴿تُقَاتِلُوْنَهُمْ اَوْ يُسْلِمُوْنَ﴾ فَاِنْ بَذَلُوْهَا فَلَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِيْنَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ لِقَوْلِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : اِنَّمَا بَذَلُوا الْجِزْيَةَ لِيَكُوْنَ دِمَاؤُهُمْ كَدِمَائِنَا وَاَمْوَالُهُمْ كَاَمْوَالِنَا، وَالْمُرَادُ بِالْبَذْلِ الْقَبُوْلُ وَكَذَا الْمُرَادُ بِالْاِعْطَاءِ الْمَذْكُوْرِ فِيْهِ فِي الْقُرْاٰنِ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ ـ

পরিচ্ছেদ : জিহাদ ও লড়াইয়ের পদ্ধতি

অনুবাদ : **মুসলিম বাহিনী যখন দারুল হরবে প্রবেশ করে কোনো শহর বা দুর্গ অবরোধ করবে তখন তাদের ইসলামের প্রতি আহ্বান করবে।** কেননা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম ﷺ ইসলামের প্রতি দাওয়াত না দিয়ে কোনো সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করেননি। **যদি তারা দাওয়াতে সাড়া দেয় তাহলে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই থেকে বিরত থাকবে।** কেননা উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে গেছে। আর নবী করীম ﷺ বলেছেন– اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা পর্যন্ত লোকদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি।

আর যদি তারা সাড়া দানে বিরত থাকে তাহলে তাদেরকে জিজিয়া কর প্রদানের আহ্বান জানাবে। প্রেরিত বিভিন্ন বাহিনীর অধিনায়কদের রাসূল ﷺ এমনই আদেশ করেছেন। তাছাড়া আয়াতের ভাষ্য অনুযায়ী জিজিয়া হচ্ছে লড়াই থেকে বিরত থাকার পন্থাসমূহের অন্যতম। উক্ত বিধান তাদের বেলায়, যাদের থেকে জিজিয়া গ্রহণের বিধান রয়েছে। পক্ষান্তরে মুরতাদ ও আরব মূর্তিপূজক যাদের থেকে জিজিয়া গ্রহণের বিধান নেই তাদের থেকে জিজিয়া গ্রহণের আহ্বান করাতে কোনো ফায়দা নেই। কেননা তাদের থেকে তো ইসলাম ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করা হবে না। আল্লাহ বলেছেন– تُقَاتِلُوْنَهُمْ اَوْ يُسْلِمُوْنَ তারা ইসলাম গ্রহণ করবে অথবা তাদের বিরুদ্ধে তোমরা লড়াই করবে।

https://e-ilm.weebly.com/

যদি তারা জিজিয়া দিতে সম্মত হয় তাহলে মুসলমানদের যাবতীয় সুবিধা তাদের জন্য হবে এবং মুসলমানদের উপর আরোপিত যাবতীয় দায়ভার তাদের উপর হবে। কেননা হযরত আলী (রা.) বলেছেন, তারা জিজিয়া এজন্যই ব্যয় করেছে যে, তাদের রক্ত আমাদের রক্তের মতোই নিরাপদ হয়ে যায় এবং তাদের সম্পদ আমাদের সম্পদের মতোই নিরাপদ হয়ে যায়। মতনে যে (بذل) 'বায্‌ল' শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে এবং কুরআনে এ সম্পর্কে যে ই'তা (اعطاء) শব্দের উল্লেখ রয়েছে এ উভয়টির দ্বারা 'জিজিয়া প্রদান' করা উদ্দেশ্য। আল্লাহই অধিক অবগত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

فَإِنْ أَجَابُوْا كَفُّوْا عَنْ قِتَالِهِمْ : উক্ত ইবারত দ্বারা মুসান্নেফ (র.) কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকার প্রথম পন্থা তুলে ধরেছেন যে, তারা যদি ইসলামের আহ্বান প্রত্যাখ্যান না করে ইসলামের ডাকে সাড়া দেয় তাহলে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা থেকে বিরত থাকতে হবে। কেননা যুদ্ধের উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর দীনকে কাফের রাষ্ট্রে বিজয়ী বেশে প্রতিষ্ঠিত করা আর এ উদ্দেশ্য ইসলাম গ্রহণের দ্বারা পূর্ণভাবে সাধিত হয়েছে। সুতরাং তাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কোনো প্রয়োজন নেই। গ্রন্থকার (র.) তাঁর উক্ত সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ রাসূল ﷺ -এর হাদীস (বাণী) উদ্ধৃতি করছেন "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ উচ্চারণ করা পর্যন্ত লোকদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি" উক্ত হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র.) তাঁদের সহীহাইন কিতাবদ্বয়ে সাহাবী হযরত আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন– হাদীসের শেষাংশে আছে "তারা যদি ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তারা মুসলমানের ন্যায় জান-মাল ও ইজ্জতের নিরাপত্তার অধিকার পাবে এবং ইসলামের দণ্ড বিধান তাদের উপর প্রয়োগ করা হবে"।

قوله : فَإِنْ بَذَلُوْا الْجِزْيَةَ الخ : উক্ত ইবারত দ্বারা গ্রন্থকার (র.) কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই থেকে বিরত থাকার দ্বিতীয় পন্থা বর্ণনা করেছেন "যদি তারা ইসলাম গ্রহণের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে তাহলে দ্বিতীয় পর্যায়ে তাদেরকে জিজিয়া প্রদানের আহ্বান জানানো হবে।" যদি তারা জিজিয়া দিতে সম্মত হয় তাহলে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই থেকে বিরত থাকা হবে; কারণ এর দ্বারাও اعلاء كلمة الله তথা আল্লাহর দীনের বড়ত্ব, মহত্ত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পায়। সুতরাং এ উদ্দেশ্য দ্বিতীয় পর্যায়ে সাধিত হচ্ছে। ইসলামি রাষ্ট্রে জিজিয়া প্রদান করে ইসলামের অধীনস্থ হয়ে জীবনযাপন করতে সম্মত হওয়ার কারণে তারাও মুসলমানদের মতো যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবে এবং যাবতীয় দায়ভার তারাও বহন করবে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَلَا يَجُوْزُ اَنْ يُقَاتِلَ مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ اِلَى الْاِسْلَامِ اِلَّا اَنْ يَدْعُوَهُ لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ فِيْ وَصِيَّةِ اُمَرَاءِ الْاَجْنَادِ ﴿فَادْعُهُمْ اِلٰى شَهَادَةِ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ﴾ وَلِاَنَّهُمْ بِالدَّعْوَةِ يَعْلَمُوْنَ اَنَّا نُقَاتِلُهُمْ عَلَى الدِّيْنِ لَا عَلٰى سَلْبِ الْاَمْوَالِ وَسَبْيِ الذَّرَارِيِّ فَلَعَلَّهُمْ يُجِيْبُوْنَ فَنُكْفٰى مُؤْنَةَ الْقِتَالِ، وَلَوْ قَاتَلَهُمْ قَبْلَ الدَّعْوَةِ اَثِمَ لِلنَّهْيِ، وَلَا غَرَامَةَ لِعَدَمِ الْعَاصِمِ وَهُوَ الدِّيْنُ اَوِ الْاِحْرَازُ بِالدَّارِ فَصَارَ كَقَتْلِ النِّسْوَانِ وَالصِّبْيَانِ وَيُسْتَحَبُّ اَنْ يَدْعُوَ مَنْ بَلَغَتْهُ الدَّعْوَةُ مُبَالَغَةً فِي الْاِنْذَارِ، وَلَا يَجِبُ ذٰلِكَ لِاَنَّهٗ صَحَّ ﴿اَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اَغَارَ عَلٰى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّوْنَ﴾ . ﴿وَعَهِدَ اِلٰى اُسَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنْ يُغِيْرَ عَلٰى اُبْنٰى صَبَاحًا ثُمَّ يُحَرِّقَ﴾ وَالْغَارَةُ لَا تَكُوْنُ بِدَعْوَةٍ . قَالَ فَاِنْ اَبَوْا ذٰلِكَ اسْتَعَانُوْا بِاللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَحَارَبُوْهُمْ لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ فِيْ حَدِيْثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ ﴿فَاِنْ اَبَوْا ذٰلِكَ فَادْعُهُمْ اِلٰى اِعْطَاءِ الْجِزْيَةِ. اِلٰى اَنْ قَالَ: فَاِنْ اَبَوْهَا فَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَقَاتِلْهُمْ﴾ وَلِاَنَّهٗ تَعَالٰى هُوَ النَّاصِرُ لِاَوْلِيَائِهٖ وَالْمُدَمِّرُ عَلٰى اَعْدَائِهٖ فَيُسْتَعَانُ بِهٖ فِيْ كُلِّ الْاُمُوْرِ . قَالَ وَنَصَبُوْا عَلَيْهِمُ الْمَجَانِيْقَ كَمَا نَصَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى الطَّائِفِ وَحَرَّقُوْهُمْ لِاَنَّهٗ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اَحْرَقَ الْبُوَيْرَةَ .

অনুবাদ : যাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছেনি, তাদের ইসলামের দাওয়াত দেওয়া ছাড়া লড়াই শুরু করা জায়েজ নেই। কেননা বিভিন্ন বাহিনীর অধিনায়কদের উপদেশ প্রদানকালে নবী করীম ﷺ বলেছেন "তখন আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এ সাক্ষ্য প্রদানের দাওয়াত দাও।" তাছাড়া ইসলামের দাওয়াত প্রদানের মাধ্যমেই তারা জানতে পারবে যে, দীনের বিষয়ে আমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছি। সম্পদ লুণ্ঠন ও পরিবার-পরিজনকে দাস বানানোর উদ্দেশ্য নয়। তাতে হয়তো তারা দাওয়াতে সাড়া দিবে। আর আমরাও লড়াইয়ের পরিশ্রম থেকে বেঁচে যাবো।

যদি দাওয়াতের পূর্বেই তাদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করে তাহলে নিষেধাজ্ঞা থাকার কারণে গুনাহগার হবে। তবে কোনো ক্ষতিপূরণ আসবে না। কেননা প্রাণ রক্ষাকারী বিষয়টি এখানে অনুপস্থিত। আর তা হলো দীন গ্রহণ কিংবা ইসলামি রাষ্ট্রে আশ্রয় গ্রহণ। সুতরাং অমুসলিম নারী বা শিশুদের হত্যার মতো হলো।

আর যাদের কাছে ইতঃপূর্বে দাওয়াত পৌঁছেছে, তাদেরও দাওয়াত দেওয়া মুস্তাহাব। অতিরিক্ত সতর্কীকরণ হিসেবে: তবে তা ওয়াজিব নয়। কেননা বিশুদ্ধ বর্ণনায় প্রমাণিত যে, নবী করীম ﷺ অসতর্ক অবস্থায় বনী মুস্তালিকের উপর হামলা করেছিলেন এবং উসামা (রা) কে দায়িত্ব দিয়েছিলেন উবনা বস্তিতে খুব জোরে হামলা চালানোর এবং বস্তি জ্বালিয়ে দেওয়ার জন্য। আর অসতর্ক হানা দাওয়াত দিয়ে হয় না।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, **যদি তারা প্রত্যাখ্যান করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ সাহায্য প্রার্থনা করবে এবং লড়াইয়ে অবতীর্ণ হবে।** কেননা সোলায়মান ইবনে বুরায়দা (রা.) সম্পর্কিত হাদীসে নবী করীম ﷺ

https://e-ilm.weebly.com/

বলেছেন, যদি তারা দাওয়াত অস্বীকার করে তাহলে তাদের জিজিয়া প্রদানের আহ্বান জানাও। এরপর তিনি বলেছেন, যদি তারা তা প্রত্যাখ্যান করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা কর এবং তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর।

আর যেহেতু আল্লাহই তাঁর প্রিয় বান্দাদের সাহায্যকারী এবং তাঁর শত্রুদের ধ্বংসকারী। সুতরাং সকল বিষয়ে তাঁরই সাহায্য প্রার্থনা করা কর্তব্য। **আর তাদের বিরুদ্ধে মিনজানিক (কামান) মোতায়ন করবে।** যেমন নবী করীম ﷺ তায়েফের বিরুদ্ধে কামান মোতায়েন করেছিলেন। **আর তাদের বিরুদ্ধে জ্বালাও পোড়াও চালাবে।** কেননা নবী করীম ﷺ বোয়াইরা অঞ্চল প্রয়োজনে জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَقَوْلُهُ وَلَوْ قَاتَلَهُمْ قَبْلَ الدَّعْوَةِ اَثِمَ لِلنَّهْيِ : উক্ত ইবারত দ্বারা গ্রন্থকার (র.) ইসলামের প্রতি আহ্বান করা ছাড়া লড়াইয়ের হুকুম বর্ণনা করছেন। যে সব অঞ্চলে ইসলামের দাওয়াত এখনো পৌঁছেনি সেসব এলাকায় ইসলামের দাওয়াত না দিয়ে লড়াই শুরু করা যাবে না। কেননা রাসূল ﷺ এভাবে লড়াই করতে নিষেধ করেছেন। হযরত আলী (রা) বর্ণনা করেন কোনো এক যুদ্ধে রাসূল ﷺ আমাকে প্রেরণের সময় বলেছিলেন– لَا تُقَاتِلْ قَوْمًا حَتّٰى تَدْعُوَهُمْ তুমি কোনো সম্প্রদায়ের সাথে লড়াই কর না তাদেরকে ইসলামে আহ্বান করা ব্যতীত। হাদীসটি ইমাম আব্দুর রায্যাক তার গ্রন্থ মুসান্নাফে উল্লেখ করেছেন। রাসূল ﷺ -এর এই নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে যদি কেউ লড়াইয়ে লিপ্ত হয় তাহলে সে গুনাহগার হবে। তবে وَلَا غَرَامَةَ لِعَدَمِ الْعَاصِمِ তথা শত্রু পক্ষের নিহতদের ক্ষতিপূরণ কিংবা জরিমানা দিতে হবে না।

মুসান্নেফ (গ্রন্থকার) (র.) এই হুকুমের কারণ বর্ণনা করেছেন তার বাক্যাংশ لِعَدَمِ الْعَاصِمِ দিয়ে অর্থাৎ কাফেরদের জান, মাল, রক্ষাকারী নিরাপত্তা তাদের ছিল না। কারণ এই নিরাপত্তা অধিকার তারাই ভোগ করবে যারা দীনে-ইসলাম গ্রহণ করেছে কিংবা জিজিয়া দিয়ে ইসলামি রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়ার সুযোগ লাভ করেছে। আর এই দুটি বিষয় কেবল প্রাণ রক্ষক হতে পারে সুতরাং তাদের এই বিষয়টি অনুপস্থিত হওয়ার কারণে তাদের হত্যার জরিমানা ধার্য হবে না। এটি হানাফী মাযহাবের বিধান। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.) এর বিপরীত মত পোষণ করেছেন। তাঁর মতে রাসূল ﷺ -এর নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘিত হওয়ায় হত্যাবস্তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে– যেহেতু ইসলাম পূর্ব ঘোষণা ব্যতীত কারো কোনো প্রকার ক্ষতির কামনা করে না। সুতরাং এ ক্ষতির খেসারত মুসলমানদের দিতে হবে। মুসান্নেফ (র.)-এর উত্তরে পূর্বে আলোচিত দুটি কারণ (ইসলাম বা কর প্রদান) বলেছেন যা এই কাফেরদের ক্ষেত্রে বিদ্যমান নেই। উপরন্তু গ্রন্থকার উক্ত সিদ্ধান্তের দৃষ্টান্ত স্বরূপ আরেকটি মাসআলার হুকুম বর্ণনা করে বলেন, বিষয়টি যেন যুদ্ধ ক্ষেত্রে শিশু ও নারী হত্যার মতো। কারণ সর্বসম্মতিক্রমে এই বিষয়ে মুসলমানদের উপর দিয়ত ওয়াজিব হয় না। যদিও রাসূল ﷺ যুদ্ধ ক্ষেত্রে, শিশু-নারীকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। হ্যাঁ, ইচ্ছাকৃত এরূপ করলে গুনাহ হবে। আর অসতর্কতা বা যুদ্ধের ময়দান বিশৃঙ্খলার কারণে শিশু বা নারী হত্যা হলে এতে যোদ্ধার হস্তক্ষেপ না থাকায় সে গুনাহ থেকে মুক্ত থাকবে।

وَقَوْلُهُ نَصَبُوْا عَلَيْهِمُ الْمَجَانِيْقَ : বাক্যে مَجَانِيْق শব্দটি مَنْجَنِيْقٌ শব্দের বহুবচন। অর্থ : পাথর নিক্ষেপ করার যন্ত্র, কামান। রাসূল ﷺ তায়েফ যুদ্ধে শত্রুপক্ষকে পরাস্ত করার জন্য কামান স্থাপন করেছিলেন। এ হাদীসের উপর ভিত্তি করে ফুকাহায়ে কেরাম বলেন, শত্রুবাহিনীকে পরাস্ত করার জন্য বর্তমান আধুনিক অস্ত্রপাতি ব্যবহার করা যাবে। কারণ যুদ্ধের উদ্দেশ্য হলো শত্রুপক্ষকে যে কোনোভাবে পরাস্ত করে আল্লাহর দীনের বড়ত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করা।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ وَاَرْسَلُوْا عَلَيْهِمُ الْمَاءَ وَقَطَعُوْا اَشْجَارَهُمْ وَافْسَدُوْا زُرُوْعَهُمْ لِاَنَّ فِىْ جَمِيْعِ ذٰلِكَ اِلْحَاقَ الْكَبْتِ وَالْغَيْظِ بِهِمْ وَكَسْرَ شَوْكَتِهِمْ وَتَفْرِيْقَ جَمْعِهِمْ فَيَكُوْنُ مَشْرُوْعًا، وَلَا بَاْسَ بِرَمْيِهِمْ، وَاِنْ كَانَ فِيْهِمْ مُسْلِمٌ اَسِيْرٌ اَوْ تَاجِرٌ لِاَنَّ فِي الرَّمْيِ دَفْعَ الضَّرَرِ الْعَامِّ بِالذَّبِّ عَنْ بَيْضَةِ الْاِسْلَامِ، وَقَتْلُ الْاَسِيْرِ وَالتَّاجِرِ ضَرَرٌ خَاصٌّ، وَلِاَنَّهُ قَلَّمَا يَخْلُوْا حِصْنٌ عَنْ مُسْلِمٍ، فَلَوِ امْتَنَعَ بِاعْتِبَارِهِ لَانْسَدَّ بَابُهُ وَاِنْ تَتَرَّسُوْا بِصِبْيَانِ الْمُسْلِمِيْنَ اَوْ بِالْاُسَارٰى لَمْ يَكُفُّوْا عَنْ رَمْيِهِمْ لِمَا بَيَّنَّاهُ وَيَقْصِدُوْنَ بِالرَّمْيِ الْكُفَّارَ لِاَنَّهُ اِنْ تَعَذَّرَ التَّمْيِيْزُ فِعْلًا فَلَقَدْ اُمْكِنَ قَصْدًا، وَالطَّاعَةُ بِحَسَبِ الطَّاقَةِ، وَمَا اَصَابُوْهُ مِنْهُمْ لَا دِيَةَ عَلَيْهِمْ وَلَا كَفَّارَةَ لِاَنَّ الْجِهَادَ فَرْضٌ وَالْغَرَامَاتُ لَا تُقْرَنُ بِالْفُرُوْضِ . بِخِلَافِ حَالَةِ الْمَخْمَصَةِ لِاَنَّهُ لَا يُمْتَنَعُ مَخَافَةَ الضَّمَانِ لِمَا فِيْهِ مِنْ اِحْيَاءِ نَفْسِهِ . اَمَّا الْجِهَادُ فَمَبْنِيٌّ عَلٰى اِتْلَافِ النَّفْسِ فَيُمْتَنَعُ حِذَارَ الضَّمَانِ.

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, **(বাঁধ ভেঙ্গে বা অন্য উপায়ে) তাদের উপর পানি ছেড়ে দেবে এবং তাদের বৃক্ষ নিধন করবে এবং তাদের ফসল নষ্ট করবে।** কেননা এসব দ্বারা তাদের লাঞ্ছিত করা হয়। তাদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি করা হয়। তাদের প্রতিপত্তি ভেঙ্গে দেওয়া হয় এবং তাদের সংহতি বিচ্ছিন্ন করা হয়। সুতরাং তা বৈধ হবে।

তাদের মাঝে মুসলিম বন্দি বা ব্যবসায়ী থাকলেও তাদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করতে বাধা নেই। কেননা তীর বর্ষণে ইসলামের কেন্দ্র থেকে প্রতিরোধের মাধ্যমে বৃহৎ ক্ষতিরোধ করা হয়। পক্ষান্তরে মুসলিম বন্দী ও ব্যবসায়ী নিহত হওয়ায় সীমিত ক্ষতি। তাছাড়া খুব কম দুর্গই কিছু সংখ্যক মুসলমান থেকে খালি হয়। সুতরাং তা বিবেচনা করে যদি বিরত থাকতে হয় তাহলে তো জিহাদের দরজাই বন্ধ হয়ে যাবে।

যদি তারা মুসলিম বালকদের কিংবা বন্দিদের 'ঢাল' রূপে ব্যবহার করে তাহলে (আমাদের বর্ণিত কারণে) তাদের প্রতি তীর বর্ষণ থেকে বিরত থাকবে না। অবশ্য কাফিরদের প্রতি তীর বর্ষণের নিয়ত করবে। কেননা কার্যতঃ পার্থক্য করা অসম্ভব হলেও উদ্দেশ্যগতভাবে তা সম্ভব। আর আদেশ পালনের দায়িত্ব সাধ্য অনুযায়ী। আর ঐ মুসলমানদের যে কজন তাদের তীর বর্ষণের শিকার হবে তাদের দিয়ত মুজাহিদদের উপর ওয়াজিব হবে না। আর কাফফারাও ওয়াজিব হবে না। কেননা জিহাদ হলো ফরজ, আর ফরজ পালনের সাথে 'দণ্ড' যুক্ত হতে পারে না। জীবনাশঙ্কাপূর্ণ ক্ষুধার সময় অন্যের মাল গ্রহণের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা ক্ষতিপূরণের ভয়ে কেউ তা থেকে বিরত থাকে না। কারণ তাতে জীবন বাঁচানোর বিষয় রয়েছে। পক্ষান্তরে জিহাদের ভিত্তি হলো প্রাণনাশ করার উপর। সুতরাং ক্ষতিপূরণের ভয়ে তা থেকে বিরত থাকতে পারে।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قوله : وَمَا أَصَابُوْهُ مِنْهُمْ لَادِيَةَ عَلَيْهِمْ وَلَاكَفَّارَةَ الخ : উক্ত ইবারত দ্বারা মুসান্নেফ (র.) ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মাযহাব খণ্ডন করে আহনাফের মাযহাবকে উপস্থাপন করছেন। কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলাকালে তারা যদি কোনো মুসলিম শিশু বা বন্দিকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে তারপরও মুজাহিদের জন্য যুদ্ধ স্থগিত রাখার সুযোগ নেই বরং লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। তবে তীর বা গুলি ছাড়বার সময় কাফেরদের নিয়ত করতে হবে। যেহেতু প্রকৃতপক্ষে ঐ অবস্থায় মুসলমানদেরকে অক্ষত রেখে যুদ্ধ পরিচালনা করা সম্ভব নয়। সুতরাং নিয়তের মাধ্যমে পার্থক্য সৃষ্টি করে লড়াই করা ছাড়াতো আর কোনো উপায় নেই। তাদের প্রাণের প্রতি দয়া দেখিয়ে যদি জিহাদ বন্ধ করা হয় তাহলে তো বড় ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে মুজাহিদ দলকে। বিধায় এতটুকু ক্ষতিকে বিসর্জন দিয়ে বড় ক্ষতি রোধ করা জরুরি। সুতরাং যুদ্ধে মুসলমান শিশু বা বন্দি কিংবা ব্যবসায়ী যদি মুজাহিদের হাতে নিহত হয় তাহলে মুজাহিদের উপর দিয়ত কিংবা কাফফারা ওয়াজিব হবে না। উপরিউক্ত মতটি আহনাফ গ্রহণ করেছেন। আর ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে এটা প্রকৃতপক্ষে কতলে খাতা তথা ভুলক্রমে হত্যার শামিল হওয়ায় মুজাহিদের উপর দিয়ত কিংবা কাফফারা ওয়াজিব হবে। মুসান্নেফ (র.) ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর এই মতের জওয়াব لِاَنَّ الْجِهَادَ فَرْضٌ ইবারত দ্বারা দিয়েছেন যা আহনাফের মতের পক্ষে একটি বলিষ্ঠ যুক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ জিহাদ হলো ফরজ। আর ফরজ পালন করতে গিয়ে যদি মুজাহিদদের উপর দণ্ড বিধান চাপিয়ে দেওয়া হয় তাহলে ক্ষতিপূরণের ভয়ে সকলে জিহাদ থেকে বিরত থাকবে। এমতাবস্থায় জিহাদের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। অথচ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন- الْجِهَادُ مَاضٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ 'জিহাদ কেয়ামত পর্যন্ত কার্যকর বিধান।' সুতরাং কোনোক্রমেই মুজাহিদের উপর দিয়ত, কিসাস, কিংবা কাফ্ফারার মতো দণ্ড বিধান প্রয়োগ করা উচিত হবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ وَلَا بَأْسَ بِإِخْرَاجِ النِّسَاءِ وَالْمَصَاحِفِ مَعَ الْمُسْلِمِيْنَ إِذَا كَانُوْا عَسْكَرًا عَظِيْمًا يُؤْمَنُ عَلَيْهِ لِاَنَّ الْغَالِبَ هُوَ السَّلَامَةُ وَالْغَالِبُ كَالْمُتَحَقِّقِ وَيُكْرَهُ إِخْرَاجُ ذٰلِكَ فِيْ سَرِيَّةٍ لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهَا لِاَنَّ فِيْهِ تَعْرِيْضَهُنَّ عَلَى الضَّيَاعِ وَالْفَضِيْحَةِ وَتَعْرِيْضَ الْمَصَاحِفِ عَلَى الْاِسْتِخْفَافِ فَاِنَّهُمْ يَسْتَخِفُّوْنَ بِهَا مُغَايَظَةً لِلْمُسْلِمِيْنَ، وَهُوَ التَّاوِيْلُ الصَّحِيْحُ لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ ﴿لَا تُسَافِرُوْا بِالْقُرْآنِ فِيْ اَرْضِ الْعَدُوِّ﴾ وَلَوْ دَخَلَ مُسْلِمٌ اِلَيْهِمْ بِاَمَانٍ لَا بَأْسَ بِاَنْ يَحْمِلَ مَعَهُ الْمُصْحَفَ إِذَا كَانُوْا قَوْمًا يُوْفُوْنَ بِالْعَهْدِ لِاَنَّ الظَّاهِرَ عَدَمُ التَّعَرُّضِ، وَالْعَجَائِزُ يَخْرُجْنَ فِي الْعَسْكَرِ الْعَظِيْمِ لِاِقَامَةِ عَمَلٍ يَلِيْقُ بِهِنَّ كَالطَّبْخِ وَالسَّقْيِ وَالْمُدَاوَاةِ، فَاَمَّا الشَّوَابُّ فَقَرَارُهُنَّ فِي الْبُيُوْتِ اَدْفَعُ لِلْفِتْنَةِ، وَلَا يُبَاشِرْنَ الْقِتَالَ لِاَنَّهٗ يُسْتَدَلُّ بِهٖ عَلٰى ضَعْفِ الْمُسْلِمِيْنَ اِلَّا عِنْدَ الضَّرُوْرَةِ، وَلَا يُسْتَحَبُّ اِخْرَاجُهُنَّ لِلْمُبَاضَعَةِ وَالْخِدْمَةِ، فَاِنْ كَانُوْا لَا بُدَّ مُخْرِجِيْنَ فَبِالْاِمَاءِ دُوْنَ الْحَرَائِرِ وَلَا تُقَاتِلُ الْمَرْاَةُ اِلَّا بِاِذْنِ زَوْجِهَا وَلَا الْعَبْدُ اِلَّا بِاِذْنِ سَيِّدِهٖ لِمَا بَيَّنَّاهُ اِلَّا اَنْ يَهْجُمَ الْعَدُوُّ عَلٰى بَلَدٍ لِلضَّرُوْرَةِ.

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, **মুসলিম বাহিনীর সাথে নারীদেরকে এবং কুরআন শরীফ নিয়ে যাওয়ায় বাধা নেই যদি এমন বড় বাহিনী হয় যাতে নিরাপত্তার উপর নির্ভর করা যায়।** কেননা এক্ষেত্রে নিরাপত্তাই প্রবল, আর যা প্রবলতা সুনিশ্চিতের মতো। **কিন্তু নিরাপদ নয় এমন ক্ষুদ্র বাহিনী সাথে নিয়ে যাওয়া মাকরূহ।** কেননা এতে তাদের জান ও মান-সম্মান বিনষ্ট করার সম্মুখীন করা হয়, আর কুরআন শরীফকে অসম্মানের মুখে ফেলা হয়। কেননা মুসলমানদের প্রতি ক্রোধবশত তারা কুরআনের অবমাননা করে বসবে। আর এটাই হলো নবী করীম ﷺ -এর নিম্নোক্ত নিষেধ বাণীর সঠিক ব্যাখ্যা لَا تُسَافِرُوا بِالْقُرْآنِ فِي اَرْضِ الْعَدُوِّ (শত্রু ভূমিতে কুরআন নিয়ে সফর করো না)।

পক্ষান্তরে কোনো মুসলমান যদি নিরাপত্তা নিয়ে তাদের দেশে প্রবেশ করে এবং তারা যদি প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী হয় তাহলে কুরআন শরীফ বহন করায় কোনো দোষ নেই। কেননা এক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ না করাই স্বাভাবিক। বড় বাহিনীতে বয়স্ক নারীদের তাদের উপযোগী সেবা কর্মে অংশ নেওয়ার জন্য বের হওয়াতে বাধা নেই। যেমন– রান্না, পানি পান করানো এবং শুশ্রূষা প্রদান। পক্ষান্তরে যুবতীদের ক্ষেত্রে গৃহে অবস্থানই অধিক ফিতনা রোধক। আর বিনা প্রয়োজনে বয়স্কা নারীরাও প্রত্যক্ষ লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করবে না। কেননা এটা দ্বারা মুসলমানদের দুর্বলতা প্রমাণিত হবে। কিন্তু সহবাস ও খেদমতের উদ্দেশ্যে তাদের সাথে নেওয়া ভালো নয়। যদি এ কাজে নিতেই চায় তাহলে স্বাধীন নারীর পরিবর্তে দাসীদের নেওয়াই ভালো। **স্ত্রী তার স্বামীর অনুমতি ছাড়া এবং দাস তার মনিবের অনুমতি ছাড়া লড়াই করবে না।** এর কারণ আমরা পূর্বেই বর্ণনা করেছি। **তবে শত্রু যদি কোনো শহরের উপর চড়াও হয় প্রয়োজনের তাগিদে।**

https://e-ilm.weebly.com/

وَيَنْبَغِيْ لِلْمُسْلِمِيْنَ اَنْ لَا يَغْدِرُوْا وَلَا يَغْلُوْا وَلَا يُمَثِّلُوْا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ ﴿لَا تَغْلُوْا وَلَا تَغْدِرُوْا وَلَا تُمَثِّلُوْا﴾ وَالْغُلُوْلُ : السَّرِقَةُ مِنَ الْمَغْنَمِ، وَالْغَدْرُ : الْخِيَانَةُ وَنَقْضُ الْعَهْدِ، وَالْمُثْلَةُ الْمَرْوِيَّةُ فِيْ قِصَّةِ الْعُرَنِيِّيْنَ مَنْسُوْخَةٌ بِالنَّهْيِ الْمُتَأَخِّرِ هُوَ الْمَنْقُوْلُ ـ

অনুবাদ : মুসলমানদের উচিত তারা যেন বিশ্বাস ভঙ্গ না করে, গনিমতের মাল চুরি না করে এবং লাশ বিকৃত না করে। কেননা রাসূল ﷺ বলেছেন– لَا تَغْلُوْا وَلَا تَغْدِرُوْا وَلَا تُمَثِّلُوْا অর্থাৎ "তোমরা গনিমতের খেয়ানত করো না, বিশ্বাস ভঙ্গ করো না এবং লাশ বিকৃত করো না।" এর অর্থ হলো গনিমতের মাল চুরি করা আর হক খিয়ানত করা এবং চুক্তি ভঙ্গ করা। আর উপরিউক্ত ঘটনায় লাশ-বিকৃতের যে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে তা পরবর্তী নিষেধাজ্ঞা দ্বারা রহিত এরূপই বর্ণিত হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قِصَّةِ عُرَنِيِّيْنَ مَنْسُوْخَةٌ : উক্ত ইবারত দ্বারা মুসান্নেফ (র.) একটি উহ্য প্রশ্নের জওয়াব দিয়েছেন– যেন তাকে প্রশ্ন করা হলো হাদীসে (لا تمثلوا) শব্দটি অঙ্গ বিকৃত করাকে হারাম সাব্যস্ত করে অথচ হাদীসে উরানিয়্যীন (عرنيين) -এর ঘটনা দ্বারা বুঝা যায় (مثله) অঙ্গ বিকৃতিকরণ বৈধ আছে। কেননা সেই ঘটনায় রাসূল ﷺ مُثْلَة করেছেন। সুতরাং হাদীস দুটি পরস্পর দ্বন্দ্ব বিরোধ পরিলক্ষিত হওয়ায় এর দ্বারা مثلة (মুছলা) হারাম হওয়া বিষয়টি প্রমাণিত হয় না। মুসান্নেফ (র.) এর উত্তরে বলেছেন– عُرَنِيِّيْن -এর হাদীসটি ইসলামের প্রাথমিক যুগের যা পরবর্তীতে রহিত হয়ে গেছে। রহিত হওয়ার প্রমাণ হলো মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বাতে হযরত ইমরান (রা.) থেকে বর্ণিত আছে–

مَا قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يَعُدْ مَا مَثَّلَ الْأَرْكَانَ مُحِيْطًا عَلَى الصَّدَقَةِ وَيَنْهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ

অর্থ : 'রাসূল ﷺ সদকার উটের ক্ষেত্রে শাস্তি স্বরূপ যে অঙ্গ বিকৃত করেছেন তার আর কখনো পুনরাবৃত্তি করেননি। তিনি আমাদেরকে مثلة (অঙ্গ বিকৃতি) করতে নিষেধ করতেন।' উক্ত হাদীসে খুতবার মাঝে রাসূল ﷺ উক্ত ঘটনার পর বিশেষভাবে مثلة নিষিদ্ধকরণের বিষয়টি উল্লেখ করা সুস্পষ্ট থাকায় হাদীসে উরানিয়্যীন রহিত হওয়ার উপর প্রমাণ বহন করে। এতদসত্ত্বেও ইমাম বায়হাকী (র.) উক্ত ঘটনা উল্লেখ করার পর হযরত আনাস (রা.) থেকে একটি বর্ণনা দিয়েছেন–

مَا خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَعْدَ ذٰلِكَ اِلَّا نَهٰى فِيْهَا عَنِ الْمُثْلَةِ অর্থাৎ রাসূল ﷺ উক্ত ঘটনার পর যখন খুতবা দিতেন তখন মুছলা (বিকৃতিকরণ) থেকে নিষেধ করেছেন। সহীহাইনে উক্ত ঘটনার পর হযরত কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণনা আছে–

قَالَ فَحَدَّثَنِيْ اِبْنُ سِيْرِيْنَ اَنَّ ذٰلِكَ كَانَ قَبْلَ اَنْ تَنْزِلَ الْحُدُوْدُ ইবনে সীরীন (র.) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, উক্ত ঘটনাটি শাস্তি (حدود)-এর বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে। এসব বর্ণনা থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয় উক্ত ঘটনার বিষয়টি রহিত হয়েছে। এটি ইমাম আবূ হানীফা ও শাফেয়ী (র.)-এর মাযহাব।

https://e-ilm.weebly.com/

قَوْلُهُ قِصَّةُ الْعُرَنِيِّيْنَ : ইমাম বুখারী ও মুসলিম উক্ত হাদীসটি সাহাবী হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন–

اِنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَة قَدِمُوْا اِلى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَبَايَعُوْهُ عَلَى الاِسْلَامِ فَاسْتَوْخَمُوْا و سَقِمَتْ اَبْدَانُهُمْ فَشَكَوْا ذٰلِكَ اِلَيْهِ فَقَالَ اَلَا تَخْرُجُوْنَ مَعَ رَاعِيْنَا فَتَطَيَّبُوْنَ مِنْ اَبْوَالِ الاِبِلِ وَاَلْبَانِهَا قَالُوْا بَلٰى فَخَرَجُوْا فَصَحُّوْا ثُمَّ مَالُوْا اِلَى الرُّعَاةِ فَقَتَلُوْهُمْ وَارْتَدُّوْا وَاسْتَاقُوْا اِبِلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَبَلَغَهُ ذٰلِكَ فَبَعَثَ فِيْ اِثْرِهِمْ فَاتٰى بِهِمْ فَقُطِعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ وَسُمِلَ اَعْيُنُهُمْ وَتَرَكَهُمْ فِيْ الحَرَّةِ وَاَمَرَ بِمَسَامِيْرَ فَاُحْمِيَتْ ثُمَّ كُحِلَهُمْ بِهَا وَتَرَكَهُمْ بِالحَرَّةِ يَسْتَسْقُوْنَ فَلَايُسْقَوْنَ فِيْ آخِرِهِ قَالَ قَتَادَةُ فَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ سِيْرِيْنَ اَنَّ ذٰلِكَ قَبْلَ اَنْ يَنْزِلَ الحُدُوْدُ ـ

অর্থ : উরায়না গোত্র থেকে কিছু মানুষ (৮জন) মদিনায় রাসূল ﷺ -এর নিকট এসে ইসলাম গ্রহণ করল। মদিনার আবহাওয়া অনুকূল না হওয়ায় তাদের শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ল। এ বিষয়টি রাসূল ﷺ -কে জানানো হলে তিনি তাদেরকে রাখালদের সাথে পশু চারণ ভূমিতে গিয়ে উটের পেশাব ও দুধ দ্বারা চিকিৎসা করার কথা বললেন। তারা সেখানে গিয়ে তাই করল, ফলে তারা সুস্থ্য আরোগ্য হলো। এরপর তারা রাখালদের হত্যা করে এবং মুরতাদ হয়ে পশুগুলোকে হাকিয়ে নিয়ে চলল। এ সংবাদ রাসূল ﷺ -এর নিকট পৌঁছার পর রাসূল ﷺ তাদেরকে পাকড়াও করার জন্য তাদের পশ্চাতে একটি দল প্রেরণ করলেন। তারা তাদেরকে আটক করে আনলে তাদের হাত পা কেটে দেওয়া হয়, চক্ষু ফুটা করে দেওয়া হয় এবং উত্তপ্ত বালিতে তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয় এবং তিনি ﷺ লোহার সলাকা গরম করে তাদের চক্ষে লাগানোর নির্দেশ দেন এবং উত্তপ্ত বালুতে তাদেরকে নিক্ষেপ করা হয়। তারা পানি পান করতে চেয়েছে কিন্তু তাদের পানি দেওয়া হয়নি। হযরত কাতাদা (র.) বলেন, ইবনে সীরীন (র.) আমাকে বলেছেন, উক্ত ঘটনাটি حُدُوْد -এর বিধান নাজিলের পূর্বে হয়েছিল।

https://e-ilm.weebly.com/

وَلَا يَقْتُلُوا امْرَاةً وَلَا صَبِيًّا وَلَا شَيْخًا فَانِيًا وَلَا مُقْعَدًا وَلَا اَعْمٰى لِاَنَّ الْمُبِيْحَ لِلْقَتْلِ عِنْدَنَا هُوَ الْحِرَابُ وَلَا يَتَحَقَّقُ مِنْهُمْ، وَلِهٰذَا لَا يُقْتَلُ يَابِسُ الشِّقِّ وَالْمَقْطُوْعُ الْيُمْنٰى وَالْمَقْطُوْعُ يَدُهٗ وَرِجْلُهٗ مِنْ خِلَافٍ . وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ يُخَالِفُنَا فِى الشَّيْخِ الْفَانِيْ وَالْمُقْعَدِ وَالْاَعْمٰى لِاَنَّ الْمُبِيْحَ عِنْدَهُ الْكُفْرُ وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا بَيَّنَّا، وَقَدْ صَحَّ ﴿اَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ نَهٰى عَنْ قَتْلِ الصِّبْيَانِ وَالذَّرَارِيِّ﴾ " ﴿وَحِيْنَ رَاٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَاَةً مَقْتُوْلَةً قَالَ : هَاهْ. مَا كَانَتْ هٰذِهٖ تُقَاتِلُ فَلِمَ قُتِلَتْ؟﴾ قَالَ اِلَّا اَنْ يَكُوْنَ اَحَدُ هٰؤُلَاءِ مِمَّنْ لَهٗ رَاْىٌ فِى الْحَرْبِ اَوْ تَكُوْنَ الْمَرْاَةُ مَلِكَةً لِتَعَدِّيْ ضَرَرِهَا اِلَى الْعِبَادِ، وَكَذَا يُقْتَلُ مَنْ قَاتَلَ مِنْ هٰؤُلَاءِ دَفْعًا لِشَرِّهٖ، وَلِاَنَّ الْقِتَالَ مُبِيْحٌ حَقِيْقَةً

অনুবাদ : আর স্ত্রীলোক, বালক, অতিবৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী ও অন্ধকে হত্যা করবে না। কেননা আমাদের মতে হত্যার জন্য লড়াই হচ্ছে বৈধতা দানকারী। আর তাদের দ্বারা তো লড়াই হয় না। এ কারণেই একপাশ যাদের অবশ এবং যাদের ডান হাত কর্তিত এবং যাদের হাত ও পা বিপরীতভাবে কাটা, তাদের হত্যা করা যায় না।

অতিবৃদ্ধ, পঙ্গু ও অন্ধ সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ী (র.) আমাদের সাথে ভিন্নমত পোষণ করেন। কেননা তাঁর মতে কুফর হলো হত্যা বৈধতা দানকারী। আমরা যা বর্ণনা করেছি তা-ই হলো এর বিপক্ষে প্রমাণ। আর বিশুদ্ধ বর্ণনায় এসেছে যে, নবী করীম ﷺ বালক ও নারীদের হত্যা করতে নিষেধ করেছেন এবং একবার এক নিহত নারীকে দেখতে পেয়ে রাসূল ﷺ বলেছেন, আহা! এতো লড়াইকারী ছিল না, তাহলে কেন একে হত্যা করা হলো?

গ্রন্থকার (র.) বলেন, তবে এদের কেউ যদি যুদ্ধে বুদ্ধি ও পরামর্শদাতা হয়, কিংবা স্ত্রীলোক যদি অধিপতি হয় (এতে তাদেরকে হত্যা করা যাবে।) কেননা তার 'অনিষ্ট' অন্য লোকদের পর্যন্ত সংক্রমিত হয়। তদ্রূপ এদের কেউ যদি লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করে তাহলে তাদের অনিষ্ট রোধ করার জন্য তাদের হত্যা করা যাবে। তাছাড়া কারণ এই যে, তাদের পক্ষ থেকে লড়াই মূলত কতলকে বৈধতা দান করে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قوله : اِلَّا اَنْ يَكُوْنَ اَحَدُ هٰؤُلَاءِ مِمَّنْ لَهٗ رَاْىٌ فِى الْحَرْبِ الخ : উক্ত ইবারতটুকু ইমাম কুদূরী (র.) -এর. তিনি তার পূর্বের বাক্য وَلَا تَقْتُلُوْا اِمْرَأَةً الخ -এর হুকুমের ব্যতিক্রম হুকুম বর্ণনা করছেন। উভয় বাক্যের মাঝে হিদায়া গ্রন্থকার নিজে ব্যাখ্যা পেশ করেছেন। উক্ত ইবারতের মূল উদ্দেশ্য হলো- যেসব বালক, স্ত্রীলোক, বৃদ্ধ যুদ্ধে বুদ্ধি, পরামর্শদাতা হয় কিংবা স্ত্রীলোক অধিপতি হয়। মোটকথা তাদের অনিষ্ট যদি অন্য লোক পর্যন্ত সংক্রমিত হয় তাহলে তাকে হত্যা করা যাবে। হত্যা বৈধ হওয়ার মূল কারণ "লড়াইয়ে ভূমিকা রাখা।" আর এটা তাদের মধ্যে বিদ্যমান আছে। সুতরাং তাদের হত্যা করতে কোনো আপত্তি নেই।

https://e-ilm.weebly.com/

وَلَا يَقْتُلُ مَجْنُوْنًا لِاَنَّهُ غَيْرُ مُخَاطَبٍ اِلَّا اَنْ يُقَاتِلَ فَيُقْتَلُ دَفْعًا لِشَرِّهٖ، غَيْرَ اَنَّ الصَّبِيَّ وَالْمَجْنُوْنَ يُقْتَلَانِ مَا دَامَا يُقَاتِلَانِ، وَغَيْرُهُمَا لَا بَأْسَ بِقَتْلِهٖ بَعْدَ الْاَسْرِ لِاَنَّهُ مِنْ اَهْلِ الْعُقُوْبَةِ لِتَوَجُّهِ الْخِطَابِ نَحْوَهُ، وَاِنْ كَانَ يُجَنُّ وَيُفِيْقُ فَهُوَ فِيْ حَالِ اِفَاقَتِهٖ كَالصَّحِيْحِ

وَيُكْرَهُ اَنْ يَبْتَدِئَ الرَّجُلُ اَبَاهُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَيَقْتُلَهُ لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى ﴿وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا﴾ وَلِاَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ اِحْيَاؤُهُ بِالْاِنْفَاقِ فَيُنَاقِضُهُ الْاِطْلَاقُ فِيْ اِفْنَائِهٖ فَاِنْ اَدْرَكَهُ امْتَنَعَ عَلَيْهِ حَتّٰى يَقْتُلَهُ غَيْرُهُ لِاَنَّ الْمَقْصُوْدَ يَحْصُلُ بِغَيْرِهٖ مِنْ غَيْرِ اقْتِحَامِهِ الْمَأْثَمَ، وَاِنْ قَصَدَ الْاَبُ قَتْلَهُ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُهُ دَفْعُهُ اِلَّا بِقَتْلِهٖ لَا بَأْسَ بِهٖ؛ لِاَنَّ مَقْصُوْدَهُ الدَّفْعُ، اَلَا تَرٰى اَنَّهُ لَوْ شَهَرَ الْاَبُ الْمُسْلِمُ سَيْفَهُ عَلٰى اِبْنِهٖ وَلَا يُمْكِنُهُ دَفْعُهُ اِلَّا بِقَتْلِهٖ يَقْتُلُهُ لِمَا بَيَّنَّا فَهٰذَا اَوْلٰى -

---

অনুবাদ : আর কোনো পাগলকে হত্যা করবে না। কেননা সে শরিয়তের সম্বোধন পাত্র নয়। তবে সে যদি লড়াই করে তাহলে তার অনিষ্ট রোধ করার জন্য তাকে হত্যা করা হবে। অবশ্য বালক ও পাগলকে যতক্ষণ তারা লড়াইরত থাকে ততক্ষণ শুধু হত্যা করা যাবে। পক্ষান্তরে অন্যদের বন্দি করার পরেও হত্যা করতে বাধা নেই। কেননা (مكلف) শরিয়তের সম্বোধন তাদের অভিমুখী হওয়ার কারণে সে শাস্তির পাত্র।

যদি কখনো সুস্থ থাকে আবার কখনো মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে তাহলে সুস্থ অবস্থায় সে সুস্থ ব্যক্তির সমতুল্য। **মুশরিক পিতাকে নিজে অগ্রগামী হয়ে হত্যা করা মাকরূহ হবে।** কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– (وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا) দুনিয়ার জীবনে সদাচারণের সাথে তাদেরকে সঙ্গ দান কর।

তাছাড়া এজন্য যে, পুত্রের তো কর্তব্য হলো ভরণপোষণের মাধ্যমে পিতার জীবন রক্ষা করা। সুতরাং তার প্রাণ নাশের নিঃশর্ত অনুমতি প্রদান করা এর পরিপন্থি। **যদি সে তাকে সামনে পেয়ে যায় তাহলে নিজে এমনভাবে বাধাগ্রস্ত করবে, যাতে অন্য কেউ হত্যা করতে পারে।** কেননা নিজে গুনাহে লিপ্ত না হয়ে অন্যের দ্বারা উদ্দেশ্য হাসিল হতে পারে। আর পিতা যদি তাকে হত্যা করতে এমনভাবে উদ্যত হয় যে, হত্যা করা ছাড়া তাকে রোধ করা সম্ভব না হয়, তাহলে তাকে হত্যা করায় কোনো দোষ নেই। কেননা তার উদ্দেশ্য তো হলো আত্মরক্ষা করা। দেখুন না মুসলিম পিতা যদি পুত্রের বিরুদ্ধে তরবারি উত্তোলন করে আর হত্যা করা ছাড়া যদি তাকে প্রতিহত করা সম্ভব না হয়, তাহলে আমাদের বর্ণিত কারণে তাকে হত্যা করা বৈধ। সুতরাং এক্ষেত্রে তা আরো উত্তম।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ الْمُوَادَعَةِ وَمَنْ يَجُوْزُ اَمَانُهُ

وَاِذَا رَاٰى الْاِمَامُ اَنْ يُصَالِحَ اَهْلَ الْحَرْبِ اَوْ فَرِيْقًا مِنْهُمْ وَكَانَ فِىْ ذٰلِكَ مَصْلَحَةٌ لِلْمُسْلِمِيْنَ فَلَا بَاْسَ بِهٖ لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى ﴿وَاِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ﴾ ﴿وَوَادَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَهْلَ مَكَّةَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ عَلٰى اَنْ يَضَعَ الْحَرْبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ عَشْرَ سِنِيْنَ﴾، وَلِاَنَّ الْمُوَادَعَةَ جِهَادٌ مَعْنًى اِذَا كَانَ خَيْرًا لِلْمُسْلِمِيْنَ لِاَنَّ الْمَقْصُوْدَ وَهُوَ دَفْعُ الشَّرِّ حَاصِلٌ بِهٖ، وَلَا يُقْتَصَرُ الْحُكْمُ عَلَى الْمُدَّةِ الْمَرْوِيَّةِ لِتَعَدِّي الْمَعْنٰى اِلٰى مَا زَادَ عَلَيْهَا، بِخِلَافِ مَا اِذَا لَمْ يَكُنْ خَيْرًا؛ لِاَنَّهٗ تَرْكُ الْجِهَادِ صُوْرَةً وَمَعْنًى وَاِنْ صَالَحَهُمْ مُدَّةً ثُمَّ رَاٰى نَقْضَ الصُّلْحِ اَنْفَعَ نَبَذَ اِلَيْهِمُ الْاِمَامُ وَقَاتَلَهُمْ ﴿لِاَنَّهٗ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ نَبَذَ الْمُوَادَعَةَ الَّتِىْ كَانَتْ بَيْنَهٗ وَبَيْنَ اَهْلِ مَكَّةَ﴾، وَلِاَنَّ الْمَصْلَحَةَ لَمَّا تَبَدَّلَتْ كَانَ النَّبْذُ جِهَادًا وَاِيْفَاءُ الْعَهْدِ تَرْكُ الْجِهَادِ صُوْرَةً وَمَعْنًى، فَلَا بُدَّ مِنَ النَّبْذِ تَحَرُّزًا عَنِ الْغَدْرِ، وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ ﴿فِى الْعُهُوْدِ وَفَاءٌ لَا غَدْرٌ﴾

পরিচ্ছেদ : সন্ধিস্থাপন ও যাকে নিরাপত্তা দেওয়া যায়

অনুবাদ : শাসক যদি যুদ্ধ-লিপ্ত সম্প্রদায়ের সাথে কিংবা তাদের কোনো দলের সাথে সন্ধি করা সঙ্গত মনে করেন এবং এতে মুসলমানদের উপকার থাকে তাহলে সন্ধিতে কোনো দোষ নেই। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- وَاِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ যদি তারা সন্ধির প্রতি ঝুঁকে পড়ে তাহলে তুমিও সন্ধিতে এগিয়ে আস এবং আল্লাহর উপর ভরসা কর।

আর নবী করীম ﷺ হোদায়বিয়ার বছর এ শর্তে মক্কাবাসীদের সঙ্গে সন্ধি করেছিলেন যে, তাঁর ও তাদের মাঝে দশ বছর পর্যন্ত যুদ্ধ স্থগিত থাকবে। তা ছাড়া মুসলমানদের জন্য যদি কল্যাণকর হয় তাহলে সন্ধিও গুণগতভাবে জিহাদ। কেননা অনিষ্ট প্রতিরোধের উদ্দেশ্য তা দ্বারা অর্জিত হয়। আর হোদায়বিয়ার ঘটনায় বর্ণিত সময়ের সাথে বিধান বিশিষ্ট হবে না। কেননা অন্তর্গত উদ্দেশ্য অধিকতর সময়ের দিকে সম্প্রসারিত হতে পারে। পক্ষান্তরে যদি তা কল্যাণকর না হয় তাহলে ভিন্ন কথা। কেননা তাতে বাহ্যত ও গুণগত উভয় দিক থেকেই জিহাদ পরিত্যক্ত হয়ে যায়। **যদি একটি নির্ধারিত সময়ের জন্য তাদের সাথে সন্ধি করা হয় এরপর শাসক সন্ধি প্রত্যাহার করাকেই অধিকতর কল্যাণকর মনে করেন, তাহলে তাদের সন্ধি প্রত্যাখ্যানের খবর দিবেন এবং তাদের বিরুদ্ধে শাসক লড়াই শুরু করবেন।** কেননা নবী করীম ﷺ তাঁর ও মক্কাবাসীদের মাঝে সম্পন্ন সন্ধি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তাছাড়া এ কারণে যে, কল্যাণের দিকে যখন পরিবর্তিত হয়েছে তখন সন্ধি বর্জনই হবে জিহাদ। পক্ষান্তরে সন্ধি রক্ষা করা হবে বাহ্যত ও গুণগত উভয় দিকে থেকে জিহাদ বর্জন। সুতরাং চুক্তি ভঙ্গ পরিহার করার জন্য সন্ধি প্রত্যাখ্যান অবহিত করা জরুরি হবে। বিশেষত নবী করীম ﷺ যাবতীয় প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে বলেছেন وَفَاءٌ لَا غَدْرٌ (প্রতিশ্রুতি রক্ষা করো, ভঙ্গ করো না)।

https://e-ilm.weebly.com/

وَلَا بُدَّ مِنْ اِعْتِبَارِ مُدَّةٍ يَبْلُغُ فِيْهَا خَبَرُ النَّبْذِ اِلَى جَمْعِهِمْ، وَيَكْتَفِيْ فِيْ ذٰلِكَ بِمُضِيِّ مُدَّةٍ يَتَمَكَّنُ مَلِكُهُمْ بَعْدَ عِلْمِهٖ بِالنَّبْذِ مِنْ اِنْفَاذِ الْخَبَرِ اِلٰى اَطْرَافِ مَمْلَكَتِهٖ؛ لِاَنَّ بِذٰلِكَ يَنْتَفِي الْغَدْرُ .

অনুবাদ : আর এতটা সময়কাল বিবেচনা করা অপরিহার্য, যাতে তাদের প্রধান দলের কাছে সন্ধি বর্জনের খবর পৌঁছে যায়। এক্ষেত্রে এ পরিমাণ সময় অতিক্রান্ত হওয়া যথেষ্ট যাতে তাদের শাসক সন্ধি বর্জনের খবর অবগত হওয়ার পর তার রাজ্যের বিভিন্ন দিকে খবর পৌঁছে দিতে পারে। কেননা এর দ্বারা চুক্তি ভঙ্গের অভিযোগ আসবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قوله : تعالى وَاِنْ جَنَحُوْا الخ : কাফেরদের সাথে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার বৈধতা যে ইসলাম সমর্থিত এ বিষয়ে মুসান্নেফ (র.) প্রমাণ স্বরূপ উক্ত আয়াতে কারীমা দলিল হিসেবে পেশ করেছেন। তথা তারা যদি সন্ধি, সোলাহ করতে আগ্রহী হয় বা প্রস্তাব পেশ করে, তাহলে হে রাসূল! আপনি তাদের প্রস্তাব গ্রহণ করে সন্ধিতে আবদ্ধ হন। অর্থাৎ ইসলামের সাথে সন্ধিতে আবদ্ধ হতে কোনো আপত্তি নেই। উক্ত আয়াত সন্ধিচুক্তির বৈধতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট।

প্রশ্ন : যদি আপত্তি করা হয় যে, উক্ত আয়াতে কারীম আয়াতুল জিহাদ فَاقْتُلُوْا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوْهُمْ **"মুশরিক দলকে যেখানে পাও হত্যা কর" এর দ্বারা রহিত হয়ে গেছে।**

উত্তর : وَاِنْ جَنَحُوْا আয়াতের প্রেক্ষাপট বিচারে ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন, উক্ত আয়াত ঐ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যখন সন্ধি চুক্তি মুসলমানদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে/তাতে কোনো মহৎ কল্যাণ নিহিত থাকবে। উক্ত ব্যাখ্যাটি আরেকটি আয়াত দ্বারা প্রমাণিত (محمد ٣٥) فَلَا تَهِنُوْا وَتَدْعُوْا اِلَى السَّلْمِ وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ অর্থ : 'অতএব তোমরা হীনবল হয়ো না এবং সন্ধির আহ্বান জানিওনা, তোমরাই হবে প্রবল।' সুতরাং আয়াত দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হচ্ছে সন্ধিচুক্তির বিষয়টি ইসলামে এখনো বিদ্যমান এটি রহিত হয়নি। অপরদিকে আয়াতুল জিহাদের ব্যাখ্যা উলামায়ে কেরাম দু-ভাবে দিয়েছেন।

এক. যদি মেনে নেওয়া হয় আয়াতুল জিহাদ ও উপরিউক্ত সন্ধি-চুক্তি বৈধতার আয়াত সম্পন্ন বিপরীতমুখী অর্থ পরিলক্ষিত হচ্ছে। তাহলে আমরা এই সমস্যার সুরাহা রাসূল ﷺ -এর হুদায়বিয়ার ঘটনা থেকে পাই যে, রাসূল ﷺ মুসলমানদের কল্যাণ নিহিত থাকায় এরূপ সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছেন সুতরাং রাসূল ﷺ -এর উক্ত ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, আয়াতুল জিহাদ (জিহাদের নির্দেশমূলক আয়াতসমূহ) সন্ধির বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করেনি।

দুই. এর আরেকটি উত্তর এভাবে দেওয়া হয়, জিহাদের আয়াত যদি সন্ধির বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করে তাহলে আয়াতের হুকুমটি জাজিরাতুল আরব (আরব দ্বীপ) -এর জন্য প্রযোজ্য হবে। যেমন- জিজিয়া, কর এর বিধানে ঐ এলাকাবাসীর জন্য দ্বিতীয় কোনো পন্থার দ্বার খুলে দেওয়া হয়নি; বরং হয় ইসলাম গ্রহণ, না হয় হত্যা, তেমনি তাদের জন্য সন্ধি-চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে আরব ভূমিতে অবস্থান করারও সুযোগ নেই।

قوله : وَلَا يَقْتَصِرُ الْحُكْمُ عَلَى الْمُدَّةِ الْمَرْوِيَّةِ : হুদায়বিয়ার সন্ধি দশ বছরের জন্য হয়েছিল। হাদীসের উক্ত ঘটনার সময়কাল সন্ধি-চুক্তির জন্য জরুরি নয়। রাষ্ট্রনায়ক যদি কল্যাণকর বলে মনে করেন তাহলে সন্ধিচুক্তির সময়সীমা দশ থেকেও বেশি করতে পারেন। এবং কমও করতে পারেন। কেননা সময়সীমা নির্ধারণ করাটা নির্ভর করবে মুসলমানদের কল্যাণের উপর। আর এই কল্যাণের দাবি কম-বেশি হতে পারে। সুতরাং (تعدى المعنى) অনিষ্টরোধ করার কল্যাণ বেশি হতে পারে, বিধায় সন্ধি-চুক্তির সময়সীমা হুদায়বিয়ার সময়ের সাথে বিশিষ্ট নয়।

হুদায়বিয়ার সন্ধি : দীর্ঘ ছয় বছর যাবৎ মহানবী ﷺ মদিনায় অবস্থান করছিলেন। পবিত্র জিলকদ মাসে আরবদের প্রথানুযায়ী যুদ্ধ বিগ্রহ নিষিদ্ধ ছিল। তাই মহানবী ﷺ হজ্জব্রত পালনের জন্য ১৪০০ সাহাবীসহ মক্কা যাত্রা করেন। এদিকে কুরাইশরা খালিদ ও ইকরামার নেতৃত্বে মুসলমানদের প্রতিরোধ করার জন্য সৈন্যদল পাঠায়। রাসূল ﷺ ইহা অবগত হয়ে হুদায়বিয়া নামক স্থানে শিবির স্থাপন করেন। অতঃপর তিনি দূত মারফত কুরাইশদের নিকট স্বীয় অভিপ্রায় জানিয়ে দেন। কুরাইশরা সন্ধির জন্য হযরতের কাছে লোক প্রেরণ করে। কিন্তু উক্ত ব্যক্তির দুর্ব্যবহারে সন্ধি প্রস্তাব বানচাল হয়ে যায়।

https://e-ilm.weebly.com/

অতঃপর রাসূল ﷺ প্রথমে খোরাশ এবং পরে হযরত উসমান (রা.) -কে শান্তি প্রস্তাবসহ তাদের কাছে প্রেরণ করেন। হযরত উসমান (রা)-কে কুরাইশরা আটক করলে রাসূল ﷺ সাহাবীগণের নিকট থেকে যুদ্ধের বায়'আত গ্রহণ করেন যা "বায়'আতে রিজওয়ান" বা "বায়'আতুশ শাজারা" নামে পরিচিত। পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে কুরাইশরা হযরত উসমান (রা)-কে ছেড়ে এবং মহানবী (সা)-এর সাথে সন্ধি চুক্তি সম্পাদন করে। সন্ধির শর্তাবলি বাহ্যত কুরাইশদের পক্ষে থাকায় সাহাবায়ে কেরামকে তা মেনে নিতে কঠিন হয়েছিল যার ফলে তাদের আগাম সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য উক্ত সন্ধিকে 'ফাতহুম মুবীন' বলা হয়েছে। যে সন্ধি মক্কা বিজয়ের প্রধান ফটকের রূপ দান করেছিল। শর্তসমূহের অন্যতম একটি শর্তছিল আরবের যে কোনো গোত্র কুরাইশ বা হযরতের সাথে সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হতে পারবে। উক্ত শর্ত মোতাবেক মক্কার বনূ খোযা গোত্র মহানবী ﷺ -এর সাথে মিত্রতা এবং বনূ বকর গোত্র কুরাইশগণের সাথে যোগদান করে। দশবছর মেয়াদে উক্ত সন্ধি-চুক্তি সম্পাদন হয়েছিল।

সন্ধি-চুক্তি ভঙ্গ ও মক্কা বিজয় : বনূ খোযা ও বনূ বকর গোত্রদ্বয়ের মধ্যে পূর্ব থেকে শত্রুতা ছিল। কুরাইশগণ রাসূল ﷺ -এর সাথে বনূ খোযা গোত্রের মিত্রতাকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারল না। তাদের উস্কানিত বনূ বকরের লোকেরা সন্ধির দু'বছর পরে একরাতে খোযা গোত্রের পল্লীতে আক্রমণ করে তাদের অনেক নর-নারীকে হত্যা করে। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার সংবাদ রাসূল ﷺ -এর নিকট পৌঁছলে, রাসূল ﷺ দূত মারফত কুরাইশদের নিকট তিনটি প্রস্তাব পাঠান।

১. হত্যার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।
২. অথবা বনূ বকর গোত্রের সাথে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে।
৩. অথবা হুদায়বিয়ার সন্ধি বাতিল বলে গণ্য হবে।

কুরাইশরা তৃতীয় প্রস্তাবটি গ্রহণ করে। তখন মহানবী ﷺ বুঝতে পারলেন অনতিবিলম্বে তাদের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের বিকল্প নেই। এরপর গোপনে সমরায়োজন চলতে থাকে, এভাবে ৮ম হিজরিতে মক্কা বিজয় হয়। সীরাতের কিতাবে এ সম্পর্কে সবিস্তর আলোচনা রয়েছে।

وَفَاءٌ لَا غَدْرٌ : قَوْلُهُ : وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْعُهُوْدِ وَفَاءٌ لَا غَدْرٌ 'ইসলামে প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হয়, বিশ্বাস ঘাতকতা নেই।' গ্রন্থকারের বক্তব্যের ভঙ্গিমা থেকে বুঝে আসে উক্ত শব্দদ্বয় রাসূল ﷺ -এর মুখ নিসৃত। কিন্তু মুহাদ্দিসগণ তা অস্বীকার করে বলেন, হাদীসটি মাওকূফ তথা সাহাবীর বাণী। আবূ দাউদ, নাসায়ী ও তিরমিযীর বর্ণনা থেকে বুঝে আসে শব্দগুলো সাহাবী আমর ইবনে উতবা (রা)-এর কথার অন্তর্ভুক্ত। হাদীসটি ইমামত্রয় মুসলিম ইবনে আমর থেকে বর্ণনা করেন" একসময় রাষ্ট্র নায়ক হযরত মুয়াবিয়া (রা) ও রোম সম্রাটের মাঝে সন্ধি-চুক্তি ছিল। হযরত মুয়াবিয়া (রা) সেনাবাহিনী নিয়ে রোমের সীমান্তে অবস্থান করছিলেন এ উদ্দেশ্যে যে, যখন সন্ধিচুক্তির সময়সীমা উত্তীর্ণ হবে তখন তারা রোমবাসির উপর অতর্কিত হামলা করবে। এ সিদ্ধান্ত মোতাবেক তাদের উপর হামলা করার উদ্দেশ্যে কাছাকাছি স্থানে সৈন্য সমাবেশ ঘটান ঠিক তখন এক অশ্বারোহী এই বলে তাদের দিকে ছুটে এলেন—

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَفَاءٌ لَاغَدْرٌ 'আল্লাহ মহান! আল্লাহ মহান! প্রতিশ্রুতি পূরণ করা হবে। বিশ্বাসঘাতকতা নয়।' তখন তিনি ফিরে তাকিয়ে দেখন ঐ ঘোষক হলেন সাহাবী হযরত আমর ইবনে উতবা (রা.)। হযরত মুয়াবিয়া (রা) তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে সাহাবী হাদীস বর্ণনা করে শুনালেন—

فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ كَانَ بَيْنَه وبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلْيَشُدَّ عَقْدَه وَلَايَحُلُّهَا حَتّٰى يَنْقَضِيَ اَمَدُهَا اَوْ يَنْبِذَ اِلَيْهِمْ عَلٰى سَوَاءٍ فَرَجَعَ مُعَاوِيَةُ بِالنَّاسِ -

অর্থ : 'আমি রাসূল ﷺ -কে বলতে শুনেছি 'যার সাথে কোনো সম্প্রদায়ের সন্ধিচুক্তি আছে সে যেন তা রক্ষা করে এবং সময় সীমা অতিক্রান্ত হওয়া কিংবা তাদের কাছে খবর পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত ঐ চুক্তি ভঙ্গ না করে।' রাসূল ﷺ -এর বাণী শ্রবণের পর হযরত মুয়াবিয়া (রা) সেনাবাহিনীকে নিয়ে ফিরে আসলেন।— (ফতহুল কাদীর)

উক্ত ঘটনা থেকে বুঝে আসে وَفَاءٌ لَا غَدْرٌ অংশটি সাহাবী হযরত আমর ইবনে উতবা (রা.) -এর সর্তকবাণী।' যা দ্বারা তিনি হযরত আমীরে মোয়াবিয়া (রা) ও তাঁর সেনাবাহিনীকে দ্রুত সতর্ককরণ দ্বারা বিশ্বাসঘাতকতা থেকে রক্ষা করেছেন। তার কথাটি তার পরবর্তী বর্ণিত হাদীসের মূল বক্তব্য। সময়ের সংক্ষেপ এবং বিষয়টি জটিল হওয়ার কারণে তিনি ঐ মুহূর্তে হাদীস বর্ণনা না করে হাদীসের মূলবক্তব্য দ্বারা সর্তক করেছেন এটি ছিল অবস্থার দাবি। তাই যখন তারা যুদ্ধ থেকে বিরত হলেন তখন তিনি হাদীসটি শুনিয়ে ছিলেন যে, চুক্তির সময়সীমা উত্তীর্ণ হওয়ার পরও তাদের কাছে বিষয়টির সংবাদ না পৌঁছা পর্যন্ত এবং সকলে সজাগ না হওয়া পর্যন্ত আক্রমণ করা বৈধ হবে না। কেননা চুক্তির সময়সীমা এবং তদসংলগ্ন সময়টিও সন্ধির অন্তর্ভুক্ত।' যা অমান্য করা বিশ্বাসঘাতকতার নামান্তর। তাই হযরত মুয়াবিয়া (রা.) তাঁর দল নিয়ে ফিরে এসেছিলেন।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ وَاِنْ بَدَءُوْا بِخِيَانَةٍ قَاتَلَهُمْ وَلَمْ يَنْبِذْ اِلَيْهِمْ اِذَا كَانَ ذٰلِكَ بِاتِّفَاقِهِمْ لِاَنَّهُمْ صَارُوْا نَاقِضِيْنَ لِلْعَهْدِ فَلَا حَاجَةَ اِلَى نَقْضِهِ بِخِلَافِ مَا اِذَا دَخَلَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ فَقَطَعُوا الطَّرِيْقَ وَلَا مَنَعَةَ لَهُمْ حَيْثُ لَا يَكُوْنُ هٰذَا نَقْضًا لِلْعَهْدِ، وَلَوْ كَانَتْ لَهُمْ مَنَعَةٌ وَقَاتَلُوْا الْمُسْلِمِيْنَ عَلَانِيَةً يَكُوْنُ نَقْضًا لِلْعَهْدِ فِيْ حَقِّهِمْ دُوْنَ غَيْرِهِمْ؛ لِاَنَّهُ بِغَيْرِ اِذْنِ مَلِكِهِمْ فَفِعْلُهُمْ لَا يُلْزِمُ غَيْرَهُمْ حَتّٰى لَوْ كَانَ بِاِذْنِ مَلِكِهِمْ صَارُوْا نَاقِضِيْنَ لِلْعَهْدِ لِاَنَّهُ بِاتِّفَاقِهِمْ مَعْنًى . وَاِذَا رَاَى الْاِمَامُ مُوَادَعَةَ اَهْلِ الْحَرْبِ وَاَنْ يَاْخُذَ عَلٰى ذٰلِكَ مَالًا فَلَا بَاْسَ بِهِ لِاَنَّهُ لَمَّا جَازَتْ الْمُوَادَعَةُ بِغَيْرِ الْمَالِ فَكَذَا بِالْمَالِ، لٰكِنْ هٰذَا اِذَا كَانَ بِالْمُسْلِمِيْنَ حَاجَةٌ، اَمَّا اِذَا لَمْ تَكُنْ لَا يَجُوْزُ لِمَا بَيَّنَّا مِنْ قَبْلُ، وَالْمَاْخُوْذُ مِنَ الْمَالِ يُصْرَفُ مَصَارِفَ الْجِزْيَةِ، هٰذَا اِذَا لَمْ يَنْزِلُوْا بِسَاحَتِهِمْ بَلْ اَرْسَلُوْا رَسُوْلًا؛ لِاَنَّهُ فِيْ مَعْنَى الْجِزْيَةِ، اَمَّا اِذَا اَحَاطَ الْجَيْشُ بِهِمْ ثُمَّ اَخَذُوْا الْمَالَ فَهُوَ غَنِيْمَةٌ يُخَمِّسُهَا وَيُقَسِّمُ الْبَاقِيَ بَيْنَهُمْ لِاَنَّهُ مَاْخُوْذٌ بِالْقَهْرِ مَعْنًى ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, **"যদি তারাই বিশ্বাস ভঙ্গ করে বসে এবং তা তাদের মূল নেতৃত্বের সম্মতিক্রমে হয়, তাহলে শাসক সন্ধি প্রত্যাখ্যানের ঘোষণা ছাড়াই তাদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করবেন।"** কেননা তারাই চুক্তি ভঙ্গকারী হয়েছে। সুতরাং আমাদের তা ভঙ্গ করার প্রয়োজন নেই।" পক্ষান্তরে যদি তাদের বিছিন্ন কোনো দল অনুপ্রবেশ করে রাহাজানি করে এবং তাদের পর্যাপ্ত শক্তিবল না থাকে তাহলে এটাকে চুক্তি ভঙ্গ ধরা হবে না। আর যদি তাদের শক্তিবল পর্যাপ্ত থাকে এবং তারা প্রকাশ্যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লিপ্ত হয় তাহলে তাদের ক্ষেত্রে চুক্তি ভঙ্গ সাব্যস্ত হবে। কিন্তু অন্যদের ক্ষেত্রে নয়। কেননা এটা তাদের শাসকের বিনা অনুমতিতে হয়েছে। সুতরাং তাদের পদক্ষেপের দায় অন্যদের উপর আরোপিত হবে না। অবশ্য এটা যদি তাদের শাসকের সম্মতিতে ঘটে থাকে তাহলে সমগ্র সম্প্রদায় চুক্তি ভঙ্গকারী হবে। কেননা গুণগতভাবে এটা তাদের সবার সম্মতিক্রমেই ঘটেছে।

শাসক যদি যুদ্ধরত সম্প্রদায়ের সাথে আর্থিক সুবিধা গ্রহণপূর্বক সন্ধি করা কল্যাণকর মনে করেন তাহলে এতে কোনো দোষ নেই। কেননা অর্থ ছাড়া সন্ধি করা জায়েজ রয়েছে। তবে অর্থের বিনিময়েও জায়েজ হবে। তবে এটা তখনই জায়েজ হবে যখন মুসলমানদের অর্থের প্রয়োজন থাকে। কিন্তু যদি প্রয়োজন না থাকে তবে তা জায়েজ নয়। কারণ ইতঃপূর্বে আমরা বর্ণনা করেছি (যে, উদ্দেশ্য হলো– আল্লাহর দীনকে বুলন্দ করা, সম্পদ লাভ করা নয়।)

আর গৃহীত অর্থ জিজিয়ার খাতে ব্যয় করা হবে। অবশ্য এটা তখন যখন তারা যুদ্ধের মাঠে অবতীর্ণ না হয়ে দূত মারফত অর্থ প্রেরণ করে। কেননা এটা জিজিয়ার সমার্থক। পক্ষান্তরে যদি মুসলিমবাহিনী তাদের ঘিরে ফেলে অতঃপর অর্থ গ্রহণ পূর্বক সন্ধি করে তাহলে তা গনিমতের মাল হবে এবং পঞ্চমাংশ (বায়তুলমালের জন্য) রেখে অবশিষ্ট মুজাহিদদের মাঝে বণ্টন করা হবে। কেননা গুণগতভাবে এটা বলপূর্বক লব্ধ মাল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قوله : لما بينا من قبل : উক্ত ভাষ্য দ্বারা গ্রন্থকার কোন কথার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন তার প্রধানত দুটি অভিমত পাওয়া যায়।

এক. উক্ত ইবারত দ্বারা لانه ترك الجهاد صورة ومعنى এটা দৃশ্যত ও প্রকৃতপক্ষে জিহাদ তরক করা হচ্ছে এ কথার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। দৃশ্যত বিরত থাকা তো স্পষ্ট আর গুণগত বিরত থাকার কারণ হলো মুসলমানদের প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও অর্থ গ্রহণ করে জিহাদ থেকে বিরত থাকাতে কোনো কল্যাণ নিহিত নেই বিধায় প্রকৃত অর্থে এতে জিহাদের কোনো অর্থই পাওয়া যায় না।

দুই. এর দ্বারা গ্রন্থকার পূর্বের পরিচ্ছেদে جُعْل তথা পারিশ্রমিক গ্রহণের আলোচনাকে বুঝিয়েছেন। কাফেরদের থেকে অর্থ গ্রহণ করে এই অর্থের বিনিময়ে জিহাদ পরিত্যাগ করা এটি جُعْل পারিশ্রমিকতার অর্থ পাওয়া যাওয়ায় এটা জায়েজ হবে না। তবে এখানে প্রথম অভিমতটি বেশি গ্রহণযোগ্য।

https://e-ilm.weebly.com/

وَاَمَّا الْمُرْتَدُّوْنَ فَيُوَادِعُهُمُ الْاِمَامُ حَتّٰى يَنْظُرَ فِيْ اَمْرِهِمْ لِاَنَّ الْاِسْلَامَ مَرْجُوٌّ مِنْهُمْ فَجَازَ تَاْخِيْرُ قِتَالِهِمْ طَمَعًا فِيْ اِسْلَامِهِمْ وَلَا يَاْخُذُ عَلَيْهِ مَالًا لِاَنَّهُ لَا يَجُوْزُ اَخْذُ الْجِزْيَةِ مِنْهُمْ لِمَا نُبَيِّنُ وَلَوْ اَخَذَهُ لَمْ يَرُدَّهُ لِاَنَّهُ مَالٌ غَيْرُ مَعْصُوْمٍ وَلَوْ حَاصَرَ الْعَدُوُّ الْمُسْلِمِيْنَ وَطَلَبُوْا الْمُوَادَعَةَ عَلٰى مَالٍ يَدْفَعُهُ الْمُسْلِمُوْنَ اِلَيْهِمْ لَا يَفْعَلُهُ الْاِمَامُ لِمَا فِيْهِ مِنْ اِعْطَاءِ الدَّنِيَّةِ وَاِلْحَاقِ الْمَذَلَّةِ بِاَهْلِ الْاِسْلَامِ اِلَّا اِذَا خَافَ الْهَلَاكَ، لِاَنَّ دَفْعَ الْهَلَاكِ وَاجِبٌ بِاَىِّ طَرِيْقٍ يُمْكِنُ وَلَا يَنْبَغِي اَنْ يُبَاعَ السِّلَاحُ مِنْ اَهْلِ الْحَرْبِ وَلَا يُجَهَّزُ اِلَيْهِمْ لِاَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ نَهٰى عَنْ بَيْعِ السِّلَاحِ مِنْ اَهْلِ الْحَرْبِ وَحَمْلِهِ اِلَيْهِمْ، وَلِاَنَّ فِيْهِ تَقْوِيَتَهُمْ عَلٰى قِتَالِ الْمُسْلِمِيْنَ فَيُمْنَعُ مِنْ ذٰلِكَ وَكَذَا الْكُرَاعُ لِمَا بَيَّنَّا، وَكَذَا الْحَدِيْدُ لِاَنَّهُ اَصْلُ السِّلَاحِ، وَكَذَا بَعْدَ الْمُوَادَعَةِ؛ لِاَنَّهَا عَلٰى شَرَفِ النَّقْضِ اَوِ الْاِنْقِضَاءِ فَكَانُوْا حَرْبًا عَلَيْنَا، وَهٰذَا هُوَ الْقِيَاسُ فِى الطَّعَامِ وَالثَّوْبِ، اِلَّا اَنَّا عَرَفْنَاهُ بِالنَّصِّ ﴿فَاِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اَمَرَ ثُمَامَةَ اَنْ يَمِيْرَ اَهْلَ مَكَّةَ وَهُمْ حَرْبٌ عَلَيْهِمْ -

---

অনুবাদ : আর মুরতাদদের সঙ্গে শাসক তাদেরকে নিজেদের বিষয়ে চিন্তাভাবনা করার সময় পর্যন্ত সন্ধি করতে পারেন। কেননা শাসক তাদের পুনঃ ইসলাম গ্রহণ প্রত্যাশিত। সুতরাং তাদের ইসলাম গ্রহণের আশায় তাদের বিরুদ্ধে লড়াই বিলম্বিত করা বৈধ। তবে এর বিনিময়ে অর্থ গ্রহণ করবে না। কেননা তাদের থেকে জিজিয়া গ্রহণ করা প্রয়োজন নয়। এর কারণ আমরা (জিজিয়া অধ্যায়ে) বর্ণনা করব। আর যদি অর্থ গ্রহণ করে ফেলে তবে তা ফেরত দেওয়া হবে না। কেননা এ সম্পদ নিরাপত্তাগুণ রহিত।

আর যদি শত্রুবাহিনী মুসলমানদের অবরোধ করে এবং মুসলমানগণ তাদের পক্ষ থেকে অর্থ পরিশোধ করার শর্তে সন্ধি দাবি করে তাহলে শাসক তা করবে না। কেননা এটা হলো মুক্তিপণ প্রদান এবং মুসলিম উম্মাহকে লাঞ্ছিত করণের নামান্তর। অবশ্য ধ্বংস হওয়ার আশঙ্কা হলে ভিন্ন কথা। কেননা সম্ভাব্য যে কোনো উপায়ে ধ্বংস রোধ করা অপরিহার্য।

হরবী কাফেরদের কাছে অস্ত্র বিক্রি করা উচিত নয় এবং তাদের দিকে যেন যুদ্ধ সামগ্রী নিয়ে যাওয়া না হয়। কেননা নবী করীম ﷺ হরবী কাফেরদের কাছে অস্ত্র বিক্রি করতে এবং তাদের কাছে অস্ত্র নিয়ে যেতে নিষেধ করেছেন। তাছাড়া এই কারণে যে, এতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তাদের শক্তি যোগানো হয়। সুতরাং তা নিষেধ করা হবে।

আমাদের বর্ণিত একই কারণে ঘোড়া সম্পর্কেও একই হুকুম। তদ্রূপ লৌহ। কেননা তা হলো অস্ত্রের মূল উপাদান। সন্ধির পরও তা একইভাবে নিষিদ্ধ হবে। কেননা সন্ধি তো ভঙ্গ হওয়ার কিংবা সময় উত্তীর্ণ হওয়ার সম্মুখীন। সুতরাং তারা আমাদের ক্ষতি করতে পারে।

খাদ্যবস্ত্র সম্পর্কে একই হুকুম, এটাই হলো কিয়াসের দাবি। তবে এর বৈধতা আমরা হাদীসের মাধ্যমে অবগত হয়েছি। কেননা নবী করীম ﷺ হযরত ছুমামাহ (রা.)-কে মক্কাবাসীদের খাদ্য সরবরাহের আদেশ করেছিলেন অথচ তারা নবী করীম ﷺ -এর বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ছিল। (সুতরাং খাদ্যবস্ত্র আটক রাখা বৈধ হবে না তবে কঠিন মুহূর্তে তাদেরকে পরাস্ত করার জন্য বৈধ হবে)।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قوله : لِاَنَّهُ مَالٌ غَيْرُ مَعْصُوْمٍ الخ : মুরতাদরা যদি সন্ধি করতে চায় এবং তাদের পক্ষ থেকে পুনরায় ইসলাম গ্রহণের আশা করা যায় তাহলে শাসক তাদের সঙ্গে তাদেরকে নিজেদের বিষয়ে চিন্তাভাবনা করার পর্যন্ত সন্ধি করতে পারেন। তাদের পক্ষ থেকে পুনঃ ইসলাম গ্রহণ প্রত্যাশিত হওয়ায় তাদের বিরুদ্ধে লড়াই বিলম্ব করা হবে। তবে তাদের থেকে অর্থ গ্রহণ করা হবে না। কেননা তারা জিজিয়া প্রদান করত নিরাপত্তার সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারবে না। তাদের ব্যাপারে ইসলাম দুটি হুকুম প্রবর্তন করেছে। হয় ইসলাম গ্রহণ না হয় হত্যা। তৃতীয় কোনো পন্থা রাখেনি। যদি রাষ্ট্রপ্রধান তাদের থেকে সম্পদ গ্রহণ করে তাহলে পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণের পর তাদেরকে ঐ সম্পদ ফেরত দেওয়া হবে না। ইসলাম ত্যাগের কারণে তাদের সম্পদ নিরাপত্তা অধিকার গুণশূন্য হয়ে পড়েছে। তাইতো ঐ সময় যদি মুসলমানরা তাদের উপর বিজয়ী হয়ে তাদের সম্পদ হস্তগত করত তাহলে তা যেমন মুসলমানদের মালিকানা সাব্যস্ত হতো বা ফেরত দিতে হতো না তেমনি রাষ্ট্রনায়ক কর্তৃক গৃহীত সম্পদ আর ফেরত দেওয়া হবে না। পক্ষান্তরে রাষ্ট্রনায়ক যদি রাষ্ট্রদ্রোহীদের থেকে সম্পদ গ্রহণ করে তাহলে যুদ্ধের পর তা আবার ফিরিয়ে দেওয়া হবে। কেননা তা মালে ফাইয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে যুদ্ধ চলাকালীন ফেরত দেওয়া হবে না। কারণ এতে আরও অবাধ্যতা বেড়ে যেতে পারে।− (বিনায়া)

https://e-ilm.weebly.com/

فَصْلٌ : إِذَا أَمَّنَ رَجُلٌ حُرٌّ أَوْ اِمْرَأَةٌ حُرَّةٌ كَافِرًا أَوْ جَمَاعَةً أَوْ أَهْلَ حِصْنٍ أَوْ مَدِينَةٍ صَحَّ أَمَانُهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ قِتَالُهُمْ وَالْأَصْلُ فِيْهِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ «الْمُسْلِمُوْنَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَيَسْعٰى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ» أَيْ أَقَلُّهُمْ وَهُوَ الْوَاحِدُ وَلِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْقِتَالِ فَيَخَافُوْنَهُ إِذْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْمَنَعَةِ فَيَتَحَقَّقُ الْأَمَانُ مِنْهُ لِمُلَاقَاتِهِ مَحَلَّهُ ثُمَّ يَتَعَدّٰى إِلٰى غَيْرِهِ، وَلِأَنَّ سَبَبَهُ لَا يَتَجَزَّأُ وَهُوَ الْإِيْمَانُ، وَكَذَا الْأَمَانُ لَا يَتَجَزَّأُ فَيَتَكَامَلُ كَوِلَايَةِ الْإِنْكَاحِ . قَالَ إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ فِيْ ذٰلِكَ مَفْسَدَةٌ. فَيُنْبَذُ إِلَيْهِمْ كَمَا إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ بِنَفْسِهِ ثُمَّ رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِي النَّبْذِ وَقَدْ بَيَّنَّاهُ. وَلَوْ حَاصَرَ الْإِمَامُ حِصْنًا وَأَمَّنَ وَاحِدٌ مِنَ الْجَيْشِ وَفِيْهِ مَفْسَدَةٌ يَنْبِذُ الْإِمَامُ الْأَمَانَ لِمَا بَيَّنَّا، وَيُؤَدِّبُهُ الْإِمَامُ لِافْتِيَاتِهِ عَلٰى رَأْيِهِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ فِيْهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ رُبَّمَا تَفُوْتُ الْمَصْلَحَةُ بِالتَّأْخِيرِ فَكَانَ مَعْذُوْرًا وَلَا يَجُوْزُ أَمَانُ ذِمِّيٍّ لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ بِهِمْ، وَكَذَا لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ .

অনুবাদ : অনুচ্ছেদ : কোনো স্বাধীন মুসলিম নর বা নারী যদি কোনো কাফেরকে কিংবা কোনো দলকে কিংবা কোনো দুর্গে অবস্থানকারীদের কিংবা কোনো শহরের অধিবাসীদের নিরাপত্তা প্রদান করে তাহলে তাদের নিরাপত্তা দান বৈধ হবে। তখন মুসলমানদের কারো পক্ষেই তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার অধিকার থাকবে না।

এ ক্ষেত্রে মূল দলিল হলো নবী করীম ﷺ -এর বাণী اَلْمُسْلِمُوْنَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَيَسْعٰى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ মুসলমানদের সকলের রক্ত সমান এবং তাদের নিম্নতর ব্যক্তিও তাদের পক্ষ হতে নিরাপত্তা প্রদানের চেষ্টা করতে পারে। এখানে আদনা অর্থ সংখ্যায় কম অর্থাৎ একজন মাত্র ব্যক্তি।

তাছাড়া এ কারণে যে, সে শক্তি-বলের অধিকারী এবং যুদ্ধক্ষম হওয়ার কারণে শত্রুরা তাকে ভয় করবে। সুতরাং তার পক্ষ হতে নিরাপত্তা প্রদান সাব্যস্ত হতে পারে। কারণ তা যথা স্থানের (অর্থাৎ উভয়ের পাত্রের) সাথে যুক্ত হয়েছে। অতঃপর তা তার থেকে অন্যদের দিকে সম্প্রসারিত হবে। কেননা নিরাপত্তা প্রদানের অধিকার লাভের কারণ অর্থাৎ ঈমান তা বিভাজ্য নয়। সুতরাং নিরাপত্তা প্রদানও বিভাজ্য হবে না। সুতরাং তা পূর্ণভাবে সাব্যস্ত হবে। যেমন বিবাহ প্রদানের অভিভাবকত্বের ক্ষেত্রে।

গ্রন্থকার বলেন, তবে যদি তাতে মুসলমানের অকল্যাণ থাকে তাহলে তা তাদের উদ্দেশ্যে ছুড়ে ফেলা হবে। যেমন শাসক যদি স্বয়ং নিরাপত্তা প্রদান করেন অতঃপর তা প্রত্যাখ্যান করার মধ্যে কল্যাণ রয়েছে মনে করেন (তাহলে নিরাপত্তা প্রত্যাখ্যান করবেন) বিষয়টি আমরা পূর্বে বর্ণনা করে এসেছি।

আর শাসক যদি কোনো দুর্গ অবরোধ করেন, আর বাহিনীর কোনো একজন নিরাপত্তা প্রদান করে অথচ তাতে অনিষ্ট রয়েছে, সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রনায়ক আমাদের বর্ণিত কারণে প্রদত্ত নিরাপত্তা প্রত্যাখ্যান করবেন এবং নিজের এবং নিজের মতো আগে বাড়ার কারণে তাকে শাসন করবেন। তবে তাতে কল্যাণ থাকলে ভিন্ন কথা। কেননা হয়তো বিলম্বের কারণে কল্যাণ হাত ছাড়া হয়ে যেত। তাই তার ওজর-আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে। **কোনো জিম্মির নিরাপত্তা প্রদান বৈধ নয়।** কেননা সে তাদের ব্যাপারে তোহমতের পাত্র। তদুপরি মুসলমানদের উপর তার কোনো কর্তৃত্ব নেই।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ : أَيْ أَقَلُّهُمْ وَهُوَ الوَاحِدُ : হাদীসে أَدْنَاهُمْ শব্দটি دَنَاءَةٌ থেকে উৎগত। অর্থ হবে সমাজে যারা নিচু শ্রেণি, ইতর বা যাকে সম্মান প্রদর্শন করা হয় না। ইমাম মুহাম্মদ (র.) এই অর্থ গ্রহণ করে বলেন, দাসদেরকে যেহেতু সমাজে সবচেয়ে নিচু মনে করা হয় তাই সেও উক্ত হাদীসের ভিত্তিতে নিরাপত্তা প্রদানের অধিকার পাবে। কিন্তু মুসান্নেফ (র.)-এর নিকট ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মতটি অগ্রহণযোগ্য হওয়াতে তিনি হাদীসে أَدْنَاهُمْ শব্দটির ব্যাখ্যা أَقَلُّهُمْ শব্দ দ্বারা করেছেন অর্থাৎ হাদীসের অর্থ হলো তোমাদের যে কেউ (সংখ্যায় কম) যদি নিরাপত্তা প্রদান করে তাহলে সকলের দায়িত্বে তা রক্ষা করা জরুরি হবে। আমানদাতা চাই যুবক হোক বা বৃদ্ধ হোক, সুস্থ হোক কিংবা অসুস্থ হোক, আর আমানদাতা যদি দাস হয় তাহলে তার নিরাপত্তা প্রদান অধিকার নেই। এ সম্পর্কে গ্রন্থকার নিজেই একটু পরে আলোচনা করবেন।

قَوْلُهُ : ثُمَّ يَتَعَدَّى إِلَى غَيْرِهِ الخ : কোনো একজন মুসলমানের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা প্রদানের ফলে আরোপিত আহকাম নিরাপত্তাদাতা থেকে অন্যের দিকে সম্প্রসারিত হবে। অর্থাৎ প্রকারান্তে যেন সকল মুসলমান উক্ত নিরাপত্তা প্রদানে একমত পোষণ করেছেন। সুতরাং আমানদাতার জন্য যেমন তা রক্ষা করা অপরিহার্য তেমনি অবশিষ্টদের জন্য তা রক্ষা করা জরুরি। এই কথাটি উপরিউক্ত ভাষ্যে পরিস্ফুটিত হয়েছে। দৃষ্টান্ত প্রদানে বিষয়টি আরও সুস্পষ্ট হবে, একজন চাঁদ দর্শনকারীর উপর সর্বপ্রথম রমজানের হুকুম বর্তায়, এরপর তার সাক্ষীর দ্বারা অন্যদের উপরও রমজানের আহকাম আরোপিত হয়। তার উপর হুকুমটি شَهَادَةٌ -এর কারণে অন্যের প্রতি সম্প্রসারিত হয়েছে। তেমনি আলোচ্য মাসআলায় একজনের নিরাপত্তা প্রদানের কারণে সকলের উপর তার হুকুম আহকাম মান্য করা জরুরি।(আইনী)

قَوْلُهُ : كَوِلَايَةِ الإِنْكَاحِ : নিরাপত্তাদানের অধিকার সকল মুসলমানের সমান যা হাদীস থেকে স্পষ্ট। অর্থাৎ সকলের দেওয়া নিরাপত্তা সমানভাবে মূল্যায়ন করা হবে। সুতরাং একজন নিরাপত্তাদানের পর তা প্রত্যাখান করার অধিকার কারো নেই। সকলের নিরাপত্তাদানকে মূল্যায়ন করার কারণ হলো– সকল মুজাহিদের উদ্দেশ্য এক আল্লাহর দীনকে বুলন্দ করা। সুতরাং তারা কেউ ইসলামের অকল্যাণ হোক এই কামনা করতে পারে না এবং এ ধরনের কোনো কর্মে জড়িয়ে যাবে না। তাই যে কেউ যুদ্ধচলাকালীন সময়ে অহেতুক নিরাপত্তা প্রদান করে জিহাদ থেকে বিরত থাকবে না এটি স্বাভাবিক। যদি সে নিরাপত্তা প্রদান করে তাহলে অবশ্য তার দৃষ্টিতে এতে কোনো কল্যাণ নিহিত রয়েছে। তাই অন্যের জন্য তা রক্ষা করা জরুরি। তবে আমীরের নিকট যদি ঐ নিরাপত্তা ভঙ্গ করা কল্যাণকর মনে হয় তাহলে তিনি এই নিরাপত্তা প্রত্যাখ্যান করতে পারেন। এই কথাটিকে আরো স্পষ্ট করার জন্য মুসান্নেফ (র.) বিবাহের (وِلَايَةٌ) অভিভাবকত্ব বিষয়টিকে তুলনা করেছেন। আর তাহলো যদি কোনো নারীর বিবাহে একাধিক সমান স্তরের অভিভাবক থাকে তাহলে তারা সকলে অবশ্যই মেয়ের কল্যাণ কামনা করবে। তাই তাদের যে কেউ যদি মেয়ের বিবাহের অনুমতি প্রদান করে তাহলে অন্যের জন্য তা প্রত্যাখ্যান করার সুযোগ নেই। কেননা নিকটত্ব বিষয়টি বিভাজ্য নয়। একজনের অনুমতি দ্বারা পুরা অধিকার হাতছাড়া হয়ে যায়।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ وَلَا اَسِيْرٍ وَلَا تَاجِرٍ يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ لِاَنَّهُمَا مَقْهُوْرَانِ تَحْتَ اَيْدِيهِمْ فَلَا يَخَافُوْنَهُمَا وَالْاَمَانُ يَخْتَصُّ بِمَحَلِّ الْخَوْفِ وَلِاَنَّهُمَا يُجْبَرَانِ عَلَيْهِ فِيْهِ فَيَعْرَى الْاَمَانُ عَنِ الْمَصْلَحَةِ، وَلِاَنَّهُمْ كُلَّمَا اشْتَدَّ الْاَمْرُ عَلَيْهِمْ يَجِدُوْنَ اَسِيْرًا اَوْ تَاجِرًا فَيَتَخَلَّصُوْنَ بِاَمَانِهِ فَلَا يَنْفَتِحُ لَنَا بَابُ الْفَتْحِ . وَمَنْ اَسْلَمَ فِيْ دَارِ الْحَرْبِ وَلَمْ يُهَاجِرْ اِلَيْنَا لَا يَصِحُّ اَمَانُهُ لِمَا بَيَّنَّا وَلَا يَجُوْزُ اَمَانُ الْعَبْدِ الْمَحْجُوْرِ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ اِلَّا اَنْ يَأْذَنَ لَهُ مَوْلَاهُ فِى الْقِتَالِ . وَقَالَ مُحَمَّدٌ يَصِحُّ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَاَبُوْ يُوْسُفَ مَعَهُ فِيْ رِوَايَةٍ، وَمَعَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ فِيْ رِوَايَةٍ لِمُحَمَّدٍ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ ﴿اَمَانُ الْعَبْدِ اَمَانٌ﴾ رَوَاهُ اَبُوْ مُوْسٰى الْاَشْعَرِيُّ، وَلِاَنَّهُ مُؤْمِنٌ مُمْتَنِعٌ فَيَصِحُّ اَمَانُهُ اِعْتِبَارًا بِالْمَأْذُوْنِ لَهُ فِي الْقِتَالِ وَبِالْمُؤَيَّدِ مِنَ الْاَمَانِ، فَالْاِيْمَانُ لِكَوْنِهِ شَرْطًا لِلْعِبَادَةِ، وَالْجِهَادُ عِبَادَةٌ، وَالْاِمْتِنَاعُ لِتَحَقُّقِ اِزَالَةِ الْخَوْفِ بِهِ، وَالتَّأْثِيْرُ اِعْزَازُ الدِّيْنِ وَاِقَامَةُ الْمَصْلَحَةِ فِيْ حَقِّ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِيْنَ؛ اِذِ الْكَلَامُ فِيْ مِثْلِ هٰذِهِ الْحَالَةِ، وَاِنَّمَا لَا يَمْلِكُ الْمُسَايَفَةَ لِمَا فِيْهِ مِنْ تَعْطِيْلِ مَنَافِعِ الْمَوْلٰى وَلَا تَعْطِيْلَ فِيْ مُجَرَّدِ الْقَوْلِ .

অনুবাদ : **গ্রন্থকার বলেন, অদ্রূপ কোনো বন্দি কিংবা তাদের এলাকায় গমনকারী কোনো ব্যবসায়ীর অধিকার নেই।** কেননা তারা উভয়ে তাদের কর্তৃত্বাধীনে অসহায়। সুতরাং তাদের তারা ভয় পাবে না। অথচ নিরাপত্তা প্রদানের বিষয়টি ভীতিপ্রদ লোকের সাথে বিশিষ্ট।

তাছাড়া তাদের নিরাপত্তাদানে বাধ্য করা হতে পারে। ফলে নিরাপত্তা প্রদান কল্যাণ মুক্ত হবে। আর এ জন্য যে, যখনই তাদের অবস্থা গুরুতর হবে তখনই তারা কোনো বন্দী বা ব্যবসায়ীকে হাতে পেয়ে তার প্রদত্ত নিরাপত্তা দ্বারা রেহাই পেয়ে যাবে। ফলে আমাদের জন্য যুদ্ধ জয়ের দ্বার উন্মুক্ত হবে না। কেউ যদি দারুল হরবে ইসলাম গ্রহণ করার পর আমাদের দারুল ইসলামে হিজরত না করে তাহলে তার নিরাপত্তা প্রদান বৈধ হবে না। কারণ আমরা ইতঃপূর্বে বর্ণনা করেছি।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে কর্ম স্বাধীনতা রহিত দাসের নিরাপত্তা প্রদান বৈধ নয়। কিন্তু যদি মনিব তাকে লড়াই করার অনুমতি প্রদান করে থাকে তাহলে ভিন্ন কথা। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, তার নিরাপত্তাদান সহীহ হবে। এটাই ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মত। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) এক বর্ণনায় ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর সঙ্গে একমত, আর অন্য বর্ণনায় ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর সঙ্গে একমত।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর দলিল হলো নবী করীম ﷺ -এর বাণী أمانُ العَبْدِ امانٌ দাসের নিরাপত্তা প্রদানও নিরাপত্তা। হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা.) এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া এই কারণে যে, সে শক্তি বলের অধিকারী মুমিন। সুতরাং তার নিরাপত্তা প্রদান বৈধ হবে। তিনি তাকে লড়াইয়ের অনুমতিপ্রাপ্ত দাসের এবং স্থায়ী নিরাপত্তার উপর কিয়াস করেন। নিরাপত্তা প্রদানের জন্য ঈমানের শর্ত আরোপের কারণ এই যে, ইবাদতের জন্য তা শর্ত এবং জিহাদ একটি ইবাদত। আর শক্তি বলের অধিকারী হওয়া শর্ত এই জন্য যে তা দ্বারা ভয় বিদূরীত হওয়া সাব্যস্ত হয়।

উভয় প্রকার গোলামের মাঝে যোগসূত্র হলো দ্বীনের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা এবং মুসলমানদের জামাতের অনুকূলে স্বার্থ রক্ষা করা। কেননা কথাতো এধরনের ক্ষেত্রেই হচ্ছে। তবে তার আগ বেড়ে (বিনাঅনুমতিক্রমে) জিহাদে যেতে না পারার কারণ হলো তাতে মনিবের স্বার্থ নষ্ট হয়। পক্ষান্তরে শুধু কথা দেওয়ায় স্বার্থ নষ্ট হয় না।

https://e-ilm.weebly.com/

وَلِاَبِيْ حَنِيْفَةَ اَنَّهُ مَحْجُوْرٌ عَنِ الْقِتَالِ فَلَا يَصِحُّ اَمَانُهُ لِاَنَّهُمْ لَا يَخَافُوْنَهُ فَلَمْ يُلَاقِ الْاَمَانُ مَحَلَّهُ، بِخِلَافِ الْمَاْذُوْنِ لَهُ فِي الْقِتَالِ لِاَنَّ الْخَوْفَ مِنْهُ مُتَحَقِّقٌ، وَلِاَنَّهُ اِنَّمَا لَا يَمْلِكُ الْمُسَابَقَةَ لِمَا اَنَّهُ تَصَرُّفٌ فِيْ حَقِّ الْمَوْلٰى عَلٰى وَجْهٍ لَا يَعْرِي عَنْ اِحْتِمَالِ الضَّرَرِ فِيْ حَقِّهِ، وَالْاَمَانُ نَوْعُ قِتَالٍ وَفِيْهِ مَا ذَكَرْنَاهُ؛ لِاَنَّهُ قَدْ يُخْطِئُ بَلْ هُوَ الظَّاهِرُ، وَفِيْهِ سَدُّ بَابِ الْاِسْتِغْنَامِ، بِخِلَافِ الْمَاْذُوْنِ لِاَنَّهُ رَضِيَ بِهِ وَالْخَطَأُ نَادِرٌ لِمُبَاشَرَتِهِ الْقِتَالَ، وَبِخِلَافِ الْمُؤَبَّدِ لِاَنَّهُ خَلَفٌ عَنِ الْاِسْلَامِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الدَّعْوَةِ اِلَيْهِ، وَلِاَنَّهُ مُقَابَلٌ بِالْجِزْيَةِ وَلِاَنَّهُ مَفْرُوْضٌ عِنْدَ مَسْاَلَتِهِمْ ذٰلِكَ، وَاِسْقَاطُ الْفَرْضِ نَفْعٌ فَافْتَرَقَا . وَلَوْ اَمِنَ الصَّبِيُّ وَهُوَ لَا يَعْقِلُ لَا يَصِحُّ كَالْمَجْنُوْنِ وَاِنْ كَانَ يَعْقِلُ وَهُوَ مَحْجُوْرٌ عَنِ الْقِتَالِ فَعَلَى الْخِلَافِ، وَاِنْ كَانَ مَاْذُوْنًا لَهُ فِى الْقِتَالِ فَالْاَصَحُّ اَنَّهُ يَصِحُّ بِالْاِتِّفَاقِ .

অনুবাদ : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, যেহেতু সে লড়াই থেকে নিষেধকৃত, সেহেতু তার নিরাপত্তা প্রদান বৈধ নয়। কেননা তারা তো ভয় পাবে না। সুতরাং নিরাপত্তা প্রদান যথাস্থানে যুক্ত হয়নি। লড়াইয়ের অনুমতি প্রাপ্ত গোলামের বিষয়টি ভিন্ন কেননা তার প্রতি ভীতি সাব্যস্ত রয়েছে।

দ্বিতীয় দলিল এই যে, সে আগ বেড়ে জিহাদ করতে না পারার কারণ এই যে, এটা মনিবের অধিকারে এমন হস্তক্ষেপ। যা তার বিষয়ে ক্ষতির সম্ভাবনা থেকে মুক্ত নয়। আর নিরাপত্তা প্রদানও এক প্রকার যুদ্ধ। আর তাতে আমাদের উল্লেখিত (মনিবের ক্ষতির) দিকটি রয়েছে। কেননা সে ভুল সিদ্ধান্ত নিতে পারে, আর সেটাই স্বাভাবিক। তাছাড়া তাতে গনিমত লাভের পথ রুদ্ধ হয়।

অনুমতিপ্রাপ্ত গোলামের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা মনিব তো তাতে সম্মত রয়েছে। আর যুদ্ধে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণের কারণে তার ভুল করার সম্ভাবনা কম। স্থায়ী নিরাপত্তার বিষয়টিও ভিন্ন। কেননা সেটা হলো ইসলাম গ্রহণের স্থলবর্তী। সুতরাং তা ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত প্রদানের সমতুল্য। তাছাড়া এটা জিজিয়া প্রদানের বিনিময়ে হয়ে থাকে। আর তাদের পক্ষ থেকে জিম্মি চুক্তি প্রার্থনা করার পর শাসকের জন্য তা মঞ্জুর করা ফরজ হয়ে পড়ে। আর ফরজ দায়িত্ব আদায় কল্যাণজনক। সুতরাং উভয় প্রকার গোলামের মাঝে পার্থক্য হয়ে গেল।

বালক যদি বুদ্ধি-বিবেচনা সম্পন্ন না হয় তাহলে তার নিরাপত্তা দান বৈধ হবে না। যেমন বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তির ক্ষেত্রে অগ্রহণযোগ্য। আর বুদ্ধি-বিবেচনা সম্পন্ন হয় কিন্তু লড়াই থেকে নিষেধকৃত হয় তাহলে তা একই মত পার্থক্যপূর্ণ। পক্ষান্তরে বালক লড়াইয়ের অনুমতিপ্রাপ্ত হলে বিশুদ্ধতম বর্ণনা মতে সর্বসম্মতিক্রমে নিরাপত্তা প্রদান বৈধ হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قوله : وَلَا يَجُوْزُ أَمَانُ العَبْدِ المَحْجُوْرِ عَلَيْهِ عِنْدَهُ : মাসআলা : যুদ্ধের ময়দানে কাফেররা নিরাপত্তার আশ্রয় প্রার্থনা করলে তাদেরকে অবস্থার পরিস্থিতি বুঝে নিরাপত্তা দেওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা এতে জিহাদ বন্ধ করা হয় এবং গনিমতের মাল হাতছাড়া হয়ে যায়। সুতরাং যুদ্ধ ময়দানে নিরাপত্তা দেওয়া এরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দাসের হস্তক্ষেপ করার অধিকার থাকবে কিনা এ নিয়ে আয়েম্মায়ে কেরামের মাঝে মতভেদ রয়েছে। তবে যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করার অনুমতি প্রাপ্ত দাসের এই অধিকার থাকবে এবং তার নিরাপত্তা দেওয়াকে কার্যকর হিসেবে গ্রহণ করা হবে। এ ব্যাপার সকলে ঐকমত্য পোষণ করেন। কিন্তু মতানৈক্য ঐ দাসের ক্ষেত্রে যাকে মনিব যুদ্ধ করতে অনুমতি দেয়নি।

* জমহুর ওলামায়ে কেরাম (ইমাম শাফেয়ী, মালেক, আহমদ ও মুহাম্মদ (র)-এর মতে অনুমতিপ্রাপ্ত নয় এমন দাসেরও আমান দেওয়া অধিকার আছে এবং তা কার্যকর হবে।

* ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তার নিরাপত্তা প্রদান কার্যকর হবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে উভয় রকম বর্ণনা পাওয়া যায়।

দলিল : জমহুর আয়েম্মায়ে কেরামের দলিল :

১. হযরত আবূ মূসা আশা'আরী (র.) হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন– أَمَانُ الْعَبْدِ أَمَانٌ দাসের নিরাপত্তা প্রদান কার্যকর বিধান।'

২. হযরত আলী (র.) রাসূল ﷺ থেকে বর্ণনা করেন– قَالَ لَيْسَ لِلْعَبْدِ مِنَ الْغَنِيْمَةِ إِلَّا خرثى (اى اثاث) من المتاع وَأَمَانُهُ جَائِزٌ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ) "দাসের জন্য গনিমতের অংশ (সম্পদ) নেই, তবে কিছু আসবাব-পত্র দেওয়া যাবে। আর তার নিরাপত্তা প্রদান কর্যকর বিধান।

৩. যুক্তি : দাস যেহেতু মুমিন শক্তিশালী এবং ভীতিকর তথা সে যুদ্ধ করার ক্ষমতা রাখে। সুতরাং তার আমান কার্যকর ধরা হবে। যেমনটি সে যদি কোনো হরবী জিম্মি হওয়ার আবেদনকে গ্রহণ করে, তাহলে যেমন সেই হরবীকে জিম্মি হিসেবে সকলে গ্রহণ করে তদ্রূপ আলোচ্য মাসআলাটিও হওয়া যুক্তিসঙ্গত।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল

* তিনি যুক্তি পেশ করেছেন, দাস যেহেতু যুদ্ধের অনুমতিপ্রাপ্ত নয়, কেননা সে যুদ্ধের পরিস্থিতি বুঝতে সক্ষম হবে না সুতরাং তার নিরাপত্তা প্রদান কার্যকর হবে না। আর দ্বিতীয়ত সে যুদ্ধের ময়দানে অস্ত্র সজ্জিত না হওয়ায় প্রতিপক্ষ বুঝতে সক্ষম হবে যে, সে দাস। তারা দাস কে ভয় করবে না, সুতরাং সে এই অধিকার পাবে না। পক্ষান্তরে অনুমতি প্রাপ্ত দাসের বিষয়টি ভিন্ন।

جُمْهُوْر-এর দলিলের জবাব :

* প্রথমত হযরত আবূ মূসা (রা)-এর হাদীসটি গরীব এবং হযরত আলী (রা)-এর হাদীস দুর্বল (ضعيف)।

* দ্বিতীয়ত উক্ত হাদীসে "দাসের নিরাপত্তা প্রদান কার্যকর বিধান" বিষয়ে অনুমতিপ্রাপ্ত দাসের ক্ষেত্রে। আর যাকে অনুমতি দেওয়া হয়নি তার হুকুম আমরা যা যুক্তির আলোকে উল্লেখ করেছি।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ الْغَنَائِمِ وَقِسْمَتِهَا

وَاِذَا فَتَحَ الْاِمَامُ بَلْدَةً عَنْوَةً اَيْ قَهْرًا فَهُوَ بِالْخِيَارِ اِنْ شَاءَ قَسَّمَهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ كَمَا فَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَيْبَرَ ـ وَاِنْ شَاءَ اَقَرَّ اَهْلَهُ عَلَيْهِ وَوَضَعَ عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةَ وَعَلٰى اَرَاضِيْهِمُ الْخَرَاجَ كَذٰلِكَ فَعَلَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ بِسَوَادِ الْعِرَاقِ بِمُوَافَقَةِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَلَمْ يُحْمَدْ مَنْ خَالَفَهُ، وَفِي كُلٍّ مِنْ ذٰلِكَ قُدْوَةٌ فَيَتَخَيَّرُ ـ

পরিচ্ছেদ : গনিমতের মাল ও তার বণ্টন

অনুবাদ : শাসক যদি কোনো শহর বলপূর্বক জয় করেন তাহলে তার এখতিয়ার রয়েছে, যদি ইচ্ছা করেন তাহলে তা মুসলমানদের মাঝে বণ্টন করে দিতে পারেন। যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ খাইবারের ক্ষেত্রে করেছেন।

আর যদি ইচ্ছা করেন, তাহলে শহরের অধিবাসীদেরকেই সেখানে বহাল রাখতে পারেন। তখন তাদের উপর জিজিয়া এবং তাদের ভূমির উপর খারাজ নির্ধারণ করবেন।

ইরাকের ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামের সম্মতিক্রমে হযরত ওমর (রা.) এরূপই করেছিলেন এবং যিনি এর বিপক্ষে মত প্রকাশ করেছিলেন তাকে প্রশংসার চোখে দেখা হয়নি। বস্তুত উভয় পদক্ষেপেই আমাদের জন্য আদর্শ রয়েছে। তাই এখতিয়ার প্রদান করা হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মুসলিম সেনাপতি যখন কোনো শহর বলপূর্বক জয় করে, তখন সেখানকার লোকজন ভূসম্পদ ও অন্যান্য সকল সম্পদের ব্যাপারে ইমামের এখতিয়ার থাকবে। ইমাম ইচ্ছা করলে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন সম্পত্তি মুজাহিদদের মাঝে বণ্টন করে দিতে পারেন। ইচ্ছা করলে সম্পদসমূহ পূর্বাবস্থায় বহাল রেখে সেসবের বিনিময়ে লোকদের থেকে জিযিয়া গ্রহণ করবেন এবং কৃষিক্ষেতের বিনিময়ে খারাজ গ্রহণ করবেন।

হযরত আসলাম নিজ পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ওমর (রা.) বলেছেন, ভবিষ্যতে ইসলাম গ্রহণকারীদের জন্য জমিজমার ব্যাপারে আমার কোনো চিন্তা হয় না। তা তিনি বিজিত এলাকার জমিজমা মুজাহিদদের মাঝে বণ্টন করে দিতেন, যেমন রাসূল ﷺ খাইবারের ক্ষেত্রে করেছিলেন। (ইমাম বুখারী ও ইমাম মালেক থেকে বর্ণিত)

ইরাক বিজয়ের পর হযরত ওমর (রা.) সেখানকার লোকদেরকে পূর্বাবস্থায় থাকতে দিয়েছিলেন এ উদ্দেশ্য যে, ভবিষ্যতে কখনো মুসলমানদের প্রয়োজন হলে পুনরায় নিয়ে নিবেন। তাদেরকে সর্বদার জন্য থাকতে দেননি। এ ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে হযরত বেলাল, হযরত সালমান ও কতিপয় সাহাবী ব্যতীত অন্যসব সাহাবীগণ ঐকমত্য পোষণ করেন। হযরত ওমর (রা.) মতপার্থক্যকারী স্বল্পসংখ্যক সাহাবীকে ডেকে বললেন, সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করে আমি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তা সঠিক। কিন্তু তারা হযরত ওমরের কথা মানলেন না। তারা হুজুর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খাইবারের ভূমি বণ্টনকে নিজেদের পক্ষে দলিল রূপে পেশ করলেন। তখন অনান্য সাহাবীরা হযরত ওমর (রা.)-এর সিদ্ধান্তের কল্যাণজনক দিকগুলো তাদেরকে বুঝানোর চেষ্টা করলেন, যাতে ভিন্নমতাবলম্বী সাহাবীগণও তাদের সাথে একমত হয়ে যান। কিন্তু তা হলো না। পরিশেষে হযরত ওমর (রা.) তাদের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, হে আল্লাহ!

https://e-ilm.weebly.com/

বেলাল ও তার সমমনা লোকদের মোকাবিলায় আপনি আমার জন্য যথেষ্ট হোন। ফলে এক বৎসরের মধ্যে সে সকল সাহাবী ইন্তেকাল করেন।

মোটকথা, বলপূর্বক বিজিত এলাকার সম্পদসমূহ মুসলিম শাসকের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। তিনি ইচ্ছা করলে মুজাহিদদের মাঝে বণ্টন করে দিতে পারেন। ইচ্ছা করলে পূর্বাবস্থায় বহাল রেখে তাদের থেকে জিজিয়া এবং খারাজ নিতে পারেন।

খাইবার বিজয়ে পর রাসূল ﷺ খাইবারের ভূমিকে আঠারো ভাগে ভাগ করে, প্রতিভাগ একশজন মুজাহিদের মাঝে বণ্টন করে দিয়েছিলেন। (আবূ দাউদ)

মুজাহিদগণ দরিদ্র হলে বিজিত এলাকা তাদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়াই উত্তম।

উল্লেখ্য যে, বিজিত এলাকায় প্রাপ্ত সম্পদ তিনভাগে বিভক্ত হয়ে থাকে, ১. আসবাবপত্র, ২. ভূমি ও ৩. কয়েদি। প্রথমোক্ত দু-প্রকার সম্পদকে পাঁচভাগ করে এক পঞ্চমাংশ বায়তুল মালে দিতে হবে। অবশিষ্ট চার পঞ্চমাংশ যোদ্ধাদের মাঝে বণ্টন করে দিতে হবে।

কিংবা তাবৎ সম্পদ কাফের মালিকদের মালিকানায় বহাল রেখে তাদের থেকে জিজিয়া এবং খারাজ গ্রহণ করা হবে। কয়েদিদের ব্যাপারে মুসলিম শাসকের তিন রকম এখতিয়ার থাকবে–

১. পুরুষদেরকে হত্যা করবে। নারী ও শিশুদেরকে কয়েদি বানাবে।

২. সকল কয়েদিকে পাঁচ ভাগে ভাগ করে একভাগ বায়তুলমালে দিবে এবং অবশিষ্ট চার ভাগ যোদ্ধাদের মাঝে বণ্টন করে দিবে। শর্ত হলো কয়েদিরা মুরতাদ কিংবা আরবি না হতে হবে। যদি কয়েদিরা মুরতাদ কিংবা আরবি হয়, তাহলে তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হলো হয়তো ইসলাম গ্রহণ করবে অথবা তাদের হত্যা করা হবে।

৩. মুসলিম শাসক উপযুক্ত মনে করলে অনুগ্রহপূর্বক সকলকে মুক্ত করে দিতে পারেন।

وَإِنْ شَاءَ أَقَرَّ أَهْلَهُ عَلَيْهِ وَوَضَعَ الخ : নবী যুগের বিজয়সমূহের পর আরবের বাহিরে ইরাক বিজয় হলো সর্ববৃহৎ বিজয়। সেখানকার ভূমি অতি সবুজ শ্যামল হওয়ার কারণে তাকে سَوَادُ الْعِرَاقِ বলে ব্যক্ত করা হয়। এ অঞ্চল বিজয়ের পর হযরত ওমর (রা.) সাহাবীদের পরামর্শক্রমে সেখানকার অধিবাসীদের কাছে তা রেখে দেন এবং তাদের উপর জিজিয়া এবং খারাজ নির্ধারণ করে দেন। হযরত বেলাল, সালমান ফারসী, এবং আবুদ বুরদা (রা.) প্রমুখ সাহাবী মতানৈক্য করেন। তারা বলেন, ইরাক ভূমি যোদ্ধাদের মাঝে ভাগ করে দেওয়ার জন্য। দলিল স্বরূপ তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আমল পেশ করেন যে, খায়বার বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানকার ভূমি যোদ্ধাদের মাঝে ভাগ করে দিয়েছিলেন।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, রাসূল ﷺ -এর আমল এবং সাহাবীদের ঐকমত্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত উভয়ই উম্মতের জন্য আদর্শ স্বরূপ। অতএব, দুটি সুরতের যে কোনো একটি সুরতই মুসলিম শাসক এখতিয়ার করতে পারবেন।

https://e-ilm.weebly.com/

وَقِيْلَ الْاَوْلٰى هُوَ الْاَوَّلُ عِنْدَ حَاجَةِ الْغَانِمِيْنَ، وَالثَّانِيْ عِنْدَ عَدَمِ الْحَاجَةِ لِيَكُوْنَ عِدَّةً فِيْ الزَّمَانِ الثَّانِيْ، وَهٰذَا فِيْ الْعَقَارِ . اَمَّا فِيْ الْمَنْقُوْلِ الْمُجَرَّدِ لَا يَجُوْزُ الْمَنُّ بِالرَّدِّ عَلَيْهِمْ: لِاَنَّهُ لَمْ يَرِدْ بِهِ الشَّرْعُ فِيْهِ، وَفِي الْعَقَارِ خِلَافُ الشَّافِعِيِّ لِاَنَّ فِي الْمَنِّ اِبْطَالَ حَقِّ الْغَانِمِيْنَ اَوْ مِلْكِهِمْ فَلَا يَجُوْزُ مِنْ غَيْرِ بَدَلٍ يُعَادِلُهُ، وَالْخَرَاجُ غَيْرُ مُعَادِلٍ لِقِتْلِهِ، بِخِلَافِ الرِّقَابِ لِاَنَّ لِلْاِمَامِ اَنْ يُبْطِلَ حَقَّهُمْ رَأْسًا بِالْقَتْلِ، وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا رَوَيْنَاهُ، وَلِاَنَّ فِيْهِ نَظَرًا: لِاَنَّهُمْ كَالْاَكَرَةِ الْعَامِلَةِ لِلْمُسْلِمِيْنَ الْعَالِمَةِ بِوُجُوْهِ الزِّرَاعَةِ وَالْمُؤَنِ مُرْتَفِعَةٌ مَعَ مَا اَنَّهُ يُحَظّٰى بِهِ الَّذِيْنَ يَأْتُوْنَ مِنْ بَعْدُ، وَالْخَرَاجُ وَاِنْ قَلَّ حَالًا فَقَدْ جَلَّ مَالًا لِدَوَامِهِ، وَاِنْ مَنَّ عَلَيْهِمْ بِالرِّقَابِ وَالْاَرَاضِيْ يَدْفَعُ اِلَيْهِمْ مِنَ الْمَنْقُوْلَاتِ بِقَدْرِ مَا يَتَهَيَّأُ لَهُمُ الْعَمَلُ لِيَخْرُجَ عَنْ حَدِّ الْكَرَاهَةِ ـ

অনুবাদ : কারো কারো মতে বিজয়ী মুসলমানদের প্রয়োজনের ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপটি উত্তম। পক্ষান্তরে প্রয়োজন না থাকা অবস্থায় দ্বিতীয় পদক্ষেপটি উত্তম, যাতে পরবর্তী কালের জন্য তা সঞ্চয় হিসাবে থাকে। বহাল রাখার এ সিদ্ধান্ত হলো স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে। পক্ষান্তরে স্বতন্ত্র অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে সেগুলো তাদেরকে ফেরত দানের মাধ্যমে অনুগ্রহ প্রদর্শন করা বৈধ নয়। কেননা অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে এ ধরনের সিদ্ধান্ত শরিয়তে বর্ণিত হয়নি। আর স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে ইমাম শাফেয়ী (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। কেননা তাদের প্রতি অনুগ্রহ করার অর্থ মুজাহিদদের হক বাতিল করা কিংবা তাদের মালিকানা বাতিল করা। সুতরাং সমতুল্য বিনিময় গ্রহণ ছাড়া অনুগ্রহ প্রদর্শন বৈধ হবে না। আর হত্যার পরিবর্তে খারাজ সাব্যস্ত করা ঐ ভূমির সমতুল্য বিনিময় নয়।

মানুষের উপর মালিকানার বিষয়টি ভিন্ন (অর্থাৎ শাসক তাদেরকে মুজাহিদদের মাঝে বণ্টনও করতে পারেন আবার অনুগ্রহ বশত ছেড়েও দিতে পারেন। কেননা ইমামের অধিকার রয়েছে তাদের হত্যা করার মাধ্যমে সম্পূর্ণভাবে মুজাহিদদের হক বাতিল করে দেওয়ার।

তার বিপক্ষে আমাদের প্রমাণ হলো (হযরত ওমর (রা.)-এর সিদ্ধান্ত) যা আমরা বর্ণনা করেছি। তাছাড়া এ কারণে যে, তাতে কল্যাণ রয়েছে। কেননা তারা অভিযুক্ত কৃষক হিসাবে মুসলমানদের হয়ে কাজ করবে। আবার চাষ-বাসের খরচের ভারও মুসলমানদের থেকে রহিত হয়ে যাবে। তদুপরি পরে যারা আসবে তারা এর সুফল ভোগ করতে পারবে। আর বর্তমান হিসাবে খারাজ যদিও পরিমাণে কম, কিন্তু স্থায়ী হিসাবে তার পরবর্তী পরিমাণ অধিক।

শাসক যদি তাদেরকে আজাদ করে এবং ভূমি দান করে অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন তাহলে তাদেরকে এই পরিমাণ অস্থাবর সম্পদও দান করবেন যাতে (ভূমিচাষ ও জীবন ধারণের) কাজ চালিয়ে যাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হয়। যাতে বিষয়টি মাকরুহের সীমা থেকে বের হয়ে আসে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্ণিত দুটি ব্যবস্থাপনার মধ্যেই সামঞ্জস্য বিধান করে কেউ কেউ বলেছেন, মুজাহিদের যদি প্রয়োজন থাকে, তাহলে তাদের মাঝে বণ্টন করে দেওয়াই উত্তম। আর যদি মুজাহিদদের প্রয়োজন না থাকে, তাহলে বিজিত এলাকার অধিবাসীদেরকে বহাল রাখাই ভালো।

https://e-ilm.weebly.com/

শুধু অস্থাবর সম্পদ কাফেরদেরকে ফেরত দিয়ে অনুগ্রহ করা জায়েজ নেই। কারণ শুধু অবস্থার সম্পদ ফেরত দেওয়ার বিধান শরিয়তে বর্ণিত হয় নি। তবে স্থাবর সম্পদ ফেরত দেওয়া হলে তার সাথে কিছু অস্থাবর সম্পদও ফেরত দেওয়ার বিধান রয়েছে। যা উপরোক্ত মতনের শেষ দিকের ইবারতে وَاِنْ مَنَّ عَلَيْهِمْ بِالرِّقَابِ......الخ উল্লেখ রয়েছে। স্থাবর সম্পত্তি ফেরত দেওয়ার ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতভেদ আছে। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, বিজিত এলাকার ভূমি মুজাহিদদের মাঝে বণ্টন করে দিতে হবে। সে ভূমিতে কাফেরদের বহাল রাখা জায়েজ নেই। ইমাম আহমদও অনুরূপ মত পোষণ করেন। ইমাম মালেক (র.) হতে দুরকম মত বর্ণিত আছে। একটি মত আহনাফের মতের ন্যায়। অপর মত ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অনুরূপ।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল : তিনি বলেন, বিজিত এলাকার অধিবাসীদেরকে তাদের ভূমিতে বহাল রাখা হলে মুজাহিদের হক (আহনাফের মতে) কিংবা তাদের মালিকানা (ইমাম শাফেয়ীর মতে) বাতিল করা হয়। অতএব, উপযুক্ত বিনিময় ছাড়া এরূপ করা জায়েজ হবে না।

এ দলিলের উপর আপত্তি করে কেউ বলতে পারে যে, অধিবাসীদেরকে তাদের ভূমিতে বহাল রাখা হলে অবশ্যই তাদের থেকে খারাজ গ্রহণ করা হবে, যা একপ্রকার বিনিময়। অতএব, বহাল রাখার সুরতে বিনিময় বিহীন হক বা মালিকানা বাতিল করা হচ্ছে না।

এর উত্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, খারাজ বিনিময় হলেও তা পরিমাণে অতি অল্প হওয়ার কারণে সমতুল্য বিনিময় নয়। অতএব, তা গ্রহণযোগ্য নয়। এ পর্যায়ে পুনরায় প্রশ্ন হয় যে, খারাজের বিনিময়ে যদি ভূমি দেওয়া জায়েজ না হয়, তাহলে জিজিয়ার বিনিময়ে কয়েদিদেরকে মুক্তি দেওয়াও জায়েজ হবে না। কেননা ভূমিতে যেমন মুজাহিদদের হক সাব্যস্ত হয়েছে, তেমনি কয়েদিদের সত্তাতেও মুজাহিদদের হক সাব্যস্ত হয়েছে। অতএব, একটি জায়েজ না হলে অপরটিও জায়েজ হবে না।

এ প্রশ্নের উত্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, কয়েদিদের ব্যাপারটি ভিন্ন। কারণ কয়েদিদেরকে হত্যা করে মুজাহিদদের হক সম্পূর্ণরূপে বাতিল করে দেওয়ার অধিকারও ইমামের আছে। অতএব, জিজিয়ার বিনিময়ে মুক্ত করে আংশিক হক বাতিল আরো উত্তমরূপে জায়েজ হবে। পক্ষান্তরে ভূমি সংশ্লিষ্ট হক সম্পূর্ণ বা আংশিক কোনোটিই বাতিল করা জায়েজ না। بِخِلَافِ الرِّقَابِ لِاَنَّ الخ বলে এ প্রশ্নোত্তরের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

আহনাফের দলিল : আহনাফের প্রথম দলিল হলো হযরত ওমর (রা.)-এর পূর্ববর্ণিত আমল। তিনি সাহাবীদের পরামর্শক্রমে ইরাকের ভূমিতে সেখানকার অধিবাসীদেরকে বহাল রেখেছিলেন। দ্বিতীয় হলো, বিজিত এলাকার অধিবাসীদেরকে তাদের ভূমিতে বহাল রাখাতে মুজাহিদদের কল্যাণ রয়েছে। কারণ তারা কৃষিকাজে অভিজ্ঞ। তারা সেই অভিজ্ঞতা নিয়ে মুসলমানদের শ্রমিক হিসাবে কৃষিকাজ করবে। এতে করে মুসলমানদের কাজের বোঝা হালকা হলো। অপর দিকে চাষাবাদ করার ক্ষেত্রে মুসলমানদের যে অর্থ খরচ হতো তাও কাফেররাই বহন করবে। সে হিসাবে মুসলমানদের আর্থিক বোঝাও লাঘব হলো। তদুপরি এ অবণ্টিত বিজিত ভূমিটা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য অবশিষ্ট থাকবে। তারাও সেটা দ্বারা উপকৃত হতে পারবে। অতএব, বিজিত ভূমিতে তথাকার অধিবাসীকে খারাজের বিনিময় বহাল রাখা সার্বিক বিবেচনায় উত্তম।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিলের জবাব : ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছিলেন, খারাজ পরিমাণে অতি অল্প হওয়ার কারণে তা সমতুল্য বিনিময় নয়। তাই এর বিনিময়ে মুজাহিদদের মালিকানা বাতিল করা যাবে না।

এর উত্তর হলো, খারাজের পরিমাণ তাৎক্ষণিকভাবে অল্প বলে মনে হলেও পরিণামে তা অনেক। কেননা তা প্রতি বৎসর পরিশোধ করা হবে। কিছু বৎসর অতিবাহিত হলে এর পরিমাণ বিশাল হয়ে দাঁড়াবে।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ وَهُوَ فِى الْاُسَارٰى بِالْخِيَارِ اِنْ شَاءَ قَتَلَهُمْ ﴿لِاَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ قَدْ قَتَلَ﴾، وَلِاَنَّ فِيْهِ حَسْمَ مَادَّةِ الْفَسَادِ وَاِنْ شَاءَ اسْتَرَقَّهُمْ لِاَنَّ فِيْهَا دَفْعَ شَرِّهِمْ مَعَ وُفُوْرِ الْمَنْفَعَةِ لِاَهْلِ الْاِسْلَامِ وَاِنْ شَاءَ تَرَكَهُمْ اَحْرَارًا ذِمَّةً لِلْمُسْلِمِيْنَ لِمَا بَيَّنَّاهُ اِلَّا مُشْرِكِى الْعَرَبِ وَالْمُرْتَدِّيْنَ عَلٰى مَا نُبَيِّنُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَلَا يَجُوْزُ اَنْ يَرُدَّهُمْ اِلٰى دَارِ الْحَرْبِ لِاَنَّ فِيْهِ تَقْوِيَتَهُمْ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ، فَاِنْ اَسْلَمُوْا لَا يَقْتُلُهُمْ لِانْدِفَاعِ الشَّرِّ بِدُوْنِهِ وَلَهُ اَنْ يَسْتَرِقَّهُمْ تَوْفِيْرًا لِلْمَنْفَعَةِ بَعْدَ انْعِقَادِ سَبَبِ الْمِلْكِ بِخِلَافِ اِسْلَامِهِمْ قَبْلَ الْاَخْذِ؛ لِاَنَّهُ لَمْ يَنْعَقِدِ السَّبَبُ بَعْدُ -

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, **বন্দিদের ব্যাপারে শাসকের এখতিয়ার রয়েছে, ইচ্ছা হলে তিনি তাদেরকে হত্যা করবেন।** কেননা নবী করীম ﷺ কোনো কোনো বন্দিকে হত্যা করেছেন।

তাছাড়া এ কারণে যে, তাতে ফ্যাসাদের উপাদান নিশ্চিহ্ন করা হয়। **আবার ইচ্ছা করলে তিনি তাদের দাস বানাতে পারেন। কেননা তাতে মুসলমানদের উপকার অর্জনসহ তাদের দুষ্কর্ম রহিত হয়। আবার ইচ্ছা করলে তাদের স্বাধীনরূপে ছেড়ে দিতে পারেন মুসলমানের জিম্মি হিসাবে।** এর কারণ আমরা বর্ণনা করেছি। **কিন্তু আরব মুশরিকদের ও মুরতাদদের বিষয়টি ভিন্ন।** বিষয়টি ইনশাআল্লা (জিজিয়া পরিচ্ছেদে) আমরা বর্ণনা করব।

তবে এ বন্দিদেরকে দারুল হরবে ফেরত পাঠানো জায়েজ নয়। কেননা তাতে মুসলমাদের বিরুদ্ধে তাদের শক্তি বৃদ্ধি করা হবে। তবে যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে হত্যা করবে না। কারণ হত্যা ছাড়াই তাদের দুষ্কর্ম বিদূরিত হয়ে গেল। আর তিনি তাদের দাসও বানাতে পারেন, যাতে মালিকানার কারণ বিদ্যমান হওয়ার পর পূর্ণরূপে উপকার অর্জিত হয়। অবশ্য বন্দি হওয়ার পূর্বে ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা এক্ষেত্রে মালিকানার কারণ সংঘটিত হয়নি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

বন্দিদের সম্পর্কে ইমামের কর্তব্য কি এ বিষয়ে উপরিউক্ত ইবারতে আলোচনা করা হয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, বন্দিদের ব্যাপারে শাসকের তিনটি এখতিয়ার থাকবে– ১. হত্যা করা, ২. দাস বানানো ও ৩. জিম্মি হিসাবে রেখে দেওয়া।

ইমাম ইচ্ছা করলে বন্দিদেরকে হত্যা করতে পারবে। এর দলিল হলো ১. ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন শিরস্ত্রাণ পরিহিত অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করলেন। অতঃপর যখন তিনি শিরস্ত্রাণ খুললেন তখন একলোক এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! ইবনে খাতাল কা'বা শরীফের চাদর আঁকড়ে ধরে আছে। নবী ﷺ বললেন, তোমরা তাকে হত্যা কর। ২ আবূ দাউদ বর্ণনা করেছেন, হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর হতে, যে রাসূল ﷺ বদরের দিন তিন ব্যক্তি কে বেঁধে হত্যা করেছেন। ৩. বন্দিদের হত্যা করা হলে ফ্যাসাদের উপাদানও সমূলে নাশ করা হয়।

ইমাম ইচ্ছা করলে বন্দিদেরকে গোলাম বাঁদিও বানাতে পারেন। তাদেরকে গোলাম বাঁদি বানিয়ে রাখলে তাদের অনিষ্টও দূরীভূত হবে, পাশাপাশি মুসলমানদেরও উপকার হবে। ইমাম ইচ্ছা করলে বন্দিদেরকে মুসলমানদের জিম্মি হিসাবে তাদেরকে স্বাধীন অবস্থায় ছেড়ে দিতে পারে। কেননা হযরত ওমর (রা.) এরূপ করেছেন।

উপরিউক্ত এখতিয়ারসমূহ কেবল অনারবী মুশরিক ও সাধারণ বন্দিদের ক্ষেত্রে। আরবি মুশরিক ও মুরতাদদের হুকুম ভিন্ন। আরবীয় মুশরিক ও মুরতাদদের ক্ষেত্রে দাস বানানো এবং জিম্মি বানানো শুদ্ধ নয়। তারা হয়তো মুসলমান হবে অথবা তাদের হত্যা করা হবে। বন্দিদের কে দারুল হরবে ফিরিয়ে দেওয়া যাবে না। কেননা বন্দিদেরকে দারুল হরবে ফিরিয়ে দেওয়া হলে কাফেরদের শক্তি বৃদ্ধি পাবে।

বন্দিরা যদি কাফের অবস্থায় ধৃত হওয়ার পর ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তাদেরকে দাস বানানো যাবে। কারণ তাদের ক্ষেত্রে দাস বানানোর কারণ পাওয়া যাবে, তা হলো কাফের অবস্থায় ধৃত হওয়া । অতএব, কেউ যদি ধৃত হওয়ার পূর্বেই মুসলমান হয়ে যায়, তাহলে তাকে দাস বানানো যাবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

وَلَا يُفَادٰى بِالْأُسَارٰى عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ، وَقَالَا : يُفَادٰى بِهِمْ اُسَارٰى الْمُسْلِمِيْنَ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ لِاَنَّ فِيْهِ تَخْلِيْصَ الْمُسْلِمِ وَهُوَ اَوْلٰى مِنْ قَتْلِ الْكَافِرِ وَالْاِنْتِفَاعِ بِهٖ . وَلَهٗ اَنَّ فِيْهِ مَعُوْنَةً لِلْكَفَرَةِ؛ لِاَنَّهٗ يَعُوْدُ حَرْبًا عَلَيْنَا، وَدَفْعُ شَرِّ حَرْبِهٖ خَيْرٌ مِنْ اِسْتِنْقَاذِ الْاَسِيْرِ الْمُسْلِمِ؛ لِاَنَّهٗ اِذَا بَقِيَ فِيْ اَيْدِيْهِمْ كَانَ اِبْتِلَاءً فِيْ حَقِّهٖ غَيْرَ مُضَافٍ اِلَيْنَا، وَالْاِعَانَةُ بِدَفْعِ اَسِيْرِهِمْ اِلَيْهِمْ مُضَافٌ اِلَيْنَا . اَمَّا الْمُفَادَاتُ بِمَالٍ يَاْخُذُ مِنْهُمْ لَا يَجُوْزُ فِي الْمَشْهُوْرِ مِنَ الْمَذْهَبِ لِمَا بَيَّنَّا . وَفِي السِّيَرِ الْكَبِيْرِ اَنَّهٗ لَا بَاْسَ بِهٖ اِذَا كَانَ بِالْمُسْلِمِيْنَ حَاجَةٌ اِسْتِدْلَالًا بِاُسَارٰى بَدْرٍ، وَلَوْ كَانَ اَسْلَمَ الْاَسِيْرُ فِيْ اَيْدِيْنَا لَا يُفَادٰى بِمُسْلِمٍ اَسِيْرٌ فِيْ اَيْدِيْهِمْ لِاَنَّهٗ لَا يُفِيْدُ اِلَّا اِذَا طَابَتْ نَفْسُهٗ بِهٖ وَهُوَ مَاْمُوْنٌ عَلٰى اِسْلَامِهٖ .

অনুবাদ : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে বন্দিদের বিনিময়ে মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে না। সাহেবাইন (র.) বলেন, তাদের বিনিময়ে মুসলিম বন্দিদের গ্রহণ করা হবে। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এরও এটাই অভিমত। কেননা এতে মুসলমান ছাড়া পাচ্ছে। আর এটা কাফের হত্যা করা কিংবা তার দ্বারা উপকৃত হওয়া অপেক্ষা উত্তম।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, এতে কাফেরদের সাহায্য করা হয়। কেননা সে আমাদের বিরুদ্ধে যোদ্ধা হয়ে ফিরে আসবে। আর তার লড়াইয়ের ক্ষতি রোধ করা মুসলিম বন্দিকে রক্ষার চেয়ে উত্তম। কেননা সে যদি তাদের হাতে বন্দি থেকে যায়, তাহলে তার দিকে থেকে এটা হবে একটা পরীক্ষা, যার দায়দায়িত্ব আমাদের সাথে সম্পৃক্ত হবে না। কিন্তু তাদের বন্দিকে তাদের হাতে অর্পণের দ্বারা সাহায্য করার দায়দায়িত্ব আমাদের সাথে সম্পৃক্ত হবে। পক্ষান্তরে তাদের থেকে মুক্তিপণের অর্থ গ্রহণ করা আমাদের মাযহাবের প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী জায়েজ নেই। এর কারণ আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি (যে এতে তাদের শক্তি যোগানো হয়।) তবে বন্দিদের উপর কিয়াস করে সিয়ারে কাবীর কিতাব বলা হয়েছে যে, মুসলমানদের প্রয়োজন থাকলে তাদের মুক্তিপণ গ্রহণ করাতে কোনো দোষ নেই।

আর যদি বন্দিরা আমাদের হাতে থাকা অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তাদের হাতে বন্দি কোনো মুসলমানের বিনিময়ে তাকে মুক্তিপণ রূপে ফেরত দেওয়া হবে না। কেননা এতে কোনো উপকার লাভ হবে না। তবে সে যদি স্বেচ্ছায় সম্মত হয় এবং সে তার ইসলাম রক্ষার ব্যাপারে নিশ্চিত থাকে তাহলে ভিন্ন কথা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

لا يفادى শব্দটি المفاداة -মাসদার হতে উৎপন্ন। এর অর্থ হলো– অর্থের বিনিময়ে কিংবা বন্দির বিনিময়ে বন্দিকে মুক্তি দেওয়া। বন্দি মুক্তির বিনিময়ে যা কিছু আদান-প্রদান করা হয়, তাকে ফিদিয়া বা মুক্তিপণ বলে।

মুক্তিপণ গ্রহণ করা যাবে কিনা এ ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে মতানৈক্য আছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে মুক্তিপণ গ্রহণ করা জায়েজ নেই। অর্থাৎ অর্থ গ্রহণ করে কাফের বন্দিকে মুক্তি দেওয়া বৈধ নয়। ইমাম আবূ ইউসুফ, ইমাম

https://e-ilm.weebly.com/

শাফেয়ী ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মত হলো কাফের বন্দিকে মুক্তি দিয়ে মুসলমান বন্দিদেরকে মুক্ত করা হবে। অর্থাৎ বন্দি বিনিময়ে করা যাবে।

ইমাম আবূ ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হলো– কাফের বন্দিকে মুক্তি দিয়ে মুসলমান বন্দিকে মুক্ত করা, কাফের বন্দিকে হত্যা করা কিংবা তকে দাস বানিয়ে তার দ্বারা উপকৃত হওয়া অপেক্ষা উত্তম। অতএব, কাফের বন্দিকে হত্যা না করে এবং দাস না বানিয়ে তাকে মুক্তিদানের বিনিময়ে মুসলমান বন্দিকে মুক্ত করে আনা হবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, বন্দি বিনিময় করা হবে অর্থাৎ মুসলমান বন্দিকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে কাফের বন্দিকে মুক্তি দিলে কাফেরকে সাহায্য করা হয়। কেননা যে বন্দিটিকে মুক্তি দেওয়া হবে, সে পুনরায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবে! অতএব, তার ক্ষতি থেকে বেঁচে থাকা মুসলমান বন্দিকে মুক্ত করার তুলনায় উত্তম হবে। কেননা কোনো মুসলমান ব্যক্তি কাফেরদের হাতে বন্দি অবস্থায় থাকা ঐ ব্যক্তির জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা স্বরূপ। এর কোনো দায়দায়িত্ব শাসকের সাথে সম্পৃক্ত নয়। পক্ষান্তরে যদি কাফের বন্দিকে মুক্তি দানের মাধ্যমে কাফেরদেরকে সাহায্য করা হয়, তাহলে এর দায় দায়িত্ব শাসকের উপর বর্তাবে। অতএব, শাসকের পক্ষে এ পথ অবলম্বন করা জায়েজ হবে না। অর্থের বিনিময়ে কাফের বন্দিকে মুক্তি দেওয়া প্রসিদ্ধ মত অনুসারে ইমাম আবূ ইউসুফ এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতেও জায়েজ নয়। কারণ এতে কাফেরদেরকে সাহায্য করা হয়ে থাক।

সিয়ারে কাবীর নামক গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মদ (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, মুসলমানদের যদি অর্থের প্রয়োজন থাকে তাহলে অর্থের বিনিময়ে কাফের বন্দিকে মুক্তি দেওয়াতে কোনো সমস্যা নেই। ইমাম শাফেয়ী ইমাম মুহাম্মদ (র.) ও এ মত পোষণ করেন।

তাদের এ মতের পক্ষে দলিল হলো, বদর যুদ্ধের বন্দিদেরকে নবী করীম ﷺ অর্থের বিনিময়ে মুক্তি দিয়েছিলেন। এক একজন বন্দির মুক্তিপণ ছিল চার হাজার দিরহাম। কিন্তু তাদের এ দলিলটি প্রশ্নবিদ্ধ। কেননা মুক্তিপণ নিয়ে বদরের বন্দিদেরকে মুক্তিদানের বিষয়টি কুরআন প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে–

لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيْمَا اَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ -

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, যদি আজাব নাজিল হতো, তাহলে হযরত ওমর ছাড়া অন্য কেউ সে আজাব হতে রক্ষা পেত না। কারণ হযরত ওমর (রা.)-এর পরামর্শ ছিল, মুক্তি না নিয়ে বন্দিদেরকে হত্যা করার।

মোটকথা, অর্থ গ্রহণের মাধ্যমে কাফেরবন্দিকে মুক্তি দানের সিদ্ধান্তটি কুরআন দ্বারা প্রত্যাখ্যাত। তাই এটা দলিল হতে পারে না।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ وَلَا يَجُوْزُ الْمَنُّ عَلَيْهِمْ اَىْ عَلَى الْأَسَارٰى خِلَافًا لِّلشَّافِعِىِّ فَاِنَّهٗ يَقُوْلُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى بَعْضِ الْأَسَارٰى يَوْمَ بَدْرٍ . وَلَنَا قَوْلُهٗ تَعَالٰى ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ﴾ وَلِاَنَّهٗ بِالْاَسْرِ وَالْقَسْرِ يَثْبُتُ حَقُّ الِاسْتِرْقَاقِ فِيْهِ فَلَا يَجُوْزُ اِسْقَاطُهٗ بِغَيْرِ مَنْفَعَةٍ وَعِوَضٍ، وَمَا رَوَاهُ مَنْسُوْخٌ بِمَا تَلَوْنَا ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (রা.) বলেন, **বন্দিদের উপর অনুগ্রহ করা** (দাস না বানিয়ে, কিংবা জিম্মি না করে কিংবা হত্যা না করে তাদের এমনি ছেড়ে দেওয়া) **জায়েজ নেই**। ইমাম শাফেয়ী (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ যুদ্ধে কোনো কোনো বন্দির উপর অনুগ্রহ করেছেন।

আমাদের দলিল হলো, আল্লাহ তা'আলার বাণী : فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ (মুশরিকদেরকে যেখানে পাও সেখানেই হত্যা কর)

তা ছাড়া এ কারণে যে, বন্দি করে হাতের মুঠোয় আনার মাধ্যমে তাকে দাস বানানোর হক সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং কোনো লাভ ও বিনিময় ছাড়া উক্ত হক রহিত করা জায়েজ হবে না। আর তার বর্ণিত হাদীস আমাদের তেলাওয়াতকৃত আয়াতের দ্বারা মানসূখ বা রহিত হয়ে গেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কাফের বন্দিকে হত্যা না করে দাস না বানিয়ে কিংবা জিম্মি না বানিয়ে এমনিতেই মুক্তি দিয়ে দেওয়া জায়েজ আছে কিনা এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে।

আহনাফের মত হলো এমনিতে ছেড়ে দেওয়া জায়েজ নেই। ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) বলেন, কাফের বন্দিদের উপর অনুগ্রহ করা তথা এমনিতেই ছেড়ে দেওয়া জায়েজ আছে। তাদের দলিল হলো নবী করীম ﷺ বদরের যুদ্ধের দিন কতিপয় বন্দির উপর অনুগ্রহ করেছেন।

আহনাফের দলিল হলো ১. কুরআনের আয়াত اُقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ মুনাফিকদেরকে যেখানে পাও হত্যা কর

২. বন্দিকে ধরে আনার মাধ্যমে তাকে গোলাম বানানোর অধিকার সাব্যস্ত হয়েছে। অতএব কোনো প্রকার বিনিময় ছাড়া উক্ত হক নষ্ট করা ঠিক হবে না।

৩. কাফের বন্দিকে এমনিতে ছেড়ে দিলে কাফেরদেরকে শক্তিশালী করা হয়। অতএব, এটা অস্ত্র ফেরত দেওয়ার মতো হলো। তাই অস্ত্র দেওয়া যেমন জায়েজ নেই তেমনি বন্দি ফেরৎ দেওয়াও জায়েজ নেই।

ইমামত্রয়ের দলিলের জবাব : ইমামত্রয়ের বর্ণিত হাদীসটি اُقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ .... الخ -এর মাধ্যমে মানসূখ হয়ে গেছে। কেননা আয়াতটি পরে অবতীর্ণ হয়েছে। তাই এর দ্বারা পূর্ববর্তী বিপরীত নসসমূহ রহিত হয়ে গেছে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَاِذَا اَرَادَ الْاِمَامُ الْعَوْدَ وَمَعَهُ مَوَاشٍ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلٰى نَقْلِهَا اِلٰى دَارِ الْاِسْلَامِ ذَبَحَهَا وَحَرَقَهَا وَلَا يَعْقِرُهَا وَلَا يَتْرُكُهَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يَتْرُكُهَا؛ لِاَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ ﴿نَهٰى عَنْ ذَبْحِ الشَّاةِ اِلَّا لِمَأْكَلَةٍ﴾. وَلَنَا اَنَّ ذَبْحَ الْحَيَوَانِ يَجُوْزُ لِغَرَضٍ صَحِيْحٍ، وَلَا غَرَضَ اَصَحُّ مِنْ كَسْرِ شَوْكَةِ الْاَعْدَاءِ، ثُمَّ يُحْرَقُ بِالنَّارِ لِيَنْقَطِعَ مَنْفَعَتُهُ عَنِ الْكُفَّارِ وَصَارَ كَتَخْرِيْبِ الْبُنْيَانِ بِخِلَافِ التَّحْرِيْقِ قَبْلَ الذَّبْحِ لِاَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ، وَبِخِلَافِ الْعَقْرِ لِاَنَّهُ مُثْلَةٌ، وَتُحْرَقُ الْاَسْلِحَةُ اَيْضًا، وَمَا لَا يَحْتَرِقُ مِنْهَا يُدْفَنُ فِيْ مَوْضِعٍ لَا يَقِفُ عَلَيْهِ الْكُفَّارُ اِبْطَالًا لِلْمَنْفَعَةِ عَلَيْهِمْ -

অনুবাদ : ইমাম যখন (দারুল হারব হতে দারুল ইসলামে) ফিরে আসার ইচ্ছা করেন তখন যদি তার সাথে পশুপাল থাকে, এবং তিনি সেগুলো দারুল ইসলামে নিয়ে আসতে সক্ষম না হন, তাহলে সেগুলো জবাই করে জ্বালিয়ে দিবে। পশুপালের হাত পা কাটাবে না কিংবা এমনিতে ছেড়ে দিবে না। ইমাম শাফেয়ী (র.) ফেলে আসার কথা বলেছেন। কেননা নবী করীম ﷺ খাওয়ার প্রয়োজন ছাড়া বকরি জবাই করতে নিষেধ করেছেন।

আমাদের দলিল হলো, কোনো সৎ উদ্দেশ্যে পশু জবাই করা জায়েজ আছে। আর শত্রুর শক্তি খর্ব করার চেয়ে অধিক সৎ উদ্দেশ্য কিছুই হতে পারে না। অতঃপর আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হবে, যাতে কাফেরদের তা থেকে উপকৃত হওয়ার সুযোগ না থাকে। সুতরাং তা বাড়িঘর নষ্ট করে দেওয়ার মতোই হলো। জবাই করার পূর্বে পুড়িয়ে দেওয়ার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা (হাদীসে) তা নিষিদ্ধ। তদ্রূপ হাত পা কর্তনের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা এটা হলো মুসলাহ (বা দেহের বিকৃতি সাধন)।

অস্ত্রশস্ত্র ও জ্বালিয়ে (নষ্ট করে) ফেলা হবে। আর যা জ্বালানো সম্ভব নয় তা কাফেররা খোজ পাবে না এমন স্থানে পুঁতে ফেলা হবে। উদ্দেশ্য হলো তাদের ফায়দা হাসিলের সুযোগ নষ্ট করা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ইমামের সাথে যদি পশুপাল থাকে এবং সেগুলো দারুল ইসলামে নিয়ে আসা সম্ভব না হয়, তাহলে সেগুলো কি করবে এ বিষয়ে পূর্বোক্ত ইবারতে আলোচনা করা হয়েছে।

আহনাফের মত হলো জবাই করে জ্বালিয়ে দিবে পশুর হাত পা কাটবে না কিংবা এমনি ছেড়ে দিবে না।

ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ (র.)-এর মত হলো, এমনি ছেড়ে দিবে, জবাই করে জ্বালাবে না। এ ব্যাপারে তাদের দলিল হলো, খাওয়ার প্রয়োজন ছাড়া বকরি জবাই করতে নবী করীম ﷺ নিষেধ করেছেন।

আহনাফের দলিল হলো, সৎ উদ্দেশ্যে পশু জবাই করা জায়েজ আছে। আর কাফেরদের শক্তি নষ্ট করার চেয়ে অধিক সৎ উদ্দেশ্য আর কিছু হতে পারে না। এ বিষয়টি কাফেরদের ঘরবাড়ি নষ্ট করার মতোই হলো। অতএব, তাদের শক্তি খর্ব করার উদ্দেশ্যে যেমন ঘরবাড়ি ধ্বংস করা জায়েজ আছে তেমনি পশু জবাই করাও জায়েজ হবে। তবে জবাই করার পূর্বে আগুনে জ্বালানো যাবে না। কেননা আগুন দ্বারা শাস্তি দিতে হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ একবার আমাদেরকে এক যুদ্ধে পাঠালেন। পাঠানোর সময় বললেন যদি তোমরা অমুক অমুককে পাও, তাহলে আগুনে পুড়িয়ে দিও। অতঃপর যখন আমরা রওয়ানা করলাম তখন তিনি আমাদের কে ডেকে বললেন, যদি অমুক অমুক কে পাও তাহলে তাদের হত্যা করে ফেলো আগুনে পুড়িয়ো না । কেননা আগুন দ্বারা একমাত্র আল্লাহই শাস্তি দিয়ে থাকেন। বুখারী, মুসনাদে বাযযার। অনুরূপ পশুর হাত পাও কর্তন করা যাবে না। কেননা হাত পা কর্তন করা হলে তা মুছলা হবে, যা শরিয়তে নিষিদ্ধ। কাফেরদের থেকে পাওনা অস্ত্রশস্ত্র দারুল ইসলামে নিয়ে আসা যদি সম্ভব না হয়, তাহলে সেগুলোও পুড়িয়ে দিবে। পুড়ানো সম্ভব না হলে এমন স্থানে পুঁতে দিবে কাফেররা যেখানের সন্ধান না পায়। এসবের দ্বারা মূল উদ্দেশ্য হলো কাফেরদেরকে শক্তিহীন করে দেওয়া ।

https://e-ilm.weebly.com/

وَلَا يُقَسِّمُ غَنِيْمَةً فِيْ دَارِ الْحَرْبِ حَتّٰى يُخْرِجَهَا اِلٰى دَارِ الْإِسْلَامِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا بَأْسَ بِذٰلِكَ . وَاَصْلُهٗ اَنَّ الْمِلْكَ لِلْغَانِمِيْنَ لَا يَثْبُتُ قَبْلَ الْإِحْرَازِ بِدَارِ الْإِسْلَامِ عِنْدَنَا، وَعِنْدَهٗ يَثْبُتُ وَيَبْتَنِيْ عَلٰى هٰذَا الْاَصْلِ عِدَّةٌ مِنَ الْمَسَائِلِ ذَكَرْنَاهَا فِي الْكِفَايَةِ . لَهٗ اَنَّ سَبَبَ الْمِلْكِ الِاسْتِيْلَاءُ اِذَا وَرَدَ عَلٰى مَالٍ مُبَاحٍ فِي الصُّيُوْدِ، وَلَا مَعْنٰى لِلِاسْتِيْلَاءِ سِوٰى اِثْبَاتِ الْيَدِ وَقَدْ تَحَقَّقَ . وَلَنَا اَنَّهٗ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ﴿نَهٰى عَنْ بَيْعِ الْغَنِيْمَةِ فِيْ دَارِ الْحَرْبِ﴾، وَالْخِلَافُ ثَابِتٌ فِيْهِ، وَالْقِسْمَةُ بَيْعٌ مَعْنًى فَتَدْخُلُ تَحْتَهٗ، وَلِاَنَّ الِاسْتِيْلَاءَ اِثْبَاتُ الْيَدِ الْحَافِظَةِ وَالنَّاقِلَةِ وَالثَّانِيْ مُنْعَدِمٌ لِقُدْرَتِهِمْ عَلَى الِاسْتِنْقَاذِ وَوُجُوْدِهٖ ظَاهِرًا . ثُمَّ قِيْلَ : مَوْضِعُ الْخِلَافِ تَرَتُّبُ الْاَحْكَامِ عَلَى الْقِسْمَةِ اِذَا قَسَمَ الْاِمَامُ لَا عَنْ اجْتِهَادٍ، لِاَنَّ حُكْمَ الْمِلْكِ لَا يَثْبُتُ بِدُوْنِهٖ . وَقِيْلَ الْكَرَاهَةُ، وَهِيَ كَرَاهَةُ تَنْزِيْهٍ عِنْدَ مُحَمَّدٍ فَاِنَّهٗ قَالَ عَلٰى قَوْلِ اَبِيْ حَنِيْفَةَ وَاَبِيْ يُوْسُفَ لَا تَجُوْزُ الْقِسْمَةُ فِيْ دَارِ الْحَرْبِ . وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ الْاَفْضَلُ اَنْ يُقَسِّمَ فِيْ دَارِ الْاِسْلَامِ . وَوَجْهُ الْكَرَاهَةِ اَنَّ دَلِيْلَ الْبُطْلَانِ رَاجِحٌ، اِلَّا اَنَّهٗ تَقَاعَدَ عَنْ سَلْبِ الْجَوَازِ فَلَا يَتَقَاعَدُ عَنْ اِيْرَاثِ الْكَرَاهَةِ ـ

অনুবাদ : দারুল ইসলামে নিয়ে আসার পূর্বে দারুল হরবে গনিমতের মাল বণ্টন করা হবে না। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, তাতে কোনো দোষ নেই। বিষয়টির মূলভিত্তি হলো, আমাদের মতে দারুল ইসলামের সীমানায় এনে সংরক্ষণের পূর্বে মুজাহিদদের মালিকানা সাব্যস্ত হয় না। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে মালিকানা সাব্যস্ত হয়ে যায়। এ মূল ভিত্তির উপর কয়েকটি মাসআলা নির্ভর করে। যেগুলো আমরা কিফায়াতুল মুনতাহী নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছি।

তাঁর (ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হলো, মালিকানার কারণ হলো মুবাহ মালে দখল প্রতিষ্ঠিত হওয়া। যেমন শিকারের পশু-পাখির ক্ষেত্রে। আর দখল প্রতিষ্ঠার অর্থ কব্জা প্রতিষ্ঠিত হওয়া ছাড়া অন্য কিছু নয়। আর তা তো দারুল হবরেই) সম্পন্ন হয়েছে।

আমাদের দলিল হলো, নবী করীম ﷺ দারুল হরবে গনিমতের মাল বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। এ বিষয়েও (আমাদের মাঝে ও তার মাঝে) মতভিন্নতা রয়েছে। আর গুণগতভাবে বণ্টনও একপ্রকার বিক্রয়; সুতরাং এটাও নিষেধাজ্ঞার আওতায় আসবে।

আরো একটি কারণ হলো, দখল প্রতিষ্ঠার অর্থ হলো রক্ষা ও স্থানান্তরের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হওয়া। আর দ্বিতীয়টি এখানে অবিদ্যমান। কেননা তাদের পুনরুদ্ধারের ক্ষমতা রয়েছে। আর (তাদের সীমানায় অবস্থান পর্যন্ত) সেটা হওয়াই স্বাভাবিক।

আবার কেউ কেউ বলেছেন, মতভিন্নতার ক্ষেত্র এই যে, শাসক যদি নিজস্ব ইজতিহাদ ছাড়া বণ্টন করেন তাহলে এ বণ্টনের উপর মালিকানার যাবতীয় আহকাম প্রযুক্ত হবে কিনা। কেননা মালিকানার আহকাম তো মালিকানা ছাড়া প্রযুক্ত হতে পারে না।

কোনো কোনো মতে (আমাদের মাযহাবে) নিষেধের অর্থ (জায়েজ না হওয়া নয়) মাকরূহ হওয়া এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে এটা মাকরূহে তানযিহী। কেননা তিনি বলেছেন, ইমাম আবূ হানীফা (র.) এবং ইমাম

https://e-ilm.weebly.com/

আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে দারুল হরবে বন্টন করা জায়েজ নয়। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে দারুল ইসলামে বন্টন করা উত্তম। মাকরুহ হওয়ার কারণ হলো, সতর্কতার দাবি হিসাবে অবৈধতার দলিল অগ্রাধিকার যোগ্য। কিন্তু (সর্বসম্মতিক্রমে বিশেষ বিবেচনায়) বৈধতা রহিতকরণ থেকে বিরত থাকা হয়েছে। সুতরাং কারাহাত সাব্যস্ত করা থেকে বিরত থাকা হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মুশরিকরা পরাজিত হওয়ার পর দারুল হরবে গনিমতের মাল বন্টন করা যাবে কিনা এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। আহনাফের মতে দারুল হরবে গনিমতের মাল বন্টন করা যাবে না। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর মতে দারুল হরবে গনিমতের মাল বন্টন করতে কোনো সমস্যা নেই। ইমাম মালেক (র.)-এর মতে গনিমতের মাল দারুল হরবে বন্টন করা হবে। আর গোলাম বাঁদি দারুল ইসলামে এনে বন্টন করা হবে।

এ এখতেলাফের ভিত্তি হলো অন্য একটি এখতেলাফের উপর। সেই এখতেলাফটি হলো, গনিমতের মাল দারুল ইসলামে এনে সংরক্ষণের পূর্বে তাতে মুজাহিদদের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় কিনা। আহনাফের মত হলো গনিমতের মাল দারুল ইসলামে আনার পূর্বে তার উপর মুজাহিদদের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় না। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে গনিমতের মাল দারুল ইসলামে আনার পূর্বেই তাতে মুজাহিদদের মালিকানা সাব্যস্ত হয়ে যায়।

এতএব, ইমাম শাফেয়ী (র.) এর মতে যেহেতু দারুল হরবেই মুজাহিদদের মালিকানা সাব্যস্ত হয়ে যায় তাই দারুল হরবেই মুজাহিদদের মাঝে গনিমতের মাল বন্টন করা যাবে। আর আহনাফের মতে যেহেতু দারুল হরবে থাকা অবস্থায় গনিমতের মালের উপর মুজাহিদদের মালিকানা সাব্যস্ত হয় না, সেহেতু দারুল হরবে তা বন্টনও করা যাবে না। দারুল হরবে মালিকানা প্রতিষ্ঠা হওয়া, না হওয়া সম্পর্কিত দলিল ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন, দারুল হরবে থাকা অবস্থায়ই গনিমতের মালের উপর মুজাহিদদের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এ ব্যাপারে তার দলিল হলো এই যে, মালিকানার কারণ হলো মুবাহ বস্তুর উপর দখল প্রতিষ্ঠিত হওয়া। যেমন– শিকার পাখি, লাকড়ি ঘাস ইত্যাদি। এগুলোর উপর কারো দখল প্রতিষ্ঠিত হলেই দখলকারী ব্যক্তি এগুলোর মালিক হয়ে যায়। তদ্রূপ গনিমতের মালের উপরও দখল প্রতিষ্ঠিত হলে মালিকানা অর্জন হয়ে যাবে। আর দখলতো দারুল হরবে থাকা অবস্থায়ই প্রতিষ্ঠিত গেছে তাই দারুল হরবে মালিকানাও অর্জন হয়। অতএব বন্টন করাও শুদ্ধ হবে।

আহনাফের দলিল হলো, নবী করীম ﷺ দারুল হরবে গনিমতের মাল মুসলমানদের বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। আর বন্টন যেহেতু গুণগতভাবে একপ্রকার বিক্রয়, তাই বন্টনও এ হাদীসের আওতাভুক্ত হবে এবং নিষিদ্ধ হবে। অবশ্য ইমাম শাফেয়ী (র.) বিক্রয়ের ক্ষেত্রেও মতানৈক্য করেন।

আরেক দলিল হলো, দখল দ্বারা উদ্দেশ্য হলো রক্ষা ও স্থানান্তর করার ক্ষমতা অর্জন হওয়া। আর আলোচ্য সুরতে রক্ষা করার ক্ষমতা অর্জন হলেও স্থানান্তর করার ক্ষমতা অর্জন হয়নি বিধায়, এক্ষেত্রে দখল সাব্যস্ত হয়নি। অতএব, মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে না এবং বন্টন শুদ্ধ হবে না। বাকি স্থানান্তর করার ক্ষমতা অর্জন না হওয়ার কারণ হলো, মালগুলো এখনো দারুল হরবে থেকে যাওয়া। দেশটি যেহেতু তাদের দিকে সম্বন্ধকৃত, তাই হতে পারে যে কোনো সময় তারা পুনরায় আক্রমণ করে মালগুলো মুসলমানদের স্থানান্তর ক্ষমতা অর্জন হয়নি।

কারো কারো মতে উপরে বর্ণিত এখতেলাফের ক্ষেত্রটি হলো ইমাম যদি নিজস্ব ইজতিহাদ ব্যতীত গনিমতের মাল বন্টন করে দেয়, তাহলে বন্টনের হুকুম আহকাম প্রযোজ্য হবে কিনা? ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে বন্টনের হুকুম প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ বন্টন করে যাকে যে সম্পদ দেওয়া হয়, সে সেই সম্পদের মালিক হয়ে যাবে। আহনাফের মতে মালিক হবে না। যেহেতু তাদের মতে বন্টনের হুকুম প্রযোজ্য হচ্ছে না।

দারুল হরবে গনিমতের মাল বন্টনের হুকুম হানাফীদের মতে পূর্বের বর্ণনা অনুয়ায়ী জায়েজ নেই। কারো মতে হানাফী মাযহাবে তা মাকরুহ। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে মাকরুহে তানযীহী। মাকরুহে তানযিহী হওয়ার মত ইমাম আবূ হানীফা (র.) হতেও বর্ণিত আছে। মাকরুহ হওয়ার পক্ষে দলিল হলো, আলোচ্য মাসআলায় বন্টন জায়েজ হওয়ার পক্ষে যেমন দলিল রয়েছে তেমনি বাতিল হওয়ার পক্ষেও দলিল রয়েছে। কিন্তু সর্বসম্মতিক্রমে বন্টন জায়েজ রয়েছে। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে সাধারণ অবস্থাতেই জায়েজ আছে যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আমাদের মতেও জায়েজ আছে যদি ইমাম নিজস্ব ইজতিহাদের মাধ্যমে বন্টন করে ফেলে। তাই বন্টন কে নাজায়েজ বলা গেল না। বরং মাকরুহ বলা আবশ্যক হয়ে পড়ল, বাতিল হওয়ার দলিলের প্রতি লক্ষ্য রেখে। কেননা যদি মাকরুহ না বলা হয়, তাহলে শুধু বৈধতার দলিলের উপর আমল করা হয় এবং বাতিল হওয়ার দলিলটি সম্পূর্ণরূপে পরিহার করা হয়। পক্ষান্তরে মাকরুহ বলা হলে বৈধতা এবং অবৈধতা উভয় পক্ষের দলিলের উপরই আমল হয়ে যায়।

https://e-ilm.weebly.com/

وَالرِّدْءُ وَالْمُقَاتِلُ فِي الْعَسْكَرِ سَوَاءٌ لِاسْتِوَائِهِمْ فِي السَّبَبِ وَهُوَ الْمُجَاوَزَةُ أَوْ شُهُوْدُ الْوَقْعَةِ عَلٰى مَا عُرِفَ، وَكَذٰلِكَ إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ لِمَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ لِمَا ذَكَرْنَا ـ وَإِذَا لَحِقَهُمُ الْمَدَدُ فِيْ دَارِ الْحَرْبِ قَبْلَ أَنْ يُخْرِجُوْا الْغَنِيْمَةَ إِلٰى دَارِ الْإِسْلَامِ شَارَكُوْهُمْ فِيْهَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ بَعْدَ اِنْقِضَاءِ الْقِتَالِ وَهُوَ بِنَاءٌ عَلٰى مَا مَهَّدْنَاهُ مِنَ الْأَصْلِ، وَإِنَّمَا يَنْقَطِعُ حَقُّ الْمُشَارَكَةِ عِنْدَنَا بِالْإِحْرَازِ أَوْ بِقِسْمَةِ الْإِمَامِ فِيْ دَارِ الْحَرْبِ أَوْ بِبَيْعِهِ الْمَغَانِمَ فِيْهَا، لِأَنَّ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا يَتِمُّ الْمِلْكُ فَيَنْقَطِعُ حَقُّ شَرِكَةِ الْمَدَدِ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, **বাহিনীতে সাহায্যকারী এবং মূল লড়াইকারী উভয়ে (গনিমতের মালে) সমান হকদার।** কেননা গনিমতের হকদার হওয়ার হেতুর মধ্যে উভয়ে সমান। আর তা হলো (আমাদের মতে লড়াইয়ের নিয়তে) সীমান্ত অতিক্রম করা কিংবা (ইমাম শাফেয়ী (র.) এর মতে) যুদ্ধে উপস্থিত থাকা। যেমন আলোচিত হয়েছে। অদ্রূপ সমান হকদার হবে যদি অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে লড়াইয়ে অংশ গ্রহণ না করে। কারণ আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি।

গনিমতের মাল দারুল ইসলামে নিয়ে আসার পূর্বেই যদি সাহায্যকারী দল দারুল হরবে তাদের সাথে গিয়ে যুক্ত হয় তাহলে তারাও গনিমতের অংশীদার হবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। লড়াই শেষ হওয়ার পর এই মতভিন্নতার ভিত্তি সেই নীতির উপর যা আমরা পূর্বে বিশ্লেষণ করে এসেছি।

আর আমাদের মতে দারুল ইসলামে সংরক্ষণ করা দ্বারা কিংবা দারুল হরবে ইমাম কর্তৃক বণ্টন করার দ্বারা কিংবা গনিমতের মালগুলো তথায় বিক্রি করার দ্বারা অংশীদার হওয়ার হক রহিত হয়ে যায়। কেননা এই তিনটির কোনো একটি দ্বারা মালিকানা সম্পন্ন হয়ে যায়। ফলে সাহায্যকারী দলের অংশীদারিত্বের হক রহিত হয়ে যাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

গনিমতের মালে হকদার হওয়ার সবব বা কারণ হলো আহনাফের মতে জিহাদের উদ্দেশ্যে দারুল ইসলামের সীমান্ত অতিক্রম করা। আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে লড়াইয়ে উপস্থিত থাকা। অতএব, বাহিনীর যে সকল সদস্য সরাসরি লড়াইয়ে অংশ নেয় আর যে সকল সদস্য অনান্য কাজে নিয়োজিত থাকে, সকলেই গনিমতের মালে সমান অংশ পাবে। কারণ সীমান্ত অতিক্রম করে যাওয়ার যে হেতু রয়েছে, তা সকলের ক্ষেত্রে সমানভাবে বিদ্যমান।

যদি কোনো সদস্য অসুস্থতা জনিত কারণে কিংবা ইমাম কর্তৃক কোথায় ও প্রেরিত হওয়ার কারণে লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করতে না পারে তাহলে সেও গনিমতের মালে সমান অংশ পাবে। উপরিউক্ত কারণে।

قَوْلُهُ : وَإِذَا لَحِقَهُمُ الْمَدَدُ فِي دَارِ الْحَرْبِ الخ : গনিমতের মাল নিয়ে দারুল ইসলামে প্রবেশের পূর্বে যদি কোনো সাহায্যকারী দল গিয়ে মুজাহিদদের সাথে মিলিত হয়, তাহলেই তারা গনিমতের মালে অংশীদার হয়ে যাবে, আহনাফের মতে। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, যুদ্ধ শেষে গনিমতের মাল সংগ্রহ করার সাহায্যকারী দল গিয়ে মিলিত হলে তারা অংশীদার হবে না। এই মতপার্থক্যের ভিত্তি হলো পূর্বালোচিত মূলনীতির উপর। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে গনিমতের মালের উপর দখল সাব্যস্ত হওয়ার দ্বারা মুজাহিদদের মালিকানা প্রতিষ্ঠা হয়ে যায়। তাই গনিমত সংগ্রহ করার পর সেই মালের মধ্যে নতুন কেউ অংশীদার হতে পারবে না। পক্ষান্তরে আহনাফের মতে নতুন লোকদের অংশীদার হওয়ার সুযোগ শেষ হয় নিম্নোক্ত তিন বিষয়ের যে কোনো একটি দ্বারা ১. গনিমতের মাল দারুল ইসলামে পৌছে যাওয়া। ২. দারুল হরবে থাকা অবস্থায় ইমাম কর্তৃক বণ্টন করে দেওয়া। ৩. দারুল হরবে থাকা অবস্থায় গনিমতের মাল ইমাম কর্তৃক বিক্রি করে দেওয়া।

অতএব, এ তিন বিষয়ের কোনো একটি সংঘটিত হওয়ার পূর্বে যদি সাহায্যকারী দল এসে মিলিত হয়, তাহলে আহনাফের মতে তারাও অংশীদার হবে। আর এ তিন বিষয়ের কোনো একটি সংঘটিত হওয়ার পর কেউ এসে মিলিত হলে সেও গনিমতের মালে অংশীদার হবে। কারণ উপরিউক্ত যে কোনো বিষয়ের দ্বারা মুজাহিদরা গনিমতের মালিক হয়ে যায়। তাই এতে নতুন কেউ শরিক হতে পারবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ وَلَا حَقَّ لِاَهْلِ سُوْقِ الْعَسْكَرِ فِي الْغَنِيْمَةِ اِلَّا اَنْ يُقَاتِلُوْا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِيْ اَحَدِ قَوْلَيْهِ : يُسْهِمُ لَهُمْ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ﴿اَلْغَنِيْمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ﴾ وَلِاَنَّهُ وَجَدَ الْجِهَادَ مَعْنًى بِتَكْثِيْرِ السَّوَادِ . وَلَنَا اَنَّهُ لَمْ تُوجَدُ الْمُجَاوَزَةُ عَلٰى قَصْدِ الْقِتَالِ فَانْعَدَمَ السَّبَبُ الظَّاهِرُ فَيُعْتَبَرُ السَّبَبُ الْحَقِيْقِيُّ وَهُوَ الْقِتَالُ فَيُفِيْدُ الْاِسْتِحْقَاقَ عَلٰى حَسَبِ حَالِهِ فَارِسًا اَوْ رَاجِلًا عِنْدَ الْقِتَالِ، وَمَا رَوَاهُ مَوْقُوْفٌ عَلٰى عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ تَاْوِيْلَهُ اَنْ يُشْهِدَهَا عَلٰى قَصْدِ الْقِتَالِ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, সেনাবাহিনীর জন্য যারা বাজার বসায়, গনিমতের মালে তাদের কোনো হক নেই। তবে যদি তারা লড়াইয়ে শরিক হয়, তাহলে ভিন্ন কথা। ইমাম শাফেয়ী (র.) হতে বর্ণিত দুটি মতের একটি মতে তিনি বলেন, তাদের জন্যও হিস্‌সা নির্ধারণ করা হবে। কেননা রাসূল ﷺ বলেছেন, اَلْغَنِيْمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ গনিমত তাদের জন্য যারা ঘটনায় রয়েছে।

আর এ কারণে যে, লোক সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে গুণগতভাবে তারাও জিহাদের শামিল রয়েছে।

আমাদের দলিল হলো, লড়াইয়ের নিয়াত সীমান্ত অতিক্রম পাওয়া যায়নি। ফলে (গনিমতের মালে অংশীদার হওয়ার) বাহ্যিক কারণটি অবিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং (তাদের ক্ষেত্রে) প্রকৃত কারণটিই বিবেচতি হবে। আর তা হলো লড়াই। আর লড়াইয়ের সময়ে নিজের অবস্থা হিসাবে অশ্বারোহীর কিংবা পদাতিকের হিস্‌সার হকদার হবে।

আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর বর্ণিত হাদীসটি হযরত ওমর (রা.)-এর উপর মাওকুফ কিংবা তার ব্যাখ্যা এই যে, লড়াইয়ের উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি যুদ্ধের ঘটনায় উপস্থিত হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মুজাহিদদের কাছে বিভিন্ন কিছু বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে যারা মুজাহিদদের সাথে দারুল হরব গমন করে তারা গনিমতের মালে অংশীদার হবে কিনা এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে মতানৈক্য হয়েছে। আহনাফের মত হলো তারা অংশীদার হবে না।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) এবং এক বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী (র.)ও অনুরূপ মত পোষণ করেন। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অন্য উক্তি হলো, তাদের জন্যও হিস্‌সা নির্ধারণ করা হবে।

এক্ষেত্রে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হলো ১. রাসূল ﷺ -এর বাণী– اَلْغَنِيْمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ 'গনিমত তাদের জন্য যারা যুদ্ধের ঘটনায় উপস্থিত থাকে।'

২. ব্যবসায়ীদের কারণে মুসলিম বাহিনীর লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। সে হিসাবে তারা যুদ্ধে শরিক হয়েছে। অতএব, গনিমতের মালে তাদেরও হিসসা থাকবে। আহনাফের দলিল হলো, ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে অংশীদারিত্বের বাহ্যিক কারণটি পাওয়া যায়নি। আর তা হলো (আহনাফের মতানুসারে) জিহাদের নিয়তে দারুল ইসলামের সীমান্ত অতিক্রম করা কারণ তারা সীমান্ত অতিক্রম করেছে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে। অতএব, তাদের ক্ষেত্রে প্রকৃত কারণ বিবেচনা করতে হবে। প্রকৃত কারণ হলো লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করা। যদি কোনো ব্যবসায়ী ব্যক্তি সরাসরি লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করে তাহলে সে পদাতিক কিংবা অশ্বারোহী হিসাবে হিসসা পাবে, চার ইমামের মতেই। যদি পদাতিক অবস্থায় অংশগ্রহণ করে তাহলে পদাতিকের অংশ পাবে। আর যদি অশ্বারোহী অবস্থায় অংশগ্রহণ করে তাহলে অশ্বারোহীর হিস্‌সা পাবে। লড়াইয়ে অংশগ্রহণ না করলে কোনো হিস্‌সাই পাবে না।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিলের জবাব হলো, ১. ইমাম শাফেয়ী (র.) যে হাদীসটি পেশ করেছেন, তা মারফূ' হাদীস নয়। বরং তা হযরত ওমর (রা.)-এর উপর মাওকুফ। হাদীসটি ইবনে শায়বা সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন ২. কিংবা হাদীসটির ব্যাখ্যা হলো এই যে, যে ব্যক্তি লড়াইয়ের উদ্দেশ্য ঘটনা স্থলে উপস্থিত থাকে, তার জন্য গনিমত। অতএব, ব্যবসায়ীরা যদিও ঘটনা স্থলে উপস্থিত ছিল কিন্তু তারা লড়াইয়ের উদ্দেশ্যে উপস্থিত ছিল না, তাই তারা হিস্‌সা পাবে না। হিস্‌সা পেতে হলে লড়াইয়ের উদ্দেশ্যে উপস্থিত থাকতে হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَاِنْ لَمْ تَكُنْ لِلْاِمَامِ حَمُوْلَةٌ تُحْمَلُ عَلَيْهَا الْغَنَائِمُ قَسَمَهَا بَيْنَ الْغَانِمِيْنَ قِسْمَةَ اِيْدَاعٍ لِيَحْمِلُوْهَا اِلٰى دَارِ الْاِسْلَامِ ثُمَّ يَرْتَجِعُهَا مِنْهُمْ فَيُقَسِّمُهَا قَالَ الْعَبْدُ الضَّعِيْفُ : هٰكَذَا ذُكِرَ فِى الْمُخْتَصَرِ، وَلَمْ يَشْتَرِطْ رِضَاهُمْ وَهُوَ رِوَايَةُ السِّيَرِ الْكَبِيْرِ . وَالْجُمْلَةُ فِىْ هٰذَا اَنَّ الْاِمَامَ اِذَا وَجَدَ فِى الْمَغْنَمِ حَمُوْلَةً يَحْمِلُ الْغَنَائِمَ عَلَيْهَا لِاَنَّ الْحَمُوْلَةَ وَالْمَحْمُوْلَ مَالُهُمْ . وَكَذَا اِذَا كَانَ فِىْ بَيْتِ الْمَالِ فَضْلُ حَمُوْلَةٍ لِاَنَّهُ مَالُ الْمُسْلِمِيْنَ، وَلَوْ كَانَ لِلْغَانِمِيْنَ اَوْ لِبَعْضِهِمْ لَا يُجْبِرُهُمْ فِىْ رِوَايَةِ السِّيَرِ الصَّغِيْرِ لِاَنَّهُ اِبْتِدَاءُ اِجَارَةٍ وَصَارَ كَمَا اِذَا نَفَقَتْ دَابَّتُهُ فِىْ مَفَازَةٍ وَمَعَ رَفِيْقِهِ فَضْلُ حَمُوْلَةٍ، وَيُجْبِرُهُمْ فِىْ رِوَايَةِ السِّيَرِ الْكَبِيْرِ لِاَنَّهُ دَفْعُ الضَّرَرِ الْعَامِّ بِتَحْمِيْلِ ضَرَرٍ خَاصٍّ -

অনুবাদ : ইমামের নিকট যদি গনিমতের মাল বহন করে আনার মতো বাহন না থাকে, তাহলে তিনি আমানত হিসাবে যোদ্ধাদের মাঝে তা বন্টন করে দিবেন।' যাতে তারা সেগুলো দারুল ইসলাম পর্যন্ত বহন করে আনে অতঃপর তাদের থেকে ফেরত নিয়ে (নিয়ম মাফিক) বন্টন করবেন।

হেদায়া গ্রন্থকার বলেন, ইমাম কুদূরী (র.) এরূপই বর্ণনা করেছেন। তিনি তাদের সম্মতির শর্ত আরোপ করেননি। সিয়ারে কাবীরের বর্ণনাও তাই। এবিষয়ে মৌলিক কথা এই যে, গনিমতের মালের মধ্যে যদি বাহন থেকে থাকে তাহলে ইমাম তাতেই গনিমতের মাল বহন করবেন। কেননা বাহন এবং বাহিত দ্রব্য সবই মুসলমানদের। তদ্রূপ যদি বায়তুলমালে অতিরিক্ত বাহন থাকে। কেননা সেগুলোও মুসলমানদের মাল। পক্ষান্তরে যদি মুজাহিদদের কিংবা তাদের একাংশের বাহন থেকে থাকে তাহলে সিয়ারে সাগীর কিতাবের বর্ণনা অনুযায়ী তাদের বাধ্য করা যাবে না। কেননা সেটা হলো একটি ইজারা চুক্তির প্রারম্ভের ন্যায় এবং যেমন মরুভূমিতে কারো বাহন ধ্বংস হয়ে যাওয়া এবং সাথির কাছে অতিরিক্ত বাহন থাকার ন্যায়। কিন্তু সিয়ারে কাবীর কিতাবের বর্ণনা মতে তাদের বাধ্য করা হবে। কেননা এটা হলো ব্যক্তিগত ক্ষতি বরদাশ্ত করার মাধ্যমে সমষ্টিগত ক্ষতি রোধ করা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

দারুল হরব থেকে গনিমতের মাল বহন করে দারুল ইসলামে আনার জন্য ইমাম গনিমত হিসাবে প্রাপ্ত বাহন (উট, ঘোড়া, গাধা ইত্যাদি) ব্যবহার করতে পারবে, বায়তুলমালে কোনো বাহন থাকলে তাও ব্যবহার করতে পারবে যদি উপরিউক্ত ধরনের কোনো বাহন না থাকে, তাহলে গনিমতের মাল মুজাহিদগণের মাঝে আমানতরূপে ভাগ করে দেওয়া হবে। তারা সেগুলো নিজ নিজ বাহন দ্বারা বহন করে দারুল ইসলামে এনে পৌছে দিবে। এক্ষেত্রে মুজাহিদগণের সম্মতির প্রয়োজন আছে কিনা এ ব্যাপারে দু-রকম বর্ণনা রয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

১. সিয়ারে সাগীরের বর্ণনা মোতাবেক মাজাহিদগণের সম্মতির প্রয়োজন আছে। তারা বহন করতে সম্মত না হলে তাদেরকে বাধ্য করা যাবে না। কেননা তাদের বাহনে করে গনিমতের মাল বহন করার বিষয়টি হলো একটি নতুন ইজারা চুক্তির মতো। অর্থাৎ কেমন যেন ইমাম মুজাহিদদের বাহনগুলো নিজের কাজের জন্য ইজারা নিচ্ছে। আর ইজারার জন্য কাউকে বাধ্য করা যায় না। কেউ যদি সন্তুষ্টিক্রমে নিজের কোনো কিছু ইজারা দেয়, তাহলেই কেবল ইজারা হয়ে থাকে। জোর করে কারো থেকে কিছু ভাড়া নেওয়া যায় না। অতএব, আলোচ্য মাসআলায়ও ইমাম মুজাহিদদের সওয়ারি জোর করে নিতে পারবে না। আলোচ্য মাসআলার একটি নজির হলো, যেমন মরুভূমিতে সফর কালে কারো বাহন ধ্বংস হয়ে গেল। তার সাথির একটি অতিরিক্ত বাহন অপর সাথি ব্যবহার করতে পারবে। যদি সে সম্মত না হয়, তাহলে তার বাহন অপরজন ব্যবহার করতে পারবে না। অনুরূপ আলোচ্য মাসআলায়ও ইমামের বাহন নেই, কিন্তু তার সফরসঙ্গী মুজাহিদদের বাহন আছে। অতএব, তাদের বাহন ইমামের ব্যবহার করতে হলে অবশ্যই তাদের সম্মতি লাগবে।

২. সিয়ারে কাবীরের বর্ণনা অনুযায়ী মুজাহিদদের সম্মতির প্রয়োজন নেই; বরং ইমাম তাদেরকে বাধ্য করবে নিজেদের বাহনে গনিমতের মাল বহন করার জন্য। এ বর্ণনা অনুয়ায়ী আলোচ্য মাসআলার নজির হলো নৌকা ভাড়া নিয়ে নদীর মাঝখানে যাওয়ার পর ভাড়ার মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার মাসআলা। অর্থাৎ কেউ কারো থেকে একটি নৌকা ভাড়া নিয়ে নদীর মাঝখানে পৌছার পর ভাড়ার মেয়াদ শেষ হেয় গেল। এমতাবস্থায় পুনরায় ভাড়ার জন্য নৌকার মালিককে যেমন বাধ্য করা যায়, তেমনি আলোচ্য মাসআলায়ও ইমাম মুজাহিদদেরকে বাধ্য করতে পারবে। কেননা এতে ব্যক্তির ক্ষতি হলেও সমষ্টির উপকার হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَلَا يَجُوْزُ بَيْعُ الْغَنَائِمِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فِيْ دَارِ الْحَرْبِ لِاَنَّهُ لَا مِلْكَ قَبْلَهَا ، وَفِيْهِ خِلَافُ الشَّافِعِيِّ، وَقَدْ بَيَّنَّا الْأَصْلَ وَمَنْ مَاتَ مِنَ الْغَانِمِيْنَ فِيْ دَارِ الْحَرْبِ فَلَا حَقَّ لَهُ فِيْ الْغَنِيْمَةِ، وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ بَعْدَ اِخْرَاجِهَا اِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ فَنَصِيْبُهُ لِوَرَثَتِهِ لِاَنَّ الْاِرْثَ يَجْرِيْ فِيْ الْمِلْكِ، وَلَا مِلْكَ قَبْلَ الْاِحْرَازِ، وَاِنَّمَا الْمِلْكُ بَعْدَهُ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ بَعْدَ اِسْتِقْرَارِ الْهَزِيْمَةِ يُوْرَثُ نَصِيْبُهُ لِقِيَامِ الْمِلْكِ فِيْهِ عِنْدَهُ وَقَدْ بَيَّنَّاهُ ـ

অনুবাদ : বণ্টনের পূর্বে দারুল হরবে গনিমতের মাল বিক্রি করা জায়েজ নেই। কেননা এর পূর্বে মালিকানা সাব্যস্ত হয় না। এ বিষয়ে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর ভিন্নমত রয়েছে। আমরা এর মূলনীতি পূর্বে বর্ণনা করেছি।

দারুল হরবে গনিমত লাভকারীদের মাঝে যে ব্যক্তি মারা যায় গনিমতের মালে তার কোনো হক নেই। কিন্তু দারুল ইসলামে গনিমত নিয়ে আসার পর যে মারা যায়, তারা হিস্সা তার ওয়ারিশরা পাবে। কেননা মালিকানাভুক্ত জিনিসে মিরাশ জারি হয়। আর দারুল ইসলামে সংরক্ষণ করার পূর্বে মালিকানা অর্জিত হয় না। বরং তার পরে মালিকানা সাব্যস্ত হয়।

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, পরাজয় সুনিশ্চিত হওয়ার পর যে মুজাহিদ মারা যায় তার হিসসার মাঝে মিরাশ জারি হবে। কেননা তার মতে তাতে মালিকানা সাব্যস্ত হয়েছে। আর তা আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

বণ্টনের পূর্বে যেহেতু গনিমতের মালে কারো মালিকানা সাব্যস্ত হয় না, তাই তা বিক্রি করা জায়েজ হবে না। তবে যদি ইমাম বিক্রি করে তাহলে তা শুদ্ধ হবে। এর দ্বারা বুঝা যায়, বিক্রয় জায়েজ না হওয়ার অর্থ হলো মাকরূহ হওয়া আর এই মাকরূহও কেবল তখন হবে, যখন মুজাহিদদের প্রয়োজন ছাড়া বিক্রি করা হয়। পক্ষান্তরে যদি মুজাহিদদের কোনো প্রয়োজনে বিক্রি করা হয়, তাহলে মাকরূহ না হওয়া উচিত।

বণ্টনের পূর্বে গনিমতের মাল বিক্রয় করা জায়েজ না হওয়ার ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতভেদ রয়েছে। তাঁর মতে মালিকানা অর্জনের কারণ হলো দখল প্রতিষ্ঠা হওয়া। অতএব, যখন দখল প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর মালিকানা অর্জন হয়ে যায় বিধায় বণ্টন করা না হলেও তা বিক্রি করা জায়েজ হবে। এ মূলনীতি সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। আনাফের মতে গনিমতের মাল দারুল ইসলামে আনার পর মালিকানা প্রতিষ্ঠা হয়। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে তখন সাব্যস্ত হওয়ার পরই মালিকানা প্রতিষ্ঠা হয়। এ মূলনীতির আলোকে কোনো মুজাহিদ যদি গনিমতের মাল দারুল ইসলামে আনার পূর্বে মারা যায়, তাহলে গনিমতের মালে তার কোনো হক থাকবে না। কেননা মালিকানার কারণ বিদ্যমান হওয়ার পূর্বেই সে মারা গেছে। আর যদি দারুল ইসলামে নিয়ে আসার পর কোনো মুজাহিদ মারা যায়, তাহলে সে গনিমতের মালে অংশীদার হবে এবং তার অংশটা তার ওয়ারিশরা পাবে।

ঈমান শাফেয়ী (র.) বলেন, মুশরিকদের পরাজয় নিশ্চিত হওয়ার পর কোনো মুজাহিদ মারা গেলে সেও গনিমতের মালে হিস্সা পাবে এবং তার এ হিসসাতে মিরাশ জারি হবে। কেননা তার মতে দখল সাব্যস্ত হলেই মালিকানা প্রতিষ্ঠা হয়ে যায়।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ وَلَا بَأْسَ بِاَنْ يَعْلِفَ الْعَسْكَرُ فِيْ دَارِ الْحَرْبِ وَيَأْكُلُوْا مَا وَجَدُوْهُ مِنَ الطَّعَامِ قَالَ الْعَبْدُ الضَّعِيْفُ: اَرْسَلَ وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِالْحَاجَةِ، وَقَدْ شَرَطَهَا فِيْ رِوَايَةٍ وَلَمْ يَشْتَرِطْهَا فِيْ اُخْرٰى . وَجْهُ الْاُوْلٰى اَنَّهُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْغَانِمِيْنَ فَلَا يُبَاحُ الْاِنْتِفَاعُ بِهِ اِلَّا لِحَاجَةٍ كَمَا فِي الثِّيَابِ وَالدَّوَابِّ . وَجْهُ الْاُخْرٰى قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ ﴿فِيْ طَعَامِ خَيْبَرَ كُلُوْهَا وَاعْلِفُوْهَا وَلَا تَحْمِلُوْهَا﴾ وَلِاَنَّ الْحُكْمَ يُدَارُ عَلٰى دَلِيْلِ الْحَاجَةِ وَهُوَ كَوْنُهُ فِيْ دَارِ الْحَرْبِ، لِاَنَّ الْغَازِىَ لَا يَسْتَصْحِبُ قُوْتَ نَفْسِهِ وَعَلَفَ ظَهْرِهِ مُدَّةَ مُقَامِهِ فِيْهَا وَالْمِيْرَةُ مُنْقَطِعَةٌ، فَبَقِىَ عَلٰى اَصْلِ الْاِبَاحَةِ لِلْحَاجَةِ بِخِلَافِ السِّلَاحِ لِاَنَّهُ يَسْتَصْحِبُهُ فَانْعَدَمَ دَلِيْلُ الْحَاجَةِ، وَقَدْ تَمَسُّ اِلَيْهِ الْحَاجَةُ فَتُعْتَبَرُ حَقِيْقَتُهَا فَيَسْتَعْمِلُهُ ثُمَّ يَرُدُّهُ فِى الْمَغْنَمِ اِذَا اسْتَغْنٰى عَنْهُ، وَالدَّابَّةُ مِثْلُ السِّلَاحِ، وَالطَّعَامُ كَالْخُبْزِ وَاللَّحْمِ وَمَا يُسْتَعْمَلُ فِيْهِ كَالسَّمْنِ وَالزَّيْتِ ـ قَالَ وَيَسْتَعْمِلُوْا الْحَطَبَ وَفِيْ بَعْضِ النُّسَخِ : الطِّيْبَ، وَيَدْهِنُوْا بِالدُّهْنِ وَيُوْقِحُوْا بِهِ الدَّابَّةَ لِمَسَاسِ الْحَاجَةِ اِلٰى جَمِيْعِ ذٰلِكَ وَيُقَاتِلُوْا بِمَا يَجِدُوْنَهُ مِنَ السِّلَاحِ، كُلُّ ذٰلِكَ بِلَا قِسْمَةٍ وَتَاْوِيْلُهُ اِذَا احْتَاجَ اِلَيْهِ بِاَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ سِلَاحٌ وَقَدْ بَيَّنَّاهُ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, **বাহিনী দারুল হরবে পশুকে চারা দানা খাওয়াতে পারে এবং খাদ্য- দ্রব্য পেলে তা থেকে নিজেও খেতে পারে।**

হেদায়া গ্রন্থকার বলেন, ইমাম কুদূরী বিষয়টি নিঃশর্ত রেখেছেন। প্রয়োজনের শর্ত দ্বারা আবদ্ধ করেননি। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (র.) একটি বর্ণনায় শর্তযুক্ত করেছেন আবার অন্য বর্ণনায় শর্তযুক্ত করেননি। প্রথম বর্ণনার কারণ এই যে, এতে সকল গনিমত লাভকারীদের মধ্যে শরিকানা রয়েছে। সুতরাং অনিবার্য প্রয়োজন ছাড়া সেগুলো দ্বারা উপকৃত হওয়া বৈধ হবে না। যেমন বস্ত্র ও বাহনের ক্ষেত্রে। দ্বিতীয় বর্ণনার দলিল হলো খায়বারে প্রাপ্ত খাদ্যদ্রব্য সম্পর্কে রাসূল ﷺ -এর বাণী- كُلُوْهَا وَاعْلِفُوْهَا وَلَا تَحْمِلُوْهَا এগুলো তোমরা খেতে পার, পশুকে খাওয়াতে পার কিন্তু বহন করে নিয়ে যাবে না। তাছাড়া এ কারণে যে, বিধান প্রয়োজনের দলিলের উপর আবর্তিত হয়। আর প্রয়োজনের দলিল হলো দারুল হরবে তার উপস্থিতি। কেননা সাধারণত মুজাহিদ দারুল হরবে তার অবস্থানের পূর্ণ মেয়াদের জন্য নিজের খাবার ও পশুর চারা সাথে নিয়ে যায় না। আর রসদ বিচ্ছিন্ন হতে পারে। সুতরাং প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে মূল বৈধতার উপরই হুকুম বিদ্যমান থাকবে।

অস্ত্রের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা মুজাহিদ এগুলো সাথে নিয়ে যায়। সুতরাং এক্ষেত্রে প্রয়োজনের প্রমাণ অনুপস্থিত। তবে এক্ষেত্রেও কখনো প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। তাই প্রকৃত প্রয়োজন বিবেচ্য হবে। এবং প্রয়োজনে ব্যবহার করে প্রয়োজন শেষে আবার গনিমতের ভাণ্ডারে ফেরত দিবে। আর বাহন অস্ত্রের অনুরূপ। খাদ্যদ্রব্য দ্বারা উদ্দেশ্য হলো রুটি, গোশ্ত এবং তাতে ব্যবহৃত ঘি, তৈল।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, **জ্বালানী কাঠ ব্যবহার করতে পারবে।** কোনো কোনো নুসখায় (অনুলিপিতে) কাঠের জায়গায় খুশবুর কথা উল্লেখ রয়েছে। **আর তেল ব্যবহার করতে পারবে এবং তা দ্বারা বাহনকে মালিশ করতে পারবে।**

কেননা এ সবের প্রয়োজন দেখা দেয়। **আর প্রাপ্ত অস্ত্র দ্বারা লড়াই করতে পারবে এবং এসবই বণ্টন ছাড়া।** আর এর ব্যাখ্যা এই যে, যদি এতে তার প্রয়োজন হয় যেমন তার অস্ত্র নেই। আমরা এর কারণ বর্ণনা করে এসেছি।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

يعلف শব্দটি বাবে ضرب হতে مضارع معروف -এর واحد مذكر غائب -এর সীগাহ। মাসদার হলো علف। অর্থ হলো– পশুকে ঘাস, খড় খাওয়ানো। মতনে উল্লিখিত العسكر শব্দটি يعلف-ক্রিয়ার কর্তা। সে হিসাবে العسكر শব্দটিতে رفع হবে يعلف ক্রিয়ার مفعول বা কর্ম উহ্য আছে। তাহলো الدابة পশু।

দারুল হরবে প্রাপ্ত খাদ্য, ঘাস, অস্ত্র, বাহন ইত্যাদি বস্তু মুজাহিদগণ ব্যবহার করতে পারবে কিনা এ সম্পর্কে উপরিউক্ত ইবারতে আলোকপাত করা হয়েছে। পশুর খাদ্য ও মানুষের খাদ্য সম্পর্কে দু-রকম বর্ণনা রয়েছে–

১. সিয়ারে ছাগীরের বর্ণনা অনুযায়ী প্রয়োজন থাকার শর্তে প্রাপ্ত খাদ্য মুজাহিদরা খেতে পারবে এবং পশুর খাদ্য পশুকে খাওয়াতে পারবে।

২. সিয়ারে কাবীরের বর্ণনায় প্রয়োজন থাকার শর্ত আরোপ করা হয়নি। নিঃশর্তভাবে বলা হয়েছে প্রাপ্ত খাদ্য মুজাহিদরা খেতে পারবে এবং পশুর খাদ্য পশুকে খাওয়াতে পারবে। এ বর্ণনাটিই ইমাম কারখী ও ইমাম কুদূরী (র.) গ্রহণ করেছেন। প্রথম বর্ণনার কারণ হলো, প্রাপ্ত খাদ্য দ্রব্য ও পশু খাদ্য সকল মুজাহিদদের মাঝে শরিকানা। অর্থাৎ এর মধ্যে সকলের হক রয়েছে। অতএব, নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি সেই খাদ্য বা পশুও ব্যবহার করতে পারবে না অনিবার্য প্রয়োজন ছাড়া। যদি কারো অনিবার্য প্রয়োজন দেখা দেয় তাহলে সে উক্ত প্রয়োজন পরিমাণ খাদ্য ও পশুখাদ্য ব্যবহার করতে পারবে। যেমন বস্ত্র ও বাহনের মাসআলা। দারুল হরবে প্রাপ্ত বস্ত্র ও বাহন সকলের শরিকানা হওয়ার কারণে নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি তা ব্যবহার করতে পারে না। তবে অনিবার্য প্রয়োজন দেখা দিলে বস্ত্র ও বহন ব্যবহার করা যায়। তদ্রূপ খাদ্যও পশুখাদ্যও অনিবার্য প্রয়োজন সাপেক্ষ ব্যবহার করতে পারবে, অন্যথায় নয়। দ্বিতীয় বর্ণনার কারণ হলো এই যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, খায়বরের যুদ্ধের দিন রাসূল ﷺ বলেছেন كلوا واعلفوا ولا تحملوا অর্থাৎ (প্রাপ্ত খাদ্যদ্রব্য) তোমরা খাও, পশুকে খাওয়াও কিন্তু বহন কারো না। হাদীসটি ইমাম বায়হাকী, ইমাম যায়লাঈ, ওয়াকেদী প্রমুখ নিজ নিজ কিতাবে উল্লেখ করেছেন।

উল্লেখ্য উক্ত হাদীসে খাওয়া এবং খাওয়ানোর অনুমতি প্রদান করা হয়েছে নিঃশর্তভাবে। প্রয়োজন বিদ্যমান থাকার শর্ত আরোপ করা হয়নি।

এছাড়া আরেক কারণ হলো, (খাদ্যদ্রব্য) বৈধ হওয়ার হুকুমটি প্রয়োজনের প্রমাণের উপর আবর্তিত হয়। আর আলোচ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনের প্রমাণ বিদ্যমান আছে। কেননা মুজাহিদ যখন দারুল হরবে গমন করে, তখন নিজের ও বাহনের প্রয়োজনীয় তাবৎ খাদ্য সামগ্রী সাথে নিয়ে যায় না; বরং যতটুকু সাথে নিয়ে যায়, তা কিছু দিন পর শেষ হয়ে যায়। তাই স্বাভাবিকভাবেই মুজাহিদগণ খাদ্য পশুখাদ্যের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে। অতএব, তাদের এ প্রয়োজন ও মুখাপেক্ষীতার দিকে লক্ষ্য রেখে সকল খাদ্য মৌলিকভাবে ইবাহাতের উপরই থাকবে। যে কারো জন্য তা ব্যবহার করা বৈধ হবে। উপরিউক্ত আলোচনায় খাদ্য বলে রুটি, গোশ্‌ত, ঘি, তেল ইত্যাদি বুঝানো হয়েছে।

দারুল হরবে প্রাপ্ত অস্ত্রশস্ত্র ও বাহন সম্পর্কে কথা এই যে, অস্ত্র ও বাহনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনের দলিল বিদ্যমান নেই। কেননা মুজাহিদ দারুল হরবে যাওয়ার সময় অস্ত্র ও বাহন সাথে নিয়ে যায়। তবে কোনো সময় আবার প্রয়োজনও দেখা দেয়। যেমন কোনো মুজাহিদের তরবারি ভেঙ্গে গেল কিংবা তার ঘোড়াটি মরে গেল। এমতাবস্থায় সে অবশ্যই একটি তরবারি ও ঘোড়ার মুখাপেক্ষী হবে। অতএব, এগুলোর ক্ষেত্রে প্রকৃত প্রয়োজন বিবেচ্য হবে। অর্থাৎ যে মুজাহিদ অস্ত্র বা বাহন ব্যবহারের মুখাপেক্ষী হবে সে কেবল প্রয়োজন পরিমাণ প্রাপ্ত অস্ত্রও বাহন ব্যবহার করতে পারবে। প্রয়োজন শেষ হওয়ার পর পুনরায় সেগুলো গনিমতের ভাণ্ডারে জমা দিতে হবে।

قوله : وَيَسْتَعْمِلُوا الْحَطَبَ وَفِيْ بَعْضِ النُّسَخِ : কোনো কোনো অনুলিপিতে الحطب -এর স্থলে الطيب শব্দ আছে। কিন্তু তা শুদ্ধ নয়। কেননা الطيب শব্দ যুক্ত ইবারতের অর্থ হবে, দারুল হরবে প্রাপ্ত সুগন্ধি বণ্টনের পূর্বে ব্যবহার করা মুজাহিদদের জন্য জায়েজ হবে। অথচ তা সঠিক নয়। কেননা স্বয়ং ইমাম কুদূরী (র.) মুখতাসারুল কারখীর ব্যাখ্যাগ্রন্থে লিখেছেন দারুল হরবে প্রাপ্ত খুশবু ব্যবহার করা জায়েজ নেই।

দারুল হরবে প্রাপ্ত কাঠ কড়ি মুজাহিদরা ব্যবহার করতে পারবে। কেননা কাঠ খড়ি মুজাহিদরা দারুল ইসলাম থেকে নিয়ে যায় না। প্রাপ্ত তেল নিজেরা ব্যবহার করতে পারবে, পশুর গায়ে মালিশ করতে পারবে। কেননা এরও প্রয়োজন পড়ে। তেল দ্বারা উদ্দেশ্য হলো খাওয়ার তেল। সাজ -সজ্জার জন্য ব্যবহৃত তেল মুজাহিদরা ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহার করতে পারবে না। গনিমতের ভাণ্ডারে জমা দিতে হবে। প্রাপ্ত অস্ত্র যদি কোনো মুজাহিদের ব্যবহার করার প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে ব্যবহার করতে পারবে এবং প্রয়োজন শেষে পুনরায় অস্ত্রভাণ্ডারে জমা দিতে হবে। এ মাসআলা দ্বয়ের প্রমাণ পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَلَا يَجُوْزُ اَنْ يَبِيْعُوْا مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا وَلَا يَتَمَوَّلُوْنَهُ لِاَنَّ الْبَيْعَ يَتَرَتَّبُ عَلَى الْمِلْكِ وَلَامِلْكَ عَلٰى مَا قَدَّمْنَاهُ، وَاِنَّمَا هُوَ اِبَاحَةٌ وَصَارَ كَالْمُبَاحِ لَهُ الطَّعَامُ، وَقَوْلُهُ وَلَا يَتَمَوَّلُوْنَهُ اِشَارَةٌ اِلٰى اَنَّهُمْ لَا يَبِيْعُوْنَهُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْعُرُوْضِ لِاَنَّهُ لَا ضَرُوْرَةَ اِلٰى ذٰلِكَ، فَاِنْ بَاعَهُ اَحَدُهُمْ رَدَّ الثَّمَنَ اِلَى الْغَنِيْمَةِ؛ لِاَنَّهُ بَدَلُ عَيْنٍ كَانَتْ لِلْجَمَاعَةِ . وَاَمَّا الثِّيَابُ وَالْمَتَاعُ فَيُكْرَهُ الْاِنْتِفَاعُ بِهَا قَبْلَ الْقِسْمَةِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ لِلْاِشْتِرَاكِ، اِلَّا اَنَّهُ يَقْسِمُ الْاِمَامُ بَيْنَهُمْ فِيْ دَارِ الْحَرْبِ اِذَا احْتَاجُوا اِلَى الثِّيَابِ وَالدَّوَابِّ وَالْمَتَاعِ؛ لِاَنَّ الْمُحَرَّمَ يُسْتَبَاحُ لِلضَّرُوْرَةِ فَالْمَكْرُوْهُ اَوْلٰى، وَهٰذَا لِاَنَّ حَقَّ الْمَدَدِ مُحْتَمَلٌ، وَحَاجَةُ هٰؤُلَاءِ مُتَيَقَّنٌ بِهَا فَكَانَ اَوْلٰى بِالرِّعَايَةِ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْقِسْمَةَ فِي السِّلَاحِ، وَلَا فَرْقَ فِى الْحَقِيْقَةِ لِاَنَّهُ اِذَا احْتَاجَ وَاحِدٌ يُبَاحُ لَهُ الْاِنْتِفَاعُ فِي الْفَصْلَيْنِ، فَاِنِ احْتَاجَ الْكُلُّ يُقَسَّمُ فِى الْفَصْلَيْنِ، بِخِلَافِ مَا اِذَا احْتَاجُوْا اِلَى السَّبْيِ حَيْثُ لَا يُقَسَّمُ لِاَنَّ الْحَاجَةَ اِلَيْهِ مِنْ فُضُوْلِ الْحَوَائِجِ ـ

অনুবাদ : এসবের কোনো কিছু বিক্রি করা জায়েজ হবে না এবং এগুলোকে সম্পদে রূপান্তরিত করতে পারবে না। কেননা বিক্রি মালিকানার উপর বির্ভরশীল হয়। আর আমাদের পূর্ব বিবরণ অনুযায়ী এগুলোতে মালিকানা সাব্যস্ত হয় না। বরং ব্যবহারের বৈধতা দান করা হয়েছে মাত্র। সুতরাং সে ঐ ব্যক্তির মতো হলো যার জন্য (মালিকের পক্ষ থেকে) খাবার বৈধ করে দেওয়া হয়েছে। ইমাম কুদূরীর শব্দ لَا يَتَمَوَّلُوْنَهُ (এগুলোকে সম্পদে পরিণত করা যাবে না) দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, স্বর্ণ, রৌপ্য ও অনান্য দ্রব্যের বিনিময়ে এগুলোকে বিক্রি করতে পারবে না। কেননা তা করার প্রয়োজন নেই। যোদ্ধাদের কেউ যদি তা বিক্রি করে তাহলে তার মূল্য গনিমতের মালে ফেরত দিবে। কেননা এই মূল্য হচ্ছে এমন বস্তুর বদল, যার মালিকানা ছিল সমগ্র জামাতের, আর বস্ত্র ও অন্যান্য আসবাব বণ্টনের পূর্বে বিনা প্রয়োজন ব্যবহার করা মাকরূহ, সবার অংশীদারিত্ব থাকার কারণে। অবশ্য বস্ত্র, বাহন ও অনান্য আসবাব ব্যবহারের প্রয়োজন দেখা দিলে শাসক দারুল হরবেই তাদের মাঝে তা বণ্টন করে দিবেন। কেননা প্রয়োজনের জন্য হারাম জিনিসও মুবাহ হয়ে যায়। সুতরাং মাকরূহ মুবাহ হওয়া আরো স্বাভাবিক।

এর কারণ হলো, সাহায্যকারী দলের (আগমন এবং উক্ত মালে তাদের) হক নির্ধারিত হওয়ার বিষয়টি সম্ভাবনাভুক্ত। পক্ষান্তরে এদের প্রয়োজন হলো সুনিশ্চিত। সুতরাং এটাই অধিক বিবেচনাযোগ্য।

অস্ত্র বণ্টনের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়নি। প্রকৃতপক্ষে অস্ত্রও বস্ত্রের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। কেননা কারো প্রয়োজন হয়ে পড়লে উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা জায়েজ রয়েছে। সুত :ং যদি বসার ই প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে উভয় ক্ষেত্রেই বণ্টন করা হবে।

পক্ষান্তরে দাস-দাসীর প্রয়োজন দেখা দেওয়ার বিষয়টি ভিন্ন, সেগুলো বণ্টন করা হবে না। কেননা এসবের প্রয়োজন হলো মৌলিক প্রয়োজনের বাইরে ।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

দারুল হরবে প্রাপ্ত খাদ্য, পশুখাদ্য কাঠ ইত্যাদি বন্টনের পূর্বে কেউ বিক্রি করতে পারবে না। কারণ বন্টনের পূর্বে এগুলোতে কারো মালিকানা সাব্যস্ত হয় না। আর মালিকানা ছাড়া বস্তু বিক্রি করা যায় না। তবে ওসব দ্রব্য মুজাহিদদের জন্য বন্টনের পূর্বে ব্যবহারের অনুমতি রয়েছে। সে হিসাবে এগুলো ঐ খানার মতো হলো, যে খানাব মালিক কাউকে খানা খাওয়ার অনুমতি দেয়। সেই অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য উক্ত খানা খাওয়া জায়েজ হয়। কিন্তু বিক্রি করা জায়েজ হয় না।

কেউ যদি কোনো দ্রব্য বিক্রি করে তাহলে তার মূল্য গনিমতের ভাণ্ডারে জমা দিতে হবে। কারণ এ মালে এবং তার মূল্যে সকল মুজাহিদদের মালিকানা রয়েছে। এসব দ্রব্য প্রয়োজনের আগ থেকে নিজের কাছে সঞ্চয় করে রাখাও জায়েজ নেই। বস্ত্র ও অন্যান্য সামগ্রী ব্যবহারের প্রয়োজন দেখা দিলে মুজাহিদগণ ব্যবহার করতে পারবে। প্রয়োজন দেখা না দিলে ব্যবহার করা মাকরূহ। কারণ এতে সকল মুজাহিদের মালিকানা রয়েছে। তবে যদি সকল মুজাহিদ বস্ত্র বাহন ইত্যাদির মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে, তাহলে ইমাম সেগুলো দারুল হরবেই বন্টন কর দিবেন। কারণ হারাম বিষয়ও প্রয়োজনের কারণে জায়েজ হয়ে যায়। অতএব, মাকরূহ বিষয়ের তো কথাই নেই।

মোটকথা, দারুল হরবে গনিমত বন্টন করা মাকরূহ হওয়া সত্ত্বেও প্রয়োজনের কারণে বন্টন করা হবে। বস্ত্র, বাহন ইত্যাদি দারুল হরবে বন্টনের পক্ষে আরেকটি যুক্তি এই যে, কোনো সাহায্যকারী দল আসা এবং উক্ত গনিমতের মাল অংশীদার হওয়ার ব্যাপারটি ইহতিমালী বা সম্ভাব্যপূর্ণ। আর উপস্থিত মুজাহিদের মুখাপেক্ষীতার ব্যাপারটি নিশ্চয়তাপূর্ণ তাই নিশ্চয়তাপূর্ণ দিকটিকেই প্রাধান্য দেওয়া হবে এবং তাদের মাঝে বস্ত্র, বাহন বন্টন করে দেওয়া হবে।

অস্ত্রের মাসআলা বস্ত্রের ন্যায়। অর্থাৎ প্রয়োজনের খাতিরে যেমন বস্ত্র ব্যবহার করা যায়, তেমনি অস্ত্রও ব্যবহার করা যায়। সকলের প্রয়োজন দেখা দিলে যেমন বস্ত্র বন্টন করে দেওয়া হয়, তেমনি সকলের প্রয়োজন হলে অস্ত্রও বন্টন করে দেওয়া হবে।

গোলাম বাদির প্রয়োজনে মৌলিক প্রয়োজন বলে গণ্য নয়। অতএব, বন্টনের পূর্বে গোলামবাদি ব্যবহার করা বৈধ হবে না এবং তা দারুল হরবে বন্টনও করা হবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ وَمَنْ اَسْلَمَ مِنْهُمْ مَعْنَاهُ فِيْ دَارِ الْحَرْبِ اَحْرَزَ بِاِسْلَامِهٖ نَفْسَهٗ لِاَنَّ الْاِسْلَامَ يُنَافِي اِبْتِدَاءَ الْاِسْتِرْقَاقِ وَاَوْلَادَهُ الصِّغَارَ لِاَنَّهُمْ مُسْلِمُوْنَ بِاِسْلَامِهٖ تَبَعًا وَكُلَّ مَالٍ هُوَ فِيْ يَدِهٖ لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ ﴿مَنْ اَسْلَمَ عَلٰى مَالٍ فَهُوَ لَهٗ﴾ وَلِاَنَّهٗ سَبَقَتْ يَدُهُ الْحَقِيْقِيَّةُ اِلَيْهِ يَدَ الظَّاهِرِيْنَ عَلَيْهِ اَوْ وَدِيْعَةً فِيْ يَدِ مُسْلِمٍ اَوْ ذِمِّيٍّ لِاَنَّهٗ فِيْ يَدٍ صَحِيْحَةٍ مُحْتَرَمَةٍ وَيَدُهٗ كَيَدِهٖ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, **তাদের মধ্য থেকে কেউ যদি ইসলাম গ্রহণ করে** অর্থাৎ দারুল হরবের মধ্যে, **তাহলে সে তার ইসলাম দ্বারা নিজেকে নিরাপদ করে নিল।** কেননা ইসলাম গ্রহণ প্রাথমিক দাসত্বের পরিপন্থি। **এবং তার ছোট সন্তান দিগকেও নিরাপদ করে নিল।** কেননা তার ইসলাম গ্রহণের কারণে অনুগামী হিসাবে তারাও মুসলমান হিসাবে গণ্য। **আর তার সে সমস্ত সম্পদ নিরাপদ করে নিল যা তার কব্জায় রয়েছে।** কেননা নবী করীম ﷺ বলেছেন- مَنْ اَسْلَمَ عَلٰى مَالٍ فَهُوَ لَهٗ 'যে ব্যক্তি কোনো মাল নিয়ে ইসলাম গ্রহণ করবে সে মাল তারই হবে।'

তাছাড়া এ কারণেও যে, এমালের উপর তার কব্জা বিজয়ীদের বিজয়গত কব্জা থেকে অগ্রবর্তী হয়েছে। **কিংবা কোনো মুসলমান বা জিম্মির হাতে আমানতরূপে রক্ষিত মালকেও সে নিরাপদ করে নিল।** কেননা তা বৈধ ও সম্মানযোগ্য হস্তে রয়েছে। আর আমানত রক্ষাকারী হস্ত তার হস্তেরই সমতুল্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যে ব্যক্তি দারুল হরবে ইসলাম গ্রহণ করে সে তার ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে নিজেকে দাসত্বের হাত থেকে রক্ষা করবে।

ইসলাম গ্রহণ করলে দাসত্বের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া কারণ হলো দাসত্ব মূলত কুফরির প্রতিদান। কেননা মানুষ যখন আল্লাহর গোলাম হতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে, তখন আল্লাহ তা'আলা এর প্রতিদান হিসাবে তাকে তার গোলামের গোলাম বানিয়ে দেন। অতএব, কেউ যদি ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে সে এ থেকে রক্ষা পাবে। তবে কেউ যদি পূর্ব থেকেই দাস হয়ে থাকে তাহলে মুসলামন হওয়ার পরও সে দাস থাকবে।

ব্যক্তির অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান তার অনুগামী হয়ে থাকে। সে হিসাবে ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তির ছোট সন্তানরাও মুসলমান বলে গণ্য হবে এবং দাসত্বের হাত থেকে রক্ষা পাবে। ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তির মালিকানায় যে সম্পদ থাকে, তাও তার মালিকানায় অবিশিষ্ট থাকবে। কেননা রাসূল ﷺ বলেছেন مَنْ اَسْلَمَ عَلٰى مَالٍ فَهُوَ لَهٗ -যে ব্যক্তি কোনো মাল নিয়ে ইসলাম গ্রহণ করে, সে সম্পদ তারই থাকে। আর যুক্তি হলো এই যে, তার সম্পদের উপর তার দখল বিজয়ীদের দখল থেকেও অগ্রবর্তী। অতএব, তার দখলের মূল্যায়ন করা হবে। সম্পদ তার মালিকানায় থাকবে।

ইসলাম গ্রহণকারীব কোনো সম্পদ যদি কোনো মুসলমানের হাতে বা কোনো জিম্মির হাতে আমানত থাকে, তাহলে সে সম্পদও তার মালিকানায় অবশিষ্ট থাকবে। কারণ আমানত গ্রহণকারীর হাত আমানত দাতার সমকক্ষ। অতএব সে সম্পদও তার মালিকানায় অক্ষুণ্ন থাকবে। আর যে সম্পদ কোনো হারবীর হাতে আমানত থাকে, তা গনিমত বলে গণ্য হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

فَإِنْ ظَهَرْنَا عَلَى دَارِ الْحِرَابِ فَعَقَارُهُ فَيْءٌ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : هُوَ لَهُ لِأَنَّهُ فِيْ يَدِهِ فَصَارَ كَالْمَنْقُوْلِ . وَلَنَا أَنَّ الْعَقَارَ فِيْ يَدِ أَهْلِ الدَّارِ وَسُلْطَانِهَا إِذْ هُوَ مِنْ جُمْلَةِ دَارِ الْحَرْبِ فَلَمْ يَكُنْ فِي يَدِهِ حَقِيْقَةً، وَقِيْلَ هٰذَا قَوْلُ أَبِيْ حَنِيْفَةَ وَأَبِيْ يُوْسُفَ الْآخَرُ . وَفِيْ قَوْلِ مُحَمَّدٍ وَهُوَ قَوْلُ أَبِيْ يُوْسُفَ الْأَوَّلُ هُوَ كَغَيْرِهِ مِنَ الْأَمْوَالِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْيَدَ حَقِيْقَةً لَا تَثْبُتُ عَلَى الْعَقَارِ عِنْدَهُمَا، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ تَثْبُتُ وَزَوْجَتُهُ فَيْءٌ لِأَنَّهَا كَافِرَةٌ حَرْبِيَّةٌ لَا تَتْبَعُهُ فِي الْإِسْلَامِ وَكَذَا حَمْلُهَا فَيْءٌ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ . هُوَ يَقُوْلُ إِنَّهُ مُسْلِمٌ تَبَعًا كَالْمُنْفَصِلِ . وَلَنَا أَنَّهُ جُزْؤُهَا فَيَرِقُّ بِرِقِّهَا وَالْمُسْلِمُ مَحَلٌّ لِلتَّمَلُّكِ تَبَعًا لِغَيْرِهِ بِخِلَافِ الْمُنْفَصِلِ لِأَنَّهُ حُرٌّ لِانْعِدَامِ الْجُزْئِيَّةِ عِنْدَ ذٰلِكَ ـ

অনুবাদ : যদি আমরা দারুল হরবে বিজয় লাভ করি, তাহলে ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তির স্থাবর সম্পত্তি গনিমতরূপে গণ্য হবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, সেটা তারই থাকবে। কেননা তার কব্জায় রয়েছে। সুতরাং তা অস্থাবর সম্পদের মতোই হলো। আমাদের দলিল এই যে, উক্ত ভূসম্পদ দেশের অধিবাসীদের এবং দেশের শাসকের কব্জায় রয়েছে কেননা তা দারুল হরবের সমগ্র ভূমির অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং প্রকৃত পক্ষে তা তার কব্জায় নেই। কেউ কেউ বলেন, এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মত এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) এর পরবর্তী মত। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মাদ (র.) এর মতে এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) এর প্রথম মত অনুয়ায়ী স্থাবর সম্পত্তি অন্যান্য সম্পদের ন্যায়।

এর ভিত্তি এই যে, শাইখানের মতে স্থাবর সম্পদে প্রকৃত কব্জা সাব্যস্ত হয় না। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর মতে তা সাব্যস্ত হয়। **আর তার স্ত্রী গনিমতের মালরূপে গণ্য হবে।** কারণ সে কাফের হারবী নারী ইসলামের ক্ষেত্রে সে স্বামীর অনুগামী নয়। **ঐ স্ত্রীর গর্ভস্থ সন্তান গনিমতরূপে গণ্য হবে।** ইমাম শাফেয়ী (র.) ভিন্নমত পোষণ করে বলেন, ভূমিষ্ঠ সন্তানের ন্যায় গর্ভস্থ সন্তানও অনুগামী রূপে মুসলমান বলে বিবেচিত হবে।

আমাদের দলিল এই যে, গর্ভস্থ সন্তান স্ত্রীরই অংশ তার দাসত্বের কারণে সেও দাসরূপে গণ্য হবে। আর মুসলিম অন্যের অনুগামী হিসাবে মালিকানার পাত্র হতে পারে। ভূমিষ্ঠ সন্তানের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর অংশত্ব বিদ্যমান না থাকার কারণে সে স্বাধীন হয়ে যায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিউক্ত ইবারতে ৩টি মাসআলা আলোচনা করা হয়েছে−

১. মুসলিম বাহিনী যদি দারুল হরবের উপর বিজয় লাভ করে তাহলে পূর্বালোচিত মুসলিম ব্যক্তির স্থাবর সম্পত্তির কি হুকুম এনিয়ে ইমামগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে।

ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর মতে, স্থাবর সম্পত্তি অস্থাবর সম্পদের মতোই। অর্থাৎ অস্থাবর সম্পদ যেমন ব্যক্তির মালিকানায় বহাল থাকে, তেমনি স্থাবর সম্পত্তিও ব্যক্তির মালিকানায় বহাল

https://e-ilm.weebly.com/

থাকবে (যাহেরুর রেওয়ায়েত অনুযায়ী) ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে স্থাবর সম্পত্তি গনিমত বলে গণ্য হবে। ইমাম মালেক প্রমুখের মতের পক্ষে দলিল হলো স্থাবর সম্পত্তি কব্জায় আছে তাই তার মালিকানাও থাকবে। যেমন অস্থাবর তার কব্জায় থাকার কারণে তার মালিকানায় থাকে। অর্থাৎ ইমামত্রয়ের মতে স্থাবর অস্থাবর উক্ত উভয় প্রকার সম্পদের এক হুকুম। আহনাফের দলিল হলো এই যে, ব্যক্তির স্থাবর সম্পত্তি মূলত ব্যক্তির কব্জায় নয়। বরং তা দারুল হরবের অধিবাসীদের সম্পদ এবং তা প্রকৃত পক্ষে বাদশাহর কব্জায়। অতএব, দেশ বিজিত হওয়ার ফলে তা গনিমত বলে গণ্য হবে।

কোনো কোনো বর্ণনা মতে উল্লিখিত মতটি ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর প্রথম উক্তি হলো স্থাবর সম্পত্তি ব্যক্তির মালিকানায় বহাল থাকবে।

এই এখতেলাফের ভিত্তি হলো একথার উপর যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে স্থাবর সম্পত্তির উপর প্রকৃত কব্জা প্রতিষ্ঠিত হয় না; বরং স্থাবর সম্পত্তি বাদশাহর কব্জায় থাকে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর মতে স্থাবর সম্পত্তির উপর ব্যক্তির প্রকৃত কব্জা প্রতিষ্ঠিত হয়। অতএব তার মতে স্থাবর এবং অস্থাবর উভয় সম্পদ এক হুকুমের আওতাভুক্ত। আবূ ইউসুফ (র.) হতে দুরকম মতই বর্ণিত আছে।

ফকীহ আবুল লাইস (র.) জামেসাগীরের ব্যাখ্যা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর অভিমত ইমাম শাফেয়ী (র.) প্রমুখের মতের অনুরূপ। কিন্তু যাহেরুর রেওয়ায়েত অনুযায়ী আহনাফের পরস্পরে কোনো মতভেদ নেই।

২. দারুল হরবে ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তির স্ত্রী গনীমত বলে গণ্য হবে। কারণ স্ত্রী একজন কাফের হরবী নারী। ইসলামের ক্ষেত্রে সে স্বামীর অনুগামী নয়। তাই স্বামী মুসলমান হওয়ার কারণে স্ত্রী মুসলমান বলে গণ্য হবে না।

৩. আহনাফের মতে উক্ত মহিলার গর্ভস্থ সন্তানও গনিমত। ইমাম শাফেয়ী (র.) এর মতে গর্ভস্থ সন্তান গনিমত নয়। তিনি গর্ভের সন্তানকে ভূমিষ্ট সন্তানের সাথে কিয়াস করে বলেন, ভূমিষ্ঠ সন্তানরা যেমন পিতার অনুগামী হিসাবে মুসলিম এবং স্বাধীন হয়ে যায়, তেমনি গর্ভস্থ সন্তানও পিতার অনুগামী হিসাবে মুসলিম এবং স্বাধীন হবে। আহনাফের দলিল হলো গর্ভস্থ সন্তান তার মায়ের অংশ তাই সে মায়ের অনুগামী হিসাবে গনিমত হবে। তবে দীনের দিক থেকে পিতার অনুগামী হিসাবে মুসলিম হবে।

এক্ষেত্রে প্রশ্ন হয় যে, মুসলিম সত্তা মালিকানার মহল হয় কিভাবে? এর উত্তরে গ্রন্থকার বলেছেন وَالْمُسْلِمُ مَحَلٌّ لِلتَّمَلُّكِ تَبَعًا لِغَيْرِهِ -মুসলিম সত্তা সরাসরি মালিকানার মহল না হলেও অন্যের অনুগামী হিসাবে কারো মালিকানার মহল হতে পারে। অর্থাৎ কারো গোলাম বাঁদী হতে পারে। অতএব, আলোচ্য ক্ষেত্রে গর্ভস্থ শিশুটি মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও মায়ের অনুগামী হিসাবে গনিমত বলে গণ্য হবে।

ইমাম শাফেয়ী (র.) এর কিয়াসের জবাব ইমাম শাফেয়ী (র.) যে গর্ভস্থ শিশুকে ভূমিষ্ঠ শিশুর সাথে কিয়াস করেছেন তা সঠিক নয়। কারণ উভয়ের মাঝে পার্থক্য বিদ্যমান আছে। পার্থক্য এই যে, ভূমিষ্ঠ শিশু মায়ের অংশ নয়। তাই সে মায়ের অনুগামী হয় না। পক্ষান্তরে গর্ভস্থ শিশুটি মায়ের অংশ, সে হিসাবে সে মায়ের অনুগামী হওয়া আবশ্যক।

https://e-ilm.weebly.com/

وَاَوْلَادُهُ الْكِبَارُ فَيْءٌ لِاَنَّهُمْ كُفَّارٌ حَرْبِيُّونَ وَلَا تَبَعِيَّةَ وَمَنْ قَاتَلَ مِنْ عَبِيْدِهِ فَيْءٌ لِاَنَّهُ لَمَّا تَمَرَّدَ عَلٰى مَوْلَاهُ خَرَجَ مِنْ يَدِهِ فَصَارَ تَبَعًا لِاَهْلِ دَارِهِمْ وَمَا كَانَ مِنْ مَالِهِ فِيْ يَدِ حَرْبِيٍّ فَهُوَ فَيْءٌ غَصْبًا كَانَ اَوْ وَدِيْعَةً ؛ لِاَنَّ يَدَهُ لَيْسَتْ بِمُحْتَرَمَةٍ وَمَا كَانَ غَصْبًا فِيْ يَدِ مُسْلِمٍ اَوْ ذِمِّيٍّ فَهُوَ فَيْءٌ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ . وَقَالَ مُحَمَّدٌ (رحـ) : لَا يَكُوْنُ فَيْئًا قَالَ الْعَبْدُ الضَّعِيْفُ رَحِمَهُ اللّٰهُ : كَذَا ذُكِرَ الِاخْتِلَافُ فِي السِّيَرِ الْكَبِيْرِ . وَذَكَرُوْا فِيْ شُرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ قَوْلَ اَبِيْ يُوْسُفَ مَعَ مُحَمَّدٍ . لَهُمَا اَنَّ الْمَالَ تَابِعٌ لِلنَّفْسِ، وَقَدْ صَارَتْ مَعْصُوْمَةً بِاِسْلَامِهِ فَيَتْبَعُهَا مَالُهُ فِيْهَا . وَلَوْ أَنَّهُ مَالٌ مُبَاحٌ فَيُمْلَكُ بِالِاسْتِيْلَاءِ وَالنَّفْسُ لَمْ تَصِرْ مَعْصُوْمَةً بِالْاِسْلَامِ؛ اَلَا تَرٰى اَنَّهَا لَيْسَتْ بِمُتَقَوَّمَةٍ اِلَّا اَنَّهُ مُحَرَّمُ التَّعَرُّضِ فِي الْاَصْلِ لِكَوْنِهِ مُكَلَّفًا وَاِبَاحَةُ التَّعَرُّضِ بِعَارِضِ شَرِّهِ وَقَدْ اِنْدَفَعَ بِالْاِسْلَامِ، بِخِلَافِ الْمَالِ؛ لِاَنَّهُ خُلِقَ عُرْضَةً لِلِامْتِهَانِ فَكَانَ مَحَلًّا لِلتَّمَلُّكِ وَلَيْسَتْ فِي يَدِهِ حُكْمًا فَلَمْ تَثْبُتْ الْعِصْمَةُ ـ

অনুবাদ : তার সাবালক সন্তানরা গনিমতের মালরূপে গণ্য। কেননা তারা কাফের হারবী। আর (সাবালক সন্তানের ক্ষেত্রে) অনুগামিতা নেই। তার গোলামদের মধ্যে যারা লড়াই করেছে তারা গনিমতের মাল হবে। কেননা মনিবের বিরুদ্ধাচারণের কারণে তারা তার কব্জা থেকে বের হয়ে গেছে। ফলে তারা দারুল হরবের অধিবাসীদের অনুগামী হয়ে পড়েছে।

কোনো হারবীর হাতে তার যে মাল রয়েছে তা গনিমতের মাল হবে। গসবকৃত হোক বা আমানত হোক। কেননা তার কব্জা সম্মানিত নয়।

আর তার যে মাল কোনো মুসলমান কিংবা জিম্মির কব্জায় গসবের মাল হিসাবে রয়েছে ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মতে তা গনিমতের মাল হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, তা গনিমতের মাল হবে না।

হেদায়া গ্রন্থকার বলেন, সিয়ারে কাবীর কিতাবে ইমাম মুহাম্মদের এরূপ মতভিন্নতাই উল্লেখ করেছেন। আর জামে ছাগীরের ব্যাখ্যা গ্রন্থে ভাষ্যকারগণ ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) এর মতামত ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর অনুকূলে উল্লেখ করেছেন।

সাহেবাইনের দলিল হলো, মাল হচ্ছে ব্যক্তি সত্তার অনুগামী আর তার ব্যক্তি সত্তা ইসলাম গ্রহণ দ্বারা নিরাপদ হয়েছে। সুতরাং নিরাপত্তার ক্ষেত্রে তার মালও তার ব্যক্তি সত্তার অনুবর্তী হবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, উক্ত মাল হচ্ছে মুবাহ মাল। সুতরাং দখল দ্বারা দখলকারীর মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। আর ব্যক্তিসত্তা ইসলাম গ্রহণ দ্বারা নিরাপদ হয়নি।

দেখুন না মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও তা মূল্য সম্পন্ন নয়। তবে শরিয়তের বিধান প্রাপ্ত হওয়ার কারণে মূলত তার উপর হস্তক্ষেপ হারাম। কিন্তু তার দুষ্কৃতির অবস্থার কারণে তার উপর হস্তক্ষেপ (হত্যা করা) বৈধ ছিল। আর দুষ্কৃতির উপসর্গ ইসলাম গ্রহণের কারণে দূরীভূত হয়েছে। কিন্তু মালের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা নগণ্য হিসাবে ব্যবহারের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। ফলে তা মালিকানার পাত্র হয়েছে। আর আইনগতভাবে তা তার কব্জায় নেই। অতএব নিরাপত্তা সাব্যস্ত হবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিউক্ত ইবারতে দুটি মাসআলা আলোচিত হয়েছে–

১. দারুল হরবে ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তির সাবালক সন্তানদের হুকুম কি? এ সম্পর্কে কথা হলো, সন্তান সাবালক হলে সে আর দীনের দিক থেকে পিতার অনুগামী হয় না। যদি সন্তান নিজে ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে মুসলমান। অন্যথায় কাফের থাকবে। অতএব, আলোচ্য ক্ষেত্রে সন্তান যেহেতু নিজে ইসলাম গ্রহণ করেনি এবং সাবালক হওয়ার কারণে সে পিতার অনুগামী হিসাবেও মুসলমান নয়, সেহেতু সে কাফের হারবী। তাই সে মুসলমানদের কাছে গনিমত রূপে গণ্য হবে।

২. দারুল হরবে ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তির কোনো গোলাম যদি মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে শরিক হয়, তাহলে সে আর উক্ত ব্যক্তির মাল থাকবে না। বরং সে মুসলমানদের গনিমত হয়ে যাবে। কারণ গোলামটি মনিবের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। তাই সে তার কব্জা থেকে বের হয়ে গেছে। এবং দারুল হরবের অধিবাসীদের অনুগামী হয়ে গেছে। ফলে দারুল হরবের অন্যান্য অধিবাসীদের যে হুকুম উক্ত গোলামেরও সেই হুকুম।

قوله : وَمَا كَانَ مِنْ مَالِهِ فِي يَدِ حَرْبِيٍّ الخ : উপরিউক্ত ইবারতে দুটি মাসআলা আলোচিত হয়েছে।

১. দারুল হরবে ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তির মাল যদি হরবীর হাতে গছব কিংবা আমানত হিসাবে থাকে তাহলে তা গনিমত হয়ে যাবে। কারণ হরবী ব্যক্তির কব্জা সন্মানিত নয়।

২. দারুল হরবে ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তির যে মাল কোনো মুসলমান অথবা যিম্মির হাতে গছব হিসাবে থাকে, তার হুকুম নিয়ে আহনাফের মাঝে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মতে উক্তমাল গনিমত, সাহেবাইনের মতে গনিমত নয়।

সাহেবাইনের দলিল : সম্পদ ব্যক্তির তাবে বা অনুগামী ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করার মাধ্যমে নিরাপদ হয়ে গেছে। অতএব তার অনুগামী হিসাবে তার সম্পদও নিরাপদ হয়ে যাবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর দলিল এই যে, ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তির নিকট থেকে যে মাল কোনো মুসলমান বা জিম্মি গছব করে নিয়েছে, তা মুবাহ, মা'সূম বা নিরাপত্তাগুণ সম্পন্ন নয়। আর মুবাহকাহ মালের উপর কারো দখল প্রতিষ্ঠা হলে সে উক্ত মালের মালিক হয়ে যায়। অতএব, মুসলমান বা জিম্মি কর্তৃক গসবকৃত মুবাহ সম্পদে যখন মুজাহিদদের দখল প্রতিষ্ঠা হবে, তখন অবশ্যই তা মুজাহিদদের মালিকানায় চলে যাবে অর্থাৎ গনিমতে পরিণত হবে।

সাহেবাইনের দলিলের জবাব : সাহেবাইন বলেছিলেন, সম্পদ ব্যক্তি সত্তার অনুগামী। আর ব্যক্তি যখন ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে নিরাপদ হয়ে গেছে, তখন সম্পদও তার অনুগামী হিসাবে নিরাপদ হয়ে যাবে। এর জবাব এই যে, ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তির সত্তা ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে নিরাপদ হয়ে গেছে এ কথাটি গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে যে নিরাপত্তা অর্জন হয়েছে তা কোনো মূল্যমান সম্পন্ন নিরাপত্তা নয়। মূল্যমান সম্পন্ন নিরাপত্তা অর্জন হয় কেবল দারুল ইসলামে প্রবেশ করার মাধ্যমে। দারুল হরবে থাকা অবস্থায় যে নিরাপত্তা অর্জন হয় তা মূল্যমান সম্পন্ন না হওয়ার দলিল হলো, যদি ঐ ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তিকে কোনো মুসলমান ইচ্ছাকৃত বা ভুলবশত হত্যা করে, তাহলে কেসাস বা দিয়ত কিছুই ওয়াজিব হয় না। এর দ্বারা বুঝা যায়, তার ব্যক্তিসত্তা প্রকৃতপক্ষে মা'সূম বা নিরাপদ নয়। অতএব, তার অনুগামী হিসাবে সম্পদ নিরাপদ হওয়ার তো প্রশ্নই আসে না।

একটি প্রশ্ন ও তার জবাব : এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন হতে পারে যে যদি উক্ত ব্যক্তি নিরাপদ না হয়ে থাকে, তাহলে তাকে হত্যা করা হারাম কেন? হরবী কাফেরের মতো তাকে হত্যা করা বৈধ নয় কেন? এর উত্তর হলো মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে তাকলীফের জন্য অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার বিধান সমূহের বোঝা বহন করার জন্য। আর এই বোঝা বহন সম্ভব নয় মানুষটি বেঁচে না থাকলে। তাই তাকলীফের জন্য তাকে বাঁচিয়ে রাখা হবে। তাকে হত্যা করা অন্যায় হবে। পক্ষান্তরে হরবী কাফেরকে হত্যা করা বৈধ হয় তার অনিষ্ট দূর করার জন্য। কিন্তু যে ইসলাম গ্রহণ করেছে, তার অনিষ্ট ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে দূরীভূত হয়ে গেছে। তাই সে আসল অবস্থায় ফিরে আসবে অর্থাৎ তাকলীফের উদ্দেশ্যে তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। হত্যা করা অন্যায় হবে।

মোটকথা দারুল হরবে ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তির সৃষ্টির উদ্দেশ্য যেহেতু তাকলীফ তাই তাকে মা'সূম সাব্যস্ত করা হয়। কিন্তু তার ইসমত প্রকৃত ইসমত বা মূল্যমান সম্পন্ন ইসমত নয়।

الا انه محرم......الخ বলে গ্রন্থকার উক্ত প্রশ্নোত্তরের দিকেই ইশারা করেছেন। بخلاف المال বলে ব্যক্তি ও সম্পদের মাঝে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। ব্যক্তির সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো মহৎ তথা তাকলীফ। তাই তার উপর কারো মালিকানা সাব্যস্ত হয় না। পক্ষান্তরে সম্পদ সৃষ্টি করা হয়েছে মানুষের ব্যবহারের উদ্দেশ্যে। অতএব, এর উপর মালিকানা সাব্যস্ত হবে। যার দখল প্রতিষ্ঠা হবে তার জন্যই মালিকানা সাব্যস্ত হবে। আলোচ্য মাসআলায় গসবকৃত সম্পদটি মুসলমান ব্যক্তির দখলে নেই, প্রকৃত পক্ষেও নয়, আইনগত ভাবেও নয়। কেননা গাছেব ব্যক্তির হাত মালিকের হাতের স্থলাভিষিক্ত নয়। অতএব, বলা যায়, আলোচ্য সম্পদটি কারো দখলেই নেই। সুতরাং যখন উক্ত সম্পদের উপর মুজাহিদদের দখল প্রতিষ্ঠা হবে, তখন অবশ্যই তাতে তাদের মালিকানা সাব্যস্ত হবে। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মাযহাব।

https://e-ilm.weebly.com/

وَاِذَا خَرَجَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ لَمْ يَجُزْ اَنْ يَعْلِفُوْا مِنَ الْغَنِيْمَةِ وَلَا يَأكُلُوْا مِنْهَا لِاَنَّ الضَّرُوْرَةَ قَدْ اِرْتَفَعَتْ، وَالْاِبَاحَةُ بِاعْتِبَارِهَا، وَلِاَنَّ الْحَقَّ قَدْ تَاَكَّدَ حَتّٰى يُوْرَثَ نَصِيْبُهُ وَلَا كَذٰلِكَ قَبْلَ الْاِخْرَاجِ اِلٰى دَارِ الْاِسْلَامِ ـ وَمَنْ فَضَلَ مَعَهُ عَلَفٌ اَوْ طَعَامٌ رَدَّهُ اِلَى الْغَنِيْمَةِ مَعْنَاهُ اِذَا لَمْ تُقَسَّمْ . وَعَنِ الشَّافِعِيِّ مِثْلُ قَوْلِنَا . وَعَنْهُ اَنَّهُ لَا يَرُدُّ اِعْتِبَارًا بِالْمُتَلَصِّصِ . وَلَنَا اَنَّ الْاِخْتِصَاصَ ضَرُوْرَةُ الْحَاجَةِ وَقَدْ زَالَتْ، بِخِلَافِ الْمُتَلَصِّصِ؛ لِاَنَّهُ كَانَ اَحَقَّ بِهِ قَبْلَ الْاِحْرَازِ فَكَذَا بَعْدَهُ، وَبَعْدَ الْقِسْمَةِ تَصَدَّقُوْا بِهِ اِنْ كَانُوا اَغْنِيَاءَ، وَانْتَفَعُوْا بِهِ اِنْ كَانُوْا مَحَاوِيجَ لِاَنَّهُ صَارَ فِيْ حُكْمِ اللُّقَطَةِ لِتَعَذُّرِ الرَّدِّ عَلَى الْغَانِمِيْنَ، وَاِنْ كَانُوْا انْتَفَعُوْا بِهِ بَعْدَ الْاِحْرَازِ تُرَدُّ قِيْمَتُهُ اِلَى الْمَغْنَمِ اِنْ كَانَ لَمْ يُقَسَّمْ، وَاِنْ قُسِّمَتْ الْغَنِيْمَةُ فَالْغَنِيُّ يَتَصَدَّقُ بِقِيْمَتِهِ وَالْفَقِيْرُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِقِيَامِ الْقِيْمَةِ مَقَامَ الْاَصْلِ فَاَخَذَ حُكْمَهُ ـ

অনুবাদ : মুসলমানগণ যখন দারুল হরবের সীমানা থেকে বের হয়ে আসবে তখন থেকে গনিমতের চারা দানা খাওয়ানো এবং গনিমতের খাদ্যদ্রব্য আহার করা জায়েজ নয়। কেননা প্রয়োজন দূরীভূত হয়ে গেছে। আর প্রয়োজনের ভিত্তিতেই বৈধতা ছিল।

তাছাড়া এখন মুসলমানদের হক দৃঢ়মূল হয়ে গেছে। এ কারণেই মুজাহিদের প্রাপ্ত হিস্সায় মিরাশ জারি হয়। অথচ দারুল ইসলামে নিয়ে আসার পূর্বে তা এরূপ ছিল না।

যার কাছে অতিরিক্ত চারা দানা বা খাদ্যদ্রব্য রয়ে গেছে সে তা গনিমতের মালে ফেরত দিবে। অর্থাৎ যদি বণ্টন না হয়ে থাকে। ইমাম শাফেয়ী (র.) থেকেও আমাদের মতামতের অনুরূপ মত বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য তারপক্ষ থেকে এরূপ বর্ণিত হয়েছে যে, ফেরত দিতে হবে না। এটা হলো দারুল হরব থেকে চোরাইকৃত মালের উপর কিয়াসের ভিত্তিতে।

আমাদের দলিল এই যে, উক্ত বিশেষ বিধান ছিল প্রয়োজনের অনিবার্য কারণে, আর তা বিদূরীত হয়েছে। চুরি করে হস্তগত কারীর বিষয়টি ভিন্ন। কেননা দারুল ইসলামে সংরক্ষণ করার পূর্বেই সে সেটার অধিক হকদার ছিল। সুতরাং পরেও অধিক হকদার হবে।

আর যদি বণ্টন হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে স্বচ্ছল ব্যক্তি হলে তা সদকা করে দিবে। আর অভাবগ্রস্থ হলে নিজেই ব্যবহার করবে। কারণ যোদ্ধাদের হাতে ফেরত দেওয়া দুঃসাধ্য হওয়ার কারণে তা লুকতার মালের (কুড়িয়ে পাওয়া সম্পদের) পর্যায়ভুক্ত হয়ে গেছে।

আর যদি দারুল ইসলামে সংরক্ষণ করার পর ব্যবহার করে থাকে এবং অবস্থা এই যে, এখনো গনিমত বণ্টন হয়নি, তাহলে তার মূল্য ফেরত দিবে। পক্ষান্তরে গনিমত বন্টিত হয়ে গিয়ে থাকলে স্বচ্ছল ব্যক্তি তার মূল্য সদকা করবে। আর অভাবগ্রস্থ ব্যক্তির উপর কিছুই ওয়াজিব হবে না। কেননা মূল্য মূল বস্তুর স্থলবর্তী হয়। সুতরাং মূল্য মূল বস্তুর বিধান গ্রহণ করবে।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

গনিমতস্বরূপে প্রাপ্ত খাদ্য ও পশু খাদ্য দারুল হরবে অবস্থানকালে প্রয়োজনের কারণে মুজাহিদদের জন্য ব্যবহার করা বৈধ। তবে বাহিনী যখন দারুল হরব থেকে বের হয়ে আসে, তখন আর তা বৈধ থাকে না। কারণ বিষয়টি বৈধ প্রয়োজনের কারণে। অতএব তা প্রয়োজন পর্যন্তই সীমিত থাকবে। সুতরাং দারুল হরব থেকে বের হয়ে আসার পর যেহেতু আর জরুরত অবশিষ্ট থাকে না, তাই বৈধতাও থাকবে না।

দ্বিতীয় আরেকটি কারণ হলো, দারুল হরব থেকে বের হয়ে আসার পর গনিমতের মালের মধ্যে মুসলমানদের তথা মুজাহিদদের হক দৃঢ়মূল হয়ে যায়। এর প্রমাণ হলো এই যে, এমতাবস্থায় যদি কোনো মুজাহিদ মারা যায়, তাহলে তার প্রাপ্ত হিস্সার উত্তরাধিকার জারি হয়ে থাকে। সুতরাং যে সম্পদে সকলের হক দৃঢ়মূল হয়ে গেছে, সে সম্পদ কোনো ব্যক্তির একা ব্যবহার করা বৈধ নয়। পক্ষান্তরে দারুল ইসলামের উদ্দেশ্যে বের করে আনার পূর্বে উক্ত সম্পদের এ অবস্থা ছিল না। বরং তখন তাতে সকল মুজাহিদের হক দৃঢ়মূল ছিল না। তাই সেটা ব্যবহার করা যে কোনো মুজাহিদের জন্য বৈধ ছিল।

قَوْلُهُ : وَمَنْ فَضَلَ مَعَهُ عَلَفٌ أَوْ طَعَامٌ رَدَّهُ الخ : দারুল হরব হতে বেরিয়ে আসার পর যদি কারো কাছে খাদ্য বা পশু খাদ্য থেকে যায়, তাহলে সে তা কি করবে এ প্রসঙ্গে উপরিউক্ত ইবারতে আলোচনা করা হয়েছে।

এক্ষেত্রে দুটি অবস্থা হতে পারে– ১. কেউ যখন অতিরিক্ত খাদ্য বা পশু খাদ্য নিয়ে এসেছে তখনো গনিমতে বণ্টন হয়নি ২. যখন নিয়ে এসেছে, তখন গণিমত বণ্টন শেষ হয়ে গেছে।

প্রথম অবস্থায় অর্থাৎ যদি গনিমত বণ্টন না হয়ে থাকে, তাহলে অতিরিক্ত খাদ্য যা নিয়ে এসেছে, তা গনিমতের মালে ফেরত দিবে। আর দ্বিতীয় অবস্থায় অর্থাৎ যদি গনীমতের মাল বণ্টন হয়ে গিয়ে তাকে, তাহলে দেখতে হবে ব্যক্তিটি ধনী না দরিদ্র। যদি ব্যক্তিটি ধনী হয়, তাহলে উক্ত খাদ্য বা পশু খাদ্য সদকা করে দিবে। আর যদি ব্যক্তিটি দরিদ্র হয়, তাহলে তা নিজেই ব্যবহার করে ফেলবে। কারণ গনিমত বণ্টন হয়ে যাওয়ার পরে উক্ত খাদ্য মুজাহিদদের কাছে পৌঁছে দেওয়া কঠিন। তাই সেটা লুকতা বা কুড়িয়ে পাওয়া সম্পদের মতো হয়ে গেছে। আর কুড়িয়ে পাওয়া সম্পদ দরিদ্র ব্যক্তির জন্য ব্যবহার করা জায়েজ।

আলোচ্য মাসআলায় প্রথম সূরতে ইমাম শাফেয়ী (র.) হতে দু-রকম মত বর্ণিত আছে। একটি মত আহনাফের মতের অনুরূপ অপর মতটি হলো থেকে যাওয়া খাদ্য ফেরত দিতে হবে না। তার এ মতের পক্ষে দলিল হলো কিয়াস। তিনি থেকে যাওয়া গনিমতের মালকে দারুল হরবে থেকে চোরাইকৃত মালের উপর কিয়াস করেছেন। অর্থাৎ তিনি বলেন, যদি দুই একজন লোকই ইমামের অনুমতি ছাড়া লুটতরাজের জন্য দারুল হরবে প্রবেশ করে কিছু মালামাল নিয়ে আসে,তাহলে তাতে যোদ্ধাদের কোনো হক থাকে না। বাইতুল মালের এক পঞ্চমাংশও তা থেকে নেওয়া হয় না। অনুরূপভাবে কারো কাছে থেকে যাওয়া গনিমতের মালের একই হুকুম। তা আর গনিমতের মালের মধ্যে ফেরত দিবে না এবং তা থেকে খুমুসও নেওয়া হবে না।

আমাদের তথা আহনাফের দলিল হলো গনিমতের মাল বণ্টনের পূর্বে ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহার করা বৈধ ছিল প্রয়োজনের কারণে। দারুল হরব থেকে বেরিয়ে আসার দ্বারা সেই প্রয়োজন শেষ হয়ে গেছে। অতএব,এরপর ব্যক্তিগত ব্যবহারে অনুমতি নেই। অবশ্যই তা গনিমতের মালে ফেরত দিতে হবে।

ইমাম শাফেয়ী (র.) এর দলিলের জবাব : ইমাম শাফেয়ী (র.) যে থেকে যাওয়া গনিমতের মালকে চুরির মালের উপর কিয়াস করেছেন, তা ঠিক নয়। কারণ চুরির মাল দারুল ইসলামে আনার পূর্ব থেকেই সংশ্লিষ্ট লোকেরা এর হকদার। তাই দারুল ইসলামে আনার পরও তারা এর হকদার হবে। এতে অন্য কারো হক থাকবে না।

পক্ষান্তরে গনিমতের মাল দারুল ইসলামে আনার পূর্বে নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি এর হকদার নয়। তাই একে চুরির মালের সাথে কিয়াস করা যাবে না।

শেষ মাসআলা : গনিমতের মাল দারুল ইসলামে পৌছার পর যদি কেউ নিজের কাছে থেকে যাওয়া খাদ্য বা পশুখাদ্য ব্যয় করে ফেলে, তাহলে সে কি করবে? এব্যাপারে কথা হলো, তখন যদি গনীমতের মাল বণ্টন না হয়ে থাকে,তাহলে সেই খাদ্যের মূল্য গনিমতের ভাণ্ডারে জমা দিতে হবে। আর যদি গনিমত বণ্টন হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ধনী হলে খাদ্যের মূল্য সদকা করতে হবে। আর দরিদ্র হলে কিছু ওয়াজিব হবে না।

মাসআলার দলিল হলো এই যে, বস্তুর মূল্য, বস্তুর স্থলাভিষিক্ত হয়। অতএব, খাদ্য বস্তুটি বিদ্যমান থাকলে যে হুকুম হতো খাদ্য বস্তুর অবিদ্যমানে তার মূল্যের সেই হুকুম হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

فَصْلٌ فِيْ كَيْفِيَّةِ الْقِسْمَةِ

قَالَ وَيُقَسِّمُ الْإِمَامُ الْغَنِيْمَةَ فَيُخْرِجُ خُمُسَهَا لِقَوْلِهِ تَعَالٰى ﴿فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ﴾ اِسْتَثْنَى الْخُمُسَ وَيُقَسِّمُ اَرْبَعَةَ الْاَخْمَاسِ بَيْنَ الْغَانِمِيْنَ ﴿لِاَنَّهٗ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ قَسَمَهَا بَيْنَ الْغَانِمِيْنَ﴾ ـ

অনুচ্ছেদ : গনিমতের মাল বণ্টন পদ্ধতি

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, শাসক গনিমতের মাল বণ্টন করতে গিয়ে তার পঞ্চমাংশ বের করে নিবেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা পঞ্চমাংশকে ব্যতিক্রম সাব্যস্ত করে বলেছেন– فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ - আল্লাহর জন্য তার পঞ্চমাংশ এবং রাসূলের জন্য।

অতঃপর পাচ ভাগের অবিশিষ্ট চার ভাগ মুজাহিদদের মাঝে বণ্টন করবেন। কেননা নবী করীম ﷺ তা মুজাহিদদের মাঝে বন্টন করেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

গনিমতের মাল ইমাম (মুসলিম শাসক) বণ্টন করবেন। প্রথমে পূর্ণ মালকে পাঁচ ভাগে ভাগ করবেন। অতঃপর পাঁচ ভাগ হতে এক ভাগ বাইতুলমালের জন্য রেখে দিবেন। কেননা এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ

অর্থাৎ 'তোমরা জেনে রাখ যে, গনিমত হিসাবে তোমরা যা কিছু পাবে তার এক পঞ্চমাংশ হলো আল্লাহর জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য, রাসূলের নিকটাত্মীয়দের জন্য, এতিম, গরিব ও মুসাফিরদের জন্য।' অতঃপর অবিশিষ্ট চার ভাগ মুজাহিদদের মাঝে বণ্টন করবেন (বণ্টন পদ্ধতি সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসছে।)

পাঁচ ভাগের এক ভাগ বাইতুলমালে রেখে অবশিষ্ট চার ভাগ মুজাহিদদের মাঝে বণ্টন করে দেওয়ার বিষয়টি রাসূল ﷺ থেকে প্রমাণিত আছে। ইমাম তাবারানী তাঁর মু'জামে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন,

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً فَغَنِمُوْا خُمُسَ الْغَنِيْمَةِ فَضَرَبَ ذٰلِكَ الْخُمُسَ فِىْ خَمْسَةٍ - ثُمَّ قَرَأَ وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ ـ

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কোনো মুজাহিদ দল কোথাও পাঠাতেন এবং তাঁরা গনিমত লাভ করত, তখন রাসূল ﷺ তা পাঁচ ভাগে ভাগ করতেন। অতঃপর পাঁচ ভাগের এক ভাগ পাঁচ শ্রেণির জন্য (রাসূল ﷺ, রাসূল ﷺ -এর নিকটাত্মীয়, এতিম, মিসকিন ও মুসাফির) খরচ করতেন। অতঃপর তিনি (নিজ কর্মের সমর্থনে এ আয়াত) পাঠ করতেন–

وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ........الخ

https://e-ilm.weebly.com/

ثُمَّ لِلْفَارِسِ سَهْمَانِ وَلِلرَّاجِلِ سَهْمٌ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَا : لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةُ اَسْهُمٍ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى، لِمَا رَوٰى ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ﴿اَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اَسْهَمَ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةَ اَسْهُمٍ وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا﴾ وَلِاَنَّ الْاِسْتِحْقَاقَ بِالْغِنَاءِ وَغِنَاؤُهُ عَلٰى ثَلَاثَةِ اَمْثَالِ الرَّاجِلِ؛ لِاَنَّهُ لِلْكَرِّ وَالْفَرِّ وَالثُّبَاتِ، وَالرَّاجِلُ لِلثُّبَاتِ لَاغَيْرُ . وَلِاَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى مَا رَوٰى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا ﴿اَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اَعْطَى الْفَارِسَ سَهْمَيْنِ وَالرَّاجِلَ سَهْمًا﴾ فَتَعَارَضَ فِعْلَاهُ، فَيُرْجَعُ اِلٰى قَوْلِهِ وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ ﴿لِلْفَارِسِ سَهْمَانِ وَلِلرَّاجِلِ سَهْمٌ﴾ كَيْفَ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا ﴿اَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ قَسَمَ لِلْفَارِسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا﴾ وَاِذَا تَعَارَضَتْ رِوَايَتَاهُ تُرَجَّحُ رِوَايَةُ غَيْرِهِ، وَلِاَنَّ الْكَرَّ وَالْفَرَّ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ فَيَكُوْنُ غِنَاؤُهُ مِثْلَيْ غِنَاءِ الرَّاجِلِ فَيُفَضَّلُ عَلَيْهِ بِسَهْمٍ وَلِاَنَّهُ تَعَذَّرَ اعْتِبَارُ مِقْدَارِ الزِّيَادَةِ لِتَعَذُّرِ مَعْرِفَتِهِ فَيُدَارُ الْحُكْمُ عَلٰى سَبَبٍ ظَاهِرٍ، وَلِلْفَارِسِ سَبَبَانِ النَّفْسُ وَالْفَرَسُ، وَلِلرَّاجِلِ سَبَبٌ وَاحِدٌ فَكَانَ اسْتِحْقَاقُهُ عَلٰى ضِعْفِهِ .

অনুবাদ : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে **অশ্বারোহী যোদ্ধার জন্য দুই হিস্সা**। আর পদাতিক যোদ্ধার জন্য এক হিস্সা। **আর সাহেবাইন (র.) বলেন, অশ্বারোহী পাবে তিন হিস্সা**। এটা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমত। কেননা হযরত ইবনে ওমর (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম ﷺ অশ্বারোহীকে তিন হিস্সা পদাতিককে এক হিস্সা দিয়েছেন। তাছাড়া এ কারণে যে, হকদার সাব্যস্ত হয় কার্যসম্পাদনের কারণে আর তার কার্য সম্পাদন হচ্ছে পদাতিকের তিনগুণ। কেননা অশ্বারোহীর ভূমিকা হলো হামলা, প্রত্যাবর্তন ও অবিচলিত। পক্ষান্তরে পদাতিকের ভূমিকা অবিচল ক্ষেত্রে, অন্য কোনো ক্ষেত্রে নয়।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম ﷺ অশ্বারোহীকে দুই হিস্সা এবং পদাতিক কে এক হিস্সা প্রদান করেছেন। ফলে দুটি বর্ণনায় তার কার্য আপাত বিরোধপূর্ণ হলো তাই তার বক্তব্যের দিকে ফিরে যাওয়া হবে। আর তিনি বলেছেন لِلْفَارِسِ سَهْمَانِ وَلِلرَّاجِلِ سَهْمٌ - অশ্বারোহীর জন্য দুই হিস্সা আর পদাতিক সৈন্যের জন্য এক হিস্সা ।

সর্বোপরি হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতেও বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ অশ্বারোহীর জন্য দুই হিস্সা এবং পদাতিকের জন্য এক হিস্সা বণ্টন করেছেন। এভাবে হযরত ইবনে ওমর (রা.) এর দুটি বর্ণনা যখন পরস্পর বিরোধপূর্ণ হলো, তখন অন্যের বর্ণনাই অগ্রাধিকার লাভ করবে। তাছাড়া এ কারণে যে, আক্রমণ ও প্রত্যাবর্তন এক জাতীয় কাজ। সুতরাং সে তার চেয়ে এক হিস্সা বেশি পাবে।

তাছাড়া দ্বিতীয় কারণ হলো, কার্য সম্পাদনের আধিক্যের প্রকৃত পরিমাণ জানা অসম্ভব হওয়ার কারণে আধিক্যের পরিমাণ বিবেচনা করাও অসম্ভব। সুতরাং বাহ্যিক কারণের উপর বিধান আবর্তিত হবে। আর অশ্বারোহীর অনুকূলে দুটি কারণ রয়েছে। অর্থাৎ তার নিজস্ব ব্যক্তি এবং ঘোড়া। পক্ষান্তরে পদাতিকের অনুকূলে কারণ মাত্র একটি। সুতরাং অশ্বারোহীর হকদারি পদাতিকের দ্বিগুণ হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মুজাহিদের মাঝে গনিমতের মাল বন্টন করার পদ্ধতি নিয়ে ইমামগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম যুফার (র.)-এর মতে অশ্বারোহী যোদ্ধা পাবে দুই হিস্‌সা আর পদাতিক যোদ্ধা পাবে এক হিস্‌সা।

ইমাম আবূ ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক, ইমাম, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, লাইছ, আবূ সাওর ও অধিকাংশ আলিমের মতে অশ্বারোহী যোদ্ধা পাবে তিন হিস্‌সা। আর পদাতিক যোদ্ধা পাবে এক হিস্‌সা।

সাহেবাইন ও ইমাম শাফেয়ী (র.) প্রমুখের দলিল :

১. হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত, اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَسْهَمَ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةَ اَسْهُمٍ وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا অর্থাৎ নবী করীম ﷺ অশ্বারোহী ব্যক্তিকে তিন হিস্‌সা দিয়েছেন এবং পদাতিক যোদ্ধাকে এক হিস্‌সা দিয়েছেন। এ হাদীসটি ইমাম নাসায়ী ব্যতীত অন্যান্য মুহাদ্দিস বর্ণনা করেছেন। কতক বর্ণনায় এরূপ আছে اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَسْهَمَ لِرَجُلٍ وَلِفَرَسِه ثَلَاثَةَ اَسْهُمٍ سَهْمًا لَهُ وَسَهْمَيْنِ لِفَرَسِه- অর্থাৎ রাসূল ﷺ ও ব্যক্তির ঘোড়ার জন্য তিন হিস্‌সা দিয়েছেন। এক হিস্‌সা তার জন্য দুই হিস্‌সা তার ঘোড়ার জন্য।

২. গনিমতের মালে হকদারী অর্জন হয় কার্যের মাধমে। আর পদাতিক যোদ্ধার তুলনায় অশ্বারোহী যোদ্ধার কাজ দুই গুণ বেশি। কেননা পদাতিক যোদ্ধা কেবল নিজস্থানে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করে। আর অশ্বারোহী যোদ্ধা কখনো আক্রমণ করে, কখনো পিছনে পালিয়ে আসে। আবার কখনো এক স্থানে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করে। অতএব, পদাতিক যোদ্ধা একটি কাজ করার কারণে সে এক হিস্‌সা পাবে আর অশ্বারোহী যোদ্ধা তিনটি কাজ করার কারণে তিন হিস্‌সা পাবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল :

১. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত-اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْطَى الْفَارِسَ سَهْمَيْنِ وَالرَّاجِلَ سَهْمًا অর্থাৎ অশ্বারোহী যোদ্ধাকে দুই অংশ দিয়েছেন এবং পদাতিক যোদ্ধাকে এক অংশ দিয়েছেন।

২. হযরত মাজমা ইবনুল জারিয়া আল আনসারী (রা.) হতে বর্ণিত–

قَالَ شَهِدْنَا الْحُدَيْبِيَةَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاِلَى اَنْ قَالَ فَقَسَمْتُ خَيْبَرَ عَلَى اَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ فَقَسَّمَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا وَكَانَ الْجَيْشُ اَلْفًا و خَمْسَ مِائَةٍ فِيْهِمْ ثَلَاثَةُ مِائَةِ فَارِسٌ فَاَعْطَى الْفَارِسَ سَهْمَيْنِ وَاَعْطَى الرَّاجِلَ سَهْمًا-

অর্থাৎ হযরত মাজমা ইবনুল জারিয়া আল আনসারী (রা.) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে হুদাইববিয়ায় উপস্থিত ছিলাম। তিনি বলেন, অতঃপর খাইবারের সম্পদ হুদাইবিয়ায় উপস্থিতদের মাঝে বণ্টন করা হলো। সে সম্পদ রাসূলুল্লাহ ﷺ আঠার ভাগে ভাগ করলেন। মুজাহিদ ছিল পানের শত। তন্মধ্যে তিন শত ছিল অশ্বারোহী। নবী করীম ﷺ অশ্বারোহীকে দিলেন দুই অংশ এবং পদাতিককে দিলেন এক অংশ। –(আবূ দাউদ)।

৩. হযরত উরওয়ার সূত্রে হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত–

قَالَتْ اَصَاب رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ سَبَايَا بَنِى الْمُصْطَلِقِ فَاَخْرَجَ الْخُمُسَ مِنْهَا ثُمَّ قَسَّمَ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَاَعْطَى الْفَارِسَ سَهْمَيْنِ وَالرَّاجِلَ سَهْمًا-

অর্থাৎ হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন, বনীল মুসতালিক গোত্রেব বন্দিরা রাসূল ﷺ -এর নিকট পৌছল। তিনি তার থেকে খুমুস বের করলেন। অতঃপর অবশিষ্টগুলো মুসলমানদের মাঝে তথা মুজাহিদদের মাঝে বন্টন করলেন। অশ্বারোহীকে দিলেন দুই অংশ আর পদাতিককে দিলেন এক অংশ। –নসবুর রায়াহ

তরীকে ইস্তিদলাল : ইমাম শাফি (র.)-এর দলিলরূপে বর্ণিত হাদীস ও ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিলরূপে বর্ণিত হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, রাসূল ﷺ -এর বন্টন নীতি দু-রকম ছিল। হযরত ইবনে ওমর কর্তৃক বর্ণিত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় রাসূল ﷺ অশ্বারোহীকে তিন হিস্‌সা দিয়েছেন আর হযরত ইবনে আব্বাস, ইবনুল জারিয়া ও আয়েশা (রা.)-এর রেওয়ায়েত দ্বারা বুঝা যায়, অশ্বারোহীকে দুই হিস্‌সা দিয়েছেন। অতএব, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দুটি ফে'লী হাদীসের মধ্যে

https://e-ilm.weebly.com/

তা'আরুয বা অসঙ্গতি হওয়ায় রাসূল ﷺ -এর কাওলী হাদীসের দিকে রুজু করতে হবে। আর রাসূল ﷺ -এর কাউলী হাদীস হলো لِلْفَارِسِ سَهْمَانِ وَلِلرَّاجِلِ سَهْمٌ- অশ্বারোহীর দুই হিস্‌সা এবং পদাতিকের এক হিস্‌সা। এরূপ রেওয়ায়েত হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতেও বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْطَى الْفَارِسَ سَهْمَيْنِ وَالرَّاجِلَ سَهْمًا নবী করীম ﷺ অশ্বারোহীর জন্য দুই হিস্‌সা এবং পদাতিকের জন্য এক হিস্‌সা বণ্টন করেছেন। অতএব, হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত দুই হাদীসের মাঝেও তা'আরুয বা অসঙ্গতি হয়ে গেল। সুতরাং ইবনে ওমর (রা.) হযরত এর হাদীসের উপর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদীস প্রাধান্য পাবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর আকলী দলিল : যুদ্ধের সময় কার কতটুকু কষ্ট বা ত্যাগ হয়েছে, তার প্রকৃত পরিমাণ জানা অসম্ভব। তাই উক্ত কমবেশির বিবেচনা করাও সম্ভব নয়। অতএব, বাহ্যিক কারণই বিবেচনা করা হবে। সে হিসাবে অশ্বারোহীর পক্ষে দুটি কারণ– এক হলো ব্যক্তি নিজে, অপরটি হলো তার ঘোড়া। আর পদাতিক যোদ্ধার পক্ষে একটি কারণ শুধু ব্যক্তি নিজে। অতএব, অশ্বারোহী দুই হিস্‌সা পাবে এবং পদাতিক যোদ্ধা এক হিসসা পাবে।

সাহেবাইন ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর আকলী দলিলের জবাব : তারা বলেছিলেন, পদাতিক যোদ্ধার কাজ একটি– শুধু নিজ স্থানে অবিচল থেকে যুদ্ধ করা, পক্ষান্তরে অশ্বারোহীর কাজ তিনটি। অবিচল থেকে যুদ্ধ করা, আক্রমণ করা এবং পালিয়ে আসা। এর জবাব হলো, পালিয়ে আসা কোনো পৃথক কাজ নয়; বরং তা আক্রমণের মধ্যেই গণ্য কেননা, পালিয়ে আসা মূলত প্রশংসনীয় নয়। এটা প্রশংসনীয় হয় পরবর্তীতে পুনরায় আক্রমণে উদ্দেশ্যে হলে। অতএব, পালিয়ে আসা এবং আক্রমণ করা একই কাজ তাই অশ্বারোহীর কাজ তিনটি নয়, বরং দুটি। অবিচল থেকে যুদ্ধ করা এবং আক্রমণ করা। সুতরাং সে দুই হিস্‌সা পাবে। পদাতিক যোদ্ধা এক হিস্‌সা পাবে।

সামঞ্জস্য বিধান : উভয় মাযহাবের পক্ষ থেকে যেসব রেওয়ায়েত পেশ করা হয়েছে, সেসব রেওয়ায়েতের কোনো কোনোটির শব্দ গরিব হলেও বক্তব্য সঠিক। কোনো কোনোটি বিশেষ সনদের বিবেচনায় দুর্বল হলেও তার মুতাবি' রয়েছে। সে হিসাবে উভয় পক্ষের দলিলই গ্রহণযোগ্য। তাই কোনো একপ্রকার হাদীসের উপর আমল করে অন্য প্রকার হাদীস সম্পূর্ণ পরিহার করা ঠিক হবে না; বরং উভয় প্রকার হাদীসের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করাই উত্তম। অতএব, দু-রকম হাদীসের মধ্যে উলামায়ে কেরাম এভাবে সামঞ্জস্য করেছেন যে, যেসব হাদীসে অশ্বারোহী যোদ্ধার জন্য দুই হিস্‌সার কথা বলা হয়েছে, সেসব হাদীসে মূলত ন্যায্য পাওনার কথা বলা হয়েছে, আর সেসব হাদীসে অশ্বারোহী যোদ্ধার জন্য তিন হিস্‌সার কথা বলা হয়েছে সেসব হাদীসে অতিরিক্ত পুরস্কারের কথা বলা হয়েছে। অন্য কথায়, ইমাম অশ্বারোহী যোদ্ধাকে দুই হিস্‌সা দিবে তার হক হিসাবে। ইচ্ছা করলে আরো এক হিস্‌সা দিতে পারেন পুরস্কার স্বরূপ। এভাবে উভয় প্রকার হাদীসের উপর আমল হয়ে যায়। কোনো একপ্রকার হাসীসকে সম্পূর্ণ পরিহার করা আবশ্যক হয় না।

https://e-ilm.weebly.com/

وَلَا يُسْهِمُ اِلَّا لِفَرَسٍ وَاحِدٍ وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ : يُسْهِمُ لِفَرَسَيْنِ، لِمَا رُوِيَ ﴿اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَسْهَمَ لِفَرَسَيْنِ﴾ وَلِاَنَّ الْوَاحِدَ قَدْ يَعْيَا فَيَحْتَاجُ اِلَى الْاٰخَرِ. وَلَهُمَا ﴿اَنَّ الْبَرَاءَ بْنَ اَوْسٍ قَادَ فَرَسَيْنِ فَلَمْ يُسْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَّا لِفَرَسٍ وَاحِدٍ﴾ وَلِاَنَّ الْقِتَالَ لَايَتَحَقَّقُ بِفَرَسَيْنِ دَفْعَةً وَاحِدَةً فَلَا يَكُوْنُ السَّبَبُ الظَّاهِرُ مُفْضِيًا اِلَى الْقِتَالِ عَلَيْهِمَا فَيُسْهِمُ لِوَاحِدٍ. وَلِهٰذَا لَا يُسْهِمُ لِثَلَاثَةِ اَفْرَاسٍ، وَمَا رَوَاهُ مَحْمُوْلٌ عَلَى التَّنْفِيْلِ كَمَا اَعْطٰى سَلَمَةَ بْنَ الْاَكْوَعِ سَهْمَيْنِ وَهُوَ رَاجِلٌ وَالْبَرَاذِيْنُ وَالْعِتَاقُ سَوَاءٌ لِاَنَّ الْاِرْهَابَ مُضَافٌ اِلَى جِنْسِ الْخَيْلِ فِي الْكِتَابِ، قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى ﴿وَمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ﴾ وَاسْمُ الْخَيْلِ يَطْلَقُ عَلَى الْبَرَاذِيْنِ وَالْعِتَاقِ وَالْهَجِيْنِ وَالْمَقْرِفِ اِطْلَاقًا وَاحِدًا، وَلِاَنَّ الْعَرَبِيَّ اِنْ كَانَ فِي الطَّلَبِ وَالْهَرَبِ اَقْوٰى فَالْبِرْذَوْنُ اَصْبَرُ وَاَلْيَنُ عَطْفًا، فَفِيْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَنْفَعَةٌ مُعْتَبَرَةٌ فَاسْتَوَيَا.

অনুবাদ : কেবল একটি ঘোড়ার জন্য হিস্‌সা প্রদান করা হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, দুই ঘোড়ার হিস্‌সা প্রদান করা হবে। কেননা বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ দুই ঘোড়ার জন্য হিস্‌সা প্রদান করেছেন।

তাছাড়া এই কারণে যে, একটি ঘোড়া কখনো দুর্বল হয়ে পড়ে, তখন তার অন্য ঘোড়ার প্রয়োজন হয়।

তরফাইনের দলিল এই যে, হযরত বারা ইবনে আউস (রা.) দুটি ঘোড়া নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু নবী করীম ﷺ তাকে একটি ঘোড়ার হিস্‌সা দিয়েছিলেন। আরো একটি কারণ এই যে, একই সঙ্গে দুটি ঘোড়া দ্বারা লড়াই সম্পাদিত হয় না। সুতরাং বাহ্যিক কারণ দুই ঘোড়ার দ্বারা লড়াই পর্যন্ত গড়ায় না। অতএব, এক ঘোড়ার জন্য হিস্‌সা দেওয়া হবে। এ কারণে (কারোর মতেই) তিন ঘোড়ার জন্য হিস্‌সা প্রদান করা হয় না।

আর তার বর্ণিত হাদীসটি অতিরিক্ত দানের উপর প্রযোজ্য হবে। যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ সালামা ইবনুল আকওয়া (রা.) কে দুই হিস্‌সা দান করেছিলেন, অথচ তিনি ছিলেন পদাতিক।

আজমী ঘোড়া ও উৎকৃষ্ট আরবি ঘোড়া সমান। কেননা কুরআনের আয়াতে 'ভীতি সৃষ্টিকরণ', অশ্ব শ্রেণিরই সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– وَمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ - আর অশ্বারোহী প্রস্তুত রাখবে। এর দ্বারা তোমরা সন্ত্রস্ত করবে আল্লাহর শত্রুকে এবং তোমাদের শত্রুকে।

আর الخيل বা অশ্ব শব্দটি অভিন্ন প্রয়োগ আজমী ঘোড়া, আরবি ঘোড়া ও উভয়ের মিশ্র ঘোড়ার উপর প্রযুক্ত হয়। তাছাড়া আরবী ঘোড়া যদি হামলায় ও ছোটায় অধিকতর শক্তিশালী হয়ে থাকে তবে আজমী ঘোড়া অধিক কষ্ট সহিষ্ণু ও অতি সহজে অঙ্গ সঞ্চালনকারী। সতুরাং উভয়ের প্রতিটিতেই বিবেচনাযোগ্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে সুতরাং দুটোই সমান হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কোনো যোদ্ধা যদি দুটি ঘোড়া নিয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে, তাহলে সে দুটি ঘোড়ার হিস্‌সাই পাবে নাকি সে একটি ঘোড়ার হিস্‌সা পাবে এ নিয়ে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

ইমাম আবূ হানীফা, মুহাম্মদ, যুফার, হাসান ও শাফেয়ী (র.)-এর মতে তাকে একটি ঘোড়ার জন্যই হিস্সা প্রদান করা হবে।

ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের মতে দুটি ঘোড়ার হিস্সা প্রদান করা হবে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের দলিল :

১. ইমাম দারাকুতনী বর্ণনা করেছেন-

عَنْ اَبِىْ عَمْرَةَ بَشِيْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مِحْصَنٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ اَسْهَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفَرَسِىْ اَرْبَعَةَ اَسْهُمٍ وَلِىْ سَهْمًا فَاَخَذْتُ خَمْسَةَ اَسْهُمٍ ـ

অর্থাৎ হযরত আবূ আমারাহ বাশীর ইবনে আমর ইবনে মিহসান (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার দুই ঘোড়ার জন্য চার হিস্সা প্রদান করেছেন, আর আমাকে প্রদান করেছেন এক হিস্সা। তাই আমি সর্বমোট পাঁচ হিস্সা গ্রহণ করেছি।

২. মুজাহিদ কখনো একটি ঘোড়া দিয়ে যুদ্ধ করতে করতে ঘোড়াটি ক্লান্ত হয়ে যায়। তখন অবশ্যই তার আরেকটি ঘোড়ার প্রয়োজন হয়। তাই দুটি ঘোড়া ব্যবহার করা ন্যায়সঙ্গত। অতএব দুটি ঘোড়ার হিস্সা দেওয়াও ন্যায় সঙ্গত হবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও তার সমমনাদের দলিল :

১. عَنْ بَرَاءِ بْنِ أَوْسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَادَ فَرَسَيْنِ وَلَمْ يُسْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَّا لِفَرَسٍ وَاحِدٍ -

হযরত বারা ইবনে আউস (রা.) হতে বর্ণিত যে, তিনি দুটি ঘোড়া নিয়েছিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে এক ঘোড়ার হিস্সা দিয়েছেন।

২. কোনো মুজাহিদ দুটি ঘোড়া সাথে নিলেও, দুটি ঘোড়া দ্বারা একই সময়ে জিহাদ সম্পাদিত হয় না; বরং একটি ক্লান্ত হলে অপরটি কাজে লাগে। তাই জিহাদ সংঘটিত হয় মূলত একটি ঘোড়া দ্বারা। অতএব, সে এক ঘোড়ার হিস্সা পাবে।

৩. কোনো মুজাহিদ যদি তিনটি ঘোড়া ব্যবহার করে, তাহলে কারো মতেই তাকে তিন ঘোড়ার হিস্সা দেওয়া হয় না। শুধু এক ঘোড়ার হিস্সা দেওয়া হয়। এতেও প্রতীয়মান হয় যে, দুই ঘোড়ার হিস্সা দেওয়া হবে না।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিলের জবাব : ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) দুই ঘোড়ার হিসসা সম্পর্কিত যে হাদীস পেশ করেছেন সেটি অতিরিক্ত দানের উপর প্রযোজ্য। অর্থাৎ তার ন্যায্য পাওনা ছিল এক ঘোড়ার হিস্সা রাসূল ﷺ তাকে আরেকটি ঘোড়ার হিস্সা অতিরিক্ত দান করেছেন।

যেমন একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) কে অশ্বারোহী যোদ্ধার হিস্সা দান করেছিলেন। অথচ হযরত সালামা উবনুল আকওয়া (রা.) সে যুদ্ধে অশ্বারোহী ছিলেন না। তিনি ছিলেন পদাতিক। সুতরাং তাকে অশ্বারোহীর হিস্সা দেওয়াটা ছিল অতিরিক্ত দান বা পুরস্কার স্বরূপ আলোচ্য ক্ষেত্রেও অনুরূপ।

قوله : وَالْبَرَاذِيْنُ وَالْعِتَاقُ سَوَاءٌ لِاَنَّ الْاِرْهَابَ الخ : اَلْبَرَاذِيْنُ শব্দটি বহুবচন। এর একবচন হলো بِرْذَوْنٌ অর্থ হলো আজমী বা অনারবি ঘোড়া। عِتَاقٌ শব্দটি ও বহুবচন। এর একবচন হলো عَتِيْقٌ অর্থ হলো আরবী উন্নত ঘোড়া। اَلْهَجِيْنُ যে ঘোড়ার বাপ আজমী এবং মা আরবী। اَلْمَقْرِفُ যে ঘোড়ার বাপ আরবী এবং মা আজমী। কেউ কেউ বলেছেন, اَلْهَجِيْنُ হলো যার বাপ আরবি। আর اَلْمَقْرِفُ হলো যার মা আরবী। কেউ কেউ বলেছেন, যে ঘোড়ার বাপ ও মার কোনো একটি আরবী হয় এবং অপরটি অনারবী হয় সে ঘোড়াকে هَجِيْنٌ বলে।

মাসআলার ব্যাখ্যা : গনিমতের হিস্সা পাওয়ার ক্ষেত্রে আরবী এবং অনারবী ঘোড়া সমান বলে বিবেচ্য হয়। এর এক কারণ হলো, যুদ্ধ ক্ষেত্রে ঘোড়ার ভূমিকা বা প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা اَلْخَيْلُ শব্দ ব্যবহার করেছেন। আর اَلْخَيْلُ শব্দ দ্বারা আরবি, অনারবী মিশ্র সর্ব প্রকার ঘোড়াকেই বুঝানো হয়। এ হিসাবে সব ঘোড়া সমান। আরেক কারণ হলো আরবি ঘোড়ার কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা অনারবি ঘোড়ার মধ্যে নেই। আক্রমণ ও পলায়নের ক্ষেত্রে আরবি ঘোড়া অধিক পটু। কিন্তু এক্ষেত্রে অনারবী ঘোড়া তেমন নয়। পক্ষান্তরে অনারবী ঘোড়া অত্যধিক কষ্ট সহ্যকারী এবং অতি সহজে সঞ্চালনকারী, আরবী ঘোড়ার মধ্যে এগুণ দুটি অনুপস্থিত। অতএব, সার্বিক বিবেচনায় আরবী এবং অনারবী ঘোড়া সমান। তাই উভয়ের হিস্সাও সমান হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَمَنْ دَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ فَارِسًا فَنَفَقَ فَرَسُهُ اِسْتَحَقَّ سَهْمَ الْفُرْسَانِ، وَمَنْ دَخَلَ رَاجِلًا فَاشْتَرٰى فَرَسًا اِسْتَحَقَّ سَهْمَ رَاجِلٍ وَجَوَابُ الشَّافِعِيِّ عَلٰى عَكْسِهِ فِي الْفَصْلَيْنِ، وَهٰكَذَا رَوَى ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ اَبِيْ حَنِيْفَةَ فِي الْفَصْلِ الثَّانِيْ اَنَّهُ يَسْتَحِقُّ سَهْمَ الْفُرْسَانِ . وَالْحَاصِلُ اَنَّ الْمُعْتَبَرَ عِنْدَنَا حَالَةُ الْمُجَاوَزَةِ، وَعِنْدَهُ حَالَةُ اِنْقِضَاءِ الْحَرْبِ لَهُ اَنَّ السَّبَبَ هُوَ الْقَهْرُ وَالْقِتَالُ فَيُعْتَبَرُ حَالُ الشَّخْصِ عِنْدَهُ وَالْمُجَاوَزَةُ وَسِيْلَةٌ اِلَى السَّبَبِ كَالْخُرُوْجِ مِنَ الْبَيْتِ، وَتَعْلِيْقِ الْاَحْكَامِ بِالْقِتَالِ يَدُلُّ عَلٰى اِمْكَانِ الْوُقُوْفِ عَلَيْهِ، وَلَوْ تَعَذَّرَ اَوْ تَعَسَّرَ تَعَلَّقَ بِشُهُوْدِ الْوَقْعَةِ؛ لِاَنَّهُ اَقْرَبُ اِلَى الْقِتَالِ . وَلَنَا اَنَّ الْمُجَاوَزَةَ نَفْسَهَا قِتَالٌ لِاَنَّهُ يَلْحَقُهُمُ الْخَوْفُ بِهَا وَالْحَالُ بَعْدَهَا حَالَةُ الدَّوَامِ وَلَا مُعْتَبَرَ بِهَا؛ وَلِاَنَّ الْوُقُوْفَ عَلٰى حَقِيْقَةِ الْقِتَالِ مُتَعَسِّرٌ؛ وَكَذَا عَلٰى شُهُوْدِ الْوَقْعَةِ لِاَنَّ حَالَ الْتِقَاءِ الصَّفَّيْنِ فَتُقَامُ الْمُجَاوَزَةُ مَقَامَهُ اِذْ هُوَ السَّبَبُ الْمُفْضِيْ اِلَيْهِ ظَاهِرًا اِذَا كَانَ عَلٰى قَصْدِ الْقِتَالِ فَيُعْتَبَرُ حَالُ الشَّخْصِ حَالَةِ الْمُجَاوَزَةِ فَارِسًا كَانَ اَوْ رَاجِلًا .

অনুবাদ : কেউ যদি অশ্বারোহী অবস্থায় দারুল হরবে প্রবেশ করে অতঃপর তার ঘোড়া হালাক হয়ে যায়, তাহলে সে অশ্বারোহীদের হিস্‌সা লাভ করবে। পক্ষান্তরে যে পদাতিক অবস্থায় প্রবেশ করার পর একটি ঘোড়া খরিদ করে নেয় সে পদাতিকের হিস্‌সাই পাবে। উভয় ক্ষেত্রে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর সিদ্ধান্ত এর বিপরীত। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র.) হতে ইবনুল মোবারক এরূপ সিদ্ধান্ত বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ (প্রবেশের পর) ঘোড়া ক্রয়কারী ব্যক্তি অশ্বারোহী হিস্‌সার হকদার হবে। মোটকথা আমাদের নিকট বিবেচ্য হলো সীমান্ত অতিক্রম করার অবস্থা। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নিকট বিবেচ্য হলো যুদ্ধ শেষ হওয়ার অবস্থা।

তাঁর দলিল হলো, গনিমতের হকদারির হেতু হলো বিজয় ও লড়াই। সুতরাং যোদ্ধার সে সময়ের অবস্থাই বিবেচ্য হবে। আর সীমান্ত অতিক্রম হলো হেতু পর্যন্ত উপনীত হওয়ার মাধ্যম। যেমন গৃহ থেকে বের হওয়া সম্ভব। আর যদি (লড়াই করেছে বা করেনি) তা জানা অসম্ভব হয় কিংবা দুঃসাধ্য হয় তাহলে যুদ্ধে উপস্থিতির সাথে শুধুমাত্র শর্তযুক্ত করা যেতে পারে। কেননা এটা যুদ্ধের নিকটতম অবস্থা।

আমাদের দলিল হলো, স্বয়ং সীমান্ত অতিক্রম যুদ্ধভুক্ত বিষয়। কেননা এতেই শত্রুদের উপর ভীতি সঞ্চারিত হয়। এর পরবর্তী অবস্থা হলো যুদ্ধের চলমান অবস্থা। সেটি বিবেচ্য নয়।

তাছাড়া লড়াইয়ের প্রকৃত অবস্থা অবগত হওয়া কষ্টসাধ্য বিষয়। তেমনি যুদ্ধে উপস্থিতির বিষয়টিও। কেননা তাহলো দুই শত্রু সারির মুখোমুখি হওয়ার অবস্থা। সতুরাং সীমান্ত অতিক্রমকেই এর স্থলবর্তী করা হবে। কেননা বাহ্যত সেটাই হলো যুদ্ধে উপনীত করার কারণ যদি তা যুদ্ধের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। সুতরাং অশ্বারোহী বা পদাতিক যেই হোক, সীমান্ত অতিক্রমের অবস্থাই হবে বিবেচ্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পদাতিক বা অশ্বারোহীর হিস্‌সা পাওয়ার জন্য যোদ্ধার কোন অবস্থাটি বিবেচনা করা হবে? তা নিয়ে ইমামগণের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে।

১নং মাযহাব : আহনাফের মতে সীমান্ত অতিক্রমের অবস্থা ধর্তব্য। অর্থাৎ কোনো যোদ্ধা যদি অশ্বারোহী অবস্থায় দারুল হরবে প্রবেশ করে অতঃপর তার ঘোড়াটি মারা যায়, তাহলে সে অশ্বারোহীর হিস্‌সা পাবে। তবে যদি সে নিজের ঘোড়া বিক্রি করে দেয়, অথবা কাউকে দান করে দেয়, কিংবা ভাড়া দিয়ে দেয় কিংবা কাউকে কর্য দেয়, তাহলে অশ্বারোহীর হিস্‌সা পাবে না। হাসান ইবনে যিয়াদ ইমাম আবূ হানীফা (র.) হতে বর্ণনা করেছেন, এ অবস্থায় সে অশ্বারোহীর হিসসা পাবে। পক্ষান্তরে কোনো যোদ্ধা যদি পদাতিক অবস্থায় সীমান্ত অতিক্রম করে দারুল হরবে প্রবেশ করে, অতঃপর যদি ঘোড়া ক্রয় করে অথবা কেউ তাকে একটি দান করে, কিংবা সে ওয়ারিশ সূত্রে ঘোড়া লাভ করে, কিংবা একটি ঘোড়া ভাড়ায় নেয় বা কর্জ নেয় এবং সে ঘোড়ায় চরে যুদ্ধ করে তাহলেও সে পদাতিকের হিস্‌সা পাবে। হাসান ইবনে যিয়াদের বর্ণনা মতে সে অশ্বারোহীর হিস্‌সা পাবে।

২নং মাযহাব : ইমাম শাফেয়ী ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর মত হলো, যুদ্ধকালীন অবস্থা ধর্তব্য। অর্থাৎ তাদের মতে যে ব্যক্তি যুদ্ধের সময় পদাতিক ছিল, সে পদাতিকের হিস্‌সা পাবে। আর যে ব্যক্তি যুদ্ধের সময় অশ্বারোহী ছিল সে অশ্বারোহীর হিস্‌সা পাবে।

আবদুল্লাহ ইবনুল মোবারক (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তার মতেও ব্যক্তি দ্বিতীয় অবস্থায় অশ্বারোহীর হিস্‌সা পাবে। মোটকথা আহনাফের মতে সীমান্ত অতিক্রম করাকালীন অবস্থা বিবেচ্য। আর ইমামত্রয়ের মতে যুদ্ধকালীন অবস্থা বিবেচ্য।

ইমামত্রয়ের দলিল : গনিমতের হকদার হওয়ার মূল কারণ হলো যুদ্ধ এবং বিজয়। সুতরাং এ অবস্থাটিই বিবেচনার বিষয় হবে। যুদ্ধের সময় যদি অশ্বারোহী হয় তাহলে অশ্বারোহী, যুদ্ধের সময় যদি পদাতিক হয় তাহলে পদাতিক।

আহনাফের মতের বিরোধিতা করে বলেন, সীমান্ত অতিক্রমের অবস্থা ধর্তব্য নয়। কেননা সীমান্ত অতিক্রম করা গণিমতের হেতু নয়; বরং গনিমতের হেতু হলো যুদ্ধ। আর যুদ্ধের হেতু হলো সীমান্ত অতিক্রম। ঘর থেকে বের হওয়াও এরকম হেতু। অতএব, ঘর থেকে বের হওয়ার অবস্থা যেমন ধর্তব্য নয়। তেমনি সীমান্ত অতিক্রমের অবস্থাও ধর্তব্য নয়। কারণ এর কোনোটিই গনিমতের হেতু নয়। বরং গনিমতের হেতুর হেতু।

ইমামত্রয়ের দলিলের উপর প্রশ্ন হতে পারে যে, যুদ্ধকালীন অবস্থা জানা সম্ভব নয়। তাই একে গনিমতের হেতু নির্ধারণ সম্ভব নয়। অতএব যুদ্ধের বাহ্যিক কারণ তথা সীমান্ত অতিক্রমকেই যুদ্ধের স্থলবর্তী হিসাবে ধরতে হবে। সীমান্ত অতিক্রমের সময় যে পদাতিক সে পদাতিক বলে বিবেচ্য হবে। আর যে অশ্বারোহী সে অশ্বারোহী বলে বিবেচ্য হবে।

এ প্রশ্নের জবাবে তারা বলেন, শিশু, গোলাম, জিম্মি, নারী প্রমুখকে গনিমতের মালে হতে অল্প দেওয়ার বিধান আছে এ শর্তে যে, তারা যদি যুদ্ধে শরিক হয়। তাহলে এসব বিধান যুদ্ধাবস্থার সাথে শর্তযুক্ত করা হলো। এর দ্বারা বুঝা যায় যুদ্ধাবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়া সম্ভব। অতএব, যুদ্ধাবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়া অসম্ভব একথা ঠিক নয়।

আর যদি মেনে নেওয়া হয় যে, যুদ্ধাবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়া অসম্ভব বা কঠিন, তাহলে আলোচ্য হুকুমটি যুদ্ধে উপস্থিত হওয়ার সাথে সম্পৃক্ত হবে। কারণ যুদ্ধে উপস্থিত হওয়ার অবস্থাটি যুদ্ধের অবস্থার নিকটবর্তী। অতএব, যুদ্ধে উপস্থিত হওয়ার, সময় যদি কেউ অশ্বারোহী থাকে তাহলে সে অশ্বারোহীর হিস্‌সা পাবে। আর যুদ্ধে উপস্থিত হওয়ার সময় যদি কেউ পদাতিক থাকে, তাহলে সে পদাতিক যোদ্ধার অংশ পাবে।

আহনাফের দলিল : মুসলিম রাষ্ট্রের সীমান্ত অতিক্রম করাটাই যুদ্ধের অন্তর্ভুক্ত। কেননা মুসলিম বাহিনীর সীমান্ত অতিক্রম করার দ্বারা শত্রুদের মাঝে ভীতি সঞ্চার হয়ে যায়। আর এর পরবর্তী অবস্থাগুলো হলো চলমান অবস্থা। চলমান অবস্থা কারো মতেই বিবেচ্য বিষয় নয়। কারণ একজন যোদ্ধার পক্ষে সর্বদা ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করা অসম্ভব। তা কোনো যোদ্ধা যুদ্ধ করল কি করল না, সেদিকে তাকিয়ে থাকা ইমামের পক্ষে সম্ভব নয়। আবার যুদ্ধে উপস্থিত হওয়ার অবস্থা সম্পর্কে জানা কঠিন। কেননা তখন হলো দুই বাহিনী মুখোমুখি হওয়ার সময়। অতএব, যখন যুদ্ধের অবস্থা এবং যুদ্ধে উপস্থিত হওয়ার অবস্থা উভয় সম্পর্কে অবগত হওয়া কঠিন হলো, তখন সীমান্ত অতিক্রমের অবস্থাটি বিবেচনা করা অপরিহার্য হয়ে গেল। কারণ বাহ্যিকভাবে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে সীমান্ত অতিক্রম করাটাই যুদ্ধে উপনীত করার হেতু। অতএব, সীমান্ত অতিক্রম করার সময় যে যোদ্ধা অশ্বারোহী হবে, সে অশ্বারোহী বলেই বিবেচ্য হবে। আর তখন যে যোদ্ধা পদাতিক থাকবে, সে পদাতিক বলেই গণ্য হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَلَوْ دَخَلَ فَارِسًا وَقَاتَلَ رَاجِلًا لِضِيْقِ الْمَكَانِ يَسْتَحِقُّ سَهْمَ الْفُرْسَانِ بِالْاِتِّفَاقِ، وَلَوْ دَخَلَ فَارِسًا ثُمَّ بَاعَ فَرَسَهُ أَوْ وَهَبَ أَوْ أَجَرَ أَوْ رَهَنَ فَفِيْ رِوَايَةِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيْ حَنِيْفَةَ يَسْتَحِقُّ سَهْمَ الْفُرْسَانِ اِعْتِبَارًا لِلْمُجَاوَزَةِ . وَفِيْ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ يَسْتَحِقُّ سَهْمَ الرَّجَّالَةِ لِاَنَّ الْاِقْدَامَ عَلٰى هٰذِهِ التَّصَرُّفَاتِ يَدُلُّ عَلٰى اَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ قَصْدِهِ بِالْمُجَاوَزَةِ الْقِتَالُ فَارِسًا. وَلَوْ بَاعَهُ بَعْدَ الْفَرَاغِ لَمْ يَسْقُطْ سَهْمُ الْفُرْسَانِ. وَكَذَا اِذَا بَاعَ فِيْ حَالَةِ الْقِتَالِ عِنْدَ الْبَعْضِ. وَالْاَصَحُّ اَنَّهُ يَسْقُطُ لِاَنَّ الْبَيْعَ يَدُلُّ عَلٰى اَنَّ غَرْضَهُ التِّجَارَةُ فِيْهِ اِلَّا اَنَّهُ يَنْتَظِرُ عِزَّتَهُ .

অনুবাদ : অশ্বারোহী অবস্থায় (দারুল হরবে) প্রবেশ করার পর যদি স্থান সংকীর্ণ হওয়ার কারণে পদাতিক অবস্থায় লড়াই করে তাহলে সর্বসম্মতিক্রমেই সে অশ্বারোহীদের হিস্সার হকদার হবে। পক্ষান্তরে যদি অশ্বারোহী অবস্থায় প্রবেশ করার পর ঘোড়া বিক্রি করে কিংবা দান করে কিংবা ভাড়ায় খাটায় কিংবা বন্ধক রাখে, (আর নিজে পদাতিক হিসাবে লড়াই করে) তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) হতে হাসান ইবনে যিয়াদের বর্ণনা মতে অতিক্রমের অবস্থার বিবেচনায় সে অশ্বারোহীদের হিস্সার হকদার হবে। আর যাহিরে রেওয়ায়েত অনুযায়ী পদাতিকের হিস্সার হকদার হবে। কেননা এ সকল পদক্ষেপ প্রমাণ করে যে, এ সীমান্ত অতিক্রমের উদ্দেশ্য অশ্বারোহীরূপে লড়াই করা ছিল না। আর যদি লড়াই থেকে অব্যাহতি পাওয়ার পর বিক্রি করে তাহলে অশ্বারোহীদের হিস্সা নাকচ হবে না। কারো কারো মতে লড়াই চলাকালে যদি বিক্রি করে তাহলেও একই হুকুম হবে। কিন্তু বিশুদ্ধ মত এই যে, হিস্সা রহিত হয়ে যাবে। কেননা বিক্রয় প্রমাণ করে যে, তার উদ্দেশ্য হলো ব্যবসা করা। সে শুধু ঘোড়ার চাহিদা সৃষ্টির অপেক্ষায় ছিল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিউক্ত ইবারতে কয়েকটি মাসআলা আলোচিত হয়েছে।

১. কোনো যোদ্ধা দারুল ইসলামের সীমান্ত পেরিয়ে দারুল হরবে প্রবেশ করার সময় অশ্বারোহী অবস্থায় প্রবেশ করেছে। কিন্তু যুদ্ধের স্থান অতিসংকীর্ণ হওয়ার কারণে যুদ্ধ করেছে পদাতিক অবস্থায়। এ যোদ্ধা সম্পর্কে আলেমগণ একমত যে, সে অশ্বারোহী যোদ্ধার হিস্সার হকদার হবে।

২. কোনো যোদ্ধা অশ্বারোহী অবস্থায় দারুল ইসলামের সীমান্ত অতিক্রম করার পর দারুল হরবে পৌছে যুদ্ধের পূর্বে নিজের অশ্বটি বিক্রি করে দিয়েছে, কিংবা কাউকে দান করে দিয়েছে, কিংবা ভাড়ায় খাটিয়েছে কিংবা বন্ধক রেখেছে। এ যোদ্ধা পদাতিকের হিস্সা পাবে নাকি অশ্বারোহীর হিস্সা পাবে এ নিয়ে দুটি বর্ণনা রয়েছে।

এক. ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর পক্ষ থেকে হাসান ইবনে যিয়াদের বর্ণনা অনুযায়ী উক্ত মুজাহিদ অশ্বারোহীর হিস্সা পাবে। কারণ সে সীমান্ত অতিক্রম করার সময় অশ্বারোহী ছিল। সে হিসাবে সে অশ্বারোহী মুজাহিদ বলে গণ্য হবে।

দুই. যাহেরের রেওয়ায়েত অনুযায়ী উক্ত যোদ্ধা পদাতিকের হিস্সা পাবে। কেননা ঘোড়া বিক্রি করা, ভাড়া বা বন্ধক দেওয়া ইত্যাদি দ্বারা বুঝা যায়, সে অশ্বারোহী অবস্থায় যুদ্ধ করার জন্য সীমান্ত অতিক্রম করেনি। তাই পদাতিক বলে গণ্য হবে।

৩. কোনো যোদ্ধা অশ্বারোহী অবস্থায় যুদ্ধ করেছে। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর সে নিজের অশ্বটি বিক্রি করে দিয়েছে। এমতাবস্থায় সে অশ্বারোহীর হিস্সা পাবে।

৪. কোনো যোদ্ধা যুদ্ধ চলাকালে ঘোড়া বিক্রি করে দিয়েছে তার সম্পর্কে দু রেওয়ায়েত। কতিপয় মাশায়েখের মতে অশ্বারোহী যোদ্ধার হিস্সা পাবে। কেননা সে ঘোড়া বিক্রি করেছে চরম সংকটপূর্ণ অবস্থায়। যখন প্রাণ হুমকির মুখে থাকে। এর দ্বারা বুঝা যায়, যুদ্ধের খাতিরে বিশেষ কোনো প্রয়োজনে বিক্রি করেছে। ব্যবসার উদ্দেশ্যে নয়। অতএব, সে অশ্বারোহী বলেই গণ্য হবে।

কিন্তু বিশুদ্ধ মত হলো, উক্ত যোদ্ধা অশ্বারোহীর হিস্সা পাবে না। কারণ যুদ্ধের সময় ঘোড়া বিক্রি করে দেওয়ার বুঝা যায়, তার উদ্দেশ্য হলো ব্যবসা করা। তবে এতক্ষণ সে ঘোড়ার দাম বাড়ার অপেক্ষায় ছিল। যুদ্ধ চরম অবস্থায় উপনীত হওয়ার পর ঘোড়ার দাম বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে সে তা বিক্রি করে দিয়েছে। তাই সে পদাতিকের হিস্সা পাবে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَلَا يُسْهِمُ لِمَمْلُوْكٍ وَلَا امْرَأَةٍ وَلَا صَبِيٍّ وَلَا ذِمِّيٍّ وَلٰكِنْ يَرْضَخُ لَهُمْ عَلٰى حَسَبِ مَا يَرَى الْإِمَامُ لِمَا رُوِيَ ﴿أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ لَا يُسْهِمُ لِلنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَالْعَبِيْدِ وَكَانَ يَرْضَخُ لَهُمْ﴾ وَلَمَّا اسْتَعَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِالْيَهُوْدِ عَلَى الْيَهُوْدِ لَمْ يُعْطِهِمْ شَيْئًا مِنَ الْغَنِيْمَةِ : يَعْنِي أَنَّهُ لَمْ يُسْهِمْ لَهُمْ، وَلِأَنَّ الْجِهَادَ عِبَادَةٌ، وَالذِّمِّيُّ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْعِبَادَةِ، وَالصَّبِيُّ وَالْمَرْأَةُ عَاجِزَانِ عَنْهُ وَلِهٰذَا لَمْ يَلْحَقْهُمَا فَرْضُهُ، وَالْعَبْدُ لَا يُمْكِنُهُ الْمَوْلٰى وَلَهُ مَنْعُهُ، إِلَّا أَنَّهُ يَرْضَخُ لَهُمْ تَحْرِيْضًا عَلَى الْقِتَالِ مَعَ إِظْهَارِ انْحِطَاطِ رُتْبَتِهِمْ، وَالْمُكَاتَبُ بِمَنْزِلَةِ الْعَبْدِ لِقِيَامِ الرِّقِّ وَتَوَهُّمِ عَجْزِهِ فَيَمْنَعُهُ الْمَوْلٰى عَنِ الْخُرُوْجِ إِلَى الْقِتَالِ ثُمَّ الْعَبْدُ إِنَّمَا يَرْضَخُ لَهُ إِذَا قَاتَلَ لِأَنَّهُ دَخَلَ لِخِدْمَةِ الْمَوْلٰى فَصَارَ كَالتَّاجِرِ، وَالْمَرْأَةُ يَرْضَخُ لَهَا إِذَا كَانَتْ تُدَاوِي الْجَرْحٰى، وَتَقُوْمُ عَلَى الْمَرْضٰى لِأَنَّهَا عَاجِزَةٌ عَنْ حَقِيْقَةِ الْقِتَالِ فَيُقَامُ هٰذَا النَّوْعُ مِنَ الْإِعَانَةِ مَقَامَ الْقِتَالِ، بِخِلَافِ الْعَبْدِ؛ لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلٰى حَقِيْقَةِ الْقِتَالِ، وَالذِّمِّيُّ إِنَّمَا يَرْضَخُ لَهُ إِذَا قَاتَلَ أَوْ دَلَّ عَلَى الطَّرِيْقِ .

অনুবাদ : কোনো দাস, স্ত্রীলোক, বালক, পাগল আর জিম্মিকে গনিমতে হিস্‌সা প্রদান করা হবে না তবে শাসক নিজের বিবেচনা অনুযায়ী কিছু 'থোক' বা সামান্য পরিমাণ দিয়ে দিবেন। কেননা বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ লোক, বালক ও দাসদের হিস্‌সা প্রদান করতেন না। তবে কিছু থোক প্রদান করতেন।

তদ্রূপ (খায়বার যুদ্ধে) নবী করীম ﷺ যখন ইহুদিদের বিরুদ্ধে ইহুদিদের সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন, তখন তাদের তিনি গনিমত থেকে কিছুই দেননি। অর্থাৎ তাদের জন্যই হিস্‌সা নির্ধারণ করেননি। তাছাড়া এই কারণে যে, জিহাদ হলো ইবাদত। অথচ জিম্মি ইবাদত অদায়ের যোগ্য নয়। আর বালক ও স্ত্রীলোক লড়াইয়ে অক্ষম। এজন্যই তাদের উপর জিহাদের ফরজিয়ত আরোপিত হয়নি। আর গোলামকে তো মনিব সুযোগ দেবে না; বরং তার অধিকার রয়েছে বাধা প্রদানের। তবে তাদের মর্যাদা নিম্নতা প্রকাশ করার পাশাপাশি লড়াইয়ে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে শাসক তাদের জন্য কিছু থেকে প্রদান করবেন। আর দাসত্ব বন্ধন এবং অক্ষমতার ধারণা বিদ্যমান থাকার কারণে মুকাতাব দাসও সাধারণ দাসের পর্যায়ভুক্ত হবে এবং মনিব তাকে যুদ্ধে গমনে বাধা প্রদান করতে পারবে। অবশ্য গোলাম যদি লড়াই করে তাহলেই শুধু তার জন্য থেকে বা সামান্য পরিমাণ নির্ধারণ করা হবে। কেননা সে মনিবের সেবার জন্য দারুল হরবে এসেছে। সুতরাং সে ব্যবসায়ীর মতো হলো। তদ্রূপ আহতদের শুশ্রূষা করে এবং অসুস্থদের দেখাশোনা করে। কেননা সে তো মূল যুদ্ধে অক্ষম। সুতরাং এধরনের সহযোগিতামূলক কাজগুলোকেই লড়াইয়ের স্থলবর্তী গণ্য করা হবে। দাসের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা সে তো মূল যুদ্ধে সক্ষম। জিম্মিকে থোক দেওয়া হবে, যদি সে লড়াই করে। কিংবা লড়াই না করে পথ দেখিয়ে দেয়।

https://e-ilm.weebly.com/

وَلَمْ يُقَاتِلْ لِاَنَّ فِيْهِ مَنْفَعَةً لِلْمُسْلِمِيْنَ، اِلَّا اَنَّهُ يُزَادُ عَلَى السَّهْمِ فِي الدَّلَالَةِ اِذَا كَانَتْ فِيْهِ مَنْفَعَةٌ عَظِيْمَةٌ، وَلَا يَبْلُغُ بِهِ السَّهْمُ اِذَا قَاتَلَ؛ لِاَنَّهُ جِهَادٌ، وَالْاَوَّلُ لَيْسَ مِنْ عَمَلِهِ وَلَا يُسَوِّي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِ فِي حُكْمِ الْجِهَادِ .

অনুবাদ : কেননা এতে মুসলমানদের উপকার রয়েছে। তবে পথ বাতলে দেওয়ার মধ্যে যদি বড় ধরনের ফায়দা থাকে তাহলে (মুজাহিদদের সাধারণ হিসসার চেয়ে) তাকে পরিমাণে বাড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে। পক্ষান্তরে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে সেটা মুজাহিদদের হিস্‌সার সমান হবে না। কেননা লড়াই হলো জিহাদ। কিন্তু পথ প্রদর্শন জিহাদের আমলভুক্ত বিষয় নয়। আর জিহাদ সংশ্লিষ্ট কোনো হুকুমের ক্ষেত্রে তার ও মুসলমানদের মাঝে সমতা সাব্যস্ত করা যায় না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

الرضخ বাব فتح - رضخ يرضخ হতে ব্যবহৃত হয়। অর্থ হলো অল্প মাল দেওয়া। আর প্রদত্ত অল্প মালকে বলা হয় الرضخ

আলোচ্য ইবারতের সার সংক্ষেপ : দাস, স্ত্রীলোক, বালক, পাগল, জিম্মি, গনিমতের মালে এদের কোনো হিস্‌সা নেই। তবে এরা যদি লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করে, তাহলে শাসক বিবেচনা করে তাদেরকে অল্প কিছু দিবে। এ সম্পর্কে **নকলী দলিল :**

١. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ لَا يُسْهِمُ لِلْعَبِيْدِ وَالنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَيَرْضَخُ ـ

অর্থাৎ হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ দাস, নারী ও বালককে গনিমতের হিস্‌সা প্রদান করতেন না; বরং তাদেরকে অল্প কিছু প্রদান করতেন। (হাদীসটি আতবায়ী উল্লেখ করেছেন, তবে কোনো হাওয়ালা দেননি।)

٢. اَخْرَجَ مُسْلِمٌ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ هُرْمُزَ قَالَ كَتَبَ نَجْدَةُ بْنُ عَامِرٍ الْحَرُوْرِى اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ يَسْأَلُهُ عَنِ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ يَحْضُرَانِ الْمَغْنَمَ هَلْ يُقْسَمُ لَهُمَا؟ فَكَتَبَ اِلَيْهِ اَنَّهُ لَيْسَ لَهُمَا اِلَّا اَنْ يُحْذَيَا ـ

অর্থাৎ ইমাম মুসলিম (র.) ইয়াযীদ ইবনে হুরমুয হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, নাজদা ইবনে আমের হারুরী হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর পত্রযোগে জিজ্ঞাসা করলেন, দাস ও নারীকে গনিমতের হিসসা দেওয়া হবে কি? হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) উত্তর দিলেন, তাদের কোনো হিস্‌সা দেওয়া হবে না। তবে সামান্য কিছু দেওয়া হবে।

আকলী দলিল : দাসকে গনিমেতর হিস্‌সা দেওয়া হবে না। কারণ সে মনিবের অধীনস্থ। মনিব তাকে যুদ্ধের অনুমতি দিবে না, কিংবা বাধা প্রদান করবে এবং সে সাধারণত মনিবের সেবার উদ্দেশ্যে দারুল হরব গমন করে থাকে। তবে যদি কোনো দাস যুদ্ধে শরিক হয়, তাহলে গনিমতের মাল থেকে তাকে অল্প কিছু দান করা হবে। এতে সে লড়াইয়ে অংশগ্রহণের প্রতি উৎসাহী হবে। পাশাপাশি তার মর্যাদাগত নিম্নতাও প্রকাশ পাবে।

স্ত্রীলোককে গনিমতের হিস্‌সা দেওয়া হয় না। এর কারণ হলো, স্ত্রীলোক লড়াই করতে সক্ষম না। এ কারণেই তাদের উপর জিহাদ ফরজ হয়নি। তবে স্ত্রীলোক যদি যুদ্ধে আহত মুজাহিদদের সেবা শুশ্রূষা করে, তাহলে এটাই তার যুদ্ধে অংশগ্রহণের স্থলবর্তী হবে এবং তাকে গনিমতের মাল থেকে অল্প কিছু প্রদান করা হবে। বালকের ক্ষেত্রেও একই কথা।

জিম্মিকে গনিমতের হিসসা দেওয়া হবে না। কারণ জিম্মির দ্বারা জিহাদ সম্পাদিত হয় না। কেননা জিহাদ হলো ইবাদত। আর ইবাদত কাফের দ্বারা হতে পারে না। তবে কোনো জিম্মি যদি যুদ্ধ করে বা মুসলমানদের পথ দেখিয়ে দেয়, তাহলে ইমাম তাকে বিবেচনা পূর্বক কিছু দিয়ে দিবেন। জিম্মির পথ প্রদর্শন দ্বারা মুসলমানদের বিশেষ উপকার হলে ইমাম তাকে সাধারণ মুজাহিদের হিস্‌সা অপেক্ষা বেশিও দিতে পারবে। তবে জিহাদের কোনো হুকুমের ক্ষেত্রে মুসলিম অমুসলিমের মাঝে সমতা সাব্যস্ত করা যাবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

وَاَمَّا الْخُمُسُ فَيُقْسَمُ عَلٰى ثَلَاثَةِ اَسْهُمٍ : سَهْمٌ لِلْيَتَامٰى وَسَهْمٌ لِلْمَسَاكِيْنِ وَسَهْمٌ لِابْنِ السَّبِيْلِ يَدْخُلُ فُقَرَاءُ ذَوِي الْقُرْبٰى فِيْهِمْ وَيُقَدَّمُوْنَ، وَلَا يُدْفَعُ اِلٰى اَغْنِيَائِهِمْ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَهُمْ خُمُسُ الْخُمُسِ يَسْتَوِيْ فِيْهِ غَنِيُّهُمْ وَفَقِيْرُهُمْ، وَيُقْسَمُ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ، وَيَكُوْنُ لِبَنِيْ هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ دُوْنَ غَيْرِهِمْ لِقَوْلِهِ تَعَالٰى ﴿وَلِذِي الْقُرْبٰى﴾ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ الْغَنِيِّ وَالْفَقِيْرِ . وَلَنَا اَنَّ الْخُلَفَاءَ الْاَرْبَعَةَ الرَّاشِدِينَ قَسَمُوْهُ عَلٰى ثَلَاثَةِ اَسْهُمٍ عَلٰى نَحْوِ مَا قُلْنَاهُ وَكَفٰى بِهِمْ قُدْوَةً . وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ ﴿يَا مَعْشَرَ بَنِيْ هَاشِمٍ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى كَرِهَ لَكُمْ غُسَالَةَ النَّاسِ وَاَوْسَاخَهُمْ وَعَوَّضَكُمْ مِنْهَا بِخُمُسِ الْخُمُسِ﴾ وَالْعِوَضُ اِنَّمَا يَثْبُتُ فِيْ حَقِّ مَنْ يَثْبُتُ فِيْ حَقِّهِ الْمُعَوَّضُ وَهُمُ الْفُقَرَاءُ . وَالنَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اَعْطَاهُمْ لِلنُّصْرَةِ؛ اَلَا تَرٰى اَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَّلَ فَقَالَ : ﴿اِنَّهُمْ لَنْ يَزَالُوْا مَعِيْ هٰكَذَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالْاِسْلَامِ. وَشَبَّكَ بَيْنَ اَصَابِعِهِ﴾ دَلَّ عَلٰى اَنَّ الْمُرَادَ مِنَ النَّصْرِ قُرْبُ النُّصْرَةِ لَا قُرْبُ الْقَرَابَةِ.

অনুবাদ : আর পঞ্চমাংশকে তিন ভাগ করা হবে। একভাগ এতিমদের জন্য। একভাগ দরিদ্রদের এবং একভাগ মুসাফিরদের জন্য। নবী করীম ﷺ -এর আত্মীয়বর্গের যারা দরিদ্র তারা এ তিন শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত থাকবে এবং তাদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে। কিন্তু তাদের ধনীদের প্রদান করা হবে না।

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, নবী করীম ﷺ -এর আত্মীয়স্বজনের জন্য গনিমতের এক পঞ্চমাংশের পঞ্চমাংশ প্রদান করা হবে। এক্ষত্রে তাদের ধনী দরিদ্র সমান হবে। একজন পুরুষের জন্য দুজন স্ত্রীলোকের হিস্সা এই নিয়মে তাদের মাঝে তা বণ্টন করা হবে এবং তা শুধু বনী হাশিম ও বনী মুত্তালিবের জন্য হবে। অন্যদের জন্য নয়।

ধনী দরিদ্রের শর্তমুক্ত হওয়ার দলিল হলো, আল্লাহ তা'আলা ধনী ও দরিদ্রের মাঝে পার্থক্য ছাড়াই বলেছেন وَلِذِي الْقُرْبٰى -আর আত্মীয়বর্গের জন্য।

আমাদের দলিল হলো, চার খোলাফায়ে রাশেদা আমাদের উল্লেখকৃত হিসাবেই এটাকে তিন ভাগে ভাগ করেছিলেন। আর অনুসরণীয় আদর্শ হিসাবে তারা যথেষ্ট।

তাছাড়া নবী করীম ﷺ বলেছেন يَا مَعْشَرَ بَنِي هَاشِمٍ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى كَرِهَ لَكُمْ غُسَالَةَ النَّاسِ وَاَوْسَاخَهُمْ وَعَوَّضَكُمْ مِنْهَا بِخُمُسِ الْخُمُسِ অর্থাৎ হে বনূ হাশিম গোষ্ঠী! আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য মানুষের ময়লা ধোয়া পানি এবং তাদের আবর্জনা অপছন্দ করেছেন এবং তার বিনিময়ে তোমাদের এক পঞ্চমাংশের পঞ্চমাংশ দান করেছেন। আর বিনিময় তো তার পক্ষেই সাব্যস্ত হতে পারে, যার পক্ষে বিনিময়কৃত বস্তু সাব্যস্ত রয়েছে। আর তারা হলেন দরিদ্রগণ।

আর নবী করীম ﷺ তাদেরকে দান করেছেন (তাঁর প্রতি তাদের) নুসরাত ও সাহায্যের কারণে। দেখুন না, তিনি এই বলে কারণ উল্লেখ করেছেন اِنَّهُمْ لَنْ يَزَالُوا مَعِي هٰكَذَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالْاِسْلَامِ -ইসলাম ও জাহেলী যুগে তারা আমার সাথে এমনভাবে জড়িত ছিল। একথা বলে তিনি দু হাতের আঙ্গুলগুলো পরস্পর প্রবেশ করিয়ে দেখালেন

এটা প্রমাণ করে যে, আয়াতে বর্ণিত নৈকট্য দ্বারা নুসরাত ও সাহায্যের নৈকট্য বুঝানো উদ্দেশ্য। আত্মীয় নৈকট্য মূল উদ্দেশ্য নয়।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

গনিমত বণ্টন সংক্রান্ত আলোচনার পর এখান থেকে খুমুস বণ্টন সংক্রান্ত আলোচনা শুরু হয়েছে।

খুমুস বণ্টনের পদ্ধতি নিয়ে ইমামগণের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে।

ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে খুমুসকে তিন অংশে ভাগ করা হবে। তন্মধ্যে একভাগ এতিমদের জন্য, একভাগ মিসকিনদের জন্য তথা সমাজের দরিদ্র লোকদের জন্য, আর এক ভাগ মুসাফিরদের জন্য। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আত্মীয়গণ এ তিন শ্রেণির ভিতরেই প্রবিষ্ট হবেন। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আত্মীয়দের মাঝে যারা এতিম, তারা এতিমের অংশ থেকে পাবে। যারা দরিদ্র, তারা মিসকিনের অংশ থেকে পাবে। যারা মুসাফির তারা মুসাফিরের অংশ থেকে পাবে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর সূত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র.) হতে এক বর্ণনা মতে, খুমুসের মাল রাসূলের আত্মীয়, এতিম, মিসকিন ও মুসাফির এ চার শ্রেণির মাঝে বণ্টন করা হবে।

প্রত্যেক শ্রেণির মাঝে মাল বণ্টনের ক্ষেত্রে রাসূলের আত্মীয়গণকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। রাসূলের আত্মীয়দের মাঝে যারা ধনী তারা খুমুসের মাল পাবে না।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মাযহাব হলো, খুমুসের এক পঞ্চমাংশ রাসূলের আত্মীয়দের জন্য। এতে ধনী দরিদ্র সবাই অংশ পাবে। প্রত্যেক পুরুষ মহিলার দ্বিগুণ পাবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) হতে আরেকটি বর্ণনা এরূপ যে, খুমুসকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হবে। তন্মধ্যে এক ভাগ নবী করীম ﷺ -এর জন্য তার জীবদ্দশায়। নবী করীম ﷺ -এর ইন্তেকালের পর এ অংশটি মুসলিম শাসক যে কোনো দীনি কাজে ব্যয় করতে পারবেন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)ও এ মত পোষণ করেন।

ইমাম মালেক (র.)-এর মতে খুমুস বণ্টনের বিষয়টি শাসকের বিবেচনাধীন। তিনি তার বিবেচনা মোতাবেক বণ্টন করবেন।

দলিল পর্ব :

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছিলেন, রাসূল ﷺ -এর ধনী-দরিদ্র সকল আত্মীয়ই খুমুসের মালে অংশ পাবে। এক্ষেত্রে তাঁর দলিল হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী وَلِذِي الْقُرْبٰى -আর আত্মীয়দের জন্য। আল্লাহ তা'আলা খুমুসের বণ্টন প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে গিয়ে উপরিউক্ত শব্দ ব্যবহার করেছেন। এ শব্দ সকল আত্মীয়কে বুঝানো হয়েছে। ধনী-দরিদ্রের মাঝে কোনো তফাৎ করা হয়নি।

আহনাফ বলেছেন, কেবল রাসূল ﷺ -এর দরিদ্র আত্মীয়রা খুমুসের অংশীদার হবে, ধনীরা খুমুসের অংশ পাবে না। এ বিষয় আহনাফের দলিল হলো, ১. খুলাফায়ে রাশেদাহ তথা হযরত আবূ বকর (রা.), হযরত ওমর (রা.), হযরত ওসমান (রা.) ও হযরত আলী (রা.) গনিমতের মালকে তিন অংশে ভাগ করতেন। একভাগ এতিমদের জন্য। একভাগ দরিদ্র লোকদের জন্য। আর একভাগ মুসাফিরদের জন্য। (রাসূল ﷺ -এর ধনী আত্মীয়দের জন্য কোনো অংশ ছিল না।)

২. রাসূল ﷺ -এর হাদীস يَا مَعْشَرَ بَنِي هَاشِمٍ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى كَرِهَ لَكُمْ غُسَالَةَ النَّاسِ وَاَوْسَاخَهُمْ وَعَوَّضَكُمْ مِنْهَا بِخُمُسِ الْخُمُسِ অর্থাৎ হে বনূ হাশেম! আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য মানুষের ময়লা ধোয়া পানি এবং আবর্জনা অপছন্দ করেছেন এবং এর বিনিময়ে তিনি তোমাদেরকে খুমুসের খুমুস দান করেছেন। প্রকাশ থাকে যে, ময়লা ধোয়া পানি এবং আবর্জনা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো জাকাত। আর খুমুসকে বলা হয়েছে এর বিনিময় বা বিকল্প। আর বিকল্প তাদের জন্যই সাব্যস্ত হয় যাদের জন্য মূল সাব্যস্ত হয়। অতএব, যাদের জন্য জাকাত সাব্যস্ত হয়, তাদের জন্যই খুমুস সাব্যস্ত হয়। বলা বাহুল্য জাকাত সাব্যস্ত হয় দরিদ্রদের জন্য, তাই খুমুসও সাব্যস্ত হবে দরিদ্রের জন্য। ধনীরা জাকাতের হকদার নয়, তাই তারা খুমুসেরও হক দার নয়। কেননা খুমুস হলো জাকাতের বিনিময়।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ فَأَمَّا ذِكْرُ اللّٰهِ تَعَالٰى فِي الْخُمُسِ فَإِنَّهُ لِافْتِتَاحِ الْكَلَامِ تَبَرُّكًا بِاسْمِهِ، وَسَهْمُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ سَقَطَ بِمَوْتِهِ كَمَا سَقَطَ الصَّفِيُّ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يَسْتَحِقُّهُ بِرِسَالَتِهِ وَلَا رَسُوْلَ بَعْدَهُ وَالصَّفِيُّ شَيْءٌ كَانَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ يَصْطَفِيْهِ لِنَفْسِهِ مِنَ الْغَنِيْمَةِ مِثْلَ دِرْعٍ أَوْ سَيْفٍ أَوْ جَارِيَةٍ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يُصْرَفُ سَهْمُ الرَّسُوْلِ إِلَى الْخَلِيْفَةِ، وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا قَدَّمْنَاهُ وَسَهْمُ ذَوِي الْقُرْبٰى كَانُوْا يَسْتَحِقُّوْنَهُ فِيْ زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنُّصْرَةِ لِمَا رَوَيْنَا .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, **পঞ্চমাংশ সম্পর্কে আল্লাহ যে, নিজের নাম উল্লেখ করেছেন** সেটা শুধু **নামের বরকত দিয়ে বক্তব্য শুরু করার জন্য। আর নবী করীম ﷺ-এর হিস্সা তার ওফাতের মাধ্যমেই রহিত হয়ে গেছে। যেমন নিজর জন্য বাছাই রহিত হয়ে গেছে।**

কেননা নবী করীম ﷺ তাঁর রেসালাতের সুবাদে এর হকদার হতেন। আর তার পরে কোনো রাসূল নেই।

আর صَفِي (বা ইচ্ছাকৃত) ঐ জিনিসকে, যা নবী করীম ﷺ গনিমত থেকে নিজের জন্য পছন্দ করে নিতেন। যেমন একটি বর্ম, তরবারি বা দাসী । ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, নবী করীম ﷺ-এর হিস্সা এখন খলিফার জন্য প্রত্যাবর্তিত হবে। তার বিপরীত প্রমাণ হলো যা আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি।

আর নবী করীম ﷺ -এর জমানায় তার নিকট আত্মীয়গণ হিস্সার হকদার হতেন সাহায্যের কারণে।

প্রমাণ আমাদের বর্ণিত হাদীস।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আলোচ্য ইবারতে এক প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে। প্রশ্নটি হলো এই যে, গনিমত সম্পর্কিত আয়াতে বলা হয়েছে তোমরা যে গনিমত লাভ কর, তার পঞ্চমাংশ হলো আল্লাহর জন্য, তার রাসূলের জন্য।

আল্লাহর জন্য পঞ্চমাংশ হওয়ার দ্বারা কি উদ্দেশ্য? আল্লাহর রাসূলের যে হিস্সা তার কি হুকুম? এসব প্রশ্নের উত্তরে মুসান্নিফ (র.) বলেন, আলোচনার শুরুতে আল্লাহর নাম উল্লেখ করা হয়েছে কেবল বরকতের জন্য। খুমুসের মধ্যে প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর কোনো অংশ নেই। কেননা তিনি সব কিছুর মালিক। তিনি সব কিছু হতে বেনিয়াজ। সকলই তার মুহতাজ।

আল্লাহর রাসূলের জন্য তার জীবদ্দশায় যে অংশ ছিল তা আহনাফের মতে রাসূলের মৃত্যু দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। কারণ রাসূল ﷺ সে হিস্সার হকদার হতেন রাসূল হওয়ার কারণে, আর তাঁর ইন্তেকালের পর দুনিয়াতে কোনো রাসূল নেই বা কেউ রাসূল হবে না। তাই তার হিসসাটি আর কেউ পাবে না। আবার উত্তরাধিকার সূত্রেও সে হক কেউ পাবে না। কেননা, রাসূলদের উত্তরাধিকারী হওয়া যায় না। প্রতিনিধিত্বের কারণেও সে হক নেওয়া যাবে না। কারণ রাসূলের ইন্তেকালের পর হযরত আবূ বকর (রা.) রাসূলের প্রতিনিধি হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি খুমুসের অংশ নেননি। পরবর্তী খলিফাগণও নেননি। খুমুসের অংশ রহিত হওয়ার নজির হলো ছফি রহিত হওয়া। অর্থাৎ নবী করীম ﷺ -এর একটি

https://e-ilm.weebly.com/

অধিকার এই ছিল যে, তিনি গনিমতের মাল থেকে পছন্দনীয় যে কোনো বস্তু নিজের জন্য বাছাই করে নিতে পারতেন। রাসূলের ইন্তেকালের পর সে অধিকার রহিত হয়ে গেছে। রাসূলের ইন্তেকালের পর কারো জন্য গনিমত থেকে পছন্দমতো কিছু নেওয়া জায়েজ নেই। অনুরূপভাবে খুমুসের অংশ নেওয়াও কারো জন্য জায়েজ নেই।

ছফি সম্পর্কিত একটি রেওয়ায়েত-

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رض) قَالَ قَدِمْنَا خَيْبَر فَلَمَّا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الحصْنَ ذُكِرَ لَهُ جَمَالُ صَفِيَّةَ بِنْتِ حي ابْنِ أَخْطَبَ وقَدْ قُتِل زَوْجُهَا وكَانَتْ عَرُوْسًا فَاصْطَفَاهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِه رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ

অর্থাৎ হযরত আনাস (রা.) বলেন, আমরা খায়বারে অভিযান পরিচালনা করার পর আল্লাহ যখন খায়বারের দুর্গ বিজয় দান করলেন, তখন রাসূল ﷺ এর কাছে সাফিয়াহ বিনতে হুয়াই ইবনে আখতাবের সৌন্দর্যের ব্যাপারে আলোচনা করা হলো। সে ছিল নববধূ। তার স্বামী যুদ্ধে নিহত হয়েছিল। তাই নবী করীম ﷺ তাকে নিজের জন্য বাছাই করে নিলেন। -(বুখারী) ও অন্যান্য।)

ইমাম শাফির (র.) -এর পক্ষ থেকে একাধিক রেওয়ায়েত রয়েছে-

১. রাসূল ﷺ -এর খুমুসের অংশ তাঁর ইন্তেকালের পর খলিফাদেরকে দেওয়া হবে।

২. রাসূল ﷺ -এর খুমুসের অংশ মুসলমানদের কল্যাণমূলক কাজে ব্যবহার করা হবে।

৩. রাসূল ﷺ -এর খুমুসের অংশ খুমুসের অন্যান্য হকদারের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া হবে।

এক্ষেত্রে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতের বিপক্ষে আমাদের দলিল হলো পূর্বোক্ত রেওয়ায়েত। অর্থাৎ হযরত আবূ বকর ও অন্যান্য খলিফাগণ খুমুসের অংশ নেননি।

রাসূল ﷺ -এর আত্মীয়বর্গ রাসূলের জীবদ্দশায় খুমুসের যে অংশ পেত, তা ছিল রাসূল ﷺ -কে সাহায্য করার সুবাদে। যেমন পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে, রাসূল ﷺ দুহাতের আঙুলসমূহ পরস্পর প্রবেশ করিয়ে দেখিয়ে বলেছেন এরা এভাবে আমার সাথে ছিল ইসলামি যুগে ও জাহেলি যুগে।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ وَبَعْدَهُ بِالْفَقْرِ قَالَ الْعَبْدُ الضَّعِيْفُ عَصَمَهُ اللّٰهُ : هٰذَا الَّذِيْ ذَكَرَهُ قَوْلُ الْكَرْخِيِّ . وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ : سَهْمُ الْفَقِيْرِ مِنْهُمْ سَاقِطٌ اَيْضًا لِمَا رَوَيْنَا مِنَ الْاِجْمَاعِ، وَلِاَنَّ فِيْهِ مَعْنَى الصَّدَقَةِ نَظَرًا اِلَى الْمَصْرِفِ فَيُحَرِّمُهُ كَمَا حَرَّمَ الْعِمَالَةَ . وَجْهُ الْاَوَّلِ وَقِيْلَ هُوَ الْاَصَحُّ مَا رُوِيَ اَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَعْطَى الْفُقَرَاءَ مِنْهُمْ، وَالْاِجْمَاعُ اِنْعَقَدَ عَلٰى سُقُوْطِ حَقِّ الْاَغْنِيَاءِ، اَمَّا فُقَرَاؤُهُمْ فَيَدْخُلُوْنَ فِي الْاَصْنَافِ الثَّلَاثَةِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, আর তার ওফাতের পরে দরিদ্রতার কারণে। হেদায়া গ্রন্থকার (আল্লাহ তাকে রক্ষা করুন) বলেন, ইমাম কুদূরী (র.) যা উল্লেখ করেছেন, তা হলো ইমাম কারখীর অভিমত।

পক্ষান্তরে ইমাম ত্বহাবী (র.) বলেন, তাদের মধ্যে ফকিরদের হিস্‌সা রহিত হয়ে গেছে। আমাদের পূর্ব বর্ণিত ইজমাঈ মতের কারণে তাছাড়া একারণে যে, খরচের খাত বিবেচনায় এতে সদকার গুণগত দিক রয়েছে। সুতরাং তা হারাম হবে, যেমন (জাকাত সংগ্রহের দায়িত্বে নিযুক্ত হাশেমীর জন্য) জাকাতের অর্থ থেকে পারিশ্রমিক গ্রহণ হারাম। প্রথমোক্ত মতের এবং কথিত হয়েছে যে, এটাই বিশুদ্ধতম অভিমত, প্রমাণ হলো এই বর্ণনা যে, হযরত ওমর (রা.) তাদের দরিদ্রদেরকে তা প্রদান করতেন। আর ইজমাতো সংঘটিত হয়েছে তাদের ধনীদের হিস্‌সা ব্যহত হওয়ার ব্যাপারে। পক্ষান্তরে তাদের দরিদ্ররা উপরিউক্ত তিন শ্রেণির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

রাসূল ﷺ -এর আত্মীয়বর্গ রাসূল ﷺ -এর ওফাতের পর খুমুসের হিস্‌সা পাবে কিনা এ সম্পর্কে দুটি মত বর্ণিত হয়েছে।

১. ইমাম কারখী (র.) -এর মতে, রাসূল ﷺ -এর দরিদ্র আত্মীয়বর্গ রাসূলের ওফাতের পরেও খুমুসের হিস্‌সা পাবে। এটিই বিশুদ্ধতম মত।

২. ইমাম ত্বহাবী (র.)-এর মতে, রাসূল ﷺ -এর দরিদ্র আত্মীয়বর্গও খুমুসের হিস্‌সা পাবে না।

এ দ্বিতীয় মতের পক্ষে দলিল হলো পূর্ব বর্ণিত ইজমা। অর্থাৎ খুলাফায়ে রাশেদীন রাসূল ﷺ -এর ওফাতের পর খুমুসকে তিন ভাগে ভাগ করতেন। একভাগ এতিমদের জন্য, একভাগ মিসকিনদের জন্য, আরেকভাগ মুসাফিরদের জন্য। আত্মীয়বর্গের জন্য কোনো হিস্‌সা ছিল না।

আরো একটি দলিল হলো, মাসরাফের বিবেচনায়, অর্থাৎ খরচের খাতের বিবেচনায় এর মধ্যে সদকার দিক রয়েছে। কেননা আত্মীয় ধনী হলে তাকে খুমুস দেওয়া কারো মতেই জায়েজ নেই। যাকে দেওয়া হয় তাকে দরিদ্র হওয়ার কারণেই দেওয়া হয়। যেমন দরিদ্রকে সদকা দেওয়া হয়। অতএব হাশেমীর গ্রহণ করা শুদ্ধ হবে না। যেমনিভাবে জাকাত উসুলের কাজে নিয়োজিত হাশেমীর জন্য জাকাতের অর্থ থেকে পারিশ্রমিক নেওয়া শুদ্ধ হয় না।

প্রথম মতের পক্ষে দলিল হলো– হযরত ওমর (রা.) রাসূলের দরিদ্র আত্মীয়দেরকে খুমুসের হিস্‌সা দিয়েছেন। যাদেরকে খুলাফায়ে রাশেদীন খুমুস দেননি,তারা হলেন ধনী আত্মীয়বর্গ। দরিদ্ররা উপরে বর্ণিত তিন শ্রেণির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে। অর্থাৎ রাসূল ﷺ -এর এতিম আত্মীয়বর্গ এতিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে। দরিদ্র আত্মীয়বর্গ মিসকিনদের অন্তর্ভুক্ত হবে। মুসাফির আত্মীয়বর্গ মুসাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হবে। এবং মাল বন্টনের ক্ষেত্রে প্রত্যেক শ্রেণিতে রাসূল ﷺ -এর আত্মীয়দেরকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে। মোটকথা, রাসূল ﷺ -এর জীবদ্দশায় ধনী দরিদ্র সকল আত্মীয় খুমুস পেতেন দীনি সাহায্যের কারণে। আর তার ওফাতের পরে কেবল দরিদ্র আত্মীয়গণ খুমুস পাবেন তবে ভিন্ন শ্রেণি হিসাবে নয় বরং এতিম মিসকিন ও মুসাফির হিসাবে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَإِذَا دَخَلَ الْوَاحِدُ اَوْ الْاِثْنَانِ دَارَ الْحَرْبِ مُغِيْرَيْنِ بِغَيْرِ اِذْنِ الْاِمَامِ فَاَخَذُوْا شَيْئًا لَمْ يُخَمَّسْ لِاَنَّ الْغَنِيْمَةَ هُوَ الْمَاخُوْذُ قَهْرًا وَغَلَبَةً لَا اِخْتِلَاسًا وَسَرِقَةً، وَالْخُمُسُ وَظِيْفَتُهَا، وَلَوْ دَخَلَ الْوَاحِدُ اَوِ الْاِثْنَانِ بِاِذْنِ الْاِمَامِ فَفِيْهِ رِوَايَتَانِ، وَالْمَشْهُوْرُ اَنَّهُ يُخَمَّسُ لِاَنَّهُ لَمَّا اَذِنَ لَهُمُ الْاِمَامُ فَقَدْ الْتَزَمَ نُصْرَتَهُمْ بِالْاِمْدَادِ فَصَارَ كَالْمَنَعَةِ فَاِنْ دَخَلَتْ جَمَاعَةٌ لَهَا مَنَعَةٌ فَاَخَذُوْا شَيْئًا خُمِّسَ وَاِنْ لَمْ يَاْذَنْ لَهُمُ الْاِمَامُ لِاَنَّهُ مَاخُوْذٌ قَهْرًا وَغَلَبَةً فَكَانَ غَنِيْمَةً، وَلِاَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْاِمَامِ اَنْ يَنْصُرَهُمْ اِذْ لَوْ خَذَلَهُمْ كَانَ فِيْهِ وَهْنُ الْمُسْلِمِيْنَ، بِخِلَافِ الْوَاحِدِ وَالْاِثْنَيْنِ: لِاَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ نُصْرَتُهُمْ .

অনুবাদ : শাসকের অনুমতি ছাড়া একজন বা দুজন যদি লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে দারুল হরবে প্রবেশ করে এবং কোনো কিছু হস্তগত করে, তাহলে তা থেকে পঞ্চমাংশ নেওয়া হবে না। কেননা গনিমত হলো যা শক্তি বলে বিজয়ের মাধ্যমে অর্জন করা হয় ছিনতাই ও চুরির মাধ্যমে নয়। আর পঞ্চমাংশ হচ্ছে গনিমত সংশ্লিষ্ট বিধান।

পক্ষান্তরে একজন বা দুজন যদি শাসকের অনুমতিক্রমে গিয়ে থাকে তাহলে সে সম্পর্কে দুটি বর্ণনা রয়েছে। প্রসিদ্ধ বর্ণনা এই যে, তার থেকে পঞ্চমাংশ নেওয়া হবে। কেননা শাসক যখন তাদের অনুমতি প্রদান করলেন তখন তিনি সাহায্য যুগিয়ে তাদের মদদ করার দায় গ্রহণ করলেন। সুতরাং তারা শক্তিবল সম্পন্নই হলো।

আর যদি শক্তিবল সম্পন্ন কোনো দল ঢুকে পড়ে এবং কোনো কিছু হস্তগত করে তাহলে শাসক তাদের অনুমতি প্রদান না করলেও তা থেকে পঞ্চমাংশ নেওয়া হবে। কেননা তা শক্তিবলে ও বিজয়ের মাধ্যমে লাভ করা হয়েছে। সুতরাং এটা গনিমত হবে। তাছাড়া এমতাবস্থায় শাসকের অবশ্যকর্তব্য হবে তাদের সাহায্য করা। কেননা তিনি যদি তাদেরকে বর্জন করেন তাহলে মুসলমানদের দুর্বলতা প্রকাশ পাবে। পক্ষান্তরে একজন দুজনের বিষয়টি ভিন্ন কেননা তাদেরকে সাহায্য করা শাসকের অবশ্য কর্তব্য নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মুসলিম শাসকের অনুমতি ছাড়া দু-একজন যদি দারুল হরবে প্রবেশ করে কিছু মাল সম্পদ চুরি ছিনতাই করে নিয়ে আসে তাহলে তা থেকে খুমুস নেওয়া হবে কিনা এ নিয়ে ইমামগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে।

আহনাফের মতে উক্ত মাল হতে খুমুস নেওয়া হবে না। ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক (র.) ও অধিকাংশ আলেমের মতে তা থেকেও খুমুস নেওয়া হবে। তাদের যুক্তি হলো– তাদের অর্জিত মালগুলো হরবীদের মাল। সেগুলো জোরপূর্বক আনা হয়েছে। তাই সেগুলো গনিমত। অতএব তা থেকে খুমুস বা পঞ্চমাংশ গ্রহণ করা হবে। আহনাফের যুক্তি হলো খুমুস নেওয়া হয় গনিমত থেকে, আর গনিমত হলো যা শক্তিবলে বিজয়ের মাধ্যমে অর্জন করা হয়। আলোচ্য সম্পদটি এরূপ নয়। কারণ তারা সে সম্পদ চুরি করে ছিনতাই করে এনেছে। অতএব, এটা গনিমত নয়। তাই তা থেকে খুমুস নেওয়া হবে না। দুএকজন লোক যদি ইমামের অনুমতিক্রমে দারুল হরবে প্রবেশ করে কিছু মালামাল নিয়ে আসে, তাহলে তা থেকে খুমুস নেওয়ার ব্যাপারে দুরকম বর্ণনা আছে। প্রসিদ্ধ বর্ণনাটি হলো তা থেকে খুমুস নেওয়া হবে। কারণ বাদশাহর অনুমতিক্রমে প্রবেশ করার অর্থ হলো, বাদশাহ তাদেরকে সহযোগিতা করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। এর ফলে তারা শক্তিবল সম্পন্ন একটি বাহিনীর মতো হয়ে গেল। তাই তারা যে মালামাল নিয়ে আসবে তা গনিমত হিসাবে ধর্তব্য হবে এবং তা থেকে খুমুস নেওয়া হবে । অপ্রসিদ্ধ বর্ণনাটি হলো উক্ত মাল থেকে খুমুস নেওয়া হবে না।

قَوْلُهُ : فَاِنْ دَخَلَتْ جَمَاعَةٌ لَهَا مَنَعَةٌ فَاَخَذُوْا الخ : শক্তিবল সম্পন্ন কোনো দল ইমামের অনুমতি ছাড়া দারুল হরবে প্রবেশ করে মালামাল লুণ্ঠন করে আনলে তা থেকে খুমুছ নেওয়া হবে। কারণ, উক্ত মাল একদল শক্তিশালী লোক জোরপূর্বক এনেছে। তাই তা গনিমত বলে গণ্য হবে এবং তা থেকে খুমুস নেওয়া হবে।

এ ধরনের দলকে সাহায্য করা ইমামের কর্তব্য। সাহায্য করা না হলে মুসলমানদের দুর্বলতা প্রকাশ পাবে।

একটি দল শক্তিশালী হওয়ার জন্য সংখ্যায় নয় জন হওয়া আবশ্যক, ইবনে শুজা রচিত কিতাবুল খারাজের বর্ণনা অনুযায়ী। ফাতহুল কাদীর মুহিত ইত্যাদির বিবরণ অনুযায়ী যে দলের লোক সংখ্যা সাত, সে দল শক্তিশালী নয়। যে দলের লোক সংখ্যা দশ, সে দল শক্তিশালী।

https://e-ilm.weebly.com/

فَصْلٌ فِي التَّنْفِيْلِ

قَالَ وَلَا بَأْسَ بِاَنْ يُنَفِّلَ الْاِمَامُ فِيْ حَالِ الْقِتَالِ وَيُحَرِّضَ بِهٖ عَلَى الْقِتَالِ فَيَقُوْلُ "مَنْ قَتَلَ قَتِيْلًا فَلَهٗ سَلَبُهٗ" وَيَقُوْلُ لِلسَّرِيَّةِ قَدْ جَعَلْتُ لَكُمُ الرُّبُعَ بَعْدَ الْخُمُسِ مَعْنَاهُ بَعْدَمَا رَفَعَ الْخُمُسَ لِاَنَّ التَّحْرِيْضَ مَنْدُوْبٌ اِلَيْهِ، قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى ﴿يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ﴾ وَهٰذَا نَوْعُ تَحْرِيْضٍ، ثُمَّ قَدْ يَكُوْنُ التَّنْفِيْلُ بِمَا ذَكَرَ وَقَدْ يَكُوْنُ بِغَيْرِهٖ، اِلَّا اَنَّهٗ لَا يَنْبَغِي لِلْاِمَامِ اَنْ يُنَفِّلَ بِكُلِّ الْمَاْخُوْذِ لِاَنَّ فِيْهِ اِبْطَالَ حَقِّ الْكُلِّ، فَاِنْ فَعَلَهٗ مَعَ السَّرِيَّةِ جَازَ؛ لِاَنَّ التَّصَرُّفَ اِلَيْهِ وَقَدْ يَكُوْنُ الْمَصْلَحَةُ فِيْهِ وَلَا يُنَفِّلُ بَعْدَ اِحْرَازِ الْغَنِيْمَةِ بِدَارِ الْاِسْلَامِ لِاَنَّ حَقَّ الْغَيْرِ قَدْ تَاَكَّدَ فِيْهِ بِالْاِحْرَازِ. قَالَ اِلَّا مِنَ الْخُمُسِ لِاَنَّهٗ لَا حَقَّ لِلْغَانِمِيْنَ فِي الْخُمُسِ.

অনুচ্ছেদ : নফল বা হিস্‌সার অতিরিক্ত প্রদান

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, লড়াইয়ের অবস্থায় লড়াইয়ে উদ্বুদ্ধ করার জন্য শাসক নফল বা পুরস্কার করতে পারবেন এতে কোনো দোষ নেই। যেমন তিনি বললেন, কোনো শত্রুকে যে হত্যা করবে তার থেকে প্রাপ্ত যাবতীয় জিনিসপত্র তারই হবে। এবং কোনো ক্ষুদ্র দলকে বললেন, পঞ্চমাংশের পর তোমাদের জন্য চতুর্থাংশ নির্ধারণ করলাম। অর্থাৎ পঞ্চমাংশ আলাদা করে নেওয়ার পর। কেননা উদ্বুদ্ধ করা শরিয়তের পছন্দনীয় বিষয়। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ -হে নবী! আপনি মুমিনগণকে লড়াইয়ে উদ্বুদ্ধ করুন।

আর এটাও এক ধরনের উদ্বুদ্ধকরণ। আর নফল বা পুরস্কার ঘোষণা উল্লিখিত পরিমাণ দ্বারা হতে পারে, কিংবা অন্যভাবেও হতে পারে। তবে শাসকের কর্তব্য হলো লব্ধ গনিমতের সবটুকুই পুরস্কার ঘোষণা না করা। কেননা এতে সকলের হক বাতিল করা হয়। তা সত্ত্বেও যদি তিনি কোনো যোদ্ধা দলের ক্ষেত্রে এটা করেন, তাহলে জায়েজ হবে। কেননা হস্তক্ষেপের অধিকার তার এবং তাতে বিশেষ কল্যাণও থাকতে পারে।

তবে গনিমতের মাল দারুল ইসলামে নিয়ে আসার পর নফল ঘোষণা করা যাবে না। কেননা সংরক্ষণ সম্পন্ন হওয়ার পর উক্ত মালে অন্যদের হক সুদৃঢ় হয়ে গেছে। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, তবে পঞ্চমাংশ থেকে করা যাবে। কেননা পঞ্চমাংশে যোদ্ধাদের কোনো হক নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

নফল গনিমতেরই এক বিশেষ প্রকার। তাই গনিমতের বণ্টন সংক্রান্ত আলোচনার পর নফল সংক্রান্ত আলোচনার অবতারণা করা হয়েছে। গনিমতে বণ্টনের বিষয়টি সুনির্দিষ্ট নিয়মের ভিত্তিতে হয়ে থাকে। আর নফল প্রদানের বিষয়টি কোনো সুনির্দিষ্ট নিয়মের অধীন নয়; বরং তা ইমাম তথা মুসলিম শাসকের সিদ্ধান্তের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি যাকে যে পরিমাণ দেওয়া উপযুক্ত মনে করেন, দিতে পারেন।

https://e-ilm.weebly.com/

نفل একবচন। বহুবচন হলো انفال। نفل - ثلاثى مجرد -نفّل باب تفعيل হতে এবং হতে একই অর্থে ব্যবহার হয়। অর্থ হলো- ইমাম কোনো যোদ্ধাকে তার নির্ধারিত হিস্সার চেয়ে বেশি দিল।

শাসকের জন্য মোস্তাহাব হলো-যোদ্ধাকে বা যোদ্ধাদলকে যুদ্ধে উৎসাহিত করার জন্য নফল ঘোষণা করা। শাসক এরূপ বলে দিবে যে, যে মুজাহিদ কোনো দুশমনকে হত্যা করতে পারবে, সে তার নিকট প্রাপ্ত যাবতীয় মালামাল নিয়ে যাবে।

কোনো দলকে সম্বোধন করে বলে দিবে যে, তোমরা যে গনিমত লাভ করবে, তার খুমুস নেওয়ার পর চতুর্থাংশ তোমাদেরকে দেওয়া হবে। এছাড়া অন্য কিছুও ঘোষণা করতে পারে। যেমন বলতে পারে, তোমাদেরকে গনিমতের অর্ধেক দেওয়া হবে। কিংবা এরূপ বলা যে, তোমাদেরকে এ পরিমাণ স্বর্ণ রূপা দান করা হবে ইত্যাদি। তবে পূর্ণ গনিমত নফল ঘোষণা করা উচিত নয়। কেননা গনিমতের সমস্ত সম্পদ নফল ঘোষণা করে দিলে সকল মুজাহিদদের হক নষ্ট করা হবে। তদুপরি যদি শাসক কোনো দলের পূর্ণ গনিমতকে নফল ঘোষণা করে ফেলে, তাহলেও তা জায়েজ হবে। কারণ গনিমতের মালে তাসাররুফ করার অধিকার তার আছে এবং হতে পারে এরূপ করাতে বিশেষ কোনো উপকারও থাকতে পারে। নফল ঘোষণা করার বিষয়টি মোস্তাহাব। কেননা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ 'হে নবী! আপনি মুমিনগণকে যুদ্ধের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করুন।' নফল ঘোষণার মাধ্যমেও যেহেতু যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করা হয়, সেহেতু নফল ঘোষণা করাও মোস্তাহাব।

وَلَا يُنَفِّلُ بَعْدَ إِحْرَازِ الْغَنِيمَةِ الخ : গনিমতের মাল দারুল ইসলামে সংরক্ষিত হয়ে যাওয়ার পর এতে অন্যান্য যোদ্ধাদের হক দৃঢ় হয়ে যায়। ইমামের জন্য সে হক বাতিল করা বৈধ নয়। তাই গনিমত দারুল ইসলামে চলে আসার পর তা থেকে নফল ঘোষণা জায়েজ নয়।

তবে খুমুস তথা পঞ্চমাংশ থেকে নফল ঘোষণা করা তখনও জায়েজ। কেননা দারুল ইসলামে আসার পরও খুমুসের মধ্যে যোদ্ধাদের কোনো হক থাকে না; বরং সেটা ইমামের দায়িত্বে ন্যস্ত থাকে। ইমাম তার নিজ রায় অনুপাতে মুসলমানের কল্যাণকর যে কোনো খাতে ব্যয় করতে পারেন। অতএব, দারুল ইসলামে আসার পরও ইমাম ইচ্ছা করলে খুমুস থেকে নফল ঘোষণা করতে পারবেন। যেহেতু খুমুস থেকে নফল ঘোষণা করলে কারো হক বাতিল করা হয় না।

প্রশ্ন হতে পারে যে, খুমুসের মাঝে যোদ্ধাদের হক না থাকলেও এতিম, মিসকিন ও মুসাফির এই তিন শ্রেণির হক রয়েছে। সুতরাং খুমুস থেকে নফল ঘোষণা করা হলে এ তিন শ্রেণির হকতো বাতিল করা হয়। এর জাবাব হলো, উক্ত তিন শ্রেণি খুমুসের মাসরাফ তথা খুমুস ব্যয় করার খাত; মুস্তাহিক বা হকদার নয়। তাই নফল ঘোষণা করা হলে তাদের হক বাতিল করা অবধারিত হয় না। তবে খুমুস থেকে যে ব্যক্তির জন্য নফল ঘোষণা করা হবে, সে ব্যক্তি দরিদ্র হওয়া আবশ্যক কারণ খুমুস দরিদ্র মানুষের হক- ধনীদের হক নয়। ধনী ব্যক্তির জন্য খুমুস হতে নফল ঘোষণা করা হলে দরিদ্রদের হক নষ্ট করা হয়।

https://e-ilm.weebly.com/

وَإِذَا لَمْ يَجْعَلِ السَّلْبَ لِلْقَاتِلِ فَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ الْغَنِيْمَةِ، وَالْقَاتِلُ وَغَيْرُهُ فِيْ ذٰلِكَ سَوَاءٌ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : السَّلْبُ لِلْقَاتِلِ إِذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ أَنْ يُسْهِمَ لَهُ وَقَدْ قَتَلَهُ مُقْبِلًا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ ﴿مَنْ قَتَلَ قَتِيْلًا فَلَهُ سَلَبُهُ﴾ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ نَصْبُ شَرْعٍ لِأَنَّهُ بُعِثَ لَهُ. وَلِأَنَّ الْقَاتِلَ مُقْبِلًا أَكْثَرَ غِنَاءً فَيَخْتَصُّ بِسَلَبِهِ إِظْهَارًا لِلتَّفَاوُتِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ . وَلَنَا أَنَّهُ مَأْخُوْذٌ بِقُوَّةِ الْجَيْشِ فَيَكُوْنُ غَنِيْمَةً فَيُقَسَّمُ الْغَنَائِمَ كَمَا نَطَقَ بِهِ النَّصُّ. وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ لِحَبِيْبِ بْنِ أَبِيْ سَلَمَةَ ﴿لَيْسَ لَكَ مِنْ سَلَبِ قَتِيْلِكَ إِلَّا مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُ إِمَامِكَ﴾ وَمَا رَوَاهُ يَحْتَمِلُ نَصْبَ الشَّرْعِ وَيَحْتَمِلُ التَّنْفِيْلَ فَنَحْمِلُهُ عَلَى الثَّانِيْ لِمَا رَوَيْنَاهُ . وَزِيَادَةُ الْغِنَاءِ لَا تُعْتَبَرُ فِيْ جِنْسٍ وَاحِدٍ كَمَا ذَكَرْنَاهُ .

অনুবাদ : নিহতের কাছ থেকে প্রাপ্ত জিনিসপত্র যদি হত্যাকারীর জন্য ঘোষণা করা না হয়ে থাকে, তাহলে তা সমগ্র গনিমতের অংশ হবে। আর ঐ ক্ষেত্রে হত্যাকারী ও অন্যরা সমান হকদার হবে।

আর ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, হত্যাকারী যদি তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়, যাদের জন্য গনিমত থেকে হিস্সা দেওয়া যেতে পারে, আর সে শত্রুকে সামনাসামনি হত্যা করেছে, তাহলে নিহতের থেকে প্রাপ্ত জিনিসপত্র এককভাবে তারই হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– مَنْ قَتَلَ قَتِيْلًا فَلَهُ سَلَبُهُ অর্থাৎ যে মুজাহিদ কোনো শত্রুকে হত্যা করবে, তার থেকে প্রাপ্ত জিনিসপত্র তারই হবে।

এ হাদীস দ্বারা এ-ই স্বাভাবিক যে, এ বক্তব্য দ্বারা তিনি শরিয়তের একটি বিধান প্রবর্তন করেছেন। কেননা এজন্যেই তো তিনি প্রেরিত হয়েছেন।

আর এজন্য যে, দুশমনকে সামনাসামনি হত্যাকারী ব্যক্তি অধিক উপকার করল। সুতরাং তার ও অন্যদের মাঝে পার্থক্য প্রকাশের জন্য নিহতের লব্ধ জিনিসপত্র তার জন্য নির্দিষ্ট হবে।

আমাদের দলিল হলো, তার জিনিসগুলো বাহিনীর শক্তিতে লাভ হয়েছে। সুতরাং তা গনিমত হবে এবং গনিমতের ন্যায় বণ্টিত হবে। যেমন নাস -এ বর্ণিত হয়েছে। আর নবী করীম ﷺ হাবিব ইবনে আবী সালামাকে বলেছেন– لَيْسَ لَكَ مِنْ سَلَبِ قَتِيْلِكَ إِلَّا مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُ إِمَامِكَ অর্থাৎ তোমার হাতে নিহত ব্যক্তি হতে প্রাপ্ত জিনিসপত্র তোমার জন্য ততটুকুই বৈধ, যতটুকুতে তোমার শাসকের সন্তুষ্টি রয়েছে।

আর ইমাম শাফেয়ী (র.) যে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তা যেমন শরিয়তের বিধান প্রবর্তনের সম্ভাবনাপূর্ণ, তেমনি পুরস্কার ঘোষণারও সম্ভাবনাপূর্ণ। সুতরাং আমাদের বর্ণিত হাদীসটির কারণে দ্বিতীয় সম্ভাবনার ক্ষেত্রেই আমরা তা প্রয়োগ করব। আর একই শ্রেণির বিষয়ের ক্ষেত্রে অধিক উপকারের বিষয় বিবেচ্য নয়, যেমন আমরা উল্লেখ করে এসেছি।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যে সালাব যোদ্ধার জন্য পুরস্কার স্বরূপ ঘোষিত হয়নি, তা নিয়ে ইমামগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে।

আহনাফের মতে, যে সালাব যোদ্ধার জন্য পুরস্কার হিসাবে ঘোষিত হয়নি, তা গনিমতের মালের অন্তর্ভুক্ত। শত্রুকে হত্যাকারী যোদ্ধা ও অন্যান্য যোদ্ধা সকলই তাতে সমান হকদার। ইমাম মালেক ও সুফিয়ান ছাওরী (র.) এমত পোষণ করেন। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র.) হতেও এটি একটি রেওয়ায়েত।

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, শত্রুকে হত্যাকারী যোদ্ধা যদি গনিমতের হিস্সা পাওয়ার উপযুক্ত হয় সে উক্ত শত্রুকে সামনাসামনি অবস্থায় হত্যা করে থাকে, তাহলে হত্যাকারী যোদ্ধাই উক্ত সালাবের হকদার। এটি ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র.) হতে এক রেওয়ায়েত। ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর দলিল–

১. নবী করীম ﷺ -এর বাণী مَنْ قَتَلَ قَتِيْلًا فَلَهُ سَلَبُهُ -যে ব্যক্তি কোনো কাফেরকে হত্যা করবে, সেই তার সালাবের অধিকারী। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, নবী করীম ﷺ -এর উক্ত বাণীটি একটি শরয়ী বিধান। শরয়ী বিধান প্রবর্তনের উদ্দেশ্যেই তিনি এ বাণীটি উচ্চারণ করেছেন। কেননা তিনি বিধান প্রবর্তনের জন্যই প্রেরিত হয়েছিলেন।

২. যে যোদ্ধা কোনো কাফেরকে মুখোমুখি অবস্থায় হত্যা করে, তার দ্বারা যুদ্ধাঙ্গনে বিশেষ উপকার সাধিত হয়। অতএব, তার মাঝে ও অন্যান্য যোদ্ধাদের মাঝে পার্থক্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে ব্যক্তির সালাব হত্যাকারী যোদ্ধাকেই প্রদান করা হবে এবং এটা তার জন্যই খাস হবে। অন্য যোদ্ধাকে দেওয়া হবে না।

আহনাফ, ইমাম মালেক, সুফিয়ান ছাওরী প্রমুখের দলিল :

১. নিহত ব্যক্তির সালাব গোটা বাহিনীর শক্তিতে অর্জন হয়েছে। অতএব, এটা গনিমত বলে গণ্য হবে এবং গনিমতের মতোই বণ্টন করা হবে। যেমন কুরআনের আয়াত–

وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى الخ

২. নবী করীম ﷺ -এর বাণী হযরত হাবিব ইবনে সালামা (রা.)-কে সম্বোধন করে لَيْسَ لَكَ مِنْ سَلَبِ قَتِيْلِكَ اِلَّا مَاطَابَتْ بِهِ نَفْسُ اِمَامِكَ অর্থাৎ ইমামের সন্তুষ্টি ব্যতীত নিহত ব্যক্তির সালাব তোমার জন্য বৈধ নয়।

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, ইমাম অনুমতি দিলেই কেবল কোনো যোদ্ধার জন্য নিহত ব্যক্তির সালাব বৈধ হয়ে থাকে। অন্যথায় সালাব গনিমতের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং সকল যোদ্ধারই তাতে অংশ থাকে।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিলের জবাব : ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর দলিলরূপে বর্ণিত হাদীসটি যেমন শরয়ী বিধান হওয়ার সম্ভাবনা আছে, তেমনি ঘোষণা হওয়ারও সম্ভাবনা আছে। এমতাবস্থায় যদি হাদীসটিকে শরয়ী বিধানরূপে গ্রহণ করা হয়, তাহলে আহনাফের বর্ণিত হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক হয়ে দাঁড়ায়। কেননা ঐ হাদীসে বলা হয়েছে ইমামের সন্তুষ্টি ছাড়া সালাব বৈধ নয়। অতএব, দুই হাদীসের মাঝে যেন সংঘর্ষ না হয়, সে জন্য ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর বর্ণিত হাদীসটিকে নফল ঘোষণার অর্থেই প্রয়োগ করা হবে, যাতে করে নবী করীম ﷺ -এর বাণীসমূহ পরস্পরে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে যায়।

আকলী দলিল স্বরূপ ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছিলেন, সামনাসামনি হত্যাকারী যোদ্ধার দ্বারা অধিক উপকার সাধিত হয়, তাই তাকে সালাব দেওয়া হবে অন্যান্য যোদ্ধাদের থেকে পৃথকভাবে তাকে মূল্যায়ন করার উদ্দেশ্যে। এর জবাবে আহনাফ বলেন, এক জাতীয় কাজের মধ্যে আধিক্যের কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। কেননা যুদ্ধের ময়দানে হাজারো যোদ্ধা শত্রুর মোকাবিলায় অবতীর্ণ হয়। কার দ্বারা কম উপকার হয় আর কার দ্বারা বেশি উপকার হয়, যুদ্ধের ময়দানে সেটা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। অতএব, সকল যোদ্ধাই সমান উপকারী বলে বিবেচিত হবে।

لِاَنَّهُ تَعَذَّرَ كَمَا ذَكَرْنَا বলে মুসান্নিফ (র.) ইঙ্গিত করেছেন, فَصْلٌ فِىْ كَيْفِيَّةِ الْقِسْمَةِ - এ উল্লিখিত এ বক্তব্যের দিকে اِعْتِبَارُ مِقْدَارِ الزِّيَادَةِ لِتَعَذُّرِ مَعْرِفَتِهِ অর্থাৎ যোদ্ধাদের কাজের আধিক্য সম্পর্কে অবগত হওয়া অসম্ভব হওয়ার কারণে, আধিক্যের বিবেচনা করাও অসম্ভব।

https://e-ilm.weebly.com/

وَالسَّلَبُ مَا عَلَى الْمَقْتُوْلِ مِنْ ثِيَابِهِ وَسِلَاحِهِ وَمَرْكَبِهِ، وَكَذَا مَا كَانَ عَلَى مَرْكَبِهِ مِنَ السَّرْجِ وَالْأٰلَةِ، وَكَذَا مَا مَعَهُ عَلَى الدَّابَّةِ مِنْ مَالِهِ فِيْ حَقِيْبَتِهِ اَوْ عَلَى وَسَطِهِ وَمَا عَدَا ذٰلِكَ فَلَيْسَ بِسَلَبٍ وَمَا كَانَ مَعَ غُلَامِهِ عَلَى دَابَّةٍ اُخْرٰى فَلَيْسَ بِسَلَبِهِ، ثُمَّ حُكْمُ التَّنْفِيْلِ قَطَعَ حَقَّ الْبَاقِيْنَ. فَاَمَّا الْمِلْكُ فَاِنَّمَا يَثْبُتُ بَعْدَ الْاِحْرَازِ بِدَارِ الْاِسْلَامِ لِمَا مَرَّ مِنْ قَبْلُ حَتّٰى لَوْ قَالَ الْاِمَامُ مَنْ اَصَابَ جَارِيَةً فَهِيَ لَهُ فَاَصَابَهَا مُسْلِمٌ وَاسْتَبْرَاَهَا لَمْ يَحِلَّ لَهُ وَطْؤُهَا، وَكَذَا لَا يَبِيْعُهَا . وَهٰذَا عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ وَاَبِيْ يُوْسُفَ. وَقَالَ مُحَمَّدٌ : لَهُ اَنْ يَطَاَهَا وَيَبِيْعَهَا، لِاَنَّ التَّنْفِيْلَ يَثْبُتُ بِهِ الْمِلْكُ عِنْدَهُ كَمَا يَثْبُتُ بِالْقِسْمَةِ فِيْ دَارِ الْحَرْبِ وَبِالشِّرَاءِ مِنَ الْحَرْبِيِّ، وَوُجُوْبُ الضَّمَانِ بِالْاِتْلَافِ قَدْ قِيْلَ عَلَى هٰذَا الْاِخْتِلَافِ.

অনুবাদ : সালাব (প্রাপ্ত সম্পদ) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নিহত ব্যক্তির সাথে যা কিছু থাকে যেমন বস্ত্র, অস্ত্র, বাহন ইত্যাদি, অদ্রূপ বাহনে যুক্ত জিন ও সংশ্লিষ্ট সরঞ্জাম, অদ্রূপ তার সঙ্গের বাহনের কিংবা তার কোমরের থলিতে রক্ষিত মাল ইত্যাদি এছাড়া অন্যান্য বস্ত্র সালাব তথা প্রাপ্ত সম্পদ বলে গণ্য নয়। তার গোলামের সঙ্গে অন্য বাহনে যা কিছু রয়েছে, তা সালাব নয়।

আর পুরস্কার ঘোষণার ফলশ্রুতি হলো অন্যদের হক রহিতকরণ। পক্ষান্তরে মালিকানা সাব্যস্ত হবে দারুল ইসলামে স্থানান্তর পূর্বক সংরক্ষণ করা দ্বারা, পূর্ব বর্ণিত কারণে।

সুতরাং শাসক যদি এরূপ বলেন যে, কেউ কোনো দাসীকে হস্তগত করলে সেটা তার। অতঃপর কোনো মুসলমান কোনো দাসী হস্তগত করল এবং তার গর্ভশূন্যতা নিশ্চিত করে নিল তবু তার সাথে সহবাস করা এবং তাকে বিক্রি করা তার জন্য জায়েজ হবে না।

এ হলো ইমাম আবূ হানীফা (র.)ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মত। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, তার সাথে সহবাস করতে পারবে এবং তাকে বিক্রি করতে পারবে। কেননা তাঁর মতে পুরস্কার ঘোষণার দ্বারা মালিকানা সাব্যস্ত হয়ে যায়, যেমন দারুল হরবে বণ্টন সম্পন্ন হওয়ার দ্বারা এবং হরবীর কাছ থেকে খরিদ করা দ্বারা মালিকানা সাব্যস্ত হয়।

আর পুরস্কাররূপে ঘোষণাকৃত সালাব কেউ নষ্ট করে ফেললে তার ক্ষতিপূরণ অবশ্য সাব্যস্ত হওয়ার ব্যাপারে কারো কারো মতবিরোধ রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

নিহত ব্যক্তির কোন কোন সম্পদ সালাব হিসাবে গণ্য হবে এ সম্পর্কে উপরিউক্ত ইবারতে আলোকপাত করা হয়েছে :

নিহত ব্যক্তির অস্ত্র, বস্ত্র, বাহন ও বাহনের জিন অন্যান্য সরঞ্জাম ব্যক্তির পকেটে বা কোমরে রক্ষিত অর্থ কড়ি এগুলো সালাব হিসাবে গণ্য হবে। এছাড়া অন্যান্য সম্পদ সালাব নয়।

নিহত ব্যক্তির গোলামের সাথে অন্য বাহনে যা থাকে, সালাব বলে গণ্য হবে না; বরং গনিমত হিসাবে গণ্য হবে। নফল ঘোষণা করার ফলে নিহত ব্যক্তির সালাব হত্যাকারীর জন্য সাব্যস্ত হয়ে যায় এবং এ থেকে অন্যদের হক রহিত হয়ে

https://e-ilm.weebly.com/

যায়। নফলরূপে প্রাপ্ত সালাবের উপর হত্যাকারী যোদ্ধার মালিকানা সাব্যস্ত হবে দারুল ইসলামে এনে মালগুলো সংরক্ষণ করার পর। মুসান্নেফ (র.) لما مر من قبل বলে ইশারা করেছেন باب الغنائم এ উল্লিখিত নিম্নোক্ত ইবারতের দিকে -

لِاَنَّ الْاِسْتِيْلَاءَ اِثْبَاتُ الْيَدِ الْحَافِظَةِ وَالنَّاقِلَةِ وَالثَّانِيَةُ مُنْعَدِمَةٌ قَبْلَ الْاِحْرَازِ فَلَا يَثْبُتُ الْمِلْكُ ـ

قوله : حَتّٰى لَوْ قَالَ الْإِمَامُ الخ : যদি মুসলিম শাসক এরূপ করেন যে, যে যোদ্ধা কোনো দাসী হস্তগত করবে, সে দাসী তারই হবে, অতঃপর যদি কোনো যোদ্ধা একটি দাসী হস্তগত করে ইস্তিবরায়ে রেহেম (গর্ভশূন্যতা) নিশ্চিত করে নেয়, তাহলে উক্ত যোদ্ধা উক্ত দাসীর সাথে সহবাস করতে পারবে কিনা? এ নিয়ে ইমামগণের মাঝে মতভেদ হয়েছে।

ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) এর মতে উক্ত যোদ্ধা উক্ত বাঁদির সাথে সহবাস করতে পারবে না এবং তাকে বিক্রিও করতে পারবে না।

পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর মতে উক্ত যোদ্ধা উক্ত বাঁদির সাথে সহবাস করতে পারবে এবং তাকে বিক্রিও করতে পারবে। তাদের যুক্তি হলো, পুরস্কার ঘোষণার মাধ্যমে মালিকানা সাব্যস্ত হয়ে যায়, যেমন দারুল হরবে থাকাবস্থায়ই যদি ইমাম গনিমতের মাল বণ্টন করে দেয়, তাহলে যেমন মালিকানা সাব্যস্ত হয়ে যায় এবং যেমন কোনো হরবী ব্যক্তির দাসী বা কোনো কিছু খরিদ করলে মালিকানা সাব্যস্ত হয়ে যায়। তদ্রূপ পুরস্কার ঘোষণার দ্বারাও মালিকানা সাব্যস্ত হয়ে যাবে। তাই তার সাথে সহবাস করা এবং তাকে বিক্রি করা সংশ্লিষ্ট যোদ্ধার পক্ষে হালাল হবে।

কারো প্রাপ্ত সালাব যদি কেউ নষ্ট করে ফেলে তাহলে এর ক্ষতিপূরণ দিতে হবে কি-না এ সম্পর্কে উপরিউক্ত মতভেদ বিদ্যমান আছে। অর্থাৎ ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম ইউসুফ (র.)-এর মতে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। কারণ তখনো তাতে কারো মালিকানা সাব্যস্ত হয়নি। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ ও ইমামত্রয়ের মতে নষ্টকৃত সালাবের ক্ষতিপূরণ দেওয়া অত্যাবশ্যক। কেননা তাদের মতে উক্ত মাল সংশ্লিষ্ট যোদ্ধার মালিকানা হয়ে গেছে। তাই এটা কেউ নষ্ট করলে অবশ্যই তাকে এর ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ اِسْتِيْلَاءِ الْكُفَّارِ

وَاِذَا غَلَبَ التُّرْكُ عَلَى الرُّوْمِ فَسَبَوْهُمْ وَاَخَذُوْا اَمْوَالَهُمْ مَلَكُوْهَا؛ لِاَنَّ الْاِسْتِيْلَاءَ قَدْ تَحَقَّقَ فِيْ مَالٍ مُبَاحٍ وَهُوَ السَّبَبُ عَلٰى مَا نُبَيِّنُهٗ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى فَاِنْ غَلَبْنَا عَلَى التُّرْكِ حَلَّ لَنَا مَا نَجِدُهٗ مِنْ ذٰلِكَ اِعْتِبَارًا بِسَائِرِ اَمْلَاكِهِمْ

পরিচ্ছেদ : কাফেরদের দখল ও আধিপত্য বিস্তার

অনুবাদ : তুর্কিরা যদি রোমকদের উপর বিজয় অর্জন করে এবং তাদেরকে বন্দি করে এবং তাদের সম্পদসমূহ অধিকার করে তাহলে তারা সেগুলোর মালিক হয়ে যাবে। কেননা মুবাহ মালের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন হয়েছে। আর ইনশাআল্লাহ সামনে আমরা বর্ণনা করব যে, এটা হলো কোনো বস্তুর মালিকানা লাভের কারণ।

অতঃপর আমরা যদি তুর্কিদের উপর বিজয় লাভ করি তাহলে তাদের অন্য সকল সম্পদের উপর কিয়াস করে **প্রাপ্ত ঐ সকল সম্পদেও আমরা মালিকানা লাভ করব।**

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

এ পরিচ্ছেদে কাফেরদের বিজয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। তাই মুসান্নিফ (র.) কাফেরদের পরস্পরে একের উপর অন্যের বিজয় লাভ করার প্রসঙ্গ দ্বারা আলোচনা শুরু করেছেন।

اَلتُّرْكُ শব্দটি تُرْكِىْ শব্দের বহুবচন। উদ্দেশ্য হলো তুর্কি কাফের। اَلرُّوْمُ শব্দটি رُوْمِىْ শব্দের বহুবচন। উদ্দেশ্য হলো রোমক খ্রিস্টান। বর্ণিত মাসআলার সারসংক্ষেপ হলো– এক কাফের গোষ্ঠী যদি অন্য অন্য কাফের গোষ্ঠীর উপর বিজয় লাভ করে তাদেরকে বন্দি করে নেয় এবং তাদের মালামাল নিজেদের দখলে নিয়ে নেয়, তাহলে বিজয়ী গোষ্ঠী পরাজিত গোষ্ঠীর তাবৎ মালসম্পদের মালিক হয়ে যাবে। কারণ কাফেরদের মাল মুবাহ, আর এই মুবাহ মালের উপর বিজয়ীদের দখল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই তারা এর মালিক হয়ে যাবে। কেননা মুবাহ সম্পদের উপরে যার দখল প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই তার মালিক হয়ে যায়। এরপর কোনো সময় যদি এই বিজয়ী কাফেরদের উপর মুসলমানরা বিজয় লাভ করে, তাহলে তাদের সকল সম্পদের মালিক মুসলমানরা হবে। যে সম্পদ এই কাফের গোষ্ঠী অন্য কাফেরদের থেকে জয় করে এনেছিল, তাও তাদের অন্যান্য সম্পদের মতোই বিবেচিত হবে। অতএব, তাদের নিজেদের মূল সম্পদ ও অন্য দেশ হতে জয় করে আনীত সম্পদ উভয়ই মুসলমানদের মালিকানা বলে গণ্য হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَإِذَا غَلَبُوْا عَلَى أَمْوَالِنَا وَالْعِيَاذُ بِاللهِ وَاَحْرَزُوْهَا بِدَارِهِمْ مَلَكُوْهَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا يَمْلِكُوْنَهَا؛ لِأَنَّ الْاِسْتِيْلَاءَ مَحْظُوْرٌ اِبْتِدَاءً وَانْتِهَاءً وَالْمَحْظُوْرُ لَا يَنْتَهِضُ سَبَبًا لِلْمِلْكِ عَلَى مَا عُرِفَ مِنْ قَاعِدَةِ الْخَصْمِ . وَلَنَا اَنَّ الْاِسْتِيْلَاءَ وَرَدَ عَلَى مَالٍ مُبَاحٍ فَيَنْعَقِدُ سَبَبًا لِلْمِلْكِ دَفْعًا لِحَاجَةِ الْمُكَلَّفِ كَاسْتِيْلَائِنَا عَلَى أَمْوَالِهِمْ، وَهَذَا لِأَنَّ الْعِصْمَةَ تَثْبُتُ عَلَى مُنَافَاةِ الدَّلِيْلِ ضَرُوْرَةَ تَمَكُّنِ الْمَالِكِ مِنَ الْاِنْتِفَاعِ، فَإِذَا زَالَتِ الْمُكْنَةُ عَادَ مُبَاحًا كَمَا كَانَ، غَيْرَ اَنَّ الْاِسْتِيْلَاءَ لَا يَتَحَقَّقُ اِلَّا بِالْاِحْرَازِ بِالدَّارِ؛ لِاَنَّهُ عِبَارَةٌ عَنِ الْاِقْتِدَارِ عَلَى الْمَحَلِّ حَالًا وَمَالًا، وَالْمَحْظُوْرُ لِغَيْرِهِ اِذَا صَلُحَ سَبَبًا لِكَرَامَةٍ تَفُوْقُ الْمِلْكَ وَهُوَ الثَّوَابُ الْاٰجِلُ فَمَا ظَنُّكَ بِالْمِلْكِ الْعَاجِلِ؟

অনুবাদ : আল্লাহ না করুন তারা যদি আমাদের সম্পদের উপর দখল প্রতিষ্ঠা করে এবং নিজেদের দেশে স্থানান্তরপূর্বক সংরক্ষণ করে ফেলে তাহলে তারা সেগুলোর মালিক হয়ে যাবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, তারা সেগুলোর মালিক হবে না। কেননা (দারুল ইসলামে) প্রথম অবস্থায় এবং (দারুল হরবে) সমাপ্তি অবস্থায় উভয় অবস্থায় তাদের এ দখল প্রতিষ্ঠা নিষিদ্ধ। আর উসূলে ফিকহ শাস্ত্রে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, নিষিদ্ধ বিষয় মালিকানার কারণ হতে পারে না।

আমাদের দলিল হলো, মুবাহ মালের উপর দখল প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন হয়েছে। সুতরাং বান্দার প্রয়োজন নিরসনের জন্য মালিকানার কারণ রূপে তা সাব্যস্ত হবে। যেমন তাদের মালের উপর আমাদের দখল পতিষ্ঠার ক্ষেত্রে হয়। (তাদের দখল প্রতিষ্ঠা মুবাহ মালের উপর হয়েছে।) এটা এ কারণে যে, মালিকের উপকার লাভের সক্ষমতা সাব্যস্ত হওয়ার অনিবার্য প্রয়োজনে দলিলের বিপরীতে মালের নিরাপত্তাগুণ সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং যখনই নিয়ন্ত্রণ বিলুপ্ত হবে, তখন মাল (তার আসল অবস্থায় অর্থাৎ) মুবাহ অবস্থায় ফিরে আসবে। অবশ্য দখল সম্পন্ন হবে না। আপন ভূখণ্ডে (স্থানান্তর পূর্বক) সংরক্ষণ করা ব্যতীত। কেননা দখল অর্থ সম্পদ পাত্রের উপর বর্তমান ও পরবর্তীতে (উপকার লাভের) সক্ষমতা অর্জন। আর পার্শ্ব কারণে নিষিদ্ধ বিষয় যদি মালিকানার চেয়েও মর্যাদাপূর্ণ বিষয়ের তথা পরকালীন পুণ্যলাভের কারণ হতে পারে তাহলে ইহকালীন মালিকানা লাভের (হেতু হওয়া) সম্পর্কে তোমার কি ধারণা?

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যদি কোনো কাফের গোষ্ঠী মুসলমানদের উপর বিজয় লাভ করে, তাহলে তারা মুসলমানের সম্পদের মালিক হবে কিনা এনিয়ে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, কাফেররা মুসলমানের সম্পদ দখল করে দারুল হরবে নিয়ে সংরক্ষণ করে ফেলার দ্বারা উক্ত সম্পদের মালিক হয়ে যায়।

ইমাম মালেক (র.) বলেন, কাফেররা মুসলমানের সম্পদ দখল করার দ্বারাই মালিক হয়ে যাবে। দারুল হরবে নিয়ে সংরক্ষণ করা শর্ত নয়।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র.) হতে দুটি বর্ণনা রয়েছে। একটি বর্ণনা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অনুরূপ। অপরটি ইমাম মালেক (র.)-এর অনুরূপ।

https://e-ilm.weebly.com/

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে কাফেররা মুসলমানের সম্পদের উপর আধিপত্য বিস্তার করার দ্বারা এর মালিক হবে না।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল : ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, মুসলমানের সম্পদের উপর কাফেরদের আধিপত্য বিস্তার করা নিষিদ্ধ। প্রাথমিক পর্যায়েরও নিষিদ্ধ চূড়ান্ত পর্যায়েও নিষিদ্ধ। প্রাথমিক পর্যায়ে আধিপত্য বিস্তার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো দারুল ইসলামে মুসলমানের মাল দখল করা। চূড়ান্ত পর্যায় দ্বারা উদ্দেশ্য হলো দারুল হরবে নিয়ে সংরক্ষণ করা। মোটকথা, মুসলমানের সম্পদের উপর কাফেরদের আধিপত্য বিস্তার করা নিষিদ্ধ। অতএব, একটি নিষিদ্ধ বিষয় মালিকানা লাভের কারণ হতে পারে না। কেননা মালিকানা একটি নিয়ামত। এটা নিষিদ্ধ প্রক্রিয়ায় অর্জন হতে পারে না।

ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মালেক (র.) প্রমুখের দলিল :

১. নকলী দলিল : لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا .... الخ- দরিদ্র মুহাজিরদের জন্য, যারা নিজ বাড়িঘর হতে বহিষ্কৃত হয়েছে। এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুহাজিরদেরকে ফকির বলেছেন। ফকির ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়, যার কোনো মালিকানা নেই। এর দ্বারা বুঝা যায়, মুহাজিরগণ মক্কা হতে বহিষ্কৃত হওয়ার পর তাদের সম্পদ তাদের মালিকানায় ছিল না। বরং সেগুলো মক্কার কাফেরদের মালিকানায় চলে গিয়েছিল। অন্যথায় আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ফকির বলতেন না।

২. আকলী দলিল : পূর্বে ও উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোনো মুবাহ বস্তুর উপর কারো দখল প্রতিষ্ঠিত হলে সে উক্ত বস্তুর মালিক হয়ে যায়। আলোচ্য মাসআলায় মুবাহ সম্পদের উপর কাফেরদের দখল সাব্যস্ত হওয়ার কারণে তারা উক্ত মালের মালিক হয়ে যাবে। যেমনিভাবে তারা কাফেরদের কোনো সম্পদের উপর মুসলমানের দখল প্রতিষ্ঠিত হলে মুসলমান সে সম্পদে মালিক হয়ে যায়।

দলিলের ব্যাখ্যা : উপরিউক্ত দলিলের সারমর্ম হলো দুটি কথা।
১. কাফেরদের দখল প্রতিষ্ঠিত হওয়া ২. মুবাহ মালের উপর। অতএব, আমাদেরকে বুঝতে হবে দখল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অর্থ কি? এটা কখন হয়। এবং মুসলমানের সম্পদ মুবাহ হলো কিরূপে।
কোনো কিছুর উপর দখল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অর্থ হলো–

الاِقْتِدَارُ عَلَى الْمَحَلِّ مُطْلَقًا عَلَى وَجْهٍ يَتَمَكَّنُ مِنَ الْاِنْتِفَاعِ فِى الْحَالِ وَمِنَ الْاِدِّخَارِ فِى الْمَالِ

অর্থাৎ কোনো বস্তুর উপর এমন ক্ষমতা অর্জিত হওয়া যে, বর্তমানে তা দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় এবং ভবিষ্যতে তা সংরক্ষণ করা যায়। উল্লেখ্য যে, কোনো কাফের যখন মুসলমানের সম্পদ কেড়ে নেয়, তখন দারুল ইসলামে থাকা পর্যন্ত উপরিউক্ত ধরনের ক্ষমতা কাফের ব্যক্তির অর্জিত হয় না; বরং সম্পদটি নিয়ে দারুল হরবে পৌছার পর কাফের ব্যক্তির উপরিউক্ত ক্ষমতা অর্জন হয়।

আর মুসলমানের সম্পদ মুবাহ হয় এভাবে যে, মৌলিকভাবে বা সৃষ্টিগতভাবে সকল সম্পদই মুবাহ। কেননা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا পৃথিবীর সবকিছু তিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। এ হিসাবে সকল সম্পদ দুনিয়ার সব মানুষের বৈধ হওয়া উচিত। কিন্তু একটি সম্পদে সকলের জন্য বৈধতা সাব্যস্ত হলে, পরস্পরে ঝগড়া সৃষ্টি হবে। কেউ কোনো সম্পদ দ্বারা উপকৃত হতে পারবেনা। তাই উপরিউক্ত আয়াতের বিপরীতে একেক মালের উপর একেক ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণ সাব্যস্ত করা হয়েছে, যাতে সে উক্ত মাল দ্বারা উপকৃত হতে পারে। তাহলে বুঝা গেল, যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো মালের উপর কারো নিয়ন্ত্রণ থাকবে, ততক্ষণ তা কেবল তার জন্যই বৈধ। অন্যের জন্য বৈধ নয়। যখন তার নিয়ন্ত্রণ শেষ হয়ে যায়, তখন তা অন্যের জন্য মুবাহ হয়ে যায়। অতএব, কোনো কাফের যখন মুসলমানের সম্পদ নিয়ে দারুল হরবে পৌছে যায়, তখন সে মালের উপর আর মুসলমানের নিয়ন্ত্রণ অবশিষ্ট থাকে না বিধায় সে মাল মুবাহ হয়ে যায়। আর তখনই উক্ত মুবাহ মালের উপর কাফেররের পূর্ববর্ণিত ধরনের দখল প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং তখন সে উক্ত মালের মালিক হয়ে যাবে। মোটকথা, সম্পদ যতক্ষণ মুসলমানের নিয়ন্ত্রণে থাকে ততক্ষণ তা মুবাহ নয়। কিন্তু দারুল হরবে পৌছে সেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যায়, ফলে সম্পদটি মুবাহ হয়ে যায়। আর তখনই উক্ত মুবাহ সম্পদের উপর কাফের ব্যক্তির প্রকৃত দখল প্রতিষ্ঠিত হয়। এর ফলে সে উক্ত মালের মালিক হয়ে যায়। কেননা মুবাহ মালের উপর দখল প্রতিষ্ঠিত হলে মালিক হয়ে যাওয়ার বিষয়টি সর্বসম্মত।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিলের জবাব : ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছিলেন, কাফেরদের দখল প্রতিষ্ঠা একটি নিষিদ্ধ বিষয়। আর নিষিদ্ধ বিষয় কখনো মালিকানা লাভের কারণ হতে পারে না। এর জবাবে আহনাফ বলেন, নিষিদ্ধ বিষয় দু-প্রকার– ১. সত্তাগত কারণে নিষিদ্ধ, ২. পার্শ্ব কারণে নিষিদ্ধ। প্রথমটি মালিকানা লাভের কারণ হতে না পারলেও দ্বিতীয়টি পারে। কেননা, পার্শ্ব কারণে নিষিদ্ধ বিষয় মালিকানার চেয়েও মূল্যবান বস্তুর কারণ হয়ে থাকে। যেমন, কেউ ছিনতাইকৃত জমিনে উপর নামাজ পড়ল। তার এ নামাজ পার্শ্ব কারণে নিষিদ্ধ। অর্থাৎ ছিনতাইকৃত জমিনে নামাজ পড়া উচিত নয়। তথাপি যদি কেউ পড়ে ফেলে, তাহলে সে নামাজের ছওয়াব পেয়ে যায়।

তাহলে দেখা গেল পার্শ্ব কারণে নিষিদ্ধ বিষয় আখেরাতের পুণ্য অর্জনের কারণ হতে পারে। অতএব তা দুনিয়াতে একটি তুচ্ছ সম্পদের মালিকানা লাভের কারণ কেন হতে পারবে না? অবশ্যই হতে পারবে।

https://e-ilm.weebly.com/

فَإِنْ ظَهَرَ عَلَيْهَا الْمُسْلِمُوْنَ فَوَجَدَهَا الْمَالِكُوْنَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَهِيَ لَهُمْ بِغَيْرِ شَيْءٍ، وَإِنْ وَجَدُوْهَا بَعْدَ الْقِسْمَةِ أَخَذُوْهَا بِالْقِيْمَةِ إِنْ أَحَبُّوْا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِيْهِ ﴿إِنْ وَجَدْتَهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَهُوَ لَكَ بِغَيْرِ شَيْءٍ. وَإِنْ وَجَدْتَهُ بَعْدَ الْقِسْمَةِ فَهُوَ لَكَ بِالْقِيْمَةِ﴾ وَلِأَنَّ الْمَالِكَ الْقَدِيْمَ زَالَ مِلْكُهُ بِغَيْرِ رِضَاهُ فَكَانَ لَهُ حَقُّ الْأَخْذِ نَظَرًا لَهُ، إِلَّا أَنَّ فِي الْأَخْذِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ ضَرَرًا بِالْمَأْخُوْذِ مِنْهُ بِإِزَالَةِ مِلْكِهِ الْخَاصِّ فَيَأْخُذُهُ بِالْقِيْمَةِ؛ لِيَعْتَدِلَ النَّظَرُ مِنَ الْجَانِبَيْنِ. وَالشَّرِكَةُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ عَامَّةٌ فَيَقِلُّ الضَّرَرُ فَيَأْخُذُهُ بِغَيْرِ قِيْمَةٍ.

অনুবাদ : মুসলমানগণ যদি ঐ সম্পদের উপর আধিপত্য লাভ করে আর বন্টনের পূর্বেই পূর্ববর্তী মালিকরা সে মাল পেয়ে যায় তাহলে বিনামূল্যেই সেগুলো তাদের হয়ে যাবে। আর যদি বন্টনের পর পায়, তাহলে ইচ্ছা করলে মূল্যের বিনিময়ে তা নিতে পারে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ এ সম্পর্কে বলেছেন–

إِنْ وَجَدْتَهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَهُوَ لَكَ بِغَيْرِ شَيْءٍ، وَإِنْ وَجَدْتَهُ بَعْدَ الْقِسْمَةِ فَهُوَ لَكَ بِالْقِيْمَةِ

অর্থাৎ যদি বন্টনের পূর্বে তুমি তা পেয়ে যাও, তাহলে কোনো বিনিময় ছাড়াই তা তোমার। আর যদি বন্টনের পরে পাও, তাহলে মূল্যের বিনিময়ে তা তোমার হবে। তাছাড়া এ কারণে যে, পূর্ববর্তী মালিকের মালিকানা তার সম্মতি ছাড়াই বিলুপ্ত হয়েছে। সুতরাং তার কল্যাণের বিবেচনা করে তার জন্য ফেরত নেওয়ার হক সাব্যস্ত হবে। তবে বন্টনের পর নেওয়ার ক্ষেত্রে যার কাছ থেকে নেওয়া হবে, তার ক্ষতি রয়েছে। কেননা তার ব্যক্তি মালিকানা নাকচ করা হবে। সুতরাং সে তা মূল্যের বিনিময়ে নিবে, যাতে উভয় তরফের কল্যাণ সমানভাবে রক্ষিত হয়। পক্ষান্তরে বন্টনের পূর্বে অংশীদারিত্ব হচ্ছে ব্যাপক। ফলে তাতে ক্ষতি হয় সামান্য। সুতরাং বিনামূল্যেই সে তা নিতে পারে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কাফেররা মুসলমানদের কাছ থেকে সম্পদ জয় করে নিয়েছিল, সে সম্পদের উপর যদি পুনরায় মুসলমানরা জয় লাভ করে, এবং কোনো ব্যক্তি নিজের কোনো সম্পদ পেয়ে যায়, তাহলে গনিমত বন্টনের পূর্বে হলে, বিনামূল্যেই নিয়ে যেতে পারবে আর গনিমত বন্টন হয়ে যাওয়ার পরে পেলে সম্পদটি যার ভাগে পড়েছে, তার কাছ থেকে মূল্য দিয়ে নিতে পারবে।

এ বিষয়ক নকলী দলিল হলো–

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيْمَا أَحْرَزَهُ الْعَدُوُّ فَاسْتَنْقَذَهُ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْهُمْ إِنْ وَجَدَهُ صَاحِبُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَإِنْ وَجَدَهُ قَدْ قُسِمَ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِالثَّمَنِ

অর্থাৎ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) সূত্রে বর্ণিত, যে সম্পদ কাফেররা জয় করে নিয়ে যায়, তারপর মুসলমানরা তা পুনরায় উদ্ধার করে সে সম্পদ সম্পর্কে নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, যদি কোনো মালিক তার সম্পদটি গনিমত বন্টন হওয়ার পূর্বে পায়, তাহলে সেই তার বেশি হকদার। আর যদি গনিমত বন্টন হওয়ার পরে নিজের সম্পদটি পায়, তাহলে নিতে চাইলে মূল্য দিয়ে নিতে পারবে। (দারাকুতনী)

আকলী দলিল : প্রাপ্ত বস্তুটির প্রাক্তন মালিকের মালিকানা তার অসন্তুষ্টিতে বিলুপ্ত হয়ে ছিল। অর্থাৎ কাফেররা তার সম্পদটি জোরপূর্বক নিয়ে গিয়েছিল। অতএব, যখন বস্তুটি পাওয়া গেল, তখন সেই তার অধিক হকদার হবে। তাহলেই তার জন্য কল্যাণ কামনা হবে। তবে যদি গনিমতের মাল বন্টন হয়ে যায় এবং সম্পদটি কোনো মুসলমানের অধিকারে চলে যায়, তাহলে তার কাছ থেকে প্রাক্তন মালিক নিয়ে গেলে সে ব্যক্তির ক্ষতি হবে। তাই তখন নিতে হলে মূল্য দিয়ে নিতে পারবে। আর গনিমত বন্টনের পূর্বে যেহেতু সবাই শরিক থাকে, তাই সম্পদটি নেওয়ার দ্বারা কারো বিশেষ কোনো ক্ষতি হয় না। তাই তখন বিনামূল্যেই নিতে পারে।

ইমাম শাফেয়ী (র.) আলোচ্য মাসআলা সম্পর্কে বলেন, বন্টনের পূর্বে হোক বা বন্টনের পরে হোক, উভয় অবস্থায় প্রাক্তন মালিক তার প্রাপ্ত সম্পদটি বিনামূল্যে নিতে পারবে। বন্টনের পূর্বে যদি হয়, তাহলে তো কোনো সমস্যাই নেই। আর বন্টনের পরে যদি হয়, তাহলে সম্পদটি যার ভাগে পড়েছিল, তাকে বায়তুলমাল হতে শাসক বিনিময় দিয়ে দিবেন। বিনিময় দেওয়ার মতো কিছু যদি বায়তুল মালে না থাকে, তাহলে শাসক পুনরায় নতুনভাবে বন্টন করবেন।

https://e-ilm.weebly.com/

وَاِنْ دَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ تَاجِرٌ فَاشْتَرٰى ذٰلِكَ وَاَخْرَجَهُ اِلٰى دَارِ الْإِسْلَامِ فَمَالِكُهُ الْأَوَّلُ بِالْخِيَارِ اِنْ شَاءَ اَخَذَهُ بِالثَّمَنِ الَّذِيْ اِشْتَرَاهُ بِهٖ، وَاِنْ شَاءَ تَرَكَهُ؛ لِاَنَّهُ يَتَضَرَّرُ بِالْاَخْذِ مَجَّانًا؛ اَلَا تَرٰى اَنَّهُ قَدْ دَفَعَ الْعِوَضَ بِمُقَابَلَتِهٖ فَكَانَ اعْتِدَالُ النَّظَرِ فِيْمَا قُلْنَاهُ، وَلَوْ اِشْتَرَاهُ بِعَرَضٍ يَاْخُذُهٗ بِقِيْمَةِ الْعَرَضِ، وَلَوْ وَهَبُوْهُ لِمُسْلِمٍ يَاْخُذُهٗ بِقِيْمَتِهٖ؛ لِاَنَّهٗ ثَبَتَ لَهٗ مِلْكٌ خَاصٌّ فَلَا يَزَالُ اِلَّا بِالْقِيْمَةِ، وَلَوْ كَانَ مَغْنُوْمًا وَهُوَ مِثْلِيٌّ يَاْخُذُهٗ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَلَا يَاْخُذُهٗ بَعْدَهَا؛ لِاَنَّ الْاَخْذَ بِالْمِثْلِ غَيْرُ مُفِيْدٍ، وَكَذَا اِذَا كَانَ مَوْهُوْبًا لَا يَاْخُذُهٗ لِمَا بَيَّنَّا. وَكَذَا اِذَا كَانَ مُشْتَرًى بِمِثْلِهٖ قَدْرًا وَوَصْفًا.

অনুবাদ : কোনো ব্যবসায়ী যদি দারুল হরবে গিয়ে ঐ বস্তু ক্রয় করে দারুল ইসলামে নিয়ে আসে তাহলে প্রথম মালিকের এখতিয়ারে থাকবে। ইচ্ছা করলে সে ক্রয় মূল্যের বিনিময়ে তা নিতে পারে। আর ইচ্ছা করলে ছেড়ে দিতে পারে। কারণ বিনামূল্যে নিয়ে নিলে ক্রয়কারী ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কেননা তুমি কি লক্ষ্য করছ না যে, সে তো এর বিনিময় প্রদান করেছে। সুতরাং আমরা বলেছি, তাতেই কল্যাণ ভারসাম্য রয়েছে। আর যদি সে কোনো দ্রব্যের বিনিময়ে ক্রয় করে থাকে, তাহলে ঐ দ্রব্যের সমমূল্যের বিনিময়ে গ্রহণ করবে।

আর যদি দারুল হরবের লোক কোনো মুসলমানকে তা দান করে থাকে তাহলে তার মূল্যের বিনিময়ে সে তা নিতে পারে। কেননা দানপ্রাপ্ত ব্যক্তির মালিকানা সাব্যস্ত হয়ে গেছে। সুতরাং মূল্যের বিনিময়ে ছাড়া তার মালিকানা রহিত হবে না।

আর যদি বস্তুটি শক্তিবলে দখলকৃত হয় এবং বস্তুটির (মূল্য নির্ভর না হয় বরং) সদৃশ (مثلى) হয়, তাহলে বণ্টনের পূর্বে বিনিময় ছাড়া নিয়ে নিবে। কিন্তু বণ্টনের পর নিতে পারবে না। কেননা সদৃশ বস্তুর বিনিময়ে সদৃশ বস্তু গ্রহণ করা অর্থহীন। তদ্রূপ বস্তুটি দানকৃত হলে একই কারণে পূর্ববর্তী মালিক তা আর নিতে পারবে না। তদ্রূপ যদি বস্তুটি মান ও পরিমাণের দিক থেকে সদৃশ বস্তুর বিনিময়ে ক্রয়কৃত হয়, তাহলেও পূর্ববর্তী মালিক তা আর নিতে পারবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিউক্ত ভাষ্যে কয়েকটি মাসআলা আলোচিত হয়েছে।

১. কাফেররা দারুল ইসলাম থেকে মুসলমানের যে সম্পদ নিয়ে গিয়েছিল, যদি কোনো মুসলিম ব্যবসায়ী দারুল হরব থেকে সে সম্পদ ক্রয় করে দারুল ইসলামে নিয়ে আসে, তাহলে উক্ত সম্পদের মালিকের এখতিয়ার থাকবে, সে ইচ্ছা করলে ব্যবসায়ী ব্যক্তি যে মূল্যের বিনিময়ে সম্পদটি কিনে এনেছে, সে মূল্য ব্যবসায়ীকে দিয়ে সম্পদটি নিতে পারে। কিন্তু ব্যবসায়ীর কাছ থেকে সম্পদটি প্রথম মালিক বিনামূল্যে নিতে পারবে না। কেননা ব্যবসায়ী তা দারুল হরব হতে মূল্যের বিনিময়ে কিনে এনেছে। এখন যদি আসল মালিক তা বিনামূল্যে নিয়ে নেয়, তাহলে ব্যবসায়ী ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অতএব, মূল্যের বিনিময়ে গ্রহণ করার মধ্যেই ব্যবসায়ী এবং প্রথম মালিক উভয়ের কল্যাণ কামনা হয়।

https://e-ilm.weebly.com/

২. যদি ব্যবসায়ী ব্যক্তি উক্ত সম্পদটি দারুল হরব হতে কোনো বস্তুর বিনিময়ে ক্রয় করে এনে থাকে, তাহলে সেই বস্তুর মূল্য দ্বারা সম্পদটি প্রথম মালিক নিতে পারবে।

৩. যদি দারুল হরবের লোকেরা কোনো মুসলমানকে উক্ত সম্পদটি দান করে, তাহলে সম্পদটির প্রাক্তন মালিক তা নিতে চাইলে সম্পদটির ন্যায্য মূল্য দিয়ে নিতে পারবে। বিনামূল্যে নিতে পারবে না। কেননা দান করার কারণে দানপ্রাপ্ত ব্যক্তি বস্তুটির মালিক হয়েছে। বিনিময় ছাড়া তার সে মালিকানা বাতিল করা যাবে না।

৪. কাফেরদের নিয়ে যাওয়া বস্তুটি যদি পুনরায় মুসলমানরা জোরপূর্বক উদ্ধার করে আনে এবং বস্তুটি যদি মিছলী হয়, যেমন স্বর্ণ-রূপা, গম, যব ইত্যাদি, তাহলে বন্টনের পূর্বে প্রাক্তন মালিক সেটা বিনামূল্যে নিয়ে যেতে পারবে। কিন্তু বন্টনের পরে নিতে পারবে না। কেননা বন্টনের পরে নিতে হলে বস্তুর অনুরূপ বস্তু দিয়ে নিতে হবে। আর অনুরূপ বস্তু দিয়ে বস্তু গ্রহণ করা অর্থহীন। যেমন একমণ গম দিয়ে একমণ গম নেওয়া অনর্থক।

তদ্রূপ যদি মিছলী বস্তুটি কাউকে দান করা হয়, তাহলেও তা প্রথম মালিক নিতে পারবে না। কেননা নিলে অনুরূপ বস্তু দিয়ে নিতে হবে। আর বস্তুর অনুরূপ বস্তু দিয়ে বস্তু গ্রহণ করা অর্থহীন।

তদ্রূপ যদি কোনো মিছলী বস্তু মানে পরিমাণে তার অনুরূপ বস্তু দ্বারা ক্রয় করে আনা হয়, তাহলেও তা প্রাক্তন মালিক নিতে পারবে না সেই একই কারণে।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ : فَإِنْ أَسَرُوْا عَبْدًا فَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ وَأَخْرَجَهُ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ فَفُقِئَتْ عَيْنُهُ وَأَخَذَ أَرْشَهَا فَإِنَّ الْمَوْلٰى يَأْخُذُهُ بِالثَّمَنِ الَّذِيْ أُخِذَ بِهِ مِنَ الْعَدُوِّ أَمَّا الْأَخْذُ بِالثَّمَنِ فَلِمَا قُلْنَا وَلَا يَأْخُذُ الْأَرْشَ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ فِيْهِ صَحِيْحٌ، فَلَوْ أَخَذَهُ أَخَذَهُ بِمِثْلِهِ وَهُوَ لَا يُفِيْدُ وَلَا يُحَطُّ شَيْءٌ مِنَ الثَّمَنِ؛ لِأَنَّ الْأَوْصَافَ لَا يُقَابِلُهَا شَيْءٌ مِنَ الثَّمَنِ، بِخِلَافِ الشُّفْعَةِ؛ لِأَنَّ الصَّفْقَةَ لَمَّا تَحَوَّلَتْ إِلَى الشَّفِيْعِ صَارَ الْمُشْتَرٰى فِيْ يَدِ الْمُشْتَرِيْ بِمَنْزِلَةِ الْمُشْتَرٰى شِرَاءً فَاسِدًا، وَالْأَوْصَافُ تُضْمَنُ فِيْهِ كَمَا فِي الْغَصْبِ، أَمَّا هَاهُنَا الْمِلْكُ صَحِيْحٌ فَافْتَرَقَا .

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি তারা কোনো গোলামকে বন্দিকে করে নিয়ে যায়, অতঃপর একজন লোক তাকে ক্রয় করে দারুল ইসলামে নিয়ে আসে। আর তার চক্ষু উপড়ে ফেলা হয় এবং ক্রয়কারী তার দিয়ত উশুল করে। এখন মনিব (নিতে চাইলে) শত্রুর থেকে ক্রয় করা মূল্যের বিনিময়ে তাকে নিতে পারবে।

ক্রয় মূল্যের বিনিময়ে নেওয়ার কারণ, তা আমরা পূর্বেই বর্ণনা করে এসেছি। দিয়তের অর্থ সে নিতে পারবে না। কেননা গোলামের মালিকানা সিদ্ধ হয়েছে। সুতরাং এখন যদি সে দিয়ত গ্রহণ করতে চায় তাহলে সদৃশ পরিমাণ মাল দ্বারা তা নিতে হবে। আর এ দ্বারা সে উপকৃত হবে না। আর সৃষ্ট খুঁতের কারণে ক্রয় মূল্য থেকে কোনো পরিমাণ হ্রাস করা যাবে না। কেননা গুণের বিনিময়ে মূল্যের কোনো অংশ বিবেচিত হয় না। শোফার মাসআলাটি ভিন্ন। কেননা বিক্রয় চুক্তি যখন শোফা দাবিকারীর হাতে হস্তান্তরিত হয়, তখন বিক্রীত বস্তুটি ক্রেতার হাতে অসিদ্ধ ক্রয় দ্বারা ক্রয়কৃত বস্তুর পর্যায়ভুক্ত হয়ে বিদ্যমান থাকে আর এক্ষেত্রে বস্তুর গুণাবলি দায়ভুক্ত যেমন, গসবের ক্ষেত্রে। পক্ষান্তরে এখানে মালিকানাটি সিদ্ধ হয়েছে। সুতরাং মাসআলা দুটিতে পার্থক্য হয়ে গেল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কোনো মুসলমানের একটি গোলাম কাফেররা বন্দি করে নিয়ে গেল। অতঃপর মুসলমান দারুল হরব থেকে উক্ত গোলামকে ক্রয় করে দারুল ইসলামে নিয়ে এলো।

তারপর কেউ গোলামটির চোখ উপড়ে ফেলল। ফলে ক্রয়কারী ব্যক্তি দিয়ত উশুল করল ঐ ব্যক্তি হতে, যে চোখ উপড়ে ফেলেছে। এমতাবস্থায় গোলামের প্রথম মালিক যদি গোলমটি নিতে চায়, তাহলে ক্রয়কারী ব্যক্তি যে মূল্যে কাফেরদের থেকে ক্রয় করে এনেছে, সেই মূল্যের বিনিময় গোলামটি নিতে পারবে। বিনামূল্যে নিতে পারবে না। কারণ বিনামূল্যে নিয়ে গেলে ক্রয়কারী লোকটি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কেননা সে গোলামটি কাফেরদের থেকে বিনামূল্যে আনতে পারেনি। অর্থ ব্যয় করে আনতে হয়েছে। অতএব, প্রথম মালিক গোলামটি নিতে চাইলে সেই ক্রয়মূল্য পরিশোধ করেই নিতে হবে।

তবে গোলামের চোখ উপড়ে ফেলার কারণে ক্রয়কারী মালিক যে দিয়ত উশুল করেছে, প্রথম মালিক সে দিয়ত ও চাইতে পারবে না। কারণ ক্রয়কারী মালিকের মালিকানাটি শুদ্ধ। আর শুদ্ধ মালিকানায় বস্তুর কোনো গুণের বিপরীতে মূল্য বিবেচনা করা হয় না। তাই চোখ থাকা অবস্থায় গোলামটির যে মূল্য ছিল, চোখ উপড়ে ফেলার পরও তার সেই মূল্যই হবে। যেহেতু শুদ্ধ মালিকানায় গুণের বিনিময়ে মূল্য থাকে না। আর যদি প্রথম মালিক চোখের দিয়ত নিতে চায় তাহলে দিয়তের সমপরিমাণ অর্থ দিয়ে তা নিতে হবে। সুতরাং এতে কোনো লাভ হবে না।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, অশুদ্ধ মালিকানার ক্ষেত্রে বস্তুর গুণের বিপরীতে মূল্য বিবেচনা করা হয়। যেমন, কোনো জমিন যখন ক্রয়কারীর হাত থেকে শোফা দাবিকারীর হাতে স্থানান্তরিত হয়, তখন যদি কোনো গুণ নষ্ট হয়ে থাকে, তাহলে এর বিনিময়ে মূল্য হ্রাস পায়। কারণ উক্ত ক্রয়কারীর হাতে জমিনটি শুদ্ধ মালিকানার ভিত্তিতে ছিল না। বরং তা ছিল অশুদ্ধ ক্রয়ের ভিত্তিতে। তাই সেখানে বস্তুর গুণ ও মূল্যমান সম্পন্ন হবে। গসবের ক্ষেত্রেও তদ্রূপ বস্তুর গুণের মোকাবিলায় মূল্য বিবেচিত হয়। পক্ষান্তরে আলোচ্য মাসআলায় দারুল হরব থেকে যে ব্যক্তি গোলামটি ক্রয় করে এনেছে, তার মালিকানা শুদ্ধ। তাই এক্ষেত্রে গোলামের কোনো গুণ মূল্যমান সম্পন্ন হবে না। ফলে শোফার মাসআলা ও আলোচ্য মাসআলা পরস্পরে পার্থক্যপূর্ণ হলো।

https://e-ilm.weebly.com/

وَإِنْ أَسَرُوْا عَبْدًا فَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَسَرُوْهُ ثَانِيًا وَأَدْخَلُوْهُ دَارَ الْحَرْبِ فَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ آخَرُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَلَيْسَ لِلْمَوْلَى الْأَوَّلِ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنَ الثَّانِي بِالثَّمَنِ؛ لِأَنَّ الْأَسْرَ مَا وَرَدَ عَلَى مِلْكِهِ وَلِلْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنَ الثَّانِيْ بِالثَّمَنِ؛ لِأَنَّ الْأَسْرَ وَرَدَ عَلَى مِلْكِهِ ثُمَّ يَأْخُذُهُ الْمَالِكُ الْقَدِيْمُ بِأَلْفَيْنِ إِنْ شَاءَ؛ لِأَنَّهُ قَامَ عَلَيْهِ بِالثَّمَنَيْنِ فَيَأْخُذُهُ بِهِمَا، وَكَذَا إِذَا كَانَ الْمَأْسُوْرُ مِنْهُ الثَّانِي غَائِبًا لَيْسَ لِلْأَوَّلِ أَنْ يَأْخُذَهُ اعْتِبَارًا بِحَالِ حَضْرَتِهِ.

অনুবাদ : যদি তারা কোনো গোলামকে বন্দি করে নিয়ে যায়, অতঃপর কোনো লোক তাকে এক হাজার দিরহাম দিয়ে খরিদ করে এরপর তারা দ্বিতীয়বার তাকে বন্দি করে দারুল হরবে নিয়ে যায়। এরপর অন্য এক ব্যক্তি একহাজার দিরহাম দিয়ে খরিদ করে তাহলে প্রথম মালিক তাকে দ্বিতীয় ক্রেতা থেকে ক্রয়মূল্যের বিনিময়ে গ্রহণ করার অধিকার পাবে না। কেননা দ্বিতীয় বন্দিতে তার মালিকানায় সম্পন্ন হয়নি। অবশ্য প্রথম ক্রেতা দ্বিতীয় ক্রেতা থেকে ক্রয়মূল্যের বিনিময়ে নিতে পারবে। কেননা দ্বিতীয় বন্দিত্ব তার মালিকানায় সম্পন্ন হয়েছে। অতঃপর প্রাক্তন মালিক ইচ্ছা করলে দুই হাজার দেরহামের বিনিময়ে গোলামটি ফেরত নিতে পারবে। কেননা প্রথম ক্রেতার প্রতিকূল দুটি মূল্য সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং দুই মূল্যের বিনিময়ে সে তা নিতে পারে।

তদ্রূপ দ্বিতীয়বার যার কাছ থেকে বন্দি করা হয়েছে (অর্থাৎ প্রথম ক্রেতা) সে যদি অনুপস্থিত থাকে, তাহলেও প্রাক্তন মালিক গোলামটি নিতে পারবে না। এটাকে তার উপস্থিতির অবস্থার উপর কিয়াস করা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিউক্ত ভাষ্যে যে মাসআলাটি আলোচিত হয়েছে তার সারসংক্ষেপ হলো, মুসলমানের একটি গোলাম কাফেররা বন্দী করে দারুল হরবে নিয়ে গেল। এরপর একহাজার দিরহাম দ্বারা একজনে খরিদ করে দারুল ইসলামে নিয়ে এল। পুনরায় কাফেররা গোলামটিকে বন্দি করে দারুল হরবে নিয়ে গেল। এরপর এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে অন্য এক ব্যক্তি গোলামটি ক্রয় করে আনল। এমতাবস্থায় প্রাক্তন মালিক গোলামটি দ্বিতীয় ক্রেতার কাছ থেকে ক্রয়মূল্যে নিতে পারবে না। কারণ দ্বিতীয় ক্রেতা যে বন্দিত্বের পরে ক্রয় করে এনেছে, সেই বন্দিত্বটি প্রাক্তন মালিকের মালিকানায় সংঘটিত হয়নি; বরং সে বন্দিত্ব সংঘটিত হয়েছে প্রথম ক্রেতার মালিকানায়। তাই প্রথম ক্রেতা ইচ্ছা করলে দ্বিতীয় ক্রেতার কাছ থেকে গোলামটি ক্রয় মূল্যে গ্রহণ করতে পারবে।

এরপর প্রাক্তন ক্রেতা ইচ্ছা করলে প্রথম ক্রেতার কাছ থেকে দুই হাজার দিরহাম দ্বারা গোলামটি নিতে পারবে। কেননা প্রথম ক্রেতা উক্ত গোলামের মূল্যবাবদ এ পর্যন্ত দুই হাজার দিরহাম ব্যয় করেছে। তাই দুই হাজার দিরহামের বিনিময়েই প্রাক্তন মালিক গোলামটি নিতে পারবে।

প্রথম ক্রেতা অনুপস্থিত থাকাকালেও দ্বিতীয় ক্রেতার কাছ থেকে প্রাক্তন মালিক গোলামটি নিতে পারবে না। এসিদ্ধান্তের ভিত্তি হলো, প্রথম ক্রেতার অনুপস্থিতিকে তার উপস্থিতির উপর কিয়াস করা। অর্থাৎ প্রথম ক্রেতা উপস্থিত থাকাকালে যেমন প্রাক্তন মালিক গোলামটি দ্বিতীয় ক্রেতার কাছে থেকে নিতে পারে না, তেমনি প্রথম ক্রেতা অনুপস্থিত থাকাকালেও প্রাক্তন মালিক দ্বিতীয় ক্রেতার কাছ থেকে গোলামটি নিতে পারবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

وَلَا يَمْلِكُ عَلَيْنَا اَهْلُ الْحَرْبِ بِالْغَلَبَةِ مُدَبَّرِيْنَا وَاُمَّهَاتِ اَوْلَادِنَا وَمُكَاتَبِيْنَا وَاَحْرَارَنَا وَنَمْلِكُ عَلَيْهِمْ جَمِيْعَ ذٰلِكَ؛ لِاَنَّ السَّبَبَ اِنَّمَا يُفِيْدُ الْمِلْكَ فِيْ مَحَلِّهِ، وَالْمَحَلُّ الْمَالُ الْمُبَاحُ، وَالْحُرُّ مَعْصُوْمٌ بِنَفْسِهِ، وَكَذَا مَنْ سِوَاهُ؛ لِاَنَّهُ تَثْبُتُ الْحُرِّيَّةُ فِيْهِ مِنْ وَجْهٍ، بِخِلَافِ رِقَابِهِمْ؛ لِاَنَّ الشَّرْعَ اَسْقَطَ عِصْمَتَهُمْ جَزَاءً عَلٰى جِنَايَتِهِمْ وَجَعَلَهُمْ اَرِقَّاءَ وَلَا جِنَايَةَ مِنْ هٰؤُلَاءِ

অনুবাদ : শত্রুপক্ষ দখল প্রতিষ্ঠার কারণে আমাদের প্রতিকূলে আমাদের মুদাববার, উম্মে ওয়ালাদ, মুকাতাব দাস দাসী এবং আমাদের স্বাধীন ব্যক্তিদের মালিক হবে না। কিন্তু আমরা তাদের প্রতিকূলে ঐ সব কিছুর মালিক হবো। কেননা মালিকানার কারণ, শুধু মালিকানা লাভের পাত্রেই কার্যকরী হতে পারে। আর মুবাহ মালই হচ্ছে মালিকানা লাভের বৈধ পাত্র। আর স্বাধীন ব্যক্তি নিজস্ব সত্তাগতভাবেই নিরাপত্তাগুণ সম্পন্ন। তদ্রূপ উল্লিখিত অন্যান্যরাও। কেননা তাদের মাঝেও আংশিক স্বাধীনতা সাব্যস্ত আছে। কিন্তু কাফেরদের দেহসত্তার অবস্থা ভিন্ন। কেননা শরিয়ত তাদের অপরাধের শাস্তি স্বরূপ তাদের নিরাপত্তাগুণ রহিত করে দিয়েছে এবং তাদের দাস সাব্যস্ত করেছে। পক্ষান্তরে এদের দিক থেকে কোনো অপরাধ নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَلَا يَمْلِكُ عَلَيْنَا أَهْلُ الْحَرْبِ : আলোচ্য মাসআলার সারংক্ষেপ এই যে, কাফের সম্প্রদায় মুসলমানদের উপর বিজয় লাভ করলেও স্বাধীন মুসলিম, মুসলমানের মুদাব্বার, উম্মে ওয়ালাদ, মুকাতাব প্রভৃতির মালিক হবে না। পক্ষান্তরে মুসলমানরা কাফেরগোষ্ঠীর উপর বিজয় লাভ করলে স্বাধীন কাফের ও তাদের মুদাববার, মুকাতাব, উম্মে ওয়ালাদ সব কিছুরই মালিক হবে।

এ পার্থক্যের কারণ হলো এই যে, আধিপত্য বিস্তার ও দখল কোনো বস্তুর মালিকানা লাভের কারণ। তবে একারণটি কার্যকর হওয়ার জন্য শর্ত হলো বস্তুটি মালিকানার পাত্র হতে হবে। আর মালিকানার পাত্র হলো মুবাহ মাল। অতএব, মুবাহ সম্পদের উপর কারো আধিপত্য ও দখল প্রতিষ্ঠিত হলে, সে উক্ত বস্তুর মালিকানা লাভ করবে।

এ নীতির আলোকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, স্বাধীন মুসলমান মুবাহ সম্পদ নয়। কারণ মুসলমানের উপর আল্লাহ তা'আলার বিধি বিধান রয়েছে। সেগুলো পালনের উদ্দেশ্যে সে আল্লাহ কর্তৃক নিরাপত্তা প্রাপ্ত। তাই তার উপর কারো মালিকানা সাব্যস্ত হতে পারে না। তদ্রূপ মুকাতাব, মুদাববার, উম্মে ওয়ালাদ প্রভৃতির জন্য একপ্রকার নিরাপত্তা সাব্যস্ত আছে। অতএব, তারা মুবাহ মাল না হওয়ার কারণে তাদের উপর কাফেরদের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে না।

পক্ষান্তরে কাফের জাতি কুফরির অপরাধের কারণে আল্লাহর পক্ষ থেকে তারা নিরাপত্তাহীন। তাই তাদের উপর মুসলমানরা বিজয়ী হলে তাদের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَإِذَا أَبَقَ عَبْدٌ لِمُسْلِمٍ فَدَخَلَ إِلَيْهِمْ فَأَخَذُوْهُ لَمْ يَمْلِكُوْهُ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ، وَقَالَا يَمْلِكُوْنَهُ؛ لِأَنَّ الْعِصْمَةَ لِحَقِّ الْمَالِكِ لِقِيَامِ يَدِهِ وَقَدْ زَالَتْ، وَلِهٰذَا لَوْ أَخَذُوْهُ مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ مَلَكُوْهُ. وَلَهُ أَنَّهُ ظَهَرَتْ يَدُهُ عَلٰى نَفْسِهِ بِالْخُرُوْجِ مِنْ دَارِنَا؛ لِأَنَّ سُقُوْطَ اِعْتِبَارِهِ لِتَحَقُّقِ يَدِ الْمَوْلٰى عَلَيْهِ تَمْكِيْنًا لَهُ مِنَ الْاِنْتِفَاعِ وَقَدْ زَالَتْ يَدُ الْمَوْلٰى فَظَهَرَتْ يَدُهُ عَلٰى نَفْسِهِ وَصَارَ مَعْصُوْمًا بِنَفْسِهِ فَلَمْ يَبْقَ مَحِلًّا لِلْمِلْكِ، بِخِلَافِ الْمُتَرَدِّدِ؛ لِأَنَّ يَدَ الْمَوْلٰى بَاقِيَةٌ عَلَيْهِ لِقِيَامِ يَدِ أَهْلِ الدَّارِ فَمَنَعَ ظُهُوْرَ يَدِهِ . وَإِذَا لَمْ يَثْبُتِ الْمِلْكُ لَهُمْ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ يَأْخُذُهُ الْمَالِكُ الْقَدِيْمُ بِغَيْرِ شَيْءٍ مَوْهُوْبًا كَانَ أَوْ مُشْتَرًى أَوْ مَغْنُوْمًا قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَبَعْدَ الْقِسْمَةِ يُؤَدّٰى عِوَضُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ إِعَادَةُ الْقِسْمَةِ لِتَفَرُّقِ الْغَانِمِيْنَ وَتَعَذُّرِ اِجْتِمَاعِهِمْ وَلَيْسَ لَهُ عَلَى الْمَالِكِ جُعْلُ الْآبِقِ؛ لِأَنَّهُ عَامِلٌ لِنَفْسِهِ إِذْ فِيْ زَعْمِهِ أَنَّهُ مِلْكُهُ .

অনুবাদ : কোনো মুসলমানের (এবং জিম্মির) কোনো মুসলিম গোলাম যদি পালিয়ে গিয়ে দারুল হরবে প্রবেশ করে আর তারা তাকে পাকড়াও করে নেয় তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তারা তার মালিক হবে না। সাহেবাইন (র.) বলেন, মালিক হয়ে যাবে। কেননা গোলামের মাঝে বিদ্যমান নিরাপত্তাগুণটি হলো মালিকের অধিকারের কারণে। কেননা তার নিয়ন্ত্রণ বিদ্যমান ছিল। আর এখন তা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। একারণেই তো দারুল ইসলাম থেকে তাকে ধরে নিয়ে গেলে তারা মালিক হয়ে যায়।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর দলিল এই যে, আমাদের দারুল ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়ার কারণে তার নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রকাশিত হয়েছে। কেননা তার উপর মনিবের নিয়ন্ত্রণ সাব্যস্ত হওয়ার কারণে তার নিজের নিয়ন্ত্রণ রহিত হওয়ার ব্যাপারটি বিবেচনা করা হয়েছিল। যাতে মনিবের অনুকূলে উপকার লাভের সক্ষমতা থাকে। আর এখন মনিবের নিয়ন্ত্রণ বিলুপ্ত হয়েছে। সুতরাং তার নিজের উপর নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রকাশিত হবে। এবং নিজস্ব সত্তাগতভাবেই সে নিরাপত্তাগুণ সম্পন্ন হয়ে যাবে। ফলে মালিকানা লাভের পাত্র রইল না।

দারুল ইসলামে ঘুরতে থাকা পলাতক গোলামের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা দারুল ইসলামের (অধিবাসীদের) নিয়ন্ত্রণ বিদ্যমান থাকার কারণে মনিবের নিয়ন্ত্রণ (গুণগতভাবে) বিদ্যমান রয়েছে। ফলে তার আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রকাশ বাধাগ্রস্ত হয়েছে। যাহোক ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে যখন দারুল হরবের লোকদের মালিকানা সাব্যস্ত হলো না, তখন প্রাক্তন মালিক তাকে বিনামূল্যে নিয়ে নিতে পারবে। হোক সে হেবাকৃত কিংবা ক্রয়কৃত কিংবা বণ্টন পূর্ব গনিমতের মাল। পক্ষান্তরে বণ্টন পরবর্তী হলে বায়তুলমালের পক্ষ থেকে তার বিনিময় আদায় করা হবে। কেননা মুজাহিদদের আলাদা হয়ে যাওয়ার কারণে এবং তাদের পুনঃসমাবেশ দুঃসাধ্য হওয়ার কারণে পুনঃবণ্টন করা সম্ভব নয়। (এতদিন গোলামের নিয়ন্ত্রণ যার হাতে ছিল) তাকে গোলামের শ্রমলব্ধ অর্থ মালিককে ফেরত দিতে হবে না। কেননা তার ধারণায় যেহেতু গোলামটি তার মালিকানাধীন, সেহেতু সে তাকে নিজের কাজে নিযুক্ত করেছে। (প্রাক্তন মনিবের কাজে নয়।)

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কোনো মুসলমান বা জিম্মির মুসলমান গোলাম যদি দারুল ইসলাম থেকে পালিয়ে দারুল হরবে চলে যায় এবং কাফেররা তাকে ধরে ফেলে, তাহলে কাফেররা উক্ত গোলামের মালিক মালিক হবে কিনা এনিয়ে ইমামগণের মতভেদ রয়েছে।

ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম শাফেয়ী ও এক বর্ণনায় ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর মতে কাফেররা উক্ত গোলামের মালিক হবে না।

ইমাম আবূ ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ, ইমাম মালেক ও প্রসিদ্ধ বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র.) এর মতে কাফেররা উক্ত গোলামের মালিক হয়ে যাবে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ও তাঁর সাথে একমত পোষণকারীদের দলিল হলো, গোলামের উপর মনিবের হক থাকার কারণে তার উপর মনিবের দখল প্রতিষ্ঠিত থাকে। আর মনিবের দখল প্রতিষ্ঠিত থাকার কারণে গোলাম নিরাপত্তাগুণ বিশিষ্ট থাকে।

মুসলমান হওয়ার কারণে গোলাম নিরাপত্তাগুণ বিশিষ্ট হয় না। কিন্তু গোলাম যখন দারুল ইসলাম হতে পালিয়ে দারুল হরবে চলে যায়, তখন তার উপর মনিবের যে দখল ছিল, তা উঠে যায়, ফলে গোলাম আর নিরাপত্তাগুণ বিশিষ্ট থাকে না। তাই তখন তার উপর যার দখল প্রতিষ্ঠিত হবে, সেই তার মালিক হয়ে যাবে।

মনিবের দখল উঠে যাওয়ার কারণে গোলামের নিরাপত্তা শেষ হয়ে যায় এর প্রমাণ হলো, যদি কাফেররা মুসলমানের গোলামকে দারুল ইসলাম থেকে নিয়ে যায়, তাহলেও কাফেররা তার মালিক হয়ে যায়। কেননা ধরে নেওয়ার কারণে মনিবের দখল বাতিল হয়ে গেছে, তাই গোলাম আর নিরাপত্তাগুণ বিশিষ্ট থাকে না। ফলে তার উপর কাফেরদের দখল প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় কাফেররা মালিক হয়ে যায়। লক্ষণীয় যে, গেলামের নিরাপত্তাগুণ যদি সে মুসলমান হওয়ার কারণে হতো, তাহলে দারুল ইসলাম থেকে ধরে নিয়ে যাওয়ার কারণে তার নিরাপত্তাগুণ শেষ হতো না।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও তাঁর সাথে একমত পোষণকারীদের দলিল হলো, গোলাম দারুল ইসলামে থাকা অবস্থায় তার উপর মনিবের দখল প্রতিষ্ঠিত ছিল। যাতে মনিব তার দ্বারা ইচ্ছামতো উপকৃত হতে পারে। কিন্তু দারুল ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়ার দ্বারা মনিবের দখল শেষ হয়ে গেছে। আর মনিবের দখল বা নিয়ন্ত্রণ শেষ হওয়ার সাথে সাথে গোলামের নিজের উপর নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রকাশিত হবে। কেননা মনিবের নিয়ন্ত্রণের কারণে তার নিজের নিয়ন্ত্রণ অপ্রকাশিত ছিল। আর যখন গোলামের নিজের উপর নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রকাশিত হলো, তখন সে সত্তাগতভাবে নিরাপত্তাগুণ সম্পন্ন হয়ে গেল। সে আর অন্যের মালিকানার পাত্র থাকে নাই। অতএব, কাফেররা তার মালিক হতে পারবে না।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পক্ষান্তরে যে গোলাম মনিবের কাছ থেকে পালিয়ে গিয়ে দারুল ইসলামেই ঘুরতে থাকে, তার উপর মনিবের দখল অবশিষ্ট থেকে যায়। তাই তার নিজের উপর নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রকাশিত হবে না।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতানুসারে যেহেতু দারুল হরবে পালিয়ে যাওয়া গোলামের মালিক কাফের হয়না, তাই উক্ত গোলামটি বিনামূল্যে নিয়ে নিতে পারবে। গোলামটি কেউ দারুল হরব থেকে ক্রয় করে আনুক কিংবা গনিমত হিসাবে আনুক কিংবা হেবা হিসাবে আনুক। সর্বাবস্থায় প্রাক্তন মালিক গোলামটি বিনামূল্যে নিয়ে নিবে। তবে যদি মুসলিম বাহিনী গোলামটি দারুল হরব থেকে গনিমত হিসাবে এনে থাকে, তাহলে কথা এই যে, গনিমত বণ্টনের পূর্বে হলে তা মনিব বিনামূল্যেই নিয়ে নিবে। আর গনিমত বণ্টন হওয়ার পরে হলে মনিব গোলামটি বিনামূল্যে নিয়ে নিবে ঠিক, কিন্তু গোলামটি যার ভাগে পড়েছিল, তাকে বায়তুলমাল হতে বিনিময় দিতে হবে। কেননা বায়তুলমাল হতে তাকে বিনিময় না দেওয়া হলে, গনিমতের মাল পুনঃবণ্টন করা আবশ্যক হয়। সেটা সম্ভব নয়। মুজাহিদদেরকে পুনরায় সমাবেত করা অসম্ভব হওয়ার কারণে।

অতএব আলোচ্য গোলামটি যে মুজাহিদের ভাগে পড়েছিল, মনিব কর্তৃক গোলামটি নিয়ে যাওয়ার পর তাকে বায়তুল মাল থেকে বিনিময় প্রদান করাই শ্রেয়। প্রাক্তন মালিক গোলামটি নেওয়ার আগ পর্যন্ত গোলামটি যে মুজাহিদদের হাতে কিংবা ব্যবসায়ীর হাতে কিংবা দানপ্রাপ্ত ব্যক্তির হাতে ছিল, তার খরচকৃত অর্থ পরিশোধ করা মনিবের জন্য আবশ্যক নয়। কেননা গোলামটি যার হাতে ছিল, তার ধারণা মতে, গোলামটি তারই ছিল। সে হিসাবে গোলামটি তার কাজই করেছে। অতএব, খরচও তাকেই বহন করতে হবে– মনিবকে নয়।

https://e-ilm.weebly.com/

وَإِنْ نَدَّ بَعِيرٌ إِلَيْهِمْ فَأَخَذُوهُ مَلَكُوهُ لِتَحَقُّقِ الْإِسْتِيلَاءِ إِذْ لَا يَدَ لِلْعَجْمَاءِ لِتَظْهَرَ عِنْدَ الْخُرُوجِ مِنْ دَارِنَا، بِخِلَافِ الْعَبْدِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا . وَإِنِ اشْتَرَاهُ رَجُلٌ وَأَدْخَلَهُ دَارَ الْإِسْلَامِ فَصَاحِبُهُ يَأْخُذُهُ بِالثَّمَنِ إِنْ شَاءَ لِمَا بَيَّنَّا فَإِنْ أَبَقَ عَبْدٌ إِلَيْهِمْ وَذَهَبَ مَعَهُ بِفَرَسٍ وَمَتَاعٍ فَأَخَذَ الْمُشْرِكُونَ ذٰلِكَ كُلَّهُ وَاشْتَرَى رَجُلٌ ذٰلِكَ كُلَّهُ، وَأَخْرَجَهُ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ فَإِنَّ الْمَوْلَى يَأْخُذُ الْعَبْدَ بِغَيْرِ شَيْءٍ وَالْفَرَسَ وَالْمَتَاعَ بِالثَّمَنِ، وَهٰذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَالَا : يَأْخُذُ الْعَبْدَ وَمَا مَعَهُ بِالثَّمَنِ إِنْ شَاءَ اعْتِبَارًا لِحَالَةِ الْإِجْتِمَاعِ بِحَالَةِ الْإِنْفِرَادِ وَقَدْ بَيَّنَّا الْحُكْمَ فِي كُلِّ فَرْدٍ.

অনুবাদ : যদি উট ভেগে দারুল হরবে চলে যায়, আর তারা তা ধরে ফেলে তাহলে তারা তার মালিক হয়ে যাবে। কেননা বোবা জানোয়ারের আত্মনিয়ন্ত্রণ নেই, যা দারুল ইসলাম থেকে বের হওয়ার মাধ্যমে প্রকাশিত হবে। সুতরাং তার উপর তাদের দখল সাব্যস্ত হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে আমাদের উল্লিখিত আলোচনার ভিত্তিতে গোলামের বিষয়টি ভিন্ন হবে। আর যদি কোনো লোক ঐ উট খরিদ করে দারুল ইসলামে নিয়ে আসে তাহলে উটের মালিক ইচ্ছা করলে ক্রয়মূল্যের বিনিময়ে তা নিতে পারে। এর কারণ আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি।

কোনো গোলাম যদি ঘোড়া ও মালামালসহ তাদের কাছে পালিয়ে যায় আর তারা এসব কিছু অধিকার করে নেয়, এরপর কোনো লোক সেগুলো খরিদ করে দারুল ইসলামে নিয়ে আসে তাহলে মনিব গোলামটি বিনামূল্যে নিতে পারবে। আর ঘোড়া ও অন্যান্য দ্রব্য ক্রয় মূল্যের বিনিময়ে নিতে পারবে। এ হলো ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মত। সাহেবাইন (র.) বলেন, ইচ্ছা করলে গোলাম ও মালামাল ক্রয়মূল্যের বিনিময়ে নিতে পারবে।

(এ সিদ্ধান্ত হয়েছে) এগুলোর একত্র অবস্থাকে পৃথক অবস্থার উপর কিয়াস করে। আর (ইতঃপূর্বে) আমরা প্রত্যিটির পৃথক বিধান বর্ণনা করেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ند يند ندودا - ভেগে যাওয়া । পালিয়ে যাওয়া । باب ضرب হতে। العجماء অবলা পশু, নির্বাক পশু।

আলোচ্য মাসআলার সারসংক্ষেপ : একটি উট (উদাহরণস্বরূপ দারুল ইসলাম থেকে পালিয়ে দারুল হরবে গিয়ে প্রবেশ করল এবং কাফেররা উটটি ধরে ফেলল। এতে কাফেররা উটটির মালিক হয়ে যাবে। কারণ উটটি দারুল ইসলামে থাকাকালে তার উপর মুসলমান মালিকের দখল সাব্যস্ত ছিল। কিন্তু দারুল হরবে প্রবেশ করার কারণে মুসলমান মালিকের দখল বাতিল হয়ে গেছে। এবং উটটি পশু হওয়ার কারণে তার নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রকাশ পাবে না। তাই সে এখন মুবাহ সম্পদ। সে হিসাবে যেহেতু কাফেরদের দখল সাব্যস্ত হয়েছে, তাই কাফেররা এর মালিক হয়ে যাবে। এরপর যদি কেউ কাফেরদের থেকে উটটি খরিদ করে দারুল ইসলামে নিয়ে আসে এবং উটের প্রাক্তন মালিক উটটি নিতে চায়, তাহলে ক্রয়মূল্যের বিনিময়ে উটটি নিতে পারবে। বিনামূল্যে নিতে পারবে না। কেননা বিনামূল্যে নিয়ে গেলে ক্রেতা লোকটি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

পূর্বে আলোচিত গোলামের মাসআলা উটের মাসআলার বিপরীত। কেননা গোলাম দারুল হরবে প্রবেশ করলে তার নিজের উপর নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রকাশ পায়। ফলে কেউ তার মালিক হতে পারে না এবং কেউ তাকে দারুল ইসলামে নিয়ে আসলে প্রাক্তন মালিক তাকে বিনামূল্যে নিয়ে নিতে পারে।

فَإِنْ أَبَقَ عَبْدٌ إِلَيْهِمْ وَذَهَبَ مَعَهُ بِفَرَسٍ الخ : আলোচ্য মাসআলাটি মূলত পূর্বে বর্ণিত পৃথক পৃথক দুটি মাসআলার সমন্বিতরূপ। আলোচ্য মাসআলাটি হলো গোলাম ঘোড়া ও অন্যান্য মালসহ দারুল ইসলাম হতে পালিয়ে দারুল হরবে চলে গেছে। কাফেররা গোলামকে ঘোড়া ও মালসহ ধরে নিল। এমতাবস্থায় ঘোড়া ও মালামালের আত্মনিয়ন্ত্রণ না থাকার কারণে দখলকারী কাফের সেগুলোর মালিক হয়ে যাবে। সাহেবাইনের মতে গোলামেরও মালিক হয়ে যাবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে ঘোড়া ও মালের মালিক কাফেররা হবে; গোলামের মালিক হবে না। তাই কেউ এগুলো খরিদ করে দারুল ইসলামে নিয়ে এলে প্রাক্তন মালিক যদি নিতে চায়, তাহলে সাহেবাইনের মতে সবগুলোর ক্রয়মূল্যের বিনিময়ে নিতে পারবে। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে গোলামের মূল্য দিতে হবে না। মালামালও ঘোড়ার মূল্য দিয়ে নিতে হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَإِذَا دَخَلَ الْحَرْبِيُّ دَارَنَا بِأَمَانٍ وَاشْتَرٰى عَبْدًا مُسْلِمًا وَأَدْخَلَهُ دَارَ الْحَرْبِ عَتَقَ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ، وَقَالَا : لَا يُعْتَقُ؛ لِأَنَّ الْإِزَالَةَ كَانَتْ مُسْتَحِقَّةً بِطَرِيْقٍ مُعَيَّنٍ وَهُوَ الْبَيْعُ وَقَدْ انْقَطَعَتْ وِلَايَةُ الْجَبْرِ عَلَيْهِ فَبَقِيَ فِيْ يَدِهِ عَبْدًا . وَلِأَبِيْ حَنِيْفَةَ أَنَّ تَخْلِيْصَ الْمُسْلِمِ عَنْ ذُلِّ الْكَافِرِ وَاجِبٌ، فَيُقَامُ الشَّرْطُ وَهُوَ تَبَايُنُ الدَّارَيْنِ مَقَامَ الْعِلَّةِ وَهُوَ الْإِعْتَاقُ تَخْلِيْصًا لَهُ، كَمَا يُقَامُ مُضِيُّ ثَلَاثِ حِيَضٍ مَقَامَ التَّفْرِيْقِ فِيْمَا إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ فِيْ دَارِ الْحَرْبِ .

অনুবাদ : হারবী যদি নিরাপত্তা নিয়ে আমাদের দারুল ইসলামে প্রবেশ করে এবং কোনো মুসলিম (বা জিম্মি) গোলাম খরিদ করে দারুল হরবে নিয়ে যায় তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে গোলামটি আজাদ হয়ে যাবে। সাহেবাইন বলেন, আজাদ হবে না। কেননা একটি নির্ধারিত পন্থায় অর্থাৎ বিক্রয়ের মাধ্যমে মালিকানা বিলুপ্ত করা অনিবার্য ছিল। কিন্তু দারুল ইসলাম থেকে নিয়ে যাওয়ার কারণে তার উপর ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। সুতরাং সে তার হাতে গোলামরূপেই থেকে যাবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, মুসলমানকে কাফেরের লাঞ্ছনা মুক্ত করা অবশ্যকর্তব্য। সুতরাং (তার মালের নিরাপত্তাগুণ রহিত হওয়ার) শর্তটিকে অর্থাৎ দারুল ইসলাম ও দারুল হরবের ভিন্নতাকে (নিরাপত্তাগুণ রহিত হওয়ার) কারণ বা হেতুর স্থলবর্তী করা হবে, যাতে লাঞ্ছনা থেকে মুক্ত করা সম্ভব হয়। যেমন দারুল হরবে স্বামী-স্ত্রীর একজন ইসলাম গ্রহণ করলে তিন হায়েয অতিক্রমের সময় কালকেই বিচ্ছেদকরণের স্থলবর্তী সাব্যস্ত করা হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আলোচ্য মাসআলার সারসংক্ষেপ এই যে, কোনো হারবী ব্যক্তি নিরাপত্তা নিয়ে দারুল ইসলামে প্রবেশ করার পর একটি মুসলিম অথবা জিম্মি গোলাম খরিদ করল। এমতাবস্থায় তাকে বাধ্য করা হবে গোলামটি কোনো মুসলমানের কাছে বিক্রি করার জন্য, যাতে করে মুসলমান কাফেরের কাছে লাঞ্ছিত না হয়।

কিন্তু যদি হারবী ব্যক্তি মুসলিম গোলামটিকে নিয়ে দারুল হরবে চলে যায় তাহলে উক্ত গোলামের হুকুম কি এ নিয়ে ইমামগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে গোলামটি আজাদ হয়ে যাবে। সাহেবাইন, ইমাম মালেক, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের এক উক্তি অনুযায়ী এবং ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে উক্ত গোলাম হরবীর হাতে গোলাম অবস্থায় থেকে যাবে আজাদ হবে না।

দলিল পর্ব :

সাহেবাইন প্রমুখের দলিল হলো, গোলামের ক্রেতা হারবী কাফেরের মালিকানা বাতিল করার জন্য একটি নির্ধারিত পন্থা ছিল। সেটি হলো তাকে চাপ প্রয়োগ করে গোলামটি বিক্রি করতে বাধ্য করা। কিন্তু যখন সে দারুল ইসলামের সীমান্ত পেরিয়ে দারুল হরবে পৌঁছে গেল, তখন আর তার উপর চাপ প্রয়োগ করার সুযোগ থাকেনি। অতএব, সে হারবীর হাতে গোলামরূপেই থেকে যাবে।

https://e-ilm.weebly.com/

ইমাম আবূ হানীফা (র.) দলিল হলো, মুসলমান গোলামকে কাফেরের হাত থেকে আজাদ করা অপরিহার্য। কেননা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا

কিন্তু হারবীর উপর কাজির ফয়সালা কার্যকর হবে না বিধায় কাজির পক্ষ থেকে ঘোষণা দিয়ে গোলামটিকে আজাদ করা সম্ভব নয়। তাই ইল্লাতের (কাযির পক্ষ থেকে আজাদ করা) স্থলবর্তী করা হবে শর্তকে তথা দু-দেশের ভিন্নতাকেই ধরে নেওয়া হবে যে, গোলামটিকে আজাদ করে দেওয়া হলো।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিলটি এভাবে বর্ণনা করা যায় যে, হারবী ব্যক্তি যতক্ষণ দারুল ইসলামে থাকে, ততক্ষণ তার সম্পদের একটি নিরাপত্তা থাকে, আমান নিয়ে দারুল ইসলামে প্রবেশ করার কারণে। কিন্তু যখন সে দারুল হরবে প্রবেশ করে তখন তার আমান শেষ হয়ে যায়। ফলে তার সম্পদ ও নিরাপত্তাগুণ সম্পন্ন থাকে না। তাই গোলামটি আজাদ হয়ে যাবে।

কোনো বিষয়ের শর্তকে ইল্লতের স্থলবর্তী করা হয় এর একটি নজির হলো স্বামী স্ত্রী দুজনের কোনো একজন যদি দারুল হরবে অবস্থানকালে অপরজন ইসলাম গ্রহণ করে তখন কাজি সাহেব দারুল হরবে অবস্থানকারীর নিকট ইসলাম পেশ করতে এবং তাদের মাঝে বিচ্ছেদ ঘোষণা করতে অক্ষম হওয়ার কারণে তিন হায়েযের সময়কাল অতিক্রম করলেই বিচ্ছেদ হয়ে যায়।

এক্ষেত্রে কাজির পক্ষ থেকে ইসলাম পেশ করা এবং বিচ্ছেদ করে দেওয়া হলো ইল্লত। আর তিন হায়েয কাল অতিক্রান্ত হওয়া হলো শর্ত। ইল্লত অসম্ভব হওয়ার কারণে শর্তকেই তার স্থলবর্তী করা হয়। অর্থাৎ তিন হায়েযের সময়কাল অতীত হলেই উক্ত দম্পতির মাঝে বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। তদ্রূপ আলোচ্য মাসআলায়ও ইল্লত তথা কাজি কর্তৃক আজাদ করা অসম্ভব হওয়ার কারণে শর্তকে তথা দারুল ইসলাম ও দারুল হরবে ভিন্নতাকে ইল্লতের স্থলবর্তী করা হবে। অতএব, আমান গ্রহণকারী হরবী ব্যক্তি দারুল ইসলামের সীমান্ত পেরিয়ে দারুল হরবে প্রবেশ করা মাত্রই গোলামটি আজাদ হয়ে যাবে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَإِذَا أَسْلَمَ عَبْدٌ لِحَرْبِيٍّ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا أَوْ ظُهِرَ عَلَى الدَّارِ فَهُوَ حُرٌّ، وَكَذٰلِكَ إِذَا خَرَجَ عَبِيْدُهُمْ إِلَى عَسْكَرِ الْمُسْلِمِيْنَ فَهُمْ أَحْرَارٌ لِمَا رُوِيَ ﴿أَنَّ عَبِيْدًا مِنْ عَبِيْدِ الطَّائِفِ أَسْلَمُوْا وَخَرَجُوْا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضٰى بِعِتْقِهِمْ وَقَالَ: هُمْ عُتَقَاءُ اللهِ﴾ وَلِأَنَّهُ أَحْرَزَ نَفْسَهُ بِالْخُرُوْجِ إِلَيْنَا مُرَاغِمًا لِمَوْلَاهُ أَوْ بِالْإِلْتِحَاقِ بِمَنَعَةِ الْمُسْلِمِيْنَ، إِذَا ظُهِرَ عَلَى الدَّارِ، وَاعْتِبَارُ يَدِهِ أَوْلٰى مِنْ اعْتِبَارِ يَدِ الْمُسْلِمِيْنَ؛ لِأَنَّهَا أَسْبَقُ ثُبُوْتًا عَلٰى نَفْسِهِ، فَالْحَاجَةُ فِيْ حَقِّهِ إِلٰى زِيَادَةِ تَوْكِيْدٍ وَفِيْ حَقِّهِمْ إِلٰى إِثْبَاتِ الْيَدِ إِبْتِدَاءً فَلِهٰذَا كَانَ أَوْلٰى.

অনুবাদ : কোনো হারবীর গোলাম যদি ইসলাম গ্রহণ করে আমাদের কাছে চলে আসে কিংবা দারুল হরবে বিজিত হয়, তাহলে সে আজাদ বলে গণ্য হবে। অনুরূপ যদি তাদের দাসগণ বের হয়ে মুসলিম বাহিনীর কাছে আসে তাহলে তারা আজাদ গণ্য হবে। কেননা বর্ণিত আছে যে, তায়েফের একদল গোলাম ইসলাম গ্রহণ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে চলে এসেছিল। তাঁর তিনি তাদেরকে আজাদ হওয়ার ফায়সালা দিয়ে বলেছিলেন এরা হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে আজাদকৃত।

তাছাড়া এ কারণে যে, সে মনিবের অধীনতা ছিন্ন করে আমাদের কাছে চলে আসার মাধ্যমে কিংবা দারুল হরব জয়ের ক্ষেত্রে মুসলমাদের বাহিনীতে এসে পড়ার মাধ্যমে নিজেকে সংরক্ষিত করে নিয়েছে। আর মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণ বিবেচনা করার চেয়ে তার নিজের নিয়ন্ত্রণ বিবেচনা করা অধিক যুক্তিসঙ্গত। কেননা তার আপন সত্তার উপরে তার নিজের নিয়ন্ত্রণ অগ্রবর্তী হয়েছে। সুতরাং তার ক্ষেত্রে শুধু প্রয়োজন হলো সাব্যস্ত নিয়ন্ত্রণকে অধিকতর দৃঢ়তা দান। পক্ষান্তরে মুসলমানদের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হলো সূচনা থেকে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা। সুতরাং প্রতিষ্ঠিত নিয়ন্ত্রণকে বিবেচনা করাই উত্তম হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কোনো হারবীর গোলাম যদি ইসলাম গ্রহণ করে দারুল ইসলামে চলে আসে কিংবা দারুল হরব বিজয় হওয়ার সময় মুসলিম বাহিনীর কাছে চলে আসে, তাহলে উক্ত ইসলাম গ্রহণকারী গোলাম আজাদ বলে গণ্য হবে। কেননা হাদীস বর্ণিত আছে, তায়েফের যুদ্ধের সময় কিছু গোলাম মুসলিম বাহিনীর কাছে চলে আসার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে আজাদ ঘোষণা করেছিলেন।

যেমন মুসনাদে আহমদ, মুসান্নেফ ইবনে আবি শাইবা ও মু'জামে তাবারানীতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, দুজন গোলাম তায়েফ থেকে বের হয়ে নবী করীম ﷺ নিকট এলো এবং ইসলাম গ্রহণ করল। অতঃপর নবী করীম ﷺ তাদেরকে আজাদ ঘোষণা করলেন। তাদের একজন ছিলেন হযরত আবূ বাকরা (রা.)।

আকলী দলিল : হারবী ব্যক্তির গোলাম যখন তার মনিবের অধীনতা ছেড়ে দারুল ইসলামে চলে আসে কিংবা মুসলিম বাহিনীর কাছে চলে আসে তখন সে নিজেকে নিজে সংরক্ষিত করে নেয়। তাই তার উপর আর অন্যের নিয়ন্ত্রণ থাকবে না; বরং তার উপর তার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

উক্ত গোলামের উপর মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা অপেক্ষা তার নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠাই অধিক উত্তম। কারণ সে যখন দারুল ইসলামে বা মুসলিম বাহিনীতে এসে পৌঁছল তখন তার নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এখন শুধু সে নিয়ন্ত্রণটি শক্তিশালী করা প্রয়োজন। পক্ষান্তরে তার উপর মুসলিম বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ বিবেচনা করতে হলে সে নিয়ন্ত্রণ শুরু থেকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সুতরাং নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার তুলনায় পূর্ব প্রতিষ্ঠিত নিয়ন্ত্রণকে শক্তিশালী করাই উত্তম।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ الْمُسْتَامِنِ

وَاِذَا دَخَلَ الْمُسْلِمُ دَارَ الْحَرْبِ تَاجِرًا فَلَا يَحِلُّ لَه اَنْ يَتَعَرَّضَ لِشَيْءٍ مِنْ اَمْوَالِهِمْ وَلَا مِنْ دِمَائِهِمْ؛ لِاَنَّهُ ضَمِنَ اَنْ لَا يَتَعَرَّضَ لَهُمْ بِالْاِسْتِئْمَانِ، فَالتَّعَرُّضُ بَعْدَ ذٰلِكَ يَكُوْنُ غَدْرًا وَالْغَدْرُ حَرَامٌ، اِلَّا اِذَا غَدَرَ بِهِمْ مَلِكُهُمْ فَاَخَذَ اَمْوَالَهُمْ اَوْ حَبَسَهُمْ اَوْ فَعَلَ غَيْرُهُ بِعِلْمِ الْمَلِكِ وَلَمْ يَمْنَعْهُ؛ لِاَنَّهُمْ هُمُ الَّذِيْنَ نَقَضُوْا الْعَهْدَ بِخِلَافِ الْاَسِيْرِ؛ لِاَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَامِنٍ فَيُبَاحُ لَهُ التَّعَرُّضُ، وَاِنْ اَطْلَقُوْهُ طَوْعًا - فَاِنْ غَدَرَ بِهِمْ اَعْنِي التَّاجِرُ فَاَخَذَ شَيْئًا وَخَرَجَ بِهِ مَلَكَهُ مِلْكًا مَحْظُوْرًا لِوُرُوْدِ الْاِسْتِيْلَاءِ عَلٰى مَالٍ مُبَاحٍ، اِلَّا اَنَّهُ حَصَلَ بِسَبَبِ الْغَدْرِ فَاَوْجَبَ ذٰلِكَ خُبْثًا فِيْهِ فَيُؤْمَرُ بِالتَّصَدُّقِ بِهِ وَهٰذَا؛ لِاَنَّ الْحَظْرَ لِغَيْرِهِ لَا يَمْنَعُ انْعِقَادَ السَّبَبِ عَلٰى مَا بَيَّنَّاهُ -

পরিচ্ছেদ : নিরাপত্তা অর্জনকারী ব্যক্তি

অনুবাদ : (নিরাপত্তা অর্জনকারী) মুসলমান যদি ব্যবসায়ী হিসাবে দারুল হরবে (অমুসলিম দেশে) গমন করে তাহলে তার জন্য জায়েজ হবে না তাদের জানমালে কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করা। কেননা সে নিরাপত্তা অর্জনের মাধ্যমে তাদের প্রতি হস্তক্ষেপ না করার দায় গ্রহণ করেছে। সুতরাং এর পরে হস্তক্ষেপ করা বিশ্বাসঘাতকতা হবে। আর বিশ্বাসঘাতকতা হারাম।

তবে তাদের শাসক যদি নিরাপত্তা অর্জনকারী মুসলমানের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাদের মালামাল দখল করে নেয় কিংবা তাদের বন্দি করে কিংবা শাসকের জ্ঞাতসারে অন্য কেউ তা করে আর শাসক তাকে বাধাপ্রদান না করে (তবে ঐ মুসলমানের হস্তক্ষেপকে বিশ্বাসঘাতকতা গণ্য করা হবে না।) কেননা তারাই প্রথমে বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে।

বন্দির বিষয়টি ভিন্ন। কেননা সে নিরাপত্তাপ্রাপ্ত নয়। সুতরাং যে কোনো হস্তক্ষেপ করা তার জন্য বৈধ হবে। যদিও তারা স্বেচ্ছায় তাকে মুক্তি দিয়ে দেয়।

নিরাপত্তা অর্জনকারী ব্যবসায়ী যদি তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং কোনো কিছু হাতিয়ে নিয়ে চলে আসে, তাহলে সে নিষিদ্ধপন্থায় তার মালিকানা লাভ করবে। কেননা মুবাহ মালের উপর দখল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তবে যেহেতু তা বিশ্বাসঘাতকতা করার মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে, সেহেতু তা দোষযুক্ত হয়েছে। তাই তাকে ঐ জিনিস সদকা করে দেওয়ার আদেশ করা হবে। এর (মালিকানা গ্রহণযোগ্য হওয়ার) কারণ এই যে, পার্শ্ব কারণে নিষিদ্ধ হওয়া মালিকানার হেতু সাব্যস্ত হওয়াকে বাধাগ্রস্ত করে না। যেমন আমরা বর্ণনা করে এসেছি।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

اَلْمُسْتَأْمِنُ শব্দটি বাবে استفعال হতে اسم فاعل -এর واحد مذكر -এর সীগাহ, যা أ م ن । মূলধাতু হতে উৎপন্ন। اَلْمُسْتَأْمِنُ নিরাপত্তা প্রার্থনাকারী।

পরিভাষায় مستأمن বলা হয়, ঐ মুসলিমকে, যে নিরাপত্তা নিয়ে দারুল হরবে (অমুসলিম দেশে) গমন করে এবং ঐ হরবীকে, যে নিরাপত্তা নিয়ে দারুল ইসলামে আগমন করে।

বক্ষ্যমাণ পরিচ্ছেদে মুসলিম মুস্তামিনকে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পরবর্তী অনুচ্ছেদে কাফের বা হরবী (অমুসলিম দেশের অধিবাসী) মুস্তামিন সম্পর্কে আলোচনা হবে। ইনশাআল্লাহ।

আলোচ্য মাসআলার সারসংক্ষেপ এই যে, কোনো মুসলিম যদি আমান (নিরাপত্তা) নিয়ে দারুল হরবে গমন করে, তাহলে সেখানকার কারো জান মালে কোনো হস্তক্ষেপে করতে পারবে না। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তির উপর আক্রমণ করতে পারবে না এবং কারো সম্পদ লুণ্ঠন বা ধ্বংস করতে পারবে না। কারণ আমান নিয়ে প্রবেশ করার মানেই হলো এই ওয়াদা করা যে, সেখানে সে কোনোরূপ বিশৃঙ্খলা করবে না বা কারো জানমালে হস্তক্ষেপ করবে না। অতএব, যদি এখন কোনো হস্তক্ষেপ করে তাহলে ওয়াদা ভঙ্গ করা হবে।

আর ওয়াদা ভঙ্গ করা হারাম। হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, কেয়ামত দিবসে ওয়াদা খেলাপকারীর জন্য একটি নিশান লাগিয়ে দেওয়া হবে এবং বলা হবে, এই হলো ওয়াদা খেলাপকারীর চিহ্ন।

কিন্তু যদি দারুল হরবের বাদশাহ কিংবা বাদশার অবগতিতে কোনো ব্যক্তি মুস্তামিন ব্যক্তির জানমালের উপর হস্তক্ষেপ করে এবং এরপরে যদি মুস্তামিন মুসলমান কাফেরদের উপর হস্তক্ষেপ করে তাহলে তা ওয়াদা খেলাপ বলে সাব্যস্ত হবে না। কেননা এ ক্ষেত্রে কাফেররাই ওয়াদা খেলাপ করেছে।

বন্দির মাসআলা মুস্তামিনের মাসআলার বিপরীত। অর্থাৎ কোনো মুসলিম যদি দারুল হরবে বন্দি হয়ে যায়, তাহলে যে কারো জানমালের উপর হস্তক্ষেপ করা তার জন্য জায়েজ হবে। কারণ সে কোনো ওয়াদা বা অঙ্গীকার করে সেখানে প্রবেশ করেনি। কাফেররা যদি তাকে স্বেচ্ছায় মুক্তি দিয়ে দেয়, তাহলেও তার জন্য হস্তক্ষেপ করা জায়েজ আছে।

قَوْلُهُ : فَإِنْ غَدَرَ بِهِمْ الخ : নিরাপত্তা নিয়ে দারুল হরবে প্রবেশকারী ব্যবসায়ী যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে সেখান থেকে কোনো কিছু নিয়ে আসে, তাহলে সে এগুলোর মালিক হয়ে যাবে। কারণ কাফেরের মাল মুবাহ! আর সেই মুবাহ মালের উপর মুসলমানের দখল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই সে উক্ত মালের মালিক হয়ে যাবে। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে হওয়ার কারণে তাতে দোষ সৃষ্টি হবে। এ কারণে তাকে উক্ত মাল সদকা করে দেওয়ার জন্য আদেশ করা হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَإِذَا دَخَلَ الْمُسْلِمُ دَارَ الْحَرْبِ بِأَمَانٍ فَأَدَانَهُ حَرْبِيٌّ أَوْ أَدَانَ هُوَ حَرْبِيًّا أَوْ غَصَبَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا وَاسْتَأْمَنَ الْحَرْبِيُّ لَمْ يُقْضَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ بِشَيْءٍ أَمَّا الْإِدَانَةُ فَلِأَنَّ الْقَضَاءَ يَعْتَمِدُ الْوِلَايَةَ وَلَا وِلَايَةَ وَقْتَ الْإِدَانَةِ أَصْلًا وَلَا وَقْتَ الْقَضَاءِ عَلَى الْمُسْتَأْمِنِ؛ لِأَنَّهُ مَا الْتَزَمَ حُكْمَ الْإِسْلَامِ فِيمَا مَضَى مِنْ أَفْعَالِهِ وَإِنَّمَا الْتَزَمَ ذٰلِكَ فِي الْمُسْتَقْبَلِ. وَأَمَّا الْغَصْبُ فَلِأَنَّهُ صَارَ مِلْكًا لِلَّذِيْ غَصَبَهُ وَاسْتَوْلٰى عَلَيْهِ لِمُصَادَفَتِهِ مَالًا غَيْرَ مَعْصُوْمٍ عَلٰى مَا بَيَّنَّاهُ، وَكَذٰلِكَ لَوْ كَانَا حَرْبِيَّيْنِ فَعَلَا ذٰلِكَ ثُمَّ خَرَجَا مُسْتَأْمَنَيْنِ لِمَا قُلْنَا ـ وَلَوْ خَرَجَا مُسْلِمَيْنِ قُضِيَ بِالدَّيْنِ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يُقْضَ بِالْغَصْبِ أَمَّا الْمُدَايَنَةُ فَلِأَنَّهَا وَقَعَتْ صَحِيْحَةً لِوُقُوْعِهَا بِالتَّرَاضِيْ، وَالْوِلَايَةُ ثَابِتَةٌ حَالَةَ الْقَضَاءِ لِالْتِزَامِهِمَا الْأَحْكَامَ بِالْإِسْلَامِ. وَأَمَّا الْغَصْبُ فَلِمَا بَيَّنَّا أَنَّهُ مِلْكُهُ وَلَا خُبْثَ فِيْ مِلْكِ الْحَرْبِيِّ حَتّٰى يُؤْمَرَ بِالرَّدِّ.

অনুবাদ : কোনো মুসলমান নিরাপত্তা নিয়ে দারুল হরবে প্রবেশ করার পর কোনো হরবী যদি তাকে ঋণ প্রদান করে কিংবা সে কোনো হরবীকে ঋণ প্রদান করে কিংবা একে অপরের কোনো জিনিস গসব করে (ছিনতাই করে নিয়ে যায়) এরপর ঐ মুসলমান দারুল ইসলামে ফিরে আসে এবং হরবীও নিরাপত্তা নিয়ে দারুল ইসলামে আগমন করে, তখন একজনের অনুকূলে অপর জনের প্রতিকূলে কোনো ফয়সালা দেওয়া যাবে না। ঋণের বিষয়টি এ কারণে যে, ফয়সালা নির্ভর করে জারি করার ক্ষমতা হাসিল হওয়ার উপর। অথচ ঋণ আদান-প্রদানের সময় কারো উপরই ক্ষমতা ছিল না এবং ফয়সালা জারি করার সময় নিরাপত্তাধারী হরবীর উপরও ক্ষমতা নেই। কেননা সে তার বিগত সময়ের কোনো আচরণের ক্ষেত্রে ইসলামের বিধান পালনের দায় গ্রহণ করেনি; বরং দারুল ইসলামে অবস্থান কালে তা পালনের দায় গ্রহণ করেছে। আর গসবের ক্ষেত্রে কারণ এ যে, দখল ও নিয়ন্ত্রণ লাভের পর সেটা গসবকারীর মালিকানাধীন হয়ে গেছে। কেননা এই গসব ও নিয়ন্ত্রণ নিরাপত্তাগুণ রহিত মালের সাথে যুক্ত হয়েছে। যেমন আমরা বর্ণনা করে এসেছি।

অনুরূপ হুকুম, যদি দুই হরবী এরূপ কিছু করার পর নিরাপত্তা গ্রহণ করে দারুল ইসলামে আগমন করে; কারণ আমরা পূর্বেই বলেছি –[ফয়সালা অভিভাবকত্ব ক্ষমতার উপর নির্ভর করে।]

আর যদি উভয়ে মুসলমান হয়ে দারুল ইসলামে চলে আসে তাহলে ঋণের বিষয়ে উভয়ের মাঝে ফয়সালা দেওয়া হবে, কিন্তু গসব সম্পর্কে ফয়সালা দেওয়া হবে না। ঋণের ক্ষেত্রে কারণ এই যে, উভয়ের সম্মতিতে সম্পন্ন হওয়ার কারণে তা সিদ্ধরূপে সম্পন্ন হয়েছে। আর উভয়ে ইসলামের যাবতীয় বিধান পালনের দায় গ্রহণের কারণে ফয়সালা জারির অবস্থায় উভয়ের উপর (কাজির) ক্ষমতা সাব্যস্ত হয়েছে।

পক্ষান্তরে গসবের ক্ষেত্রের কারণ আমরা বর্ণনা করেছি যে, বস্তুটি তার মালিকানাধীন হয়ে গেছে। আর হরবীর মালিকানায় কোনো দোষ নেই, যাতে ফেরত দানের হুকুম দিতে হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিউক্ত ভাষ্যে তিনটি মাসআলা আলোচিত হয়েছে–

১. কোনো মুসলিম আমান নিয়ে দারুল হরবে গেল। সেখানে যাওয়ার পর কোনো হরবী তাকে ঋণ দিল কিংবা সে কোনো হরবীকে ঋণ দিল। এরপর মুসলিম ব্যক্তি দারুল ইসলামে চলে এলো এবং হরবী ব্যক্তিও আমান নিয়ে দারুল ইসলামে এলো। অতঃপর তাদের এই ঋণ সংক্রান্ত মু'আমাল কাজির দরবারে উত্থাপন করল। এমতাবস্থায় হুকুম হলো, কাজি সাহেব মুসলিম এবং হরবী কারো পক্ষে বা বিপক্ষে কোনো রায় দিতে পারবে না।

কেননা কারো পক্ষে বা বিপক্ষে কাজি সাহেবের কোনো রায় ঘোষণার জন্য শর্ত হলো উক্ত ব্যক্তির উপর কাজি সাহেবের কর্তৃত্ব বা অভিভাবকত্ব থাকতে হবে। কিন্তু আলোচ্য মাসআলায় ঋণ আদান-প্রদান হয়েছে দারুল হরবে। সেখানে কারো উপর কাজি সাহেবের কোনো কর্তৃত্ব নেই।

কারণ হরবী লোক কখনো ইসলামের বিধান মানার দায় গ্রহণ করেনি। তাই তার উপর কাজির অভিভাবকত্ব নেই। আবার বর্তমানেও আমান নিয়ে আগমনকারী হরবীর উপরে কাজির কোনো অভিভাবকত্ব নেই। অতএব, যেহেতু মু'আমালার উভয় পক্ষের উপর অতীতে ও বর্তমানে কাজি সাহেবের কোনো অভিভাবকত্ব নেই, সেহেতু কাজি সাহেব তাদের কারো পক্ষে বা বিপক্ষে কোনো ফয়সালা করতে পারবে না।

২. কোনো মুসলিম আমান নিয়ে দারুল হরবে প্রবেশ করল এবং সে কোনো হরবীর মাল গসব করল কিংবা কোনো হরবী মুসলমানের মাল গসব করল। অতঃপর মুসলমান লোকটি দারুল ইসলামে ফিরে আসল এবং হরবীও আমান নিয়ে দারুল ইসলামে এলো। তারপর তাদের মধ্যকার এ গসরের বিষয়টি কাজির দরবারে উত্থাপিত হলো। এমতাবস্থায় হুকুম হলো, কাজি সাহেব দু'জনের কোনো একজনের পক্ষে বা বিপক্ষে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না।

কারণ গসবের ঘটনা ঘটেছে দারুল হরবে। সেখানে সমস্ত সম্পদ মুবাহ। যে কোনো সম্পদের উপর কারো দখল সাব্যস্ত হলে সে উক্ত সম্পদের মালিক হয়ে যায়। এতএব, গসবকারী ব্যক্তি যখন অপর পক্ষের সম্পদ গসব করেছে এবং সেই সম্পদের উপর তার দখল সাব্যস্ত হয়েছে, তখন সে উক্ত সম্পদের মালিক হয়ে গেছে। অতএব, সে সম্পদ আর ফিরিয়ে দেওয়ার আদেশ করা যাবে না।

৩. দুজন হরবী পরস্পর একে অপরকে ঋণ দিয়েছে দারুল হরবে কিংবা একে অন্যের মাল গসব করেছে দারুল হরবে। তারপর উভয়ই আমান নিয়ে দারুল ইসলামে আগমন করেছে এবং তাদের এই ঋণ সংক্রান্ত ঘটনা কিংবা গসব সংক্রান্ত ঘটনা মুসলিম কাজির দরবারে উত্থাপিত হয়েছে। এমতাবস্থায় কাজি সাহেব কারো অনুকূলে বা কারো প্রতিকূলে কোনোরূপ ফয়সালা করতে পারবে না। কারণ তাই যা উল্লিখিত মাসআলাদ্বয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

قَوْلُهُ : وَلَوْ خَرَجَا مُسْلِمَيْنِ قُضِيَ بِالدَّيْنِ بَيْنَهُمَا الخ : আলোচ্য মাসআলার সারসংক্ষেপ হলো, দুজন হরবী দারুল হরবে একে অপরকে ঋণ দেওয়ার পর কিংবা একে অপরের মাল গসব করার পর উভয়ই মুসলমান হয়ে দারুল ইসলামে চলে এসেছে। এরপর তাদের ঋণ সংক্রান্ত মু'আমালা যদি কাজির দরবারে উত্থাপনপূর্বক রায় চাওয়া হয়, তাহলে কাজি সাহেব ঋণ গ্রহীতাকে আদেশ করবেন ঋণ পরিশোধ করে দেওয়ার জন্য। পক্ষান্তরে গসবের বিষয়ে কাজি সাহেব কারো উপর কোনো নির্দেশ জারি করবেন না।

ঋণের ব্যাপারে ফয়সালা করার কারণ হলো, ঋণ দেওয়া নেওয়ার ব্যাপারটি দুপক্ষের সম্মতিতে হয়েছিল। তাই সেটা শুদ্ধরূপে সম্পন্ন হয়েছিল। আবার ফয়সালা দেওয়ার সময় উভয় পক্ষের উপর কাজি সাহেবের বেলায়েত বা অভিভাবকত্বও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কারণ উভয় ইসলাম গ্রহণ করেছে তথা ইসলামের যাবতীয় বিধান পালনের দায় গ্রহণ করেছে, তাই কাজি সাহেবের ফয়সালা দেওয়ার শর্ত বিদ্যমান থাকায় ঋণ আদান প্রদানের মতো একটি সহীহ-শুদ্ধ বিষয়ে কাজি সাহেব রায় দিতে পারবেন।

গসবের বিষয়ে কোনো রায় দিতে পারবেন না, এর কারণ হলো দারুল হরবের সমস্ত সম্পদ মুবাহ হওয়ার ফলে গসবকারী ব্যক্তি অপর জনের সম্পদ গসব কারার সঙ্গে সঙ্গে উক্ত সম্পদের মালিক হয়ে গেছে। আর হরবী ব্যক্তি কোনো কিছুর মালিক হওয়াতে কোনো সমস্যাও নেই। অতএব, গসবকৃত মাল ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য গসবকারীকে নির্দেশ দেওয়া যাবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

وَإِذَا دَخَلَ الْمُسْلِمُ دَارَ الْحَرْبِ بِأَمَانٍ فَغَصَبَ حَرْبِيًّا ثُمَّ خَرَجَا مُسْلِمَيْنِ أُمِرَ بِرَدِّ الْغَصْبِ وَلَمْ يُقْضَ عَلَيْهِ أَمَّا عَدَمُ الْقَضَاءِ فَلِمَا بَيَّنَّا أَنَّهُ مَلَكَهُ. وَأَمَّا الْأَمْرُ بِالرَّدِّ وَمُرَادُهُ الْفَتْوٰى بِهِ فَلِأَنَّهُ فَسَدَ الْمِلْكُ لِمَا يُقَارِنُهُ مِنَ الْمُحَرَّمِ وَهُوَ نَقْضُ الْعَهْدِ وَإِذَا دَخَلَ مُسْلِمَانِ دَارَ الْحَرْبِ بِأَمَانٍ فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً فَعَلَى الْقَاتِلِ الدِّيَةُ فِيْ مَالِهِ وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ فِي الْخَطَإِ أَمَّا الْكَفَّارَةُ فَلِإِطْلَاقِ الْكِتَابِ، وَالدِّيَةُ فَلِأَنَّ الْعِصْمَةَ الثَّابِتَةَ بِالْإِحْرَازِ بِدَارِ الْإِسْلَامِ لَا تَبْطُلُ بِعَارِضِ الدُّخُوْلِ بِالْأَمَانِ، وَإِنَّمَا لَا يَجِبُ الْقِصَاصُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ اسْتِيْفَاؤُهُ إِلَّا بِمَنَعَةٍ، وَلَا مَنَعَةَ بِدُوْنِ الْإِمَامِ وَجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِيْنَ، وَلَمْ يُوجَدْ ذٰلِكَ فِيْ دَارِ الْحَرْبِ، وَإِنَّمَا تَجِبُ الدِّيَةُ فِيْ مَالِهِ فِي الْعَمْدِ؛ لِأَنَّ الْعَوَاقِلَ لَا تَعْقِلُ الْعَمْدَ؛ وَفِي الْخَطَإِ لِأَنَّهُ لَا قُدْرَةَ لَهُمْ عَلَى الصِّيَانَةِ مَعَ تَبَايُنِ الدَّارَيْنِ وَالْوُجُوْبُ عَلَيْهِمْ عَلٰى اعْتِبَارِ تَرْكِهَا.

অনুবাদ : কোনো মুসলমান যদি নিরাপত্তা গ্রহণ করে দারুল হরবে প্রবেশ করে এবং কোনো হরবীর মাল গসব করে। অতঃপর উভয়ে মুসলমান অবস্থায় দারুল ইসলামে চলে আসে, তাহলে তাকে গসবকৃত মাল ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হবে। অবশ্য কাজি এ ফয়সালা তার বিরুদ্ধে দিবে না।

ফয়সালা না দেওয়ার কারণ আমরা (পিছনে) বর্ণনা করেছি যে, এটা তার মালিকানাভুক্ত হয়ে গেছে।

আর ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ, যে ব্যাপারে ফতোয়া রয়েছে বলে ইমাম মুহাম্মদ (র.) মত প্রকাশ করেছেন তা এজন্য যে, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের হারাম কাজ মালিকানার সাথে যুক্ত হওয়ার কারণে মালিকানা ফাসেদ হয়ে গেছে।

দুজন মুসলিম যদি নিরাপত্তা গ্রহণপূর্বক দারুল হরবে প্রবেশ করে, অতঃপর একে অপরকে ইচ্ছাকৃতভাবে কিংবা অনিচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে তাহলে হত্যাকারীর উপর তার নিজস্ব মাল থেকে দিয়ত ওয়াজিব হবে। আর অনিচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে তার উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে।

কাফফারা ওয়াজিব হওয়ার কারণ এই যে, কুরআনের আয়াত (স্থানগত) শর্ত থেকে মুক্ত। আর দিয়ত ওয়াজিব হওয়ার কারণ এই যে, দারুল ইসলামে সংরক্ষিত হওয়ার কারণে সাব্যস্ত নিরাপত্তা গ্রহণ দারুল হরবে নিরাপত্তা গ্রহণপূর্বক সাময়িক অবস্থানের দ্বারা রহিত হয় না। তবে কেসাস ওয়াজিব হবে না, কারণ শক্তি-বল ছাড়া তা বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। আর ইমাম ও মুসলমানদের দলগত উপস্থিতি ছাড়া শক্তি-বল সাব্যস্ত হয় না; আর দারুল হরবে তা বিদ্যমান নেই।

ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে তার মাল থেকে দিয়ত ওয়াজিব হওয়ার কারণ এই যে, শরিয়তের বিধানে আকেলাহ (নিকট পুরুষ আত্মীয়গণ) ইচ্ছাকৃত অপরাধের দায় বহন করবে না। পক্ষান্তরে অনিচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে কারণ এই যে, দুই দেশের ভিন্নতার কারণে তাকে রক্ষা করার সামর্থ্য তাদের নেই; অথচ রক্ষা দায়িত্ব বর্জনের ভিত্তিতেই তাদের উপর দিয়ত অবশ্য আরোপিত হয়।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কোনো মুসলমান ব্যক্তি নিরাপত্তা নিয়ে দারুল হরবে প্রবেশ করার পর কোনো হরবীর মাল গসব করল। এরপর মুসলমান ব্যক্তি মুসলমান হিসাবেই দারুল ইসলামে ফিরে এলো। আবার হরবী ব্যক্তিও ইসলাম গ্রহণ করে দারুল ইসলামে চলে এলো এমতাবস্থায় কাজি সাহেব মুসলমান ব্যক্তিকে নির্দেশ দিবেন গসবকৃত মালটি দিয়ানত স্বরূপ ইসলাম গ্রহণকারী হরবীর কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য; অর্থাৎ সে যেন আল্লাহর প্রতি লক্ষ্য করে মালটি ফিরিয়ে দেয়। তবে আইনগত তার উপর কোনো চাপ প্রয়োগ করা যাবে না; কারণ দারুল হরবের মাল মুবাহ। মুবাহ মাল গসব করার কারণে সে উক্ত মালের মালিক হয়ে গেছে, তাই উক্ত মাল ফেরত দেওয়ার জন্য তাকে অইনগতভাবে চাপ দেওয়া যাবে না। কিন্তু মালিকানাটি একটি হারাম বিষয়ের সাথে মিলিত হয়েছে; সেটি হলো ওয়াদা ভঙ্গ করা। এ কারণে তা ফাসেদ হয়েছে, ফলে দিয়ানত স্বরূপ তার দায়িত্ব হবে মালটি ফিরিয়ে দেওয়া।

ওয়াদা ভঙ্গ করা হয়েছে এভাবে যে, আমান নিয়ে দারুল হরবে প্রবেশ করার অর্থই হলো এ ওয়াদা করা যে, সেখানে গিয়ে সে কারো জানমালের উপর হস্তক্ষেপ করবে না। কিন্তু যখন সে হরবীর মাল গসব করল, তখন কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করা হলো।

وَإِذَا دَخَلَ مُسْلِمَانِ دَارَ الْحَرْبِ الخ : উপরিউক্ত ইবারতে দুটি মাসআলা আলোচনা করা হয়েছে।

১. দুজন মুসলমান আমান নিয়ে দারুল হরবে প্রবেশ করার পর একে অপরকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করেছে।

২. দুজন মুসলমান আমান নিয়ে দারুল হরবে প্রবেশ করার পর একে অপরকে অনিচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করেছে।

প্রথম মাসআলার ব্যাখ্যা : দুজন মুসলমান নিরাপত্তা নিয়ে দারুল হরবে প্রবেশ করার পর যদি একজন অপরজনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে, তাহলে হত্যাকারীর ব্যক্তিগত সম্পদ থেকে নিহত ব্যক্তির দিয়ত পরিশোধ করা ওয়াজিব হবে। কারণ নিহত মুসলমান ব্যক্তি দারুল ইসলামে থাকা অবস্থায় মাসুম ছিল তথা তার জন্য নিরাপত্তাপ্রাপ্ত ছিল। সাময়িকভাবে সে আমান নিয়ে দারুল হরবে প্রবেশ করেছে। কিন্তু সেখান থেকে সে সত্বরই ফিরে আসবে। অতএব, দারুল হরবে এ সাময়িক অবস্থানের কারণে তার জানের নিরাপত্তা গুণ রহিত হবে না। তাই হত্যাকারী ব্যক্তি মূলত একটি সংরক্ষিত এবং নিরাপত্তাপ্রাপ্ত প্রাণকে নাশ করেছে। বিধায় এর দিয়ত ওয়াজিব হবে। আবার এ দিয়ত তার নিজের সম্পদ দ্বারা পরিশোধ করতে হবে। আকেলা বা নিকট আত্মীয়রা দিয়ত বহন করবে না। কেননা আকেলাগণ ইচ্ছাকৃত অপরাধের দায় বহন করেন না।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর : ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করলে তো কেসাস ওয়াজিব হয়। আলোচ্য সুরতে দিয়ত ওয়াজিব হলো কেন?

উত্তর : কেসাস ওয়াজিব হলেও আলোচ্য সুরতে কেসাস বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। কেননা কেসাস বাস্তবায়ন করতে শক্তিবলের প্রয়োজন হয়। আর শক্তিবল অর্জন হয় মুসলমানদের দলগত উপস্থিতি এবং ইমামের উপস্থিতি দ্বারা। কিন্তু দারুল হরবে এটা অনুপস্থিত। তাই সেখানে কেসাস বাস্তবায়ন করার মতো শক্তি-বল নেই। এমতাবস্থায় কেসাস ওয়াজিব হলেও কোনো লাভ নেই। তাই কেসাস ওয়াজিব হবে না; বরং দিয়ত ওয়াজিব হবে।

দ্বিতীয় মাসআলার ব্যাখ্যা : দুজন মুসলমান দারুল হরবে প্রবেশ করার পর অনিচ্ছা বশত একজন অপর জনকে হত্যা করল। এমতাবস্থায় হত্যাকারী ব্যক্তির উপর দিয়ত ওয়াজিব হবে এবং কাফফারাও ওয়াজিব হবে।

দিয়ত ওয়াজিব হওয়ার কারণ হলো, সে একজন মাসুম তথা সংরক্ষিত এবং নিরাপত্তা গুণসম্পন্ন লোককে হত্যা করেছে। তদুপরি সেই দিয়ত নিজস্ব সম্পদ দ্বারা পরিশোধ করতে হবে। আকেলা বা নিকট আত্মীয়গণ বহন করবে না। কারণ আকেলার উপর দিয়ত ওয়াজিব হয় হত্যাকারী বা অপরাধী ব্যক্তিকে সামলে না রাখার কারণে। কিন্তু আলোচ্য সুরতে উক্ত ব্যক্তি অবস্থান করেছে দারুল হরবে, আর তার আত্মীয়রা অবস্থান করছে দারুল ইসলামে। এমতাবস্থায় অপরাধীকে সামলে রাখা আত্মীয়দের ক্ষমতার বাইরে। তাই তারা এক্ষেত্রে নির্দোষ। বিধায় আলোচ্য হত্যার দিয়ত আত্মীয়গণ বহন করবে না। হত্যাকারী ব্যক্তি তার ব্যক্তিগত সম্পদ হতে দিয়ত পরিশোধ করবে।

আর কাফফারা ওয়াজিব হওয়ার কারণ হলো, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোনো মুমিনকে ভুলবশত হত্যা করে, তাহলে তাকে একটি গোলাম আজাদ করতে হবে।

আয়াতের বিধানটি শর্তমুক্ত। দারুল ইসলামে হওয়ার শর্ত আরোপ করা হয়নি। অতএব, হত্যাকাণ্ডটি দারুল ইসলামে বা দারুল হরবে যেখানেই সংঘটিত হোক, হত্যাকারীর উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে।

নোট : কাযীখান জামে সাগীরে উল্লেখ করেছেন, দারুল হরবে ইচ্ছাকৃতভাবে মুসলমানকে হত্যা করলে দিয়ত ওয়াজিব হওয়া কেবল ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মত। সাহেবাইনের মতে কেসাস ওয়াজিব হবে। ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর মতেও কেসাস ওয়াজিব হবে। কারণ সে একজন নিরাপত্তা গুণ সম্পন্ন ব্যক্তিকে হত্যা করেছে। দারুল হরবে প্রবেশ করার কারণে তার নিরাপত্তা গুণ রহিত হয়ে যায়নি। অতএব, তাকে দারুল ইসলামে হত্যা করলে যেমন কেসাস ওয়াজিব হতো, তেমনি দারুল হরবে হত্যা করলেও কেসাস ওয়াজিব হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَإِنْ كَانَا أَسِيْرَيْنِ فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ أَوْ قَتَلَ مُسْلِمٌ تَاجِرٌ أَسِيْرًا فَلَا شَيْءَ عَلَى الْقَاتِلِ إِلَّا الْكَفَّارَةُ فِي الْخَطَإِ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ، وَقَالَا : فِي الْأَسِيْرَيْنِ الدِّيَةُ فِي الْخَطَإِ وَالْعَمْدِ؛ لِأَنَّ الْعِصْمَةَ لَا تَبْطُلُ بِعَارِضِ الْأَسْرِ كَمَا لَا تَبْطُلُ بِعَارِضِ الْاِسْتِئْمَانِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ، وَامْتِنَاعُ الْقِصَاصِ؛ لِعَدَمِ الْمَنَعَةِ وَيَجِبُ الدِّيَةُ فِيْ مَالِهِ لِمَا قُلْنَا . وَلِأَبِيْ حَنِيْفَةَ أَنَّ بِالْأَسْرِ صَارَ تَبَعًا لَهُمْ؛ لِصَيْرُوْرَتِهِ مَقْهُوْرًا فِيْ أَيْدِيْهِمْ، وَلِهٰذَا يَصِيْرُ مُقِيْمًا بِإِقَامَتِهِمْ وَمُسَافِرًا بِسَفَرِهِمْ فَيَبْطُلُ بِهِ الْإِحْرَازُ أَصْلًا وَصَارَ كَالْمُسْلِمِ الَّذِي لَمْ يُهَاجِرْ إِلَيْنَا. وَخَصَّ الْخَطَأَ بِالْكَفَّارَةِ؛ لِأَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ فِي الْعَمْدِ عِنْدَنَا.

অনুবাদ : আর যদি মুসলিম ও কাফের দুজন বন্দি হয়, এবং সে অবস্থায় একে অপরকে হত্যা করে কিংবা (নিরাপত্তাধারী) কোনো মুসলিম ব্যবসায়ী যদি বন্দিকে হত্যা করে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে হত্যাকারীর উপর কোনো শাস্তি ধার্য হবে না। তবে অনিচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে কাফফারা ওয়াজিব হবে। আর সাহেবাইন (র.) বলেন, উক্ত দুই বন্দির ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃত এবং অনিচ্ছাকৃত উভয় অবস্থায় দিয়ত ওয়াজিব হবে। কেননা আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি যে, বন্দিত্বের উপসর্গের কারণে নিরাপত্তা গুণ বাতিল হয় না, যেমন নিরাপত্তা গ্রহণের কারণে বাতিল হয় না। তবে কেসাস রহিত হওয়ার কারণ হলো শক্তি-বলের অবিদ্যমানতা। আর তার নিজের মালে দিয়ত ওয়াজিব হওয়ার কারণ সেটাই, যা আমরা ইতঃপূর্বে বলে এসেছি।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, বন্দিত্বের কারণে যেহেতু সে তাদের হাতে অসহায় হয়ে পড়েছে, সেহেতু সে তাদের অনুবর্তী সাব্যস্ত হবে। এ কারণেই তাদের মুকীম অবস্থায় সেও মুকীম হয় এবং তাদের মুসাফির অবস্থায় সেও মুসাফির হয়। সুতরাং অনুবর্তিতার কারণে তার সংরক্ষণ অবস্থা সম্পূর্ণতর বাতিল হবে এবং সে ঐ মুসলমানের মতো হয়ে যাবে, যে দারুল ইসলামে হিজরত করে আসেতে পারেনি। কাফফারার বিষয়টি অনিচ্ছকৃত হত্যার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট করার কারণ এই যে, আমাদের মতে ইচ্ছাকৃত হত্যায় কাফফারা নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

বর্ণিত মাসআলার সারসংক্ষেপ এই যে, দারুল হরবে বন্দি এমন দুজন মুসলমান যদি একে অপরকে হত্যা করে ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে হত্যাকারীর উপর কোনো কিছু ওয়াজিব হবে না। তবে অনিচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে শুধু কাফফারা ওয়াজিব হবে। কোনো মুসলিম ব্যবসায়ী যদি বন্দিকে হত্যা করে তাহলে ইমামের মতে একই হুকুম।

পক্ষান্তরে সাহেবাইন (র.) বলেন, বন্দি দুজনের একজন অপরজনকে হত্যা করলে হত্যাকারীর নিজস্ব মাল থেকে দিয়ত ওয়াজিব হবে ইচ্ছাকৃত হত্যা ও অনিচ্ছাকৃত হত্যা উভয় অবস্থায়। অনিচ্ছাকৃত হওয়ার ক্ষেত্রে কাফফারাও ওয়াজিব হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

দলিল পর্ব : সাহেবাইন (র.)-এর দলিল হলো, মুসলমান আমান নিয়ে দারুল হরবে গেলে যেমন তার নিরাপত্তা গুণ বা সংরক্ষণ বাতিল হয় না, তেমনি বন্দিত্বের কারণেও সংরক্ষণ বাতিল হয় না। অতএব, তাকে হত্যা করলে নিরাপত্তা গুণসম্পন্ন সংরক্ষিত প্রাণ হরণ করা হয়, তাই দিয়ত ওয়াজিব হবে। তাও নিজের মাল থেকে। নিজের মাল থেকে দিয়ত ওয়াজিব হওয়ার কারণ হলো, ইচ্ছাকৃত হত্যার দায় আকেলা বহন করে না। অনিচ্ছাকৃত হত্যার দায় আকেলা বহন করে; কিন্তু আলোচ্য সুরতে ঘটনাটি দারুল হরবে ঘটার কারণে আকেলা দোষমুক্ত, তাই তারা অনিচ্ছাকৃত হত্যার দায়ও বহন করবে না। তাই ইচ্ছাকৃত, অনিচ্ছাকৃত উভয় অবস্থায় দিয়ত হত্যাকারীর ব্যক্তিগত মাল দ্বারা পরিশোধ করবে। অনিচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে কাফফারাও ওয়াজিব হবে। কারণ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোনো মুমিনকে ভুল বশত হত্যা করে তার উপর ওয়াজিব হলো একটি গোলাম আজাদ করা। তার ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে কেসাস ওয়াজিব হবে না। কেননা দারুল হরবে কেসাস বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে না।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল এই যে, বন্দীরা কাফেরদের হাতে বন্দী থাকার কারণে কাফেরদের অনুবর্তী। অতএব, কাফেরদের যেমন সংরক্ষণ বা নিরাপত্তাগুণ নেই। তেমনি তাদের হাতে বন্দীদেরও নিরাপত্ত গুণ নেই। একারণে তাদেরকে হত্যা করলে কোনো দিয়ত বা কেসাস ওয়াজিব নয়। তবে ভুলবশত হত্যার সুরতে হত্যাকারীর উপর শুধু কাফফারা ওয়াজিব হবে। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোনো মুমিনকে হত্যা করবে তার, উপর ওয়াজিব হবে একটি দাস মুক্ত করা। এ বিধানটি শর্তমুক্ত। তাই হত্যা কাণ্ডটি দারুল হরবে ঘটা সত্ত্বেও কাফফারা ওয়াজিব হবে।

কাফেরদের হাতে বন্দি মুসলমান যে কাফেরদের অনুবর্তী- এর সমর্থক বিষয় হলো, কাফেররা যদি মুকীম হয়, তাহলে বন্দিরাও মুকীম হয়। কাফেররা যদি মুসাফির হয়, তাহলে বন্দিরাও মুসাফির হয়। এর দ্বারা বুঝা যায়, কাফেরের হাতে বন্দি মুসলমানরা কাফেরদের অনুবর্তী। তাই ইমাম আবূ হানীফা (র.) মনে করেন বন্দিদের ইসমত বা সংরক্ষণ গুণ বিদ্যমান নেই। যেমন কাফেরদের নেই। তিনি বলেন, এসব বন্দি মূলত ঐ সব মুসলমানের ন্যায়, যারা মুসলমান হওয়ার পর দারুল হরবে অবস্থান করে। দারুল ইসলামে হিজরত করে আসতে পারে না।

https://e-ilm.weebly.com/

فَصْلٌ : قَالَ وَإِذَا دَخَلَ الْحَرْبِيُّ إِلَيْنَا مُسْتَأْمِنًا لَمْ يُمَكَّنْ أَنْ يُقِيْمَ فِيْ دَارِنَا سَنَةً وَيَقُوْلُ لَهُ الْإِمَامُ : اِنْ اَقَمْتَ تَمَامَ السَّنَةِ وَضَعْتُ عَلَيْكَ الْجِزْيَةَ وَالْاَصْلُ اَنَّ الْحَرْبِيَّ لَا يُمَكَّنُ مِنْ اِقَامَةٍ دَائِمَةٍ فِيْ دَارِنَا اِلَّا بِالْاِسْتِرْقَاقِ اَوْ الْجِزْيَةِ؛ لِاَنَّهُ يَصِيْرُ عَيْنًا لَهُمْ وَعَوْنًا عَلَيْنَا فَتَلْتَحِقُ الْمَضَرَّةُ بِالْمُسْلِمِيْنَ، وَيُمَكَّنُ مِنَ الْاِقَامَةِ الْيَسِيْرَةِ؛ لِاَنَّ فِيْ مَنْعِهَا قَطْعَ الْمِيْرَةِ وَالْجَلَبِ وَسَدَّ بَابِ التِّجَارَةِ، فَفَصَّلْنَا بَيْنَهُمَا بِسَنَةٍ؛ لِاَنَّهَا مُدَّةٌ تَجِبُ فِيْهَا الْجِزْيَةُ فَتَكُوْنُ الْاِقَامَةُ لِمَصْلَحَةِ الْجِزْيَةِ، ثُمَّ اِنْ رَجَعَ بَعْدَ مَقَالَةِ الْاِمَامِ قَبْلَ تَمَامِ السَّنَةِ اِلٰى وَطَنِهٖ فَلَا سَبِيْلَ عَلَيْهِ، وَاِذَا مَكَثَ سَنَةً فَهُوَ ذِمِّيٌّ؛ لِاَنَّهُ لَمَّا اَقَامَ سَنَةً بَعْدَ تَقَدُّمِ الْاِمَامِ اِلَيْهِ صَارَ مُلْتَزِمًا لِلْجِزْيَةِ فَيَصِيْرُ ذِمِّيًّا، وَلِلْاِمَامِ اَنْ يُوَقِّتَ فِيْ ذٰلِكَ مَا دُوْنَ السَّنَةِ كَالشَّهْرِ وَالشَّهْرَيْنِ وَاِذَا اَقَامَهَا بَعْدَ مَقَالِ الْاِمَامِ يَصِيْرُ ذِمِّيًّا لِمَا قُلْنَا ثُمَّ لَا يُتْرَكُ اَنْ يَرْجِعَ اِلٰى دَارِ الْحَرْبِ؛ لِاَنَّ عَقْدَ الذِّمَّةِ لَا يُنْقَضُ، كَيْفَ وَاَنَّ فِيْهِ قَطْعَ الْجِزْيَةِ وَجَعْلَ وَلَدِهٖ حَرْبًا عَلَيْنَا وَفِيْهِ مَضَرَّةٌ بِالْمُسْلِمِيْنَ .

অনুবাদ : অনুচ্ছেদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, হরবী যদি নিরাপত্তা গ্রহণপূর্বক আমাদের দেশে আগমন করে তাহলে পূর্ণ একবছর তাকে থাকতে দেওয়া হবে না; বরং শাসক তাকে বলে দিবেন যে, যদি তুমি পূর্ণবছর অবস্থান কর তাহলে তোমার উপর জিজিয়া আরোপ করব। এ ক্ষেত্রে মূলনীতি এই যে, দাসত্ব কিংবা জিজিয়া ছাড়া কোনো হরবীকে স্থায়ী অবস্থানের অবকাশ প্রদান করা হবে না। কেননা তখন সে আমাদের বিরুদ্ধে তাদের গুপ্তচর ও সাহায্যকারী হয়ে যাবে, ফলে মুসলমানদের ক্ষতি সাধিত হবে।

তবে স্বল্প সময় অবস্থানের অনুমতি প্রদান করা যেতে পারে। কেননা তাও নিষেধ করা হলে খাদ্য সরবরাহ, আমদানি-রপ্তানি ও ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যাবে। সুতরাং উভয় অবস্থার মাঝে একবছর দ্বারা আমরা পার্থক্য নির্ধারণ করেছি। কেননা এ সময়কালে জিজিয়া সাব্যস্ত হয়। সুতরাং তখন তার অবস্থান হবে জিজিয়ার স্বার্থে। অতঃপর শাসকের বক্তব্যের পরে যদি সে বছর পূর্তির পূর্বেই স্বদেশে চলে যায়, তাহলে তাকে বাধা দেওয়ার অবকাশ নেই। আর যদি একবছর অবস্থান করে তাহলে জিম্মি হয়ে যাবে। কেননা ইমামের ঘোষণার পর একবছর অবস্থানের মাধ্যমে সে জিজিয়ার দায় গ্রহণ করেছে। তাই সে জিম্মি হয়ে যাবে। অবশ্য শাসকের অধিকার রয়েছে এক্ষেত্রে একবছরের কম সময় নির্ধারণ করার। যেমন- এক মাস দুই মাস।

ইমামের ঘোষণা দেওয়ার পর যদি (একবছর) অবস্থান করে তবে আমাদের বর্ণিত কারণে সে জিম্মি হয়ে যাবে। এরপর আর দারুল হরবে ফিরে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে না। কেননা জিম্মি চুক্তি ভঙ্গ করা যায় না। কিভাবে তাকে যাওয়ার জন্য ছেড়ে দেওয়া যাবে? অথচ এর জিজিয়া বন্ধ হবে এবং (সেও) তার সন্তান আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী হবে। আর তাতে মুসলমানদের ক্ষতি রয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিউক্ত ভাষ্যের সারকথা হলো, কোনো হরবী ব্যক্তি দারুল ইসলামে বাস করার দুটি অবস্থা– ১. স্থায়ীভাবে বাস করা। ২. একেবারেই বসবাস করতে না পারা। প্রথম সুরতে সমস্যা হলো, কোনো হরবীকে দারুল ইসলামে স্থায়ীভাবে বাস করার সুযোগ দেওয়া হলে সে মুসলমানদের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তি করে। কাফেরদের পক্ষে গোপনে কাজ করবে। আর দ্বিতীয় সুরতে সমস্যা হলো, কাফেরদেরকে একেবারেই দারুল ইসলামে আসার বা থাকার সুযোগ না দেওয়া হলে আমদানি-রপ্তানী, ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যাবে। তাই ফকীহগণ এ দুই অবস্থার মাঝে একটি তৃতীয় অবস্থা নির্ধারণ করেছেন, যাতে উভয় উপরে উল্লিখিত উভয় সমস্যা থেকে বাঁচা সম্ভব হয়। তৃতীয় অবস্থাটি হলো এই যে, কাফেররা দারুল ইসলামে আসতে পারবে এবং বাস করতে পারবে, তবে স্থায়ীভাবে নয়; বরং সাময়িকভাবে।

সাময়িক অবস্থানের মেয়াদ হলো একবছরের কম। এ মেয়াদ এজন্য নির্ধারণ করা হয়েছে যে, একবছর অবস্থানের ফলে জিজিয়া ওয়াজিব হয়ে থাকে, তাই দারুল ইসলামে আগমনকারী হরবীকে মুসলিম শাসক অবস্থানের মেয়াদ নির্ধারণ করে দিবেন। প্রয়োজন অনুসারে যেমন এক মাস, দু-মাস, পাঁচ মাস, ছয় মাস। পূর্ণ একবছর নয়; বরং ইমাম তাকে বলে দিবেন যদি তুমি পূর্ণ একবছর দারুল ইসলামে অবস্থান কর, তাহলে তোমার উপর জিজিয়া আরোপ করা হবে। ইমামের এ ঘোষণার পর যদি আগত হরবী দারুল হরবে চলে যেতে চায়, তাহলে সে চলে যেতে পারবে। তাকে বাধা দেওয়া যাবে না, আর যদি সে পূর্ণবছর দারুল ইসলামে অবস্থান করে তাহলে সে জিম্মি হয়ে যাবে এবং তাকে জিজিয়া পরিশোধ করতে হবে এবং সে আর দারুল হরবে যেতে পারবে না। কেননা জিম্মি হওয়ার পর পুনরায় দারুল হরবে চলে গেলে মুসলমানদের আর্থিক ক্ষতি হয় অর্থাৎ জিজিয়া কমে যায়। অতএব, জিম্মি হওয়ার পর তাকে জিজিয়া প্রদানের মাধ্যমে চিরকাল দারুল ইসলামে বাস করতে হবে। কেননা কোনো কাফের দারুল ইসলামে স্থায়ীভাবে বাস করার দুটিই সুরত। এক. জিজিয়া দিয়ে। দুই. গোলাম হয়ে।

وَإِذَا أَقَامَهَا بَعْدَ مَقَالَةِ الْإِمَامِ يَصِيْرُ الخ : উপরিউক্ত ইবারতের সারসংক্ষেপ হলো, কোনো হরবীকে মুসলিম শাসক বলে দিল, যদি তুমি এক বছরকাল দারুল ইসলামে অবস্থান কর, তাহলে তোমার উপরে জিজিয়া আরোপ করা হবে। ইমামের পক্ষ থেকে এ অবগতি দেওয়ার পর হরবী ব্যক্তি যদি একবছর অবস্থান করে, তাহলে সে জিম্মি হয়ে যাবে। কেননা সে এক বছর অবস্থানের মাধ্যমে জিজিয়া প্রদানের দায় গ্রহণ করেছে।

হরবী ব্যক্তি এভাবে জিম্মি হওয়ার পর আর তাকে দারুল হরবে ফিরে যেতে দেওয়া হবে না। কারণ জিম্মিচুক্তি ভঙ্গ করা যায় না। কেননা জিম্মিচুক্তি হলো ইসলামের স্থলবর্তী বিষয়। তাই ইসলাম যেমন ভঙ্গ করা যায় না, তেমনি তার স্থলবর্তী বিষয় জিম্মিচুক্তিও ভঙ্গ করা যাবে না। তাছাড়া জিম্মিচুক্তি ভঙ্গ করা হলে মুসলমানদের ক্ষতি হয় দুভাবে– এক. জিজিয়া কমে যায়। দুই. উক্ত হরবী ও তার সন্তানদেরকে মুসলমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সুযোগ দেওয়া হয়।

https://e-ilm.weebly.com/

فَإِنْ دَخَلَ الْحَرْبِيُّ دَارَنَا بِأَمَانٍ وَاشْتَرٰى أَرْضَ خَرَاجٍ فَإِذَا وُضِعَ عَلَيْهِ الْخَرَاجُ فَهُوَ ذِمِّيٌّ؛ لِأَنَّ خَرَاجَ الْأَرْضِ بِمَنْزِلَةِ خَرَاجِ الرَّأْسِ، وَإِذَا الْتَزَمَهُ صَارَ مُلْتَزِمَ الْمُقَامِ فِيْ دَارِنَا، أَمَّا بِمُجَرَّدِ الشِّرَاءِ لَا يَصِيْرُ ذِمِّيًّا؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَشْتَرِيْهَا لِلتِّجَارَةِ، وَإِذَا لَزِمَهُ خَرَاجُ الْأَرْضِ فَبَعْدَ ذٰلِكَ تَلْزَمُهُ. الْجِزْيَةُ لِسَنَةٍ مُسْتَقْبَلَةٍ؛ لِأَنَّهُ يَصِيْرُ ذِمِّيًّا بِلُزُوْمِ الْخَرَاجِ فَتُعْتَبَرُ الْمُدَّةُ مِنْ وَقْتِ وُجُوْبِهِ . وَقَوْلُهُ فِي الْكِتَابِ فَإِذَا وُضِعَ عَلَيْهِ الْخَرَاجُ فَهُوَ ذِمِّيٌّ تَصْرِيْحٌ بِشَرْطِ الْوَضْعِ فَيَتَخَرَّجُ عَلَيْهِ أَحْكَامٌ جَمَّةٌ فَلَا يُغْفَلُ عَنْهُ ـ

অনুবাদ : হরবী যদি নিরাপত্তা নিয়ে আমাদের দেশে প্রবেশ করে এবং কোনো খারাজী ভূমি ক্রয় করে আর তার উপর খারাজ ধার্য করা হয় তাহলে সে জিম্মি হয়ে যাবে। কেননা ভূমির ট্যাক্স ব্যক্তির ট্যাক্সের সমপর্যায়ের। আর যখন সে উক্ত দায় গ্রহণ করল তখন যেন আমাদের দারুল ইসলামে বসবাসের দায় গ্রহণ করল। কিন্তু শুধু ভূমি ক্রয় দ্বারা জিম্মি হবে না। কেননা সে ব্যবসার উদ্দেশ্যে ক্রয় করতে পারে। যখন তার ভূমির খারাজ ধার্য হয়ে যাবে তখন পরবর্তীতে আগামী বছরের জন্য তার উপর জিজিয়া আবশ্যক হবে। কেননা খারাজ ধার্য হওয়ার কারণে সে জিম্মি হয়ে গেছে। সুতরাং তা আরোপিত হওয়ার সময় থেকে মেয়াদ বিবেচনা করা হবে।

আর কিতাবে যে বলা হয়েছে যদি তার উপর খারাজ নির্ধারণ করা হয় তাহলে সে জিম্মি হয়ে যাবে এ হলো খারাজ নির্ধারণের সুস্পষ্ট শর্ত এবং একে কেন্দ্র করে অনেক হুকুম বের হবে। সুতরাং এটি যেন উপেক্ষা করা না হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিউক্ত ইবারতের সারসংক্ষেপ এই যে, যদি কোনো হরবী লোক নিরাপত্তা নিয়ে দারুল ইসলামে প্রবেশের পরে খারাজী ভূমি ক্রয় করে এবং তার উপর খারাজ আরোপিত হয়, তাহলে এর দ্বারা সে জিম্মি হয়ে যাবে এবং পরবর্তী বৎসর হতে তার উপর জিজিয়াও আরোপিত হবে। কারণ খারাজ এবং জিজিয়া উভয়টি দারুল ইসলামে বসবাস করার সাথে সম্পর্কিত বিষয়। অতএব খারাজ ধার্য হলেই হরবী জিম্মি হয়ে যাবে এবং পরবর্তীতে তাকে জিজিয়াও পরিশোধ করতে হবে। যে সময় থেকে তার উপর খারাজ ওয়াজিব হয়েছে সে সময় থেকে তার বসবাসের মেয়াদ বিবেচনা করা হবে। অর্থাৎ সে সময় থেকে এক বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পর তার জিজিয়া পরিশোধ করতে হবে।

কোনো হরবী দারুল ইসলামে ভূমি কিনলেই জিম্মি হবে না। কারণ সে তা ব্যবসার উদ্দেশ্যেও কিনতে পারে, বসবাসের উদ্দেশ্যে নয়। তবে কতিপয় আলেমের মতে শুধু ভূমি ক্রয় দ্বারাই হরবী জিম্মি হয়ে যাবে।

হরবীর উপর যখন খারাজ ধার্য করা হয় তখন সে জিম্মি হয়ে যায় এ কথাটি ইমাম মুহাম্মদ (র.) তাঁর জামেউস সাগীরে উল্লেখ করেছেন। এ কথাটি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, শুধু ভূমিক্রয় দ্বারা হরবী জিম্মি হয় না, বরং হরবী জিম্মি হওয়ার জন্য শর্ত হলো খারাজী ভূমি ক্রয় করার পর তার উপর খারাজ ধার্য হওয়া। গ্রন্থকার বলেন, এ শর্তটি উপেক্ষা করা ঠিক হবে না। কেননা এ শর্তের উপর ভিত্তি করে আরো অনেক হুকুম নির্গত হবে। যেমন, দারুল হরবে যেতে না দেওয়া, ভুলবশত হত্যার ক্ষেত্রে দিয়ত ওয়াজিব হওয়া। তার মাঝে ও মুসলমানের মাঝে কেসাস জারি হওয়া ইত্যাদি।

https://e-ilm.weebly.com/

وَاِذَا دَخَلَتْ حَرْبِيَّةٌ بِاَمَانٍ فَتَزَوَّجَتْ ذِمِّيًّا صَارَتْ ذِمِّيَّةً؛ لِاَنَّهَا الْتَزَمَتِ الْمُقَامَ تَبَعًا لِلزَّوْجِ وَاِذَا دَخَلَ حَرْبِيٌّ بِاَمَانٍ فَتَزَوَّجَ ذِمِّيَّةً لَمْ يَصِرْ ذِمِّيًّا؛ لِاَنَّهُ يُمْكِنُهُ اَنْ يُطَلِّقَهَا فَيَرْجِعُ اِلَى بَلَدِهِ فَلَمْ يَكُنْ مُلْتَزِمًا لِلْمُقَامِ . وَلَوْ اَنَّ حَرْبِيًّا دَخَلَ دَارَنَا بِاَمَانٍ ثُمَّ عَادَ اِلَى دَارِ الْحَرْبِ وَتَرَكَ وَدِيْعَةً عِنْدَ مُسْلِمٍ اَوْ ذِمِّيٍّ اَوْ دَيْنًا فِيْ ذِمَّتِهِمْ فَقَدْ صَارَ دَمُهُ مُبَاحًا بِالْعَوْدِ؛ لِاَنَّهُ اَبْطَلَ اَمَانَهُ وَمَا فِيْ دَارِ الْاِسْلَامِ مِنْ مَالِهِ عَلَى خَطَرٍ، فَاِنْ اُسِرَ اَوْ ظُهِرَ عَلَى الدَّارِ فَقُتِلَ سَقَطَتْ دُيُوْنُهُ وَصَارَتِ الْوَدِيْعَةُ فَيْئًا اَمَّا الْوَدِيْعَةُ فَلِاَنَّهَا فِيْ يَدِهِ تَقْدِيْرًا؛ لِاَنَّ يَدَ الْمُوْدَعِ كَيَدِهِ فَيَصِيْرُ فَيْئًا تَبَعًا لِنَفْسِهِ، وَاَمَّا الدَّيْنُ فَلِاَنَّ اِثْبَاتَ الْيَدِ عَلَيْهِ بِوَاسِطَةِ الْمُطَالَبَةِ وَقَدْ سَقَطَتْ، وَيَدُ مَنْ عَلَيْهِ اَسْبَقُ اِلَيْهِ مِنْ يَدِ الْعَامَّةِ فَيَخْتَصُّ بِهِ ـ

অনুবাদ : যদি কোনো হরবী নারী আমান নিয়ে প্রবেশ করার পর কোনো জিম্মিকে বিবাহ করে, তাহলে সেও জিম্মি হয়ে যাবে। কেননা স্বামীর অনুবর্তীরূপে সেও অবস্থানের দায় গ্রহণ করেছে। পক্ষান্তরে যদি কোনো হরবী পুরুষ নিরাপত্তা নিয়ে প্রবেশ করে এবং কোনো জিম্মি নারীকে বিবাহ করে তাহলে সে জিম্মি হবে না। কেননা তার পক্ষে তো তাকে তালাক দিয়ে দেশে ফিরে যাওয়া সম্ভব। সুতরাং সে অবস্থানের দায় গ্রহণকারী হয়নি।

কোনো হরবী যদি নিরাপত্তা নিয়ে আমাদের দারুল ইসলামে প্রবেশ করে অতঃপর দারুল হরবে ফিরে যায়, কিন্তু মুসলমান বা জিম্মির কাছে কোনো আমানত গচ্ছিত রেখে যায়। কিংবা তাদের কাছে কোনো ঋণ পাওনা রেখে যায় তাহলে সম্পর্কের এই রেশটুকু থাকা সত্ত্বেও ফিরে যাওয়ার কারণে তার খুন হালাল হয়ে যাবে। কেননা সে তার নিরাপত্তা বাতিল করেছে। আর দারুল ইসলামে বিদ্যমান তার সম্পদ ঝুলন্ত অবস্থায় থাকবে। যদি সে বন্দি হয় কিংবা দারুল হরব বিজিত হয় এবং সে নিহত হয় তাহলে তার প্রাপ্য ঋণগুলো রহিত হয়ে যাবে এবং গচ্ছিত আমানত গনিমতের মাল হয়ে যাবে। কেননা গচ্ছিত আমানত গুণগতভাবে তারই হাতে রয়েছে। এ কারণে যে, আমানত রক্ষাকারীর হাত তার নিজের হাতের মতোই। সুতরাং তার আপন দেহসত্তার অনুগামী হয়ে ঐ মালও গনিমতরূপে গণ্য হবে।

আর ঋণের ক্ষেত্রে কারণ এই যে, ঋণের উপর তার হস্ত নিয়ন্ত্রণের সাব্যস্তি তাগাদা প্রদানের মাধ্যমে হয়। অথচ তাগাদার অধিকার রহিত হয়ে গেছে। আর যার হাতে ঋণ রয়েছে তার নিয়ন্ত্রণ সাধারণ মুসলমানের নিয়ন্ত্রণ থেকে অগ্রবর্তী হয়েছে। সুতরাং সেটা তার সাথেই বিশিষ্ট হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কোনো হরবী মহিলা নিরাপত্তা গ্রহণ করে দারুল হরব হতে দারুল ইসলামে আগমন করার পর যদি সে কোনো জিম্মি পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। তাহলে সে মহিলা আহনাফের মতে জিম্মি হয়ে যাবে।

অন্য তিন ইমামের মতে উক্ত মহিলা জিম্মি হবে না। আহনাফের যুক্তি হলো, মহিলা যখন জিম্মিকে বিবাহ করল, তখন সে স্বামীর অনুগামী হিসাবে দারুল ইসলামে বসবাস করার দায় গ্রহণ করল। আর যে কাফের দারুল ইসলামে

https://e-ilm.weebly.com/

বসবাস করার দায় গ্রহণ করে, সেই জিম্মি। অতএব, উক্ত মহিলাও জিম্মি হিসাবে পরিগণিত হবে। পক্ষান্তরে ইমামের মতে মহিলা জিম্মি হবে না। তাদের যুক্তি হলো, জিম্মি স্বামীর অধিকার আছে, ইচ্ছা হলে সে এই হরবী স্ত্রীর সাথে থাকতে পারে, ইচ্ছা হলে তাকে বিচ্ছেদও করে দিতে পারে। এ কারণে উক্ত মহিলার অবস্থান করাটা দারুল ইসলামে নিশ্চিত নয়। তাই সে জিম্মি নয়।

যদি কোনো হরবী পুরুষ নিরাপত্তা গ্রহণ করে দারুল ইসলামে প্রবেশ করার পর কোনো জিম্মি মহিলাকে বিবাহ করে, তাহলে সে কারো মতেই জিম্মি হবে না। কেননা এ পুরুষের অধিকার আছে সে যে কোনো সময় স্ত্রীকে তালাক দিয়ে স্বদেশে ফিরে যেতে পারে। তাই সে এদেশে অবস্থানের দায় গ্রহণ করেছে বলা যায় না। সুতরাং সে জিম্মি হবে না।

وَلَوْ اَنَّ حَرْبِيًّا دَخَلَ دَارَنَا بِاَمَانٍ : কোনো হরবী নিরাপত্তা নিয়ে দারুল ইসলামে এসে কিছু দিন পর পুনরায় দারুল হরবে ফিরে গেল। কিন্তু সে দারুল ইসলামের মুসলমানদের কাছে কিংবা জিম্মিদের কাছে আমানত রেখে গেছে অথবা তাদেরকে ঋণ দিয়ে গেছে। এমতাবস্থায় হুকুম হলো হরবী ব্যক্তি দারুল হরবে ফিরে যাওয়ার কারণে তার আমান বাতিল হয়ে যাবে। আর সে যে দারুল ইসলামে মুসলমনাদের কাছে বা জিম্মিদের কাছে আমানত ও ঋণ রেখে গেছে, তা ঝুলন্ত অবস্থায় থাকবে। অর্থাৎ সে যদি পুনরায় এসে আমানত ও ঋণ উসুল করে নিতে পারে, তাহলে ভালো। আর যদি সে মুসলমানের হাতে বন্দি হয় কিংবা দারুল হরব বিজিত হয় এবং সে নিহত হয়, তাহলে তার আমানত এবং ঋণ গনিমতে পরিণত হবে।

আমানত গনিমত হয়ে যাওয়ার কারণ হলো, আমানত রক্ষাকারীর হাত, আমানতদাতার হাতের মতোই। সে হিসাবে আমানতের মাল হুকমিভাবে হরবীর হাতেই আছে। অতএব হরবীর সত্তার অনুগামী হিসাবে তার মালটুকুও গনিমতে পরিণত হবে। আর ঋণ গনিমতে পরিণত হওয়ার কারণ হলো, যদি ঋণদাতা তাগদা করে ঋণ উসুল করে নিতে পারে, তাহলে ঋণের অর্থের উপর তার নিয়ন্ত্রণ সাব্যস্ত হয়। কিন্তু হরবী বন্দি বা নিহত হওয়ার ফলে আর তার তাগদা করার সুযোগ নেই। তাই উক্ত মাল গনিমত হিসাবে সকল মুসলমানের হক হয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু যেহেতু উক্ত মালের উপর ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির দখল পূর্ব থেকেই সাব্যস্ত হয়ে আছে, সেহেতু উক্ত মাল তার হাতেই থেকে যাবে। অন্য মুসলমান সেই মালের হকদার হবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

وَاِنْ قُتِلَ وَلَمْ يُظْهَرْ عَلَى الدَّارِ فَالْقَرْضُ الْوَدِيْعَةُ لِوَرَثَتِهِ وَكَذٰلِكَ اِذَا مَاتَ: لِاَنَّ نَفْسَهٗ لَمْ تَصِرْ مَغْنُوْمَةً كَذٰلِكَ مَالُهٗ، وَهٰذَا لِاَنَّ حُكْمَ الْاَمَانِ بَاقٍ فِيْ مَالِهٖ فَيُرَدُّ عَلَيْهِ اَوْ عَلٰى وَرَثَتِهٖ مِنْ بَعْدِهٖ قَالَ وَمَا اَوْجَفَ الْمُسْلِمُوْنَ عَلَيْهِ مِنْ اَمْوَالِ اَهْلِ الْحَرْبِ بِغَيْرِ قِتَالٍ يُصْرَفُ فِيْ مَصَالِحِ الْمُسْلِمِيْنَ كَمَا يُصْرَفُ الْخَرَاجُ قَالُوْا : هُوَ مِثْلُ الْاَرَاضِي الَّتِي اَجْلَوْا اَهْلَهَا عَنْهَا وَالْجِزْيَةِ وَلَا خُمُسَ فِيْ ذٰلِكَ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : فِيْهِمَا الْخُمُسُ اِعْتِبَارًا بِالْغَنِيْمَةِ . وَلَنَا مَا رُوِيَ "اَنَّهٗ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اَخَذَ الْجِزْيَةَ" وَكَذَا عُمَرُ وَمُعَاذٌ، وَوُضِعَ فِيْ بَيْتِ الْمَالِ وَلَمْ يُخَمَّسْ وَلِاَنَّهٗ مَالٌ مَاْخُوْذٌ بِقُوَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ غَيْرِ قِتَالٍ، بِخِلَافِ الْغَنِيْمَةِ؛ لِاَنَّهٗ مَمْلُوْكٌ بِمُبَاشَرَةِ الْغَانِمِيْنَ وَبِقُوَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ فَاسْتَحَقَّ الْخُمُسَ بِمَعْنًى وَاسْتَحَقَّهُ الْغَانِمُوْنَ بِمَعْنًى، وَفِيْ هٰذَا السَّبَبِ وَاحِدٌ، وَهُوَ مَا ذَكَرْنَاهُ فَلَا مَعْنَى لِاِيْجَابِ الْخُمُسِ ـ

অনুবাদ : আর যদি সে নিহত হয় কিন্তু দারুল হরব বিজিত না হয় তাহলে ঋণ ও গচ্ছিত আমানত তার উত্তরাধিকারীরা পাবে। তদ্রূপ স্বাভাবিক মৃত্যু হলেও একই হুকুম হবে। কেননা তার দেহসত্তা গনিমত হয়নি। সুতরাং তার সম্পদও গনিমত হবে না। এ কারণে যে, তার মালের ক্ষেত্রে প্রদত্ত নিরাপত্তা এখনো বহাল রয়েছে। সুতরাং ঐ মাল তাকে কিংবা তার পরবর্তীতে তার উত্তরাধিকারীদেরকে অবশ্যই ফেরত দিতে হবে।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, **আর মুসলমানগণ যদি যুদ্ধ ছাড়া ধাওয়া করে হরবীদের মাল কব্জা করে নেয়, তাহলে সেগুলো মুসলমানদের জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা হবে। যেমন খারাজের অর্থ জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা হয়।** মাশায়েখগণ বলেছেন যে, এটা অমুসলমানদের উৎখাতপূর্বক প্রাপ্তভূমি এবং জিজিয়ার মালের মতো হলো। আর এ থেকে পঞ্চমাংশ নেওয়া হবে না। ইমাম শাফেয়ী (র.) গনিমতের মালের উপর কিয়াস করে বলেন, এতে পঞ্চমাংশ ধার্য হবে।

আমাদের দলিল হলো বর্ণিত এ রেওয়ায়েত যে, নবী করীম ﷺ (হাজর অঞ্চলের অগ্নিপূজকদের উপর) এবং হযরত ওমর (রা.) (ইরাকীদের উপর) এবং হযরত মু'আয (রা.) (ইয়ামানীদের উপর) জিযিয়া নির্ধারণ করেছেন এবং পঞ্চমাংশ পৃথক না করে তা বাইতুলমালে জমা করেছেন।

তাছাড়াও এ কারণে যে, এগুলো হলো মুসলমানদের শক্তি বলে বিনাযুদ্ধে অর্জিত মাল। পক্ষান্তরে গনিমতের মাল হলো মুজাহিদদের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ ও মুসলমানদের শক্তি-বলে অর্জিত মাল। সুতরাং এ কারণে (অর্থাৎ মুসলমানদের ভীতির কারণে) পঞ্চমাংশের হক সাব্যস্ত হবে এবং আরেকটি কারণে (অর্থাৎ মুজাহিদদের প্রত্যক্ষ লড়াইয়ের কারণে) মুজাহিদদের হক সাব্যস্ত হবে। পক্ষান্তরে এ (আলোচ্য) মাসআলায় কারণ হলো একটি যা আমরা উল্লেখ করেছি, সুতরাং পঞ্চমাংশ ধার্য করার কোনো যৌক্তিকতা নেই।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যে হরবী আমান নিয়ে দারুল ইসলামে এসে কোনো মুসলমান বা জিম্মির কাছে আমানত কিংবা ঋণ রেখে পুনরায় দারুল হরবে ফিরে গেছে। সে যদি স্বাভাবিকভাবে মারা যায় অথবা নিহত হয়, কিন্তু দেশ বিজিত না হয়, তাহলে তার আমানত ও ঋণ গনিমত হবে না। কারণ পূর্বের মাসআলায় আলোচনা করা হয়েছে যে, আমানত, ঋণ এগুলো হরবীর দেহসত্তার অনুগামী। অতএব, আলোচ্য মাসআলায় যেহেতু হরবীর দেহসত্তা গনিমত হয়নি, সেহেতু তার সম্পদও গনিমত হবে না। সুতরাং সে সম্পদ হরবীর জীবদ্দশায় তার হাতে এবং তার মৃত্যুর পরে তার ওয়ারিশদের হাতে পৌঁছে দিতে হবে।

وَمَا أَوْجَفَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ مِنْ أَمْوَالِ الخ : মুসলমানগণ শুধু ভয়ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে কোনোরূপ যুদ্ধবিগ্রহ ছাড়াই কাফেরদের কাছ থেকে যে সম্পদ লাভ করে, তাকে মালে ফাই বলে। আর যুদ্ধবিগ্রহের মাধ্যমে যে সম্পদ লাভ করে, তাকে মালে গনিমত বলে। মালে গনিমতের হুকুম ইতঃপূর্বে সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। বক্ষ্যমাণ ইবারতে মালে ফাইয়ের হুকুম বর্ণিত হয়েছে।

মালে ফাই হতে খুমুস পৃথক করা হবে কিনা, এ নিয়ে ইমামগণের পরস্পরে মতভেদ রয়েছে।

আহনাফ ও মালেকীদের মতামত হলো, মালেফাই হতে খুমুস পৃথক করা হবে না। বরং মালেফাই পুরোটাই মুসলমানদের কল্যাণকর কাজে ব্যয়িত হবে। যেমন- রাস্তাঘাট নির্মাণ, মেরামত, পুল নির্মাণ, সরাইখানা নির্মাণ, সীমান্ত ব্যবস্থা দৃঢ় করা, সীমান্ত রক্ষীদের বেতন দেওয়া, শিক্ষকদের বেতন দেওয়া, কাজি ও হাকিমদের বেতন দেওয়া ইত্যাদি। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) হতে দুটি বর্ণনা রয়েছে। একটি বর্ণনা মতে খুমুস পৃথক করা হবে। তবে নির্ভরযোগ্য মত হলো, খুমুস পৃথক করা হবে না। অতএব, জমহুর আলেমের মতে মালেফাই হতে খুমুস পৃথক করা হবে না।

পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, মালে ফাই হতে খুমুস পৃথক করা হবে এবং এই খুমুস বণ্টন করা হবে ঐ লোকদের মাঝে, যাদের মাঝে গনিমতের খুমুস বণ্টন করা হয়। অবশিষ্ট চার পঞ্চমাংশ মুসলিম শাসক নিজের বিবেচনা মোতাবেক মুসলমানদের বিভিন্ন কল্যাণজনক কাজে ব্যয় করেন। এ ক্ষেত্রে ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর দলিল হলো কিয়াস। তিনি মালে ফাইকে মালে গনিমতের উপর কিয়াস কারে বলেন, মালে গনিমত থেকে যেমন খুমুস পৃথক করা হয়, তেমনি মালে ফাই থেকেও খুমুস পৃথক করা হবে। জিজিয়া খারাজ ইত্যাদি থেকেও খুমুস পৃথক করা হবে।

জমহুর আলেমের দলিল হলো- ১. হযরত নবী করীম ﷺ হযরত ওমর, হযরত মুআয (রা.) বিভিন্ন জাতির কাছে থেকে জিজিয়া উসুল করে এনে তা বাইতুলমালে জমা করেছেন। কিন্তু তা থেকে খুমুস পৃথক করেননি। আর জিজিয়া, খারাজ, মালে ফাইও কাফেরদের উৎখাত পূর্বক প্রাপ্তভূমি সবগুলোর একই হুকুম। অতএব, জিজিয়া খারাজ ইত্যাদি থেকে যেমন খুমুস পৃথক করা হয় না তেমনি মালে ফাই থেকেও খুমুস পৃথক করা হবে না।

২. মালে গনিমত অর্জনের পিছনে দুটি কারণ থাকে। একটি কারণ হলো ভয়ভীতি প্রদর্শন। অপরটি হলো সরাসরি যুদ্ধকরণ। প্রথম কারণটির দ্বারা খুমুস ওয়াজিব হয়। আর দ্বিতীয় কারণটি দ্বারা মুজাহিদদের হক সাব্যস্ত হয়। পক্ষান্তরে মালে ফাই অর্জনের পিছনে কারণ মাত্র একটি। তা হলো ভয়ভীতি প্রদর্শন। মুজাহিদগণের যুদ্ধবিগ্রহ এখানে প্রয়োজন হয় না, তাই তাদের হকও সাব্যস্ত হয়। অতএব, যখন মালটি দু-ভাগে বিভক্ত হচ্ছে না, তখন পুরো মালটিই সাধারণভাবে সমস্ত মুসলমানদের জন্য থেকে যাবে। এর থেকে খুমুস পৃথক করার কোনো যৌক্তিকতা নেই। যদি মালটিতে মুজাহিদদের হক সাব্যস্ত হতো, তাহলে তা থেকে সাধারণ মুসলমানের খুমুস পৃথক করে নেওয়ার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু মালে ফাইয়ের মধ্যে তা হয়নি। অতএব, মালে ফাই সম্পূর্ণটুকু মুসলমানের জন্য থেকে যাবে। মুসলিম শাসক সেটা নিজ বিবেচনা অনুযায়ী মুসলমানদের বিভিন্ন কল্যাণকর কাজে ব্যয় করবেন।

https://e-ilm.weebly.com/

وَاِذَا دَخَلَ الْحَرْبِيُّ دَارَنَا بِاَمَانٍ وَلَهُ امْرَاَةٌ فِيْ دَارِ الْحَرْبِ وَاَوْلَادٌ صِغَارٌ وَكِبَارٌ وَمَالٌ اَوْدَعَ بَعْضَهُ ذِمِّيًا وَبَعْضَهُ حَرْبِيًّا وَبَعْضَهُ مُسْلِمًا فَاَسْلَمَ هَاهُنَا ثُمَّ ظُهِرَ عَلَى الدَّارِ فَذٰلِكَ كُلُّهُ فَيْءٌ اَمَّا الْمَرْاَةُ وَاَوْلَادُهُ الْكِبَارُ فَظَاهِرٌ؛ لِاَنَّهُمْ حَرْبِيُّوْنَ كِبَارٌ وَلَيْسُوْا بِاَتْبَاعٍ، وَكَذٰلِكَ مَا فِيْ بَطْنِهَا لَوْ كَانَتْ حَامِلًا لِمَا قُلْنَا مِنْ قَبْلُ . وَاَمَّا اَوْلَادُهُ الصِّغَارُ فَلِاَنَّ الصَّغِيْرَ اِنَّمَا يَصِيْرُ مُسْلِمًا تَبَعًا لِاِسْلَامِ اَبِيْهِ اِذَا كَانَ فِيْ يَدِهٖ وَتَحْتَ وِلَايَتِهٖ، وَمَعَ تَبَايُنِ الدَّارَيْنِ لَا يَتَحَقَّقُ ذٰلِكَ، وَكَذَا اَمْوَالُهُ لَا تَصِيْرُ مُحْرَزَةً بِاِحْرَازِهٖ نَفْسَهُ لِاِخْتِلَافِ الدَّارَيْنِ فَبَقِيَ الْكُلُّ فَيْئًا وَغَنِيْمَةً ـ

অনুবাদ : হরবী যদি নিরাপত্তা গ্রহণ করে আমাদের দারুল ইসলামে আসে এমন অবস্থায় যে, দারুল হরবে তার স্ত্রী, অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তান ও প্রাপ্তবয়স্ক সন্তান রয়েছে। আর সম্পদের অংশবিশেষ কোনো জিম্মির কাছে, অংশবিশেষ কোনো হরবীর কাছে এবং অংশবিশেষ কোনো মুসলমানের কাছে আমানত হিসাবে গচ্ছিত রয়েছে। এ অবস্থায় সে এখানে ইসলাম গ্রহণ করল, অতঃপর দারুল হরব বিজিত হলো তাহলে ঐ সব কিছু গনিমত হয়ে যাবে। স্ত্রী ও প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের বিষয়টি তো সুস্পষ্ট। কেননা তারা প্রাপ্তবয়স্ক হরবী। তার অনুবর্তী নয়। তদ্রূপ স্ত্রী গর্ভবতী হলে গর্ভস্থ সন্তানও গনিমত হবে। এর কারণ আমরা পূর্বে বলেছি (যে, সেটা স্ত্রীলোকের অংশবিশেষ।)

আর অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের ক্ষেত্রে কারণ এই যে, অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তান পিতার ইসলামের কারণে তার অনুবর্তীরূপ মুসলমান গণ্য হবে। যদি তার নিয়ন্ত্রণে ও অভিভাবকত্বে থাকে। আর দুই দেশের ভিন্নতার অবস্থায় অভিভাবকত্ব সাব্যস্ত হবে না। তদ্রূপ দুই দেশের ভিন্নতার কারণে তার দেহসত্তার নিরাপত্তা লাভের সুবাদে তার সম্পদ নিরাপত্তা লাভ করবে না। সুতরাং সবকিছুই গনিমতের মাল হিসাবে থেকে যাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কোনো হরবীর স্ত্রী, প্রাপ্তবয়স্ক সন্তান, অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তান, ধনসম্পদ দারুল হরবে রেখে সে দারুল ইসলামে এসে ইসলাম গ্রহণ করল। এরপর দারুল হরব মুসলমানদের হাতে বিজিত হলো, এমতাবস্থায় তার স্ত্রী, সন্তান ও সম্পদ সবই গনিমতরূপে গণ্য হবে।

স্ত্রী ও প্রাপ্তবয়স্ক সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার কারণে তারা ইসলাম গ্রহণকারী স্বামী বা পিতার অনুগামী হবে না; বরং পৃথক স্বয়ং সম্পন্ন হরবী হিসাবে থাকবে এবং দারুল হরবে বিজিত হলে অন্যান্য হরবীদের মতোই তারা গনিমতে পরিণত হবে।

স্ত্রীর গর্ভে যদি সন্তান থাকে, তাহলে সে সন্তান ও মায়ের অনুগামী হিসাবে গনিমত হবে। কেননা গনিমত সম্পর্কিত অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, গর্ভবর্তী সন্তান মায়ের অংশ হওয়ার কারণে সেও স্বাধীন ও পরাধীন হওয়ার দিক থেকে মায়ের অনুগামী। মা স্বাধীন হলে গর্ভজাত সন্তান স্বাধীন। মা পরাধীন হলে গর্ভজাত সন্তানও পরাধীন।

দারুল ইসলামে এসে ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তির অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তান ও তার সম্পদসমূহ তার অনুবর্তীরূপে সংরক্ষিত হওয়া বা গনিমত না হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু দেশের ভিন্নতার কারণে নাবালেগ সন্তান ও সম্পদের উপর ব্যক্তির অভিভাবকত্ব বিদ্যমান না থাকায় সেগুলোও তার অনুবর্তী হবে না। বিধায় সবই গনিমত হিসাবে গণ্য হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَإِنْ أَسْلَمَ فِيْ دَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ جَاءَ فَظَهَرَ عَلَى الدَّارِ فَأَوْلَادُهُ الصِّغَارُ أَحْرَارٌ مُسْلِمُوْنَ تَبَعًا لِأَبِيْهِمْ؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوْا تَحْتَ وِلَايَتِهِ حِيْنَ أَسْلَمَ إِذْ الدَّارُ وَاحِدَةٌ وَمَا كَانَ مِنْ مَالٍ أَوْدَعَهُ مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيًا فَهُوَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ فِيْ يَدٍ مُحْتَرَمَةٍ وَيَدُهُ كَيَدِهِ وَمَا سِوَى ذٰلِكَ فَيْءٌ أَمَّا الْمَرْأَةُ وَأَوْلَادُهُ الْكِبَارُ فَلِمَا قُلْنَا . وَأَمَّا الْمَالُ الَّذِيْ فِيْ يَدِ الْحَرْبِيِّ؛ فَلِأَنَّهُ لَمْ يَصِرْ مَعْصُوْمًا؛ لِأَنَّ يَدَ الْحَرْبِيِّ لَيْسَتْ يَدًا مُحْتَرَمَةً ـ

অনুবাদ : যদি দারুল হরবে ইসলাম গ্রহণের পর দারুল ইসলামে চলে আসে অতঃপর দারুল হরব বিজিত হয় তাহলে তার অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানরা তাদের পিতার অনুগামীরূপে স্বাধীন মুসলমান গণ্য হবে। কেননা যখন সে ইসলাম গ্রহণ করে তখন দেশের অভিন্নতার কারণে তারা তার অভিভাবকত্বে ছিল।

আর কোনো মুসলমান বা জিম্মির কাছে যে মাল আমানত রেখেছিল তা তার হবে। কেননা তা একটি সম্মানযোগ্য কব্জায় ছিল। আর সেই কব্জা তারই কব্জার মতো। এছাড়া সবকিছু গনিমতের মাল হবে।

স্ত্রী ও প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের ক্ষেত্রে কারণ তাই, যা আমরা বর্ণনা করে এসেছি।

হরবীর হাতে রক্ষিত আমানতের ক্ষেত্রে কারণ এই যে, হরবীর কব্জা যেহেতু সম্মানযোগ্য নয়, সেহেতু তার হাতে রক্ষিত মাল নিরাপত্তা গুণসম্পন্ন হয়নি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আলোচ্য মাসআলাটি পূর্বের মাসআলার অনুরূপ। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, হরবী ব্যক্তি পূর্বের মাসআলায় ইসলাম গ্রহণ করেছিল দারুল ইসলামে এসে। এ মাসআলায় সে ইসলাম গ্রহণ করেছে দারুল হরবে থেকে। ফলে দেশ অভিন্ন হওয়ার কারণে তার অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের উপর তার অভিভাবকত্ব ছিল। তাই তারা তার অনুবর্তী হিসাবে মুসলমান হয়ে যাবে। দারুল হরব বিজিত হলেও তারা গনিমত হবে না।

কোনো মুসলমান বা জিম্মির হাতে যে অর্থ আমানত ছিল তাও তার মালিকানায় থাকবে। গনিমত হবে না। কারণ মুসলমান ও জিম্মি ব্যক্তির কব্জা সম্মানযোগ্য। এই কব্জায় রক্ষিত সম্পদ নিরাপদ থাকবে। আর আমানত রক্ষাকারীর হাত যেহেতু আমানতদাতা বা মূল মালিকের হাতের স্থলবর্তী, সে হিসাবে আমানতের সম্পদ মূল মালিকের হাতে আছে অতএব মুসলমান বা জিম্মির হাতের আমানত ইসলাম গ্রহণকারীর মালিকানায় বহাল থাকবে। পক্ষান্তরে কোনো হরবীর হাতে যে সম্পদ আমানত ছিল, তা গনিমত হয়ে যাবে। কেননা হরবীর হাত সম্মানযোগ্য নয়; বিধায় সে হাতে রক্ষিত সম্পদ নিরাপদ হবে না; বরং দারুল হরব বিজিত হলে তা গনিমতে পরিণত হবে, হরবীদের অন্যান্য সম্পদের মতো। স্ত্রী ও প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানরা পিতার অনুবর্তী না হওয়ার কারণে তারাও গনিমতরূপে গণ্য হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَاِذَا اَسْلَمَ الْحَرْبِيُّ فِيْ دَارِ الْحَرْبِ فَقَتَلَهُ مُسْلِمٌ عَمْدًا اَوْ خَطَأً وَلَهُ وَرَثَةٌ مُسْلِمُوْنَ هُنَاكَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ اِلَّا الْكَفَّارَةُ فِي الْخَطَاِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : تَجِبُ الدِّيَةُ فِي الْخَطَاِ وَالْقِصَاصُ فِي الْعَمْدِ؛ لِاَنَّهُ اَرَاقَ دَمًا مَعْصُوْمًا لِوُجُوْدِ الْعَاصِمِ وَهُوَ الْاِسْلَامُ لِكَوْنِهِ مُسْتَجْلِبًا لِلْكَرَامَةِ، وَهٰذَا؛ لِاَنَّ الْعِصْمَةَ اَصْلُهَا الْمُؤْثِمَةُ؛ لِحُصُوْلِ اَصْلِ الزَّجْرِ بِهَا وَهِيَ ثَابِتَةٌ اِجْمَاعًا، وَالْمُقَوِّمَةُ كَمَالٌ فِيْهِ لِكَمَالِ الْاِمْتِنَاعِ بِهِ فَيَكُوْنُ وَصْفًا فِيْهِ فَتَتَعَلَّقُ بِمَا عُلِّقَ بِهِ الْاَصْلُ . وَلَنَا قَوْلُهُ تَعَالٰى ﴿فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾ الْاٰيَةَ . جَعَلَ التَّحْرِيْرَ كُلَّ الْمُوجِبِ رُجُوْعًا اِلٰى حَرْفِ الْفَاءِ اَوْ اِلٰى كَوْنِهِ كُلَّ الْمَذْكُوْرِ فَيَنْتَفِيْ غَيْرُهُ، وَلِاَنَّ الْعِصْمَةَ الْمُؤْثِمَةَ بِالْاٰدَمِيَّةِ لِاَنَّ الْاٰدَمِيَّ خُلِقَ مُتَحَمِّلًا اَعْبَاءَ التَّكْلِيْفِ، وَالْقِيَامَ بِهَا بِحُرْمَةِ التَّعَرُّضِ، وَالْاَمْوَالُ تَابِعَةٌ لَهَا .

অনুবাদ : কোনো হরবী যদি দারুল হরবে ইসলাম গ্রহণ করে আর কোনো মুসলমান ইচ্ছাকৃতভাবে কিংবা অনিচ্ছাকৃতভাবে কাউকে হত্যা করে আর সেখানে তার মুসলিম উত্তরাধিকারী রয়েছে, তাহলে অনিচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে হত্যাকারীর উপর কাফফারা ছাড়া আর কোনো দায় আরোপ করা হবে না।

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, অনিচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে দিয়ত এবং ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে কেসাস ওয়াজিব হবে। কেননা সম্মান হাসিলকারী হিসাবে ইসলাম হলো (জান মাল) রক্ষাকারী। সুতরাং রক্ষাকারী বিদ্যমান থাকার কারণে সে একটি নিষ্পাপ নিরাপত্তা গুণসম্পন্ন প্রাণ হত্যা করেছে। আর তা এজন্য যে, নিরাপত্তাই হলো মূলত গুনাহগার হওয়ার কারণ। কেননা গুনাহের ভীতি দ্বারাই সতর্কতা অর্জিত হয়। আর তা এখানে সর্বসম্মতভাবে বিদ্যমান রয়েছে। পক্ষান্তরে মূল্য সাব্যস্তকারী গুণটি হচ্ছে মূল নিরাপত্তা গুণের পূর্ণতার পর্যায়। কেননা তাতে অপরাধ থেকে পূর্ণ নিবৃত্তি অর্জিত হয়। সুতরাং এটা হবে মূল নিরাপত্তা গুণের অতিরিক্ত একটি গুণ। তাই মূল নিরাপত্তা গুণ যার সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে (অর্থাৎ ইসলাম) পূর্ণতাগুণ সম্পন্ন নিরাপত্তাগুণও তার সাথে সাথে সম্পৃক্ত হবে।

আমাদের দলিল হলো, আল্লাহ তা'আলার বাণী অর্থাৎ যদি فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ (নিহত ব্যক্তি) তোমাদের শত্রু সম্প্রদায়ের হয় আর সে মুমিন হয় তাহলে একটি মুমিন দাস আজাদ করতে হবে।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা দাসমুক্ত করাকে অবশ্য সাব্যস্ত বিধানের সমগ্ররূপ সাব্যস্ত করেছেন। পরিণতি জ্ঞাপক অব্যয় فاء -এর দিকে লক্ষ্য করে অথবা এ দিকে লক্ষ্য করে যে, এটা হচ্ছে উল্লিখিত সমগ্র দণ্ড। সুতরাং অন্য সব নাকচ হয়ে গেল।

তাছাড়া এ কারণে যে, পাপ সাব্যস্তকারী নিরাপত্তা গুণ সাব্যস্ত হয় মানবত্ব গুণের কারণে। কেননা মানবকে সৃষ্টি করা হয়েছে শরিয়তের বিধান পালনের দায় বহনকারীরূপে। আর তা পালন করা সম্ভব তার উপর হস্তক্ষেপ করা হারাম হওয়ার মাধ্যমে। আর সম্পদ হচ্ছে মানবত্ব গুণের অনুবর্তী।

https://e-ilm.weebly.com/

اَمَا الْمُقَوِّمَةُ فَالْاَصْلُ فِيْهَا الْاَمْوَالُ؛ لِاَنَّ التَّقَوُّمَ يُؤْذِنُ بِجَبْرِ الْفَائِتِ وَذٰلِكَ فِي الْاَمْوَالِ دُوْنَ النُّفُوْسِ؛ لِاَنَّ مِنْ شَرْطِهِ التَّمَاثُلَ، وَهُوَ فِي الْمَالِ دُوْنَ النَّفْسِ. فَكَانَتْ النُّفُوْسُ تَابِعَةً، ثُمَّ الْعِصْمَةُ الْمُقَوِّمَةُ فِي الْاَمْوَالِ بِالْاِحْرَازِ بِالدَّارِ؛ لِاَنَّ الْعِزَّةَ بِالْمَنَعَةِ فَكَذٰلِكَ فِي النُّفُوْسِ اِلَّا اَنَّ الشَّرْعَ أَسْقَطَ اِعْتِبَارَ مَنَعَةِ الْكَفَرَةِ؛ لِمَا اَنَّهُ اَوْجَبَ اِبْطَالَهَا . وَالْمُرْتَدُّ وَالْمُسْتَأْمَنُ فِيْ دَارِنَا مِنْ اَهْلِ دَارِهِمْ حُكْمًا لِقَصْدِهِمَا الْاِنْتِقَالَ اِلَيْهَا .

অনুবাদ : পক্ষান্তরে মূল্য সাব্যস্তকারী "নিরাপত্তা গুণের" ক্ষেত্রে সম্পদ হলো মূল। কেননা মূল্য সম্পন্নতা ক্ষতিপূরণের ইঙ্গিতবাহী। আর তা মালের ক্ষেত্রে হতে পারে, জানের ক্ষেত্রে হতে পারে না। কেননা ক্ষতিপূরণের জন্য শর্ত হলো সাদৃশ্য। আর তা মালের ক্ষেত্রে বিদ্যমান। জানের ক্ষেত্রে বিদ্যমান নয়। সুতরাং এক্ষেত্রে জান হলো মালের অনুবর্তী।

আর মালের ক্ষেত্রে মূল্য সাব্যস্তকারী নিরাপত্তা গুণ সাব্যস্ত হবে দারুল ইসলামে সংরক্ষণের মাধ্যমে। কেননা শক্তি বল দ্বারাই সম্মান অর্জিত হয়। সুতরাং জানের ক্ষেত্রেও তাই হবে।

তবে শরিয়ত কাফেরদের শক্তির বিবেচনাকে রহিত করেছে। কেননা শরিয়ত তা বাতিল করে দিয়েছে।

আর মুরতাদ ও আমাদের দারুল ইসলামে আগমনকারী নিরাপত্তাধারী ব্যক্তি গুণগতভাবে দারুল হরবেরই অধিবাসী। কেননা উভয়ের নিয়ত হলো তথায় স্থানান্তরিত হওয়া।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিউক্ত ভাষ্যে একটি মতভেদপূর্ণ মাসআলা দলিলসহ আলোচিত হয়েছে। মাসআলাটি এই যে, কোনো হরবী ব্যক্তি দারুল হরবে অবস্থানরত। এমতাবস্থায় সে ইসলাম গ্রহণ করল, এরপর কোনো মুসলিম ব্যক্তি সেই নতুন ইসলাম গ্রহণকারী লোকটিকে ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত হত্যা করে ফেলল। এমতাবস্থায় হত্যকারীর উপর কি ধরনের শাস্তি আরোপিত হবে এ নিয়ে ঈমামগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে।

আহনাফের মতে, কেবল অনিচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে হত্যাকারীর উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে। আর কোনো সুরতে কিছু ওয়াজিব হবে না। ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) এর মাযহাব হলো, অনিচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে দিয়ত ওয়াজিব হবে এবং ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে কেসাস ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ দারুল ইসলামে ইচ্ছাকৃত হত্যা এবং অনিচ্ছাকৃত হত্যার যে হুকুম, দারুল হরবেও একই হুকুম।

দলিল পর্ব : ইমাম শাফেয়ী ও তার সমমতাবলম্বীদের দলিল এই যে, ইসলাম হলো মানুষের জান মাল সংরক্ষক বিষয়। যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে তার জানমাল সংরক্ষিত হয়ে যায়। অতএব, যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানকে হত্যা করল, সে একটি সংরক্ষিত প্রাণ নাশ করল। আর যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো সংরক্ষিত প্রাণ নাশ করে তার উপর কেসাস ওয়াজিব হয় এবং যে ব্যক্তি অনিচ্ছাকৃতভাবে সংরক্ষিত প্রাণ নাশ করে তার উপর দিয়ত ও কাফফারা ওয়াজিব হয়। কারণ ইসমত বা সংরক্ষিত হওয়ার মূল অর্থ হলো এমন হওয়া যে, তাকে কেউ হত্যা করলে সে গোনাহগার হবে। কেননা গোনাহের কারণেই মানুষ বিভিন্ন কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকে। আর এই ইসমত আলোচ্য ব্যক্তির ক্ষেত্রে সর্বসম্মতিক্রমে বিদ্যমান আছে। সুতরাং তাকে হত্যা করা হলে কেসাস বা দিয়ত ওয়াজিব না হওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

যে ইসমত ভঙ্গ করলে গোনাহ হয়, তাকে বলা হয় ইসমতে মু'সিমাহ আর যে ইসমত ভঙ্গ করার দায়ে অর্থদণ্ড আরোপিত হয়, তাকে বলে ইসমতে মুকাওয়িমাহ। এই ইসমতে মুকাওয়িমাহ হলো ইসমতে মু'সিমাহর জন্য একটি অতিরিক্ত গুণ স্বরূপ বা পূর্ণাঙ্গতা স্বরূপ। কেননা কেউ যদি জানতে পারে যে, অমুককে হত্যা করলে গোনাহ হবে। তাহলে

https://e-ilm.weebly.com/

সে তাকে হত্যা করা থেকে বিরত থাকে। আর যদি জানতে পারে যে, তাকে হত্যা করলে গোনাহ হবে এবং অর্থদণ্ডও ভোগ করতে হবে, তাহলে সে তাকে হত্যা করা থেকে আরো বেশি সাবধান থাকে। তাই ইসমতে মুকাওয়িমাহটি ইসমতে মু'সিমাহর শাখা বা গুণ। অতএব, ইসমতে মু'সিমাহ যে বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত হয়, ইসমাতে মুকাওয়িমাহও সে বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত হবে। অর্থাৎ ইসলাম দ্বারা যেমন ইসমতে মু'সিমাহ সাব্যস্ত হয়। তেমনি ইসলাম দ্বারা ইসমতে মুকাওয়িমাহও সাব্যস্ত হবে। অতএব, কোনো মুসলমানকে হত্যা করার দ্বারা দিয়তও (বিশেষ কোনো অবস্থায়) ওয়াজিব হবে।

আহনাফের দলিলে নকলী : আল্লাহ তা'আলার বাণী فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. নিহত ব্যক্তিটি যদি তোমাদের শত্রু সম্প্রদায়ের হয় আর সে মুমিন হয় তাহলে একটি মুমিন দাস আজাদ করতে হবে।

তরীকে ইস্তিদলাল ১. উপরিউক্ত আয়াতংশটি جُمْلَهْ شَرْطِيَّهْ নিহত মুমিন ব্যক্তিটি যদি তোমাদের শত্রু সম্প্রদায়ের হয় এ বাক্যটি হলো شرط। তাহলে একটি মুমিন দাস আজাদ করতে হবে। বাক্যটি পূর্বোক্ত شرط -এর جزا। কেননা এ বাক্যের শুরুতে فاء উল্লেখ রয়েছে। এ অব্যয়টি এ কথা নির্দেশ করে যে তার পরে উল্লিখিত বিষয়টিই পূর্বের বিষয়ের জাযা বা পরিণতি। অতএব, দারুল হরবে অবস্থানকারী মুসলিমকে হত্যা করলে (অনিচ্ছাকৃতভাবে) তার পরিণতি হলো একটি মুমিন দাসকে আজাদ করা। অন্য কিছু নয়।

তরীকে ইস্তিদলাল ২. দারুল হরবে বসবাসকারী মুমিনকে হত্যা করলে তার প্রায়শ্চিত্ত কি হবে? সে প্রসঙ্গ বর্ণনা করার জন্যই উপরিউক্ত আয়াতটির অবতারণা। আর একটি মুমিন দাস আজাদ করতে হবে। একথাটি বলেই আল্লাহ তা'আলা প্রসঙ্গটি শেষ করে দিয়েছেন। এর দ্বারা বুঝা যায়, এতটুকুই শাস্তি। অন্য কোনো শাস্তি আর নেই। যদি অন্য শাস্তি থাকত, তাহলে এখানেই বর্ণনা করা করা হতো। অতএব, যতটুকু উল্লেখ আছে, এতটুকুকুই (মুমিন দাস আজাদ করা) জাযা বা প্রায়শ্চিত্ত। অন্য কিছু নয়।

আহনাফের দলিলে আকলী : ইসমতে মু'সিমা তথা পাপ সাব্যস্তকারী নিরাপত্তাগুণটি মূলত মানবত্বের দ্বারা অর্জিত। কেননা মানবকে সৃষ্টি করা হয়েছে আল্লাহর হুকুম আহকাম পালনের জন্য। আর এই হুকুম আহকাম পালন করা তখন সম্ভব যখন সে নিরাপত্তা সম্পন্ন হয়। কারণ যদি তার নিরাপত্তা না থাকে, তাহলে সে হুকুম পালনে মনোনিবেশ করতে পারবে না। বরং নিজের চিন্তায় ব্যস্ত থাকতে হবে। অতএব, মানুষ মাত্রই নিরাপত্তাগুণ সম্পন্ন, তার মানবত্বের কারণে। তবে মানুষ যখন কাফের হয়। তখন তার কুফুরির কারণে তার নিরাপত্তা রহিত হয়ে যায়। এরপর যদি কাফের ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে পুনরায় তার নিরাপত্তা গুণ ফিরে আসে। আর হয় দারুল ইসলামে সংরক্ষিত থাকার মাধ্যমে। কেননা ইসমত সম্পন্ন হওয়ার বিষয়টি এক প্রকার ইজ্জত বা সম্মান। আর সম্মান হাসিল শক্তি বলের দ্বারা। আর কাফেরদের শক্তিবলকে আল্লাহ তা'আলা বাতিল সাব্যস্ত করেছেন। তাই কোনো সম্পদ কেবল দারুল ইসলামে থাকা অবস্থায়ই তা ইসমতে মুকাওয়িমাহ সম্পন্ন হবে। দারুল হরবে থাকলে তা ইসমতপূর্ণ হবে না।

অতএব, উক্ত হুকুম মানুষের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। কারণ আগে বলা হয়ে গেছে। ইসমতে মুকাওয়িমাহর ক্ষেত্রে মানুষ সম্পদের অনুগামী। আর প্রধান বিষয়ের যে হুকুম, অনুগামীরও সেই হুকুমই হয়ে থাকে। সুতরাং মানুষ যদি দারুল ইসলামে থাকে তাহলে সে ইসমতে মুকাওয়িমাহ সম্পন্ন হবে, দারুল হরবে থাকলে হবে না। কোনো বস্তু ইসমতে মুকাওয়িমাহ সম্পন্ন না হলে তার দিয়ত ওয়াজিব হয় না।

মোটকথা, ১. ইসমতে মুকাওয়িমাহর ক্ষেত্রে সম্পদ প্রধান আর মানুষ হয় তার অনুগামী। ২. প্রধানের যে হুকুম, অনুগামীরও সেই একই হুকুম। ৩. দারুল ইসলামে থাকা অবস্থায় সম্পদ ইসমত সম্পন্ন হয়, দারুল হরবে নয়। ৪. যার ইসমতে মুকাওয়িমাহ নেই। তার দিয়ত ওয়াজিব হয় না। এ চারটি ভূমিকা সাব্যস্ত করার মাধ্যমে আহনাফ এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে, দারুল হরবে অবস্থানরত কোনো মুসলিম হত্যার শিকার হলে, হত্যাকারীর উপর দিয়ত ওয়াজিব হবে না। কুরআনের আয়াতের আলোকে শুধু কাফফারা ওয়াজিব হবে।

পূর্ব বর্ণিত আহনাফের দলিল হতে একটি প্রশ্ন সৃষ্টি হতে পারে যে, কোনো মুরতাদ বা নিরাপত্তাধারী কাফের যদি দারুল ইসলামে অবস্থান করে তাহলে সেও ইসমত সম্পন্ন হবে এবং তাকে হত্যা করলে দিয়ত ওয়াজিব হবে। কিন্তু বাস্তবে তা হয় না কেন?

এর উত্তর হলো এই যে, এরা দারুল ইসলামে অবস্থান করলেও হুকমিভাবে তথা গুণগতভাবে দারুল হরবের অধিবাসী হিসাবে গণ্য হয়। কারণ তারা কিছুদিন পরই দারুল হরবে চলে যাবে। নিরাপত্তাধারী হরবী ব্যক্তি তার নিরাপত্তার মেয়াদ শেষ হলে চলে যাবে আর মুরতাদ ব্যক্তি পালিয়ে যাবে। তাই তারা দারুল ইসলামে থাকা অবস্থায়ও হরবী বলে গণ্য হয়। বিধায় তাদেরকে হত্যা করা হলে দিয়ত ওয়াজিব হয় না।

https://e-ilm.weebly.com/

وَمَنْ قَتَلَ مُسْلِمًا خَطَأً لَا وَلِيَّ لَهُ اَوْ قَتَلَ حَرْبِيًّا دَخَلَ اِلَيْنَا بِاَمَانٍ فَاَسْلَمَ فَالدِّيَةُ عَلٰى عَاقِلَتِهٖ لِلْاِمَامِ وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ؛ لِاَنَّهٗ قَتَلَ نَفْسًا مَعْصُوْمَةً خَطَأً فَتُعْتَبَرُ بِسَائِرِ النُّفُوْسِ الْمَعْصُوْمَةِ، وَمَعْنٰى قَوْلِهٖ لِلْاِمَامِ اَنَّ حَقَّ الْاَخْذِ لَهٗ؛ لِاَنَّهٗ لَا وَارِثَ لَهٗ ـ وَاِنْ كَانَ عَمْدًا فَاِنْ شَاءَ الْاِمَامُ قَتَلَهٗ، وَاِنْ شَاءَ اَخَذَ الدِّيَةَ؛ لِاَنَّ النَّفْسَ مَعْصُوْمَةٌ، وَالْقَتْلَ عَمْدٌ، وَالْوَلِيَّ مَعْلُوْمٌ وَهُوَ الْعَامَّةُ اَوِ السُّلْطَانُ . قَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ ﴿السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهٗ﴾ وَقَوْلُهٗ وَاِنْ شَاءَ اَخَذَ الدِّيَةَ مَعْنَاهُ بِطَرِيْقِ الصُّلْحِ؛ لِاَنَّ مُوْجِبَ الْعَمْدِ وَهُوَ الْقَوَدُ عَيْنًا، وَهٰذَا؛ لِاَنَّ الدِّيَةَ اَنْفَعُ فِيْ هٰذِهِ الْمَسْاَلَةِ مِنَ الْقَوَدِ فَلِهٰذَا كَانَ لَهٗ وِلَايَةُ الصُّلْحِ عَلَى الْمَالِ فَلَيْسَ لَهٗ اَنْ يَعْفُوَ؛ لِاَنَّ الْحَقَّ لِلْعَامَّةِ وَوِلَايَتُهٗ نَظَرِيَّةٌ وَلَيْسَ مِنَ النَّظَرِ اِسْقَاطُ حَقِّهِمْ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ .

অনুবাদ : কেউ যদি এমন কোনো মুসলমানকে অনিচ্ছাকৃত হত্যা করে যার কেনো ওয়ালী নেই অথবা এমন কোনো হরবীকে হত্যা করে, যে নিরাপত্তা নিয়ে আমাদের দারুল ইসলামে এসে ইসলাম গ্রহণ করেছে, তাহলে হত্যাকারীর আকেলাদের উপর শাসকের অনুকূলে দিয়ত ওয়াজিব হবে। আর হত্যাকারীর উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে। কেননা সে একটি নিরাপত্তা গুণ সম্পন্ন প্রাণকে অনিচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করেছে। সুতরাং তাকেও অন্যান্য সকল সংরক্ষিত প্রাণের উপর কিয়াস করা হবে। শাসকের অনুকূলে, ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর এ কথার অর্থ হলো, উপরিউক্ত অর্থ গ্রহণের হক হলো শাসকের। কেননা তার তো কোনো ওয়ারিশ নেই।

আর যদি ইচ্ছাকৃত হত্যা হয় তাহলে শাসক ইচ্ছা করলে হত্যাকারীকে কতল করবেন, কিংবা ইচ্ছা করলে দিয়ত গ্রহণ করবেন। কেননা জান হলো নিরাপত্তা গুণ সম্পন্ন আর হত্যা হয়েছে ইচ্ছাকৃতভাবে আবার অভিভাবকও জ্ঞাত আছে। তারা হলো সাধারণ মুসলমান বা শাসক। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, اَلسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهٗ যার কোনো অভিবাবক নেই, শাসকই হলেন তার অভিভাবক। -[আবূ দাউদ]

ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর উক্তি, ইচ্ছা করলে দিয়ত গ্রহণ করবেন, এ কথার অর্থ হলো, সমঝোতার ভিত্তিতে। কেননা ইচ্ছাকৃত হত্যার অবশ্য সাব্যস্ত শাস্তি হলো স্বয়ং কেসাস। দিয়ত গ্রহণের অবকাশ এজন্য যে, আলোচ্য সুরতে কিসাসের চেয়ে দিয়ত গ্রহণই অধিক কল্যাণজনক। এ কারণেই অর্থের বিনিময়ে সমঝোতা করার অধিকার তার রয়েছে।

কিন্তু শাসকের ক্ষমা করার অধিকার নেই। কেননা (কেসাস বা দিয়তের) মূল হক হলো সাধারণের। আর শাসকের অভিভাকত্ব হচ্ছে কল্যাণ ভিত্তিক। অথচ কোনো বিনিময় ছাড়া সাধারণের হক বাতিল করে দেওয়ার মধ্যে কল্যাণের কোনো দিক নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

অনিচ্ছাকৃত কোনো মুসলমানকে হত্যা করলে দিয়ত ওয়াজিব হয়। এ মাসআলা পূর্বেই অতিবাহিত হয়েছে। এ সম্পর্কিত দলিল হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী।

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ الخ

https://e-ilm.weebly.com/

তবে আলোচ্য মাসআলায় যেহেতু নিহত ব্যক্তির কোনো ওয়ারিশ নেই। তাই সে দিয়ত ইমাম উসূল করবেন এবং বাইতুল মালে রেখে দিবেন। অনুরূপভাবে যে হরবী আমান নিয়ে দারুল ইসলামে এসে ইসলাম গ্রহণ করেছে। সেও দারুল ইসলামের বাসিন্দা হয়ে গেছে। তাই তার হুকুম ও অন্যান্য মুসলমানের হুমুমের মতো।

وَإِنْ كَانَ عَمْدًا فَإِنْ شَاءَ الْإِمَامُ قَتَلَهُ : অভিভাবকহীন কোনো মুসলমানকে কিংবা দারুল হবর হতে আগত মুসলমানকে কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে, তাহলে ইমামের দুটি বিষয়ের মাঝে এখতিয়ার থাকবে। ইচ্ছা করলে কেসাসস্বরূপ হত্যা করতে পারবে, ইচ্ছা করলে দিয়তও গ্রহণ করতে পারবে।

অভিভাবকহীন মুসলমানের অভিভাবক হলো এ সম্পর্কিত দলিল হলো রাসূল ﷺ -এর বাণী اَلسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ যার কোনো অভিভাবক নেই, তার অভিভাবক হলো ইমাম বা শাসক। হাদীসটি ইমাম তিরমিযী, নাসায়ী আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ প্রমুখ বর্ণনা করেছেন।

আলোচ্য সুরতে ইমাম ইচ্ছা করলে কেসাস গ্রহণ করতে পারবেন, এর কারণ হলো হত্যাটি ইচ্ছাকৃতভাবে সংঘটিত হয়েছে। আর ইচ্ছাকৃত হত্যার হুকুম হলো কেসাস। তবে নিহত ব্যক্তির আত্মীয় অভিভাবক না থাকার কারণে কেসাস গ্রহণের তুলনায় দিয়ত গ্রহণ করাই অধিক কল্যাণ জনক। অতএব, যদি হত্যাকারী পক্ষ অর্থের বিনিময়ে সমঝোতা করতে চায়, তাহলে ইমাম সমঝোতা করতে পারবেন। তথা দিয়ত গ্রহণ করতে পারবেন।

পূর্বোক্ত মতনে যে বলা হয়েছে– وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ ইমাম ইচ্ছা করলে দিয়ত গ্রহণ করতে পারবেন। এর অর্থ এই নয় যে, সে ইচ্ছা করলে কেসাস বাদ দিয়ে দিয়ত গ্রহণ করতে পারবেন; বরং এর অর্থ হলো ইচ্ছাকৃত হত্যার একটিই মাত্র দণ্ড, তাহলো কেসাস। তবে আলোচ্য সুরতে কিসাসের তুলনায় দিয়ত গ্রহণ করা অধিক লাভ জনক হওয়ার কারণে হত্যাকারী পক্ষ যদি দিয়তের বিনিময়ে কেসাস রহিত করার আবেদন করে। তাহলে ইমাম তাদের আবেদন গ্রহণ করতে পারবেন। তথা কেসাস মাফ করে দিয়ত গ্রহণ করতে পারবেন।

উপরিউক্ত সুরতে ইমামের ক্ষমা করার অধিকার নেই। কেননা ইমামের অভিভাবকত্বের উদ্দেশ্যেই হলো জন সাধারণের কল্যাণ কামনা করা। যদি কেসাস ও দিয়ত উভয় মাফ করে দেওয়া হয়, তাহলে জন সাধারণের কল্যাণ কামনা হয় না। অতএব, ইমাম হয়তো কেসাস গ্রহণ করবেন অথবা সমঝোতার ভিত্তিতে দিয়ত গ্রহণ করবেন।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ الْعُشْرِ وَالْخَرَاجِ

قَالَ اَرْضُ الْعَرَبِ كُلُّهَا اَرْضُ عُشْرٍ، وَهِيَ مَا بَيْنَ الْعُذَيْبِ اِلَى اَقْصَى حَجَرٍ بِالْيَمَنِ بِمَهْرَةَ اِلَى حَدِّ الشَّامِ وَالسَّوَادُ اَرْضُ خَرَاجٍ، وَهُوَ مَا بَيْنَ الْعُذَيْبِ اِلَى عَقَبَةِ حُلْوَانَ، وَمِنَ الثَّعْلَبِيَّةِ وَيُقَالُ مِنَ الْعَلْثِ اِلَى عَبَّادَانَ؛ لِاَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالْخُلَفَاءَ الرَّاشِدِيْنَ لَمْ يَأْخُذُوْا الْخَرَاجَ مِنْ اَرَاضِي الْعَرَبِ، وَلِاَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْفَيْءِ فَلَا يَثْبُتُ فِيْ اَرَاضِيهِمْ كَمَا لَا يَثْبُتُ فِيْ رِقَابِهِمْ، وَهٰذَا؛ لِاَنَّ وَضْعَ الْخَرَاجِ مِنْ شَرْطِهِ اَنْ يُقَرَّ اَهْلُهَا عَلَى الْكُفْرِ كَمَا فِيْ سَوَادِ الْعِرَاقِ وَمُشْرِكُوا الْعَرَبِ لَا يُقْبَلُ مِنْهُمْ اِلَّا الْاِسْلَامُ اَوِ السَّيْفُ، وَعُمَرُ حِيْنَ فَتَحَ السَّوَادَ وَضَعَ الْخَرَاجَ عَلَيْهَا بِمَحْضَرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَوَضَعَ عَلَى مِصْرَ حِيْنَ افْتَتَحَهَا عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، وَكَذَا اِجْتَمَعَتِ الصَّحَابَةُ عَلَى وَضْعِ الْخَرَاجِ عَلَى الشَّامِ۔

পরিচ্ছেদ : উশর ও খারাজ প্রসঙ্গে

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, সমগ্র আরব ভূমি হচ্ছে উশরী ভূমি। আর তার সীমানা হচ্ছে, উযাইব থেকে শুরু ইয়ামানের হাজর অঞ্চলের শেষ সীমা পর্যন্ত। তথা মাহরাহ অঞ্চল থেকে শামের সীমানা পর্যন্ত। আর ইরাকের ভূমি হচ্ছে খারাজী ভূমি। আর তার সীমানা হলো, উযাইব থেকে হুলওয়ানের উপত্যকা পর্যন্ত। ছা'লাবাহ (বা আলাছ) থেকে আব্বাদান পর্যন্ত। কেননা নবী করীম ﷺ ও খোলাফায়ে রাশেদীনগণ আরবভূমি হতে খারাজ গ্রহণ করেননি। তা ছাড়া এজন্য যে, খারাজ হচ্ছে গনিমতের সমতুল্য। সুতরাং তা তাদের ভূমিতে সাব্যস্ত হবে না। যেমন– তাদের দেহসত্তায় সাব্যস্ত হয় না। এর কারণ এই যে, খারাজ নির্ধারণের শর্ত হলো ঐ ভূমির অধিবাসীদেরকে কুফরির উপর বহাল থাকতে দেওয়া যেমন ইরাকের ভূমিতে হয়েছে। অথচ আরবের মুশরিকদের বেলায় ইসলাম কিংবা তলোয়ার ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করা হয় না।

আর হযরত ওমর (রা.) ইরাক ভূমি জয় করার পর সাহাবায়ে কেরামের উপস্থিতিতে তাতে খারাজ ধার্য করেছেন। তদ্রূপ হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) যখন মিশর জয় করেন তখন তিনি তাতে খারাজ নির্ধারণ করেছেন। তদ্রূপ শামের উপর খারাজ নির্ধারণের ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরাম একমত হয়েছিলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

عُشْرٌ শব্দটি عَشَرَةٌ (দশ) হতে গৃহীত। عُشْرٌ অর্থ হলো এক দশমাংশ বা দশ ভাগের একভাগ। পরিভাষায় عُشْرٌ বলা হয়, উৎপাদিত ফসলের দশ ভাগের এক ভাগকে, যা উশরী ভূমির পক্ষ থেকে দিতে হয়।

https://e-ilm.weebly.com/

خراج মানবসত্তার পক্ষ থেকে ও খারাজী ভূমির পক্ষ থেকে প্রতি বৎসর যে অর্থ পরিশোধ করতে হয়, উভয়কে খারাজ বলে। তবে (জিম্মি) মানবসত্তার পক্ষ থেকে যা পরিশোধ করতে হয় তাকে জিজিয়াও বলে। বর্তমান যুগে যে ট্যাক্স নেওয়া হয়, তা উশর বা খারাজ নয়; বরং তা একটি ভিন্ন বিষয়।

পূর্বের পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার আলোচনা করেছেন, জিম্মি হওয়ার উপকরণসমূহ সম্পর্কে। আর বক্ষ্যমাণ পরিচ্ছেদে তিনি আলোচনা করবেন জিম্মি ব্যক্তির কর্তব্য সম্পর্কে। উশর ও খারাজ দুটি বিষয় তিনি ভিন্ন ভিন্ন দুটি পরিচ্ছেদে আলোচনা করেছেন তবে উশরের মধ্যে ইবাদতের দিক বিদ্যমান থাকার কারণে উশরের প্রসঙ্গ আগে উল্লেখ করেছেন। আর কোন ভূমিতে উশর ওয়াজিব হয়, কোন ভূমিতে খারাজ ওয়াজিব হয়, তা জানা দরকার সর্বপ্রথম। তাই এ প্রসঙ্গ দিয়েই গ্রন্থকার আলোচনার সূচনা করেছেন।

আরবের ভূমি পুরোটা উশরী। আরব ভূমির উৎপন্ন ফসল হতে উশর গ্রহণ করা হবে, খারাজ গ্রহণ করা হবে না। কারণ ১. নবী করীম ﷺ ও খোলাফায়ে রাশেদগণ আরব ভূমি হতে খারাজ গ্রহণ করেননি। এর দ্বারা বুঝা যায়, আরবের ভূমি খারাজী নয়; বরং উশরী।

২. ভূমির উপর যে খারাজ ধার্য করা হয়, তা হলো গনিমতের পর্যায়ে। অতএব, আরবের ভূমিতে তা ধার্য করা যাবে না। যেমন আরবের অধিবাসীদের গনিমত সাব্যস্ত হয় না।

৩. কোনো ভূমিতে খারাজ ধার্য করার জন্য শর্ত হলো, সে ভূমির অধিবাসীকে কুফরের উপর বহাল রাখা। কিন্তু আরব ভূখণ্ডের অধিবাসীকে কুফরের উপর বহাল রাখা জায়েজ নয়। তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হলো দুটি– হয়তো তারা ইসলাম গ্রহণ করবে অথবা তাদেরকে হত্যা করা হবে। মোটকথা, আরবের অধিবাসীকে যেহেতু কুফরের উপর বহাল রাখা যায় না। সেহেতু তাদের ভূমির উপরও খারাজ ধার্য করা যায় না।

আরব ভূমির চতুর্সীমা : আরব ভূমির দৈর্ঘ্য সীমা হলো বনি তামীমের জলাশয়, উযাইব নামক অঞ্চল হতে ইয়ামানের হাজার নামক অঞ্চলের শেষ পর্যন্ত। আর প্রস্থ সীমা হলো ইয়াবরীন, দাহনা প্রভৃতি অঞ্চল হতে শাম পর্যন্ত। ইরাক, মিশর ও শামের ভূমি খারাজী। এসব অঞ্চলের উপর সাহাবীগণ খারাজ নির্ধারণ করে গেছেন। অতএব এগুলো সব খারাজী ভূমি।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ وَأَرْضُ السَّوَادِ مَمْلُوْكَةٌ لِاَهْلِهَا يَجُوْزُ بَيْعُهُمْ لَهَا وَتَصَرُّفُهُمْ فِيْهَا؛ لِاَنَّ الْاِمَامَ اِذَا فَتَحَ اَرْضًا عَنْوَةً وَقَهْرًا لَهُ اَنْ يُقِرَّ اَهْلَهَا عَلَيْهَا وَيَضَعَ عَلَيْهَا وَعَلٰى رُءُوْسِهِمُ الْخَرَاجَ فَتَبْقَى الْاَرَاضِيْ مَمْلُوْكَةً لِاَهْلِهَا وَقَدْ قَدَّمْنَاهُ مِنْ قَبْلُ قَالَ وَكُلُّ اَرْضٍ اَسْلَمَ اَهْلُهَا اَوْ فُتِحَتْ عَنْوَةً وَقُسِمَتْ بَيْنَ الْغَانِمِيْنَ فَهِيَ اَرْضُ عُشْرٍ لِاَنَّ الْحَاجَةَ اِلَى ابْتِدَاءِ التَّوْظِيْفِ عَلَى الْمُسْلِمِ وَالْعُشْرُ اَلْيَقُ بِهِ لِمَا فِيْهِ مِنْ مَعْنَى الْعِبَادَةِ، وَكَذَا هُوَ اَخَفُّ حَيْثُ يَتَعَلَّقُ بِنَفْسِ الْخَارِجِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, **ইরাকের ভূমি তার অধিবাসীদের মালিকানাধীন তাদের ঐ ভূমি ক্রয়-বিক্রয় এবং তাতে অন্যান্য ব্যবহার বৈধ রয়েছে।** কেননা শাসক যখন কোনো ভূমি শক্তি ও বল প্রয়োগের মাধ্যমে জয় করেন, তখন তার অধিকার রয়েছে যে, সেই ভূমির বাসিন্দাদের ঐ ভূমিতে বহাল রাখার এবং সেই ভূমির উপর এবং ভূমির অধিবাসীদের উপর খারাজ নির্ধারণ করার। তখন ঐ ভূমি ঐ বাসিন্দাদের মালিকানাধীন থেকে যায়। আর ইতঃপূর্বে আমরা তা আলোচনা করে এসেছি।

যে সকল ভূমির অধিবাসীরা ইসলাম গ্রহণ করে কিংবা বলপূর্বক জয় করার পর তা মুজাহিদদের মাঝে বণ্টন করা হয় সেগুলো হলো উশরী ভূমি। কেননা এখানে প্রয়োজন হলো, মুসলমানের উপর আর্থিক দায় আরোপের সূচনা করা। আর যেহেতু উশরের মাঝে ইবাদতের গুণ রয়েছে, সেহেতু এ ক্ষেত্রে উশর নির্ধারণই অধিক উপযুক্ত। অদ্রূপ তা লঘুতর। কারণ তা উৎপাদিত ফসলের সাথে সম্পৃক্ত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

বলপ্রয়োগ করে বিজিত ভূমিতে সেখানকার অধিবাসীদেরকে বহাল রাখা জায়েজ আছে। তখন সেই ভূমি ও তার অধিবাসীর উপর খারাজ ধার্য করা হবে। অধিবাসীর উপর যে খারাজ ধার্য করা হয়, তাকে জিজিয়াও বলা হয়। বহাল রাখা অধিবাসীরা তাদের সেই খারাজী ভূমিতে যে কোনো ধরনের তসরুফ করতে পারবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) ও অন্যান্য ইমাম হতে কিছু মতপার্থক্যও বর্ণিত আছে।

وَكُلُّ اَرْضٍ اَسْلَمَ اَهْلُهَا اَوْ فُتِحَتْ : উপরিউক্ত ইবারতে উশরী জমিনের পরিচয় বর্ণনা করা হয়েছে।

যে ভূমির বাসিন্দারা ইসলাম গ্রহণ করে সে ভূমি উশরী। যে ভূমি বলপ্রয়োগে বিজিত হওয়ার পর মুজাহিদদের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া হয়, সে ভূমিও উশরী। এ প্রকার ভূমি উশরী হওয়ার কারণ হলো, মুসলমানদের উপর আর্থিক দায় আরোপ করা এখানে প্রয়োজন। আর মুসলমানের উপর আর্থিক দায় আরোপের জন্য উপযুক্ত হলো উশর। কারণ উশরের মধ্যে ইবাদতের দিক রয়েছে। এ কারণেই যে সব খাতে সদকা ব্যয় করা হয়। সেসব খাতে উশরও ব্যয় করা হয়।

উশরের দায়টি খারাজের তুলনায় সহজও বটে। কেননা উশরের সম্পর্ক হলো ভূমিতে উৎপন্ন ফসলের সাথে। ভূমিতে ফসল উৎপন্ন হলে উশর দিতে হবে। ফসল উৎপন্ন না হলে দিতে হবে না। অতএব, মুসলমানের জন্য এটাই সমীচীন।

https://e-ilm.weebly.com/

وَكُلُّ أَرْضٍ فُتِحَتْ عَنْوَةً فَأُقِرَّ أَهْلُهَا عَلَيْهَا فَهِيَ أَرْضُ خَرَاجٍ وَكَذَا إِذَا صَالَحَهُمْ؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ إِلَى ابْتِدَاءِ التَّوْظِيْفِ عَلَى الْكَافِرِ وَالْخَرَاجُ أَلْيَقُ بِهِ، وَمَكَّةُ مَخْصُوْصَةٌ مِنْ هٰذَا، فَإِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَحَهَا عَنْوَةً وَتَرَكَهَا لِأَهْلِهَا، وَلَمْ يُوَظِّفِ الْخَرَاجَ ـ

وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ كُلُّ أَرْضٍ فُتِحَتْ عَنْوَةً فَوَصَلَ إِلَيْهَا مَاءُ الْأَنْهَارِ فَهِيَ أَرْضُ خَرَاجٍ، وَمَا لَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا مَاءُ الْأَنْهَارِ وَاسْتُخْرِجَ مِنْهَا عَيْنٌ فَهِيَ أَرْضُ عُشْرٍ؛ لِأَنَّ الْعُشْرَ يَتَعَلَّقُ بِالْأَرْضِ النَّامِيَةِ، وَنَمَاؤُهَا بِمَائِهَا فَيُعْتَبَرُ السَّقْيُ بِمَاءِ الْعُشْرِ أَوْ بِمَاءِ الْخَرَاجِ ـ

অনুবাদ : আর যে সকল ভূমি বলপূর্বক জয় করা হয়েছে এবং ভূমির অধিবাসীদেরকে তাতে বহাল রাখা হয়েছে, সেগুলো হচ্ছে খারাজী ভূমি। একই হুকুম হবে যদি শাসক তাদের সাথে সন্ধি করে থাকেন। কেননা এখানে প্রয়োজন হলো কাফেরদের উপর আর্থিক দায় আরোপের সূচনা করার। এজন্য খারাজই অধিক উপযুক্ত। আর মক্কা এ বিধান থেকে ব্যতিক্রম। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলপূর্বক তা জয় করেছেন। তথায় তার অধিবাসীদেরকে তাতে বহাল রেখেছেন। কিন্তু তাদের উপর খারাজ ধার্য করেননি।

আর জামেউস সগীর কিতাবে বলা হয়েছে, যে সকল ভূমি বলপূর্বক জয় করা হয়েছে অতঃপর তাতে খালের পানি দ্বারা সেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে তা হলো খারাজী ভূমি। আর যে ভূমিতে নদী বা খালের পানি পৌছায়নি বরং তাতে ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনের ব্যবস্থা করা হয়েছে, সেটা উশরী ভূমি। কেননা উশরের সম্পর্ক হলো উৎপাদনের গুণবিশিষ্ট ভূমির সাথে আর ভূমির উৎপাদন গুণের সম্পর্ক হলো পানির সাথে। সুতরাং উশরী পানি দ্বারা কিংবা খারাজী পানি যা দ্বারা সেচ দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিউক্ত ইবারতে খারাজী ভূমির পরিচয় দেওয়া হয়েছে। যে ভূমি যুদ্ধ করে জয় করা হয়, অতঃপর সেখানকার বাসিন্দাদেরকে সেখানে বহাল রাখা হয়, সে ভূমি খারাজী। অনুরূপভাবে যে এলাকার লোকজন মুসলিম শাসকের সাথে সন্ধি করে সে এলাকাও খারাজী। কেননা সেখানে কাফেরদের উপর আর্থিক দায় চাপানো প্রয়োজন। এর জন্য খারাজ অধিক উপযুক্ত। যেহেতু খারাজের মধ্যে শাস্তির অর্থ রয়েছে এবং সেটা খানিকটা কঠিনও বটে। কেননা ফসল উৎপন্ন হোক, বা না হোক, প্রতি বৎসরই খারাজ পরিশোধ করতে হয়। অতএব, এটাই কাফেরদের পক্ষে উপযুক্ত।

প্রশ্ন হতে পারে যে, পূর্বোক্ত বর্ণনা অনুযায়ী মক্কা নগরীও খারাজী ভূমি হওয়া উচিত। কেননা মক্কা নগরী রাসূলুল্লাহ ﷺ বলপূর্বক জয় করেছেন। অথচ পূর্বে বলা হয়েছে আরবের সমগ্র ভূমি উশরী।

এ প্রশ্নের জবাবে গ্রন্থকার বলেন, মক্কা ভূমি বর্ণিত নিয়মের ব্যতিক্রম, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা নগরী বলপূর্বক জয় করার পর তাতে খারাজ আরোপ করেননি। কারো কারো মতে মক্কা নগরীকে তার সম্মানার্থে উশরী হিসাবে রাখা হয়েছে।

قوله : وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ كُلُّ أَرْضٍ فُتِحَتْ الخ : জামে সাগীরে উপরিউক্ত ইবারত উদ্ধৃত করে হিদায়ার গ্রন্থকার যে বিষয়টি বুঝাতে চেয়েছেন, তা এই যে, কোনো ভূমি খারাজী হওয়া সম্পর্কিত মাসআলায় কুদূরী ও জামে সাগীরের বর্ণনার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কেননা কুদূরীর বর্ণনায় বলা হয়েছে, বলপূর্বক বিজিত ভূমিতে যদি কাফেরদেরকে বহাল রাখা হয়, তাহলে সেটা খারাজী ভূমি। আর জামে সাগীরের বর্ণনায় রয়েছে। বিজিত ভূমি যদি খালের পানিতে সেচ করা হয়, তাহলে তা খারাজী ভূমি, আর ভূগর্ভ হতে উঠানো পানি দ্বারা সেচ করা হলে সেটা উশরী ভূমি। চাই সে ভূমিটা মুজাহিদদের মাঝে বণ্টন করা হোক অথবা সেখানে কাফেরদেরকে বহাল রাখা হোক। উভয় অবস্থায় সেচের পানির বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে। দুই কিতাবের বর্ণনার মধ্যকার এই পার্থক্যের প্রতি ইঙ্গিত করার উদ্দেশ্যে হিদায়া গ্রন্থকার জামে সাগীরের ভাষ্য উদ্ধৃত করেছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ : وَمَنْ اَحْيَا اَرْضًا مَوَاتًا فَهِيَ عِنْدَ اَبِيْ يُوْسُفَ مُعْتَبَرَةٌ بِحَيِّزِهَا ، فَاِنْ كَانَتْ مِنْ حَيِّزِ اَرْضِ الْخَرَاجِ وَمَعْنَاهُ بِقُرْبِهِ فَهِيَ خَرَاجِيَّةٌ، وَاِنْ كَانَتْ مِنْ حَيِّزِ أَرْضِ الْعُشْرِ فَهِيَ عُشْرِيَّةٌ وَالْبَصْرَةُ عِنْدَهُ عُشْرِيَّةٌ بِاِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ؛ لِاَنَّ حَيِّزَ الشَّيْءِ يُعْطٰى لَهُ حُكْمُهُ، كَفِنَاءِ الدَّارِ يُعْطٰى لَهُ حُكْمُ الدَّارِ حَتّٰى يَجُوْزَ لِصَاحِبِهَا الْاِنْتِفَاعُ بِهِ . وَكَذَا لَا يَجُوْزُ اَخْذُ مَا قَرُبَ مِنَ الْعَامِرِ، وَكَانَ الْقِيَاسُ فِي الْبَصْرَةِ اَنْ تَكُوْنَ خَرَاجِيَّةً؛ لِاَنَّهَا مِنْ حَيِّزِ اَرْضِ الْخَرَاجِ، اِلَّا اَنَّ الصَّحَابَةَ وَظَّفُوْا عَلَيْهَا الْعُشْرَ فَتُرِكَ الْقِيَاسُ لِاِجْمَاعِهِمْ وَقَالَ مُحَمَّدٌ : اِنْ اَحْيَاهَا بِبِئْرٍ حَفَرَهَا اَوْ بِعَيْنٍ اِسْتَخْرَجَهَا اَوْ مَاءِ دِجْلَةَ اَوِ الْفُرَاتِ اَوِ الْاَنْهَارِ الْعِظَامِ الَّتِيْ لَا يَمْلِكُهَا اَحَدٌ فَهِيَ عُشْرِيَّةٌ وَكَذَا اَنْ اَحْيَاهَا بِمَاءِ السَّمَاءِ وَاِنْ اَحْيَاهَا بِمَاءِ الْاَنْهَارِ الَّتِي اِحْتَفَرَهَا الْاَعَاجِمُ مِثْلَ نَهْرِ الْمَلِكِ وَنَهْرِ يَزْدَجِرْدَ فَهِيَ خَرَاجِيَّةٌ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ اِعْتِبَارِ الْمَاءِ اِذْ هُوَ السَّبَبُ لِلنَّمَاءِ وَلِاَنَّهُ لَا يُمْكِنُ تَوْظِيْفُ الْخَرَاجِ اِبْتِدَاءً عَلَى الْمُسْلِمِ كَرْهًا فَيُعْتَبَرُ فِيْ ذٰلِكَ الْمَاءُ؛ لِاَنَّ السَّقْيَ بِمَاءِ الْخَرَاجِ دَلَالَةُ الْاِلْتِزَامِيَّةِ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কেউ যদি কোনো পতিত ভূমি আবাদ করে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে তা পার্শ্ববর্তী ভূমির সাথে বিবেচ্য হবে। সুতরাং যদি তা খারাজী ভূমির পার্শ্ববর্তী হয়, তাহলে খারাজী ভূমি হবে। আর যদি উশরী ভূমির পার্শ্ববর্তী হয় তাহলে উশরী ভূমি হবে। আর তাঁর মতে বসরার সমগ্র এলাকা উশরী ভূমি যেহেতু এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের ইজমা রয়েছে। কেননা কোনো কিছুর পার্শ্ববর্তীকে তারই হুকুম প্রদান করা হয়। যেমন বাড়ির সংলগ্ন পতিত ভূমিকে বাড়ির পর্যায়ভুক্ত ধরা হয়। এমনকি (মালিকানা না থাকা সত্ত্বেও) তার দ্বারা উপকৃত হওয়া বাড়ির মালিকের জন্য বৈধ রয়েছে। অদ্রূপ আবাদ ভূমির সন্নিকটবর্তী (পতিত) ভূমিকে আবাদ করা জায়েজ নেই। (কেননা তা আবাদ ভূমির হুকমভুক্ত)।

বসরার ভূখণ্ডের ক্ষেত্রে কিয়াসের দাবি ছিল খারাজী ভূমি হওয়া। কেননা তা খারাজী ভূমির নিকটবর্তী। কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম তাতে উশর নির্ধারণ করেছেন, সুতরাং তাদের ইজমার কারণে কিয়াস বর্জন করা হয়েছে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, কূপ খননের মাধ্যমে কিংবা ঝরনা উৎসারিত করার মাধ্যমে কিংবা দজলা, ফোরাতের পানি দ্বারা যা মানুষের মালিকানাধীন হয় না যদি এ সকল পানি দ্বারা জমি আবাদ করা হয় তাহলে তা উশরী ভূমি হবে। অদ্রূপ উশরী হবে যদি বৃষ্টির পানি দ্বারা আবাদ করা হয়।

আর যদি অনারব আজমীদের খননকৃত খালের পানিতে আবাদ করা হয়, যেমন– বাদশাহ নওশেরওয়াহর (খননকৃত) খাল এবং ইয়াজদাজারদের (খননকৃত) খাল, তাহলে সেটা খারাজী ভূমি হবে। এজন্য যে পানির বিবেচনার কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। কেননা পানিই– হলো ভূমির উৎপাদনশীলতার কারণ। তাছাড়া দ্বিতীয় কারণ এই যে, মুসলমানের উপর জবরদস্তি প্রথম পর্যায়ে খারাজের দায় আরোপ সম্ভব নয়। সুতরাং সেক্ষেত্রে পানির বিষয়টি বিবেচনা করা হবে। কেননা খারাজী পানি দ্বারা সেচদান খারাজের দায় গ্রহণের প্রতি ইঙ্গিতবহ।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পতিতভূমি আবাদ করা হলে তা উশরী হবে না খারাজী হবে, উপরিউক্ত ইবারতে এ সম্পর্কিত মূলনীতি এবং দলিল বর্ণনা করা হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, ইবারতে যে মূলনীতি বর্ণিত হয়েছে, তা কেবল মুসলমান কর্তৃক আবাদ করার সাথে সম্পৃক্ত। কেননা যদি কোনো জিম্মি ব্যক্তি কোনো পতিত ভূমিকে আবাদ করে তাহলে তা কেবলই খারাজী হয়। আর যদি কোনো মুসলমান কোনো পতিত ভূমি আবাদ করে তাহলে তা উশরী না খারাজী সেটা নির্ভর করবে তার পার্শ্ববর্তী ভূমির অবস্থার উপর। পার্শ্ববর্তী ভূমিগুলো যদি উশরী হয়, তাহলে আবাদকৃত ভূমিও উশরী। আর পার্শ্ববর্তী ভূমিগুলো যদি খারাজী হয়, তাহলে আবাদকৃত ভূমিও খারাজী হবে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর এ মূলনীতির পিছনে দলিল হলো, কোনো বস্তুকে তার পার্শ্ববর্তী বস্তুর হুকুমের আওতাভুক্ত করা হয়। যেমন- কোনো ব্যক্তির বাড়ির পাশে যদি পতিত ভূমি থাকে, তাহলে বাড়ির মালিক সেই পতিত ভূমি ব্যবহার করে উপকৃত হতে পারে। অথচ পতিত ভূমি তার মালিকানা নয়। কিন্তু তার বাড়ির পার্শ্ববর্তী হওয়ার কারণে সে যেমন নিজ বাড়ি ব্যবহার করতে পারে, তদ্রূপ পতিত ভূমিও ব্যবহার করতে পারে।

অনুরূপভাবে কারো আবাদ ভূমির পাশে যদি পতিত ভূমি থাকে তাহলে উক্ত পতিত ভূমি আবাদ করা কারো জন্য জায়েজ নয়। অথচ পতিত ভূমি হিসাবে তা আবাদ করা জায়েজ হওয়া উচিত। কিন্তু পার্শ্ববর্তী ভূমিটি আবাদ ভূমি হওয়ার কারণে এবং পতিত ভূমিকেও আবাদ ভূমির হুকুমভুক্ত করার কারণে তা আবাদ করা কারো জন্য জায়েজ হয় না।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর এ মূলনীতি অনুসারে বসরার ভূমি খারাজী হওয়া উচিত। কেননা বসরার আশপাশের ভূমিগুলে খারাজী। কিন্তু বসরার ভূমির উপর উশর ধার্য করার ব্যাপারে সাহাবীগণের ঐকমত্য থাকার কারণে বসরার ক্ষেত্রে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) তার মূলনীতি ত্যাগ করেছেন। তাই বসরার পার্শ্ববর্তী ভূমি খারাজী হওয়া সত্ত্বেও বসরার ভূমি উশরী।

أَرْض مَوَات বা পতিত ভূমি সম্পর্কে কিছু জরুরি জ্ঞাতব্য বিষয় : আরবিতে বলা হয় أَرْض مَوَات বাংলা ভাষায় একে বলা হয় পতিত ভূমি বা অনাবাদ ভূমি। উর্দু ভাষায় একে বলা হয় بنجر زمين।

যাহিরে রেওয়ায়েত অনুযায়ী পতিত ভূমি বলা হয়, যে ভূমিতে কারো মালিকানা থাকে না, কারো কোনো হক থাকে না এবং ভূমিটি উপকার লাভের যোগ্য না হয়।

ইমাম ত্বহাবী (র.)-এর মতে পতিত বলে ঐ ভূমিকে বুঝানো হয়, যা বসতি থেকে অনেক দূরে হয়।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, যে ভূমি জনবসতি হতে এতদূরে অবস্থিত হয় যে, জনবসতি থেকে সজোরে হাঁক দিলে সেখান থেকে তা শুনা যায় না। সেটাই موات বা পতিত ভূমি।

যাহিরে রেওয়ায়েত অনুসারে যেহেতু দূরে অবস্থিত হওয়ার শর্ত নেই সেহেতু নদী গর্ভ হতে যে ভূমি বের হয় তা পতিত ভূমির আওতাভুক্ত হবে। কারো মালিকানাধীন বড় হাওড়, বিল ইত্যাদিও পতিত ভূমির অন্তর্ভুক্ত হবে।

পতিত ভূমি সাধারণত তিন ধরনের হয়ে থাকে :

১. **স্থায়ীভাবে পতিত :** যে ভূমি স্থায়ীভাবে পতিত পড়ে আছে। ভূমি কঠিন হওয়ার কারণে বা পানির কোনো ব্যবস্থা না থাকার কারণে লোকজন তা আবাদ করার সাহস করে না।

২. **আবাদযোগ্য পতিত ভূমি :** যে ভূমি আবাদ করার উপযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও বিশেষ কোনো কারণে অনাবাদ অবস্থায় পড়ে আছে। যেমন কোনো জনবসতি উজাড় হয়ে যাওয়াতে তার পার্শ্ববর্তী ফসলি ভূমি অনাবাদ হয়ে গেল। কিন্তু সেচ ব্যবস্থা কঠিন হওয়ার ফলে কোনো ফসলি ভূমি অনাবাদ পড়ে থাকল।

https://e-ilm.weebly.com/

৩. খাস বা রাষ্ট্রায়ত্ত ভূমি : যে ভূমি ইসলামি হুকুমতের জন্য বিশেষ করে রাখা হয়।

قوله : وَقَالَ مُحَمَّدٌ : انْ اَحْيَاهَا بِبِئْرٍ حفرَهَا الخ : উপরিউক্ত ভাষ্যে আরো কিছু উশরী ও খারাজী ভূমির পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

খননকৃত কূপের পানিতে, উৎসারিত ঝরনার পানিতে, বৃষ্টির পনিতে, দজলা নদীর পানিতে, ফোরাত নদীর পানিতে, মালিকবিহীন যে কোনো বড় নদীর পানিতে যে সকল ভূমি সেচ করা, সেগুলো উশরী ভূমি।

আজমী তথা অনারবি লোকদের খননকৃত খালের পানিতে যে ভূমি সেচ করা হয়, তা খারাজী ভূমি।

কারণ পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ভূমির উশরী বা খারাজী হওয়ার সম্পর্ক হলো উৎপাদন ক্ষমতার সাথে। আর উৎপাদন ক্ষমতার সম্পর্ক হলো পানির সাথে, তাই যে পানি দ্বারা ভূমি সেচ করা হয়, তা বিবেচনার বিষয়। সেচের পানি যদি উশরী হয়, তাহলে ভূমি উশরী হবে। সেচের পানি যদি খারাজী হয়, তাহলে সেচকৃত ভূমিও খারাজী হবে।

তা ছাড়া আরেক কারণ হলো, মুসলমানের উপর প্রাথমিকভাবে খারাজের দায় চাপানো যায় না। খারাজের মধ্যে শাস্তির দিক থাকার কারণে এবং সেটা জিজিয়ার পর্যায়ভুক্ত হওয়ার কারণে। তাই সেচের পানির দিকে লক্ষ্য করা হবে। কেউ যদি খারাজী পানি দ্বারা জমি সেচ করে তাহলে ধরে নেওয়া হবে সে খারাজের দায় গ্রহণ করেছে।

বাদশাহ নওশেরওয়াহ এবং বাদশাহ ইয়াজদাজারদের পরিচিতি :

বাদশাহ নওশেরওয়াহ-এর পিতার নাম কুববাদ। তিনি ছিলেন পারস্যের প্রতাপশালী সম্রাট। তার রাজত্বকাল ছিল ৪৭ বৎসর ৭ মাস। খসরু পারভেজ হলো তার ছেলে। তার রাজত্ব কাল ছিল ৩৮ বছর।

বাদশাহ ইয়াজদাজারদ এর পিতার নাম শাহরিয়ার। তিনি পনের বছর বয়সে রাজত্ব গ্রহণ করেন। রুস্তম ছিল তার সেনাপতি। হযরত সা'আদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (র.) -এর সাথে যুদ্ধ করে রুস্তম নিহত হলে বাদশাহ ইয়াজদাজারদ রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে যায়। হযরত উসমান (রা.) -এর খেলাফতকালে ৩১ হিজরি সনে সিজিস্থানের পথে মারওয়ার উদ্দেশ্যে পালিয়ে যাওয়ার সময় তাকে হত্যা করা হয়।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ وَالْخَرَاجُ الَّذِيْ وَضَعَهُ عُمَرُ عَلَى اَهْلِ السَّوَادِ مِنْ كُلِّ جَرِيْبٍ يَبْلُغُهُ الْمَاءُ قَفِيْزٌ هَاشِمِيٌّ وَهُوَ الصَّاعُ وَدِرْهَمٌ، وَمِنْ جَرِيْبِ الرَّطْبَةِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَمِنْ جَرِيْبِ الْكَرْمِ الْمُتَّصِلِ وَالنَّخِيْلِ الْمُتَّصِلِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ وَهٰذَا هُوَ الْمَنْقُوْلُ عَنْ عُمَرَ، فَاِنَّهُ بَعَثَ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ حَتّٰى يَمْسَحَ سَوَادَ الْعِرَاقِ، وَجَعَلَ حُذَيْفَةَ مُشْرِفًا عَلَيْهِ، فَمَسَحَ فَبَلَغَ سِتًّا وَثَلَاثِيْنَ اَلْفَ اَلْفِ جَرِيْبٍ وَوَضَعَ عَلٰى ذٰلِكَ مَا قُلْنَا، وَكَانَ ذٰلِكَ بِمَحْضَرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ مِنْ غَيْرِ نَكِيْرٍ فَكَانَ اِجْمَاعًا مِنْهُمْ . وَلِاَنَّ الْمُؤَنَ مُتَفَاوِتَةٌ فَالْكَرْمُ اَخَفُّهَا مُؤْنَةً وَالْمَزَارِعُ اَكْثَرُهَا مُؤْنَةً وَالرُّطَبُ بَيْنَهُمَا، وَالْوَظِيْفَةُ تَتَفَاوَتُ بِتَفَاوُتِهَا فَجُعِلَ الْوَاجِبُ فِي الْكَرْمِ اَعْلَاهَا وَفِي الزَّرْعِ اَدْنَاهَا وَفِي الرُّطَبَةِ اَوْسَطَهَا قَالَ : وَمَا سِوٰى ذٰلِكَ مِنَ الْاَصْنَافِ كَالزَّعْفَرَانِ وَالْبُسْتَانِ وَغَيْرِهِ يُوْضَعُ عَلَيْهَا بِحَسَبِ الطَّاقَةِ؛ لِاَنَّهُ لَيْسَ فِيْهِ تَوْظِيْفُ عُمَرَ وَقَدْ اِعْتَبَرَ الطَّاقَةَ فِيْ ذٰلِكَ فَنَعْتَبِرُهَا فِيْمَا لَا تَوْظِيْفَ فِيْهِ . قَالُوْا : وَنِهَايَةُ الطَّاقَةِ اَنْ يَبْلُغَ الْوَاجِبُ نِصْفَ الْخَارِجِ لَا يُزَادُ عَلَيْهِ.

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, হযরত ওমর (রা.) ইরাকবাসীদের উপর যে হারে খারাজ নির্ধারণ করেছিলেন তা এই, প্রতি জারীব সেচপ্রাপ্ত জমিতে হাশেমী এক কাফীয। অর্থাৎ এক'সা শস্য এবং এক দিরহাম। আর তরিতরকারির জমিতে জারীব প্রতি পাঁচ দিরহাম। নিরেট আঙ্গুর ও খেজুর বাগানে জারীব প্রতি দশ দিরহাম।

হযরত ওমর (রা.) থেকে এরূপই বর্ণিত হয়েছে। কেননা তিনি উসমান ইবনে হুনাইফ (রা.)-কে ইরাকের ভূমি জরিপের জন্য পাঠিয়ে ছিলেন এবং হযরত হুযায়ফা (র.)-কে তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেছিলেন। জরিপে জমিন পরিমাণ হয়েছিল ছত্রিশ লক্ষ্য জারীব। সেই জমিতে আমাদের বর্ণিত হারে সাহাবাদের উপস্থিতিতে হযরত ওমর (রা.) খারাজ নির্ধারণ করেছেন। কেউ কোনো প্রতিবাদ করেননি। ফলে এতে তাদের পক্ষ থেকে ইজমা বা সর্বসম্মতি সাব্যস্ত হয়েছে।

তাছাড়া এই কারণে যে, উৎপাদন ব্যয় ও শ্রমের মধ্যে ব্যবধান রয়েছে। আঙ্গুর বাগানের ব্যয় সবচেয়ে কম। আর ফসলি জমির ব্যয় সবচে বেশি। এবং তরিতরকারির জমিতে খরচ উভয়ের মধবর্তী। আর উৎপাদন খরচের তারতম্যে ধার্যকৃত ভূমি কর তারতম্য পূর্ণ হওয়াই স্বাভাবিক। তাই আঙ্গুর বাগানে সর্বোচ্চ কর, ফসলি ভূমিতে সর্বনিম্ন কর এবং তরকারির জমিতে মধ্যবর্তী কর ধার্য করা হয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, এ ছাড়া অন্য প্রকার উৎপাদনে যেমন- জাফরানের চাষ এবং বাগ-বাগিচা ইত্যাদিতে অবস্থাভেদে সাধ্য অনুযায়ী খারাজ নির্ধারণ করা হবে। কেননা এসব ক্ষেত্রে হযরত ওমর (রা.) হতে নির্ধারিত খারাজ সাব্যস্ত নেই। আর তার নির্ধারণের ক্ষেত্রে যেহেতু সাধ্যের তারতম্যের বিষয় বিবেচনা করা হয়েছে, সেহেতু যে সকল ক্ষেত্রে তার পক্ষ থেকে নির্ধারণ নেই সেখানে আমরা সাধ্য অনুযায়ী বিবেচনা করব।

মাশায়েখগণ বলেছেন যে, সাধ্যের চূড়ান্ত সীমা হলো ধার্যকৃত কর উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক হওয়া। এর বেশি ধার্য করা যাবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

لانَّ التَّنْصِيْفَ عَيْنُ الْاَنْصَافِ لما كَانَ لَنَا اَنْ نُقَسِّمَ الْكُلَّ بَيْنَ الْغَانِمِيْنَ . وَالْبُسْتَانُ كُلُّ اَرْضٍ يَحُوْطُهَا حَائِطٌ وَفِيْهَا نَخِيْلٌ مُتَفَرِّقَةٌ وَاَشْجَارٌ اُخَرُ. وَفِيْ دِيَارِنَا وَظَّفُوْا مِنَ الدَّرَاهِمِ فِي الْاَرَاضِيْ كُلِّهَا وَتُرِكَ كَذٰلِكَ: لِاَنَّ التَّقْدِيْرَ يَجِبُ اَنْ يَكُوْنَ بِقَدْرِ الطَّاقَةِ مِنْ اَيِّ شَيْءٍ كَانَ .

অনুবাদ : কেননা অর্ধা-অর্ধি করা পূর্ণ ন্যায়ানুগ বিষয়। বিশেষত আমাদের তো অধিকার ছিল সমগ্রকেই মুজাহিদদের মাঝে বণ্টন করে দেওয়ার। আর বাগান হলো চতুর্দিক দিয়ে প্রাচীর বেষ্টিত ভূমি। যাতে ফাঁকে ফাঁকে খেজুর গাছ ও অন্যান্য গাছ রয়েছে।

আমাদের দেশে (কারগানাতে) সকল প্রকার জমিতে দিরহাম দ্বারা কর নির্ধারণ করা হয়েছে এবং এভাবেই তা চালু রাখা হয়েছে। কেননা অবশ্যকর্তব্য হলো কর নির্ধারণ যেন সাধ্য অনুপাতে হয়। তা যে জিনিস দ্বারাই হোক।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিউক্ত ইবারতে খারাজের পরিমাণ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে : জমিসমূহকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে– ১. ফসলি জমি ২. খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান। ৩. তরিতরকারির জমি। প্রথম প্রকার জমিতে খারাজের পরিমাণ হলো জারীব প্রতি এক সা' শস্য ও একটি দিরহাম, দ্বিতীয় প্রকার জমিতে জারীব প্রতি দশ দিরহাম। তৃতীয় প্রকার জমিতে জারীব প্রতি পাঁচ দিরহাম।

এ ব্যাপারে প্রথম দলিল হলো সাহাবায়ে কেরামের ইজমা বা ঐকমত্য। যার বিস্তারিত বিবরণ হলো এই যে, হযরত ওমর (রা.) তার শাসনামলে হযরত হুযাইফা (রা.)-কে তত্ত্বাবধায়ক করে হযরত উসমান ইবনে হুনাইফ (রা.)-কে ইরাকের জমি জরিপ করার জন্য প্রেরণ করেন। নির্দেশ মতো জরিপ করার পর দেখা গেল জমির পরিমাণ হলো ছত্রিশ লক্ষ জারীব। (জারীব, সা', দিরহাম সম্পর্কিত আলোচনা পরে আসবে) অতঃপর হযরত ওমর (রা.) অন্যান্য সাহাবীদের উপস্থিতিতে উপরে বর্ণিত হারে খারাজ ধার্য করেন। তখন কোনো সাহাবী কোনোরূপ আপত্তি বা প্রতিবাদ করেননি। এভাবে খারাজের পরিমাণের ব্যাপারে সাহাবীগণের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়।

দ্বিতীয় দলিল হলো আকলী : তা এই যে, সব ফসলের খরচ সমান নয়; বরং কোনো ফসল উৎপাদন করতে অর্থ ব্যয় হয় অনেক, আবার কোনো ফসলের ক্ষেত্রে কম। তাই খারাজ নির্ধারণের ক্ষেত্রে সেদিকেও খেয়াল রাখা হয়েছে। যে ফসলের উৎপাদন খরচ সবচে বেশি সে ফসলের ভূমিতে খারাজের পরিমাণ রাখা হয়েছে বেশি, যেমন- ধান-গম ইত্যাদি শস্য উৎপাদনে সবচেয়ে বেশি শ্রম ও অর্থ খরচ হয়। তাই এসব ফসলের ভূমিতে খারাজের হার ধার্য করা হয়েছে প্রতি জারীব জমিতে এক সা' শস্য ও এক দিরহাম মাত্র। আঙ্গুরের চাষে খরচ হয় সবচে কম, তাই আঙ্গুর বাগানে খারাজের পরিমাণ হলো প্রতি জারীব জমিতে দশ দিরহাম, আর তরকারি উৎপাদনে খরচ হয় মাঝামাঝি। তাই তার খারাজও ধার্য করা হয়েছে মাঝামাঝি পরিমাণ। প্রতি জারীব ভূমিতে পাঁচ দিরহাম।

জারীব, সা', দিরহাম সম্পর্কিত আলোচনা :

পারস্য সম্রাটের প্রবর্তিত ذراع বা হাত অনুযায়ী ষাট হাত দীর্ঘ ও ষাট হাত প্রশস্ত ভূমি হলো এক জারীব। আর পারস্য সম্রাটের প্রবর্তিত ذراع বা হাতের পরিমাণ হলো সাত মুষ্টি। জনসাধারণ পূর্ব প্রচলিত হাত হতো ছয় মুষ্টিতে। মোটকথা, সাত মুষ্টিতে এক হাত, এরূপ হাতে ষাট হাত দৈর্ঘ্য ও ষাট হাত প্রস্থ বিশিষ্ট ভূমিকে বলা হয়, এক জারীব। এক صاع হলো আট রেতেলের সমান। আর এক দিরহাম দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ওজনে সাবা অনুযায়ী এক দিরহাম।

وما سوى ذٰلك من الْاَصْنَافِ كالزعفران الخ : যেসব ফসলের খারাজ হযরত ওমর (রা.) হতে নির্ধারিত নেই সেসব ফসলের খারাজ কি হবে, খারাজের ক্ষেত্রে অবশ্যকর্তব্য কি, বুস্তান বা বাগান বলতে কি বুঝায় ইত্যাদি বিষয়ে উপরিউক্ত ইবারতে আলোকপাত করা হয়েছে। যেসব ফসলের ক্ষেত্রে হযরত ওমর (রা.) হতে খারাজের পরিমাণ নির্ধারিত নেই, সেসব ফসলের ভূমিতে চাষীদের সাধ্য অনুপাতে খারাজ নির্ধারণ করে দেওয়া হবে। তবে খারাজের পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে সাধ্যের প্রতি অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। কেননা সাধ্যের প্রতি খেয়াল রাখা অবশ্যকর্তব্য। সাধ্যের চূড়ান্ত পর্যায় উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক পরিমাণ ও খারাজ হিসাবে ধার্য করে দেওয়া হয়, তাহলে তা ন্যায়সঙ্গত হবে। কেননা মুসলিম শাসকের অধিকার ছিল সমগ্র বিজিত ভূমি মুজাহিদগণের মাঝে বণ্টন করে দেওয়ার। সে ক্ষেত্রে তিনি যখন তা বণ্টন না করে তথাকার বাসিন্দাদেরকে বহাল রেখেছেন তখন অর্ধেক ফসল কর ধার্য করা খুবই স্বাভাবিক। তবে অর্ধেক ফসলের বেশি কর ধার্য করা যাবে না। চার দিক থেকে দেওয়াল ঘেরা জমিকে বুস্তান বা বাগান বলে এতে খেজুর আঙ্গুর ও অন্যান্য ফল-ফসলের চাষ করা যেতে পারে।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ فَإِنْ لَمْ تُطِقْ مَا وُضِعَ عَلَيْهَا نَقَصَهُمْ الْإِمَامُ وَالنُّقْصَانُ عِنْدَ قِلَّةِ الرِّيْعِ جَائِزٌ بِالْإِجْمَاعِ؛ أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِ عُمَرَ : لَعَلَّكُمَا حَمَّلْتُمَا الْأَرْضَ مَا لَا تُطِيْقُ، فَقَالَا : لَا بَلْ حَمَّلْنَاهَا مَا تُطِيْقُ، وَلَوْ زِدْنَا لَأَطَاقَتْ . وَهٰذَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ النُّقْصَانِ، وَأَمَّا الزِّيَادَةُ عِنْدَ زِيَادَةِ الرِّيْعِ يَجُوْزُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ اِعْتِبَارًا بِالنُّقْصَانِ، وَعِنْدَ أَبِيْ يُوْسُفَ لَا يَجُوْزُ؛ لِأَنَّ عُمَرَ لَمْ يَزِدْ حِيْنَ أُخْبِرَ بِزِيَادَةِ الطَّاقَةِ، وَإِنْ غَلَبَ عَلَى أَرْضِ الْخَرَاجِ الْمَاءُ أَوْ اِنْقَطَعَ الْمَاءُ عَنْهَا أَوْ اِصْطَلَمَ الزَّرْعَ آفَةٌ فَلَا خَرَاجَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ فَاتَ التَّمَكُّنُ مِنَ الزِّرَاعَةِ، وَهُوَ النَّمَاءُ التَّقْدِيْرِيُّ الْمُعْتَبَرُ فِي الْخَرَاجِ، وَفِيْمَا إِذَا اصْطَلَمَ الزَّرْعَ آفَةٌ فَاتَ النَّمَاءُ التَّقْدِيْرِيُّ فِيْ بَعْضِ الْحَوْلِ وَكَوْنُهُ نَامِيًا فِيْ جَمِيْعِ الْحَوْلِ شَرْطٌ كَمَا فِيْ مَالِ الزَّكٰوةِ أَوْ يُدَارُ الْحُكْمُ عَلَى الْحَقِيْقَةِ عِنْدَ خُرُوْجِ الْخَارِجِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ভূমি যদি ধার্যকৃত কর বহন করতে না পারে তাহলে শাসক তা হ্রাস করবেন। ফসল কম হওয়ার ক্ষেত্রে হ্রাস করা সর্বসম্মতভাবেই বৈধ। দেখুন না হযরত ওমর (রা.) বলেছেন,

لَعَلَّكُمَا حَمَّلْتُمَا الْأَرْضَ مَا لَا تُطِيْقُ، فَقَالَا : لَا بَلْ حَمَّلْنَاهَا مَا تُطِيْقُ، وَلَوْ زِدْنَا لَأَطَاقَتْ .

অর্থাৎ হয়তো তোমরা ভূমির উপর সাধ্যাতীত করের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছ, তারা দুজন বললেন, না; বরং আমরা সহনীয় পরিমাণেই চাপিয়েছি। এমনকি যদি আরো বৃদ্ধি করতাম তাহলে ভূমি তাও বহনযোগ্য ছিল। এ বক্তব্য হ্রাস করার বৈধতা প্রমাণ করে। আর হ্রাস করার উপর কিয়াস করে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে ফসলের বেশি ফলনের সময় কর বৃদ্ধি করা জায়েজ। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে তা বৈধ নয়। কেননা হযরত ওমর (রা.)-কে অতিরিক্ত বহন ক্ষমতা বিদ্যমান থাকার কথা অবহিত করা সত্ত্বেও তিনি তা বৃদ্ধি করেননি।

যদি খারাজী জমি অতি পানি বা অল্প পানির সংকটে নিপতিত হয়, কিংবা ফসল কোনো আপদবিশিষ্ট হয়ে যায়, তাহলে তাতে খারাজ আসবে না। কেননা (পানি সমস্যার ক্ষেত্রে) ফসল উৎপন্ন করার সক্ষমতা বিলুপ্ত হয়েছে। কারণ সামর্থ্যই হলো গুণগত ফলনশীলতা যা খারাজের ক্ষেত্রে বিবেচ্য।

আর ফসল বিপদগ্রস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে বছরের কিয়দংশে গুণগত ফলনশীলতা বিলুপ্ত হয়েছে। অথচ পূর্ণ বছরের জন্য ফলনশীল হওয়া শর্ত। যেমন- যাকাতের সম্পদের ক্ষেত্রে. কিংবা বিষয়টি এমন যে, ফসল উৎপন্ন হওয়ার অবস্থায় প্রকৃত ফলনশীলতার উপরেই বিধান আবর্তিত হবে। (কিন্তু প্রকৃত ফলনশীলতা বিনষ্ট হয়েছে। সুতরাং খারাজ রহিত হবে।)

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিউক্ত ইবারতে খারাজ হ্রাস-বৃদ্ধি করা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

ফসল কম হলে খারাজ হ্রাস করা সর্বসম্মতিক্রমে জায়েজ। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, ফসল বৃদ্ধি পেলে খারাজ বৃদ্ধি করাও জায়েজ আছে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে খারাজ বৃদ্ধি করা জায়েজ নেই। খারাজ হ্রাস-বৃদ্ধি সম্পর্কিত মতনে বর্ণিত হাদীসটি ইমাম বুখারী (র.) তাঁর বুখারী শরীফে ফাযায়েলে সাহাবা অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।

قَوْلُهُ : وإنْ غَلَبَ عَلَى أرْضِ الْخراجِ الْمَاءُ الخ : ভূমির উপর খারাজ ওয়াজিব হওয়ার জন্য শর্ত হলো ভূমির ফলনশীলতা বা ভূমি ফলনশীল হওয়া। এ ফলনশীলতা দু-প্রকার- ১. প্রকৃত ফলনশীলতা, ২. গুণগত ফলনশীলতা। প্রকৃত ফলনশীলতার অর্থ হলো, প্রকৃতপক্ষে বা বাস্তবে জমিতে ফসল গজানো। আর গুণগত ফলনশীলতার অর্থ হলো, জমি ফসল ফলানোর উপযুক্ত হওয়া। খারাজ ওয়াজিব হওয়ার বিধানটি দু-প্রকার ফলনশীলতার উপরই নির্ভর করে।

অতএব, যদি কোনো জমিতে পানি জমে থাকার কারণে কিংবা পানি না থাকার কারণে ফসল ফলানো সম্ভব না হয়, তাহলে জমির ফলনশীলতা বিলুপ্ত হয়েছে। তাই সে জমিতে খারাজ আসবে না। আর যদি ফসল গজানোর পর তা আপদগ্রস্ত হয়, তাহলেও সাময়িকভাবে গুণগত ফলনশীলতা বিলুপ্ত হয় কিংবা বলা যায় উক্ত জমির প্রকৃত ফলনশীলতা ব্যাহত হয়েছে। যেহেতু ফলন গজানোর পর তা ধ্বংস হয়ে গেছে। অতএব, উক্ত জমিতে খারজ ওয়াজিব হবে না। কেননা খারাজ ওয়াজিব হওয়ার জন্য শর্ত হলো জমিটি পূর্ণ বছর ব্যাপী ফলনশীল থাকা। উৎপন্ন ফসল ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কারণে যেহেতু জমিটি সারা বছর প্রকৃত ফলনশীল থাকে নাই, তাই তার উপর খারাজ আসবে না। যেমন যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য শর্ত হলো সারা বৎসর নেসাব পূর্ণ থাকা। যদি কোনো ব্যক্তি ব্যবসার উদ্দেশ্যে একটি দাসী খরিদ করে অতঃপর ছয় মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর সে এই দাসী দ্বারা খেদমত করানোর ইচ্ছা করে, তাহলে এ দাসীর জন্য জাকাত ওয়াজিব হবে না। কারণ দাসীটি সারা বৎসর ব্যবসায়ের মাল হিসাবে থাকেনি। তদ্রূপ খারাজের ক্ষেত্রেও জমি পূর্ণ বৎসর ফলনশীল থাকা শর্ত।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ وَاِنْ عَطَّلَهَا صَاحِبُهَا فَعَلَيْهِ الْخَرَاجُ؛ لِاَنَّ التَّمَكُّنَ كَانَ ثَابِتًا وَهُوَ الَّذِيْ فَوَّتَهُ. قَالُوْا : مَنْ انْتَقَلَ اِلَى اَخَسِّ الْاَمْرَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَعَلَيْهِ خَرَاجُ الْاَعْلَى؛ لِاَنَّهُ هُوَ الَّذِيْ ضَيَّعَ الزِّيَادَةَ، وَهٰذَا يُعْرَفُ وَلَا يُفْتَى بِهِ كَيْ لَا يَتَجَرَّاَ الظَّلَمَةُ عَلَى اَخْذِ اَمْوَالِ النَّاسِ۔ وَمَنْ اَسْلَمَ مِنْ اَهْلِ الْخَرَاجِ اُخِذَ مِنْهُ الْخَرَاجُ عَلَى حَالِهِ؛ لِاَنَّ فِيْهِ مَعْنَى الْمُؤْنَةِ فَيُعْتَبَرُ مُؤْنَةً فِيْ حَالَةِ الْبَقَاءِ فَاَمْكَنَ اِبْقَاؤُهُ عَلَى الْمُسْلِمِ وَيَجُوْزُ اَنْ يَشْتَرِيَ الْمُسْلِمُ اَرْضَ الْخَرَاجِ مِنَ الذِّمِّيِّ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ الْخَرَاجُ لِمَا قُلْنَا، وَقَدْ صَحَّ اَنَّ الصَّحَابَةَ اِشْتَرَوْا اَرَاضِيَ الْخَرَاجِ وَكَانُوْا يُؤَدُّوْنَ خَرَاجَهَا، فَدَلَّ عَلَى جَوَازِ الشِّرَاءِ وَاَخْذِ الْخَرَاجِ وَاَدَائِهِ لِلْمُسْلِمِ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ۔

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ভূমিওয়ালা যদি (ভূমিতে চাষাবাদ না করে) পতিত ফেলে রাখে তাহলে তার উপর খারাজ আসবে। কেননা সামর্থ্য তো বিদ্যমান ছিল। সে নিজেই তা হাতছাড়া করেছে। মাশায়েখগণ বলেছেন, বিনা ওজরে যদি উচ্চমানের চাষের পরিবর্তে নিম্নমানের চাষ গ্রহণ করে তাহলে তার উপর উচ্চ হারের খারাজই ধার্য হবে। কেননা অধিক লাভের সুযোগ সেই নষ্ট করেছে, এ বিধান নীতিগতভাবে জানা থাকা উচিত। তবে এর অনুকূলে ফতোয়া প্রদান করা হবে না, যাতে জালিম শাসকেরা মানুষের অর্থ হরণে দুঃসাহসী না হয়ে উঠে।

খারাজীদের কেউ যদি ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তার থেকে যথাপূর্ব খারাজ গ্রহণ করা হবে। কেননা তাতে ভূমির দায় বহনের দিক রয়েছে। সুতরাং চলমান অবস্থার ক্ষেত্রে ভূমির দায় বহনের দিকটি বিবেচনা করা হবে। এ হিসাবে মুসলমানের উপর তা বহাল রাখা সম্ভব।

মুসলমানের জন্য জায়েজ আছে খারাজী ভূমি ক্রয় করা ঐ লোকের নিকট থেকে, যার থেকে খারাজ নেওয়া হয়। এর কারণ এই মাত্র বলেছি। আর বিশুদ্ধরূপে প্রমাণিত যে, সাহাবায়ে কেরাম খারাজী ভূমি ক্রয় করেছেন এবং তারা খারাজই আদায় করতেন। সুতরাং তা মুসলমানের জন্য খারাজী ভূমি ক্রয়ের খারাজ পরিশোধের এবং উসুলের বৈধতা প্রমাণ করে কোনো প্রকার কারাহাত ব্যতীতই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিউক্ত ইবারতে দুটি মাসআলা আলোচিত হয়েছে–

১. জমি চাষাবাদের উপযুক্ত এবং চাষি ব্যক্তি চাষাবাদে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও যদি চাষাবাদ না করে জমি পতিত ফেলে রাখে, তাহলে সে জমিতে খারাজ ওয়াজিব হবে। কেননা জমির উৎপাদন ক্ষমতা বিদ্যমান ছিল। চাষি নিজের ইচ্ছায় তা নষ্ট করেছে। তাই খারাজ মওকুফ হবে না।

আর যদি জমি চাষাবাদের উপযুক্ত হয়, কিন্তু চাষি অক্ষম হয় তার শারীরিক অসুস্থতার কারণে কিংবা চাষের সরঞ্জাম না থাকার কারণে, তাহলে শাসক তার জমিটি অন্য কারো কাছে মুযারাআর ভিত্তিতে সোপর্দ করবেন। এরপর উৎপন্ন ফসল হতে মালিক যে হিসসা পাবে, তা থেকে খারাজ উসুল করবে এবং অবশিষ্ট ফসল মালিককে দিয়ে দিবে। অথবা শাসক তার জমিটি ভাড়ায় দিবে এবং সেই ভাড়া থেকে খারাজ উসুল করবে এবং অবশিষ্ট ফসল মালিককে দিয়ে দিবে।

https://e-ilm.weebly.com/

২. জমিতে উচ্চমানের ফসল ফলানোর সুযোগ থাকা সত্ত্বেও চাষি যদি নিম্নমানের ফসল ফলায় তাহলে তার উপর উচ্চ হারের খারাজই ওয়াজিব হবে। কেননা এমতাবস্থায় চাষি নিজে অধিক লাভের সুযোগ নষ্ট করেছে যেমন কোনো জমিতে জাফরানের চাষ করার সুযোগ থাকা অবস্থায় চাষি তাতে শস্য চাষ করল। এমতাবস্থায় জাফরানের খারাজ ওয়াজিব হবে।

গ্রন্থকার বলেন, এ মাসআলাটি জনা থাকা কর্তব্য। কিন্তু এর অনুকূলে ফতোয়া দেওয়া যাবে না। কেননা ফতোয়া দেওয়া হলে জালিম শাসকেরা মানুষের অর্থ হরণে দুঃসাহসী হয়ে যাবে। অর্থাৎ মানুষ তাদের জমিতে যে ফসলই করবে, শাসকরা বলবে, এ জমিতে এর চেয়ে উন্নত ফসল ফলানোর অবকাশ ছিল। তাই সেই উন্নত ফসলের খারাজ দিতে হবে। এভাবে তারা মানুষের নিকট থেকে অধিক হারে খারাজ উসুল করবে।

قوله : وَمَنْ اَسْلَمَ مِنْ اَهْلِ الْخَرَاجِ اُخِذَ مِنْهُ الخ : উপরিউক্ত মাসআলার সারসংক্ষেপ এই যে, কোনো খারাজী ব্যক্তি যদি মুসলমান হয়ে যায়, তাহলেও তার ভূমির উপর আগের মতোই খারাজ ধার্য থাকবে। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালেক (র.)-এর মতে খারাজী ব্যক্তি মুসলমান হলে তার খারাজ রহিত হয়ে যাবে।

উল্লেখ্য যে, মুসলমানের উপর শুরু থেকে খারাজ ধার্য করা যায় না। কিন্তু পূর্ব থেকে খারাজ ধার্য হয়ে থাকলে, মুসলমান হওয়ার পরেও তা বহাল থাকবে। কেননা খারাজের মধ্যে দুটি দিক রয়েছে– একটি হলো শাস্তির দিক, অপরটি ভূমির খরচের দিক। খারাজী ব্যক্তি মুসলমান হলে শাস্তির দিক বিবেচনা করে যদিও তার উপরে খারাজ বহাল রাখা যায় না; কিন্তু ভূমির খরচের দিক বিবেচনা করে খারাজ বহাল রাখা যায়। তাই খরচের দিক বিবেচনা করে ইসলাম গ্রহণকারী খারাজী ব্যক্তির উপর পূর্ব ধার্যকৃত খারাজ যথারীতি বহাল রাখা হবে।

قوله : وَيَجُوزُ اَنْ يَشْتَرِيَ الْمُسْلِمُ اَرْضَ الْخَرَاجِ الخ : খারাজী ভূমি মুসলমান খরিদ করতে পারবে কিনা? এ সম্পর্কে কথা হলো এই যে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে মুসলমানের জন্য খারাজী ভূমি ক্রয় করা জায়েজ আছে। ইমাম মালেক (র.)-এর মতে জায়েজ নেই। এক বর্ণনা মোতাবেক ইমাম মালেক (র.)-এর মতেও জায়েজ আছে। তবে তখন খারাজ রহিত হয়ে যাবে।

আমাদের মাযহাব অনুসারে যদি কোনো মুসলমান ব্যক্তি খারাজী জমি ক্রয় করে, তাহলে তার উপর পূর্ব ধার্যকৃত খারাজ যথারীতি বহাল থাকবে এবং সেই ক্রেতা মুসলমানকে অবশ্যই খারাজ পরিশোধ করতে হবে। কেননা মুসলমানের উপর প্রাথমিকভাবে খারাজ ধার্য করা না গেলেও, পূর্ব থেকে ধার্যকৃত খারাজ বহাল রাখা যেতে পারে, ভূমির খরচের দিক বিবেচনা করে, যেমন ইতঃপূর্বেও বলা হয়েছে।

এ মাসআলার দলিল হলো সাহাবা কেরামের আমল। কেননা বিশুদ্ধরূপে প্রমাণিত আছে যে, কতক সাহাবী খারাজী ভূমি ক্রয় করেছেন এবং তারা খারাজ পরিশোধ করেছেন। যেমন- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.), হুসাইন ইবনে আলী (রা.), খাব্বাব ইবনু আরাত (রা.) প্রমুখ সাহাবী খারাজী জমিন ক্রয় করেছিলেন। তাদের এ আমল দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, খারাজী ভূমি ক্রয় করা মুসলমানের জন্য জায়েজ আছে। খারাজ পরিশোধ করা এবং খারাজ উসুল করাও মুসলমানের জন্য জায়েজ আছে। কোনোটিতে কোনো প্রকার কারাহাত নেই।

https://e-ilm.weebly.com/

وَلَا عُشْرَ فِي الْخَارِجِ مِنْ اَرْضِ الْخَرَاجِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا؛ لِاَنَّهُمَا حَقَّانِ مُخْتَلِفَانِ وَجَبَا فِيْ مَحِلَّيْنِ بِسَبَبَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فَلَا يَتَنَافِيَانِ . وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ ﴿لَا يَجْتَمِعُ عُشْرٌ وَخَرَاجٌ فِيْ اَرْضِ مُسْلِمٍ﴾، وَلِاَنَّ اَحَدًا مِنْ اَئِمَّةِ الْعَدْلِ وَالْجَوْرِ لَمْ يَجْمَعْ بَيْنَهُمَا، وَكَفٰى بِاِجْمَاعِهِمْ حُجَّةً؛ وَلِاَنَّ الْخَرَاجَ يَجِبُ فِيْ اَرْضٍ فُتِحَتْ عَنْوَةً قَهْرًا، وَالْعُشْرُ فِيْ اَرْضٍ اَسْلَمَ اَهْلُهَا طَوْعًا، وَالْوَصْفَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ فِيْ اَرْضٍ وَاحِدَةٍ، وَسَبَبُ الْحَقَّيْنِ وَاحِدٌ وَهُوَ الْاَرْضُ النَّامِيَةُ اِلَّا اَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي الْعُشْرِ تَحْقِيْقًا وَفِي الْخَرَاجِ تَقْدِيْرًا، وَلِهٰذَا يُضَافَانِ اِلَى الْاَرْضِ، وَعَلٰى هٰذَا الْخِلَافِ الزَّكَاةُ مَعَ اَحَدِهِمَا وَلَا يَتَكَرَّرُ الْخَرَاجُ بِتَكَرُّرِ الْخَارِجِ فِي سَنَةٍ؛ لِاَنَّ عُمَرَ لَمْ يُوَظِّفْهُ مُكَرَّرًا، بِخِلَافِ الْعُشْرِ؛ لِاَنَّهُ لَا يَتَحَقَّقُ عُشْرًا اِلَّا بِوُجُوْبِهٖ فِيْ كُلِّ خَارِجٍ .

অনুবাদ : খারাজী ভূমির উৎপন্ন ফসলে উশর নেই। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, উশর ও খারাজ একত্র করা হবে। কেননা এ হচ্ছে ভিন্ন দুটি হক যা পৃথক দুটি ক্ষেত্রে ভিন্ন দুই কারণে ওয়াজিব হয়েছে। সুতরাং এদুটি স্ববিরোধী নয়।

আমাদের দলিল এই যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, لَا يَجْتَمِعُ عُشْرٌ وَخَرَاجٌ فِي اَرْضِ مُسْلِمٍ 'কোনো মুসলমানের ভূমিতে উশর ও খারাজ একত্রিত হবে না'। তাছাড়া ন্যায়বিচারক কিংবা অত্যাচারী কোনো শাসকই দুটিকে একত্রে আরোপ করেননি। আর তাদের ইজমা বা ঐকমত্য প্রমাণরূপে যথেষ্ট।

তাছাড়া এ কারণে যে, খারাজ ওয়াজিব হয় শক্তি ও ক্ষমতা বলে বিজিত ভূমির উপর। আর উশর ওয়াজিব হয় ঐ ভূমিতে যার অধিবাসীরা স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছে। আর এ দুটি অবস্থা একটি ভূমিতে একত্রিত হতে পারে না। তদুপরি উভয় হক সাব্যস্ত হওয়ার হেতু অভিন্ন, অর্থাৎ ফলনশীল ভূমি। তবে উশরের প্রকৃত ফলনশীলতা বিবেচ্য হয়। পক্ষান্তরে খারাজের ক্ষেত্রে গুণগত ফলনশীলতা বিবেচনা করা হয়। এ কারণেই উভয়টিকেই ভূমির সাথে সম্পৃক্ত করা হয়।

দুটির কোনো একটির সাথে জাকাত আরোপ করার বিষয়টিও একই মতবিরোধপূর্ণ।

এক বছরে একাধিক ফলনের কারণে একাধিক খারাজ আরোপিত হবে না। কেননা হযরত ওমর (রা.) খারাজ পুনঃপুন ধার্য করেননি। উশরের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা প্রতিটি উৎপন্ন ফসলে উশর সাব্যস্ত না হলে উশর তথা দশমাংশ বাস্তবায়িত হয় না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিউক্ত ইবারতে দুটি মতভেদপূর্ণ মাসআলা আলোচনা করা হয়েছে।

১. উশর এবং খারাজ একই জমিতে একত্র হবে কিনা, অর্থাৎ একই ভূমি থেকে উশর এবং খারাজ উভয়টি উসুল করা যাবে কিনা, এ নিয়ে ইমামগণের মাঝে মতপার্থক্য হয়েছে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, উশর এবং খারাজ একই ভূমিতে একত্রিত হবে না।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে উশর এবং খারাজ একই ভূমিতে একত্রিত হবে। ইমাম মালেক এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)ও এ অভিমত পোষণ করেন।

https://e-ilm.weebly.com/

দলিল পর্ব :

ইমাম শাফেয়ী (র.) ও তাঁর সমমনাদের দলিল : তারা বলেন, উশর এবং খারাজ ভিন্ন ভিন্ন দুটি হক। পৃথক পৃথক দুটি কারণে পৃথক দুটি মহলে বা ক্ষেত্রে ওয়াজিব হয়ে থাকে। অতএব, দুটির মাঝে কোনো বৈপরীত্য নেই। একটি ওয়াজিব হলে অপরটি ওয়াজিব হতে পারবে না, এরূপ নয়। বরং দুটি হক একই সঙ্গে ওয়াজিব হতে পারবে।

দলিলের ব্যাখ্যা : উশর ও খারাজ দুটি ভিন্ন ভিন্ন হক। কারণ উশরের মধ্যে রয়েছে ইবাদতের গুণ। যে কারণে এটি মুসলমানের উপর ধার্য করা হয়। আর খারাজের মধ্যে রয়েছে শাস্তির অর্থ। একারণে এটি কাফেরদের উপর ধার্য করা হয়। অতএব, উশর ও খারাজ সত্তাগতভাবেই ভিন্ন ভিন্ন দুটি হক। উশর এবং খারাজ ওয়াজিব হওয়ার কারণও ভিন্ন ভিন্ন। উশর ওয়াজিব হওয়ার কারণ ভূমির প্রকৃত ফলনশীলতা। অর্থাৎ যদি ভূমিতে বাস্তবিকই ফসল উৎপন্ন হয়, তাহলে উশর ওয়াজিব হয়। আর খারাজ ওয়াজিব হওয়ার কারণ হলো ভূমির গুণগত ফলনশীলতা। অর্থাৎ ভূমি যদি ফসল ফলানোর উপযুক্ত থাকে, তাহলেই সে ভূমিতে খারাজ ওয়াজিব হয়। বাস্তবে ফসল হওয়া আবশ্যক নয়। উশর এবং খারাজ ওয়াজিব হওয়ার মহল বা ক্ষেত্রও ভিন্ন ভিন্ন। কেননা উশর ওয়াজিব হয় উৎপন্ন ফসলের মধ্যে। আর খারাজ ওয়াজিব হয় খারাজী ব্যক্তির জিম্মায়। এমন কি উশর এবং খারাজের মাসরাফ বা ব্যয়ের খাতও ভিন্ন ভিন্ন। কেননা উশরের মাসরাফ হলো ফুকারা তথা দরিদ্র লোকেরা। আর খারাজের মাসরাফ হলো যোদ্ধারা। মোটকথা, উশর ও খারাজের সবব, মহল ও মাসরাফ ভিন্ন ভিন্ন। সত্তাগতভাবেও দুটি জিনিস ভিন্ন ভিন্ন। তাই দুটির উজুবের মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই। উভয়টি এক সঙ্গে ওয়াজিব হতে পারে।

আহনাফের দলিল :

দলিল : ১. রাসূল ﷺ-এর বাণী : اَيَجْتَمِعُ عُشْرٌ وَخَرَاجٌ فِيْ اَرْضِ مُسْلِمٍ

অর্থাৎ কোনো মুসলমানের ভূমিতে উশর এবং খারাজ একত্র হতে পারে না। হাদীসটি ইবনে আদী তার আল কামেল নামক কিতাবে উল্লেখ করেছেন, তাঁর সনদ ও মতন নিম্নরূপ :

عَنْ يَحْيَى ابْنِ عَنْبَسَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَجْتَمِعُ عَلٰى مُسْلِمٍ عُشْرٌ وَخَرَاجٌ.

অর্থাৎ কোনো মুসলমানের উপর উশর ও খারাজ একত্র হতে পারে না।

সনদে উল্লিখিত ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর পরবর্তী রাবী ইয়াহয়া ইবনে আনবাসার উপর ইবনে আদী আপত্তি করেছেন, তিনি বলেছেন, ইয়াহয়া ইবনে আনবাসা মুনকারুল হাদীস। কিন্তু ইয়াহয়া ইবনে আনবাসা সম্পর্কিত আপত্তি আহনাফের ইস্তিদলালের ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নয়। কারণ হাদীসটি ইয়াহয়া ইবনে আনবাসা ছাড়া অন্য রাবী থেকেও বর্ণিত আছে। যেমন আল্লামা ইবনে শাহীন হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইয়াহয়া ইবনে ঈসা থেকে, তিনি ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে। তাছাড়া আমাদের নির্ভরযোগ্য মাশায়েখগণ নিজ নিজ কিতাবে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। তাই হাদীসটি আলোচ্য বিষয়ে দলিল হওয়ার জন্য যথোপযুক্ত।

দলিল : ২. ন্যায়বিচারক বা অত্যাচারী কোনো মুসলিম শাসকই একই ভূমিতে উশর এবং খারাজ একত্র করেননি। ন্যায়পন্থি শাসকগণ উশর ও খারাজ একত্র করেননি একারণে যে, এটা ন্যায় ও ইনসাফ পরিপন্থি। আর অত্যাচারী শাসকগণ উশর এবং খারাজ একত্র করেননি উলামায়ে কেরামের ফতোয়ার কারণে। কেননা অত্যাচারী শাসক সাধারণত মানুষের যে অত্যাচার করে থাকে, তা হয়ে থাকে রাজনৈতিক কারণে অন্যথায় মুসলমান হিসাবে ইসলামি বিধিবিধানের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ অবশ্যই থাকে, দীনি বিষয়ে তাদের কোনো মতপার্থক্য থাকে না। আর উশর ও খারাজ যেহেতু সম্পূর্ণ দীনি বিষয়, তাই অত্যাচারী শাসকরাও ইসলামি শাসনকালে উশর ও খারাজ একত্র করেননি। অতএব, ন্যায়পন্থি ও অত্যাচারী উভয় শ্রেণির শাসকের উশর ও খারাজ একত্র না করার কর্মনীতি এ বিষয়ে হুজ্জত যে, উশর ও খারাজ মুসলমানের উপর একত্র হতে পারে না।

দলিল : ৩. খারাজ ওয়াজিব হয় এমন ভূমিতে, যা বল প্রয়োগ করে জয় করা হয়েছে। আর উশর ওয়াজিব হয় এমন ভূমিতে যার মালিকেরা স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছে। আর স্বেচ্ছা এবং বলপ্রয়োগ পরস্পর বিপরীত বিষয়। একই ভূমিতে এ দুটি বিষয় একত্র হতে পারে না। অর্থাৎ এরূপ হতে পারে না যে, একই ভূমির মালিক স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং তার উপর বলও প্রয়োগ করা হয়েছে। অতএব, স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ এবং বল প্রয়োগ যেমন একত্র হতে পারে না। তেমনি উশর এবং খারাজ একই ভূমিতে একত্র হতে পারে না। কেননা উশরের সম্পর্ক হলো স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণের সাথে আর খারাজের সম্পর্ক হলো বল প্রয়োগে জয় করার সাথে। অতএব, এ আকলী দলিল দ্বারাও প্রমাণিত হলো যে, উশর-খারাজ এক ভূমিতে একত্র হতে পারে না।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিলের জবাব : ইমাম শাফেয়ী (রা.) বলেছিলেন, উশর ও খারাজ উভয়ের সবব ভিন্ন। আহনাফের পক্ষ থেকে এর জাবাবে বলা হয়, উশর ও খারাজের সবব ভিন্ন ভিন্ন নয়; বরং উশর ও খারাজের সবব এক ও

https://e-ilm.weebly.com/

অভিন্ন, তা হলো ভূমির ফলনশীলতা। তবে উশরের ক্ষেত্রে এ ফলনশীলতা বাস্তবিকভাবে বিবেচনা করা হয়। আর খারাজের ক্ষেত্রে ফলনশীলতা গুণগতভাবে বিবেচনা করা হয়। অর্থাৎ বাস্তবিক পক্ষেই যদি কোনো ভূমিতে ফসল ফলে, তাহলে সে ফসলে উশর ওয়াজিব হয়। আর কেউ যদি ফলনশীল ভূমির আধিকারী হয়, তার উপর খারাজ ওয়াজিব হয়। সে ভূমিতে বাস্তবে ফসল উৎপন্ন হওয়া আবশ্যক নয়। এতএব, প্রমাণিত হলো যে, উশর ও খারাজের সবব মূলত এক ও অভিন্ন। উভয়ের সবব ভিন্ন ভিন্ন নয়। যেমন ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর দলিলে বলা হয়েছিল।

উশর খারাজ উভয়ের সবব এক হওয়ার পক্ষে আরেকটি দলিল হলো, উশর খারাজ উভয়কেএক বস্তুর দিকে সম্বন্ধ করা হয়। অর্থাৎ উভয়কে ভূমির দিকে সম্বন্ধ করা হয়। যেমন বলা হয়, خَرَاجُ الْأَرْضِ عُشْرُ الْأَرْضِ ভূমির উশর, ভূমির খারাজ। এর দ্বারাও বুঝা যায়, ভূমি তথা ফলনশীল ভূমিই হলো উশর খারাজ উভয়ের অভিন্ন সবব।

মোটকথা, গোটা বহছের আলোচনা পর্যালোচনা দ্বারা এটা প্রতীয়মান হয় যে, আলোচ্য মাসআলায় আহনাফের মতই প্রাধান্যযোগ্য। ইমামত্রয়ের মত নয়।

মাসআলা ২. মতভেদপূর্ণ দ্বিতীয় মাসআলাটি হলো এই যে, উশর বা খারাজের সাথে জাকাত একত্র হবে কিনা?

সুরতে মাসআলা এই যে, কোনো ব্যক্তি ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে উশরী ভূমি কিংবা খারাজী ভূমি ক্রয় করল। এমতাবস্থায় ক্রয়কৃত ভূমিটি উশরী হলে তার উপর উশর ওয়াজিব হবে আর ভূমিটি খারাজী হলে খারাজ ওয়াজিব হবে। পাশাপাশি ভূমিটি ব্যবসার মাল হিসাবে তার উপর জাকাত ও ওয়াজিব হবে কিনা? এ নিয়ে ইমামগণের মাঝে পূর্বরূপ মতানৈক্য রয়েছে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মত হলো, ক্রয়কৃত ভূমি উশরী হলে শুধু উশর ওয়াজিব হবে, ক্রয়কৃত ভূমিটি খারাজী হলে শুধু খারাজ ওয়াজিব হবে। উশর বা খারাজ কোনেটির সাথেই ব্যবসার পণ্য হিসাবে তাতে জাকাত ওয়াজিব হবে না।

ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মত হলো উশর বা খারাজ, দুটির জন্য কোনো একটি ওয়াজিব হবে। তার সাথে ব্যবসায়ের পণ্য হিসাবে তাতে জাকাতও ওয়াজিব হবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) ও এমত পোষণ করেন।

ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম শাফেয়ী (র.) মনে করেন- উশর, খারাজ এবং জাকাত, প্রত্যেকটির সবব এবং মহল ভিন্ন ভিন্ন। তাই একটি ওয়াজিব হওয়ার দ্বারা অপরটির ওয়াজিব হওয়া বাধাগ্রস্ত হয় না। তাই উশর, খারাজ ওয়াজিব হওয়া সত্ত্বেও জাকাত ওয়াজিব হবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন, উশর, খারাজ ও যাকাত সবগুলোই আল্লাহর হক। অতএব, একটি ভূমির মালিকানার কারণে তার উপর আল্লাহর দুটি হক ওয়াজিব হতে পারে না। যেমন- কেউ যদি ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে সায়েমা জন্তু ক্রয় করে, তাহলে তার উপর দুটি জাকাত ওয়াজিব হয় না। একটি সায়েমা জন্তু হিসাবে অপরটি ব্যবসার পণ্য হিসাবে; বরং সেখানে একটি জাকাতই ওয়াজিব হয়। তদ্রূপ আলোচ্য মাসআলায়ও উশর, খারাজের সাথে জাকাত ওয়াজিব হবে না; বরং কেবল উশর ওয়াজিব হবে অথবা খারাজ ওয়াজিব হবে।

وَلَا يَتَكَرَّرُ الْخَرَاجُ بِتَكَرُّرِ الْخَارِجِ الخ : উপরিউক্ত ইবারতের মর্ম এই যে, খারাজী ভূমিতে প্রতি বৎসর একবারই খারাজ ওয়াজিব হবে। ভূমিতে প্রতি বৎসর দুইবার বা তিনবার ফসল হলে, দুইবার বা তিনবার খারাজ উসুল করা যাবে না। কারণ হযরত ওমর (রা.) কোনো ভূমি হতে বৎসরে দুইবার খারাজ উসুল করেননি। আর এ বিষয়ে হযরত ওমর (রা.)-এর আমলই দলিল। অতএব, কোনো খারাজী হতে বৎসরে দুইবার খারাজ উসুল করা যাবে না।

তবে খারাজটি যদি খারাজে মুকাসামাহ হয়, তাহলে তা প্রত্যেক ফসল থেকেকেই উসুল করা হবে। কেননা খারাজে মুকাসামাহ হলো উশরের মতো। উশর যেমন প্রত্যেক ফসলে ওয়াজিব হয়, তেমনি খারাজে মুকাসামাহ ও প্রত্যেক ফসলে ওয়াজিব হয়।

উশর প্রত্যেক ফসলে ওয়াজিব হওয়ার কারণ হলো, উশরের অর্থই হচ্ছে উৎপাদিত ফসলের দশমাংশ। অতএব, যদি প্রত্যেক ফসল থেকে উশর নেওয়া না হয়, তাহলে তা আর উৎপন্ন ফসলের দশমাংশ থাকবে না; বরং তা কমে যাবে। অথচ ওয়াজিব হলো দশমাংশ। অতএব, বছরে যতবার ফসল উৎপন্ন হবে, ততবারই তা থেকে উশর নেওয়া হবে।

নোট : খারাজ দু-প্রকার, ১. খারাজে মুওয়াযযাফ। ২. খারাজে মুকাসামাহ।

১. খারাজী ভূমির উপর বাৎসরিক যে অর্থ ধার্য করে দেওয়া হয় তাকে খারাজে মুওয়াযযাফ বলে। যেমন- প্রতি জারীব আঙ্গুর বাগানের উপর ধার্য করে দেওয়া হলো প্রতি বৎসর দশ দিরহাম খারাজ পরিশোধ করতে হবে। সে বাগানে চাষি ফসল ফলাক বা নাই ফলাক ধার্যকৃত দশ দিরহাম তাকে প্রতি বৎসর পরিশোধ করতেই হবে। এটা হলো খারাজে মুওয়াযযাফ। এটাই বৎসরে একবার ওয়াজিব হয়।

২. খারাজী ভূমিতে উৎপন্ন ফসলের উপর অনুপাতিক হারে যে খারাজ ধার্য করা হয়, তাকে খারাজে মুকাসামাহ বলে যেমন- কোনো খারাজী ভূমির উপর এরূপ ধার্য করা হলো যে, এ ভূমিতে যে ফসল উৎপন্ন হবে, তার অর্ধেক বা তার এক তৃতীয়াংশ খারাজ হিসাবে জমা দিতে হবে। খাইবারের খেজুর বাগানে যেরূপ নির্ধারণ করা হয়েছিল। এটাই হলো খারাজে মুকাসামাহ। এটা উশরের মতো প্রতি ফসল থেকেই উসুল করা হয়।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ الْجِزْيَةِ

وَهِيَ عَلَى ضَرْبَيْنِ : جِزْيَةٌ تُوْضَعُ بِالتَّرَاضِيْ وَالصُّلْحِ فَتَتَقَدَّرُ بِحَسَبِ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الْاِتِّفَاقُ كَمَا {صَالَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَهْلَ نَجْرَانَ عَلَى اَلْفٍ وَمِائَتَيْ حُلَّةٍ}، وَلِاَنَّ الْمُوْجِبَ هُوَ التَّرَاضِيْ فَلَا يَجُوْزُ التَّعَدِّيْ اِلَى غَيْرِ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْاِتِّفَاقُ ـ

পরিচ্ছেদ : জিজিয়া প্রসঙ্গ

অনুবাদ : জিজিয়া দু-প্রকার। একপ্রকার জিজিয়া পারস্পরিক সম্মতি ও সমঝোতার ভিত্তিতে ধার্য করা হয়। সুতরাং যে পরিমাণের উপর ঐকমত্য হয় সে পরিমাণই হবে। যেমন– রাসূল ﷺ নাজরানবাসীদের সাথে এক হাজার দুই শত সেট পোশাকের উপর সমঝোতা করেছিলেন। তা ছাড়া এ কারণে যে, এখানে পারস্পরিক সম্মতিই সাব্যস্তকারী। সুতরাং যে পরিমাণের উপর ঐকমত্য হয়েছে তা লঙ্ঘন করে অন্য পরিমাণ ধার্য করা যাবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে ছিল খারাজুল আরদ বা ভূমি করের আলোচনা। এ পরিচ্ছেদে হবে খারাজে রা'স বা ব্যক্তি করের আলোচনা। খারাজে রা'স -এর অপর নাম হলো জিজিয়া। الجزية শব্দটি একবচন। তার বহুবচন হলো الجزى আর তা جزاء শব্দ থেকে গৃহীত। যার অর্থ হলো– বদলা। الجزية-কে জিজিয়া এ কারণে বলা হয় যে, এটা জিম্মির হত্যার বদলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ জিম্মি যখন জিজিয়া আদায়ে সম্মত হয়, তখন আর তাকে হত্যা করা হয় না। পরিভাষায় জিজিয়া বলা হয়, যে অর্থ বা সম্পদ জিম্মি ব্যক্তির নিরাপত্তার দায় স্বরূপ মুসলিম শাসকের নিকট পরিশোধ করতে হয়। জিজিয়া দু-প্রকার। একপ্রকার জিজিয়া হলো যা মুসলিম ও অমুসলিমদের পারস্পরিক সম্মতি ও সমঝোতার ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। যেমন– রাসূল ﷺ নাজরানের (নাজরান ইয়ামানের একটি অঞ্চল, যেখানের অধিবাসীরা খ্রিস্টান ছিল) অধিবাসীদের সাথে সমঝোতা করেছিলেন এভাবে যে, তারা প্রতিবছর একহাজার দুইশত কাপড় জোড়া জিজিয়া স্বরূপ পরিশোধ করবে। এ প্রকার জিজিয়ার যে পরিমাণ উভয় পক্ষের ঐকমত্য অনুসারে নির্ধারিত হয়, তাই বাস্তবায়ন করতে হয়; লঙ্ঘন করা জায়েজ নয়।

নাজরানবাসীদের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যে চুক্তি হয়েছিল, সে চুক্তি সম্পর্কিত হাদীসটি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। হাদীসটি নিম্নরূপ :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ صَالَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَهْلَ نَجْرَانَ عَلَى الْفَيْءِ حُلَّةِ النِّصْفِ فِيْ صَفَرَ وَ الْبَقِيَّةَ فِيْ رَجَبَ يُؤَدُّوْنَهَا اِلَى الْمُسْلِمِيْنَ ـ

অর্থাৎ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ নাজরানবাসীদের সাথে সমঝোতা করেন এ মর্মে যে, তারা প্রতি বছর দু-হাজার জোড়া কাপড় মুসলমানদের হাতে পরিশোধ করবে। অর্ধেক পরিশোধ করবে সফর মাসে বাকি অর্ধেক পরিশোধ করবে রজব মাসে। –(আবূ দাউদ শরীফ)

উল্লেখ্য যে, বর্ণিত হাদীসে দু-হাজার হুল্লার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আর হেদায়া গ্রন্থকার বলেছেন, এক হাজার দুইশত হুল্লার কথা, এটি সঠিক নয়। হাদীসের বক্তব্যই সঠিক। –(ফাতহুল কাদীর দ্রষ্টব্য)

https://e-ilm.weebly.com/

وَجِزْيَةٌ يَبْتَدِئُ الْإِمَامُ وَضْعَهَا اِذَا غَلَبَ الْإِمَامُ عَلَى الْكُفَّارِ، وَاَقَرَّهُمْ عَلَى اَمْلَاكِهِمْ، فَيَضَعُ عَلَى الْغَنِيِّ الظَّاهِرِ الْغِنٰى فِيْ كُلِّ سَنَةٍ ثَمَانِيَةً وَاَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا يَاْخُذُ مِنْهُمْ فِيْ كُلِّ شَهْرٍ اَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ . وَعَلٰى وَسَطِ الْحَالِ اَرْبَعَةً وَعِشْرِيْنَ دِرْهَمًا فِيْ كُلِّ شَهْرٍ دِرْهَمَيْنِ، وَعَلَى الْفَقِيْرِ الْمُعْتَمِلِ اِثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا فِيْ كُلِّ شَهْرٍ دِرْهَمًا وَهٰذَا عِنْدَنَا ـ

অনুবাদ : আরেক প্রকার জিজিয়া হলো কাফেরদের উপর বিজয় লাভ করা এবং তাদেরকে তাদের সহায় সম্পদের উপর বহাল রাখার পর শাসক নিজেই শুরুতে যা নির্ধারণ করেন। সেক্ষেত্রে মালদার ব্যক্তির উপর প্রতি বছর আটচল্লিশ দিরহাম নির্ধারণ করবেন এবং প্রতিমাসে চার দিরহাম হারে উশুল করবেন। আর মধ্যবিত্ত ব্যক্তির উপর চল্লিশ দিরহাম জিযিয়া নির্ধারণ করবেন এবং প্রতি মাসে দুই দিরহাম হারে উসুল করবেন। আর শ্রমে নিযুক্ত ব্যক্তির উপর বার দিরহাম ধার্য করবেন এবং মাস প্রতি এক দিরহাম উসুল করবেন। এটা আমাদের অভিমত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

দ্বিতীয় প্রকার জিজিয়া হলো, যা মুসলিম বিজিত কাফেরদের উপর অনুগ্রহ পূর্বক ধার্য করে দেন। অর্থাৎ মুসলমান বাহিনী যখন কাফেরদের উপর শক্তি-বলে জয় লাভ করে, তখন শাসকের এখতিয়ার থাকে। সে ইচ্ছা করলে তাদেরকে হত্যা করতে পারে। ইচ্ছা করলে তাদেরকে দাস বানাতে পারে। ইচ্ছা করলে তাদেরকে তাদের সহায় সম্পদের উপর বহাল রেখে তাদের উপর জিজিয়া ধার্য করে দিতে পারে।

অতএব, মুসলিম শাসক যদি বিজিত কাফেরদেকে হত্যা না করে এবং দাস না বানিয়ে অনুগ্রহ পূর্বক তাদের মালিকানায় বহাল রাখেন, তাহলে তাদের উপর একটি জিজিয়া আরোপ করে দিবেন। এই জিজিয়ার পরিমাণ নির্ধারিত হবে কাফেরদের অর্থনৈতিক অবস্থার তারতম্যের ভিত্তিতে। তাদেরকে তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করা হবে– ১. বিত্তবান শ্রেণি ২.মধ্যবিত্ত শ্রেণি ৩. দরিদ্র শ্রেণি।

যারা দশ হাজার দিরহাম বা তার চেয়ে বেশি অর্থের মালিক হয়, তাদেরকে বিত্তবান শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করা হবে এবং তাদের জিজিয়ার পরিমাণ হবে বাৎসরিক আটচল্লিশ দিরহাম। বোঝা হালকা করার উদ্দেশ্যে প্রতিমাসে চার দিরহাম করে উসুল করা হবে। যারা দুইশত দিরহাম থেকে দশ হাজার দিরহামের কম সম্পদের মালিক হয় তাদেরকে মধ্যবিত্ত শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করা হবে। তাদের জিজিয়ার পরিমাণ হবে বাৎসরিক চব্বিশ দিরহাম বোঝা হালকা করণার্থে প্রতিমাসে দুই দিরহাম করে উসুল করা হবে।

যারা দুইশত দিরহামের কম অর্থের মালিক বা যাদের কাছে কোনো সম্পদ সঞ্চিত নেই কিন্তু কর্মক্ষম, তারা হবে দরিদ্র শ্রেণি। তাদের জিজিয়ার পরিমাণ হবে বৎসরে বারো দিরহাম। প্রতিমাসে উসুল করা হবে এক দিরহাম এ হলো জিজিয়ার হার, আহনাফের মতানুসারে।

কোনো কাফেরের উপর জিযিয়া আরোপিত হওয়ার জন্য শর্ত হলো লোকটি مُعْتَمِل বা কর্মক্ষম হতে হবে। যুদ্ধ করার উপযুক্ত হতে হবে। অতএব, হাত পা অসার এমন ব্যক্তির উপর এবং লেংড়া ব্যক্তির উপর জিজিয়া আরোপ করা হবে না।

অনুরূপভাবে যদি কোনো কাফের পূর্ণ একবছর অসুস্থ থাকে কিংবা বছরের অধিকাংশ সময় অসুস্থ থাকে কিংবা অর্ধেক বছর অসুস্থ থাকে, তাহলে তার উপরও জিজিয়া আরোপ করা হবে না।

কোনো কাফের যদি কাজ করতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বে কাজ না করে বেকার বসে থাকে, তাহলে তার জিজিয়া মওকুফ হবে না; বরং সে কর্মক্ষম হওয়ার কারণে তার উপর জিজিয়া ওয়াজিব হবে। ফকীহ আবূ জাফর (র.) বলেছেন, ধনী মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র হওয়ার বিষয়টি পরিবেশ নির্ভর। কেননা বলখ শহরে কোনো ব্যক্তি পঞ্চাশ হাজার দিরহামের মালিক হলে তাকে ধনী মনে করা হয়। অথচ বাগদাদে সে ব্যক্তিকে ধনী মনে করা হয় না। অতএব, প্রত্যেক দেশের পরিবেশের দিকে লক্ষ্য রেখে ধনী, দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত নির্ণয় করা কর্তব্য। কেউ কেউ বলেছেন, যে ব্যক্তি স্বাভাবিক জীবনযাপনের সামর্থ্য রাখে না সে দরিদ্র। যে ব্যক্তি নিজের ও নিজ পরিবার-পরিজনের ব্যয়ভার বহন করতে সক্ষম সে মধ্যবিত্ত যে ব্যক্তি নিজের ও পরিবারের খরচের তুলনায় বেশি অর্থের মালিক, সে ধনী বা বিত্তবান।

https://e-ilm.weebly.com/

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رحـ) : يَضَعُ عَلَى كُلِّ حَالِمٍ دِيْنَارًا أَوْ مَا يَعْدِلُ الدِّيْنَارَ، وَالْغَنِيُّ وَالْفَقِيْرُ فِيْ ذٰلِكَ سَوَاءٌ ﴿لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ لِمُعَاذٍ خُذْ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ وَحَالِمَةٍ دِيْنَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ﴾ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ . وَلِأَنَّ الْجِزْيَةَ إِنَّمَا وَجَبَتْ بَدَلًا عَنِ الْقَتْلِ حَتّٰى لَا تَجِبَ عَلٰى مَنْ لَا يَجُوْزُ قَتْلُهُ بِسَبَبِ الْكُفْرِ كَالذَّرَارِيِّ وَالنِّسْوَانِ، وَهٰذَا الْمَعْنٰى يَنْتَظِمُ الْفَقِيْرَ وَالْغَنِيَّ . وَمَذْهَبُنَا مَنْقُوْلٌ عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ (رضـ)، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمْ أَحَدٌ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ، وَلِأَنَّهُ وَجَبَ نُصْرَةً لِلْمُقَاتِلَةِ فَتَجِبُ عَلَى التَّفَاوُتِ بِمَنْزِلَةِ خَرَاجِ الْأَرْضِ، وَهٰذَا لِأَنَّهُ وَجَبَ بَدَلًا عَنِ النُّصْرَةِ بِالنَّفْسِ وَالْمَالِ وَذٰلِكَ يَتَفَاوَتُ بِكَثْرَةِ الْوَفْرِ وَقِلَّتِهِ، فَكَذَا مَا هُوَ بَدَلُهُ، وَمَا رَوَاهُ مَحْمُوْلٌ عَلٰى أَنَّهُ كَانَ ذٰلِكَ صُلْحًا، وَلِهٰذَا أَمَرَهُ بِالْأَخْذِ مِنَ الْحَالِمَةِ وَإِنْ كَانَتْ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا الْجِزْيَةُ ـ

অনুবাদ : ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, সর্বাবস্থায় এক দিনার বা দিনারের সমপরিমাণ ধার্য করা হবে। এক্ষেত্রে ধনী-দরিদ্র সমান। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত মু'আয (রা.)-কে বলেছিলেন-

خُذْ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ وَحَالِمَةٍ دِيْنَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ

'প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক নর ও নারী থেকে এক দিনার কিংবা তার সমপরিমাণ মাআফেরী চাদর উসুল করো।'

এখানে ধনী দরিদ্রের মাঝে তফাৎ করেননি। তাছাড়া এ কারণে যে, জিজিয়া ওয়াজিব হয় হত্যার পরিবর্তে। এ কারণেই যাদেরকে কুফরির কারণে হত্যা করা জায়েজ হয় না, তাদের উপর জিজিয়াও ওয়াজিব হয় না। যেমন– শিশু ও স্ত্রীলোক। আর এ গুণগত দিক ধনী-দরিদ্র উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করে।

আমাদের মাযহাব হযরত ওমর, ওসমান ও আলী (রা.) হতে বর্ণিত আছে। আর আনসার ও মুহাজিরদের কেউ তাদের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করেননি। তাছাড়া এ কারণে যে, তা ওয়াজিব হয়েছে মুজাহিদদের সাহায্য সহায়তা স্বরূপ। সুতরাং ভূমির খারাজের মতো তারতম্যের ভিত্তিতেই জিজিয়া সাব্যস্ত হবে।

এর প্রমাণ এই যে, জিজিয়া ওয়াজিব হয়েছে যুদ্ধে জান ও মাল দ্বারা সাহায্য করার বাধ্যবাধকতার পরিবর্তে। আর তা সম্পদের প্রাচুর্য ও স্বল্পতার কারণে পার্থক্য করা হয়। সুতরাং যা তার স্থলবর্তী তাও পার্থক্যপূর্ণ হবে।

ইমাম শাফেয়ী (র.) যে হাদীস বর্ণনা করেছেন তা এক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে, তা সমঝোতার ভিত্তিতে হয়েছিল। এ কারণেই তিনি তাকে আদেশ করেছেন প্রাপ্তবয়স্কা নারীর নিকট থেকে গ্রহণের, অথচ তার থেকে জিজিয়া গ্রহণ করা হয় না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিউক্ত ইবারতে জিজিয়ার পরিমাণ সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতামত বর্ণনা করা হয়েছে। মূলত জিজিয়ার পরিমাণ নিয়ে ইমামগণের মাঝে বিস্তর মতপার্থক্য হয়েছে। এ সম্পর্কে আহনাফের মত ইতঃপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম মালেক (র.) বলেছেন, ধনী লোকের নিকট থেকে চার দিনার বা চল্লিশ দিরহাম নেওয়া হবে। দরিদ্র লোকের নিকট থেকে এক দিনার বা দশ দিরহাম নেওয়া হবে। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) বলেন, জিজিয়ার পরিমাণ নির্ধারিত নেই; বরং জিজিয়ার পরিমাণ নির্ধারণের বিষয়টি ইমামের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীল। সুফিয়ান ছাওরী (র.) অনুরূপ মত পোষণ করেন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) হতে এক রেওয়ায়েত আহনাফের মতও রয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, জিজিয়ার পরিমাণ হলো একদিনার সমপরিমাণ সম্পদ। এতে ধনী-গরিব সমান :

দলিল পর্ব : ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর প্রথম দলিল হলো হযরত মু'আয (রা.)-কে সম্বোধন করে রাসূল ﷺ -এর উক্তি :

خُذْ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ وَحَالِمَةٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرِ

অর্থাৎ (হে মু'আয) প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক নর-নারী থেকে এক দিনার বা তার সমপরিমাণ মাআফেরী চাদর উসূল করো। হাদীসটি ইমাম তিরমিযী, আবূ দাঊদ, নাসায়ী প্রমুখ বর্ণনা করেছেন।

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, উক্ত হাদীসে নবী করীম ﷺ হযরত মু'আযকে আদেশ করেছেন প্রাপ্তবয়স্ক নারী-পুরুষের কাছ থেকে এক দিনার করে জিজিয়া উসূল করতে। ধনী-গরিবের মাঝে কোনোরূপ পার্থক্য করা হয়নি। অতএব, এটাই হবে জিজিয়ার বিধান।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দ্বিতীয় দলিল হলো, জিজিয়া ওয়াজিব হয় হত্যার পরিবর্তে। অর্থাৎ জিজিয়া প্রদানের কারণে জিম্মি ব্যক্তি মুসলমানের হাতে নিহত হওয়া থেকে রক্ষা পায়। এ কারণে যেসব কাফের হত্যা করা বৈধ নয়, তাদের উপর জিজিয়া আরোপ করা যায় না। যেমন– কাফের শিশু এবং কাফের মহিলা। এরা কাফের হওয়া সত্ত্বেও এদেরকে হত্যা করা যায় না। ফলে এদের উপর জিজিয়াও আরোপ করা হয় না। এর দ্বারা বুঝা যায়, জিজিয়া হলো হত্যার বদলা স্বরূপ। অতএব, হত্যার কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার ক্ষেত্রে যেহেতু ধনী-গরিব সমান, সেহেতু জিজিয়ার মধ্যে ধনী-গরিব সমান হবে।

আহনাফের দলিল : আহনাফের প্রথম দলিল হলো, সাহাবীগণের ইজমা। কেননা আহনাফ যে মত অবলম্বন করেছেন, তা হযরত ওমর, ওসমান ও আলী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে। এ সম্পর্কিত হাদীসটি ইবনে আবী শায়বাহ তার মুসান্নাফে উল্লেখ করেছেন। যার সনদ ও মতন নিম্নরূপ :

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مسهرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيْ عَنْ اَبِيْ عَوْنٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الثَّقَفِيْ قَالَ وَضَعَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رض فِيْ الجِزْيَةِ عَلٰى رُؤُوْسِ الرِّجَالِ عَلَى الغَنِيِّ ثَمَانِيَةً و اَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا وعَلَى المُتَوَسِّطِ اَرْبَعَةً وَعِشْرِيْنَ وعَلَى الفَقِيْرِ اِثْنَا عَشَرَ دِرْهَمًا ـ

অর্থাৎ হযরত ওমর (রা.) জিজিয়া ধার্য করেছেন পুরুষদের উপর, ধনীর উপর আটচল্লিশ দিরহাম। মধ্যবিত্তের উপর চব্বিশ দিরহাম, আর দরিদ্রের উপর বারো দিরহাম।

হযরত ওমর (রা.)-এর এ আমলটি ছিল আনসার মুহাজির সকল সাহাবীদের সম্মুখে। কিন্তু কেউ কোনো আপত্তি করেননি। হযরত ওমর (রা.)-এর পরে হযরত ওসমান (রা.)ও এ নীতির উপর আমল করেছেন। হযরত ওসমান (রা.)-এর পর এভাবে উক্ত মতের উপর সাহাবীদের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর সাহাবীদের ইজমা نَصّ قَطْعِيْ -এর সমকক্ষ। অর্থাৎ কুরআন ও হাদীসের অকাট্য উক্তির সমান।

আহনাফের দ্বিতীয় দলিল হলো, জিজিয়া ওয়াজিব হয় মুসলমানদেরকে যুদ্ধের সময় জানমাল দিয়ে সাহায্য করার পরিবর্তে, অর্থাৎ কাফেরদের উপর ওয়াজিব ছিল মুসলমানদের সাথে জান মাল নিয়ে যুদ্ধে শরিক হওয়া। কিন্তু তা তারা করে না, এর পরিবর্তে তাদের উপর জিজিয়া ওয়াজিব হয়। আর জানমাল দিয়ে যুদ্ধের সময় সাহায্য করার বিষয়টি আর্থিক সামর্থ্যের ভিত্তিতে তারতম্য হয়ে থাকে। অতএব, এবিষয়ের বিকল্প বিষয় যা অর্থাৎ জিজিয়া, তাও সামর্থ্যের তার তম্যের কারণে তারতম্য হবে। অর্থাৎ তারা যদি জিহাদের সময় মুসলমানদেরকে জান মাল দিয়ে সাহায্য করত, তাহলে তারা অবশ্যই সকলে একরকম সাহায্য করতে পারত না। প্রত্যেকেই নিজ নিজ সাধ্য অনুযায়ী সাহায্য করত। কেউ কম কেউ বেশি। অতএব, এ সাহায্যের বদলায় যে জিজিয়া ওয়াজিব হবে তাও তাদের সাধ্যের তারতম্যের ভিত্তিতে তারতম্য হবে। বিত্তবান লোকের জিযিয়া হবে সবচেয়ে বেশি। মধ্য বিত্তদের হবে মধ্যম পর্যায়ে। দরিদ্র লোকদের জিজিয়া হবে সবচেয়ে কম।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিলের জবাব : ইমাম শাফেয়ী (র.) যে হাদীসটি দলিল হিসাবে পেশ করেছেন, তা আলোচ্য জিজিয়া তথা দ্বিতীয় প্রকার জিজিয়া সম্পর্কিত নয়; বরং হাদীসটি জিজিয়ার প্রথম প্রকার সম্পর্কিত। অর্থাৎ হাদীসে যে বলা হয়েছে, প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক নর-নারী হতে এক দিনার জিজিয়া উসূল কর। তা ছিল সুলাহ বা সমঝোতার ভিত্তিতে ধার্যকৃত জিজিয়া অর্থাৎ জিজিয়ার প্রথম প্রকার। এর প্রমাণ হলো, উক্ত জিজিয়া প্রথম প্রকার তথা সমঝোতার ভিত্তিতে না হলে, নারীর কাছ থেকে জিজিয়া নেওয়া হতো না। যখন নারীর কাছ থেকেও এক দিনার নিতে বলা হলো, তখন বুঝা গেল এটি জিজিয়ার দ্বিতীয় প্রকার নয়; বরং জিজিয়ার প্রথম প্রকার। অতএব, হাদীস দ্বারা জিজিয়ার দ্বিতীয় প্রকার সম্পর্কে দলিল পেশ করা যাবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ وَتُوْضَعُ الْجِزْيَةُ عَلَى اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمَجُوْسِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ﴾ -اَلْاٰيَةُ وَوَضَعَ ﴿رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْجِزْيَةَ عَلَى الْمَجُوْسِ﴾

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কিতাবী ও মাজূসীদের উপর জিজিয়া ধার্য করা হবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية - যারা কিতাব প্রাপ্ত হয়েছে (তাদের সঙ্গে লড়াই কর) যতক্ষণ না তারা জিজিয়া প্রদান করে। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ মাজূসীদের উপর জিজিয়া আরোপ করেছিলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কিতাবী সম্প্রদায়ের উপর জিজিয়া আরোপ করার ব্যাপারে কারো কোনো মতানৈক্য নেই; বরং কিতাবীদের জিজিয়া আরোপিত হওয়ার বিষয়টি সর্বসম্মত। কারণ, এ বিষয়ে সুস্পষ্ট নস রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية 'জিজিয়া না দেওয়া পর্যন্ত কিতাবী সম্প্রদায় বলতে উদ্দেশ্য হলো, ইহুদি নাসারা ও তাদের ধর্মাবলম্বী যে কোনো গোষ্ঠী।

ইহুদিরা তাওরাতে বিশ্বাসী এবং নিজেদেরকে হযরত মূসা (আ.)-এর অনুসারী বলে দাবি করে। নাসারারা ইঞ্জীলে বিশ্বাসী, তারা নিজদেরকে হযরত ঈসা (আ.)-এর অনুসারী বলে দাবি করে। নাসারাদের মধ্যে অনেক উপ-সম্প্রদায় রয়েছে। যেমন- ইয়াকূবিয়্যাহ, নাসতূরিয়্যাহ, মালাকিয়্যাহ, রূম, আরমান ইত্যাদি সবই নাসারা বা আহলে কিতাব বলে গণ্য। সকল গোষ্ঠীর উপরই জিজিয়া আরোপিত হবে।

সাবীদের সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) হতে বর্ণিত আছে, সাবীরা নাসারাদেরই এক গোষ্ঠী। হযরত ওমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, সাবীরা শনিবার উদ্‌যাপন করে, তাই তারা ইহুদিদের অন্তর্ভুক্ত। মুজাহিদ (র.) বলেছেন, সাবীরা ইহুদি ও নাসারার মাঝামাঝি এক সম্প্রদায়। কিন্তু বিশদ কথা হলো এই যে, সাবীরা যদি কোনো নবীর কিতাব স্বীকার করে, তাহলে তারা আহলে কিতাব। আর যদি সাবীরা তারকার পূজা করে, তাহলে তারা মূর্তিপূজকের ন্যায়। مَجُوْسٌ শব্দটি مَجُوْسِى-এর বহুবচন। তাদের বিশ্বাস হলো এরূপ যে, ভালো ও কল্যাণ সংঘটিত হয় নূরের পক্ষ থেকে, তথা আলো থেকে। মন্দ ও অকল্যাণ ঘটে জুলমত বা অন্ধকার হতে। তাই তারা আগুনের পূজা করে। কারণ আগুন আলোর সাথে সম্পর্কিত। তবে কিতাবের সাথে তাদেরও সম্পর্ক আছে; এজন্য তাদের থেকে জিজিয়া নেওয়া হবে।

হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, মাজূসীদের কাছে ইলম ছিল, কিতাব ছিল। কিন্তু একবার তাদের বাদশাহ নিজ কন্যার সাথে কিংবা বোনের সাথে কুকর্মে লিপ্ত হয়। তখন তাদের অন্তর থেকে ইলম উঠিয়ে নেওয়া হয় এবং তাদের কিতাবও অবশিষ্ট থাকেনি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ মাজূসীদের উপর জিজিয়া আরোপ করেছেন। ইমাম বুখারী (র.) তাঁর সহীহ বুখারীর জিজিয়া সম্পর্কিত অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ওমর (রা.) মাজূসীদের কাছ থেকে জিজিয়া নিতেন না। কিন্তু হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) সাক্ষ্য দিলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হাজারবাসী (হাজার, বাহরাইনের একটি শহরের নাম) মাজূসীদের থেকে জিযিয়া নিয়েছেন। হাদীসটি ইমাম আবূ দাউদ এবং ইমাম তিরমিযী (র.) বর্ণনা করেছেন।

মোটকথা, আহলে কিতাবের মতো মাজূসীদের উপরও জিজিয়া আরোপ করা হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ وَعَبَدَةِ الْأَوْثَانِ مِنَ الْعَجَمِ وَفِيْهِ خِلَافُ الشَّافِعِيِّ . هُوَ يَقُوْلُ : إِنَّ الْقِتَالَ وَاجِبٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَقَاتِلُوْهُمْ﴾ إِلَّا أَنَّا عَرَفْنَا جَوَازَ تَرْكِهِ فِيْ حَقِّ أَهْلِ الْكِتَابِ بِالْكِتَابِ وَفِيْ حَقِّ الْمَجُوْسِ بِالْخَبَرِ فَبَقِيَ مَنْ وَرَاءَهُمْ عَلَى الْأَصْلِ . وَلَنَا أَنَّهُ يَجُوْزُ اسْتِرْقَاقُهُمْ فَيَجُوْزُ ضَرْبُ الْجِزْيَةِ عَلَيْهِمْ إِذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَشْتَمِلُ عَلَى سَلْبِ النَّفْسِ مِنْهُمْ فَإِنَّهُ يَكْتَسِبُ وَيُؤَدِّيْ إِلَى الْمُسْلِمِيْنَ وَنَفَقَتُهُ فِيْ كَسْبِهِ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, **এবং অনারবী মূর্তিপূজকদের উপর জিজিয়া ধার্য করা হবে।** এ ক্ষেত্রে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর ভিন্নমত রয়েছে। তিনি বলেন, আল্লাহর আদেশ وَقَاتِلُوْهُمْ (তোমরা তাদের সাথে লড়াই কর) -এর কারণে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা অবশ্যকর্তব্য। তবে কিতাবীদের ক্ষেত্রে লড়াই পরিহার করার বৈধতা আমরা বিতাবুল্লার দ্বারা জেনেছি। আর মাজূসীদের ক্ষেত্রে হাদীস দ্বারা জেনেছি। সুতরাং অন্যদের ক্ষেত্রে বিধানটি মূল অবস্থায় বহাল থাকবে।

আমাদের দলিল হলো, যেহেতু তাদেরকে দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করা বৈধ হবে, সেহেতু তাদের উপর জিযিয়া আরোপ করাও বৈধ হবে। কেননা উভয়ের প্রতিটি দেহসত্তার স্বত্ব হরণ করার অর্থকে অন্তর্ভুক্ত করে এভাবে যে, সে উপার্জন করে মুসলমানদেরকে প্রদান করে অথচ তার ভরণপোষণ নিজের উপার্জনের উপর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আরবের মুশরিকদের উপর জিজিয়া আরোপ করা হয় না। তারা হয়তো ইসলাম গ্রহণ করবে অথবা তাদেরকে হত্যা করা হবে। অনারবী মুশরিকদের উপর জিজিয়া আরোপ করা যাবে কিনা, এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। আহনাফের মতে অনারবী মুশরিকদের উপর জিজিয়া আরোপ করা হবে। ইমাম শাফেয়ী (রা.)-এর মত হলো, অনারবী মুশরিকদের উপরও জিযিয়া আরোপ করা যাবে না। তারা হয়তো ইসলাম গ্রহণ করবে অথবা তাদেরকে হত্যা করা হবে। এক্ষেত্রে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হলো, আল্লাহ তা'আলা আদেশ করেছেন তোমরা তাদের (বিধর্মীদের) সাথে লড়াই কর। এ নির্দেশ সকল বিধর্মীকে অন্তর্ভুক্ত করে। পরে আমরা কুরআনের আয়াত দ্বারা জানতে পেরেছি আহলে কিতাবীদের উপর জিজিয়া আরোপ করা যায় এবং তাদেরকে নিজেদের ধর্মের উপর থাকতে দেওয়া যায়। তদ্রূপ হাদীস দ্বারা জানতে পেরেছি মাজূসীদের উপরও জিজিয়া আরোপ করে তাদেরকে তাদের ধর্মের উপর থাকতে দেওয়া যায়। অতএব, যুদ্ধ করার বিধান থেকে আহলে কিতাব ও মাজূসীরা আওতামুক্ত হবে। এছাড়া অন্য সব বিধর্মী وَقَاتِلُوْهُمْ (তাদের সাথে যুদ্ধ কর) এ বিধানের আওতাভুক্ত থাকবে। অতএব, অনারবী মুশরিককরা যেহেতু আহলে কিতাব বা মাজূসী নয়, সেহেতু তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। তাদের উপর জিজিয়া আরোপ করে, নিজ ধর্মের উপর থাকতে দেওয়া যাবে না।

আহনাফের দলিল হলো, অনারবী মুশরিকদের গোলাম বানানো সর্বসম্মতিক্রমে জায়েজ আছে। তাই তাদের উপর জিজিয়া আরোপ করাও জায়েজ হবে। কারণ গোলাম বানানো এবং জিজিয়া আরোপ একই ধরনের বিষয়। কেননা গোলাম বানানোর মাধ্যমে যেমন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব হরণ করা হয়, তেমনি জিজিয়া আরোপের দ্বারাও ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব হরণ করা হয়। গোলাম বানানোর দ্বারা ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব হরণ করা হয়। এভাবে যে, গোলাম যা উপার্জন করে তার মালিক সে হতে পারে না; বরং তার উপার্জনের মালিক হয় তার মনিব। এ হিসাবে গোলাম হয়ে যায় পশুর মতো। তার কোনো ব্যক্তিত্ব থাকে না। তেমনি জিযিয়া আরোপ করা হলেও ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব হারায়। তা এভাবে যে, জিযিয়া আরোপকৃত ব্যক্তির উপার্জিত অর্থ মুসলমানদেরকে দিয়ে দিতে হয়। সাথে সাথে তার নিজের ভরণপোষণও থাকে তার নিজ দায়িত্বে। এ হিসাবে জিযিয়া আরোপিত ব্যক্তি আর গোলাম ব্যক্তি এক সমান। অতএব, কাউকে গোলাম বানানো এবং কারো উপর জিজিয়া আরোপ করা একই কথা। সুতরাং অনারবী মুশরিককে যদি গোলাম বানানো বৈধ হয়, তাহলে তার উপর জিজিয়া আরোপ করাও বৈধ হবে। আর গোলাম বানানো তো সর্বসম্মতিক্রমে বৈধ, তাই জিজিয়া আরোপ করাও বৈধ। এটাই আহনাফের মাযহাব

https://e-ilm.weebly.com/

وَاِنْ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ قَبْلَ ذٰلِكَ فَهُمْ وَنِسَاؤُهُمْ وَصِبْيَانُهُمْ فَيْءٌ لِجَوَازِ اِسْتِرْقَاقِهِمْ وَلَا تُوْضَعُ عَلٰى عَبَدَةِ الْاَوْثَانِ مِنَ الْعَرَبِ وَلَا الْمُرْتَدِّيْنَ لِاَنَّ كُفْرَهُمَا قَدْ تَغَلَّظَ. اَمَّا مُشْرِكُو الْعَرَبِ فَلِاَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَشَاَ بَيْنَ اَظْهُرِهِمْ وَالْقُرْاٰنُ نَزَلَ بِلُغَتِهِمْ فَالْمُعْجِزَةُ فِيْ حَقِّهِمْ اَظْهَرُ. وَاَمَّا الْمُرْتَدُّ: فَلِاَنَّهُ كَفَرَ بِرَبِّهِ بَعْدَمَا هُدِيَ لِلْاِسْلَامِ وَوَقَفَ عَلٰى مَحَاسِنِهِ فَلَا يُقْبَلُ مِنَ الْفَرِيْقَيْنِ اِلَّا الْاِسْلَامُ اَوِ السَّيْفُ زِيَادَةً فِي الْعُقُوْبَةِ. وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللّٰهُ يُسْتَرَقُّ مُشْرِكُو الْعَرَبِ. وَجَوَابُهُ مَا قُلْنَا ـ

অনুবাদ : যদি জিজিয়া নির্ধারণের পূর্বেই তাদের উপর বিজয় অর্জন হয়, তাহলে তারা, তাদের স্ত্রীরা, তাদের সন্তানরা মালে গনিমত হবে। কেননা তাদেরকে গোলাম বানানো বৈধ আছে।

আরবের মূর্তিপূজকদের উপর এবং (আরব-অনারব) মুরতাদদের উপর জিজিয়া নির্ধারণ করা হবে না। কেননা তাদের কুফরি গুরুতর। আরবের মুশরিকদের ক্ষেত্রে কারণ এই যে, নবী করীম ﷺ তাদের মাঝেই আবির্ভূত হয়েছেন এবং কুরআন তাদের ভাষায় নাজিল হয়েছে। সুতরাং মু'জিযা তাদের ক্ষেত্রে অধিক প্রকাশিত। আর মুরতাদের ক্ষেত্রে কারণ এই যে, সে তার প্রতিপালকের সাথে কুফরি করেছে তাকে ইসলামের দিকে পথপ্রদর্শন করার পর এবং ইসলামের যাবতীয় সৌন্দর্য অবগত করার পর। সুতরাং অধিক শাস্তি হিসাবে উভয় দল থেকে ইসলাম কিংবা তলোয়ার ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করা হবে না।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে আরব মুশরিকদের দাস বানানো যাবে। এর জবাব তা-ই, যা আমরা পূর্বে বলেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আহলে কিতাব, মাজুসী এবং অনারবী মুশরিকদের উপর যদি জিজিয়া আরোপ করার পূর্বে মুসলমানদের বিজয় লাভ হয়ে যায়, তাহলে তাদের পুরুষ, নারী, শিশু সবই গনিমতের মালে পরিণত হবে। তখন ইমামের এখতিয়ার থাকবে। ইচ্ছা করলে তিনি তাদেরকে দাস-দাসী বানাতে পারবেন। আবার ইচ্ছা করলে তাদের উপর জিজিয়াও আরোপ করতে পারবেন।

قَوْلُهُ وَلَا تُوْضَعُ عَلٰى عَبَدَةِ الْاَوْثَانِ مِنَ الْعَرَبِ الخ : মুরতাদ এবং আরবি মুশরিকদের উপর জিজিয়া আরোপ করে তাদেরকে নিজ ধর্মের উপর থাকতে দেওয়া হবে না। তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হলো এই তারা হয়তো ইসলাম গ্রহণ করবে, অন্যথায় তাদেরকে হত্যা করা হবে। এ সিদ্ধান্তের কারণ হলো, তাদের অপরাধ গুরুতর। কেননা মুরতাদদেরকে ইসলামের দিকে আল্লাহ তা'আলা একবার পথ দেখিয়েছেন। তারা ইসলামে প্রবেশ করে ইসলামের সকল সৌন্দর্য বা ভালো দিকসমূহ প্রত্যক্ষ করেছে তবুপরও সে ইসলাম ত্যাগ করেছে। নিজ প্রভুর সাথে কুফরি করেছে। তাই তাদেরকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে।

অনুরূপভাবে আরব মুশরিকদের অপরাধও গুরুতর। কারণ স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের মাঝে প্রেরিত হয়েছেন। তিনি তাদের সমাজে বসবাস করেই বড় হয়েছেন। ঐশীগ্রন্থ কুরআনে কারীমও তাদের ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। তারা রাসূল ﷺ এর মু'জিযা সমূহের প্রত্যক্ষদর্শী। তাই তাদের কর্তব্য ছিল সর্বাগ্রে ইসলাম গ্রহণ করা। নবী করীম ﷺ কে সর্বাধিক সাহায্য সহযোগিতা করা। কিন্তু তারা করেছে বিপরীত। অতএব, তাদের শাস্তি কঠোর হবে। তারা হয়তো ইসলাম গ্রহণ করবে নতুবা তাদেরকে হত্যা করা হবে। জিযিয়া আরোপ করে তাদেরকে নিজ মতবাদের উপর থাকতে দেওয়া হবে না। অবশ্য আরব মুশরিকদের ব্যাপারে ইমামগণের মতানৈক্য রয়েছে ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, আরব মুশরিকদেরকে গোলাম বানানো জায়েজ আছে। ইমাম মালেক ও আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) এ কথাই বলেন। তাদের যুক্তি হলো, গোলাম বানানো আর হত্যা করা একই কথা। কেননা হত্যা করলে প্রকৃত অর্থে ধ্বংস করা হয়, আর গোলাম বানালে গুণগতভাবে ধ্বংস করা হয়। অতএব, যেমন হত্যা করা জায়েজ, তেমনি গোলাম বানানোও জায়েজ। তাদের জবাবে আহনাফ সে কথাই বলেন যা ইতঃপূর্বে বলেছেন। অর্থাৎ তাদের অপরাধ গুরুতর। তাই তারা হয়তো অপরাধ ত্যাগ করবে তথা কুফরি ছেড়ে ইসলাম গ্রহণ করবে, অন্যথায় তাদেরকে হত্যা করা হবে। দ্বিতীয় কোনো পথ তাদের জন্য খোলা নেই।

https://e-ilm.weebly.com/

وَاِذَا ظَهَرَ عَلَيْهِمْ فَنِسَاؤُهُمْ وَصِبْيَانُهُمْ فَيْءٌ لِاَنَّ اَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيْقَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اِسْتَرَقَّ نِسْوَانَ بَنِيْ حَنِيْفَةَ وَصِبْيَانَهُمْ لَمَّا اِرْتَدُّوْا وَقَسَّمَهُمْ بَيْنَ الْغَانِمِيْنَ وَمَنْ لَمْ يُسْلِمْ مِنْ رِجَالِهِمْ قُتِلَ لِمَا ذَكَرْنَا وَلَاجِزْيَةَ عَلٰى اِمْرَءَةٍ وَلَا صَبِيٍّ لِاَنَّهَا وَجَبَتْ بَدَلًا عَنِ الْقَتْلِ اَوْ عَنِ الْقِتَالِ وَهُمَا لَا يُقْتَلَانِ وَلَايُقَاتِلَانِ لِعَدَمِ الْاَهْلِيَّةِ -

অনুবাদ : যদি তাদের উপর বিজয় অর্জিত হয়, তবে তাদের স্ত্রী ও সন্তানরা মালে গনিমত হবে। কেননা, মুরতাদ হওয়ার অপরাধে হযরত আবূ বকর (রা.) বনী হানীফ গোত্রের স্ত্রীলোকদের এবং সন্তানদের দাস বানিয়েছিলেন এবং তাদেরকে মুজাহিদদের মাঝে বন্টন করে দিয়েছিলেন।

তাদের পুরুষদের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করবে না, তাদেরকে হত্যা করা হবে। আমাদের উল্লেখকৃত কারণে : **কোনো স্ত্রীলোক এবং কোনো শিশুর উপর জিজিয়া আরোপ করা হবে না।** কেননা তা হত্যা কিংবা লড়াইয়ে যোগ দেওয়ার বিকল্প হিসাবে ওয়াজিব হয়। আর এদেরকে হত্যাও করা যায় না এবং লড়াইয়েও নিযুক্ত করা যায় না। তাদের সে যোগ্যতা না থাকার কারণে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যদি আরব মুশরিক ও মুরতাদদের উপর মুজাহিদগণ বিজয় লাভ করতে পারে, তাহলে তাদের যুবক শ্রেণিকে হত্যা করা হবে এবং তাদের স্ত্রীলোক ও সন্তানদেরকে গনিমত হিসাবে মুজাহিদগণের মাঝে বন্টন করে দেওয়া হবে। কেননা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) বনী হানীফা গোত্রের মুরতাদদের স্ত্রী ও শিশুদেরকে মুজাহিদদের মাঝে ভাগ করে দিয়েছিলেন।

তাদের ঘটনা এই যে, বনী হানীফা গোত্রের এক ব্যক্তির নাম ছিল মুসাইলামাতুল কাযযাব। সে নবী করীম ﷺ -এর উপর ঈমান এনেছিল। নবী করীম ﷺ -এর মৃত্যুপূর্ব অসুস্থতাকালে সে ব্যক্তি ইসলাম ত্যাগ করে নিজেকে নবী বলে দাবী করে। নবী করীম ﷺ -এর মৃত্যুর পর হযরত আবূ বকর (রা.) হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা.)-এর নেতৃত্বে সাহাবীদের একটি বাহিনী প্রেরণ করেন তাদের সাথে লড়াই করার জন্য। তাদের লোকজন ছিল অনেক। ষাট হাজারেরও অধিক লোক সাহাবীদের বিরুদ্ধে সম্মুখ সমরে অংশ গ্রহণ করে। তুমুল যুদ্ধ হয়। সাহাবীদের মধ্য থেকে হযরত আবূ দুজানাহ আনসারী, হযরত নযর ইবনে আনাস ও অনেক আলেম সাহাবী (রা.) সে যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। শেষ পর্যন্ত মুসলমানরাই বিজয় লাভ করে। মুসাইলামা কাযযাবকে হত্যা করা হয়। তখন বনূ হানীফা গোত্রের লোকদেরকে আটক করা হয়। তখন হযরত আবূ বকর (রা.) তাদের স্ত্রী ও অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদেরকে মুজাহিদদের মাঝে বন্টন করে দেন। হযরত আলী (রা.)-এর ভাগেও একটি নারী এসেছিল। তার পেটে হযরত আলী (রা.) -এর পুত্র সন্তান জন্মে। যার নাম ছিল মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়্যাহ।

قَوْلُهُ وَمَنْ لَمْ يُسْلِمْ مِنْ رِجَالِهِمْ قُتِلَ الخ : মুরতাদ ও আরব মুশরিক পুরুষদের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করবে না, তাদেরকে হত্যা করা হবে পূর্ববর্ণিত কারণে। অর্থাৎ তাদের অপরাধ গুরুতর হওয়ার কারণে তাদের শাস্তিও কঠিন করার উদ্দেশ্যে।

স্ত্রীলোকের উপর এবং শিশুর উপর জিজিয়া আরোপ করা যাবে না। কারণ জিজিয়া ওয়াজিব হয় হত্যার বিকল্প রূপে অথবা লড়াইয়ে অংশ গ্রহণের বিকল্প রূপে। অর্থাৎ পরাজিত কাফেরকে হত্যা করা বৈধ। কিন্তু সে হত্যার কবল থেকে রক্ষা পায় জিজিয়ার মাধ্যমে। অনুরূপভাবে তাদের কর্তব্য ছিল জানমাল নিয়ে মুসলমানদের সাথে লড়াইয়ে অংশ গ্রহণ করা। কিন্তু তারা তা করে না। তাই এর বিকল্প হিসাবে তাদের উপর জিজিয়া ওয়াজিব হয় তাই বলা হয়েছে জিজিয়া ওয়াজিব হয় হত্যার এবং লড়াইয়ে অংশগ্রহণের বিকল্প হিসাবে। এখন শিশু এবং স্ত্রীলোককে যেহেতু হত্যা করা জায়েজ নয়। অনুরূপভাবে লড়াইয়ে অংশগ্রহণ শিশু ও স্ত্রী লোকের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই হত্যার বিকল্প বিষয় জিজিয়া আরোপ করাও জায়েজ নয়। অনুরূপভাবে লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করা শিশু ও স্ত্রীলোকের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই বিকল্প বিষয় জিজিয়া আরোপ করাও তাদের উপর সম্ভব নয়।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ وَلَا زَمِنٍ وَلَا اَعْمٰى وَكَذَا الْمَفْلُوْجُ وَالشَّيْخُ الْكَبِيْرُ لِمَا بَيَّنَّا . وَعَنْ اَبِيْ يُوْسُفَ (رحـ) اَنَّهُ تَجِبُ اِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ لِاَنَّهُ يُقْتَلُ فِي الْجُمْلَةِ اِذَا كَانَ لَهُ رَأْيٌ وَلَا عَلٰى فَقِيْرٍ غَيْرِ مُعْتَمِلٍ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ . لَهُ اِطْلَاقُ حَدِيْثِ مُعَاذٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ .وَلَنَا اَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ لَمْ يُوَظِّفْهَا عَلٰى فَقِيْرٍ غَيْرِ مُعْتَمِلٍ وَكَانَ ذٰلِكَ بِمَحْضَرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ، وَلِاَنَّ خَرَاجَ الْاَرْضِ لَا يُوَظَّفُ عَلٰى اَرْضٍ لَا طَاقَةَ لَهَا فَكَذَا هٰذَا الْخَرَاجُ، وَالْحَدِيْثُ مَحْمُوْلٌ عَلَى الْمُعْتَمِلِ وَلَا يُوْضَعُ عَلَى الْمَمْلُوْكِ وَالْمُكَاتَبِ وَالْمُدَبَّرِ وَاُمِّ الْوَلَدِ لِاَنَّهُ بَدَلٌ عَنِ الْقَتْلِ فِيْ حَقِّهِمْ وَعَنِ النُّصْرَةِ فِيْ حَقِّنَا، وَعَلٰى اِعْتِبَارِ الثَّانِيْ لَا تَجِبُ فَلَا تَجِبُ بِالشَّكِّ وَلَا يُؤَدِّيْ عَنْهُمْ مَوَالِيْهِمْ لِاَنَّهُمْ تَحَمَّلُوا الزِّيَادَةَ بِسَبَبِهِمْ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, **পঙ্গু ও অন্ধের উপরও নয়।** তদ্রূপ অর্ধাঙ্গ, রোগাক্রান্ত এবং অতি বৃদ্ধের উপরও নয়। কারণ আমরা বর্ণনা করেছি (তাদেরকে হত্যা করা যায় না এবং লড়াইয়ে নিযুক্ত করা যায় না।) ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) হতে বর্ণিত রয়েছে যে, তার মাল থাকলে ধার্য করা হবে। কেননা কোনো কোনো ক্ষেত্রে সে হত্যাযোগ্য যদি সে মন্ত্রণাদাতা হয়।

কর্মহীন দরিদ্রের উপরও নয়। ইমাম শাফেয়ী (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁর দলিল হলো হযরত মু'আয (রা.) সংশ্লিষ্ট হাদীসের নিঃশর্ততা। আর আমাদের দলিল এই যে, হযরত ওসমান (রা.) কর্মহীন দরিদ্রের উপর জিযিয়া ধার্য করেননি। আর এ সিদ্ধান্ত সাহাবায়ে কেরামের উপস্থিতিতে হয়েছিল। তাছাড়া এই কারণে যে, যে ভূমির সামর্থ্য নেই, সে ভূমির উপর ভূমির খারাজ ধার্য করা হয় না। সুতরাং এ খারাজও সামর্থ্য ছাড়া ধার্য করা হবে না। আর হাদীসটি শ্রমে নিযুক্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হবে।

সাধারণ দাস-দাসী, মুকাতাব, মুদাববার ও উম্মে ওয়ালাদ দাসীর উপর জিজিয়া ধার্য করা হবে না। কেননা তাদের ক্ষেত্রে এটা হত্যার বিকল্প আর আমাদের ক্ষেত্রে যুদ্ধে সাহায্য করার বিকল্প। দ্বিতীয় দিক হতে জিজিয়া ধার্য হতে পারে না। সুতরাং সন্দেহের কারণে ধার্য করা হবে না। **তাদের পক্ষ হতে তাদের মনিবগণও পরিশোধ করবে না।** কেনন তাদের কারণে মনিবগণ অতিরিক্ত পরিমাণ বহন করেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শব্দ-বিশ্লেষণ : زَمِنٌ একবচন -এর বহুবচন হলো زَمْنٰى অর্থ হলো পঙ্গু। زمن يزمن زمانة বাবে سمع থেকে ব্যবহৃত হয়।

الْمَفْلُوْجُ - فالج দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তি। فالج একটি রোগ। যে রোগে লম্বালম্বিভাবে দেহের একপাশ অবশ হয়ে যায়। অর্ধাঙ্গ রোগ। প্যারালাইসিস।

বর্ণিত মাসআলার সারসংক্ষেপ : অন্ধ, পঙ্গু ও অর্ধাঙ্গ রোগীর উপর জিযিয়া আরোপ করা হবে না। অতিবৃদ্ধ লোকের উপরও জিজিয়া আরোপ করা হবে না। তবে এ বিষয়ে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) মতানৈক্য করেছেন। তিনি বলেছেন, বৃদ্ধ ব্যক্তির যদি সম্পদ থাকে, তাহলে তার উপর জিজিয়া আরোপ করা হবে।

উপরিউক্ত লোকদের উপর জিজিয়া আরোপ না করার পক্ষে কারণ হলো, এদেরকে হত্যা করা জায়েজ নেই। তাই তাদের উপর জিজিয়াও আরোপ করা যাবে না। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) যে বলেছেন, অতি বৃদ্ধের উপর জিজিয়া

https://e-ilm.weebly.com/

আরোপ করা হবে– তার যুক্তি হলো, অতি বৃদ্ধকে কখনো কখনো হত্যা করা জায়েজ হয়। যেমন– বৃদ্ধ যদি যুবক শ্রেণিকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বুদ্ধি বাতলে দেয়, তাহলে তাকে হত্যা করা হয়। অতএব, তার উপর জিজিয়া আরোপ করা জায়েজ হবে, যদি তার মাল-সম্পদ থাকে। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এরও একটি উক্তি এমন রয়েছে যে, পঙ্গু, অন্ধ, অর্ধাঙ্গের কাছ থেকেও জিজিয়া উসূল করা হবে।

আহনাফের মতে কর্মহীন দরিদ্র লোকের উপর জিজিয়া আরোপ করা হবে না। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন, কর্মহীন দরিদ্রের উপর জিজিয়া আরোপ করা হবে।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হলো হযরত মু'আয (রা.)-এর হাদীস, রাসূল ﷺ তাকে বলেছেন, প্রাপ্তবয়স্ক নর-নারী হতে এক দিনার করে জিজিয়া উসূল করো।

এ হাদীসটি ব্যাপক। কর্মহীন দরিদ্র ব্যক্তিকে ব্যতিক্রম করা হয়নি। অতএব, সেও উক্ত হাদীসের অন্তর্ভুক্ত। তার উপরও জিজিয়া ওয়াজিব হবে।

আহনাফের প্রথম দলিল হলো ইজমায়ে সাহাবা। ইজমায়ে সাহাবা এভাবে যে, হযরত ওমর (রা.) যখন ওসমান ইবনে হুনাইফ (রা.)-কে ইরাকে পাঠিয়েছিলেন খারাজ জিজিয়া সংক্রান্ত কাজের জন্য, তখন তিনি সেখানকার কর্মহীন দরিদ্র লোকদের উপর জিজিয়া আরোপ করেনেনি। তার এ সিদ্ধান্ত সাহাবীগণের উপস্থিতিতে ছিল। কিন্তু কেউ কোনো প্রতিবাদ করেনি। ফলে বিষয়টির উপর সাহাবীগণের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দ্বিতীয় দলিল হলো জিজিয়া ভূমির খারাজের মতো। আর কোনো ভূমিতে সামর্থ্য না থাকলে অর্থাৎ ভূমির ফলনশীলতা না থাকলে সে ভূমিতে খারাজ ধার্য করা হয় না। অতএব, খারাজের মতো জিজিয়াও সামর্থ্য ছাড়া আরোপ করা হবে না।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিলের জবাব :

১ নং জবাব যা হেদায়ায় উল্লেখ আছে, হযরত মু'আয (রা.)-এর হাদীসটি কর্মে নিযুক্ত দরিদ্র ব্যক্তির উপর প্রযুক্ত। কর্মহীন দরিদ্র লোক এ হাদীসের আওতাভুক্ত নয়। এরূপ ব্যাখ্যা করা হলে হযরত মু'আয (রা.)-এর হাদীস ইজমায়ে সাহাবার মাঝে সামঞ্জস্য হয়ে যায়। উভয়ের উপর আমল হয়ে যায়। একটি ধরে অপরটি ছাড়তে হয় না।

২ নং জবাব যা হিদায়ার হাশিয়াতে উল্লেখ আছে তা এই যে, হযরত মু'আয (রা.)-এর হাদীসকে কর্মে নিযুক্ত দরিদ্রের উপর প্রযুক্ত করার প্রয়োজন নেই। কারণ, পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত মু'আয (রা.)-এর হাদীসটি প্রথম প্রকার জিজিয়ার সাথে সম্পর্কিত। অর্থাৎ সমঝোতার ভিত্তিতে যে জিজিয়া আরোপিত হয় তাই ছিল হাদীসে বর্ণিত জিজিয়া। এ কারণেই তা মহিলার কাছ থেকেও নেওয়া হয়েছে, কর্মহীন দরিদ্র পুরুষের কাছ থেকেও নেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় প্রকার জিজিয়ার সাথে এ হাদীসের কোনো সম্পর্ক নেই। অতএব, হাদীসটি কর্মে নিযুক্ত দরিদ্রের উপর প্রযুক্ত করে ইজমার সাথে সামঞ্জস্য বিধান করারও প্রয়োজন নেই।

قَوْلُهُ وَلَا يُوضَعُ عَلَى الْمَمْلُوكِ وَالْمُكَاتَبِ الخ : সাধারণ দাস-দাসী, মুদাববার, মুকাতাব, উম্মে ওয়ালাদের উপর জিজিয়া আরোপ করা যাবে না। এর কারণ হলো, জিজিয়া আরোপ করা হয় দুটি বিষয়ের বিকল্প হিসাবে।

১. হত্যার বিকল্প হিসাবে। ২. যুদ্ধের সময় মুসলমানদেরকে জানমাল দিয়ে সাহায্য করার বিকল্প হিসেবে। প্রথম বিষয়টি দাস-দাসী, মুদাববার প্রমুখের ক্ষেত্রে। কেননা হারবী দাস-দাসীকে হত্যা করা জায়েজ আছে। কিন্তু দ্বিতীয় বিষয়টি তাদের মাঝে বিদ্যমান নেই। কেননা দাস-দাসী ইত্যাদির পক্ষে জানমাল দিয়ে মুসলমানদেরকে সাহায্য করা সম্ভব নয়। যেহেতু তারা নিজের নিজের জানমালের উপর তাসাররুফ করার অধিকার রাখে না।

অতএব জিজিয়া যে দুটি বিষয়ের বিকল্প রূপে ওয়াজিব হয়, সে দুটি বিষয় উপরিউক্ত লোকদের মাঝে বিদ্যমান না থাকায় তাদের উপর জিজিয়া ওয়াজিব হবে না।

উল্লেখ্য যে, তাদের জিজিয়া যেমন তাদের নিজের উপর ওয়াজিব হয় না, তেমনি তাদের মনিবদের উপরও ওয়াজিব হয় না। কারণ মনিবরা গোলাম বাঁদির মালিক হওয়ার কারণে এমনিতেই তাদের উপর অধিক জিজিয়া ওয়াজিব হয়ে থাকে অর্থাৎ তাদেরকে বিত্তবান গণ্য করে তাদের উপর উচ্চ মাত্রার জিজিয়া ওয়াজিব করা হয়, তাই তাদের উপর পুনরায় দাস-দাসীদের জিজিয়ার বোঝা চাপানো হবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

وَلَا تُوْضَعُ عَلَى الرُّهْبَانِ الَّذِيْنَ لَا يُخَالِطُوْنَ النَّاسَ كَذَا ذَكَرَ هَاهُنَا . وَذَكَرَ مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِيْ حَنِيْفَةَ أَنَّهُ تُوْضَعُ عَلَيْهِمْ إِنْ كَانُوْا يَقْدِرُوْنَ عَلَى الْعَمَلِ، وَهُوَ وَقَوْلُ أَبِيْ يُوْسُفَ (رحـ) . وَجْهُ الْوَضْعِ عَلَيْهِمْ أَنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى الْعَمَلِ هُوَ الَّذِيْ ضَيَّعَهَا فَصَارَ كَتَعْطِيْلِ الْأَرْضِ الْخَرَاجِيَّةِ. وَوَجْهُ الْوَضْعِ عَنْهُمْ أَنَّهُ لَا قَتْلَ عَلَيْهِمْ إِذَا كَانُوْا لَا يُخَالِطُوْنَ النَّاسَ، وَالْجِزْيَةُ فِيْ حَقِّهِمْ لِإِسْقَاطِ الْقَتْلِ، وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُوْنَ الْمُعْتَمِلُ صَحِيْحًا وَيَكْتَفِي بِصِحَّتِهِ فِيْ أَكْثَرِ السَّنَةِ -

অনুবাদ : আর ঐসব রাহেবদের উপর ধার্য করা হবে না, যারা লোকদের সাথে মেলামেশা করে না।

ইমাম কুদূরী (র.) এখানে এরূপই উল্লেখ করেছেন। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তারা যদি কর্মক্ষম হয়, তাহলে তাদের উপর ধার্য করা হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এরও এ অভিমত। ধার্য করার কারণ এই যে, সে নিজে তার কর্মক্ষমতাকে কাজে লাগায়নি। সুতরাং খারাজী ভূমিকে অনাবাদ রেখে দেওয়ার মতো হলো।

ধার্য না করার কারণ এই যে, তারা যদি মানুষের সাথে মেলা-মেশা না রাখে, তাহলে তাদেরকে হত্যা করা যায় না। অথচ তাদের দিক থেকে জিজিয়া আরোপের কারণ হলো, হত্যা শাস্তি রহিত হওয়া।

আর শ্রমে নিযুক্ত ব্যক্তির সুস্থ হওয়া আবশ্যক। অবশ্য বছরের অধিকাংশ সময় সুস্থ থাকাই যথেষ্ট হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

রাহেব তথা ধর্মজাযকদের উপর জিজিয়া ওয়াজিব হবে কি-না, এ ব্যাপারে দু-রকম বর্ণনা রয়েছে।

১. ইমাম কুদূরী (র.)-এর বর্ণনা হলো, রাহেবদের জিজিয়া আরোপ করা হবে না। এটি ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর এক উক্তি, এক রেওয়ায়েত অনুয়ায়ী ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) এর অভিমত। এমতের পক্ষে যুক্তি হলো এই যে, রাহেবরা যদি মানুষের সাথে মেলা মেশা না করে, তাহলে তাদেরকে হত্যা করা জায়েজ হয় না। আর জিজিয়া হলো হত্যার বিকল্প, তাই জিজিয়াও আরোপ করা যাবে না।

২. ইমাম মুহাম্মদ (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.) হতে বর্ণনা করেছেন, রাহেবরা যদি কাজকর্ম করার মতো সামর্থ্যবান হয়, তাহলে তাদের উপর জিজিয়া ওয়াজিব হবে।

এমতের পক্ষে যুক্তি হলো এই যে, তাদের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যখন তারা কাজ না করে তখন তারা ঐ ভূমির অনুরূপ হয়ে যায়, যে ভূমিতে ফসল ফলানোর সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কৃষক তা অনাবাদে ফেলে রাখে। অতএব, ঐ ভূমিতে যেমন খারাজ ওয়াজিব হয়, তেমনি এই রাহেবদের উপরও জিজিয়া ওয়াজিব হবে। কেননা তাদের মূলত কাজ করার ক্ষমতা আছে, কিন্তু সে ক্ষমতা তারা নিজেরা কাজে লাগায়নি। অতএব, এর দ্বারা জিজিয়া রহিত হবে না। পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, কর্মে নিয়োজিত দরিদ্র ব্যক্তির উপর জিজিয়া ওয়াজিব হয়। সে প্রসঙ্গে এখানে বলা হলো, কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তির উপর জিজিয়া আরোপ করার জন্য শর্ত হলো, সে বৎসরের অধিকাংশ সময় কিংবা বৎসরের অর্ধেক সময় সুস্থ থাকতে হবে। যদি বৎসরের অর্ধেক সময়ও সুস্থ না থাকে, তাহলে তার উপর জিজিয়া ওয়াজিব হবে না। অর্ধেক বৎসরের অসুস্থতাকে শরিয়তে ওজর হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। এর চেয়ে কম সময়ের অসুস্থতা ওজর বলে গণ্য নয়। কেননা অল্প কিছুর রোগ-ব্যাধি মানুষের সাথে সর্বদা লেগেই থাকে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَمَنْ اَسْلَمَ وَعَلَيْهِ جِزْيَةٌ سَقَطَتْ عَنْهُ وَكَذٰلِكَ اِذَا مَاتَ كَافِرًا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ فِيْهِمَا. لَهُ اَنَّهَا وَجَبَتْ بَدَلًا عَنِ الْعِصْمَةِ اَوْ عَنِ السُّكْنٰى وَقَدْ وَصَلَ اِلَيْهِ الْمُعَوَّضُ فَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ الْعِوَضُ بِهٰذَا الْعَارِضِ كَمَا فِي الْأُجْرَةِ وَالصُّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ. وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ ﴿لَيْسَ عَلَى مُسْلِمٍ جِزْيَةٌ﴾ وَلِاَنَّهَا وَجَبَتْ عُقُوْبَةً عَلَى الْكُفْرِ وَلِهٰذَا تُسَمّٰى جِزْيَةً وَهِيَ وَالْجَزَاءُ وَاحِدٌ، وَعُقُوْبَةُ الْكُفْرِ تَسْقُطُ بِالْاِسْلَامِ وَلَا تُقَامُ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَلِاَنَّ شَرْعَ الْعُقُوْبَةِ فِي الدُّنْيَا لَا يَكُوْنُ اِلَّا لِدَفْعِ الشَّرِّ وَقَدْ اِنْدَفَعَ بِالْمَوْتِ وَالْاِسْلَامِ؛ وَلِاَنَّهَا وَجَبَتْ بَدَلًا عَنِ النُّصْرَةِ فِيْ حَقِّنَا وَقَدْ قَدَرَ عَلَيْهَا بِنَفْسِهِ بَعْدَ الْاِسْلَامِ . وَالْعِصْمَةُ تَثْبُتُ بِكَوْنِهِ اٰدَمِيًّا وَالذِّمِّيُّ يَسْكُنُ مِلْكَ نَفْسِهِ فَلَا مَعْنٰى لِاِيْجَابِ بَدَلِ الْعِصْمَةِ وَالسُّكْنٰى -

অনুবাদ : জিজিয়া ধার্যকৃত যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করবে তার উপর থেকে জিজিয়া রহিত হয়ে যাবে। অনুরূপ বিধান যদি কাফের অবস্থায় মারা যায়। উভয় ক্ষেত্রে ইমাম শাফেয়ী (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। কেননা জিজিয়া ওয়াজিব হয়েছে নিরাপত্তা গুণ লাভের বিনিময়ে কিংবা বসবাসের অধিকার লাভের বিনিময়ে। আর বিনিময় (তথা নিরাপত্তাগুণ ও বসবাসের অধিকার) তার কাছে পৌঁছে গেছে। সুতরাং বিনিময়ে সাব্যস্ত জিনিস উক্ত উদ্ভূত কারণে রহিত হবে না। যেমন- ভাড়ার ক্ষেত্রে এবং কিসাসের পরিবর্তে সমঝোতাকৃত রক্তপণের ক্ষেত্রে।

আমাদের দলিল হলো, নবী করীম ﷺ বলেছেন, لَيْسَ عَلَى مُسْلِمٍ جِزْيَةٌ অর্থাৎ কোনো মুসলমানের উপর জিজিয়া নেই। (তিরমিযী) তা ছাড়া এ কারণে যে, এটা কুফরির শাস্তিরূপে সাব্যস্ত হয়েছে। এ কারণেই এটাকে جِزْيَة বলে। বস্তুত جِزْيَة এবং جزاء অভিন্ন অর্থপূর্ণ। আর কুফরির শাস্তি ইসলাম গ্রহণের দ্বারা রহিত হয়ে যায় এবং মৃত্যুর পর শাস্তি কার্যকর করা যায় না।

আর দ্বিতীয় কারণ হলো, দুনিয়াতে শাস্তি প্রবর্তন করা হয় শুধু দুষ্কৃতি রোধ করার জন্য। আর মৃত্যুর কারণে এবং ইসলাম গ্রহণের কারণে তা দূরীভূত হয়ে গেছে। আর তৃতীয় কারণ হলো, আমাদের দিক থেকে এটা সাব্যস্ত হয়েছে (যুদ্ধে) সাহায্য করার পরিবর্তে। অথচ ইসলাম গ্রহণের পর সে নিজস্বভাবেই সাহায্য করতে সক্ষম হয়েছে। আর নিরাপত্তাগুণ তার মানবত্বগুণের কারণে সাব্যস্ত হয়, আর জিম্মি তো তার নিজস্ব মালিকানাধীন স্থানে বাস করে। সুতরাং নিরাপত্তাগুণের এবং বসবাসের অধিকারের বিনিময়ে জিজিয়া ধার্য করার কোনো অর্থ নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

জিজিয়া ওয়াজিব হয়েছে তার উপর, কিন্তু সে এখনো জিজিয়া পরিশোধ করেনি এমতাবস্থায় যদি সে মুসলমান হয়ে যায় কিংবা মারা যায়, তাহলে তার জিজিয়া রহিত হয়ে যাবে কি-না এ নিয়ে ইমামগণের মাঝে মতভেদ হয়েছে। আহনাফের মতে উক্ত ব্যক্তির জিজিয়া রহিত হয়ে যাবে। তা আর আদায় করতে হবে না। ইমাম মালেক (র.) সুফিয়ান ছাওরী, আবূ উবাইদ ও অন্যান্য আলেম এমত পোষণ করেন। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, উপরিউক্ত দুই ব্যক্তির জিজিয়া রহিত হবে না।

দলিল পর্ব :

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল : ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হলো এই যে, জিম্মি ব্যক্তির উপর জিজিয়া ওয়াজিব হয়ে থাকে তার জানমালের নিরাপত্তার বদলা হিসাবে। মতান্তরে দারুল ইসলামে জিজিয়া ওয়াজিব হয়ে থাকে, বাস করার

https://e-ilm.weebly.com/

অধিকারের বদলা হিসেবে। তাই জানমালের নিরাপত্তা বা বসবাসের অধিকার হলো জিম্মির প্রাপ্য। আর এর বিনিময়ে জিম্মির কাছে মুসলিম সরকারের পাওনা হলো জিজিয়া। অতএব, জিম্মি ব্যক্তি যেহেতু তার প্রাপ্য বিষয় উসুল করে নিয়েছে বা ভোগ করেছে, তাই এর বিনিময় তার উপর অবশ্যই ওয়াজিব হবে এবং তা তাকে পরিশোধ করতে হবে। মুসলমান হওয়ার দ্বারা বা মৃত্যুবরণ করার দ্বারা রহিত হবে না।

ইমাম শাফেয়ী (র.) নিজ মতের পক্ষে দুটি নজির পেশ করেছেন–

১. যেমন কোনো জিম্মি যদি কারো কাছ থেকে একটি বাড়ি ভাড়া নেয় এবং বাড়িতে বসবাস করার পর মারা যায় বা ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে বাড়ির ভাড়া তার উপর থেকে রহিত হয় না। বাড়ির উপকারিতা ভোগ করার কারণে বাড়ির ভাড়া তার উপর অবধারিত হবে এবং তা অবশ্যই তাকে পরিশোধ করতে হবে।

২. কোনো জিম্মি যদি কাউকে ইচ্ছাকৃত হত্যা করে যার ফলে তার উপর কিসাস ওয়াজিব হয়, অতঃপর সে নিহত ব্যক্তির অভিভাবকদের সাথে সম্পদ বা অর্থের বিনিময়ে সমঝোতা করল। এমতাবস্থায় যদি হত্যাকারী জিম্মি মুসলমান হয়ে যায় কিংবা মারা যায় তাহলে তার উপর থেকে কিসাসের বিকল্পরূপে ধার্যকৃত অর্থ রহিত হয় না। কেননা এ অর্থের বিনিময়ে যা লাভ করার তা সে লাভ করেছে। অর্থাৎ সে তার প্রাণ রক্ষা করেছে। অতএব, এর বদলা তাকে পরিশোধ করতেই হবে

মোটকথা, বাড়ি ভাড়া নিয়ে বাড়ির উপকারিতা ভোগ করলে যেমন ভাড়া দিতে হয় এবং অর্থের বিনিময়ে প্রাণ রক্ষা করলে যেমন অর্থ পরিশোধ করতে হয়, মারা গেলে বা মুসলমান হয়ে গেলে রহিত হয় না, তেমনি জানমালের নিরাপত্তা ভোগ বা দারুল ইসলামে বাস করলে জিম্মির উপর জিজিয়া ওয়াজিব হবে এবং সে জিজিয়া তাকে পরিশোধ করতে হবে। মুসলমান হয়ে গেলে কিংবা মৃত্যুবরণ করলে তা রহিত হবে না।

আহনাফের দলিল :

১. আহনাফের প্রথম দলিল হলো হাদীস। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন- لَيْسَ عَلَى مُسْلِمٍ جِزْيَةٌ কোনো মুসলমানের উপর জিজিয়া নেই। উক্ত হাদীসটি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। ইমাম তিরমিযী, আবূ দাউদ, ইমাম আহমদ, দারাকুতনী, তাবারানী, প্রমুখ মুহাদ্দিস নিজ নিজ কিতাবে উল্লেখ করেছেন। কোনো কোনো বর্ণনায় হাদীসটি এরূপে বর্ণিত আছে যে, مَنْ أَسْلَمَ فَلَا جِزْيَةَ عَلَيْهِ - যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে, তার উপর কোনো জিজিয়া নেই। অতএব, এ হাদীসের আলোকে আহনাফ বলেন, কোনো জিম্মি ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করলে তার জিজিয়া রহিত হয়ে যাবে।

২. জিম্মির উপর জিজিয়া ওয়াজিব হয়, তার কুফরির শাস্তি হিসাবে। এ কারণেই অত্যন্ত লাঞ্ছনা ও অপদস্থতার সাথে জিজিয়া পরিশোধ করতে হয়। অতএব, ব্যক্তি যখন ইসলাম গ্রহণ করার মাধ্যমে কুফরি ত্যাগ করল, তখন আর তার উপর কুফরির শাস্তি (জিজিয়া) প্রয়োগ করা যাবে না। অনুরূপ যদি জিম্মি মারা যায়, তাহলেও জিজিয়া রহিত হবে। কারণ মৃতের উপর শাস্তি বাস্তবায়ন করা যায় না।

৩. দুনিয়াতে শাস্তির (জিজিয়ার) বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে, কাফেরদের দুষ্কৃতি রোধ করার জন্য। আর কাফের যখন ইসলাম গ্রহণ করে কিংবা মৃত্যুবরণ করে,তখন তার দুষ্কৃতি এমনিতেই রোধ হয়। তাই তখন তার উপর শাস্তি তথা জিজিয়া প্রদানের প্রয়োজন অবশিষ্ট থাকে না।

৪. জিম্মির উপর জিজিয়া ওয়াজিব হয়েছিল যুদ্ধের সময় মুসলমানদেরকে সাহায্য করার বিকল্প হিসাবে। কিন্তু জিম্মি যখন মুসলমান হলো, তখন সে সাহায্য করতে সক্ষম হয়ে গেল। অর্থাৎ মুসলমান হওয়ার পর সে অন্য মুসলমানদের সাথে জিহাদে শরিক হতে পারবে অতএব, সে যখন মূল বিষয় আদায় করতে পারছে তখন তার উপর বিকল্প (জিজিয়া) আরোপ করার প্রশ্ন আসে না। কেননা বিকল্পের প্রয়োজন তখনই হয়, যখন মূল বিষয় অসম্ভব হয়।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিলের জবাব : মানুষ, মানুষ হিসাবে নিরাপত্তাগুণের অধিকারী হয়। কেননা মানুষকে সৃষ্টিই করা হয়েছে, সংরক্ষিত ও নিরাপত্তাগুণ বিশিষ্ট করে। তবে কুফরির কারণে সেটা সাময়িকভাবে বাতিল হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর যখন সে ইসলাম গ্রহণ করল তখন পুনরায় নিজ অবস্থায় ফিরে আসবে অর্থাৎ মানুষ হিসাবেই সে নিরাপত্তা গুণের অধিকারী হবে। জিজিয়ার বদলায় নয়।

অনুরূপভাবে জিম্মি ব্যক্তি নিজের মালিকানাধীন ভূমিতে বাস করে অন্যের মালিকানা জমিতে সে বাস করে না। অতএব, তার বসবাসের কারণেও জিজিয়া আরোপ করা হবে না। কেননা জিজিয়া যদি জিম্মি ব্যক্তির বসবাসের কারণে আরোপ করা হতো, তাহলে সেটা জিজিয়া থাকত না; বরং সেটা ভাড়া হয়ে যেত, আর ভাড়ার ক্ষেত্রে মেয়াদ বা ভোগ কাল নির্দিষ্ট থাকে। অথচ জিযিয়ার ক্ষেত্রে কোনো ভোগ কাল নির্দিষ্ট নেই। অর্থাৎ জিম্মি কয় মাস বা কয় বৎসর দারুল ইসলামে বাস করবে সেটা নির্ধারিত নয়। এর দ্বারা বুঝা যায়, জিম্মির নিকট থেকে যে জিযিয়া নেওয়া হয়, তার বসবাসের বিনিময়ে, ভাড়া হিসাবে নয়।

অতএব, ইমাম শাফেয়ী (র.) যে বলেছিলেন জিম্মির নিরাপত্তা এবং বসবাসের অধিকারের বিনিময়ে জিজিয়া ওয়াজিব হয়, একথা সঠিক নয়; বরং সঠিক কথা হলো, জিজিয়া ওয়াজিব হয় তার হত্যা এবং মুসলমানকে যুদ্ধে সাহায্য করার বিকল্প হিসেবে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَإِنْ اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ الْحَوْلَانِ تَدَاخَلَتْ الْجِزْيَتَانِ . وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ : وَمَنْ لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ خَرَاجُ رَأْسِهِ حَتّٰى مَضَتِ السَّنَةُ وَجَاءَتْ سَنَةٌ أُخْرٰى لَمْ يُؤْخَذْ وَهٰذَا عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ (رح) . وَقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ : يُؤْخَذُ مِنْهُ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللّٰهُ -

অনুবাদ : যদি তার উপর দুই বছরের জিজিয়া একত্রিত হয়ে যায়, তাহলে উভয় জিজিয়া একীভূত হয়ে যাবে।

জামে সাগীরে রয়েছে, যার কাছ থেকে তার মাথার খারাজ (অর্থাৎ জিজিয়া) উসুল করা হয়নি, এমনকি এক বছর অতিক্রান্ত হয়ে নতুন বছর এসে গেছে, তাহলে বিগত বছরের খারাজ নেওয়া হবে না।

এ হলো ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত। ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, নেওয়া হবে। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এরও একই উক্তি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَإِنْ اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ الْحَوْلَانِ -এ বাক্যটি মূলত ছিল এইরূপ وَإِنِ اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ جِزْيَتَا الْحَوْلَيْنِ 'যদি কোনো জিম্মির উপর দুই বছরের জিজিয়া একত্রিত হয়ে যায়।' অতঃপর جِزْيَتَا শব্দটিকে বিলুপ্ত করে الْحَوْلَيْنِ শব্দকে তার স্থলবর্তী করে দেওয়া হয়েছে। কারণ আরবি নিয়ম রয়েছে, অনেক সময় مُضَافٌ কে বিলুপ্ত করে مُضَافٌ إِلَيْهِ -কে তার স্থলবর্তী করা যায়। আলোচ্য মাসআলার সারমর্ম হলো, যদি কোনো জিম্মির উপর দুই বছরের জিজিয়া একত্র হয়ে যায়, অর্থাৎ কোনো জিম্মির কাছ থেকে এক বৎসরের জিজিয়া নেওয়া হলো না এমতাবস্থায় পরবর্তী বৎসর এসে গেল, তাহলে তার কাছ থেকে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উভয় বৎসরের জিজিয়া উসূল করা হবে নাকি শুধু পরবর্তী বৎসরের জিজিয়া উসূল করা হবে, এ নিয়ে ইমামগণের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মত হলো, উক্ত জিম্মির দুই বৎসরের জিজিয়া পরস্পরে তাদাখুল তথা একীভূত হয়ে যাবে। অর্থাৎ তার কাছ থেকে দুটি জিযিয়া উসুল করা হবে না; বরং একটি জিজিয়া উসুল করা হবে এবং এই একটি জিজিয়া-ই দুই বৎসরের জিজিয়া বলে গণ্য হবে।

ইমাম আবূ ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের মতামত হলো, উক্ত জিম্মির কাছ থেকে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উভয় বৎসরের পৃথক পৃথক দুটি জিজিয়া উসুল করা হবে।

ইমাম মালেক (র.)-এর মত হলো, জিম্মির কাছ থেকে দুই বৎসরের জিজিয়াই উসুল করা হবে। তবে যদি সে দরিদ্র হয়, তাহলে নয়। কেননা তার মতে দরিদ্র লোকের উপর জিজিয়া ওয়াজিব হয় না।

https://e-ilm.weebly.com/

وَإِنْ مَاتَ عِنْدَ تَمَامِ السَّنَةِ لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا، وَكَذٰلِكَ إِنْ مَاتَ فِيْ بَعْضِ السَّنَةِ أَمَّا مَسْأَلَةُ الْمَوْتِ فَقَدْ ذَكَرْنَاهَا . وَقِيْلَ خَرَاجُ الْأَرْضِ عَلٰى هٰذَا الْخِلَافِ . وَقِيْلَ لَا تَدَاخُلَ فِيْهِ بِالِاتِّفَاقِ . لَهُمَا فِي الْخِلَافِيَّةِ أَنَّ الْخَرَاجَ وَجَبَ عِوَضًا، وَالْأَعْوَاضُ إِذَا اجْتَمَعَتْ وَأَمْكَنَ اسْتِيْفَاؤُهَا تُسْتَوْفٰى، وَقَدْ أَمْكَنَ فِيْمَا نَحْنُ فِيْهِ بَعْدَ تَوَالِي السِّنِيْنَ، بِخِلَافِ مَا إِذَا أَسْلَمَ؛ لِأَنَّهُ تَعَذَّرَ اسْتِيْفَاؤُهُ . وَلِأَبِيْ حَنِيْفَةَ أَنَّهَا وَجَبَتْ عُقُوْبَةً عَلَى الْإِصْرَارِ عَلَى الْكُفْرِ عَلٰى مَا بَيَّنَّاهُ، وَلِهٰذَا لَا يُقْبَلُ مِنْهُ لَوْ بَعَثَ عَلٰى يَدِ نَائِبِهِ فِيْ أَصَحِّ الرِّوَايَاتِ، بَلْ يُكَلَّفُ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ بِنَفْسِهِ فَيُعْطِيَ قَائِمًا، وَالْقَابِضُ مِنْهُ قَاعِدٌ . وَفِيْ رِوَايَةٍ : يَأْخُذُ بِتَلْبِيْبِهِ وَيَهُزُّهُ هَزًّا وَيَقُوْلُ : أَعْطِنِي الْجِزْيَةَ يَا ذِمِّيُّ وَقِيْلَ عَدُوَّاللهِ فَثَبَتَ أَنَّهُ عُقُوْبَةٌ، وَالْعُقُوْبَاتُ إِذَا اجْتَمَعَتْ تَدَاخَلَتْ كَالْحُدُوْدِ؛ وَلِأَنَّهَا وَجَبَتْ بَدَلًا عَنِ الْقَتْلِ فِيْ حَقِّهِمْ وَعَنِ النُّصْرَةِ فِيْ حَقِّنَا كَمَا ذَكَرْنَا، لٰكِنْ فِي الْمُسْتَقْبَلِ لَا فِي الْمَاضِيْ؛ لِأَنَّ الْقَتْلَ إِنَّمَا يُسْتَوْفٰى لِحِرَابٍ قَائِمٍ فِي الْحَالِ لَا لِحِرَابٍ مَاضٍ ـ

অনুবাদ : আর যদি বছর পূর্তির মাথায় সে মারা যায়, তাহলে সকলের মতেই তার থেকে জিজিয়া নেওয়া হবে না। একই হুকুম বছরের যে কোনো অংশে মারা গেলেও । মৃত্যুর বিষয়েতো আমরা কারণ উল্লেখ করেছি । আর কেউ কেউ বলেন যে, জমির খারাজ সম্পর্কেও একই মতপার্থক্য । কিন্তু কারো কারো মতে সর্বসম্মতভাবেই তাতে একীভূত হওয়ার অবকাশ নেই ।

মতপার্থক্যপূর্ণ ক্ষেত্রে সাহেবাইনের দলিল হলো, খারাজ তো বিনিময়রূপে সাব্যস্ত হয়েছে । আর কতগুলো বিনিময় যদি একত্র হয়ে যায় এবং সেগুলো উসুল করা সম্ভব হয়, তাহলে সেগুলো অবশ্যই উসুল করা হবে । আর আমাদের আলোচ্য ক্ষেত্রে কয়েক বছর পরেও তা সম্ভব । কিন্তু যদি সে ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে বিষয়টি ভিন্ন । কেননা ঐ অবস্থায় তার নিকট থেকে উসুল করা সম্ভব নয় ।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, এটা কুফরির উপর হঠকারী হয়ে থাকার শাস্তিরূপে সাব্যস্ত হয়েছে । যেমন আমরা বর্ণনা করেছি । এ কারণেই যদি সে তার নায়েবের হাতে তা পাঠিয়ে দেয়, তাহলে বিশুদ্ধতম বর্ণনা মতে তা গ্রহণ করা হবে না; বরং তাকে স্বশরীরে তা জমা দেওয়ার আদেশ করা হবে এবং সে দাঁড়ানো অবস্থায় প্রদান করবে । আর গ্রহণকারী তা বসে গ্রহণ করবে । আর অন্য এক বর্ণনামতে তার জামার বুকে ধরে ঝাকুনি দিয়ে বলবে এই জিম্মি ! মতান্তরে এই আল্লাহর দুশমন! জিজিয়া দাও । সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, এটা শাস্তি । আর শাস্তিসমূহ একত্রিত হলে একীভূত হয়ে পড়ে । যেমন– হদ্দ সমূহের ক্ষেত্রে ।

তা ছাড়া দ্বিতীয় কারণ এই যে, তাদের দিক থেকে এটা সাব্যস্ত হয়েছে হত্যার বিকল্প হিসাবে, আর আমাদের দিক থেকে সাব্যস্ত হয়েছে (যুদ্ধে) সাহায্য করার (বাধ্যবাধ্যকতার) বিকল্প হিসাবে । যেমন আমরা উল্লেখ করে এসেছি । তবে ভবিষ্যতের হত্যার বিকল্প, বিগতকালের হত্যার বিকল্প নয় । কেননা হত্যা -শাস্তি তো কার্যকর হয় বর্তমানে বিদ্যমান যুদ্ধের কারণে, বিগত যুদ্ধের কারণে নয় ।

https://e-ilm.weebly.com/

وَكَذَا النُّصْرَةُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ؛ لِاَنَّ الْمَاضِيَ وَقَعَتْ الْغُنْيَةُ عَنْهُ . ثُمَّ قَوْلُ مُحَمَّدٍ فِي الْجِزْيَةِ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ وَجَاءَتْ سَنَةٌ أُخْرٰى، حَمَلَهُ بَعْضُ الْمَشَايِخِ عَلَى الْمُضِيِّ مَجَازًا . وَقَالَ : الْوُجُوْبُ بِاٰخِرِ السَّنَةِ، فَلَا بُدَّ مِنَ الْمُضِيِّ لِيَتَحَقَّقَ الْاِجْتِمَاعُ فَتَتَدَاخَلَ. وَعِنْدَ الْبَعْضِ هُوَ مُجْرًى عَلٰى حَقِيْقَتِهِ، وَالْوُجُوْبُ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) بِاَوَّلِ الْحَوْلِ فَيَتَحَقَّقُ الْاِجْتِمَاعُ بِمُجَرَّدِ الْمَجِيْءِ وَالْاَصَحُّ اَنَّ الْوُجُوْبَ عِنْدَنَا فِي اِبْتِدَاءِ الْحَوْلِ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ فِيْ اٰخِرِهِ اِعْتِبَارًا بِالزَّكَاةِ . وَلَنَا اَنَّ مَا وَجَبَ بَدَلًا عَنْهُ لَا يَتَحَقَّقُ اِلَّا فِي الْمُسْتَقْبَلِ عَلٰى مَا قَرَّرْنَاهُ فَتَعَذَّرَ اِيْجَابُهُ بَعْدَ مُضِيِّ الْحَوْلِ فَاَوْجَبْنَاهَا فِيْ اَوَّلِهِ ـ

অনুবাদ : তদ্রূপ সাহায্য করার বিষয়টিও ভবিষ্যতের সাথে সম্পৃক্ত। কেননা যা বিগত হয়েছে তার প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়ে গেছে। আর জামেউস সাগীর কিতাবে জিজিয়া সম্পর্কে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর বক্তব্য "অন্য এক বছর এসে গেছে" এটাকে কোনো কোনো মাশায়েখ রূপক অর্থে বিগত হওয়া ধরেছেন এবং বছর শেষে জিজিয়া ওয়াজিব হওয়ার কথা বলেছেন। সুতরাং দুই জিজিয়া একত্র হওয়ার জন্য দ্বিতীয় বছর অতিক্রান্ত হওয়া অনিবার্য তখন দুই জিজিয়া একীভূত হবে।

পক্ষান্তরে কোনো কোনো মাশায়েখের মতে এটা প্রকৃত অর্থেই প্রযোজ্য। কেননা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে বছর শুরু হওয়া দ্বারাই জিজিয়া ওয়াজিব হয়ে থাকে। সুতরাং বছর শুরু হওয়া দ্বারাই দুই জিজিয়ার একত্র সমাবেশ বিদ্যমান হয়ে যাবে। বিশুদ্ধমত এই যে, আমাদের মতে বছরের শুরুতেই وجوب বা আবশ্যকতা সম্পন্ন হয়ে যায়। আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে জাকাতের উপর কিয়াস করে বছরের শেষে وجوب সাব্যস্ত হয়।

আমাদের দলিল হলো, যে জিনিসের বিনিময় রূপে তা সাব্যস্ত হচ্ছে, সেটা ভবিষ্যতেই শুধু সম্পন্ন হয়, যেমন আমরা প্রমাণ করে এসেছি। সুতরাং বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর তা সাব্যস্ত করা সম্ভব নয়, তাই আমরা বছরের শুরুতে সাব্যস্ত করেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিউক্ত ইবারতে বেশ কয়েকটি বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে। আলোচিত বিষয়গুলো প্রথমে নম্বরসহ ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করা হলো। এরপর ইবারত নির্দেশনাসহ বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। আলোচিত বিষয়সমূহ :

১. জিজিয়া রহিত হওয়া সম্পর্কিত একটি ইত্তেফাকী মাসআলা।
২. ভূমির খারাজ সম্পর্কিত একটি ইখতেলাফী মাসআলার প্রতি ইঙ্গিত।
৩. জিজিয়া তাদাখুল হওয়া সম্পর্কিত মাসআলায় দু-পক্ষের দলিল-প্রমাণ।
৪. জামেউস সাগীরে উল্লিখিত ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর একটি বক্তব্যের ব্যাখ্যা।
৫. জিজিয়া ওয়াজিব হওয়ার সময় সম্পর্কিত ইখতেলাফ ও দলিল।

বিস্তারিত আলোচনা :

বিষয় নং ১. উপরিউক্ত ইবারতে জিজিয়া সম্পর্কিত যে ইত্তেফাকী মাসআলাটি বর্ণনা করা হয়েছে তা এই যে, কোনো জিম্মির কাছে থেকে বৎসরের শুরু হতে জিজিয়া উসুল করা না হয়, ফলে তার জিজিয়া তার জিম্মায় জমতে থাকে। এরপর বৎসরের মাঝখানে কিংবা বৎসরের মাথায় উক্ত জিম্মি মরে যায়, তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে তার জিজিয়া রহিত হয়ে যাবে। এ মাসআলাটি মুসান্নিফ (র.) বর্ণনা করেছেন وَاِنْ مَاتَ عِنْدَ تَمَامِ السَّنَةِ বলে।

https://e-ilm.weebly.com/

উক্ত মাসআলার দলিল হলো, জিম্মির মৃত্যুটি হয়তো জিজিয়া ওয়াজিব হওয়ার পূর্বে সংঘটিত হয়েছে অথবা জিজিয়া ওয়াজিব হওয়ার পরে সংঘটিত হয়েছে। যদি জিজিয়া ওয়াজিব হওয়ার পূর্বে জিম্মির মৃত্যু হয়ে থাকে, তাহলে জিজিয়া রহিত হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। আর যদি জিজিয়া ওয়াজিব হওয়ার পর তার মৃত্যু হয়ে থাকে, তাহলে (আমাদের মতে) মৃত্যুর দ্বারা জিজিয়া রহিত হয়ে যাবে। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে মৃত্যুর দ্বারা জিজিয়া রহিত হয়ে যাবে। কারণ তাঁর মতে জিযিয়া ওয়াজিব হয় বৎসরের শেষে। অতএব, যেন জিম্মি ব্যক্তিটি জিজিয়া ওয়াজিব হওয়ার পূর্বেই মারা গেল। তাই তার কাছে থেকে জিজিয়া উসুল করা হবে না।

وَأَمَّا مَسْئَلَةُ الْمَوْتِ فَقَدْ ذَكَرْنَاهَا বলে মুসান্নিফ (র.) ইঙ্গিত করেছেন পূর্বে অতিবাহিত একটি ইবারতের দিকে। ইবারতটি এই وَلِأَنَّ شَرْعَ الْعُقُوبَةِ فِي الدُّنْيَا لَا يَكُونُ إِلَّا لِدَفْعِ الشَّرِّ وَقَدْ انْدَفَعَ بِالْمَوْتِ وَالْإِسْلَامِ- অর্থাৎ ইহজগতে জিজিয়ার শাস্তি প্রবর্তন করা হয়েছে কাফেরদের দুষ্কৃতি রোধ করার জন্য। আর মৃত্যুর দ্বারা এবং ইসলাম গ্রহণের দ্বারা তাদের দুষ্কৃতি রোধ হয়ে যায়। বিধায় মৃত্যুর পর জিজিয়া ওয়াজিব হওয়ার কোনো যৌক্তিকতা নেই। এ প্রসঙ্গটি ইতঃপূর্বেও বর্ণিত হয়েছে।

বিষয় নং ২. খারাজ সম্পর্কিত যে ইখতেলাফী মাসআলার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে তা নিম্নরূপ :

কোনো ব্যক্তির উপর যদি দুই বৎসরের খারাজ একত্রিত হয়ে যায় তাহলে খারাজ দুটি তাদাখুল বা একীভূত হবে কি-না এ বিষয়ে মাশায়েখগণ দু-ধরনের মত বর্ণনা করেছেন।

কোনো কোনো মাশায়েখের অভিমত খারাজের মাসআলাটিও জিজিয়ার মাসআলার অনুরূপ। অর্থাৎ দুই বৎসরের খারাজ একত্র হয়ে গেলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তাদাখুল হবে। অতএব, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছ থেকে একটি মাত্র খারাজ আদায় করা হবে। সাহেবাইনের মতে তাদাখুল হবে না, ফলে তার থেকে দুই বৎসরের জন্য পৃথক পৃথক দুটি খারাজই উসুল করা হবে। আবার অন্য কতিপয় মাশায়েখ বলেন, দুটি খারাজ একত্র হলে একীভূত হবে না। এটি সর্বসম্মত। এ ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই। এ মাসআলাটির দিকে মুসান্নিফ (র.) ইঙ্গিত করেছেন নিম্নোক্ত বাক্য দ্বারা–

وَقِيلَ خَرَاجُ الْأَرْضِ عَلَى هٰذَا الْخِلَافِ وَقِيلَ لَاتَدَاخُلَ فِيهِ بِالْإِتِّفَاقِ

বিষয় নং ৩. জিজিয়া তাদাখুল হওয়া না হওয়া সম্পর্কিত মাসআলায় দু'পক্ষের দলিলসমূহ নিম্নরূপ : لهما في الخلافية -এর ইবারত হতে সাহেবাইনের দলিল শুরু। সাহেবাইন বলেছিলেন, দুটি জিজিয়া একত্র হলে পরস্পরে তাদাখুল তথা একীভূত হবে না; বরং দুটি জিজিয়াই সংশ্লিষ্ট জিম্মির কাছ থেকে উসুল করা হবে। এক্ষেত্রে তাঁদের দলিল হলো, জিজিয়া ওয়াজিব হয় বিনিময় স্বরূপ। (যেমন পূর্বে বলা হয়েছে) আর একাধিক বিনিময় যখন একত্রিত হয়ে যায় এবং সেগুলো উসুল করা সম্ভব হয়, তখন সবকয়টি বিনিময়ই উসুল করা হয়। যেমন– কোনো বাড়ির ভাড়াটে ব্যক্তির কাছে যদি দু-মাস বা তিন মাসের ভাড়া আটকে যায়, তাহলে সব কয়টি ভাড়াই তার থেকে উসুল করা হয়। ভাড়াগুলো একীভূত হয়ে যায় না। তেমনি আলোচ্য মাসআলায়ও যদি কোনো জিম্মির কাছে গড়ে কয়েক বৎসরের জিজিয়া একত্র হয়ে যায়, তাহলেও সেগুলো উসুল করা সম্ভব বিধায় সবগুলো জিজিয়া পৃথক পৃথকভাবে উসুল করা হবে। দুই বা ততোধিক জিজিয়া একীভূত হবে না। পক্ষান্তরে যদি ইসলাম গ্রহণ করে ফেলে তাহলে তার থেকে জিজিয়া উসুল করা সম্ভব নয়। কেননা জিজিয়া ওয়াজিব হয় ব্যক্তির অপমানের জন্য, তাকে লাঞ্ছিত করার উদ্দেশ্যে। আর মুসলমান ব্যক্তি নিজের ঈমানের বদৌলতে সম্মান ও শ্রদ্ধার যোগ্য হয়ে যায়। তাই মুসলমান থেকে জিজিয়া আদায় করা যায় না।

قَوْلُهُ (رح) وَلِأَبِي حَنِيفَةَ -এখান থেকে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল শুরু। ইমাম আবূ হনীফা (র.)-এর দলিল হলো, জিজিয়া একটি শাস্তি, যা কুফরির উপর হঠকারিতা করার কারণে সাব্যস্ত হয়ে থাকে। শাস্তি হওয়ার বিষয়টি এভাবে প্রতীয়মান হয় যে, জিজিয়া জিম্মির নিজ হাতে পরিশোধ করতে হয়। জিম্মি যদি নিজের কর্মচারীর মাধ্যমে জিজিয়া পাঠায় তাহলে তা গ্রহণ করা হয় না। জিজিয়া দাঁড়ানো অবস্থায় প্রদান করতে হয় এবং গ্রহণকারী ব্যক্তি তা বসে বসে গ্রহণ করে। কোনো কোনো বর্ণনায় আছে, জিম্মি যখন জিজিয়া প্রদান করতে আসবে, তখন জিজিয়া উসুলকারী ব্যক্তি জিম্মির জামার বুকে ধরে ঝাকুনি দিবে এবং বলবে, এই আল্লাহর দুশমন, জিজিয়া দাও। এসব কথা ও আচরণ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জিজিয়া একটি শাস্তি। আর শাস্তির ক্ষেত্রে নিয়ম হলো যদি এক জাতীয় একাধিক শাস্তি একত্র হয় তাহলে পরস্পরে তাদাখুল হয়ে যায় তথা একীভূত হয়ে যায়। যেমন– কোনো ব্যক্তির উপর একাধিক হদ্দ একত্র হলে, সব মিলে এক হদ্দে পরিণত হয়। অতএব, জিজিয়া যেহেতু শাস্তি, সেহেতু একাধিক জিজিয়া একত্র হলে একীভূত হয়ে যাবে।

https://e-ilm.weebly.com/

তা ছাড়া আরেকটি বিষয় হলো এই যে, জিম্মিকে ভবিষ্যতের যে কোনো সময় হত্যা করা যেত, সে হত্যার বিনিময়ে জিজিয়া ওয়াজিব হয় এবং ভবিষ্যতের কোনো যুদ্ধে আমাদেরকে যে সহযোগিতা করার বাধ্যবাধকতা ছিল তার বিনিময়ে। অতএব, জিজিয়ার ক্ষেত্রে অতীতকাল ততটা বিবেচ্য নয়। তাই অতীতে দুই বৎসরের জিজিয়া একত্র হয়ে গেলে একটি জিজিয়াই উসুল করা হবে। মুসান্নিফ (র.) এ কারণটির দিকে ইশারা করেছেন নিম্নোক্ত ইবারত দ্বারা-

وَلِأَنَّهَا وَجَبَتْ بَدَلًا عَنِ الْقَتْلِ فِيْ حَقِّهِمْ وَعَنِ النُّصْرَةِ فِيْ حَقِّنَا الخ

মাবসূত কিতাবে উল্লেখ রয়েছে যে, জিম্মিদের থেকে যে জিজিয়া উসুল করা হয়, তার সম্পদ সঞ্চয় করা উদ্দেশ্য নয়; বরং আসল উদ্দেশ্য হলো জিম্মিদেরকে লাঞ্ছিত করা। আর এ উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য দুটি জিজিয়া উসুল করার প্রয়োজন হয় না। একটি জিজিয়া দ্বারাই উক্ত উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যায়।

বিষয় নং ৪. জামেউস সাগীরে বর্ণিত ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর বক্তব্যটি হলো-

وَمَنْ لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ خَرَاجُ رَأْسِهِ حَتّٰى مَضَتِ السَّنَةُ وَجَاءَتْ سَنَةٌ أُخْرٰى لَمْ يُؤْخَذْ - যে ব্যক্তির খারাজে রা'স তথা জিজিয়া উসুল করা হলো না, ইতোমধ্যে বৎসর শেষ হয়ে গেল এবং অন্য বৎসর এসে পড়ল, তার থেকে (বিগত বৎসরের জিজিয়া) উসুল করা হবে না।

এ বক্তব্যে وَجَاءَتْ سَنَةٌ أُخْرٰى (অন্য বৎসর এসে গেল) বাক্যটি দ্বারা কি উদ্দেশ্য– এ ব্যাপারে দুরকম মতামত রয়েছে। কোনো কোনো মাশায়েখ جَاءَتْ سَنَةٌ أُخْرٰى বাক্যটিকে "আরেকটি বৎসর অতীত হয়ে গেল" এ অর্থে গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ جَاءَ শব্দটিকে مَضَتْ শব্দের অর্থে নিয়েছেন। সে হিসাবে তাদের মতে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর বক্তব্যের অর্থ দাঁড়াবে এই, যে ব্যক্তির জিযিয়া উসুল করা হয়নি, এমতাবস্থায় বৎসর শেষ হয়ে গেল এরপর আরও একটি বৎসর অতীত হয়ে গেল। (সে ব্যক্তির নিকট থেকে দুটি জিজিয়া) উসুল করা হবে না।

অতএব, তাঁদের মতে দুটি জিজিয়া তখনই একত্র হবে, যখন দ্বিতীয় বৎসরও অতিক্রান্ত হয়ে যায় এবং তখনই দুটি জিজিয়া পরস্পর তাদাখুল বা একীভূত হবে এবং সংশ্লিষ্ট জিম্মির নিকট হতে একটি জিজিয়া উসুল করা হবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর বক্তব্যের উপরিউক্ত ব্যাখ্যা অনুযায়ী জিজিয়া ওয়াজিব হবে বৎসরের শেষে।

বাকি থাকল একথা যে, উল্লিখিত মাশায়েখগণ جَاءَتْ শব্দকে যে مَضَتْ শব্দের অর্থে গ্রহণ করেছেন, এর ভিত্তি কি? এর উত্তর হলো جَاءَتْ শব্দকে مَضَتْ-এর অর্থে গ্রহণ করার ভিত্তি হলো مَجَازْ। কোনো عَلَاقَة বা সামঞ্জস্যের উপর ভর করে এক শব্দকে অন্য শব্দের অর্থে প্রয়োগ করাকে مَجَازْ বলে। আরবি ভাষায় যে সব আলাকার ভিত্তিতে مَجَازْ হয়ে থাকে, সেসবের একটি হলো عَلَاقَة تَلَازُمْ তথা দুই বস্তু বা বিষয়ের পরস্পর আবশ্যকীয়তার সম্পর্ক। আলোচ্য বাক্যে এধরনের عَلَاقَة-এর ভিত্তিতেই جَاءَتْ শব্দকে مَضَتْ শব্দের অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে। কেননা جَاءَتْ سَنَةٌ - (একটি বৎসর এসে গেল এবং مَضَتْ سَنَةٌ (একটি বৎসর অতীত হলো) এ দুয়ের মাঝে পরস্পর আবশ্যকীয়তার সম্পর্ক বিদ্যমান। কারণ নতুন বৎসরে আগমনের জন্য অত্যাবশ্যক হলো পুরান বৎসর অতিবাহিত হওয়া এবং পুরান বৎসর অতীত হওয়ার জন্য আবশ্যক হলো নতুন বৎসর আগমন করা।

মোটকথা, বৎসর আসা এবং বৎসর যাওয়া এ দুয়ের মাঝে عَلَاقَة تَلَازُمْ থাকার কারণে একটিকে অপরটির অর্থে গ্রহণ করা যেতে পারে। উপরিউক্ত মাশায়েখগণ তাই করেছেন।

অন্য মাশায়েখগণ বলেন, ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর বক্তব্যে جَاءَتْ سَنَةٌ শব্দটি নিজ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। এ হিসাবে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর বক্তব্যটির অর্থ হবে যে ব্যক্তির জিজিয়া নেওয়া হয়নি এমতাবস্থায় প্রথম বৎসরটি অতীত হয়ে গেল এরপর দ্বিতীয় বৎসর আগমন করল, তার কাছ থেকে অতীত বৎসরের জিজিয়া উসুল করা হবে না। এ ব্যাখা অনুযায়ী দুই জিজিয়া একত্র হওয়ার জন্য দুই বৎসর অতিক্রান্ত হওয়া আবশ্যক নয়; বরং এক বৎসর অতিক্রান্ত হয়ে দ্বিতীয় বৎসর শুরু হলেই দুটি জিজিয়া একত্র হয়ে যাবে এবং এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী জিজিয়া ওয়াজিব হওয়ার সময় হলো বৎসরের শুরু লগ্ন। মুসান্নিফ (র.) এ প্রসঙ্গটি আলোচনা করেছেন ثُمَّ قَوْلُ مُحَمَّدٍ (رحـ) বলে।

বিষয় নং ৫. জিজিয়া ওয়াজিব হওয়ার সময় সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। বিশুদ্ধ মতানুসারে আহনাফের মতে বৎসরের শুরুতে জিজিয়া ওয়াজিব হয়, ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে জিজিয়া ওয়াজিব হয় বৎসরের শেষে।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হলো, জাকাতের উপর কিয়াস। অর্থাৎ তিনি বলেন, জাকাত যেমন বৎসরের শেষে ওয়াজিব হয় তেমনি জিজিয়াও বৎসরের শেষে ওয়াজিব হবে।

আহনাফের দলিল হলো, জিজিয়া ওয়াজিব হয়ে থাকে ভবিষ্যতকালীন হত্যা ও যুদ্ধে সাহায্য করার বিনিময় হিসাবে। তাই এটা বৎসরের শেষে ওয়াজিব করা সম্ভব নয়। কেননা বৎসরের শেষে ওয়াজিব করা হলে সেটা অতীতকালের হত্যা ও যুদ্ধে সাহায্যের বিনিময় হয়ে যাবে। অথচ পূর্বে প্রমাণ করা হয়েছে যে, জিজিয়া হলো ভবিষ্যতকালীন হত্যা ও যুদ্ধের সাহায্য করার বিনিময়। অতএব, বৎসরান্তে ওয়াজিব করা অসম্ভব হওয়ার কারণে আহনাফ তা বৎসরের শুরুতে ওয়াজিব করেছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

فَصْلٌ : وَلَا يَجُوْزُ اِحْدَاثُ بِيْعَةٍ وَلَا كَنِيْسَةٍ فِيْ دَارِ الْاِسْلَامِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿لَا خِصَاءَ فِي الْاِسْلَامِ وَلَا كَنِيْسَةَ﴾ وَالْمُرَادُ اِحْدَاثُهَا ـ وَاِنْ اِنْهَدَمَتِ الْبِيَعُ وَالْكَنَائِسُ الْقَدِيْمَةُ اَعَادُوْهَا لِاَنَّ الْاَبْنِيَةَ لَا تَبْقَى دَائِمًا، وَلَمَّا اَقَرَّهُمُ الْاِمَامُ فَقَدْ عَهِدَ اِلَيْهِمُ الْاِعَادَةَ اِلَّا اَنَّهُمْ لَا يُمَكَّنُوْنَ مِنْ نَقْلِهَا؛ لِاَنَّهُ اِحْدَاثٌ فِي الْحَقِيْقَةِ، وَالصَّوْمَعَةُ لِلتَّخَلِّي فِيْهَا بِمَنْزِلَةِ الْبِيْعَةِ، بِخِلَافِ مَوْضِعِ الصَّلٰوةِ فِي الْبَيْتِ؛ لِاَنَّهُ تَبَعٌ لِلسُّكْنٰى، وَهٰذَا فِي الْاَمْصَارِ دُوْنَ الْقُرٰى؛ لِاَنَّ الْاَمْصَارَ هِيَ الَّتِيْ تُقَامُ فِيْهَا الشَّعَائِرُ فَلَا تُعَارَضُ بِاِظْهَارِ مَا يُخَالِفُهَا. وَقِيْلَ فِيْ دِيَارِنَا يُمْنَعُوْنَ مِنْ ذٰلِكَ فِي الْقُرٰى اَيْضًا؛ لِاَنَّ فِيْهَا بَعْضَ الشَّعَائِرِ، وَالْمَرْوِيُّ عَنْ صَاحِبِ الْمَذْهَبِ فِيْ قُرَى الْكُوْفَةِ لِاَنَّ اَكْثَرَ اَهْلِهَا اَهْلُ الذِّمَّةِ. وَفِيْ اَرْضِ الْعَرَبِ يُمْنَعُوْنَ مِنْ ذٰلِكَ فِيْ اَمْصَارِهَا وَقُرَاهَا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ ﴿لَا يَجْتَمِعُ دِيْنَانِ فِيْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ﴾.

অনুবাদ : অনুচ্ছেদ : দারুল ইসলামে গির্জা ও উপাসনালয় নতুনভাবে তৈরি করা জায়েজ নয়।

কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– لَا خِصَاءَ فِى الْاِسْلَامِ وَلَا كَنِيْسَةَ অর্থাৎ ইসলামে খোজাকারণ ও গির্জার অবকাশ নেই। উদ্দেশ্যে হলো নতুনভাবে তৈরি করা।

যদি প্রাচীন গির্জা বা উপাসনালয় ভেঙ্গে যায়, তাহলে সেগুলো পুনর্নির্মাণ করতে পারে। কেননা ভবন তো চিরস্থায়ী থাকে না। অথচ শাসক যখন দারুল ইসলামে তাদের বহাল রেখেছেন তখন (ধরে নেওয়া হবে যে,) তিনি তাদের পুনর্নির্মাণের সুযোগ দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তবে তাদের তা স্থানান্তরের সুযোগ দেওয়া হবে না। কেননা প্রকৃতপক্ষে এটা নতুন বানানো। আর নির্জনতার জন্য সাধুনিবাস গির্জার সমতুল্য। তবে ঘরে প্রার্থনাস্থল নির্ধারণের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা সেটা বাসস্থানের অনুবর্তী।

(নিষেধাজ্ঞা) এ বিধান শহরের সাথে সীমিত। গ্রামে প্রযোজ্য নয়। কেননা শহরেই ইসলামের বিশিষ্ট নিদর্শনসমূহ প্রতিষ্ঠা করা হয়ে থাকে। সুতরাং তার বিপরীত কিছু প্রকাশ করে তার বিরুদ্ধাচরণ করা যাবে না।

কারো কারো মতে আমাদের দেশে গ্রামেও নিষেধ করা হবে। কেননা সেখানেও কতিপয় ইসলামি নিদর্শন রয়েছে। আর মাযহাব প্রধান ইমাম আবূ হানীফা (র.) হতে যা বর্ণিত হয়েছে তা হলো কুফার গ্রমাঞ্চল সম্পর্কে। কেননা সেখানকার অধিকাংশ অধিবাসী হলো জিম্মি।

আরব ভূখণ্ডে শহরে-গ্রামে সবত্রই নিষেধ করা হবে। কেননা রাসূল ﷺ বলেছেন– لَا يَجْتَمِعُ دِيْنَانِ فِيْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ অর্থাৎ জাযীরাতুল আরবে দুটি দীন একত্র হতে পারে না।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শব্দ-বিশ্লেষণ : خِصَاء - خ হরফে যেরযোগে। শব্দটি মাসদার বা ক্রিয়ামূল। তার অর্থ হলো خُصْيَةٌ বা অণ্ডকোষ বের করা বা কেটে ফেলে দেওয়া।

بِيْعَةٌ - শব্দটি একবচন। তার বহুবচন হলো بِيَعٌ।

كَنِيْسَةٌ শব্দটি ও একবচন। এর বহুবচন হলো كَنَائِسُ।

মূলত بِيْعَةٌ এবং كَنِيْسَةٌ উভয় শব্দ ইহুদি ও খ্রিস্টান উভয়ের উপাসনালয়ের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হতো। পরবর্তীতে শুধু ইহুদিদের উপাসনালয়কে কানীসাহ বলা হতে থাকে। আর খ্রিস্টানদের উপাসনালয়কে বলা হয় বীআ।

বক্ষ্যমাণ অনুচ্ছেদে মূলত জিম্মি সম্পর্কিত আরো কিছু বিধিবিধান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মতনে উল্লিখিত মাসআলার মর্ম হলো, ইসলাম ধর্মে কোনো পুরুষের অণ্ডকোষ কেটে তাকে খাসি বানানোর অনুমতি নেই। অনুরূপভাবে দারুল ইসলামে ইহুদি বা খ্রিস্টানদের জন্য নতুনভাবে গির্জা নির্মাণ করাও বৈধ নয়। এ সম্পর্কে দলিল হলো রাসূল ﷺ -এর বাণী- لَا خِصَاءَ وَلَا كَنِيْسَةَ فِيْ الْإِسْلَامِ এ হাদীসটি ইমাম বায়হাকী, আবূ উবাইদ কাসেম ইবনে সাল্লাম, ইবনে আদী প্রমুখ মুহাদ্দিস নিজ নিজ কিতাবে উল্লেখ করেছেন। হাদীসটি হযরত ইবনে আব্বাস ও ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তবে হাদীসটির সনদে দুর্বলতা রয়েছে।

প্রশ্ন হতে পারে যে, রাসূল ﷺ খোঁজাকরণ (নপংসুক) ও গির্জা নির্মাণ বিষয় দুটিকে একত্রে উল্লেখ করেছেন কেন? দুয়ের সামঞ্জস্য কি?

এর উত্তর হলো এই যে, দুইয়ের মাঝে সামঞ্জস্য রয়েছে। তা এভাবে যে, গির্জা হয়ে থাকে খ্রিস্টানদের। তদ্রূপ খোঁজাকরণের নিয়মও খ্রিস্টানদের মাঝে প্রচলিত ছিল, তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট দুটি বিষয় একত্রে নিষিদ্ধ করেছেন।

কেউ কেউ এরূপ সমঞ্জস্যও বর্ণনা করেছেন যে, খোঁজার কারণ হলো মানুষের ক্ষেত্রে একটি দুর্বলতা, আর দারুল ইসলামে গির্জা নির্মাণ হলো ইসলামের একটি দুর্বলতা, তাই দুটি দুর্বলতা সম্পর্কে রাসূল ﷺ একত্রে সতর্ক করেছেন।

কারো কারো মতে প্রকৃত ব্যাপার হলো এই যে, এক ব্যক্তি রাসূল ﷺ -কে খোঁজাকরণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছে। তখনই সাথে সাথে আরেক ব্যক্তি প্রশ্ন করেছে, গির্জা বানানো সম্পর্কে। এরপর রাসূল ﷺ উভয় প্রশ্নকারীর জবাব একসঙ্গে এভাবে দিয়েছেন যে, لَا خِصَاءَ وَلَا كَنِيْسَةَ فِى الْإِسْلَامِ

قوله : وَاِنْ انْهَدَمَتْ الْبِيَعُ وَالْكَنَائِسُ الْقَدِيْمَةُ الخ : ইহুদি-খ্রিস্টানরা তাদের পুরাতন গির্জা মেরামত করতে পারবে কিংবা ধ্বংস হয়ে গেল পুনর্নির্মাণ করতে পারবে। পুরাতন গির্জা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, মুসলমানদের বিজয় লাভ করার পূর্বকাল হতে যেসব গির্জা বিদ্যমান থাকে।

জাযীরাতুল আরবের গ্রাম-শহর সবখানেই গির্জা নির্মাণ নিষিদ্ধ। এর কারণ হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী لَا يَجْتَمِعُ دِيْنَانِ فِي جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ অর্থাৎ আরব ভূখণ্ডে দুটি দীন একত্র হতে পারে না। হাদীসটি ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ তাঁর মুসনাদে বর্ণনা করেছেন। যার সনদ ও মতন নিম্নরূপ :

قَالَ رَاهْوَيْهِ : اَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ حَدَّثَنَا صَالِحُ ابْنُ اَبِى الْاَخْوَصِ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِىْ مَرَضِهِ الَّذِىْ تُوُفِّىَ فِيْهِ لَايَجْتَمِعُ دِيْنَانِ فِىْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ.

অর্থাৎ উল্লিখিত সনদে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর অন্তিম অসুস্থতাকালে ইরশাদ করেছেন, জাযীরাতুল আরবে দুটি দীন একত্র হতে পারে না।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ وَيُؤْخَذُ اَهْلُ الذِّمَّةِ بِالتَّمَيُّزِ عَنِ الْمُسْلِمِيْنَ فِيْ زِيِّهِمْ وَمَرَاكِبِهِمْ وَسُرُوْجِهِمْ وَقَلَانِسِهِمْ فَلَا يَرْكَبُوْنَ الْخَيْلَ وَلَا يَعْمَلُوْنَ بِالسِّلَاحِ. وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ : وَيُؤْخَذُ اَهْلُ الذِّمَّةِ بِاِظْهَارِ الْكُسْتِيْجَاتِ وَالرُّكُوْبِ عَلَى السُّرُوْجِ الَّتِيْ هِيَ كَهَيْئَةِ الْاَكُفِ وَاِنَّمَا يُؤْخَذُوْنَ بِذٰلِكَ اِظْهَارًا لِلصَّغَارِ عَلَيْهِمْ وَصِيَانَةً لِضَعَفَةِ الْمُسْلِمِيْنَ؛ وَلِاَنَّ الْمُسْلِمَ يُكْرَمُ، وَالذِّمِّيُّ يُهَانُ، وَلَا يُبْتَدَأُ بِالسَّلَامِ وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ الطَّرِيْقُ، فَلَوْ لَمْ تَكُنْ عَلَامَةٌ مُمَيِّزَةٌ فَلَعَلَّهُ يُعَامَلُ مُعَامَلَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَذٰلِكَ لَا يَجُوْزُ؛ وَالْعَلَامَةُ يَجِبُ اَنْ تَكُوْنَ خَيْطًا غَلِيْظًا مِنَ الصُّوْفِ يَشُدُّهُ عَلٰى وَسَطِهِ دُوْنَ الزُّنَّارِ مِنَ الْاِبْرِيْسَمِ فَاِنَّهُ جَفَاءٌ فِيْ حَقِّ اَهْلِ الْاِسْلَامِ. وَيَجِبُ اَنْ يَتَمَيَّزَ نِسَاؤُهُمْ عَنْ نِسَائِنَا فِي الطُّرُقَاتِ وَالْحَمَّامَاتِ، وَيُجْعَلُ عَلٰى دُوْرِهِمْ عَلَامَاتٌ كَيْ لَا يَقِفَ عَلَيْهَا سَائِلٌ يَدْعُوْ لَهُمْ بِالْمَغْفِرَةِ . قَالُوْا : الْاَحَقُّ اَنْ لَا يُتْرَكُوْا اَنْ يَرْكَبُوْا اِلَّا لِلضَّرُوْرَةِ . وَاِذَا رَكِبُوْا لِلضَّرُوْرَةِ فَلْيَنْزِلُوْا فِيْ مَجَامِعِ الْمُسْلِمِيْنَ، فَاِنْ لَزِمَتْ الضَّرُوْرَةُ اتَّخَذُوْا سُرُوْجًا بِالصِّفَةِ الَّتِيْ تَقَدَّمَتْ، وَيُمْنَعُوْنَ مِنْ لِبَاسٍ يَخْتَصُّ بِهٖ اَهْلُ الْعِلْمِ وَالزُّهْدِ وَالشَّرَفِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, **জিম্মিদেরকে তাদের পোশাকে, বাহনে, জিন বা গদিতে এবং টুপিতে মুসলমানদের থেকে ভিন্নতা রক্ষা করতে বাধ্য করা হবে। সূতরাং তারা ঘোড়ায় চড়বে না এবং অস্ত্র বহন করবে না।**

জামেউস সগীর কিতাবে রয়েছে যে, জিম্মিদের বাধ্য করা হবে তাদের ধর্মীয় ডোর প্রকাশ্যভাবে বাঁধতে এবং গাধার পিঠে ব্যবহৃত জিনের অনুরূপ জিন ব্যবহর করতে। এ বিষয়ে বাধ্য করার কারণ হচ্ছে তাদের প্রতি তুচ্ছতা প্রকাশ করা এবং দুর্বল মুসলমানদের ঈমান রক্ষা করা। তাছাড়া মুসলমান হলো সম্মানের যোগ্য আর জিম্মি হলো অসম্মানের যোগ্য। তাকে আগে সালাম দেওয়া যাবে না এবং রাস্তায় তাকে পাশ কেটে যেতে বাধ্য করা হবে। অথচ তার মাঝে যদি পার্থক্যকারী কোনো চিহ্ন না থাকে, তাহলে হয়তো তার সাথে মুসলমানদের অনুরূপ আচরণ করা হবে যা জায়েজ নয়।

আর চিহ্ন হতে হবে পশমের মোটা ডোর যা তাদের কোমরে বাঁধবে। রেশমের ডোর বাঁধতে পারবে না; কেননা এতে মুসলমানদের প্রতি হাম বড়াই ভাব রয়েছে। পথেঘাটে ও হাম্মামখানায় তাদের নারীরা আমাদের নারীদের থেকে পৃথক পরিচয় বহন করবে এবং তাদের বাড়িঘরেও পরিচয় চিহ্ন রাখবে, যাতে তাদের দুয়ারে ভিক্ষুক গিয়ে না দাঁড়ায় এবং তাদের জন্য মাগফেরাতের দোয়া না করে।

মাশায়েখগণ বলেছেন, বরং অধিকতর সঙ্গত হলো প্রয়োজন ছাড়া তাদেরকে বাহনে আরোহণ করতে না দেওয়া।

আর প্রয়োজনে আরোহণ যদি করেই, তাহলে মুসলমানদের সমাবেশ স্থলে যেন নেমে যায়। আর বাহনে আরোহণের প্রয়োজন যদি দীর্ঘ স্থায়ী হয় তাহলে যেন পূর্ববর্ণিত রকমের জিন (গাধার পিঠে ব্যবহৃত জিনের অনুরূপ জিন) ব্যবহার করে। আলেম, বুজুর্গ ও অভিজাত লোকদের বিশিষ্ট পোশাক ব্যবহার করা থেকে তাদের বিরত রাখা হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَمَنْ اِمْتَنَعَ مِنَ الْجِزْيَةِ اَوْ قَتَلَ مُسْلِمًا اَوْ سَبَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اَوْ زَنٰى بِمُسْلِمَةٍ لَمْ يُنْتَقَضْ عَهْدُهٗ لِاَنَّ الْغَايَةَ الَّتِيْ يَنْتَهِيْ بِهَا الْقِتَالُ الْتِزَامُ الْجِزْيَةِ لَا اَدَاؤُهَا وَالْاِلْتِزَامُ بَاقٍ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : سَبُّ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُوْنُ نَقْضًا؛ لِاَنَّهٗ يَنْقُضُ اِيْمَانَهٗ فَكَذَا يَنْقُضُ اَمَانَهٗ اِذْ عَقْدُ الذِّمَّةِ خَلَفٌ عَنْهُ . وَلَنَا اَنَّ سَبَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفْرٌ مِنْهُ، وَالْكُفْرُ الْمُقَارِنُ لَا يَمْنَعُهٗ فَالطَّارِئُ لَا يَرْفَعُهٗ .

অনুবাদ : কেউ যদি জিজিয়া দেওয়া থেকে বিরত থাকে কিংবা কোনো মুসলমানকে হত্যা করে কিংবা নবী ﷺ -কে গালি দেয়, কিংবা কোনো মুসলিম নারীর সাথে জেনা করে তাহলে তার জিম্মি চুক্তি ভঙ্গ হবে না। কেননা যে চূড়ান্ত সীমা লড়াইয়ের ইতি হয়, তা হলো জিযিয়ার দায় গ্রহণ করে নেওয়া আদায় করা নয়। আর দায় গ্রহণের বিষয়টি তো এখনো বিদ্যমান আছে।

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন, নবী করীম ﷺ -কে গালি দিলে চুক্তি ভঙ্গ হবে। কেননা সে মুসলমান হলে তার ঈমান ভঙ্গ হতো। সুতরাং তার নিরাপত্তা ভঙ্গ হবে। কেননা জিম্মি চুক্তি হচ্ছে ঈমানের স্থলবর্তী।

আমাদের দলিল হলো, নবী করীম ﷺ -কে গালি দেওয়া হচ্ছে তার পক্ষ থেকে কুফরি। আর তার সাথে গোড়া থেকে জড়িত কুফরি যখন তার নিরাপত্তা রহিত করে না, তখন পরে উদ্ভূত কুফরিও তা রহিত করবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শব্দ-বিশ্লেষণ : زِيٌّ - ز হরফে যেরযোগে অর্থ হলো- পোশাক -পরিচ্ছেদ, ফ্যাশন। مَرَاكِبُ -বহুবচন। একবচন مَرْكَبٌ অর্থ- বাহন। ঘোড়া, গাধা ইত্যাদি। سُرُوْجٌ বহুবচন, একবচন سَرْجٌ - জিন, বাহনের পিঠে ব্যবহারের গদি। قَلَانِسُ বহুবচন। একবচন قَلَنْسُوَةٌ - টুপি।

كُسْتِيْجَاتٌ - বহুবচন, একবচন كُسْتِيْجٌ। একপ্রকার ডোর বা দাড়ি, যা বিধর্মীরা কোমরে বাঁধে। সুতার তৈরি হয় এবং আঙ্গুলের মতো মোটা হয়।

জিম্মিদেরকে মতনে বর্ণিত বিষয়সমূহে বাধ্য করা হবে, এর উদ্দেশ্য হলো তাদেরকে তুচ্ছ প্রতিপন্ন করা এবং দুর্বল মুসলমানদের ঈমান রক্ষা করা। কেননা ঈমানীভাবে দুর্বল মুসলমানরা যদি কাফেরদেরকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে এবং বিলাসী অবস্থায় দেখতে পায়, তাহলে তাদের মনে এরূপ চিন্তা আসবে যে, ঈমানদাররা কষ্টে আছে, অথচ কাফেররা দেখি বেশ ভালোই আছে। তাই জিম্মিদেরকে অপদস্থ হয়ে থাকতে বাধ্য করা হবে।

জিম্মিদেরকে আলেম উলামা, পীর বুজুর্গ ও অভিজাত লোকদের পোশাক পরতে দেওয়া হবে না, এ ব্যাপারে হযরত ওমর (রা.)-এর নির্দেশ রয়েছে।

قوله : وَمَنْ امْتَنَعَ مِنَ الْجِزْيَةِ اَوْ قَتَلَ مُسْلِمًا الخ : কোনো জিম্মি যদি জিজিয়া দিয়ে থাকে, তাহলে এর দ্বারা তার জিম্মি চুক্তি বতিল হবে না। কারণ চুক্তি বাতিল হওয়ার বিষয়টি জিজিয়া পরিশোধ করার উপর নির্ভর করে না; বরং তা নির্ভর করে জিজিয়া প্রদানের দায় গ্রহণ করার উপর। আলোচ্য সুরতে যেহেতু জিজিয়া প্রদানের দায় বহাল আছে. তাই চুক্তিও বহাল থাকবে।

https://e-ilm.weebly.com/

জিম্মি যদি নবী করীম ﷺ -কে গালি দেয় তাহলে তার চুক্তি বহাল থাকার ব্যাপারে ইমামগণের মতভেদ রয়েছে। আহনাফের মতে চুক্তি বহাল থাকবে, ভঙ্গ হবে না।

ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতে গালিদাতা জিম্মির জিম্মি চুক্তি ভঙ্গ হয়ে যাবে।

ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর দলিল হলো, গালিদাতা ব্যক্তি যদি মুসলমান হতো, তাহলে গালি দেওয়ার কারণে তার ঈমান নষ্ট হয়ে যেতো। অতএব, জিম্মি হওয়ার কারণে তার ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে। অর্থাৎ তার নিরাপত্তা শেষ হয়ে যাবে, চুক্তি ভঙ্গ হয়ে যাবে। কারণ জিম্মির ক্ষেত্রে তার জিম্মি চুক্তিটি হলো মুসলমানের ঈমানের স্থলবর্তী। তাই যে বিষয়ের দ্বারা মুসলমানের ঈমান নষ্ট হয়ে যায়, সে বিষয়ের দ্বারা জিম্মির চুক্তি নষ্ট হয়ে যাবে।

আহনাফের দলিল : আহনাফের দলিল হলো, জিম্মি কর্তৃক নবীকে গালি দেওয়াটা তার পক্ষ থেকে একটি উদ্ভূত বা নতুন সৃষ্ট কুফরি। আর তার সাথে গোড়া থেকে স্থায়ীভাবে কুফরি লেগে আছে। সেই স্থায়ী কুফরির দ্বারা যেহেতু জিম্মির চুক্তি ভঙ্গ হয়নি, সেহেতু উদ্ভূত নতুন কুফরি দ্বারাও তার চুক্তি ভঙ্গ হবে না।

উর্দু আশরাফুল হিদায়ার গ্রন্থকার বলেন, জিম্মির মাঝে যে কুফরিটি চুক্তি করার সময় ছিল বা যে কুফরি স্থায়ীভাবে পূর্ব থেকে আছে, তা হলো তার বিশ্বাসগত। আর নতুন উদ্ভূত কুফরিটির উৎপত্তি হয়েছে মুসলমানদের ঈমান আকীদার প্রতি তার অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্য থেকে। অতএব, এরূপ দুষ্কৃতিকারী ব্যক্তিকে হত্যা করাই শ্রেয়।

দুররুল মুনতাকা নামক কিতাবে রয়েছে, কেউ যদি প্রকাশ্যে নবী করীম ﷺ -কে গালমন্দ করে কিংবা নবীকে গালমন্দ করার মতো জঘন্য কাজ কারো থেকে বার বার সংঘটিত হয়, তাহলে তাকে হত্যা করা হবে, যদিও সে নারী হোক না কেন। বর্তমান যুগে এ হুকুম অনুসারেই ফতোয়া প্রদান করা উচিত। –[দুররুল মুখতার]

মদিনায় বসবাসকারী ইহুদি কা'ব ইবনে আশরাফ যখন রাসূল ﷺ -এর নিন্দা করেছিল, তখন রাসূল ﷺ বলেছিলেন, কা'ব ইবনে আশরাফকে হত্যা করার জন্য কে প্রস্তুত আছে? একথা শুনে হযরত মুহাম্মদ ইবনে মাসলামাহ (রা.) বললেন, হুযুর! আমিই তার জন্য যথেষ্ট। এরপর তিনি তাকে হত্যা করেন। –[বুখারী]

আবূ রাফে, ইবনে খতল ও আরো কতিপয় কাফেরকে এই একই অপরাধে হত্যা করা হয়েছিল।

মুহাজির ইবনে আবূ উমাইয়া যিনি হযরত আবূ বকর (রা.)-এর শাসনামলে ইয়ামানের গর্ভনর ছিলেন, একবার তিনি জানতে পারলেন, সেখানকার জনৈক মহিলা গান গেয়ে গেয়ে নবীজির নিন্দা করে। অতঃপর মুহাজির ইবনে উমাইয়া তাকে ধরে এনে হাত কেটে দিলেন এবং তার দাঁত ভেঙ্গে দিলেন। এ সংবাদ হযরত আবূ বকর (রা.)-এর কর্ণগোচর হলে তিনি বললেন, তুমি যদি উক্ত মহিলাকে এরূপ শাস্তি না দিতে তাহলে আমি তোমাকে আদেশ করতাম, তাকে হত্যা করার জন্য।

আল্লামা আইনী (র.) বলেছেন, কেউ রাসূল ﷺ -কে গালমন্দ করলে, আমি তাকে হত্যা করার ফতোয়া দিব। আল্লামা ইবনুল হুমাম (র.) -এর উক্তি অনুরূপ। ইমাম মালেক, আহমদ ইবনে হাম্বল, শাফেয়ী, ইসহাক (র.) প্রমুখ এ মতই পোষণ করেন। ইবনুল মুনযির বলেছেন, আধিকাংশ আলেমের অভিমত এটাই।

শাইখ ইবনুল হুমাম (র.) বলেছেন, জিম্মিকে ততক্ষণ পর্যন্ত হত্যা করা হবে না, যতক্ষণ সে বিনয়ের সাথে জিজিয়া আদায় করে। আর যখন সে অহংকার করবে, মুসলমানকে গালমন্দ করবে কিংবা মুসলমানের বিরুদ্ধাচরণ করবে, তখন তাকে হত্যা করা বৈধ হয়ে যাবে। এটাই বাস্তবসম্মত কথা। –[আল্লাহ সর্বজ্ঞ]

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ وَلَا يَنْتَقِضُ الْعَهْدُ اِلَّا اَنْ يَلْحَقَ بِدَارِ الْحَرْبِ اَوْ يَغْلِبُوْا عَلٰى مَوْضِعٍ فَيُحَارِبُوْنَنَا؛ لِاَنَّهُمْ صَارُوْا حَرْبًا عَلَيْنَا فَيَعْرَى عَقْدُ الذِّمَّةِ عَنِ الْفَائِدَةِ وَهُوَ دَفْعُ شَرِّ الْحِرَابِ . وَاِذَا نَقَضَ الذِّمِّيُّ الْعَهْدَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُرْتَدِّ مَعْنَاهُ فِي الْحُكْمِ بِمَوْتِهِ بِاللَّحَاقِ؛ لِاَنَّهُ الْتَحَقَ بِالْاَمْوَاتِ، وَكَذَا فِيْ حُكْمِ مَا حَمَلَهُ مِنْ مَالِهِ، اِلَّا اَنَّهُ لَوْ اُسِرَ يُسْتَرَقُّ بِخِلَافِ الْمُرْتَدِّ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, **জিম্মির চুক্তি কেবল তখনই ভঙ্গ হবে, যখন সে দারুল হরবে গিয়ে মিলিত হয় অথবা কোনো স্থানে আধিপত্য বিস্তার করে আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে।** কেননা তাতে সে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধপক্ষ হয়ে গেল। ফলে জিম্মি চুক্তি অর্থহীন হয়ে যায়। আর চুক্তির উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধের অনিষ্ট রোধ করা।

আর জিম্মি যদি চুক্তি ভঙ্গ করে তাহলে সে মুরতাদদের পর্যায়ভুক্ত। এর অর্থ এই যে, দারুল হরবে পলায়নের কারণে তার প্রতি মৃত্যুর হুকুম প্রযোজ্য হবে। কেননা সে (কাফের) মৃতদের সাথে মিলিত হয়ে গেছে।

তদ্রূপ যে মালামাল সাথে নিয়ে গেছে, সেগুলোর ক্ষেত্রেও সে মুরতাদ তুল্য হবে। তবে পার্থক্য এই যে, বন্দি করা হলে তাকে দাস বানানো হবে। কিন্তু মুরতাদের বিষয়টি ভিন্ন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিউক্ত ইবারতে জিম্মি চুক্তি বাতিল হওয়ার দুটি সুরত বর্ণনা করা হয়েছে। ১. যদি জিম্মি ব্যক্তি দারুল ইসলাম থেকে দারুল হারবে চলে যায়। ২. যদি জিম্মি ব্যক্তি কোনো এলাকায় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে, মুসলমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে।

এ উভয় সুরতে জিম্মিচুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। কারণ জিম্মি চুক্তির উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধ রোধ করা। আর উল্লিখিত দুই অবস্থায় যেহেতু জিম্মি মুসলমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধপক্ষ হয়ে গিয়েছে, সেহেতু আর চুক্তি বহাল রাখার কোনো অর্থ নেই। উপরিউক্ত অবস্থা দুটিতে চুক্তি বাতিল বলে গণ্য হবে।

قوله : وَاِذَا نَقَضَ الذِّمِّيُّ الْعَهْدَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الخ : কোনো জিম্মি যদি চুক্তি ভঙ্গ করে, তাহলে সে মুরতাদের পর্যায়ভুক্ত হয়ে যায়। একথার ব্যাখ্যা হলো, মুরতাদ ব্যক্তির উপর যেমন মৃত্যুর হুকুম আরোপ করা হয়, তেমনি চুক্তি ভঙ্গকারী-জিম্মির উপরও মৃত্যুর হুকুম আরোপ করা হবে। অর্থাৎ তাকে মৃত বলে গণ্য করা হবে। তার রেখে যাওয়া ধন-সম্পদ মুরতাদের সম্পদের ন্যায় বণ্টন করে দেওয়া হবে। এরূপ হুকুম লাগানো কারণ হলো এই যে, সে দারুল হরবে পালিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে মৃতদের সাথে অর্থাৎ কাফেরদের সাথে মিলিত হয়েছে। তাই তাকেও মৃত ধরা হবে।

চুক্তি ভঙ্গকারী জিম্মি নিজের সঙ্গে যে সম্পদ নিয়ে যায়, তার হুকুমও মুরতাদের সম্পদের মতো। অর্থাৎ দারুল হরব বিজিত হলে মুরতাদের সম্পদ যেমন গনিমত হয়ে যায়, তেমনি জিম্মি সম্পদও গনিমত হয়ে যায়।

কিন্তু মুরতাদ ও চুক্তি ভঙ্গকারী জিম্মির মাঝে একটি হুকুমের ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে। তা এই যে, দারুল হরবে পালিয়ে যাওয়া জিম্মি যদি মুসলমানের হাতে ধৃত হয়, তাহলে তাকে দাস বানানো জায়েজ আছে। পক্ষান্তরে মুরতাদ ধৃত হলে তাকে দাস বানানো জায়েজ নেই; বরং সে হয়তো তওবা করে পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করবে অথবা তাকে হত্যা করা হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

فَصْلٌ : وَنَصَارٰى بَنِيْ تَغْلِبَ يُؤْخَذُ مِنْ اَمْوَالِهِمْ ضِعْفُ مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ مِنَ الزَّكَاةِ؛ لِاَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ صَالَحَهُمْ عَلٰى ذٰلِكَ بِمَحْضَرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَيُؤْخَذُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْ صِبْيَانِهِمْ لِاَنَّ الصُّلْحَ وَقَعَ عَلَى الصَّدَقَةِ الْمُضَاعَفَةِ، وَالصَّدَقَةُ تَجِبُ عَلَيْهِنَّ دُوْنَ الصِّبْيَانِ فَكَذَا الْمُضَاعَفُ. وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللّٰهُ لَا يُؤْخَذُ مِنْ نِسَائِهِمْ اَيْضًا، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ؛ لِاَنَّهُ جِزْيَةٌ فِي الْحَقِيْقَةِ عَلٰى مَا قَالَ عُمَرُ : هٰذِهِ جِزْيَةٌ فَسَمُّوْهَا مَا شِئْتُمْ، وَلِهٰذَا تُصْرَفُ مَصَارِفَ الْجِزْيَةِ وَلَا جِزْيَةَ عَلَى النِّسْوَانِ . وَلَنَا اَنَّهُ مَالٌ وَجَبَ بِهِ الصُّلْحُ، وَالْمَرْاَةُ مِنْ اَهْلِ وُجُوْبِ مِثْلِهِ عَلَيْهَا وَالْمَصْرِفُ مَصَالِحُ الْمُسْلِمِيْنَ؛ لِاَنَّهُ مَالُ بَيْتِ الْمَالِ وَذٰلِكَ لَا يَخْتَصُّ بِالْجِزْيَةِ؛ اَلَا تَرٰى اَنَّهُ لَا يُرَاعٰى فِيْهِ شَرَائِطُهَا.

অনুবাদ : অনুচ্ছেদ : বনি তাগলিব গোত্রের নাসারাদের মাল থেকে মুসলমানাদের থেকে নেওয়া জাকাতের পরিমাণের দ্বিগুণ নেওয়া হবে। কেননা হযরত ওমর (রা.) সাহাবায়ে কেরামের উপস্থিতিতে এই শর্তে তাদের সাথে সমঝোতা করেছিলেন।

আর তাদের নারীদের থেকেও (জিজিয়া) নেওয়া হবে। কিন্তু তাদের নাবালক সন্তানদের থেকে নেওয়া হবে না। কেননা জাকাতের দ্বিগুণ নির্ধারণের উপর সমঝোতা হয়েছে। আর স্ত্রীলোকদের উপর জাকাত ওয়াজিব হয়। কিন্তু নাবালকদের উপর ওয়াজিব হয় না। সুতরাং দ্বিগুণের ক্ষেত্রেও একই হুকুম।

ইমাম যুফার (র.) বলেন, তাদের স্ত্রীলোকদের থেকেও নেওয়া হবে না। এটা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মত। কেননা প্রকৃতপক্ষে এ হলো জিজিয়া, যেমন হযরত ওমর (রা.) বলেছেন, هٰذِهِ جِزْيَةٌ فَسَمُّوْهَا مَا شِئْتُمْ -এটা জিজিয়া, তোমাদের ইচ্ছা, যে নামে নামকরণ কর।

এ কারণেই একে জিজিয়ার খাতে খরচ করা হয়। আর স্ত্রীলোকদের উপর জিজিয়া ধার্য হয় না।

আমাদের দলিল হলো, এ মাল সমঝোতার মাধ্যমে ওয়াজিব হয়েছে। আর স্ত্রীলোক, এ ধরনের মাল তার উপর ওয়াজিব হওয়ার যোগ্য।

আর বাইতুলমালের সম্পদ হিসাবে মুসলমানদের জন্য কল্যাণকর কাজকর্মই হলো এর ব্যয়ক্ষেত্র। আর এ ব্যয়ক্ষেত্র জিজিয়ার সাথে বিশিষ্ট নয়। দেখুন না এটা গ্রহণের ক্ষেত্রে জিজিয়ার শর্ত বিবেচনা করা হয় না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

এ অনুচ্ছেদে বনী তাগলিব গোত্রের নাসারাদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তাদের আলোচনা পৃথক অনুচ্ছেদে করার কারণ হলো, তাদের হুকুম অন্যান্য নাসারাদের হুকুম থেকে কিছুটা ব্যতিক্রম হওয়া।

বনি তাগলিব গোত্রটি মূলত বংশগতভাবে আরবী। জাহেলি যুগে তারা খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত হয়। হযরত ওমর (রা.) তাঁর শাসনামলে তাদের থেকে জিজিয়া তলব করেন। তারা জিজিয়া দিতে অস্বীকার করে এবং বলে যে, আমরা আরবী

https://e-ilm.weebly.com/

তাই আমাদের কাছ থেকে ঐভাবে নেওয়া হোক, যেভাবে আরবীদের থেকে নেওয়া হয়। তখন হযরত ওমর (রা.) বললেন, আমি মুশরিকদের থেকে সদকা নেব না। একথা শুনে বনী তাগলিবের কিছু খ্রিস্টান পলিয়ে গিয়ে সিরিয়ার খ্রিস্টানদের সাথে জোট বাঁধল। তখন নুমান ইবনে যুবআ এ মর্মে আবেদন করল যে, হে আমীরুল মুমিনীন! এরা আরবী, যোদ্ধা জাতি। জিজিয়া দিতে তাদের লজ্জাবোধ হয়, তাই আপনি তাদের থেকে সদকার নামে জিজিয়া উসুল করুন এবং তাদেরকে শত্রুকর্তৃক ব্যবহৃত হওয়ার সুযোগ বন্ধ করুন। পরিশেষে হযরত ওমর (রা.) তাদেরকে ডেকে পাঠালেন। এবং মুসলমানদের থেকে যে পরিমাণ উসুল করা হয়, তার দ্বিগুণ তাদের প্রত্যেক নারী পুরুষের উপর ধার্য করলেন। ফলে হযরত ওমর (রা.)-এর উক্ত সিদ্ধান্তের ব্যাপারে উপস্থিত সকল সাহাবী একমত পোষণ করলেন।

قوله : وَيُؤْخَذُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْ صِبْيَانِهِمْ الخ : উপরিউক্ত ইবারতে একটি মতভেদপূর্ণ মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে। বনী তাগলিবের নারীদের থেকে জাকাতের দ্বিগুণ অর্থ নেওয়া হবে কিনা এ ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে।

ইমাম কুদূরীর বর্ণনা ও জাহিরে রেওয়ায়েত অনুসারে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে বনী তাগলিবের নারীদের থেকে জাকাতের দ্বিগুণ অর্থ নেওয়া হবে। আর হাসান ইবনে যিয়াদ বর্ণনা করেছেন, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে ও নারীদের থেকে নেওয়া হবে না। আবুল হাসান কারখী বলেছেন, এ বর্ণনাটি অধিক যুক্তি সঙ্গত। কেননা নারীদের থেকে জিজিয়া নেওয়া হয় না, তাই জিজিয়ার বিকল্পও না নেওয়া উচিত।

ইমাম যুফার ও ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতে বনী তাগলিবের নারীদের থেকে অর্থ নেওয়া হবে না। এ মতের পক্ষে তাদের দলিল হলো, বনী তাগলিবের কাছ থেকে যে অর্থ উসুল করা হয়, তা মূলত জিজিয়া। আর নারীর উপর জিজিয়া ওয়াজিব হয় না। তাই বনী তাগলিবের নারীদের থেকেও তা উসুল করা হবে না।

তাদের থেকে নেওয়া অর্থগুলো জিজিয়া হওয়ার ব্যাপারে দলিল হলো হযরত ওমর (রা.)-এর বাণী هٰذِهٖ جِزْيَةٌ فَسَمُّوْهَا مَا شِئْتُمْ অর্থাৎ এটা জিজিয়া। তোমরা যে নামেই নামকরণ করনা কেন?

ইমাম আবূ হানীফার (র.)-এর মতের দলিল হলো–

১. বনী তাগলিবের সাথে সমঝোতা হয়েছে, এভাবে যে, তাদের প্রত্যেক ব্যক্তি জাকাতের দ্বিগুণ অর্থ প্রদান করবে। আর জাকাত নারীদের উপর ওয়াজিব হতে পারে। অতএব, তাদের নারীদের উপরও জাকাতের দ্বিগুণ অর্থ প্রদান করা ওয়াজিব হবে।

২. বনী তাগলিবের উপর জাকাতের দ্বিগুণ অর্থ ধার্য করা হয়েছে সমঝোতার ভিত্তিতে। আর সমঝোতার ভিত্তিতে নারীদের উপরও অর্থ ওয়াজিব হতে পারে। তাই বনী তাগলিবের নারীদের কাছ থেকেও উক্ত ধার্যকৃত অর্থ উসুল করা হবে।

ইমাম শাফেয়ী (র.) একথাও বলেছিলেন যে, বনী তাগালিবের নিকট থেকে উসুলকৃত অর্থ মুসলমানদের কল্যাণকর খাতে ব্যয় করা হয়, যা কিনা জিজিয়া ব্যয় করার খাত। এর দ্বারাও বুঝা যায় যে, তাদের থেকে নেওয়া অর্থগুলো প্রকৃতপক্ষে জিজিয়া।

এর জবাবে আহনাফ বলেন, তাদের থেকে নেওয়া অর্থ বাইতুলমালের সম্পদ। আর বাইতুলমালের সম্পদ হিসাবে তা মুসলমানদের কল্যাণকর খাতে ব্যয় করা হয়। কেননা মুসলমানদের কল্যাণকর খাতে ব্যয় হওয়ার বিষয়টি জিজিয়ার সাথে বিশিষ্ট নয়।

https://e-ilm.weebly.com/

وَيُوضَعُ عَلَى مَوْلَى التَّغْلِبِيِّ الْخَرَاجُ اَيِ الْجِزْيَةُ وَخَرَاجُ الْاَرْضِ بِمَنْزِلَةِ مَوْلَى الْقُرَشِيِّ وَقَالَ زُفَرُ : يُضَاعَفُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ ﴿اِنَّ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ﴾؛ اَلَا تَرَى اَنَّ مَوْلَى الْهَاشِمِيِّ يَلْحَقُ بِهِ فِي حَقِّ حُرْمَةِ الصَّدَقَةِ . وَلَنَا اَنَّ هٰذَا تَخْفِيْفٌ وَالْمَوْلَى لَا يَلْحَقُ بِالْاَصْلِ فِيْهِ، وَلِهٰذَا تُوْضَعُ الْجِزْيَةُ عَلَى مَوْلَى الْمُسْلِمِ اِذَا كَانَ نَصْرَانِيًّا، بِخِلَافِ حُرْمَةِ الصَّدَقَةِ لِاَنَّ الْحُرُمَاتِ تَثْبُتُ بِالشُّبُهَاتِ فَاُلْحِقَ الْمَوْلَى بِالْهَاشِمِيِّ فِيْ حَقِّهٖ، وَلَا يَلْزَمُ مَوْلَى الْغَنِيِّ حَيْثُ لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ، لِاَنَّ الْغَنِيَّ مِنْ اَهْلِهَا، وَاِنَّمَا الْغِنٰى مَانِعٌ وَلَمْ يُوجَدْ فِيْ حَقِّ الْمَوْلَى، اَمَّا الْهَاشِمِيُّ فَلَيْسَ بِاَهْلٍ لِهٰذِهِ الصِّلَةِ اَصْلًا لِاَنَّهٗ صِيْنَ لِشَرَفِهٖ وَكَرَامَتِهٖ عَنْ اَوْسَاخِ النَّاسِ فَاُلْحِقَ بِهٖ مَوْلَاهُ .

অনুবাদ : তাগলিবীর আজাদকৃত দাসের উপর খারাজ তথা জিজিয়া এবং ভূমির খারাজ ধার্য করা হবে। যেমন কুরাইশীর আজাদকৃত দাসের ক্ষেত্রে।

ইমাম যুফার (র.) বলেন, তার ক্ষেত্রেও দ্বিগুণ করা হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, اِنَّ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ অর্থাৎ কোনো গোত্রের আজাদকৃত দাস ঐ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত।

দেখুন না, জাকাতের মাল হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে হাশেমীর আজাদকৃত গোলাম হাশেমীর সাথে সম্পৃক্ত হয়। আমাদের দলিল হলো, দ্বিগুণ গ্রহণের অর্থ হলো (তাগলিবী পরিচয়ের কারণে বিধানটিতে) লঘুতা আনয়ন। কেননা জিজিয়ার অপদস্থতা বিদূরিত হয়েছে। আর লঘুতার ক্ষেত্রে মাওলা মূল মনিবের সাথে সম্পৃক্ত হয় না। এ কারণেই মুসলমানের আজাদকৃত (অমুসলিম) দাসের উপর জিজিয়া আরোপ করা হয়, যদি সে নাসরানী হয়।

জাকাত হারাম হওয়ার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা সন্দেহ দ্বারা হারাম সাব্যস্ত হয়ে যায়। সুতরাং হাশেমীর হকের ক্ষেত্রে হাশেমীর মাওলাকেও তার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

ধনীর মাওলার ক্ষেত্রে জাকাত হারাম না হওয়ার কারণে আপত্তি উত্থাপিত হবে না। কেননা ধনীও সত্তাগতভাবে জাকাত গ্রহণের উপযুক্ত। কিন্তু সচ্ছলতা হচ্ছে প্রতিবন্ধক, যা তার মাওলার ক্ষেত্রে পাওয়া যায়নি।

পক্ষান্তরে হাশেমী কোনো অবস্থাতেই এই দানের উপযুক্ত নয়। কেননা তার সম্মান ও মর্যাদাকে মানুষের ময়লা থেকে পবিত্র রাখা হয়েছে। সুতরাং তার মাওলাকেও তার সাথে যুক্ত করা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

তাগলিবী ব্যক্তির আজাদকৃত দাসের উপর জাকাতের দ্বিগুণ ধার্য হবে, নাকি সাধারণ জিজিয়া ওয়াজিব হবে এ নিয়ে ইমামগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে তাগলিবীর আজাদকৃত দাসের উপর সাধারণ জিম্মির মতো জিজিয়া এবং ভূমির খারাজ আরোপ করা হবে। যেমন– কুরাইশ ব্যক্তির আজাদকৃত অমুসলিম দাসের উপর জিজিয়া ও খারাজ আরোপ করা হয়।

পক্ষান্তরে ইমাম যুফার (র.) বলেন, তাগলিবীর নিকট থেকে যেমন জাকাতের দ্বিগুণ অর্থ উসুল করা হয়, তেমনি তার আজাদকৃত দাসের নিকট থেকেও জাকাতের দ্বিগুণ অর্থ উসুল করা হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

দলিল পাঠ : ইমাম যুফার (র.)-এর দলিল– ১. রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাদীস– إِنَّ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ কোনো গোত্রের আজাদকৃত দাস ঐ গোত্রের আওতাভুক্ত। অতএব, বনি তাগলিবের যে হুকুম, তাদের আজাদকৃত দাসেরও সে হুকুমই হবে। বিধায় তার কাছ থেকে জাকাতের দ্বিগুণ অর্থ উসুল করা হবে।

২. কিয়াস, অর্থাৎ তাগলিবীর আজাদকৃত দাসকে হাশেমীর আজাদকৃত দাসের সাথে কিয়াস করা। ইমাম যুফার (র.) বলেন, হাশেমী লোকদের জন্য সদকা গ্রহণ করা হারাম এবং তাদের কওমের আজাদকৃত দাস ঐ কওমেরই পর্যায়ভুক্ত। এমনিভাবে তাগলিবীর আজাদকৃত দাসও বনী তাগলিবের পর্যায়ভুক্ত হবে। ফলে তার থেকে জাকাতের দ্বিগুণ অর্থ উসুল করা হবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল : বনী তাগলিবের নিকট থেকে যে জাকাতের দ্বিগুণ অর্থ নেওয়া হয়, তা এক প্রকার তাখফীফ বা লঘুতা। কেননা জাকাতের দ্বিগুণ অর্থ নেওয়ার কারণে তারা জিযিয়ার লাঞ্ছনা থেকে বেঁচে যায়। আর আজাদকৃত দাস কোনো তাখফীফ তথা লঘুতার ক্ষেত্রে মনিবের পর্যায়ভুক্ত হয় না। যেমন কোনো মুসলমান যদি একটি নাসরানী দাসকে আজাদ করে দেয়, তাহলে সে দাসের উপর মুসলমানের হুকুম কার্যকর হয় না। অর্থাৎ মুসলমান যেমন জিজিয়া এবং খারাজের বোঝা মুক্ত, তার আজাদ কৃতদাস তেমনি জিজিয়া ও খারাজের বোঝামুক্ত হয় না; বরং দাসের উপর জিজিয়া খারাজ আরোপ করা হয়। এর দ্বারা বুঝা গেল, কোনো তাখফীফ বা লঘুতার ক্ষেত্রে আজাদ গোলাম তার মনিবের পর্যায়ভুক্ত হয় না। অতএব, বনী তাগলিবের আজাদ গোলামও জিজিয়ার লাঞ্ছনা থেকে মুক্তি পাওয়ার ক্ষেত্রে তার মনিবের পর্যায়ভুক্ত হবে না। অর্থাৎ তাকে জিজিয়া দিতে হবে এবং জিজিয়ার লাঞ্ছনা তাকে ভোগ করতে হবে। জাকাতের দ্বিগুণ অর্থ তার থেকে গ্রহণ করা হবে না। যেমন তাগলিবী মনিবের নিকট হতে গ্রহণ করা হয়।

ইমাম যুফার (র.)-এর কিয়াসের জবাব : সদকা হরাম হওয়ার ক্ষেত্রে হাশেমীর আজাদকৃত গোলামকে হাশেমীর পর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে এ কারণে যে, হুরমতের বিষয়টি সন্দেহের দ্বারা সাব্যস্ত হয়ে যায়। আর হাশেমীর জন্য সদকা গ্রহণ হারাম হওয়ার কারণে তার আজাদ গোলামের পক্ষেও সদকা গ্রহণ হারাম হওয়ার সন্দেহ দেখা দিয়েছে। তাই হাশেমীর গোলামের উপরও সদকা গ্রহণ হরাম করা হয়েছে।

একটি প্রশ্ন ও তার জবাব : কেউ বলতে পারে যে, হাশেমীর আজাদ গোলামের জন্য সদকা হারাম হওয়ার যে কারণটি বর্ণনা করা হলো, তা ধনী ব্যক্তির গোলামের ক্ষেত্রেও বিদ্যমান আছে। সে হিসাবে ধনী ব্যক্তির গোলামের পক্ষেও সদকা হারাম হওয়া উচিত; কিন্তু তা হয়নি কেন?

এর উত্তর এই যে, ধনী ব্যক্তির গোলামের ক্ষেত্রে উক্ত কারণ বিদ্যমান নেই। কেননা ধনী ব্যক্তির জন্যই মূলত সদকা হারাম নয়। তার জন্য ব্যক্তি হিসাবে সদকা গ্রহণ করা জায়েজ। তবে তার ধনাঢ্য সদকা গ্রহণের পথে প্রতিবন্ধক হওয়ার কারণে সে সদকা গ্রহণ করতে পারে না। কিন্তু এ প্রতিবন্ধক গোলামের ক্ষেত্রে বিদ্যমান নেই। বিধায় সে সদকা গ্রহণ করতে পারবে। পক্ষান্তরে হাশেমীর জন্য ব্যক্তি হিসাবেই সদকা গ্রহণ করা হারাম। কেননা তাকে তার মর্যাদার কারণে মানুষের ময়লা তথা জাকাত-সদকা হতে পবিত্র রাখা হয়েছে। অতএব, হাশেমীর সাথে ধনীকে কিয়াস করা ঠিক নয়।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ : وَمَا جَبَاهُ الْإِمَامُ مِنَ الْخَرَاجِ وَمِنْ اَمْوَالِ بَنِيْ تَغْلِبَ وَمَا اَهْدَاهُ اَهْلُ الْحَرْبِ اِلَى الْإِمَامِ وَالْجِزْيَةُ يُصْرَفُ فِيْ مَصَالِحِ الْمُسْلِمِيْنَ كَسَدِّ الثُّغُوْرِ وَبِنَاءِ الْقَنَاطِرِ وَالْجُسُوْرِ، وَيُعْطَى قُضَاةُ الْمُسْلِمِيْنَ وَعُمَّالُهُمْ وَعُلَمَاؤُهُمْ مِنْهُ مَا يَكْفِيْهِمْ، وَيُدْفَعُ مِنْهُ اَرْزَاقُ الْمُقَاتِلَةِ وَذَرَارِيْهِمْ؛ لِاَنَّهُ مَالُ بَيْتِ الْمَالِ فَاِنَّهُ وَصَلَ اِلَى الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ غَيْرِ قِتَالٍ وَهُوَ مُعَدٌّ لِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِيْنَ وَهٰؤُلَاءِ عَمَلَتُهُمْ وَنَفَقَةُ الذَّرَارِيِّ عَلَى الْاٰبَاءِ، فَلَوْ لَمْ يُعْطَوْا كِفَايَتَهُمْ لَاحْتَاجُوْا اِلَى الْاِكْتِسَابِ وَلَا يَتَفَرَّغُوْنَ لِلْقِتَالِ.

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, খারাজ, তাগলিবী থেকে উসুলকৃত মাল, মুসলিম শাসককে হারবীদের প্রদত্ত উপহার ও জিজিয়ার মাল যা শাসক সংগ্রহ করেন– সেগুলো মুসলমানদের জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা হবে। যেমন সীমান্ত রক্ষার কাজে পুল ও সেতু নির্মাণের কাজে ব্যয় হবে। আর মুসলমানদের বিচারকার্য ও শাসনকার্যে নিযুক্ত ব্যক্তিদের এবং আলেমদের তা থেকে প্রয়োজন পরিমাণ প্রদান করা হবে। আর তা থেকে যোদ্ধা ও তাদের সন্তানদের (পরিবার -পরিজনদের) ভাতা দেওয়া হবে। কেননা বিনা লড়াইয়ে যেহেতু তা মুসলমানদের হাতে এসেছে, সেহেতু এটা বাইতুলমালের সম্পদ। আর বাইতুলমাল মুসলমানদের কল্যাণের জন্যই নিবেদিত। আর উল্লিখিত সকলে মুসলমানদের সেবা কর্মে নিয়েজিত। আর সন্তানাদি (ও পরিবার পরিজনের) ভরণপোষণ পিতার দায়িত্বে। এমতাবস্থায় প্রয়োজন পরিমাণ মাল প্রদান করা না হলে তারা উপার্জনে নিয়োজিত হতে বাধ্য হবে ফলে, তারা লড়াইয়ের জন্য অবসর পাবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শব্দ-বিশ্লেষণ : جَبَوْا - اَلْمَالُ وَالْخَرَاجَ جَبَا يَجْبُوْ বাবে نصر হতে। অর্থ হলো, সম্পদ সঞ্চয় করল বা খারাজ সংগ্রহ করল। ثُغُوْرٌ বহুবচন : একবচন হলো ثَغْرٌ অর্থ– সীমান্ত। قَنَاطِرُ বহুবচন। একবচন قَنْطَرَةٌ অর্থ– ছোট ও সমতল পুল। جُسُوْرٌ বহুবচন। একবচন جِسْرٌ অর্থ– বড় ও উঁচু সেতু। قُضَاةٌ বহুবচন, একবচন قَاضِيْ অর্থ– বিচারক। عُمَّالٌ - বহুবচন, একবচন عَامِلٌ অর্থ– কর্মী, কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তি। ذَرَارِيْ - বহুবচন, একবচন ذُرِّيَّةٌ অর্থ– সন্তানাদি, পরিজন।

উপরিউক্ত ইবারতে বাইতুলমালের সম্পদ ও তা ব্যয়ের খাত বর্ণনা করা হয়েছে–

১. খারাজ বাবাদ উসুলকৃত সম্পদ, ২. বনী তাগলিব থেকে প্রাপ্ত সম্পদ, ৩.জিযিয়া বাবদ প্রাপ্ত সম্পদ, ৪. হারবীদের থেকে উপঢৌকন হিসাবে প্রাপ্ত সম্পদ, সবই বাইতুলমালের সম্পদ বলে গণ্য। এগুলো মুসলমানদের কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা হবে। যেমন, ১. মুসলিম দেশের সীমান্ত রক্ষার কাজে, ২. পুল ও সেতু নির্মাণের কাজে, ৩. বিচারক ও অন্যান্য রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে নিয়োজিত লোকদের ভাতা প্রদানে, ৪. আলেমগণের ভাতা প্রদানে, সৈনিকদের ভাতা প্রদানে।

এসব লোকদের পিছনে বাইতুলমালের সম্পদ ব্যয় করার কারণ হলো, এরা সকলেই মুসলমানের সেবায় নিয়োজিত থাকে। যদি তাদের জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা বাইতুল মাল হতে না করা হয়, তাহলে তারা মুসলমানের সেবামূলক দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে পারবে না; বরং তাদের উপর্জনমূলক কাজে ব্যস্ত হতে হবে। যার ফলে সকল মুসলমান ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

অতএব, মুসলমানদের স্বার্থেই উপরিউক্ত শ্রেণির লোকদের জীবিকার ব্যবস্থা বাইতুলমাল হতে করা হয়। কেননা বাইতুলমাল মুসলমানের কল্যাণের জন্যই তৈরি করা হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَمَنْ مَاتَ فِيْ نِصْفِ السَّنَةِ فَلَا شَيْءَ لَهُ مِنَ الْعَطَاءِ لِاَنَّهُ نَوْعُ صِلَةٍ وَلَيْسَ بِدَيْنٍ؛ وَلِهٰذَا سُمِّيَ عَطَاءً فَلَا يُمْلَكُ قَبْلَ الْقَبْضِ وَيَسْقُطُ بِالْمَوْتِ، وَاَهْلُ الْعَطَاءِ فِيْ زَمَانِنَا مِثْلُ الْقَاضِيْ وَالْمُدَرِّسِ وَالْمُفْتِيْ، وَاللّٰهُ اَعْلَمُ.

অনুবাদ : উপরে বর্ণিত লোকদের কেউ যদি বৎসরের মাঝে মারা যায়, তাহলে তাকে ভাতা প্রদান করা হবে না। কেননা এটা এক ধরনের দান, প্রাপ্য ঋণ নয়। এ কারণেই এটাকে আতা বা দান বলা হয়। সুতরাং হস্তগত করার পূর্বে তার মালিকানা সাব্যস্ত হবে না এবং মৃত্যুর কারণে তা রহিত হয়ে যাবে।

আমাদের যুগে ভাতার হকদাররা হলেন, কাজি বা বিচারক, মুদাররিস বা দীনি শিক্ষক ও মুফতি প্রমুখ। আল্লাহই অধিক অবগত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

বর্ণিত মাসআলার সারমর্ম এই যে, বাইতুলমাল থেকে যাদেরকে ভাতা প্রদান করা হয়, তাদের কেউ যদি বৎসরের মাঝে মারা যায়, তাহলে সে বাইতুলমাল থেকে কিছু পাবে না।

কারণ হলো, বাইতুলমাল হতে যা দেওয়া হয়, তা কোনো ঋণের মতো প্রাপ্য নয়; বরং তা একপ্রকার দান। বিধায় কব্জা করার পূর্বে এর মালিকানা সাব্যস্ত হবে না; বরং মৃত্যুর দ্বারা তা রহিত হয়ে যাবে।

আর তাদের কেউ যদি বৎসরের শেষে মারা যায়, তাহলে তার ভাতাটুকু তার নিকটাত্মীয়দের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ اَحْكَامِ الْمُرْتَدِّيْنَ

وَاِذَا ارْتَدَّ الْمُسْلِمُ عَنِ الْاِسْلَامِ وَالْعِيَاذُ بِاللّٰهِ عُرِضَ عَلَيْهِ الْاِسْلَامُ، فَاِنْ كَانَتْ لَهُ شُبْهَةٌ كُشِفَتْ عَنْهُ لِاَنَّهُ عَسَاهُ اعْتَرَتْهُ شُبْهَةٌ فَتُزَاحُ، وَفِيْهِ دَفْعُ شَرِّهِ بِاَحْسَنِ الْاَمْرَيْنِ، اِلَّا اَنَّ الْعَرْضَ عَلٰى مَا قَالُوْا غَيْرُ وَاجِبٍ؛ لِاَنَّ الدَّعْوَةَ بَلَغَتْهُ وَيُحْبَسُ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ، فَاِنْ اَسْلَمَ وَاِلَّا قَالَ قُتِلَ . وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ : اَلْمُرْتَدُّ يُعْرَضُ عَلَيْهِ الْاِسْلَامُ حُرًّا كَانَ اَوْ عَبْدًا فَاِنْ اَبٰى قُتِلَ وَتَاْوِيْلُ الْاَوَّلِ اَنَّهُ يَسْتَمْهِلُ فَيُمْهَلُ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ لِاَنَّهَا مُدَّةٌ ضُرِبَتْ لِاِبْلَاءِ الْاَعْذَارِ . وَعَنْ اَبِيْ حَنِيْفَةَ رہ وَاَبِيْ يُوْسُفَ رحہ اَنَّهُ يُسْتَحَبُّ اَنْ يُؤَجِّلَهُ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ طَلَبَ ذٰلِكَ اَوْ لَمْ يَطْلُبْ . وَعَنِ الشَّافِعِيِّ اَنَّ عَلَى الْاِمَامِ اَنْ يُؤَجِّلَهُ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ اَنْ يَقْتُلَهُ قَبْلَ ذٰلِكَ؛ لِاَنَّ ارْتِدَادَ الْمُسْلِمِ يَكُوْنُ عَنْ شُبْهَةٍ ظَاهِرًا فَلَا بُدَّ مِنْ مُدَّةٍ يُمْكِنُهُ التَّاَمُّلُ فَقَدَّرْنَاهَا بِالثَّلَاثِ .

পরিচ্ছেদ : মুরতাদদের বিধানসমূহ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, আল্লাহর পানাহ! মুসলমান যদি ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যায় তাহলে তার সামনে ইসলাম পেশ করা হবে। যদি তার মনে কোনো সন্দেহ থাকে তাহলে তার সন্দেহ দূর করা হবে।

কেননা হতে পারে যে, তার মনে কোনো সন্দেহ দেখা দিয়েছে। সুতরাং তা নিরসন করা উচিত। আর তাতে (হত্যা কিংবা পুনঃ ইসলাম গ্রহণ এই) দুই পন্থার উত্তম পন্থায় তার দুষ্কৃতি প্রতিরোধ করা হয়। তবে মাশায়েখগণ বলেছেন যে, ইসলাম পেশ করা ওয়াজিব নয়। কেননা তার কাছে তো (ইসলামের) দাওয়াত পৌঁছেছে :

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, তাকে তিন দিন আটক রাখা হবে। যদি সে ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তো ভালো। অন্যথায় তাকে হত্যা করা হবে। আর জামে সাগীর কিতাবে রয়েছে, মুরতাদ স্বাধীন হোক কিংবা গোলাম, তার সামনে ইসলাম পেশ করা হবে। যদি সে অস্বীকার করে তাহলে তাকে হত্যা করা হবে।

প্রথম বক্তব্যের ব্যাখ্যা এই যে, সে (চিন্তা-ভাবনা ও মতবিনিময়ের জন্য) সময় প্রার্থনা করলে তাকে তিন দিন সময় দেওয়া হবে। কেননা এ হচ্ছে ওজর অজুহাত পরীক্ষা করে দেখার জন্য শরিয়ত নির্ধারিত সময়সীমা। (যেমন– ক্রয়-বিক্রয়ের ভালো-মন্দ ভেবে দেখার জন্য তিন দিন সময় দেওয়া হয়।)

ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, সে সময় প্রার্থনা করুক বা না করুক, তাকে তিন দিন অবকাশ দেওয়া মোস্তাহাব।

ইমাম শাফেয়ী (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিন দিন সময় দেওয়া শাসকের অবশ্য কর্তব্য। এর পূর্বে তাকে হত্যা করা তার জন্য বৈধ হবে না। কেননা বাহ্যতঃ মুসলমানের ধর্মত্যাগ উদ্ভূত কোনো সন্দেহের কারণেই হয়ে থাকবে। সুতরাং এমন একটি সময়সীমা অপরিহার্য, যা তাকে চিন্তাভাবনা করার সুযোগ দিবে। আর সেটাকে আমরা তিন দিন নির্ধারণ করেছি।

https://e-ilm.weebly.com/

وَلَنَا قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ﴾ مِنْ غَيْرِ قَيْدِ الْإِمْهَالِ، وَكَذَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ﴿مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ﴾ وَلِأَنَّهُ كَافِرٌ حَرْبِيٌّ بَلَغَتْهُ الدَّعْوَةُ فَيُقْتَلُ لِلْحَالِ مِنْ غَيْرِ اسْتِمْهَالٍ، وَهٰذَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوْزُ تَأْخِيْرُ الْوَاجِبِ لِأَمْرٍ مَوْهُوْمٍ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ لِإِطْلَاقِ الدَّلَائِلِ . وَكَيْفِيَّةُ تَوْبَتِهِ أَنْ يَتَبَرَّأَ عَنِ الْأَدْيَانِ كُلِّهَا سِوَى الْإِسْلَامِ؛ لِأَنَّهُ لَا دِيْنَ لَهُ، وَلَوْ تَبَرَّأَ عَمَّا انْتَقَلَ إِلَيْهِ كَفَاهُ لِحُصُوْلِ الْمَقْصُوْدِ .

অনুবাদ : আমাদের দলিল হলো– আল্লাহ তা'আলার বাণী : فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ মুশরিকদের হত্যা করো। এখানে অবকাশ প্রদানের শর্ত নেই। অদ্রূপ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ যে তার ধর্ম পরিবর্তন করে তাকে হত্যা করো। তা ছাড়া এই কারণে যে, সে হলো এক হারবী কাফের যার নিকট দাওয়াত পৌছেছে; সুতরাং অবকাশ প্রদান ছাড়াই তৎক্ষণাৎ হত্যা করা যাবে। এর কারণ এই যে, একটি ধারণাজাত বিষয়ের কারণে ওয়াজিব কাজে বিলম্ব করা সঙ্গত নয়।

স্বাধীন ও গোলামের মাঝে পার্থক্য না করার কারণ হলো, দলিল সমূহের নিঃশর্ততা। তার তওবার সুরত এই যে, সে ইসলাম ছাড়া অন্যসকল ধর্মের সাথে নিজের নিঃসম্পর্কতা ঘোষণা করবে। কেননা তার তো কোনো ধর্ম নেই।

আর যদি যে ধর্ম সে গ্রহণ করেছে তার থেকে নিঃসম্পর্কতা ঘোষণা করে তাহলে যথেষ্ট হবে। কেননা তাতে উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বের অধ্যায়ে কুফরে আসলী বা স্থায়ী কুফরি সম্পর্কে আলোচনা ছিল। এ অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে কুফরে ত্বারী বা উদ্ভূত কুফরি সম্বন্ধে। কেননা কুফরে ত্বারী কুফরে আসলীর পরেই বিদ্যমান হয়ে থাকে।

اَلْمُرْتَدُّوْنَ-শব্দটি বহুবচন। এর একবচন হলো اَلْمُرْتَدُّ এটি واحد مذكر-এর সীগাহ। বহছ اسم فاعل; বাবে افتعال। ক্রিয়ারূপ হলো اِرْتَدَّ يَرْتَدُّ اِرْتِدَادًا অর্থ হলো– ফিরে যাওয়া, ঘুরে যাওয়া। ইসলামি পরিভাষায় মুরতাদ বলা হয়, যে ব্যক্তি ইসলাম ত্যাগ করে। অর্থাৎ কেউ ইসলাম গ্রহণ করার পর যদি ইসলাম ছেড়ে দেয় তাহলেই সে মুরতাদ।

কেউ মুরতাদ হয়ে গেলে তার কাছে পুনরায় ইসলাম পেশ করা হবে। যদি তার মনে ইসলাম সম্বন্ধে কোনো সংশয় থাকে তাহলে তা নিরসন করা হবে। এরপর যদি সে পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করে এবং নিজ কৃতকর্ম থেকে তওবা করে তাহলে সে হত্যার কবল থেকে রক্ষা পাবে। অন্যথায় তাকে হত্যা করা হবে।

মুরতাদের কাছে ইসলাম পেশ করার হেকমত এই যে, মুরতাদের সামনে দুটি পথ খোলা থাকে, এক. তওবা করে পুনরায় ইসলামে ফিরে আসা। দুই. হত্যা করা। এই দুই পদ্ধতির মাঝে উত্তম পথ হলো প্রথমটি। তার কাছে ইসলাম পেশ করার উদ্দেশ্য হলো সে যেন এই উত্তম পথটি অবলম্বন করে এবং যেন তার অনিষ্ট থেকে মানুষ রক্ষা পায়, সেও রক্ষা পায়। মুরতাদের কাছে ইসলাম পেশ করার কাজটি ওয়াজিব বা জরুরি নয়; বরং তা মোস্তাহাব। কেননা ইসলামের দাওয়াত তার কাছে পূর্বেই পৌছেছে পুনরায় দাওয়াত দেওয়ার কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই।

قوله : وَيُحْبَسُ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ. فَاِنْ اَسْلَمَ وَاِلَّا قُتِلَ الخ : উপরিউক্ত ইবারতে তিনটি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

১. মুরতাদকে অবকাশ দেওয়া সম্পর্কিত কুদূরী ও জামে সাগীরের বর্ণনা এবং উভয়ের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান।

২. অবকাশ দেওয়া সম্পর্কে ইমামগণের মতামত ও দলিল।

৩. মুরতাদের তওবার পদ্ধতি।

https://e-ilm.weebly.com/

বিস্তারিত আলোচনা

এক. ইমাম কুদূরী (র.)-এর বর্ণনা হলো কেউ মুরতাদ হয়ে গেলে তাকে তিন দিন বন্দী করে রাখা হবে এবং তাকে তওবার সুযোগ দেওয়া হবে। যদি তিন দিনের মধ্যে তওবা করে, তাহলে তো ভালোই। তিন দিনের মধ্যে তওবা না করলে। তিন দিন পর তাকে হত্যা করা হবে।

আর জামে সাগীরের বর্ণনা হলো, মুরতাদের নিকট ইসলাম পেশ করা হবে। যদি গ্রহণ করে তাহলে ভালো। যদি অস্বীকার করে তাহলে তৎক্ষণাৎ হত্যা করা হবে। অর্থাৎ তাকে কোনোরূপ অবকাশ দেওয়া হবে না। সুতরাং কুদূরীর বর্ণনা ও জামে সাগীরের বর্ণনার মাঝে বৈপরীত্য দেখা দিল।

হেদায়া গ্রন্থকার (র.) এ বৈপরীত্য দূর করার উদ্দেশ্যে কুদূরীর বর্ণনাটি ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে যে, কেউ যদি মুরতাদ হওয়ার পর, পুনরায় ইসলামে ফিরে আসার ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করার জন্য অবকাশ চায়, তাহলে তাকে তিন দিনের অবকাশ দেওয়া হবে। যদি সে নিজে অবকাশ প্রার্থনা না করে, তাহলে কোনো অবকাশ দেওয়া হবে না। এটা হলো ইমাম কুদূরী (র.)-এর রেওয়ায়েতের মর্ম।

অতএব, বলা যায়, ইমাম কুদূরী (র.)-এর বর্ণনাটি মুরতাদের পক্ষ থেকে অবকাশ প্রার্থনা করার সুরতের সাথে সম্পর্কিত। আর জামে সাগীরের বর্ণনাটি মুরতাদের পক্ষ থেকে অবকাশ প্রার্থনা না করার সুরতের সাথে সম্পর্কিত। সুতরাং দুই বর্ণনার মাঝে কোনো বৈপরীত্য নেই।

দুই. মুরতাদকে অবকাশ দেওয়া না দেওয়া সম্পর্কে ইমামগণের মতামত :

ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, মুরতাদকে তিন দিনের অবকাশ দেওয়া মোস্তাহাব। সে নিজে অবকাশ প্রার্থনা করুক কিংবা না করুক।

আর ইমাম শাফেয়ী (র.) থেকে বর্ণিত আছে, মুরতাদকে তিন দিনের অবকাশ দেওয়া ওয়াজিব। তিন দিনের পূর্বে তাকে হত্যা করা ইমামের পক্ষে জায়েজ নয়।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল : ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, কোনো মুসলমান যখন ইসলাম ত্যাগ করে, তখন এটাই স্বাভাবিক যে, সে কোনো উদ্ভূত সন্দেহের কারণে ইসলাম ত্যাগ করেছে। তাই তাকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সময় দেওয়া উচিত যাতে সে একটু চিন্তাভাবনা করতে পারে। অতএব, আমরা তার জন্য তিন দিন সময় নির্ধারণ করেছি।

আহনাফের দলিল :

১. কুরআনের আয়াত : فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ -অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ করেছেন, তোমরা মুশরিকদেরকে হত্যা করো, অবকাশের কোনো শর্তারোপ করেননি।

২. রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাদীস : مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ -অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ আদেশ করেছেন, যে ব্যক্তি তার ধর্ম পরিবর্তন করবে, তাকে তোমরা হত্যা করবে। এ হাদীসেও অবকাশ দেওয়ার কোনো শর্তারোপ করা হয়নি।

উল্লেখ্য যে, উক্ত হাদীসটি হযরত ইবনে আব্বাস, হযরত মুআবিয়া, হযরত আয়েশা (রা.) প্রমুখ সাহাবাদের থেকে ইমাম বুখারী, ইমাম তাবারানী প্রমুখ বর্ণনা করেছেন।

৩. মুরতাদ ব্যক্তি একজন হারবী কাফের। কেননা সে জিম্মি নয়, যেহেতু জিজিয়া দেয়নি। আবার মুস্তামিনও নয়, যেহেতু সে নিরাপত্তা চায়নি এবং তাকে নিরাপত্তা দেওয়াও হয়নি। আর হারবী কাফেরকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করাই বাঞ্ছনীয়। অবকাশ দেওয়ার কোনো যৌক্তিকতা নেই। কেননা তাকে হত্যা করা হলো ওয়াজিব, আর তার ইসলামে ফিরে আসার বিষয়টি কেবলই ধারণাজাত। অতএব, ধারণাজাত বিষয়ের আশায় ওয়াজিব হুকুম পালনের ক্ষেত্রে বিলম্ব করা যুক্তি সঙ্গত নয়।

প্রকাশ থাকে যে, মুরতাদকে হত্যা করা ওয়াজিব। এ বিধানের ক্ষেত্রে স্বাধীন ও গোলাম এক বরাবর। অর্থাৎ কোনো স্বাধীন মুসলমান ধর্মত্যাগ করলে যেমন তাকে হত্যা করা হয়, তেমনি কোনো গোলাম যদি ইসলাম ত্যাগ করে তাহলে তাকে হত্যা করা হবে। কারণ মুরতাদকে হত্যা করা সম্পর্কিত দলিলসমূহ ব্যাপক, স্বাধীন গোলাম উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। যেমন- فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ، مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ - ইত্যাদি। অতএব, স্বাধীন আর পরাধীনের মাঝে কোনো পার্থক্য করা হবে না।

তিন. মুরতাদের তওবার পদ্ধতি : মুরতাদ যদি ইসলাম ত্যাগ করার পর অন্য ধর্মে প্রবেশ করে না থাকে, তাহলে তার তওবা করার পদ্ধাতি হলো এই যে, প্রথমে সে তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য দিবে। অর্থাৎ কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করবে। অতঃপর ইসলাম ছাড়া অন্য সকল ধর্ম হতে সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করবে। অর্থাৎ এরূপ বলবে যে, আমি মুসলমান। ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্মের সাথে আমার কোনোরূপ সম্পর্ক নেই। আর যদি মুরতাদ ব্যক্তি ইসলাম ত্যাগ করার পর অন্য ধর্মে প্রবেশ করে থাকে, তাহলে তার তওবা করার নিয়ম হলো সে তাওহীদ-রেসালাতের সাক্ষ্য দিবে এবং যে ধর্মে প্রবেশ করেছে সে ধর্ম থেকে সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করবে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-কে প্রশ্ন করা হলো, মুরতাদ কিভাবে তওবা করবে? তিনি উত্তর দিলেন, মুরতাদ সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, হযরত মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর বান্দা এবং রাসূল। আল্লাহ প্রদত্ত সকল বিধিবিধান স্বীকার করবে। যে ধর্মে প্রবেশ করেছে, সে ধর্ম থেকে সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করবে এবং বলবে যে, আমি এ ধর্মে কখনো প্রবেশ করিনি। আমি এধর্ম থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ فَإِنْ قَتَلَهُ قَاتِلٌ قَبْلَ عَرْضِ الْإِسْلَامِ عَلَيْهِ كُرِهَ، وَلَا شَيْءَ عَلَى الْقَاتِلِ وَمَعْنَى الْكَرَاهِيَةِ هَاهُنَا تَرْكُ الْمُسْتَحَبِّ وَانْتِفَاءُ الضَّمَانِ؛ لِأَنَّ الْكُفْرَ مُبِيحٌ لِلْقَتْلِ، وَالْعَرْضُ بَعْدَ بُلُوْغِ الدَّعْوَةِ غَيْرُ وَاجِبٍ وَأَمَّا الْمُرْتَدَّةُ فَلَا تُقْتَلُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رحـ تُقْتَلُ لِمَا رَوَيْنَا؛ وَلِأَنَّ رِدَّةَ الرَّجُلِ مُبِيْحَةٌ لِلْقَتْلِ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ جِنَايَةٌ مُتَغَلِّظَةٌ فَتُنَاطُ بِهَا عُقُوْبَةٌ مُتَغَلِّظَةٌ وَرِدَّةُ الْمَرْأَةِ تُشَارِكُهَا فِيْهَا فَتُشَارِكُهَا فِيْ مُوجِبِهَا . وَلَنَا ﴿أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَهٰى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ﴾، وَلِأَنَّ الْأَصْلَ تَأْخِيْرُ الْأَجْزِيَةِ إِلٰى دَارِ الْآخِرَةِ إِذْ تَعْجِيْلُهَا يُخِلُّ بِمَعْنَى الْإِبْتِلَاءِ، وَإِنَّمَا عُدِلَ عَنْهُ دَفْعًا لِشَرٍّ نَاجِزٍ وَهُوَ الْحِرَابُ، وَلَا يَتَوَجَّهُ ذٰلِكَ مِنَ النِّسَاءِ؛ لِعَدَمِ صَلَاحِيَّةِ الْبِنْيَةِ، بِخِلَافِ الرِّجَالِ فَصَارَتْ الْمُرْتَدَّةُ كَالْأَصْلِيَّةِ قَالَ وَلٰكِنْ تُحْبَسُ حَتّٰى تُسْلِمَ؛ لِأَنَّهَا امْتَنَعَتْ عَنْ إِيْفَاءِ حَقِّ اللّٰهِ تَعَالٰى بَعْدَ الْإِقْرَارِ فَتُجْبَرُ عَلٰى إِيْفَائِهِ بِالْحَبْسِ كَمَا فِيْ حُقُوْقِ الْعِبَادِ وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ : وَتُجْبَرُ الْمَرْأَةُ عَلَى الْإِسْلَامِ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ইসলাম পেশ করার পূর্বেই যদি কোনো হত্যাকারী তাকে হত্যা করে ফেলে তাহলে তা মাকরূহ হবে। তবে হত্যাকারীর উপর কোনো দায় সাব্যস্ত হবে না। এখানে কারাহাত বা মাকরূহ হওয়ার অর্থ হলো মোস্তাহাব বা পছন্দনীয় কাজ তরক করা। ক্ষতিপূরণ সাব্যস্ত না হওয়ার কারণ হলো, কুফরি হচ্ছে হত্যাকে বৈধতা দানকারী একটি অবস্থা। আর দাওয়াত পৌঁছার পর ইসলাম পেশ করা ওয়াজিব নয়।

মুরতাদ মহিলাকে হত্যা করা হবে না। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, তাকেও হত্যা করা হবে। এর কারণ আমাদের পূর্ব বর্ণিত হাদীস। তাছাড়াও এ কারণে যে, পুরুষের ধর্ম ত্যাগ এদিক থেকে হত্যা কে বৈধতা দানকারী যে, তা একটি গুরুতর অপরাধ। তাই এর সাথে গুরুতর শাস্তি সম্পৃক্ত হয়। আর অপরাধের গুরুত্বের ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকের ধর্মত্যাগ পুরুষের ধর্মত্যাগের সমকক্ষ। সুতরাং অপরাধের পরিণতির ক্ষেত্রেও তাকে সমান অংশীদার করবে।

আমাদের দলিল এই যে, নবী করীম ﷺ স্ত্রীলোকদের হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। তা ছাড়া মূল তো হলো অপরাধের শাস্তি আখেরাত পর্যন্ত স্থগিত রাখা। কেননা তড়িৎ শাস্তি প্রদান পরীক্ষার উদ্দেশ্যকে ক্ষুণ্ন করে। এ বিধান থেকে সরে আসা হয়েছে। শুধু তাৎক্ষণিক অনিষ্ট রোধ করার জন্য। আর তা হলো মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ। পক্ষান্তরে স্ত্রীলোকদের থেকে দেহ কাঠামোগত যোগ্যতার অভাবে সে আশঙ্কা দেখা দিবে না।

পুরুষদের বিষয়টি ভিন্ন। সুতরাং মুরতাদ নারী আসল কাফের নারীর মতো হলো।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, **তবে পুনঃ ইসলাম গ্রহণ পর্যন্ত তাকে আটক রাখা হবে।** কেননা সে আল্লাহর হক স্বীকার করার পর তা আদায় করা হতে বিরত রয়েছে। সুতরাং আটক করে তাকে তা আদায় করতে বাধ্য করা হবে। যেমন বান্দার হকের ক্ষেত্রে। **আর জামে সাগীর কিতাবে রয়েছে, স্ত্রীলোক স্বাধীন হোক কিংবা দাসী তাকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হবে।**

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কোনো মুরতাদ ব্যক্তির নিকট ইসলাম পেশ করার পূর্বেই যদি কেউ তাকে হত্যা করে ফেলে, তাহলে তার উপর কোনো যেমান বা দায় ওয়াজিব হবে না। কারণ মুরতাদ হওয়ার কারণে সে وَاجِبُ الْقَتْلِ হয়েছে বা তাকে হত্যা করা ওয়াজিব ছিল। আর হত্যাকারী ব্যক্তি সেই ওয়াজিব কাজটিই আঞ্জাম দিয়েছে। তবে তার নিকট ইসলাম পেশ করা মোস্তাহাব ছিল। সে মোস্তাহাবটি ত্যাগ করা হয়েছে। মুরতাদের নিকট ইসলাম পেশ করা মোস্তাহাব, ওয়াজিব নয়। কারণ ইসলামের দাওয়াত তার নিকট আগেই পৌঁছেছে।

قوله : وَأَمَّا الْمُرْتَدَّةُ فَلَا تُقْتَلُ الخ : কোনো মহিলা মুরতাদ হয়ে গেলে তাকে হত্যা করা যাবে কিনা এ নিয়ে ইমামগণের মাঝে মতপার্থক্য হয়েছে।

আহনাফের মত হলো কোনো মহিলা মুরতাদ হয়ে গেলে তাকে হত্যা করা হবে না; বরং তাকে বন্দী করে রেখে পুনরায় ইসলাম গ্রহণের জন্য দাওয়াত দেওয়া হবে এবং উৎসাহিত করা হবে। যদি সে ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে ভালো। অন্যথায় তাকে মৃত্যু পর্যন্তই বন্দী করে রাখা হবে। ইতোমধ্যে যদি কোনো হত্যাকারী তাকে হত্যা করে ফেলে তাহলে তার উপর কোনো দায় ওয়াজিব হবে না। এ বিধান সকল মুরতাদ মহিলার, চাই স্বাধীন হোক, কিংবা বাঁদি হোক।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মত হলো, মুরতাদ মহিলাকে হত্যা করা হবে। ইমাম মালেক (র.), আমদ ইবনে হাম্বল (র.), যুহরী, নাখয়ী, আওযায়ী, মাকহুল, হাম্মাদ ও আবুল লাইস (র.) প্রমুখও এ মত পোষণ করেন।

ইমাম শাফেয়ী (র.) ও তার মতাবলম্বীদের দলিল :

১. রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী : مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ (যে ব্যক্তি তার ধর্ম পরিবর্তন করে তোমরা তাকে হত্যা কর)।

এ হাদীসটি ব্যাপক, যে-ই ধর্ম পরিবর্তন করবে, তাকেই হত্যার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নারীকে ব্যতিক্রম করা হয়নি। এতএব, নারী-পুরুষ উভয়ই এর আওতাভুক্ত।

২. মুরতাদ হওয়া যেমন পুরুষের ক্ষেত্রে জঘন্য অপরাধ। তেমনি তা নারীর ক্ষেত্রেও জঘন্য অপরাধ। অতএব, মুরতাদ হওয়ার দায়ে যেমন পুরুষকে হত্যা করা হয়, তেমনি এর দায়ে নারীকেও হত্যা করা হবে।

আহনাফের দলিল :

১. রাসূলুল্লাহ ﷺ নারীকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। ইমাম বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী প্রমুখ মুহাদ্দিস উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। যেমন-

عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض اَنَّ امْرَاَةً وُجِدَتْ فِيْ بَعْضِ مَغَازِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهٰى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ-

নাফে' সূত্রে হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর উপস্থিতিতে কোনো এক যুদ্ধে একজন নারীকে পাওয়া গেল। তখন রাসূল ﷺ নারী ও শিশুকে হত্যা করতে নিষেধ করলেন।

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ انْطَلِقُوْا بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ لَا تَقْتُلُوْا شَيْخًا فَانِيًا وَلَا طِفْلًا وَلَا صَغِيْرًا وَلَا امْرَاَةً-

তোমরা আল্লাহর নামে আল্লাহর সাথে রাসূলের মিল্লাতের উপর চলো। কোনো অতি বৃদ্ধকে হত্যা করো না। বালককে হত্যা করো না। শিশুকে হত্যা করো না। কোনো নারীকেও হত্যা করোনা। (আবূ দাউদ)

২. শরিয়তের মূলনীতি হলো কোনো অপরাধের শাস্তি দুনিয়াতে না দেওয়া; বরং আখেরাত পর্যন্ত তা স্থগিত রাখা, যাতে পরীক্ষার উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হয়। কেননা যদি পাপের শাস্তি দুনিয়াতে প্রদান করা হয়, তাহলে শাস্তির ভয়ে মানুষ

https://e-ilm.weebly.com/

পাপ বর্জন করবে। তখন আরো মানবকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্য সফল হবে। বিধায় মূল অবস্থা হলো, পাপের শাস্তি আখেরাত পর্যন্ত বিলম্বিত হওয়া। কিন্তু মুরতাদের ক্ষেত্রে এ মূলনীতির ব্যতিক্রম করা হয়েছে এবং দুনিয়াতেই তাকে হত্যা করার বিধান রাখা হয়েছে। এর কারণ হলো এই যে, মুরতাদকে হত্যা না করা হলে, সে মুসলমানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে পারে। মুসলমানের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হতে পারে। তাই উক্ত ক্ষতি বা সমস্যা প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্য মুরতাদকে হত্যা করা হয়। এ আশঙ্কাটি মুরতাদ নারীর ক্ষেত্রে অবিদ্যমান। কেননা নারীরা দৈহিকভাবে দুর্বল। তারা অস্ত্র ধারণ ও যুদ্ধ করার ক্ষমতা রাখে না। তাই তাদেরকে হত্যা করারও প্রয়োজনীয়তা নেই। বিধায় মুরতাদ পুরুষকে হত্যা করা হবে। মুরতাদ নারীকে হত্যা করা হবে না।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিলের জবাব : ইমাম শাফেয়ী (র.) দলিল স্বরূপ যে হাদীসটি পেশ করেছেন সে হাদীসটি ব্যাপক, নারী-পুরুষ সবাইকে আওতাভুক্ত করে ঠিক, কিন্তু হাদীসটি متروك الظاهر অর্থাৎ হাদীসটির বাহ্যিক অর্থ পরিত্যাজ্য। বাহ্যিক অর্থের উপর আমল করা হয়নি। কেননা হাদীসটিতে বলা হয়েছে যে-ই ধর্ম পরিবর্তন করে, তাকেই তোমরা হত্যা করো। অথচ কোনো ইহুদি যদি নাসরানী হয়ে যায় কিংবা কোনো নাসরানী ইহুদি হয়ে যায়, অথবা কোনো হিন্দু মুসলমান হয়ে যায়, তাহলে তাকে কেউ হত্যা করতে বলে না। তাকে হত্যা করা হয় না। এর দ্বারা বুঝা গেল হাদীসটির ব্যাপকতার উপর উম্মত আমল করেনি; বরং হাদীসটিকে শুধু মুরতাদ পুরুষের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হবে। যাতে এহাদীস ও নারীকে হত্যা নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কিত হাদীসের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান হয়ে যায়।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, মুরতাদ নারীকে বন্দী করে পুনরায় ইসলাম গ্রহণের জন্য বাধ্য করা হবে। কেননা সে আল্লাহর হক স্বীকার করার পর তা আদায় করা থেকে বিরত রয়েছে। তাই তার কাছ থেকে সেটা চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে আদায় করা হবে। যেমন কেউ কোনো বান্দার হক স্বীকার করার পর আদায় না করলে তা আদায় করতে বাধ্য করা হয়। বন্দী করা ও চাপ প্রয়োগ করার বিধানের ক্ষেত্রে স্বাধীন নারী ও বাঁদি উভয়ই সমান। এই সমতার বিষয়টি বর্ণনার উদ্দেশ্যেই হেদায়া গ্রন্থকার জামে সাগীরের ভাষ্য উদ্ধৃত করেছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

وَالْاَمَةُ يُجْبِرُهَا مَوْلَاهَا اَمَّا الْجَبْرُ فَلِمَا ذَكَرْنَا، وَمِنَ الْمَوْلٰى: لِمَا فِيْهِ مِنَ الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَقَّيْنِ، وَيُرْوٰى تُضْرَبُ فِيْ كُلِّ اَيَّامٍ مُبَالَغَةً فِي الْحَمْلِ عَلَى الْاِسْلَامِ . قَالَ وَيَزُوْلُ مِلْكُ الْمُرْتَدِّ عَنْ اَمْوَالِهِ بِرِدَّتِهِ زَوَالًا مُرَاعًى، فَاِنْ اَسْلَمَ عَادَتْ اِلٰى حَالِهَا، قَالُوْا : هٰذَا عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ رح، وَعِنْدَهُمَا لَا يَزُوْلُ مِلْكُهُ لِاَنَّهُ مُكَلَّفٌ مُحْتَاجٌ، فَاِلٰى اَنْ يُقْتَلَ يَبْقٰى مِلْكُهُ كَالْمَحْكُوْمِ عَلَيْهِ بِالرَّجْمِ وَالْقِصَاصِ . وَلَهُ اَنَّهُ حَرْبِيٌّ مَقْهُوْرٌ تَحْتَ اَيْدِيْنَا حَتّٰى يُقْتَلَ، وَلَا قَتْلَ اِلَّا بِالْحِرَابِ، فَهٰذَا يُوْجِبُ زَوَالَ مِلْكِهِ وَمَالِكِيَّتِهِ، غَيْرَ اَنَّهُ مَدْعُوٌّ اِلَى الْاِسْلَامِ بِالْاِجْبَارِ عَلَيْهِ وَيُرْجٰى عَوْدُهُ اِلَيْهِ فَتَوَقَّفْنَا فِيْ اَمْرِهِ، فَاِنْ اَسْلَمَ جُعِلَ الْعَارِضُ كَاَنْ لَمْ يَكُنْ فِيْ حَقِّ هٰذَا الْحُكْمِ وَصَارَ كَاَنْ لَمْ يَزَلْ مُسْلِمًا وَلَمْ يَعْمَلِ السَّبَبُ، وَاِنْ مَاتَ اَوْ قُتِلَ عَلٰى رِدَّتِهِ اَوْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ وَحُكِمَ بِلِحَاقِهِ اسْتَقَرَّ كُفْرُهُ فَيَعْمَلُ السَّبَبُ عَمَلَهُ وَزَالَ مِلْكُهُ

অনুবাদ : আর দাসীকে তার মনিব বাধ্য করবে। বাধ্য করার কারণ আমরা (পূর্বে) উল্লেখ করেছি। আর মনিবের পক্ষ থেকে পদক্ষেপ গ্রহণের কারণ এই যে, তাতে (আল্লাহর ও মনিবের) দুটি হকের সমাবেশ রয়েছে। আরো বর্ণিত আছে যে, ইসলাম গ্রহণে অধিকতর উদ্বুদ্ধ করার জন্য প্রতিদিন তাকে প্রহার করা হবে।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ধর্ম ত্যাগের কারণে মুরতাদের যাবতীয় মালামাল থেকে তার মালিকানা সংরক্ষিত অবস্থায় বিলুপ্ত হবে। সুতরাং যদি ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে মালিকানা পূর্বাবস্থায় ফিরে আসবে। মাশায়েখগণ বলেছেন, এটা হলো ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত। আর সাহেবাইনের মতে তার মালিকানা বিলুপ্ত হবে না। কেননা সে দায়িত্ববান মুহতাজ (প্রয়োজনগ্রস্ত) ব্যক্তি। সুতরাং কতল সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত তার মালিকানা বহাল থাকবে। যেমন কিসাস ও রজম দ্বারা দণ্ডিত ব্যক্তির ক্ষেত্র হয়ে থাকে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল এই যে, সে হচ্ছে আমাদের করতলগত এক হারবী। তাই তাকে হত্যার বিধান রয়েছে। অথচ হারব বা যুদ্ধ ছাড়া হত্যা হতে পারে না। আর আমাদের করতলগত হারবী হওয়া তার স্বত্ব ও সত্ত্বাধিকারের বিলুপ্তিকে অবশ্য সাব্যস্ত করে। তবে যেহেতু সে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াত প্রাপ্ত, আর ইসলামে তার প্রত্যাবর্তন আশা করা যায়, তাই তার ব্যাপারে আমরা তার স্বত্ব স্থগিত রেখেছি।

যদি সে পুনঃ ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে (মালিকানা বিলুপ্তির) এই হুকুমের ক্ষেত্রে এই উদ্ভূত উপসর্গটিকে ধরে নেওয়া হবে যেন তার অস্তিত্বই হয়নি এবং যেন সে অব্যাহতভাবে মুসলমানই রয়েছে। আর (মালিকানা বিলুপ্তির) কারণ কার্যকর হয়নি। আর যদি ধর্মত্যাগের অবস্থায় মারা যায় কিংবা সে নিহত কিংবা যদি দারুল হরবে গিয়ে মিলিত হয় এবং (আদালতের পক্ষ থেকে) দারুল হরবে গিয়ে মিলিত হওয়ার হুকুম জারি করা হয় তাহলে তার কুফরি স্থায়ী হয়ে যাবে। ফলে কারণ কার্যকরী হবে এবং তার মালিকানা বিলুপ্ত হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

বাঁদি মুরতাদ হয়ে গেলে মনিব তাকে ইসলাম গ্রহণের জন্য বাধ্য করবে। বাধ্য করার কারণ হলো সে আল্লাহর হক স্বীকার করার পর তা আদায় করা থেকে বিরত রয়েছে, তাই তাকে উক্ত হক আদায় করার জন্য বল প্রয়োগে বাধ্য করা হবে। আর বাধ্য করার পদক্ষেপটি মনিব গ্রহণ করবে-এর কারণ হলো এই যে, বাঁদির মধ্যে দুটি হক সমবেত আছে। এক. আল্লাহর হক; তা হলো তাকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা। দুই. মনিবের হক তা হলো বাঁদির সেবা গ্রহণ করা। তাকে

https://e-ilm.weebly.com/

বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা। এমতাবস্থায় যদি তাকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করার জন্য কাজির কাছে সোপর্দ করা হয়, তাহলে মনিবের হক বিনষ্ট হবে। সে বাদীর দ্বারা কাজ নিতে পারবে না। অতএব, বাঁদীকে মনিবের কাছেই রাখা হবে। সে বাদীকে দিয়ে কাজ করাবে এবং ইসলাম গ্রহণের জন্যও বাধ্য করবে।

ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করার জন্য প্রত্যহ মনিব তাকে প্রহার করবে। হযরত হাসান বসরী (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, মুরতাদ মহিলাকে প্রত্যহ উনচল্লিশটি করে বেত্রাঘাত করা হবে। এর ফলে হয়তো সে মৃত্যুবরণ করবে অথবা ইসলাম গ্রহণ করবে।

قوله : قَالَ وَيَزُوْلُ مِلْكُ الْمُرْتَدِّ عَنْ اَمْوَالِهِ الخ : ফকীহগণ এ ব্যাপারে একমত যে, কেউ মুরতাদ হওয়ার পর যদি পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তার মালিকানা বহাল থাকবে। অর্থাৎ সে মুসলিম থাকা অবস্থায় তার যে সম্পদ ছিল, সে সম্পদ এখনো তার মালিকানা বলেই গণ্য হবে। এ সম্পদে সে তাসাররুফ করতে পারবে। আর যদি পুনরায় ইসলাম গ্রহণ না করে মুরতাদ অবস্থায় মারা যায় কিংবা মুরতাদ অবস্থায় তাকে হত্যা করা হয় কিংবা সে দারুল হরবে চলে যায়, তাহলে তার মালিকানা বাতিল হয়ে যাবে।

কিন্তু ইমামগণের মাঝে মতভেদ হয়েছে এ ব্যাপারে যে, মুরতাদ হওয়ার পর থেকে মারা যাওয়া, নিহত হওয়া কিংবা দারুল হরবে চলে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সময়টুকুতে মুরতাদের মালিকানা বহাল থাকবে না স্থগিত হবে, এ বিষয়ে ইমামগণের দুটি মত বর্ণিত আছে।

১. ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মত হলো, মুরতাদ হওয়ার দ্বারা মুরতাদ ব্যক্তির মালিকানা স্থগিত হয়ে যাবে অথবা সংরক্ষিত অবস্থায় বাতিল হবে। অর্থাৎ ব্যক্তি মুরতাদ হওয়ার পর তার নিজ সম্পদে কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। এরপর যদি পুনরায় সে ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তার মালিকানা পূর্বাবস্থায় ফিরে আসবে। অন্যথায় মালিকানা চিরতরে বাতিল হয়ে যাবে। এটি ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর বিশুদ্ধতম উক্তি। এক বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলেরও মত।

২. সাহেবাইন তথা ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মত হলো, মুরতাদ হওয়ার দ্বারা মুরতাদ ব্যক্তির মালিকানা স্থগিত হবে না; বরং তা বহাল থাকবে। অর্থাৎ সে মুরতাদ হওয়ার পরেও নিজ সম্পদে তসররুফ করতে পারবে। পরে যদি সে মুরতাদ অবস্থায় মারা যায় কিংবা তাকে হত্যা করা হয় কিংবা দারুল হরবে চলে যায়, তাহলে তখন তার মালিকানা বিলুপ্ত হবে। এটা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর এক উক্তি। ইমাম মুযানী (র.)-এর নিকট পছন্দনীয় মত।

দলিল পর্ব : সাহেবাইনের মতের পক্ষে দলিল হলো, মুরতাদ প্রয়োজনগ্রস্ত একজন মুকাল্লাফ ব্যক্তি। অর্থাৎ তার সম্পদের প্রয়োজন আছে। কারণ মুকাল্লাফ হওয়ার কারণে তার উপর যে দায়িত্ব রয়েছে সে দায়িত্ব সম্পদ ব্যতীত পালন করা সম্ভব নয়। বিধায় তার সম্পদ তার মালিকানায় বহাল থাকবে।

মোটকথা সাহেবাইন মনে করেন কোনো ব্যক্তি মুরতাদ হওয়ার দ্বারা শুধু তার দম হালাল হয় বা তাকে হত্যা করা বৈধ হয়ে যায়, কিন্তু তার মালিকানা বাতিল হয় না। যেমন কারো উপর যদি কিসাস বা রজম ওয়াজিব হয়, তাহলে তার দম হালাল হয়ে যায়, কিন্তু এর ফলে তার মালিকানা বাতিল হয়ে যায় না। তদ্রূপ মুরতাদের ক্ষেত্রেও। মুরতাদের দম হালাল হবে কিন্তু তার মালিকানা বিলুপ্ত হবে না।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, মুরতাদ ব্যক্তি মুসলমানদের করতলগত একজন হারবী কাফেরের ন্যায়। কাফের একারণে যে, সে ইসলাম ত্যাগ করেছে। আর হারবী হওয়ার কারণ হলো সে মুসলমানদেরকে জিজিয়া দেয় না এবং সে আমান বা নিরাপত্তাও গ্রহণ করেনি।

তাই সে একজন হারবী কাফের। আর হারবী কাফের যখন মুসলমানের করতলগত হয়, তখন তাকে হত্যা করা হয়। আর হত্যা করার জন্য প্রয়োজন হলো তার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া এবং এ বিষয়টি মালিকানা বিলুপ্ত হওয়াকে অবধারিত করে। কেননা মালিকানার অর্থ এক প্রকার ক্ষমতা ও অধিকার, যার দ্বারা সে সম্পদের মধ্যে তসররুফ করতে পারে। এর জন্য প্রয়োজন হয় নিরাপত্তা। কিন্তু মুরতাদের নিরাপত্তা নেই, বিধায় সম্পদে তসররুফের ক্ষমতা বা মালিকানাও থাকবে না। এ যুক্তিটির দাবি হলো মুরতাদের মালিকানা সম্পূর্ণরূপে বাতিল হয়ে যাওয়া। কিন্তু মুরতাদ ব্যক্তিকে যেহেতু পুনরায় ইসলাম গ্রহণের জন্য বল প্রয়োগ করা হয় এবং সে পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করবে এরূপ আশাও করা যায়, সেহেতু তার মালিকানা বাতিল হওয়া উচিত। অতএব, ইমাম আবূ হানীফা (র.) দুই যুক্তির মাঝামাঝি অবস্থান গ্রহণ করলেন। তিনি বললেন, মুরতাদের মালিকানা বহাল থাকবে না। আবার সম্পূর্ণ বাতিলও হবে না; বরং তার মালিকানা স্থগিত থাকবে।

পরে যদি সে পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে মালিকানা বিলুপ্ত হওয়ার যে কারণটি ছিল (মুরতাদ হওয়া) সেটি কার্যকর হবে না; বরং মনে করা হবে যেন কারণটি ছিলইনা এবং সে সর্বদাই মুসলমান আছে। বিধায় তার মালিকানা অক্ষুণ্ন থাকবে। পক্ষান্তরে যদি সে মুরতাদ অবস্থায় মারা যায় কিংবা তাকে হত্যা করা হয় কিংবা সে দারুল হরবে চলে যায়, তাহলে মালিকানা বাতিল হওয়ার কারণটি কার্যকরী হবে এবং তার মালিকানা চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ وَاِنْ مَاتَ اَوْ قُتِلَ عَلٰى رِدَّتِهٖ اِنْتَقَلَ مَا اكْتَسَبَهٗ فِي اِسْلَامِهٖ اِلٰى وَرَثَتِهِ الْمُسْلِمِيْنَ، وَكَانَ مَا اكْتَسَبَهٗ فِي حَالِ رِدَّتِهٖ فَيْئًا وَهٰذَا عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ : كِلَاهُمَا لِوَرَثَتِهٖ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : كِلَاهُمَا فَيْءٌ؛ لِاَنَّهٗ مَاتَ كَافِرًا وَالْمُسْلِمُ لَا يَرِثُ الْكَافِرَ، ثُمَّ هُوَ مَالُ حَرْبِيٍّ لَا اَمَانَ لَهٗ فَيَكُوْنُ فَيْئًا . وَلَهُمَا اَنَّ مِلْكَهٗ فِي الْكَسْبَيْنِ بَعْدَ الرِّدَّةِ بَاقٍ عَلٰى مَا بَيَّنَّاهُ فَيَنْتَقِلُ بِمَوْتِهٖ اِلٰى وَرَثَتِهٖ وَيَسْتَنِدُ اِلٰى مَا قُبَيْلَ رِدَّتِهٖ اِذِ الرِّدَّةُ سَبَبُ الْمَوْتِ فَيَكُوْنُ تَوْرِيْثَ الْمُسْلِمِ مِنَ الْمُسْلِمِ . وَلِاَبِيْ حَنِيْفَةَ اَنَّهٗ يُمْكِنُ الْاِسْتِنَادُ فِيْ كَسْبِ الْاِسْلَامِ لِوُجُوْدِهٖ قَبْلَ الرِّدَّةِ، وَلَا يُمْكِنُ الْاِسْتِنَادُ فِيْ كَسْبِ الرِّدَّةِ لِعَدَمِهٖ قَبْلَهَا وَمِنْ شَرْطِهٖ وُجُوْدُهٗ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, আর যদি সে মুরতাদ অবস্থায় মারা যায় কিংবা তাকে হত্যা করা হয় তাহলে মুসলমান অবস্থায় যা উপার্জন করেছিল, তা তার মুসলিম উত্তরাধিকারীদের হাতে হস্তান্তরিত হবে। আর মুরতাদ অবস্থায় যা উপার্জন করবে, তা মালে গনিমত হবে। এ হলো ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত। আর ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, উভয় অবস্থার উপার্জন তার উত্তরাধিকারীদের জন্য হবে।

আর ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, উভয় অবস্থায় উপার্জন মালে গনিমত হবে। কেননা সে (মুরতাদ) কাফের অবস্থায় মারা গেছে। আর মুসলমান কাফেরের উত্তরাধিকারী হয় না। এ হলো নিরাপত্তাগুণ বঞ্চিত হারবীর মাল। সুতরাং তা মালে গনিমত হবে।

সাহেবাইনের দলিল এই যে, মুরতাদ হওয়ার পরও উভয় অবস্থায় উপার্জনের মালিকানা বিদ্যমান রয়েছে। যেমন আমরা বর্ণনা করেছি। সুতরাং তা তার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারীদের হাতে হস্তান্তরিত হবে এবং এই উত্তরাধিকার লাভ তার মুরতাদ হওয়ার পূর্ব মুহূর্তের সাথে সম্পৃক্ত হবে। কেননা ধর্মত্যাগ হলো মৃত্যুর কারণ সুতরাং এই হিসাবে মুসলমান থেকে মুসলমানের উত্তরাধিকার লাভ হবে।

আর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল এই যে, ইসলামের অবস্থায় উপর্জিত সম্পদের ক্ষেত্রে সম্পৃক্ততা সম্ভব। কেননা তা ধর্ম ত্যাগের পূর্বে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু ধর্মত্যাগের পরবর্তী উপার্জনের ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। কেননা ধর্মত্যাগের পূর্বে তা বিদ্যমান ছিল না। অথচ উত্তরাধিকার লাভের সম্পৃক্ততার জন্য রিদ্দাতের পূর্বেই তা বিদ্যমান হওয়া শর্ত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিউক্ত ইবারতে একটি মতভেদপূর্ণ মাসআলা আলোচিত হয়েছে। মাসআলাটি এই যে, কোনো মুরতাদ ব্যক্তি যদি মুরতাদ অবস্থায় মারা যায় কিংবা তাকে হত্যা করা হয়, তাহলে তার উপার্জিত সম্পদের হুকুম কি? এ বিষয়ে ইমামগণের তিনটি মত বর্ণিত হয়েছে।

১. ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মত।

২. সাহেবাইনের মত।

৩. ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মত।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মত হলো, মুরতাদ ব্যক্তি মুসলমান থাকাকালে যে সম্পদ উপার্জন করেছিল সেগুলো তার মুসলিম উত্তরাধিকারীদের হাতে হস্তান্তরিত হবে। আর মুরতাদ হওয়ার পর যে সম্পদ উপার্জন করেছে, সেগুলো গনিমতের মাল বলে গণ্য হবে। ইমাম যুফার ও হাসান (র.) এ মত পোষণ করেন।

https://e-ilm.weebly.com/

সাহেবাইন (র.)-এর মত হলো মুসলমান এবং মুরতাদ উভয় অবস্থার উপার্জিত সম্পদ উত্তরাধিকারীদের হাতে হস্তান্তরিত হবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) মুরতাদ হওয়ার পূর্বে এ পরে উভয় অবস্থার উপার্জিত সম্পদ গনিমত বলে গণ্য হবে। ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-ও এ মতই পোষণ করেন।

দলিল পর্ব :

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হলো, মুরতাদ ব্যক্তিটি কাফের অবস্থায় মারা গেছে। আর মুসলমান কখনো কাফেরের ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকারী হয় না। তাই মুরতাদের সম্পদ তার মুসলিম আত্মীয়রা পাবে না।

তাছাড়া মুরতাদের সম্পদগুলো হচ্ছে একজন হারবী ব্যক্তির সম্পদের মতো, যার কোনো নিরপত্তা নেই।

অতএব, এগুলো মুসলমানদের গনিমত বলে গণ্য হবে এবং সেগুলো বাইতুল মালে রেখে দেওয়া হবে।

সাহেবাইনের দলিল : সাহেবাইনের দলিল হলো, মুরতাদ ব্যক্তি মুরতাদ হওয়ার পূর্বে যে সম্পদ উপার্জন করেছে এবং মুরতাদ হওয়ার পরে যে সম্পদ উপার্জন করেছে, উভয় প্রকার সম্পদের মাঝে তার মালিকানা বহাল আছে (সাহেবাইনের মতে, কেননা তাদের মতে কেউ মুরতাদ হওয়ার কারণে তার মালিকানা বাতিল হয় না। যেমন পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে।) আর মালিক মারা গেলে তার সম্পদসমূহ উত্তরাধিকারীদের হাতে সাধারণভাবেই হস্তান্তরিত হয়ে থাকে। এতএব, মুরতাদ ব্যক্তির সম্পদও তার মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারীদের হাতে হস্তান্তরিত হবে। কিন্তু সাহেবাইনের মাযহাবের উপর একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, এ মাযহাব অনুযায়ী মুসলমানগণ কাফেরের উত্তরাধিকারী হয়ে থাকে। অথচ এটা সর্বমতে অশুদ্ধ।

গ্রন্থকার এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন وَيَسْتَنِدُ اِلَى مَا قُبَيْلَ رِدَّتِهِ ......الخ বলে। যার সারসংক্ষেপ হলো এই যে, রিদ্দাত বা মুরতাদ হওয়া হলো মৃত্যুর কারণ। তাই রিদ্দাতকে হুকমিভাবে বা গুণগতভাবে মৃত্যু বলে ধরা হবে এবং ইসলামের অবস্থাকে জীবন বলে ধরা হবে। আর উত্তরাধিকার যেহেতু জীবনের শেষমুহূর্তে বা মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে সাব্যস্ত হয়ে থাকে, সেহেতু মুরতাদের ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার সাব্যস্ত হবে মুরতাদ হওয়ার পূর্বমুহূর্তে বা মুসলমান অবস্থার শেষ মুহূর্তে। সে হিসেবে মুসলমান উত্তরাধিকারীরা মুসলমান ব্যক্তিরই ওয়ারিশ হলো, মুসলমান কাফেরের ওয়ারিশ হয়নি। এটাই বলা হয়েছে যে, উত্তরাধিকার লাভের বিষয়টিকে রিদ্দাতের পূর্ব মুহূর্তের সাথে সম্পৃক্ত করা।

ইমাম আবূ হানীফার (র.)-এর দলিল : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, উত্তরাধিকার সাব্যস্ত করার জন্য শর্ত হলো সম্পদ বিদ্যমান থাকা। অতএব, রিদ্দাতের পূর্বে যে সম্পদ বিদ্যমান ছিল, সে সম্পদগুলোতে রিদ্দাতের পূর্ব মুহূর্তে উত্তরাধিকার সাব্যস্ত করা সম্ভব। কিন্তু যে সম্পদ গুলো সে রিদ্দতের পরে উপার্জনে করেছে, সে গুলোতে রিদ্দাতের পূর্ব মুহূর্তে উত্তরাধিকার সাব্যস্ত করা সম্ভব নয়। কারণ এ সম্পদগুলো রিদ্দাতের পূর্ব মুহূর্তে বিদ্যমান ছিল না। বরং যদি এগুলোতে উত্তরাধিকার সাব্যস্ত করতেই হয়, তাহলে রিদ্দাতের পর সাব্যস্ত করতে হবে এবং তখন মুসলমান ব্যক্তিরা কাফেরের উত্তরাধিকারী হওয়া আবশ্যক হয়ে দাড়াবে যা কিনা সর্বসম্মতিক্রমে অশুদ্ধ। তাই ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতামত হলো, মুসলমান অবস্থায় উপার্জিত সম্পদের মধ্যে মুরতাদের মুসলিম আত্মীয়গণ উত্তরাধিকারী হবেন। আর মুরতাদ অবস্থায় যে সম্পদ উপার্জন করেছে, তাতে উত্তরাধিকার সাব্যস্ত হবে না; বরং সেগুলো মুসলমানদের গনিতমতের মাল হিসাবে গণ্য হবে।

আলোচ্য মাসআলায় ইমাম শাফেয়ী (র.) ও সাহেবাইনের মাযহাব অপেক্ষা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মাযহাব অধিক শক্তিশালী। কেননা তার মাযহাব অনুযায়ী সকল দলিলের মাঝে সামঞ্জস্য সৃষ্টি হয়ে যায়। কোথাও কোনো বিরোধ থাকে না।

পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মাযহাব অনুসারে আমল করলে সাহাবাদের ইজমা পরিহার করতে হয়। কেননা হযরত আলী (রা.)-এর কর্তৃত্বে এ ব্যাপারে সাহাবীদের ইজমা হয়েছে যে, মুরতাদ হওয়ার পূর্বে অর্জিত সম্পদের ক্ষেত্রে মুরতাদের মুর্সলিম আত্মীয়রা উত্তরাধিকারী হবে। আর সাহেবাইনের মাযহাব অনুসারে আমল করলে لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ মুসলমান কাফেরের উত্তরাধিকারী হয় না। হাদীসটি পরিহার করতে হয়।

কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মাযাহাব মুতাবেক আমল করলে উপরিউক্ত ইজমায়ে সাহাবা ও হাদীস উভয়ের উপর আমল হয়ে যায়। বিধায় ইমাম আবূ হানীফা এর মাযহাব অগ্রগণ্য।

https://e-ilm.weebly.com/

ثُمَّ اِنَّمَا يَرِثُهُ مَنْ كَانَ وَارِثًا لَهُ حَالَةَ الرِّدَّةِ وَبَقِيَ وَارِثًا اِلَى وَقْتِ مَوْتِهِ فِي رِوَايَةٍ عَنْ اَبِي حَنِيْفَةَ اِعْتِبَارًا لِلْاِسْتِنَادِ . وَعَنْهُ اَنَّهُ يَرِثُهُ مَنْ كَانَ وَارِثًا لَهُ عِنْدَ الرِّدَّةِ، وَلَا يَبْطُلُ اِسْتِحْقَاقُهُ بِمَوْتِهِ بَلْ يَخْلُفُهُ وَارِثُهُ؛ لِاَنَّ الرِّدَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْمَوْتِ . وَعَنْهُ اَنَّهُ يُعْتَبَرُ وُجُوْدُ الْوَارِثِ عِنْدَ الْمَوْتِ لِاَنَّ الْحَادِثَ بَعْدَ اِنْعِقَادِ السَّبَبِ قَبْلَ تَمَامِهِ كَالْحَادِثِ قَبْلَ انْعِقَادِهِ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ الْحَادِثِ مِنَ الْمَبِيْعِ قَبْلَ الْقَبْضِ . وَتَرِثُهُ اِمْرَاَتُهُ الْمُسْلِمَةُ اِذَا مَاتَ اَوْ قُتِلَ عَلَى رِدَّتِهِ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ؛ لِاَنَّهُ يَصِيْرُ فَارًّا، وَاِنْ كَانَ صَحِيْحًا وَقْتَ الرِّدَّةِ .

অনুবাদ : আর ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে প্রাপ্ত একটি বর্ণনা অনুযায়ী উত্তরাধিকারী কেবল সেই হতে পারবে, যে লোকটির ধর্ম ত্যাগের অবস্থায়ও তার উত্তরাধিকারী হওয়ার যোগ্যতা সম্পন্ন ছিল এবং তার মৃত্যু পর্যন্ত উত্তরাধিকারী রূপে বহাল ছিল। তিনি সম্পৃক্ততার বিষয়টির বিবেচনা করেছেন। তার পক্ষ থেকে আরেকটি বর্ণনা এই যে, রিদ্দাতের সময় যে তার উত্তরাধিকারী (হওয়ার যোগ্য) ছিল সে তার উত্তরাধিকার লাভ করবে এবং (মুরতাদের মৃত্যুর পূর্বে) তার মৃত্যু হওয়ার কারণে তার উত্তরাধিকারের হকদারি বাতিল হবে না; বরং তার উত্তরাধিকারীরা তার স্থলবর্তী হবে। কেননা রিদ্দাত বা ধর্মত্যাগ মৃত্যুর সমপর্যায়ভুক্ত।

তার পক্ষ হতে প্রাপ্ত আরেকটি বর্ণনা এই যে, তিনি মুরতাদের মৃত্যুর সময় উত্তরাধিকারীর বিদ্যমান থাকার শর্তারোপ করেছেন। কেননা কার্যকারণ অস্তিত্ব লাভ করার পর পূর্ণতা লাভের পূর্বে সম্পন্ন কার্য (মূলত) অস্তিত্ব লাভের পূর্বে সম্পন্ন কার্যের অনুরূপ। যেমন দখল গ্রহণের পূর্বে বিক্রীত (পশু বা দাসী) এর গর্ভ থেকে জন্ম লাভকারী সন্তান। মুরতাদ অবস্থায় যদি সে মারা যায় কিংবা তাকে হত্যা করা হয়, আর তার মুসলিম স্ত্রী ইদ্দতের অবস্থায় থাকে তাহলে সে তার উত্তরাধিকারী হবে। কেননা সে মিরাশ ফাঁকি দানকারী বলে গণ্য হবে। যদি মুরতাদ হওয়ার সময় সে সুস্থ থেকে থাকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিউক্ত ইবারতে দুটি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

১. মুরতাদের ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকার কারা হবে।

২. মুরতাদের মুসলিম স্ত্রী ওয়ারিশ হবে কিনা।

বিস্তারিত : মুরতাদের ওয়ারিশ কারা হবে এ বিষয়ে ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে তিনটি বর্ণনা পাওয়া যায়।

একটি বর্ণনা হাসান ইবনে যিয়াদের সূত্রে। দ্বিতীয় বর্ণনাটি ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর সূত্রে। তৃতীয় বর্ণনাটি ইমাম মুহাম্মদ (র.) সূত্রে বর্ণিত। শেষোক্ত বর্ণনাটিই সর্বাধিক বিশুদ্ধ। (মাবসূত)

হাসান ইবনে যিয়াদের সূত্রে প্রাপ্ত বর্ণনাটি এই যে, মুরতাদ ব্যক্তির যে সকল উত্তরাধিকার সে মুরতাদ হওয়ার সময় উত্তরাধিকারী ছিল এবং মুরতাদের মৃত্যু বা হত্যা পর্যন্ত উত্তরাধিকারীরূপে বহাল ছিল, কেবল তারাই মুরতাদের উত্তরাধিকারী হবে। অর্থাৎ মুরতাদের ত্যাজ্য সম্পদে হিস্সা পাবে ; অতএব, এ বর্ণনা অনুসারে মুরতাদের উত্তরাধিকার লাভ করার জন্য দুটি বিষয় শর্ত হলো, ১. ব্যক্তিটি মুরতাদ হওয়ার সময় তার উত্তরাধিকারীরূপে গণ্য হতে হবে। ২. মুরতাদের মৃত্যু বা হত্যা পর্যন্ত উত্তরাধিকারী রূপে বহাল থাকতে হবে।

সুতরাং কোনো ওয়ারিশের ক্ষেত্রে যদি উপরিউক্ত দুটি বিষয়ের কোনো একটি অনুপস্থিত থাকে, তাহলে সে মিরাশ পাবে না। যেমন, মুরতাদের ঐ ছেলে যে তার মুরতাদ হওয়ার পর জন্ম গ্রহণ করেছে, সে তার ওয়ারিশ হবে না। কারণ এছেলের ক্ষেত্রে প্রথম বিষয়টি অনুপস্থিত। অর্থাৎ ব্যক্তি মুরতাদ হওয়ার সময় তার ওয়ারিশ ছিল না। কিন্তু মুরতাদের মৃত্যুর সময় সে তার ওয়ারিশ বটে, তথাপি সে মিরাশ পাবে না। শর্তারিত বিষয়ের প্রথমটি অনুপস্থিত থাকার কারণে।

https://e-ilm.weebly.com/

তদ্রূপ যদি কোনো ওয়ারিশের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিষয়টি অনুপস্থিত থাকে তাহলে সেও মিরাশ পাবে না। যেমন মুরতাদের কোনো ছেলে সে মুরতাদ হওয়ার সময় জীবিত ছিল, কিন্তু মুরতাদ পিতার মৃত্যুর পূর্বে ছেলেটি মৃত্যুবরণ করল। এমতাবস্থায় এই মৃত্যু বরণকারী ছেলে মুরতাদের মিরাশ পাবে না। কারণ তার ক্ষেত্রে শর্তায়িত দ্বিতীয় বিষয়টি অনুপস্থিত। অর্থাৎ সে যদিও পিতা মুরতাদ হওয়ার সময় তার ওয়ারিশ ছিল, কিন্তু মুরতাদের মৃত্যু পর্যন্ত সে ওয়ারিশ হিসাবে বহাল থাকেনি। বিধায় মিরাশ পাবে না।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর সূত্রে প্রাপ্ত বর্ণনাটি হলো, মুরতাদ ব্যক্তির যে সকল উত্তরাধিকার সে মুরতাদ হওয়ার সময় উত্তরাধিকারী ছিল, তারা সকলেই মিরাশ পাবে। অতএব, এ বর্ণনা অনুসারে কেবল প্রথম বিষয়টি শর্ত। সুতরাং যদি কোনো ওয়ারিশ মুরতাদ ব্যক্তির মুরতাদ হওয়ার সময় জীবিত থাকে, কিন্তু মুরতাদের মৃত্যুর পূর্বে সে ওয়ারিশ মৃত্যুবরণ করে, তাহলে তার মিরাশ বাতিল হবে না; বরং মৃতব্যক্তির উত্তরাধিকারীর উত্তরাধিকারীরা তার স্থলবর্তী হিসাবে মুরতাদ ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদে হিস্‌সা পাবে।

পক্ষান্তরে মুরতাদ ব্যক্তির যে সন্তান তার মুরতাদ হওয়ার সময় ছিল না, বরং মুরতাদ হওয়ার পর সে জন্ম গ্রহণ করেছে, সে সন্তান এই বর্ণনা অনুযায়ী মুরতাদ পিতার ওয়ারিশ হবে না। কেননা সে তার পিতার মুরতাদ হওয়ার সময় উত্তরাধিকারী ছিল না। কারণ তখন তার জন্মই হয়নি।

এ বর্ণনার পিছনে যুক্তি হলো এই যে, রিদ্দাত বা মুরতাদ হওয়ার বিষয়টি মৃত্যুর পর্যায়ভুক্ত। আর নিয়ম এটাই যে, ব্যক্তির মৃত্যুর সময় তার যেসব উত্তরাধিকারী জীবিত থাকে, তারাই উত্তরাধিকার লাভ করে। অতএব, মুরতাদের মুরতাদ হওয়ার সময় যারা জীবিত থাকবে তারাই তার মিরাশ লাভ করবে।

আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর সূত্রে বর্ণনাটি হলো এই যে, মুরতাদের মৃত্যুর সময় তার যে সকল ওয়ারিশ জীবিত থাকবে তারাই তার ওয়ারিশ হবে। মুরতাদ হওয়ার সময় বিদ্যমান থাকা শর্ত নয়। অতএব, মুরতাদ ব্যক্তির যে সন্তান তার মুরতাদ হওয়ার সময় বিদ্যমান ছিল না; বরং মুরতাদ হওয়ার পর জন্মলাভ করেছে, সে সন্তান তার উত্তরাধিকারী হবে।

পক্ষান্তরে যে সন্তান পিতা মুরতাদ হওয়ার সময় জীবিত ছিল, কিন্তু মুরতাদ পিতার মৃত্যুর পূর্বে মারা গিয়েছে, সে মিরাশ পাবে না। কেননা এ বর্ণনা অনুযায়ী মিরাশ লাভের জন্য মুরতাদের মৃত্যুর সময় জীবিত থাকা শর্ত।

এ বর্ণনার পিছনে যুক্তি হলো রিদ্দাত বা মুরতাদ হওয়া হচ্ছে মিরাশ সাব্যস্ত হওয়ার সবব তথা কারণ। এই সববের পূর্ণতা হলো মুরতাদের মৃত্যু ঘটা। আর এটি একটি স্বীকৃত কথা যে, কোনো সবব বা কারণ বিদ্যমান হওয়ার পর তা পূর্ণতায় পৌছার পূর্বে যা কিছু ঘটে, তা সবব বিদ্যমান হওয়ার পূর্বে ঘটিত বিষয়ের অনুরূপ। কেননা বস্তু পূর্ণতায় না পৌছলে তা বিদ্যমান হলেও তার কোনো গ্রহণ যোগ্যতা নেই।

যেমন- কেউ যদি একটি পশু বা দাসী ক্রয় করে, কিন্তু তা কবজ না করে বিক্রেতার হাতেই পশুটি রেখে দেয়, তাহলে এক্ষেত্রে ক্রেতার মালিকানা লাভের সবব তথা ক্রয় বিদ্যমান হলো বটে। কিন্তু তা গ্রহণযোগ্য হয় না পূর্ণতায় না পৌছার কারণে অর্থাৎ করজ না করার কারণে। ফলে এ অবস্থায় যদি পশুটির বাচ্চা হয় কিংবা দাসীটি কোনো সন্তান প্রসব করে তাহলে সেই বাচ্চা ও সন্তান বিক্রেতার মালিকানা বলে গণ্য হয়। কারণ বাচ্চা বা সন্তানটি ক্রেতার মালিকানার সবব বিদ্যমান হওয়ার পরে বিদ্যমান হওয়া সত্ত্বেও ধরা হয় সেটি সবব বিদ্যমান হওয়ার পূর্বে বিদ্যমান হয়েছে, সবব পূর্ণতায় না পৌছার কারণে। যার ফলে বাচ্চাটি বিক্রেতার মালিকানাধীন পশু বা দাসীর গর্ভের বলে পরিগণিত হয়।

মুরতাদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ। রিদ্দাত হলো সবব, যার পূর্ণতা হলো মুরতাদের মৃত্যু। অতএব, সবব তথা রিদ্দত বিদ্যমান হওয়ার পরে তা পূর্ণতায় পৌছার আগে যে সন্তান জন্ম হলো সে যেন সবব বিদ্যমান হওয়ার আগেই জন্ম হলো। তাই রিদ্দাতের পরে জন্মগ্রহণকারী সন্তান ও মিরাশ পায়।

দ্বিতীয় বিষয় ছিল, মুরতাদের মুসলিম স্ত্রী তার উত্তরাধিকারী হবে কিনা? এ সম্পর্কে কথা হলো, স্বামী মুরতাদ হয়ে গেলে স্ত্রী তার থেকে তালাকে বায়েনের মাধ্যমে তালাকপ্রাপ্তা হয়ে যায়। এরপর যদি স্ত্রী তালাকের ইদ্দত পালনরত অবস্থায় মুরতাদ স্বামী মারা যায় কিংবা তাকে হত্যা করা হয়, তাহলে উক্ত স্ত্রী মুরতাদ স্বামীর উত্তরাধিকারী হবে।

কারণ রিদ্দাত বা মুরতাদ হওয়া হচ্ছে ধ্বংসের হেতু, যেমন অসুস্থতা ধ্বংসের হেতু। সে হিসাবে রিদ্দাতের দ্বারা পতিত তালাকটি অসুস্থ অবস্থায় প্রদত্ত তালাকের মতো গণ্য করা হবে। আর অসুস্থ অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার পর যদি স্ত্রীর ইদ্দত সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে স্বামী মারা যায়, তাহলে স্ত্রী স্বামীর ওয়ারিশ হয়। অতএব, রিদ্দাতের ক্ষেত্রেও এরূপই হবে। অর্থাৎ স্ত্রীর ইদ্দত সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে মুরতাদ স্বামী মারা গেলে স্ত্রী ওয়ারিশ হবে। কেননা এক্ষেত্রে মুরতাদ স্বামীকে زوج فار তথা মিরাশ ফাঁকিদানকারী স্বামীর মতো মনে করা হয়। মিরাশ ফাঁকিদানকারী স্বামী দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যে স্বামী তার অন্তিম অসুস্থতার সময় স্ত্রীকে মিরাশ থেকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে তালাক দিয়ে দেয়। মোটকথা, মুরতাদ স্বামীকে মিরাশ ফাঁকিদানকারী স্বামীর মতো মনে করা হয়। বিধায় মিরাশ ফাঁকিদানকারী স্বামীর স্ত্রী যেমন ইদ্দতের ভিতরে স্বামী মারা গেলে মিরাশ পায়, তেমনি মুরতাদের স্ত্রী ও ইদ্দতের ভিতরে মুরতাদ মারা গেলে কিংবা তাকে হত্যা করা হলে মিরাশ পাবে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَالْمُرْتَدَّةُ كَسْبُهَا لِوَرَثَتِهَا؛ لِاَنَّهُ لَا حِرَابَ مِنْهَا فَلَمْ يُوْجَدْ سَبَبُ الْفَيْءِ، بِخِلَافِ الْمُرْتَدِّ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَيَرِثُهَا زَوْجُهَا الْمُسْلِمُ اِنِ ارْتَدَّتْ وَهِيَ مَرِيْضَةٌ لِقَصْدِهَا اِبْطَالَ حَقِّهِ، وَاِنْ كَانَتْ صَحِيْحَةً لَا يَرِثُهَا؛ لِاَنَّهَا لَا تُقْتَلُ فَلَمْ يَتَعَلَّقْ حَقُّهُ بِمَالِهَا بِالرِّدَّةِ، بِخِلَافِ الْمُرْتَدِّ .

অনুবাদ : আর মুরতাদ নারীর উপার্জন তার উত্তরাধিকারীরা পাবে। কেননা তার পক্ষ থেকে যুদ্ধের আশঙ্কা নেই। সুতরাং মালে গনিমত হওয়ার কারণ বিদ্যমান হয়নি। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-নিকট মুরতাদের বিষয়টি ভিন্ন।

আর সে যদি অসুস্থ অবস্থায় মুরতাদ হয় তাহলে তার মুসলিম স্বামী তার উত্তরাধিকারী হবে। কেননা সে তার উত্তরাধিকার বাতিল করার ইচ্ছা করেছে। আর (মুরতাদ হওয়ার সময়) সুস্থ থাকলে স্বামী তার উত্তরাধিকারী হবে না। কেননা তাকে তো হত্যা করা হয় না। সুতরাং রিদ্দাত বা ধর্ম ত্যাগের কারণে তার মালের সাথে তার হক সম্পৃক্ত হয় না। কিন্তু মুরতাদের বিষয়টি ভিন্ন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মুরতাদ মহিলার অর্জিত সম্পদ তার ওয়ারিশরা পাবে। সেটা গনিমতের সম্পদ হবে না। কারণ মহিলার পক্ষ থেকে যুদ্ধের আশঙ্কা নেই। তাই তাকে হত্যা করা হয় না, তার প্রাণ নিরাপদ থাকে। আর প্রাণের অনুগামী হিসাবে মালও নিরাপদ থাকবে। অতএব তার মাল গনিমত হবে না। কেননা গনিমত হওয়ার জন্য শর্ত হলো সম্পদ নিরাপত্তাহীন হওয়া। সুতরাং মুরতাদ মহিলার সম্পদ মিরাশ হিসাবে তার উত্তরাধিকারীদের হাতে স্থানান্তরিত হবে। বাইতুল মালে যাবে না।

পক্ষান্তরে মুরতাদ পুরুষের পক্ষ থেকে যুদ্ধের আশঙ্কা থাকে। বিধায় তাকে হত্যা করা হয়। তার প্রাণ নিরাপত্তাহীন হয়ে যায়। ফলে তা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে গনিমতের মালে পরিণত হয়।

قَوْلُهُ : وَيَرِثُهَا زَوْجُهَا الْمُسْلِمُ اِنِ ارْتَدَّتْ الخ : কোনো মহিলা মুরতাদ হয়ে গেলে তার স্বামী উত্তাধিকারী হবে কিনা? এ বিষয়টি উপরিউক্ত ইবারতে আলোচনা করা হয়েছে। যার সারমর্ম হলো, দেখতে হবে মহিলা যখন মুরতাদ হয় তখন সুস্থ ছিল, না অসুস্থ ছিল। যদি মহিলা অসুস্থ অবস্থায় মুরতাদ হয়ে থাকে, তাহলে তার স্বামী তার উত্তরাধিকারী হবে। আর যদি সে সুস্থ অবস্থায় মুরতাদ হয়ে থাকে, তাহলে স্বামী তার উত্তরাধিকারী হবে না।

এ সিদ্ধান্তের পিছনে যুক্তি হলো এই যে, মহিলা যদি অসুস্থ অবস্থায় মুরতাদ হয়ে থাকে, তাহলে ধরা হবে সে নিজ স্বামীকে মিরাশ থেকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে মুরতাদ হয়েছে। তাই তার হীন উদ্দেশ্য পণ্ড করে স্বামীকে উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত করা হবে।

আর যদি সুস্থাবস্থায় মুরতাদ হয়, তাহলে স্বামী মিরাশ পাবে না। কারণ মুরতাদ হওয়ার দ্বারা মহিলা হত্যার যোগ্য হয় না। এর ফলে স্ত্রীর সম্পদের সাথে স্বামীর হকও সম্পৃক্ত হয় না।

পক্ষান্তরে স্বামী যদি মুরতাদ হয়, তাহলে তাকে যেহেতু মুরতাদ হওয়ার কারণে হত্যা করা হয়, সেহেতু তার সম্পদের সাথে স্ত্রীর হক সম্পৃক্ত হয়ে যায়। ফলে স্ত্রী তার মুরতাদ স্বামীর ওয়ারিশ হয়ে থাকে।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ : وَاِنْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ مُرْتَدًّا وَحَكَمَ الْحَاكِمُ بِلَحَاقِهِ عَتَقَ مُدَبَّرُوْهُ وَاُمَّهَاتُ اَوْلَادِهِ وَحَلَّتْ الدُّيُوْنُ الَّتِي عَلَيْهِ وَنُقِلَ مَا اكْتَسَبَهُ فِيْ حَالِ الْاِسْلَامِ اِلٰى وَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يَبْقٰى مَالُهُ مَوْقُوْفًا كَمَا كَانَ؛ لِاَنَّهُ نَوْعُ غَيْبَةٍ فَاَشْبَهَ الْغَيْبَةَ فِيْ دَارِ الْاِسْلَامِ. وَلَنَا اَنَّهُ بِاللَّحَاقِ صَارَ مِنْ اَهْلِ الْحَرْبِ وَهُمْ اَمْوَاتٌ فِيْ حَقِّ اَحْكَامِ الْاِسْلَامِ لِانْقِطَاعِ وِلَايَةِ الْاِلْزَامِ كَمَا هِيَ مُنْقَطِعَةٌ عَنِ الْمَوْتٰى فَصَارَ كَالْمَوْتِ، اِلَّا اَنَّهُ لَا يَسْتَقِرُّ لَحَاقُهُ اِلَّا بِقَضَاءِ الْقَاضِيْ لِاحْتِمَالِ الْعَوْدِ اِلَيْنَا فَلَا بُدَّ مِنَ الْقَضَاءِ، وَاِذَا تَقَرَّرَ مَوْتُهُ ثَبَتَتْ الْاَحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِهِ وَهِيَ مَا ذَكَرْنَاهَا كَمَا فِي الْمَوْتِ الْحَقِيْقِيِّ، ثُمَّ يُعْتَبَرُ كَوْنُهُ وَارِثًا عِنْدَ لِحَاقِهِ فِيْ قَوْلِ مُحَمَّدٍ رحـ؛ لِاَنَّ اللَّحَاقَ هُوَ السَّبَبُ وَالْقَضَاءُ لِتَقَرُّرِهِ لِقَطْعِ الْاِحْتِمَالِ، وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ : وَقْتَ الْقَضَاءِ؛ لِاَنَّهُ يَصِيْرُ مَوْتًا بِالْقَضَاءِ، وَالْمُرْتَدَّةُ اِذَا لَحِقَتْ بِدَارِ الْحَرْبِ فَهِيَ عَلٰى هٰذَا الْخِلَافِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, আর যদি সে মুরতাদ অবস্থায় দারুল হরবে চলে যায় এবং শাসক তার অন্তর্ভুক্তির ঘোষণা জারি করেন, তাহলে তার মুদাব্বার এবং উম্মে ওয়ালাদ (দাস দাসীরা) আজাদ হয়ে যাবে এবং তার ঋণগুলো দায়মুক্ত হয়ে যাবে। আর মুসলমান অবস্থায় যা সে উপার্জন করেছে, সেগুলো তার মুসলমান উত্তরাধিকারীর হাতে স্থানান্তরিত হবে।

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, তার মাল স্থগিত অবস্থায় থাকবে, (দারুল হরবে অন্তর্ভুক্তির আগে) যেমন ছিল। কেননা এ হলো এক ধরনের নিরুদ্দেশ হওয়া। সুতরাং দারুল ইসলামে নিরুদ্দেশ হওয়ার সদৃশ হবে।

আমাদের দলিল এই যে, দারুল হরবে চলে যাওয়ার মাধ্যমে সে (চূড়ান্তভাবে) মুরতাদ সাব্যস্ত হলো। আর ইসলামের যাবতীয় আহকামের ক্ষেত্রে তারা মৃততুল্য। কেননা তাদের উপর বিধান আরোপ করার ক্ষমতা রহিত হয়ে যায়। সুতরাং এ হলো মৃত্যুতুল্য।

তবে আদালতের ফয়সালা ছাড়া তার অন্তর্ভুক্তি স্থিতিবান হবে না। কেননা দারুল ইসলামে তার প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং আদালতের পক্ষ হতে তার ফয়সালা হওয়া অপরিহার্য। আর যখন তার গুণগত মৃত্যু স্থিতিবান হয়ে গেল তখন সংশ্লিষ্ট বিধানগুলো যা আমরা উল্লেখ করেছি, তা সাব্যস্ত হয়ে যাবে। যেমন প্রকৃত মৃত্যুর ক্ষেত্রে।

অতঃপর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে মুরতাদের দারুল হরবে চলে যাওয়ার সময় তার উত্তরাধিকার বিবেচ্য হবে। কেননা দারুল হরবে অন্তর্ভুক্তিই হলো কারণ। আদালতের ফয়সালার প্রয়োজনীয়তা শুধু বিষয়টির নিশ্চয়তার জন্য। যাতে প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা (আইনগতভাবে) রহিত হয়ে যায়।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, আদালতের ফয়সালার উত্তরাধিকার বিবেচ্য। কেননা আদালতের ফয়সালার মাধ্যমে (তার গুণগত মৃত্যু স্থির হবে এবং) সে মৃত বলে গণ্য হবে।

মুরতাদ স্ত্রীলোক দারুল হরবে চলে গেলে তার হুকুমের ব্যাপারেও এ মতভেদ রয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিউক্ত ইবারতে দুটি ইখতেলাফী মাসআলা আলোচনা করা হয়েছে। প্রথমটি আহনাফ ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মাঝে। দ্বিতীয়টি ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মাঝে।

প্রথম মাসআলা : কোনো মুরতাদ যদি দারুল হরবে পৌঁছে যায় এবং আদালতের পক্ষ থেকে তার সম্পর্কে অন্তর্ভুক্তির ঘোষণা হয়ে যায়, তাহলে আহনাফের মতে মুসলমান অবস্থায় তার অর্জিত তার সম্পদ তার ওয়ারিশদের হাতে স্থানান্তরিত হবে। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে উক্ত মুরতাদের সম্পদ স্থগিত থাকবে দারুল ইসলামে থাকা অবস্থায় যেমন ছিল। মুসলিম শাসক তার মালসমূহ সংরক্ষণ করবে। ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)ও এমত পোষণ করেন।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর যুক্তি হলো, মুরতাদ ব্যক্তির দারুল হরবে চলে যাওয়ার বিষয়টি নিরুদ্দেশ হওয়ার মতো। অতএব, মুরতাদ দারুল ইসলামে নিরুদ্দেশ হয়ে গেলে যেমন তার মালামাল স্থগিত থাকে, তেমনি দারুল হরবে চলে গেলেও তার মালামাল স্থগিত থাকবে। শাসকের হাতে সংরক্ষিত থাকবে।

আহনাফের দলিল : মুরতাদ যখন দারুল হরবে চলে যায়, তখন সে চূড়ান্তভাবে মুরতাদ সাব্যস্ত হয়। আর যখন চূড়ান্তভাবে মুরতাদ সাব্যস্ত হয়ে যায়, তখন সে মৃত ব্যক্তির পর্যায়ভুক্ত হয়ে যায়। কারণ কোনো মৃত মানুষের উপর যেমন শরিয়তের বিধান কার্যকর করা যায় না, তদ্রূপ মুরতাদের উপরও শরিয়তের বিধান সমূহ কার্যকর হয় না। তাই মুরতাদকে মৃত বলে গণ্য করা হয়। তবে যেহেতু মুরতাদ ব্যক্তি কোনো সময় দারুল ইসলামে ফিরে আসতে পারে এমন সম্ভাবনা থেকে যায়, তাই তার ব্যাপারে আদালতের ফয়সালার প্রয়োজন হয়। অতএব, যখন মুরতাদ দারুল হরবে চলে যাওয়ার বিষয়ে আদালত ফয়সালা দিয়ে দেয়, তখন সে নিশ্চিত ও চূড়ান্ত রূপে মুরতাদ ও মৃত বলে গণ্য হয়। আর মৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে এটাই সাধারণ নিয়ম যে, তার সম্পদ উত্তরাধিকারীদের হাতে স্থানান্তরিত হয়ে যায়, তার মুদাব্বার ও উম্মে ওয়ালাদ আজাদ হয়ে যায়, তার ঋণসমূহ দায়মুক্ত হয়ে যায়।

অতএব, আহনাফের মত হলো মুরতাদ ব্যক্তি চূড়ান্তরূপে মুরতাদ সাব্যস্ত হওয়ার পর তার উপরও এসব হুকুম কার্যকর হবে।

দ্বিতীয় মাসআলা, যা ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মাঝে মতভেদ পূর্ণ। যারা দারুল হরবে পালিয়ে যাওয়া মুরতাদের উত্তরাধিকারী হবে, তাদের কোন সময়ের উত্তরাধিকার বিবেচনাযোগ্য এ নিয়ে সাহেবাইনের পরস্পরে মতভেদ হয়েছে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, মুরতাদ ব্যক্তি দারুল হরবে চলে যাওয়ার সময়ের উত্তরাধিকার বিবেচ্য হবে। অর্থাৎ মুরতাদ দারুল হরবে চলে যাওয়ার সময় যারা তার উত্তরাধিকারী ছিল, তারাই তার মিরাশ লাভ করবে।

আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, আদালতের ফয়সালা প্রদানের সময়ের উত্তরাধিকার বিবেচ্য হবে। অর্থাৎ তার মতে মুরতাদ দারুল হরবে চলে যাওয়ার বিষয়ে আদালত যখন ফায়সালা দেয়, তখন যারা মুরতাদের ওয়ারিশ ছিল কেবল তারাই তার মিরাশ পাবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর যুক্তি হলো, মুরতাদের মালিকানা বিলুপ্ত হওয়া এবং উত্তরাধিকারীদের উত্তরাধিকার সাব্যস্ত হওয়ার মূল সবব বা কারণ হলো তার দারুল হরবে চলে যাওয়া। আদালাতের ফয়সালা মূল কারণ নয়; বরং আদালতের ফয়সালার প্রয়োজন হয় ফিরে আসার সম্ভাবনা নাকচ করার জন্য। অতএব, মূল কারণ তথা দারুল হরবে পালিয়ে যাওয়ার সময় যারা তার উত্তরাধিকারী থাকবে তারাই তার মিরাশ পাবে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর যুক্তি হলো, মুরতাদ ব্যক্তি আদালতের ফয়সালার দ্বারাই মৃত বলে গণ্য হয়। অতএব, এ সময় যারা তার ওয়ারিশ হবে, তারাই মিরাশ পাবে।

কোনো মুরতাদ মহিলা যদি দারুল হরবে পালিয়ে যায়, তাহলে তার ক্ষেত্রে উপরে বর্ণিত মতভেদ প্রযোজ্য হবে।

অর্থাৎ আহনাফের মতে তার মালামাল উত্তরাধিকারীদের হাতে স্থানান্তরিত হবে আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে তার মালামাল স্থগিত থাকবে, ইমাম সেগুলো সংরক্ষণ করবে।

ইমাম মুহাম্মাদ (র.)-এর মতে, মুরতাদ মহিলা দারুল হরবে পালিয়ে যাওয়ার সময়ের উত্তরাধিকার বিবেচ্য হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে আদালত কর্তৃক ফয়সালা প্রদানের সময়ের উত্তরাধিকার বিবেচ্য হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَتُقْضَى الدُّيُوْنُ الَّتِي لَزِمَتْهُ فِيْ حَالِ الْإِسْلَامِ مِمَّا اكْتَسَبَهُ فِيْ حَالِ الْإِسْلَامِ، وَمَا لَزِمَتْهُ فِيْ حَالِ رِدَّتِهِ مِنَ الدُّيُوْنِ تُقْضَى مِمَّا اكْتَسَبَهُ فِيْ حَالِ رِدَّتِهِ قَالَ الْعَبْدُ الضَّعِيْفُ عَصَمَهُ اللّٰهُ : هٰذِهِ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ وَعَنْهُ أَنَّهُ يُبْدَأُ بِكَسْبِ الْإِسْلَامِ، وَإِنْ لَمْ يَفِ بِذٰلِكَ يُقْضَى مِنْ كَسْبِ الرِّدَّةِ وَعَنْهُ عَلٰى عَكْسِهِ . وَجْهُ الْأَوَّلِ أَنَّ الْمُسْتَحَقَّ بِالسَّبَبَيْنِ مُخْتَلِفٌ . وَحُصُوْلُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْكَسْبَيْنِ بِاعْتِبَارِ السَّبَبِ الَّذِي وَجَبَ بِهِ الدَّيْنُ فَيُقْضَى كُلُّ دَيْنٍ مِنَ الْكَسْبِ الْمُكْتَسَبِ فِيْ تِلْكَ الْحَالَةِ لِيَكُوْنَ الْغُرْمُ بِالْغُنْمِ . وَجْهُ الثَّانِيْ أَنَّ كَسْبَ الْإِسْلَامِ مِلْكُهُ حَتّٰى يَخْلُفَهُ الْوَارِثُ فِيْهِ، وَمِنْ شَرْطِ هٰذِهِ الْخِلَافَةِ الْفَرَاغُ عَنْ حَقِّ الْمُوَرِّثِ فَيُقَدَّمُ بِالدَّيْنِ عَلَيْهِ، أَمَّا كَسْبُ الرِّدَّةِ فَلَيْسَ بِمَمْلُوْكٍ لَهُ؛ لِبُطْلَانِ أَهْلِيَّةِ الْمِلْكِ بِالرِّدَّةِ عِنْدَهُ فَلَا يُقْضَى دَيْنُهُ مِنْهُ إِلَّا إِذَا تَعَذَّرَ قَضَاؤُهُ مِنْ مَحَلٍّ اٰخَرَ فَحِيْنَئِذٍ يُقْضَى مِنْهُ، كَالذِّمِّيِّ إِذَا مَاتَ وَلَا وَارِثَ لَهُ يَكُوْنُ مَالُهُ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِيْنَ، وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يُقْضَى مِنْهُ كَذٰلِكَ هٰهُنَا .

অনুবাদ : মুসলমান অবস্থায় যে সকল ঋণ তার উপর চেপেছে, সেগুলো মুসলমান অবস্থার উপার্জন দ্বারা শোধ করা হবে। আর মুরতাদ অবস্থার ঋণ, মুরতাদ অবস্থার উপার্জন দ্বারা শোধ করা হবে।

অধম বান্দা (হেদায়া গ্রন্থকার) বলেন, আল্লাহ তাকে রক্ষা করুন– এটা হলো ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে প্রাপ্ত বর্ণনা। তার আরেকটি বর্ণনা এই যে, মুসলমান অবস্থার উপার্জন দ্বারা ঋণ পরিশোধ শুরু করা হবে। যদি তা দ্বারা পরিশোধ পূর্ণ না হয় তাহলে মুরতাদ অবস্থার উপার্জন দ্বারা শোধ করা হবে।

তার পক্ষ থেকে এর বিপরীত বর্ণনাও পাওয়া যায়, প্রথম বর্ণনার কারণ এই যে, দুই কারণে (অর্থাৎ দুই সময়ের ঋণ গ্রহণ দ্বারা) সাব্যস্ত ঋণের মাঝে (গুণগত) ভিন্নতা রয়েছে এবং উভয় উপার্জনের প্রতিটি ঐ কারণের সাথে বিবেচ্য হবে, যা দ্বারা ঋণ অবশ্য সাব্যস্ত হয়েছে।

সুতরাং প্রতিটি ঋণ ঐ উপার্জন দ্বারা পরিশোধিত হবে যে উপার্জন ঐ ঋণের অবস্থায় উপার্জিত হয়েছে। যাতে দায়ভোগ ফলভোগের বিনিময়ে হয়।

দ্বিতীয় বর্ণনার দলিল এই যে, মুসলমান অবস্থার সম্পদ হচ্ছে তার মালিকানাধীন। এ কারণেই ঐ সম্পদের ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারী তার স্থলবর্তী হয়। আর উত্তরাধিকারগত স্থলবর্তীতার জন্য শর্ত হলো "মূরিছ" তথা উত্তরাধিকারীর হক থেকে সম্পদ মুক্ত হওয়া। সুতরাং ঋণ পরিশোধের বিষয়টিকে উত্তরাধিকারের উপর অগ্রবর্তী করা হবে। আর মুরতাদ অবস্থার ঋণ তার মালিকানাধীন নয়। কেননা ইমাম সাহেবের মতে রিদ্দাত বা মুরতাদ হওয়ার দ্বারা মালিক হওয়ার যোগ্যতা বাতিল হয়ে যায়। সুতরাং উক্ত সম্পদ দ্বারা তার ঋণ পরিশোধ করা হবে না। যদি না অন্য ক্ষেত্র থেকে (অর্থাৎ মুসলমান অবস্থার উপার্জন থেকে) তা শোধ করা অসম্ভব হয়। তখন অবশ্য এখান থেকেও শোধ করা হবে। যেমন জিম্মি যদি লা-ওয়ারিশ অবস্থায় মারা যায়। তখন তার সম্পদ মুসলিম জনসাধারণের হয়ে যায়। আর যদি তার উপর কোনো ঋণের দায় থাকে তাহলে উক্ত সম্পদ থেকে তা পরিশোধ করা হয়। এখানেও অনুরূপ হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَجْهُ الثَّالِثِ اَنَّ كَسْبَ الْإِسْلَامِ حَقُّ الْوَرَثَةِ وَكَسْبَ الرِّدَّةِ خَالِصُ حَقِّهِ، فَكَانَ قَضَاءُ الدَّيْنِ مِنْهُ اَوْلَى اِلَّا اِذَا تَعَذَّرَ بِاَنْ لَمْ يَفِ بِهِ فَحِيْنَئِذٍ يُقْضَى مِنْ كَسْبِ الْإِسْلَامِ تَقْدِيْمًا لِحَقِّهِ . وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ : تُقْضَى دُيُوْنُهُ مِنَ الْكَسْبَيْنِ؛ لِاَنَّهُمَا جَمِيْعًا مِلْكُهُ حَتَّى يَجْرِيَ الْاِرْثُ فِيْهِمَا، وَاللّٰهُ اَعْلَمُ .

অনুবাদ : তৃতীয় বর্ণনার কারণ এই যে, মুসলমান অবস্থায় উপার্জিত সম্পদ ওয়ারিশদের হক। আর মুরতাদ অবস্থায় উপার্জিত সম্পদ হলো তার নিজস্ব হক। সুতরাং তা দ্বারাই ঋণ পরিশোধ করা অধিকতর সঙ্গত হবে। তবে যদি তা দ্বারা ঋণ পরিশোধ পূর্ণ হওয়া অসম্ভব হয়, তখন মুসলমান অবস্থার উপার্জন দ্বারাও পরিশোধ করা হবে, তার হককে অগ্রাধিকার প্রদানের উদ্দেশ্যে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.) বলেন, উভয় উপার্জন থেকেই তার ঋণসমূহ পরিশোধ করা হবে। কেননা উভয় সম্পদই তার মালিকানাধীন, যেজন্য উভয় সম্পদে উত্তরাধিকার কার্যকর হয়। আল্লাহ-ই অধিক অবগত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মুরতাদ মারা যাওয়ার সময় যদি তার জিম্মায় ঋণ থাকে, তাহলে সে ঋণ কোন সম্পদ দ্বারা পরিশোধ করা হবে- এ নিয়ে আহনাফের মাঝে একাধিক মত রয়েছে। এর মধ্যে তিনটি বর্ণনা পাওয়া যায় ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে ; আর একটি বর্ণনা পাওয়া যায় সাহেবাইন (র.) থেকে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে প্রাপ্ত তিনটি মত ধারাবাহিকভাবে নিম্নরূপ :

১. মুরতাদ ব্যক্তি মুসলমান অবস্থায় যে ঋণগুলো করেছিল, সেগুলো মুসলমান অবস্থার উপার্জিত সম্পদ দ্বারা পরিশোধ করা হবে। আর মুরতাদ অবস্থায় যে ঋণ করেছে, মুরতাদ অবস্থার অর্জিত সম্পদ দ্বারা পরিশোধ করা হবে। এ রেওয়ায়াতটি ইমাম যুফার (র.) সূত্রে প্রাপ্ত।

২. মুসলমান অবস্থার উপার্জিত সম্পদ দ্বারা ঋণ পরিশোধ শুরু করা হবে। যদি তা দ্বারা ঋণ পরিশোধ শেষ না হয় তাহলে মুরতাদ অবস্থার উপার্জিত সম্পদও লাগানো হবে। এ রেওয়ায়েতটি হাসান ইবনে যিয়াদের সূত্রে প্রাপ্ত।

৩. মুরতাদ অবস্থার উপার্জিত সম্পদ দ্বারা ঋণ পরিশোধ শুরু করা হবে। যদি এর দ্বারা ঋণ পরশোধ না হয়, তাহলে মুসলমান অবস্থার উপার্জিত সম্পদও লাগানো হবে। এ বর্ণনাটি ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) সূত্রে প্রাপ্ত।

সাহেবাইন (র.)-এর মতামত : সাহেবাইনের মত হলো, মুসলমান অবস্থার উপার্জিত সম্পদ এবং মুরতাদ অবস্থার উপার্জিত সম্পদ উভয় দ্বারা ঋণ পরিশোধ করা হবে।

উপরিউক্ত মতামত সমূহের দলিল ধারাবাহিকভাবে নিম্নরূপ :

১. ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর প্রথম মতটির পিছনে যুক্তি হলো, মুরতাদের উপর যে ঋণগুলো রয়েছে– সেগুলোর মাঝে গুণগত পার্থক্য রয়েছে। পার্থক্যটি এই যে, কিছু ঋণ সে করেছিল মুসলমান অবস্থায় উপার্জনের জন্য আর কিছু ঋণ সে করেছে মুরতাদ অবস্থায় উপার্জনের জন্য। এ হিসাবে এক প্রকার ঋণের সবব হলো মুসলমান অবস্থার অর্থোপার্জন ; অন্য প্রকার ঋণের সবব হলো মুরতাদ অবস্থার অর্থোপার্জন এবং একটি ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে সে মুসলমান অবস্থার সম্পদগুলো উপার্জন করেছে। আর অন্য একটি ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে মুরতাদ অবস্থার সম্পদগুলো উপার্জন করেছে। অতএব, যে ঋণের সাহায্যে যে সম্পদ উপার্জন করেছে, সে সম্পদ দ্বারাই সেই ঋণ পরিশোধ করা হবে। যাতে দায়ভোগ ফলভোগের বিনিময়ে হয়। সুতরাং মুসলমান অবস্থায় গৃহীত ঋণ মুসলমান অবস্থায় উপার্জিত সম্পদ দ্বারা পরিশোধ করবে এবং মুরতাদ অবস্থার গৃহীত ঋণ মুরতাদ অবস্থার উপার্জিত সম্পদ দ্বারা পরিশোধ করবে :

https://e-ilm.weebly.com/

২. দ্বিতীয় মতের পিছনে যুক্তি হলো, মুসলমান অবস্থায় উপার্জিত সম্পদসমূহ হচ্ছে মুরতাদ ব্যক্তির নিজস্ব মালিকানাধীন সম্পদ। একারণেই মুসলমান অবস্থার উপার্জিত সম্পদের মধ্যে তার উত্তরাধিকারীদের উত্তরাধিকার সাব্যস্ত হয়। তবে উত্তরাধিকারীদের উত্তরাধিকার সাব্যস্ত হওয়ার জন্য শর্ত হলো সংশ্লিষ্ট সম্পদ ঋণমুক্ত হতে হবে। অতএব, যদি মুরতাদের উপর ঋণ থাকে তাহলে প্রথমে তার সম্পদ দ্বারা তার ঋণ পরিশোধ করা হবে।

পক্ষান্তরে মুরতাদ অবস্থায় উপার্জিত সম্পদসমূহ মুরতাদের মালিকানায় নয়। কারণ মুরতাদ হওয়া দ্বারা তার মালিক হওয়ার যোগ্যতা রহিত হয়ে গেছে। তাই এ সম্পদ দ্বারা তার ঋণ পরিশোধ করা হবে না। কিন্তু যদি মুসলমান অবস্থার উপার্জিত সম্পদ দ্বারা ঋণ পরিশোধ করা শেষ না হয়, তাহলে মুরতাদ অবস্থার উপার্জিত সম্পদও ঋণ পরিশোধের জন্য ব্যয় করা হবে।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর ঃ

প্রশ্ন হতে পারে যে, কোনো ঋণগ্রস্ত মুরতাদের কাছে যদি মুসলমান অবস্থায় উপার্জিত সম্পদ না থাকে, আর এদিকে মুরতাদ অবস্থায় উপার্জিত সম্পদগুলোতেও তার মালিকানা না হয়, তাহলে এই মুরতাদের ঋণ কিভাবে পরিশোধ করা হবে?

উত্তর ঃ এই মুরতাদের ঋণ মুরতাদ অবস্থার সম্পদ দ্বারাই পরিশোধ করা হবে। কেননা মুরতাদ অবস্থার উপার্জিত সম্পদসমূহ মুরতাদের মালিকানা না হওয়ার কারণে সেগুলো বায়তুল মালের সম্পদের আওতাভুক্ত। সাধারণ মুসলমানের হক বলে গণ্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ সম্পদ উপার্জনকারী মুরতাদের ঋণ পরিশোধের জন্য ব্যয় করা হবে।

যেমন কোনো জিম্মি যদি লাওয়ারিশ অবস্থায় মারা যায়, তাহলে তার পরিত্যক্ত সম্পদ সাধারণ মুসলমানের হক বলে গণ্য হয়। কিন্তু যদি জিম্মির ঘাড়ে ঋণ থাকে, তাহলে তার ঋণ উক্ত সম্পদ দ্বারাই পরিশোধ করা হয়। অথচ এ সম্পদ সাধারণ মুসলমানের সম্পদ বলে গণ্য।

আলোচ্য মুরতাদের ক্ষেত্রেও এরূপই হবে। অর্থাৎ তার মুরতাদ অবস্থার উপার্জিত সম্পদ সাধারণ মুসলমানের সম্পদ বলে গণ্য হওয়া সত্ত্বেও তা দ্বারা মুরতাদের ঋণ পরিশোধ করা হবে, মুসলমান অবস্থায় উপার্জিত সম্পদ না থাকা অবস্থায়।

كالذمى اذا مات الخ : ইবারত দ্বারা মুসান্নিফ (র.) এ প্রশ্ন ও উত্তরের দিকেই ইঙ্গিত করেছেন

৩. তৃতীয় মতের পিছনে কারণ এই যে, মুসলমান অবস্থায় উপার্জিত সম্পদ মুরতাদের উত্তরাধিকারীদের হক। তাই এগুলো দ্বারা তার ঋণ পরিশোধ করা হবে না; বরং মুরতাদ অবস্থার উপার্জিত সম্পদ দ্বারা তার ঋণ পরিশোধ করা হবে। কারণ সেগুলো তার হক। তবে যদি এ সম্পদ দ্বারা ঋণ পরিশোধ শেষ না হয়, তাহলে মুসলমান অবস্থার উপার্জিত সম্পদও ব্যয় করা হবে।

৪. সাহেবাইনের মতের পিছনে দলিল হলো, মুসলমান অবস্থার উপার্জিত সম্পদ ও মুরতাদ অবস্থার উপার্জিত সম্পদ উভয়ই মুরতাদের মালিকানাধীন সম্পদ। এ কারণেই উভয়প্রকার সম্পদের মধ্যে উত্তরাধিকারীদের উত্তরাধিকার সাব্যস্ত হয়ে থাকে। অতএব, উভয় প্রকার সম্পদ দ্বারাই তার ঋণ পরিশোধ করা হবে।

ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-ও সাহেবাইনের অনুরূপ মত পোষণ করেন।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ : وَمَا بَاعَهُ أَوْ اِشْتَرَاهُ أَوْ أَعْتَقَهُ أَوْ وَهَبَهُ أَوْ رَهَنَهُ أَوْ تَصَرَّفَ فِيْهِ مِنْ أَمْوَالِهِ فِيْ حَالِ رِدَّتِهِ فَهُوَ مَوْقُوْفٌ، فَإِنْ أَسْلَمَ صَحَّتْ عُقُوْدُهُ، وَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ أَوْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ بَطَلَتْ وَهٰذَا عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ . وَقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ : يَجُوْزُ مَا صَنَعَ فِي الْوَجْهَيْنِ . اِعْلَمْ أَنَّ تَصَرُّفَاتِ الْمُرْتَدِّ عَلٰى أَقْسَامٍ : نَافِذٌ بِالْاِتِّفَاقِ كَالْاِسْتِيْلَادِ وَالطَّلَاقِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَفْتَقِرُ إِلٰى حَقِيْقَةِ الْمِلْكِ وَتَمَامِ الْوِلَايَةِ . وَبَاطِلٌ بِالْاِتِّفَاقِ كَالنِّكَاحِ وَالذَّبِيْحَةِ؛ لِأَنَّهُ يَعْتَمِدُ الْمِلَّةَ وَلَا مِلَّةَ لَهُ . وَمَوْقُوْفٌ بِالْاِتِّفَاقِ كَالْمُفَاوَضَةِ؛ لِأَنَّهَا تَعْتَمِدُ الْمُسَاوَاةَ وَلَا مُسَاوَاةَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْمُرْتَدِّ مَا لَمْ يُسْلِمْ . وَمُخْتَلَفٌ فِيْ تَوَقُّفِهِ وَهُوَ مَا عَدَدْنَاهُ . لَهُمَا أَنَّ الصِّحَّةَ تَعْتَمِدُ الْأَهْلِيَّةَ وَالنَّفَاذَ يَعْتَمِدُ الْمِلْكَ، وَلَا خَفَاءَ فِيْ وُجُوْدِ الْأَهْلِيَّةِ لِكَوْنِهِ مُخَاطَبًا، وَكَذَا الْمِلْكُ لِقِيَامِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ عَلٰى مَا قَرَّرْنَاهُ مِنْ قَبْلُ، وَلِهٰذَا لَوْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ بَعْدَ الرِّدَّةِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ اِمْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ يَرِثُهُ وَلَوْ مَاتَ وَلَدُهُ بَعْدَ الرِّدَّةِ قَبْلَ الْمَوْتِ لَا يَرِثُهُ فَتَصِحُّ تَصَرُّفَاتُهُ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, মুরতাদ অবস্থায় সে যা বিক্রি করে বা খরিদ করে বা আজাদ করে বা দান করে বা বন্ধক রাখে বা নিজের সম্পদে যেকোনো ব্যাবহার করে তা স্থগিত থাকবে। যদি সে পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তার উক্ত মো'আমালাসমূহ বৈধ হয়ে যাবে। আর যদি মারা যায় বা নিহত হয় কিংবা দারুল হরবে চলে যায়, তাহলে বাতিল হয়ে যাবে।

এ হলো ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মত। আর ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, সে যা সম্পাদন করেছে, তা উভয় অবস্থায় বৈধতা লাভ করবে।

জ্ঞাতব্য যে, মুরতাদ ব্যক্তির তাসাররুফ বা কার্যকলাপসমূহ কয়েক প্রকার :

১.সর্বসম্মতরূপে কার্যকর। যেমন- দাসীকে উম্মে ওয়ালাদ করা এবং তালাক দেওয়া। কেননা (প্রথম ক্ষেত্রে) প্রকৃত মালিকানার প্রয়োজন হয় না। আর (দ্বিতীয় ক্ষেত্রে) পূর্ণ শরিয়তি কর্তৃত্ব প্রয়োজন হয় না।

২. সর্বসম্মতরূপে বাতিল। যেমন- বিবাহ এবং তার জবাইকৃত পশু। কেননা এ দুটো দীন নির্ভর বিষয়। অথচ তার কোনো মিল্লাত নেই।

৩. সর্বসম্মতরূপে স্থগিত। যেমন- শিরকাতুল মুফাওয়াযাহ। (অর্থাৎ ব্যবসায় সমঅংশীদারিত্ব)। কেননা এ অংশীদারিত্ব সমতার উপর নির্ভর করে। অথচ পুনঃ ইসলাম গ্রহণ না করা পর্যন্ত মুরতাদ ও মুসলমানের মাঝে সমতা নেই।

৪. মতভেদ ক্রমে স্থগিত। আর তা হলো আমাদের উপরে বর্ণিত বিষয়সমূহ।

সাহেবাইনের দলিল এই যে, বৈধতা নির্ভর করে যোগ্যতার উপর আর কার্যকারিতা নির্ভর করে মালিকানার উপর। আর যেহেতু মুরতাদ শরিয়তের সম্বোধন পাত্র, সেহেতু যোগ্যতার বিদ্যমানতা সম্পর্কে কোনো অস্পষ্টতা নেই। তদ্রূপ মালিকানাও বিদ্যমান রয়েছে। কেননা ইতিপূর্বে আমরা সাব্যস্ত করে এসেছি যে, তা মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত বহাল থাকবে। এ কারণেই যদি রিদ্দাতের ছয় মাসের মাথায় মুসলিম স্ত্রীর গর্ভে তার সন্তান ভূমিষ্ট হয় তাহলে সে তার ওয়ারিশ হবে। পক্ষান্তরে (রিদ্দাতের পূর্বে জন্মলাভকারী কোনো সন্তান) যদি রিদ্দাতের পর মৃত্যুর পূর্বে মারা যায়, তাহলে সে তার ওয়ারিশ হবে না। সুতরাং সাব্যস্ত হলো যে, তার মৃত্যুর পূর্বের কার্যসমূহ বৈধ হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

اِلَّا اَنَّ عِنْدَ اَبِيْ يُوْسُفَ رحـ تَصِحُّ كَمَا تَصِحُّ مِنَ الصَّحِيْحِ؛ لِاَنَّ الظَّاهِرَ عَوْدُهُ اِلَى الْاِسْلَامِ، اِذِ الشُّبْهَةُ تُزَاحُ فَلَا يُقْتَلُ وَصَارَ كَالْمُرْتَدَّةِ . وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ تَصِحُّ كَمَا تَصِحُّ مِنَ الْمَرِيْضِ؛ لِاَنَّ مَنِ انْتَحَلَ اِلَى نِحْلَةٍ لَا سِيَّمَا مُعْرِضًا عَمَّا نَشَاَ عَلَيْهِ قَلَّمَا يَتْرُكُهُ فَيُفْضِيْ اِلَى الْقَتْلِ ظَاهِرًا، بِخِلَافِ الْمُرْتَدَّةِ؛ لِاَنَّهَا لَا تُقْتَلُ . وَلِاَبِيْ حَنِيْفَةَ اَنَّهُ حَرْبِيٌّ مَقْهُوْرٌ تَحْتَ اَيْدِيْنَا عَلَى مَا قَرَّرْنَاهُ فِيْ تَوَقُّفِ الْمِلْكِ وَتَوَقُّفُ التَّصَرُّفَاتِ بِنَاءٌ عَلَيْهِ، وَصَارَ كَالْحَرْبِيِّ يَدْخُلُ دَارَنَا بِغَيْرِ اَمَانٍ فَيُؤْخَذُ وَيُقْهَرُ وَتَتَوَقَّفُ تَصَرُّفَاتُهُ؛ لِتَوَقُّفِ حَالِهِ، وَكَذَا الْمُرْتَدُّ، وَاسْتِحْقَاقُهُ الْقَتْلَ لِبُطْلَانِ سَبَبِ الْعِصْمَةِ فِي الْفَصْلَيْنِ فَاَوْجَبَ خَلَلًا فِي الْاَهْلِيَّةِ ، بِخِلَافِ الزَّانِي وَقَاتِلِ الْعَمْدِ؛ لِاَنَّ الْاِسْتِحْقَاقَ فِيْ ذٰلِكَ جَزَاءٌ عَلَى الْجِنَايَةِ . وَبِخِلَافِ الْمَرْاَةِ؛ لِاَنَّهَا لَيْسَتْ حَرْبِيَّةً؛ وَلِهٰذَا لَا تُقْتَلُ .

অনুবাদ : তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে ঐ বৈধতা একজন সুস্থলোকের বৈধতার অনুরূপ। কেননা ইসলামের দিকে তার পুনঃ প্রত্যাবর্তনই স্বাভাবিক, যদি সন্দেহ নিরসন করা হয়। তখন তাকে আর হত্যা করা হবে না, যেমন মুরতাদ নারীকে হত্যা করা হয় না।

পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-মতে ঐ বৈধতা (অন্তিম) রোগে আক্রান্ত ব্যাক্তির বৈধতার অনুরূপ হবে। কেননা কেউ যখন কোনো ধর্মমত গ্রহণ করে, বিশেষত ঐ ধর্ম ত্যাগ করে যার উপর সে প্রতিপালিত হয়েছে, তখন নতুন ধর্মমত খুব কমই সে পরিত্যাগ করে থাকে। ফলে কতল পর্যন্ত গড়ানোই স্বাভাবিক। মুরতাদ নারীর বিষয়টা ভিন্ন। তাকে তো হত্যা করা হয় না।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল এই যে, নিশ্চয় সে (মুরতাদ) আমাদের করতলগত একজন অপদস্থ হারবী। যেমন আমরা মালিকানা স্থগিত হওয়ার ক্ষেত্রে সাব্যস্ত করে এসেছি। আর তাসাররুফ তথা বিভিন্ন কার্যক্রম স্থগিত হওয়া, মালিকানা স্থগিত হওয়ার উপর নির্ভরশীল এবং সে ঐ হারবীর মতো হলো, যে নিরাপত্তা ছাড়া দারুল ইসলামে প্রবেশ করে, ফলে তাকে পাকড়াও করা হয়, অপদস্থ করা হয় এবং তার তাসাররুফ বা লেনদেনসমূহ স্থগিত থাকে, তার অবস্থা ঝুলন্ত হওয়ার কারণে। মুরতাদও অনুরূপ।

আর হারবী ও মুরতাদ উভয়ের ক্ষেত্রে হত্যাযোগ্যতার কারণ হচ্ছে (আল্লাহ প্রদত্ত) নিরাপত্তাগুণ রহিত হয়ে যাওয়া। সুতরাং এটি তার যোগ্যতাকে বিঘ্নিত করবে। কিন্তু জেনাকারী ও ইচ্ছাকৃত হত্যাকারীর বিষয়টি ভিন্ন। কেননা তাদের ক্ষেত্রে হত্যাযোগ্যতার কারণ হচ্ছে অপরাধের শাস্তি।

মুরতাদ নারীর বিষয়টিও ভিন্ন। কেননা সে হারবী নয়। তাই তাকে হত্যা করা হয় না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিউক্ত ইবারতে মূলত ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও সাহেবাইনের মাঝে বিতর্কিত একটি মাসআলা আলোচনা করা হয়েছে এবং আনুসঙ্গিকভাবে আরো কিছু বিষয় আলোচনায় এসেছে। যেমন মুরতাদের কাজসমূহকে চার ভাগ করা হয়েছে এবং সাহেবাইনের পরস্পর একটি মতভেদও উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব, ইবারত নির্দেশনাসহ তার সারসংক্ষেপ নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

https://e-ilm.weebly.com/

وَمَا بَاعَهُ أَوْ اِشْتَرَاهُ .... الخ বলে ইমাম আবূ হানীফা ও সাহেবাইন (র.)-এর অভিমত বর্ণনা করা হয়েছে

কোনো মুরতাদ যদি মুরতাদ অবস্থায় কিছু বিক্রি করে বা কিছু ক্রয় করে কিংবা কোনো গোলাম- বাঁদিকে আজাদ করে কিংবা কাউকে কিছু দান করে অথবা কারো নিকট কিছু বন্ধক রাখে অথবা নিজের অন্য কোনো তসররুফ করে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মত হলো, মুরতাদের এসব কাজসমূহ মওকুফ বা স্থগিত থাকবে। যদি সে পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে তার কাজসমূহ বৈধ হিসাবে কার্যকর হবে। আর যদি মুরতাদ অবস্থায় মারা যায় কিংবা তাকে হত্যা করা হয় কিংবা সে দারুল হরবে চলে যায়, তাহলে তার উপরিউক্ত আকদসমূহ বাতিল বলে গণ্য হবে।

সাহেবাইন (র.) বলেন, ইসলাম গ্রহণ করুক বা না করুক (অর্থাৎ মারা যাক বা নিহত হোক বা দারুল হরবে চলে যাক) উভয় অবস্থায় মুরতাদের আক্দসমূহ বৈধ হিসাবে কার্যকর হবে। اِعْلَمْ اَنَّ تَصَرُّفَاتِ الْمُرْتَدِّ বলে মুরতাদের কার্যসমূহকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে। কোনো ব্যক্তি মুরতাদ অবস্থায় যেসব আক্দ সম্পূর্ণ করে সেগুলোকে চার ভাগে বিভক্ত করা যায়।

১. যে সব আক্দ সকলের মতে বৈধ বা কার্যকর হয়। যেমন মুরতাদ কর্তৃক যদি কোনো বাঁদীকে উম্মে ওয়ালাদ বানানো, স্ত্রীকে তালাক দেওয়া ইত্যাদি। অর্থাৎ মুরতাদ যদি কোনো বাদীকে উম্মে ওয়ালাদ বানায় তাহলে তা কার্যকরী হবে। কেননা উম্মে ওয়ালাদ বানানোর জন্য প্রকৃত মালিকানা প্রয়োজন হয় না। একারণেই কেউ যদি নিজের ছেলের বাদীকে উম্মে ওয়ালাদ বানায় তাহলেও তা শুদ্ধ হয়ে যায়, কার্যকরী হয়ে যায়। অথচ ছেলের বাঁদীর উপর ব্যক্তির কোনো মালিকানা থাকে না। অতএব, মুরতাদ ব্যক্তি তার বাঁদীকে উম্মে ওয়ালাদ বানালে তা কার্যকরী হবে। তদ্রূপ মুরতাদ যদি তার স্ত্রীকে তালাক দেয়, তাহলে তা কার্যকরী হবে। কেননা তালাকের জন্য পূর্ণ বেলায়েত বা কর্তৃত্ব আবশ্যক হয় না। একারণেই গোলাম তার স্ত্রীকে তালাক দিলে কার্যকর হয়ে থাকে। অথচ গোলামের নিজের উপরই নিজের বেলায়েত বা কর্তৃত্ব নেই। অতএব, মুরতাদ ব্যক্তির তালাকও কার্যকর হবে।

২. যে সব কাজ সর্বসম্মতিক্রমে বাতিল : যেমন বিবাহ এবং জবাইকৃত পশু। অর্থাৎ কোনো মুরতাদ যদি বিবাহ করে তাহলে তা সকলের মতে বাতিল বলে গণ্য হবে। এবং কোনো মুরতাদ যদি কোনো পশু জবাই করে, তাহলে তা ভক্ষণ করা বৈধ হবে না। কেননা বিবাহ এবং জবাই একান্তই ধর্ম নির্ভর কাজ। আর মুরতাদের যেহেতু কোনো ধর্ম নেই, তাই তার এসব কাজ শুদ্ধ হবে না।

৩. যেসব কাজ সর্ব সম্মতিক্রমে মওকুফ। যেমন শিরকতে মুফাওয়াযাহ। অর্থাৎ কোনো মুরতাদ যদি কোনো মুসলিমের সাথে শিরকতে মুফাওয়াযাহ-এর আকদ বা চুক্তি করে তাহলে তা সকলের মতে স্থগিত থাকবে। কেননা দুজনের মধ্যে শিরকতে মুফাওয়াযাহ সম্পাদন হওয়ার জন্য শর্ত হলো ধর্ম, সম্পদ ও তাসাররুফের দিক থেকে উভয় পক্ষ সমান হওয়া। এ কারণেই স্বাধীন ও গোলামের মাঝে, বালেগ ও নাবালেগর মাঝে, মুসলিম ও কাফেরের মাঝে শিরকতে মুফাওয়ায়াহ সম্পন্ন হয় না। অতএব, মুরতাদ ও মুসলিমের মাঝেও যেহেতু সমতা নেই, যেহেতু তাদের মধ্যেও শিরকতে মুফাওয়াযাহ সম্পন্ন হবে না। বরং তা মওকুফ থাকবে। যদি পরবর্তীতে মুরতাদ ব্যক্তি মুসলমান হয়, তাহলে তা কার্যকর হবে। অন্যথায় বাতিল হবে।

৪. যেসব কাজ স্থগিত হওয়ার ব্যাপারে এখতেলাফ রয়েছে। যেমন ক্রয়-বিক্রয়, হেবা, ইতক, বন্ধক ইত্যাদি। মুরতাদের এসব কাজ ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে মওকুফ তথা স্থগিত থাকবে। যদি মুরতাদ পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তার এসব কাজ শুদ্ধ বলে বিবেচিত হবে। আর যদি মুরতাদ মারা যায়, তাহলে তার এসব কাজ অশুদ্ধ বলে ধরা হবে। সাহেবাইনের মতে, মুরতাদ ইসলাম গ্রহণ করুক বা না করুক, সর্বাবস্থায় তার এসব কাজ শুদ্ধ ও কার্যকরী বলে গণ্য হবে।

لَهُمَا اَنَّ الصِّحَّةَ الخ থেকে সাহেবাইনের দলিল বর্ণনা করা হয়েছে।

সাহেবাইনের দলিল হলো, তসররুফ সহীহ হওয়ার উপর তথা তসররুফের যোগ্যতা রাখার উপর। আর তসররুফ কার্যকরী হওয়ার বিষয়টি নির্ভর করে মালিকানার উপর। মুরতাদের মধ্যে তসররুফের যোগ্যতা ও সম্পদের মালিকানা উভয়ই বিদ্যমান আছে।

https://e-ilm.weebly.com/

আহলিয়াত বা যোগ্যতা বিদ্যমান থাকার প্রমাণ হলো, মুরতাদ ব্যক্তি শরিয়তবেত্তার নিকট সম্বোধিত। অর্থাৎ তার উপর শরিয়তের বিধান কার্যকর হয়। একারণেই তাকে মুরতাদ হওয়ার দায়ে হত্যা করা হয়। যদি শিশু পাগল ইত্যাদির মতো মুরতাদের আহলিয়াত না থাকত, তাহলে তার উপর শরিয়তের বিধান কার্যকর হতো না। অতএব, প্রমাণিত হলো যে, মুরতাদের আহলিয়াত আছে, সে তসররুফের আহল বা যোগ্য। পাশাপাশি মুরতাদের মালিকানাও মৃত্যু পর্যন্ত বহাল থাকে। এবিষয়টি পূর্বেই প্রমাণ করা হয়েছে। মৃত্যু পর্যন্ত মুরতাদের মালিকানা বহাল থাকার প্রমাণ হলো, মুরতাদ হওয়ার থেকে ছয় মাসের ভিতরে যদি, মুরতাদ ব্যক্তির মুসলিম স্ত্রীর গর্ভ হতে কোনো সন্তান ভূমিষ্ট হয়, তাহলে উক্ত সন্তান মুরতাদের ওয়ারিশ হয়। এর দ্বারা বুঝা যায়, মুরতাদের মালিকানা মুরতাদ হওয়ার দ্বারা বাতিল হয় না। বরং তা মুরতাদের মৃত্যু পর্যন্ত বহাল থাকে।

কেননা যদি মুরতাদের মালিকানা বহাল না থাকত, তাহলে উক্ত সন্তান তার ওয়ারিশ হতো না।

মুরতাদের মালিকানা মৃত্যু পর্যন্ত বহাল থাকার আরো একটি প্রমাণ হলো এই যে, মুরতাদের যে সন্তান তার মুরতাদ হওয়ার পূর্বে জন্ম গ্রহণ করে, সে যদি পিতার মুরতাদ হওয়ার পর তার মৃত্যুর আগেই মরে যায়, তাহলে সে সন্তান ওয়ারিশ হয় না। এর দ্বারাও প্রতীয়মান হয়, মুরতাদের মালিকানা তার মৃত্যু পর্যন্ত বহাল থাকে।

কেননা যদি মৃত্যু পর্যন্ত মুরতাদের মালিকানা বহাল না থাকত, বরং মুরতাদ হওয়ার দ্বারাই তার মালিকানা বাতিল হয়ে যেত, তাহলে উক্ত সন্তান তার ওয়ারিশ হতো। কেননা সে পিতা মুরতাদ হওয়ার সময় জীবিত ছিল। মোটকথা, এসব আনুষঙ্গিক আসআলাসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মুরতাদের আহলিয়াত এবং মালিকানা উভয়ই তার মৃত্যু পর্যন্ত বহাল থাকে। অতএব, তার তসররুফসমূহ শুদ্ধ এবং কার্যকর হবে।

إِلَّا أَنَّ عِنْدَ أَبِي يُوْسُفَ رحـ..............الخ বলে সাহেবাইনের পারস্পরিক মতপার্থক্য ও তার দলিলের বর্ণনা করা হয়েছে। সাহেবাইনের পারস্পরিক মতপার্থক্যটি এই যে, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, মুরতাদের আলোচ্য তসররুফসমূহ একজন সুস্থ মানুষের তসররুফের ন্যায় শুদ্ধ হবে। অর্থাৎ তার তসররুফসমূহ তার সমস্ত সম্পদ থেকে কার্যকরী হবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, মুরতাদের আলোচ্য তসররুফসমূহ একজন অন্তিম রোগাক্রান্ত (مَرِيْضٌ بِمَرَضِ الْمَوْتِ) ব্যক্তির তসররুফের ন্যায় কার্যকর হবে। অর্থাৎ মুরতাদের তসররুফ সমূহ তার সম্পদের এক তৃতীয়াংশ থেকে কার্যকর হবে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর যুক্তি হলো, মুরতাদ ইসলাম ত্যাগ করেছে কোনো সন্দেহের কারণে। অতএব, এটা স্বাভাবিক যে, তার সন্দেহ নিরসন করা হলে সে পুনরায় মুসলমান হয়ে যাবে। আর মুসলামন হয়ে গেলে তাকে হত্যা করা হবে না। বরং সে একজন সুস্থ সাধারণ মুসলমান হিসাবে বেঁচে থাকবে। এতএব, তার তসররুফসমূহ সুস্থ মানুষের তসররুফের মতোই গোটা সম্পদ থেকে কার্যকর হবে। যেমন কোনো মহিলা মুরতাদের তসররুফসমূহ তার গোটা সম্পদ থেকে কার্যকর হয়, তাকে হত্যা করার বিধান না থাকার কারণে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর যুক্তি হলো, মানুষ যে ধর্মের উপর লালিত পালিত হয়, যে ধর্ম দীর্ঘদিন পালন করে সে বড় হয়ে উঠে, সে ধর্ম থেকে বিমুখ হয়ে যখন অন্য ধর্মে চলে যায়, তখন এটাই স্বাভাবিক যে, সে আর আগের ধর্মে ফিরে আসবে না। বিধায় ইসলাম ত্যাগী মুরতাদের ক্ষেত্রেও এটাই স্বাভাবিক যে, সে পুনরায় ইসলম গ্রহণ করবে না। যার ফলে তার হত্যা অবশ্যম্ভাবী। অতএব, তার তসররুফসমূহ অন্তিম রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির তসররুফের ন্যায় সম্পদের এক তৃতীয়াংশ হতে কার্যকর হবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর দলিল :

ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেছিলেন মুরতাদের ক্রয় বিক্রয়, হেবা, বন্ধক, ইত্‌ক ইত্যাদি তসররুফসমূহ তার মৃত্যু কিংবা ইসলাম গ্রহণ পর্যন্ত মওকুফ থাকবে। যদি সে পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তসররুফসমূহ কার্যকর হবে। আর যদি মারা যায়, কিংবা নিহত হয়, কিংবা দারুল হরবে চলে যায়, তাহলে তার তসররুফসমূহ বাতিল হবে।

তার এ মতের পক্ষে দলিল হলো এই যে, মুরতাদ ব্যক্তি হলো হারবী কাফেরের ন্যায়। যদি কোনো হারবী আমান গ্রহণ করা ছাড়া দারুল ইসলামে প্রবেশ করে ধৃত হয়, তাহলে তার মালিকানা মওকুফ হয়ে যায়, এবং এ কারণে তসররুফসমূহও মওকুফ থাকে। এরপর যদি হারবী ব্যক্তি রেহাই পায়, তাহলে তার তসররুফসমূহ কার্যকর হয়। আর যদি

https://e-ilm.weebly.com/

তাকে গোলাম বানিয়ে ফেলা হয়, অথবা হত্যা করা হয়, তাহলে তার তসররুফসমূহ বাতিল হয়ে যায়। অতএব, মুরতাদের বিষয়টিও এরূপই হবে। অর্থাৎ মুরতাদ ব্যক্তির মালিকানা ও তসররুফসমূহ মওকুফ থাকবে। এর পর যদি মুরতাদ পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তার তসররুফসমূহ কার্যকর হয়। আর যদি সে মুরতাদ অবস্থায় মারা যায়, কিংবা তাকে হত্যা করা হয়, তাহলে তার তসররুফসমূহ বাতিল হয়ে যাবে।

وَاسْتِحْقَاقُهُ الْقَتْلَ الخ : থেকে সাহেবাইনের দলিলের জবাব দেওয়া হয়েছে। সাহেবাইন বলেছিলেন যে, তসররুফ সহীহ হওয়ার বিষয়টি নির্ভর করে আহলিয়াতের উপর। তথা তসররুফ করার যোগ্য হওয়ার উপর। আর মুরতাদ ব্যক্তির আহলিয়াতও আছে, তাই তাসাররুফসমূহ সহীহ হবে।

এর জবাবে ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে, মানুষ হিসাবে প্রত্যেকটা মানুষের নিরাপত্তা থাকে, তা মুরতাদ ও হারবীর ক্ষেত্রে বাতিল হয়ে যায়, তাদের কুফরের কারণে। একারণেই তারা হত্যার যোগ্য। আর এ বিষয়টিই তাদের আহলিয়াতের মধ্যে ত্রুটি সৃষ্টি করে। অতএব, তাদের ত্রুটিযুক্ত আহলিয়াতের দ্বারা তসররুফ হবে না। কেননা তসররুফ সহীহ হওয়ার জন্য পূর্ণ আহলিয়াত শর্ত।

بِخِلَافِ الزَّانِيْ وَقَاتِلٍ .... الخ বলে একটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর বক্তব্যের উপর প্রশ্ন হতে পারে যে, হত্যার যোগ্য হওয়ার কারণে যদি আহলিয়াত ত্রুটিপূর্ণ হয়ে যায়, এবং সে কারণে তসররুফ মওকুফ থাকে, তাহলে রজমের শাস্তি প্রাপ্ত ব্যভিচারী এবং ইচ্ছাকৃত হত্যাকারী ব্যক্তির আহলিয়াত ত্রুটিপূর্ণ হওয়া উচিত। কেননা তারা হত্যার যোগ্য। এবং একারণে তাদের তসররুফও মওকুফ হওয়া উচিত। অথচ তাদের তসররুফ মওকুফ হয় না; বরং তা কার্যকর হয়।

এ প্রশ্নের জবাব হলো এই যে, শুধু হত্যার যোগ্য হলেই আহলিয়াত ত্রুটিযুক্ত হয় না।

বরং নিরাপত্তা বাতিল হয়ে যাওয়ার কারণে যদি কেউ হত্যার যোগ্য হয়, তাহলেই তার আহলিয়াত ত্রুটিযুক্ত হয়। যেমন মুরতাদ ও হারবী। আর যদি কোনো অপরাধের শাস্তি হিসাবে কেউ হত্যার যোগ্য হয়। তাহলে এর দ্বারা তার আহলিয়াত ত্রুটিপূর্ণ হয় না। ফলে তার তসররুফও মওকুফ থাকে না। যেমন মুহসান ব্যভিচারী ব্যক্তি এবং ইচ্ছাকৃত হত্যাকারী ব্যক্তি। এরা হত্যা যোগ্য হয় কৃত অপরাধের শাস্তি হিসাবে। নিরাপত্তা বাতিল হওয়ার কারণে নয়। কেননা নিরাপত্তা বাতিল হওয়ার কারণ তথা কুফরি তাদের মধ্যে নেই। বরং তারা মুসলমান।

মোটকথা, হারবী ও মুরতাদ হত্যার যোগ্য হয় তাদের নিরাপত্তা বাতিল হওয়ার কারণে, ফলে তাদের আহলিয়াত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পক্ষান্তরে ব্যভিচারী ও ইচ্ছাকৃত হত্যাকারী ব্যক্তি হত্যার যোগ্য হয় কৃত অপরাধের শাস্তি হিসাবে। তাই তাদের আহলিয়াত ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। অতএব, এদেরকে দিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করা ঠিক নয়।

وَبِخِلَافِ الْمَرْأَةِ বলে সাহেবাইনের একটি কিয়াস বা তুলনার জবাব দেওয়া হয়েছে। তারা বলেছিলেন, মুরতাদ পুরুষ, মুরতাদ নারীর মতোই হলো। তাই মুরতাদ নারীর তসররুফ যেমন কার্যকর হয়, তেমনি মুরতাদ পুরুষের তসররুফও কার্যকর হবে।

এর উত্তর হলো, কিয়াস বা তুলনাটি ঠিক নয়। কেননা মুরতাদ নারীর পক্ষ থেকে যুদ্ধের আশঙ্কা নেই, বিধায় সে হারবী নয়। এ কারণে সে হত্যার যোগ্য। তাই তার তসররুফ কার্যকর হয় না। অতএব, পুরুষকে নারীর সাথে তুলনা করা আদৌ উচিত নয়।

https://e-ilm.weebly.com/

فَاِنْ عَادَ الْمُرْتَدُّ بَعْدَ الْحُكْمِ بِلِحَاقِهِ بِدَارِ الْحَرْبِ اِلَى دَارِ الْاِسْلَامِ مُسْلِمًا فَمَا وَجَدَهُ فِيْ يَدِ وَرَثَتِهِ مِنْ مَالِهِ بِعَيْنِهِ اَخَذَهُ؛ لِاَنَّ الْوَارِثَ اِنَّمَا يَخْلُفُهُ فِيْهِ لِاسْتِغْنَائِهِ، وَاِذَا عَادَ مُسْلِمًا احْتَاجَ اِلَيْهِ فَيُقَدَّمُ عَلَيْهِ؛ بِخِلَافِ مَا اِذَا اَزَالَهُ الْوَارِثُ عَنْ مِلْكِهِ، وَبِخِلَافِ اُمَّهَاتِ اَوْلَادِهِ وَمُدَبَّرِيْهِ؛ لِاَنَّ الْقَضَاءَ قَدْ صَحَّ بِدَلِيْلٍ مُصَحِّحٍ فَلَا يُنْقَضُ، وَلَوْ جَاءَ مُسْلِمًا قَبْلَ اَنْ يَقْضِيَ الْقَاضِيْ بِذٰلِكَ فَكَاَنَّهُ لَمْ يَزَلْ مُسْلِمًا لِمَا ذَكَرْنَا .

অনুবাদ : মুরতাদ যদি তার দারুল হরবে পলায়নের ঘোষণা জারি হওয়ার পর পুনঃ মুসলমান হয়ে দারুল ইসলামে ফিরে আসে, তাহলে ওয়ারিশদের হাতে তার যে মাল হুবহু বিদ্যমান পাবে, তা সে নিয়ে নিবে। কেননা মুরতাদ তার মালের প্রতি অমুখাপেক্ষী হওয়ার কারণেই ওয়ারিশ সেই মালের ক্ষেত্রে তার স্থলবর্তী হয়ে যায়। কিন্তু যখন সে পুনঃ ইসলাম গ্রহণ করে ফিরে আসে তখন সে ঐ সম্পদের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে। সুতরাং তাকে ওয়ারিশদের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

তবে ওয়ারিশ যদি ঐ সম্পদ নিজের মালিকানাচ্যুত করে ফেলে তাহলে বিষয়টি ভিন্ন হবে। তদ্রূপ তার উম্মে ওয়ালাদ ও মুদাব্বারদের বিষয়টিও ভিন্ন। কেননা বৈধতাদানকারী প্রমাণ বিদ্যমান থাকার কারণে আদালতের রায় বৈধ হয়েছিল। সুতরাং তা বাতিল হবে না। আর যদি আদালতের পক্ষ থেকে পলায়নের রায় ঘোষণা হওয়ার পূর্বেই সে মুসলমান হয়ে ফিরে আসে, তাহলে ধরে নেওয়া হবে যেন সে মুসলিমরূপেই বহাল রয়েছে। আমাদের পূর্ব বর্ণিত কারণে (অর্থাৎ আদালতের ঘোষণা ছাড়া তার পলায়ন স্থিত হয় না।)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(বর্ণিত মাসআলার সারসংক্ষেপ হলো যদি কোনো ব্যক্তি মুরতাদ হয়ে দারুল হরবে চলে যায় এবং মুসলমান হয়ে পুনরায় দারুল ইসলামে ফিরে আসে, তাহলে এক্ষেত্রে দুটি সুরত হতে পারে। উক্ত সুরত দুটি ও সংশ্লিষ্ট হুকুম দলিল সহ নিম্নরূপ–

সুরত ১ : আদালতের পক্ষে থেকে পলায়ন সম্পর্কিত রায় ঘোষণা হওয়ার মুরতাদ ফিরে আসবে।

এ সুরতের হুকুম হলো, ফিরে আসার পর নিজের যে সম্পদ কোনো ওয়ারিশের হাতে হুবহু বিদ্যমান পাবে, তা নিয়ে নিবে। কারণ মুরতাদ দারুল হরবে চলের যাওয়ার দ্বারা নিজ সম্পদের প্রতি অমুখাপেক্ষী হয়ে গিয়েছিল । যার ফলে সে সম্পদে তার ওয়ারিশদের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু মুরতাদ পুনরায় মুসলমান হয়ে দারুল ইসলামে চলে আসার পর সে আবার নিজ সম্পদের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছে। তাই ওয়ারিশদের হকের উপর তার হককে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। ফলে সে ওয়ারিশদের হাতে হুবহু বিদ্যমান সম্পদগুলো নিজের কাছে ফিরিয়ে আনতে পারবে।

তবে কোনো ওয়ারিশ যদি উক্ত সম্পদ নিজের মালিকানাচ্যুত করে, অর্থাৎ বিক্রি করে ফেলে, কিংবা দান দেয়, কিংবা আজাদ করে দেয়, তাহলে তা আর ফিরিয়ে আনা যাবে না।

অনুরূপভাবে পলায়নকারী মুরতাদের কোনো উম্মে ওয়ালাদ বাঁদী অথবা মুদাব্বার দাস আজাদ হয়ে থাকলে, সেও পুনরায় মুরতাদের মালিকানায় প্রবেশ করবে না। বরং তাদের আজাদি চূড়ান্ত বলেই বিবেচিত হবে। কারণ তারা আজাদ হয়েছে, আদালতের সিদ্ধান্তের বলে। আদালতের সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হয়েছিল সঠিক প্রমাণের ভিত্তিতে। তাই সে সিদ্ধান্ত বাতিল হবে না এবং সে সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে যারা আজাদ হয়েছে তাদের আজাদিও বাতিল হবে না; বরং তা বহাল থাকবে ও চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

সুরত ২ : পলায়ন সম্পর্কে আদালতের রায় ঘোষণার পূর্বেই মুরতাদ মুসলমান হয়ে ফিরে আসবে। এ সুরতের হুকুম হলো, মনে করা হবে যে, সে মুরতাদ হয়নি। বরং সর্বদাই সে মুসলমান ছিল। বিধায় তার তাবৎ মালিকানা বহাল থাকবে এমনকি উম্মে ওয়ালাদ ও মুদাব্বারও আজাদ হবে না।

এর কারণ হলো মুরতাদ ব্যক্তির পলায়ন সম্পর্কে আদালতের রায় ঘোষিত না হওয়ার কারণে তার পলায়নটি বিবেচনা যোগ্য হবে না। বিধায় পলায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো হুকুম তার উপর কার্যকর হবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

وَاِذَا وَطِئَ الْمُرْتَدُّ جَارِيَةً نَصْرَانِيَةً كَانَتْ لَهُ فِيْ حَالَةِ الْاِسْلَامِ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ لِاَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ اَشْهُرٍ مُنْذُ اِرْتَدَّ فَادَّعَاهُ فَهِيَ اُمُّ وَلَدٍ لَهُ وَالْوَلَدُ حُرٌّ وَهُوَ اِبْنُهُ وَلَا يَرِثُهُ، وَاِنْ كَانَتِ الْجَارِيَةُ مُسْلِمَةً وَرِثَهُ الِابْنُ اِنْ مَاتَ عَلَى الرِّدَّةِ اَوْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ اَمَّا صِحَّةُ الْاِسْتِيْلَادِ فَلِمَا قُلْنَا. وَاَمَّا الْاِرْثُ فَلِاَنَّ الْاُمَّ اِذَا كَانَتْ نَصْرَانِيَّةً وَالْوَلَدُ تَبَعٌ لَهُ لِقُرْبِهِ اِلَى الْاِسْلَامِ لِلْجَبْرِ عَلَيْهِ فَصَارَ فِيْ حُكْمِ الْمُرْتَدِّ وَالْمُرْتَدُّ لَا يَرِثُ الْمُرْتَدَّ. اَمَّا اِذَا كَانَتْ مُسْلِمَةً فَالْوَلَدُ مُسْلِمٌ تَبَعًا لَهَا؛ لِاَنَّهَا خَيْرُهُمَا دِيْنًا وَالْمُسْلِمُ يَرِثُ الْمُرْتَدَّ .

অনুবাদ : মুরতাদ যদি মুসলিম অবস্থায় তার যে খ্রিস্টান (বা ইহুদি) দাসী ছিল তার সাথে সহবাস করে আর ঐ দাসী রিদ্দাত থেকে নিয়ে ছয় মাসের বেশি সময় পরে সন্তান প্রসব করে আর সে পিতৃত্ব দাবি করে তাহলে দাসী তার উম্মে ওয়ালাদ হবে এবং নবজাতক তার পুত্ররূপে স্বাধীন হবে। কিন্তু তার উত্তরাধিকারী হবে না। পক্ষান্তরে দাসী যদি মুসলিম হয় আর সে মুরতাদ অবস্থায় মারা যায় কিংবা দারুল হরবে দাখিল হয়ে যায় তাহলে ঐ সন্তান তার উত্তরাধিকারী হবে।

সন্তান উৎপাদন বৈধ হওয়ার কারণ তো আমরা পূর্বেই বলেছি, (যে এর জন্য প্রকৃত মালিকানার প্রয়োজন হয় না।) আর উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে কারণ এই যে, দাসী মাতা যখন খ্রিস্টান হবে এবং ইসলামের দিকে প্রত্যাবর্তনের বাধ্যবাধকতার কারণে মুরতাদ ইসলামের নিকটবর্তী হিসাবে সন্তান যখন (ধর্মের ক্ষেত্রে) তার অনুবর্তী হবে তখন সে সন্তান মুরতাদের হুকুমভুক্ত হবে। আর মুরতাদ মুরতাদের উত্তরাধিকারী হতে পারে না। পক্ষান্তরে মুসলিম দাসী হলে তার অনুবর্তীরূপে সন্তানও মুসলিম হবে। কেননা ধর্মতঃ উভয়ের মাঝে সেই উত্তম আর মুসলিম মুরতাদের উত্তরাধিকারী হয়ে থাকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মুরতাদ ব্যক্তির একটি বাঁদী ছিল, মুসলমান থাকাকালে। সে মুরতাদ হওয়ার পর উক্ত বাঁদীর সাথে সহবাস করল। এরপর তার মুরতাদ হওয়া থেকে নিয়ে ছয় মাসের ভিতরে যদি উক্ত বাঁদীর গর্ভ থেকে কোনো সন্তান ভূমিষ্ট হয়। তাহলে সে সন্তান মুসলমান বলে গণ্য হবে এবং সে সন্তান মুরতাদ পিতার উত্তরাধিকারী হবে।

কেননা সন্তানটি ছয় মাসের ভিতরে জন্ম নেওয়ার দ্বারা প্রতীয়মান হয়ে যে, ব্যক্তি মুসলিম থাকা অবস্থায়, তার বীর্য দ্বারা সন্তানটি গর্ভস্থির হয়েছিল। তাই সে মুসলিম পিতার সন্তান হিসাবে মুসলিম বলে গণ্য হবে এবং পিতার উত্তরাধিকারী হবে। (উল্লেখ্য, এ সুরতটি উপরিউক্ত মতনে বর্ণিত হয়নি।)

আর যদি ব্যক্তি মুরতাদ হওয়া থেকে নিয়ে ছয় মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর বাঁদীর সন্তান ভূমিষ্ট হয়, তাহলে দেখতে হবে সন্তান ভূমিষ্টকারিণী বাঁদীটি মুসলিম না অমুসলিম। যদি বাঁদীটি অমুসলিম হয়, তাহলে সন্তানটি মুরতাদ পিতার অনুগামী হবে এবং সেও মুরতাদ বলে গণ্য হবে। তবে সে পিতার ওয়ারিশ হবে না। দাসীটি উম্মে ওয়ালাদ বলে গণ্য হবে। সন্তানটি আজাদ হবে।

কেননা দাসীকে উম্মে ওয়ালাদ বানানোর জন্য প্রকৃত মালিকানা প্রয়োজন হয় না। তাই মুরতাদ যখন সন্তানের দাবি করল, তখন তার দাবি গ্রহণযোগ্য হবে। ফলে দাসী উম্মে ওয়ালাদ বলে স্বীকৃতি পাবে এবং তার সন্তান আজাদ হবে। আর সন্তানটি পিতার অনুগামী হওয়ার কারণ হলো, পিতা ইসলামের নিকটবর্তী। কেননা মুরতাদ কে ইসলাম গ্রহণের জন্য বাধ্য করা হবে কিন্তু অমুসলিম মাতাকে ইসলাম গ্রহণের জন্য বাধ্য করা যাবে না। তাই সন্তান মাতার অনুগামী হবে না : বরং সে পিতার অনুগামী হবে, মুরতাদ বলে গণ্য হবে। কিন্তু মুরতাদ যেহেতু মুরতাদের ওয়ারিশ হয় না। সেহেতু এ সন্তান তার পিতার ওয়ারিশ হবে না

পক্ষান্তরে যদি দাসীটি মুসলিম হয়, তাহলে সন্তান মায়ের অনুগামী হবে, মুসলমান হবে। কেননা ধর্মের দিক থেকে এ ক্ষেত্রে মাতা উত্তম। আর মাতা পিতার মধ্যে ধর্মের দিক থেকে যে উত্তম হয়, সন্তান তারই অনুগামী হয়। সে হিসাবে আলোচ্য সুরতে সন্তানটি মুসলিম হবে। আর মুসলিম যেহেতু মুরতাদের ওয়ারিশ হয়, তাই সন্তানও পিতার ওয়ারিশ হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَاِذَا لَحِقَ الْمُرْتَدُّ بِمَالِهٖ بِدَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ ظُهِرَ عَلٰى ذٰلِكَ الْمَالِ فَهُوَ فَيْءٌ، فَاِنْ لَحِقَ ثُمَّ رَجَعَ وَاَخَذَ مَالًا وَاَلْحَقَهٗ بِدَارِ الْحَرْبِ فَظُهِرَ عَلٰى ذٰلِكَ الْمَالِ فَوَجَدَتْهُ الْوَرَثَةُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ رُدَّ عَلَيْهِمْ: لِاَنَّ الْاَوَّلَ مَالٌ لَمْ يَجْرِ فِيْهِ الْاِرْثُ، وَالثَّانِيَ انْتَقَلَ اِلَى الْوَرَثَةِ بِقَضَاءِ الْقَاضِيْ بِلِحَاقِهٖ فَكَانَ الْوَارِثُ مَالِكًا قَدِيْمًا

অনুবাদ : মুরতাদ যদি নিজ সম্পদসহ দারুল হরবে চলে যায়, এরপর মুজাহিদীন বিজয়ী হয়ে ঐ সম্পদের উপর কব্জা করে তাহলে তা গনিমতরূপে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে যদি একা চলে যায়, এরপর ফিরে এসে আবার সম্পদ নিয়ে দারুল হরবে চলে যায়। এরপর মুজাহিদীন বিজয়ী হয়ে ঐ মালের কব্জা করে। এমতাবস্থায় ওয়ারিশগণ যদি গনিমতের বন্টনের পূর্বে ঐ মাল পেয়ে যায়, তাহলে তা তাদেরকে অর্পণ করা হবে। কেননা প্রথমোক্ত সম্পদ এমন যাতে উত্তরাধিকার আদৌ কার্যকর হয়নি। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় সম্পদ কাজি কর্তৃক তার দারুল হরবে চলে যাওয়ার ঘোষণা দেওয়ার কারণে উত্তরাধিকারীদের মালিকানায় স্থানান্তরিত হয়েছিল। সুতরাং ওয়ারিশ ঐ সম্পদের পূর্ববর্তী মালিক বিবেচিত হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরে বর্ণিত মাসআলার সারসংক্ষেপ : যদি কোনো মুরতাদ ব্যক্তি দারুল হরবে পালিয়ে যাওয়ার সময় নিজের সম্পদসমূহ সাথে নিয়ে যাওয়ার পর যদি মুজাহিদ বাহিনী দারুল হরবে গিয়ে ঐ মুরতাদের সম্পদসমূহ দখল করে নেয়, তাহলে সে সম্পদ মালে গনিমত হবে। কেননা মুরতাদ হচ্ছে হারবী কাফের। আর হারবী কাফেরের সম্পদের উপর মুজাহিদগণের দখল প্রতিষ্ঠা হলে তা গনিমত হয়ে যায়। অতএব, মুরতাদের সম্পদও গনিমত হয়ে যাবে। এতে মুরতাদের ওয়ারিশদের কোনো হক থাকবে না। কারণ এ সম্পদ ওয়ারিশদের মালিকানায় স্থানান্তরিত হয়নি।

আর যদি মুরতাদ দারুল হরবে পালানোর সময় খালি হাতে পালিয়ে যায়। এবং আদালতের পক্ষ থেকে তার পালানোর ব্যাপারে ঘোষণা জারি হয়ে যায়, এরপর সেই মুরতাদ পুনরায় দারুল ইসলামে এসে নিজের সম্পদ নিয়ে যায়, এরপর যদি মুজাহিদ বাহিনী দারুল হরবে গিয়ে মুরতাদের সম্পদসমূহ কব্জা করে এবং উক্ত মাল গনিমতরূপে বন্টন হওয়ার পূর্বে মুরতাদের ওয়ারিশ পেয়ে যায়, তাহলে তা ওয়ারিশের হাতে অর্পণ করা হবে।

কারণ মুরতাদ দারুল হরবে প্রথমবার পালিয়ে যাওয়ার পর যখন আদালতের পক্ষ থেকে তার পালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা হয়েছে, তখন মুরতাদের সম্পদসমূহ তার ওয়ারিশদের মালিকানায় স্থানান্তরিত হয়েছে। এরপর মুরতাদ পুনরায় এসে যখন সম্পদ নিয়ে যায়, তখন সে মূলত মুসলমানদের সম্পদ নিয়ে যায়। আর কোনো মুসলমানের সম্পদ কোনো হরবী কাফের কর্তৃক দখল হয়ে দারুল হরবে চলে যাওয়ার পর পুনরায় তা মুজাহিদগণের হস্তগত হলে যে হুকুম হয়, আলোচ্য সম্পদের ক্ষেত্রেও সে হুকুমই হবে। অর্থাৎ তা গনিমতরূপে বণ্টিত হওয়ার পূর্বে পূর্বের মালিক যদি পেয়ে যায়, তাহলে তা তাকেই দিয়ে দেওয়া হয়। অতএব, আলোচ্য সম্পদও ওয়ারিশদেরকে দিয়ে দেওয়া হবে। কেননা তারা উক্ত সম্পদের পূর্ববর্তী মালিক।

আর যদি মুরতাদ ব্যক্তি কাজির রায় ঘোষণার পূর্বেই এসে নিয়ে যায়, এরপর তা মুজাহিদ দখল করে, তাহলে তা ওয়ারিশদের হাতে অর্পণ করা হবে কিনা এ নিয়ে দুরকম বর্ণনা রয়েছে। ১. যাহিরে রেওয়ায়েত অনুযায়ী উক্ত সম্পদও ওয়ারিশদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। অন্য একটি বর্ণনায় আছে, উক্ত সম্পদ গনিমত হিসাবেই বণ্টিত হয়ে যাবে। ওয়ারিশদের কাছে অর্পণ করা হবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

وَإِذَا لَحِقَ الْمُرْتَدُّ بِدَارِ الْحَرْبِ وَلَهُ عَبْدٌ فَقُضِيَ بِهِ لِابْنِهِ وَكَاتَبَهُ الِابْنُ ثُمَّ جَاءَ الْمُرْتَدُّ مُسْلِمًا فَالْمُكَاتَبَةُ جَائِزَةٌ، وَالْكِتَابَةُ وَالْوَلَاءُ لِلْمُرْتَدِّ الَّذِي أَسْلَمَ؛ لِأَنَّهُ لَا وَجْهَ إِلَى بُطْلَانِ الْكِتَابَةِ لِنُفُوْذِهَا بِدَلِيْلٍ مُنَفِّذٍ. فَجَعَلْنَا الْوَارِثَ الَّذِي هُوَ خَلَفُهُ كَالْوَكِيْلِ مِنْ جِهَتِهِ، وَحُقُوْقُ الْعَقْدِ فِيْهِ تَرْجِعُ إِلَى الْمُوَكِّلِ، وَالْوَلَاءُ لِمَنْ يَقَعُ الْعِتْقُ عَنْهُ .

অনুবাদ : মুরতাদ যদি তার গোলাম রেখে দারুল হরবে চলে যায় আর ঐ গোলাম তার পুত্রের মালিকানাভুক্ত বলে ঘোষিত হয় এবং পুত্র তার সাথে কিতাবাত চুক্তি করে এরপর মুরতাদ পুনঃ ইসলাম গ্রহণপূর্বক ফিরে আসে, তাহলে কিতাবাত চুক্তি বৈধ থাকবে। তবে কিতাবাতের অর্থ এবং তার উত্তরাধিকারী হওয়ার হক পুনঃ ইসলাম গ্রহণকারী মুরতাদের জন্য হবে।

কেননা কার্যকরকারী দলিল বিদ্যমান থাকার কারণে যেহেতু কিতাবাত চুক্তি কার্যকর হয়েছে, সেহেতু তা বাতিল হওয়ার কোনো কারণ নেই। সুতরাং উত্তরাধিকারীকে যে তার স্থলবর্তী হয়েছিল, তার পক্ষ থেকে নিযুক্ত উকিল বিবেচনা করা হবে। আর কিতাবাত চুক্তির অধিকার ও দায় মুওয়াক্কেলের সাথে সম্পৃক্ত হয়। আর গোলামের মুক্তি যার পক্ষ থেকে হয়, ওয়ালা বা উত্তরাধিকারী হওয়ার হক তার জন্যই সাব্যস্ত হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আলোচ্য মাসআলার সারসংক্ষেপ হলো, কোনো মুরতাদ ব্যক্তি নিজের গোলামকে ফেলে রেখে দারুল হরব চলে গেল। গোলামটি মুরতাদের পুত্রের মালিকানায় চলে এলো। পুত্র উক্ত গোলামের সাথে কিতাবাতের চুক্তি করল। অতঃপর মুরতাদ পিতা ইসলাম গ্রহণ করে পুনরায় দারুল ইসলামে ফিরে এলো। এমতাবস্থায় পুত্র কর্তৃক সম্পাদিত কিতাবতের চুক্তি বহাল থাকবে। কেননা এ চুক্তি কার্যকরকারী দলিল বিদ্যমান থাকা অবস্থায় সম্পাদিত হয়েছে। অর্থাৎ আদালতের পক্ষ থেকে মুরতাদের দারুল হরবে চলে যাওয়া সম্পর্কে রায় ঘোষিত হওয়ার পর সম্পাদিত হয়েছে। অতএব, চুক্তিটি বাতিল হবে না; বরং চুক্তি সম্পাদনকারী পুত্রকে পিতার পক্ষ থেকে উকিল হিসাবে বিবেচনা করা হবে। আর পিতাকে বিবেচনা করা হবে মুওয়াক্কেলরূপে। আর যেহেতু কিতাবাতের চুক্তি সংশ্লিষ্ট যাবতীয় দায় ও অধিকার মুওয়াক্কেলের উপর বর্তায়, সেহেতু আলোচ্য সুরতেও কিতাবাতের চুক্তি সংশ্লিষ্ট দায় ও অধিকার পিতার উপর বর্তাবে। ফলে পিতা কিতাবাতের অর্থের মালিক হবে। তার পক্ষ থেকেই আজাদকরণ সাব্যস্ত হবে এবং উক্ত গোলামের ওয়ালাও সেই পাবে। অর্থাৎ গোলামের মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারী হওয়ার হক বা অধিকার পিতার জন্যই সাব্যস্ত হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَإِذَا قَتَلَ الْمُرْتَدُّ رَجُلًا خَطَأً ثُمَّ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ أَوْ قُتِلَ عَلَى رِدَّتِهِ فَالدِّيَةُ فِيْ مَالٍ اكْتَسَبَهُ فِيْ حَالِ الْإِسْلَامِ خَاصَّةً عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ . وَقَالَا : الدِّيَةُ فِيْمَا اكْتَسَبَهُ فِيْ حَالَةِ الْإِسْلَامِ وَالرِّدَّةِ جَمِيْعًا؛ لِأَنَّ الْعَوَاقِلَ لَا تَعْقِلُ الْمُرْتَدَّ؛ لِانْعِدَامِ النُّصْرَةِ فَتَكُوْنُ فِيْ مَالِهِ. وَعِنْدَهُمَا الْكَسْبَانِ جَمِيْعًا مَالُهُ؛ لِنُفُوْذِ تَصَرُّفَاتِهِ فِي الْحَالَيْنِ، وَلِهٰذَا يَجْرِي الْإِرْثُ فِيْهِمَا عِنْدَهُمَا. وَعِنْدَهُ مَالُهُ الْمُكْتَسَبُ فِي الْإِسْلَامِ؛ لِنَفَاذِ تَصَرُّفِهِ فِيْهِ دُوْنَ الْمَكْسُوْبِ فِي الرِّدَّةِ؛ لِتَوَقُّفِ تَصَرُّفِهِ، وَلِهٰذَا كَانَ الْأَوَّلُ مِيْرَاثًا عَنْهُ، وَالثَّانِي فَيْئًا عِنْدَهُ .

অনুবাদ : মুরতাদ যদি কাউকে ভুলক্রমে হত্যা করে দারুল হরবে দাখিল হয়ে যায় অথবা ধর্মচ্যুতির কারণে তাকে হত্যা করা হয়, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মতে শুধু তার মুসলিম অবস্থার উপার্জিত অর্থের দ্বারা দিয়ত আদায় করা হবে। সাহেবাইনের মতে ইসলাম ও রিদ্দাত উভয় অবস্থায় উপার্জিত সমস্ত সম্পদ দ্বারা দিয়ত আদায় করা হবে।

কেননা এখানে সাহায্য সম্পর্কের অনুপস্থিতির কারণে নিকটবর্তী আত্মীয়গণ মুরতাদের রক্তপণের দায় গ্রহণ করবে না। সুতরাং তার সম্পদেই দিয়ত সাব্যস্ত হবে। আর সাহেবাইনের মতে উভয় অবস্থার উপার্জনই তার সম্পদরূপে গণ্য। কেননা উভয় অবস্থাতেই সম্পদের উপর তার ব্যবহার কার্যকর হয়। এবং এ কারণেই তাদের মতে উভয় উপার্জনে উত্তরাধিকার প্রয়োগ হয়। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে মুসলিম অবস্থার উপার্জনই হলো তার সম্পদ। কেননা ঐ সম্পদেই কেবল তার ব্যবহার কার্যকর হয়। মুরতাদ অবস্থার উপার্জন তার সম্পদ নয়। কেননা তাতে তার ব্যবহার স্থগিত থাকে। এ কারণেই তার মতে প্রথমোক্ত সম্পদ হলো মিরাশ। আর দ্বিতীয়োক্ত সম্পদ হলো গনিমত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিউক্ত মাসআলার সারসংক্ষেপ এই যে, যদি কোনো মুরতাদ ব্যক্তি ভুলবশত কাউকে হত্যা করার পর দারুল হরবে চলে যায় কিংবা নিহত হয়, তাহলে তার নিজের সম্পদের মধ্যে উক্ত হত্যার দিয়ত ওয়াজিব হবে। মুরতাদের আকেলা বা আত্মীয়গণ এই হত্যার দায় বহন করবে না। কারণ আকেলার উপর দিয়ত ওয়াজিব হয়, সহযোগিতার দায়িত্ব থাকার কারণে। আর মুরতাদকে সাহায্য করা যেহেতু আত্মীয়দের দায়িত্ব নয়, সেহেতু মুরতাদ কর্তৃক হত্যাকাণ্ডের দিয়ত আত্মীয়দের উপর ওয়াজিব হবে না। বরং সে দিয়ত স্বয়ং মুরতাদের সম্পদ দ্বারাই পরিশোধ করতে হবে।

তবে মুরতাদের কোন সম্পদ দ্বারা এই দিয়ত পরিশোধ করা হবে- এ নিয়ে ইমামগণের মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর অভিমত হলো, মুরতাদ ব্যক্তির মুসলমান অবস্থায় উপার্জিত সম্পদ দ্বারা দিয়ত পরিশোধ করা হবে। মুরতাদ অবস্থার উপার্জিত সম্পদ দ্বারা দিয়ত পরিশোধ করা হবে না।

পক্ষান্তরে সাহেবাইনের মত হলো, মুসলমান অবস্থার উপার্জিত এবং মুরতাদ অবস্থার উপার্জিত উভয় প্রকার সম্পদ দ্বারাই দিয়ত পরিশোধ করা হবে। ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)ও এ মত পোষণ করেন।

সাহেবাইনের দলিল হলো, মুসলমান অবস্থায় উপার্জিত এবং মুরতাদ অবস্থায় উপার্জিত উভয় প্রকার সম্পদ মুরতাদের মালিকানা। তাই উভয় প্রকার সম্পদের মধ্যে তার তসররুফ কার্যকর হয় এবং উত্তরাধিকার সাব্যস্ত হয়। অতএব উভয় প্রকার সম্পদ দ্বারাই তার উপর আরোপিত দিয়ত পরিশোধ করা হবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

وَإِذَا قُطِعَتْ يَدُ الْمُسْلِمِ عَمْدًا فَارْتَدَّ وَالْعِيَاذُ بِاللّٰهِ ثُمَّ مَاتَ عَلٰى رِدَّتِهِ مِنْ ذٰلِكَ أَوْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ جَاءَ مُسْلِمًا فَمَاتَ مِنْ ذٰلِكَ فَعَلَى الْقَاطِعِ نِصْفُ الدِّيَةِ فِيْ مَالِهِ لِلْوَرَثَةِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّ السِّرَايَةَ حَلَّتْ مَحَلًّا غَيْرَ مَعْصُوْمٍ فَأُهْدِرَتْ، بِخِلَافِ مَا إِذَا قُطِعَ يَدُ الْمُرْتَدِّ ثُمَّ أَسْلَمَ فَمَاتَ مِنْ ذٰلِكَ؛ لِأَنَّ الْإِهْدَارَ لَا يَلْحَقُهُ الْإِعْتِبَارُ، أَمَّا الْمُعْتَبَرُ قَدْ يُهْدَرُ بِالْإِبْرَاءِ فَكَذَا بِالرِّدَّةِ . وَأَمَّا الثَّانِيْ وَهُوَ مَا إِذَا لَحِقَ وَمَعْنَاهُ إِذَا قُضِيَ بِلِحَاقِهِ فَلِأَنَّهُ صَارَ مَيِّتًا تَقْدِيْرًا، وَالْمَوْتُ يَقْطَعُ السِّرَايَةَ، وَإِسْلَامُهُ حَيَاةٌ حَادِثَةٌ فِي التَّقْدِيْرِ فَلَا يَعُوْدُ حُكْمُ الْجِنَايَةِ الْأُوْلٰى، فَإِذَا لَمْ يَقْضِ الْقَاضِيْ بِلِحَاقِهِ فَهُوَ عَلَى الْخِلَافِ الَّذِيْ نُبَيِّنُهُ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى.

অনুবাদ : কোনো মুসলমানের হাত যদি ইচ্ছাকৃতভাবে কেটে ফেলা হয় এরপর (আল্লাহ না করুন) সে মুরতাদ হয়ে যায় এবং ঐ ক্ষতের কারণে রিদ্দাতের অবস্থায় মারা যায় কিংবা দারুল হরবে দাখিল হয়ে যায়। অতঃপর পুনঃ ইসলাম গ্রহণ পূর্বক ফিরে আসে এবং ঐ ক্ষতের কারণে মারা যায়, তাহলে কর্তনকারীর উপর তার মাল থেকে অর্ধেক দিয়ত সাব্যস্ত হবে এবং তা মুরতাদের ওয়ারিশরা পাবে।

প্রথম অবস্থার ক্ষেত্রে কারণ এই যে, (কর্তন জনিত ক্ষতের) সংক্রমণ নিরাপত্তাগুণ বর্জিত স্থানে প্রবেশ করেছে। সুতরাং তার দায় বাতিল হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে মুরতাদের হাত কাটা হলে এবং পুনঃ ইসলাম গ্রহণের পর ঐ কারণে তার মৃত্যু হলে বিষয়টি ভিন্ন হবে। (অর্থাৎ কোনো দিয়ত সাব্যস্ত হবে না।) কেননা কোনো অপরাধ দণ্ডহীন সাব্যস্ত হওয়ার পর তা বিবেচনা যোগ্যতা ফিরে পায় না। পক্ষান্তরে বিবেচিত অপরাধ দায়মুক্ত করে দিলে দণ্ডহীন হয়ে যায়। সুতরাং রিদ্দাতের কারণেও বিবেচিত অপরাধ দণ্ডহীন হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় অবস্থার ক্ষেত্রে অর্থাৎ দারুল হরবে দাখিল হওয়া এবং আদালত থেকে চলে যাওয়া ঘোষিত হওয়ার ক্ষেত্রে কারণ এই যে, গুণগতভাবে সে মৃত সাব্যস্ত হয়েছে। আর মৃত্যু ক্ষতের সংক্রমণ রহিত করে। এরপর ইসলাম গ্রহণ হচ্ছে গুণগতভাবে উদ্ভূত নবজীবন। সুতরাং প্রথম অপরাধের হুকুম ও বিবেচ্যতা প্রত্যাবর্তন করবে না।

কিন্তু কাযী যদি তার দারুল হরবে চলে যাওয়া ঘোষণা না করেন, তাহলে বিষয়টা মতপার্থক্যপূর্ণ হবে, যা আমরা ইনশাআল্লাহ পরবর্তীতে বর্ণনা করব।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিউক্ত ইবারতে মূলতঃ একটি মাসআলার দুটি সুরত আলোচিত হয়েছে। মাঝে প্রসঙ্গক্রমে আরেকটি মাসআলা আলোচিত হয়েছে।

মূল মাসআলার প্রথম সুরত ঃ যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো মুসলমানের হাত কেটে ফেলে। অতঃপর সেই মুসলমান লোকটি মুরতাদ হয়ে যায় এবং হাতকাটার সংক্রমণের কারণে মুরতাদ অবস্থায় মারা যায়, তাহলে হাত কর্তনকারী ব্যক্তির নিজস্ব সম্পদে অর্ধেক দিয়ত ওয়াজিব হবে। এ হুকুমটি কয়েকটি বিষয় সম্বলিত। যথা-

১. অর্ধেক দিয়ত ওয়াজিব হবে,

২. পূর্ণ দিয়ত ওয়াজিব হবে না।

৩. অর্ধেক দিয়ত হাত কর্তনকারীর নিজস্ব সম্পদ থেকে পরিশোধ করা ওয়াজিব হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

এ বিষয়গুলোর কারণ নিম্নরূপ :

১. অর্ধেক দিয়ত ওয়াজিব হওয়ার কারণ : মুসলমান ব্যক্তির জান মাল মাসূম বা সংরক্ষিত। এর উপর হস্তক্ষেপ করা কারো জন্য বৈধ নয় কিন্তু যখন কেউ তার একটি হাত কেটে দিল, তখন এর মূল হুকুম ছিল কেসাস ওয়াজিব হওয়া অর্থাৎ মুসলমানের হাত কাটার শাস্তি হিসাবে কর্তনকারী ব্যক্তির একটি হাত কেটে দেওয়া। কিন্তু মুসলমান ব্যক্তিটি পরবর্তীতে মুরতাদ হয়ে যাওয়ার কারণে কর্তনকারীর কেসাস ওয়াজিব হবে না; বরং দিয়ত ওয়াজিব হবে। আর এক হাতের দিয়ত হলো প্রাণের দিয়তের অর্ধেক। তাই আলোচ্য সুরতে কর্তনকারীর উপর অর্ধেক দিয়ত ওয়াজিব হবে।

২. পূর্ণ দিয়ত ওয়াজিব না হওয়ার কারণ : হাত কাটার পর যখন মুসলমান লোকটি মুরতাদ হয়ে গেল, তখন তার প্রাণ মাসূম থাকেনি। তথা তার জান নিরাপত্তাগুণ সম্পন্ন থাকে না। তাই তখন কর্তনজনিত সংক্রমণের কারণে সে প্রাণ ধ্বংস হলেও দিয়ত আসবে না। কেননা দিয়ত, কেসাস ওয়াজিব হয় কেবল নিরাপত্তাগুণ সম্পন্ন প্রাণ নাশ করার দ্বারা। কিন্তু তার হাতটি যখন কর্তন করা হয়েছিল তখন সে নিরাপত্তাগুণ সম্পন্ন ছিল। বিধায় হাতের দিয়ত স্বরূপ অর্ধেক দিয়ত ওয়াজিব হয়।

৩. এই অর্ধেক দিয়ত হাত কর্তনকারীর নিজস্ব সম্পদে ওয়াজিব হওয়ার কারণ : হাতকাটার জিনায়েত বা অপরাধটি যেহেতু সে ইচ্ছাকৃতভাবে করেছে, তাই এর দিয়ত তার নিজস্ব সম্পদ দ্বারা পরিশোধ করতে হবে। তার আকেলা বা আত্মীয়গণ এর দায় বহন করবে না। কেননা আকেলা বা আত্মীয়গণ শুধু এমন অপরাধের দায় বহন করে থাকেন, যা ভুলক্রমে বা অনিচ্ছাকৃত সংঘটিত হয়। উল্লেখ্য যে, উক্ত অর্ধেক দিয়তের অর্থ মুরতাদের ওয়ারিশগণ পাবে।

মাসআলার দ্বিতীয় সুরত : কেউ কোনো মুসলমানের হাত ইচ্ছাকৃতভাবে কেটে ফেলল। এরপর এই মুসলমান মুরতাদ হয়ে দারুল হরবে চলে গেল। পুনরায় সে ইসলাম গ্রহণ করে দারুল ইসলামে ফিরে এলো এবং সেই কর্তনজনিত সংক্রমণের কারণে মৃত্যুবরণ করল। এ অবস্থায়ও হাত কর্তনকারীর উপর অর্ধেক দিয়ত ওয়াজিব হবে। প্রাণ নাশের কারণে পূর্ণ দিয়ত ওয়াজিব হবে না।

এ মাসআলার দলিল হলো, ব্যক্তিটি যখন মুরতাদ হয়ে দারুল হরব চলে গেল এবং আদালতের পক্ষ থেকে তার চলে যাওয়ার ব্যাপারে ঘোষণা হয়ে গেল তখন সে মৃত্যুবরণ করল। আর মৃত্যু দ্বারা ক্ষতের সংক্রমণ রহিত হয়ে যায়। তাই ধরে নেওয়া হবে যে, সে তখন ক্ষতের সংক্রমণ ভিন্ন অন্য কারণে বা স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করেছে। এরপর যখন সে পুনরায় মুসলমান হয়ে দারুল ইসলামে ফিরে আসে, তখন ধরা হবে, সে নতুন জীবন লাভ করেছে। এরপর যদি সে কর্তনের সংক্রমণের দ্বারা মারা যায়, তাহলেও তা বিবেচ্য হবে না। কারণ হাত কাটার অপরাধটি ঘটেছিল তার পূর্ববর্তী জীবনে। পরবর্তী জীবনে সেই অপরাধ ফিরে আসবে না। অর্থাৎ সেই অপরাধের দায়ে পরবর্তী জীবনে কোনো দণ্ড সাব্যস্ত হবে না। তাই অপরাধী ব্যক্তির পূর্ণ দিয়ত ওয়াজিব হবে না। কেবল হাত কাটার দায়ে অর্ধেক দিয়ত ওয়াজিব হবে।

আর যদি আদালতের পক্ষ থেকে মুরতাদের চলে যাওয়ার ব্যাপারে রায় ঘোষণা হওয়ার পূর্বেই সে পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করে দারুল ইসলামে ফিরে আসে এবং কর্তন জনিত সংক্রমণের কারণে মারা যায়। তাহলে তার হুকুম কি হবে, এনিয়ে মতভেদ রয়েছে। এমাসআলাটি সামনে আলোচিত হবে।

প্রাসঙ্গিকভাবে আলোচিত মাসআলা : যদি কোনো মুরতাদ ব্যক্তির হাত কেটে দেওয়া হয়, এরপর সে ইসলাম গ্রহণ করে এবং কর্তনজনিত সংক্রমণের কারণে মৃত্যুবরণ করে, তাহলে হাত কর্তনকারীর উপরে কোনো দিয়ত ওয়াজিব হবে না। কারণ যখন তার হাত কাটা হয়েছিল, তখন সে মুরতাদ হওয়ার কারণে নিরাপত্তাহীন ছিল। তাই তখনকার জিনায়েত দ্বারা দণ্ড ওয়াজিব হয়নি। পরবর্তীতেও সে জিনায়েতের কারণে কোনো দণ্ড ওয়াজিব হবে না।

কেননা কোনো অপরাধ অবিবেচ্য হওয়ার পর পুনরায় বিবেচ্য হতে পারে না। তাই হাত কাটার অপরাধটি প্রথম অবস্থায় যেহেতু অবিবেচ্য ছিল তথা তার দ্বারা কোনো দণ্ড সাব্যস্ত হয়নি, সেহেতু পরবর্তী আর বিবেচ্য হবে না। অর্থাৎ তার দ্বারা অপরাধীর উপর কোনো দণ্ড সাব্যস্ত করা যাবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ فَإِنْ لَمْ يَلْحَقْ وَاَسْلَمَ ثُمَّ مَاتَ فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً وَهٰذَا عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ وَاَبِيْ يُوْسُفَ (رحـ) . وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَزُفَرُ (رحـ) : فِيْ جَمِيْعِ ذٰلِكَ نِصْفُ الدِّيَةِ؛ لِاَنَّ اعْتِرَاضَ الرِّدَّةِ اَهْدَرَ السِّرَايَةَ فَلَا يَنْقَلِبُ بِالْاِسْلَامِ اِلَى الضَّمَانِ، كَمَا اِذَا قَطَعَ يَدَ مُرْتَدٍّ فَاَسْلَمَ . وَلَهُمَا اَنَّ الْجِنَايَةَ وَرَدَتْ عَلٰى مَحَلٍّ مَعْصُوْمٍ وَتَمَّتْ فِيْهِ فَيَجِبُ ضَمَانُ النَّفْسِ، كَمَا اِذَا لَمْ تَتَخَلَّلِ الرِّدَّةُ، وَهٰذَا؛ لِاَنَّهُ لَا مُعْتَبَرَ بِقِيَامِ الْعِصْمَةِ فِيْ حَالِ بَقَاءِ الْجِنَايَةِ، وَاِنَّمَا الْمُعْتَبَرُ قِيَامُهَا فِيْ حَالِ اِنْعِقَادِ السَّبَبِ وَفِيْ حَالِ ثُبُوْتِ الْحُكْمِ، وَحَالَةُ الْبَقَاءِ بِمَعْزِلٍ مِنْ ذٰلِكَ كُلِّهِ، وَصَارَ كَقِيَامِ الْمِلْكِ فِيْ حَالِ بَقَاءِ الْيَمِيْنِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি দারুল হরবে (বরং দারুল ইসলামেই) পুনঃ ইসলাম গ্রহণ করে অতঃপর (ঐ কারণে) মারা যায়, তাহলে তার উপর পূর্ণ দিয়ত সাব্যস্ত হবে। এ হলো ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর অভিমত। **ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর মতে এসকল ক্ষেত্রে অর্ধেক দিয়ত হবে।**

কেননা মাঝখানে উদ্ভূত মুরতাদ অবস্থা ক্ষতের সংক্রমণকে দণ্ডহীন সাব্যস্ত করেছে। সুতরাং ইসলাম গ্রহণের কারণে তা ক্ষতিপূরণ সাব্যস্তকারীরূপে পরিবর্তিত হবে না। যেমন মুরতাদের হাত কর্তন করার পর যদি ইসলাম গ্রহণ করে।

শায়খায়নের দলিল এই যে, অপরাধটি নিরাপত্তাগুণ সম্পন্ন স্থানে সংঘটিত হয়েছে এবং সেখানেই সম্পূর্ণ হয়েছে। সুতরাং জানের ক্ষতিপূরণ (তথা পূর্ণ দিয়ত) ওয়াজিব হবে। যেমন মুরতাদ অবস্থা মধ্যবর্তী না হলে (পূর্ণ দিয়ত সাব্যস্ত হতো)। এর কারণ এই যে, অপরাধ বিদ্যমানতার অবস্থায় নিরাপত্তাগুণের বিদ্যমানতা বিবেচ্য নয়; বরং বিবেচ্য হলো কারণ সংঘটিত হওয়ার অবস্থার মধ্যে এবং হুকুম সাব্যস্ত হওয়ার অবস্থার মধ্যে নিরাপত্তাগুণটি বিদ্যমান থাকা। পক্ষান্তরে বিদ্যমানতার অবস্থা এসব কিছু থেকে পৃথক। সুতরাং এ ইয়ামীন তথা আরোপিত শর্তের বিদ্যমানতার অবস্থায় মালিকানার বিদ্যমানতার অনুরূপ হলো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিউক্ত ইবারতে একটি মতভেদপূর্ণ মাসআলা আলোচিত হয়েছে। ইতিপূর্বে যার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছিল

মাসআলাটি এই যে, কেউ কোনো মুসলমানের হাত কেটে দিল, অতঃপর সে মুরতাদ হয়ে গেল। কিন্তু সে দারুল হরবে যায়নি। বরং দারুল ইসলামে থেকেই পুনরায় সে ইসলাম গ্রহণ করল এবং হাত কাটার ক্ষতের সংক্রমণের কারণে মৃত্যুবরণ করল। এমতাবস্থায় ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মত হলো হাত কর্তনকারী ব্যক্তির উপর জানের ক্ষতিপূরণ তথা পূর্ণ দিয়ত ওয়াজিব হবে।

পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ (র.) ও ইমাম যুফার (র.)-এর মত হলো এ সুরতেও অর্ধেক দিয়ত ওয়াজিব হবে, যেমন পূর্বে আলোচিত মাসআলার দু সুরতে অর্ধেক দিয়ত ওয়াজিব হয়েছিল।

দলিল পর্ব : ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম যুফার (র.) এর দলিল : মুসলমান ব্যক্তিটির হাত কাটার পর যখন সে মুরতাদ হয়ে গেল তখন তার এই মুরতাদ হওয়ার বিষয়টি হস্তকর্তনজনিত সংক্রমণকে দণ্ডহীন সাব্যস্ত করেছে। তাই সে পুনরায়

https://e-ilm.weebly.com/

ইসলাম গ্রহণ করলেও সেই সংক্রমণ দ্বারা দণ্ড সাব্যস্ত হবে। অতএব, সে ইসলাম গ্রহণের পর উক্ত সংক্রমণের কারণে মারা গেলেও প্রাণের দিয়ত ওয়াজিব হবে না। কারণ সে দণ্ডহীন সংক্রমণ দ্বারা মারা গেছে। যেমন কোনো ব্যক্তি মুরতাদ হওয়ার পর যদি তার হাত কেটে দেওয়া হয় এবং সেই হাতকাটার সংক্রমণের কারণে যদি ঐ মুরতাদ মারা যায়, তাহলে কোনো দিয়ত ওয়াজিব হয় না। তেমনিভাবে আলোচ্য সুরতেও ব্যক্তি মুরতাদ হওয়ার দ্বারা তার হস্তকর্তনজনিত সংক্রমণ দণ্ডহীন সাব্যস্ত হওয়ার কারণে, প্রাণের দিয়ত ওয়াজিব হবে না।

ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) এর দলিল : ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) এর দলিল হলো, অপরাধটির সূচনা হয়েছে মাসূম পাত্রে, অর্থাৎ নিরাপত্তা গুণসম্পন্ন একজন ব্যক্তির উপর। কেননা যখন তার হাত কাটা হয় তখন সে মুসলমান ছিল। আবার অপরাধটির সমাপ্তি ঘটেছে মাসূম পাত্রে বা নিরাপত্তাগুণ সম্পন্ন ব্যক্তির উপরই। কেননা হাত কাটার সংক্রমণ জনিত কারণে যখন লোকটি মারা যায়, তখনও সে মুসলমান। তবে সূচনা সমাপ্তির মাঝখানে কিছু সময় সে নিরাপত্তা সম্পন্ন ছিল না, মুরতাদ হয়ে যাওয়ার কারণে। অতএব, অপরাধটির শুরু ও শেষ বিবেচনা করা হবে।

মধ্যবর্তী অবস্থাটি বিবেচনা করা হবে না। সুতরাং নিরাপত্তা সম্পন্ন ব্যক্তির হাতকাটার কারণে, যখন সে উক্ত সংক্রমণে নিরাপত্তা সম্পন্ন অবস্থায়ই মারা গেল, তখন হাত কর্তনকারী ব্যক্তির উপর প্রাণের দিয়ত তথা পূর্ণ দিয়তই ওয়াজিব হবে। মাঝখানে কিছুকালের জন্য মুরতাদ হওয়ার বিষয়টি বিবেচ্য না হওয়ার কারণে, কেমন যেন সে মুরতাদই হয়নি। বিধায় কোনো মুসলমানের হাত কাটার পর যদি সে উক্ত কর্তনজনিত সংক্রমণে মারা যায়, তাহলে যেমন পূর্ণ দিয়ত ওয়াজিব হয়, আলোচ্য ব্যক্তির ক্ষেত্রেও তেমনি পূর্ণ দিয়ত ওয়াজিব হবে।

সবব সংঘটিত হওয়ার অবস্থা তথা অপরাধটি সূচনার অবস্থা এবং হুকুম সাব্যস্ত হওয়ার বা অপরাধের সমাপ্তির অবস্থা বিবেচ্য হয়, মধ্যবর্তী অবস্থা বিবেচ্য হয় না। এ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত আলোচ্য মাসআলার অনুরূপ আরেকটি মাসআলা হলো শর্ত আরোপের সময় এবং শর্ত বাস্তবায়নের সময় মালিকানা বিবেচ্য হওয়া। মধ্যবর্তী সময়ের মালিকানা বিবেচ্য না হওয়া। যেমন কেউ নিজের মালিকানাধীন দাসকে সম্বোধন করে বলল, তুমি যদি গৃহে প্রবেশ কর তাহলে তুমি আজাদ। এরপর সে দাসটি বিক্রি করে ফেলল। পুনরায় সে তাকে কিনে আনল। এরপর দাসটি গৃহে প্রবেশ করল। এমতাবস্থায় দাসটি আজাদ হয়ে যাবে। কারণ শর্ত আরোপের সময় অর্থাৎ সবব সংঘটিত হওয়ার সময় তার মালিকানা ছিল, এবং শর্ত বাস্তবায়নের সময় তথা, হুকুম সাব্যস্ত হওয়ার সময় তার মালিকানা ছিল, বিধায় সূচনা ও সমাপ্তির অবস্থাই বিবেচনা করা হবে, মধ্যবর্তী সময়ে তার মালিকানা না থাকার বিষয়টি বিবেচনা করা হয় না। তাই তার দাস তার শর্তের দ্বারা তার পক্ষ থেকে আজাদ হওয়ার সিদ্ধান্ত করা হয়।

আলোচ্য মাসআলায়ও অনুরূপ হাত কাটার পর সময় এবং মারা যাওয়ার সময় যেহেতু ব্যক্তিটি মুসলমান ছিল, সেহেতু ধরে নেওয়া হবে যে, একজন মুসলমানের হাত কাটার পর এর সংক্রমণে সে প্রাণ হারিয়েছে। অতএব, হাত কর্তনকারীর উপর পূর্ণ দিয়ত সাব্যস্ত হবে। মাঝখানে যে সে মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল, সেটা বিবেচনা করা হবে না। বরং মনে করা হবে, সে কখনো মুরতাদই হয়নি।

অনুরূপ আরেকটি মাসআলা হলো জাকাতের মাসআলা। বৎসরের প্রারম্ভে যদি কারো নিকট নেসাব পরিমাণ সম্পদ থাকে, বৎসরের মাঝখানে আবার সম্পদ কমে গিয়ে নেসাব অপূর্ণ হয়ে যায়, এরপর বৎসরের শেষে পুনরায় সম্পদ বৃদ্ধি পেয়ে নেসাব পূর্ণ হয়ে যায়, তাহলে মধ্যবর্তী অবস্থার বিবেচনা না করে কেবল বৎসরের শুরু ও শেষ অবস্থা বিবেচনা করে উক্ত ব্যক্তির উপর জাকাত ওয়াজিব হয়ে থাকে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَاِذَا ارْتَدَّ الْمُكَاتَبُ وَلَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ وَاكْتَسَبَ مَالًا فَاُخِذَ بِمَالِهِ وَاَبٰى اَنْ يُسْلِمَ فَقُتِلَ فَاِنَّهٗ يُوَفّٰي مَوْلَاهُ مُكَاتَبَتَهٗ وَمَا بَقِيَ فَلِوَرَثَتِهٖ وَهٰذَا ظَاهِرٌ عَلٰى اَصْلِهِمَا؛ لِاَنَّ كَسْبَ الرِّدَّةِ مِلْكُهٗ اِذَا كَانَ حُرًّا، فَكَذَا اِذَا كَانَ مُكَاتَبًا . وَاَمَّا عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رح) فَلِاَنَّ الْمُكَاتَبَ اِنَّمَا يَمْلِكُ اَكْسَابَهٗ بِالْكِتَابَةِ، وَالْكِتَابَةُ لَا تَتَوَقَّفُ بِالرِّدَّةِ فَكَذَا اَكْسَابُهٗ؛ اَلَا تَرٰى اَنَّهٗ لَا يَتَوَقَّفُ تَصَرُّفُهٗ بِالْاَقْوٰى وَهُوَ الرِّقُّ، فَكَذَا بِالْاَدْنٰى بِالطَّرِيْقِ الْاَوْلٰى .

অনুবাদ : যদি কোনো মুকাতাব গোলাম মুরতাদ হয়ে দারুল হরবে চলে যায় এবং মুরতাদ অবস্থায় সম্পদ উপার্জন করে এরপর (ইমামের হাতে) মালসহ তাকে পাকড়াও করা হয় এবং ইসলাম গ্রহণে অস্বীকার করার কারণে তাকে হত্যা করা হয়, তাহলে তার মনিবকে কিতাবত চুক্তির পুরো অর্থ পরিশোধ করা হবে। এরপর যা অবশিষ্ট থাকবে, তা তার ওয়ারিশদের হবে।

সাহেবাইনের মূলনীতি অনুযায়ী এতো পরিষ্কার। কেননা মুরতাদ অবস্থার আজাদ ব্যক্তির উপার্জন তার মালিকানাভুক্ত হয়। সুতরাং মুকাতাবের উপার্জনও তাই হবে। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে কারণ এই যে, কিতাবতের চুক্তির কারণেই মুকাতাব আপন উপার্জনের মালিক হয়। আর কিতাবতের চুক্তি রিদ্দাতের কারণে স্থগিত হয় না। অতএব, তার উপার্জনও স্থগিত হবে না। দেখুন না, রিদ্দাতের চেয়ে শক্তিশালী কারণ হলো দাসত্ব। অথচ তাতে তার তাসাররুফ স্থগিত হয় না। অতএব, নিম্নতর কারণ দ্বারা আরো স্বাভাবিক ভাবেই তার হস্তক্ষেপ স্থগিত হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিউক্ত মাসআলার সারমর্ম হলো, কোনো মুকাতাব গোলাম মুরতাদ হয়ে দারুল হরবে চলে যায় এবং মুরতাদ অবস্থায় সম্পদ উপার্জন করে, এরপর সে মুসলিম শাসকের হাতে বন্দী হয় এবং ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করার কারণে তাকে হত্যা করা হয়, তাহলে তার সম্পদসমূহ দ্বারা প্রথমে তার মনিবের কিতাবতের অর্থ পরিশোধ করা হবে। কিতাবতের অর্থ পরিশোধের পর যে সম্পদ অবশিষ্ট থাকবে তা মুকাতাব মুরতাদের উত্তরাধিকারীরা পাবে।

উক্ত হুকুমের কারণ বা ইল্লত সাহেবাইনের উসূল বা মূলনীতি অনুসারে সুস্পষ্ট। কেননা সাহেবাইনের মতে স্বাধীন মুরতাদ ব্যক্তি মুরতাদ অবস্থায় যে সম্পদ উপার্জন করে, তা তার মালিকানা বলে গণ্য হয়। তদ্রূপ মুকাতাব ব্যক্তিও মুরতাদ অবস্থায় যে সম্পদ উপার্জন করবে, তা তার মালিকানা বলে গণ্য হবে। অতএব, তার মৃত্যুর পর তার এই উপার্জিত সম্পদ দ্বারা প্রথমে কিতাবতের অর্থ পরিশোধ করা হবে। এরপর অবশিষ্ট সম্পদ ওয়ারিশদের মাঝে বণ্টন করা হবে।

কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মূলনীতি অনুসারে বিষয়টি কিছুটা জটিল। কেননা তার মতে স্বাধীন মুরতাদ ব্যক্তি মুরতাদ অবস্থায় যে সম্পদ উপার্জন করে তা তার মালিকানা বলে গণ্য হয় না। অথচ মুকাতাব দাসের মুরতাদ অবস্থার উপার্জিত সম্পদকে তার মালিকানা বলে গণ্য করেছেন। তাই স্বাধীন মুরতাদ ও মুকাতাব মুরতাদের মাঝে পার্থক্যের কারণ দর্শানো তার পক্ষে আবশ্যক হয়ে যায়। তাই তিনি বলেন, কেউ গোলাম থাকা অবস্থায় নিজের উপার্জিত সম্পদের মালিক নিজে হতে পারে কিন্তু যখন সে মুকাতাব হয় তথা নিজের মনিবের সাথে কিতাবাতের চুক্তি করে, তখন সে কিতাবতের অবদানে নিজের উপার্জিত সম্পদের মালিক হতে থাকে। আর মুরতাদ হওয়ার দ্বারা কিতাবতের চুক্তি বাতিল হয়ে যায় না। অতএব, কিতাবতের বলে উপার্জিত সম্পদও বাতিল হবে না। বরং তা তার মালিকানাভুক্ত হবে এবং এতে তার তসররুফ কার্যকর হবে

বিষয়টি স্পষ্ট করার উদ্দেশ্যে তিনি আরো বলেন, দাসত্ব ও রিদ্দাত উভয় বিষয়ই মানুষের তসররুফ কার্যকরী হওয়ার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে থাকে। তবে প্রতিবন্ধক হিসাবে দুটির মধ্যে বেশি শক্তিশালী হলো দাসত্ব। আর তুলনামূলক কম শক্তিশালী হলো রিদ্দাত বা মুরতাদ হওয়া। কেননা মুরতাদ ব্যক্তির কিছু তসররুফ মুরতাদ হওয়া সত্ত্বেও সব সময় কার্যকর হয়। যেমন নিজ স্ত্রীকে তালাক দেওয়া, দাসীকে উম্মে ওয়ালাদ বানানো ইত্যাদি। পক্ষান্তরে দাসের কোনো তসররুফই কার্যকরী হয় না। এর দ্বারা বুঝা গেল, দাসত্ব শক্তিশালী প্রতিবন্ধক। আর রিদ্দাত কম শক্তিশালী প্রতিবন্ধক। আর মুকাতাব ব্যক্তির তসররুফ, উপার্জন যেহেতু দাসত্ব (যা কিনা শক্তিশালী প্রতিবন্ধক) দ্বারা স্থগিত হয় না। সেহেতু রিদ্দাত (যা কম শক্তিশালী) দ্বারাও স্থগিত হবে না। বরং উত্তমরূপে স্থগিত হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَاِذَا ارْتَدَّ الرَّجُلُ وَامْرَاَتُهُ وَالْعِيَاذُ بِاللّٰهِ وَلَحِقَا بِدَارِ الْحَرْبِ فَحَبِلَتْ الْمَرْاَةُ فِيْ دَارِ الْحَرْبِ وَوَلَدَتْ وَلَدًا وَوُلِدَ لِوَلَدِهِمَا وَلَدٌ فَظُهِرَ عَلَيْهِمْ جَمِيْعًا فَالْوَلَدَانِ فَيْءٌ: لِاَنَّ الْمُرْتَدَّةَ تُسْتَرَقُّ فَيَتْبَعُهَا وَلَدُهَا، وَيُجْبَرُ الْوَلَدُ الْاَوَّلُ عَلَى الْاِسْلَامِ، وَلَا يُجْبَرُ وَلَدُ الْوَلَدِ . وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رح) اَنَّهُ يُجْبَرُ تَبَعًا لِلْجَدِّ، وَاَصْلُهُ التَّبَعِيَّةُ فِي الْاِسْلَامِ وَهِيَ رَابِعَةُ اَرْبَعَةِ مَسَائِلَ كُلُّهَا عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ . وَالثَّانِيَةُ صَدَقَةُ الْفِطْرِ . وَالثَّالِثَةُ جَرُّ الْوَلَاءِ . وَالْاُخْرٰى الْوَصِيَّةُ لِلْقَرَابَةِ .

অনুবাদ : আল্লাহ না করুন, যদি কোনো স্বামী স্ত্রী উভয়ই মুরতাদ হয়ে দারুল হরবে চলে যায়, আর সেখানে স্ত্রী গর্ভবতী হয়ে সন্তান প্রসব করে কিংবা তাদের সন্তানের কোনো সন্তান জন্ম গ্রহণ করে অতঃপর তাদের সবার উপর মুসলমানদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে সমস্ত সন্তান গনিমত হিসাবে গণ্য হবে। কেননা মুরতাদ নারীকে তো দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করা হবে। সুতরাং তার সন্তানও তার অনুবর্তী হবে। আর তাদের প্রত্যক্ষ সন্তানকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হবে। কিন্তু সন্তানের সন্তানকে বাধ্য করা হবে না।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে হাসান বিন যিয়াদ বর্ণনা করেছেন যে, তাকেও দাদার অনুবর্তী বাধ্য করা হবে। এর মূল সূত্র হচ্ছে ইসলামের ক্ষেত্রে অনুবর্তী হওয়া। এ হলো সে চার মাসআলার একটি যেগুলোর সবকটি মাসআলাই দু মতে বিভক্ত। দ্বিতীয় হলো– সদাকায়ে ফিতর। তৃতীয় হলো– ওয়ালার সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া। চতুর্থ হলো নিকটাত্মীয়ের জন্য অসিয়ত করা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরে বর্ণিত মাসআলার সারমর্ম এই যে, কোনো স্বামী স্ত্রী উভয় মুরতাদ হয়ে দারুল হরবে চলে গেল, অতঃপর দারুল হরবে স্ত্রী গর্ভবতী হলো কিংবা দারুল ইসলামে থাকা অবস্থায়ই গর্ভবতী হলো, এরপর দারুল হরবে যাওয়ার পর সন্তান প্রসব করল। সন্তান বড় হয়ে বিবাহ শাদি করার পর সন্তানেরও সন্তান হলো। এরপর মুজাহিদগণ দারুল হরব আক্রমণ করে বিজয় লাভ করে এবং সেই মুরতাদ স্বামী স্ত্রী, তাদের সন্তান, সন্তানের সন্তান সকলকে বন্দী করে নিয়ে আসে। এমতাবস্থায় মুরতাদ দম্পতির সন্তানও সন্তানের সন্তান উভয়ই গনিমত বলে গণ্য হবে। কেননা সন্তান স্বাধীন পরাধীন হওয়ার ক্ষেত্রে মায়ের অনুবর্তী হয়ে থাকে। আর আলোচ্য সন্তানের মা মুরতাদ অবস্থায় বন্দী হওয়ার কারণে দাসী বলে গণ্য হবে। তাই তার সন্তানও গোলাম বলে গণ্য হবে।

অতঃপর পিতার অনুগামী হিসাবে সন্তানকে ইসলাম গ্রহণের জন্য বাধ্য করা হবে। কিন্তু সন্তানের সন্তানকে তথা নাতীকে বাধ্য করা যাবে না যাহিরের রেওয়ায়েত অনুসারে। আর হাসান ইবনে যিয়াদের বর্ণনা অনুসারে নাতীকেও ইসলাম গ্রহণের জন্য বাধ্য করা হবে দাদার অনুগামী হিসাবে।

গ্রন্থকার বলেন, দাদা পিতার স্থলবর্তী হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে দুরকম মত রয়েছে। এরূপ মোট চারটি মাসআলা আছে। আলোচ্য মাসআলাটি সেই চার মাসআলার অন্যতম। কেননা এ মাসআলায়ও দাদা পিতার স্থলবর্তী হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে দুরকম মত বর্ণিত আছে : যাহিরে রেওয়ায়েত অনুযায়ী দাদা পিতার স্থলবর্তী হবে না। তাই পিতার

https://e-ilm.weebly.com/

অনুগামী হিসাবে সন্তানকে ইসলাম গ্রহণের জন্য বাধ্য করা হবে। কিন্তু দাদার অনুগামী বানিয়ে নাতীকে ইসলাম গ্রহণের জন্য বাধ্য করা যাবে না। পক্ষান্তরে হাসান ইবনে যিয়াদের বর্ণনা অনুযায়ী দাদা পিতার স্থলবর্তী হবে। সে হিসাবে দাদার অনুগামী করে নাতীকেও ইসলাম গ্রহণের জন্য বাধ্য করা হবে।

পূর্বোক্ত চার মাসআলার মধ্যে দ্বিতীয় মাসআলা হলো সদকায়ে ফিতিরের মাসআলা। অর্থাৎ কোনো নাবালেগ সন্তানের পিতা দরিদ্র হওয়ার কারণে যদি সদকায়ে ফিতির আদায় করতে না পারে, তাহলে উক্ত সন্তানের দাদা তার সদকায়ে ফিতির আদায় করবে কি না এ ব্যাপারে দুটি বর্ণনা রয়েছে।

যাহিরে রেওয়ায়েতে অনুসারে দাদা পিতার স্থলবর্তী নয়। তাই দাদা উক্ত সন্তানের সদকায়ে ফিতির আদায় করবে না। পক্ষান্তরে হাসান ইবনে যিয়াদের বর্ণনা অনুসারে দাদা পিতার স্থলবর্তী। বিধায় পিতা উক্ত সন্তানের সদকায়ে ফিতির আদায় করতে অক্ষম হওয়ার কারণে দাদা তা আদায় করে দিবে।

চার মাসআলার মধ্যে তৃতীয় মাসআলা হলো ওয়ালা সম্পর্কিত মাসআলা। তা এই যে, কোনো আজাদকৃত দাসী এক গোলামের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলো। অতঃপর তাদের এক সন্তান হলো। এমতাবস্থায় উক্ত সন্তান তার মায়ের অনুগামী হিসাবে স্বাধীন হবে। এবং তার ওয়ালা তার মায়ের আজাদকারী মনিব পাবে। কিন্তু যদি উক্ত সন্তানের পিতা আজাদ হয়ে যায়, তাহলে তার ওয়ালা পিতার মনিব পাবে। আর পিতার স্থলে যদি দাদা আজাদ হয়, তাহলে দাদা পিতার মতো ওয়ালা টেনে আনতে পারবে কিনা, অর্থাৎ দাদার আজাদকারী মনিব ওয়ালা পাবে কিনা এসম্পর্কে দুরকম বর্ণনা রয়েছে। যাহিরে রেওয়ায়েত অনুসারে দাদা পিতার মতো নাতীর ওয়ালা টেনে আনতে পারবে না। হাসান ইবনে যিয়াদের বর্ণনা অনুযায়ী পিতা যেমন সন্তানের ওয়ালা টেনে আনে, দাদাও তেমনি নাতির ওয়ালা টেনে আনবে।

চার মাসআলার মধ্যে চতুর্থ মাসআলা হলো, নিকটাত্মীয়দের জন্য অসিয়ত সম্পর্কিত মাসআলা। তা এই যে, কোনো ব্যক্তি যদি তার নিকটাত্মীয়দের কোনো অসিয়ত করে। তাহলে অসিয়তকারীর পিতা উক্ত অসিয়তের অন্তর্ভুক্ত হবে না। কারণ পিতা নিকটাত্মীয় নয়। বরং সে নিকটাত্মীয়ের চেয়েও অধিক নিকটতম। কিন্তু দাদা উক্ত অসিয়তের অন্তর্ভুক্ত হবে কিনা এ নিয়ে দুই বর্ণনা রয়েছে। যাহিরে রেওয়ায়েত অনুসারে দাদা পিতার স্থলবর্তী নয়, বিধায় সে অসিয়তের অন্তর্ভুক্ত হবে আর হাসান ইবনে যিয়াদের বর্ণনা অনুযায়ী দাদা পিতার স্থলবর্তী বিধায় দাদা উক্ত অসিয়তের অন্তর্ভুক্ত হবে না, যেমন পিতা অন্তর্ভুক্ত হয় না।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ وَارْتِدَادُ الصَّبِيِّ الَّذِيْ يَعْقِلُ ارْتِدَادٌ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ، وَيُجْبَرُ عَلَى الْاِسْلَامِ وَلَا يُقْتَلُ، وَاِسْلَامُهُ اِسْلَامٌ لَا يَرِثُ اَبَوَيْهِ اِنْ كَانَا كَافِرَيْنِ . وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ (رح) : ارْتِدَادُهُ لَيْسَ بِارْتِدَادٍ وَاِسْلَامُهُ اِسْلَامٌ وَقَالَ زُفَرُ وَالشَّافِعِيُّ : اِسْلَامُهُ لَيْسَ بِاِسْلَامٍ وَارْتِدَادُهُ لَيْسَ بِارْتِدَادٍ . لَهُمَا فِي الْاِسْلَامِ اَنَّهُ تَبَعٌ لِاَبَوَيْهِ فِيْهِ فَلَا يُجْعَلُ اَصْلًا . وَلِاَنَّهُ يَلْزَمُهُ اَحْكَامًا تَشُوْبُهَا الْمَضَرَّةُ فَلَا يُؤَهَّلُ لَهُ . وَلَنَا فِيْهِ اَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَسْلَمَ فِيْ صِبَاهُ، وَصَحَّحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِسْلَامَهُ، وَافْتِخَارُهُ بِذٰلِكَ مَشْهُوْرٌ . وَلِاَنَّهُ اَتٰى بِحَقِيْقَةِ الْاِسْلَامِ وَهِيَ التَّصْدِيْقُ وَالْاِقْرَارُ مَعَهُ؛ لِاَنَّ الْاِقْرَارَ عَنْ طَوْعٍ دَلِيْلٌ عَلٰى اِعْتِقَادِهِ عَلٰى مَا عُرِفَ وَالْحَقَائِقُ لَا تُرَدُّ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ سَعَادَةٌ اَبَدِيَّةٌ وَنَجَاةٌ عُقْبَاوِيَّةٌ، وَهِيَ مِنْ اَجَلِّ الْمَنَافِعِ وَهُوَ الْحُكْمُ الْاَصْلِيُّ، ثُمَّ يُبْتَنٰى عَلَيْهِ غَيْرُهَا فَلَا يُبَالِيْ بِشَوْبِهِ . وَلَهُمْ فِي الرِّدَّةِ اَنَّهَا مَضَرَّةٌ مَحْضَةٌ، بِخِلَافِ الْاِسْلَامِ عَلٰى اَصْلِ اَبِيْ يُوْسُفَ؛ لِاَنَّهُ تَعَلَّقَ بِهِ اَعْلَى الْمَنَافِعِ عَلٰى مَا مَرَّ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, বোধ সম্পন্ন বালকের ধর্মত্যাগ ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে ধর্মত্যাগরূপে বিবেচ্য। সুতরাং তাকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হবে এবং (গ্রহণ না করলে) হত্যা করা হবে না। অদ্রূপ তার ইসলাম গ্রহণও বিবেচ্য হবে। সুতরাং তার পিতা মাতা কাফের হলে সে তাদের উত্তরাধিকারী হবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, তার ধর্মত্যাগ রিদ্দাতরূপে বিবেচ্য নয়। তবে তার ইসলাম গ্রহণ বিবেচ্য হবে। ইমাম যুফার (র.) ও ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, তার ইসলাম গ্রহণ ও ধর্মত্যাগ কোনোটাই বিবেচ্য নয়।

ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে ইমাম যুফার ও ইমাম শাফেয়ী (র.) এর দলিল এই যে, ধর্মমতের দিক থেকে সে তার পিতামাতার অনুবর্তী। সুতরাং তাকে মূল ও স্বতন্ত্র ধরা হবে না। তা ছাড়া এক্ষেত্রে তার উপর এমন কিছু আহকাম ও বিধান আরোপিত হবে, যাতে ক্ষতি মিশ্রিত আছে। সুতরাং তাকে ইসলাম গ্রহণের উপযোগী গণ্য করা হবে না।

ইসলাম গ্রহণ প্রসঙ্গে আমাদের দলিল এই যে, হযরত আলী (রা.) বালক অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং নবী করীম ﷺ তাকে বৈধতা দান করেছেন। এসম্পর্কে হযরত আলী (রা.) এর গর্ব সুপ্রসিদ্ধ। তাছাড়া এই কারণে যে, ইসলামের হাকীকত তথা অন্তরের বিশ্বাস এবং সেই সাথে মৌখিক স্বীকৃতি সে সম্পন্ন করেছে। আর যথা (স্থানে এটা আলোচিত হয়েছে যে, স্বেচ্ছা স্বীকৃতি তার বিশ্বাসেরই প্রমাণ। আর কোনো হাকীকত (ও বাস্তব সত্য) প্রত্যাখ্যান যোগ্য নয়। (কেননা প্রত্যাখান দ্বারা তা অস্তিত্বহীন হবে না)

আর ইসলাম গ্রহণের সাথে যে বিষয়ের সম্পর্ক, সেটা হলো সৌভাগ্য ও পরকালীন মুক্তি। যা সর্বশ্রেষ্ঠ উপকারিতা। এবং এটাই হলে ইসলামের মূল হুকুম বা ফলাফল। অতঃপর অন্যান্য হুকুম ও ফলাফল তার উপর নির্ভর করে। সুতরাং তাতে ক্ষতির মিশ্রণের বিষয়টি বিবেচনা করা হবে না। ধর্মত্যাগ প্রসঙ্গে ইমাম আবূ ইউসুফ, যুফার ও শাফেয়ী (র.) এর দলিল এই যে, এ হলো নিরেট ক্ষতি। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) এর মূলনীতি অনুয়ায়ী ইসলামের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা (এই মাত্র) আলোচনা অতিবাহিত হয়েছে যে, তার সাথে সর্বোচ্চ লাভ সম্পৃক্ত আছে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَلِأَبِي حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ فِيْهَا أَنَّهَا مَوْجُوْدَةٌ حَقِيْقَةً، وَلَا مَرَدَّ لِلْحَقِيْقَةِ كَمَا قُلْنَا فِي الْإِسْلَامِ، إِلَّا أَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى الْإِسْلَامِ لِمَا فِيْهِ مِنَ النَّفْعِ لَهُ، وَلَا يُقْتَلُ؛ لِأَنَّهُ عُقُوْبَةٌ، وَالْعُقُوْبَاتُ مَوْضُوْعَةٌ عَنِ الصِّبْيَانِ مَرْحَمَةً عَلَيْهِمْ . وَهٰذَا فِي الصَّبِيِّ الَّذِي يَعْقِلُ . وَمَنْ لَا يَعْقِلُ مِنَ الصِّبْيَانِ لَا يَصِحُّ ارْتِدَادُهُ؛ لِأَنَّ إِقْرَارَهُ لَا يَدُلُّ عَلَى تَغَيُّرِ الْعَقِيْدَةِ، وَكَذَا الْمَجْنُوْنُ وَالسَّكْرَانُ الَّذِيْ لَا يَعْقِلُ .

অনুবাদ : রিদ্দাতের ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল এই যে, তা একটি বাস্তব সত্যরূপে অস্তিত্ব লাভ করেছে। আর বাস্তব সত্য প্রত্যাখানযোগ্য নয়। যেমনটি ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে আমরা বলে এসেছি। তবে ইসলাম গ্রহণে তাকে বাধ্য করা হবে। কেননা তাতে কল্যাণ রয়েছে। কিন্তু ত্যাগ করা হবে না। কেননা এ হলো শাস্তি। আর বালকদের প্রতি করুণাবশত: যাবতীয় শাস্তি তাদের থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে।

এ মতপার্থক্য হলো বোধ সম্পূর্ণ বালকের ক্ষেত্রে। পক্ষান্তরে যে বালকের বোধশক্তি গড়ে উঠেনি তার ধর্মত্যাগ বিবেচ্য নয়। কেননা তার স্বীকারোক্তি আকীদা বিশ্বাস পরিবর্তন করার প্রমাণ নয়। বিকৃত মস্তিষ্ক, বুদ্ধিভ্রষ্ট মাতালও একই হুকুমভুক্ত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

নাবালেগ সন্তানের ইসলাম গ্রহণ এবং ধর্মত্যাগ গ্রহণযোগ্য হবে কিনা? এ নিয়ে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। এক্ষেত্রে তিনটি মাযহাব উপরিউক্ত মতনে দলিল সহ বর্ণিত হয়েছে।

১. ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে বোধসম্পন্ন নাবালেগ সন্তানের ইসলাম গ্রহণ এবং ধর্মত্যাগ উভয়ই গ্রহণযোগ্য।

২. ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) এর মতে বোধসম্পন্ন নাবালেগের ইসলাম গ্রহণযোগ্য কিন্তু ধর্মত্যাগ গ্রহণযোগ্য নয়।

৩. ইমাম যুফার (র.) ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে নাবালেগের ইসলাম গ্রহণ ও ধর্মত্যাগ কোনোটিই গ্রহণযোগ্য নয়।

এই এখতেলাফটি এভাবেও বর্ণনা করা যায় যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.) ইমাম মুহাম্মদ (র.) ইমাম আবূ ইউসুফ এর মতে নাবালেগের ইসলাম গ্রহণ বিবেচ্য। ইমাম যুফার (র.) ও ইমাম শাফেয়ী এর মতে নাবালেগের ইসলাম গ্রহণ বিবেচ্য নয়।

ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে নাবালেগের ধর্মত্যাগ বিবেচ্য। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ইমাম শাফেয়ী (র.) ও ইমাম যুফার (র.)-এর মতে নাবালেগের ধর্মত্যাগ বিবেচ্য নয়।

দলিল পর্ব : যারা বলেন, নাবালেগের ইসলাম গ্রহণযোগ্য নয় তাদের দলিল হলো-

ক. নাবালেগ সন্তান ধর্মের বিষয়ে তার পিতা মাতার অনুগামী। অতএব, তাকে পিতামাতার ধর্মের অনুগামী হিসাবেই বিবেচনা করা হবে। এক্ষেত্রে তাকে মূল বা স্বতন্ত্র ধরা হবে না। তাই তার ইসলাম গ্রহণ বিবেচ্য হবে না।

খ. ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে কিছু বিধান তার উপর আরোপিত হবে। যার মধ্যে তার জন্য ক্ষতি রয়েছে : যেমন, সে মুসলমান হলে কাফের পিতার উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হবে। অথচ নাবালেগ সন্তান উক্ত ক্ষতি বহনের উপযুক্ত নয় তাই তার ইসলাম গ্রহণ বিবেচ্য হবে না।

গ. শিশু যদি তালাক দেয় কিংবা কোনো কিছু ক্রয় করে বা বিক্রয় করে, তাহলে এসব ক্ষেত্রে তার কথা গ্রহণযোগ্য হয় না। অনুরূপভাবে ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রেও তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

যারা বলেন, শিশুর ইসলাম গ্রহণ বিবেচ্য, তাদের দলিল হলো (ক) হযরত আলী (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণ। এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পক্ষ থেকে স্বীকৃতি দান। একাধিক বর্ণনার আলোকে হযরত আলী (রা.) সাত কিংবা আট কিংবা দশ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। রাসূল ﷺ তার ইসলাম গ্রহণকে বৈধতা দিয়েছেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নাবালেগের ইসলাম গ্রহণ বিবেচ্য হবে। হযরত আলী (রা.) তার ইসলাম গ্রহণ নিয়ে রীতিমতো গর্ববোধ করতেন। তিনি বলতেন– سَبَقْتُكُمْ اِلَى الْاِسْلَامِ طُرًّا + صَبِيًّا مَا بَلَغْتُ اَوَانَ حِلْمِىْ

অর্থ : আমি তোমাদের সকলের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছি শৈশবকালে, যখন আমি যৌবনে পৌছিনি।

(খ) নাবালেগ সন্তান অন্তরের বিশ্বাস এবং মুখের স্বীকারোক্তির মাধ্যমে ইসলামের হাকিকত বা মূল বিষয় বাস্তবায়িত করেছে। অতএব, সে মুসলমান বলে গণ্যে হবে। কেননা স্বেচ্ছায় মৌখিক স্বীকারোক্তি প্রদান করাটাই অন্তরের বিশ্বাসের প্রমাণ। সুতরাং বিশ্বাস ও স্বীকারোক্তি উভয়ই তার থেকে পাওয়া গেল, যা ঈমান ইসলামের হাকিকত। আর এটা সর্বসম্মত কথা যে, হাকিকত প্রত্যাখ্যান করা যায় না। অতএব, আলোচ্য ক্ষেত্রেও তা প্রত্যাখ্যাত হবে না। বিধায় নাবালেগ সন্তান মুসলিম বলেই গণ্য হবে।

প্রতিপক্ষের জবাব : ইমাম যুফার ও ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছিলেন, ইসলাম গ্রহণের দ্বারা নাবালেগের উপর এমন কিছু বিধি বিধান আরোপিত হয় যার মধ্যে সন্তানের ক্ষতি রয়েছে, তাই নাবালেগের ইসলাম বিবেচ্য হবে না। এর জবাবে আহনাফ বলেন, ইসলাম গ্রহণের ফলে পরকালীন মুক্তি ও চিরস্থায়ী সফলতা অর্জন হবে, এবং এটাই ইসলাম গ্রহণের মূল উদ্দেশ্য ও সর্বাধিক বড় উপকার। অতএব, এটা অর্জন হওয়ার পর তার সাথে যদি কিছু ক্ষয়-ক্ষতি-মিশ্রিত হয়, তাহলে সেটা লক্ষণীয় নয়। কেননা বিভিন্ন তসররুফের ক্ষেত্রে উক্ত তসররুফের মূল ও প্রধান উদ্দেশ্য বা ফলাফলই লক্ষণীয় হয়ে থাকে। আনুসঙ্গিক বিষয়সমূহ লক্ষণীয় হয় না।

যারা বলেন, নাবালেগের রিদ্দাত বা ধর্মত্যাগ বিবেচ্য হবে না, তাদের দলিল : রিদ্দাত একটি নিরেট ক্ষতিকর বিষয়। এতে দুনিয়া আখেরাতের ক্ষতি ছাড়া কোনো লাভ নেই। অতএব, শিশুর পক্ষে এমন ক্ষতিকর একটি তসররুফ গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

যারা বলেন, নাবালেগের রিদ্দাত বিবেচ্য হবে, তাদের দলিল : তারা বলে, রিদ্দাতের হাকিকত যখন তার মধ্যে পাওয়া গেল, তখন তা অবশ্যই বিবেচ্য হবে। কেননা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে যে, হাকিকত এড়ানো যায় না। অতএব, নাবালেগ যদি বাস্তবিক পক্ষেই ইসলাম ত্যাগ করে, তাহলে সে মুরতাদ বলেই গণ্য হবে।

তবে কিয়াস অনুযায়ী মুরতাদের যে শাস্তি ছিল হত্যা, তা শিশুর উপর কার্যকর করা হবে না। কারণ হত্যা একটি কঠিন শাস্তি , শিশুর ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়। বরং ইস্তিহসান হিসাবে তাকে পুনরায় ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হবে। কারণ এতেই তার কল্যাণ নিহিত আছে।

উপরিউক্ত মতপার্থক্য কেবলই বোধ সম্পন্ন শিশুর ক্ষেত্রে। পক্ষান্তরে শিশু যদি বোধসম্পন্ন না হয়, তাহলে তার রিদ্দাত কারো মতেই বিবেচ্য নয়। কারণ বোধহীন শিশুর কথা, অন্তরের বিশ্বাস পরিবর্তন হওয়াকে নিশ্চিত করে না। এমনিভাবে পাগল এবং বুদ্ধিভ্রষ্ট মাতালের রিদ্দাতও বিবেচ্য নয়। কেননা এদের কথা ও অন্তরের বিশ্বাস পরিবর্তন হওয়াকে বুঝায় না।

হযরত আলী (রা.) -এর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কিত কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় : উরওয়াহ থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত আলী (রা.) যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন তার বয়স ছিল সাত কিংবা আট বছর। ইবনে সা'আদ মুজাহিদের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, ইসলাম গ্রহণের সময় হযরত আলী (রা.) এর বয়স ছিল দশ বৎসর। কোনো কোনো বর্ণনায় নয় বৎসরের কথাও উল্লেখ আছে। তবে দশ বৎসরের বর্ণনাটিই প্রাধান্যযোগ্য।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ الْبُغَاةِ

পরিচ্ছেদ : বিদ্রোহী দল প্রসঙ্গ

بُغَاةٌ শব্দটি বহুবচন, একবচন بَاغٍ । অর্থ হলো– বিদ্রোহী, মুসলিম শাসকের আনুগত্য পরিহারকারী। প্রকাশ থাকে যে, যারা ন্যায়পন্থি মুসলিম শাসকের আনুগত্য অন্যায়ভাবে পরিহার করে, তাদেরকে বাগী বা বিদ্রোহী বলা হয়।

যখন মুসলমানরা সকলের ঐকমত অনুসারে কাউকে ইমাম বানিয়ে নেয় এবং সকলেই তার ছায়াতলে এসে যায়, এরপর যদি কিছু লোক উক্ত ইমামের আনুগত্য ত্যাগ করে, তাহলে দেখতে হবে, এমনটি কেন ঘটল। -এর পিছনে কারণ কি? যদি বাস্তবিক পক্ষেই ইমাম তাদের উপর জুলুম করে থাকে এবং এ কারণেই তারা বিদ্রোহী হয়ে থাকে, তাহলে তাদের কে বাগী বলা যাবে না। বরং ইমামের কর্তব্য হবে জুলুম ত্যাগ করে তাদের প্রতি ইনসাফ করা। আর অন্যান্য মুসলমানের কর্তব্য হবে তাদের কে সাহায্য না করা এবং ইমামকেও সাহায্য না করা। পক্ষান্তরে যদি শরিয়তের দৃষ্টিতে ইমাম কোনোরূপ জুলুম না করে থাকে, বরং তারাই কেবল নিজেদের হক দাবি করে বিদ্রোহ করে থাকে, তাহলে তাদের কে বাগী বলে আখ্যায়িত করা হবে। তখন সাধারণ মুসলমানদের কর্তব্য হবে, ইমামের পক্ষ হয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ঘুমন্ত ফিতনাকে জাগিয়ে তুলে (শান্ত পরিবেশকে অশান্ত করে) তার উপর আল্লাহর লা'নত।

কতিপয় মাশায়েখ বলেছেন, যদি হযরত আলী (র.) না হতেন, তাহলে আহলে কেবলার সাথে যে যুদ্ধ করতে হয়, সেটা আমরা জানতে পারতাম না। যারা হযরত আলী (র.) -এর সাথে ছিল, তারা ছিল ন্যায়পন্থি। আর যারা তার বিপক্ষে ছিল, তার ছিল বাগী।

https://e-ilm.weebly.com/

وَاِذَا تَغَلَّبَ قَوْمٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ عَلٰى بَلَدٍ وَخَرَجُوْا مِنْ طَاعَةِ الْاِمَامِ دَعَاهُمْ اِلَى الْعَوْدِ اِلَى الْجَمَاعَةِ وَكَشَفَ عَنْ شُبْهَتِهِمْ؛ لِاَنَّ عَلِيًّا فَعَلَ كَذٰلِكَ بِاَهْلِ حَرُوْرَاءَ قَبْلَ قِتَالِهِمْ، وَلِاَنَّهٗ اَهْوَنُ الْاَمْرَيْنِ . وَلَعَلَّ الشَّرَّ يَنْدَفِعُ بِهٖ فَيُبْدَاُ بِهٖ .

অনুবাদ : মুসলমানদের কোনো দল যদি কোনো শহর অধিকার করে নেয় এবং শাসকের আনুগত্য থেকে বের হয়ে যায়, তাহলে শাসক "জামাতে" ফিরে আসার জন্য তাদের কে আহবান জানাবেন এবং তাদের সন্দেহ নিরসন করবেন।

কেননা হযরত আলী (রা.) কূফার সন্নিকটবর্তী হারুরাবাসীদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করার পূর্বে এমন করেছিলেন। তা ছাড়া এই কারণে যে, এ হলো দুই বিষয়ের মধ্যে লঘুতর।

আর আশা করা যায়-এর দ্বারাই অনিষ্ট দূর হয়ে যাবে। সুতরাং তা দ্বারাই পদক্ষেপ শুরু করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মুসলিম শাসক বিদ্রোহীদের সাথে প্রথমেই যুদ্ধ শুরু করবে না। বরং তাদের কে বুঝাবে এবং চিন্তা ভাবনা করার জন্য অবকাশ দিবে। হযরত আলী (রা.) হারুরাবাসীদের সাথে এরূপই করেছিলেন। হরুরা শব্দটির আরবিতে দুভাবে পড়া যায় ১. حروراء মদ্দসহ। ২. حرورا মদ্দ ছাড়া, এটি কূফা নগরীর নিকটবর্তী একটি গ্রামের নাম। যেখানে খারেজীদের সমাবেশ ঘটেছিল।

এ সম্পর্কিত বিস্তারিত ঘটনা এই যে, হযরত আলী (র.) এবং হযরত মুআবিয়া (রা.)-এর মাঝে মীমাংসার জন্য যখন দুজন ব্যক্তিকে হাকাম ফয়সাল বানানো হয়, তখন হযরত আলী (র.)-এর দলের কিছু লোক দল ছেড়ে চলে যায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এ লোকেরা যখন হারুরা নামক এলাকায় গিয়ে একত্রিত হলো, তখন আমি বললাম, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি আগামী ওয়াক্তের নামাজ একটু বিলম্ব করে পড়ার এলান করে দিন। এ সুযোগে আমি ওদের (খারেজীদের) সাথে একটু কথা বলে দেখি। হতে পারে তাদের বুঝে আসবে। হযরত আলী (রা.) বললেন, আমার ভয় হয়, তারা তোমার কোনো ক্ষতি করে কিনা! হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন– না, এ ধরনের কোনো ভয় নেই। এরপর আমি তাদের কাছে গিয়ে পৌছলাম। আমাকে দেখে তারা বলল, হে ইবনে আব্বাস! আপনি কেন তাশরিফ নিয়ে এসেছেন? আমি বললাম, আমি রাসূলের সাহাবী, রাসূলের চাচাত ভাই ও রাসূলের জামাতার পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট এসেছি। একথা শুনে তাদের কিছু লোক আমার বক্তব্য শুনার জন্য একপাশে একত্রিত হলো। তখন আমি তাদের কে প্রশ্ন করলাম, তোমরা রাসূলের সাহাবী ও চাচাত ভাই হযরত আলী (রা.) -এর মধ্যে কি দোষ পেয়েছ? যে কারণে তোমরা তাঁর দল ত্যাগ করে চলে এসেছ? তোমরা তোমাদের অভিযোগ খুলে বলো, আমি তোমাদেরকে উপযুক্ত জবাব দেওয়ার চেষ্টা করব। তখন তারা বলল, অভিযোগ তিনটি।

১. হযরত আলী তাঁর মাঝে ও মুআবিয়া -এর মাঝে ফয়সালা করার জন্য আবূ মূসা আশআরী কে হাকাম তথা সালিশ নির্ধারণ করেছেন। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ফয়সালা একমাত্র আল্লাহর।

২. হযরত আলী, তিনি মুআবিয়া বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করে বিজয়ী হয়েছেন। কিন্তু তাদের স্ত্রী-সন্তানদেরকে বন্দী করেননি। তাদের সম্পদ ও লুণ্ঠন করেননি। এখন প্রশ্ন হলো, যাদের সাথে আমাদের যুদ্ধ হলো, তারা যদি কাফের হয়ে থাকে, তাহলে তাদের জান মাল আমাদের জন্য হালাল হওয়া উচিত। আর যদি তারা মুসলমান হয়ে থাকে, তাহলে তো তাদের সাথে যুদ্ধ করা আমাদের জন্য হারাম হয়েছে।

৩. হযরত আলী (রা.) ঘোষণা পত্রে নিজ নাম থেকে আমীরুল মুমিনীন শব্দ মুছে ফেলেছেন। অতএব, যদি আমীরুল মুমিনীন না হয়ে থাকেন, তাহলে অবশ্যই -এর বিপরীত তিনি আমীরুল কাফিরীন। (কাফেরদের সরদার) নাউযুবিল্লাহ!

https://e-ilm.weebly.com/

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, তাদের অভিযোগ শুনার পর আমি বললাম, যদি আমি তোমাদের এসব অভিযোগ কুরআন ও হাদীসের আলোকে জবাব দিয়ে নিরসন করতে পারি তাহলে কি তোমরা নিজেদের মত পরিহার করবে? বিরোধিতা ত্যাগ করবে? তারা উত্তর দিল, আল্লাহর কসম! অবশ্যই আমরা বিরোধিতা ত্যাগ করব।

তখন আমি তাদের প্রথম অভিযোগের উত্তরে বললাম, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- يحكم به ذوى عدل منكم অর্থাৎ ইহরাম অবস্থায় কেউ কোনো জীব শিকার করলে, তার মূল্য নির্ধারণের জন্য আল্লাহ তা'আলা ন্যায়পন্থি বিশ্বস্ত দুজন মুসলমানের উপর জিম্মাদারী দিয়েছেন। অনুরূপ স্ত্রীদের বিষয়ে ও আল্লাহ তা'আলা সালিশ নির্ধারণের কথা বলেছেন। ইরশাদ করেছেন- فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا অর্থাৎ তোমরা স্বামীর পক্ষ থেকে একজন সালিশ এবং স্ত্রীর পক্ষ থেকে একজন সালিশ পাঠাও।

অতএব, আমি তোমাদেরকে কসম করে বলছি, ইহরাম অবস্থায় শিকারকৃত একটি খরগোশের মূল্য নির্ধারণের জন্য যদি সালিশের প্রয়োজন হয়, তাহলে মুসলমানদের জান মালের প্রশ্নে সালিশ নির্ধারণ করা আরো অনেক বেশি প্রয়োজনীয় এবং যুক্তিসিদ্ধ।

এখন তোমরা বল, আমি তোমাদের অভিযোগ নিরসন করতে পেরেছি কিনা? তারা বলল, হ্যাঁ, অবশ্যই পেরেছেন।

তোমাদের দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল, যাদের সাথে যুদ্ধ করা হলো তাদের কে গোলাম বাঁদী বানানো হলো না কেন? -এর উত্তরে আমি বলব, হযরত আলী (রা.) কূফায় শুধু হযরত আয়েশা (র.) ও তার সহচরদের সাথে যুদ্ধ করেছেন। অতএব, তোমরাই বলো, উম্মতের জননী আয়েশা (রা.)-কে বাঁদী বানানো এবং তাঁর সাথে বাঁদীর মতো আচরণ করা কি তোমরা হালাল মনে কর? যতি তোমরা তা হালাল মনে কর, তাহলে তোমরা কাফের। এখন বলো, এ প্রশ্নেরও উপযুক্ত উত্তর আমি দিতে পারলাম কি না? তার বলল, হ্যাঁ, আপনি সঠিক উত্তর দিয়েছেন। যুক্তিসঙ্গত উত্তর দিয়েছেন।

তোমাদের তৃতীয় আপত্তি হলো হযরত আলী তার নামের পিছন থেকে আমীরুল মুমিনীন শব্দ মুছে ফেলেছে, তাই সে আমীরুল কাফিরীন।

এর উত্তরে বলব, হযরত রাসূল ﷺ যখন হুদায়বিয়ার সন্ধি পত্র লিখেন, তখন সেখানে নিজ নামের পরে রাসূলুল্লাহ শব্দটি লিখেছিলেন, অর্থাৎ এরূপ লিখেছিলেন, যে, مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ কিন্তু কুরাইশের লোকেরা আপত্তি করে বলল, আমরা যদি তোমাকে রাসূলুল্লাহ বলেই জানতাম, তাহলে তো কা'বায় যেতে বাঁধা দিতাম না। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, رَسُوْلُ اللهِ শব্দ মুছে ফেল এবং তার স্থলে مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ লিখ। লক্ষণীয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আলী অপেক্ষা বহু গুণে শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তা সত্ত্বেও তিনি নিজ নাম থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ শব্দ মুছে ফেলেছেন এবং একারণে তিনি রিসালাত হারিয়ে ফেলেন নি।

এখন তোমরা বলো, আমি তোমাদের এ প্রশ্নেরও সঠিক জাবাব দিতে পারলাম কিনা? তারা বলল, হ্যাঁ, আপনি সঠিক জবাব দিয়েছেন। আমরা সন্দেহ মুক্ত হয়েছি। অতঃপর ছয় হাজার বিদ্রোহীর মধ্যে থেকে দুই হাজার বিদ্রোহী নিজের মত ত্যাগ করে, তওবা করে আমার সাথে চলে আসে। আবশিষ্ট লোকেরা নিজেদের হঠকারিতার উপর অটল থাকে এবং শেষ পর্যন্ত তাদের কে হত্যা করা হয়। এ ঘটনাটি ইমাম নাসায়ী ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, আব্দুর রাযযাক, তাবারানী, হাকেম প্রমুখ বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, وانْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا .... الخ মুমিনদের দুটি দল যদি পরস্পর খুনাখুনি করে, ...। ইমাম বুখারী বলেন, পরস্পর খুনাখুনি করা সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা উভয় দলকে মুমিন বলে আখ্যায়িত করেছেন। খারেজীরা যে বলে খুনাখুনি করলে মুসলমান কাফের হয়ে যায় একথা মোটেও ঠিক নয়। ভুল এবং প্রত্যাখ্যানযোগ্য।

আল্লাহ তা'আলা বাগীদের কথা স্বয়ং কুরআনে উল্লেখ করেছেন এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বলেছেন। যতক্ষণ না তারা হুকমে এলাহীর দিকে ফিরে আসে। অতএব, যতক্ষণ তারা ইমামের আনুগত্য গ্রহণ না করবে ততক্ষণ তারা বাগী বা বিদ্রোহী বলে পরিগণিত হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَلَا يَبْدَأُ بِقِتَالٍ حَتّٰى يَبْدَءُوْهُ، فَإِنْ بَدَءُوْهُ قَاتَلَهُمْ حَتّٰى يُفَرِّقَ جَمْعَهُمْ قَالَ الْعَبْدُ الضَّعِيْفُ : هٰكَذَا ذَكَرَهُ الْقُدُوْرِيُّ فِيْ مُخْتَصَرِهِ . وَذَكَرَ الْإِمَامُ الْمَعْرُوْفُ بِخُوَاهَرْ زَادَهْ أَنَّ عِنْدَنَا يَجُوْزُ أَنْ يَبْدَأَ بِقِتَالِهِمْ إِذَا تَعَسْكَرُوْا وَاجْتَمَعُوْا . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا يَجُوْزُ حَتّٰى يَبْدَءُوْا بِالْقِتَالِ حَقِيْقَةً؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوْزُ قَتْلُ الْمُسْلِمِ إِلَّا دَفْعًا وَهُمْ مُسْلِمُوْنَ، بِخِلَافِ الْكَافِرِ؛ لِأَنَّ نَفْسَ الْكُفْرِ مُبِيْحٌ عِنْدَهُ . وَلَنَا أَنَّ الْحُكْمَ يُدَارُ عَلَى الدَّلِيْلِ وَهُوَ الْاِجْتِمَاعُ وَالْاِمْتِنَاعُ، وَهٰذَا؛ لِأَنَّهُ لَوْ اِنْتَظَرَ الْإِمَامُ حَقِيْقَةَ قِتَالِهِمْ رُبَّمَا لَا يُمْكِنُهُ الدَّفْعُ فَيُدَارُ عَلَى الدَّلِيْلِ ضَرُوْرَةَ دَفْعِ شَرِّهِمْ، وَإِذَا بَلَغَهُ أَنَّهُمْ يَشْتَرُوْنَ السِّلَاحَ وَيَتَأَهَّبُوْنَ لِلْقِتَالِ يَنْبَغِي أَنْ يَأْخُذَهُمْ وَيَحْبِسَهُمْ حَتّٰى يُقْلِعُوْا عَنْ ذٰلِكَ وَيُحْدِثُوا تَوْبَةً دَفْعًا لِلشَّرِّ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ. وَالْمَرْوِيُّ عَنْ أَبِيْ حَنِيْفَةَ مِنْ لُزُوْمِ الْبَيْتِ مَحْمُوْلٌ عَلٰى حَالِ عَدَمِ الْإِمَامِ، أَمَّا إِعَانَةُ الْإِمَامِ الْحَقِّ فَمِنَ الْوَاجِبِ عِنْدَ الْغَنَاءِ وَالْقُدْرَةِ .

অনুবাদ : আর শাসক লড়াই শুরু করবে না যতক্ষণ না তারা শুরু করে, তাহলে শাসক তাদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করবেন। যতক্ষণ না তাদের গোষ্ঠী ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়।

অধম বান্দা বলছে, আল মুখতাসার কিতাবে ইমাম কুদূরী (র.) এমনই উল্লেখ করেছেন।

পক্ষান্তরে খাহার যাদাহ নামে প্রসিদ্ধ ইমাম বলেন, বিদ্রোহী দল যদি সৈন্য সমাবেশ ঘটায় এবং সংঘবদ্ধ হয় তাহলে আমাদের মতে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করা জায়েজ।

আর ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, তারা বাস্তবত লড়াই শুরু না করা পর্যন্ত (ইমামের লড়াই শুরু করা) জায়েজ হবে না। কেননা প্রতিরোধের প্রয়োজন ছাড়া মুসলমানকে হত্যা করা জায়েজ নয়। আর বিদ্রোহীরা মুসলমান। কাফেরের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা তার মতে স্বয়ং কুফরই হত্যাকে বৈধতা দান করে।

আমাদরে দলিল এই যে, এখানে হুকুম বা বিধান আবর্তিত হবে (লড়াইয়ের) প্রমাণের উপর, আর তা হচ্ছে সংঘবদ্ধ হওয়া এবং আনুগত্য থেকে বিরত থাকা।

এটা এজন্য যে, শাসক যদি তাদের পক্ষ থেকে বাস্তব লড়াই শুরু হওয়ার অপেক্ষা করেন, তাহলে হয়তো তাদের প্রতিরোধ করা তার পক্ষে সম্ভব হবে না।

সুতরাং তাদের অনিষ্ট রোধ করার অনিবার্য প্রয়োজনে, প্রমাণের উপরই বিধান আবর্তিত হবে।

যদি শাসকের কাছে এমর্মে সংবাদ আসে যে, বিদ্রোহীরা অস্ত্র ক্রয় করেছে এবং লড়াইয়ের প্রস্তুতি গ্রহণ করছে তাহলে যথা সম্ভব অনিষ্ট রোধ করার স্বার্থে তার কর্তব্য হলো তাদের ধরপাকড় ও বন্দী করা, যাতে তারা তা থেকে বিরত হয় এবং তওবা করে।

আর ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর পক্ষ থেকে যে বাড়িতে বসে থাকার কথা বর্ণিত আছে। তা কোনো শাসকের অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে প্রযুক্ত। পক্ষান্তরে সঙ্গতি ও সামর্থ্য থাকলে হাক্কানী শাসককে সাহায্য করা ওয়াজিব।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিউক্ত ইবারতে বিদ্রোহী-সংশ্লিষ্ট কয়েকটি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

১. বিদ্রোহীর সাথে কখন যুদ্ধ করা জায়েজ। এ ক্ষেত্রে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মত হলো যতক্ষণ পর্যন্ত বিদ্রোহীরা যুদ্ধ শুরু না করে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের কে হত্যা করা মুসলিম শাসকের পক্ষে বৈধ নয়।

তার দলিল, প্রতিরোধের প্রয়োজন ছাড়া কোনো মুসলমান কে হত্যা করা জায়েজ নেই। অতএব, বিদ্রোহীরা যেহেতু মুসলমান, সেহেতু তাদেরকে আগে আগে হত্যা করা যাবে না। তবে যখন তারা নিজেরা যুদ্ধ শুরু করে দেয়, তখন তাদের কে প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে হত্যা জায়েজ হয়ে যাবে।

আহনাফের মত হলো, বিদ্রোহীরা যদি সংঘবদ্ধ হয় এবং সৈন্য সমাবেশ ঘটায় তাহলেই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করা মুসলিম শাসকের পক্ষে বৈধ হবে।

আহনাফের দলিল হলো, বিদ্রোহীদের পক্ষ থেকে যুদ্ধ শুরু হওয়ার অপেক্ষায় থাকলে হয়তো, তাদেরকে প্রতিরোধ করা শাসকের পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। তাই তাদের অনিষ্ট রোধ করার স্বার্থে এক্ষেত্রে হুকুম আবর্তিত হবে লড়াইয়ের দলিল বা প্রমাণের উপর। লড়াইয়ের উপর নয়। আর লড়াইয়ের দলিল হলো সংঘবদ্ধ হওয়া, সৈন্যসমাবেশ ঘটানো। অতএব, সৈন্য সমাবেশ ঘটালেই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করা বৈধ হবে।

২. শাসকের কাছে যদি এমন সংবাদ পৌঁছে যে, বিদ্রোহীরা অস্ত্র খরিদ করছে, তারা সংঘবদ্ধ হয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করছে, তাহলে শাসক তখন কি করবেন?

এমন সংবাদ পৌঁছলে তাদের কে ধরে এনে শাস্তি দিবেন, বন্দী করবেন, যাতে করে তাদের চক্রান্ত নিঃশেষ হয়ে যায়।

৩. ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, মুসলমানের পরস্পরে ফেতনা দেখা দিলে নিজ ঘরে বসে থাকা উচিত এ কথা কোন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য?

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর উক্ত কথাটি কেবল তখনই প্রযোজ্য, যখন মুসলমানদের কোনো আমীর বা শাসক না থাকে। পক্ষান্তরে যদি মুসলমানদের শাসক নির্ধারিত থাকে, তাহলে নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী শাসককে সাহায্য করা অবশ্য কর্তব্য। কেননা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ বিদ্রোহী দলের সাথে তোমরা যুদ্ধ কর, যতক্ষণ না আল্লাহর বিধানের দিকে ধাবিত হয়। এতএব, বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ন্যায়পন্থি শাসককে সাহায্য করা সাধারণ মুসলমানদের উপর ওয়াজিব।

আয়াত থেকে এ বিষয়টিও প্রতীয়মান হয় যে, বিদ্রোহকারীরা মুমিন মুসলিম বলেই গণ্য, যদিও তারা বিদ্রোহের কারণে গুনাহগার হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

فَإِنْ كَانَتْ لَهُمْ فِئَةٌ أُجْهِزَ عَلَى جَرِيْحِهِمْ وَأُتْبِعَ مُوَلِّيْهِمْ دَفْعًا لِشَرِّهِمْ كَيْ لَا يَلْحَقُوْا بِهِمْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِئَةٌ لَمْ يُجْهَزْ عَلَى جَرِيْحِهِمْ وَلَمْ يُتْبَعْ مُوَلِّيْهِمْ لِانْدِفَاعِ الشَّرِّ دُوْنَهُ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا يَجُوْزُ ذٰلِكَ فِي الْحَالَيْنِ؛ لِأَنَّ الْقِتَالَ إِذَا تَرَكُوْهُ لَمْ يَبْقَ قَتْلُهُمْ دَفْعًا. وَجَوَابُهُ مَا ذَكَرْنَاهُ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ دَلِيْلُهُ لَا حَقِيْقَتُهُ.

অনুবাদ : আর যদি তাদের সংঘবদ্ধ দল থাকে, তাহলে তাদের অনিষ্ট রোধ করার জন্য আহতকে হত্যা করে ফেলা হবে এবং তাদের পলায়নকারীকে ধাওয়া করা হবে। যাতে তারা দলে গিয়ে যোগ দিতে না পারে। পক্ষান্তরে যদি তাদের সংঘবদ্ধ কোনো দল না থাকে তাহলে আহতকে হত্যা এবং পলায়নকারীকে ধাওয়া করা হবে না। কেননা তা ছাড়াই তাদের অনিষ্ট রোধ হয়ে যায়। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, কোনো অবস্থাতেই তা বৈধ হবে না। কেননা যখন তারা লড়াই ত্যাগ করল, তখন তাদের হত্যা করা অনিষ্ট রোধ করার জন্য হয় না। এ বক্তব্যের উত্তর আমরা উল্লেখ করে এসেছি যে, লড়াইয়ের প্রমাণ বিদ্যমান থাকাই হলো বিবেচ্য বিষয়, প্রকৃত লড়াই বিদ্যমান থাকা বিবেচ্য নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

أُجْهِزَ عَلٰى .... এখানে أُجْهِزَ শব্দটি বাবে افعال হতে ماضى مجهول -এর واحد مذكر غائب -এর সীগাহ। অর্থ হলো– আহত ব্যক্তিকে তাড়াতাড়ি হত্যা করে দেওয়া হবে।

مُوَلِّيْهِمْ এখানে أُتْبِعَ শব্দটি বাবে افتعال হতে ماضى مجهول -এর واحد مذكر غائب -এর সীগাহ। আর مولى বাবে تفعيل হতে اسم فاعل -এর واحد مذكر -এর সীগাহ। অর্থ– পলায়নকারী, পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারী। أُتْبِعَ مُوَلِّيْهِمْ অর্থ– তাদের মাঝে যারা পলায়ন করে, তাদের পিছু ধাওয়া করা হবে।

মাসআলার সারমর্ম হলো, বিদ্রোহীদের যদি সংঘবদ্ধ দল থাকে, তাহলে তাদের আহতকে হত্যা করা হবে এবং পলায়নকারীদেরকে ধাওয়া করা হবে, যাতে তারা গিয়ে দলের সাথে যোগ দিতে না পারে। আর যদি সংঘবদ্ধ দল না থাকে, তাহলে আহত কে হত্যা করা হবে না এবং পলায়নকারীদেরকেও পিছু ধাওয়া করা হবে না। কারণ সংঘবদ্ধ দল না থাকা অবস্থায় হত্যা এবং ধাওয়া করা ছাড়া তাদের অনিষ্ট রোধ হয়ে যায়। এতএব, এর প্রয়োজন নেই।

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, বিদ্রোহীরা যখন পরাজিত হয় তখন তাদের আহতকে হত্যা করা এবং পলায়ন কারীদেরকে ধাওয়া করা জায়েজ নেই। তাদের সংঘবদ্ধ দল থাকুক বা নাই থাকুক। কারণ তারা পরাজিত হওয়ার ফলে তাদের অনিষ্ট রোধ হয়ে গেছে। অতএব, এরপর তাদেরকে আর হত্যা করা বা ধাওয়া করা নিষ্প্রয়োজন, অবৈধ।

আহনাফ -এর জবাবে বলেন, বৈধতার বিষয়টি নির্ভর করে লড়াইয়ের দলিলের উপর, প্রকৃত লড়াইয়ের উপর নয়। অতএব, এদের যদি সংঘবদ্ধ দল থাকে, তাহলে লড়াইয়ের প্রমাণ বিদ্যমান থাকে। তাই তখন তাদেরকে হত্যা করা, ধাওয়া করা বৈধ হবে। আর যদি সংঘবদ্ধ দল না থাকে, তাহলে যেহেতু লড়াইয়ের প্রমাণ বিদ্যমান থাকে না, তাই তখন তাদেরকে হত্যা করা, ধাওয়া করা বৈধ হবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

وَلَا يُسْبَى لَهُمْ ذُرِّيَّةٌ وَلَا يُقَسَّمُ لَهُمْ مَالٌ لِقَوْلِ عَلِيٍّ يَوْمَ الْجَمَلِ : وَلَا يُقْتَلُ أَسِيرٌ وَلَا يُكْشَفُ سِتْرٌ وَلَا يُؤْخَذُ مَالٌ، وَهُوَ الْقُدْوَةُ فِي هٰذَا الْبَابِ . وَقَوْلُهُ فِي الْأَسِيرِ تَأْوِيْلُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِئَةٌ، فَإِنْ كَانَتْ يَقْتُلُ الْإِمَامُ الْأَسِيْرَ، وَإِنْ شَاءَ حَبَسَهُ لِمَا ذَكَرْنَا، وَلِأَنَّهُمْ مُسْلِمُوْنَ وَالْإِسْلَامُ يَعْصِمُ النَّفْسَ وَالْمَالَ وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُقَاتِلُوْا بِسِلَاحِهِمْ إِنِ احْتَاجَ الْمُسْلِمُوْنَ إِلَيْهِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا يَجُوْزُ، وَالْكُرَاعُ عَلَى هٰذَا الْخِلَافِ . لَهُ أَنَّهُ مَالُ مُسْلِمٍ فَلَا يَجُوْزُ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ إِلَّا بِرِضَاهُ . وَلَنَا أَنَّ عَلِيًّا قَسَّمَ السِّلَاحَ فِيْمَا بَيْنَ أَصْحَابِهِ بِالْبَصْرَةِ وَكَانَتْ قِسْمَتُهُ لِلْحَاجَةِ لَا لِلتَّمْلِيكِ، وَلِأَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَفْعَلَ ذٰلِكَ فِيْ مَالِ الْعَادِلِ عِنْدَ الْحَاجَةِ، فَفِيْ مَالِ الْبَاغِيْ أَوْلٰى وَالْمَعْنٰى فِيْهِ إِلْحَاقُ الضَّرَرِ الْأَدْنٰى لِدَفْعِ الْأَعْلٰى ـ

অনুবাদ : তাদের সন্তান সন্ততিকে বন্দী করা হবে না, এবং তাদের সম্পদ বন্টন করা হবে না।

কেননা জামাল যুদ্ধের দিন হযরত আলী (রা.) বলেছেন, অর্থাৎ وَلَا يُقْتَلُ أَسِيرٌ وَلَا يُكْشَفُ سِتْرٌ وَلَا يُؤْخَذُ مَالٌ কোনো বন্দীকে হত্যা করা হবে না, কারো আবরু উম্মুক্ত করা হবে না। আর কারো মাল কব্জা করা হবে না। আর বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে তিনিই হলেন আদর্শ।

বন্দী প্রসঙ্গে তার বক্তব্যের ব্যাখ্যা এই যে, যদি তাদের সংঘবদ্ধ দল না থাকে। পক্ষান্তরে সংঘবদ্ধ দল থাকলে শাসক বন্দীকে হত্যা করবেন। কিংবা ইচ্ছা করলে তাদের বন্দী রাখবেন। এর কারণ আমরা উল্লেখ করেছি। তাছাড়া তারা হলো মুসলমান, আর ইসলাম জান মালের নিরাপত্তা দেয়।

মুসলমানদের যদি প্রয়োজন হয়, তাহলে বিদ্রোহীদের অস্ত্র দ্বারা লড়াই করবে।

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, তা জায়েজ নয়। উট (ঘোড়া ও অন্যান্য সরঞ্জাম) সম্পর্কে একই মতপার্থক্য।

তার দলিল এই যে, এগুলো মুসলমানের মাল, সুতরাং তার সম্মতি ছাড়া তা ব্যবহার করা বৈধ হবে না।

আমাদের দলিল এই যে, হযরত আলী (রা.)-এর বসরায় তার অনুগামীদের মাঝে অস্ত্র বন্টন করে দিয়েছিলেন। এবং তার এ বন্টন ছিল প্রয়োজনের জন্য, মালিকানা প্রদানের জন্য নয়।

তাছাড়া শাসকের জন্য তো প্রয়োজনে অনুগত প্রজার সম্পদেরও এমন হস্তক্ষেপ বৈধ রয়েছে। সুতরাং বিদ্রোহীর সম্পদে আরো অধিক অধিকার থাকবে।

এর নিগুঢ় মর্ম হলো বৃহত্তর ক্ষতি রোধ করার উদ্দেশ্যে লঘুতর ক্ষতি গ্রহণ করা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিউক্ত ইবারতে বিদ্রোহী সংশ্লিষ্ট কিছু হুকুম এবং একটি বিরোধপূর্ণ মাসআলা বর্ণিত হয়েছে।

বিদ্রোহী সংশ্লিষ্ট হুকুমগুলো এই যে, বিদ্রোহীরা যখন যুদ্ধে পরাজিত হয়, তখন তাদের সন্তানাদিকে, স্ত্রীদেরকে বন্দী করা যাবে না। তাদের সম্পদ সমূহ মুজাহিদদের মাঝে বন্টন করে দেওয়া যাবে না। তাদের স্ত্রীরা মুজাহিদদের জন্য হালাল হবে না। মোটকথা মুসলিম বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করে কাফের বাহিনী পরাজিত হলে, এই পরাজিত কাফের বাহিনীর সাথে যেরূপ আচরণ করা হয়, বিদ্রোহীদের সাথে সেরূপ আচরণ করা যাবে না। কারণ বিদ্রোহীরা কাফের নয়। বরং তারা মুসলমান। আর ইমামের দায়িত্ব হলো মুসলমানের জান মাল হেফাজত করা। তাই বিদ্রোহীদের জান মাল হেফাজত করা ইমামের দায়িত্ব

https://e-ilm.weebly.com/

বিদ্রোহীদের সাথে আচরণ সম্পর্কিত বিষয়ে আদর্শ হলেন হযরত আলী (রা.)। কেননা তিনি বিদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধ করেছেন। এতএব, তখন তিনি তাদের সাথে যে আচরণ করেছেন, সে আচরণই আমাদের পক্ষে হতে ওয়াজিব বা অবশ্য পালনীয়।

হাদীসে বর্ণিত আছে যে, জামাল যুদ্ধের দিন (বিদ্রোহীদের সাথে যে যুদ্ধ হয়েছিল) হযরত আলী (রা.) ঘোষণা করেছেন- وَلَا يُقْتَلُ اَسِيرٌ وَلَا يُكْشَفُ سِتْرٌ وَلَا يُؤْخَذُ مَالٌ

সাবধান! কোনো বন্দীকে হত্যা করা যাবে না, কারো আবরু নষ্ট করা যাবে না। কারো মাল সম্পদ লুণ্ঠন করা যাবে না। অতএব, বিদ্রোহীদের সাথে এরূপ আচরণই হলো পরবর্তী উম্মতের জন্য আদর্শ।

তবে তিনি যে বলেছেন, কোনো বন্দীকে হত্যা করা যাবে না। এ কথাটি ব্যখ্যা সাপেক্ষ। তা এই যে, বিদ্রোহীদের যদি কোনো সংঘবদ্ধ দল না থাকে, তাহলে বন্দীকে হত্যা করা যাবে না। আর যদি তাদের সংঘবদ্ধ দল থাকে, তাহলে বন্দীকে হত্যা করা যাবে। যেন তারা পুনরায় গিয়ে দলের সাথে মিলিত হতে না পারে।

বিদ্রোহীদের থেকে ছিনিয়ে আনা অস্ত্র দ্বারা মুসলিম বাহিনী যুদ্ধ করতে পারবে কিনা? এ নিয়ে ইমামগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মত হলো বিদ্রোহীদের থেকে অস্ত্র ছিনিয়ে এনে তা দ্বারা মুসলিম বাহিনী যুদ্ধ করতে পারবে না। কেননা সেগুলো মুসলমানের সম্পদ। আর মুসলমানের সম্পদ সম্মতি ছাড়া ব্যবহার করা জায়েজ নেই।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মত হলো, প্রয়োজন হলে বিদ্রোহীদের অস্ত্র দ্বারা মুসলিম বাহিনী যুদ্ধ করতে পারবে।

দলিল ১. হযরত আলী (রা.) বিদ্রোহীদের অস্ত্র সামগ্রী প্রয়োজনের মুহূর্তে যুদ্ধ করার জন্য মুসলিম বাহিনীর মাঝে বণ্টন করে দিয়েছিলেন।

দলিল ২. এ ধরনের তসররুফ সাধারণ প্রজাদের সম্পদেও ইমামের পক্ষে জায়েজ আছে। অর্থাৎ জাতীয় প্রয়োজনে ইমাম যে কোনো সময় সাধারণ প্রজাদের সম্পদ ব্যবহার করতে পারে। এতএব, বিদ্রোহীদের সম্পদে এরূপ করা উত্তম রূপে জায়েজ হবে।

তা ছাড়া বিদ্রোহীদের অস্ত্র ছিনিয়ে নিলে তাদের বিদ্রোহও দমন হবে এবং তারা গুনাহ থেকে রক্ষা পাবে।

হযরত আলী (রা.) জামাল যুদ্ধের শেষে যে ঘোষণা করেছিলেন, সে সম্পর্কে ইবনে আবী শায়বা যাহ্হাক থেকে বর্ণনা করেছেন যে, যখন তালহা, যুবাইর ও তাদের সাথিরা পরাজিত হয়, তখন হযরত আলী এভাবে একটি ব্যাপক ঘোষণা দেন যে, সাবধান কোনো পলায়নকারীকে যেন হত্যা করা না হয়, কোনো গৃহের দরজা যেন খোলা না হয়, কোনো মহিলা বা সম্পদ যেন হালাল মনে করা না হয়।

ইবনে আবী শায়বা, আবদে খাইর থেকে আরো বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আলী (রা.) জামাল যুদ্ধের দিন ঘোষণা করেছিলেন যে, কোনো পলায়নকারীর পিছু ধাওয়া করো না, কোনো আহত কে হত্যা করো না, যে ব্যক্তি নিজের অস্ত্র সমর্পণ করবে, সে নিরাপদ, এ ধরনের রেওয়ায়েত আরো অনেক সাহাবী থেকেই বর্ণিত আছে। এসব রেওয়ায়েত ইমাম বায়হাকী আবদুর রাজ্জাক ইবনে আবী শায়বাহ, ইবনে সাআদ প্রমুখ মুহাদ্দিস নিজ নিজ কিতাবে উল্লেখ করেছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

وَيَحْبِسُ الْإِمَامُ أَمْوَالَهُمْ فَلَا يَرُدُّهَا عَلَيْهِمْ وَلَا يُقَسِّمُهَا حَتَّى يَتُوْبُوْا فَيَرُدَّهَا عَلَيْهِمْ أَمَّا عَدَمُ الْقِسْمَةِ فَلِمَا بَيَّنَّاهُ . وَأَمَّا الْحَبْسُ فَلِدَفْعِ شَرِّهِمْ بِكَسْرِ شَوْكَتِهِمْ وَلِهٰذَا يَحْبِسُهَا عَنْهُمْ، وَإِنْ كَانَ لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهَا، إِلَّا أَنَّهُ يَبِيْعُ الْكُرَاعَ؛ لِأَنَّ حَبْسَ الثَّمَنِ أَنْظَرُ وَأَيْسَرُ، وَأَمَّا الرَّدُّ بَعْدَ التَّوْبَةِ فَلِانْدِفَاعِ الضَّرُوْرَةِ وَلَا اسْتِغْنَامَ فِيْهَا قَالَ : وَمَا جَبَاهُ أَهْلُ الْبَغْيِ مِنَ الْبِلَادِ الَّتِيْ غَلَبُوْا عَلَيْهَا مِنَ الْخَرَاجِ وَالْعُشْرِ لَمْ يَأْخُذْهُ الْإِمَامُ ثَانِيًا؛ لِأَنَّ وِلَايَةَ الْأَخْذِ لَهُ بِاعْتِبَارِ الْحِمَايَةِ وَلَمْ يَحْمِهِمْ فَإِنْ كَانُوْا صَرَفُوْهُ فِيْ حَقِّهِ أَجْزَأَ مَنْ أُخِذَ مِنْهُ لِوُصُوْلِ الْحَقِّ إِلَى مُسْتَحِقِّهِ وَإِنْ لَمْ يَكُوْنُوا صَرَفُوْهُ فِيْ حَقِّهِ فَعَلَى أَهْلِهِ فِيْمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللّٰهِ تَعَالَى أَنْ يُعِيْدُوْا ذٰلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَصِلْ إِلَى مُسْتَحِقِّهِ . قَالَ الْعَبْدُ الضَّعِيْفُ : قَالُوْا الْإِعَادَةُ عَلَيْهِمْ فِي الْخَرَاجِ؛ لِأَنَّهُمْ مُقَاتِلَةٌ فَكَانُوْا مَصَارِفَ، وَإِنْ كَانُوْا أَغْنِيَاءَ، وَفِي الْعُشْرِ إِنْ كَانُوْا فُقَرَاءَ، فَكَذٰلِكَ؛ لِأَنَّهُ حَقُّ الْفُقَرَاءِ وَقَدْ بَيَّنَّاهُ فِي الزَّكَاةِ . وَفِي الْمُسْتَقْبَلِ يَأْخُذُهُ الْإِمَامُ؛ لِأَنَّهُ يَحْمِيْهِمْ فِيْهِ؛ لِظُهُوْرِ وِلَايَتِهِ .

অনুবাদ : শাসক তাদের সম্পদ আটক করবেন, তবে তাদেরকে ফেরত দেবেন না এবং মুজাহিদদের মাঝেও বণ্টন করবেন না যতক্ষণ না তওবা করে। তওবার পর তাদের মাল তাদের ফেরত দেবেন।

বণ্টন না করার কারণ হলো, আমাদের বর্ণিত হযরত আলী (রা)-এর বাণী।

আর আটক করবে কারণ হলো, তাদের শক্তি খর্ব করার মধ্যমে তাদের অনিষ্ট রোধ করা।

এ কারণেই শাসক উক্ত সম্পদ তাদের ফেরত না দিয়ে আটক রাখবেন। যদিও তিনি এ সম্পদের প্রয়োজন বোধ না করেন। তবে উট (ঘোড়া ও অন্যান্য সরঞ্জাম যা রক্ষণাবেক্ষণ করা কঠিন) বিক্রি করে দেবেন। কেননা মূল্য সংরক্ষণ করা অধিকতর সহজ ও কল্যাণ কর।

তওবার পর ফেরত দেওয়ার কারণ এই যে, প্রয়োজন শেষ হয়ে গেছে। আর তাতে গনিমতের বিধান নেই।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, দখলকৃত অঞ্চল থেকে যদি বিদ্রোহীরা খারাজ-উশর আদায় করে ফেলে, তাহলে শাসক দ্বিতীয়বার তা আদায় করবেন না। কেননা নিরাপত্তা দানের ভিত্তিতেই শাসক তা আদায়ের কর্তৃত্ব লাভ করেছেন। অথচ তিনি তাদের নিরাপত্তা দিতে পারেননি। বিদ্রোহীরা যদি উত্তলকৃত মাল যথা ক্ষেত্রে ব্যয় করে থাকে, তাহলে যাদের থেকে উত্তল করা হয়েছে, তারা দায়মুক্ত হয়ে যাবে।

কেননা হক তার প্রাপকের কাছে পৌছেছে। আর যদি তারা যথাক্ষেত্রে ব্যয় না করে থাকে, তাহলে আল্লাহর মাঝে ও তাদের মাঝে বিদ্যমান সম্পর্কের দাবি হিসাবে তাদের কর্তব্য হলো পুনরায় তা আদায় করা।

কেননা মাল তার হকদারের কাছে পৌছেনি। অধম বান্দা (হেদায়া গ্রন্থকার) বলে, আমাদের মাশায়েখগণ বলেছেন, খারাজের ক্ষেত্রে পুনঃআদায় করা জরুরি নয়। কেননা বিদ্রোহীরা যুদ্ধবাজ সুতরাং স্বচ্ছল হলেও তারা ব্যয়ক্ষেত্র

উশরের ক্ষেত্রে যদি তারা দরিদ্র হয়, তাহলে তারা বৈধ ব্যয়ক্ষেত্র। কেননা উশর দরিদ্রের হক। আমরা এ বিষয়ে জাকাত অধ্যায়ে আলোচনা করে এসেছি। ভবিষ্যতে শাসক তা আদায় করবেন। কেননা তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণে তিনি অঞ্চলবাসীকে নিরাপত্তা দান করেছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিউক্ত ইবারতের সারমর্ম হলো এই যে, শাসক বিদ্রোহীদের সম্পদ আটক করে রাখবেন। যাতে তাদের শক্তি নষ্ট হয়ে যায়। তবে সে সম্পদ মুসলিম বাহিনীর মাঝে বণ্টন করে দিবেন না। যেহেতু তারা হরবী কাফের নয়। বরং বিদ্রোহীরা যখন তওবা করবে তখন তাদের সম্পদ পুনরায় তাদের হাতে ফেরত দিবেন। সংরক্ষণের সুবিধার্থে উট ঘোড়া ও অন্যান্য সরঞ্জাম বিক্রি করে লব্ধ অর্থ সংরক্ষণ করবেন। হরবীদের থেকে আটক করা অর্থ সম্পদ গনিমত হতে পারে না।

قوله : وَمَا جَبَاهُ أَهْلُ الْبَغْيِ مِنَ الْبِلَادِ الخ : উপরিউক্ত ইবারতের সারসংক্ষেপ হলো, বিদ্রোহীদের অধিকৃত অঞ্চলের লোকদের থেকে যদি বিদ্রোহীরা উশর, খারাজ ইত্যাদি উশুল করে নেয়, তাহলে শাসক পুনরায় তাদেরকে উশর, খারাজ উশুল করতে পারবে না। কারণ এ গুলো উশুল করার আধিকার ঐ ব্যক্তির, যে তাদেরকে নিরাপত্তা দেয়। শাসক যেহেতু তাদেরকে নিরাপত্তা দিতে পারেনি, সেহেতু সে এগুলো উশুল করতে পারবে না।

ইমাম শাফেয়ী (র.) ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) ও আহনাফের অনুরূপ মতই পোষণ করেন।

এরপর বিদ্রোহীরা যে উশর বা খারাজ উশুল করেছে, তা যদি যথা ক্ষেত্রে ব্যয় করে, তাহলে আদায়কারীগণ দায়মুক্ত হয়ে যাবে। আর যদি বিদ্রোহীরা উশুলকৃত সম্পদ যথা পাত্রে ব্যয় না করে থাকে, তাহলে আদায় কারীদের নৈতিক দায়িত্ব হবে পুনরায় তা আদায় করা। কেননা তাদের প্রথমবারের আদায়কৃত সম্পদ তার উপযুক্ত হকদারের হাতে পৌঁছেনি।

হেদায়া গ্রন্থকার বলেন, মাশায়েখগণ বলেছেন, মালটি যদি খারাজের হয়, আর বিদ্রোহীরা তা যথাপাত্রে না পৌঁছিয়ে নিজেরা ভোগ করে ফেলে, তাহলেও তা পুনরায় আদায় করতে হবে না। কেননা বিদ্রোহীরা যুদ্ধবাজ হওয়ার কারণে তারাও খারাজের একটি ব্যয় ক্ষেত্র। অতএব, খারাজের অর্থ বিদ্রোহীরা ভোগ করলে তা যথাপাত্রেই ব্যয় হয়েছে, বিধায় তা পুনরায় আদায় করতে হবে না।

আর সম্পদটি উশরের হয় এবং বিদ্রোহীরা গরিব হয়, তাহলেও তা পুনরায় আদায় করতে হবে না। কেননা গরিব লোকেরাই উশরের হকদার। অতএব, উশরের সম্পদ দরিদ্র বিদ্রোহীরা ভোগ করে থাকলে তা যথাক্ষেত্রেই ব্যয় হয়েছে, বিধায় পুনরায় আদায় করতে হবে না।

মুসলিম শাসক যদি বিদ্রোহীদের কে দমন করে তাদের আধিকৃত অঞ্চলের উপর পুনরায় নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারে, তাহলে তখন শাসকই উশর, খারাজ ইত্যাদি উশুল করবেন। কারণ তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হওয়ার ফলে তিনি উক্ত অঞ্চলের অধিবাসীদেরকে নিরাপত্তা প্রদানকারী সাব্যস্ত হয়েছেন। সুতরাং উশর, খারাজ উশুল করার অধিকার তারই থাকবে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَمَنْ قَتَلَ رَجُلًا وَهُمَا مِنْ عَسْكَرِ اَهْلِ الْبَغْيِ ثُمَّ ظُهِرَ عَلَيْهِمْ فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ؛ لِاَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لِاِمَامِ الْعَدْلِ حِيْنَ الْقَتْلِ فَلَمْ يَنْعَقِدْ مُوْجِبًا كَالْقَتْلِ فِيْ دَارِ الْحَرْبِ وَاِنْ غَلَبُوْا عَلَى مِصْرٍ فَقَتَلَ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْمِصْرِ رَجُلًا مِنْ اَهْلِ الْمِصْرِ عَمْدًا ثُمَّ ظُهِرَ عَلَى الْمِصْرِ فَاِنَّهُ يُقْتَصُّ مِنْهُ وَتَاْوِيْلُهُ اِذَا لَمْ يَجْرِ عَلَى اَهْلِهِ اَحْكَامُهُمْ وَاُزْعِجُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ. وَفِيْ ذٰلِكَ لَمْ تَنْقَطِعْ وِلَايَةُ الْاِمَامِ فَيَجِبُ الْقِصَاصُ .

অনুবাদ : বিদ্রোহীদের সৈন্যদের মধ্যে যদি এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে হত্যা করে, এরপর তাদের উপর বিজয় অর্জিত হয়, তাহলে তাদের উপর (কেসাস বা দিয়ত) কিছুই ওয়াজিব হবে না। কেননা হত্যাকাণ্ড ঘটার সময় ন্যায়পরায়ণ শাসকের কোনো কর্তৃত্ব ছিলনা। সুতরাং এটা (কেসাস বা দিয়ত) ওয়াজিবকারীরূপে সংঘটিত হয়নি। যেমন দারুল হরবের হত্যাকাণ্ড (কেসাস বা দিয়ত ওয়াজিবকারী রূপে সংঘটিত হয় না)।

যদি তারা কোনো শহর দখল করে এবং শহরবাসীকে ইচ্ছাকৃত ভাবে হত্যা করে, এরপর শহরের উপর শাসকের দখল প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে হত্যাকারী থেকে কেসাস নেওয়া হবে। এর ব্যাখ্য এই যে, যদি শহরবাসীর উপর বিদ্রোহীদের আইন জারি না হয়ে থাকে। এর আগেই যদি তারা উৎখাত হয়ে গিয়ে থাকে। কেননা এ ক্ষেত্রে (গুণগতভাবে) শাসকের কর্তৃত্ব বিলুপ্ত হয়নি। সুতরাং কেসাস ওয়াজিব হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

বিদ্রোহীদের উপর যেহেতু শাসকের নিয়ন্ত্রণ থাকে না, সেহেতু তাদের সাথে কোনো হত্যাকাণ্ড ঘটলে তা দারুল হরবে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের মতো। আর দারুল হরবে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের দ্বারা কিসাস দিয়ত ওয়াজিব হয় না। বিধায় বিদ্রোহীদের মাঝে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের দ্বারাও কেসাস দিয়ত ওয়াজিব হবে না।

قوله : وَاِنْ غَلَبُوا عَلَى مِصْرٍ فَقَتَلَ رَجُلٌ الخ : কোনো শহর বিদ্রোহীরা দখল করে নেওয়ার পর যদি শহরবাসীদের কোনো এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে হত্যা করে ইচ্ছাকৃতভাবে, এরপর এ শহরের উপর পুনরায় শাসকের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে, হত্যাকারী থেকে কেসাস গ্রহণ করা হবে।

এ মাসআলার বাখ্যায় ইমাম ফখরুল ইসলাম বাযদাবী (র.) বলেন, উপরিউক্ত মাসআলায় যে বলা হয়েছে, হত্যাকারী থেকে কেসাস গ্রহণ করা হবে, এর জন্য শর্ত হলো, অধিকৃত অঞ্চলে বিদ্রোহীদের আইন চালু না হতে হবে। অর্থাৎ অধিকৃত অঞ্চলে বিদ্রোহীদের আইন হওয়ার পূর্বেই যদি তারা উৎখাত হয়ে যায় এবং ইতিমধ্যে শহরবাসীদের মাঝে কোনো হত্যাকাণ্ড ঘটে থাকে, তাহলে সে হত্যার বিচার হবে। কারণ বিদ্রোহীদের আইন প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার কারণে ধরা হবে যেন, সে অঞ্চল বিদ্রোহীদের দখলেই যায়নি। বরং সেখানে মুসলিম শাসকের কর্তৃত্ব বহাল আছে। অতএব, মুসলিম শাসকের কর্তৃত্বাধীন অঞ্চলে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হলে যেমন বিচার হয়, তেমনি আলোচ্য বিদ্রোহীদের অধিকৃত অঞ্চলেও কোনো হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হলে তার বিচার হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَإِذَا قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعَدْلِ بَاغِيًا فَإِنَّهُ يَرِثُهُ، فَإِنْ قَتَلَهُ الْبَاغِيْ وَقَالَ قَدْ كُنْتُ عَلَى حَقٍّ وَأَنَا الْآنَ عَلَى حَقٍّ وَرِثَهُ، وَإِنْ قَالَ قَتَلْتُهُ وَأَنَا أَعْلَمُ أَنِّيْ عَلَى الْبَاطِلِ لَمْ يَرِثْهُ. وَهٰذَا عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ وَقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ : لَا يَرِثُ الْبَاغِيْ فِي الْوَجْهَيْنِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ . وَأَصْلُهُ أَنَّ الْعَادِلَ إِذَا أَتْلَفَ نَفْسَ الْبَاغِيْ أَوْ مَالَهُ لَا يَضْمَنُ وَلَا يَأْثَمُ؛ لِأَنَّهُ مَأْمُوْرٌ بِقِتَالِهِمْ دَفْعًا لِشَرِّهِمْ، وَالْبَاغِيْ إِذَا قَتَلَ الْعَادِلَ لَا يَجِبُ الضَّمَانُ عِنْدَنَا وَيَأْثَمُ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللّٰهُ فِي الْقَدِيْمِ : إِنَّهُ يَجِبُ، وَعَلَى هٰذَا الْخِلَافِ إِذَا تَابَ الْمُرْتَدُّ، وَقَدْ أَتْلَفَ نَفْسًا أَوْ مَالًا . لَهُ أَنَّهُ أَتْلَفَ مَالًا مَعْصُوْمًا أَوْ قَتَلَ نَفْسًا مَعْصُوْمَةً فَيَجِبُ الضَّمَانُ اعْتِبَارًا بِمَا قَبْلَ الْمَنَعَةِ . وَلَنَا إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ، رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ . وَلِأَنَّهُ أَتْلَفَ عَنْ تَأْوِيْلٍ فَاسِدٍ، وَالْفَاسِدُ مِنْهُ مُلْحَقٌ بِالصَّحِيْحِ إِذَا ضُمَّتْ إِلَيْهِ الْمَنَعَةُ فِيْ حَقِّ الدَّفْعِ كَمَا فِيْ مَنَعَةِ أَهْلِ الْحَرْبِ وَتَأْوِيْلِهِمْ،

অনুবাদ : শাসকের অনুগত কোনো ব্যক্তি যদি কোনো বিদ্রোহীকে হত্যা করে (আর উভয়ের মাঝে উত্তরাধিকারের আত্মীয়তা থাকে, তাহলে সে তার উত্তরাধিকারী হবে। পক্ষান্তরে বিদ্রোহী যদি তাকে হত্যা করে এবং দাবি করে যে, আমি আগেও হকের উপর ছিলাম, এখনো হকের উপর আছি, তাহলে হত্যাকারী নিহতের ওয়ারিশ হবে। পক্ষান্তরে যদি বলে যে, একথা জেনেই তাকে হত্যা করেছি যে, আমি অন্যায়ের উপর আছি, তাহলে সে তার ওয়ারিশ হবে না। এটা হলো ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র.)-এর মাযহাব। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, কোনো অবস্থায়ই বিদ্রোহী নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশ হবে না। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এরও এই বক্তব্য।

এই মতপার্থক্যের মূলভিত্তি এই যে, ইমামের অনুগত ব্যক্তি যদি বিদ্রোহীর প্রাণ বা সম্পদ নষ্ট করে তাহলে সে তার ক্ষতিপূরণের দায় বহন করবে না এবং গুনাহগার হয় না। কেননা তাদের অনিষ্ট রোধ করার জন্য তাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ব্যাপারে সে আদিষ্ট রয়েছে।

পক্ষান্তরে বিদ্রোহী যদি ন্যায়পরায়ণ (আর্থাৎ শাসকের অনুগত) ব্যক্তি কে হত্যা করে, তাহলে আমাদের মতে সে তার ক্ষতিপূরণের দায় বহন করবে না। তবে সে গুনাহগার হবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) তার পূর্ববর্তী মতে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে বলেছেন।

ইমাম শাফেয়ী (র.) ও আমাদের মাঝে একই মতভিন্নতা রয়েছে, যদি মুরতাদ কোনো জান বা মাল নষ্ট করার পরে তওবা করে।

তার দলিল এই যে, সে নিরাপত্তা গুণসম্পন্ন মাল নষ্ট করেছে অথবা নিরাপত্তা সম্পন্ন জান হত্যা করেছে। সুতরাং প্রতিরোধ শক্তি লাভের পূর্ববর্তী অবস্থার উপর কিয়াস করে ক্ষতি পূরণ ওয়াজিব হবে।

আমাদের দলিল হলো সাহাবায়ে কেরামের ইজমা, যা ইমাম যুহরী (র.) বর্ণনা করেছেন।

তাছাড়া এই কারণে যে, বিদ্রোহী ভুল ব্যাখ্যার ভিত্তিতে জান বা মাল নষ্ট করেছে। আর ভুল ব্যাখ্যা জনিত পদক্ষেপের সাথে যদি প্রতিরোধ শক্তি যোগ হয়, তাহলে ক্ষতিপূরণ রোধ করার ক্ষেত্রে তা নির্ভুল পদক্ষেপের সাথে সংযুক্ত হবে। হরবীদের প্রতিরোধ শক্তি ও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে যেমন।

https://e-ilm.weebly.com/

وَهٰذَا: لِاَنَّ الْاَحْكَامَ لَابُدَّ فِيْهَا مِنَ الْاِلْزَامِ اَوِ الْاِلْتِزَامِ، وَلَا الْتِزَامَ لِاِعْتِقَادِ الْاِبَاحَةِ عَنْ تَاْوِيْلٍ، وَلَا اِلْزَامَ لِعَدَمِ الْوِلَايَةِ لِوُجُوْدِ الْمَنَعَةِ، وَالْوِلَايَةُ بَاقِيَةٌ قَبْلَ الْمَنَعَةِ وَعِنْدَ عَدَمِ التَّاْوِيْلِ ثَبَتَ الْاِلْتِزَامُ اعْتِقَادًا. بِخِلَافِ الْاِثْمِ؛ لِاَنَّهُ لَا مَنَعَةَ فِيْ حَقِّ الشَّارِعِ، اِذَا ثَبَتَ هٰذَا فَنَقُوْلُ : قَتْلُ الْعَادِلِ الْبَاغِيَ قَتْلٌ بِحَقٍّ فَلَا يَمْنَعُ الْاِرْثَ . وَلِاَبِيْ يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ فِيْ قَتْلِ الْبَاغِيْ الْعَادِلَ اَنَّ التَّاْوِيلَ الْفَاسِدَ اِنَّمَا يُعْتَبَرُ فِيْ حَقِّ الدَّفْعِ وَالْحَاجَةُ هَاهُنَا اِلٰى اِسْتِحْقَاقِ الْاِرْثِ فَلَا يَكُوْنُ التَّاْوِيْلُ مُعْتَبَرًا فِيْ حَقِّ الْاِرْثِ . وَلَهُمَا فِيْهِ اَنَّ الْحَاجَةَ اِلٰى دَفْعِ الْحِرْمَانِ اَيْضًا، اِذِ الْقَرَابَةُ سَبَبُ الْاِرْثِ فَيُعْتَبَرُ الْفَاسِدُ فِيْهِ، اِلَّا اَنَّ مِنْ شَرْطِهِ بَقَاءَهُ عَلٰى دِيَانَتِهِ، فَاِذَا قَالَ : كُنْتُ عَلَى الْبَاطِلِ لَمْ يُوْجَدْ الدَّافِعُ فَوَجَبَ الضَّمَانُ .

অনুবাদ : এর কারণ এই যে, শরিয়তের বিধান আরোপের জন্য শাসকের পক্ষ হতে বাধ্যবাধকতা আরোপের কিংবা নিজের পক্ষ থেকে বাধ্যবাধকতা গ্রহণ অপরিহার্য। আর এখানে বাধ্যবাধকতা গ্রহণ অনুপস্থিত। কেননা সে নিজস্ব ব্যখ্যার ভিত্তিতে (স্বীয় ধর্মকে) বৈধ বলে বিশ্বাস করেছে, আর প্রতিরোধ শক্তি বিদ্যমান থাকার কারণে শাসকের কর্তৃত্বের অনুপস্থিতির দরুন বাধ্যবাধকতাও নেই।

পক্ষান্তরে প্রতিরোধ শক্তি অর্জনের পূর্বে শাসকের কর্তৃত্ব বহাল থাকে। অদ্রূপ বৈধতার নিজস্ব ব্যাখ্যা না থাকলে আকীদা ও বিশ্বাসের পর্যায়ে, বাধ্যবাধকতা গ্রহণের দিকটি বিদ্যমান হয়।

পাপের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা শরিয়তের মোকাবিলায় প্রতিরোধ শক্তি কার্যকর নয়।

যখন এটা সাব্যস্ত হলো, তখন আমরা বলব, শাসকের অনুগত ব্যক্তি কর্তৃক বিদ্রোহী কে হত্যা করা হলো বৈধ হত্যা। সুতরাং তা উত্তরাধিকার রহিত করবে না।

বিদ্রোহী কর্তৃক শাসকের অনুগত ব্যক্তিকে হত্যা করার ক্ষেত্রে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল এই যে, শুধু ক্ষতিপূরণ রোধ করার ক্ষেত্রে ভুল ব্যাখ্যা বিবেচনা হবে। অথচ এখানে প্রয়োজন হচ্ছে উত্তরধিকার যোগ্যতা সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে। সুতরাং উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে ভুল ব্যাখ্যা বিবেচ্য হবে না।

এ ক্ষেত্রে তরফাইনের দলিল এই যে, (ক্ষতিপূরণ রোধ করার ক্ষেত্রে যেমন প্রয়োজন) (তেমনি মিরাশ বঞ্চনা রোধ করার ক্ষেত্রেও প্রয়োজন রয়েছে। কেননা নিকটাত্মীয়তা হলো উত্তরাধিকার লাভ করার কারণ। সুতরাং এ ক্ষেত্রেও ভুল ব্যাখ্যা বিবেচ্য হবে। তবে সে জন্য শর্ত হলো আপন বিশ্বাসের উপর তার বহাল থাকা। সুতরাং যদি সে বলে যে, আমি অন্যায়ের উপর ছিলাম, তাহলে রোধকারী বিদ্যমান নেই। বিধায় ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিউক্ত ইবারতে দুটি মাসআলা দলিলসহ আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় মাসআলাটি আলোচিত হয়েছে প্রথম মাসআলার অনুষঙ্গরূপে। নিম্নে উভয়টি মাসআলা দলিল প্রমাণ ও ইবারত নির্দেশনা সহ উল্লেখ করা হলো।

১. মাসআলা : যদি মুসলিম শাসকের অনুগত কোনো লোক বিদ্রোহী ব্যক্তিকে হত্যা করে এবং হত্যাকারী ব্যক্তি নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হয়, তাহলে সে তার মিরাশ পাবে। আর যদি বিদ্রোহী-ব্যক্তি কোনো অনুগত ব্যক্তিকে হত্যা করে,

https://e-ilm.weebly.com/

এবং যদি বিদ্রোহী বলে যে, আমি আগেও হকের উপর ছিলাম, এখানো হকের উপর আছি, তাহলে সে নিহতের মিরাশ পাবে। আর যদি বলে যে, আমি অন্যায়ের উপর আছি একথা জেনেই তাকে হত্যা করেছি। তাহলে মিরাশ পাবে না। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমত ; ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) এবং ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, বর্ণিত অবস্থায় কোনো অবস্থাতেই বিদ্রোহী ব্যক্তি মিরাশ পাবে না। وَإِذَا قَتَلَ ... الخ বলে উপরিউক্ত মতভেদ পূর্ণ মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে।

وَلَنَا বলে উক্ত মাসআলায় তরফাইনের প্রথম দলিল বর্ণনা করা হয়েছে। এবং এটিই হলো আনুষঙ্গিকভাবে বর্ণিত ২য় মাসআলা।

যার সারসংক্ষেপ হলো এই যে, কোনো অনুগত ব্যক্তি যদি কোনো বিদ্রোহীর জান বা মাল নষ্ট করে, তাহলে তাকে এর দায় বহন করতে হবে না এবং গুনাহগারও হবে না। কারণ বিদ্রোহীদের অনিষ্ট দূর করার উদ্দেশ্যে অনুগত ব্যক্তিরা তাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য আদিষ্ট হয়েছে। অতএব, অনুগত ব্যক্তি যখন কোনো বিদ্রোহীকে হত্যা করেছে কিংবা তার সম্পদ ধ্বংস করেছে, তখন সে তার দায়িত্বই পালন করেছে। সুতরাং তার উপর কোনো দায় চাপার প্রশ্নই উঠে না।

পক্ষান্তরে যদি কোনো বিদ্রোহী কোনো অনুগত ব্যক্তিকে হত্যা করে তাহলে আমাদের মতে সে হত্যার দায় বহন করবে না। তবে গুনাহগার হবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) তার প্রাচীন মতানুসারে বলেন, হত্যাকারীর উপর হত্যার দায় ওয়াজিব হবে। কোনো মুরতাদ ব্যক্তি যদি মুরতাদ অবস্থায় কারো জান মাল নষ্ট করে, অতঃপর তওবা করে ফেলে, তাহলে তার ক্ষেত্রে অনুরূপ মতপার্থক্য রয়েছে। অর্থাৎ আমাদের মতে তার উপর হত্যার দায় ওয়াজিব হবে না। শুধু গুনাহগার হবে। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে হত্যার দায় ওয়াজিব হবে।

لَهُ أَنَّهُ أَتْلَفَ الخ বলে আলোচ্য মাসআলায় ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল বর্ণনা করা হয়েছে। যার সারমর্ম হলো বিদ্রোহী ব্যক্তি একটি নিরাপত্তা গুণসম্পন্ন প্রাণ হরণ করেছে অথবা নিরাপত্তা সম্পন্ন সম্পদ ধ্বংস করেছে। অতএব, তাকে প্রাণের বা সম্পদের দায় বহন করতে হবে। যেমন– প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জনের পূর্বে তথা বিদ্রোহী হওয়ার পূর্বে যদি এ অপরাধ করত, তাহলে তাকে এর দায় বহন করতে হতো।

وَلَنَا إِجْمَاعُ.....الخ বলে আলোচ্য মাসআলায় আহনাফের ১ম দলিল বর্ণনা করা হয়েছে। তা হলো ইমাম যুহরী (র.) হতে বর্ণিত একটি ইজমা। যার তাফসীল নিম্নরূপ : সুলাইমান ইবনে হিশাম, ইমাম যুহরী (র.)-এর নিকট এমর্মে পত্র লিখেন যে, জনৈক মহিলা নিজ স্বামীকে ছেড়ে, খারেজীদের কাছে পালিয়ে গেছে। সেখানে গিয়ে বলেছে যে, তার কওম মুশরিক হয়ে গেছে এবং সে একজন খারেজী পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনেও আবদ্ধ হয়েছে। এরপর সে পুনরায় তওবা করে ফিরে এসেছে। এমতাবস্থায় উক্ত মহিলার হুকুম কি?

এ প্রশ্নের উত্তরে ইমাম যুহরী লিখে পাঠান যে, প্রথমবার যখন খারেজীদের ফেৎনা হয়, তখন হযরত আলী (রা.)-এর সাথে এমন অনেক সাহাবাই বিদ্যমান ছিলেন, যারা বদরের যুদ্ধে শরিক হয়েছিলেন। তখন সকলের পরামর্শ ক্রমে এটাই সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে, খারেজীরা যদি কুরআন ভিত্তিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে কোনো নারীকে হালাল করে থাকে, তাহলে তার উপর হদ্দ জারি করা হবে না। কুরআন ভিত্তিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে যদি কাউকে হত্যা করা হালাল মনে করে তাকে হত্যা করে থাকে, তাহলে কেসাস নেওয়া হবে না।

খারেজীদের কাছে যদি কোনো মুসলমানের সম্পদ হুবহু বিদ্যমান থাকে, তাহলে তা মুসলমানের নিকট ফিরিয়ে দেওয়া হবে। সুতরাং আমার জ্ঞান মুতাবেক এটাই সিদ্ধান্ত যে, তোমরা এ মহিলা কে তার স্বামীর নিকট ফিরিয়ে দাও। যদি কেউ তার সম্পর্কে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়, তাহলে তার উপর হদ্দে কযফ প্রয়োগ কর। ইবনে আবী শায়বা, মা'মারের সূত্রে যুহরী থেকে উক্ত রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন।

অতএব, কোনো বিদ্রোহী কর্তৃক মুসলমানের জান মাল নষ্ট হলে বিদ্রোহী এর দায় বহন করবে না ইজমা দ্বারা প্রমাণিত হলো।

আহনাফের ২য় দলিল وَلِأَنَّهُ أَتْلَفَ عَنْ تَأْوِيلٍ .... الخ থেকে আহনাফের দ্বিতীয় দলিল বর্ণনা করা হয়েছে। এর সারমর্ম হলো এই যে, ক্ষতিপূরণ রোধ করার ক্ষেত্রে ভুল ব্যাখ্যা সঠিক ব্যাখ্যার পর্যায়ভুক্ত হয়ে থাকে, প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকার শর্তে। অর্থাৎ সঠিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে যদি কেউ কাউকে হত্যা করে, তাহলে যেমন হত্যাকারীর উপর হত্যার দায় বর্তায় না। তেমনি যদি কেউ কাউকে ভুল ব্যাখ্যার ভিত্তিতে হত্যা করে এবং হত্যাকারী ব্যক্তি বা দল প্রতিরোধ ক্ষমতা

https://e-ilm.weebly.com/

সম্পন্ন হয়, তাহলে তার উপরও হত্যার দায় বর্তাবে না। সুতরাং বিদ্রোহী ব্যক্তি যেহেতু প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন এবং সে একটি ভুল ব্যাখ্যার ভিত্তিতে অনুগত ব্যক্তিকে হত্যা করেছে বা তার সম্পদ নষ্ট করেছে, সেহেতু তার উপরও হত্যা বা সম্পদ নষ্ট করার দায় বর্তাবে না। বিদ্রোহী ব্যক্তি যে ভুল ব্যাখ্যাটির ভিত্তিতে শাসকের অনুগত মুসলমান কে হত্যা করে তা হলো এই যে, খারেজীরা (বিদ্রোহীরা) মনে করে, সগীরা বা কবিরা তথা ছোট-বড় যে কোনো গুনাহের দ্বারা মুসলমানের জান মালের নিরাপত্তা রহিত হয়ে যায়। অর্থাৎ তাকে হত্যা করা এবং তার সম্পদ নষ্ট করা বৈধ হয়ে যায়। এ বিশ্বাসের পেছনে তারা দলিল হিসাবে পেশ করে থাকেন এ আয়াত–

وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا.

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রাসূলের নাফরমানি করে তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের অগ্নির শাস্তি। সেথায় সে চিরকাল অবস্থান করবে।

খারেজীদের উক্ত ব্যাখ্যাটি ভুল। তথাপি তাদের এ ব্যাখ্যা ক্ষতিপূরণ রোধ করার ক্ষেত্রে ধর্তব্য হবে যদি তারা প্রতিরোধ শক্তির অধিকারী হয়।

একটি অনুরূপ মাসআলা : ভুল ব্যাখ্যার ভিত্তিতে প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন লোক কোনো মুসলমান কে হত্যা করলে বা সম্পদ নষ্ট করলে যে, তার উপর ক্ষতি পূরণের দায় বর্তায় না, এরকম আরেকটি মাসআলা হলো এই যে, হরবী কাফেররা যদি যুদ্ধে বহু মুসলমান কে হত্যা করে এবং তাদের মালামাল ধ্বংস করে ফেলে, এরপর তারা সবাই ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে তাদের উপর কোনো কেসাস দিয়ত ও সম্পদের ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয় না। কারণ হত্যাকারী কাফেররা প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন ছিল এবং তারা তাদের ধর্মীয় (ভুল) ব্যাখ্যার ভিত্তিতেই মুসলমানদেরকে হত্যা করেছে। অতএব, তাদের উপর হত্যা ও ধ্বংসের দায় বর্তায় না। তেমনি আলোচ্য মাসআলায় খারেজীদের ক্ষেত্রেও।

ভুল ব্যাখ্যার ভিত্তিতে হত্যা করলে দায় না বর্তানোর কারণ কি وَهٰذَا لِأَنَّ الْأَحْكَامَ لَابُدَّ فِيهَا ...... الخ বলে তাই বর্ণনা করা হয়েছে।

শরিয়তের বিধি বিধান করো উপর আরোপিত হওয়ার জন্য দুটি বিষয়ের কোনো একটি বিষয় বিদ্যমান থাকা অবশ্যই শর্ত। ১. ব্যক্তির পক্ষ থেকে শরিয়ত গ্রহণ করে নেওয়া। ২. শাসকের পক্ষ থেকে শর'য়ীবিধান মেনে চলা বাধ্যতামূলক করে দেওয়া। যেমন– মুসলিম ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ইসলামের বিধি বিধান নিজের জন্য আবশ্যক করে নেয়, তাই তার উপর শরিয়ত আরোপিত হয়। আর ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাসকারী কাফের তথা জিম্মিদের উপর শাসকের পক্ষ থেকে কিছু ইসলামি বিধান মেনে চলা বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হয়, তাই সেগুলো তাদের উপর আরোপিত হয়, সেগুলো তাদের মেনে চলতে হয়।

পক্ষান্তরে বিদ্রোহী ব্যক্তি। তার ক্ষেত্রে স্বেচ্ছায় গ্রহণ এবং শাসকের পক্ষ থেকে বাধ্যতামূলক করণ, উভয়টি অনুপস্থিত। কেননা তার ক্ষেত্রে اِلْتِزَام বা স্বেচ্ছায় গ্রহণ পাওয়া যায়নি, কারণ সে একটি ব্যাখ্যার ভিত্তিতে মুসলমান কে হত্যা করা বৈধ জ্ঞান করে থাকে। আবার শাসকের পক্ষ থেকে اِلْزَام বা বাধ্যতামূলক করার বিষয়টিও পাওয়া যায় না। কারণ বিদ্রোহীদের উপর শাসকের কর্তৃত্ব নেই। তাই তাদের উপর কিছু চাপাতে পারে না। অতএব, যখন বিদ্রোহীদের ক্ষেত্রে اِلْتِزَام ও اِلْزَام উভয়টি অনুপস্থিত, তাই তাদের উপর শরিয়তের বিধান আরোপিত হবে না।

পক্ষান্তরে যদি বিদ্রোহীদের উপর শাসকের কর্তৃত্ব থাকে অর্থাৎ তাদের হাতে প্রতিরোধ শক্তি সঞ্চিত না থাকে, কিংবা তারা শাসকের নিকট পরাজয় বরণ করে, আর তখন যদি কোনো হত্যাকাণ্ড ঘটায়, তাহলে তার উপর এ হত্যার দায় বর্তাবে। কেননা এ ক্ষেত্রে اِلْزَام পাওয়া গেছে। এমনিভাবে যদি বিদ্রোহীর কাছে কোনো ভুল ব্যাখ্যা না থাকে, তাহলেও বিশ্বাসগতভাবে তার ক্ষেত্রে اِلْتِزَام পাওয়া যায়। এ জন্যই যদি সে বলে যে, আমি অন্যায়ের উপর আছি একথা জেনেই আমি তাকে (মুসলমান কে) হত্যা করেছি, তাহলে তার উপর হত্যার দায় আরোপিত হয়। কেননা পূর্বেই বলা হয়েছে, কারো ক্ষেত্রে اِلْتِزَام বা স্বেচ্ছা গ্রহণ অথবা اِلْزَام বা বাধ্যকরণ দুটির কোনো একটি পাওয়া গেলে তার উপর শরিয়তের বিধি বিধান আরোপিত হয়।

https://e-ilm.weebly.com/

তবে হত্যাকারীর উপর পার্থিব শর'য়ী বিধান কার্যকর হোক বা না হোক, সর্বাবস্থায় গুনাহগার সে অবশ্যই হবে। কেননা শরিয়ত বেত্তার নিকট তথা আল্লাহর নিকট মানুষের প্রতিরোধ ক্ষমতার কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। অতএব, বিদ্রোহীদের হাতে প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকুক বা না থাকুক সর্বাবস্থায় তারা গুনাহগার হবে। إذ ثبت هذا ..... الخ বলে গ্রন্থকারের দ্বিতীয় দলিলের তাতিম্মাহ বা সমাপ্তি টানা হয়েছে। অর্থাৎ পূর্ব বর্ণিত মূলনীতিটি যখন প্রমাণিত হলো তখন আমরা বলতে পারি যে, শাসকের অনুগত লোক কর্তৃক বিদ্রোহী কে হত্যা করা হলে সেটি একটি বৈধ হত্যা। সুতরাং এর কারণে হত্যাকারী ব্যক্তি নিহতের মিরাশ থেকে বঞ্চিত হবে না। এমনিভাবে বিদ্রোহী কর্তৃক অনুগত ব্যক্তি কে হত্যা করা হলে বিদ্রোহী ব্যক্তি ন্যায়ের উপর থাকার দাবি করা অবস্থায়, সেটিও বৈধ হত্যা, তাই হত্যাকারী বিদ্রোহী ব্যক্তি অনুগত নিহত ব্যক্তির মিরাশ থেকে বঞ্চিত হবে না।

প্রথম মাসআলায় ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল : ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেছেন, হত্যাকারী বিদ্রোহী ব্যক্তি ন্যায়ের উপর থাকার দাবি করুক কিংবা অন্যায়ের উপর থাকার দাবি করুক, সর্বাবস্থায় সে অনুগত নিহতের মিরাশ থেকে বঞ্চিত হবে। এ ক্ষেত্রে তার দলিল হলো এই যে, ভুল ব্যাখ্যার বিষয়টি কেবল ক্ষতিপূরণ রোধ করার ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য বা বিবেচ্য হতে পারে।

মিরাশের হকদারিত্ব সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে ভুল ব্যাখ্যা বিবেচ্য হতে পারে না। অতএব, ভুল ব্যাখ্যার ভিত্তিতে যে নিজের মিরাশকে হত্যা করবে, সে তার মিরাশ থেকে বঞ্চিত হবে, যেমন কোনো প্রকার ব্যাখ্যা ছাড়া হত্যাকারী ব্যক্তি নিহতের মিরাশ থেকে বঞ্চিত হয়।

কিন্তু তরফাইন তথা ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর কথা হলো, হত্যার দায় তথা কেসাস দিয়ত যেমন একটি শাস্তি, তেমনি মিরাশ থেকে বঞ্চিত হওয়াও একটি শাস্তি। অতএব, দায় রোধ করার যেমন ভুল ব্যাখ্যা বিবেচ্য হয়, ঠিক তেমনি মিরাশ বঞ্চনা রোধ করার ক্ষেত্রেও ভুল ব্যাখ্যা বিবেচ্য হবে। অতএব, হত্যাকারী বিদ্রোহী যদি বলে, আমি ন্যায়ের উপর ছিলাম, ন্যায়ের উপর আছি, তাহলে সে নিহতের মিরাশ পাবে এবং তার উপর হত্যার কোনো দায় বর্তাবে না। পক্ষান্তরে যদি বলে যে, আমি অন্যায়ের উপর আছি তাহলে যেহেতু শাস্তি রোধকারী ভুল ব্যাখ্যা বিদ্যমান থাকছে না, সেহেতু সে মিরাশ থেকেও বঞ্চিত হবে এবং তার উপর হত্যার দায়ও আরোপিত হবে।

পুরো আলোচনার সার নির্যাস : কোনো বিদ্রোহীকে যদি শাসকের অনুগত ব্যক্তি হত্যা করে বা তার সম্পদ ধ্বংস করে তাহলে তার উপর হত্যার বা সম্পদ ধ্বংসের কোনো দায় বর্তাবে না। কারণ অনুগত ব্যক্তি, বিদ্রোহীকে হত্যা কারার জন্য এবং তার সম্পদ ধ্বংস করার জন্য আদিষ্ট।

কোনো বিদ্রোহী যদি শাসকের কোনো অনুগত ব্যক্তিকে হত্যা করে, তাহলে ইমাম শাফেয়ী (র)-এর ক্বাদীম উক্তি মুতাবেক ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে। কারণ সে নিরাপত্তা গুণসম্পন্ন জান মাল নষ্ট করেছে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, হত্যাকারী বিদ্রোহীর হাতে যদি প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকে এবং সে ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার দাবিদার হয়, তাহলে সে মিরাশ থেকেও বঞ্চিত হবে না, তার উপর হত্যা বা সম্পদ ধ্বংসের কারণে কোনো দায়ও বর্তাবে না। কারণ উক্ত বিদ্রোহীর ক্ষেত্রে শর'য়ী বিধানের إلزام ও الْتِزام কোনোটিই পাওয়া যায়নি। আর যদি বিদ্রোহীর হাতে প্রতিরোধ ক্ষমতা না থাকে কিংবা অন্যায়ের উপর থাকার স্বীকারোক্তি করে তাহলে তার উপর হত্যা ও সম্পদ ধ্বংসের দায় বর্তাবে এবং সে নিহতের মিরাশ থেকেও বঞ্চিত হবে। কারণ তার ক্ষেত্রে إلزام বা الْتِزام যে কোনো একটি বিদ্যমান আছে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, ন্যায়ের উপর থাকার দাবিদার হওয়া অবস্থায়ও কেবল সে হত্যা বা সম্পদ ধ্বংসের দায় থেকে রক্ষা পাবে। কিন্তু মিরাশ থেকে বঞ্চিত হতে হবে। কারণ ভুল ব্যাখ্যার বিষয়টি কেবল দায় রোধ করার ক্ষেত্রে বিবেচনা যোগ্য, মিরাশ বঞ্চনার ক্ষেত্রে ভুল ব্যাখ্যা বিবেচনা যোগ্য নয়।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ وَيُكْرَهُ بَيْعُ السِّلَاحِ مِنْ اَهْلِ الْفِتْنَةِ وَفِيْ عَسَاكِرِهِمْ: لِاَنَّهُ اِعَانَةٌ عَلَى الْمَعْصِيَةِ وَلَيْسَ بِبَيْعِهِ بِالْكُوفَةِ مِنْ اَهْلِ الْكُوْفَةِ وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْهُ مِنْ اَهْلِ الْفِتْنَةِ بَاْسٌ؛ لِاَنَّ الْغَلَبَةَ فِي الْاَمْصَارِ لِاَهْلِ الصَّلَاحِ. وَاِنَّمَا يُكْرَهُ بَيْعُ نَفْسِ السِّلَاحِ لَا بَيْعُ مَا لَا يُقَاتَلُ بِهِ اِلَّا بِصَنْعَةٍ، اَلَا تَرى اَنَّهُ يُكْرَهُ بَيْعُ الْمَعَازِفِ وَلَا يُكْرَهُ بَيْعُ الْخَشَبِ. وَعَلٰى هٰذَا الْخَمْرُ مَعَ الْعِنَبِ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ফেতনাকারী ও (বিদ্রোহী) দের কাছে এবং তাদের বাহিনীতে অস্ত্র বিক্রি করা মাকরূহ (তাহরিমী)। কেননা এ হলো অন্যায় কাজে সাহায্য করা। আর কূফার (যে কোনো শহরে) কূফাবাসীদের কাছে এবং যে ব্যক্তি ফেতনাকারীরূপে পরিচিত নয়, তার কাছে অস্ত্র বিক্রি করতে কোনো দোষ নেই। কেননা শহরে সৎ লোকদেরই প্রাধান্য থাকে। আর নিষিদ্ধ হলো প্রকৃত অস্ত্র বিক্রি করা। এমন সামগ্রী বিক্রি করা নিষিদ্ধ নয়, যা দ্বারা কারিগরি করে অস্ত্র তৈরি করা ব্যতীত লড়াই করা যায় না। দেখুন না, বাদ্যযন্ত্র বিক্রি করা মাকরূহ। কিন্তু যন্ত্র তৈরির উপাদান কাঠ বিক্রি করা মাকরূহ নয়। মদ ও আঙ্গুরের বিষয়টিও অনুরূপ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

বিদ্রোহীদের কাছে অস্ত্র বিক্রি করা মাকরূহ তাহরিমী। কেননা তাদের কাছে অস্ত্র বিক্রি করা হলো তাদের কে অন্যায় কাজে সাহায্য করা হয়।

অথচ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

تَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ অর্থাৎ তোমরা নেক কাজ ও তাকওয়ার বিষয়ে একে অপরকে সাহায্য কর, পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে কেউ কাউকে সাহায্য করোনা। –(সূরা মায়েদা, আয়াত নং ২)

কূফা শহরে সেখানের আধিবাসীদের কাছে কিংবা বিদ্রোহী হিসাবে পরিচিত নয় এমন লোকের কাছে অস্ত্র বিক্রি করতে কোনো সমস্যা নেই। কূফা শহরের নাম উল্লেখের কারণ হলো, বিদ্রোহের ফেতনা সর্বপ্রথম কূফা শহরেই ঘটেছিল। অন্যথায় যে কোনো শহরই এ হুকুমের আওতাভুক্ত। অতএব, ফেতনাকারী হিসাবে পরিচিত লোক ছাড়া শহরের যে কোনো লোকের কাছে অস্ত্র বিক্রি করা যাবে। কারণ শহরের অধিকাংশ অধিবাসীই ভালো হয়ে থাকে, সৎ হয়ে থাকে।

অস্ত্র তৈরির উপাদান যেমন, কাঠ, বাঁশ, লোহা ইত্যাদি বিক্রি করা নিষিদ্ধ নয়। কেননা এসব উপাদান দ্বারা লড়াই করা সম্ভব নয়। বরং উপাদানের উপর বিশেষ কাজকর্ম করার মাধ্যমে তাকে অস্ত্রে রূপান্তরিত করার পরই কেবল তা দ্বারা যুদ্ধ করা সম্ভব হয়। এতএব, উপাদান যেহেতু অস্ত্র নয়, সেহেতু তা বিক্রি করা জায়েজ আছে।

যেমন বাদ্যযন্ত্র করা বিক্রি করা জায়েজ নয়, কিন্তু বাদ্যযন্ত্র তৈরির উপাদান কাঠ বিক্রি করা জায়েজ আছে, অনুরূপভাবে মদ বিক্রি করা জায়েজ নেই, কিন্তু মদ তৈরির উপাদান আঙ্গুর বিক্রি করা জায়েজ আছে। অস্ত্র ও অস্ত্রের বিষয়টিও তদ্রূপ।

مِعْزَفٌ একবচন, বহুবচন مَعَازِفُ এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র যা ইয়ামানের লোকেরা কাঠ দ্বারা তৈরি করত।

https://e-ilm.weebly.com/

كِتَابُ اللَّقِيطِ

اَللَّقِيْطُ سُمِّيَ بِهِ بِاعْتِبَارِ مَالِهِ لِمَا اَنَّهُ يُلْقَطُ . وَالِالْتِقَاطُ مَنْدُوْبٌ اِلَيْهِ لِمَا فِيْهِ مِنْ اِحْيَائِهِ، وَاِنْ غَلَبَ عَلٰى ظَنِّهِ ضَيَاعُهُ فَوَاجِبٌ . قَالَ اللَّقِيْطُ حُرٌّ؛ لِاَنَّ الْاَصْلَ فِيْ بَنِيْ اٰدَمَ اِنَّمَا هُوَ الْحُرِّيَّةُ، وَكَذَا الدَّارُ دَارُ الْاَحْرَارِ؛ وَلِاَنَّ الْحُكْمَ لِلْغَالِبِ وَنَفَقَتُهُ فِيْ بَيْتِ الْمَالِ هُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ (رض)، وَلِاَنَّهُ مُسْلِمٌ عَاجِزٌ عَنِ التَّكَسُّبِ، وَلَا مَالَ لَهُ وَلَا قَرَابَةَ فَاَشْبَهَ الْمُقْعَدَ الَّذِيْ لَا مَالَ لَهُ؛ وَلِاَنَّ مِيْرَاثَهُ لِبَيْتِ الْمَالِ، وَالْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ وَلِهٰذَا كَانَتْ جِنَايَتُهُ فِيْهِ . وَالْمُلْتَقِطُ مُتَبَرِّعٌ فِي الْاِنْفَاقِ عَلَيْهِ؛ لِعَدَمِ الْوِلَايَةِ اِلَّا اَنْ يَاْمُرَهُ الْقَاضِيْ بِهِ لِيَكُوْنَ دَيْنًا عَلَيْهِ لِعُمُوْمِ الْوِلَايَةِ -

অধ্যায় : কুড়িয়ে পাওয়া শিশু

অনুবাদ : লাকীত অর্থ কুড়িয়ে পাওয়া শিশু। পরিণামের দিকে লক্ষ্য করে তাকে লাকীত বলা হয়, যেহেতু তাকে কুড়িয়ে নেওয়া হবে। শিশুকে কুড়িয়ে নেওয়া মোস্তাহাব। কেননা এতে তার প্রাণ রক্ষা করা হয়। আর যদি তার প্রাণনাশের প্রবল আশঙ্কা হয় তাহলে কুড়িয়ে নেওয়া ওয়াজিব।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, **কুড়িয়ে পাওয়া শিশু স্বাধীন।** কেননা স্বাধীন হওয়াই হলো আদম সন্তানের প্রকৃত অবস্থা। এছাড়াও একারণে যে, বাসস্থান হলো স্বাধীন মানুষের আবাস ভূমি। তাছাড়া অধিক্যের অনুকূলেই হুকুম হয়ে থাকে। **আর তার ভরণ-পোষণ বাইতুল মাল থেকে হবে।** হযরত ওমর (রা.) ও হযরত আলী (রা.) থেকে এটাই বর্ণিত আছে। তাছাড়া এ কারণে যে, সে উপার্জন অক্ষম মুসলমান, যার নিজস্ব মাল নেই এবং কোনো আত্মীয় স্বজন নেই। সুতরাং সে এমন পঙ্গুর সদৃশ যার কোনো মাল নেই।

তা ছাড়া একারণে যে, তার মিরাশ বাইতুল মালের হয়ে থাকে, আর খারাজ (প্রাপ্তির অধিকার) আর্থিক দায় বহনের বিনিময়ে হয়ে থাকে। এ কারণেই তার কৃত অপরাধের দায় বাইতুল মালের উপর আসে।

যে কুড়িয়ে আনল, সে তার জন্য খরচ করার ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাদানকারী হবে। (শিশুটির ব্যাপারে তার কোনো) কর্তৃত্ব না থাকার কারণে। তবে যদি কাজি তাকে খরচ করার আদেশ দেয়, তাহলে তা ঐ শিশুটির প্রতিকূলে ঋণ হিসেবে থাকবে। (যা সে কর্মক্ষম হওয়ার পর পরিশোধ করবে।) কেননা কাজির ব্যাপক কর্তৃত্ব রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

لَقِيْط শব্দটি فَعِيْلٌ-এর ওজনে اسم مفعول -এর অর্থে, لَقْطٌ ক্রিয়ামূল হতে নির্গত।

لقط শব্দের অর্থ হলো পড়ে থাকা বস্তু উঠিয়ে নেওয়া বা কুড়িয়ে নেওয়া।

পরিভাষায় لَقِيْط বলা হয় এমন শিশুকে, যাকে তার পিতা-মাতা ফেলে দিয়েছে দারিদ্র্যের ভয়ে কিংবা ব্যভিচারের অভিযোগ থেকে নিজেদের রক্ষা করার উদ্দেশ্যে।

এ ধরনের ফেলে দেওয়া শিশুকে لَقِيْط (কুড়িয়ে পাওয়া শিশু) বলা হয়, তার পরিণামের দিকে লক্ষ্য করে। কেননা ফেলে দেওয়া শিশুর পরিণাম এটাই যে, কেউ তাকে কুড়িয়ে নেবে। অতএব, لَقِيْط শব্দটি قَتِيْل -এর অনুরূপ। অর্থাৎ

https://e-ilm.weebly.com/

শব্দদ্বয় فعيل -এর ওজনে এবং اسم مفعول -এর অর্থে, পরিণামের দিকে লক্ষ্য করে। যেমন নবী করীম ﷺ বলেছেন- من قتل قتيلا فله سلبه (যে ব্যক্তি কোনো قتيل তথা নিহতকে হত্যা করবে সে তার যাবতীয় সামগ্রী নিয়ে যাবে)। এ হাদীসে কাফের যোদ্ধাকে قتيل বা নিহত বলা হয়েছে পরিণামের প্রতি লক্ষ্য করে। لقيط শব্দটিও তদ্রূপ।

ফেলে দেওয়া শিশুকে কুড়িয়ে নেওয়ার হুকুম : ফেলে দেওয়া শিশুকে কুড়িয়ে নেওয়া সাধারণ অবস্থায় মোস্তাহাব। কেননা শিশুটি ধ্বংসের সম্মুখীন। তাকে কুড়িয়ে নিলে তার প্রাণ রক্ষা পাবে। আর ছোটদের প্রতি মমতার প্রকাশ ঘটবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন- ছোটকে স্নেহ করো, বড়কে শ্রদ্ধা করো।

আর যদি ব্যক্তির মনে এরূপ আশঙ্কা জাগে যে, শিশুটিকে কুড়িয়ে না নিলে তার প্রাণ শেষ হয়ে যাবে সে মরে যাবে তাহলে তখনই তাকে কুড়িয়ে নেওয়া উক্ত ব্যক্তির উপর ওয়াজিব।

ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) বলেন, ফেলে দেওয়া শিশুকে কুড়িয়ে নেওয়া ফরজে কেফায়া। তবে প্রাণহানির আশঙ্কা হলে ফরজে আইন।

قوله : اللقيط حر؛ لان الاصل الخ : উপরিউক্ত ভাষ্যে কুড়িয়ে পাওয়া শিশু সম্পর্কে দুটি বিধান বর্ণিত হয়েছে।

এক. কুড়িয়ে পাওয়া শিশু স্বাধীন বলে বিবেচ্য হবে। গোলাম বা দাস বলে গণ্য হবে না। এ ব্যাপারে আলেমগণের ইজমা রয়েছে। ইমাম নাখয়ী (র.) হতে দ্বিমত বর্ণিত আছে। কিন্তু তা গ্রহণযোগ্য নয়।

কুড়িয়ে পাওয়া শিশু স্বাধীন বলে গণ্য হওয়ার পক্ষে তিনটি কারণ বর্ণনা করেছেন।

১. স্বাধীন হওয়াই হলো মানব সন্তানের প্রকৃত অবস্থা। কেননা সকল মানব হযরত আদম (আ.) ও হযরত হাওয়া (আ.)-এর সন্তান, আর তারা দু'জন স্বাধীন ছিলেন। বিধায় তাদের সকল সন্তানই স্বাভাবিকভাবে স্বাধীন। তবে যদি কোনো সন্তান কাফের হয়ে যায় তাহলে তার উপর দাসত্ব নেমে আসে, তার উদ্ভূত কুফরির কারণে।

২. দারুল ইসলাম স্বাধীন মানুষের আবাস ভূমি। বিধায় দারুল ইসলামে প্রাপ্ত শিশুও স্বাধীন বলেই গণ্য হবে।

৩. দারুল ইসলামের অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমান ও স্বাধীন। অতএব, প্রাপ্ত শিশু সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসীর সারিভুক্ত করা হবে এবং তাকে স্বাধীন বিবেচনা করা হবে।

দুই. কুড়িয়ে পাওয়া শিশুর ভরণ-পোষণ কোথা থেকে হবে- এ সম্পর্কে কথা হলো এই যে, যদি কুড়িয়ে পাওয়া শিশুর সাথে কোনো মাল-সম্পদ পাওয়া যায়, তাহলে তার ভরণ-পোষণ সেই মাল থেকেই হবে। আর যদি শিশুর সাথে কোনো মাল-সম্পদ না থাকে তাহলে তার ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা বাইতুল মাল থেকে করা হবে। এ হুকুমের পক্ষেও গ্রন্থকার তিনটি দলিল উল্লেখ করেছেন।

১. কুড়িয়ে পাওয়া শিশুর ভরণ-পোষণ বাইতুল মাল থেকে হওয়ার বিষয়টি হযরত ওমর (রা.) ও হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে।

২. কুড়িয়ে পাওয়া শিশুটি রোজগার করতে অক্ষম একজন মুসলমান। পাশাপাশি তার নিজস্ব কোনো সম্পদ নেই, যা থেকে তার ভরণ-পোষণ করা যাবে। আবার তার কোনো আত্মীয়ও নেই, যার উপর তার ভরণ-পোষণ আবশ্যক হতে পারে। এ হিসাবে সে একজন স্বজন-সম্বলহীন পঙ্গু মুসলমানের মতোই হলো। আর স্বজন-সম্বলহীন পঙ্গু মুসলমানের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা বাইতুল মাল থেকে হয়ে থাকে। অতএব, উক্ত কুড়িয়ে পাওয়া শিশুর ভরণ-পোষণের ব্যবস্থাও বাইতুল মাল থেকে হবে।

৩. কুড়িয়ে পাওয়া শিশুর মৃত্যুর পর তার মিরাস বা পরিত্যক্ত সম্পদ বাইতুল মালে যায়। অতএব, তার ভরণ-পোষণও বাইতুল মাল থেকে হবে। কেননা মূলনীতি রয়েছে, "দায় যার, প্রাপ্তি তার।"

(الخراج بالضمان) (الغرم بالغنم) অতএব, কুড়িয়ে পাওয়া শিশুর ত্যাজ্য সম্পদ যেহেতু বাইতুল মাল পাবে, সেহেতু তার ভরণ-পোষণের দায়ও বাইতুল মাল বহন করবে এবং একারণেই কুড়িয়ে পাওয়া শিশুর কৃত অপরাধের দায়ও বাইতুল মালের উপর বর্তায়।

যে ব্যক্তি শিশুকে কুড়িয়ে এনেছে সে যদি শিশুর জন্য অর্থ খরচ করে, তাহলে তা স্বেচ্ছায় দান বলে গণ্য হবে। আর যদি কাজি তাকে এ মর্মে নির্দেশ দেয় যে, তুমি এই শিশুর ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করো এবং এ বাবদ ব্যয়িত অর্থ শিশুর উপর ঋণ হিসাবে থাকবে। শিশু বড় হলে তা পরিশোধ করবে। তাহলে ঐ ব্যক্তি শিশুর জন্য অর্থ খরচ করবে এবং তা ঋণ হিসাবেই থাকবে। শিশু যখন বড় হয়ে কর্মক্ষম হবে, তখন সে উপার্জন করে উক্ত ঋণ পরিশোধ করবে। পক্ষান্তরে কাজি যদি শুধু অর্থ ব্যয়ের নির্দেশ দেয় 'ঋণ হিসাবে থাকবে' একথা না বলে, তাহলে শিশুর জন্য ব্যয়কৃত অর্থ স্বেচ্ছাদান বলে গণ্য হবে। ঋণ বলে বিবেচিত হবে না। এটাই বিশুদ্ধ কথা।

https://e-ilm.weebly.com/

قال فَإِنْ اِلْتَقَطَهُ رَجُلٌ لَمْ يَكُنْ لِغَيْرِهِ اَنْ يَأْخُذَهُ مِنْهُ؛ لِاَنَّهُ ثَبَتَ حَقُّ الْحِفْظِ لَهُ لِسَبْقِ يَدِهِ فَاِنْ اِدَّعٰى مُدَّعٍ اَنَّهُ اِبْنُهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ. مَعْنَاهُ : اِذَا لَمْ يَدَّعِ الْمُلْتَقِطُ نَسَبَهُ وَهٰذَا اِسْتِحْسَانٌ. وَالْقِيَاسُ اَنْ لَا يُقْبَلَ قَوْلُهُ؛ لِاَنَّهُ يَتَضَمَّنُ اِبْطَالَ حَقِّ الْمُلْتَقِطِ. وَجْهُ الْاِسْتِحْسَانِ اَنَّهُ اِقْرَارٌ لِلصَّبِيِّ بِمَا يَنْفَعُهُ؛ لِاَنَّهُ يَتَشَرَّفُ بِالنَّسَبِ وَيُعَيَّرُ بِعَدَمِهِ . ثُمَّ قِيْلَ يَصِحُّ فِيْ حَقِّهِ دُوْنَ اِبْطَالِ يَدِ الْمُلْتَقِطِ . وَقِيْلَ يُبْتَنٰى عَلَيْهِ بُطْلَانُ يَدِهِ، وَلَوِ ادَّعَاهُ الْمُلْتَقِطُ قِيْلَ يَصِحُّ قِيَاسًا وَاسْتِحْسَانًا، وَالْاَصَحُّ اَنَّهُ عَلَى الْقِيَاسِ وَالْاِسْتِحْسَانِ وَقَدْ عُرِفَ فِي الْاَصْلِ.

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, **কোনো লোক যদি তাকে কুড়িয়ে আনে তাহলে তার কাছ থেকে তাকে নিয়ে নেওয়ার অন্য কারো অধিকার নেই।** কেননা তার হাত বা নিয়ন্ত্রণ অগ্রবর্তী হওয়ার কারণে সংরক্ষণ অধিকার তার জন্য সাব্যস্ত হয়েছে। **কেউ যদি দাবি করে যে, এটা তার সন্তান, তাহলে তার দাবিই গ্রহণযোগ্য।** অর্থাৎ যে কুড়িয়ে এনেছে, সে যদি তার বংশ সম্পর্কে দাবি না করে। এটা হলো সূক্ষ্ম কিয়াসের দাবি। পক্ষান্তরে কিয়াসের দাবি এই যে, তার দাবি গ্রহণ করা হবে না। কেননা এ দাবি, যে ব্যক্তি কুড়িয়ে এনেছে তার হক বাতিল করাকে অন্তর্ভুক্ত করে।

সূক্ষ্ম কিয়াসের কারণ এই যে, এ দাবির মধ্যে শিশুর জন্য কল্যাণকর বিষয়ের স্বীকৃতি রয়েছে। কেননা এর দ্বারা শিশুটি বংশ পরিচয়ের মর্যাদা লাভ করবে, আর বংশ পরিচয়হীনতার কারণে মানুষ তিরস্কৃত হয়ে থাকে।

আবার কেউ কেউ বলেছেন, কুড়ানেওয়ালা ব্যক্তির হস্তনিয়ন্ত্রণ বাতিল না করে দাবিদারের জন্য বংশ পরিচয় সাব্যস্ত হবে। আর কারো কারো মতে, কুড়ানেওয়ালার নিয়ন্ত্রণ বাতিল হওয়ার বিষয়টি এর উপর নির্ভর করবে।

আর কুড়ানেওয়ালা ব্যক্তি যদি বংশ সম্পর্কে দাবি করে তাহলে কোনো কোনো মতে কিয়াস ও সূক্ষ্ম কিয়াস উভয় বিচারেই এ দাবি শুদ্ধ হবে। কিন্তু বিশুদ্ধতম মত এই যে, তাতে কিয়াস ও সূক্ষ্ম কিয়াসের দাবি ভিন্ন ভিন্ন। মাবসূতে তার বিশদ আলোচনা রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কুড়িয়ে পাওয়া জিনিসটি মুবাহ বস্তু বা সম্পদের ন্যায়। আর মুবাহ বস্তুর ক্ষেত্রে নিয়ম হলো, যে ব্যক্তি তা আগে দখল করবে সেই তার মালিক হবে। অন্য কেউ তার কাছ থেকে নিতে পারবে না। যেমন- ঘাস, পানি, কাঠ-কড়ি ইত্যাদি। এসবের উপর যার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই মালিক হয়ে যায়। তদ্রূপ কুড়িয়ে পাওয়া শিশুও। তাকে যে ব্যক্তি প্রথম কুড়িয়ে নিবে, তার জন্যই সংরক্ষণ ক্ষমতা সাব্যস্ত হবে। অন্য কেউ তাকে তার কাছ থেকে নিতে পারবে না।

قوله : فَاِنْ اِدَّعٰى مُدَّعٍ اَنَّهُ اِبْنُهُ الخ : শিশুকে কুড়িয়ে আনার পর যদি কেউ এসে এমন দাবি করে যে, এটি আমার সন্তান, তাহলে তার এ দাবি গ্রহণযোগ্য হবে কি-না? এ ক্ষেত্রে দেখতে হবে, যে ব্যক্তি শিশুকে কুড়িয়ে এনেছে তার কোনো দাবি আছে কি-না, যদি সে কোনোরকম বংশ সম্পর্কের দাবি না করে তাহলে সন্তান বলে দাবিকারী ব্যক্তির দাবি গ্রহণযোগ্য হবে। তবে তার দাবি গ্রহণযোগ্য হওয়ার বিষয়টি ইস্তিহসান অনুযায়ী, কিয়াস অনুযায়ী নয়। কিয়াসের চাহিদা হলো, তার দাবি গ্রহণযোগ্য না হওয়া। কেননা তার দাবি গ্রহণযোগ্য হলে কুড়ানেওয়ালা ব্যক্তির সংরক্ষণ অধিকার বিনষ্ট হয়ে যায়। তথাপি ইস্তিহসানের ভিত্তিতে তার দাবি গ্রহণযোগ্য হবে। কারণ তাতে শিশুর কল্যাণ রয়েছে।

শিশু বংশ পরিচয়ের অধিকারী হচ্ছে। অন্যথায় সে সারা জীবন বংশ পরিচয়হীন থেকে যেত, যা ছিল লজ্জার কারণ। অতএব, ইস্তিহসানের ভিত্তিতে সন্তান বলে দাবিকারীর দাবি গ্রহণযোগ্য হবে।

পক্ষান্তরে শিশুকে যে কুড়িয়ে এনেছে সে নিজেই যদি এ দাবি করে যে এটি আমার সন্তান, তাহলে তার দাবিই গ্রহণযোগ্য হবে। কারণ উক্ত শিশুর উপর পূর্ব থেকে তার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত আছে। তাই তার দাবি অগ্রগণ্য।

https://e-ilm.weebly.com/

وَإِنْ ادَّعَاهُ اثْنَانِ وَوَصَفَ أَحَدُهُمَا عَلَامَةً فِيْ جَسَدِهِ فَهُوَ أَوْلَى بِهِ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ شَاهِدٌ لَهُ لِمُوَافَقَةِ الْعَلَامَةِ كَلَامَهُ، وَإِنْ لَمْ يَصِفْ أَحَدُهُمَا عَلَامَةً فَهُوَ ابْنُهُمَا لِاسْتِوَائِهِمَا فِي السَّبَبِ. وَلَوْ سَبَقَتْ دَعْوَةُ أَحَدِهِمَا فَهُوَ ابْنُهُ؛ لِأَنَّهُ ثَبَتَ حَقُّهُ فِيْ زَمَانٍ لَا مُنَازِعَ لَهُ فِيْهِ إِلَّا إِذَا أَقَامَ الْآخَرُ الْبَيِّنَةَ؛ لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ أَقْوَى . وَإِذَا وُجِدَ فِيْ مِصْرٍ مِنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِيْنَ أَوْ فِيْ قَرْيَةٍ مِنْ قُرَاهُمْ فَادَّعَى ذِمِّيٌّ أَنَّهُ ابْنُهُ ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ وَكَانَ مُسْلِمًا وَهٰذَا اسْتِحْسَانٌ؛ لِأَنَّ دَعْوَاهُ تَضَمَّنَ النَّسَبَ وَهُوَ نَافِعٌ لِلصَّغِيْرِ، وَإِبْطَالَ الْإِسْلَامِ الثَّابِتِ بِالدَّارِ وَهُوَ يَضُرُّهُ فَصَحَّتْ دَعْوَتُهُ فِيْمَا يَنْفَعُهُ دُوْنَ مَا يَضُرُّهُ .

অনুবাদ : আর দুই ব্যক্তি যদি তার বংশ সম্পর্কে দাবি করে এবং একজন কোনো শারীরিক আলামত বলতে পারে তাহলে সে তার অধিক হকদার হবে। কেননা শারীরিক আলামত তার বক্তব্যের অনুযায়ী হওয়ার কারণে বাহ্যিক অবস্থা তার অনুকূলে সাক্ষ্য দিচ্ছে। **পক্ষান্তরে উভয়ের কেউ যদি কোনো আলামত বলতে না পারে, তাহলে** সববের ক্ষেত্রে উভয়ের সমকক্ষতার কারণে **সে উভয়ের সন্তান হবে। আর যদি একজন আগে দাবি উথাপন করে তাহলে সে তার পুত্র হয়ে যাবে।** কেননা তার দাবি এমন সময়ে সাব্যস্ত হয়েছে যখন তার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। **তবে যদি অপর পক্ষ প্রমাণ পেশ করে তাহলে তা ভিন্ন কথা।** কেননা সাক্ষ্য প্রমাণ অধিক শক্তিশালী।

মুসলমানদের কোনো শহরে বা মুসলমানদের কোনো গ্রামে যদি তাকে পাওয়া যায়, আর কোনো জিম্মি তাকে আপন পুত্র বলে দাবি করে, তাহলে তার সাথে তার বংশ সম্পর্ক সাব্যস্ত হবে এবং শিশুটি মুসলমান বলে গণ্য হবে।

এ হলো সূক্ষ্ম কিয়াসের দাবি। কেননা তার দাবি বংশ সম্পর্ক অন্তর্ভুক্ত করে, যা ছোট শিশুর জন্য উপকারী তদ্রূপ তা বাসভূমির অনুবর্তিতা দ্বারা সাব্যস্ত মুসলিম পরিচয় নাকচ করাকেও অন্তর্ভুক্ত করে যা তার জন্য ক্ষতিকর। সুতরাং শিশুর জন্য কল্যাণকর বিষয়ে তার দাবি শুদ্ধ হবে, ক্ষতিকর বিষয়ে নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিউক্ত ইবারতের সার-সংক্ষেপ এই যে, কুড়ানেওয়ালা ব্যক্তি ছাড়া অন্য দু'জন লোক যদি একসাথে এমন দাবি করে যে এটি আমার সন্তান, তাহলে তাদেরকে শিশুর শারীরিক আলামত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে : যদি তাদের কোনো একজন শারীরিক আলামত বর্ণনা করতে পারে এবং তা বাস্তব সম্মত হয়, তাহলে তার দাবিই গ্রহণযোগ্য হবে। আর দু'জনের একজনও যদি কোনো আলামত বর্ণনা করতে না পারে, তাহলে শিশুটি উভয় দাবিদারের সন্তান বলে গণ্য হবে। যেহেতু দাবির ক্ষেত্রে উভয় দাবিদার সমান। কারো উপর অন্যকে প্রাধান্য দেওয়া যাচ্ছে না।

ইমাম শাফেয়ী (র.), আহমদ ইবনে হাম্বল (র.), ইমাম আওযায়ী (র.) ইমাম আবূ ছাউর (র.) প্রমুখ বলেন, দাবিদার একাধিক হওয়া অবস্থায় পদচিহ্ন বিশারদের কথা গ্রহণযোগ্য হবে। আলামত বর্ণনার কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই।

দু'জন দাবিদারের মধ্যে যদি একজন আগে ও আরেকজন পরে দাবি করে, তাহলে যে আগে দাবি করেছে তার দাবিই গ্রহণযোগ্য হবে। যেহেতু তার কোনো প্রতিপক্ষ নেই। তবে যে ব্যক্তি পরে দাবি করেছে সে যদি নিজ দাবির পক্ষে সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করে তাহলে তখন সেই প্রমাণই অগ্রাধিকার পাবে। পরবর্তী দাবিদারের কথা গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা সাক্ষ্য প্রমাণ অধিক শক্তিশালী।

قوله : وَإِذَا وُجِدَ فِيْ مِصْرٍ مِنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِيْنَ الخ : মুসলিম জনপদে প্রাপ্ত শিশুর ব্যাপারে যদি জিম্মি দাবি করে যে, সে তার সন্তান তাহলে এ দাবিতে শিশুর জন্য ভালো ও মন্দ দুটি দিক থাকে। ভালোর দিকটি হলো, শিশুর বংশ পরিচয় সাব্যস্ত হওয়ার তার ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা হওয়া। আর মন্দ দিকটি হলো শিশুর মুসলিম পরিচয় বিনষ্ট হওয়া। তাই এ দাবিটি কেবল ভালো দিকের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হবে। মন্দ দিকের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হবে না। অতএব, জিম্মির দাবি অনুসারে প্রাপ্ত শিশু তার সন্তান বলে বিবেচিত হবে। কিন্তু সন্তানটি মুসলিম থেকে যাবে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَإِنْ وُجِدَ فِيْ قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى أَهْلِ الذِّمَّةِ أَوْ فِيْ بِيْعَةٍ أَوْ كَنِيْسَةٍ كَانَ ذِمِّيًّا وَهٰذَا الْجَوَابُ فِيْمَا إِذَا كَانَ الْوَاجِدُ ذِمِّيًّا رِوَايَةً وَاحِدَةً، وَإِنْ كَانَ الْوَاجِدُ مُسْلِمًا فِيْ هٰذَا الْمَكَانِ أَوْ ذِمِّيًّا فِيْ مَكَانِ الْمُسْلِمِيْنَ اِخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ فِيْهِ، فَفِيْ رِوَايَةِ كِتَابِ اللَّقِيْطِ أُعْتُبِرَ الْمَكَانُ لِسَبْقِهِ، وَفِيْ كِتَابِ الدَّعْوٰى فِيْ بَعْضِ النُّسَخِ أُعْتُبِرَ الْوَاجِدُ وَهُوَ رِوَايَةُ ابْنِ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رحـ لِقُوَّةِ الْيَدِ؛ أَلَا تَرَى أَنَّ تَبَعِيَّةَ الْأَبَوَيْنِ فَوْقَ تَبَعِيَّةِ الدَّارِ حَتّٰى إِذَا سُبِيَ مَعَ الصَّغِيْرِ أَحَدُهُمَا يُعْتَبَرُ كَافِرًا، وَفِيْ بَعْضِ نُسَخِهِ أُعْتُبِرَ الْإِسْلَامُ نَظَرًا لِلصَّغِيْرِ .

অনুবাদ : **যদি জিম্মিদের কোনো লোকালয়ে কিংবা ইহুদি উপাসনালয়ে কিংবা গীর্জায় পাওয়া যায়, তাহলে জিম্মিরূপে গণ্য হবে।** উদ্ধারকারী ব্যক্তি জিম্মি হওয়ার ক্ষেত্রে এ হুকুম হওয়া সম্পর্কে একটিই রেওয়ায়েত রয়েছে। পক্ষান্তরে এসকল স্থান থেকে উদ্ধারকারী যদি মুসলিম হয় কিংবা মুসলমানদের স্থান থেকে উদ্ধারকারী ব্যক্তি যদি জিম্মি হয় তাহলে সে সম্পর্কে রেওয়ায়েতের বিভিন্নতা রয়েছে। 'মাবসূত' এর লাকীত অধ্যায়ে স্থানের বিষয়টি বিবেচনা করা হয়েছে। কেননা স্থানের সাথে তার সম্পর্ক অগ্রবর্তী হয়েছে।

পক্ষান্তরে দাওয়া বা দাবি সম্পর্কিত অধ্যায়ে কোনো কোনো অনুলিপি অনুযায়ী উদ্ধারকারীকে বিবেচনা করা হয়েছে। কব্জার বিষয় শক্তিশালী হওয়ার কারণে এটি ইমাম মুহাম্মদ (র.) হতে ইবনে সাম্মাআর বর্ণনা।

তুমি কি লক্ষ্য করছ না যে, একারণেই পিতা-মাতার অনুবর্তিতা বাসভূমির অনুবর্তিতা অপেক্ষা বেশি শক্তিশালী। এমনকি শিশুর সাথে যদি পিতা-মাতার কোনো একজন বন্দি হয় তাহলে শিশুটিকে কাফের বিবেচনা করা হয়। আর কোনো অনুলিপিতে শিশুর কল্যাণের প্রেক্ষিতে মুসলিম পরিচয় বিবেচিত হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিউক্ত ইবারতে কুড়িয়ে পাওয়া শিশুর একাধিক অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে।

১. বিধর্মীদের সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো স্থান হতে যদি কোনো জিম্মি লোক শিশুটিকে কুড়িয়ে আনে, তাহলে সে শিশুটি জিম্মি হবে এ ব্যাপারে কোনো মতভিন্নতা নেই।

২. জিম্মিদের সাথে সংশ্লিষ্ট স্থান হতে যদি মুসলমান ব্যক্তি কুড়িয়ে আনে, কিংবা মুসলমানদের সাথে সংশ্লিষ্ট স্থান হতে জিম্মি ব্যক্তি কুড়িয়ে আনে তাহলে শিশুটি কী হবে, এ নিয়ে মত ভিন্নতা রয়েছে।

১. মাবসূত কিতাবের লাকীত অধ্যায়ের বর্ণনা অনুযায়ী যে স্থানে শিশুকে পাওয়া গেছে, সে স্থানের বিবেচনা করা হবে। অর্থাৎ যদি মুসলমানদের সাথে সংশ্লিষ্ট স্থানে পাওয়া যায়, তাহলে শিশু মুসলমান বলে গণ্য হবে। আর জিম্মিদের সাথে সংশ্লিষ্ট স্থানে পাওয়া গেলে শিশুটি জিম্মি বলে গণ্য হবে।

২. মাবসূত কিতাবের কোনো নুসখায় দাবি-দাওয়া অধ্যায়ে কুড়ানেওয়ালা ব্যক্তির বিবেচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ সেখানে বলা হয়েছে, শিশুকে উদ্ধারকারী ব্যক্তি যদি মুসলিম হয়, তাহলে শিশুও মুসলিম বলে গণ্য হবে। আর উদ্ধারকারী ব্যক্তি জিম্মি হলে শিশুও জিম্মি বলে গণ্য হবে।

৩. মাবসূত কিতাবের অন্য কিছু অনুলিপিতে দাবি-দাওয়া অধ্যায়ে বলা হয়েছে, মুসলমানদের স্থানে অমুসলিম ব্যক্তি উদ্ধার করুক কিংবা অমুসলিম স্থানে মুসলিম ব্যক্তি উদ্ধার করুক, উভয় অবস্থায় শিশু মুসলিম হিসাবে পরিগণিত হবে কেননা মুসলিম বলে গণ্য হওয়া শিশুর পক্ষে কল্যাণকর। তাই তার কল্যাণ বিবেচনা করে মুসলিম বলে গণ্য করা হবে। পক্ষান্তরে কাফের বলে গণ্য হওয়া শিশুর জন্য ক্ষতিকর। তাই তাকে কাফের গণ্য করা হবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

وَمَنِ ادَّعَى اَنَّ اللَّقِيْطَ عَبْدُهُ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ؛ لِاَنَّهُ حُرٌّ ظَاهِرًا اِلَّا اَنْ يُقِيْمَ الْبَيِّنَةَ اَنَّهُ عَبْدُهُ فَاِنْ اِدَّعَى عَبْدٌ اَنَّهُ اِبْنُهُ ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ؛ لِاَنَّهُ يَنْفَعُهُ وَكَانَ حُرًّا؛ لِاَنَّ الْمَمْلُوْكَ قَدْ تَلِدُ لَهُ الْحُرَّةُ فَلَا تَبْطُلُ الْحُرِّيَّةُ الظَّاهِرَةُ بِالشَّكِّ وَالْحُرُّ فِيْ دَعْوَتِهِ اللَّقِيْطَ اَوْلَى مِنَ الْعَبْدِ، وَالْمُسْلِمُ اَوْلَى مِنَ الذِّمِّيِّ تَرْجِيْحًا لِمَا هُوَ الْاَنْظَرُ فِيْ حَقِّهِ .

অনুবাদ : কেউ যদি দাবি করে যে, কুড়িয়ে পাওয়া শিশুটি তার গোলাম, তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা বাহ্যতঃ সে স্বাধীন। তবে যদি গোলাম হওয়ার অনুকূলে সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করতে পারে, (তাহলে তার দাবি গ্রহণযোগ্য হবে।) আর যদি কোনো দাস তাকে নিজের পুত্র বলে দাবি করে তাহলে তার সাথে তার বংশ সম্পর্ক সাব্যস্ত হবে।

কেননা এটা তার জন্য কল্যাণকর হবে। আর শিশুটি স্বাধীন হবে। কেননা স্বাধীন স্ত্রী দাসের ঔরসে সন্তান প্রসব করতে পারে। সুতরাং নিছক সন্দেহের কারণে বাহ্যতঃ সাব্যস্ত স্বাধীনতা বাতিল হবে না।

লাকীতের বংশ সম্পর্কে দাবি করার ক্ষেত্রে স্বাধীন ব্যক্তি গোলামের উপর অগ্রাধিকার পাবে। মুসলমান ব্যক্তি জিম্মির উপর অগ্রাধিকার পাবে। তার পক্ষে যেটা কল্যাণজনক সেটাকে অগ্রাধিকার প্রদান করার প্রেক্ষিতে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিউক্ত ইবারতে তিনটি মাসআলা আলোচিত হয়েছে।

১. কেউ যদি কুড়িয়ে পাওয়া শিশু সম্পর্কে এমন দাবি করে যে এটা আমার গোলাম; তাহলে তার দাবি গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা বাহ্যিকভাবে উক্ত শিশু স্বাধীন বলে গণ্য হয়েছে। অতএব, তার এ স্বাধীনতা একজনের দাবির দ্বারা পণ্ড হয়ে যাবে না। তবে যদি দাবিদার তার দাবির পক্ষে প্রমাণ পেশ করতে পারে, তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবে।

২. কোনো গোলাম যদি কুড়িয়ে পাওয়া শিশু সম্পর্কে এমন দাবি করে যে, সে তার পুত্র। তাহলে তার সাথে শিশুর বংশ সম্পর্ক স্থাপিত হবে। কেননা বংশ সম্পর্ক স্থাপিত হওয়াতে শিশুর কল্যাণ রয়েছে। তবে শিশুটি গোলাম হবে না। বরং সে স্বাধীন বলেই বিবেচিত হবে। কেননা গোলামের ঔরসে স্বাধীন সন্তান জন্মলাভ করা সম্ভব। যেমন- গোলামের স্ত্রী যদি স্বাধীন না হয়, তাহলে তার ঐরসজাত সন্তানও স্বাধীন হয়। বিধায় আলোচ্য সুরতে গোলাম হওয়াতে শিশুর ক্ষতি থাকার কারণে তাকে গোলাম বলে আখ্যায়িত করা হবে না। বরং বাহ্যিকভাবে সে স্বাধীন বলে সাব্যস্ত হওয়ার কারণে সে স্বাধীনই থাকবে।

৩. কুড়িয়ে পাওয়ার শিশুর দাবির ক্ষেত্রে একজন যদি স্বাধীন ও অপরজন গোলাম হয়, তাহলে স্বাধীন ব্যক্তি গোলামের উপর প্রাধান্য পাবে। অনুরূপ একজন যদি মুসলিম হয় এবং অপর জন জিম্মি হয় তাহলে জিম্মির উপর মুসলমানের দাবি প্রাধান্য পাবে।

এ প্রাধান্যের কারণ হলো শিশুর কল্যাণ কামনা। কেননা গোলামের সাথে বংশ সম্পর্ক স্থাপন হওয়া অপেক্ষা স্বাধীন ব্যক্তির সাথে বংশ সম্পর্ক স্থাপন হওয়া শিশুর জন্য অধিক কল্যাণকর। তদ্রূপ, জিম্মির সাথে সম্পর্ক হওয়ার তুলনায় মুসলমানের সাথে সম্পর্ক হওয়া শিশুর জন্য বেশি লাভজনক। তাই শিশুর কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রেখেই উপরিউক্ত তারজীহ।

https://e-ilm.weebly.com/

وَإِنْ وُجِدَ مَعَ اللَّقِيْطِ مَالٌ مَشْدُوْدٌ عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُ اِعْتِبَارًا لِلظَّاهِرِ . وَكَذَا اِذَا كَانَ مَشْدُوْدًا عَلَى دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَيْهَا لِمَا ذَكَرْنَا ثُمَّ يَصْرِفُهُ الْوَاجِدُ اِلَيْهِ بِاَمْرِ الْقَاضِيْ؛ لِاَنَّهُ مَالٌ ضَائِعٌ وَلِلْقَاضِيْ وِلَايَةُ صَرْفِ مِثْلِهِ اِلَيْهِ . وَقِيْلَ يَصْرِفُهُ بِغَيْرِ اَمْرِ الْقَاضِيْ؛ لِاَنَّهُ لِلَّقِيْطِ ظَاهِرًا وَلَهُ وِلَايَةُ الْاِنْفَاقِ وَشِرَاءُ مَا لَابُدَّ لَهُ مِنْهُ كَالطَّعَامِ وَالْكِسْوَةِ؛ لِاَنَّهُ مِنَ الْاِنْفَاقِ لَهُ وَلَا يَجُوْزُ تَزْوِيْجُ الْمُلْتَقِطِ لِانْعِدَامِ سَبَبِ الْوِلَايَةِ مِنَ الْقَرَابَةِ وَالْمِلْكِ وَالسَّلْطَنَةِ ـ

অনুবাদ : লাকীতের সাথে জড়ানো অবস্থায় যদি কোনো মাল পাওয়া যায়, তাহলে তা তারই হবে। এটা হবে বাহ্যিক অবস্থা বিবেচনার প্রেক্ষিতে। উল্লিখিত কারণে একই হুকুম হবে যদি মাল বাহনের সাথে বাঁধা থাকে এবং সে থাকে বহনের উপরে। অতঃপর উদ্ধারকারী কাজির আদেশে সে মাল শিশুর জন্য ব্যয় করবে। কেননা এ মাল বিনাশমুখী। আর কাজির এ ধরনের মাল তার জন্য ব্যয় করার কর্তৃত্ব রয়েছে। আর কেউ কেউ বলেন, কাজির আদেশ ছাড়াই সে লাকীতের জন্য ব্যয় করতে পারে। কেননা বাহ্যতঃ তা লাকীতেরই মাল। **সেই মাল থেকে তার জন্য খরচ করার এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় আসবাব খরিদ করার অধিকার উদ্ধারকারীর রয়েছে।** যেমন– খাদ্য ও বস্ত্র। কেননা তা তার জন্য খরচ করার অন্তর্ভুক্ত। **উদ্ধারকারীর পক্ষ হতে তাকে বিবাহ দেওয়া বৈধ নয়।** কেননা অভিভাবকত্বের কারণ তথা আত্মীয়তা, মালিকানা ও শাসন কর্তৃত্ব কোনোটাই তার জন্য বিদ্যমান নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

লাকীত যেহেতু স্বাধীন, সেহেতু সে সম্পদের মালিক হওয়ার যোগ্য। আর যে সম্পদ তার সাথে বা তার বাহনের সাথে জড়ানো অবস্থায় পাওয়া যায়, তা তার দখলভুক্ত হওয়ার কারণে সে-ই উক্ত মালের মালিক। সুতরাং উদ্ধারকারী ব্যক্তি কাজির আদেশক্রমে, মতান্তরে কাজির আদেশ ছাড়া উক্ত সম্পদ লাকীতের জন্য ব্যয় করতে পারবে।

قَوْلُهُ : وَلَهُ وِلَايَةُ الْاِنْفَاقِ وَشِرَاءُ مَا لَا بُدَّ لَهُ الخ : উদ্ধারকারী ব্যক্তির যেহেতু লাকীতের জন্য খরচ করার অধিকার রয়েছে, সেহেতু সে তার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি খরিদ করতে পারবে। যেমন– শিশুর খাদ্য, বস্ত্র, ঔষধ ইত্যাদি। কারণ এসবই ইনফাকের অন্তর্ভুক্ত।

কিন্তু উদ্ধারকারী ব্যক্তি লাকীতকে বিবাহ করাতে পারবে না। কারণ বিবাহ করানোর কর্তৃত্ব বা অধিকার তার নেই; কেননা বিবাহ করানোর কর্তৃত্ব বা অধিকার তিনটি বিষয়ের দ্বারা সাব্যস্ত হয়। বিষয়গুলো হলো– আত্মীয়তা, মালিকানা ও শাসন ক্ষমতা। উল্লেখ্য উদ্ধারকারী ব্যক্তির মাঝে তিনটি বিষয়ের কোনোটি বিদ্যমান নেই। বিধায় লাকীতকে বিবাহ করানোর অধিকার তার জন্য সাব্যস্ত নয়।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ وَلَا تَصَرُّفُهُ فِيْ مَالِ الْمُلْتَقِطِ اِعْتِبَارًا بِالْأُمِّ، وَهٰذَا؛ لِاَنَّ وِلَايَةَ التَّصَرُّفِ لِتَثْمِيْرِ الْمَالِ وَذٰلِكَ يَتَحَقَّقُ بِالرَّأْيِ الْكَامِلِ وَالشَّفَقَةِ الْوَافِرَةِ وَالْمَوْجُوْدُ فِيْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اَحَدُهُمَا. قَالَ : وَيَجُوْزُ اَنْ يَقْبِضَ لَهُ الْهِبَةَ؛ لِاَنَّهُ نَفْعٌ مَحْضٌ وَلِهٰذَا يَمْلِكُهُ الصَّغِيْرُ بِنَفْسِهٖ اِذَا كَانَ عَاقِلًا وَتَمْلِكُهُ الْاُمُّ وَوَصِيُّهَا. قَالَ وَيُسَلِّمُهُ فِيْ صِنَاعَةٍ؛ لِاَنَّهُ مِنْ بَابِ تَثْقِيْفِهٖ وَحِفْظِ حَالِهٖ قَالَ وَيُؤَاجِرُهُ قَالَ الْعَبْدُ الضَّعِيْفُ : وَهٰذَا رِوَايَةُ الْقُدُوْرِيِّ فِيْ مُخْتَصَرِهٖ، وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ : لَا يَجُوْزُ اَنْ يُؤَاجِرَهُ، ذَكَرَهُ فِي الْكَرَاهِيَةِ وَهُوَ الْاَصَحُّ . وَجْهُ الْاَوَّلِ اَنَّهُ يَرْجِعُ اِلٰى تَثْقِيْفِهٖ . وَوَجْهُ الثَّانِيْ اَنَّهُ لَا يَمْلِكُ اِتْلَافَ مَنَافِعِهٖ فَاَشْبَهَ الْعَمَّ . بِخِلَافِ الْاُمِّ؛ لِاَنَّهَا تَمْلِكُهُ عَلٰى مَا نَذْكُرُهُ فِي الْكَرَاهِيَةِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, **লাকীতের মালে কারবার করা তার জন্য বৈধ নয়।** (এ সিদ্ধান্ত হয়েছে) লাকীতের মায়ের অবস্থার উপর কিয়াস করে। আর তা এজন্য যে, কারবারের অধিকার প্রদান করা হয় মাল পরিবর্ধনের জন্য। আর তা বাস্তবায়িত হতে পারে পূর্ণ বিচক্ষণতা ও পূর্ণ স্নেহ দ্বারা। অথচ উভয়ের প্রত্যেকের মাঝে দুটি গুণের একটি বিদ্যমান রয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, **উদ্ধারকারী তার অনুকূলে দান গ্রহণ করতে পারবে।** কেননা এটা নিরেট কল্যাণ; একারণেই নাবালক বোধসম্পন্ন হলে নিজেও তা গ্রহণ করতে পারে। আর মা এবং তার জন্য নিযুক্ত "অসী" (অভিভাবক)ও তা গ্রহণ করতে পারে।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, **উদ্ধারকারী ব্যক্তি লাকীত কে শিল্পকর্মে নিযুক্ত করতে পারবে।** কেননা এ হলো তাকে প্রশিক্ষিত করে তোলা এবং তার অবস্থার উৎকর্ষ সাধন করা।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, **সে তাকে মজুরির বিনিময়ে কাজে লাগাতে পারবে।**

অধম বান্দা (গ্রন্থকার) বলেন, এ হলো ইমাম কুদূরী (র.) -এর বর্ণনা তার রচিত মুখতাসার কিতাবে। পক্ষান্তরে জামে সাগীরের বর্ণনা মতে তা বৈধ নয়। ইমাম মুহাম্মদ (র.) মাকরূহ বিষয়ক আলোচনায় তা উল্লেখ করেছেন। এটাই বিশুদ্ধতম অভিমত। প্রথমোক্ত মতের কারণ এই যে, এটা তাকে প্রশিক্ষিত করে তোলার সাথে সম্পৃক্ত।

দ্বিতীয়োক্ত মতের কারণ এই যে, সে তার 'শ্রম-সুবিধা' বিনষ্ট করতে পারে না। সুতরাং সে শিশু চাচার সমতুল্য হলো। মায়ের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা মা তা করার অধিকার রাখে। মাকরূহ বিষয়ক অধ্যায়ে ইনশা-আল্লাহ আমরা তা আলোচনা করব।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিউক্ত ইবারতে তিনটি মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে।

১. উদ্ধারকারী ব্যক্তি লাকীতের সম্পদে ব্যবসায়িক তসররুফ করতে পারবে না বা তার সম্পদ দ্বারা কারবার করতে পারবে না। কারণ ব্যবসা বা কারবার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সম্পদ বাড়ানো। আর এটা নির্ভর করে দুটি গুণের উপর। এক. যে কারবার করবে তার মধ্যে পূর্ণ বুদ্ধিমাত্তা বা বিচক্ষণতা থাকা। দুই. লাকীতের প্রতি অত্যাধিক স্নেহশীল হওয়া। উদ্ধারকারী ব্যক্তি যদি পুরুষ হয়, তাহলে তার মাঝে বিচক্ষণতা আছে, কিন্তু স্নেহশীলতা নেই বিধায় তার

জন্য লাকীতের সম্পদ দ্বারা ব্যবসা করার অধিকার সাব্যস্ত হবে না। যেমন- লাকীতের মায়ের মধ্যে লাকীতের প্রতি অত্যাধিক স্নেহশীলতা আছে, কিন্তু বিচক্ষণতা না থাকার কারণে তার জন্যও লাকীতের সম্পদ ব্যবসায় খাটানোর অধিকার সাব্যস্ত হয় না।

অতএব, উক্ত মাসআলায় উদ্ধারকারীকে মায়ের সাথে কিয়াস করা হয়েছে।

২. উদ্ধারকারী ব্যক্তি মা, অসী সকলেই লাকীতের জন্য হেবা বা দান গ্রহণ করতে পারবে। কারণ এটা লাকীতের জন্য শুধুই একটি লাভজনক বিষয়। একারণে নাবালেগ সন্তানও নিজের জন্য দান গ্রহণ করতে পারে।

৩. উদ্ধারকারী ব্যক্তি লাকীতকে কোনো শিল্পকর্মে নিযুক্ত করতে পারবে। যেমন- সেলাই কাজ, মিস্ত্রির কাজ ইত্যাদি তাকে শেখাতে পারবে। কারণ এর দ্বারা তাকে প্রশিক্ষিত করে তোলা হয়। ভবিষ্যত জীবনে এর দ্বারা তার ফায়দা হয় এবং এর দ্বারা তাকে খেলা-ধূলায় সময় নষ্ট করা থেকে বাচিয়ে কর্মঠ করে তোলা হয়।

قوله : وَيُؤَاجِرُهُ قَالَ الْعَبْدُ الضَّعِيفُ الخ : উদ্ধারকারী ব্যক্তি লাকীতকে মজুরির বিনিময়ে শ্রমে নিযুক্ত করতে পারবে কি-না? এ সম্পর্কে দুটি রেওয়ায়েত রয়েছে।

১. ইমাম কুদূরীর রেওয়ায়েত হলো উদ্ধারকারী ব্যক্তি লাকীতকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে শ্রমে খাটাতে পারবে।

২. জামে সাগীরের রেওয়ায়েত হলো, পারিশ্রমিকের বিনিময়ে লাকীতকে শ্রমে খাটাতে পারবে না।

প্রথম রেওয়ায়েত অর্থাৎ ইমাম কুদূরী (র.) এর রেওয়ায়েতের পিছনে যুক্তি হলো, লাকীতকে মজুরির বিনিময়ে শ্রমে খাটানো এটা তাকে প্রশিক্ষিত করে তোলারই অন্তর্ভুক্ত। সে সিহাবে উদ্ধারকারীর জন্য তা করা জায়েজ হবে।

আর দ্বিতীয় বর্ণনা তথা জামে সাগীরের বর্ণনার পিছনে যুক্তি হলো, উদ্ধারকারী ব্যক্তি শিশুর চাচার ন্যায়। আর চাচার অধিকার নেই ভাতিজাকে মজুরির বিনিময়ে শ্রমে খাটানোর। অতএব, উদ্ধারকারীরও অধিকার নেই লাকীত কে শ্রমে খাটানোর। কেননা লাকীতের শ্রম-সুবিধা বিনষ্ট করার অধিকার তার নেই। এ বর্ণনাটিই অধিক বিশুদ্ধ। ইমাম মুহাম্মদ (র.) এটি মাকরূহ বিষয়ক অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন।

প্রকাশ থাকে যে, উপরিউক্ত দুটি বর্ণনার মাঝে বাহ্যতঃ বিরোধ পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু حاشية إبي السعود، البحر الرائق، قهستاني ইত্যাদি কিতাবের আলোচনার সমন্বয়ে এটা প্রতিভাত হয় যে, উপরিউক্ত বর্ণনা দুটির মাঝে প্রকৃতপক্ষে কোনো বিরোধ নেই।

তা এভাবে যে, লাকীতকে শ্রমে নিয়োগ করার বিষয়টি বৈধ বা অবৈধ হওয়া নির্ভর করে পারিশ্রমিক কে নিবে? সে প্রশ্নের উপর। লাকীতের শ্রমের বিনিময়ে উপার্জিত পরিশ্রমিক যদি উদ্ধারকারী ব্যক্তি নিয়ে যায়, তাহলে তা সবার মতেই নাজায়েজ। আর যদি উপার্জিত পারিশ্রমিক লাকীতের জন্যই সংরক্ষিত রাখা হয়, তাহলে তা সবার মতেই জায়েজ।

সুতরাং এ তাফসীর সামনে রেখে ইমাম কুদূরী ও জামে সাগীরের বর্ণনার মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করা সহজ।

ইমাম কুদূরী (র.) যে তার মুখতাসারে উল্লেখ করেছেন, লাকীতকে মজুরির বিনিময়ে শ্রমে নিয়োগ করা উদ্ধারকারীর জন্য জায়েজ এর অর্থ হলো, উপার্জিত অর্থ- লাকীতের জন্য থাকার শর্তে।

আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) যে, জামে সাগীরে বলেছেন, লাকীতকে মুজরির বিনিময়ে নিয়োগ করা জায়েজ নেই। তার অর্থ হলো- উপর্জিত অর্থ লাকীতের জন্য না রেখে উদ্ধারকারী ব্যক্তি নিজে নিয়ে গেলে।

অতএব, প্রমাণিত হলো যে, কুদূরী ও জামে সাগীরের বর্ণনার মাঝে বাহ্যিকভাবে বিরোধ পরিলক্ষিত হলেও প্রকৃত পক্ষে দুইয়ের মাঝে কোনো বিরোধ নেই। -[দ্র : বেনায়া, পার্শ্বটীকা]

উল্লেখ্য যে, শিশুর মায়ের বিষয়টি ভিন্ন। অর্থাৎ শিশুর মাকে আলোচ্য মাসআলায় মুলতাকিত তথা উদ্ধারকারীর সাথে কিয়াস করা চলবে না।

কেননা পারিশ্রমিক নিয়ে যাওয়ার সুরতে লাকীতকে শ্রমে নিয়োগ করা উদ্ধারকারীর জন্য জায়েজ নয়। কিন্তু শিশুর মায়ের পক্ষে এমনটি করা জায়েজ আছে। কেননা শিশুকে কোনোরূপ পারিশ্রমিক ছাড়াই শ্রমে খাটিয়ে তার শ্রম-সুবিধা বিনষ্ট করার অধিকার মায়ের আছে। অতএব, পারিশ্রমিকের বিনিময়ে হলে সেটা আরো উত্তমরূপে তার জন্য বৈধ হবে।

গ্রন্থকার বলেন, এ প্রসঙ্গটি আমরা মাকরূহ বিষয়ক অংশে বিবিধ মাসআলার আধীনে আলোচনা করব ইনশা-আল্লাহ।

https://e-ilm.weebly.com/

كِتَابُ اللُّقْطَةِ

قَالَ اللُّقْطَةُ اَمَانَةٌ اِذَا اَشْهَدَ الْمُلْتَقِطُ اَنَّهُ يَاْخُذُهَا لِيَحْفَظَهَا وَيَرُدَّهَا عَلَى صَاحِبِهَا لِاَنَّ الْاَخْذَ عَلَى هٰذَا الْوَجْهِ مَاْذُوْنٌ فِيْهِ شَرْعًا بَلْ هُوَ الْاَفْضَلُ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ وَهُوَ الْوَاجِبُ اِذَا خَافَ الضَّيَاعَ عَلَى مَا قَالُوْا، وَاِذَا كَانَ كَذٰلِكَ لَا تَكُوْنُ مَضْمُوْنَةً عَلَيْهِ، وَكَذٰلِكَ اِذَا تَصَادَقَا اَنَّهُ اَخَذَهَا لِلْمَالِكِ لِاَنَّ تَصَادُقَهُمَا حُجَّةٌ فِيْ حَقِّهِمَا فَصَارَ كَالْبَيِّنَةِ، وَلَوْ اَقَرَّ اَنَّهُ اَخَذَهَا لِنَفْسِهِ يَضْمَنُ بِالْاِجْمَاعِ لِاَنَّهُ اَخَذَ مَالَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ اِذْنِهِ وَبِغَيْرِ اِذْنِ الشَّرْعِ، وَاِنْ لَمْ يَشْهَدِ الشُّهُوْدُ عَلَيْهِ وَقَالَ الْاٰخِذُ اَخَذْتُهُ لِلْمَالِكِ وَكَذَّبَهُ الْمَالِكُ يَضْمَنُ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ رحـ وَمُحَمَّدٍ رحـ. وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ رحـ : لَا يَضْمَنُ وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ لِاَنَّ الظَّاهِرَ شَاهِدٌ لَهُ لِاخْتِيَارِهِ الْحِسْبَةَ دُوْنَ الْمَعْصِيَةِ .

অধ্যায় : লোকতা বা কুড়ানো বস্তু প্রসঙ্গে

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কুড়িয়ে পাওয়া বস্তু আমানত হিসাবে থাকবে যখন কুড়ানেওয়ালা এই মর্মে সাক্ষী রাখবে যে, সে হেফাজত করা এবং মালিককে ফিরিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে তা উঠিয়ে নিচ্ছে। কেননা এ নিয়মে তুলে নেওয়া শরিয়ত অনুমোদিত বরং অধিকাংশ আলেমের মতে এটিই উত্তম। আর নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকলে তা ওয়াজিব। (আমাদের মাশায়েখগণ) এরূপই বলেছেন। আর এরূপ হলে তা তার জিম্মায় দায়যোগ্য হবে না। তদ্রূপ দায়যোগ্য হবে না যদি উদ্ধারকারী ও মালিক এ বিষয়ে একমত হয় যে, সে মালিককে ফেরত দেওয়ার জন্যই তুলেছিল। কেননা তাদের পরস্পরকে সমর্থন করা তাদের ক্ষেত্রে প্রমাণরূপে বিবেচিত; সুতরাং এটি বাইয়্যিনাহ বা সাক্ষ্য-প্রমাণের সমতুল্য হলো।

আর যদি সে স্বীকার করে যে, সে নিজে দখল করার জন্যই তুলেছিল তাহলে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তেই সে এর জামিন হবে। কেননা সে অন্যের মাল তার অনুমতি ছাড়া এবং শরিয়তের অনুমোদন ছাড়া নিয়েছে।

আর যদি (কুড়িয়ে নেওয়ার সময়) এ বিষয়ে সে সাক্ষী না রাখে এবং বলে যে মালিককে ফেরত দেওয়ার জন্যই তা তুলেছিলাম, কিন্তু মালিক তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র.) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র.)-এর মতে সে জামিন হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে সে জামিন হবে না; বরং উদ্ধারকারীর বক্তব্যই গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা বাহ্যিক অবস্থা তার অনুকূলে সাক্ষ্য দিচ্ছে এই হিসাবে যে, সে পুণ্যের পথ গ্রহণ করেছে পাপের পথ নয়।

https://e-ilm.weebly.com/

وَلَهُمَا أَنَّهُ أَقَرَّ بِسَبَبِ الضَّمَانِ وَهُوَ أَخْذُ مَالِ الْغَيْرِ وَادَّعَى مَا يُبَرِّئُهُ وَهُوَ الْأَخْذُ لِمَالِكِهِ وَفِيْهِ وَقَعَ الشَّكُّ فَلَا يَبْرَأُ، وَمَا ذُكِرَ مِنَ الظَّاهِرِ يُعَارِضُهُ مِثْلُهُ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنْ يَكُوْنَ الْمُتَصَرِّفُ عَامِلًا لِنَفْسِهِ وَيَكْفِيْهِ فِي الْإِشْهَادِ أَنْ يَقُوْلَ مَنْ سَمِعْتُمُوْهُ يَنْشُدُ لُقَطَةً فَدُلُّوْهُ عَلَيَّ وَاحِدَةً كَانَتْ اللُّقَطَةُ أَوْ أَكْثَرَ لِأَنَّهُ اسْمُ جِنْسٍ .

অনুবাদ : তরফাইনের দলিল এই যে, সে জামিন হওয়ার কারণ স্বীকার করে নিয়েছে। আর তা হলো অন্যের মাল তুলে নেওয়া। সেই সাথে এমন বিষয়ের দাবিও করেছে যা তাকে দায়মুক্ত করে। তা হলো মালিককে ফেরত দেওয়ার জন্য তুলে নেওয়া। আর এ ব্যাপারে সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে। সুতরাং সে দায়মুক্ত হবে না।

আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) যে বাহ্যিক অবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন, অনুরূপ একটি বাহ্যিক অবস্থা তার বিপরীতে রয়েছে। কেননা বাহ্যত কোনো পদক্ষেপ গ্রহণকারী নিজের জন্যই কার্য সম্পাদন করে থাকে।

সাক্ষী বানানোর ক্ষেত্রে উদ্ধারকারী ব্যক্তির এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে, যাকে তোমরা কোনো হারানো বস্তুর অনুসন্ধান ঘোষণা করতে শুনবে, তাকে তোমরা আমার ঠিকানা বলে দিবে। উদ্ধারকৃত বস্তু একপ্রকার হোক বা বিভিন্ন প্রকার হোক (শুধু হারানো বস্তু বলাই যথেষ্ট)। কেননা শব্দটি ব্যাপক।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

لَقِيْط ও لُقَطَة শব্দদ্বয় ل - ق - ط মূলধাতু হতে নির্গত। উভয়ের অর্থ কাছাকাছি। তবে لَقِيْط শব্দটি মানবের জন্য ব্যবহৃত হয় আর لُقَطَة মানব ছাড়া অন্য সব বস্তুর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। لَقِيْط শব্দের অর্থ হলো কুড়িয়ে আনা মানব শিশু। আর لُقَطَة শব্দের অর্থ হলো কুড়িয়ে আনা বস্তু বা সম্পদ।

اَللُّقَطَة শব্দের আভিধানিক বিশ্লেষণ :

لَقَطَ يَلْقُطُ لَقْطًا বাবে بَابِ نَصَرَ হতে। অর্থ হলো– কোনো বস্তু ভূমি থেকে উঠিয়ে নেওয়া। বিভিন্ন পুস্তক হতে জ্ঞান আহরণ করা, কাপড়ে তালি লাগানো ইত্যাদি। لُقَطَة এমন বস্তু যা রাস্তায় পড়ে থাকা অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে এবং উঠিয়ে আনা হয়েছে, কিংবা এমন পরিত্যক্ত বস্তু, যার মালিক জানা নেই।

প্রসিদ্ধ নাহবী খলীল ইবনে ঈসা হতে বর্ণিত আছে যে, لُقَطَة শব্দটির ق-এ যবর যোগে পড়া হলে তা হবে اِسْم فَاعِل যা مُلْتَقِط শব্দের সমার্থক। অর্থাৎ উদ্ধারকারী বা কুড়ানেওয়ালা ব্যক্তি। আর لُقْطَة শব্দটির ق এ সাকিন যোগে পড়া হলে তা হবে اِسْمِ مَفْعُوْل। অর্থ– হবে কুড়ানো বস্তু।

আসমায়ী, ইবনুল আরাবী, ফাররা প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে لُقَطَة এর ق-এ যবর দিয়ে কুড়ানো সম্পদ অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

اَللُّقَطَة-এর পারিভাষিক ধারণা : ফতোয়া তাতারখানিয়াতে لُقَطَة-এর সংজ্ঞা এভাবে দেওয়া হয়েছে যে,

اَللُّقَطَةُ مَالٌ يُوْجَدُ وَلَايُعْرَفُ لَهُ مَالِكٌ وَلَيْسَ بِمُبَاحٍ - অর্থাৎ লোকতা এমন সম্পদ যা কোথাও পরিত্যক্ত অবস্থায় পাওয়া যায়, কিন্তু তার মালিক জানা যায় না এবং তা ভোগ করা মুবাহ বা বৈধও নয়।

ইবারতের সারমর্ম : উপরিউক্ত ইবারতে পরিত্যক্ত বস্তু উঠিয়ে আনা সম্পর্কে একাধিক সুরত বর্ণনা করা হয়েছে।

সুরত-১ : পড়ে থাকা বস্তু কুড়িয়ে আনার সময় যদি এ মর্মে সাক্ষী রাখে যে, এ বস্তুটি সংরক্ষণের জন্য এবং মালিকের নিকট ফেরত দেওয়ার উদ্দেশ্যে কুড়িয়ে নিচ্ছি, তাহলে উক্ত কুড়িয়ে আনা বস্তু উদ্ধারকারীর নিকট আমানত হিসাবে থাকবে, জামানত হিসাবে নয়। অতএব, যদি তা ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে ভর্তুকি দিতে হবে না। কেননা সাক্ষী রাখার মাধ্যমে লোকতা উঠিয়ে আনা শরিয়ত কর্তৃক অনুমোদিত; বরং তা অধিকাংশ আলেমের মতে উত্তম। আর যদি সম্পদটি ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে তাহলে তা কুড়িয়ে আনা ওয়াজিব।

অতএব, শরিয়ত কর্তৃক অনুমোদিত কিংবা আবশ্যককৃত কাজ করার ফলে ব্যক্তির উপর কোনো দায় চাপতে পারে না, তাই কুড়ানো বস্তু তার কাছে আমানত স্বরূপ থাকবে। ধ্বংস হয়ে গেলে সে জামিন হবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

সুরত : ২. কুড়ানো বস্তু কুড়িয়ে আনার সময় ব্যক্তি কাউকে সাক্ষী রাখেনি। তবে লোকতার মালিক একথা বলে যে, সে আমার নিকট বস্তুটি পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই কুড়িয়ে এনেছে; নিজে ভোগ করার জন্য নয়। এমতাবস্থায়ও উদ্ধারকারী ব্যক্তি বস্তুটির জামিন হবে না। কারণ উদ্ধারকারীর পক্ষে মালিকের স্বীকারোক্তিটি সাক্ষ্য-প্রমাণতুল্য। তাই কুড়ানোর সময় সাক্ষী রাখা হলে যে হুকুম, মালিকের স্বীকারোক্তির সুরতেও সেই হুকুম। অর্থাৎ বস্তুটি উদ্ধারকারীর নিকট আমানত স্বরূপ থাকবে। ধ্বংস হয়ে গেলে সে তার জামিন হবে না।

সুরত : ৩. উদ্ধারকারী ব্যক্তি যদি একথা স্বীকার করে যে, আমি লোকতাটি উঠিয়ে এনেছিলাম নিজে ভোগ করার উদ্দেশ্যে, এমতাবস্থায় বস্তুটি ধ্বংস হয়ে গেলে সে তার জামিন হবে। অর্থাৎ ভর্তুকি দিতে হবে। এ ব্যাপারে সমস্ত আলেম একমত।

কারণ, উক্ত উদ্ধারকারী ব্যক্তি অন্যের মাল তার অনুমতি ও শরিয়তের অনুমতি ব্যতীত উঠিয়ে এনেছে। তাই উক্ত সম্পদ তার নিকট জামানত স্বরূপ থাকবে। ধ্বংস হলে ভর্তুকি দিতে হবে।

সুরত : ৪. লোকতা উঠিয়ে আনার সময় সাক্ষী রাখেনি এবং উদ্ধারকারী ব্যক্তি দাবি করছে যে, সে তা মালিকের নিকট পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই কুড়িয়ে এনেছে, কিন্তু লোকতার মালিক উদ্ধারকারীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে। অর্থাৎ মালিক একথা বলছে যে, তুমি তা আমার নিকট পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে কুড়িয়ে আননি; বরং নিজে ভোগ করার উদ্দেশ্যে কুড়িয়ে এনেছ। এমতাবস্থায় কুড়িয়ে আনা বস্তুটি উদ্ধারকারীর নিকট আমানত স্বরূপ থাকবে না-কি জামানত স্বরূপ থাকবে? অর্থাৎ ধ্বংস হয়ে গেলে ভর্তুকি দিতে হবে কি হবে না– এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে।

ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, আলোচ্য সুরতে উদ্ধারকারীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে না, তাই বস্তুটি তার কাছে জামানত বলে গণ্য হবে এবং ধ্বংস হয়ে গেলে সে জামিন হবে অর্থাৎ ভর্তুকি দিতে হবে।

পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, আলোচ্য সুরতে উদ্ধারকারীর বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে । বস্তুটি তার কাছে আমানত স্বরূপ থাকবে। ধ্বংস হলে ভর্তুকি দিতে হবে না।

ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) অনুরূপ মত পোষণ করেন। 'শরহুল আকতা' নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে, ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর বক্তব্যও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর বক্তব্যের অনুরূপ

দ্বিতীয় ফরীক তথা ইমাম আবূ ইউসুফ ও তার অনুরূপ মতাবলম্বীদের দলিল হলো, আলোচ্য সুরতে বাহ্যিক অবস্থা উদ্ধারকারীর পক্ষে সাক্ষ্য বহন করে। কেননা উদ্ধারকারী ব্যক্তিটি মুসলমান। আর মুসলমানের কোনো কাজ সাধারণভাবেই বৈধ বলে ধরতে হয়। অতএব, আলোচ্য ক্ষেত্রেও এটাই স্বাভাবিক যে, উদ্ধারকারী ব্যক্তি বস্তুটি মালিকের নিকট পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে এবং ছওয়াবের নিয়তে কুড়িয়েছে। অবৈধ পন্থায় তথা নিজে ভোগ করার জন্য কুড়িয়ে আনেনি। অতএব, এই বাহ্যিক অবস্থার সমর্থনের বলে উদ্ধারকারীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। তাছাড়া আরেকটি বিষয় হলো, আলোচ্য সুরতে লোকতার মালিক উদ্ধারকারীর বিরুদ্ধে এমন একটি বিষয় দাবি করছে, যার দ্বারা তার উপর যামান বা ভর্তুকি অপরিহার্য হয়। আর উদ্ধারকারী ব্যক্তি তার ইনকার বা অস্বীকার করছে। অতএব, অস্বীকারকারীর কথাই কসমসহ গ্রহণযোগ্য হবে। যেমন গসবের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

প্রথম পক্ষ অর্থাৎ ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর দলিল : আলোচ্য সুরতে উদ্ধারকারী ব্যক্তি এমন একটি বিষয় স্বীকার করেছে যা দ্বারা তার উপর যেমান ওয়াজিব হয় নিশ্চিতরূপে। তা হলো অন্যের মাল তার অনুমতি ছাড়া উঠিয়ে আনা। পাশাপাশি সে আরেকটি এমন বিষয় দাবি করছে, যা দ্বারা সে যামান থেকে মুক্তি পায়, তা হলো মালিকের নিকট পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্য উঠিয়ে আনার দাবি করা। কিন্তু তার এই দ্বিতীয় দাবিতে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিপক্ষের তাকযীব বা মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কারণে। অতএব, সন্দেহযুক্ত দ্বিতীয় দাবির দ্বারা সেই যেমন বাতিল হয়ে যাবে না, যা প্রথম দাবির দ্বারা বা স্বীকারোক্তি দ্বারা নিশ্চিতরূপে সাব্যস্ত হয়েছিল। কেননা মূলনীতি রয়েছে– اَلْيَقِيْنُ لَا يَزُوْلُ بِالشَّكِّ (নিশ্চিতরূপে সাব্যস্ত বিষয় সন্দেহ দ্বারা নাকচ হয় না।) অতএব, উদ্ধারকারীর উপর ضمان ওয়াজিব হবে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিলের জবাব : ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) যে বাহ্যিক অবস্থাকে উদ্ধারকারীর বক্তব্যের সমর্থকরূপে উল্লেখ করেছেন এর বিপরীতে আরেকটি বাহ্যিক অবস্থা রয়েছে, যা উদ্ধারকারীর বক্তব্যের বিরোধিতা করে। তা হলো এই যে, কেউ যখন কোনো কাজ করে তখন বাহ্যত সে তা নিজের জন্যই করে। এ বাহ্যিক অবস্থার দাবি হলো, উদ্ধারকারী ব্যক্তি লোকতাটি নিজে ভোগ করার জন্য কুড়িয়ে এনেছে। অতএব, দুটি বাহ্যিক অবস্থা যখন পরস্পর সংঘর্ষিক হয়ে গেল, তখন কোনোটিকেই দলিল রূপে গ্রহণ করা সঠিক হবে না।

লোকতা কুড়ানোর সময় সাক্ষী রাখার পদ্ধতি : লোকতা কুড়ানোর সময় কুড়ানেওয়ালা ব্যক্তি যদি এতটুকু বলে যে, তোমরা কাউকে কোনো হারানো বস্তুর অনুসন্ধান করতে শুনলে আমার ঠিকানা বলে দিও, তাহলেই যথেষ্ট হবে। অর্থাৎ তার এ কথাই সাক্ষী রাখা বলে গণ্য হবে। "لُقَطَة" হারানো বস্তু বা এরূপ একক শব্দ ব্যবহার করাই যথেষ্ট বস্তু অনেক হলেও বহুবচনের শব্দ ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই। কেননা لُقَطَة শব্দটি اسم جنس যা এক ও একাধিক সবই বুঝাতে সক্ষম। এ কারণেই কোনো ব্যক্তি যদি দুটি লোকতা পায় এবং বলে যে عِنْدِيْ لُقَطَة 'আমার কাছে লোকতা রয়েছে', তাহলে সে দায়মুক্ত হয়ে যাবে।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ فَاِنْ كَانَتْ اَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ عَرَّفَهَا اَيَّامًا، وَاِنْ كَانَتْ عَشَرَةً فَصَاعِدًا عَرَّفَهَا حَوْلًا قَالَ الْعَبْدُ الضَّعِيْفُ : وَهٰذِهِ رِوَايَةٌ عَنْ اَبِيْ حَنِيْفَةَ رحـ. وَقَوْلُهُ اَيَّامًا مَعْنَاهُ عَلٰى حَسَبِ مَا يَرَى الْاِمَامُ . وَقَدَّرَهُ مُحَمَّدٌ رحـ فِي الْاَصْلِ بِالْحَوْلِ عَنْ غَيْرِ تَفْصِيْلٍ بَيْنَ الْقَلِيْلِ وَالْكَثِيْرِ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ رحـ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ ﴿مَنِ الْتَقَطَ شَيْئًا فَلْيُعَرِّفْهُ سَنَةً مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ﴾. وَجْهُ الْاَوَّلِ اَنَّ التَّقْدِيْرَ بِالْحَوْلِ وَرَدَ فِيْ لُقَطَةٍ كَانَتْ مِائَةَ دِيْنَارٍ تُسَاوِيْ اَلْفَ دِرْهَمٍ، وَالْعَشَرَةُ وَمَا فَوْقَهَا فِيْ مَعْنَى الْاَلْفِ فِيْ تَعَلُّقِ الْقَطْعِ بِهِ فِي السَّرِقَةِ وَتَعَلُّقِ اسْتِحْلَالِ الْفَرْجِ بِهِ وَلَيْسَتْ فِيْ مَعْنَاهَا فِيْ حَقِّ تَعَلُّقِ الزَّكَاةِ، فَاَوْجَبْنَا التَّعْرِيْفَ بِالْحَوْلِ اِحْتِيَاطًا، وَمَا دُوْنَ الْعَشَرَةِ لَيْسَ فِيْ مَعْنَى الْاَلْفِ بِوَجْهٍ مَا فَفَوَّضْنَا اِلٰى رَاْيِ الْمُبْتَلٰى بِهِ وَقِيْلَ الصَّحِيْحُ اَنَّ شَيْئًا مِنْ هٰذِهِ الْمَقَادِيْرِ لَيْسَ بِلَازِمٍ، وَيُفَوَّضُ اِلٰى رَاْيِ الْمُلْتَقِطِ يُعَرِّفُهَا اِلٰى اَنْ يَغْلِبَ عَلٰى ظَنِّهِ اَنَّ صَاحِبَهَا لَا يَطْلُبُهَا بَعْدَ ذٰلِكَ ثُمَّ يَتَصَدَّقُ بِهِ.

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, **যদি বস্তুটির মূল্য দশ দিরহাম থেকে কম হয় তাহলে কয়েকদিন ঘোষণা দিবে। পক্ষান্তরে দশ দিরহাম বা তার বেশি হলে এক বছর ঘোষণা দিবে।** অধম বান্দা (গ্রন্থকার) বলেন, এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে প্রাপ্ত বর্ণনা। আর ইমাম কুদূরী (র.) কথিত কয়েক দিনের অর্থ হলো শাসক যে কয়েকদিন সমীচীন মনে করেন। ইমাম মুহাম্মদ (র.) মাবসূত কিতাবে কম ও বেশি পরিমাণের মাঝে পার্থক্য না করে এক বছর নির্ধারণ করেছেন। আর এটা ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর অভিমত। কেননা নবী করীম ﷺ পার্থক্য নির্দেশ না করে বলেছেন- مَنِ الْتَقَطَ شَيْئًا فَلْيُعَرِّفْهُ سَنَةً 'যে ব্যক্তি কোনো বস্তু কুড়িয়ে নেয়, সে যেন তা এক বছর পর্যন্ত ঘোষণা করে।'

প্রথমোক্ত মতের দলিল হলো, উক্ত এক বছরের সময়সীমা নির্ধারণ এমন লোকতার ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে যা ছিল একশ দিনার সমান এক হাজার দিরহাম।

আর চুরির অপরাধে হস্ত কর্তনের ক্ষেত্রে দশ ও দশোর্ধ সংখ্যা এক হাজারের সমগুণ সম্পন্ন। কিন্তু জাকাতের বিধান সম্পৃক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে তা এক হাজারের সমগুণ সম্পন্ন নয়। (কেননা দশ দিরহামে জাকাত হয় না।) তাই আমরা সতর্কতা হিসাবে এক বছর ঘোষণা প্রদানকে ওয়াজিব করেছি। পক্ষান্তরে দশ দিরহামের কম পরিমাণ কোনো ক্ষেত্রেই এক হাজারের সমগুণ সম্পন্ন নয়। তাই বিষয়টিকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিবেচনার উপর ছেড়ে দিয়েছি।

কোনো কোনো মতে সঠিক সিদ্ধান্ত এই যে, এ ধরনের কোনো সময়সীমা আবশ্যকীয় নয়; বরং উদ্ধারকারী ব্যক্তির বিবেচনার উপরে ছেড়ে দেওয়া হবে। সে এমন প্রবল ধারণা সৃষ্টি হওয়া পর্যন্ত প্রচার চালাবে যে, এরপর উক্ত বস্তুর মালিক আর তা খোঁজ করবে না। অতঃপর সে তা সদকা করে দিবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

লোকতা পাওয়ার বিষয়টি কতদিন পর্যন্ত প্রচার করতে হবে- এ নিয়ে উপরিউক্ত ইবারতে আলোকপাত করা হয়েছে। এ সম্পর্কে দুটি মত বর্ণিত হয়েছে-

১. ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে প্রাপ্ত মত হলো এই যে, লোকতাটি যদি দশ দিরহামের অপেক্ষা কম মূল্যের হয়, তাহলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিবেচনার উপর ছেড়ে দেওয়া হবে। যে কদিন প্রচার করার দ্বারা তার এরূপ ধারণা হয় যে, মালিক

https://e-ilm.weebly.com/

আর তা খোঁজ করতে আসবে না, সে কদিনই সে প্রচার চালাবে। আর যদি লোকতাটি দশ দিরহাম বা এর বেশি মূল্যের হয় তাহলে পূর্ণ একবছর পর্যন্ত প্রচার চালাবে। উল্লেখ্য যে, এটি গাইরে জাহিরুর রেওয়ায়েত।

২. ইমাম মুহাম্মদ (র.) মাবসূত কিতাবে বর্ণনা করেছেন, লোকতা পাওয়ার বিষয়টি এক বছর পর্যন্ত প্রচার করতে হবে। পরিমাণে তা দশ দিরহামের কম হোক বা বেশি হোক।

ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)ও এ মত পোষণ করেন।

উল্লেখ্য যে, এটাই হানাফী মাযহাবের জাহিরে রেওয়ায়েত। দ্বিতীয় মতের দলিল হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাদীস : مَنِ الْتَقَطَ شَيْئًا فَلْيُعَرِّفْهُ سَنَةً 'যে ব্যক্তি কোনো লোকতা কুড়িয়ে আনে, সে যেন তা এক বছর প্রচার করে।' হাদীসটি ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ, দারাকুতনী (র.) প্রমুখ বর্ণনা করেছেন।

প্রকাশ থাকে যে, উক্ত হাদীসে কমবেশির মাঝে কোনো পার্থক্য করা হয়নি। তাই উপরিউক্ত ইমামগণ বলেন, লোকতার পরিমাণ যা-ই হোক না কেন এক বছর পর্যন্ত প্রচার করতে হবে।

প্রথম মতের দলিল : ১. রাসূল ﷺ -এর হাদীস–

رَوَى الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِيْ صَحِيْحِهِ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رض قَالَ اَخَذْتُ صُرَّةً مِائَةَ دِيْنَارٍ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ عَرِّفْهَا حَوْلًا فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا ثُمَّ اَتَيْتُهُ فَقَالَ عَرِّفْهَا حَوْلًا فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ أَجِدْ ثُمَّ اَتَيْتُهُ ثَلَاثًا فَقَالَ احْفَظْ وِعَاءَهَا وَعَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا -

অর্থাৎ ইমাম বুখারী (র.) তার সুপ্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থ বুখারী শরীফে বর্ণনা করেছেন, হযরত উবাই ইবনে কা'ব (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একশ দিনার ভর্তি একটি থলে কুড়িয়ে নিয়ে এসে রাসূল ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হলাম। রাসূল ﷺ বললেন, এক বছর প্রচার কর। আমি এক বছর প্রচার করলাম; কিন্তু মালিক পেলাম না। পুনরায় রাসূল ﷺ -এর কাছে আসলাম। এবারও তিনি বললেন, এক বছর প্রচার কর। তাই আমি পুনরায় এক বছর প্রচার করলাম; কিন্তু মালিক পেলাম না। এরপর তৃতীয় বারের মতো রাসূল ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হলাম। এবার তিনি বললেন, তুমি এ থলের অবয়ব, এর সংখ্যা ও এর রশিটি ভালোভাবে চিনে রাখ। যদি মালিক আসে তাহলে দিয়ে দিও, অন্যথায় তুমি এর দ্বারা উপকৃত হতে থাক।

প্রকাশ থাকে যে, লোকতার পরিমাণ একশত দিনার (যা এক হাজার দিরহামের সমান) হওয়া অবস্থায় এক বছর প্রচার করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর দশ দিরহাম যেহেতু কিছু ক্ষেত্রে হাজার দিরহামের সমকক্ষ, আবার কিছু ক্ষেত্রে হাজার দিরহামের সমকক্ষ নয়, সেহেতু সতর্কতা হিসাবে আমরা দশ বা তার বেশির ক্ষেত্রে এক বছর প্রচারের হুকুম লাগিয়েছি।

যেসব ক্ষেত্রে দশ দিরহাম হাজার দিরহামের সমকক্ষ হয় সেগুলো হলো, চোরের হাত কাটা ও নারীর যৌনাঙ্গ হালাল হওয়া। অর্থাৎ হাজার দিরহাম চুরি করলে যেমন চোরের হাত কাটা হয়, তেমনি দশ দিরহাম চুরি করলেও চোরের হাত কাটা হয়। তদ্রূপ হাজার দিরহাম মোহরের বিনিময়ে যেমন স্ত্রীর যৌনাঙ্গ হালাল হয়, তেমনি দশ দিরহাম মোহরের বিনিময়েও হালাল হয়।

যে ক্ষেত্রে দশ দিরহাম হাজার দিরহামের সমকক্ষ নয়, তা হলো জাকাত ওয়াজিব হওয়া। কেননা হাজার দিরহাম সম্পদের উপর এক বছর সময় অতিক্রান্ত হলে মালিকের উপর জাকাত ওয়াজিব হয়; কিন্তু দশ দিরহাম সম্পদের উপর এক বছর কেন, দশ বছর অতিক্রান্ত হলেও জাকাত ওয়াজিব হয় না। মোটকথা, কিছু ক্ষেত্রে দশ দিরহাম হাজার দিরহামের সমকক্ষ, কিছু ক্ষেত্রে সমকক্ষ নয়। এমতাবস্থায় সতর্কতা মূলক দশ দিরহামকে হাজার দিরহামের সমকক্ষ ধরেই এ হুকুম আরোপ করা হয়েছে যে, লোকতার পরিমাণ দশ দিরহাম বা তার বেশি হলে পূর্ণ এক বছর প্রচার করতে হবে।

পক্ষান্তরে দশ দিরহামের কম পরিমাণ সম্পদ কোনো ক্ষেত্রেই হাজার দিরহামের সমকক্ষ নয়, তাই দশ দিরহামের কম পরিমাণকে হাজার দিরহামের হুকুমের আওতাভুক্ত করিনি; বরং তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিবেচনার উপর ছেড়ে দিয়েছি।

وَقِيْلَ الصَّحِيْحُ - বলে শামসুল আইম্মা সারাখসী (র.)-এর উক্তির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। তিনি বলেন, উপরে বর্ণিত সময়সীমাগুলোর কোনোটিই আবশ্যকীয় নয়; বরং লোকতার কমবেশি যা-ই হোক, প্রচারের সময়সীমা উদ্ধারকারীর বিবেচনার উপরে নির্ভরশীল। যতদিন প্রচার করার দ্বারা তার এরূপ প্রবল ধারণা হয় যে, এ সম্পদের মালিক আর তা খোঁজ করতে আসবে না, ততদিন পর্যন্তই সে প্রচার করবে। এরপর সে তা সদকা করে দিবে। এটি মালেকী মাযহাবের কতিপয় আলেমেরও মত এবং এ মতের উপরই ফতোয়া প্রদান করা হয়। (আল-বাহরুর রায়েক)

লোকতা প্রাপ্তি প্রচার করার স্থান : হাটবাজার, রাস্তাঘাট ও এ জাতীয় জনসমাগম পূর্ণ স্থানসমূহে লোকতা প্রাপ্তির বিষয় ঘোষণা করতে হবে মালিক আর খোঁজবে না– এমন ধারণা জন্মানো পর্যন্ত।

https://e-ilm.weebly.com/

وَاِنْ كَانَتْ اللُّقَطَةُ شَيْئًا لَا يَبْقٰى عَرَّفَهُ حَتّٰى اِذَا خَافَ اَنْ يَفْسُدَ تَصَدَّقَ بِهٖ، وَيَنْبَغِيْ اَنْ يُعَرِّفَهَا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِيْ اَصَابَهَا. وَفِي الْجَامِعِ : فَاِنَّ ذٰلِكَ اَقْرَبُ اِلَى الْوُصُوْلِ اِلٰى صَاحِبِهَا ـ وَاِنْ كَانَتِ اللُّقَطَةُ شَيْئًا يَعْلَمُ اَنَّ صَاحِبَهَا لَا يَطْلُبُهَا كَالنَّوَاةِ وَقُشُوْرِ الرُّمَّانِ يَكُوْنُ اِلْقَاؤُهُ اِبَاحَةً حَتّٰى جَازَ الِانْتِفَاعُ بِهٖ مِنْ غَيْرِ تَعْرِيْفٍ وَلٰكِنَّهُ مُبْقًى عَلٰى مِلْكِ مَالِكِهٖ لِاَنَّ التَّمْلِيْكَ مِنَ الْمَجْهُوْلِ لَا يَصِحُّ .

অনুবাদ : আর যদি বস্তুটি এমন হয় যে তা স্থায়ী থাকবে না, তাহলে ঘোষণা দিবে এবং যখন নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করবে তখন সদকা করে দিবে। বস্তুটি যেখানে পেয়েছে সেখানে প্রচার করা উচিত এবং মানুষের সমাগমপূর্ণ স্থানেও প্রচার করা উচিত। কেননা বস্তুটি মালিক পর্যন্ত পৌঁছার জন্য এটি একটি উৎকৃষ্ট পন্থা।

আর যদি বস্তুটি এমন হয় যে বুঝা যায়, মালিক তা খোঁজ করবে না। যেমন- দানা বা আনারের খোসা, তাহলে তা ফেলে রেখে যাওয়া মুবাহ হওয়ার প্রমাণ; এমনকি প্রচার করা ছাড়াই তা দ্বারা উপকৃত হওয়া বৈধ হবে. তবে তা মালিকের মালিকানায় বহাল থাকবে। কেননা অজ্ঞাত ব্যক্তির পক্ষ থেকে মালিকানা প্রদান শুদ্ধ নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

লোকতা যদি ফল-ফলাদি, তরিতরকারি বা অন্য কোনো খাদ্যদ্রব্য কিংবা এমন কোনো বস্তু হয় যা দীর্ঘদিন পর্যন্ত থাকবে না; বরং একদিন বা দু'দিন গেলেই নষ্ট হয়ে যাবে তাহলে সেটাও ঘোষণা করতে থাকবে। যখন নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা হবে তখন সদকা করে দিবে।

যেখানে লোকতা পাওয়া যায় সেখানে ঘোষণা করা আবশ্যক। কেননা মানুষ কোনো কিছু সাধারণত সেখানেই খুঁজতে আসে যেখানে তা হারায়। অতএব, সে স্থানে ঘোষণা করা হলে বস্তুটি সহজে মালিকের কাছে পৌঁছানো সম্ভব হবে। এ ছাড়াও জনসমাগমপূর্ণ অন্যান্য স্থানে, যেমন– হাটবাজার, মসজিদের আঙ্গিনা ইত্যাদিতে ঘোষণা করা যায়।

قَوْلُهُ : وَاِنْ كَانَتِ اللُّقَطَةُ شَيْئًا يَعْلَمُ اَنَّ صَاحِبَهَا الخ : বর্ণিত মাসআলার সারমর্ম হলো এই যে, লোকতা যদি এমন সাধারণ বস্তু হয় যে, বুঝা যায় মালিক এটা খোঁজবে না। যেমন- খেজুরের দানা, আনারের খোসা ইত্যাদি, তাহলে এগুলো ফেলে যাওয়াটাই এ কথার দলিল হবে যে, যে পাবে তার জন্য এগুলো মুবাহ। ফলে কোনো ঘোষণা বা প্রচার ছাড়াই সে বস্তু ব্যবহার করা জায়েজ হবে। কিন্তু বস্তুটি মালিকের মালিকানা বলেই গণ্য হবে। যে ব্যক্তি পেয়েছে এবং ভোগ করছে সে উক্ত বস্তুর মালিক হবে না। কেননা সে মালিকের পরিচিত নয়; বরং সে মালিকের নিকট অজ্ঞাত। আর অজ্ঞাত ব্যক্তিকে মালিকানা প্রদান করা যায় না।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا تَصَدَّقَ بِهَا إِيْصَالًا لِلْحَقِّ إِلَى الْمُسْتَحِقِّ وَهُوَ وَاجِبٌ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ، وَذٰلِكَ بِإِيْصَالِ عَيْنِهَا عِنْدَ الظَّفَرِ بِصَاحِبِهَا وَإِيْصَالِ الْعِوَضِ وَهُوَ الثَّوَابُ عَلٰى اعْتِبَارِ إِجَازَةِ التَّصَدُّقِ بِهَا، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا رَجَاءَ الظُّفْرِ بِصَاحِبِهَا قَالَ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا يَعْنِي بَعْدَمَا تَصَدَّقَ بِهَا فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَمْضَى الصَّدَقَةَ وَلَهُ ثَوَابُهَا لِأَنَّ التَّصَدُّقَ وَإِنْ حَصَلَ بِإِذْنِ الشَّرْعِ لَمْ يَحْصُلْ بِإِذْنِهِ فَيَتَوَقَّفُ عَلٰى إِجَازَتِهِ وَالْمِلْكُ يَثْبُتُ لِلْفَقِيْرِ قَبْلَ الْإِجَازَةِ فَلَا يَتَوَقَّفُ عَلٰى قِيَامِ الْمَحَلِّ بِخِلَافِ بَيْعِ الْفُضُوْلِيِّ لِثُبُوْتِهِ بَعْدَ الْإِجَازَةِ فِيْهِ - وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْمُلْتَقِطَ لِأَنَّهُ سَلَّمَ مَالَهُ إِلَى غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ إِلَّا أَنَّهُ بِإِبَاحَةٍ مِنْ جِهَةِ الشَّرْعِ، وَهٰذَا لَا يُنَافِي الضَّمَانَ حَقًّا لِلْعَبْدِ كَمَا فِيْ تَنَاوُلِ مَالِ الْغَيْرِ حَالَةَ الْمَخْمَصَةِ وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْمِسْكِيْنَ إِذَا هَلَكَ فِيْ يَدِهِ لِأَنَّهُ قَبَضَ مَالَهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، وَإِنْ كَانَ قَائِمًا أَخَذَهُ لِأَنَّهُ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ঘোষণার পর যদি এ **বস্তুর মালিক আসে তাহলে তো ভালো অন্যথায় তা সদকা করে দিবে।** যাতে হকদারের নিকট হক পৌছানো হয়। আর যথাসম্ভব তা করা ওয়াজিব। আর তার উপায় হলো মালিকের খোঁজ পাওয়া গেলে স্বয়ং বস্তুটি পৌছানো কিংবা বিনিময় তথা ছওয়াব পৌছানো এই ধারণার ভিত্তিতে যে, সদকা করার বিষয়টি মালিক অনুমোদন করবে। আর ইচ্ছা করলে মালিকের খোঁজ পাওয়ার আশায় বস্তুটি নিজের কাছে রেখেও দিতে পারে।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, সদকা করার পর **যদি মালিক এসে হাজির হয় তাহলে মালিকের ইচ্ছাধিকার থাকবে। সে ইচ্ছা করলে সদকা বহাল রাখবে এবং ছওয়াব তার হবে।** কেননা সদকা যদিও শরিয়তের অনুমতিক্রমে হয়েছে কিন্তু তার অনুমতি তো পাওয়া যায়নি সুতরাং সদকাটি তার অনুমতির উপর স্থগিত থাকবে

আর অনুমতির পূর্বেই দরিদ্রের মালিকানা সাব্যস্ত হয়ে যাবে। সুতরাং (অনুমোদন দানের সময়) পাত্রের (তথা বস্তুটির) বিদ্যমানতার উপর অনুমোদন স্থগিত থাকবে না।

ফুযূলী তথা অনাহূত ব্যক্তির বিক্রির বিষয়টি ভিন্ন (তার অনুমোদনের সময় পাত্র তথা বস্তুটি বিদ্যমান থাকা জরুরি) কেননা তার ক্ষেত্রে মালিকের অনুমোদন নেওয়ার পরই শুধু ক্রেতার মালিকানা সাব্যস্ত হয়

আর ইচ্ছা করলে উদ্ধারকারীকে সে জামিন করতে পারে। কেননা সে তার অনুমতি ছাড়া তার মাল অন্যের কাছে হস্তান্তর করেছে। তবে তা শরিয়তের পক্ষ থেকে বৈধ ছিল। আর তা বান্দার হক হওয়ার প্রেক্ষিতে ক্ষতিপূরণ আরোপের পরিপন্থি নয়। যেমন- ক্ষুধায় কাতর অবস্থায় অন্যের মাল ভক্ষণের ক্ষেত্রে। আবার ইচ্ছা করলে দারিদ্র ব্যক্তিকেও জামিন করতে পারে, যদি বস্তুটি তার হাতে নষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে। কেননা সে মালিকের অনুমতি ছাড়া তার মাল গ্রহণ করেছে। আর যদি বস্তুটি তার হাতে বিদ্যমান থাকে, তাহলে সে তা নিয়ে নিবে কারণ সে নিজের মাল হুবহু পেয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

লোকতা সম্পর্কে প্রচার করার তিনটি সুরত সৃষ্টি হতে পারে–

১. মালিকের আগমন। যদি লোকতার মালিক আসে তাহলে তাকে দিয়ে দেওয়া হবে।

২. যদি মালিক না আসে তাহলে সদকা করে দিবে।

৩. ইচ্ছা করলে উদ্ধারকারী ব্যক্তি লোকতাটি নিজের কাছে রেখে দিতে পারে এ আশায় যে, ভবিষ্যতে কখনো মালিককে পাওয়া গেলে বস্তুটি তাকে দিয়ে দিবে।

এ ক্ষেত্রে মূল বিষয় হলো হকদারের নিকট তার হক পৌঁছে দেওয়া। এ বিষয়টি ওয়াজিব। আর এ ওয়াজিব দু'ভাবে আদায় করা যায়।

এক. যদি লোকতার মালিককে পাওয়া যায়, তাহলে স্বয়ং লোকতাটি তার কাছে পৌঁছে দেওয়া।

দুই. যদি লোকতার মালিককে না পাওয়া যায়, তাহলে তা সদকা করে দিয়ে এর পুণ্য বা ছওয়াব মালিকের নিকট পৌঁছে দেওয়া।

قَوْلُهُ : فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا يَعْنِي بَعْدَمَا الخ : উপরিউক্ত ইবারতের সারমর্ম হলো এই যে, লোকতা সদকা করে দেওয়ার পর যদি লোকতার মালিক আসে তাহলে মালিকের দুটি এখতিয়ার থাকবে, ইচ্ছা করলে সে কৃত সদকা বহাল রাখতে পারে, ইচ্ছা করলে উদ্ধারকারীকে জামিন বানাতে পারে। যদি সে সদকা বহাল রাখে, তাহলে সে সদকার ছওয়াব পাবে।

তার এরূপ এখতিয়ার থাকার কারণ হলো, তার মালিকানা উদ্ধারকারী ব্যক্তি লোকতা সদকা করার সময় শরিয়তের পক্ষ থেকে অনুমতি ছিল, কিন্তু মালিকের পক্ষ থেকে ছিল না। তাই তা কার্যকর হওয়া মালিকের অনুমতির উপর মওকুফ থাকবে। তবে মালিকের এ অনুমতির পূর্বেই সদকারূপে প্রাপ্ত লোকতার উপর ফকির বা দারিদ্রের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে। কারণ সদকা করাই মালিকানার কারণ। অতএব, যখন তাকে সদকা করা হলো তখন সে তার মালিকও হয়ে গেল। তাই যদি দরিদ্র ব্যক্তি লোকতাটি বিনাশ করে ফেলে, তারপর মালিকের সন্ধান পাওয়া যায় এবং সে সদকা অনুমোদন করতে চায় তাহলে সে অনুমোদন করতে পারবে। সদকা অনুমোদন করার জন্য তার মহল বা পাত্র অক্ষুণ্ন থাকা আবশ্যক নয়।

পক্ষান্তরে ফুযূলী ব্যক্তি অর্থাৎ মালিকের অনুমতি ছাড়া যে ব্যক্তি তার কোনো জিনিস বিক্রি করে দেয়, তার সেই মালিকের পক্ষ থেকে অনুমোদন করার জন্য আবশ্যক হলো পাত্র তথা বিক্রীত দ্রব্য বা পণ্যটি বিদ্যমান থাকা। এ মাসআলা ক্রয়বিক্রয় সংক্রান্ত অধ্যায়ে আলোচিত হবে। ইনশাআল্লাহ।

قَوْلُهُ : وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْمُلْتَقِطَ لِأَنَّهُ سَلَّمَ الخ : সদকা করার পর মালিক এসে ইচ্ছা করলে উদ্ধারকারীকে জামিন করতে পারে। কারণ সে মালিকের অনুমতি ছাড়া তার মাল সদকা করেছে।

প্রশ্ন হতে পারে যে, সদকা করার জন্য উদ্ধারকারী ব্যক্তি শরিয়তের পক্ষ থেকে অনুমতিপ্রাপ্ত ছিল। অতএব, অনুমোদিত কাজ করার পর সে জামিন হবে কেন?

গ্রন্থকার এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন এই বলে যে, বিষয়টি বান্দার হক হওয়ার কারণে শরিয়তের পক্ষ থেকে অনুমোদিত হওয়া সত্ত্বেও তার উপর যামান (ক্ষতিপূরণ) আরোপ করা হবে। যেমন- ক্ষুধার তাড়নায় কোনো ব্যক্তি মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে পড়লে তখন তার জন্য অন্যের মাল ভক্ষণ করা হালাল হয়ে যায়। কিন্তু তার উপর এর যামান (ক্ষতিপূরণ) ওয়াজিব হয়। তাহলে দেখা গেল, শরিয়তের পক্ষ থেকে খাওয়ার অনুমতি থাকা সত্ত্বেও বান্দার হক হওয়ার কারণে তার উপর ক্ষতিপূরণ আরোপ হয়ে থাকে। তদ্রূপ আলোচ্য মাসআলায়ও সদকা করাব বিষয়টি শরিয়ত কর্তৃক কারণে এর ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

قَوْلُهُ : وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْمِسْكِيْنَ الخ : লোকতা সদকা করে দেওয়ার পর যদি মালিক এসে হাজির হয়, তাহলে তখন সে ইচ্ছা করলে সদকা গ্রহীতা দরিদ্র লোককেও জামিন করতে পারে। কেননা সে অন্যের মাল তার অনমুতি ছাড়া গ্রহণ করেছে। তাই যদি সম্পদটি বিনাশ হয়ে থাকে তাহলে সে ভর্তুকি দিবে। আর যদি সম্পদটি তখনো তার হাতে বিদ্যমান থাকে তাহলে মালিক তা নিয়ে নিবে। কেননা সে তার সম্পদ হুবহু পেয়েছে।

উল্লেখ্য যে, উদ্ধারকারী ব্যক্তি কিংবা সদকা গ্রহণকারী দরিদ্র ব্যক্তি যে-ই যেমন পরিশোধ করুক, জেমানের অর্থ সে আর কারো নিকট হতে ফিরিয়ে আনতে পারবে না। অর্থাৎ এ অর্থ তার নিজের গাঁট থেকেই যাবে।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ وَيَجُوْزُ الْاِلْتِقَاطُ فِي الشَّاةِ وَالْبَقَرِ وَالْبَعِيْرِ وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ رحـ : اِذَا وُجِدَ الْبَعِيْرُ وَالْبَقَرُ فِي الصَّحْرَاءِ فَالتَّرْكُ اَفْضَلُ . وَعَلٰى هٰذَا الْخِلَافِ الْفَرَسُ . لَهُمَا اَنَّ الْاَصْلَ فِيْ اَخْذِ مَالِ الْغَيْرِ الْحُرْمَةُ وَالْاِبَاحَةُ مَخَافَةَ الضَّيَاعِ، وَاِذَا كَانَ مَعَهَا مَا يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهَا يَقِلُّ الضَّيَاعُ وَلٰكِنَّهُ يُتَوَهَّمُ فَيُقْضٰى بِالْكَرَاهَةِ وَالنَّدْبُ اِلَى التَّرْكِ . وَلَنَا اَنَّهَا لُقَطَةٌ يُتَوَهَّمُ ضَيَاعُهَا فَيُسْتَحَبُّ اَخْذُهَا وَتَعْرِيْفُهَا صِيَانَةً لِاَمْوَالِ النَّاسِ كَمَا فِي الشَّاةِ -

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, বকরি, গরু ও উট কুড়িয়ে নেওয়ার বৈধতা রয়েছে।

ইমাম মালেক ও শাফেয়ী (র.) বলেন, উট ও গরু যদি মরুভূমিতে (খোলা প্রান্তরে) পাওয়া যায়, তাহলে ছেড়ে দেওয়াই উত্তম। ঘোড়া সম্পর্কেও একই মতপার্থক্য। উভয়ের দলিল এই যে, অন্যের মাল নেওয়া হারাম হওয়াই হলো মূল বিধান। আর তা মোবাহ হওয়ার কারণ নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা। সুতরাং যদি বস্তুটির সাথে নিজেকে রক্ষা করার মতো কিছু থাকে তাহলে নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা কমে যায়। অবশ্য সম্ভাবনা থেকে যায়। সুতরাং গ্রহণ করা মাকরূহ হওয়ার এবং ছেড়ে দেওয়া উত্তম হওয়ার ফয়সালা করা হবে।

আমাদের দলিল হলো, এটা এমন হারানো বস্তু যা নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং মানুষের মাল হেফাজত করা ও ঘোষণা দেওয়ার স্বার্থে তা গ্রহণ করা মোস্তাহাব হবে। যেমন- বকরির ক্ষেত্রে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

খোলা প্রান্তরে যদি হারানো বকরি পাওয়া যায় তা ধরে নিয়ে সংরক্ষণ করা সবার মতেই মোস্তাহাব। কারণ নেকড়ে বা কোনো হিংস্র জন্তুর কবলে পড়ে ধ্বংস হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থাকে বকরির ক্ষেত্রে। কিন্তু গরু, উট, ঘোড়া ইত্যাদি খোলা প্রান্তরে পাওয়া গেলে তা ধরে এনে সংরক্ষণ করার হুকুম নিয়ে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে।

আহনাফের মতে এগুলোও ধ্বংস হওয়ার সম্ভাবনা আছে বিধায় মুসলমানের মাল হেফাজতের উদ্দেশ্যে ধরে এনে হেফাজত করা ও প্রচার করা মোস্তাহাব। পক্ষান্তরে ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মত হলো, বড় জন্তুর যেহেতু শিং আছে এবং গায়ে বেশ শক্তি আছে সেহেতু এগুলোর ক্ষেত্রে ধ্বংস হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও কিছুটা কম। এ কারণে এগুলো ছেড়ে দেওয়া উত্তম হবে আর ধরে আনা মাকরূহ হবে।

বুখারী শরীফে বর্ণিত একটি হাদীসের মাধ্যমে আহনাফের উপর প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে। হাদীসটি এই–

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلًا سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ اللُّقْطَةِ فَقَالَ عَرِّفْهَا سَنَةً اِلٰى اَنْ قَالَ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ فَقَالَ خُذْهَا فَاِنَّمَا هِيَ لَكَ اَوْ لِاَخِيْكَ اَوْ لِلذِّئْبِ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَضَالَّةُ الْاِبِلِ فَغَضِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ اَوْ قَالَ احْمَرَّ وَجْهُهُ وَقَالَ مَالَكَ وَلَهَا مَعَهَا حِذَاءُهَا وَسِقَاءُهَا حَتّٰى يَلْقَاهَا رَبُّهَا -

অর্থাৎ যায়েদ ইবনে খালেদ (রা.) বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূল ﷺ কে কুড়িয়ে পাওয়া বস্তু সম্পর্কে প্রশ্ন করল রাসূল ﷺ বললেন, এক বছর পর্যন্ত প্রচার কর। এরপর সে ব্যক্তি হারানো বকরি সম্পর্কে প্রশ্ন করল রাসূল ﷺ বললেন, তা ধরে নিয়ে এসো কেননা সেটা হয়তো তোমার হবে কিংবা তোমার ভাইয়ের হবে (অর্থাৎ আসল মালিক নিবে) কিংবা নেকড়ে খাবে। লোকটি এরপর বলল, তাহলে হারানো উট কী করব? এবার রাসূল ﷺ রাগান্বিত হলেন, এমন কি তার গণ্ডদ্বয় রক্তিম হয়ে উঠল অথবা তার চেহারা মোবারক লাল হয়ে গেল। তিনি বললেন, উটের সাথে তোমার কি সম্পর্ক? এর সঙ্গে তো আত্মরক্ষার ব্যবস্থা আছে, পানাহারের ব্যবস্থা আছে। যার ফলে সে এভাবেই থাকবে এবং এক পর্যায়ে তার মালিক তাকে পেয়ে যাবে। (বুখারী)

অতএব, দেখা গেল রাসূল ﷺ এ হাদীসে হারানো উট ধরতে নিষেধ করেছেন। আহনাফের পক্ষ হতে এর জবাব হলো, এ নিষেধ তখনই প্রযোজ্য, যখন উটটি ধ্বংস হওয়ার আশঙ্কা না থাকে। পক্ষান্তরে যদি ধ্বংস হওয়ার আশঙ্কা হয় তাহলে তার হুকুম অন্যান্য প্রাণীর মতোই।

https://e-ilm.weebly.com/

فَانْ اَنْفَقَ الْمُلْتَقِطُ عَلَيْهَا بِغَيْرِ اِذْنِ الْحَاكِمِ فَهُوَ مُتَبَرِّعٌ لِقُصُوْرِ وِلَايَتِهِ عَنْ ذِمَّةِ الْمَالِكِ، وَاِنْ اَنْفَقَ بِاَمْرِهِ كَانَ ذٰلِكَ دَيْنًا عَلٰى صَاحِبِهَا لِاَنَّ لِلْقَاضِيْ وِلَايَةً فِيْ مَالِ الْغَائِبِ نَظَرًا لَهُ وَقَدْ يَكُوْنُ النَّظَرُ فِي الْاِنْفَاقِ عَلٰى مَا نُبَيِّنُ وَاِذَا رُفِعَ ذٰلِكَ اِلَى الْحَاكِمِ نَظَرَ فِيْهِ، فَاِنْ كَانَ لِلْبَهِيْمَةِ مَنْفَعَةٌ اٰجَرَهَا وَاَنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ اُجْرَتِهَا لِاَنَّ فِيْهِ اِبْقَاءَ الْعَيْنِ عَلٰى مِلْكِهِ مِنْ غَيْرِ اِلْزَامِ الدَّيْنِ عَلَيْهِ وَكَذٰلِكَ يُفْعَلُ بِالْعَبْدِ الْاٰبِقِ.

অনুবাদ : উদ্ধারকারী যদি শাসকের নির্দেশ ছাড়া তার রক্ষণাবেক্ষণে অর্থ ব্যয় করে তাহলে সে স্বেচ্ছাদানকারী হবে। কেননা মালিকানার দায়ের দিক থেকে তার কর্তৃত্ব অসম্পূর্ণ। আর যদি শাসকের আদেশে ব্যয় করে তাহলে তা মালিকের জিম্মায় ঋণ গণ্য হবে। কেননা অনুপস্থিত ব্যক্তির কল্যাণের স্বার্থে তার সম্পদের উপর বিচারকের কর্তৃত্ব রয়েছে। আর কখনো কল্যাণ থাকে অর্থ ব্যয়ের মাঝে। যেমন- আমরা সামনে বর্ণনা করব।

আর উদ্ধারকারী যখন বিষয়টি শাসকের গোচরীভূত করবে তখন তিনি বিষয়টি বিবেচনা করে দেখবেন। যদি পশুটির শ্রমযোগ্যতা থাকে, তাহলে তাকে ভাড়ায় খাটাতে বলবেন। ঐ ভাড়া থেকে সে তার জন্য ব্যয় করবে। কেননা এতে ঋণের দায় আরোপ করা ছাড়াই হুবহু বস্তুটিকে তার মালিকানায় রাখা যায়। পলাতক গোলামের ক্ষেত্রেও একই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উদ্ধারকারী ব্যক্তি যদি লোকতা রক্ষাণাবেক্ষণের জন্য নিজের অর্থ খরচ করে কাজির আদেশ ছাড়াই, তাহলে সেটা তার পক্ষ থেকে তাবাররু বা দান বলে গণ্য হবে। কেননা উদ্ধারকারী ব্যক্তির কর্তৃত্ব মালিকের কর্তৃত্বের মতো নয়। বিধায় সে উক্ত অর্থ ব্যয় করে তা মালিকের নিকট থেকে উশুল করতে পারবে না এবং এটা এমন হবে, যেমন- কেউ অন্যের ঋণ পরিশোধ করে দিল তার আবেদন বা শাসকের নির্দেশ ছাড়াই। এমতাবস্থায় তার এই ঋণ পরিশোধ তার পক্ষ থেকে দান বলে গণ্য হয়।

পক্ষান্তরে যদি শাসকের নির্দেশে ব্যয় করে তাহলে ব্যয়িত অর্থ লোকতার মালিকের জিম্মায় ঋণ হিসাবে থাকবে। কারণ, কাজি বা শাসককে নিযুক্ত করা হয়েছে সাধারণ মুসলমানের কল্যাণের জন্য তাই তার কর্তৃত্ব ব্যাপক। সে হিসাবে লোকতার মালিকের কল্যাণ কামনার্থে তার অর্থ সে ব্যয় করার অধিকার রাখে। বিধায় শাসকের নির্দেশক্রমে উদ্ধারকারীর ব্যয়িত অর্থ লোকতার মালিকের কাঁধে ঋণ হিসাবে বর্তাবে।

قَوْلُهُ : وَاِذَا رُفِعَ ذٰلِكَ اِلَى الْحَاكِمِ الخ : লোকতার পশুর বিষয় কাজির নিকট উত্থাপিত হলে কাজি সাহেব দেখবেন, পশুটি শ্রমে খাটানো সম্ভব কিনা। যদি শ্রমে খাটানো সম্ভব হয়, যেমন- জন্তু বাহনযোগ্য হলো কিংবা হাল-চাষের উপযুক্ত হলো কিংবা মালামাল বহন করতে অথবা কূপ থেকে পানি তুলতে সক্ষম হলো, এ সকল অবস্থায় পশুটি ভাড়ায় খাটাবে এবং ভাড়া বাবদ যে অর্থ উপার্জিত হবে, তা-ই পশুটির জন্য খরচ করা হবে। এতে করে পশুটি মালিকের মালিকানায় হুবহু অবশিষ্ট থাকবে এবং মালিকের উপরেও কোনো ঋণ আরোপিত হবে না।

পলাতক গোলামের ক্ষেত্রেও এ ব্যবস্থা। গোলামকে ভাড়ায় খাটানো হবে এবং তার উপার্জিত অর্থই তার উপর খরচ করা হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهَا مَنْفَعَةٌ وَخَافَ أَنْ تَسْتَغْرِقَ النَّفَقَةُ قِيمَتَهَا بَاعَهَا وَأَمَرَ بِحِفْظِ ثَمَنِهَا إِبْقَاءً لَهُ مَعْنًى عِنْدَ تَعَذُّرِ إِبْقَائِهِ صُورَةً وَإِنْ كَانَ الْأَصْلَحُ الْإِنْفَاقَ عَلَيْهَا أَذِنَ فِيْ ذٰلِكَ وَجَعَلَ النَّفَقَةَ دَيْنًا عَلٰى مَالِكِهَا لِأَنَّهُ نُصِبَ نَاظِرًا وَفِيْ هٰذَا نَظَرٌ مِنَ الْجَانِبَيْنِ، قَالُوْا : إِنَّمَا يَأْمُرُ بِالْإِنْفَاقِ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ عَلٰى قَدْرِ مَا يَرٰى رَجَاءَ أَنْ يَظْهَرَ مَالِكُهَا، فَإِذَا لَمْ يَظْهَرْ يَأْمُرُ بِبَيْعِهَا لِأَنَّ دَارَّةَ النَّفَقَةِ مُسْتَأْصِلَةٌ فَلَا نَظَرَ فِي الْإِنْفَاقِ مُدَّةً مَدِيْدَةً . قَالَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : وَفِي الْأَصْلِ شَرْطُ إِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ وَهُوَ الصَّحِيْحُ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُوْنَ غَصْبًا فِيْ يَدِهِ وَلَا يَأْمُرُ فِيْهِ بِالْإِنْفَاقِ وَإِنَّمَا يَأْمُرُ بِهِ فِي الْوَدِيْعَةِ فَلَا بُدَّ مِنَ الْبَيِّنَةِ لِكَشْفِ الْحَالِ وَلَيْسَتِ الْبَيِّنَةُ تُقَامُ لِلْقَضَاءِ . وَإِنْ قَالَ لَا بَيِّنَةَ لِيْ بِقَوْلِ الْقَاضِيْ لَهُ أَنْفِقْ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فِيْمَا قُلْتَ حَتّٰى تَرْجِعَ عَلَى الْمَالِكِ إِنْ كَانَ صَادِقًا، وَلَا يَرْجِعُ إِنْ كَانَ غَاصِبًا.

অনুবাদ : আর যদি পশুটির শ্রমযোগ্যতা না থাকে আর আশঙ্কা হয় যে, খরচ তার মূল্যকে বেষ্টন করে ফেলবে তাহলে শাসক তা বিক্রি করে মূল্য সংরক্ষণ করার আদেশ দিবেন, যাতে বাহ্য সত্তা সংরক্ষণ করা দুঃসাধ্য হওয়ার ক্ষেত্রে গুণগত সত্তা রক্ষা করা হয়।

আর যদি তার জন্য অর্থ ব্যয় করা অধিকতর কল্যাণকর হয় তাহলে এর জন্য অনুমতি দিবেন এবং খরচের অর্থ মালিকের জিম্মায় ঋণরূপে ধার্য করবেন। কেননা শাসককে জনগণের কল্যাণ রক্ষাকারী হিসাবে নিয়োজিত করা হয়েছে। আর এ ব্যবস্থার মধ্যে মালিক ও উদ্ধারকারী উভয়ের কল্যাণ রয়েছে।

মাশায়েখগণ বলেছেন, মালিক হাজির হবে- এ আশায় ইমাম দুদিন বা তিন দিন যা ভালো মনে করেন খরচ করার আদেশ দিবেন। এর মধ্যে মালিক হাজির না হলে বিক্রি করে ফেলার আদেশ দিবেন। কেননা স্থায়ী খরচ স্বয়ং প্রাণীটিকেই (মূল্যের সমপরিমাণ হয়ে) শেষ করে দিবে। সুতরাং দীর্ঘদিন খরচ করার মধ্যে মালিকের কোনো কল্যাণ নেই।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, মাবসূত কিতাবে (ব্যয় করার পূর্বে) উদ্ধারকারীর উপর 'সাক্ষ্য-প্রমাণ' উপস্থাপনের শর্তারোপ করা হয়েছে। এটিই বিশুদ্ধ অভিমত; কেননা এটি তার হাতে গসবকৃত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর সে ক্ষেত্রে খরচ করার আদেশ দিবেন না বরং আমানতরূপে রক্ষিত মালের ক্ষেত্রেই এ আদেশ দিবেন। সুতরাং প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ করার জন্য সাক্ষ্য-প্রমাণের প্রয়োজন। আর সাক্ষ্য-প্রমাণ শুধু বিচারকার্যের জন্যই পেশ করা হয় না; অবস্থা প্রকাশের জন্যও করা হয়। আর যদি সে বলে যে, আমার কোনো 'সাক্ষ্য-প্রমাণ' নেই তাহলে কাজি তাকে বলবেন, তুমি যদি তোমার বক্তব্যে সত্যবাদী হয়ে থাক তাহলে সে বাবদ খরচ করো যাতে সত্যবাদী হলে মালিকের কাছ থেকে খরচ ফেরত নিতে পার। আর যদি গসবকারী হয়ে থাকো তাহলে ফেরত নিতে পারবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

وَقَوْلُهُ فِي الْكِتَابِ وَجَعَلَ النَّفَقَةَ دَيْنًا عَلٰى صَاحِبِهَا اِشَارَةٌ اِلٰى اَنَّهُ اِنَّمَا يَرْجِعُ عَلٰى الْمَالِكِ بَعْدَ مَا حَضَرَ وَلَمْ تُبَعِ اللُّقَطَةُ اِذَا شَرَطَ الْقَاضِيْ الرُّجُوْعَ عَلٰى الْمَالِكِ، وَهٰذِهِ رِوَايَةٌ وَهُوَ الْاَصَحُّ .

অনুবাদ : কিতাবে ইমাম কুদূরী (র.)-এর বক্তব্য "খরচ মালিকের জিম্মায় থাকবে"- এতে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, মালিক উপস্থিত হওয়ার পরই ফেরত নিবে। কাজি যদি মালিক থেকে ফেরত নেওয়ার শর্তারোপ করেন তাহলে কুড়ানো প্রাণীটি (এজন্য) বিক্রি করা যাবে না। এটি একটি বর্ণনা এবং এটাই বিশুদ্ধতম।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

লোকতার পশুটি যদি শ্রমে খাটানোর উপযুক্ত না হয়, যেমন- ছাগল, ভেড়া, মুরগি ইত্যাদি। আর এমন আশঙ্কা হয় যে, এর জন্য খরচ করতে থাকলে খরচকৃত অর্থের পরিমাণ পশুর মূল্য ডিঙ্গিয়ে যাবে, তাহলে শাসক এ মর্মে আদেশ দিবেন যে, পশুটি বিক্রি করে ফেল এবং এর মূল্য সংরক্ষণ করো। যাতে লোকতাটি হুবহু সংরক্ষণ করা না হলেও গুণগতভাবে অর্থাৎ তার মূল্য সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়।

قَوْلُهُ : وَاِنْ كَانَ الْاَصْلَحُ الْاِنْفَاقَ عَلَيْهَا الخ : উদ্ধারকারী ব্যক্তি যখন লোকতার বিষয়টি কাজির দরবারে পেশ করবে, তখন কাজি সাহেব যদি উক্ত লোকতার জন্য খরচ করা ভালো মনে করেন, তাহলে মালিকের আগমনের আশায় দু'তিনদিন খরচ করার আদেশ দিবেন। কেননা এতে উদ্ধারকারী ও মালিক উভয়ের কল্যাণ রয়েছে। আর কাজিকে নিযুক্তও করা হয়েছে মানুষের কল্যাণ চিন্তার জন্য। এরপর দু'তিন দিনের মধ্যে যদি মালিকের আগমন না ঘটে তাহলে পশুটি বিক্রি করে ফেলার আদেশ দিবেন। কেননা দীর্ঘ দিন যাবৎ পশুটির জন্য অর্থ খরচকারী হলে, খরচের পরিমাণ তার মূল্যকে ডিঙ্গিয়ে যাবে এবং এ অর্থ মালিককে পরিশোধ করতে গিয়ে তার পশুটিই হাতছাড়া হবে। ফলে এতে মালিকের কোনো কল্যাণ সাধিত হবে না, বিধায় কাজি সাহেব এমন সিদ্ধান্ত দিবেন না।

উদ্ধারকারীকে লোকতার জন্য অর্থ খরচ করার অনুমতি দানের পূর্বে কাজি সাহেব তার কাছে প্রমাণ চাইবেন। যাতে এটা প্রকাশ পায় যে, পশুটি আসলেই লোকতা। কেননা পশুটি গসবকৃত পশু হওয়ারও সম্ভাবনা আছে। যদি গসবকৃত পশু হয়ে থাকে, তাহলে তার জন্য অর্থ ব্যয়ের অনুমতি দেওয়া যাবে না। কেননা অর্থ ব্যয়ের অনুমতি কেবল আমানতরূপে রক্ষিত জন্তুর ক্ষেত্রেই প্রদান করা হয়।

উদ্ধারকারী যদি বলে আমার কাছে এ ব্যাপারে কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ নেই, তাহলে কাজি সাহেব তাকে একথা বলে দিবেন, তুমি যদি তোমার দাবিতে সত্যবাদী হয়ে থাকো, তাহলে লোকতার জন্য অর্থ খরচ কর। এরপর যদি তার সত্যবাদিতা প্রকাশ পায়, তাহলে ব্যয়িত অর্থ লোকতার মালিকের নিকট হতে ফেরত পাবে। মিথ্যাবাদী হলে ফেরত পাবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ فَإِذَا حَضَرَ يَعْنِي الْمَالِكُ فَلِلْمُلْتَقِطِ أَنْ يَمْنَعَهَا مِنْهُ حَتّٰى يُحْضِرَ النَّفَقَةَ لِأَنَّهُ يَحْيِي بِنَفَقَتِهِ فَصَارَ كَأَنَّهُ اسْتَفَادَ الْمِلْكَ مِنْ جِهَتِهِ فَأَشْبَهَ الْمَبِيعَ؛ وَأَقْرَبُ مِنْ ذٰلِكَ رَادُّ الْآبِقِ فَإِنَّ لَهُ الْحَبْسَ لِاسْتِيْفَاءِ الْجُعْلِ لِمَا ذَكَرْنَا، ثُمَّ لَا يَسْقُطُ دَيْنُ النَّفَقَةِ بِهَلَاكِهِ فِيْ يَدِ الْمُلْتَقِطِ قَبْلَ الْحَبْسِ، وَيَسْقُطُ إِذَا هَلَكَ بَعْدَ الْحَبْسِ لِأَنَّهُ يَصِيْرُ بِالْحَبْسِ شَبِيْهَ الرَّهْنِ . قَالَ وَلُقْطَةُ الْحِلِّ وَالْحَرَمِ سَوَاءٌ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يَجِبُ التَّعْرِيْفُ فِيْ لُقْطَةِ الْحَرَمِ إِلٰى أَنْ يَجِيْءَ صَاحِبُهَا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ فِي الْحَرَمِ ﴿وَلَا يَحِلُّ لُقْطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدِهَا﴾ وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ ﴿اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً﴾ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ وَلِأَنَّهَا لُقْطَةٌ، وَفِي التَّصَدُّقِ بَعْدَ مُدَّةِ التَّعْرِيْفِ إِبْقَاءُ مِلْكِ الْمَالِكِ مِنْ وَجْهٍ فَيَمْلِكُهُ كَمَا فِيْ سَائِرِهَا، وَتَأْوِيْلُ مَا رُوِيَ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ الْاِلْتِقَاطُ إِلَّا لِلتَّعْرِيْفِ، وَالتَّخْصِيْصُ بِالْحَرَمِ لِبَيَانِ أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ التَّعْرِيْفُ فِيْهِ لِمَكَانِ أَنَّهُ لِلْغُرَبَاءِ ظَاهِرًا .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যখন সে হাজির হয় অর্থাৎ মালিক তখন খরচের টাকা বুঝিয়ে দেওয়া পর্যন্ত উদ্ধারকারী লোকতার জন্য আটক রাখতে পারে। কেননা তার খরচেই পশুটি বেঁচে রয়েছে। সুতরাং যেন সে তার দিক থেকে মালিকানা লাভ করেছে। ফলে তা বিক্রীত বস্তুর সদৃশ্য হয়েছে। এর চেয়ে নিকটতর সদৃশ হলো পলাতক গোলাম ফেরত দানকারী। কেননা 'জু'ল' (বা খরচ) উশুল করার জন্য সে গোলাম আটক রাখতে পারে। আমাদের উল্লিখিত কারণে। আটক করার পূর্বে যদি উদ্ধারকারীর হাতে পশুটি মারা যায়, তাহলে খরচের ঋণ রহিত হবে না। পক্ষান্তরে আটকের পর মারা গেলে রহিত হয়ে যাবে। কেননা আটক করা দ্বারা এটা বন্ধকসদৃশ হয়ে যাবে।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, হারাম শরীফে প্রাপ্ত এবং তার বাইরে প্রাপ্ত উভয় লোকতার হুকুম এক। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, হারাম শরীফের লোকতার ক্ষেত্রে মালিক হাজির হওয়া পর্যন্ত ঘোষণা করতে থাকা ওয়াজিব। কেননা হারাম শরীফ সম্পর্কে নবী করীম ﷺ বলেছেন- وَلا يَحِلُّ لُقْطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدِهَا অর্থাৎ হারাম শরীফে পড়ে থাকা বস্তু কেবল মাত্র ঐ ব্যক্তির জন্য তুলে নেওয়া বৈধ, যে তার ঘোষণা দিবে।

আমাদের প্রমাণ হলো নবী করীম ﷺ এর বাণী- اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً অর্থাৎ পড়ে থাকা বস্তুর থলি এবং তার বাধন চিনে নাও এবং এক বছর ঘোষণা দাও। হারাম শরীফ ও তার বাইরের লোকতার মাঝে কোনো পার্থক্য করা হয়নি। তাছাড়া এ কারণে যে, এটা হচ্ছে লোকতা আর ঘোষণার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর সদকা করাতে এক দিক থেকে (অর্থাৎ ছওয়াব লাভ করার দিক থেকে) মালিকের মালিকানা রক্ষা করা হয়। সুতরাং উদ্ধারকারী ব্যক্তি তা করতে পারবে। যেমন অন্যান্য লোকতার ক্ষেত্রে করতে পারে।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর বর্ণিত হাদীসের ব্যাখ্যা এই যে, "ঘোষণা ও প্রচার করার উদ্দেশ্য ছাড়া তুলে নেওয়া বৈধ নয়।" – এ বক্তব্যকে হারাম শরীফের সাথে বিশিষ্ট করার কারণ হলো একথা বয়ান করে দেওয়া যে, বাহ্যত এটা মুসাফিরের জিনিস এই সম্ভাবনার কারণে প্রচার ও ঘোষণার দায়দায়িত্ব রহিত হবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উদ্ধারকারী ব্যক্তি কাজির আদেশক্রমে লোকতার জন্য অর্থ খরচ করার পর যখন লোকতার মালিক আসে, তখন খরচের অর্থ পরিশোধ না করা পর্যন্ত উদ্ধারকারী ব্যক্তি পশু আটকে রাখতে পারবে। কেননা পশুটি উদ্ধারকারী ব্যক্তির খরচের ফলেই বেঁচে রয়েছে। ফলে এটা তার হাতে বিক্রীত পণ্যের মতো হয়ে গেছে। আর বিক্রীত পণ্য বিক্রেতা আটকে রাখতে পারে ক্রেতা মূল্য পরিশোধ করার পূর্ব পর্যন্ত। তদ্রূপ পলাতক গোলামের পিছনে যে ব্যক্তি অর্থ ব্যয় করে সেও উক্ত অর্থ পরিশোধ করার পূর্ব পর্যন্ত গোলামটি মালিককে না দিয়ে নিজের কাছে আটকে রাখতে পারে।

পশুটি আটক করার পূর্বে যদি পশুটি উদ্ধারকারীর হাতে মারা যায়, তাহলে তার ঋণ রহিত হবে না; বরং সে তার ব্যয়িত অর্থ পশুর মালিকের নিকট থেকে ফেরত পাবে। আর যদি আটক করার পর পশুটি মারা যায়, তাহলে ঋণ রহিত হয়ে যাবে। কেননা তখন পশুটির খরচের দায় আটককৃত বন্ধকী পশুর মতো হয়ে যায়। মালিকের উপর থেকে খরচের ঋণ রহিত হয়ে যায়। তদ্রূপ আলোচ্য মাসআলায়ও খরচের দায়ে আটককৃত লোকতা মারা গেলে মালিকের জিম্মা হতে খরচের ঋণ রহিত হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ : وَلُقْطَةُ الْحِلِّ وَالْحَرَمِ سَوَاءٌ الخ : আহনাফ ও অন্যান্য উলামায়ে কেরাম হারাম শরীফের লোকতা ও অন্যান্য স্থানের লোকতাকে একই হুকুমের আওতাভুক্ত করেন। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.) ও এক বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) হারাম শরীফের লোকতা সম্পর্কে বলেন, মালিক পাওয়া পর্যন্ত তা প্রচার করতে থাকতে হবে। তার দলিল হলো বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত মক্কা বিজয়ের দিনের সুদীর্ঘ হাদীস। যার শেষ দিকে একথা রয়েছে যে, لَا يَحِلُّ لُقْطَتُهَا اِلَّا لِمُنْشِدِهَا অর্থাৎ হারামের লোকতা কুড়িয়ে নেওয়া হালাল নয়, তবে যে ব্যক্তি প্রচার করবে তার জন্য হালাল।

আহনাফের দলিল হলো সিহাহ সিত্তায় বর্ণিত হযরত যায়েদ ইবনে খালেদ জুহানী (র.)-এর প্রসিদ্ধ হাদীস, যাতে হারামের লোকতা ও বাইরের লোকতার মাঝে কোনোরূপ পার্থক্য করা ব্যতীত এক বছর পর্যন্ত ঘোষণা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আরেকটি দলিল হলো, প্রচারের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর লোকতা সদকা করে দিলে মালিকের মালিকানা রক্ষা করা হয়। কেননা মালিক সেই সদকার ছওয়াব পেয়ে যায়। অতএব, অন্যান্য লোকতার ক্ষেত্রে যেমন সদকা করা যায়, তেমনি হারাম শরীফের লোকতাও প্রচারের মেয়াদ শেষে সদকা করে দিতে পারবে।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিলের জবাব : প্রচারের উদ্দেশ্য ছাড়া হারাম শরীফের লোকতা কুড়িয়ে নেওয়া বৈধ নয়। একথা বলার উদ্দেশ্য হারাম শরীফের লোকতার ব্যাপারে লোকদিগকে বিশেষভাবে সতর্ক করা। কেননা কেউ মনে করতে পারে যে, হারাম শরীফে যারা এসেছে সবাই তো মুসাফির। অতএব, লোকতা প্রাপ্তির বিষয় প্রচার করে লাভ নেই। কেননা এর মালিক মুসাফির। সে তো দেশে চলে গেছে। এটা খোঁজার জন্য পুনরায় সে আসবে না। অতএব, আমিই তা ভোগ করে ফেলি। রাসূল ﷺ এমন ধারণার ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়ে বললেন, সাবধান প্রচারের উদ্দেশ্য ছাড়া হারাম শরীফের লোকতা উঠানোর বৈধতা নেই। কেউ যদি লোকতা উঠায় তাহলে উপরিউক্ত ধারণা বশতঃ তা প্রচার করার দায়-দায়িত্ব রহিত হবে না; বরং তা অন্যান্য লোকতার মতোই প্রচার করতে হবে। عِفَاص এবং وِعَاء শব্দ দুটির অর্থ হলো চামড়া বা কাপড়ের থলি, যাতে মুদ্রা সংরক্ষণ করা হয়। وِكَاء অর্থ হলো বাঁধন অর্থাৎ রশি বা এজাতীয় কিছু যা দ্বারা থলির মুখ বেঁধে রাখা হয়।

https://e-ilm.weebly.com/

وَاذا حضَرَ رَجُلٌ فادَّعى اللُّقَطَةَ لَمْ تُدْفَعْ اِلَيْه حَتّٰى يُقِيْمَ الْبَيِّنَةَ . فَاِنْ اَعْطٰى عَلَامَتَهَا حَلَّ لِلْمُلْتَقِطِ انْ يَدْفَعَهَا اِلَيْهِ ولا يُجْبَرُ عَلٰى ذٰلِك فِي الْقَضَاءِ. وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تعَالٰى : يُجْبَرُ، وَالْعَلَامَةُ مِثْلُ اَنْ يُسَمِّيَ وَزْنَ الدَّرَاهِمِ وَعَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا وَوِعَاءَهَا. لَهُما اَنّ صَاحِبَ الْيَدِ يُنَازِعُه فِي الْيَدِ وَلَا يُنَازِعُه فِي الْمِلْكِ، فَيُشْتَرَطُ الْوَصْفُ لِوُجُوْدِ الْمُنَازعَةِ مِنْ وَجْهٍ، وَلَا تُشْتَرَطُ اِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ لِعَدَمِ الْمُنَازعَةِ مِنْ وَجْهٍ . وَلَنَا اَنَّ الْيَدَ حَقٌّ مَقْصُوْدٌ كَالْمِلْكِ فَلَا يُسْتَحَقُّ اِلَّا بِحُجَّةٍ وَهُوَ الْبَيِّنَةُ اِعْتِبَارًا بِالْمِلْكِ اِلَّا اَنَّه يَحِلُّ لَه الدَّفْعُ عِنْدَ اِصَابَةِ الْعَلَامَةِ لِقَوْلِه عَلَيْهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلَامُ ﴿فَاِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَعَرَفَ عِفَاصَهَا وَعَدَدَهَا فَادْفَعْهَا اِلَيْهِ﴾ وَهٰذَا لِلْاِبَاحَةِ عَمَلًا بِالْمَشْهُوْرِ وَهُوَ قَوْلُه عَلَيْهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلَامُ ﴿اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِيْ﴾ اَلْحَدِيْثَ .

অনুবাদ : কেউ এসে যদি লোকতার মালিকানা দাবি করে তাহলে সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করা পর্যন্ত তার হাতে অর্পণ করা হবে না। যদি সে কোনো আলামত বা চিহ্নের কথা বলে, তাহলে উদ্ধারকারীর জন্য বৈধ হবে তার হাতে লোকতা তুলে দেওয়া। কিন্তু আইনগতভাবে তাকে বাধ্য করা যাবে না।

ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, বাধ্য করা হবে।

আলামতের উদাহরণ এই যে, দিরহামের ওজন এবং সংখ্যা, দিরহামের থলে ও বাঁধনের উল্লেখ করল। উভয় ইমামের দলিল এই যে, দখলদার ব্যক্তি দখলের বিষয়ে তার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। কিন্তু মালিকানার ক্ষেত্রে তার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে না। সুতরাং একদিক থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিদ্যমান থাকার কারণে পরিচয় পেশ করা শর্ত হবে : কিন্তু আরেক দিক থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না থাকার কারণে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করা শর্ত হবে না।

আমাদের দলিল এই যে, মালিকানার মতো দখল বা নিয়ন্ত্রণও উদ্দিষ্ট হক সুতরাং প্রমাণ তথা সাক্ষ্য ছাড়া সে তার অধিকারী হবে না। (এ সিদ্ধান্ত) মালিকানার উপর কিয়াস করে।

তবে আলামত সঠিকভাবে বলার ক্ষেত্রে অর্পণ করা তার জন্য বৈধ হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– فان جاء صاحبها وعرف عفاصها وعددها فادفعها إليه অর্থাৎ যদি মালিক আসে এবং সেটির থলে ও সংখ্যার কথা সঠিকভাবে বলতে পারে, তাহলে তার হাতে তা অর্পণ করো। প্রসিদ্ধ হাদীসের উপর আমল করার উদ্দেশ্য এ হাদীসের আদেশটিকে বৈধতার অর্থে গ্রহণ করা হবে। প্রসিদ্ধ হাদীসটি হলো البينة على المدعى (প্রমাণ পেশ করা বাদীর দায়িত্ব)।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কেউ এসে যদি লোকতার মালিকানা দাবি করে তাহলে তাকে নিজ দাবির পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ করতে হবে। সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করলেই কেবল তার হাতে লোকতা অর্পণ করা হবে। অন্যথায় নয়। তবে যদি আলামত বর্ণনা করতে পারে, যেমন- দিরহামের থলিটির অবস্থা, বাঁধনের অবস্থা, দিরহামের সংখ্যা ইত্যাদি সঠিকভাবে বলে দেয়, তাহলে লোকতা উদ্ধারকারী ব্যক্তির জন্য জায়েজ হবে লোকতাটি দাবিদার ব্যক্তির হাতে তুলে দেওয়া। কিন্তু তাকে তুলে দেওয়ার জন্য বাধ্য করা যাবে না।

ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মত হলো, আলামত বর্ণনা করলেই তার হাতে লোকতা তুলে দেওয়ার জন্য উদ্ধারকারীকে বাধ্য করা যাবে। ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ী (র)-এর দলিল হলো– উদ্ধারকারী ব্যক্তির দ্বন্দ্ব হলো মালিকের সাথে লোকতার নিয়ন্ত্রণ বা দখল নিয়ে। মালিকানা নিয়ে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। বিধায় শুধু পরিচয় বা আলামত বর্ণনা করা ওয়াজিব হবে। প্রমাণ পেশ করা ওয়াজিব হবে না।

আহনাফের দলিল হলো, দখল বা নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি মালিকানার মতোই। অতএব, মালিকানা দাবি করলে বা মালিকানা নিয়ে দ্বন্দ্ব হলে যেমন প্রমাণ পেশ করতে হয়, তেমনি দখল দাবি করলেও প্রমাণ পেশ করা আবশ্যক। সুতরাং প্রমাণ পেশ করা ব্যতীত দখল বা নিয়ন্ত্রণের অধিকারী হবে না। তাই উদ্ধারকারীকে তার নিয়ন্ত্রণ হস্তান্তর করার জন্য বাধ্য করা যাবে না।

তবে আলামত বর্ণনা যথার্থ হলে লোকতা তার হাতে অর্পণ করা উদ্ধারকারীর জন্য বৈধ হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন। লোকতার মালিক যদি থলি ও সংখ্যার বিবরণ সঠিকভাবে প্রদান করতে পারে, তাহলে তার হাতে লোকতা অর্পণ কর। হাদীসের এ নির্দেশটি ইবাহাত বা বৈধতা দান অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে, যাতে প্রসিদ্ধ হাদীসের সাথে তার সংঘর্ষ না হয়। প্রসিদ্ধ হাদীসটি হলো– اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِيْ وَالْيَمِيْنُ عَلٰى مَنْ اَنْكَرَ (বাদীর দায়িত্ব প্রমাণ পেশ করা আর বিবাদীর দায়িত্ব কসম করা)।

https://e-ilm.weebly.com/

وَيَأْخُذُ مِنْهُ كَفِيْلًا إِذَا كَانَ يَدْفَعُهُ إِلَيْهِ اسْتِيْثَاقًا، وَهٰذَا بِلَا خِلَافٍ، لِأَنَّهُ يَأْخُذُ الْكَفِيْلَ لِنَفْسِهِ، بِخِلَافِ التَّكْفِيْلِ لِوَارِثٍ غَائِبٍ عِنْدَهُ . وَإِذَا صُدِّقَ قِيْلَ لَا يُجْبَرُ عَلَى الدَّفْعِ كَالْوَكِيْلِ بِقَبْضِ الْوَدِيْعَةِ إِذَا صَدَّقَهُ . وَقِيْلَ يُجْبَرُ لِأَنَّ الْمَالِكَ هَاهُنَا غَيْرُ ظَاهِرٍ وَالْمُوْدِعُ مَالِكٌ ظَاهِرًا وَلَا يَتَصَدَّقُ بِاللُّقْطَةِ عَلَى غَنِيٍّ لِأَنَّ الْمَأْمُوْرَ بِهِ هُوَ التَّصَدُّقُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ ﴿فَإِنْ لَمْ يَأْتِ﴾ يَعْنِيْ صَاحِبَهَا، ﴿فَلْيَتَصَدَّقْ بِهِ﴾ وَالصَّدَقَةُ لَا تَكُوْنُ عَلَى غَنِيٍّ فَأَشْبَهَ الصَّدَقَةَ الْمَفْرُوْضَةَ .

অনুবাদ : এবং তার পক্ষ থেকে একজন কাফীল বা জামিনদার গ্রহণ করবে। যখন বস্তুটি তার হাতে অর্পণ করবে, তা নির্ভরতার উদ্দেশ্যে। এ বিষয়ে কারো মতভিন্নতা নেই। কেননা সে নিজের জন্য কাফীল গ্রহণ করছে। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতানুসারে অনুপস্থিত ওয়ারিশের অনুকূলে কাফীল গ্রহণের বিষয়টি ভিন্ন।

উদ্ধারকারী যদিও তাকে সত্যায়ন করে। কেউ কেউ বলেছেন, তাহলেও তাকে অর্পণ করতে বাধ্য করা যাবে না। যেমন আমানতের মাল ফেরত গ্রহণের উকিলের ক্ষেত্রে তাকে বাধ্য করা যায় না, যদিও সে সত্যায়ন করে।

আর কোনো কোনো মতে বাধ্য করা হবে। কেননা মালিক এখানে অস্পষ্ট। পক্ষান্তরে আমানতের ক্ষেত্রে আমানত গচ্ছিতকারী হলো স্পষ্টতঃ মালিক। **লোকতা কোনো ধনী লোককে সদকা করবেনা।** কারণ শরিয়তের নির্দেশ হলো সদকা করা। নবী (সা) বলেছেন– فَإِنْ لَمْ يَأْتِ فَلْيَتَصَدَّقْ بِهِ (যদি মালিক না আসে, তাহলে বস্তুটি যেন সে সদকা করে) আর সদকা ধনীকে প্রদান করা যায় না। সুতরাং তা ফরজ সদকার সদৃশ হয়ে গেল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিউক্ত ইবারতের সারমর্ম হলো এই যে, আলামত ও চিহ্ন বর্ণনার ভিত্তিতে যখন উদ্ধারকারী ব্যক্তি লোকতার দাবিদারের নিকট লোকতা হস্তান্তর করবে তখন একজনকে দাবিদারের পক্ষ থেকে জামিনদার বানিয়ে নিবে। অর্থাৎ এমন একজন লোক নির্ধারণ করবে যে এ ব্যাপারে নিশ্চয়তা প্রদান করবে যে, উক্ত দাবিদারই উক্ত লোকতার মালিক : তাকে লোকতা দিয়ে দেওয়ার পর অন্য কোনো দাবিদার আসবে না। যদি অন্য কোনো দাবিদার আসে তাহলে তার দায়িত্ব তার উপর বর্তাবে। এমন জামিনদার বানানোর উদ্দেশ্য হলো বিষয়টি মজবুত করা। এটি জায়েজ আছে। এ বিষয়ের কোনো মতানৈক্য নেই।

আর যদি দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে লোকতা হস্তান্তর করে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) হতে বিশুদ্ধ বর্ণনা হলো জামিনদার বানানোর প্রয়োজনীয়তা নেই।

আলোচ্য মাসআলার বিপরীত মাসআলা হলো মিরাশের মাসআলা। যেখানে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে কাফীল বা জামিনদার বানানো জায়েজ নেই। মাসআলাটি কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার মিরাশ তথা রেখে যাওয়া সম্পদ পাওনাদার ও উত্তরাধিকারীদের মাঝে বন্টন করা হচ্ছে। এমতাবস্থায় কোনো পাওনাদার বা উত্তরাধিকারীকে সম্পদ দেওয়ার জন্য তার পক্ষ থেকে জামিনদার গ্রহণ করা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে জায়েজ নয়। সাহেবাইনের মতে জায়েজ আছে।

https://e-ilm.weebly.com/

মোটকথা, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে লোকতার দাবিদারের হাতে লোকতা হস্তান্তর করার সময় কাফীল গ্রহণ করা জায়েজ আছে। কিন্তু ওয়ারিশকে বা পাওনাদারকে মিরাশ বা পাওনা দেওয়ার সময় কাফীল গ্রহণ করা জায়েজ নেই।

এরূপ পার্থক্যের কারণ হিসাবে তিনি বলেন, মৃতের উত্তরাধিকারী ও পাওনাদার ব্যক্তিরা পরিচিত ও নির্ধারিত হয়ে থাকে। তাই এদের সম্পদ দিয়ে দিলে পুনরায় কোনো দাবিদার বের হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না, বিধায় কাফীলের প্রয়োজন নেই। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি লোকতার দাবিদার অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজেকে লোকতার মালিক বলে দাবি করছে সে অপরিচিত। তাকে লোকতা দিয়ে দেওয়ার পর নতুন কোনো দাবিদার বেরিয়ে আসতে পারে তখন উদ্ধারকারীকে বিপদ পড়তে হবে। তাই এমন বিপদ থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে উদ্ধারকারী ব্যক্তি জামিনদার গ্রহণ করবে। যাতে নতুন কোনো দাবিদার বেরিয়ে আসলে ঐ জামিনদার ব্যক্তি প্রথম দাবিদারের নিকট থেকে লোকতা ফিরিয়ে এনে দিতে পারে।

মোটকথা মিরাশ বন্টনের ক্ষেত্রে কাফীলের প্রয়োজন নেই। লোকতা ফেরত দেওয়ার ক্ষেত্রে কাফীলের প্রয়োজন আছে। তাই প্রথম ক্ষেত্রে কাফীল গ্রহণ জায়েজ নেই দ্বিতীয় ক্ষেত্রে জায়েজ।

লোকতার দাবিদারের আলামত বর্ণনা শুনে যদি উদ্ধারকারী ব্যক্তি তাকে মালিক বলে সত্যায়ন করে, অর্থাৎ একথা বলে যে হ্যাঁ, আমি বুঝতে পেরেছি আপনি উক্ত লোকতার মালিক, তবুও লোকতা হস্তান্তর করার জন্য তাকে বাধ্য করা যাবে না। যেমন- কোনো আমানতদার ব্যক্তির কাছে যদি কোনো লোক এসে বলে যে, আমি আমানত গচ্ছিতকারীর উকিল। অর্থাৎ যে আপনার কাছে অমুক সম্পদটি আমানত রেখেছিল সে আমাকে উকিল বানিয়ে প্রেরণ করেছে, আপনার নিকট থেকে তার আমানতটুকু নিয়ে যাওয়ার জন্যে। এমতাবস্থায় আমানতদার ব্যক্তি যদি বলে যে, হ্যাঁ আমি স্বীকার করি আপনি আমানতদারের উকিল, তবুও আমানতদার ব্যক্তিকে উক্ত উকিলের হাতে আমানত সোপর্দ করার জন্য বাধ্য করা যায় না। তদ্রূপ আলোচ্য মাসআলায়ও দাবিদার ব্যক্তির হাতে লোকতা হস্তান্তর করার জন্য উদ্ধারকারীকে বাধ্য করা যাবে না। তাকে সত্যায়ন করা সত্ত্বেও।

কেউ কেউ বলেছেন, উদ্ধারকারী কর্তৃক দাবিদারকে সত্যায়ন করা অবস্থায় লোকতা হস্তান্তর করার জন্য তাকে বাধ্য করা যাবে।

কেননা তার সত্যায়ন অনুযায়ী উপস্থিত দাবিদারই লোকতার মালিক। তাকে ছাড়া অন্যকোনো মালিক আছে বলে জানা নেই। অতএব, উপস্থিত মালিকের হাতে লোকতা তুলে দেওয়ার জন্য বাধ্য করা হবে। পক্ষান্তরে আমানতদার যখন আমানত গচ্ছিতকারীর উকিলকে উকিল বলে সত্যায়ন করে তখন এটা নিশ্চিত থাকে সে মূল মালিক নয়; বরং সে মালিকের উকিল এবং মালিক হলো অন্যজন। আর উকিলের হাতে আমানত হস্তান্তর না করে মূল মালিককে ডেকে আনার অধিকার থাকে আমানতদারে বিধায় উকিলের হাতে আমানত হস্তান্তরের জন্য তাকে বাধ্য করা যায় না।

قَوْلُهُ وَلَا يَتَصَدَّقُ بِاللُّقْطَةِ عَلَى غَنِيٍّ الخ : লোকতার বিষয়ে উপযুক্ত সময়কাল ব্যাপী প্রচার চালানোর পরেও যদি কোনো মালিক বা দাবিদার না আসে, তাহলে লোকতাটি কোনো দরিদ্র মানুষকে সদকা করে দিতে হবে। কোনো ধনী লোককে লোকতা দেওয়া যাবে না। কেননা নবী ﷺ আদেশ করেছেন মালিক না এলে লোকতা সদকা করে দেওয়ার জন্য। আর ধনী লোককে সদকা করা যায় না। দরিদ্র লোককেই করতে হয়।

তবে হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকতা দ্বারা উপকৃত হওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন, তিনি ধনী হওয়া সত্ত্বেও। তাই বলে অন্য কোনো ধনী লোকের জন্য সেটা জায়েজ হবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

وَانْ كَانَ الْمُلْتَقِطُ غنيًا لَمْ يَجُزْ لَه اَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يَجُوْزُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلوٰةُ والسَّلامُ فِي حَدِيْثِ أُبَيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ﴿فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَادْفَعْهَا اِلَيْهِ وَاِلَّا فَانْتَفِعْ بِهَا﴾ وكَان من الْمَيَاسِيْرِ. وَلِاَنَّهُ اِنَّمَا يُبَاحُ لِلْفَقِيْرِ حَمْلًا لَه عَلَى رَفْعِهَا صِيَانَةً لَهَا وَالْغَنِيُّ يُشَارِكُهُ فِيْهِ . وَلَنَا اَنَّهُ مالُ الْغَيْرِ فَلَا يُبَاحُ الِانْتِفَاعُ بِهِ اِلَّا بِرِضَاهُ لِإِطْلَاقِ النُّصُوْصِ وَالْإِبَاحَةُ لِلْفَقِيْرِ لِمَا رَوَيْنَاهُ، اَوْ بِالْإِجْمَاعِ فَيَبْقَى مَا وَرَاءَهُ عَلَى الْأَصْلِ، وَالْغَنِيُّ مَحْمُوْلٌ عَلَى الْأَخْذِ لِاحْتِمَالِ افْتِقَارِهِ فِيْ مُدَّةِ التَّعْرِيْفِ، وَالْفَقِيْرُ قَدْ يَتَوَانَى لِاحْتِمَالِ اسْتِغْنَائِهِ فِيْهَا وَانْتِفَاعُ أُبَيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ كَانَ بِإِذْنِ الْإِمَامِ وَهُوَ جَائِزٌ بِإِذْنِهِ ـ

অনুবাদ : উদ্ধারকারী ব্যক্তি ধনী হলে লোকতা দ্বারা উপকৃত হওয়া তার জন্য জায়েজ নয়। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, জায়েজ হবে। কেননা হযরত উবাই (রা.) বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَادْفَعْهَا اِلَيْهِ وَاِلَّا فَانْتَفِعْ بِهَا (যদি লোকতার মালিক আসে তাহলে তার হাতে লোকতা অর্পণ কর। অন্যথায় তুমি এর দ্বারা উপকৃত হও)। অথচ তিনি সচ্ছল ব্যক্তি ছিলেন। তাছাড়া এ কারণে যে, দরিদ্রের জন্য তা বৈধ হওয়ার কারণ হচ্ছে জিনিসটিকে হেফাজতের উদ্দেশ্যে উঠিয়ে নিতে তাকে উদ্বুদ্ধ করা। এ বিষয়ে ধনী ব্যক্তির বেলায় উক্ত কারণ সমভাবে প্রযোজ্য।

আমাদের দলিল এই যে, এটা পরের সম্পদ। সুতরাং মালিকের সম্মতি ছাড়া তা দ্বারা উপকৃত হওয়া বৈধ হতে পারে না। কেননা (অন্যের মাল ভোগ করা নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কিত) আয়াতসমূহ নিঃশর্ত রয়েছে। পক্ষান্তরে দরিদ্রের জন্য বৈধ হয়েছে আমাদের বর্ণিত হাদীসটির কারণে। কিংবা ইজমার ভিত্তিতে। সুতরাং দরিদ্রের উপকৃত হওয়ার বৈধতা ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে মূল বিধান বহাল থাকবে।

আর সচ্ছল ব্যক্তি ঘোষণাকালীন সময়ে অসচ্ছল হয়ে পড়ার সম্ভাবনার কারণে কুড়িয়ে নিতে উদ্বুদ্ধ হতে পারে। পক্ষান্তরে দরিদ্র ব্যক্তি ঘোষণাকালীন সময়ে সচ্ছল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনার কারণে কুড়িয়ে নিতে অনাগ্রহ বোধ করতে পারে।

আর হযরত উবাই (রা.)-এর উপকৃত হওয়ার বিষয়টি ইমামের অনুমতিতে হয়েছে। আর ইমামের অনুমতিক্রমে তা জায়েজ আছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিউক্ত ইবারতে একটি মতভেদপূর্ণ মাসআলা আলোচিত হয়েছে। মাসআলাটি এই যে, লোকতা উদ্ধারকারী ব্যক্তি যদি ধনী হয়, তাহলে প্রচারের মেয়াদকাল শেষ হওয়ার পর লোকতা দ্বারা উপকৃত হওয়া তার জন্য বৈধ হবে কিনা?

আহনাফের মত হলো, লোকতা দ্বারা উপকৃত হওয়া ধনী ব্যক্তির জন্য জায়েজ নয়। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর মত হলো ধনী ব্যক্তিও লোকতা দ্বারা উপকৃত হতে পারবে।

https://e-ilm.weebly.com/

ইমাম শাফেয়ী (র)-এর দলিল-

দলিল-১ : হযরত উবাই (রা) হতে বর্ণিত হাদীস- فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ وَإِلَّا فَانْتَفِعْ بِهَا - যদি মালিক আসে তাহলে তার হাতে সোপর্দ কর। অন্যথায় তুমি এর দ্বারা উপকৃত হও।

এ হাদীসে রাসূল ﷺ হযরত উবাইকে আদেশ করলেন লোকতা দ্বারা উপকৃত হওয়ার জন্য। অথচ হযরত উবাই (রা.) ধনী লোক ছিলেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় ধনীলোকের জন্যও লোকতা দ্বারা উপকৃত হওয়া জায়েজ আছে।

দলিল-২ : দরিদ্রের জন্য লোকতা দ্বারা উপকৃত হওয়া বৈধ করা হয়েছে। এর মূল কারণ হলো, লোকতা কুড়িয়ে নেওয়ার জন্য দরিদ্রকে উৎসাহিত করা। অর্থাৎ দরিদ্র ব্যক্তি যখন জানবে প্রচারের মেয়াদকাল শেষ হলে আমি এই লোকতা দ্বারা উপকৃত হতে পারব তখন সে লোকতা কুড়িয়ে নিবে। ফলে লোকতার সম্পদটি নষ্ট হওয়া থেকে বেঁচে যাবে।

আর এটা সুস্পষ্ট যে, উক্ত কারণ ধনী ব্যক্তির ক্ষেত্রেও বিদ্যমান। কেননা ধনী ব্যক্তি লোকতা কুড়িয়ে এনেছে এবং তার দ্বারা লোকতার সম্পদটি হেফাজত হয়েছে। অতএব, উক্ত কারণে দরিদ্রের জন্য যেমন লোকতা দ্বারা উপকৃত হওয়া জায়েজ হয়েছে, তেমনি ধনী ব্যক্তির জন্যও জায়েজ হবে।

আহনাফের দলিল : লোকতা অন্যের সম্পদ। আর অন্যের সম্পদ দ্বারা তার মালিকের অনুমতি ছাড়া উপকৃত হওয়া নিষেধ। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ তোমরা একে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করো না।

আয়াতের নিঃশর্ততা অনুযায়ী লোকতা দ্বারা উপকৃত হওয়া ধনী-দরিদ্র সকলের জন্যই অবৈধ ছিল। কিন্তু দরিদ্রের জন্য উপকৃত হওয়ার বৈধতা দান করা হয়েছে বিশেষভাবে হাদীসের মাধ্যমে ও ইজমার কারণে। অতএব, দরিদ্র ছাড়া অন্যের ক্ষেত্রে তথা ধনীর ক্ষেত্রে মূল হুকুম হারাম হওয়াই বহাল থাকবে কুরআনের আয়াত সমূহের কারণে। দরিদ্রের জন্যই শুধু হালাল হবে।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিলের জবাব :

১. ইমাম শাফেয়ী (র.) হাদীস দ্বারা যে দলিলটি পেশ করেছেন তার জবাব হলো এই যে, হযরত উবাই (রা.) লোকতা দ্বারা উপকৃত হয়েছেন রাসূল ﷺ তথা ইমামের অনুমতিক্রমে নিয়ম ব্যতিক্রমিভাবে। অতএব, এটাকে ব্যাপক দলিলরূপে গ্রহণ করা যাবে। যেমন- নিয়ম ব্যতিক্রমিভাবে ইমামের বিশেষ নির্দেশক্রমে হযরত খুযাইমা (রা.) -এর একার সাক্ষ্য দ্বারাই ফয়সালা করা যেত। কিন্তু এটাকে সাধারণ নিয়ম হিসাবে গ্রহণ করা যায় না। হযরত খুযাইমা (রা.) ছাড়া অন্য সাক্ষী দুজন না হলে ফয়সালা করা যায় না। তদ্রূপ রাসূলের বিশেষ অনুমতিক্রমে হযরত উবাই (রা.) ধনী হয়েও লোকতা দ্বারা উপকৃত হয়েছেন। এটাকে আমরা বৈধ মনে করি। কিন্তু একে সাধারণ নিয়মরূপে গ্রহণ করা যাবে না। ইমামের অনুমতি ছাড়া যেকোনো ধনী লোক লোকতা ভোগ করতে পারবে না।

২. ইমাম শাফেয়ী (র.) দ্বিতীয় যে দলিলটি পেশ করেছিলেন, এর জবাব এই যে, ধনী ব্যক্তির জন্য লোকতা ভোগ করা হালাল না হওয়া সত্ত্বেও, লোকতা কুড়িয়ে নিতে সে উৎসাহিত হতে পারে এই ভেবে যে, হয়তো ভবিষ্যতে সে দরিদ্র হয়ে যাবে। আর তখন তার জন্য লোকতা ভোগ করা জায়েজ হবে। তদ্রূপ এর বিপরীতে দরিদ্র ব্যক্তিও লোকতা কুড়াতে অনাগ্রহ বোধ করতে পারে এই ভেবে যে, ভবিষ্যতে সে ধনী হয়ে যাবে। আর তখন তার জন্য লোকতা ভোগ করা জায়েজ হবে না। অতএব, লোকতা কুড়ানোর আগ্রহ বা অনাগ্রহ উভয়ের কারণ ধনী-দরিদ্র উভয়ের মাঝে বিদ্যমান। কিন্তু ধনীর ক্ষেত্রে তার ভবিষ্যতে দরিদ্র হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাটি দ্বারা লোকতা ব্যবহার হালাল হবে না। কেননা ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাময় কারণ বর্তমান অবস্থার উপর কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না।

https://e-ilm.weebly.com/

وَإِنْ كَانَ الْمُلْتَقِطُ فَقِيْرًا فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا لِمَا فِيْهِ مِنْ تَحْقِيْقِ النَّظَرِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ وَلِهٰذَا جَازَ الدَّفْعُ إِلٰى فَقِيْرٍ غَيْرِهِ وَكَذَا إِذَا كَانَ الْفَقِيْرُ أَبَاهُ أَوْ إِبْنَهُ أَوْ زَوْجَتَهُ وَإِنْ كَانَ هُوَ غَنِيًّا لِمَا ذَكَرْنَا، وَاللّٰهُ أَعْلَمُ

অনুবাদ : আর যদি উদ্ধারকারী ব্যক্তি দরিদ্র হয়, তাহলে তা দ্বারা উপকৃত হওয়াতে কোনো বাধা নেই। কেননা তাতে উভয় পক্ষের কল্যাণ বাস্তবায়িত হয়। এ কারণেই অন্য দরিদ্র ব্যক্তিকে প্রদান করাও জায়েজ আছে। **তদ্রূপ** (উপকৃত হতে বাধা নেই) **যদি দরিদ্র ব্যক্তি তার পিতা, সন্তান বা স্ত্রী হয় আর সে নিজে ধনী হয়।** এর কারণ আমার পূর্বে উল্লেখ করে এসেছি। আল্লাহই অধিক অবগত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যদি লোকতা উদ্ধারকারী ব্যক্তি দরিদ্র হয়, তাহলে প্রচারকাল শেষ হওয়ার পর সে তা ভোগ করতে পারবে। কিংবা উদ্ধারকারী নিজে ধনী কিন্তু তার স্ত্রী, সন্তান কিংবা তার পিতা যদি দরিদ্র হয় তাহলে লোকতাটি তাদেরকে দিয়ে দিতে পারবে। কারণ দরিদ্র ব্যক্তি কিংবা তার দরিদ্র আত্মীয়রা লোকতা ভোগ করার মধ্যে উদ্ধারকারী ও মালিক উভয় পক্ষের কল্যাণ রয়েছে।

উদ্ধারকারীর কল্যাণ রয়েছে এ কারণে সে বস্তুটি দ্বারা উপকৃত হতে পারছে। আর মালিকের কল্যাণ এ কারণে যে, তার মালিকানা বস্তু অনর্থক পড়ে না থেকে সদকা হয়ে গেছে এবং এর ফলে তার ছওয়াব হাসিল হচ্ছে। অতএব, যে ব্যবস্থায় মালিক ও উদ্ধারকারী উভয় পক্ষের কল্যাণ নিহিত আছে সে ব্যবস্থাই কাম্য।

https://e-ilm.weebly.com/

كِتَابُ الْاِبَاقِ

اَلْاٰبِقُ اَخْذُهٗ اَفْضَلُ فِيْ حَقِّ مَنْ يَقْوٰى عَلَيْهِ لِمَا فِيْهِ مِنْ اِحْيَائِهٖ، وَاَمَّا الضَّالُّ فَقَدْ قِيْلَ كَذٰلِكَ، وَقَدْ قِيْلَ تَرْكُهٗ اَفْضَلُ لِاَنَّهٗ لَا يَبْرَحُ مَكَانَهٗ فَيَجِدُهُ الْمَالِكُ وَلَا كَذٰلِكَ الْاٰبِقُ ثُمَّ اٰخِذُ الْاٰبِقِ يَأْتِيْ بِهٖ اِلَى السُّلْطَانِ لِاَنَّهٗ لَا يَقْدِرُ عَلٰى حِفْظِهٖ بِنَفْسِهٖ، بِخِلَافِ اللُّقْطَةِ، ثُمَّ اِذَا رُفِعَ الْاٰبِقُ اِلَيْهِ يَحْبِسُهٗ، وَلَوْ رُفِعَ الضَّالُّ لَا يَحْبِسُهٗ لِاَنَّهٗ لَا يُؤْمَنُ عَلَى الْاٰبِقِ الْاِبَاقُ ثَانِيًا، بِخِلَافِ الضَّالِّ ـ

অধ্যায় : দাস-দাসীর পলায়ন

অনুবাদ : যার পাকড়াও করার সামর্থ্য রয়েছে, তার জন্য পলাতককে পাকড়াও করাই উত্তম। কেননা এতে মালিকের হক সংরক্ষণ করা হয়। কোনো কোনো মতে পথহারা গোলামের হুকুমও এরূপ। আর কোনো কোনো মতে তাকে ছেড়ে দেওয়া উত্তম। কেননা তাতে সে একই স্থানে অবস্থান করবে। ফলে মালিক তাকে পেয়ে যাবে। কিন্তু পলাতকের বিষয়টি এমন নয়। আর পাকড়াওকারী পলাতককে নিয়ে শাসকের কাছে হাজির হবে। কেননা সে নিজে তাকে হেফাজত করতে সক্ষম নয়। কুড়িয়ে পাওয়া বস্তুর বিষয় ভিন্ন। আর পলাতককে শাসকের সমীপে উপস্থিত করার পর তিনি তাকে বন্দি করবেন। কিন্তু পথহারা গোলামকে উপস্থিত করলে তাকে বন্দী করবেন না। কেননা পলাতকের দ্বিতীয় পালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চয়তা নেই। কিন্তু পথহারা গোলামের বিষয়টি ভিন্ন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

اِبَاق শব্দটি মাসদার। এর ক্রিয়ারূপ হলো اَبَقَ يَأْبِقُ বাবে ضَرَبَ হতে। অর্থ- হলো পলায়ন করা, পালিয়ে যাওয়া।

اَلْاٰبِقُ শব্দটি اسم فاعل -এর واحد مذكر -এর সীগাহ। অর্থ হলো পলায়নকারী, পলাতক। এখানে পলাতক দ্বারা বুঝানো হয়েছে, যে গোলাম বা বাঁদি নিজ মনিবের নিকট হতে ইচ্ছাকৃতভাবে পালিয়ে যায়।

اَلضَّالُّ শব্দটিও اِسْمُ فَاعِلٍ -এর واحد مذكر -এর সীগাহ। ضَلَّ يَضِلُّ ضَلَالًا বাবে ضَرَبَ হতে নির্গত। অর্থ- হলো পথহারা ব্যক্তি। এখানে উদ্দেশ্য হলো, যে গোলাম-বাঁদি মনিবের নিকট পৌঁছার রাস্তা হারিয়ে বিপথে চলে যায়।

পলাতক গোলামকে ধরে এনে মনিবের কাছে পৌঁছে দেওয়ার খরচ বাবদ মনিবের উপর শরয়ীভাবে যে অর্থ দায় আরোপিত হয় তাকে اَلْجُعْلُ জু'ল বলে। সফরের দূরত্ব অপেক্ষা কম দূরত্ব থেকে গোলাম-বাঁদি পৌঁছে দেওয়ার খরচ বাবদ যে অর্থদায় আরোপিত হয় তাকে رَضْخٌ (রদখ) বলে। রদখের পরিমাণ জু'ল অপেক্ষা কম হয়ে থাকে এবং এর পরিমাণ নির্ধারিত নয়।

পলাতক দাস-দাসীকে ধরে এনে মনিবের হাতে পৌঁছে দেওয়ার পুণ্যও রয়েছে। তবে পলাতক দাস-দাসীকে পাকড়াও করার সময় এ মর্মে সাক্ষী রাখা যুক্তিযুক্ত যে, আমি তাকে তার মনিবের কাছে পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে পাকড়াও করছি।

ইবারতের ব্যাখ্যা : পলাতক গোলামকে পাকড়াও করার সামর্থ্য থাকলে তাকে পাকড়াও করা উত্তম। কেননা গোলামটি পালিয়ে গেলে মনিবের হক নষ্ট হয়। আর ধরে এনে দিতে পারলে মনিবের হক রক্ষা হয়। তাকে সাহায্য করা হয়, তার কল্যাণ কামনা করা হয়, যা নিঃসন্দেহে পুণ্যের কাজ। কেউ কেউ বলেন, পথহারা গোলামের ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য। আবার কেউ কেউ বলেন, পথহারা গোলামকে না ধরাই ভালো। কেননা সে নিজ স্থানেই অবস্থান করবে। ফলে এক পর্যায়ে মনিব তাকে পেয়ে যাবে। পলাতক গোলামকে যে ব্যক্তি পাকড়াও করবে, শামসুল আইম্মা সারাখসী (র.)-এর মতে তার দায়িত্ব হলো গোলামকে শাসকের দরবারে পৌঁছে দেওয়া। কারণ সে নিজে তাকে হেফাজত করতে পারবে না। যেহেতু সে দুষ্ট প্রকৃতির।

আর শামসুল আইম্মা হালওয়ায়ী (র.)-এর মত হলো, পাকড়াওকারী ব্যক্তি ইচ্ছা করলে নিজে হেফাজত করতে পারে, আর ইচ্ছা করলে কাজির দরবারেও হাজির করতে পারে। পলাতক গোলামকে কাজির দরবারে এনে হাজির করলে কাজি তাকে বন্দি করবেন। কেননা সে পুনরায় পালিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। পক্ষান্তরে পথহারা গোলামকে বন্দি করতে হবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ وَمَنْ رَدَّ اٰبِقًا عَلٰى مَوْلَاهُ مِنْ مَسِيْرَةِ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ فَصَاعِدًا فَلَهُ عَلَيْهِ جُعْلُهُ اَرْبَعُوْنَ دِرْهَمًا، وَاِنْ رَدَّهُ لِاَقَلَّ مِنْ ذٰلِكَ فَبِحِسَابِهِ وَهٰذَا اِسْتِحْسَانٌ . وَالْقِيَاسُ اَنْ لَا يَكُوْنَ لَهُ شَيْءٌ اِلَّا بِالشَّرْطِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى لِاَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ بِمَنَافِعِهِ فَاَشْبَهَ الْعَبْدَ الضَّالَّ . وَلَنَا اَنَّ الصَّحَابَةَ رِضْوَانُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ اِتَّفَقُوْا عَلٰى وُجُوْبِ اَصْلِ الْجُعْلِ، اِلَّا اَنَّ مِنْهُمْ مَنْ اَوْجَبَ اَرْبَعِيْنَ وَمِنْهُمْ مَنْ اَوْجَبَ مَا دُوْنَهَا، فَاَوْجَبْنَا الْاَرْبَعِيْنَ فِيْ مَسِيْرَةِ السَّفَرِ وَمَا دُوْنَهَا فِيْمَا دُوْنَهُ تَوْفِيْقًا وَتَلْفِيْقًا بَيْنَهُمَا، وَلِاَنَّ اِيْجَابَ الْجُعْلِ اَصْلُهُ حَامِلٌ عَلَى الرَّدِّ اِذِ الْحِسْبَةُ نَادِرَةٌ فَتَحْصُلُ صِيَانَةُ اَمْوَالِ النَّاسِ وَالتَّقْدِيْرُ بِالسَّمْعِ وَلَا سَمْعَ فِي الضَّالِّ فَامْتَنَعَ، وَلِاَنَّ الْحَاجَةَ اِلٰى صِيَانَةِ الضَّالِّ دُوْنَهَا اِلٰى صِيَانَةِ الْاٰبِقِ لِاَنَّهُ لَا يَتَوَارٰى وَالْاٰبِقُ يَخْتَفِيْ، وَيُقَدَّرُ الرَّضْخُ فِي الرَّدِّ عَمَّا دُوْنَ السَّفَرِ بِاصْطِلَاحِهِمَا اَوْ يُفَوَّضُ اِلٰى رَاْيِ الْقَاضِيْ وَقِيْلَ يُقَسَّمُ الْاَرْبَعُوْنَ عَلَى الْاَيَّامِ الثَّلَاثَةِ اِذْ هِيَ اَقَلُّ مُدَّةِ السَّفَرِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যে ব্যক্তি তিন দিনের কিংবা তার বেশি দূরত্ব থেকে পলাতককে তার মনিবের কাছে ফেরত এনে দেয় সে চল্লিশ দিরহাম পারিতোষিক পাবে। আর যদি এর চেয়ে কম দূরত্ব থেকে এনে দেয়, তাহলে সেই হিসাবে পাবে। এটা হলো সূক্ষ্ম কিয়াসের দাবি। সাধারণ কিয়াস মতে সে পূর্বশর্ত ছাড়া কিছুই পাবে না। এটা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মত। কেননা সে তার উপকারিতা স্বেচ্ছায় দান করেছে। সুতরাং পথ হারিয়ে ফেলা গোলামের অনুরূপ হলো।

আমাদের দলিল এই যে, সাহাবীগণ মূল পারিতোষিক ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে একমত হয়েছেন। তবে কেউ চল্লিশ দিরহাম আর কেউ তার চেয়ে কম সাব্যস্ত করেছেন। তাই আমরা সফরের দূরত্বে চল্লিশ দিরহাম এবং এর চেয়ে কম দূরত্বে তার চেয়ে কম সাব্যস্ত করেছি। উদ্দেশ্য হলো, উভয় সিদ্ধান্তের মাঝে সমন্বয় ও সঙ্গতি সাধন করা।

তা ছাড়া এ কারণে যে, মূল পারিতোষিক সাব্যস্ত করার অর্থ হলো গোলামকে ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা। কেননা ছওয়াবের অন্বেষণে কাজ করা বিরল। সুতরাং তাতে মানুষের মালের হেফাজতের বিষয়টি হাসিল হবে।

আর পরিমাণ নির্ধারণ শরিয়তের পক্ষ হতে শ্রুতির উপর নির্ভরশীল। অথচ পথহারা গোলামের ক্ষেত্রে কোনো পরিমাণ শ্রুত হয়নি। তাই সে ক্ষেত্রে (পরিমাণ নির্ধারণে) বিরত থাকা হয়েছে।

তাছাড়া এজন্য যে, পথহারা গোলামকে হেফাজতের প্রয়োজন পলাতক গোলামকে হেফাজতের প্রয়োজন অপেক্ষা কম। কেননা পথহারা গোলাম আত্মগোপন করবে না। অথচ পলাতক গোলাম আত্মগোপন করবে।

আর সফরের কম দূরত্ব থেকে ফেরত দেওয়ার ক্ষেত্রে রদখ পরিমাণ নির্ধারণ করা হবে উভয়ের সমঝোতার মাধ্যমে কিংবা কাজির মতের উপর সোপর্দ করা হবে। আর কেউ কেউ বলেছেন, চল্লিশ দিরহামকে তিন দিনের হিসাবে বণ্টন করা হবে। কেননা তিন দিনই হলো সফরের সর্বনিম্ন সময়।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِيْنَ يُقْضٰى لَهُ بِقِيمَتِهِ إِلَّا دِرْهَمًا قَالَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : وَهٰذَا قَوْلُ مُحَمَّدٍ . وَقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ : لَهُ أَرْبَعُوْنَ دِرْهَمًا، لِأَنَّ التَّقْدِيْرَ بِهَا ثَبَتَ بِالنَّصِّ فَلَا يَنْقُصُ عَنْهَا وَلِهٰذَا لَا يَجُوْزُ الصُّلْحُ عَلَى الزِّيَادَةِ، بِخِلَافِ الصُّلْحِ عَلَى الْأَقَلِّ لِأَنَّهُ حَطٌّ مِنْهُ . وَمُحَمَّدٌ وَلِمُحَمَّدٍ أَنَّ الْمَقْصُوْدَ حَمْلُ الْغَيْرِ عَلَى الرَّدِّ لِيَحْيَا مَالُ الْمَالِكِ فَيَنْقُصُ دِرْهَمٌ لِيَسْلَمَ لَهُ شَيْءٌ تَحْقِيْقًا لِلْفَائِدَةِ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, গোলামের মূল্য যদি চল্লিশ দিরহামের কম হয় তাহলে ফেরত দানকারীর জন্য তার মূল্য প্রদানের ফয়সালা করা হবে অবশ্য তা থেকে এক দিরহাম কম।

গ্রন্থকার বলেন, এটি হলো ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমত। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, সে চল্লিশ দিরহাম পাবে। কেননা হাদীসের দ্বারা এ পরিমাণ সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং তা থেকে হ্রাস করা যাবে না। এ কারণেই তো অতিরিক্ত পরিমাণের উপর সমঝোতা করা জায়েজ নয়। পক্ষান্তরে তার চেয়ে কম পরিমাণের উপর সমঝোতা করা জায়েজ আছে। কেননা এর অর্থ হলো নির্ধারিত পরিমাণ থেকে হ্রাস করা।

ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল এই যে, পারিতোষিক নির্ধারণের উদ্দেশ্য হলো তাকে গোলাম ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা, যাতে মালিকের মাল সংরক্ষিত থাকে। সুতরাং এক দিরহাম কমিয়ে দেওয়া হবে, যাতে মালিকের উপকার বাস্তবায়িত হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ : وَمَنْ رَدَّ أَبِقًا عَلَى مَوْلَاهُ مِنَ الخ : উপরিউক্ত ইবারতের সারসংক্ষেপ হলো, পথহারা গোলামকে মনিবের কাছে ফেরত এনে দিলে, এ বাবদ কোনো অর্থ দায় ওয়াজিব হয় না। পালাতক গোলামকে ফেরত এনে দিলেও ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতে কোনো কিছু পাবে না। আল্লাহর কাছে ছওয়াব পাবে। কারণ সে নিজের ইচ্ছায় একজনের সেবা করেছে। তাই এর কোনো বিনিময় দেওয়া মনিবের উপর আবশ্যক নয়।

পক্ষান্তরে আহনাফ বলেন, কোনো কিছু না পাওয়াই কিয়াসের দাবি ছিল। কিন্তু সূক্ষ্ম কিয়াসের তাগিদে সিদ্ধান্ত হলো, সফরের দূরত্ব তথা তিন দিনের পথ দূর থেকে ধরে এনে দিলে চল্লিশ দিরহাম জু'ল পাবে। আর এর চেয়ে কম দূরত্ব থেকে এনে দিলে সেই হিসাবে রদখ পাবে। এই রদখের পরিমাণ নির্ধারণ করা হবে উভয় পক্ষের সমঝোতার মাধ্যমে অথবা কাজির সিদ্ধান্তের মাধ্যমে। কেউ কেউ বলেছেন, চল্লিশ দিরহামকে তিন দিনের হিসাবে ভাগ করে সেই অনুযায়ী দেওয়া হবে।

قَوْلُهُ : وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِيْنَ يُقْضٰى الخ : ফেরত আনা পলাতক গোলামের মূল্য যদি চল্লিশ দিরহামের কম হয় তাহলে জু'ল বাবদ কত দিবে এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মত হলো চল্লিশ দিরহামই দিতে হবে, কম দিতে পারবে না। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)ও এ মত পোষণ করেন। কারণ চল্লিশ দিরহামের এ পরিমাণটি নস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। তার থেকে হ্রাস করা যাবে না। পরিমাণটি নস দ্বারা প্রমাণিত ও নির্ধারিত থাকার কারণে চল্লিশ দিরহামের বেশি লোকদের ব্যাপারে উভয় পক্ষ সম্মত হলেও বেশি লেনদেন জায়েজ হয় না। তবে চল্লিশ দিরহামের কম লেনদেনের ব্যাপারে উভয় পক্ষ সম্মত হলে তা জায়েজ হয়। কেননা তখন ফেরত আনয়নকারী ব্যক্তি নিজের হকের কিছু অংশ ছেড়ে দিতে প্রস্তুত হয়। এতে নাজায়েজ হওয়ার কিছু নেই।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, গোলামের মূল্য যদি চল্লিশ দিরহাম অপেক্ষা কম হয়, তাহলে চল্লিশ দিরহাম জু'ল দিতে হবে না; বরং গোলামের যে মূল্য আছে তার চেয়ে এক দিরহাম কম পরিমাণ জু'ল দিবে। কারণ জু'ল নির্ধারণের আসল উদ্দেশ্য হলো পলাতক গোলামকে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে উৎসাহিত করা, যাতে মনিবের সম্পদ সংরক্ষিত হয়। এখন যদি গোলামের মূল্য চল্লিশ দিরহামের কম হওয়া অবস্থায় চল্লিশ দিরহাম জু'ল দিতে হয়, তাহলে মনিবের সম্পদ সংরক্ষিত হওয়ার স্থলে তাকে আরো ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়। জু'ল নির্ধারণের আসল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। তাই গোলামের মূল্যের এক দিরহাম কম পরিমাণ জু'ল দিবে, যাতে মনিবের জন্য এক দিরহাম হলেও থেকে যায়। তার সম্পদ সামান্য হলেও রক্ষা পায় এবং জু'ল নির্ধারণের আসল উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হয়।

https://e-ilm.weebly.com/

وَاَمَّا اُمُّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرُ فِيْ هٰذَا بِمَنْزِلَةِ الْقِنِّ اِذَا كَانَ الرَّدُّ فِيْ حَيَاةِ الْمَوْلٰى لِمَا فِيْهِ مِنْ اِحْيَاءِ مِلْكِهٖ؛ وَلَوْ رُدَّ بَعْدَ مَمَاتِهٖ لَا جُعْلَ فِيْهِمَا لِاَنَّهُمَا يُعْتَقَانِ بِالْمَوْتِ بِخِلَافِ الْقِنِّ وَلَوْ كَانَ الرَّادُّ اَبَا الْمَوْلٰى اَوْ اِبْنَهٗ وَهُوَ فِيْ عِيَالِهٖ اَوْ اَحَدَ الزَّوْجَيْنِ عَلَى الْاٰخَرِ فَلَا جُعْلَ لِاَنَّ هٰؤُلَاءِ يَتَبَرَّعُوْنَ بِالرَّدِّ عَادَةً وَلَا يَتَنَاوَلُهُمْ اِطْلَاقُ الْكِتَابِ قَالَ وَاِنْ اَبَقَ مِنَ الَّذِيْ رَدَّهٗ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِاَنَّهٗ اَمَانَةٌ فِيْ يَدِهٖ لٰكِنَّ هٰذَا اِذَا اَشْهَدَ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي اللُّقْطَةِ. قَالَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَذُكِرَ فِيْ بَعْضِ النُّسَخِ اَنَّهٗ لَا شَيْءَ لَهٗ، وَهُوَ صَحِيْحٌ اَيْضًا لِاَنَّهٗ فِيْ مَعْنَى الْبَائِعِ مِنَ الْمَالِكِ، وَلِهٰذَا كَانَ لَهٗ اَنْ يَحْبِسَ الْاٰبِقَ حَتّٰى يَسْتَوْفِيَ الْجُعْلَ بِمَنْزِلَةِ الْبَائِعِ يَحْبِسُ الْمَبِيْعَ لِاسْتِيْفَاءِ الثَّمَنِ، وَكَذٰلِكَ اِذَا مَاتَ فِيْ يَدِهٖ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِمَا قُلْنَا ـ

অনুবাদ : এ বিষয়ে উম্মে ওয়ালাদ ও মুদাব্বার সাধারণ দাসের পর্যায়ভুক্ত, যদি প্রত্যর্পণ মনিবের জীবদ্দশায় হয়। কেননা এতে তার মালিকানা সংরক্ষণ করা হয়। পক্ষান্তরে যদি মনিবের মৃত্যুর পর প্রত্যর্পণ করা হয়, তাহলে ঐ দুজনের ক্ষেত্রে কোনো পারিশ্রমিক প্রদান করা হবে না। কেননা মনিবের মৃত্যুতে তারা আজাদ হয়ে যায়। সাধারণ দাসের বিষয়টি ভিন্ন। প্রত্যর্পণকারী যদি মনিবের পিতা বা পুত্র হয় আর পিতা বা পুত্র তার পোষ্য পরিবারভুক্ত হয় কিংবা স্বামী-স্ত্রীর একজন যদি অপরজনের গোলাম ধরে আনে। তাহলে পারিশ্রমিক পাবে না। কেননা সাধারণত এরা প্রত্যর্পণের ব্যাপারে স্বেচ্ছায় প্রণোদিত হয়ে থাকে। কুদূরীতে বর্ণিত বক্তব্যের নিঃশর্ততা এদের অন্তর্ভুক্ত করবে না।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যে ধরে এনেছে তার কাছ থেকে যদি পালিয়ে যায়, তাহলে তার উপর ক্ষতিপূরণ আসবে না। কেননা এটা তার হাতে আমানত ছিল। তবে এটা তখন হবে, যখন এ বিষয়ে সে সাক্ষী রাখবে; কুড়িয়ে পাওয়া লোকতার ক্ষেত্রে বিষয়টি আমরা বর্ণনা করেছি।

হেদায়া গ্রন্থকার বলেন, কুদূরীর কোনো কোনো অনুলিপিতে এরূপ রয়েছে যে, তার অনুকূলে কিছুই সাব্যস্ত হবে না। এটি সঠিক অভিমত। কেননা গুণগতভাবে সে মালিকের নিকট বিক্রয়কারী। এ কারণেই পারিশ্রমিক উসুল করা পর্যন্ত পলাতক গোলামকে সে আটক রাখতে পারে। যেরূপ বিক্রেতা ব্যক্তি বিক্রীত পণ্যের মূল্য উসুল করা পর্যন্ত পণ্য আটকে রাখতে পারে। তদ্রূপ যদি তার হস্তগত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তাহলে আমাদের বর্ণিত একই কারণে তার উপর কিছুই আরোপিত হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সাধারণ দাসকে মনিবের জীবদ্দশায় ফেরত দেওয়া হোক কিংবা মনিবের মরণোত্তর ফেরত দেওয়া হোক, সর্বাবস্থায় জু'ল প্রদান করতে হবে।

উম্মে ওয়ালাদ ও মুদাব্বারকে যদি মনিবের জীবদ্দশায় ফেরত দেওয়া হয়, তাহলে জু'ল প্রদান করতে হবে। মনিবের মরণোত্তর ফেরত দেওয়া হলে জু'ল প্রদান করতে হবে না। কেননা তখন তারা আজাদ হয়ে যায়, মনিবের সম্পদরূপে গণ্য হয় না।

https://e-ilm.weebly.com/

قوله ولو كان الراد ابن المولى او ابنه الخ : প্রত্যর্পণকারী যদি গোলামের মালিকের পিতা, পুত্র, স্বামী বা স্ত্রী হয় এবং তার পোষ্য পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহলে তাদেরকে জু'ল দিতে হবে না। পিতা যদি পোষ্য পরিবারের অন্তর্ভুক্ত না হয়, তাহলে তাকে জু'ল দিতে হবে। ছেলে পোষ্য পরিবারের অন্তর্ভুক্ত না হলেও তাকে জু'ল দিতে হবে না।

قوله وان ابق من الذي رده فلا شيء الخ : পলাতক গোলাম পাকড়াওকারীর হাত থেকে যদি পুনরায় পালিয়ে যায়, তাহলে তার উপর কিছু ওয়াজিব হবে না। কারণ তার হাতে গোলামটি আমানত স্বরূপ ছিল। আর আমানত হালাক হয়ে গেলে আমানতদারের উপর কোনো ক্ষতিপূরণ আবশ্যক হয় না। তবে এর জন্য শর্ত হলো, গোলামটি পাকড়াও করার সময় সাক্ষী রাখতে হবে এ মর্মে যে, আমি তাকে তার মনিবের নিকট পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে পাকড়াও করছি। সাক্ষী রাখা না রাখা, ক্ষতিপূরণ আবশ্যক হওয়া না হওয়ার প্রসঙ্গটি লোকতা অধ্যায়ে সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে।

কুদূরী কিতাবের নুসখা বা অনুলিপিতে আছে, প্রত্যর্পণকারীর হাত থেকে গোলাম পালিয়ে গেলে, সে কিছু পাবে না। অর্থাৎ মালিকের নিকট থেকে জু'ল পাবে না। অনুরূপভাবে যদি প্রত্যর্পণকারীর হাতে গোলাম মরে যায়, তাহলেও সে জু'ল পাবে না। কেননা প্রত্যর্পণকারী ব্যক্তি হুকমীভাবে মালিকের কাছে গোলাম বিক্রয়কারী। আর বিক্রয়কারী তার বিক্রীত পণ্য ক্রেতার হাতে হস্তান্তর করতে না পারলে কিছু পায় না। অর্থাৎ তার অনুকূলে মূল্য ওয়াজিব হয় না। তদ্রূপ প্রত্যর্পণকারী ব্যক্তিও যদি পলাতক গোলামকে তার মনিবের হাতে তুলে দিতে না পারে, তাহলে তার অনুকূলে কোনো জু'ল ওয়াজিব হবে না।

প্রত্যর্পণকারী ব্যক্তি বিক্রেতার ন্যায় হওয়ার কারণেই সে জু'ল উসুল করার আগ পর্যন্ত গোলাম আটকে রাখতে পারে। যেমন– বিক্রেতা ক্রেতার নিকট থেকে মূল্য উসুল করার আগ পর্যন্ত পণ্য আটকে রাখতে পারে।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ وَلَوْ أَعْتَقَهُ الْمَوْلَى كَمَا لَقِيَهُ صَارَ قَابِضًا بِالْإِعْتَاقِ كَمَا فِي الْعَبْدِ الْمُشْتَرَى، وَكَانَ إِذَا بَاعَهُ مِنَ الرَّادِّ لِسَلَامَةِ الْبَدَلِ لَهُ، وَالرَّدُّ وَإِنْ كَانَ لَهُ حُكْمُ الْبَيْعِ . لَكِنَّهُ بَيْعٌ مِنْ وَجْهٍ فَلَا يَدْخُلُ تَحْتَ النَّهْيِ الْوَارِدِ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُقْبَضْ فَجَازَ . قَالَ وَيَنْبَغِي إِذَا أَخَذَهُ أَنْ يُشْهِدَ أَنَّهُ يَأْخُذُهُ لِيَرُدَّهُ فَالْإِشْهَادُ حَتْمٌ فِيهِ عَلَيْهِ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رح، حَتَّى لَوْ رَدَّهُ مَنْ لَمْ يُشْهِدْ وَقْتَ الْأَخْذِ لَا جُعْلَ لَهُ عِنْدَهُمَا لِأَنَّ تَرْكَ الْإِشْهَادِ أَمَارَةٌ أَنَّهُ أَخَذَهُ لِنَفْسِهِ وَصَارَ كَمَا إِذَا اشْتَرَاهُ مِنَ الْآخِذِ أَوْ اتَّهَبَهُ أَوْ وَرِثَهُ فَرَدَّهُ عَلَى مَوْلَاهُ لَا جُعْلَ لَهُ لِأَنَّهُ رَدَّهُ لِنَفْسِهِ، إِلَّا إِذَا أَشْهَدَ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ لِيَرُدَّهُ فَيَكُونُ لَهُ الْجُعْلُ وَهُوَ مُتَبَرِّعٌ فِي أَدَاءِ الثَّمَنِ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, মনিব যদি তাকে পাওয়া মাত্র আজাদ করে দেয় তাহলে আজাদ করার মাধ্যমে সে কব্জা করে নিয়েছে বলে সাব্যস্ত হবে। যেমন– ক্রয়কৃত গোলামের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। একই হুকুম হবে যদি প্রত্যর্পণকারীর কাছে তা বিক্রি করে। কেননা মনিবের অনুকূলে গোলামের বিনিময় তথা মূল্য সংরক্ষিত রয়েছে। আর প্রত্যর্পণ যদিও বিক্রয়ের হুকুম রাখে, কিন্তু তা এক দৃষ্টিকোণ থেকে। সুতরাং তা কব্জা করার আগে বিক্রয়ের নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হবে না। তাই তা বৈধ হবে।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, **যখন সে তাকে পাকড়াও করবে, তখন তার কর্তব্য হবে এ বিষয়ে সাক্ষ্য রাখা যে, সে তাকে প্রত্যর্পণের জন্য পাকড়াও করেছে।** ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে পলাতকের ব্যাপারে সাক্ষী রাখা তার উপর অবশ্যকর্তব্য। সুতরাং যদি পাকড়াও করার সময় সাক্ষী না রেখে থাকে, তাহলে তাদের মতে ফেরত দেওয়ার সময় সে পারিশ্রমিক লাভের হকদার হবে না। কেননা সাক্ষী রাখার বিষয়টি পরিহার করা এ কথার পরিচায়ক যে, সে নিজের জন্যই পাকড়াও করেছে। সুতরাং বিষয়টি এমন হলো, যেন সে পাকড়াওকারীর কাছ থেকে খরিদ করেছে, কিংবা উপহাররূপে বা মিরাশরূপে লাভ করেছে, অতঃপর মালিকের হাতে প্রত্যর্পণ করেছে। এমতাবস্থায় তো পারিশ্রমিক লাভের হকদার হয় না। কেননা সে নিজের জন্য প্রত্যর্পণ করেছে। তবে যদি সে এমর্মে সাক্ষী রাখে যে, সে প্রত্যর্পণ করার জন্য সাক্ষী রাখছে। তাহলে পারিতোষিকের হকদার হবে। আর মূল্য পরিশোধের ব্যাপারে সে স্বেচ্ছাদানকারী হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিউক্ত ইবারতে মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে। ধারাবাহিকভাবে সবকটির ব্যাখ্যা পেশ করা হলো।

১. প্রত্যর্পণকারী পলাতক গোলামকে এনে মালিকের নিকট পেশ করা মাত্রই যদি মালিক তাকে কব্জা না করে আজাদ করে দেয়, তাহলে এই আজাদ করাটাই কব্জা করা বলে সাব্যস্ত হবে। ফলে প্রত্যর্পণকারীর জন্য জু'ল ওয়াজিব হবে যেমন– কেউ যদি কোনো গোলাম খরিদ করার পর তাকে কব্জা না করেই আজাদ করে দেয় তাহলে আজাদ করাটাই কব্জা বলে গণ্য হয়, এবং তার উপর গোলামের মূল্য পরিশোধ করা ওয়াজিব হয়। তেমনি প্রত্যর্পণের ক্ষেত্রেও। কেননা প্রত্যর্পণ গুণগতভাবে ক্রয়বিক্রয় তুল্য।

https://e-ilm.weebly.com/

২. পলাতক গোলামকে মালিকের নিকট হাজির করার পর যদি মালিক তাকে কব্জা না করেই প্রত্যার্পণকারীর কাছে বিক্রি করে দেয়, তাহলেও তার উপর জু'ল ওয়াজিব হবে। কেননা এ অবস্থায় মালিকের সম্পদ অক্ষুণ্ন রয়েছে। সে গোলামের মূল্য পেয়েছে। অতএব, এটাই কব্জা বলে গণ্য হবে এবং তার উপর জু'ল ওয়াজিব হবে।

এ ক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, পূর্বে বলা হয়েছে- প্রত্যর্পণ কাজটি ক্রয়বিক্রয়ের মতো। তাই প্রত্যার্পণকারী ব্যক্তি হলো বিক্রেতা আর গোলামের মালিক হলো ক্রেতা।

এমতাবস্থায় মালিক যদি তার পলাতক গোলামকে প্রত্যর্পণকারীর কাছ থেকে কব্জা না করেই তার কাছে বিক্রি করে দেয়, তাহলে এটা হয় بَيْعٌ قَبْلَ الْقَبْضِ। অর্থাৎ ক্রয়কৃত পণ্য ক্রেতা কর্তৃক কব্জা করার পূর্বেই অন্যত্র বিক্রি করে দেওয়া। যা করতে হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে।

গ্রন্থকার (র.) এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বলেন, ... وَالرَّدُّ وَاِنْ كَانَ لَهُ حُكْمُ অর্থাৎ প্রত্যর্পণ কাজ যদিও গুণগতভাবে ক্রয়বিক্রয় কিন্তু তা সাধারণ ক্রয়বিক্রয়ের মতো নয় বা প্রকৃত ক্রয়বিক্রয় নয়; বরং তা কেবল নির্দিষ্ট একটি দিক থেকে ক্রয়বিক্রয়। অর্থাৎ গোলাম পালিয়ে যাওয়ার কারণে গোলামের উপর মালিকের তসরুফ ক্ষমতা লোপ পেয়েছিল। এরপর গোলামটি ধরে এনে প্রত্যর্পণ করার কারণে গোলামের উপর পুনরায় মালিকের তসরুফ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। যেমন- নতুন খরিদকৃত গোলামের উপর মালিকের তসরুফ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। এ হিসাবেই কেবল প্রত্যর্পণকে ক্রয়-বিক্রয় বলা হয়েছে। অন্যথায় এটা প্রকৃত পক্ষে কোনো ক্রয়বিক্রয় নয়। কেননা পলায়ন করার কারণে গোলামের সত্তা মনিবের মালিকানা থেকে বের হয়ে যায় না; বরং পলায়ন করার পরও সে মনিবের মালিকানায়ই থেকে যায়। অতএব, তাকে ক্রয় করার কোনো অর্থ হতে পারে না।

অতএব, যখন প্রত্যর্পণ প্রকৃতপক্ষে কোনো ক্রয়বিক্রয়ই নয়, তখন আর بَيْعٌ قَبْلَ الْقَبْضِ হওয়ার প্রশ্ন উঠে না।

৩. পলাতক গোলামকে পাকড়াও করার সময় সাক্ষী রাখা ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে ওয়াজিব। অতএব, কেউ যদি সাক্ষী না রেখেই গোলাম পাকড়াও করে মালিকের কাছে এনে ফেরত দেয়, তাহলে সে তাদের মতে জু'ল পাবে না। কেননা সাক্ষী না রাখা একথার আলামত যে, সে গোলামটি নিজের জন্য পাকড়াও করেছিল। অতএব, এটা এমনই হলো যেমন- কোনো ব্যক্তি পাকড়াওকারীর নিকট থেকে গোলামকে খরিদ করে, কিংবা হেবা সূত্রে বা মিরাশ সূত্রে লাভ করে এনে মনিবের কাছে গোলামটি ফেরত দিয়ে যায়। এ অবস্থায় উক্ত ফেরতদানকারী ব্যক্তি জু'ল পায় না। অতএব, আলোচ্য মাসআলায়ও সাক্ষ্য না রেখে পাকড়াওকারী এবং প্রত্যর্পণকারী ব্যক্তি জু'ল পাবে না।

হ্যাঁ, তবে যদি পলাতক গোলামটিকে তার পাকড়াওকারীর কাছ থেকে ক্রয় করার সময় ক্রয়কারী ব্যক্তি এ মর্মে সাক্ষী রাখে যে, আমি তাকে তার মনিবের কাছে ফেরত দানের জন্য ক্রয় করছি, তাহলে সে গোলামটি মনিবের কাছে ফেরত দিয়ে জু'ল পাবে। অবশ্য গোলামটি ক্রয় বাবদ তার যে অর্থ খরচ হয়েছে, তা তার পক্ষ হতে স্বেচ্ছা দান বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ মনিবের কাছ থেকে সে গোলামের মূল্য ফেরত পাবে না। শুধু জু'ল বা রাস্তার খরচ পাবে।

ইমাম আবূ ইউসুফ, ইমাম মালেক, ইমাম শাফী ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর মতে পলাতক গোলাম পাকড়াও করার সময় সাক্ষী রাখা ওয়াজিব নয়। বিধায় তাদের মতে যে ব্যক্তি সাক্ষী রাখা ছাড়াই গোলাম পাকড়াও করে এনে মালিকের কাছে ফেরত দেয়, সেও জু'ল পাবে।

https://e-ilm.weebly.com/

فَإِنْ كَانَ الْآبِقُ رَهْنًا فَالْجُعْلُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ لِأَنَّهُ أَحْيَا مَالِيَّتَهُ بِالرَّدِّ وَهِيَ حَقُّهُ، إِذِ الْإِسْتِيفَاءُ مِنْهَا وَالْجُعْلُ بِمُقَابَلَةِ إِحْيَاءِ الْمَالِيَّةِ فَيَكُوْنُ عَلَيْهِ، وَالرَّدُّ فِيْ حَيَاةِ الرَّاهِنِ وَبَعْدَهُ سَوَاءٌ، لِأَنَّ الرَّهْنَ لَا يَبْطُلُ بِالْمَوْتِ، وَهٰذَا إِذَا كَانَتْ قِيْمَتُهُ مِثْلَ الدَّيْنِ أَوْ أَقَلَّ مِنْهُ، فَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ فَبِقَدْرِ الدَّيْنِ عَلَيْهِ وَالْبَاقِيْ عَلَى الرَّاهِنِ لِأَنَّ حَقَّهُ بِالْقَدْرِ الْمَضْمُوْنِ فَصَارَ كَثَمَنِ الدَّوَاءِ وَتَخْلِيْصُهُ عَنِ الْجِنَايَةِ بِالْفِدَاءِ ـ

অনুবাদ : পলাতক গোলাম যদি বন্ধকি মাল হয়, তাহলে বন্ধক গ্রহণকারীর উপর পারিশ্রমিক আরোপিত হবে। কেননা প্রত্যর্পণের মাধ্যমে সে গোলামের অর্থমূল্য সংরক্ষণ করেছে। আর বন্ধক গ্রহণকারীই হচ্ছে ঐ অর্থমূল্যের বর্তমান হকদার। কেননা ঐ অর্থমূল্য থেকেই তো সে তার প্রাপ্য উসুল করবে। আর পারিশ্রমিক তো সাব্যস্ত হয় অর্থমূল্য সংরক্ষিত ও পুনরুজ্জীবিত করার বিপরীতে। সুতরাং তার উপরই তা আরোপিত হবে।

আর বন্ধক প্রদানকারীর জীবদ্দশায় ও তার পরে প্রত্যর্পণ একই রকম। কেননা মৃত্যুর কারণে বন্ধক বাতিল হয় না।

বন্ধক গ্রহণকারীর উপর পারিশ্রমিক আসবে যদি গোলামের মূল্য ঋণের সমপরিমাণ বা তার চেয়ে কম হয় পক্ষান্তরে (গোলামের মূল্য) ঋণের পরিমাণের চেয়ে বেশি হলে ঋণের পরিমাণ তার উপর আসবে, বাকিটা আসবে বন্ধকদাতার উপর। কেননা তার হক জামানতের পরিমাণের সাথে সম্পৃক্ত। সুতরাং এটা গোলামের জন্য খরচকৃত ঔষধের মূল্য ও ক্ষতিপূরণ প্রদানের মাধ্যমে গোলামকে অপরাধের দায়মুক্ত করার মতো হলো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিউক্ত মাসআলার সারমর্ম হলো, পলাতক গোলাম যদি বন্ধকি হয় এবং ঋণের পরিমাণ গোলামের মূল্যের সমপরিমাণ বা তার চেয়ে বেশি হয় তাহলে সম্পূর্ণ জু'ল বন্ধকগ্রহীতার জিম্মায় ওয়াজিব হবে। কেননা তখন গোলাম তারই হক। এর দ্বারা সে নিজের ঋণ উসুল করবে।

আর যদি ঋণের পরিমাণ গোলামের মূল্য অপেক্ষা কম হয়, তাহলে তার উপর ঋণের পরিমাণ অনুপাতে জু'ল ওয়াজিব হবে। অবশিষ্ট জু'ল বন্ধকদাতা অর্থাৎ গোলামের আসল মালিকের উপর ওয়াজিব হবে।

উদাহরণ : মনে করি ঋণের পরিমাণ পাঁচ হাজার টাকা। এ ঋণের জন্য যে গোলাম বন্ধক রাখা হয়েছে তার মূল্যও পাঁচ হাজার টাকা বা এর চেয়ে কম। এমতাবস্থায় এ বন্ধকি গোলাম পলায়নরত অবস্থায় ধরে আনলে পূর্ণ জু'ল বন্ধকগ্রহীতার উপর ওয়াজিব হবে। কেননা গোলামের মূল্য ঋণের সমপরিমাণ বা কম হওয়া অবস্থায় পূর্ণ গোলামটিই মুরতাহিন তথা বন্ধকগ্রহীতার জিম্মায় থাকে। পুরোটার সাথেই তার হক জড়িত থাকে।

পক্ষান্তরে যদি ঋণের পরিমাণ পাঁচ হাজার টাকা হয়ে গোলামের মূল্য দশ হাজার টাকা হয়, তাহলে, জু'লের অর্ধেক ওয়াজিব হবে বন্ধকগ্রহীতার উপর আর বাকি অর্ধেক ওয়াজিব হবে বন্ধকদাতার উপর। কেননা এক্ষেত্রে বন্ধকগ্রহীতার হক অর্ধেক গোলামের সাথে জাড়িত। তাই আর্ধেক গোলাম তার জিম্মায়। বিধায় তার উপর জু'ল ওয়াজিব হবে অবশিষ্ট অর্ধেক জু'ল গোলামের মালিকের উপর ওয়াজিব হবে।

জু'ল বাবদ যে অর্থ খরচ হয়, তা ঐ অর্থের ন্যায় যা গোলামের চিকিৎসার জন্য খরচ করা হয়, কিংবা গোলামকে জিনায়াতের দায়মুক্ত করার জন্য খরচ করা হয়।

অর্থাৎ বন্ধকি গোলাম অসুস্থ হয়ে পড়লে তার চিকিৎসার্থে যে অর্থ ব্যয় হয় এবং বন্ধকি গোলাম ভুলবশত কাউকে হত্যা করলে তার দিয়ত বাবদ যে অর্থ খরচ হয়, তা যেমন প্রথমোক্ত অবস্থায় শুধু বন্ধকগ্রহীতার উপর এবং দ্বিতীয়োক্ত অবস্থায় দাতা-গ্রহীতা উভয়ের উপর ওয়াজিব হয়, তেমনি জু'লও প্রথমোক্ত অবস্থায় শুধু গ্রহীতার উপর এবং দ্বিতীয়োক্ত অবস্থায় দাতা-গ্রহীতা উভয়ের উপর ওয়াজিব হবে। গ্রহীতার উপর ওয়াজিব হবে তার জামানত পরিমাণ, আর বাকিটা ওয়াজিব হবে বন্ধকদাতার উপর।

https://e-ilm.weebly.com/

وَإِنْ كَانَ مَدْيُوْنًا فَعَلَى الْمَوْلَى إِنْ اِخْتَارَ قَضَاءَ الدَّيْنِ، وَإِنْ بِيْعَ بُدِئَ بِالْجُعْلِ وَالْبَاقِيْ لِلْغُرَمَاءِ لِأَنَّهُ مُؤْنَةُ الْمِلْكِ وَالْمِلْكُ فِيْهِ كَالْمَوْقُوْفِ فَيَجِبُ عَلَى مَنْ يَسْتَقِرُّ لَهُ، وَإِنْ كَانَ جَانِيًا فَعَلَى الْمَوْلَى إِنِ اخْتَارَ الْفِدَاءَ لِعَوْدِ الْمَنْفَعَةِ إِلَيْهِ، وَعَلَى الْأَوْلِيَاءِ إِنِ اخْتَارَ الدَّفْعَ لِعَوْدِهَا إِلَيْهِمْ وَإِنْ كَانَ مَوْهُوْبًا فَعَلَى الْمَوْهُوْبِ لَهُ، وَإِنْ رَجَعَ الْوَاهِبُ فِيْ هِبَتِهِ بَعْدَ الرَّدِّ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ لِلْوَاهِبِ مَا حَصَلَتْ بِالرَّدِّ بَلْ بِتَرْكِ الْمَوْهُوْبِ لَهُ التَّصَرُّفَ فِيْهِ بَعْدَ الرَّدِّ، وَإِنْ كَانَ لِصَبِيٍّ فَالْجُعْلُ فِيْ مَالِهِ لِأَنَّهُ مُؤْنَةُ مِلْكِهِ، وَإِنْ رَدَّهُ وَصِيُّهُ فَلَا جُعْلَ لَهُ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِيْ يَتَوَلَّى الرَّدَّ فِيْهِ .

অনুবাদ : আর (অনুমতিপ্রাপ্ত) পলাতক গোলাম যদি ঋণগ্রস্ত হয় তাহলে মনিব ঋণ পরিশোধের বিষয়টি গ্রহণ করলে পারিশ্রমিক তার উপর ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে গোলামকে বিক্রি করা হলে প্রথমে পারিশ্রমিক আদায় করা হবে। তারপর অবশিষ্ট অর্থ পাওনাদাররা পাবে। কেননা এটা হচ্ছে মালিকানার দায়বদ্ধ খরচ। আর এ ক্ষেত্রে উক্ত মালিকানা স্থগিত মালিকানার মতো। সুতরাং যার অনুকূলে মালিকানা স্থিত হবে তার উপর পারিশ্রমিক দায় আরোপিত হবে।

আর যদি পলাতক গোলাম অপরাধ সংঘটন করে থাকে এবং মনিব ক্ষতিপূরণ আদায়ের বিষয়টি গ্রহণ করে। তাহলে মনিবের উপর পারিশ্রমিকের দায় আরোপিত হবে। কেননা প্রত্যর্পণের লাভ তার দিকে ফিরে আসছে।

পক্ষান্তরে মনিব যদি গোলামকে ক্ষতিগ্রস্তের অভিভাবকদের হাতে তুলে দেয়, তাহলে তাদের উপর পারিশ্রমিকের দায় আসবে। কেননা প্রত্যর্পণের লাভ তাদের দিকে ফিরে আসছে।

আর যদি গোলামটি উপহাররূপে প্রদত্ত হয় তাহলে (পারিশ্রমিক) গ্রহীতার উপর আসবে। যদিও প্রত্যর্পণের পর দাতা তার দান ফেরত নিয়ে নেয়। কেননা লাভটুকু দাতার কাছে প্রত্যর্পণের সুবাদে আসেনি। বরং প্রত্যর্পণের পর গ্রহীতা দানকৃত গোলামের মাঝে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকার কারণে এসেছে।

পলাতক গোলাম যদি বালকের হয় তাহলে তার সম্পদ থেকে পারিশ্রমিক প্রদত্ত হবে। কেননা এ হলো তার মালিকানার দায়বদ্ধ খরচ। আর প্রত্যর্পণকারী যদি উক্ত বালকের অসী হয়, তাহলে তার অনুকূলে কোনো পারিশ্রমিক সাব্যস্ত হবে না। কেননা এক্ষেত্রে প্রত্যর্পণ গ্রহণের দায়িত্ব তিনি নিজে পালন করতেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিউক্ত ইবারতে দুটি মাসআলা আলোচিত হয়েছে। মাসআলা দুটির সারমর্ম হলো– প্রত্যর্পণের লাভ যে ভোগ করবে, জু'ল তার উপর বর্তাবে।

প্রথম মাসআলার ব্যাখ্যা : কারো একটি আবদে মা'যূন ছিল। অর্থাৎ এমন একটি গোলাম ছিল, যাকে সে ব্যবসা-বাণিজ্য করার অনুমতি দিয়ে রেখেছে। ঘটনাক্রমে গোলামটি ঋণগ্রস্ত অবস্থায় পালিয়ে গেল। এরপর পুনরায় সে ধৃত হয়ে মনিবের কাছে পৌঁছল। এমতাবস্থায় গোলামটির মালিকানা দোদুল্যমান। পূর্বের মালিকানায়ও থাকতে পারে আবার পাওনাদারদের মালিকানায়ও চলে যেতে পারে। যার মালিকানা স্থিত হবে, তার উপরই জু'ল ওয়াজিব হবে। যেমন-

https://e-ilm.weebly.com/

মালিক যদি মনে করে যে, গোলামের ঋণ পরিশোধ করে গোলামটি আমিই রেখে দিই, তাহলে তার উপরই জু'ল ওয়াজিব হবে। কারণ এ অবস্থায় প্রত্যপর্ণের ফায়দা বা লাভ মালিকই ভোগ করতে যাচ্ছে। তাই জু'লও তাকেই পরিশোধ করতে হবে। আর যদি মালিক ঋণের দায়ে গোলামটি বিক্রি করে ফেলার সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে সে পাওনাদারের মালিকানা হয়ে যাবে এবং পাওনাদারদের উপর জু'ল ওয়াজিব হবে। তাই গোলাম বিক্রির টাকা থেকে প্রথমে জু'ল আদায় করা হবে। এরপর অবশিষ্ট অর্থ পাওনাদারগণ নিবে।

দ্বিতীয় মাসআলার ব্যাখ্যা : পলাতক গোলাম কোনো অপরাধ সংঘটন করেছে, যার ফলে দিয়ত ওয়াজিব হয়। এরপর ধৃত হয়ে মালিকের নিকট পৌঁছেছে। এমতাবস্থায় মনিব ইচ্ছা করলে গোলামের দিয়ত পরিশোধ করে গোলামটি নিজের মালিকানায় রাখতে পারে। তখন তার উপরই জু'ল ওয়াজিব হবে। আবার ইচ্ছা করলে সে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির অভিভাবকদের হাতে গোলামকে তুলে দিতে পারে। যদি তাই করে তাহলে তাদের উপর জু'ল ওয়াজিব হবে। কেননা প্রত্যর্পণের ফয়দা তখন তারা ভোগ করবে।

قَوْلُهُ : وَإِنْ كَانَ مَوْهُوبًا فَعَلَى الْمَوْهُوبِ الخ : উপরিউক্ত ইবারতে দুটি মাসআলা আলোচনা করা হয়েছে। মাসআলা দুটির ব্যাখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হলো–

প্রথম মাসআলার ব্যাখ্যা : পলাতক গোলামটি যদি দানকৃত হয় তাহলে তার জু'ল দানগ্রহীতার উপর আবশ্যক হবে। যদিও প্রত্যর্পণের পর গোলামটি দাতা ব্যক্তি ফিরিয়ে নিয়ে যায়।

ধরা যাক কারো একটি গোলাম ছিল। সে তার গোলামটি অন্য একজনকে দান করে দিল, অতঃপর গোলামটি পালিয়ে গেল এবং ধৃত হয়ে ফিরে আসল। এমতাবস্থায় এ গোলামকে ফিরিয়ে আনার পথখরচ দানগ্রহীতার উপর আরোপিত হবে। গোলামটি প্রত্যর্পণের পর যদি দাতা ব্যক্তি তার গোলামটি ফিরেয়ে নেয়, তাহলেও তার উপর জু'ল আরোপিত হবে না।

কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, পূর্বে বলা হয়েছে, যার মালিকানা স্থিত হয় তার উপর জু'ল ওয়াজিব হয় এবং প্রত্যর্পণের লাভ যার দিকে ফিরে আসে তার উপর জু'ল ওয়াজিব হয়। সে হিসাবে আলোচ্য মাসআলায় দাতার উপর জু'ল ওয়াজিব হওয়ার কথা। যেহেতু সে দানকৃত গোলামটি ফিরিয়ে নিচ্ছে এবং প্রত্যর্পণের লাভ সেই ভোগ করবে। তা সত্ত্বেও গ্রহীতার উপর জু'ল ওয়াজিব হয় কেন?

এর উত্তর হলো, দাতা ব্যক্তি যে দানকৃত গোলামের ফায়দা ভোগ করে সেটা প্রত্যর্পণের কারণে নয়; বরং প্রত্যর্পণের কারণে গ্রহীতার মালিকানা স্থিত হয়। কিন্তু সে তাতে তসরুফ করা থেকে বিরত থাকার কারণে দাতা ব্যক্তি তা দ্বারা উপকৃত হয়। অতএব, বলা যায়, দাতা ব্যক্তি প্রত্যর্পণ দ্বারা উপকৃত হয়নি, তাই তার উপর জু'ল ওয়াজিব হয় না।

দ্বিতীয় মাসআলা : পলাতক গোলামের মালিক যদি কোনো বালক হয় এবং তার পলাতক গোলাম কেউ ধরে এনে ফেরত দেয়, তাহলে হবে। এর জু'ল বালকের সম্পদ হতেই পরিশোধ করার কারণ জু'ল হলো মালিকানায় দায়বদ্ধ খরচ, তাই সেটা তার মালিকানা হতেই পরিশোধযোগ্য।

তবে বালকের গোলামটি যদি তার অসী ধরে নিয়ে আসে, তাহলে সে কোনো জু'ল পাবে না। কেননা সে নিজেই ছিল উক্ত গোলামের অনুসন্ধানকারী এবং সে নিজেই ছিল প্রত্যর্পণ গ্রহণকারী। তাই সেই মূলত জু'ল পরিশোধকারী। কাজেই তাকে জু'ল প্রদানের কোনো যৌক্তিকতা নেই।

https://e-ilm.weebly.com/

كِتَابُ الْمَفْقُوْدِ

إِذَا غَابَ الرَّجُلُ فَلَمْ يُعْرَفْ لَهُ مَوْضِعٌ وَلَا يُعْلَمُ أَحَيٌّ هُوَ أَمْ مَيِّتٌ نَصَبَ الْقَاضِيْ مَنْ يَحْفَظُ مَالَهُ وَيَقُوْمُ عَلَيْهِ وَيَسْتَوْفِيْ حَقَّهُ لِأَنَّ الْقَاضِيْ نُصِبَ نَاظِرًا لِكُلِّ عَاجِزٍ عَنِ النَّظَرِ لِنَفْسِهِ وَالْمَفْقُوْدُ بِهٰذِهِ الصِّفَةِ وَصَارَ كَالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُوْنِ، وَفِيْ نَصْبِ الْحَافِظِ لِمَالِهِ وَالْقَائِمِ عَلَيْهِ نَظَرٌ لَهُ . وَقَوْلُهُ يَسْتَوْفِيْ حَقَّهُ لِإِخْفَاءِ أَنَّهُ يَقْبِضُ غَلَّاتِهِ وَالدَّيْنَ الَّذِيْ أَقَرَّ بِهِ غَرِيْمٌ مِنْ غُرَمَائِهِ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الْحِفْظِ، وَيُخَاصِمُ فِيْ دَيْنٍ وَجَبَ بِعَقْدِهِ لِأَنَّهُ أَصِيْلٌ فِيْ حُقُوْقِهِ، وَلَا يُخَاصِمُ فِي الَّذِيْ تَوَلَّاهُ الْمَفْقُوْدُ وَلَا فِيْ نَصِيْبٍ لَهُ فِيْ عَقَارٍ أَوْ عُرُوْضٍ فِيْ يَدِ رَجُلٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالِكٍ وَلَا نَائِبٍ عَنْهُ إِنَّمَا هُوَ وَكِيْلٌ بِالْقَبْضِ مِنْ جِهَةِ الْقَاضِيْ وَأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الْخُصُوْمَةَ بِلَا خِلَافٍ، إِنَّمَا الْخِلَافُ فِي الْوَكِيْلِ بِالْقَبْضِ مِنْ جِهَةِ الْمَالِكِ فِي الدَّيْنِ، وَإِذَا كَانَ كَذٰلِكَ يَتَضَمَّنُ الْحُكْمَ بِهِ قَضَاءً عَلَى الْغَائِبِ۔

অধ্যায় : নিখোঁজ ব্যক্তি প্রসঙ্গ

অনুবাদ : কোনো ব্যক্তি যদি এমনভাবে নিরুদ্দেশ হয় যে, তার অবস্থানস্থল জানা যাচ্ছে না এবং এটাও জানা যাচ্ছে না যে, সে জীবিত না মৃত। এমতাবস্থায় কাজি একজন (উপযুক্ত) ব্যক্তিকে নিযুক্ত করবেন, যে তার সম্পদের সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা করবে এবং তার প্রাপ্য হক উসুল করবে। কেননা নিজের কল্যাণ বিধান করতে অক্ষম এমন সকল ব্যক্তির কল্যাণ বিধান করার জন্যই কাজিকে নিযুক্ত করা হয়েছে। আর নিখোঁজ ব্যক্তি এমনই অক্ষমতার অবস্থা সম্পন্ন। ফলে সে বালক ও পাগলের ন্যায় হলো। আর তার মালের সংরক্ষণকারী ও ব্যবস্থাপনাকারী নিযুক্ত করাতে তার কল্যাণ বিধান রয়েছে।

আর ইমাম কুদূরী (র.)-এর এ বক্তব্য "সে তার প্রাপ্য উসুল করবে" দ্বারা এটা সুস্পষ্ট যে, সে তার ক্ষেতের শস্য কব্জা করবে এবং তার দেনাদারদের মধ্যে কেউ ঋণের কথা স্বীকার করলে সে তা উসুল করবে। কেননা এটা সংরক্ষণের অন্তর্ভুক্ত। আর নিযুক্ত ব্যক্তির সম্পাদিত চুক্তি বলে যে পাওনা সাব্যস্ত হয়েছে, সেগুলোর ব্যাপারে দাবি-দাওয়া করবে। কেননা সে তার নিজের কর্ম সম্পৃক্ত হকের ব্যাপারে মূল ব্যক্তি। কিন্তু নিখোঁজ ব্যক্তি যে সকল ঋণের দায়িত্ব নিয়েছিল সে ব্যাপারে নিযুক্ত ব্যক্তি দাবিদাওয়া করতে পারবে না। তদ্রূপ কোনো ভূসম্পত্তিতে তার প্রাপ্য অংশের ব্যাপারে কিংবা কোনো ব্যক্তির কব্জায় রক্ষিত কোনো দ্রব্যের ব্যাপারে দাবি-দাওয়া করতে পারবে না। কেননা সে মালিকও নয় আবার নিখোঁজ ব্যক্তির নায়েবও নয়; বরং সে শুধু কাজির পক্ষ থেকে নিযুক্ত পাওনা উসুলের উকিল মাত্র। আর (কাজির পক্ষ থেকে নিযুক্ত) কব্জা করার উকিল যে দাবিদাওয়ার অধিকারী নয় তাতে কারো দ্বিমত নেই। অবশ্য দ্বিমত রয়েছে মালিকের পক্ষ থেকে নিযুক্ত ঋণ কব্জা করার উকিলের। আর বিষয়টা যখন এরূপ হলো তখন ঐ সম্পর্কিত রায় প্রদানের অর্থ হবে অনুপস্থিত ব্যক্তির বিপক্ষে রায় প্রদান।

https://e-ilm.weebly.com/

وَأَنَّهُ لَا يَجُوْزُ إِلَّا إِذَا رَاهُ الْقَاضِيْ وَقَضٰى بِهٖ لِاَنَّهُ مُجْتَهِدٌ فِيْهِ، ثُمَّ مَا كَانَ يُخَافُ عَلَيْهِ الْفَسَادُ يَبِيْعُهُ الْقَاضِيْ لِاَنَّهُ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ حِفْظُ صُوْرَتِهٖ وَمَعْنَاهُ فَيَنْظُرُ لَهُ بِحِفْظِ الْمَعْنٰى -

অনুবাদ : আর তা বৈধ নয়। তবে কাজি যদি তা সমীচীন মনে করেন, এবং তার ফয়সালা দেন, (তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবে) বিষয়টিতে মুজতাহিদদের মতভেদ রয়েছে।

আর যা নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, কাজি তা বিক্রি করে দিবেন। কেননা তা আকৃতিগতভাবে সংরক্ষণ করা দুঃসাধ্য। সুতরাং গুণগতভাবে সংরক্ষণের মাধ্যমে তার কল্যাণ বিধান করা হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

اَلْمَفْقُوْدُ বাবে مَفْعُوْل اِسْم وَاحِدْ مُذَكَّرْ এর সীগাহ। فَقَدَ يَفْقِدُ فَقْدًا বাবে ضَرَبَ হতে নির্গত। فَقْدٌ শব্দটি পরস্পর বিপরীত দুটি অর্থে ব্যবহার হয়। ১. হারানো, ২. সন্ধান করা। নিখোঁজ ব্যক্তির ক্ষেত্রে দুটি অর্থই বিদ্যমান আছে। কেননা তাকে তার পরিজন হারিয়ে থাকে এবং তাকে সন্ধানও করে।

اَلْمَفْقُوْدُ-এর পারিভাষিক অর্থ : এমন নিরুদ্দেশ বা নিখোঁজ ব্যক্তি যার অবস্থানস্থল জানা যায় না। এটাও জানা যায় না যে সে জীবিত না মৃত।

ইবারতের সারসংক্ষেপ : মাফকূদ ব্যক্তির মালামাল সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য কাজি সাহেব একজন উপযুক্ত উকিল নিয়োগ করবেন। সে উকিল মাফকূদের ক্ষেতের শস্য ও তার ঋণ উসুল করবে। তার নিজের আকদ দ্বারা সাব্যস্ত ঋণের জন্য দাবিদাওয়া করবে। মাফকূদের দায়িত্বভুক্ত ঋণের জন্য দাবি করবে না। মাফকূদের কোনো সম্পদ যদি কারো হাতে সংরক্ষিত থাকে, এর জন্যও উকিল দাবিদাওয়া করবে না। তবে কাজি যদি এ সম্পর্কে ফয়সালা দেন, তাহলে করতে পারবে।

মাফকূদের কোনো সম্পদ নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা হলে তা বিক্রি করে মূল্য সংরক্ষণ করবে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَلَا يَبِيْعُ مَا لَا يُخَافُ عَلَيْهِ الْفَسَادُ فِيْ نَفَقَةٍ وَلَا غَيْرِهَا لِاَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَى الْغَائِبِ اِلَّا فِيْ حِفْظِ مَالِهِ فَلَا يَسُوْغُ لَهُ تَرْكُ حِفْظِ الصُّوْرَةِ وَهُوَ مُمْكِنٌ قَالَ وَيُنْفِقُ عَلَى زَوْجَتِهِ وَاَوْلَادِهِ مِنْ مَالِهِ وَلَيْسَ هٰذَا الْحُكْمُ مَقْصُوْرًا عَلَى الْاَوْلَادِ بَلْ يَعُمُّ جَمِيْعَ قَرَابَةِ الْوِلَادِ . وَالْاَصْلُ اَنَّ كُلَّ مَنْ يَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ فِيْ مَالِهِ حَالَ حَضْرَتِهِ بِغَيْرِ قَضَاءِ الْقَاضِيْ يُنْفِقُ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ عِنْدَ غَيْبَتِهِ لِاَنَّ الْقَضَاءَ حِيْنَئِذٍ يَكُوْنُ اِعَانَةً، وَكُلُّ مَنْ لَا يَسْتَحِقُّهَا فِيْ حَضْرَتِهِ اِلَّا بِالْقَضَاءِ لَا يُنْفِقُ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ فِيْ غَيْبَتِهِ لِاَنَّ النَّفَقَةَ حِيْنَئِذٍ تَجِبُ بِالْقَضَاءِ وَالْقَضَاءُ عَلَى الْغَائِبِ مُمْتَنِعٌ، فَمِنَ الْاَوَّلِ الْاَوْلَادُ الصِّغَارُ وَالْاِنَاثُ مِنَ الْكِبَارِ وَالزَّمِنِيُّ مِنَ الذُّكُوْرِ الْكِبَارِ، وَمِنَ الثَّانِي الْاَخُ وَالْاُخْتُ وَالْخَالُ وَالْخَالَةُ ـ

অনুবাদ : আর যা নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা নেই, তা ভরণপোষণের বা অন্য কোনো প্রয়োজনে বিক্রি করা যাবে না। কেননা অনুপস্থিত ব্যক্তির মাল সংরক্ষণ ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে তার উপর কাজির কোনো কর্তৃত্ব নেই। সুতরাং আকৃতিগত সংরক্ষণের দিকটি সম্ভব অবস্থায় তা পরিহার করা তার জন্য বৈধ হবে না।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, **তার স্ত্রী এবং তার সন্তানদের জন্য তার সম্পদ হতে খরচ করা হবে।**

আর এ বিধান শুধু তার সন্তানদের মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং জন্মসূত্রে সকল আত্মীয়তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এ ব্যাপারে মূলনীতি হলো, যে কেউ তার উপস্থিতিতে আদালতের রায় ছাড়াই তার মাল থেকে ভরণপোষণের হকদার হয়। লোকটির অনুপস্থিতিতেও তার মাল থেকে তার জন্য ব্যয় করা হবে। কেননা তখন আদালতের ফয়সালার অর্থ হবে, হকদারকে (তার হক লাভে) সাহায্য করা।

পক্ষান্তরে যারা তার উপস্থিতিতে আদালতের ফয়সালা ছাড়া ভরণপোষণের হকদার হয় না, তার অনুপস্থিতিতে তার মাল থেকে তাদের জন্য খরচ করা হবে না। কেননা তখন তো ভরণপোষণের খরচ আদালতের ফয়সালার মাধ্যমে সাব্যস্ত হবে। অথচ অনুপস্থিত ব্যক্তির বিপক্ষে ফায়সালা প্রদান নিষিদ্ধ। প্রথমোক্তদের উদাহরণ হলো ছোট সন্তানরা এবং প্রাপ্তবয়স্ক মেয়েরা এবং প্রাপ্তবয়স্ক প্রতিবন্ধী পুরুষরা। আর দ্বিতীয়োক্তরা হলো ভাই-বোন, মামা ও খালা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কাজির দায়িত্ব হলো মাফকূদের সম্পদ সংরক্ষণ করা। নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা না হলে কোনো প্রয়োজনে তার সম্পদ বিক্রি করা কাজির পক্ষেও জায়েজ নয়।

قَوْلُهُ : وَيُنْفِقُ عَلَى زَوْجَتِهِ وَاَوْلَادِهِ الخ : উপরিউক্ত ইবারতের সারমর্ম হলো, মাফকূদের উপস্থিতিতে যেসব লোক কাজির ফায়সালা ছাড়া স্বাভাবিকভাবে মাফকূদের নিকট হতে ভরণপোষণ পায়, তারা মাফকূদের অনুপস্থিতিতেও তার সম্পদ হতে ভরণপোষণ পাবে। পক্ষান্তরে যারা মাফকূদের উপস্থিতিতে কাজির ফায়সালা ছাড়া তার নিকট হতে ভরণপোষণ পায় না, তারা তার অনুপস্থিতিতেও কাজির ফয়সালাক্রমে ভরণপোষণ পাবে না। কেননা মাফকূদের অনুপস্থিতিতে তার সম্পদ হতে এদের ভরণপোষণের ফয়সালা দেওয়া হলে সেটা হবে قضاء على الغائب 'অনুপস্থিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফয়সালা।' যেটা জায়েজ নয়।

প্রথম শ্রেণির উদাহরণ হলো, মাফকূদের স্ত্রী, নাবালেগ ছেলে-মেয়ে, বালেগা মেয়ে, পিতা-মাতা, দাদা-দাদি, প্রাপ্তবয়স্ক প্রতিবন্ধী আত্মীয় প্রমুখ। আর দ্বিতীয় শ্রেণির উদাহরণ হলো, মাফকূদের ভাই-বোন, মামা-খালা, চাচা-ফুফু প্রমুখ।

https://e-ilm.weebly.com/

وَقَوْلُهُ مِنْ مَالِهِ مُرَادُهُ الدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيْرُ لِاَنَّ حَقَّهُمْ فِي الْمَطْعُوْمِ وَالْمَلْبُوْسِ فَاِذَا لَمْ يَكُنْ ذٰلِكَ فِيْ مَالِهِ يَحْتَاجُ اِلَى الْقَضَاءِ بِالْقِيْمَةِ وَهِيَ النَّقْدَانِ وَالتِّبْرُ بِمَنْزِلَتِهِمَا فِيْ هٰذَا الْحُكْمِ لِاَنَّهُ يَصْلُحُ قِيْمَةً كَالْمَضْرُوْبِ. وَهٰذَا اِذَا كَانَتْ فِيْ يَدِ الْقَاضِيْ فَاِنْ كَانَتْ وَدِيْعَةً اَوْ دَيْنًا يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ مِنْهُمَا اِذَا كَانَ الْمُوْدَعُ وَالْمَدْيُوْنُ مُقِرَّيْنِ بِالدَّيْنِ وَالْوَدِيْعَةِ وَالنِّكَاحِ وَالنَّسَبِ. وَهٰذَا اِذَا لَمْ يَكُوْنَا ظَاهِرَيْنِ عِنْدَ الْقَاضِيْ. فَاِنْ كَانَا ظَاهِرَيْنِ فَلَا حَاجَةَ اِلَى الْاِقْرَارِ، وَاِنْ كَانَ اَحَدُهُمَا ظَاهِرَ يَشْتَرِطُ الْاِقْرَارَ بِمَا لَيْسَ بِظَاهِرٍ هٰذَا هُوَ الصَّحِيْحُ .

অনুবাদ : আর ইমাম কুদূরী (র.)-এর বক্তব্য "তার সম্পদ থেকে" এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো দিরহাম-দিনার (নগদ অর্থ)। কেননা তাদের প্রাপ্য হক হলো অন্ন ও বস্ত্র। সুতরাং তার সম্পদে যদি অন্নদ্রব্য ও বস্ত্রদ্রব্য না থাকে, তাহলে মূল্যের ফয়সালা প্রদানের প্রয়োজন হবে। আর তা হলো নগদ অর্থ। এ বিধানের ক্ষেত্রে স্বর্ণ ও রৌপ্য খণ্ড দিরহাম-দিনারের পর্যায়ভুক্ত। কেননা মোহরাঙ্কিত স্বর্ণ ও রৌপ্যের ন্যায় সেটাও মূল্য হওয়ার যোগ্যতা রাখে। এ বিধান তখন হবে, যখন সম্পদ কাজির হাতে থাকবে।

পক্ষান্তরে যদি (মাফকূদের সম্পদ) আমানত বা ঋণরূপে (অন্যের কাছে) থাকে আর আমানত গ্রহণকারী ও ঋণ গ্রহণকারী ঋণ ও আমানতের কথা স্বীকার করে তদ্রূপ যদি বিবাহ ও বংশ পরিচয়ের বিষয়টি স্বীকার করে তাহলে তাদের দুজনের কাছ থেকে নিয়ে তাদের উপর খরচ করা হবে।

বিবাহ ও বংশ পরিচয় এবং ঋণ ও আমানত স্বীকার করার প্রশ্ন তখনই আসবে, যখন কাজির নিকট সেগুলো প্রমাণিত না থাকে। পক্ষান্তরে যদি কাজির নিকট বিষয়গুলো প্রমাণিত থাকে, তাহলে স্বীকার করার প্রয়োজন নেই।

আর যদি দুটির একটি প্রমাণিত হয় তাহলে যেটি প্রমাণিত নয় সেটির ক্ষেত্রে স্বীকার করার শর্ত থাকবে। এটিই বিশুদ্ধ অভিমত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিউক্ত ভাষ্যের সারমর্ম হলো, মাফকূদের সম্পদ যদি কাজির নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং তার সম্পদে অন্নদ্রব্য ও বস্ত্রদ্রব্য থাকে, তাহলে তা থেকেই স্ত্রী-পুত্র প্রমুখকে অন্ন-বস্ত্র দিবে। আর যদি তার সম্পদে অন্ন ও বস্ত্রদ্রব্য না থাকে তাহলে তার নগদ অর্থ তথা দীনার দিরহাম দ্বারা তাদের ভরণপোষণের ফয়সালা করবে। সাধারণ সোনা-রূপার টুকরা যাতে রাষ্ট্রীয় সিলমোহর অঙ্কিত নয়, তাও দিনার-দিরহামের হুকুমভুক্ত।

قَوْلُهُ : فَاِنْ كَانَتْ وَدِيعَةً اَوْ دَيْنًا يُنْفِقُ الخ : উপরিউক্ত ইবারতের সারমর্ম হলো, মাফকূদের সম্পদ যদি কারো নিকট ঋণ হিসেবে বিদ্যমান থাকে কিংবা কারো নিকট আমানত হিসেবে থাকে এবং আমানত, ঋণ, মাফকূদের সাথে স্ত্রীর বিবাহ বন্ধন ও অন্যান্য হকদারদের আত্মীয়তার বিষয়টি যদি স্পষ্ট হয় তথা কাজির জানা থাকে, তাহলে আমানতদার ও ঋণী ব্যক্তির নিকটে থাকা সম্পদ হতে মাফকূদের স্ত্রী ও অন্যান্য হকদার আত্মীয়দের জন্য খরচ করবে। আর যদি আমানত, ঋণ, মাফকূদের সাথে স্ত্রীর বিবাহ বন্ধন ও অন্যান্য হকদারের সাথে মাফকূদের আত্মীয়তার বিষয়টি কাজির জানা না থাকে তাহলে এসব বিষয়ে আমানতদার ও ঋণী ব্যক্তির স্বীকারোক্তি শর্ত। যদি কিছু বিষয় সম্পর্কে কাজির জানা থাকে, কিছু বিষয় সম্পর্কে জানা না থাকে, তাহলে অজানা বিষয়গুলো সম্পর্কে আমানতদার ও ঋণী ব্যক্তির স্বীকারোক্তি শর্ত।

بِالدَّيْنِ وَالْوَدِيْعَةِ وَالنِّكَاحِ وَالنَّسَبِ - এ বাক্যে دين ও وديعة দু'টিকে এক বিষয়, النكاح ও النسب এ দুটিকে এক বিষয় হিসেবে ধরা হয়েছে। সে হিসেবেই পরে বলা হয়েছে- اذا لم يكونا ظاهرين যখন বিষয় দুটি স্পষ্ট না হয়। لم يكونا শব্দে উহ্য দ্বিবচনের সর্বনামটি পূর্বোক্ত চারটি বিষয় (আমানত, ঋণ, বিবাহ বন্ধন ও বংশগত আত্মীয়তা)-কে বুঝানো হয়েছে। এরপর وان كان احدهما বলেও এরূপেই বুঝানো হয়েছে। দুটির একটি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো পূর্বোক্ত চারটির দুটি। অর্থাৎ আমানত ও ঋণ হলো একটি আর বিবাহ বন্ধন ও আত্মীয়তা হলো অপরটি।

https://e-ilm.weebly.com/

فَاِنْ دَفَعَ الْمُوْدَعُ بِنَفْسِهٖ اَوْ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ بِغَيْرِ اَمْرِ الْقَاضِيْ يَضْمَنُ الْمُوْدَعُ وَلَا يَبْرَأُ الْمَدْيُوْنُ لِاَنَّهٗ مَا اَدّٰى اِلٰى صَاحِبِ الْحَقِّ وَلَا اِلٰى نَائِبِهٖ، بِخِلَافِ مَا اِذَا دَفَعَ بِاَمْرِ الْقَاضِيْ لِاَنَّ الْقَاضِيَ نَائِبٌ عَنْهُ وَاِنْ كَانَ الْمُوْدَعُ وَالْمَدْيُوْنُ جَاحِدَيْنِ اَصْلًا اَوْ كَانَا جَاحِدَيْنِ الزَّوْجِيَّةَ وَالنَّسَبَ لَمْ يَنْتَصِبْ اَحَدٌ مِنْ مُسْتَحِقِّي النَّفَقَةِ خَصْمًا فِيْ ذٰلِكَ لِاَنَّ مَا يَدَّعِيْهِ لِلْغَائِبِ لَمْ يَتَعَيَّنْ سَبَبًا لِثُبُوْتِ حَقِّهٖ وَهُوَ النَّفَقَةُ، لِاَنَّهَا كَمَا تَجِبُ فِيْ هٰذَا الْمَالِ تَجِبُ فِيْ مَالٍ اٰخَرَ لِلْمَفْقُوْدِ۔

অনুবাদ : আর যদি আমানত গ্রহণকারী কিংবা ঋণ গ্রহণকারী কাজির নির্দেশ ছাড়া নিজেদের পক্ষ থেকে প্রদান করে তাহলে আমানত গ্রহণকারী দায় বহন করবে এবং ঋণী ব্যক্তি ঋণমুক্ত হবে না। কেননা সে তার হকদারের নিকট অথবা তার স্থলবর্তী ব্যক্তির নিকট প্রদান করেনি। আর কাজির আদেশ প্রদানের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা কাজি হলেন মাফকূদের স্থলবর্তী।

আর যদি আমানত গ্রহণকারী ও ঋণ গ্রহণকারী মূল আমানত ও ঋণের বিষয়টি অস্বীকার করে কিংবা বিবাহের সম্পর্ক ও বংশের সম্পর্ক অস্বীকার করে তাহলে খোরপোশের হকদারদের কেউ এ বিষয়ে বাদীরূপে দাঁড়াতে পারবে না। কেননা অনুপস্থিত ব্যক্তির অনুকূলে যে মালের দাবি তারা করছে, সেটা তাদের খোরপোশের হক সাব্যস্ত হওয়ার কারণরূপে নির্ধারিত নয়। কেননা সেটা এই মালে যেরূপ সাব্যস্ত হতে পারে, তেমনি অনুপস্থিত ব্যক্তির অন্য মালেও সাব্যস্ত হতে পারে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

বর্ণিত মাসআলার সারমর্ম হলো এই যে, যার কাছে মাফকূদের আমানত বা ঋণ ছিল, সে যদি আমানত বা ঋণের অর্থ মাফকূদের স্ত্রী, সন্তানের জন্য কাজির আদেশ ছাড়া নিজের উদ্যোগে খরচ করে, তাহলে আমানতদার ব্যক্তি খরচকৃত অর্থের দায় বহন করবে এবং ঋণী ব্যক্তি ঋণমুক্ত হবে না। কেননা আমানত ও ঋণের অর্থের প্রকৃত মালিকের নিকট কিংবা মালিকের প্রতিনিধির নিকট অর্থ পরিশোধ করা হয়নি। তবে কাজির আদেশক্রমে হলে ভিন্ন কথা। অর্থাৎ কাজির আদেশক্রমে ব্যয় করা হলে আমানতদার ব্যক্তি খরচকৃত অর্থের দায় বহন করবে না এবং ঋণী ব্যক্তিও ঋণমুক্ত হয়ে যাবে। কেননা কাজির আদেশক্রমে হলে এটি মালিকের নায়েবের নিকট অর্থ পরিশোধ করার মতো। যেহেতু কাজি সাহেব মালিকের তথা মাফকূদের স্থলবর্তী।

قَوْلُهٗ : وَاِنْ كَانَ الْمُوْدَعُ وَالْمَدْيُوْنُ جَاحِدَيْنِ الخ : মাফকূদের সম্পদ যার কাছে আমানত বা ঋণ হিসেবে আছে, সে যদি আমানত বা ঋণের বিষয় অস্বীকার করে অথবা মাফকূদের সাথে তার বিবাহ সম্পর্ক ও সন্তানদের বংশ সম্পর্ক অস্বীকার করে, তাহলে মাফকূদের পক্ষ থেকে খোরপোশের হকদার কোনো ব্যক্তি আমানত গ্রহণকারী ও ঋণী ব্যক্তির বিরুদ্ধে বাদী হতে পারবে না। কেননা খোরপোশের হকদার ব্যক্তি আমানত বা ঋণের মালিক নয়, মালিকের স্থলবর্তী কেউ নয়। তাই সে বাদী হতে পারবে না। তা ছাড়া আমানত বা ঋণ রূপে যে সম্পদ রয়েছে সে সম্পদই তাদের হকরূপে নির্ধারিত নয়; বরং এ সম্পদের মধ্যে যেমন তাদের হক থাকতে পারে, তেমনি মাফকূদের অন্য সম্পদের মাঝেও তাদের হক থাকতে পারে।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ وَقَالَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللهُ : إِذَا مَضَى أَرْبَعُ سِنِيْنَ يُفَرِّقُ الْقَاضِيْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ وَتَعْتَدُّ عِدَّةَ الْوَفَاةِ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ مَنْ شَاءَتْ لِاَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ هٰكَذَا قَضٰى فِي الَّذِي اِسْتَهْوَاهُ الْجِنُّ بِالْمَدِيْنَةِ وَكَفٰى بِهِ اِمَامًا، وَلِاَنَّهُ مَنَعَ حَقَّهَا بِالْغَيْبَةِ فَيُفَرِّقُ الْقَاضِيْ بَيْنَهُمَا بَعْدَمَا مَضٰى مُدَّةٌ اعْتِبَارًا بِالْاِيْلَاءِ وَالْعُنَّةِ، وَبَعْدَ هٰذَا الْاِعْتِبَارِ اَخَذَ الْمِقْدَارَ مِنْهُمَا الْاَرْبَعَ مِنَ الْاِيْلَاءِ وَالسِّنِيْنَ مِنَ الْعُنَّةِ عَمَلًا بِالشَّبَهَيْنِ . وَلَنَا قَوْلُهُ ﴿صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اِمْرَاَةِ الْمَفْقُوْدِ اَنَّهَا امْرَاَتُهُ حَتّٰى يَاْتِيَهَا الْبَيَانُ﴾ . وَقَوْلُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِيْهَا : هِيَ اِمْرَأَةٌ اُبْتُلِيَتْ فَلْتَصْبِرْ حَتّٰى يَسْتَبِيْنَ مَوْتٌ اَوْ طَلَاقٌ خَرَجَ بَيَانًا لِلْبَيَانِ الْمَذْكُوْرِ فِي الْمَرْفُوْعِ، وَلِاَنَّ النِّكَاحَ عُرِفَ ثُبُوْتُهُ وَالْغَيْبَةُ لَا تُوْجِبُ الْفُرْقَةَ وَالْمَوْتُ فِي حَيِّزِ الْاِحْتِمَالِ فَلَا يُزَالُ النِّكَاحُ بِالشَّكِّ، وَعُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ رَجَعَ اِلٰى قَوْلِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَلَا مُعْتَبَرَ بِالْاِيْلَاءِ لِاَنَّهُ كَانَ طَلَاقًا مُعَجَّلًا فَاعْتُبِرَ فِي الشَّرْعِ مُؤَجَّلًا فَكَانَ مُوْجِبًا لِلْفُرْقَةِ، وَلَا بِالْعُنَّةِ لِاَنَّ الْغَيْبَةَ تَعْقُبُ الْاَوْبَةَ، وَالْعُنَّةُ قَلَّمَا تَنْحَلُّ بَعْدَ اسْتِمْرَارِهَا سَنَةً .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, তার এবং তার স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদের ফয়সালা দেওয়া হবে না। ইমাম মালেক (র.) বলেন, চার বছর অতিবাহিত হলে কাজি তার মাঝে ও তার স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ সম্পন্ন করবেন এবং তার স্ত্রী মৃত্যুর ইদ্দত পালন করবে। অতঃপর যাকে ইচ্ছা বিবাহ করবে। কেননা মদিনায় যে ব্যক্তিকে জিনেরা নিয়ে গিয়েছিল তার সম্পর্কে হযরত ওমর (রা.) এরূপ ফয়সালা দিয়েছিলেন। আর অনুকরণীয় হিসাবে তিনিই যথেষ্ট। তাছাড়া এ কারণে যে, অনুপস্থিতির মাধ্যমে সে তার স্ত্রীর হক রোধ করেছে। সুতরাং ঈলা ও পুরুষত্বহীনতার উপর কিয়াস করে একটা সময় পার হওয়ার পর কাজি তাদের মাঝে বিচ্ছেদের ফয়সালা করবেন। আর এ কিয়াসের পর সময়সীমা উভয়টি থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। চার (মাসের সংখ্যা) নেওয়া হয়েছে ঈলা থেকে আর বছরের মেয়াদ নেওয়া হয়েছে পুরুষত্বহীনতা থেকে, যাতে উভয় সদৃশের উপর আমল হয়ে যায়।

আমাদের দলিল হলো নিখোঁজ স্বামীর স্ত্রী সম্পর্কে নবী করীম ﷺ -এর এই বক্তব্য যে, তার কাছে প্রমাণ আসা পর্যন্ত সে তার স্ত্রী থাকবে। আর হযরত আলী (রা.)-এর এ ধরনের স্ত্রী সম্পর্কে এই বক্তব্য যে, সে তার স্ত্রী, তাকে পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে। সুতরাং মৃত্যু বা তালাকের বিষয়টি পরিষ্কার হওয়া পর্যন্ত সে সবর করবে। এ হলো মারফূ' হাদীসে উল্লিখিত بيان -প্রমাণের ব্যাখ্যা। তাছাড়া এ কারণে যে, বিবাহের সাব্যস্তি সুপ্রমাণিত। আর অনুপস্থিতি বিচ্ছেদকে অনিবার্য করে না। পক্ষান্তরে মৃত্যুর বিষয়টি হচ্ছে সম্ভাবনার পর্যায়ে। সুতরাং সন্দেহের ভিত্তিতে বিবাহ বাতিল হবে না। আর হযরত ওমর (রা.) হযরত আলী (রা.) -এর মতের দিকে ফিরে এসেছেন।

আর বিষয়টিকে ঈলার উপর কিয়াস করা যায় না। কেননা (জাহিলিয়াতের যুগে) এটা অবিলম্বিত তালাকরূপে গণ্য ছিল। পরে শরিয়ত এটিকে বিলম্বিত তালাকরূপে গণ্য করেছে। তাই তা বিচ্ছেদ সাব্যস্তকারী হয়েছে।

তদ্রূপ পুরুষত্বহীনতার উপরও কিয়াস করা যায় না। কেননা অনুপস্থিতির পর ফিরে আসার সম্ভাবনা রয়েছে পক্ষান্তরে পুরুষত্বহীনতা এক বছর অব্যাহত থাকার পর খুব কমই তা দূরীভূত হয়।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিউক্ত ইবারতে একটি মতভেদপূর্ণ মাসআলা দলিল-প্রমাণসহ আলোচিত হয়েছে। যার সারসংক্ষেপ এই যে, মাফকূদ তথা নিরুদ্দেশ-নিখোঁজ ব্যক্তির স্ত্রীকে তার থেকে বিচ্ছেদ করা হবে কিনা এ নিয়ে ইমামগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে।

১. ইমাম আবূ হানীফা, সুফিয়ান ছাওরী, ইবনে আবি লাইলা, ইবনে শুবরুমাহ, আবূ কিলাবাহ, ইবরাহীম নাখয়ী, আবূ উবাইদ, ও (পরবর্তী উক্তি অনুযায়ী) ইমাম শাফেয়ী (র.) প্রমুখ বলেন, নিরুদ্দেশ ব্যক্তির মাঝে ও তার স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটানোর অনুমতি নেই।

২. ইমাম মালেক ও (পূর্ববর্তী উক্তি অনুযায়ী) ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, নিরুদ্দেশ হওয়ার সময় হতে চার বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর তার ও তার স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ করে দেওয়া হবে।

দলিল-১ : ইমাম মালেক (র.)-এর প্রথম দলিল হযরত ওমর (রা.)-এর ফয়সালা অর্থাৎ হযরত ওমর (রা.)-এর শাসনকালে মদিনায় জনৈক ব্যক্তিকে জিনেরা নিয়ে গিয়েছিল। সে ব্যক্তির স্ত্রী সম্পর্কে হযরত ওমর (রা.) এরূপ ফয়সালা দিয়েছিলেন যে, চার বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর বিচ্ছেদ করে দেওয়া হবে। অতঃপর স্বামী মারা গেলে যে ইদ্দত পালন করতে হয়, মাফকূদের স্ত্রী সেই ইদ্দত পালন করবে। এরপর যাকে ইচ্ছা তাকে বিবাহ করবে। এ সম্পর্কিত হাদীসটি মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাতে নিম্নরূপে বর্ণিত আছে–

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ اَنَّ رَجُلًا اِسْتَهْوَتْهُ الْجِنُّ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَاَتَتْ امْرَأَتُهُ عُمَرَ رَضِىَ للّٰهُ عَنْهُ فَامَرَهَا اَنْ تَتَرَبَّصَ اَرْبَعَ سِنِيْنَ ثُمَّ اَمَرَ وَلِيَّهُ بَعْدَ اَرْبَعِ سِنِيْنَ اَنْ يُطَلِّقَهَا ثُمَّ اَمَرَهَا اَنْ تَعْتَدَّ فَاِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا تَزَوَّجَتْ فَاِنْ جَاءَ زَوْجُهَا خُيِّرَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَالصَّدَاقِ ـ

অর্থাৎ সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা বর্ণনা করেন আমর হতে, তিনি ইয়াহয়া ইবনে জা'দাহ হতে, তিনি বলেন, হযরত ওমর (রা.)-এর খেলাফত কালে জনৈক ব্যক্তিকে জিনেরা নিয়ে যায়। তার স্ত্রী হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট আসে। হযরত ওমর (রা.) তাকে চার বছর অপেক্ষা করার জন্য আদেশ করেন। এরপর তিনি তার অলীকে আদেশ করেন চার বছর পর বিচ্ছেদ করে দেওয়ার জন্য। এরপর স্ত্রীকে আদেশ করেন ইদ্দত পালন করার জন্য। যখন ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে, তখন সে অন্য স্বামীকে বিবাহ করবে। পরে যদি তার স্বামী ফিরে আসে, তাহলে তাকে তার স্ত্রী ও মোহরানার মাঝে ইচ্ছাধিকার দেওয়া হবে।

এ হাদীসটি আব্দুর রাজ্জাক ইমাম মালেক দরাকুতনী প্রমুখ মুহাদ্দিসও বর্ণনা করেছেন।

দলিল-২ : ঈলা ও পুরুষত্বহীনতার মাসআলার সাথে কিয়াস। অর্থাৎ স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীর উপর ব্যভিচারের অভিযোগ উত্থাপিত হওয়ার পর উপযুক্ত সাক্ষী-প্রমাণ না থাকাকালে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ঈলা বা কসম সংঘটিত হওয়ার পর যেমন স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ করে দেওয়া হয়, তেমনি স্বামী নিখোঁজ হওয়ার চার বছর পর স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ করে দেওয়া হবে।

তদ্রূপ কোনো স্ত্রীর স্বামী যদি পুরুষত্বহীন হয় এবং এক বছর চিকিৎসার পরও পুরুষত্ব ফিরে না পায়, তাহলে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে যেমন বিচ্ছেদ করে দেওয়া হয়, তেমনি নিখোঁজ স্বামী ও তার স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ করে দেওয়া হবে। তিনটি মাসআলার পারস্পরিক যোগসূত্র হলো, স্ত্রীকে কষ্টমুক্ত করা। কেননা স্ত্রী স্বামী কর্তৃক অভিযুক্ত হলে, স্বামী পুরুষত্বহীন হলে অথবা নিখোঁজ হলে সে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে। অর্থাৎ অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে না এবং বর্তমান স্বামী দ্বারাও উপকৃত হতে পারে না। তাই স্ত্রীকে এ অবস্থার কষ্ট হতে মুক্তিদানের উদ্দেশ্যে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ করে দেওয়া হবে। উপরের বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, নিখোঁজ ব্যক্তির স্ত্রী ঈলাকারীর স্ত্রীর সদৃশ এবং পুরুষত্বহীন ব্যক্তির স্ত্রীর সদৃশ। কেননা ঈলাকারীর এবং পুরুষত্বহীনের স্ত্রী স্বামীর উপকারিতা হতে যেমন বঞ্চিত হয় তেমনি নিখোঁজ ব্যক্তির স্ত্রীও স্বামীর উপকারিতা হতে বঞ্চিত হয়। তাই ইমাম মালেক (র.) নিখোঁজ ব্যক্তির স্ত্রীর বিচ্ছেদের জন্য সময়সীমা ধার্য করেছেন, তা ঈলা ও ইন্নীনের মাসআলা হতে গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ ঈলার পরিমাণ হলো চার মাস। এখান থেকে চার সংখ্যাটি গ্রহণ করেছেন। আর ইন্নীনের পরিমাণ হলো এক বছর। এখান থেকে বছরের বিষয়টি গ্রহণ করেছেন। ফলে মাফকূদের স্ত্রীর বিচ্ছেদের জন্য সময়সীমা নির্ধারণ করেছেন চার বছর, যাতে উভয় সদৃশের সাথে সামঞ্জস্য বজায় থাকে।

https://e-ilm.weebly.com/

ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও তাঁর সমমতাবলম্বীদের দলিল–

১. নিখোঁজ ব্যক্তির স্ত্রী সম্পর্কে রাসূল ﷺ -এর বাণী اِمْرَأَةُ الْمَفْقُوْدِ اِمْرَأَتُهُ حَتّٰى يَأْتِيَهَا الْبَيَانُ অর্থাৎ নিখোঁজ ব্যক্তির স্ত্রী তার স্ত্রী হিসাবেই থাকবে, যতক্ষণ না তার কাছে প্রমাণ আসে।' এ সংক্রান্ত হাদীস ইমাম দারাকুতনী তাঁর সুনানে বর্ণনা করেছেন নিম্নরূপে–

عَنْ سِوَارِ بْنِ مُصْعَبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُرَحْبِيْلَ الْهَمْدَانِيُّ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِمْرَأَةُ الْمَفْقُوْدِ اِمْرَأَتُهُ حَتّٰى يَأْتِيَهَا الْبَيَانُ ـ

অর্থাৎ সিওয়ার ইবনে মুসআব বর্ণনা করেন মুহাম্মদ ইবনে শুরাহবীল আল হামাদানী হতে, তিনি বর্ণনা করেন মুগীরা ইবনে শু'বা (রা.) হতে, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন– নিখোঁজ ব্যক্তির স্ত্রী তার স্ত্রী হিসাবেই থাকবে, যতক্ষণ তার কাছে প্রমাণ না আসে।

২. হযরত আলী (রা.)-এর উক্তি – هِيَ اِمْرَأَةٌ اُبْتُلِيَتْ فَلْتَصْبِرْ حَتّٰى يَسْتَبِيْنَ مَوْتٌ اَوْ طَلَاقٌ অর্থাৎ নিখোঁজ ব্যক্তির স্ত্রী সম্পর্কে হযরত আলী (রা.) বলেন, সে এমন এক নারী যাকে পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে। অতএব, সে যেন ধৈর্যধারণ করে মৃত্যু বা তালাকের বিষয় পরিষ্কার হওয়া পর্যন্ত।

হাদীসটি মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক ও অন্যান্য কিতাবে বর্ণিত হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, এক নং দলিলরূপে বর্ণিত মারফূ' হাদীসে অর্থাৎ রাসূল ﷺ -এর বাণীতে যে বলা হয়েছিল, যতক্ষণ না তার কাছে اَلْبَيَانُ প্রমাণ আসে, এই প্রমাণের বিষয়টি ছিল ব্যাখ্যাযোগ্য। আর হযরত আলী (রা.)-এর উক্তিটি তারই ব্যাখ্যাস্বরূপ। অতএব, রাসূল ﷺ -এর বাণীতে উল্লিখিত প্রমাণ -এর অর্থ হলো নিখোঁজ ব্যক্তির মৃত্যু কিংবা তালাক প্রদানের বিষয় পরিষ্কার হওয়া। সে হিসাবে রাসূল ﷺ -এর বাণীর মর্ম এই দাঁড়াল যে, নিখোঁজ ব্যক্তির স্ত্রী তার স্ত্রী হিসাবেই থাকবে, যাবৎ না নিখোঁজ স্বামীর মৃত্যু নিশ্চিত হয় অথবা তাকে তালাক প্রদানের বিষয় নিশ্চিত হয়।

৩. নিখোঁজ ব্যক্তির সাথে তার স্ত্রীর বিবাহ বন্ধনটি সুনিশ্চিতরূপে প্রমাণিত। আর নিখোঁজ ব্যক্তির অনুপস্থিতি বিচ্ছেদকে অনিবার্য করে না, যেমন অন্য যে কোনো স্বামীর অনুপস্থিতি বিচ্ছেদকে অনিবার্য করে না। বাকি থাকল নিখোঁজ স্বামীর মৃত্যুর সম্ভাবনা। তো সম্ভাবনার দ্বারা সুনিশ্চিতরূপে প্রমাণিত বিষয় বাতিল হতে পারে না, যেমন ফকীহদের প্রসিদ্ধ মূলনীতি রয়েছে– اَلْيَقِيْنُ لَا يَزُوْلُ بِالشَّكِّ 'সুনিশ্চিত বিষয় সম্ভাবনা দ্বারা বিনষ্ট হয় না।' অতএব, নিখোঁজ ব্যক্তির মৃত্যুর সম্ভাবনার কারণে তার সুনিশ্চিতরূপে সাব্যস্ত বিবাহ বন্ধন বাতিল করা যাবে না।

ইমাম মালেক (র.) -এর দলিলের জবাব :

১. ইমাম মালেক (র.) -এর প্রথম দলিল ছিল এই যে, হযরত ওমর (রা.) ফয়সালা করেছেন, নিখোঁজ ব্যক্তি ও তার স্ত্রীর মাঝে চার বছর পর বিচ্ছেদ করে দেওয়া হবে। এর উত্তর হলো এই যে, হযরত ওমর (রা.) তাঁর এ ফয়সালা হতে হযরত আলী (রা.)-এর মতের দিকে রুজু করেছেন।

মাবসূত কিতাবে উল্লেখ আছে যে, হযরত ওমর (রা.) তিনটি ফয়সালা থেকে হযরত আলী (রা.)-এর মতের দিকে রুজু করেছেন। তন্মধ্যে একটি হলো নিখোঁজ ব্যক্তির স্ত্রীর বিচ্ছেদ সম্পর্কিত ফয়সালা।

অতএব, বলা যায় এ বিষয়ে হযরত আলী (রা.)-এর কথার উপর সাহাবীগণের ইজমা বা ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

২. ইমাম মালেক (র.) এর দ্বিতীয় দলিল ছিল ঈলা ও ইন্নীনের মাসআলার উপর কিয়াস। এর জবাব হলো ঈলা ও ইন্নীনের মাসআলার উপর নিখোঁজ ব্যক্তির মাসআলাকে কিয়াস করা সহীহ নয়। কেননা এগুলোর পারস্পরিক পার্থক্য রয়েছে। যেমন– ঈলাকে জাহেলি যুগে তালাকে মুয়াজ্জাল তথা তাৎক্ষণিক তালাকরূপে গণ্য করা হতো। পরবর্তীতে শরিয়তে একে তালাকে মুয়াজ্জাল বা বিলম্বিত তালাক রূপে গণ্য করা হয়েছে। আর তালাক যেহেতু বিবাহ বিচ্ছেদকারী বিষয়, তাই ঈলার মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে। পক্ষান্তরে নিখোঁজ ব্যক্তির পক্ষ থেকে মুয়াজ্জাল বা মুআজ্জাল কোনো ধরনের তালাকই পাওয়া যায়নি। বিধায় তার বিবাহ বন্ধন বিচ্ছেদ হওয়ার কিছু নেই। অতএব, নিখোঁজের মাসআলাকে ঈলার মাসআলার উপর কিয়াস করা যাবে না।

তদ্রূপ ইন্নীনের মাসআলার উপরও কিয়াস করা যায় না। কারণ দুইয়ের মাঝে পার্থক্য বিদ্যমান। যেমন– ইন্নীন তথা পুরুষত্বহীন ব্যক্তির পুরুষত্বহীনতা যদি এক বছর স্থায়ী হয়ে যায়, এক বছরের মধ্যেও সে সুস্থ না হয়, তাহলে সাধারণত আর সে সুস্থ হয় না, পুরুষত্ব ফিরে পায় না। স্ত্রীর শারীরিক হক আদায়ের সম্ভাবনা চিরতরে রুদ্ধ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে নিখোঁজ ব্যক্তির নিখোঁজ অবস্থা যদি এক বছরের বেশি হয়ে যায়, তাহলে স্ত্রীর শারীরিক হক আদায়ের সম্ভাবনা চিরতরে রুদ্ধ হয়ে যায় না; বরং যে কোনো সময় নিখোঁজ স্বামী ফিরে আসার সম্ভাবনা থাকে। অতএব, নিখোঁজ স্বামী ও ইন্নীনের মাঝে পার্থক্য বিদ্যমান থাকায় একটিকে অপরটির উপর কিয়াস করা যায় না।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ وَاِذَا تَمَّ لَهُ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ سَنَةً مِنْ يَوْمِ وُلِدَ حَكَمْنَا بِمَوْتِهِ قَالَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : وَهٰذِهِ رِوَايَةُ الْحَسَنِ عَنْ اَبِيْ حَنِيْفَةَ ﷺ : وَفِيْ ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ يُقَدَّرُ بِمَوْتِ الْاَقْرَانِ، وَفِي الْمَرْوِيِّ عَنْ اَبِيْ يُوْسُفَ ﷺ بِمِائَةِ سَنَةٍ، وَقَدَّرَهُ بَعْضُهُمْ بِتِسْعِيْنَ، وَالْاَقْيَسُ اَنْ لَا يُقَدَّرَ بِشَيْءٍ . وَالْاَرْفَقُ اَنْ يُقَدَّرَ بِتِسْعِيْنَ، وَاِذَا حُكِمَ بِمَوْتِهِ اعْتَدَّتْ اِمْرَاَتُهُ عِدَّةَ الْوَفَاةِ مِنْ ذٰلِكَ الْوَقْتِ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, নিখোঁজ লোকটির জন্মের দিন থেকে হিসাব করে যখন একশ বিশ বছর পূর্ণ হবে, তখন আমরা তার মৃত্যুর ফয়সালা করব। এটা হলো ইমাম আবূ হানীফা (র.) হতে হাসান ইবনে যিয়াদের বর্ণনা। আর যাহিরে রেওয়ায়েত অনুযায়ী তার সমবয়সীদের মৃত্যুর দ্বারা অনুমান করা হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে একশ বছরের মেয়াদ বর্ণিত হয়েছে। আবার কোনো কোনো মাশায়েখ নব্বই বছর নির্ধারণ করেছেন। তবে সর্বাধিক যুক্তিসম্মত কথা হলো কোনো মেয়াদ নির্ধারিত না করা। আর অধিকতর সহজ হলো নব্বই বছরের মেয়াদ নির্ধারণ করা।

যখন মৃত্যুর ফয়সালা প্রদান করা হবে, তখন তার স্ত্রী ফয়সালার সময় হতে ওফাতের ইদ্দত পালন করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

নিখোঁজ ব্যক্তির মৃত্যু সম্পর্কে কখন ফয়সালা করা হবে, এ নিয়ে ইমামদের থেকে একাধিক মত বর্ণিত হয়েছে। মতগুলো নিম্নরূপ :

১. হাসান ইবনে যিয়াদের সূত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র.) হতে বর্ণিত আছে, নিখোঁজ ব্যক্তির জন্মের দিন হতে হিসাব করে একশ বিশ বছর অতিবাহিত হলে মৃত্যুর ফয়সালা করা হবে।

২. যাহিরে মাযহাব হলো, নিখোঁজ ব্যক্তির সমবয়সী লোকদের মৃত্যুর সাথে অনুমান করে মৃত্যুর ফয়সালা করা হবে। এটি ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমত। ইমাম খাহারযাদাহ বলেছেন, এটি সর্বাধিক বিশুদ্ধ মত এবং মানুষের পক্ষে সর্বাধিক সহজ।

৩. ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) হতে এক বর্ণনা হলো একশ বছর, আরেক বর্ণনা হলো আটান্ন বছর।

৪. কতিপয় মাশায়েখ বলেছেন, নব্বই বছর। সদরুশ শহীদ বলেছেন, এর উপরই ফতোয়া।

৫. পরবর্তী কালের শায়েখগণ বলেছেন, ষাট বছর।

৬. কেউ কেউ বলেছেন, বিষয়টি কাজির সিদ্ধান্তের উপর অর্পিত থাকবে। কাজি যখন মৃত্যুর ফয়সালা করার উপযুক্ত মনে করবেন, তখনই করবেন।

আদালতের পক্ষ থেকে যখন নিখোঁজ ব্যক্তির মৃত্যুর ঘোষণা প্রদান করা হবে, তখন থেকে তার স্ত্রী ওফাতের ইদ্দত পালন করবে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَقُسِمَ مَالُهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ الْمَوْجُوْدِيْنَ فِيْ ذٰلِكَ الْوَقْتِ كَأَنَّهُ مَاتَ فِيْ ذٰلِكَ الْوَقْتِ مُعَايَنَةً اِذِ الْحُكْمِيُّ مُعْتَبَرٌ بِالْحَقِيْقِيِّ وَمَنْ مَاتَ قَبْلَ ذٰلِكَ لَمْ يَرِثْ مِنْهُ لِاَنَّهُ لَمْ يُحْكَمْ بِمَوْتِهِ فِيْهَا فَصَارَ كَمَا اِذَا كَانَتْ حَيَاتُهُ مَعْلُوْمَةً وَلَا يَرِثُ الْمَفْقُوْدُ اَحَدًا مَاتَ فِيْ حَالِ فَقْدِهِ لِاَنَّ بَقَاءَهُ حَيًا فِيْ ذٰلِكَ الْوَقْتِ بِاسْتِصْحَابِ الْحَالِ وَهُوَ لَا يَصْلُحُ حُجَّةً فِي الِاسْتِحْقَاقِ ـ

অনুবাদ : আর সেই সময়ে বিদ্যমান ওয়ারিশদের মাঝে তার সম্পদ বন্টন করে দেওয়া হবে। যেন চাক্ষুষভাবেই সে ঐ সময় মৃত্যুবরণ করেছে। কেননা হুকমি বিষয় হাকীকী বিষয়ের সাথে বিবেচ্য হয়ে থাকে।

এর পূর্বে যে সকল ওয়ারিশ মারা যাবে, তারা তার মিরাশ পাবে না। কেননা ঐ সময় তো তার মৃত্যুর ঘোষণা প্রদান করা হয় নি। সুতরাং এমনই হলো যেন তার জীবদ্দশায় পরিজ্ঞাত রয়েছে।

নিখোঁজ ব্যক্তি তার নিখোঁজ অবস্থায় মারা যাওয়া কারো ওয়ারিশ হবে না। কেননা ঐ সময়ে তাকে জীবিত ধরাটা চলমান অবস্থার সাথে অনুগমনের ভিত্তিতে হয়েছে, যা হকদারিত্ব সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রমাণরূপে বিবেচ্য নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিউক্ত ইবারতে দুটি মাসআলা আলোচিত হয়েছে।

১. নিখোঁজ ব্যক্তির ঘোষিত মৃত্যু প্রাকৃতিক মৃত্যুর ন্যায় বিবেচিত হবে। অতএব, কারো প্রাকৃতিক মৃত্যু ঘটলে যেমন তার সম্পদ ওয়ারিশদের মাঝে বন্টন করে দেওয়া হয়, তেমনি মৃত্যু ঘোষিত নিখোঁজ ব্যক্তির সম্পদও তার জীবিত ওয়ারিশদের মাঝে বন্টন করে দেওয়া হবে। আর যেসব ওয়ারিশ নিখোঁজ ব্যক্তির মৃত্যু ঘোষিত হওয়ার পূর্বে মারা যায়, তারা তার ওয়ারিশ হবে না। কেননা মৃত্যু ঘোষিত হওয়ার পূর্বে সে জীবিত বলে গণ্য হয়।

২. নিখোঁজ ব্যক্তি ঐ সব আত্মীয়ের ওয়ারিশ হবে না, যারা তার নিখোঁজ অবস্থায় মারা গেছে। কারণ নিখোঁজ অবস্থায় ব্যক্তিকে জীবিত গণ্য করা হয় اِسْتِصْحَابِ حَالْ (চলমান অবস্থায় অনুগমনের)-এর ভিত্তিতে। اِسْتِصْحَابِ حَال -এর অর্থ হলো اِبْقَاءُ مَا كَانَ عَلٰى مَا كَانَ لِعَدَمِ الدَّلِيْلِ الْمُزِيْلِ অর্থাৎ কোনো কিছু পূর্বে যে অবস্থায় ছিল, সে অবস্থায় এখনো আছে বলে বলে ধরে নেওয়া, পরিবর্তনের কোনো প্রমাণ না পাওয়া অবস্থায়।

এ বিষয়টি কেবল دَفْع -র ক্ষেত্রে হুজ্জত হয়ে থাকে, اِسْتِحْقَاق -এর জন্য হুজ্জত হয় না। অর্থাৎ নিখোঁজ ব্যক্তির উপর থেকে কোনো কিছু প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে اِسْتِصْحَابِ حَالْ দলিল হতে পারে। কিন্তু নিখোঁজ ব্যক্তিকে কোনো বিষয়ের হকদার সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে اِسْتِصْحَابِ حَالْ দলিল হতে পারে না।

এ কারণেই অন্যের মালের ক্ষেত্রে নিখোঁজ ব্যক্তিকে জীবিত ধরা হয়। তাই নিখোঁজ অবস্থায় কেউ তার ওয়ারিশ হতে পারে না; কিন্তু তাকে জীবিত ধরে নিয়ে অন্যের সম্পদের হকদার তথা ওয়ারিশও তাকে বানানো যায় না। কারণ তাকে জীবিত মনে করার বিষয়টি اِسْتِصْحَابْ-এর উপর নির্ভরশীল, যা اِسْتِحْقَاق -এর ক্ষেত্রে হুজ্জত নয়।

https://e-ilm.weebly.com/

وكَذٰلِكَ لَوْ اَوْصٰى لِلْمَفْقُوْدِ وَمَاتَ الْمُوصِيْ ثُمَّ الْاَصْلُ اَنَّهُ لَوْ كَانَ مَعَ الْمَفْقُوْدِ وَارِثٌ لَا يُحْجَبُ بِهِ وَلٰكِنَّهُ يَنْتَقِصُ حَقُّهُ بِهِ يُعْطٰى اَقَلَّ النَّصِيْبَيْنِ وَيُوْقَفُ الْبَاقِيْ وَاِنْ كَانَ مَعَهُ وَارِثٌ يُحْجَبُ بِهِ لَا يُعْطٰى اَصْلًا . بَيَانُهُ : رَجُلٌ مَاتَ عَنْ اِبْنَتَيْنِ وَابْنٍ مَفْقُوْدٍ وَابْنِ ابْنٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَالْمَالُ فِيْ يَدِ الْاَجْنَبِيِّ وَتَصَادَقُوْا عَلٰى فَقْدِ الِابْنِ وَطَلَبَتْ الِابْنَتَانِ الْمِيْرَاثَ تُعْطَيَانِ النِّصْفَ لِاَنَّهُ مُتَيَقَّنٌ بِهِ وَيُوْقَفُ النِّصْفُ الْاٰخَرُ وَلَا يُعْطٰى وَلَدَ الِابْنِ لِاَنَّهُمْ يُحْجَبُوْنَ بِالْمَفْقُوْدِ، وَلَوْ كَانَ حَيًّا فَلَا يَسْتَحِقُّوْنَ الْمِيْرَاثَ بِالشَّكِّ ـ وَلَا يُنْزَعُ مِنْ يَدِ الْاَجْنَبِيِّ اِلَّا اِذَا ظَهَرَتْ مِنْهُ خِيَانَةٌ وَنَظِيْرُ هٰذَا الْحَمْلُ فَاِنَّهُ تُوْقَفُ لَهُ مِيْرَاثُ ابْنٍ وَاحِدٍ عَلٰى مَا عَلَيْهِ الْفَتْوٰى، وَلَوْ كَانَ مَعَهُ وَارِثٌ اٰخَرُ اِنْ كَانَ لَا يَسْقُطُ بِحَالٍ وَلَا يَتَغَيَّرُ بِالْحَمْلِ يُعْطٰى كُلَّ نَصِيْبِهِ، وَاِنْ كَانَ مِمَّنْ يَسْقُطُ بِالْحَمْلِ لَا يُعْطٰى، وَاِنْ كَانَ مِمَّنْ يَتَغَيَّرُ بِهِ يُعْطَى الْاَقَلَّ لِلتَّيَقُّنِ بِهِ كَمَا فِي الْمَفْقُوْدِ وَقَدْ شَرَحْنَاهُ فِيْ كِفَايَةِ الْمُنْتَهِيْ بِاَتَمَّ مِنْ هٰذَا ـ

অনুবাদ : তদ্রূপ যদি নিখোঁজ ব্যক্তির অনুকূলে অসিয়ত করা হয় আর অসিয়তকারী মারা যায় তাহলে সে অসিয়ত কার্যকর হবে না। নিখোঁজ ব্যক্তির মালের ক্ষেত্রে মূলনীতি এই যে, নিখোঁজ ব্যক্তির সঙ্গে যদি এমন কোনো ওয়ারিশ বিদ্যমান থাকে যে তার দ্বারা মাহজূব (বঞ্চিত) হয় না, তবে তার দ্বারা তার হকের পরিমাণ হ্রাস পায় তাহলে দুই হিসসার অল্পতরটা তাকে প্রদান করা হবে, আর অবশিষ্ট অংশ স্থগিত থাকবে। পক্ষান্তরে যদি তার সঙ্গে এমন ওয়ারিশ বিদ্যমান থাকে যে তার দ্বারা বঞ্চিত হয়, তাহলে তাকে কোনো হিসসাই প্রদান করা হবে না।

সুরতে হালের বিশদ বিবরণ এই যে, একজন লোক দুটি কন্যা, একজন নিখোঁজ পুত্র, একজন পুত্রের পুত্র এবং একজন পুত্রের কন্যা রেখে মারা গেল, আর সম্পদ রয়েছে ওয়ারিশগণ বহির্ভূত অন্য কারো হাতে। এখন সকলে পুত্র নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপারে একমত পোষণ করল। আর কন্যাদ্বয় মিরাশ দাবি করল। এমতাবস্থায় তাদের দুজনকে সম্পদের অর্ধেক দেওয়া হবে। কেননা এ পরিমাণ প্রাপ্তি নিশ্চিত। আর অপর অর্ধেক স্থগিত থাকবে। পক্ষান্তরে পুত্রের সন্তানদেরকে কোনো হিসসা প্রদান করা হবে না। কেননা নিখোঁজ ব্যক্তির (জীবদ্দশা) কারণে তারা বঞ্চিত হয়। সুতরাং সন্দেহের অবস্থায় তারা মিরাশের হকদার হবে না।

আর ওয়ারিশ বহির্ভূত ব্যক্তির নিকট হতে খেয়ানত না পাওয়া পর্যন্ত অবশিষ্ট সম্পদ ফিরিয়ে আনা হবে না। অর্ধেক সম্পদ স্থগিতকরণের ক্ষেত্রে এর সাদৃশ্য হলো গর্ভস্থ সন্তান। কেননা তার অনুকূলে একজন পুত্র সন্তানের পরিমাণ হিসসা স্থগিত রাখা হয়। এর উপরই ফতোয়া।

আর যদি গর্ভস্থ সন্তানের সঙ্গে এমন ওয়ারিশ বিদ্যমান থাকে যার দ্বারা কোনো অবস্থায় তার হিসসা রহিত না হয় বা পরিবর্তিত না হয়, তাহলে তার পূর্ণ হিসসা দিয়ে দেওয়া হবে।

পক্ষান্তরে ওয়ারিশ যদি এমন হয় যে, গর্ভস্থ সন্তান দ্বারা তার হিসসা রহিত হয় তাহলে তাকে কিছুই প্রদান করা হবে না। আর যদি এমন হয় যে, গর্ভস্থ সন্তান দ্বারা তার হিসসা পরিবর্তিত হয়, তাহলে কম পরিমাণের হিসসা প্রদান করা হবে। কেননা এ পরিমাণ প্রাপ্তি সুনিশ্চিত, যেমন নিখোঁজ ব্যক্তির ক্ষেত্রে। বিষয়টি আমি কিফায়াতুল মুনতাহী নামক গ্রন্থে আরো অধিক পূর্ণাঙ্গ রূপে ব্যাখ্যা করেছি।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিউক্ত ইবারতে দুটি মাসআলা আলোচনা করা হয়েছে।

১. কেউ যদি নিখোঁজ ব্যক্তির জন্য অসিয়ত করে এবং সে নিখোঁজ থাকা অবস্থায়ই অসিয়তকারী ব্যক্তি মারা যায়, তাহলে নিখোঁজ ব্যক্তির অনুকূলে অসিয়ত কার্যকারী হবে না; বরং তা মওকুফ বা স্থগিত থাকবে, নিখোঁজ ব্যক্তির অবস্থা পরিজ্ঞাত হওয়া পর্যন্ত। যেমনিভাবে নিখোঁজ ব্যক্তির মিরাশ মওকুফ থাকে। কেননা অসিয়ত ও মিরাশ সমগোত্রীয় বিষয়। অতএব, উভয়ের হুকুমও অভিন্ন।

২. নিখোঁজ ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট মিরাশের একটি মূলনীতি ও তার উদাহরণ বর্ণনা করা হয়েছে।

মূলনীতিটি হলো এই যে, নিখোঁজ ব্যক্তির সাথে যদি এমন ওয়ারিশ থাকে, নিখোঁজ ব্যক্তির দ্বারা যার হিসসা কমে যায়, তাহলে উক্ত ওয়ারিশকে অল্পতর হিসসাটি প্রদান করা হবে। অবশিষ্ট অংশ স্থগিত থাকবে। আর যদি নিখোঁজ ব্যক্তির সাথে এমন ওয়ারিশ থাকে, যে নিখোঁজ ব্যক্তি দ্বারা মাহরূম বা বঞ্চিত হয়, তাহলে সে বঞ্চিত হবে। তাকে কোনো হিসসা দেওয়া হবে না। পূর্ণ মূলনীতির উদাহরণ, যেমন– কোনো ব্যক্তি মারা গেল। তার ওয়ারিশদের মধ্যে আছে দুই মেয়ে, এক ছেলে, ছেলের ছেলে, ছেলের মেয়ে। ছেলেটি নিখোঁজ, উল্লেখ্য মিরাশের বিধান অনুযায়ী ছেলের জীবদ্দশায় ছেলের ছেলে ও ছেলের মেয়ে বঞ্চিত হয়। এতএব, ছেলে নিখোঁজ থাকা অবস্থায়ও ছেলের ছেলে ও মেয়ে বঞ্চিত হবে। তারা কোন হিসসা পাবে না। আর এক ছেলের সাথে দুই মেয়ে থাকলে পূর্ণ সম্পদ দুই ভাগে ভাগ করে এক ভাগ পায় এক ছেলে, আরেক ভাগ পায় দুই মেয়ে, আর ছেলে না থাকলে দুই মেয়ে পূর্ণ সম্পদ পায়। অতএব, ছেলে নিখোঁজ থাকা অবস্থায়ও দুই মেয়ে অল্পর হিসসা পাবে। অর্থাৎ সম্পদের অর্ধেক পাবে। আর অর্ধেক স্থগিত থাকবে নিখোঁজ ছেলের অবস্থা পরিজ্ঞাত হওয়ার আগ পর্যন্ত। মাসআলার সুরত নিম্নরূপ :

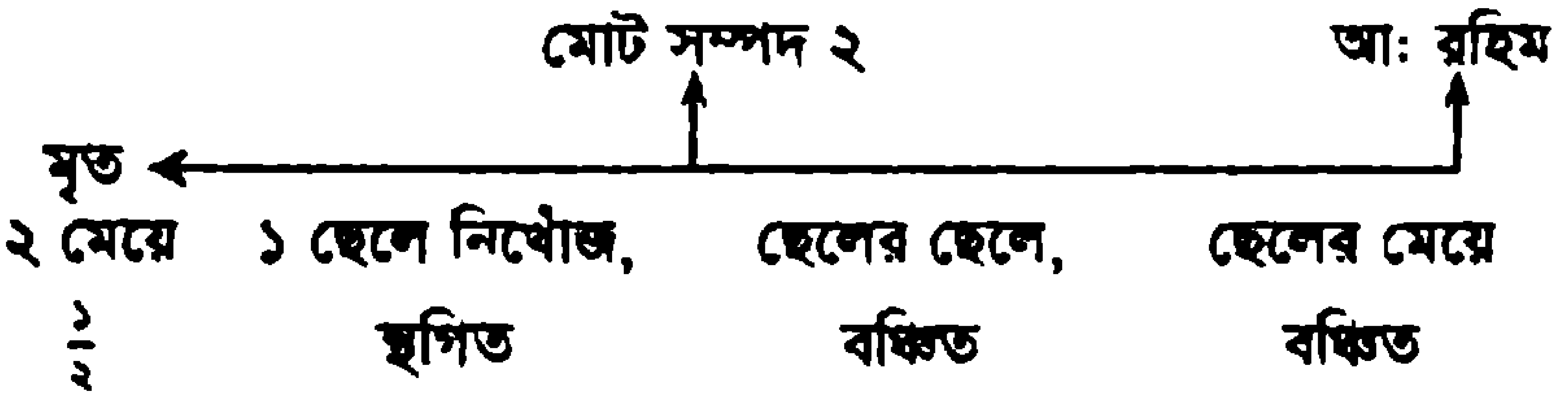

قَوْلُهُ : وَلَا يَنْزِعُ مِنْ يَدِ الْأَجْنَبِيِّ الخ : উপরিউক্ত ইবারতে পূর্বের মাসআলার সাথে সংশ্লিষ্ট একটি কথা ও পূর্বের মাসআলার একটি নজির বর্ণনা করা হয়েছে।

পূর্বের মাসআলার সাথে সংশ্লিষ্ট কথাটি হলো এই যে, দুই মেয়েকে অর্ধেক সম্পদ দেওয়ার পর অবশিষ্ট অর্ধেক সম্পদ ওয়ারিশ বাহির্ভূত যে লোকের হাতে ছিল, তার হাতেই থাকবে। তার পক্ষ থেকে কোনো খেয়ানত প্রকাশ না পাওয়া পর্যন্ত তার হাত থেকে সম্পদ ফিরিয়ে আনা হবে না। যদি তার থেকে কোনো খেয়ানত প্রকাশ পায়, যেমন– সে যদি আমানতের কথা অস্বীকার করে এরূপ বলে যে, আমার কাছে তার কোনো সম্পদ নেই, তাহলে তার হাত থেকে সম্পদ ফিরিয়ে আনা হবে।

পূর্বের মাসআলার নজির মাসআলা তথা নিখোঁজের জন্য সম্পদ স্থগিত রাখার অনুরূপ আরেকটি মাসআলা হলো গর্ভস্থ সন্তানের জন্য সম্পদ স্থগিত রাখার মাসআলা।

মাসআলাটির বিস্তারিত বিবরণ হলো এই যে, গর্ভস্থ সন্তানের জন্য কি পরিমাণ সম্পদ স্থগিত রাখতে হবে এ ব্যাপারে একাধিক বর্ণনা রয়েছে। কোনো বর্ণনা মতে চার পুত্রের সমপরিমাণ হিসসা কোনো বর্ণনা মতে তিন পুত্রের, কোনো বর্ণনা

https://e-ilm.weebly.com/

মতে দুই পুত্রের সমপরিমাণ হিসসা স্থগিত রাখতে হবে। কিন্তু সে বর্ণনা অনুযায়ী ফতোয়া, তা হলো এই যে, একজন পুত্র সন্তানের সমপরিমাণ হিসসা গর্ভজাত সন্তানের জন্য স্থগিত রাখতে হবে।

অতএব, গর্ভস্থ সন্তানের সাথে যদি এমন কোনো ওয়ারিশ থাকে যে গর্ভজাত সন্তান দ্বারা মাহরুম হয়, তাহলে তাকে কোনো হিসসা প্রদান করা হবে না। যেমন– ভাই, চাচা প্রমুখ। আর যদি গর্ভজাত সন্তানের সাথে এমন ওয়ারিশ থাকে, যার হিসসায় গর্ভজাত সন্তানের কারণে কোনো পরিবর্তনই আসে না, তাহলে তাকে পূর্ণ হিস্‌সা দিয়ে দেওয়া হবে। যেমন– দাদী। আর যদি গর্ভজাত সন্তানের সাথে এমন ওয়ারিশ থাকে, যার হিস্‌সা গর্ভজাত সন্তানের কারণে পরিবর্তিত হয় অর্থাৎ হিসসা কমে যায়, তাহলে তাকে কম হিসসাটি প্রদান করা হবে। যেমন– মা, স্ত্রী প্রমুখ।

উদাহরণ : যেমন কেউ মারা গেল, রেখে গেল এক নিখোঁজ ছেলে, এক দাদি, এক ভাই ও মা, এমতাবস্থায় প্রকাশ থাকে যে, মিরাশের নিয়ম অনুযায়ী ছেলের দ্বারা দাদির হিসসায় কোনো পরিবর্তন হয় না। দাদি সর্বাবস্থায় ষষ্ঠমাংশ পায়। ছেলের দ্বারা ভাই বঞ্চিত হয়। ছেলের দ্বারা মায়ের হিসসা পরিবর্তন হয়ে তৃতীয়াংশ হতে ষষ্ঠমাংশে নেমে আসে। অতএব, পূর্বোক্ত বর্ণনা অনুযায়ী ভাই বঞ্চিত হবে, দাদি তার পূর্ণ হিসসা পাবে, মা কম অংশ অর্থাৎ ষষ্ঠমাংশ পাবে। মাসআলার সুরত হবে এরূপ :

মোট সম্পদ ৬ — আ: বারী

মৃত

নিখোঁজ/গর্ভজাত ছেলে,	মা,	দাদী,	ভাই
$\frac{৪}{৬}$ স্থগিত	$\frac{১}{৬}$	$\frac{১}{৬}$	বঞ্চিত

উল্লেখ্য যে, উপরিউক্ত উদাহরণে মায়ের উপস্থিতিতে দাদিকে যে ষষ্ঠমাংশ প্রদান করা হয়েছে, তা কেবলই উদাহরণস্বরূপ। অন্যথায় মিরাশের নিয়ম অনুযায়ী মৃতের মা জীবিত থাকলে দাদি কোনো হিস্‌সা পায় না।

গ্রন্থকার বলেন, নিখোঁজ ব্যক্তির এ মাসআলাটি আমি কিফায়াতুল মুনতাহী নামক কিতাবে এ কিতাবের তুলনায় অধিক পূর্ণাঙ্গরূপে ব্যাখ্যা করেছি।

https://e-ilm.weebly.com/

كِتَابُ الشِّرْكَةِ

الشِّرْكَةُ جَائِزَةٌ ﴿لِاَنَّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثَ وَالنَّاسُ يَتَعَامَلُوْنَ بِهَا فَقَرَّرَهُمْ عَلَيْهِ﴾. قَالَ الشِّرْكَةُ ضَرْبَانِ : شِرْكَةُ اَمْلَاكٍ، وَشِرْكَةُ عُقُوْدٍ . فَشِرْكَةُ الْاَمْلَاكِ : اَلْعَيْنُ يَرِثُهَا رَجُلَانِ و يَشْتَرِيَانِهَا فَلَا يَجُوْزُ لِاَحدِهِمَا اَنْ يَتَصَرَّفَ فِيْ نَصِيْبِ الْاٰخَرِ اِلَّا بِاِذْنِهٖ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِيْ نَصِيْبِ صاحِبِهٖ كَالْاَجْنَبِيِّ وَهٰذِهِ الشِّرْكَةُ يَتَحَقَّقُ فِيْ غَيْرِ الْمَذْكُوْرِ فِي الْكِتَابِ كَمَا اِذَا اتَّهَبَ رَجُلَانِ عَيْنًا اَوْ مَلَكَاهَا بِالْاِسْتِيْلَاءِ اَوْ اِخْتَلَطَ مَالُهُمَا مِنْ غَيْرِ صُنْعِ اَحَدِهِمَا اَوْ بِخَلْطِهِمَا خَلْطًا يَمْنَعُ التَّمْيِيْزَ رَأْسًا اَوْ اِلَّا بِحَرَجٍ، وَيَجُوْزُ بَيْعُ اَحَدِهِمَا نَصِيْبَهُ مِنْ شَرِيْكِهٖ فِيْ جَمِيْعِ الصُّوَرِ وَمِنْ غَيْرِ شَرِيْكِهٖ بِغَيْرِ اِذْنِهٖ اِلَّا فِيْ صُوْرَةِ الْخَلْطِ وَالْاِخْتِلَاطِ فَاِنَّهُ لَا يَجُوْزُ اِلَّا بِاِذْنِهٖ، وَقَدْ بَيَّنَّا الْفَرْقَ فِيْ كِفَايَةِ الْمُنْتَهٰى۔

অধ্যায় : অংশীদারিত্ব

অনুবাদ : অংশীদারিত্ব শরিয়ত সম্মত। কেননা নবী করীম ﷺ যখন প্রেরিত হয়েছিলেন, তখন লোকেরা অংশীদারির মোআমালা করত, আর তিনি তাদের এর উপর বহাল রেখেছেন।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, অংশীদারিত্ব দু'ধরনের। মালিকানাভিত্তিক অংশীদারিত্ব এবং চুক্তিভিত্তিক অশীদারিত্ব। মালিকানাভিত্তিক অংশীদারিত্ব হলো দু'জনের যৌথভাবে কোনো সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হওয়া কিংবা দু'জন যৌথভাবে কোনো সম্পত্তি খরিদ করা। তখন একে অপরের অনুমতি ছাড়া অপরজনের হিসসা ব্যবহার করার অধিকার থাকবে না। আর তাদের উভয়ের প্রত্যেকে অপরের হিসসায় পরের মতো হবে।

আর এ অংশীদারিত্ব কুদূরী কিতাবে উল্লিখিত ক্ষেত্রদ্বয় ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রেও হতে পারে : যেমন দু'জনে একত্রে কোনো সম্পদ গ্রহণ করল। কিংবা একত্রে আধিপত্যের মাধ্যমে মালিকানা লাভ করল। কিংবা দু'জনের কারো হস্তক্ষেপ ছাড়া পরস্পরের সম্পদ মিশ্রিত হয়ে গেল কিংবা নিজেদের উদ্যোগে মিশ্রিত করল এমনভাবে যে, কোনো ক্রমেই তা পৃথক করা যায় না। কিংবা বিনা কষ্টে পার্থক্য করা সম্ভব নয়।

উপরিউক্ত সকল প্রকারেই প্রত্যেকেই নিজের অংশ অপর অংশীদারের কাছে এবং তার অনুমতি ছাড়াই অন্যের কাছে বিক্রি করতে পারবে। তবে মিশ্রিত হওয়া ও মিশ্রিত করার হুকুম ভিন্ন : অর্থাৎ শরিকদারের অনুমতি ছাড়া অন্যের কাছে বিক্রি করা বৈধ নয়। কিফায়াতুল মুনতাহী গ্রন্থে পার্থক্যের কারণ আমরা উল্লেখ করেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

اَلشِّرْكَةُ শব্দটি মাসদার। الشرك -এর সমার্থক। অর্থাৎ শরিক হওয়া, অংশীদার হওয়া। شَرِيْكٌ -এর শব্দটি ইসমে ফায়েল মুবালাগাহ-এর সীগাহ, যা مُشَارِكٌ -এর সমার্থক। অর্থাৎ অংশীদার ব্যক্তি।

https://e-ilm.weebly.com/

শিরকত বা অংশীদারিত্ব তথা অংশীদারি কারবার শরিয়ত সম্মত। এর শরিয়ত সিদ্ধতা কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস বা যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত। অতএব, শিরকত সাব্যস্তকারী আয়াত, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করা হলো।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ তাহলে তারা এক তৃতীয়াংশ সম্পদে সমান অংশীদার। -[সূরা নিসা, আয়াত নং ১২]

তিনি আরো ইরশাদ করেন- وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ শরিকদার অনেকে একে অন্যের উপর অবিচার করে থাকে। -[সূরা সাদ, আয়াত নং ২৪]

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, দুই অংশীদারকে আমি তৃতীয়জন হিসাবে সাহায্য করি, যাবৎ না তারা একে অপরের সাথে খেয়ানত করে। যখন তারা একে অপরের সাথে খেয়ানত করে তখন আমি তাদের মাঝ হতে বেরিয়ে যাই। (অর্থাৎ আমার সাহায্য উঠিয়ে নিই।) আবূ দাউদ, মুস্তাদরাকে হাকেম।

অংশীদারি মুআমালা জায়েজ হওয়ার ব্যাপারে সকল ইমাম একমত পোষণ করেছেন। কারো মতেই তা নাজায়েজ নয়।

আংশীদারি কারবার আল্লাহর ফযল তথা রিজিক বা সম্পদ উপার্জনের একটি মাধ্যম। আর সম্পদ উপার্জনের জন্য কোনো বৈধ পন্থা অবলম্বন করা কুরআন দ্বারা সাব্যস্ত। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ তোমরা আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ সন্ধান কর। -[সূরা জুমু'আ, আয়াত নং- ১০]

ইবারতের ব্যাখ্যা : শিরকাতের মুআমালা নবুয়ত পূর্ব যুগ থেকেই প্রচলিত ছিল। নবী করীম ﷺ নবুয়ত লাভ করার পর শিরকাতের মু'আমালা নিষেধ করেননি। বরং তিনি এর উপর লোকদেরকে বহাল রেখেছেন। এর দ্বারা শিরকাতের বৈধতা প্রমাণিত হয়।

শিরকাত দুই প্রকার : ১. شِرْكَةُ الْأَمْلَاكِ (মালিকানা ভিত্তিক শিরকাত)। ২. شِرْكَةُ الْعُقُودِ (চুক্তি ভিত্তিক শিরকাত।)

শিরকাতুল আমলাকের কিছু সুরত :

১. দুই বা ততোধিক ব্যক্তি মিরাশ সূত্রে কোনো কিছুর মালিক হওয়া।

২. দুই বা ততোধিক ব্যক্তি ক্রয় সূত্রে কোনো কিছুর মালিক হওয়া।

৩. দুই বা ততোধিক ব্যক্তি হেবা সূত্রে কোনো কিছুর মালিক হওয়া।

৪. দুই বা ততোধিক ব্যক্তি হারবীদের কোনো সম্পদের উপর আধিপত্য বিস্তার পূর্বক তার মালিক হওয়া।

৫. দুই বা ততোধিক ব্যক্তির সম্পদ তাদের কোনোরূপ হস্তক্ষেপ ছাড়াই একত্রিত হয়ে যাওয়া। যেমন- দু'জনের থলি ফেটে গিয়ে দুই থলির দিরহামসমূহ একত্র হয়ে যাওয়া।

৬. দুই বা ততোধিক ব্যক্তির সম্পদ তাদের উদ্যোগে একত্রিত হয়ে যাওয়া। এমনভাবে যে, পৃথক করা অসম্ভব হয়ে যায়। যেমন গমের সাথে গম মিশ্রিত করা। কিংবা পৃথক করা সম্ভব হলেও অতি কষ্টে সম্ভব হয়। যেমন- ধানের সাথে গম মিশ্রিত করা।

শিরকাতুল আমলাক সম্পর্কিত কিছু বিধান :

১. এক অংশীদার অপর অংশীদারের সম্পদে তার অনুমতি ছাড়া কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।

২. প্রত্যেক অংশীদার অপর অংশীদারের সম্পদে অচেনা ব্যক্তির ন্যায়।

৩. যে কোনো অংশীদার তার নিজের অংশ অপর শরিকের নিকট বিক্রি করতে পারবে।

৪. যে কোনো শরিক তার নিজের অংশ অপর শরিকের অনুমতি ব্যতীত অন্যের কাছেও বিক্রি করতে পারবে।

৫. দু'জনের সম্পদ মিশ্রিত হলে বা মিশ্রিত করা হলে একজনের অনুমতি ছাড়া অপরজন তার অংশ অন্যের কাছে বিক্রি করতে পারবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

وَالضَّرْبُ الثَّانِيْ : شِرْكَةُ الْعُقُوْدِ، وَرُكْنُهَا الْإِيْجَابُ وَالْقَبُوْلُ، وَهُوَ اَنْ يَقُوْلَ اَحَدُهُمَا شَارَكْتُكَ فِيْ كَذَا وَكَذَا وَيَقُوْلُ الْاٰخَرُ قَبِلْتُ وَشَرْطُهُ اَنْ يَكُوْنَ التَّصَرُّفُ الْمَعْقُوْدُ عَلَيْهِ عَقْدَ الشَّرْكَةِ قَابِلًا لِلْوَكَالَةِ لِيَكُوْنَ مَا يُسْتَفَادُ بِالتَّصَرُّفِ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا فَيَتَحَقَّقُ حُكْمُهُ الْمَطْلُوْبُ مِنْهُ ثُمَّ هِيَ اَرْبَعَةُ اَوْجُهٍ : مُفَاوَضَةٌ، وَعِنَانٌ، وَشِرْكَةُ الصَّنَائِعِ، وَشِرْكَةُ الْوُجُوْهِ.

فَاَمَّا شِرْكَةُ الْمُفَاوَضَةِ فَهِيَ اَنْ يَشْتَرِكَ الرَّجُلَانِ فَيَتَسَاوَيَا فِيْ مَالِهِمَا وَتَصَرُّفِهِمَا وَدَيْنِهِمَا لِاَنَّهَا شِرْكَةٌ عَامَّةٌ فِيْ جَمِيْعِ التِّجَارَاتِ يُفَوِّضُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اَمْرَ الشَّرْكَةِ اِلٰى صَاحِبِهٖ عَلَى الْإِطْلَاقِ اِذْ هِيَ مِنَ الْمُسَاوَاةِ، قَالَ قَائِلُهُمْ شعر : لَا يُصْلِحُ النَّاسَ فَوْضًا لَا سُرَاةَ لَهُمْ وَلَا سُرَاةَ اِذَا جُهَّالُهُمْ سَادُوْا اَيْ مُتَسَاوِيِيْنَ . فَلَا بُدَّ مِنْ تَحْقِيْقِ الْمُسَاوَاةِ اِبْتِدَاءً وَانْتِهَاءً وَذٰلِكَ فِي الْمَالِ، وَالْمُرَادُ بِهٖ مَا تَصِحُّ الشِّرْكَةُ فِيْهِ، وَلَا يُعْتَبَرُ التَّفَاضُلُ فِيْمَا لَا يَصِحُّ الشُّرْكَةُ فِيْهِ، وَكَذَا فِي التَّصَرُّفِ، لِاَنَّهُ لَوْ مَلَكَ اَحَدُهُمَا تَصَرُّفًا لَا يَمْلِكُ الْاٰخَرُ لَفَاتَ التَّسَاوِيْ، وَكَذٰلِكَ فِي الدَّيْنِ لِمَا نُبَيِّنُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى،

অনুবাদ : দ্বিতীয় প্রকার হলো, চুক্তিভিত্তিক অংশীদারিত্ব। অংশীদারিত্ব সম্পন্ন হওয়ার রুকন বা মূল তত্ত্ব হলো ইজাব ও কবুল। যেমন– একজন বলে আমি এ বিষয়ে তোমাকে অংশীদার করলাম আর অপর জন বলে, আমি তা গ্রহণ করলাম।

এই চুক্তিভিত্তিক অংশীদারিত্ব বৈধ হওয়ার জন্য শর্ত হলো, যে বিষয়ে শিরকাতের আকদ করা হয়েছে তা ওকালতের সুযোগ সম্পন্ন হওয়া। যাতে উক্ত কর্মের মাধ্যমে যা অর্জিত হবে, তা উভয়ের মাঝে শরিকানাভুক্ত হয় এবং শরিকানাচুক্তির কাঙ্ক্ষিত ফল বাস্তবায়িত হয়।

এই অংশীদারিত্ব চার প্রকার। মুফাওয়াযা ইনান, শিরকাতুস সানায়ে, শিরকাতুল উজূহ।

শিরকাতুল মুফাওয়াযা এই যে, দুই ব্যক্তি নিজেদের সম্পদের ক্ষেত্রে এবং সম্পদ পরিচালনার ক্ষেত্রে আর ঋণের ক্ষেত্রে সমভাবে অংশীদার হয়। কেননা এটা হচ্ছে সর্বপ্রকার ব্যবসায়ে সাধারণ অংশীদারিত্ব তাতে উভয়ের প্রত্যেকে অংশীদারির বিষয়টি অপরের হাতে নিঃশর্তভাবে ন্যস্ত করে। কেননা শব্দটি সমতার অর্থ নির্দেশ করে।

যেমন এক আরব কবি বলেছেন– لا يصلح الناس فوضا لا سراة لهم + ولا سراة اذا جهالهم سادوا সব মানুষ সমান হয়ে যাওয়া এবং তাদের কোনো নেতা না থাকা ভালো নয়। আর মূর্খ লোকেরা যখন নেতা হয়ে যায় তখন নেতা না থাকাই স্বাভাবিক। সুতরাং সূচনা ও সমাপ্তি প্রতিটি পর্বে সমতা বিধান করা অপরিহার্য। আর এই সমতা বিধান হবে এমন সম্পদের ক্ষেত্রে, যাতে অংশীদারিত্ব শুদ্ধ হয়। যে সকল সম্পদে অংশীদারিত্ব শুদ্ধ হয় না সে সকল ক্ষেত্রে কম-বেশি হওয়া বিবেচ্য নয়।

তদ্রূপ ব্যবহারের অধিকারের ক্ষেত্রে সমতা অপরিহার্য। কেননা একজন যদি এমন ব্যবহারের অধিকারী হয়, যার অধিকারী অন্যজন হয় না, তাহলে সমতা বিনষ্ট হবে। তদ্রূপ ঋণের ক্ষেত্রেও সমতা বিধান অপরিহার্য এর কারণ ইনশাআল্লাহ আমরা বর্ণনা করব।

https://e-ilm.weebly.com/

وَهٰذِهِ الشَّرِكَةُ جَائِزَةٌ عِنْدَنَا اِسْتِحْسَانًا. وَفِي الْقِيَاسِ لَا يَجُوْزُ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ . وَقَالَ مَالِكٌ (رحـ) : لَا أَعْرِفُ مَا الْمُفَاوَضَةُ. وَجْهُ الْقِيَاسِ أَنَّهَا تَضَمَّنَتْ الْوَكَالَةَ بِمَجْهُوْلِ الْجِنْسِ وَالْكَفَالَةَ بِمَجْهُوْلٍ، وَكُلُّ ذٰلِكَ بِانْفِرَادِهِ فَاسِدٌ . وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ قَوْلُهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿فَاوِضُوْا فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْبَرَكَةِ﴾ وَكَذَا النَّاسُ يُعَامِلُوْنَهَا مِنْ غَيْرِ نَكِيْرٍ وَبِهِ يُتْرَكُ الْقِيَاسُ وَالْجَهَالَةُ مُتَحَمَّلَةٌ تَبَعًا كَمَا فِي الْمُضَارَبَةِ وَلَا تَنْعَقِدُ إِلَّا بِلَفْظَةِ الْمُفَاوَضَةِ لِبُعْدِ شَرَائِطِهَا عَنْ عِلْمِ الْعَوَامِّ، حَتّٰى لَوْ بَيَّنَّا جَمِيْعَ مَا تَقْتَضِيْهِ تَجُوْزُ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ هُوَ الْمَعْنٰى .

অনুবাদ : আমাদের নিকট এই সমঅংশীদারিত্ব সূক্ষ্ম কিয়াস অনুযায়ী জায়েজ। পক্ষান্তরে কিয়াস অনুযায়ী জায়েজ হয় না। আর তা-ই ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর অভিমত।

ইমাম মালিক (র.) বলেন, শিরকাতুল মুফাওয়াযা কি আমি তা জানি না।

কিয়াসের দলিল এই যে, এটা জাতিগতভাবে অজ্ঞাত বিষয়ের এমন উকিল হওয়া এবং কাফীল হওয়াকে অন্তর্ভুক্ত করে। আর এ উভয়টি স্বতন্ত্রভাবে করলে ফাসিদ হয়।

সূক্ষ্ম কিয়াসের দলিল হচ্ছে নবী করীম ﷺ -এর বাণী– فَاوِضُوْا فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْبَرَكَةِ তোমরা শিরকাতে মুফাওয়াযা কর। কেননা তা অধিক বরকতপূর্ণ। তাছাড়া মানুষ শুরু থেকেই বিনা বাধায় এ মুআমালা করে আসছে। আর এরকম প্রচলনের (تعامل) কারণে কিয়াস বর্জন করা হয়।

আর (সমতা বিধানের) অনুবর্তী হিসাবে অজ্ঞতা গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে। যেমন মুদারাবার ক্ষেত্রে।

মুফাওয়াযা শব্দ ছাড়া এই শরিকানা সংঘটিত হয় না। কেননা এর শর্তসমূহ সাধারণের জ্ঞান থেকে বহির্ভূত। তবে যদি (মুফাওয়াযা শব্দ উচ্চারণ না করে) যাবতীয় শর্তসমূহ উল্লেখ করে, তাহলে শিরকাতুল মুফাওয়াযা সম্পন্ন হবে। কেননা উদ্দেশ্যই হলো বিবেচ্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিউক্ত ইবারতের সারমর্ম হলো এই যে, দ্বিতীয় প্রকার শিরকাত হলো শিরকাতুল উকূদ বা চুক্তিভিত্তিক শিরকাত। এর রুকন দু'টি। ইজাব ও কবুল। ইজাব-কবুল সম্পাদনের এ প্রক্রিয়া হলো এই যে, একজন বলবে, আমি তোমাকে অমুক লেনদেনে অংশীদার করলাম। অপরজন বলবে আমি অংশীদারিত্ব কবুল করলাম। এর দ্বারা অংশীদারিত্ব চুক্তি সম্পন্ন হবে। চুক্তিভিত্তিক অংশীদারিত্ব সম্পন্ন হওয়ার জন্য শর্ত হলো, যে লেনদেনের মধ্যে চুক্তি করা হবে, সে লেনদেনটি এমন হতে হবে যে, তাতে ওকালাত চলে অর্থাৎ কাজটি এমন হতে হবে যে, একজনের পক্ষ থেকে উকিল হয়ে অপরজন কাজটি করতে পারে। যেমন– ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি। অতএব, লাকড়ি কুড়ানো, ঘাস সংগ্রহ করা, শিকার করা ইত্যাদি কাজে শিরকাত সম্পন্ন হবে না। কেননা এসব কাজে একজন অপরজনের উকিল হতে পারে না। বরং এসব কাজ যে করে সেই মালিক হয়।

উপরিউক্ত শর্তারোপ করার উদ্দেশ্য হলো, অংশীদারিত্ব কারবারের আসল উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হওয়া। অর্থাৎ কাজের মাধ্যমে যা অর্জন হবে, তা উভয়ের মাঝে শরিকানাভুক্ত হওয়া।

https://e-ilm.weebly.com/

قَوْلُهُ : ثُمَّ هِيَ أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ : مُفَاوَضَةٌ، وَعِنَانٌ، وَشِرْكَةُ الخ : উপরিউক্ত ইবারতে কয়েকটি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে

❑ শিরকাতুল উকূদ বা চুক্তিভিত্তিক অংশীদারিত্বের প্রকারভেদ :

শিরকাতুল উকূদ বা চুক্তিভিত্তিক অংশীদারিত্ব চার প্রকার–

১. শিরকাতুল মুফাওয়াযা ২. শিরকাতুল ইনান। ৩. শিরকাতুস সানায়ে। ৪. শিরকাতুল উজূহ।

❑ শিরকাতুল মুফাওয়াযার সুরত :

শিরকাতুল মুফাওয়াযার সুরত হলো দু'জন ব্যক্তি তাদের সম্পদ, সম্পদের পরিচালনা ও ঋণের ক্ষেত্রে সমতার ভিত্তিতে অংশীদার হওয়া।

সমতার শর্ত একারণে আরোপ করা হয়েছে যে, এ প্রকার শিরকাত সকল প্রকার ব্যবসা-বাণিজ্য ও লেনদেনকে আওতাভুক্ত করে। উভয় শরিকের প্রত্যেকে অংশীদারির বিষয় অপরজনের হাতে নিঃশর্তভাবে ন্যস্ত করে থাকে। এমনকি مفاوضة শব্দটিও অর্থগত দিক বিবেচনায় مساواة (সমতা) থেকে নির্গত হয়েছে। তাই শিরকাতুল মুফাওয়াযা -এর ক্ষেত্রে সম্পদ, সম্পদ পরিচালনা ও ঋণের ক্ষেত্রে উভয় শরিক সমান হওয়া শর্ত।

مفاوضة শব্দটি সমতার অর্থের প্রতি নির্দেশ করে– এ বিষয়ে মুসান্নিফ (র.) দলিল পেশ করেছেন এক আরব কবির কবিতার মাধ্যমে।

لَا يَصْلُحُ النَّاسُ فَوْضَا لَا سُرَاةَ لَهُمْ + وَلَا سُرَاةَ إِذَا جُهَّالُهُمْ سَادُوا কবির নাম আল আফওয়াহ আল-আওদী। তিনি তার কবিতায় বলতে চেয়েছেন– সকল মানুষ যদি সমান হয়ে যায় এবং তাদের মাঝে বড় কোনো নেতা না থাকে, তাহলে এটা তাদের জন্য কল্যাণজনক নয়। কেননা কোনো গোষ্ঠীর মধ্যে সকলের মান্য ও অনুসরণীয় কেউ না থাকলে সকলেই নিজ নিজ মত বাস্তবায়ন করতে চায়। এমতাবস্থায় তাদের মাঝে ঐক্য বিনষ্ট হয়ে অনৈক্য দেখা দেয়।

লক্ষণীয় যে, কবি সমান হওয়ার অর্থ বোঝানোর উদ্দেশ্যে فوضا শব্দ ব্যবহার করেছেন। مفاوضة এর মূলধাতু হলো ف - و - ض শব্দের উৎপত্তিও এ ধাতু থেকে। অতএব, প্রমাণিত হয় যে, مفاوضة শব্দটি ধাতুগতভাবেই সমতার প্রতি ইঙ্গিত করে। সুতরাং মুফাওয়াযার মাধ্যমে পরস্পর শরিকদ্বয় সম্পদ, তসরুফ ও ঋণ ইত্যাদি বিষয়ে সমান হওয়া আবশ্যক।

সম্পদের মধ্যে উভয় শরিক সমান হওয়ার অর্থ হলো, যে সব সম্পদে শিরকত শুদ্ধ হয় সে সব সম্পদে সমান হওয়া। যেমন– দিরহাম-দীনার, টাকা-পয়সা ইত্যাদি। যেসব সম্পদে শিরকাত শুদ্ধ হয় না সে সব সম্পদে উভয়ের সমান হওয়া শর্ত নয়। যেমন– ভূমি, আসবাব-পত্র ইত্যাদি। অনুরূপভাবে শরিকদ্বয় অন্যের কাছে যে ঋণ পাবে তাতেও সমতা শর্ত নয়। তবে ঋণ উসুল হওয়ার মাধ্যমে যখন নগদ অর্থে পরিণত হয়, তখন তাতে অবশ্যই সমতা প্রয়োজন হবে।

তসরুফ তথা সম্পদ পরিচালনার ক্ষেত্রে উভয়ের সমান অধিকার থাকতে হবে। অর্থাৎ একজন অংশীদার যত প্রকার তসরুফ করার অধিকারী হবে, অপর অংশীদারও তত প্রকার তসরুফ করার অধিকারী হতে হবে। অতএব, শরিকদ্বয়ের একজন যদি মুসলমান হয়, আর অপরজন অমুসলিম হয়, তাহলে তাদের মাঝে শিরকাতুল মুফাওয়াযা শুদ্ধ হবে না। কারণ মুসলমান ব্যক্তি যে সকল তসরুফ করার ক্ষমতা রাখে, অমুসলিম ব্যক্তি সে সকল তসরুফ করার ক্ষমতা রাখে না। তদ্রূপ শরিকদ্বয়ের একজন স্বাধীন ও অপরজন গোলাম হলে কিংবা একজন প্রাপ্তবয়স্ক এবং অপরজন অপ্রাপ্তবয়স্ক হলে তাদের মাঝে শিরকাতুল মুফাওয়াযা শুদ্ধ হবে না। কারণ তসরুফের ক্ষেত্রে তাদের মাঝে সমতা রক্ষা সম্ভব নয়।

ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রেও শরিকদ্বয়ের সমান অধিকার থাকা শর্ত। এ শর্তের কারণ আমরা সামনে বর্ণনা করব ইনশাআল্লাহ।

❑ শিরকাতুল মুফাওয়াযা সম্পর্কে ইমামগণের মতামত ও জায়েজ নাজায়েজ হওয়ার কারণ :

ইমাম শাফেয়ী (র.) ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) এর মতে শিরকাতুল মুফাওয়াযা জায়েজ নয়।

https://e-ilm.weebly.com/

ইমাম মালেক (র.) বলেন, শিরকাতুল মুফাওয়াযা কী বস্তু বা কী বিষয় তা আমার জানা নেই। তবে ইমাম মালেক (র.)-এর আসহাবগণ হতে বর্ণিত আছে যে, শিরকাতুল মুফাওয়াযা জায়েজ আছে। শিরকাতুল মুফাওয়াযার অর্থ হলো শরিকদ্বয়ের প্রত্যেকের অপরের নিকট সর্বপ্রকার তসরুফের ক্ষমতা ন্যস্ত করা, নিজের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতিতে। এর জন্য উভয় শরিক সম্পদের ক্ষেত্রে সমান হওয়া শর্ত নয়।

আহনাফের মতে কিয়াস অনুযায়ী শিরকাতুল মুফাওয়াযা শুদ্ধ নয়। কিন্তু ইস্তিহসান বা সূক্ষ্ম কিয়াস মুতাবেক সহীহ।

কিয়াস অনুযায়ী সহীহ না হওয়ার কারণ হলো এই যে, মুফাওয়াযার মধ্যে শরিকদ্বয় একে অপরের উকিল ও কাফীল হয়ে থাকে সকল তসরুফের ক্ষেত্রে। অথচ আকদ করার সময় তসরুফগুলো জ্ঞাত থাকে না। তাই অজ্ঞাত বিষয়ে একজন অপরজনের উকিল ও কাফীল হয়। এ বিষয়টি শুদ্ধ নয়। অতএব, শিরকাতুল মুফাওয়াযার ভিতরে যেহেতু অশুদ্ধ বিষয় রয়েছে, তাই শিরকাতুল মুফাওয়াযাও অশুদ্ধ।

ইস্তিহসান মুতাবেক সহীহ হওয়ার কারণ হলো,

১. রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী فَاوِضُوا فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْبَرَكَةِ তোমরা শিরকাতে মুফাওয়াযা কর। কেননা এটা অধিক বরকতপূর্ণ।

সুনানে ইবনে মাজা শরীফে আরো বর্ণিত আছে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন– ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَاخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ তিনটি বিষয়ের মাঝে বরকত রয়েছে। বাকিতে বিক্রয় করা, কর্জ দেওয়া ও পরিবারের খাবারের জন্য গমের সাথে যব মিশ্রিত করা। বিক্রির জন্য নয়।

কোনো কোনো অনুলিপিতে اَلْمُقَارَضَةُ এর স্থলে اَلْمُفَاوَضَةُ শব্দ রয়েছে।

২. মানুষ শুরুকাল থেকেই কোনোরূপ বাঁধা ছাড়া শিরকাতুল মুফাওয়াযার আক্‌দ করে আসছে। আর মানুষের তা'আমুল দ্বারা কিয়াস পরিত্যাজ্য হয়ে যায়। অতএব, শিরকাতুল মুফাওয়াযার তা'আমুল থাকার কারণেও কিয়াসের দাবি পরিত্যাগ করা হবে।

একটি প্রশ্ন ও জবাব : শিরকাতুল মুফাওয়াযা অশুদ্ধ প্রমাণকারী কিয়াসের আলোচনায় বলা হয়েছিল, শিরকাতুল মুফাওয়াযার মধ্যে অজ্ঞাত বিষয়ে উকিল, কাফীল বানানো হয়, তাই এটা নাজায়েজ।

এর জবাব হলো এই যে, এই অজ্ঞতাটুকু মূল আক্‌দ বা চুক্তির অনুগামী বিষয়। অতএব, এটা বরদাশতযোগ্য। যেমন মুযারাবার মধ্যে এ ধরনের অজ্ঞতা বরদাশ্ত করা হয়। কেননা মুযারিব যখন কোনো তসরুফ করে তখন সে রাব্বুল মালের পক্ষ হতে উকিল হয়ে থাকে। কিন্তু এ তসরুফ পূর্ব থেকে জ্ঞাত থাকে না। বরং তা জাতিগতভাবে অজ্ঞাত থাকে। তথাপি অজ্ঞতাটি মূল বিষয় না হয়ে অনুগামী হওয়ার কারণে তা মেনে নেওয়া হয়। তদ্রূপ মুফাওয়াযার ক্ষেত্রেও মেনে নেওয়া হবে।

তাছাড়া অজ্ঞতার দ্বারা আক্‌দ ফাসেদ হওয়ার মূল করণ হলো, পরিণামে বিবাদ-বিতণ্ডা আবশ্য হওয়া। কিন্তু শিরকাতুল মুফাওয়াযার মধ্যে যে অজ্ঞতা থাকে, তার পরিণামে বিবাদ-বিতণ্ডা আবশ্যক হয় না। তাই এর কারণে আক্‌দও ফাসেদ হবে না।

❑ শিরকাতুল মুফাওয়াযার চুক্তি মুফাওয়াযা শব্দ উল্লেখ করা ব্যতীত শুদ্ধ হবে না। কারণ শিরকাতুল মুফাওয়াযার শর্তসমূহ সাধারণ মানুষের জ্ঞানবহির্ভূত। তাই তাদেরকে অবশ্যই মুফাওয়াযা শব্দ উল্লেখ করতে হবে। তবে যদি শরিকদ্বয় মুফাওয়াযার শব্দ উল্লেখ না করে মুফাওয়াযার শর্ত ও হুকুমসমূহ আলোচনা করে নেয়, তাহলেও শুদ্ধ হবে। কেননা শব্দ নয়, বরং অর্থ বা উদ্দেশ্যই মূল বিবেচ্য বিষয়।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ فَيَجُوْزُ بَيْنَ الْحُرَّيْنِ الْكَبِيْرَيْنِ مُسْلِمَيْنِ اَوْ ذِمِّيَّيْنِ لِتَحَقُّقِ التَّسَاوِي، وَاِنْ كَانَ اَحَدُهُمَا كِتَابِيًّا وَالْاٰخَرُ مَجُوْسِيًّا يَجُوْزُ اَيْضًا لِمَا قُلْنَا وَلَا يَجُوْزُ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْمَمْلُوْكِ وَلَا بَيْنَ الصَّبِيِّ وَالْبَالِغِ لِانْعِدَامِ الْمُسَاوَاةِ، لِاَنَّ الْحُرَّ الْبَالِغَ يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ وَالْكَفَالَةَ، وَالْمَمْلُوْكُ لَا يَمْلِكُ وَاحِدًا مِّنْهُمَا اِلَّا بِاِذْنِ الْمَوْلٰى، وَالصَّبِيُّ لَا يَمْلِكُ الْكَفَالَةَ وَلَا يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ اِلَّا بِاِذْنِ الْوَلِيِّ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, সুতরাং স্বাধীন ও প্রাপ্তবয়স্ক দুই মুসলমান কিংবা দুই জিম্মির মাঝে তা সম্পন্ন হতে পারে। যেহেতু (পূর্ণরূপে সমতা) সাব্যস্ত হয়েছে।

যদি একজন কিতাবী এবং অপরজন মাজূসী হয়, তবুও শিরকাতুল মুফাওয়াযা জায়েজ হবে। কারণ আমরা উপরে যা বলে এসেছি।

দাস ও স্বাধীনের মাঝে তা বৈধ হবে না এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও প্রাপ্ত বয়স্কের মাঝেও বৈধ হবে না।

কেননা সমতা বিদ্যমান নেই। কারণ স্বাধীন ও প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি লেনদেন করার ও দায় গ্রহণের ক্ষমতা রাখে। পক্ষান্তরে দাস তার মনিবের অনুমতি ছাড়া দু'টির একটিরও ক্ষমতা রাখে না। আর অপ্রাপ্ত বয়স্ক দায় গ্রহণের অধিকারী নয়। এবং অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া লেনদেন করারও অধিকারী নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আলোচ্য মাসআলাটি পূর্বে বর্ণিত সমতার শর্তের ফলাফল স্বরূপ। মাসআলার সারমর্ম হলো দু'জন স্বাধীন, প্রাপ্তবয়স্ক মুসলমানের মাঝে মুফাওয়াযা শুদ্ধ হবে। কারণ দু'জনের মাঝে সমতা আছে। যেহেতু দু'জনই স্বাধীন, দু'জনই প্রাপ্তবয়স্ক, দু'জনই মুসলমান। পক্ষান্তরে যদি একজন স্বাধীন অপরজন গোলাম হতো, কিংবা একজন প্রাপ্তবয়স্ক অপরজন অপ্রাপ্তবয়স্ক হতো, কিংবা একজন মুসলমান অপরজন অমুসলমান হতো, তাহলে তাদের মাঝে মুফাওয়াযা শুদ্ধ হতো না, সমতা না থাকার কারণে।

দু'জন স্বাধীন, প্রাপ্তবয়স্ক জিম্মির মাঝেও শিরকাতুল মুফাওয়াযা শুদ্ধ হবে। যেহেতু তাদের মাঝে সমতা রয়েছে। জিম্মিদের একজন যদি কিতাবী হয়, অপরজন মাজূসী হয়, তাহলেও তাদের মাঝে মুফাওয়াযা শুদ্ধ হবে। কারণ কিতাবী ও মাজূসী কাফের হিসাবে উভয়ই সমান। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন- اَلْكُفْرُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ সকল কাফের এক জাতি।

قَوْلُهُ : وَلَا يَجُوْزُ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْمَمْلُوْكِ الخ এ মাসআলাটি পূর্বোক্ত মাসআলার ন্যায় সমতার শর্তের ফলাফল স্বরূপ একটি মাসআলা। যার সার-সংক্ষেপ হলো। স্বাধীন ও দাসের মাঝে শিরকাতুল মুফাওয়াযা শুদ্ধ হবে না। কারণ স্বাধীন ও দাসের মাঝে সমতা নেই। কেননা স্বাধীন ব্যক্তি যেকোনো মু'আমালা করতে সক্ষম এবং অন্যের দায় গ্রহণ করতেও সক্ষম। পক্ষান্তরে দাস নিজ মনিবের অনুমতি ছাড়া লেনদেন ও দায় গ্রহণ কোনটিও করতে সক্ষম নয়।

অনুরূপভাবে প্রাপ্তবয়স্ক ও অপ্রাপ্ত বয়স্কের মাঝে মুফাওয়াযা শুদ্ধ নয়। সমতা না থাকার কারণে। কেননা প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি লেনদেন ও দায় গ্রহণ উভয় করার অধিকার রাখে। পক্ষান্তরে অপ্রাপ্ত বয়স্ক মোটেও দায় গ্রহণ করতে পারে না। অভিভাবক অনুমতি প্রদান করুক বা না করুক। আর অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া সে লেনদেনও করতে পারে না। মোটকথা এ দু'জনের মাঝেও সমতা না থাকার কারণে মুফাওয়াযা শুদ্ধ নয়।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ وَلَا بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ وَهٰذَا قَوْلُ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَمُحَمَّدٍ (رحـ). وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ (رحـ) يَجُوْزُ لِلتَّسَاوِيْ بَيْنَهُمَا فِي الْوَكَالَةِ وَالْكَفَالَةِ، وَلَا مُعْتَبَرَ بِزِيَادَةِ تَصَرُّفٍ يَمْلِكُهُ اَحَدُهُمَا كَالْمُفَاوَضَةِ بَيْنَ الشَّفْعَوِيِّ وَالْحَنَفِيِّ فَاِنَّهَا جَائِزَةٌ . وَيَتَفَاوَتَانِ فِي التَّصَرُّفِ فِيْ مَتْرُوْكِ التَّسْمِيَةِ، اِلَّا اَنَّهُ يُكْرَهُ لِاَنَّ الذِّمِّيَّ لَا يَهْتَدِيْ اِلَى الْجَائِزِ مِنَ الْعُقُوْدِ . وَلَهُمَا اَنَّهُ لَا تَسَاوِيْ فِي التَّصَرُّفِ، فَاِنَّ الذِّمِّيَّ لَوْ اِشْتَرٰى بِرَاْسِ الْمَالِ خُمُوْرًا اَوْ خَنَازِيْرَ صَحَّ، وَلَوْ اِشْتَرَاهَا مُسْلِمٌ لَا يَصِحُّ وَلَا يَجُوْزُ بَيْنَ الْعَبْدَيْنِ وَلَا بَيْنَ الصَّبِيَّيْنِ وَلَا بَيْنَ الْمُكَاتَبَيْنِ لِانْعِدَامِ صِحَّةِ الْكَفَالَةِ، وَفِيْ كُلِّ مَوْضِعٍ لَمْ تَصِحَّ الْمُفَاوَضَةُ لِفَقْدِ شَرْطِهَا، وَلَا يُشْتَرَطُ ذٰلِكَ فِي الْعِنَانِ كَانَ عِنَانًا لِاسْتِجْمَاعِ شَرَائِطِ الْعِنَانِ، اِذْ هُوَ قَدْ يَكُوْنُ خَاصًّا وَقَدْ يَكُوْنُ عَامًّا ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, **মুসলমান ও কাফেরের মাঝেও বৈধ হবে না।**

এটা হলো ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মত। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, বৈধ হবে। উকিল ও কাফীল হওয়ার ক্ষেত্রে তারা সমান হওয়ার কারণে। দু'জনের একজন, যে অতিরিক্ত ক্ষমতার অধিকারী তা বিবেচ্য হবে না। যেমন– শাফেয়ী মাযহাব ও হানাফী মাযহাবের অনুসারী দু'জনের মাঝে মুফাওয়াযা শুদ্ধ হয়। অথচ বিসমিল্লাহ বর্জিত পশুর মাঝে তসরুফ করার ক্ষেত্রে উভয়ের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। তবে তা মাকরূহ হবে। কেননা চুক্তির ক্ষেত্রে জিম্মি জায়েজ ও নাজায়েয সম্বন্ধে জ্ঞান রাখে না।

তরফাইনের দলিল এই যে, মু'আমালার ক্ষেত্রে উভয়ের মাঝে সমতা নেই।

কেননা জিম্মি যদি মূল পুঁজি দ্বারা মদ বা শূকর ক্রয় করে তাহলে তা বৈধ হয়। অথচ মুসলমান তা ক্রয় করলে বৈধ হয় না।

দুই দাসের মাঝে, দুই বালকের মাঝে, দুই মুকাতাবের মাঝে শিরকাতুল মুফাওয়াযা জায়েজ নয়। কেননা তাদের পক্ষে কাফীল হওয়া বৈধ নয়।

আর যে সকল ক্ষেত্রে শর্ত অবিদ্যমান হওয়ার কারণে শিরকাতুল মুফাওয়াযা বৈধ হয়নি, আর উক্ত শর্তটি শিরকাতুল ইনানে প্রযোজ্য নয়, সে সকল ক্ষেত্রে শিরকাতুল মুফাওয়াযা শিরকাতুল ইনানে রূপান্তরিত হবে। এই হিসাবে যে তাতে শিরকাতুল ইনানের যাবতীয় শর্ত বিদ্যমান রয়েছে। কারণ শিরকাতুল ইনান বিশেষ ক্ষেত্রেও হয় এবং কখনো সাধারণ ক্ষেত্রেও হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিউক্ত ইবারতে একটি ইখতেলাফী মাসআলা আলোচনা করা হয়েছে। মাসআলাটি হলো, মুসলমান ও কাফেরের মাঝে মুফাওয়াযা সহীহ হবে কি-না এ নিয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে।

ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর মতে মুসলমান ও কাফেরের মাঝে মুফাওয়াযা সহীহ হবে না।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, সহীহ হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল হলো, উকিল এবং কাফীল হওয়ার ক্ষেত্রে মুসলমান ও কাফেরের মাঝে সমতা রয়েছে। কেননা মুসলমান ও কাফের উভয়ই অন্যের উকিল হতে পারে। অন্যের কাফীলও হতে পারে। অতএব, উভয়ের মাঝে মুফাওয়াযা শুদ্ধ হবে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতের উপর প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে, কাফের ও মুসলমানের মাঝে সমতা নেই কারণ কাফের মদ, শূকর ইত্যাদি হারাম বস্তুর মধ্যে তসরুফ করতে পারে। কিন্তু মুসলমান তা পারে না।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর উত্তরে বলেন, এটি হলো তসরুফের অতিরিক্ত ক্ষমতা। এটি বিবেচ্য নয়। তিনি তার মতের পক্ষে একটি নজির পেশ করেন যে, শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী ও হানাফী মাযহাবের অনুসারী ব্যক্তির মাঝে মুফাওয়াযা শুদ্ধ আছে। অথচ তাদের একজন অতিরিক্ত তসরুফের ক্ষমতার অধিকারী। কেননা যে পশু জবাই করার সময় ইচ্ছাকৃতভাবে বিসমিল্লাহ না বলা হয়, সে পশু শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারীর নিকট হালাল, সে এতে তসরুফ করতে পারে। পক্ষান্তরে হানাফী মাযহাবের অনুসারীর নিকট এমন পশু হারাম। সে এতে তসরুফ করতে পারে না। তবুও তাদের দু'জনের মাঝে মুফাওয়াযা সহীহ হয়। এর দ্বারা বুঝা যায়, অতিরিক্ত তসরুফের ক্ষমতা বিবেচ্য নয়।

অতএব, শাফেয়ী ও হানাফী ব্যক্তিদ্বয়ের মাঝে যেমন মুফাওয়াযা সহীহ হয়। তেমনি মুসলমান ও কাফেরের মাঝেও মুফাওয়াযা সহীহ হবে। তাবে মুসলমান ও কাফেরের মধ্যকার মুফাওয়াযা মাকরূহ। কারণ কাফের অংশীদার জায়েজ নাজায়েজ বুঝে না। তাই সে অনেক সময় নাজায়েজ আকদ করে ফেলবে। এর ফলে মুসলমান ব্যক্তিও গুনাহগার হবে। হারামে লিপ্ত হবে। তাই এধরনের অংশীদারিত্ব মাকরূহ।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো, মুসলমান ও কাফেরের মাঝে তসরুফের ক্ষেত্রে সমতা নেই। কেননা জিম্মি কাফের যদি মূল পুঁজি ব্যয় করে মদ অথবা শূকর ক্রয় করে তাহলে তা শুদ্ধ হয়। আর যদি মুসলমান তা খরিদ করে তাহলে শুদ্ধ হয় না। অতএব, তাদের মাঝে তসরুফের সমতা না থাকার কারণে মুফাওয়াযা সহীহ হবে না।

قَوْلُهُ : وَلَا يَجُوزُ بَيْنَ الْعَبْدَيْنِ وَلَا بَيْنَ الصَّبِيَّيْنِ الخ : উপরিউক্ত ভাষ্যে দু'টি মাসআলা আলোচিত হয়েছে।

১. দু'জন দাস, কিংবা দু'জন মুকাতাব কিংবা দু'জন অপ্রাপ্তবয়স্ক অংশীদারের মাঝে মুফাওয়াযা শুদ্ধ নয়। কারণ শিরকাতে মুফাওয়াযার মধ্যে কাফালাত রয়েছে। অর্থাৎ দুই শরিকের প্রত্যেকে একে অপরের কাফীল হয়ে থাকে। অথচ উপরিউক্ত লোকজন কাফীল হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। বিধায় তাদের মাঝে মুফাওয়াযা সহীহ হবে না।

২. কোনো ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো শর্ত অনুপস্থিত হওয়ার কারণে যদি মুফাওয়াযা অশুদ্ধ হয়ে যায় এবং সে শর্তটি যদি শিরকাতে ইনানের জন্য শর্ত না হয়, তাহলে মুফাওয়াযা ইনানে পরিণত হবে। ধরে নিতে হবে মুফাওয়াযার শব্দ ব্যবহার করে ইনান সম্পাদন করা হয়েছে।

মুফাওয়াযা আম বা ব্যাপক। অর্থাৎ শিরকাতুল মুফাওয়াযা দু'অংশীদারের মাঝে তাদের সকল প্রকার লেনদেনের জন্য সম্পাদিত হয়। পক্ষান্তরে শিরকাতুল ইনান, এটা কখনো আম হয়, কখনো খাস হয়। অর্থাৎ সকল লেনদেনের জন্যও সম্পাদিত হয়, কখনো বিশেষ কোনো লেনদেনের জন্যও সম্পাদিত হয়। আর ভাষার এ নিয়ম রয়েছে যে, ব্যাপক শব্দ বলে বিশেষ অর্থ বুঝানো যায়। অতএব, মুফাওয়াযা বলে ইনান বুঝাতে অসুবিধা নেই।

অতএব, মুসলমান এবং জিম্মি ব্যক্তি যদি শিরকাতে মুফাওয়াযা করে, তাহলে তা শিরকাতে মুফাওয়াযা হবে। তাদের মাঝে সমতার শর্ত অনুপস্থিত থাকার কারণে। কিন্তু তা শিরকাতুল ইনান হবে। কেননা শিরকাতুল ইনানের জন্য সমতার শর্ত নেই। যেন তারা মুফাওয়াযা বলে ইনান সম্পাদন করেছে।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ وَتَنْعَقِدُ عَلَى الْوَكَالَةِ وَالْكَفَالَةِ اَمَّا الْوَكَالَةُ فَلِتَحَقُّقِ الْمَقْصُوْدِ وَهُوَ الشَّرْكَةُ فِي الْمَالِ عَلٰى مَا بَيَّنَّاهُ، وَاَمَّا الْكَفَالَةُ : فَلِتَحَقُّقِ الْمُسَاوَاةِ فِيْمَا هُوَ مِنْ مُوَاجِبِ التِّجَارَاتِ وَهُوَ تَوَجُّهُ الْمُطَالَبَةِ نَحْوَهُمَا جَمِيْعًا . قَالَ وَمَا يَشْتَرِيْهِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَكُوْنُ عَلَى الشَّرْكَةِ اِلَّا طَعَامَ اَهْلِهِ وَكِسْوَتَهُمْ وَكَذَا كِسْوَتُهُ، وَكَذَا الْاِدَامُ لِاَنَّ مُقْتَضَى الْعَقْدِ الْمُسَاوَاةُ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَائِمٌ مَقَامَ صَاحِبِهِ فِي التَّصَرُّفِ، وَكَانَ شِرَاءُ اَحَدِهِمَا كَشِرَائِهِمَا، اِلَّا مَا اسْتَثْنَاهُ فِي الْكِتَابِ، وَهُوَ اِسْتِحْسَانٌ لِاَنَّهُ مُسْتَثْنًى عَنِ الْمُفَاوَضَةِ لِلضَّرُوْرَةِ، فَاِنَّ الْحَاجَةَ الرَّاتِبَةَ مَعْلُوْمَةُ الْوُقُوْعِ، وَلَا يُمْكِنُ اِيجَابُهُ عَلٰى صَاحِبِهِ وَلَا الصَرفُ مِنْ مَالِهِ، وَلَا بُدَّ مِنَ الشِّرَاءِ فَيَخْتَصُّ بِهِ ضَرُوْرَةً . وَالْقِيَاسُ اَنْ يَكُوْنَ عَلَى الشَّرْكَةِ لِمَا بَيَّنَّا وَلِلْبَائِعِ اَنْ يَاْخُذَ بِالثَّمَنِ اَيُّهُمَا شَاءَ الْمُشْتَرِي بِالْاَصَالَةِ وَصَاحِبُهُ بِالْكَفَالَةِ، وَيَرْجِعُ الْكَفِيْلُ عَلَى الْمُشْتَرِيْ بِحِصَّتِهِ مِمَّا اَدّٰى لِاَنَّهُ قَضٰى دَيْنًا عَلَيْهِ مِنْ مَالٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُمَا .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, **শিরকাতুল মুফাওয়াযা উকিল ও কাফীল হওয়ার ব্যাপারে সংঘটিত হয়।**

উকিল হওয়ার ব্যাপারটি এজন্য যে, তাতে উদ্দেশ্য সাধিত হবে। আর তা হলো সম্পদের অংশীদারিত্ব। যেমন– আমরা বর্ণনা করে এসেছি।

আর কাফীল হওয়ার ব্যাপারটি এজন্য, যাতে ব্যবসা-বাণিজ্যের অপরিহার্য বিষয়গুলোর মাঝে সমতা সাব্যস্ত হয়। আর তা হলো দায় ও তাগাদা উভয়ের উপর আরোপিত হওয়া।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, **উভয়ের প্রত্যেকে যা কিছু ক্রয় করবে, তা অংশীদারি মূলক হবে, পরিবার-পরিজনের জন্য ক্রয়কৃত খাদ্য ও বস্ত্র ছাড়া।** তদ্রূপ তার নিজের পরিধেয় ছাড়া। তদ্রূপ তরকারি ইত্যাদি।

কেননা চুক্তির দাবি হচ্ছে সমতা। আর লেনদেনের ব্যাপারে উভয়ের প্রত্যেকে অপরজনের স্থলবর্তী। সুতরাং তাদের একজনের খরিদ করা উভয়ের খরিদ করার সমার্থক হবে। তবে কিতাবে যেগুলোকে ব্যতিক্রম করা হয়েছে সেগুলো ছাড়া।

এ হলো সূক্ষ্ম কিয়াসের দাবি। কেননা প্রয়োজনের তাগিদে এগুলোকে শিরকাতুল মুফাওয়াযা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। কারণ ধারাবাহিক প্রয়োজন সংঘটিত হওয়া তো জানাই আছে।

আর সেগুলো তার অংশীদারের উপর আরোপ করা এবং তার মাল থেকে খরচ করা সম্ভব নয়। অথচ খরিদ করা ছাড়াও উপায় নেই। সুতরাং প্রয়োজনের তাগিদে এটি তার জন্য বিশিষ্ট থাকবে। যদিও আমাদের বর্ণিত কারণে কিয়াসের দাবি হলো এটাও অংশীদারিমূলক হওয়া।

আর মূল্য উত্তলের ব্যাপারে বিক্রেতা উভয়ের যে কারো কাছে তাগাদা করতে পারবে। ক্রেতার কাছে তো মৌলিক সূত্রে, আর শরিকদারের কাছে কাফালাত সূত্রে। অবশ্য কাফীল যে পরিমাণ আদায় করেছে তার থেকে নিজের অংশ ক্রেতার কাছ থেকে ফেরত নিবে।

কেননা সে উভয়ের শরিকানা মাল থেকে ক্রেতার উপর সাব্যস্ত ঋণ শোধ করেছে।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরকাতুল মুফাওয়াযা ওকালাত এবং কাফালতের উপর সম্পাদিত হয়। অর্থাৎ যখন দু'জন অংশীদারের মাঝে শিরকাতুল মুফাওয়াযা সম্পাদিত হয়, তখন তারা একজন অপর জনের উকিল ও কাফীল হয়ে যায়।

একজন অপর জনের উকিল হওয়ার প্রয়োজন এজন্য যে, কোনো অংশীদার যখন কোনো লেনদেন করে মুনাফা লাভ করবে, তখন যেন সেই মুনাফাটা উভয়ের মাঝে অংশীদারিত্বমূলক হয়। অর্থাৎ একজন কোনো লেনদেন করলে সেটা উভয়কে শরিক করেছে বলে গণ্য হবে। ফলে এ লেনদেন দ্বারা যা অর্জন হবে, তাও উভয়ের হবে। এ হলো একজন অপরজনের উকিল হওয়ার উপকারিতা।

একজন অপরজনের উকিল হওয়ার প্রয়োজনীয়তা এজন্য যে, কোনো লেনদেনের কারণে যে দায় সাব্যস্ত হবে, তা যেন উভয়ের উপর বর্তায়। যেমন– দুই শরিকের কোনো এক শরিক যদি কোনো মুআমালার কারণে এক হাজার টাকার দায়গ্রস্ত হয়, তাহলে উক্ত উভয় শরিকের উপর বর্তাবে। পাওনাদার ব্যক্তি এই এক হাজার টাকার জন্য উভয় শরিককে তাগাদা করতে পারবে।

মোটকথা, শিরকাতুল মুফাওয়াযার চুক্তি ওকালাত ও কাফালতকে অন্তর্ভুক্ত করে। উদ্দেশ্য হলো, প্রত্যেক অংশীদার কর্তৃক সম্পাদিত লেনদেনের মুনাফা ও দায় উভয় অংশীদারের মাঝে যৌথ করা বা অংশীদারমূলক করা।

قَوْلُهُ : وَمَا يَشْتَرِيهِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَكُونُ الخ : শরিকদের কোনো কোনো তসরুফ মুফাওয়াযা -এর অন্তর্ভুক্ত হবে আর কোনোটি হবে না, এ সম্পর্কে উপরিউক্ত ইবারতে আলোকপাত করা হয়েছে। যার সারনির্যাস এই যে, মুফাওয়াযার দাবি হলো সমতা। অর্থাৎ সকল লেনদেনের মধ্যে উভয় শরিক সমান হওয়া। এ হিসাবে উভয় শরিকের সকল লেনদেন উভয়ের মাঝে অংশীদারিত্বমূলক হওয়া যুক্তির দাবি। কিন্তু কিছু লেনদেন আছে উভয়ের একান্ত ব্যক্তিগত। যেগুলোকে অপরের উপর চাপানো সম্ভব নয় এবং সেগুলোতে অপরের অর্থ খরচ করাও বৈধ নয়। যেমন– নিজের ও পরিবারের খাদ্য সামগ্রী, বস্ত্র সামগ্রী, চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যয় ইত্যাদি। অর্থ এগুলো প্রত্যেক শরিকের জন্য অপরিহার্য। তাই ইস্তিহসান তথা সূক্ষ্ম কিয়াসের দাবি অনুসারে এসকল লেনদেন মুফাওয়াযা চুক্তির বাইরে গণ্য করা হয়েছে।

অতএব, যাদের পরস্পর শিরকাতুল মুফাওয়াযা সম্পাদিত হয়েছে, তারা যা কিছু খরিদ করবে, সবই উভয় শরিকের মাঝে অংশীদারিত্বমূলক হবে। তবে একান্ত ব্যক্তিগত প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী, খরিদকারী ব্যক্তির জন্য বিশিষ্ট থাকবে। যেমন– নিজের ও পরিজনের খাবার, বস্ত্র ও ঔষধ ইত্যাদি।

قَوْلُهُ : وَلِلْبَائِعِ اَنْ يَأْخُذَ بِالثَّمَنِ اَيُّهُمَا شَاءَ الخ : উপরিউক্ত মাসআলার সারমর্ম হলো, কোনো অংশীদার যদি নিজের জন্য খাদ্য, বস্ত্র ইত্যাদি কারো থেকে খরিদ করে, তাহলে বিক্রেতার বিক্রীত পণ্যের মূল্য খরিদকারী শরিকের কাছ থেকে যেমন উশুল করতে পারবে, তেমনি তার শরিকের কাছ থেকেও উশুল করতে পারবে। খরিদকারীর কাছ থেকে উশুল করতে পারবে, যেহেতু সে-ই আসল লেনদেনকারী। আর শরিকের কাছে থেকে উশুল করতে পারবে এ কারণে যে, সে খরিদকারীর কাফীল।

তবে কাফীল যে পরিমাণ মূল্য পরিশোধ করবে, তার থেকে নিজের অংশ পরিমাণ মূল্য খরিদকারীর কাছ থেকে ফেরত নিয়ে নিবে। যেমন– একজন শরিক একশত টাকার বিনিময়ে খাদ্য খরিদ করল। এরপর এ টাকা অপর শরিক পরিশোধ করল। এমতাবস্থায় সে পঞ্চাশ টাকা খরিদকারীর নিকট থেকে ফেরত নিবে।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ وَمَا يَلْزَمُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ الدُّيُوْنِ بَدَلًا عَمَّا يَصِحُّ فِيْهِ الْاِشْتِرَاكُ فَالْاٰخَرُ ضَامِنٌ لَهُ تَحْقِيْقًا لِلْمُسَاوَاةِ. فَمِمَّا يَصِحُّ فِيْهِ الْاِشْتِرَاكُ الشِّرَاءُ وَالْبَيْعُ وَالْاِسْتِئْجَارُ، وَمِنَ الْقِسْمِ الْاٰخَرِ الْجِنَايَةُ وَالنِّكَاحُ وَالْخُلْعُ وَالصُّلْحُ عَنْ دَمِ الْعَمَدِ وَعَنِ النَّفَقَةِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যে সকল ক্ষেত্রে অংশীদারিত্ব বৈধ তার বিনিময়ে যে ঋণ উভয়ের যে কোনো একজনের উপর আরোপিত হবে, অপরজন তার জামিনদার হবে। যেন সমতা সাব্যস্ত হয়। আর যে সকল ক্ষেত্রে অংশীদারিত্ব বৈধ হয় সেগুলো হচ্ছে ক্রয় বিক্রয় ও ভাড়া নেওয়া।

আর এর বিপরীত প্রকার হলো (যেগুলোতে অংশীদারিত্ব বৈধ নয়) কৃত অপরাধের ক্ষতিপূরণ, বিবাহ ও খোলা, ইচ্ছাকৃত হত্যার দণ্ডের কারণে এবং বাধ্যতাও মূলক ভরণ-পোষণের সমঝোতা রূপে সাব্যস্ত মাল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিউক্ত ইবারতে বর্ণিত মাসআলার মূল কথা হলো, শিরকাতের আওতায় পড়ে এরূপ লেনদেনের কারণে এক অংশীদারের উপর ঋণ আরোপিত হলে অপর অংশীদার তার জামিন হবে। পক্ষান্তরে শিরকাতের আওতায় পড়ে না, এমন কোনো কারণে কোনো অংশীদারের উপর কোনো দায় আরোপিত হলে অপর অংশীদার তার জামিন হবে না।

بَيْعٌ صَحِيْحٌ তথা বিশুদ্ধ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রেতা-বিক্রেতার মাঝে নির্ধারিত মূল্যের জামিন হবে। অর্থাৎ কোনো এক শরিক বিশুদ্ধ ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে যদি কোনো পণ্য খরিদ করে তাহলে ক্রয়ের সময় ক্রেতা-বিক্রেতার মাঝে যে মূল্য নির্ধারিত হয়েছে অপর শরিক সেই মূল্যের জামিন হবে।

আর بَيْعٌ فَاسِدٌ তথা অশুদ্ধ ক্রয় বিক্রয়ের মাধ্যমে যদি কোনো শরিক কিছু খরিদ করে, তাহলে অপর শরিক উক্ত পণ্যের বাজারমূল্যের জামিন। অর্থাৎ পণ্যটির বাজারে যে মূল্য রয়েছে সে মূল্যের জামিন হবে।

কোনো অংশীদার যদি ব্যবসায়িক কাজের জন্য কোনো শ্রমিক নিয়োগ করে। কিংবা কোনো বাড়ি-গাড়ি, জীব-জন্তু ইত্যাদি ভাড়া করে, তাহলে এসব কিছুর ভাড়ার দায় অপর শরিকের উপরও বর্তাবে। ইজারাদার ব্যক্তি তার পাওনা উভয় শরিকের নিকট থেকে উসুল করতে পারবে। কারণ উভয় শরিক একজন অপরজনের কাফীল। কিন্তু শিরকাতের আওতায় আসেনা এরূপ কোনো কারণে কোনো শরিকের উপর কোনো দায় সাব্যস্ত হলে, এটা তার মধ্যে সীমিত থাকবে। অপর শরিক উক্ত দায়ের জামিন হবে না। যেমন– কোনো এক শরিকের বিরুদ্ধে কেউ এমন দাবি উত্থাপন করল যে, সে আমাকে ভুলবশত আঘাত করে আহত করেছে এবং এর জন্য তাকে নির্ধারিত পরিমাণ অর্থদণ্ড দিতে হবে। অতঃপর এ বিষয়ে সে বিবাদী (অভিযুক্ত অংশীদার) এর কাছে কসম তলব করল। সে বিবাদী কসম করল। এরপর যদি বাদী লোকটি বিবাদীর অংশীদার ব্যক্তির কাছেও কসম তলব করতে চায়, তাহলে সে তা পারবে না। অর্থাৎ এ বিষয়ে কসম করা অপর শরিকের উপর আবশ্যক হবে না। কেননা আলোচ্য ক্ষেত্রে এক শরিকের উপর যে দায় বা অর্থদণ্ড আরোপিত হয়েছে, তা কোনো ব্যবসায়িক কারণে নয়। বরং তা হয়েছে ব্যক্তিগত অপরাধের কারণে। অতএব, এ সংক্রান্ত যাবতীয় দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট শরিকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। অপর শরিক পর্যন্ত তা গড়াবে না।

যদি কোনো পুরুষ ও স্ত্রী লোক পরস্পরে শিরকাতুল মুফাওয়াযার চুক্তিতে আবদ্ধ হয়, এরপর যদি স্ত্রী লোকটি নিজ স্বামীর সাথে খোলা করে, তাহলে খোলার বিনিময় স্বরূপ স্ত্রী লোকটির উপর যে অর্থ বা ঋণ সাব্যস্ত হবে, তা সে নিজেই পরিশোধ করবে। তার সাথে অংশীদার পুরুষ ব্যক্তি এ দায় বহন করবে না। কারণ এ দায় কোনো ব্যবসায়িক কারণে সাব্যস্ত হয় নি। বরং তা সাব্যস্ত হয়েছে এক শরিকের ব্যক্তিগত বৈবাহিক কারণে। অতএব, সেটা তার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

অনুরূপভাবে পুরুষ অংশীদারের উপর যদি তার স্ত্রীর মোহরানা বাবদ কোনো ঋণ আরোপিত হয়, তাহলে তা সে নিজেই পরিশোধ করবে। অপর অংশীদার স্ত্রীলোক এ ঋণের জামিন হবে না।

কোনো অংশীদার যদি ইচ্ছাকৃতভাবে কাউকে হত্যা করে, অতঃপর নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের সাথে অর্থের বিনিময়ে সন্ধি স্থাপন করে, তাহলে এই অর্থ সে নিজেই পরিশোধ করবে। অপর অংশীদার এর জামিন হবে না। কারণ এটা কোনো বাণিজ্যিক কারণে আবশ্যক হয় নি।

তদ্রূপ যদি কোনো অংশীদার নিজের স্ত্রীর সাথে এ মর্মে সন্ধি করে যে, সে তাকে ভরণ-পোষণ দিবে না, বরং এককালীন কিছু অর্থ সম্পদ দিয়ে দিবে। তাহলে এ অর্থ সে নিজেই পরিশোধ করবে। তার অংশীদার এ অর্থের দায় বহন করবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ وَلَوْ كَفَلَ اَحَدُهُمَا بِمَالٍ عَنْ اَجْنَبِيٍّ لَزِمَ صَاحِبَهُ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ، وَقَالَا : لَا يَلْزَمُهُ لِاَنَّهُ تَبَرُّعٌ، وَلِهٰذَا لَا يَصِحُّ مِنَ الصَّبِيِّ وَالْعَبْدِ الْمَاذُوْنِ وَالْمُكَاتَبِ، وَلَوْ صَدَرَ مِنَ الْمَرِيْضِ يَصِحُّ مِنَ الثُّلُثِ وَصَارَ كَالْاِقْرَاضِ وَالْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ. وَلِاَبِيْ حَنِيْفَةَ اَنَّهُ تَبَرُّعٌ اِبْتِدَاءً وَمُعَاوَضَةٌ بَقَاءً لِاَنَّهُ يَسْتَوْجِبُ الضَّمَانَ بِمَا يُؤَدِّيْ عَلَى الْمَكْفُوْلِ عَنْهُ اِذَا كَانَتِ الْكَفَالَةُ بِأَمْرِهِ. فَبِالنَّظَرِ اِلَى الْبَقَاءِ يَتَضَمَّنُهُ الْمُفَاوَضَةُ، وَبِالنَّظَرِ اِلَى الْاِبْتِدَاءِ لَمْ تَصِحَّ مِمَّنْ ذَكَرَهُ وَتَصِحُّ مِنَ الثُّلُثِ مِنَ الْمَرِيْضِ، بِخِلَافِ الْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ لِاَنَّهُ تَبَرُّعٌ اِبْتِدَاءً وَاِنْتِهَاءً . وَاَمَّا الْاِقْرَاضُ فَعَنْ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) اَنَّهُ يَلْزَمُ صَاحِبَهُ، وَلَوْ سَلِمَ فَهُوَ اِعَارَةٌ فَيَكُوْنُ لِمِثْلِهَا حُكْمُ عَيْنِهَا لَا حُكْمُ الْبَدَلِ حَتّٰى لَا يَصِحَّ فِيْهِ الْاَجَلُ فَلَا يَتَحَقَّقُ مُعَاوَضَةٌ، وَلَوْ كَانَتِ الْكَفَالَةُ بِغَيْرِ اَمْرِهِ لَمْ تَلْزَمْ صَاحِبَهُ فِي الصَّحِيْحِ لِاِنْعِدَامِ مَعْنَى الْمُفَاوَضَةِ . وَمُطْلَقُ الْجَوَابِ فِي الْكِتَابِ مَحْمُوْلٌ عَلَى الْمُقَيَّدِ، وَضَمَانُ الْغَصْبِ وَالْاِسْتِهْلَاكِ بِمَنْزِلَةِ الْكَفَالَةِ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) لِاَنَّهُ مُعَاوَضَةٌ اِنْتِهَاءً .

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, দু'জনের একজন যদি তৃতীয় কারো পক্ষ থেকে কাফীল হয় (অর্থাৎ ঋণের দায় গ্রহণ করে।) তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মতে শরিকদারের উপরও তা আরোপিত হবে।

সাহেবাইন বলেন, তার উপর আরোপিত হবে না। কেননা তা হলো স্বেচ্ছাদান।

একারণেই বালকের পক্ষ থেকে, অনুমতিপ্রাপ্ত গোলামের পক্ষ থেকে এবং মুকাতাবের পক্ষ হতে কাফালাত (দায় গ্রহণ) বৈধ নয়। এবং মৃত্যু শয্যায় শায়িত ব্যক্তির পক্ষ হতে দায় গ্রহণ সংঘটিত হলে সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ থেকেই তা বৈধ হবে। সুতরাং তা ঋণদান এবং কারো জানের বদলে দায় গ্রহণের মতো হলো।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর দলিল এই যে, প্রাথমিকভাবে তা হলো স্বেচ্ছাদান এবং পরবর্তীতে তা বিনিময়।

কেননা কাফীল (বা দায় গ্রহণকারী) যা আদায় করবে তার ক্ষতিপূরণ ঐ ব্যক্তির উপর অবশ্য সাব্যস্ত হবে যার পক্ষ হতে আদায় করা হয়েছে যদি তার অনুমতিক্রমে আদায় করা হয়ে থাকে।

সুতরাং পরবর্তী অবস্থার দিকে লক্ষ্য করে তা শিরকাতুল মুফাওয়াযার অন্তর্ভুক্ত হবে।

পক্ষান্তরে প্রাথমিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করে তা পূর্বোল্লিখিত ব্যক্তিদের পক্ষ হতে বৈধ হয় না। আর মৃত্যুশয্যায় শায়িত ব্যক্তির ক্ষেত্রে এক তৃতীয়াংশ সম্পত্তি থেকে বৈধ হয়।

জানের বদলে কাফালতের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা এটা প্রাথমিক ও পরবর্তী উভয় পর্বেই হচ্ছে স্বেচ্ছাকৃত।

ঋণ দান সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে প্রাপ্ত একটি বর্ণনায় শরিকদারের উপরও তা আরোপিত হবে। যদি আরোপিত না হওয়ার বর্ণনা মেনে নেওয়া হয়, তাহলে পার্থক্যের কারণ এই যে, তা হলো আরিয়াত বা ঋণ দান। সুতরাং সদৃশ বস্তুটির উপর মূল বস্তুর বিধান আরোপিত হবে, বিনিময়ের বিধান আরোপিত হবে না। একারণেই তাতে মেয়াদ নির্ধারণ বৈধ নয়। সুতরাং বিনিময় আদান-প্রদান সাব্যস্ত হবে না। আর যদি দায় গ্রহণ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অনুমতি ছাড়া হয়ে থাকে, তাহলে বিশুদ্ধমতে শরিকদারের উপর তা আরোপিত হবে না। কারণ এতে মুফাওয়াযার গুণ বিদ্যমান নেই। আর জামেসাগীর কিতাবে বর্ণিত নিঃশর্ত বিধানটি শর্ত সাপেক্ষে প্রযোজ্য

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে গসব এবং ধ্বংস করে ফেলার ক্ষতিপূরণের বিষয়টি কাফালাতের পর্যায়ভুক্ত হবে। কেননা পরিণতি পর্বে এ দুটোও বিনিময় লেনদেনের নামান্তর।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিউক্ত ইবারতে একটি মতভেদপূর্ণ মাসআলা আলোচনা করা হয়েছে। যার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপঃ শিরকাতুল মুফাওয়াযার চুক্তিতে পরস্পরে চুক্তিবদ্ধ এরূপ শরিকদ্বয়ের কোনো একজন যদি অন্য কোনো লোকের كَفَالَة بِالنَّفْس গ্রহণ করে তথা অন্য জনের কাফীল হয়, তাহলে এই কাফালাত অপর শরিকের উপরে বর্তাবে না। এ ব্যাপারে সকল ইমাম একমত।

তদ্রূপ যদি কোনো শরিক অন্যের মালের কাফীল হয় তার অনুমতি ছাড়া, তাহলেও সেই কাফালাত অপর শরিকের উপর বর্তাবে না। এটিও সর্বসম্মত।

পক্ষান্তরে যদি এক শরিক مَكْفُوْل عَنْهُ (যার কাফালাত গ্রহণ করা হয়েছে) এর অনুমতিক্রমে কাফালাত গ্রহণ করে তাহলে এ কাফালাত অপর শরিকের উপর বর্তাবে কি-না এ নিয়ে আহনাফের মাঝে মতভেদ রয়েছে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে এক শরিকের গ্রহণকৃত কাফালাত অন্য শরিকের উপর বর্তাবে।

সাহেবাইন (র.) বলেন, অপর শরিকের উপর বর্তাবে না।

দলিল পর্ব : সাহেবাইনের দলিল হলো, কাফালাত হলো একটি স্বেচ্ছাদান। অর্থাৎ কাফালাত গ্রহণকারী নিজ ইচ্ছায় মাকফূল আনহুকে যেন কিছু অর্থ বা সম্পদ দান করে। অতএব, এটা তার নিজের মধ্যেই সীমিত থাকবে। অপর শরিকের উপর বর্তাবে না। কাফালাতের বিষয়টি স্বেচ্ছাদান হওয়ার ব্যাপারে প্রমাণ হলো এই যে, শিশু, অনুমতিপ্রাপ্ত গোলাম ও মুকাতাব গোলামের কাফালাত সহীহ হয় না। কারণ এরা স্বেচ্ছাদানের উপযুক্ত নয়।

আরো প্রমাণ হলো, কোনো অন্তিম রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি যদি কাফালাত গ্রহণ করে, তাহলে তা তার সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ হতে কার্যকর হয়। কারণ এটা তাবাররু বা স্বেচ্ছাদান, আর অন্তিম রোগীর স্বেচ্ছাদান তার পূর্ণ সম্পদ হতে কার্যকর হয় না। বরং এক তৃতীয়াংশ হতেই কার্যকর হয়ে থাকে। তাই কাফালাতও এক তৃতীয়াংশ হতে কার্যকর হয়।

গ্রন্থকার কাফালাত বিলমাল তথা সম্পদের কাফালাত গ্রহণের বিষয়টিকে ঋণদান এবং কাফালাত বিননাফস তথা জানের কাফালাত গ্রহণের সাথে তুলনা করেছেন। এর দ্বারা তিনি বুঝাতে চেয়েছেন। সাহেবাইনের মতে কাফালাত বিলমাল হলো ঋণদানের মতো। অর্থাৎ কোনো শরিক যদি কাউকে অর্থ ঋণ দেয়, তাহলে এই ঋণ তার মধ্যেই সীমিত থাকে। অপর শরিকের উপর বর্তায় না। তেমনি কাফালাতও কাফালাত গ্রহণকারী শরিকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। অপর শরিকের উপর বর্তাবে না।

তদ্রূপ কোনো শরিক যদি কারো কাফালাত বিন্ নাফস গ্রহণ করে, তাহলেও সেই কাফালাত শুধু গ্রহণকারীর মধ্যে সীমিত থাকে। অপর শরিকের উপর বর্তায় না। অতএব, কাফালাত বিলমালও অপর শরিকের উপর বর্তাবে না। গ্রহণকারীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর দলিল : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর সার-সংক্ষেপ হলো, কাফালাতের দু'টি অবস্থা বা পর্যায় রয়েছে। প্রাথমিক অবস্থা ও পরবর্তী অবস্থা। প্রাথমিক অবস্থায় কাফালাত একটি স্বেচ্ছাদান কিন্তু পরবর্তী অবস্থায় সেটি আর স্বেচ্ছাদান থাকে না। বরং পরবর্তী অবস্থায় সেটি এক প্রকার বিনিময়।

কাফালাত যে পরবর্তী অবস্থায় এক প্রকার বিনিময়ে পরিণত হয় এর প্রমাণ হলো, কাফীল ব্যক্তি কাফালাত বাবদ যে অর্থ পরিশোধ করে, সে পরিমাণ অর্থ পুনরায় সে মাকফূল আনহু (যার কাফালাত গ্রহণ করা হয়েছে) এর কাছ থেকে উসুল করে থাকে। তাই এটা বিনিময়। যদি এটা দান হতো, তাহলে কাফালাত বাবদ পরিশোধকৃত অর্থ সে আর ফেরত পেত না। অতঃপর পরবর্তী অবস্থার দিকে লক্ষ্য করে কাফালাত যেহেতু বিনিময় সাব্যস্ত হলো, সেহেতু তা শিরকাতুল মুফাওয়াযার অওতাভুক্ত হবে। কাফালাত বাবদ এক শরিকের উপর যে দায় আরোপিত হয়, তা অপর শরিকের উপরও বর্তাবে।

মোটকথা ইমাম আবূ হানীফা (র.) অপর শরিকের উপর দায় বর্তানোর ক্ষেত্রে কাফালাতের পরবর্তী অবস্থার বিবেচনা করেছেন। প্রাথমিক অবস্থা বিবেচনা করেন নি। কারণ অপর শরিকের উপর কাফালাতের দায় বর্তানোর ব্যাপারটি পরবর্তী অবস্থায়ও দরকার হয়। প্রাথমিক অবস্থায় এর দরকার হয় না। কেননা প্রাথমিক অবস্থায় এক শরিকের গ্রহণ করা দ্বারা তা সাব্যস্ত হয়ে যায়। সাব্যস্ত হওয়ার পর যখন উক্ত শরিকের উপর অর্থ পরিশোধের তাগাদা আসে, তখনই তা অন্য শরিকের উপর বর্তানোর প্রয়োজন দেখা দেয়। বিধায় ইমাম আবূ হানীফা (র.) এ ক্ষেত্রে কাফালাতের পরবর্তী অবস্থাটি বিবেচনা করেছেন।

পক্ষান্তরে শিশু, অনুমতিপ্রাপ্ত ও মুকাতাব গোলামের ক্ষেত্রে কাফালাতের প্রাথমিক অবস্থা বিবেচনা করেছেন। কারণ কাফালাত গ্রহণ শুদ্ধ বা অশুদ্ধ হওয়ার বিষয়টির প্রয়োজনীয়তা প্রথমেই দেখা দেয়। তাই সে ক্ষেত্রে তিনি প্রাথমিক অবস্থার দিকে লক্ষ্য করে বলেছেন। শিশু, অনুমতিপ্রাপ্ত দাস ও মুকাতাবের পক্ষে কাফালাত গ্রহণ শুদ্ধ নয়। যেহেতু প্রাথমিক অবস্থায় কাফালাত একটি স্বেচ্ছাদান। আর এরা স্বেচ্ছাদানের অধিকার রাখে না।

https://e-ilm.weebly.com/

অনুরূপভাবে অন্তিম রোগীর কাফালাত গ্রহণের ক্ষেত্রেও কাফালাতের প্রাথমাবস্থা বিবেচনা করা হয়েছে। তাই তা পূর্ণ সম্পদ হতে কার্যকর হয় না। এর তৃতীয়াংশ সম্পদ হতে কার্যকর হয়। যেমন– অন্তিম রোগীর সাধারণ দান এক তৃতীয়াংশ সম্পদ হতে কার্যকর হয়ে থাকে।

সাহেবাইনের কিয়াসের জবাব : সাহেবাইন (র.) কাফালাত বিলমাল কে কাফালাত বিননাফস ও ঋণদানের সাথে কিয়াস বা তুলনা করেছিলেন।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর পক্ষ হতে এর জবাবে বলা হয় কাফালাত বিলমাল কে কাফালাত বিননাফসের সাথে তুলনা করা সঠিক নয়। কারণ দু'টি বিষয় একরকম নয়। বরং দু'ইয়ের মাঝে বিশেষ পার্থক্য রয়েছে। পার্থক্যটি এই যে, কাফালাত বিলমাল প্রাথমিক অবস্থায় স্বেচ্ছাদান। আর পরবর্তী অবস্থায় বিনিময়। পক্ষান্তরে কাফালাত বিননাফস প্রাথমিক ও পরবর্তী উভয় অবস্থায় সেটি স্বেচ্ছাদান। অতএব, এরূপ পার্থক্যপূর্ণ দু'টি বিষয়ের একটিকে অপরটির উপর কিয়াস করা যথার্থ নয়।

সাহেবাইন (র.) কাফালাত বিলমালকে ঋণদানের সাথেও কিয়াস করেছিলেন। তারা বলেছিল, এক শরিক যদি কাউকে ঋণ দেয়, তাহলে তা যেমন অপর শরিকের উপর বর্তায় না, তেমিন কাফালাতও অন্য শরিকের উপর বর্তাবে না।

এর জবাব হলো এই যে, প্রথমত একথাটিই স্বীকৃত নয় যে, কোনো শরিক কাউকে ঋণ দান করলে তা অপর শরিকের উপর বর্তায় না। বরং হাসান ইবনে যিয়াদের সূত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র.) হতে এটাই বর্ণিত আছে যে, এক শরিক যদি কাউকে ঋণ দেয়, তাহলে তা অন্য শরিকের উপরেও বর্তাবে।

আর যদি মেনেও নেওয়া হয় যে, এক শরিক কাউকে ঋণদান করলে তা অপর শরিকের উপর বর্তায় না, তাহলেও কাফালাত কে এর উপর কিয়াস করা শুদ্ধ হবে না। কারণ কাফালাত ও ঋণদানের মাঝে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

কেননা পরবর্তী অবস্থার বিবেচনায় কাফালাত একটি বিনিময়। পক্ষান্তরে ঋণদান কোনো বিনিময় নয়। বরং তা اعارة ই'আরা। কেননা যদি সেটা ই'আরা না হয়ে বিনিময় হতো, তাহলে সেটা সুদের সম্ভাবনাময় সম্পদের মধ্যে মেয়াদি রূপে সংঘটিত হওয়ার কারণে অবৈধ হতো। অর্থাৎ ঋণদানের মর্ম হলো (উদাহরণ স্বরূপ) আব্দুর রহীম আজ আব্দুর রহমান কে পাঁচ হাজার টাকা দিল। আব্দুর রহমান এ টাকা একমাস বা যে কোনো নির্দিষ্ট সময় পরে আব্দুর রহীমের কাছে ফিরিয়ে দিবে।

লক্ষণীয় যে, লেনদেনটি টাকার মধ্যে হচ্ছে। যা কিনা اموال ربوية তথা সুদের সম্ভাবনাপূর্ণ সম্পদ। পাশাপাশি তা মেয়াদি রূপে অর্থাৎ বাকিতে সম্পাদিত হচ্ছে। এমতাবস্থায় যদি একে مُعَاوَضَة বা বিনিময় বলে আখ্যায়িত করা হয় তাহলে অবশ্যই তা অবৈধ হওয়া উচিত। কিন্তু একথা কেউ বলেন নি। বরং সকল ইমাম এ ব্যাপারে একমত যে, ঋণদান করা বৈধ। অতএব, আমরা একথাই বলতে বাধ্য যে, ঋণদান কোনো مُعَاوَضَة বা বিনিময় নয়। বরং তা ই'আরাহ। একারণেই ঋণ দানের উপর ই'আরার বিধানসমূহ কার্যকর হয়, مُعَاوَضَة বা বিনিময়ের বিধান কার্যকর হয় না। যেমন– ঋণ দেওয়ার সময় যদি পরিশোধের সময় নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। তাহলে সে সময় মেনে চলা অপরিহার্য হয় না।

মোটকথা এটা প্রমাণিত হলো যে, اقراض তথা ঋণদান একটি ই'আরাহ, বিনিময় নয়। অতএব, এর উপর কাফালাতকে কিয়াস করা যাবে না। কারণ কাফালাত পরবর্তী অবস্থার বিবেচনায় এক প্রকার বিনিময়।

আলোচনার শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছিল যে, এক শরিকের গ্রহণকৃত কাফালাতটি যদি মাকফূল আনহুর অনুমতি ছাড়া হয়ে থাকে, তাহলে উক্ত কাফালাত অপর শরিকের উপর বর্তাবে না। আর যদি মাকফূল আনহুর অনুমতিক্রমে হয়, তাহলে বর্তাবে। অথচ জামে সাগীরে মাকফূল আনহুর অনুমতিক্রমে হওয়ার শর্তটি উল্লেখ নেই। বরং সেখানে নিঃশর্তভাবে এরূপ উল্লেখ আছে যে, দুই শরিকের এক শরিক যদি কাফালাত গ্রহণ করে তাহলে তা অপর শরিকের উপর বর্তাবে।

গ্রন্থকার (র.) এ অসামঞ্জস্য দূরীভূত করার উদ্দেশ্য করে বলেন– وَمُطْلَقُ الْجَوَابِ فِي الْكِتَابِ مَحْمُوْلٌ عَلَى الْمُقَيَّدِ অর্থাৎ জামে সাগীরে নিঃশর্ত কাফালাতের উপর যে হুকুমটি লাগানো হয়েছে, সেটি মূলত শর্তযুক্ত কাফালাতের উপর প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ মাকফূল আনহুর অনুমতিক্রমে কাফালাত গ্রহণ করা হলেই তার উপর ও শরিকের উপর বর্তাবে, অন্যথায় নয়।

কোনো শরিক যদি কারো থেকে কিছু গসব করে আনে, কিংবা কারো কোনো সম্পদ ধ্বংস করে ফেলে, এবং তার উপর গসবকৃত বস্তুর বা ধ্বংসকৃত বস্তুর ক্ষতিপূরণ আরোপিত হয়। তাহলে এই ক্ষতিপূরণ অপর শরিকের উপরও আরোপিত হবে কি-না? وَضَمَانُ الْغَصْبِ বলে গ্রন্থকার এ মাসআলাটিই বর্ণনা করেছেন। যার সার-সংক্ষেপ হলো এই যে, ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে উক্ত ক্ষতিপূরণ অপর শরিকের উপর বর্তাবে। কারণ ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মতে তা কাফালাতের অন্তর্ভুক্ত। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর মতে তিজারাত বা ব্যবসার অন্তর্ভুক্ত। আর কাফালাত ও তিজারাত উভয়ই মুফাওয়াযার আওতায় পড়ে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) এর মতে অপর শরিকের উপর বর্তাবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

فَانْ وَرِثَ اَحَدُهُمَا مَا لَا يَصِحُّ فِيْهِ الشَّرْكَةُ اَوْ وُهِبَ لَهُ وَوَصَلَ اِلَى يَدِهِ بَطَلَتِ الْمُفَاوَضَةُ وَصَارَتْ عِنَانًا لِفَوَاتِ الْمُسَاوَاةِ فِيْمَا يَصْلُحُ رَأْسَ الْمَالِ اِذْ هِيَ شَرْطٌ فِيْهِ اِبْتِدَاءً وَبَقَاءً. وَهٰذَا لِأَنَّ الْأٰخَرَ لَا يُشَارِكُهُ فِيْمَا اَصَابَهُ لِانْعِدَامِ السَّبَبِ فِي حَقِّهِ، اِلَّا اَنَّهَا تَنْقَلِبُ عِنَانًا لِلْاِمْكَانِ، فَاِنَّ الْمُسَاوَاةَ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ فِيْهِ، وَلِدَوَامِهِ حُكْمُ الْاِبْتِدَاءِ لِكَوْنِهِ غَيْرَ لَازِمٍ. فَاِنْ وَرِثَ اَحَدُهُمَا عَرَضًا فَهُوَ لَهُ وَلَا تَفْسُدُ الْمُفَاوَضَةُ وَكَذَا الْعَقَارُ لِاَنَّهُ لَا يَصِحُّ فِيْهِ الشَّرْكَةُ فَلَا يُشْتَرَطُ الْمُسَاوَاةُ فِيْهِ .

অনুবাদ : জামে সাগীরে ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, **দু'জনের একজন যদি এমন কোনো সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করে, যাতে অংশীদারিত্ব বৈধ, কিংবা যদি তাকে হেবা করা হয় আর তা তার কজায় পৌঁছে যায়, তাহলে শিরকাতুল মুফাওয়াযা বাতিল হয়ে যাবে। এবং তা শিরকাতুল ইনানে পরিণত হবে।**

কেননা যে মাল মূলধন হওয়ার যোগ্য, তাতেও সমতা বিনষ্ট হয়েছে। অথচ শিরকাতুল মুফাওয়াযার মধ্যে প্রাথমিক ও পরবর্তী উভয় অবস্থায় সমতা বিদ্যমান থাকা শর্ত।

এটা একারণে যে, যা প্রাপ্ত হয়েছে, অপরজনের ক্ষেত্রে অংশীদারির কারণ বিদ্যমান না থাকায় সে তাতে অংশীদার হতে পারবে না। তার সম্ভাবনা থাকার কারণে তা শিরকাতুল ইনানে রূপান্তরিত হবে। কেননা তাতে সমতার শর্ত নেই। আর শিরকাতুল ইনানের স্থায়িত্বকালের বিধান তার প্রাথমিক অবস্থার বিধানের অনুরূপ। কেননা কোনো পক্ষের জন্য তা বাধ্যতামূলক নয়।

উভয়ের কোনো একজন যদি উত্তরাধিকার সূত্রে কোনো দ্রব্যসম্পদ লাভ করে তাহলে তা তার একক মালিকানায় থাকবে এবং শিরকাতুল মুফাওয়াযা বাতিল হবে না।

ভূ-সম্পদ লাভের ক্ষেত্রেও একই হুকুম হবে। কেননা তাতে অংশীদারিত্ব বৈধ নয়। সুতরাং সে ক্ষেত্রে সমতারও শর্ত হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিউক্ত মাসআলার সারমর্ম হলো এই যে, শিরকাতুল মুফাওয়াযার চুক্তিতে আবদ্ধ শরিকদ্বয়ের একজন যদি মিরাশ সূত্রে বা হেবা সূত্রে এমন কোনো সম্পদের মালিক হয়, যাতে শিরকাত সহীহ হয়, অর্থাৎ দিরহাম, দীনার ইত্যাদি তাহলে মুফাওয়াযা বাতিল হয়ে যাবে। কারণ মুফাওয়াযার জন্য শর্ত হলো প্রাথমিক ও পরবর্তী উভয় অবস্থায় শরিকদ্বয়ের মাঝে শিরকাতের উপযুক্ত সম্পদে সমতা বিদ্যমান থাকা। অথচ আলোচ্য সুরতে এক শরিক যে সম্পদের মালিক হয়েছে, তাতে অন্য শরিক অংশীদার না হওয়ায় তাদের মাঝের সমতা হারিয়ে গেছে। তাই মুফাওয়াযার বাতিল হয়ে যাবে।

পক্ষান্তরে শিরকাতুল ইনানের মধ্যে প্রাথমিক অবস্থায় যেমন সমতা শর্ত নয়। তেমনি পরবর্তী অবস্থায়ও শর্ত নয়। বিধায় মুফাওয়াযা বাতিল হয়ে তা ইনানে পরিণত হবে।

قَوْلُهُ : فَاِنْ وَرِثَ اَحَدُهُمَا عَرَضًا الخ : বর্ণিত মাসআলাটি পূর্ববর্তী মাসআলার বিপরীত। অর্থাৎ এ মাসআলার মূল কথা হলো কোনো শরিক যদি এমন সম্পদের অধিকারী হয়, যাতে শিরকাত বৈধ হয় না, যেমন দ্রব্যসম্পদ ও ভূসম্পদ তাহলে এর দ্বারা শিরকাতুল মুফাওয়াযা বাতিল হবে না। কারণ শিরকাতুল মুফাওয়াযার দুই শরিকের মাঝে সমতা বিদ্যমান থাকা শর্ত কেবল সে সকল সম্পদে যে সকল সম্পদ মূলধন হওয়ার উপযুক্ত। যেমন দিরহাম, দীনার ইত্যাদি। পক্ষান্তরে দ্রব্যাদি ও জমি যেহেতু মূলধন হওয়ার উপযুক্ত সম্পদ নয়, সেহেতু তাতে সমতা বিদ্যমান থাকা শর্ত নয়।

https://e-ilm.weebly.com/

فَصْلٌ : وَلَا يَنْعَقِدُ الشَّرِكَةُ اِلَّا بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيْرِ وَالْفُلُوْسِ النَّافِقَةِ وَقَالَ مَالِكٌ : يَجُوْزُ بِالْعُرُوْضِ وَالْمَكِيْلِ وَالْمَوْزُوْنِ اِذَا كَانَ الْجِنْسُ وَاحِدًا؛ لِاَنَّهَا عُقِدَتْ عَلٰى رَاْسِ مَالٍ مَعْلُوْمٍ فَاَشْبَهَ النُّقُوْدَ. بِخِلَافِ الْمُضَارَبَةِ لِاَنَّ الْقِيَاسَ يَاْبَاهَا لِمَا فِيْهَا مِنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ . فَتُقْتَصَرُ عَلٰى مَوْرِدِ الشَّرْعِ . وَلَنَا اَنَّهٗ يُؤَدِّيْ اِلٰى رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ؛ لِاَنَّهٗ اِذَا بَاعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رَاْسَ مَالِهٖ وَتَفَاضَلَ الثَّمَنَانِ فَمَا يَسْتَحِقُّهٗ اَحَدُهُمَا مِنَ الزِّيَادَةِ فِيْ مَالِ صَاحِبِهٖ رِبْحُ مَا لَمْ يَمْلِكْ وَمَا لَمْ يَضْمَنْ. بِخِلَافِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيْرِ لِاَنَّ ثَمَنَ مَا يَشْتَرِيْهِ فِيْ ذِمَّتِهٖ اِذْ هِيَ لَا يَتَعَيَّنُ فَكَانَ رِبْحُ مَا ضَمِنَ، وَلِاَنَّ اَوَّلَ التَّصَرُّفِ فِي الْعُرُوْضِ الْبَيْعُ وَفِي النُّقُوْدِ الشِّرَاءُ، وَبَيْعُ اَحَدِهِمَا مَالَهٗ عَلٰى اَنْ يَكُوْنَ الْاٰخَرُ شَرِيْكًا فِيْ ثَمَنِهٖ لَا يَجُوْزُ، وَشِرَاءُ اَحَدِهِمَا شَيْئًا بِمَالِهٖ عَلٰى اَنْ يَكُوْنَ الْمَبِيْعُ بَيْنَهٗ وَبَيْنَ غَيْرِهٖ جَائِزٌ .

অনুবাদ : অনুচ্ছেদ : দিরহাম, দীনার ও চালমুদ্রা ব্যতীত অন্য কিছুতে শিরকাতুল মুফাওয়াযা বৈধ হবে না। ইমাম মালেক (র.) বলেন, দ্রব্য-সম্পদ, মাপাও ওজনের বস্তু যদি একজাতীয় হয়, তাহলে তাতেও শিরকাতুল মুফাওয়াযা বৈধ হবে। কেননা এখানে পরিজ্ঞাত মূলধনের উপর শিরকাতুল মুফাওয়াযা সংঘটিত হয়েছে। সুতরাং মুদ্রার সদৃশ হলো। মুদারাবার বিষয়টি ভিন্ন, (তা স্বর্ণ ও রৌপ্যের সাথে বিশিষ্ট) কেননা তাতে দায়হীন মাল থেকে মুনাফা অর্জন হয়। এ কারণেই কিয়াস তার বৈধতা প্রত্যাখ্যান করে। সুতরাং তা শরিয়তের প্রবর্তন ক্ষেত্রের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

আমাদের দলিল এই যে, বিষয়টি দায়হীন সম্পদ দ্বারা মুনাফা অর্জনের দিকে নিয়ে যায়। কেননা উভয় অংশীদার যদি নিজ নিজ মূলধন বিক্রি করে ফেলে এবং মূল্য দুটি পরস্পর কম বেশ হয় (অর্থাৎ দুজনই নিজ মূলধন ভিন্ন ভিন্ন মূল্যে বিক্রি করে) তাহলে একজন তার শরিকদারের মালে যে অতিরিক্ত পরিমাণের হকদার হবে, তা হবে ঐ সম্পদের মুনাফা, যার মালিকানা তার নেই এবং যার দায় সে বহন করেনি।

দিরহাম-দীনারের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা দিরহাম-দীনার যেহেতু নির্ধারিত হয় না, সেহেতু যা সে খরিদ করবে তার মূল্য তার জিম্মায় অনির্ধারিতরূপে থেকে যাবে। সুতরাং তা ঐ মালের মুনাফা হলো যার দায় তার উপর এসেছে।

তাছাড়া দ্বিতীয় দলিল এই যে, দ্রব্য-সম্পদের ক্ষেত্রে কৃতব্যবহারের প্রাথমিক অবস্থা হচ্ছে বিক্রয়। পক্ষান্তরে দিরহাম-দীনারের ক্ষেত্রে হচ্ছে ক্রয়। আর দুজনের একজনের এ শর্তে নিজের মাল বিক্রি করা জায়েজ নেই যে, অপরজন তার মূল্যের মধ্যে শরিক হবে। পক্ষান্তরে দুজনের একজনের এই শর্তে নিজের মাল দ্বারা কোনো কিছু খরিদ করা যে, খরিদকৃত দ্রব্যটি উভয়ের শরিকানা থাকবে তা জায়েজ আছে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَاَمَّا الْفُلُوْسُ النَّافِقَةُ تَرُوْجُ رَوَاجَ الْاَثْمَانِ فَالْتَحقَتْ بِهَا . قَالُوْا : هٰذَا قَوْلُ مُحَمَّدٍ رحـ لِاَنَّهَا مُلْحَقَةٌ بِالنُّقُوْدِ عِنْدَهُ حَتّٰى لَا تَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِيْنِ، وَلَا يَجُوْزُ بَيْعُ اِثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ بِاَعْيَانِهَا عَلٰى مَا عُرِفَ، اَمَّا عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ وَاَبِيْ يُوْسُفَ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى لَا يَجُوْزُ الشَّرِكَةُ وَالْمُضَارَبَةُ بِهَا لِاَنَّ ثُمْنِيَّتَهَا تَتَبَدَّلُ سَاعَةً فَسَاعَةً وَتَصِيْرُ سِلْعًا. وَيُرْوٰي عَنْ اَبِيْ يُوْسُفَ رحـ مِثْلُ قَوْلِ مُحَمَّدٍ رحـ، وَالْاَوَّلُ اَقْيَسُ وَاَظْهَرُ، وَعَنْ اَبِيْ حَنِيْفَةَ رحـ صِحَّةُ الْمُضَارَبَةِ بِهَا

অনুবাদ : আর চালু মুদ্রা যেহেতু মুদ্রার মতোই প্রচলিত সেহেতু তা স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার সাথে সম্পৃক্ত হবে।

ফকীহগণ বলেছেন যে, এটা হলো ইমাম মুহাম্মাদ (র.) এর অভিমত। কেননা তার মতে এগুলো স্বর্ণ-রৌপ্য মুদ্রার সাথে সম্পৃক্ত। এমন কি নির্ধারণ করলেও নির্ধারিত হয় না। (যেমন দিরহাম-দীনার) একটির নির্ধারিত বিনিময়ে দুটি বিক্রি করা বৈধ নয়। যেমন পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র) এর মতে প্রচলিত অন্য ধাতবমুদ্রা দ্বারা অংশীদারি ব্যবসা ও মুদারাবা বৈধ নয়। কেননা এর মূল্যমান সময়ে সময়ে পরিবর্তিত হয় এবং কখনো পণ্যে রূপান্তরিত হয়।

আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর অনুরূপ মত বর্ণিত হয়েছে। তবে প্রথমোক্ত মতই অধিকতর কিয়াস সম্মত ও স্পষ্ট। অবশ্য ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে ধাতব-মুদ্রা দ্বারা মুদারাবা বৈধ হওয়ার বর্ণনাও রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কোন সম্পদ দ্বারা শিরকাতুল মুফাওয়াযা শুদ্ধ হবে এবং কোন সম্পদ দ্বারা শুদ্ধ হবে না। উপরিউক্ত ইবারতে এ সম্পর্কিত একটি মতভেদপূর্ণ মাসআলা আলোচনা করা হয়েছে। মাসআলাটি সারমর্ম নিম্নরূপ :

মুসান্নিফ (র.) বর্ণিত মাসআলায় দুটি মত উল্লেখ করেছেন। ১. আহনাফের মত। ২. ইমাম মালেক (র.) এর মত। আহনাফের মত হলো, শিরকাতুল মুফাওয়াযা কেবল তিন বস্তু দ্বারা শুদ্ধ হয়। তা হলো দিরহাম-দীনার ও চালু মুদ্রা। এগুলো ছাড়া অন্যকিছু দ্বারা শিরকাতুল মুফাওয়াযা শুদ্ধ হবে না।

ইমাম মালেক (র.) এর মতে, যে কোনো দ্রব্য-সম্পদ, মাপার বস্তু ও ওজন করার বস্তু দ্বারা ও শিরকাতুল মুফাওয়াযা শুদ্ধ হয়। শর্ত হলো উভয় পক্ষের সম্পদ একজাতীয় হতে হবে। যেমন- এক শরিকের কাছে যদি দশ মণ ধান থাকে এবং অপর শরিকের কাছেও তার সমপরিমাণ ধান থাকে, তাহলে তারা এর দ্বারা শিরকাতুল মুফাওয়াযাহ করতে পারবে।

একটি প্রশ্ন ও তার জবাব : প্রশ্ন হতে পারে যে, ইমাম মালেক (র.) বলেছেন, শিরকাতুল মুফাওয়াযা কি তা আমার জানা নেই। (যেমন পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে।) অতএব, তিনি এটা কিভাবে বলেন যে, পণ্য-দ্রব্য দ্বারা শিরকাতুল মুফাওয়াযাহ বৈধ হয়?

এর উত্তর হলো এই যে, পণ্য-দ্রব্য বা মাকিলী ও মাওজুনী বস্তু দ্বারা শিরকাতুল মুফাওয়াযা শুদ্ধ হয় এ মতটি মূলত ইমাম মালেক (র.) এর নয়; বরং এ মতটি ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর অথবা এও বলা যায় যে, শিরকাতুল মুফাওয়াযা বৈধতা সম্পর্কে ইমাম মালেক (র.) হতে দুটি বর্ণনা রয়েছে। একটি হলো যা প্রশ্নকারী উল্লেখ করেছে, অপরটি হলো বৈধতার। অতএব, আলোচ্য মতটি হয়তো বৈধতার বর্ণনা অনুসারে।– (বেনায়াহ)

https://e-ilm.weebly.com/

ইমাম মালেক (র.) এর দলিল : ইমাম মালেক (র.) বলেন, ধান-গম ইত্যাদি পণ্যের মাধ্যমে শিরকাতুল মুফাওয়াযা করা হলে, তা নির্ধারিত এবং পরিজ্ঞাত পুঁজির মাধ্যমেই করা হয়। যেমন- দিরহাম-দীনারের ক্ষেত্রে হয়। এ হিসাবে পণ্য দ্বারা শিরকাতুল মুফাওয়াযা করা দিরহাম-দীনার দ্বারা করারই অনুরূপ। অতএব, দিরহাম-দীনার দ্বারা যেমন জায়েজ, তেমনি পণ্য দ্বারাও জায়েজ।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, পণ্য-দ্রব্য দ্বারা মুদারাবা করা বৈধ নয়। কেননা শিরকাতুল এবং মুদারাবা এক নয়; বরং উভয়ের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। পার্থক্যটি হলো এই যে, শিরকাতের বিষয়টি কিয়াসী বা যুক্তিগ্রাহ্য। পক্ষান্তরে মুদারাবা কিয়াসী নয়। তাই প্রথমটির মধ্যে পণ্য-দ্রব্য কে দিরহাম-দীনারের হুকুমভুক্ত করা যাবে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় টির মধ্যে পণ্য-দ্রব্যকে দিরহাম-দীনারের হুকুমভুক্ত করা যাবে না। বরং মুদারাবা যুক্তিগ্রাহ্য বা কিয়াসী না হওয়া সত্ত্বেও তা দিরহাম-দীনারের মাধ্যমে শরিয়ত বৈধ করেছে। তাই এর বৈধতা দিরহাম-দীনারের মধ্যেই সীমিত থাকবে। পণ্য-দ্রব্য পর্যন্ত তা প্রসারিত হবে না। অর্থাৎ পণ্য-দ্রব্য কিংবা দিরহাম-দীনার ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা মুবারাবা বৈধ হবে না। কেননা অযৌক্তিক কোনো বিষয় শরিয়ত কর্তৃক বৈধ করা হলে তার বৈধতা শরিয়ত অনুমোদিত ক্ষেত্রের মাঝেই সীমিত থাকে।

বাকি থাকল এ কথা যে, মুদারাবা গাইরে কিয়াসী বা অযৌক্তিক হলো কিভাবে? এর উত্তর হলো- পুঁজিদাতা ব্যক্তি যখন তার পুঁজিটি মুযারেবের হাতে তথা কারবারী ব্যক্তির হাতে সোপর্দ করে, তখন তা তার হাতে আমানত স্বরূপ। আর আমানতদার ব্যক্তি আমানতের সম্পদের জামিন হয় না বা সে সম্পদ তার জিম্মায় থাকে না। অর্থাৎ আমানতের সম্পদ আমানতদারের হাতে ধ্বংস হয়ে গেলে তার ভর্তুকি দিতে হয় না। সে হিসাবে মুযারিব তথা কারবারী ব্যক্তির হাতে রক্ষিত পুঁজিও যদি ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে তাকে এর ভর্তুকি দিতে হবে না। অথচ উক্ত সম্পদ ব্যবসায় খাটিয়ে যে মুনাফা অর্জন হয়, সে তা থেকে অংশ পায়। ফলে সে যেন দায়হীন সম্পদের মুনাফা ভোগ করে থাকে। এ বিষয়টি অর্থাৎ দায়হীন সম্পদের মুনাফা ভোগ করার বিষয়টি গাইরে কিয়াসী। কেননা কিয়াস অনুযায়ী, মানুষ দুরকম সম্পদের মুনাফা ভোগ করতে পারে। এক. নিজের মালিকানাভুক্ত সম্পদ। দুই. দায়ভুক্ত সম্পদ। কিন্তু মুযারেব বা কারবারী ব্যক্তি যে সম্পদের মুনাফা ভোগ করে, সে সম্পদ তার মালিকানাও নয়, দায়ভুক্তও নয়। বিধায় তার মুনাফা ভোগের বিষয়টি তথা মুদারাবার বিষয়টি গাইরে কিয়াসী। তবু শরিয়ত তা বৈধ করেছে দিনার-দিরহামের মাধ্যমে মানুষের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য করে। অতএব, মুদারাবার বৈধতা দিনার-দিরহামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

পক্ষান্তরে শিরকাত কিয়াসী বিষয়। তাই সেটা দিরহাম-দীনারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং দিরহাম-দীনারের সমকক্ষ অন্য বস্তু দ্বারাও বৈধ হয়।

আহনাফের দলিল : আহনাফ বলেন, পণ্য-দ্রব্যের মাধ্যমে মুদারাবা যে কারণে অবৈধ, সে কারণেই পণ্য-দ্রব্যের মাধ্যমে শিরকাতও অবৈধ। অর্থাৎ পণ্য-দ্রব্যের মাধ্যমে শিরকাতকারী হলে দায়হীন সম্পদ দ্বারা মুনাফা ভোগ করা হয় অথচ তা শরিয়তে নিষিদ্ধ।

এর উদাহরণ মূলক ব্যাখ্যা হলো, যেমন- এক শরিকের নিকট পাঁচ মণ গম আছে, অপর শরিকের নিকটও পাঁচ মণ গম আছে। তারা উভয়ে এর দ্বারা শিরকাতুল মুফাওয়াযা করল। এরপর উভয়ই নিজ নিজ গম বিক্রি করল। একজন বিক্রি করল কীমতে মিছল দ্বারা অর্থাৎ ক্রয় মূল্যে ফলে তার কোনো লাভ হলো না। অপরজন বিক্রি করল ক্রয় মূল্য হতে কয়েকগুণ বেশি মূল্যে। ফলে অনেক লাভ হলো। এমতাবস্থায় অপর শরিক এ লাভের মধ্যে যে অংশ পাবে তা তার মালিকানাহীন ও দায়হীন সম্পদের মুনাফা। অর্থাৎ সে এমন সম্পদের মুনাফা ভোগ করল, যা তার মালিকানাও নয়, আবার দায়ভুক্ত নয়। অথচ এটি শরিয়তে নিষিদ্ধ। অতএব, পণ্য-দ্রব্যের মাধ্যমে শিরকাত অবৈধ হবে।

পক্ষান্তরে দিরহাম-দিনারের মাধ্যমে যদি শিরকাত করা হয় এবং এক শরিক তার দিরহাম-বা দিনারের মাধ্যমে কিছু খরিদ করল তাহলে দিরহাম-দিনার নির্ধারিত না হওয়ার কারণে ক্রয়কৃত বস্তুর মূল্য উভয় শরিকের জিম্মায় আরোপিত হয় ফলে এর দ্বারা যে মুনাফা অর্জন হয় তা উভয় শরিকের জন্য বৈধ হয়।

https://e-ilm.weebly.com/

২. দলিল : পণ্যের মাধ্যমে যদি শিরকাত করা হয়, তাহলে পণ্যের মধ্যে প্রথম তসরুফ হলো তা বিক্রি করা। আর দিরহাম-দিনারের মধ্যে প্রথম তসরুফ হলো তা দ্বারা কিছু ক্রয় করা।

অতএব, এক শরিক যদি তার পণ্য বিক্রি করে অন্য শরিক তার মূল্যের মাঝে অংশীদার হওয়ার শর্তে, তাহলে তা জায়েজ হয় না। পক্ষান্তরে যদি এক শরিক তার দিরহাম-দিনার দ্বারা কোনো কিছু খরিদ করে তাহলে খরিদকৃত পণ্যের মাঝে অংশীদার হওয়া জায়েজ আছে।

দেখা গেল পণ্য দ্বারা শিরকাত করা হলে প্রথম তসরুফের ক্ষেত্রেই একে অপরের অংশীদার হতে পারে না। দিরহাম-দিনার দ্বারা শিরকাত করা হলে একে অপরের অংশীদার হতে পারে। তাই দিনার-দিরহাম দ্বারা শিরকাত করা জায়েজ; পণ্য দ্বারা জায়েজ নয়।

الفلوس النافقة তথা চালু মুদ্রা দ্বারা শিরকাত জায়েজ হবে কি-না? এ বিষয়ে ইমামগণের মতভিন্নতা বর্ণিত হয়েছে।

১. মুহাম্মদ (র.)-এর মতে মুদ্রা দিরহাম-দীনারের মতোই প্রচলিত হওয়ার কারণে তা দিরহাম-দিনারের হুকুমভুক্ত। ফলে এক দিরহামের বিনিময়ে যেমন দুই দিরহাম বিক্রি করা জায়েজ নয়, তেমনি এক মুদ্রার বিনিময়েও দুই মুদ্রা বিক্রি করা জায়েজ নয় এবং দিরহাম-দীনার যেমন নির্ধারণের দ্বারা নির্ধারিত হয় না, তেমনি মুদ্রাও নির্ধারণের দ্বারা নির্ধারিত হয় না।

২. ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে মুদ্রা দ্বারা শিরকাত মুদারাবা জায়েজ নয়। কারণ মুদ্রা সৃষ্টিগতভাবে স্বর্ণ-রূপা তথা দীনার-দিরহামের মতো ثمن বা মূল্য নয়। বরং মানুষের সর্বসম্মত ব্যবহারের কারণে তা মূল্যরূপে পরিগণিত হয়। তাই মানুষের ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য করলে সেটা মূল্য, আর মৌলিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করলে তা মূল্য নয়। বিধয় মুদ্রার মূল্য হওয়ার বিষয়টি প্রতি মূহুর্তেই পরিবর্তনশীল। এমনকি কখনো কখনো তা পণ্যেও পরিণত হয়ে যায়। তাই ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর মতে মুদ্রা দিরহাম-দিনারের হুকুমভুক্ত নয়।

তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) হতে ইমাম মুহাম্মাদের অনুরূপ উক্তিও বর্ণিত আছে। সে হিসাবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) এর মতে মুদ্রা দ্বারা শিরকাত ও মুদারাবা জায়েজ হবে। কিন্তু গ্রন্থকার বলেন, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) হতে বর্ণিত প্রথম মতটি অধিক যুক্তি সঙ্গত এবং অধিক স্পষ্ট।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) এর প্রথম মতটি (অর্থাৎ ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মতের অনুরূপ মতটি) অধিক যুক্তিসঙ্গত এবং স্পষ্ট হওয়ার কারণ হলো, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ক্রয়-বিক্রয়ের মাসআলায় ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর অনুরূপ মত পোষণ করেন। অর্থাৎ তিনি ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মুদ্রাকে পণ্যের হুকুমভুক্ত করেন ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মতো। যার ফলে তাদের উভয়ের মতে, এক মুদ্রার বিনিময়ে নির্ধারিত দুটি মুদ্রা বিক্রি করা জায়েজ আছে। অতএব, এটাই যুক্তিসঙ্গত ও স্পষ্ট যে, ক্রয়-বিক্রয়ের মাসআলায় যেহেতু ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অনুরূপ মত পোষণ করেন, সেহেতু শিরকাত-মুদারাবার মাসআলায়ও তিনি ইমাম আবূ হানীফা এর অনুরূপ মতই পোষণ করবেন।

হাসান ইবনে যিয়াদের সূত্রে ইমাম আবূ হানীফার (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, চালু মুদ্রা দ্বারা মুদারাবা শুদ্ধ হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ وَلَا تَجُوْزُ الشَّرْكَةُ بِمَا سِوٰى ذٰلِكَ اِلَّا اَن يَتَعَامَلَ النَّاسُ بِالتِّبْرِ وَالنُّقْرَةِ فَتَصِحُّ الشَّرْكَةُ بِهِمَا هٰكَذَا ذُكِرَ فِي الْكِتَابِ وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ : وَلَا يَكُوْنُ الْمُفَاوَضَةُ بِمَثَاقِيْلِ ذَهَبٍ اَوْ فِضَّةٍ وَمُرَادُهُ التِّبْرُ، فَعَلٰى هٰذِهِ الرِّوَايَةِ التِّبْرُ سِلْعَةٌ يَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِيْنِ فَلَا يَصْلُحُ رَأْسَ الْمَالِ فِي الْمُضَارَبَاتِ وَالشَّرِكَاتِ . وَذَكَرَ فِي كِتَابِ الصَّرْفِ اَنَّ النُّقْرَةَ لَا يَتَعَيَّنُ حَتّٰى لَا يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ بِهَلَاكِهِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، فَعَلٰى تِلْكَ الرِّوَايَةِ يَصْلُحُ رَأْسَ الْمَالِ فِيْهِمَا، وَهٰذَا لِمَا عُرِفَ اَنَّهُمَا خُلِقَا ثَمَنَيْنِ فِي الْاَصْلِ، اِلَّا اَنَّ الْاَوَّلَ اَصَحُّ؛ لِاَنَّهَا وَاِنْ خُلِقَتْ لِلتِّجَارَةِ فِي الْاَصْلِ لٰكِنَّ الثَّمَنِيَّةَ تَخْتَصُّ بِالضَّرْبِ الْمَخْصُوْصِ؛ لِاَنَّ عِنْدَ ذٰلِكَ لَا يَصْرِفُ اِلٰى شَيْءٍ اٰخَرَ ظَاهِرًا اِلَّا اَنْ يَجْرِيَ التَّعَامُلُ بِاسْتِعْمَالِهِمَا ثَمَنًا فَيَنْزِلُ التَّعَامُلُ بِمَنْزِلَةِ الضَّرْبِ فَيَكُوْنُ ثَمَنًا وَيَصْلُحُ رَأْسَ الْمَالِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, এছাড়া অন্য কোনো জিনিস দ্বারা শিরকাতুল মুফাওয়াযাহ বৈধ হবে না। তবে যদি লোকেরা স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত দ্বারা বা গলিত স্বর্ণ ও রৌপ্য দ্বারা লেনদেন করে তাহলে এগুলো দ্বারাও শিরকাতুল মুফাওয়াযা বৈধ হবে। মুখতাসারুল কুদূরী নামক গ্রন্থে এরূপই উল্লেখ রয়েছে।

আর জামে সাগীরে উল্লেখ রয়েছে, স্বর্ণ ও রৌপ্য মিসকাল দ্বারা মুফাওয়াযা হবে না। তার উদ্দেশ্য হলো স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত। সুতরাং এ বর্ণনা অনুযায়ী স্বর্ণ ও রৌপ্যপাত হচ্ছে পণ্য। যা নির্ধারণ করলে নির্ধারণ হয়ে যায়. সুতরাং তা মুদারাবা ও শিরকাতুল মুফাওয়াযা এর মূলধন হওয়ার উপযুক্ত নয়।

(জামে সাগীরের) কিতাবুসসারফ অধ্যায়ে (ইমাম মুহাম্মাদ (র.) উল্লেখ করেছেন যে, গলিত স্বর্ণ ও রৌপ্যপিণ্ড নির্ধারণ দ্বারা নির্ধারিত হয় না। এমনকি সমর্পণের পূর্বে তা নষ্ট হয়ে গেলে আকদ বাতিল হয় না।

সুতরাং কিতাবুসসারফের বর্ণনা মতে উভয় ক্ষেত্রেই এটা মূলধন হওয়ার উপযুক্ত। আর এটা এ কারণে যে পূর্বেই আলোচিত হয়েছে এ দুটোকে মূলতই মূল্যধাতুরূপে সৃষ্টি করা হয়েছে (পণ্য ধাতুরূপে নয়)।

তবে প্রথমোক্ত বর্ণনা অধিকতর বিশুদ্ধ। কেননা যদিও এটাকে মূলত বাণিজ্য মাধ্যমরূপে সৃষ্টি করা হয়েছে, তবু তার মূলগুণ বিশেষভাবে মোহরাঙ্কিত মুদ্রার সাথে বিশিষ্ট। কেননা স্পষ্টতই তখন এটাকে অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করা হয় না। তবে যদি ঐ পাত বা পিণ্ডকে মূল্যধাতুরূপে ব্যবহারের মাধ্যমে লেনদেনের প্রচলন শুরু হয়ে যায়, তাহলে প্রচলনকেই মোহরাঙ্কিত মুদ্রার স্থলবর্তী ধরা হবে। ফলে তা মূল্যরূপে বিবেচিত হবে এবং মূলধন হওয়ার উপযুক্ত হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শব্দ বিশ্লেষণ : تبر গলানো হয়নি এরূপ স্বর্ণ-রূপা। نقرة গলানো হয়েছে, এমন স্বর্ণ-রূপা।

ইবারতের সারমর্ম হলো, পূর্বে বর্ণিত তিন বস্তু ছাড়া তথা দিরহাম, দীনার ও চালুমুদ্রা ব্যতীত অন্য কোনো বস্তু দ্বারা শিরকাতুল মুফাওয়াযা ও মুদারাবা শুদ্ধ হবে না। তবে যদি কোনো এলাকার লোকজন স্বর্ণ-রূপার পাত জমা কিংবা গলিত

https://e-ilm.weebly.com/

স্বর্ণ-রূপার মাধ্যমে লেনদেন করতে অভ্যস্ত হয়ে থাকে, তাহলে সে এলাকায় এরূপ স্বর্ণ-রূপা দ্বারাও শিরকাতুল মুফাওয়াযা এবং মুদারাবা শুদ্ধ হবে। মুখতাসারুল কুদূরীতে এরূপই উল্লেখ আছে। যা বাহ্যত জামে সাগীরের বর্ণনার পরিপন্থি। তাই মুসান্নিফ (র.) জামে সাগীরের বর্ণনা উল্লেখ করেছেন।

قَوْلُهُ : وفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ : وَلَا يَكُونُ الْمُفَاوَضَةُ الخ : উপরিউক্ত ইবারতের সারমর্ম হলো এই যে, স্বর্ণ-রৌপ্যের পাত বা পিণ্ড সম্পর্কে জামে সাগীরে দু'ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়।

প্রথম বর্ণনাটি হলো স্বর্ণ-রূপার পাত বা পিণ্ড দ্বারা মুফাওয়াযা ও শিরকাত শুদ্ধ হবে না। কারণ এগুলো মূল্যধাতু নয়: বরং এগুলো সাধারণ পণ্যের ন্যায় নির্ধারণ করার দ্বারা নির্ধারিত হয়ে যায়।

দ্বিতীয় বর্ণনাটি হলো (যা জামে সাগীরের "বাইয়ে সরফ" অধ্যায়ে উল্লেখ রয়েছে) স্বর্ণ-রূপার পাত বা পিণ্ড নির্ধারণ করার দ্বারা নির্ধারিত হয় না। ফলে স্বর্ণ-রূপার কোনো পাত বা পিণ্ড ক্রয়-বিক্রয় হওয়ার পর যদি পাত বা পিণ্ডটি ক্রেতার হাতে সোপর্দ করার পূর্বেই ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলেও ক্রয়-বিক্রয় চুক্তিটি বাতিল হবে না বরং বিক্রেতা অন্য একটি পাত বা পিণ্ড ক্রেতার হাতে সোপর্দ করতে পারবে। যেমন– দিরহাম-দিনার ক্রয়-বিক্রয় হওয়ার পর তা ধ্বংস হয়ে গেলে চুক্তি বাতিল হয় না বরং অন্য দিরহাম বা দিনার সোপর্দ করা যায়। অতএব, এ বর্ণনা অনুযায়ী স্বর্ণ-রূপার পাত ও পিণ্ড দিরহাম-দীনারের মতোই মূল্যধাতু। এর দ্বারা শিরকাত, মুফাওয়াযা শুদ্ধ হওয়া উচিত।

গ্রন্থকার বলেন, স্বর্ণ-রূপার পাত ও পিণ্ডকে দিরহাম-দিনারের অনুরূপ সাব্যস্ত করার কারণ হলো, স্বর্ণ ও রূপাকে আল্লাহ তা'আলা মৌলিকভাবে মূল্যধাতুরূপে সৃষ্টি করেছেন।

গ্রন্থকার (র.) জামে সাগীরের উপরিউক্ত বর্ণনা দুটির মাঝে সামঞ্জস্য বিধানের উদ্দেশ্যে বলেন, উপরিউক্ত দুই বর্ণনার মাঝে প্রথম বর্ণনা টি অধিক বিশুদ্ধ। প্রথম বর্ণনার কারণ হিসাবে তিনি বলেন, স্বর্ণ-রূপাকে সৃষ্টিই করা হয়েছে বাণিজ্য মাধ্যম হিসাবে। তাই এ দুটো বাণিজ্যের তথা লেনদেনের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার হওয়াই স্বাভাবিক তা যেকোনো আকৃতিতেই থাকুক না কেন। কিন্তু তারপর ও ছামানিয়্যাত তথা মূল্যগুণ হওয়ার বিষয়টি কেবলই মোহরাঙ্কিত স্বর্ণ-রূপা তথা দিরহাম-দীনারের সাথে বিশিষ্ট হয়ে পড়েছে। তাই কেবল দিরহাম-দীনারই মূল্য হিসাবে বিবেচিত হবে। এর দ্বারা শিরকাত, মুদারাবা ইত্যাদি শুদ্ধ হবে। মোহরাঙ্কিত নয় এরূপ সোনা-রূপা তথা সোনা-রূপার পাত বা পিণ্ড মূল্যরূপে পরিগণিত হবে না। এর দ্বারা শিরকাত মুদারাবা ইত্যাদি শুদ্ধ হবে না।

তবে যদি কোনো অঞ্চলের লোকজন সোনা-রূপার পাত ও পিণ্ডকেই মূল্যরূপে ব্যবহার করতে শুরু করে এবং সে অঞ্চলে এটা প্রচলন লাভ করে ফেলে, তাহলে তাদের এই প্রচলনকে মোহরের স্থলবর্তী হিসাবে ধরে নেওয়া হবে। ফলে মোহরাঙ্কিত স্বর্ণ-রৌপ্য যেমন মূল্যরূপে বিবেচিত হয়, তেমনি প্রচলনপ্রাপ্ত স্বর্ণ-রৌপ্যের পাওয়া পিণ্ড ও মূল্যরূপে বিবেচিত হবে। এর দ্বারা শিরকাত, মুদারাবা ইত্যাদি শুদ্ধ হবে। এটাই হলো দ্বিতীয় বর্ণনার কারণ।

https://e-ilm.weebly.com/

ثُمَّ قَوْلُهُ وَلَا يَجُوْزُ بِمَا سِوٰى ذٰلِكَ يَتَنَاوَلُ الْمَكِيْلَ وَالْمَوْزُوْنَ وَالْعَدَدِيَّ الْمُتَقَارِبَ، وَلَا خِلَافَ فِيْهِ بَيْنَنَا قَبْلَ الْخَلْطِ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رِبْحُ مَتَاعِهِ وَعَلَيْهِ وَضِيْعَتُهُ، وَاِنْ خَلَطَا ثُمَّ اشْتَرَكَا فَكَذٰلِكَ فِيْ قَوْلِ اَبِيْ يُوْسُفَ، وَالشَّرِكَةُ شَرِكَةُ مِلْكٍ لَا شَرِكَةُ عَقْدٍ . وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ تَصِحُّ شَرِكَةُ الْعَقْدِ . وَثَمَرَةُ الْاِخْتِلَافِ تَظْهَرُ عِنْدَ التَّسَاوِيْ فِي الْمَالَيْنِ وَاشْتِرَاطِ التَّفَاضُلِ فِي الرِّبْحِ، فَظَاهِرُ الرِّوَايَةِ مَا قَالَهُ اَبُوْ يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ لِاَنَّهُ يَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِيْنِ بَعْدَ الْخَلْطِ كَمَا تَعَيَّنَ قَبْلَهُ . وَلِمُحَمَّدٍ رحـ اَنَّهَا ثَمَنٌ مِنْ وَجْهٍ حَتّٰى جَازَ الْبَيْعُ بِهَا دَيْنًا فِي الذِّمَّةِ . وَمَبِيْعٌ مِنْ حَيْثُ اَنَّهُ يَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِيْنِ، فَعَمِلْنَا بِالشَّبَهَيْنِ بِالْاِضَافَةِ اِلَى الْحَالَيْنِ، بِخِلَافِ الْعُرُوْضِ؛ لِاَنَّهَا لَيْسَتْ ثَمَنًا بِحَالٍ وَلَوْ اِخْتَلَفَا جِنْسًا كَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالزَّيْتِ وَالسَّمْنِ فَخَلَطَا لَا يَنْعَقِدُ الشَّرِكَةُ بِهَا بِالْاِتِّفَاقِ . وَالْفَرْقُ لِمُحَمَّدٍ رحـ اَنَّ الْمَخْلُوْطَ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ مِنْ ذَوَاتِ الْاَمْثَالِ، وَمِنْ جِنْسَيْنِ مِنْ ذَوَاتِ الْقِيَمِ فَتَتَمَكَّنُ الْجَهَالَةُ كَمَا فِي الْعُرُوْضِ، وَاِذَا لَمْ تَصِحَّ الشَّرِكَةُ فَحُكْمُ الْخَلْطِ قَدْ بَيَّنَّاهُ فِيْ كِتَابِ الْقَضَاءِ .

অনুবাদ : অন্য কোনো জিনিস দ্বারা জায়েজ হবে না ইমাম কুদূরী (র.)-এর এ বক্তব্য মাপও ওজনকৃত দ্রব্য এবং সংখ্যা দ্বারা গণনাকৃত প্রায় সদৃশ বস্তুকে অন্তর্ভুক্ত করে। মিশ্রণ ঘটানোর পূর্ব পর্যায়ে হলে এটার অবৈধতার ব্যাপারে আমাদের ইমামদের মাঝে কোনো মতভিন্নতা নেই। উভয়ের প্রত্যেকের জন্যই নিজ নিজ পণ্যের মুনাফা হাসিল হবে এবং লোকসানও যার যার উপর বর্তাবে।

আর যদি উভয় সম্পদের মিশ্রণ ঘটানোর পর দু'জনে অংশীদারিত্ব চুক্তি করে তাহলে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) এর মতে একই বিধান হবে। তাবে এটা হবে মালিকানার অংশীদারিত্ব, চুক্তির অংশীদারিত্ব।

পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মাদ (র.) এর মতে চুক্তির অংশীদারী বৈধ হবে। মতপার্থক্যের ফলাফল প্রকাশ পাবে উভয়ের মাল সমান হওয়ার ক্ষেত্রে এবং মুনাফার শর্ত আরোপের ক্ষেত্রে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) যা বলেছেন, তাহলো যাহিরে রেওয়ায়েত। কেননা (উপরিউক্ত তিন প্রকার বস্তু) মিশ্রণের পূর্বে যেমন (নির্ধারণের দ্বারা) নির্ধারিত হয় তেমনি মিশ্রণের পরও নির্ধারিত হয়।

ইমাম মুহাম্মাদ (র.)-এর দলিল এই যে, একদিক থেকে এগুলো মূল্য, (পণ্য নয়) তাই তো (বস্তুগতভাবে) অনির্ধারিত রেখে এগুলোর বিনিময়ে কোনো কিছু বিক্রি করা জায়েজ হয়। অন্যদিক থেকে এগুলো বিক্রয়পণ্য, তাই তো নির্ধারণের দ্বারা নির্ধারিত হয়ে যায়। তাই (বিধানের ক্ষেত্রে) আমরা মিশ্রণ পূর্ব ও মিশ্রণ পরবর্তী উভয় অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত করে উভয় সাদৃশ্যকে কার্যকরী করেছে।

অন্যান্য সাধারণ পণ্যদ্রব্যের অবস্থা ভিন্ন। কেননা এগুলো কোনো অবস্থায় মূল্যরূপে বিবেচিত হয় না। আর যদি উভয় দ্রব্য জাতিগতভাবে ভিন্ন হয়। যেমন- গম ও যব এবং তেল ও ঘি। আর সেগুলোকে তারা মিশ্রিত করে তাহলে সর্ব সম্মতিক্রমে এগুলো দ্বারা অংশীদারিত্ব সম্পন্ন হবে না। (জাতিগত ভিন্নতা ও অভিন্নতার মাঝে) পার্থক্যের কারণ ইমাম মুহাম্মাদ (র.) এর নিকট এই যে, এক জাতীয় মিশ্রিতবস্তু গুণগতভাবে সদৃশ বস্তুর (ذوات الامثال) অন্তর্ভুক্ত। ফলে অজ্ঞতা প্রকট হয়, যেমন সাধারণ পণ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে। যখন অংশীদারিত্ব বৈধ হলো না, তখন মিশ্রণের বিধান কী হবে তা আমরা كتاب القضاء -তে বর্ণনা করেছি।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিউক্ত ইবারতে পূর্বের সাথে সম্পৃক্ত কিছু আনুষাঙ্গিক কথা ও একটি ইখতিলাফী মাসআলা বর্ণিত হয়েছে।

পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে যে, ইমাম কুদূরী (র.) বলেছিলেন, "দিরহাম, দীনার ও চালু মুদ্রা এতিম বস্তু ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা শিরকাতুল মুফাওয়াযাহ শুদ্ধ হবে না"– তার এ বক্তব্য মাকিলী, মাওযূনী ও আদাদী এ তিন প্রকার বস্তুকে অন্তর্ভুক্ত করে। অর্থাৎ যেসব পণ্য কাইল করে, ওজন করে কিংবা গণনা করে বিক্রয় করা হয়, যেমন- ধান, গম, তেল, ডিম ইত্যাদি। এ সবই ইমাম কুদূরী (র.)-এর বক্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। অতএব, এ সকল বস্তু দ্বারা শিরকাত শুদ্ধ হবে না।

উভয় শরিক যদি তাদের কাইলী ওজনী বা আদাদী পণ্য পরস্পরে সংমিশ্রণ করার পূর্বে শিরকাতের আকদ করে তাহলে সে শিরকাত অশুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে কোনো মতবিরোধ নেই। অর্থাৎ সর্বসম্মতিক্রমে অশুদ্ধ। অতএব, এ অবস্থায় উভয় শরিক নিজ নিজ মালের দ্বারা অর্জিত মুনাফা নিজেই পারে। অপর শরিক পাবে না। কোনো শরিকের মাল ক্ষতিগ্রস্থ হলে, তা ঐ শরিকই ভোগ করবে। ক্ষতিগ্রস্ততার দায় অপর শরিকের উপর বর্তাবে না।

তবে উভয় শরিক নিজেদের উপরিউক্ত ধরনের পণ্য পরস্পরে সংমিশ্রিত করার পর যদি শিরকাতের আকদ করে, তাহলে সে আকদ শুধু হবে কি হবে না- এ নিয়ে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র.) এর মাঝে মতভেদ হয়েছে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মত হলো, মাকিলী, মাওজূনী, আদাদী পণ্য মিশ্রিত করার পূর্বে যেমন এগুলো দ্বারা শিরকাত সহীহ নয়, তেমনি মিশ্রিত করার পরেও শিরকাত সহীহ নয়।

অতএব, যদি পণ্য সংমিশ্রণের পর শিরকাত করা হয়, তাহলে তা শিরকাতে মিলক বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ মিশ্রিত পণ্য তাদের যৌথ মালিকানা বলে ধরা হবে। শিরকাতে আক্দ হবে না।

পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মত হলো পণ্য সংমিশ্রিত করার পর যদি শিরকাত করা হয়, তাহলে শিরকাত সহীহ হবে। উক্ত মতভেদের ছামারা বা ফলাফল প্রকাশিত হবে এই ছুরতে যে, উভয় শরিকের পণ্যের পরিমাণ সমান হওয়া অবস্থায় যদি মুনাফা বণ্টনের ক্ষেত্রে কম-বেশির শর্ত করা হয়। যেমন ধরা যাক, একজনের একমণ গম আছে। আরেক জনেরও এক মণ গম আছে। এই দুই মণ গম পরস্পর সংমিশ্রণ করার পর গমের মালিকদ্বয় শিরকাতের আকদ করল, এই শর্তে যে, গম বিক্রি করে যে মুনাফা অর্জন হবে (উদাহরণ স্বরূপ) তার দুই-তৃতীয়াংশ পাবে এক মালিক, আর এক-তৃতীয়াংশ পাবে অন্য মালিক। এমতাবস্থায় ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) এর মতে তাদের আরোপিত শর্ত কার্যকর হবে না। বরং অর্জিত মুনাফা উভয় মালিকের মাঝে তাদের মালিকানার পরিমাণ অনুযায়ী বণ্টিত হবে। অর্থাৎ আলোচ্য সুরতে যেহেতু উভয় শরিকের মালিকানা সমান সেহেতু মুনাফাও সমান সমান হারে বণ্টিত হবে। এর কারণ এটাই যে, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) এর মতে তাদের শিরকাত আকদ সহীহ হয়নি বরং তা শিরকাতে মিল্ক ছিল। অতএব, প্রত্যেকে নিজ নিজ মালিকানার মুনাফা ভোগ করবে।

পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে যেহেতু তাদের শিরকাতে আক্দ সহীহ হয়েছে, সেহেতু তাদের আরোপিত শর্তও কার্যকর হবে। অতএব, শর্ত অনুযায়ী এক শরিক অর্জিত মুনাফার দুই-তৃতীয়াংশ ভোগ করবে। অপর শরিক এক তৃতীয়াংশ ভোগ করবে।

দলিল পর্ব :

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতটি জাহিরে রেওয়ায়েত। এ মতের দলিল হলো এই যে, শিরকাতের মূলধন এমন সম্পদ হওয়া শর্ত যা নির্ধারণ করার দ্বারা-নির্ধারিত হয় না। যেমন দিনার-দিরহাম। অথচ মাকিলী, মাওযূনী ও আদাদী পণ্য নির্ধারণের দ্বারা নির্ধারিত হয়ে যায়। অতএব, মাকিলী, মাওযূনী ও আদাদী বস্তু শিরকাতের মূলধন হওয়ার উপযুক্ত নয়। বিধায় এগুলো মিশ্রণের পূর্বেও যেমন মূলধন হতে পারে না তদ্রূপ মিশ্রণের পরেও মূলধন হতে পারবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

তাছাড়া মাকিলী, মাওযূনী ও আদাদী বস্তু গুলো পণ্য। যার মধ্যে প্রথম তাসাররুফ হলো বিক্রয় যার ফলে দায়হীন বস্তুর মুনাফা ভোগ করা অবধারিত হয় এবং এ বিষয়টি অবৈধ। অতএব, পণ্যদ্রব্যের মাধ্যমে শিরকাত সহীহ নয়, মিশ্রণের পূর্বেও নয়, মিশ্রণের পরেও নয়।

ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো, মাকিলী, মাওযূনী ও আদাদী বস্তু একদিক থেকে ছামান বা মূল্য অন্যদিক থেকে পণ্য। ছামান বা মূল্য এ হিসাবে যে, এসব পণ্য অনির্ধারিত রেখে এগুলোর বিনিময়ে কিছু ক্রয় করলে বৈধ হয়। যেমন- কেউ কারো থেকে পাঁচ সের গমের বিনিময়ে কিছু ক্রয় করল এবং পাঁচ সের তার জিম্মায় থাকল। পরে পরিশোধ করবে তাহলে এ ক্রয়-বিক্রয় সহীহ আছে। দেখা যাচ্ছে এ লেনদেনে পাঁচ সের গম ছামান বা মূল্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। আর মাকিলী, মাওযূনী, আদাদী বস্তু পণ্য এ হিসাবে যে, এগুলো নির্ধারণ করার দ্বারা নির্ধারিত হয়ে যায়।

মোটকথা উপরিউক্ত বস্তুসমূহ পণ্য ও মূল্য উভয়ই। তাই ইমাম মুহাম্মাদ (র.) উভয় দিক বিবেচনা করেছেন। অর্থাৎ পণ্য হওয়ার দিকটি বিবেচনা করে বলেছেন, সংমিশ্রণের পূর্বে এগুলো দ্বারা শিরকাত সহীহ হবে না। আর মূল্য হওয়ার দিকটি বিবেচনা করে বলেছেন, সংমিশ্রণের পরে এগুলো দ্বারা শিরকাত সহীহ হবে।

পক্ষান্তরে আসবাবপত্র, যেমন- চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি কোনো অবস্থায়ই মূল্য নয় সর্বাবস্থায় পণ্য। তাই এগুলো দ্বারা কখনো শিরকাত সহীহ নয়।

অনুরূপভাবে যদি সংমিশ্রিত মাকিলী, মাওজূনী বা আদাদী পণ্য এক জিনসের না হয়ে ভিন্ন ভিন্ন জিনসের হয়, যেমন- একজনের গম এবং অপরজনের যব কিংবা একজনের তেল ও অপরজনের ঘি, এবং এগুলো সংমিশ্রণ করে যদি শিরকাত করা হয় তাহলেও সে শিরকাত সর্বসম্মতিক্রমে অবৈধ।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) একজাতীয় বস্তু সংমিশ্রণের পর তার দ্বারা শিরকাত জায়েজ বলেছেন। আর দুই জাতীয় বস্তু সংমিশ্রণ করার পরেও তার দ্বারা শিরকাত না জায়েজ বলেন। তাই দুইয়ের মাঝে পার্থক্য বর্ণনা করা জরুরি।

পার্থক্য হলো এই যে, একজাতীয় বস্তু পরস্পর সংমিশ্রিত হলে সে গুলো মিছলী থেকে যায়। অর্থাৎ কেউ যদি সেই সংমিশ্রিত পণ্য ধ্বংস করে ফেলে তাহলে তাকে তার অনুরূপ পণ্য দ্বারা ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। পক্ষান্তরে দুই জিনসের পণ্য পরস্পরে সংমিশ্রিত হলে তা মিছলী থাকে না বরং কিমতী হয়ে যায়। অর্থাৎ দু জিনসের মিশ্রিত পণ্য ধ্বংস করলে অনুরূপ পণ্য দ্বারা ক্ষতিপূরণ দেওয়া যায় না; বরং তার ক্ষতিপূরণ দিতে হয় মূল্য দ্বারা। তাই এক্ষেত্রে তা প্রকট হয়ে যায়। অর্থাৎ ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রাপ্ত অর্থ বন্টনের পূর্বে প্রত্যেক শরিক নিজ নিজ হক পৃথকভাবে বুঝে নিতে পারে না। পক্ষান্তরে মিছলী জিনিস বন্টনের পূর্বেও প্রত্যেক শরিক নিজ নিজ হক বুঝে নিতে পারে।

এ পার্থক্যের কারণে ইমাম মুহাম্মদ (র.) একজাতীয় পণ্য সংমিশ্রণের পর তার দ্বারা শিরকাত করাকে জায়েজ বলেন। আর দুজাতীয় পণ্য সংমিশ্রণের পর তার দ্বারা শিরকাতকে না জায়েজ বলেন। তবে এ সুরতে শিরকাত না জায়েজ হওয়ায় তার সমাধান কি হবে তা কিতাবুল কাজা অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ وَاِذَا اَرَادَ الشَّرِكَةَ بِالْعُرُوْضِ بَاعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفَ مَالِهِ بِنِصْفِ مَالِ الْاٰخَرِ، ثُمَّ عَقَدَ الشَّرِكَةَ قَالَ وَهٰذِهِ الشَّرِكَةُ مِلْكٌ لِمَا بَيَّنَّا اَنَّ الْعُرُوْضَ لَا تَصِحُّ رَأْسَ مَالِ الشَّرِكَةِ، وَتَأْوِيْلُهُ اِذَا كَانَ قِيْمَةُ مَتَاعِهِمَا عَلَى السَّوَاءِ، وَلَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا تَفَاوُتٌ يَبِيْعُ صَاحِبُ الْاَقَلِّ بِقَدْرِ مَا يَثْبُتُ بِهِ الشَّرِكَةُ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যখন সাধারণ পণ্য-দ্রব্যের দ্বারা অংশীদারিত্ব সম্পন্ন করতে চাইবে, তখন উভয়ের প্রত্যেকে নিজের অর্ধেক মাল অপরের অর্ধেক মালের বিনিময়ে বিক্রি করবে। অতঃপর অংশীদারিত্ব চুক্তি সম্পন্ন করবে। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, এটা হলো মালিকানার অংশীদারিত্ব। কেননা আমরা বর্ণনা করে এসেছি যে, সাধারণ পণ্যদ্রব্য শিরকাতের মূলধন হতে পারে না। সুতরাং ইমাম কুদূরী (র.) এখানে যা উল্লেখ করেছেন তার ব্যাখ্যা এই যে, উভয়ের পণ্যের মূল্য যখন সমান হয়। পক্ষান্তরে উভয় পণ্যের মাঝে যদি মূল্যগত তারতম্য হয় তাহলে কম মূল্য সম্পন্ন মালের মালিক ঐ পরিমাণের বিনিময়ে বিক্রি করবে যা দ্বারা শিরকাত সিদ্ধ হতে পারে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ব থেকেই আলোচিত হয়ে আসছে যে, সাধারণ পণ্য-দ্রব্য দ্বারা শিরকাত সহীহ হয় না। কিন্তু মানুষ কখনো সাধারণ পণ্য-দ্রব্য দ্বারাও শিরকাত করার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। তাই ইমাম কুদূরী (র.) মানুষের উপকারার্থে আলোচ্য ইবারতে একটি হীলা বা কৌশল বর্ণনা করেছেন। যা অবলম্বনে সাধারণ পণ্য-দ্রব্য দ্বারাও শিরকাত সহীহ হতে পারে।

হীলাটি হলো এই যে, দুজন লোক যদি নিজ নিজ পণ্যদ্রব্য দ্বারা পরস্পর শিরকাত সম্পাদন করতে চায়, তাহলে প্রথমে তারা উভয়ে নিজের অর্ধেক পণ্য-দ্রব্য অপরের অর্ধেক পণ্য-দ্রব্যের বিনিময়ে বিক্রি করে দিবে। ফলে প্রত্যেক শরিকের অর্ধেক পণ্য অপর শরিকের নিকট মাযমূন বা দায়ভুক্ত থাকবে মূল্য হিসাবে। এবং তখন উক্ত পণ্য-দ্রব্য বিক্রয় করে যে মুনাফা অর্জন হবে, তাহলে দায়ভুক্ত সম্পদের মুনাফা, যা ভোগ করা বৈধ। অতএব, এভাবে শিরকাত জায়েজ হবে।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, বর্ণিত শিরকাতটি শিরকাতে মিল্‌ক হবে। শিরকাতে মুফাওয়াযা হবে না। কেননা আমরা ইতিপূর্বে বলে এসেছি যে, সাধারণ পণ্যদ্রব্য শিরকাতের মূলধন হতে পারে না। এর দ্বারা বুঝা যায়, ইমাম কুদূরী (র.) এর মত হিদায়া গ্রন্থকার গ্রহণ করেননি বরং তিনি তার বিপরীত মত পোষণ করেন।

তবে ইমাম কুদূরী (র.)-এর মতের ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন মনে করেন হিদায়া গ্রন্থকার। কেননা ইমাম কুদূরী (র.)-এর কথাটি সম্পূর্ণ ব্যাপক। তিনি বলেছেন, সাধারণ পণ্যের মাধ্যমে দুজন লোক শিরকাত করতে চাইলে প্রত্যেকে নিজের অর্ধেক পণ্য অন্যের অর্ধেক পণ্যের বিনিময়ে বিক্রি করবে। এরপর আকদ করবে। অথচ এ ব্যবস্থা সর্বক্ষেত্রের জন্য নয়। বরং কিছু ক্ষেত্রের জন্য। তাই হিদায়া গ্রন্থকার বলেন ইমাম কুদূরী (র.) এর কথার ব্যাখ্যা হলো, যদি উভয় পক্ষের পণ্য সমান মূল্যের হয়, তাহলেই কেবল প্রত্যেক নিজের অর্ধেক পণ্য অন্যের অর্ধেক পণ্যের বিনিময়ে বিক্রয় করবে। পক্ষান্তরে যদি উভয়ের পণ্যের মাঝে মূল্যগত তারতম্য থাকে অর্থাৎ একজনের পণ্যের দাম কম ও অপরজনের পণ্যের দাম বেশি হয়, তাহলে প্রত্যেককে তার অর্ধেক পণ্য বিক্রি করতে হবে না; বরং কম পণ্যের মালিক এতটুকু পণ্য বিক্রয় করবে, যার দ্বারা শিরকাত সম্পাদিত হয়। যেমন একজনের পণ্যের পূর্ণ মূল্য হলো চারশত দিরহাম। অপরজনের পণ্যের মোট মূল্য একশত দিরহাম। এমতাবস্থায় দ্বিতীয় ব্যক্তি তার পণ্যের চার পঞ্চমাংশ তথা পাঁচ ভাগের চার ভাগ অপর শরিকের নিকট তার এক পঞ্চমাংশ পণ্যের বিনিময়ে বিক্রয় করবে। এভাবে মিশ্রিত করলে পণ্যের পরিমাণ পাঁচ ভাগ হবে। তন্মধ্যে একভাগের মালিক একজন। অবশিষ্ট চার ভাগের মালিক অপরজন। এক ভাগের মালিক যে ব্যক্তি, সে অর্জিত মুনাফা হতে এক ভাগ পাবে। আর যে চার ভাগের মালিক সে মুনাফা হতেও চার ভাগ পাবে।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ وَأَمَّا شِرْكَةُ الْعِنَانِ فَتَنْعَقِدُ عَلَى الْوَكَالَةِ دُوْنَ الْكَفَالَةِ، وَهِيَ أَنْ يَشْتَرِكَ اِثْنَانِ فِيْ نَوْعِ بُرٍّ أَوْ طَعَامٍ، أَوْ يَشْتَرِكَانِ فِيْ عُمُوْمِ التِّجَارَاتِ وَلَا يَذْكُرَانِ الْكَفَالَةَ، وَانْعِقَادُهُ عَلَى الْوَكَالَةِ لِتَحَقُّقِ مَقْصُوْدِهِ كَمَا بَيَّنَّاهُ، وَلَا تَنْعَقِدُ عَلَى الْكَفَالَةِ؛ لِاَنَّ اللَّفْظَ مُشْتَقٌّ مِنَ الْاِعْرَاضِ يُقَالُ عَنَّ لَهُ : اَيْ اَعْرَضَ، وَهٰذَا لَا يُنْبِئُ عَنِ الْكَفَالَةِ وَحُكْمُ التَّصَرُّفِ لَا يَثْبُتُ بِخِلَافِ مُقْتَضَى اللَّفْظِ.

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, আর শিরকাতুল ইনান এই ভিত্তিতে সম্পন্ন হয় যে, পরস্পর পরস্পরের প্রতিনিধি বা উকিল হবে। কিন্তু কফীল বা দায়বহনকারী হবে না। এর রূপ এই যে, দুজন ব্যক্তি বিশেষ কোনো প্রকারের বস্ত্র বা খাদ্য-দ্রব্যে অংশীদারিত্ব গ্রহণ করবে, কিংবা সাধারণ বাণিজ্যে অংশীদারিত্ব গ্রহণ করবে কিন্তু কাফালাত (একে অপরের দায় বহনের কথা) উল্লেখ করবে না।

ওয়াকালাতের ভিত্তিতে সংঘটিত হওয়ার প্রয়োজন এজন্য যে, যাতে শিরকাতের আসল উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হয়। যেমন পূর্বে আমরা বলে এসেছি।

আর কাফালাতের ভিত্তিতে সংঘটিত না হওয়ার কারণ এই যে, (عنان) ইনান শব্দটি অর্থগত দিক থেকে কাফালাতের অর্থ ধারণ করে না। কেননা এ অর্থ হলো এড়িয়ে যাওয়া। আর এর দ্বারা কাফালাতের ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। যেকোনো কর্মের বিধান শব্দের অর্থগত চাহিদার বিপরীতে সাব্যস্ত হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরকাতুল আকদের প্রথম প্রকার তথা শিরকাতুল মুফাওয়াযাহ : আলোচনা শেষ হওয়ার পর মুসান্নিফ (র.) দ্বিতীয় প্রকারের তথা শিরকাতুল আনানের আলোচনা শুরু করছেন।

তিনি বলেন, শিরকাতুল ইনান শুধু ওয়াকালাতের ভিত্তিতে সম্পাদিত হবে। কাফালাতের ভিত্তিতে নয়। অর্থাৎ শিরকাতুল যে দু ব্যক্তির মাঝে সম্পাদিত হবে তাদের একজন অপর জনের উকিল হবে কাফীল হবে না।

শিরকাতুল ইনান সম্পাদনের প্রক্রিয়া হলো কোনো বস্ত্র-খাদ্যের কিংবা ব্যাপক ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্যে একে অপরের শরিক হওয়া এবং কাফালাতের প্রসঙ্গ উল্লেখ না করা।

শিরকাতুল ইনান ওয়াকালাতের উপর সংঘটিত হওয়ার কারণ : পূর্বে বলা হয়েছে যে, ইনান ওয়াকালাতের ভিত্তিতে সংঘটিত হয়। অর্থাৎ শরিকদ্বয় পরস্পর একে অন্যের উকিল হয়ে থাকে। এর কারণ হলো, শিরকাতের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন কেননা শিরকাতের উদ্দেশ্য হলো একজনের সম্পদে অন্যজনের তসরুফ বৈধ হওয়া। এটি হয়ে থাকে ওয়াকালাতের মাধ্যমে। অতএব, যদি শরিকদ্বয় একে অপরের উকিল না হয়, তাহলে একের সম্পদে অন্যে তসরুফ করতে পারবে না। ফলে শিরকাতের আসল উদ্দেশ্যই পণ্ড হয়ে যাবে। বিধায় শিরকাতুল ইনান ওয়াকালাতের ভিত্তিতে সংঘটিত হয়।

শিরকাতুল ইনান কাফালাতের ভিত্তিতে সংঘটিত না হওয়ার কারণ : পূর্বে বলা হয়েছে শিরকাতুল ইনান কাফালাতের ভিত্তিতে সংঘটিত হয় না। এর কারণ হলো অন্যান্য শব্দটি কাফালাতের অর্থ ধারণ করে না। কেননা عنان শব্দের মূল অর্থ হলো এড়িয়ে যাওয়া বা বিমুখ হওয়া।

আর যে কোনো তসরুফের হুকুম শব্দের চাহিদার বিপরীত সাব্যস্ত হয় না। বিধায় ইনান কাফালাতের ভিত্তিতে সংঘটিত হতে পারে না।

https://e-ilm.weebly.com/

وَيَصِحُّ التَّفَاضُلُ فِي الْمَالِ لِحَاجَةٍ اِلَيْهِ وَلَيْسَ مِنْ قَضِيَّةِ اللَّفْظِ الْمُسَاوَاةُ . وَيَصِحُّ اَنْ يَتَسَاوَيَا فِي الْمَالِ وَيَتَفَاضَلَا فِي الرِّبْحِ وَقَالَ زُفَرُ وَالشَّافِعِيُّ رحـ : لَا تَجُوْزُ لِاَنَّ التَّفَاضُلَ فِيْهِ يُؤَدِّي اِلَى رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ، فَاِنَّ الْمَالَ اِذَا كَانَ نِصْفَيْنِ وَالرِّبْحَ اَثْلَاثًا فَصَاحِبُ الزِّيَادَةِ يَسْتَحِقُّهَا بِلَا ضَمَانٍ، اِذِ الضَّمَانُ بِقَدْرِ رَأْسِ الْمَالِ. وَلِاَنَّ الشَّرِكَةَ عِنْدَهُمَا فِي الرِّبْحِ لِشَرِكَةٍ فِي الْاَصْلِ، وَلِهٰذَا يَشْتَرِطَانِ الْخَلْطَ. فَصَارَ رِبْحُ الْمَالِ بِمَنْزِلَةِ نَمَاءِ الْاَعْيَانِ فَيُسْتَحَقُّ بِقَدْرِ الْمِلْكِ فِي الْاَصْلِ . وَلَنَا قَوْلُهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ ﴿الرِّبْحُ عَلَى مَا شَرَطَا. وَالْوَضِيْعَةُ عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ﴾ وَلَمْ يُفَصِّلْ، وَلِاَنَّ الرِّبْحَ كَمَا يُسْتَحَقُّ بِالْمَالِ يُسْتَحَقُّ بِالْعَمَلِ كَمَا فِي الْمُضَارَبَةِ؛ وَقَدْ يَكُوْنُ اَحَدُهُمَا اَحْذَقَ وَاَهْدٰى وَاَكْثَرَ عَمَلًا وَاَقْوٰى فَلَا يَرْضٰى بِالْمُسَاوَاةِ فَمَسَّتِ الْحَاجَةُ اِلَى التَّفَاضُلِ،

অনুবাদ : আর উভয়ের যৌথ সম্পদের পরিমাণে তারতম্য হওয়া বৈধ। কেননা এর প্রয়োজন রয়েছে। আর ইনান শব্দটির অর্থগত চাহিদা ও দাবি নয়।

সম্পদের পরিমাণের ক্ষেত্রে উভয়ের সমান হওয়া এবং মুনাফার ক্ষেত্রে বেশ-কম হওয়াও বৈধ। ইমাম যুফার ও ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, তা বৈধ নয়। কেননা এক্ষেত্রে তারতম্য এমন সম্পদের মুনাফা গ্রহণকে অপরিহার্য করে যার দায় সে বহন করেনি। কেননা সম্পদ যখন সমান দুই ভাগ হবে আর মুনাফা (উদাহরণ স্বরূপ) তিন ভাগ হবে তখন অতিরিক্ত মুনাফা গ্রহণকারী সম্পদের দায়বহন ছাড়াই অতিরিক্ত মুনাফা ভোগকারী হবে। কেননা দায় তো মূলধনের পরিমাণ অনুপাতে হয়ে থাকে।

তাছাড়া দ্বিতীয় কারণ এই যে, ইমাম যুফার ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে মূলধনে অংশীদারিত্বের কারণে মুনাফার মধ্যে অংশীদারিত্ব সাব্যস্ত হয়। এ কারণেই তারা উভয়ের সম্পদের মিশ্রণের শর্তারোপ করেন। সুতরাং সম্পদের মুনাফা মূলতঃ মূল সম্পদের (সত্তাগত) বৃদ্ধির সমপর্যায়ের হলো। কাজেই সে মূলধনের মালিকানার পরিমাণে হকদার হবে। আমাদের দলিল হলো নবী করীম ﷺ এর বাণী–

الرِّبْحُ عَلَى مَا شَرَطَا. وَالْوَضِيْعَةُ عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ

মুনাফা সাব্যস্ত হবে উভয়ের নির্ধারিত শর্তের ভিত্তিতে, পক্ষান্তরে লোকসান সাব্যস্ত হবে উভয় মূলধনের পরিমাণের ভিত্তিতে। এখানে তিনি (মুনাফার সমতা ও তারতম্যের মাঝে) কোনো পার্থক্য করেননি, তাছাড়া দলিল এই যে, (বিনিয়োগকৃত) সম্পদের বিনিময়ে যেমন মুনাফার হকদার হওয়া যায় তেমনি শ্রম ও কর্মের বিনিময়েও হকদার হওয়া যায়। যেমন– মোদারাবার ক্ষেত্রে। আর কখনো দুই শরিকের একজন অধিকতর দক্ষ, পরিপক্ক। কর্মপটু ও সামর্থ্যবান হতে পারে তখন স্বভাবতই সে সমান মুনাফায় সম্মত হবে না। তাই মুনাফার তারতম্য করার প্রয়োজন দেখা দিবে।

https://e-ilm.weebly.com/

بِخِلَافِ اشْتِرَاطِ جَمِيْعِ الرِّبْحِ لِاَحَدِهِمَا لِاَنَّهُ يَخْرُجُ الْعَقْدُ بِهِ مِنَ الشَّرِكَةِ وَمِنَ الْمُضَارَبَةِ اَيْضًا اِلَى قَرْضٍ بِاشْتِرَاطِهِ لِلْعَامِلِ اَوْ اِلَى بِضَاعَةٍ بِاشْتِرَاطِهِ لِرَبِّ الْمَالِ، وَهٰذَا الْعَقْدُ يُشْبِهُ الْمُضَارَبَةَ مِنْ حَيْثُ اَنَّهُ يَعْمَلُ فِيْ مَالِ الشَّرِيْكِ، وَيُشْبِهُ الشَّرِكَةَ اِسْمًا وَعَمَلًا فَاِنَّهُمَا يَعْمَلَانِ فَعَمِلْنَا بِشَبَهِ الْمُضَارَبَةِ . وَقُلْنَا : يَصِحُّ اشْتِرَاطُ الرِّبْحِ مِنْ غَيْرِ ضَمَانٍ وَيُشْبِهُ الشَّرِكَةَ حَتّٰى لَا تَبْطُلَ بِاشْتِرَاطِ الْعَمَلِ عَلَيْهِمَا .

অনুবাদ : পক্ষান্তরে সম্পূর্ণ মুনাফা দুজনের একজনের জন্য শর্ত করার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা এতে করে কৃত চুক্তিটি অংশীদারিত্ব থেকে এবং মোদারাবা থেকেও বের হয়ে যায়। এবং সম্পূর্ণ মুনাফা শ্রমদাতার অনুকূলে শর্ত করলে চুক্তিটি ঋণ প্রদানের চুক্তিতে রূপান্তরিত হয় আর মূলধন দাতার অনুকূলে শর্তারোপ করলে শিরকাত বাদা'আত রূপান্তরিত হয়। তাছাড়া এই চুক্তিটি এ দিক থেকে মুদারাবার সদৃশ্য যে সে অপর শরিকদারের মূলধনে পরিশ্রম করে। পক্ষান্তরে নামগত দিক থেকে এবং কর্মগত দিক থেকে তা শিরকাতুল মুফাওয়াযার সদৃশ। কেননা (উভয়টিকে শিরকাত বা অংশীদারিত্ব বলা হয়। আর) উভয়ে পরিশ্রম করে। তাই আমরা মোদারাবার সাথে সাদৃশ্যের বিষয়টি বিবেচনায় এনে "দায়বহন" ব্যতিরেকে মুনাফার শর্তারোপ। বৈধ হওয়ার কথা বলেছি। আবার শিরকাতুল মুফাওয়াযার সাথে সাদৃশ্যের বিষয়টিও আমরা বিবেচনায় এনেছি। তাই উভয়ের শ্রমদানের শর্তারোপ করাতে তা বাতিল হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিউক্ত ইবারতে ইনান সম্পর্কিত একটি হুকুম ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট একটি ইখতিলাফী মাসআলা বর্ণনা করেছেন।

শিরকাতে ইনান সম্পর্কিত হুকুমটি হলো এই যে, ইনান শব্দটি অভিধানগতভাবে সমতা দাবি করে না। তাই যাদের মাঝে শিরকাত সম্পাদিত হবে তাদের সম্পদের পরিমাণ সমান হওয়া অবশ্যক নয়। বরং শরিকদের সম্পদ কম-বেশি হতে পারে এবং বাস্তবেও এমনটির প্রয়োজন পড়ে।

ইখতিলাফী মাসআলা : উভয় শরিকের সম্পদ যদি সমান হয় কিন্তু মুনাফা বন্টন অসমান হয়, তাহলে তা জায়েজ হবে কি-না? যেমন- উভয়ের মূলধন সমান হওয়া অবস্থায় শর্ত করা হলো, অর্জিত মুনাফার দুভাগ একজন নেবে আর একভাগ অপরজন নেবে।

তো এ বিষয়ে ফকীহগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে। আহনাফ ও ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর মতে এটা জায়েজ আছে। তাছাড়া দলিল এই যে, (বিনিয়োগকৃত) সম্পদের বিনিময়ে যেমন মুনাফার হকদার হওয়া যায়, তেমনি শ্রম ও কর্মের বিনিময়েও হওয়া যায়। যেমন মুদারাবার ক্ষেত্রে। আর কখনো দুই শরিকের একজন অধিকতর দক্ষ, পরিপক্ক, কর্মপটু ও সামর্থ্যবান হয়। তখন স্বভাবতই সে সমান মুনাফায় সম্মত হবে না। তাই মুনাফার তারতম্য করার প্রয়োজন দেখা দিবে।

পক্ষান্তরে সম্পূর্ণ মুনাফা দুজনের একজনের জন্য শর্তকরার বিষয়টি ভিন্ন, কেননা এতে করে কৃতচুক্তিটি অংশীদারিত্ব থেকে এবং মুদারাবা থেকেও বেরিয়ে যায়। এবং সম্পূর্ণ মুনাফা শ্রমদাতার অনুকূলে শর্ত করলে চুক্তিটি ঋণ প্রদানের চুক্তিতে রূপান্তরিত হয়। আর মূলধন দাতার অনুকূলে শর্ত করলে বাদাআতে রূপান্তরিত হয়।

https://e-ilm.weebly.com/

তাছাড়া এ চুক্তিটি এদিক থেকে মুদারাবার সদৃশ যে, সে অপর শরিকের মূলধনে পরিশ্রম করে। পক্ষান্তরে নামগত দিক থেকে এবং কর্মগত দিক থেকে তা শিরকাতুল মুফাওয়াযার সদৃশ। কেননা (উভয়টিকে শিরকাত বা অংশীদারিত্ব বলা হয়।) আর উভয়ে কাজ করে।

তাই আমরা মুদারাবার সাথে সাদৃশ্যের বিষয়টি বিবেচনায় এনে দায়বহন ব্যতিরেকে মুনাফার শর্তারোপ বৈধ হওয়ার কথা বলেছি। পক্ষান্তরে ইমাম যুফার (র.) ইমাম শাফেয়ী (র.) ও ইমাম মালেক (র.)-এর মতে জায়েজ নয়।

দলিল পর্ব : ইমাম যুফার (র.) ও তার সমমতাবলম্বীদের দলিল :

১. মূলধন সমান হওয়া অবস্থায় মুনাফা বণ্টনের কম-বেশ করা হলে দায়বহন ব্যতীত মুনাফা ভোগ করা অবধারিত হয়। অথচ এটা শরিয়তে নিষিদ্ধ।

কেননা যদি শরিকদ্বয়ের মূলধন সমান অর্ধেক অর্ধেক যেমন পাঁচশ পাঁচশ দিরহাম হয় এবং অর্জিত মুনাফা কে তিন ভাগে ভাগ করে এক শরিক দুই ভাগ নেয় আর অপর শরিক একভাগ নেয়, তাহলে যে শরিক মুনাফার দুই ভাগ নিল, সে তার মুনাফার কিছু অংশ সম্পদের দায়-বহন ব্যতীত নিয়েছে। কেননা দায় সাব্যস্ত হয় মূলধনের পরিমাণ অনুপাতে। সুতরাং প্রত্যেক শরিক অর্ধেক মূলধনের মালিক, তখন প্রত্যেক শরিকই অর্ধেক মূলধনের জামিন বা দায়বহনকারী। অতএব, মুনাফাও উভয় শরিক অর্ধাঅর্ধি পাবে। কম বেশ করা জায়েজ হবে না।

২. ইমাম যুফার ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, মুনাফার মধ্যে অংশীদারিত্ব সাব্যস্ত মূলধনের অংশীদারিত্বের কারণে। তাই তারা শরিকগণের মূলধন সংমিশ্রিত করার শর্তারোপ করেন। সুতরাং যদি শরিকদ্বয় নিজেদের মূলধন পরস্পর সংমিশ্রিত না করে পৃথক পৃথক রেখে দেয়, তাহলে তাদের মাঝে শিরকাত সম্পাদিত হবে না।

তাই বলা যায়, ইমাম যুফার ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে মূলধন খাটিয়ে অর্জিন মুনাফা বস্তুর বর্ধিত অংশের ন্যায়। অতএব, বস্তুর বর্ধিত অংশ যেমন বস্তুর মালিকানা অনুপাতে বণ্টন হয়, তেমনি মূলধন খাটিয়ে অর্জিত মুনাফা ও মূলধনের মালিকানা অনুপাতে বণ্টন হবে। উদাহরণ স্বরূপ, দুজন লোক যদি সমান টাকা দিয়ে একটি ছাগল ক্রয় করে এবং কিছুকাল পর ছাগলটি দুটি বাচ্চা প্রসব করে, তাহলে এক শরিক একটি বাচ্চারই মালিক হবে। যেহেতু ছাগলের মালিকানার ক্ষেত্রে উভয়ে সমান। তাই বর্ধিত অংশের মাঝেও উভয় সমান হবে। কেউ কম-বেশি নিতে পারবে না। তদ্রূপ দু'জন লোক সমান সমান মূলধন নিয়ে শিরকাত সম্পাদন করার পর যে মুনাফা অর্জিত হবে, তা উভয়ে সমান ভাগে ভাগ করে নিবে। কম-বেশ করা যাবে না।

আহনাফ ও ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর দলিল :

১. রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী– الرِّبْحُ عَلَى مَا شَرَطَا، وَالْوَضِيْعَةُ عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ মুনাফা বণ্টন হবে শরিকদ্বয়ের আরোপিত শর্ত অনুযায়ী আর লোকসান ভোগ করবে প্রত্যেকেই তার মূলধনের পরিমাণ অনুযায়ী। অর্থাৎ মূলধন যদি অর্ধাঅর্ধি হয় তাহলে লোকসান ও উভয়ের উপর অর্ধাঅর্ধি হারে বর্তাবে। কিন্তু মুনাফা বণ্টন হবে আকদের সময় সিদ্ধান্তকৃত শর্ত অনুযায়ী। যদি সমান হারে বণ্টনের শর্ত থাকে, তাহলে সমান হারে বণ্টিত হবে, যদি কম বেশ করে বণ্টনের শর্ত থাকে তাহলে কম বেশ করে বণ্টিত হবে।

লক্ষণীয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ শর্ত অনুযায়ী মুনাফা বণ্টনের নির্দেশ দিয়েছেন। সমান হারে বণ্টন ও মর্ম-বেশ করে বণ্টনের মাঝে তিনি কোনো পার্থক্য করেননি।

অতএব, প্রমাণিত হয় যে, মূলধনে সমান অংশীদারিত্ব থাকা অবস্থায় কম-বেশ করে মুনাফা অনুযায়ী কম-বেশ করেই মুনাফা বণ্টন হবে।

২. মূলধনের দ্বারা যেমন মুনাফার অংশীদার হওয়া যায়, তেমনি শ্রমের দ্বারাও মুনাকার অংশীদার হওয়া যায়। যেমন- মুদারাবার মধ্যে মুদারিব ব্যক্তি মূলধনের মালিক থাকে না; বরং মূলধন পুরোটাই দিয়ে থাকে রাব্বুল মাল, মুদারিব শুধু শ্রম দেয় এবং শ্রমের বিনিময়েই সে মুনাফার অংশীদার হয়।

https://e-ilm.weebly.com/

আর শ্রমের উভয় শরিক সমান নাও হতে পারে। কেননা হতে পারে একজন অপরজনের তুলনায় বেশি দক্ষ, বিচক্ষণ ও বেশি-কর্মঠ। এমতাবস্থায় সে সমহারে মুনাফা বন্টনের বিষয়টি হয়তো মেনে নিবে না; বরং সে অতিরিক্ত মুনাফার দাবি করবে। সুতরাং বাস্তবেও কম-বেশ করে মুনাফা বন্টনের প্রয়োজন রয়েছে।

অতএব, মূলধনের মধ্যে উভয়ের মালিকানা সমান হওয়া সত্ত্বেও শর্ত অনুযায়ী কম-বেশ করে মুনাফা বন্টন করা জায়েজ হবে।

একটি প্রশ্নও তার উত্তর : আহনাফের মতের উপর প্রশ্ন উত্থাপন করে কেউ বলতে পারে যে, আপনাদের মতে যেহেতু এক শরিকের জন্য বেশি মুনাফার শর্ত করা জায়েজ আছে, সেহেতু যদি এক শরিকের জন্য সম্পূর্ণ মুনাফার শর্ত করা হয়, তাহলেও জায়েজ হওয়ার কথা। কিন্তু আহনাফ তা না জায়েজ বলেন, এর কারণ কী?

উত্তর : কোনো এক পক্ষের জন্য সম্পূর্ণ মুনাফার শর্ত করা হলে আকদটি শিরকাত থাকে না, মুদারাবাহও থাকে না, বরং তা অন্য কিছু হয়ে যায়। তাই কোনো পক্ষের জন্য সম্পূর্ণ মুনাফার শর্ত করা জায়েজ নয়।

চুক্তি শিরকাত না থাকার কারণ হলো এই যে, শিরকাত বলাই হয় মুনাফা যৌথ হওয়াকে। অতএব, যদি মুনাফা যৌথ না হয়ে কোনো এক পক্ষের হয়ে যায় তাহলে তা শিরকাত নয়। অনুরূপভাবে মুদারাবা'র ক্ষেত্রে যদি কোনো এক পক্ষের জন্য সম্পূর্ণ মুনাফার শর্ত করা হয়, তাহলেও তা মুদারাবা থাকে না। কেননা যদি মুদারিবের জন্য সম্পূর্ণ মুনাফার শর্ত করা হয় তাহলে মুদারাবার চুক্তিটি কর্‌জ তথা ঋণদানের চুক্তিতে পরিণত হয়ে যায় অর্থাৎ যেন রাব্বুলমাল কিছু মূলধন মুদারিব কে ঋণ দিয়েছে। সে উক্ত ঋণের অর্থ ব্যবসায় খাটিয়ে মুনাফা অর্জন করছে।

আর যদি সম্পূর্ণ মুনাফার শর্তটি রাব্বুল মালের জন্য করা হয়, তাহলে মুদারাবার চুক্তিটি (بضاعة) বাদাআ-য় পরিণত হয়। بضاعة (বাদা'আ) বলা হয়, কারো নিকট ব্যবসা করার জন্য, মূলধন সোপর্দ করা এ শর্তে যে, ব্যবসায় যে মুনাফা হবে তার পুরোটাই রাব্বুল মাল তথা পুঁজিপতি নিয়ে যাবে। যে ব্যবসা করে, সে কিছুই পাবে না।

সুতরাং মুদারাবার মধ্যে রাব্বুল মালের জন্য সম্পূর্ণ মুনাফার শর্ত করা হলে কেমন যেন, সে একজনকে অর্থ প্রদান করল ব্যবসা করে তাকে মুনাফা দেওয়ার জন্য।

মোটকথার শিরকাত ও মুদারাবার মধ্যে কোনো এক শরিকের জন্য সম্পূর্ণ মুনাফার শর্ত করা বৈধ নয়।

ইমাম যুফার ও ইমাম শাফেয়ী (র.) এর জবাব : ইমাম যুফারও ইমাম শাফেয়ী বলেছিলেন, মূলধন সমান হওয়া অবস্থায় মুনাফা কম-বেশ করে বন্টন করা হলে দায় বহন ব্যতীত মুনাফা ভোগ করা হয় যা অবৈধ।

এর জবাবে গ্রন্থকার বলেন, শিরকাতে আনানের চুক্তিটি মূলত দুই বিষয়ের সাথে সাদৃশ্য রাখে। মুদারাবার সাথে সাদৃশ্য রাখে, শিরকাতুল মুফাওয়াযার সাথেও সাদৃশ্য রাখে। আমরা উভয় সাদৃশ্যের বিবেচনা করেছি। মুদারাবার সাথের সাদৃশ্যের বিবেচনা করে আমরা বলেছি দায়বহন ব্যতীতও মুনাফা ভোগ করা সহীহ হবে। যেমন মুদারাবার মধ্যে সহীহ হয়। আর শিরকাতুল মুফাওয়াযার সাথের সাদৃশ্য বিবেচনা করে আমরা বলেছি, শিরকাতুল ইনানের মধ্যে উভয় পক্ষের শ্রমের শর্ত করা হলে চুক্তি বাতিল হবে না। যেমন শিরকাতুল মুফাওয়াযার মধ্যে উভয় পক্ষের শ্রমের শর্ত করা হলে বাতিল হয় না। বাকি থাকল মুদারাবা ও শিরকাতুল মুফাওয়াযার সাথে শিরকাতুল ইনান কিভাবে সাদৃশ্য রাখে- এ প্রশ্ন : এর জবাব নিম্নরূপ : শিরকাতুল ইনান মুদারাবার সাথে এভাবে সাদৃশ্য রাখে যে, মুদারাবার মধ্যে মুদারিব ব্যক্তি রাব্বুল মালের সম্পদে শ্রম দিয়ে থাকে। তদ্রূপ শিরকাতুল ইনানের মধ্যেও প্রত্যেক শরিক অপর শরিকের সম্পদে শ্রম দিয়ে থাকে। আর শিরকাতুল মুফাওয়াযার সাথে সাদৃশ্য রাখে দু'ভাবে। নামগতভাবে ও কার্যতভাবে। নামগত সাদৃশ্য রাখার অর্থ হলো ইনান-ও মুফাওয়াযা উভয়ই শিরকাত। আর কার্যত সাদৃশ্যের অর্থ হলো শিরকাতুল মুফাওয়াযার মধ্যে যেমন শরিকদ্বয়ের প্রত্যেকেই অপর শরিকের সম্পদে শ্রম দিয়ে থাকে, তেমনি শিরকাতুল ইনানের মধ্যেও উভয় শরিক একে অপরের সম্পদে শ্রম দিয়ে থাকে। এভাবেই শিরকাতুল ইনান মুদারাবা ও শিরকাতুল মুফাওয়াযাহর সাথে সাদৃশ্য রাখে।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ وَيَجُوْزُ اَنْ يَعْقِدَهَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِبَعْضِ مَالِهِ دُوْنَ الْبَعْضِ لِاَنَّ الْمُسَاوَاةَ فِي الْمَالِ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ فِيْهِ اِذْ اللَّفْظُ لَا يَقْتَضِيْهِ وَلَا يَصِحُّ اِلَّا بِمَا بَيَّنَّا اَنَّ الْمُفَاوَضَةَ تَصِحُّ بِهِ لِلْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ وَيَجُوْزُ اَنْ يَشْتَرِكَا وَمِنْ جِهَةِ اَحَدِهِمَا دَنَانِيْرُ وَمِنَ الْاٰخَرِ دَرَاهِمُ، وَكَذَا مِنْ اَحَدِهِمَا دَرَاهِمُ بِيْضٌ وَمِنَ الْاٰخَرِ سُوْدٌ وَقَالَ زُفَرُ وَالشَّافِعِيُّ رحـ : لَا يَجُوْزُ، وَهٰذَا بِنَاءٌ عَلَى اِشْتِرَاطِ الْخَلْطِ وَعَدَمِهِ فَاِنَّ عِنْدَهُمَا شَرْطٌ وَلَا يَتَحَقَّقُ ذٰلِكَ فِيْ مُخْتَلِفِي الْجِنْسِ، وَسَنُبَيِّنُهُ مِنْ بَعْدِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, **উভয়ের প্রত্যেকে তার সম্পদের একাংশ বাদ দিয়ে অন্য অংশ দ্বারা এই অংশীদারি চুক্তি সম্পাদন করতে পারে।** কেননা عنان (ইনান) শব্দটি যেহেতু শব্দগতভাবে সমতা দাবি করে না সেহেতু সম্পদের সমতা তাতে শর্ত হবে না। **আর যে সকল সম্পদ দ্বারা শিরকাতুল মুফাওয়াযা সম্পাদন করা শুদ্ধ হয় বলে আমরা উল্লেখ করেছি,** সেগুলো দ্বারাই শুধু শিরকাতুল ইনান সম্পাদন করা শুদ্ধ হবে। কারণ তা-ই, যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি।

এক পক্ষে দীনার এবং অন্যপক্ষে দিরহাম তদ্রূপ একপক্ষে সাদা দিরহাম এবং অন্যপক্ষে কালো দিরহাম হলেও উভয়ে অংশীদারিত্ব চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারবে।

ইমাম যুফার ও ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, তা জায়েজ নয়। এ মতপার্থক্যের ভিত্তি হলো সংমিশ্রণের শর্ত থাকা-না থাকার উপর। তাদের মতে উভয়ের সম্পদের মাঝে সংমিশ্রণের শর্ত রয়েছে আর তা ভিন্ন জাতীয় দুই সম্পদের মাঝে সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গটি ইনশা-আল্লাহ আমরা পরে বর্ণনা করব।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

عنان শব্দটি আভিধানিক অর্থ অনুসারে সমতার দাবি করে না, তাই শিরকাতুল ইনানের ক্ষেত্রে উভয় শরিকের সম্পদ সমান হওয়া শর্ত নয়। সুতরাং উভয় শরিকই নিজ সম্পদের অংশ বিশেষ দ্বারা শিরকাতুল ইনান সম্পাদন করতে পারবে। সম্পদের অংশ বিশেষ শিরকাতের বাইরেও রাখতে পারবে। যেমন কারো কাছে দুহাজার দিরহাম আছে, এমতাবস্থায় যদি সে একহাজার দিরহাম দ্বারা কারো সাথে শিরকাতুল আনানের চুক্তিতে আবদ্ধ হয়, তাহলে তা সহীহ হবে। বাকি একহাজার দিরহাম তার ব্যক্তিগত মালিকানা হিসাবে শিরকাতের বাইরে থাকবে।

পক্ষান্তরে শিরকাতুল মুফাওয়াযা তা শব্দগতভাবেই সমতার দাবিদার তাই সেক্ষেত্রে শরিকদ্বয় সম্পদের ক্ষেত্রে সমান সমান হওয়া শর্ত। শিরকাত সম্পাদনযোগ্য সম্পদের ক্ষেত্রে শরিকদ্বয়ের মালিকানা সমান না হলে মুফাওয়াযা শুদ্ধ হয় না।

যে সকল সম্পদ দ্বারা ইনান শুদ্ধ হয় :

যে সকল সম্পদ দ্বারা মুফাওয়াযা সম্পাদন করা সহীহ, সে সকল সম্পদ দ্বারা ইনান সম্পাদন করাও সহীহ। তা দীনার-দিরহামও চালু মুদ্রা। এ তিন প্রকার সম্পদ ছাড়া অন্যান্য সম্পদ দ্বারা যেমন মুফাওয়াযা সম্পাদন করা সহীহ তেমনি ইনান সম্পাদন করা সহীহ নয়। কারণ অন্যান্য সম্পদ দ্বারা চুক্তি সম্পাদন করা হলে তা দায়বহন ব্যতীত মুনাফা ভোগকরণ আবশ্যক করে, যা শরিয়তে নিষিদ্ধ।

قَوْلُهُ : وَيَجُوْزُ اَنْ يَشْتَرِكَا وَمِنْ جِهَةِ اَحَدِهِمَا الخ : উপরিউক্ত ইবারতের সারমর্ম হলো, যদি দুজনের একজন দিরহাম দিয়ে এবং অপরজন দীনার দিয়ে পরস্পরে শিরকাতের চুক্তিতে আবদ্ধ হয়, তাহলে তা জায়েজ হবে। অনুরূপভাবে একজন সাদা দিরহাম দিয়ে এবং অপরজন কালো দিরহাম দিয়ে যদি শিরকাত সম্পাদন করে তাহলে তাও জায়েজ হবে। উভয় সুরতে ইখতিলাফ করেন ইমাম যুফার (র.)ও ইমাম শাফেয়ী (র.) তারা বলেন, উপরিউক্ত শিরকাত সহীহ হবে না। কারণ তাদের মতে শিরকাত সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত হলো, উভয় শরিকের সম্পদ পরস্পরে মিশ্রিত করা। অতএব, দুজনের সম্পদ দুধরনের হলে যেহেতু মিশ্রিত করা সম্ভব নয়, সেহেতু তাদের মতে শর্ত অবিদ্যমান থাকার কারণে শিরকাতও সহীহ হবে না।

গ্রন্থকার বলেন, সংমিশ্রণ শর্ত কিনা-এ প্রসঙ্গটি সামনে আলোচিত হবে। ইনশা-আল্লাহ।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ وَمَا اشْتَرَاهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِلشَّرِكَةِ طُوْلِبَ بِثَمَنِهٖ دُوْنَ الْاٰخَرِ لِمَا بَيَّنَّا اَنَّهُ يَتَضَمَّنُ الْوَكَالَةَ دُوْنَ الْكَفَالَةِ، وَالْوَكِيْلُ هُوَ الْاَصْلُ فِي الْحُقُوْقِ. قَالَ ثُمَّ يَرْجِعُ عَلٰى شَرِيْكِهٖ بِحِصَّتِهٖ مِنْهُ مَعْنَاهُ اِذَا اَدّٰى مِنْ مَالِ نَفْسِهٖ: لِاَنَّهُ وَكِيْلٌ مِنْ جِهَتِهٖ فِيْ حِصَّتِهٖ فَاِذَا نَقَدَ مِنْ مَالِ نَفْسِهٖ رَجَعَ عَلَيْهِ، فَاِنْ كَانَ لَا يُعْرَفُ ذٰلِكَ اِلَّا بِقَوْلِهٖ فَعَلَيْهِ الْحُجَّةُ: لِاَنَّهُ يَدَّعِيْ وُجُوْبَ الْمَالِ فِيْ ذِمَّةِ الْاٰخَرِ وَهُوَ يُنْكِرُ، وَالْقَوْلُ لِلْمُنْكِرِ مَعَ يَمِيْنِهٖ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, **অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে তাদের উভয়ের প্রত্যেকে যা খরিদ করবে, তার মূল্যের ব্যাপারে তার কাছেই তাগাদা করবে, অপরজনের কাছে নয়।**

কেননা আমরা (পূর্বে) বর্ণনা করেছি যে, শিরকাতুল ইনান ওকালাত তথা প্রতিনিধিত্বকে অন্তর্ভুক্ত করে, কাফালাত তথা দায় বহনকে অন্তর্ভুক্ত করে না। আর হকের ক্ষেত্রে উকিলই মূল।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, **অতঃপর সে তার শরিকদারের কাছ থেকে তার হিসসা পরিমাণ মূল্য ফেরত চেয়ে নিবে।** অর্থাৎ যদি সে নিজ মাল থেকে মূল্য আদায় করে থাকে। কেননা সে তো অংশীদারের অংশ পরিমাণ ক্ষেত্রে তার পক্ষ থেকে উকিল। সুতরাং (ওকালতের নিয়ম হিসাবে) যখন সে নিজের মাল থেকে মূল্য পরিশোধ করবে, তখন সে তার কাছ থেকে ঐ অংশ ফেরত নিবে।

আর যদি এমন হয় যে, বিষয়টির সত্যতা তার বক্তব্য ছাড়া অন্য কোনোভাবে জানা সম্ভব নয়, তাহলে তাকে প্রমাণ উপস্থিত করতে হবে। কেননা সে অপরজনের দায়িত্বে মালের দায় সাব্যস্ত হওয়ার দাবি করছে; আর অপরজন অস্বীকার করছে। আর (সাক্ষ্য-প্রমাণ না থাকলে) কসমসহ অস্বীকারকারীর বক্তব্যই গ্রহণযোগ্য হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিউক্ত ইবারতের সারমর্ম ঃ শিরকাতুল ইনানের চুক্তিতে আবদ্ধ শরিকদের কেউ কোনো কিছু ক্রয় করলে, ক্রয়কৃত বস্তুর মূল্য' বিক্রেতা ব্যক্তি কেবল খরিদকারীর নিকটই চাইতে পারবে। অপর শরিকদারের নিকট চাইতে পারবে না। কারণ শিরকাতুল ইনানের চুক্তিতে আবদ্ধ ব্যক্তিদ্বয় একে অন্যের উকিল হয়, কফিল হয় না। যেহেতু একজন অপরজনের কফিল নয়, সেহেতু একজনের উপর সাব্যস্ত ঋণের জন্য অপরজনকে তাগাদা করা যাবে না। আর খরিদকারী ব্যক্তি যদিও অপর শরিকের পক্ষ হতে উকিল স্বরূপ এবং অপর শরিক মুয়াক্কিল স্বরূপ, তবুও অপর শরিকের নিকট তথা মুওয়াক্কেলের নিকট মূল্য চাওয়া যাবে না। কারণ যাবতীয় হক ও দেনা-পাওনার ক্ষেত্রে উকিলই হলেন মূল ব্যক্তি। মুয়াক্কেল নয়।

قَوْلُهٗ : ثُمَّ يَرْجِعُ عَلٰى شَرِيْكِهٖ بِحِصَّتِهٖ مِنْهُ الخ : উপরিউক্ত ইবারতের সারমর্ম হলো এই যে, শিরকাতুল ইনানের মাধ্যমে চুক্তিবদ্ধ শরিকদ্বয়ের কোনো একজন যদি কিছু খরিদ করার পর নিজের মাল দ্বারা খরিদকৃত মূল্য পরিশোধ করে দেয়, তাহলে সে অপর শরিকের নিকট থেকে উক্ত বস্তুর ঐ পরিমাণ মূল্য ফেরত পাবে, যে পরিমাণ তার হিসসা। যেমন- এক হাজার দিরহাম দ্বারা খরিদ করলে অপর শরিকের নিকট থেকে পাঁচ শত দিরহাম ফেরত নিবে,যদি শিরকাত অর্ধাঅর্ধি হারে সম্পাদিত হয়ে থাকে। কেননা খরিদকারী শরিক অপর শরিকের পক্ষ থেকে তার হিসসার উকিল স্বরূপ। আর অপর শরিক হলো মুয়াক্কিল। আর ওয়াকালাতের নিয়ম হলো, যদি মুওয়াক্কেলের জন্য খরিদকৃত বস্তুর মূল্য উকিল নিজ সম্পদ দ্বারা আদায় করে ফেলে, তাহলে সে উক্তমূল্য মোওয়াক্কেলের নিকট থেকে ফেরত পায়। সে হিসাবে আলোচ্য মাসআলায়ও খরিদকারী শরিক উকিল হওয়াতে অপর শরিক হতে তার হিসসার মূল্য ফেরত পাবে।

কিন্তু যদি ক্রয় করা সম্পর্কে এবং ক্রয়কৃত বস্তুর মূল্য সম্পর্কে জানার কোনো উপায় না থাকে, তাহলে ক্রয়কারী শরিক তার নিজদাবি বা বক্তব্যের পক্ষে প্রমাণ পেশ করবে। যেমন- এক শরিক যদি দাবি করে যে, আমি এক হাজার দিরহাম দ্বারা শিরকাতের জন্য একটি গোলাম ক্রয় করেছিলাম, পরে সে গোলামটি মরে গেছে। আর অপর শরিক তা প্রত্যাখ্যান করে বলছে না এমনটি হয়নি। তাহলে ক্রয়ের দাবিদার শরিককে প্রমাণ পেশ করতে হবে। কারণ সে অন্য শরিকের উপর আর্থিক দায় সাব্যস্ত হওয়ার দাবি করছে। আর অন্য শরিক তা অস্বীকার করছে। তাই দাবিদারকে নিজদাবির পক্ষে প্রমাণ পেশ করতে হবে। যদি খরিদকারী শরিক নিজদাবির পক্ষে প্রমাণ পেশ করতে না পারে তাহলে অপর শরিকের বক্তব্য কসমসহ গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা দাবিদার প্রমাণ পেশ করতে পারলে এটাই নিয়ম যে কসমসহ বিবাদীর কথা গ্রহণযোগ্য হয়।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ وَاِذَا هَلَكَ مَالُ الشَّرِكَةِ اَوْ اَحَدُ الْمَالَيْنِ قَبْلَ اَنْ يَشْتَرِيَا شَيْئًا بَطَلَتْ الشَّرِكَةُ لِاَنَّ الْمَعْقُوْدَ عَلَيْهِ فِيْ عَقْدِ الشَّرِكَةِ الْمَالُ، فَاِنَّهُ يَتَعَيَّنُ فِيْهِ كَمَا فِي الْهِبَةِ وَالْوَصِيَّةِ، وَبِهَلَاكِ الْمَعْقُوْدِ عَلَيْهِ يَبْطُلُ الْعَقْدُ كَمَا فِي الْبَيْعِ، بِخِلَافِ الْمُضَارَبَةِ وَالْوَكَالَةِ الْمُفْرَدَةِ؛ لِاَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ الثَّمَنَانِ فِيْهِمَا بِالتَّعْيِيْنِ، وَاِنَّمَا يَتَعَيَّنَانِ بِالْقَبْضِ عَلٰى مَا عُرِفَ، وَهٰذَا ظَاهِرٌ فِيْمَا اِذَا هَلَكَ الْمَالَانِ، وَكَذَا اِذَا هَلَكَ اَحَدُهُمَا؛ لِاَنَّهُ مَا رَضِيَ بِشَرِكَةِ صَاحِبِهِ فِيْ مَالِهِ اِلَّا لِيُشْرِكَهُ فِيْ مَالِهِ، فَاِذَا فَاتَ ذٰلِكَ لَمْ يَكُنْ رَاضِيًا بِشَرِكَتِهِ فَيَبْطُلُ الْعَقْدُ لِعَدَمِ فَائِدَتِهِ، وَاَيُّهُمَا هَلَكَ هَلَكَ مِنْ مَالِ صَاحِبِهِ؛ اِنْ هَلَكَ فِيْ يَدِهِ فَظَاهِرٌ، وَكَذَا اِذَا كَانَ هَلَكَ فِيْ يَدِ الْاٰخَرِ لِاَنَّهُ اَمَانَةٌ فِيْ يَدِهِ، بِخِلَافِ مَا بَعْدَ الْخَلْطِ حَيْثُ يَهْلِكُ عَلَى الشَّرِكَةِ؛ لِاَنَّهُ لَا يَتَمَيَّزُ فَيُجْعَلُ الْهَالِكُ مِنَ الْمَالَيْنِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কোনো কিছু ক্রয় করার পূর্বেই যদি অংশীদারি সম্পদ নষ্ট হয়ে যায় কিংবা কোনো এক শরিকের সম্পদ নষ্ট হয়ে যায়, অংশীদারি চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে।

কেননা অংশীদারি চুক্তিতে চুক্তির ক্ষেত্র হচ্ছে মাল। একারণেই অংশীদারি চুক্তিতে মাল নির্ধারিত হয়ে থাকে। যেমন হেবা ও অসিয়তের ক্ষেত্রে। আর চুক্তির ক্ষেত্র নষ্ট হওয়ার দ্বারা চুক্তি বাতিল হয়ে যায়। যেমন বিক্রয়ের ক্ষেত্রে। মুদারাবা এবং স্বতন্ত্র ওকালাতের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা এদুটি ক্ষেত্রে মুদ্রাদ্রব্য নির্ধারণ করার দ্বারাও নির্ধারিত হয় না বরং কবজা হওয়ার পর নির্ধারিত হয়। যেমন (পূর্বে) জানা গেছে।

উভয় অংশীদারের মাল নষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে তো বিষয়টি পরিষ্কার। দুজনের একজনের মাল নষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রেও একই হুকুম। কেননা সে তো নিজের মালে অপরজনের শরিকদারিতে সম্মত হবে না। ফলে কোনো ফায়দা না থাকার কারণে চুক্তিটি বাতিল হয়ে যাবে।

উভয়ের মধ্য থেকে যার মালই নষ্ট হোক, তার নিজের হাতে থাকা অবস্থায় যদি নষ্ট হয়, তাহলে তো বিষয়টি স্পষ্ট। অপরজনের হাতে নষ্ট হলেও একই হুকুম হবে। কেননা এই মাল তার হাতে আমানত ছিল।

মিশ্রণের পরে নষ্ট হওয়ার হুকুমটি ভিন্ন হবে। যেহেতু মিশ্রণের পর (প্রত্যেকের মাল) পৃথক করা সম্ভব নয়, সেহেতু তা অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে নষ্ট হবে। সুতরাং নষ্ট হওয়ার বিষয়টি উভয়ের মাল থেকেই গণ্য হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিউক্ত ইবারতের সারমর্ম : শিরকাতের মূলধন দ্বারা কোনো কিছু ক্রয় করার পূর্বেই যদি মূলধন ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে শিরকাত বাতিল হয়ে যায়। এক্ষেত্রে কয়েকটি সুরত হতে পারে।

১. উভয় শরিকের মাল ধ্বংস হয়ে যাওয়া এ সুরতে শিরকাত বাতিল হয়ে যাবে। কারণ শিরকাতে আকদের ক্ষেত্রে মাল হলো মা'কূদ আলাইহি অর্থাৎ মাল হলো চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্র। অতএব, এ ক্ষেত্র ধ্বংস হয়ে গেলে চুক্তি থাকার প্রশ্নই আসে না। যেমন- কোনো পণ্যের উপর ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর যদি পণ্যটি ক্রেতার হাতে তুলে

https://e-ilm.weebly.com/

দেওয়ার পূর্বে ধ্বংস হয়ে যায়। তাহলে বিক্রয় চুক্তি বাতিল হয়ে যায়। কারণ চুক্তির ক্ষেত্র বা পাত্র ধ্বংস হয়ে গেছে। তদ্রূপ শিরকাতের ক্ষেত্রেও আকদের ক্ষেত্র তথা মাল বা মূলধন ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ফলে শিরকাতের চুক্তি বাতিল হয়ে যায়। শিরকাতের মধ্যে মাল ধ্বংস হওয়ার দ্বারা আকদ বাতিল হওয়ার মূল কারণ হলো, শিরকাতের মধ্যে মূলধন হিসাবে নির্ধারণকৃত মুদ্রা নির্ধারিত হয়ে যাওয়া। অর্থাৎ দুজন শরিক যখন নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে শিরকাতের চুক্তি করে তখন সেই নির্দিষ্ট অর্থগুলোই শিরকাতের মা'কূদ আলাইহি রূপে নির্ধারিত হয়ে যায়। অতএব, এই নির্ধারিত অর্থ ধ্বংস হয়ে গেল যেন মা'কূদ আলাইহি ধ্বংস হয়ে গেল বিধায় চুক্তি বাতিল হয়ে যায়।

তেমনি হেবা ও অসিয়তের ক্ষেত্রেও হেবাকৃত অর্থ এবং অসিয়তকৃত অর্থ নির্ধারিত হয়ে যায়। তাই সেই নির্ধারিত অর্থ নষ্ট হয়ে গেলে হেবা এবং অসিয়ত বাতিল হয়ে যায়।

পক্ষান্তরে মুদারাবা এবং স্বতন্ত্র ওকালত অর্থাৎ এদুই ক্ষেত্রে অর্থ নির্ধারণের দ্বারা নির্ধারিত হয় না। তাই এ ক্ষেত্রে অর্থ ধ্বংস হয়ে গেলেও চুক্তি বাতিল হবে না। যেমন- কোনো রাব্বুল মাল কোনো মুদারিবকে দশহাজার টাকা দিয়ে বলল, যাও তুমি এ টাকা দিয়ে ব্যবসা করো যা মুনাফা হবে তোমার অর্ধেক, আমার অর্ধেক। এরপর যদি মুদারিবের হাতে অর্পিত টাকাগুলো ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে মুদারাবা চুক্তি বাতিল হবে না। রাব্বুল মাল পুনরায় অর্থ দিতে পারবে। কারণ মুদারাবার মধ্যে প্রদত্ত অর্থ মা'কূদ আলাইহিরূপে নির্ধারিত নয়। তাই তা ধ্বংস হলেও চুক্তির ক্ষেত্রে ধ্বংস হয়ে যায় না। চুক্তিও বাতিল হয় না।

তদ্রূপ স্বতন্ত্র ওয়াকালত। স্বতন্ত্র ওয়াকালত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো শুধু ওয়াকালত। এ বলে ঐ ওয়াকালত কে বাদ দেওয়া হয়েছে, যা শিরকাত ও রেহান তথা বন্ধকের অধীনে হয়ে থাকে। কেননা সেই ওয়াকালতের হুকুম স্বতন্ত্র ওয়াকালতের হুকুম হতে ভিন্ন। স্বতন্ত্র ওয়াকালতের হুকুম হলো অর্থ ধ্বংস হওয়ার দ্বারা ওয়াকালত বাতিল হয় না। যেমন- কেউ যদি কাউকে এক হাজার টাকা দিয়ে বলে আমার জন্য অমুক বস্তুটি কিনে নিয়ে এসো। এরপর যদি উকিলের হাতে টাকাগুলো নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে ওকালত বাতিল হবে না বরং মুয়াক্কেল পুনরায় উকিলকে টাকা দিতে পারবে।

এই মুদারাবা এবং স্বতন্ত্র ওয়াকালত বাতিল না হওয়ার কারণ হলো প্রদত্ত অর্থ মা'কূদ আলাইহিরূপে নির্ধারিত না হওয়া।

২. কোনো এক শরিকের মাল তার নিজ হাতে ধ্বংস হয়ে যাওয়া। এ অবস্থায়ও শিরকাত বাতিল হয়ে যায়। কেননা যে শরিকের মাল ধ্বংস হয়নি, সে এটাতে রাজি হবে না যে, তার মালে অন্য কেউ শরিক হোক বিনা লাভে। অতএব, এক শরিকের মাল ধ্বংস হয়ে গেলে অপর শরিকের মাল তার নিজের জন্যই থেকে যাবে। দুইয়ের মাঝে কোনো অংশীদারিত্ব থাকবে না।

৩. এক শরিকের মাল অপর শরিকের হাতে থাকা অবস্থায় ধ্বংস হওয়া। এ অবস্থায়ও শিরকাত বাতিল হয়ে যাবে। কেননা এক শরিকের মাল অপর শরিকের হাতে আমানত। আর আমানত ধ্বংস হলে তা মালিকের উপর বর্তায়। আমানত গ্রহণকারীর উপর কোনো দায় বর্তায় না।

অতএব, কেমন যেন তা নিজের হাতেই ধ্বংস হলো, সুতরাং কোনো শরিকের মাল তার নিজ হাতে থাকা অবস্থায় ধ্বংস হলে যেমন শিরকাত বাতিল হয়ে যায়, তেমনি অপর শরিকের হাতে থাকা অবস্থায় ধ্বংস হলেও শিরকাত বাতিল হয়ে যাবে।

৪. উভয় শরিকের মাল পরস্পর মিশ্রিত করার পর কিছু অংশ ধ্বংস হয়ে যাওয়া। এ অবস্থায় ধ্বংস হওয়া মাল উভয়ের মালিকানা বলে গণ্য হবে। কেননা তাদের সম্পদ এমনভাবে মিশ্রিত করা হয়েছে যে, প্রত্যেকের সম্পদকে পৃথক করা সম্ভব নয়। বিধায় এমন অবস্থায় যা ধ্বংস হবে তা যৌথ সম্পদ থেকে ধ্বংস হবে এবং এর দায় উভয় শরিকের উপর বর্তাবে। অর্থাৎ মিশ্রিত মূলধন নষ্ট হলে তার ক্ষতি এক শরিকের উপর চাপানো হবে না বরং সেই ক্ষতি উভয় শরিক বহন করবে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَإِنْ اشْتَرَى اَحَدُهُمَا بِمَالِهِ وَهَلَكَ مَالُ الْآخَرِ قَبْلَ الشِّرَاءِ فَالْمُشْتَرَى بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَا لِاَنَّ الْمِلْكَ حِيْنَ وَقَعَ وَقَعَ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا لِقِيَامِ الشَّرِكَةِ وَقْتَ الشِّرَاءِ فَلَا يَتَغَيَّرُ الْحُكْمُ بِهَلَاكِ مَالِ الْآخَرِ بَعْدَ ذٰلِكَ. ثُمَّ الشَّرِكَةُ شَرِكَةُ عَقْدٍ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رحـ خِلَافًا لِلْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ، حَتّٰى اِنَّ اَيُّهُمَا بَاعَ جَازَ بَيْعُهُ؛ لِاَنَّ الشَّرِكَةَ قَدْ تَمَّتْ فِي الْمُشْتَرَى فَلَا يُنْتَقَضُ بِهَلَاكِ الْمَالِ بَعْدَ تَمَامِهَا .

অনুবাদ : যদি দুজনের একজন নিজের মাল দ্বারা কোনো কিছু খরিদ করে, আর অপরজনের মাল খরিদ করার পূর্বেই নষ্ট হয়ে যায় তাহলে উভয়ের নির্ধারিত শর্ত অনুযায়ী খরিদকৃত দ্রব্য উভয়ের মাঝে শরিকানা হবে।

কেননা মালিকানা সাব্যস্ত হওয়ার সময় উভয়ের মাঝে শরিক অবস্থায় সাব্যস্ত হয়েছে। কারণ (বস্তুটি) খরিদ করার সময় শিরকাত বিদ্যমান ছিল। সুতরাং পরে অপরজনের মাল নষ্ট হওয়ার কারণে হুকুম পরিবর্তন হবে না।

অতঃপর ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর মতে এই খরিদকৃত বস্তুর মধ্যে চুক্তিগত অংশীদারিত্ব সাব্যস্ত হবে। পক্ষান্তরে হাসান ইবনে যিয়াদের মতে মালিকানা ভিত্তিক অংশীদারিত্ব সাব্যস্ত হবে।

সুতরাং (ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে) দুজনের যে কেউ তা বিক্রি করলে বিক্রি সহীহ হবে। কেননা খরিদকৃত দ্রব্যের মাঝে অংশীদারিত্ব সম্পন্ন হয়ে গেছে। সুতরাং তা সম্পন্ন হওয়ার পর মাল নষ্ট হওয়ার কারণে ভঙ্গ হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিউক্ত মাসআলার সার সার-সংক্ষেপ হলো এই যে, এক শরিক তার মাল দ্বারা কিছু ক্রয় করল, কিন্তু অপর শরিক তার মাল দ্বারা কিছু ক্রয় করার পূর্বেই মাল ধ্বংস হয়ে গেল। এমতাবস্থায় এক শরিকের ক্রয়কৃত দ্রব্যটির হুকুম কি?

দ্রব্যটির হুকুম এই যে, দ্রব্য উভয় শরিকের মাঝে যৌথ সম্পদ হবে। কেননা, দ্রব্যটি যখন ক্রয় করা হয়, তখন তাদের মাঝে শিরকাত বিদ্যমান ছিল। সে হিসাবে দ্রব্যটির উপর মালিকানা প্রতিষ্ঠা হওয়ার সময় উভয়ের যৌথ মালিকানাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অতএব, দ্রব্যটির উপর যৌথ মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর অপর শরিকের মাল ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কারণে তা বাতিল হয়ে যাবে না। এবং ক্রয়কৃত দ্রব্যের হুকুম পরিবর্তিত হবে না। বরং ক্রয় করার সময় দ্রব্যটি যেমন যৌথ সম্পদ ছিল, অপর শরিকের মাল ধ্বংস হওয়ার পরও তা যৌথ থাকবে।

এরপর উক্ত দ্রব্যের মাঝে যে শিরকাত থাকবে, তা কোনো প্রকারের শিরকাত এ নিয়ে দুটি মত রয়েছে।

১. ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে শিরকাতে আকদ থাকবে।

২. ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদের মতে শিরকাতে মিলক থাকবে।

এ মতপার্থক্যের ফলাফল প্রকাশিত হবে এভাবে যে, যদি কোনো একক শরিক উক্তদ্রব্য বিক্রি করে দেয় তাহলে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে বিক্রি সহীহ হবে। কেননা তার মতে দ্রব্যটির মাঝে শিরকাতে আকদ রয়েছে আর শিরকাতে আকদের হুকুম হলো, অংশীদারিত্বপূর্ণ সম্পদের মাঝে উভয় শরিকের তসরুফ কার্যকরী হয়। সে হিসাবে দ্রব্যটি কোনো এক শরিক বিক্রি করে দিলে তার বিক্রি কার্যকরি হবে।

পক্ষান্তরে হাসান ইবনে যিয়াদের মতে কোনো এক শরিক পূর্ণ দ্রব্যটি বিক্রি করলে পূর্ণ দ্রব্যের বিক্রি সহীহ হবে না বরং বিক্রেতা শরিক যতটুকু দ্রব্যের মালিক কেবল ততটুকুর মধ্যে তার বিক্রয় কার্যকরি হবে। কেননা হাসান ইবনে যিয়াদের মতে দ্রব্যটির মাঝে শিরকাতে মিল্‌ক রয়েছে। আর শিরকাতে মিল্‌কের হুকুম হলো প্রত্যেক শরিকের তসরুফ তার মালিকানাধীন অংশের মাঝে সাব্যস্ত হয়। পূর্ণ সম্পদের মাঝে প্রত্যেক শরিকের তসরুফ কার্যকর হয় না।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর মতে পক্ষে দলিল পেশ করতে গিয়ে গ্রন্থকার (র.) বলেন- ক্রয়কৃত দ্রব্যের মধ্যে পূর্বেই শিরকাত সম্পন্ন হয়ে গেছে। অতএব, শিরকাত সম্পন্ন হয়ে যাওয়ার পর এক শরিকের মাল ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কারণে তা বাতিল হবে না। বরং পূর্ব সম্পন্ন শিরকাতে আকদই বহাল থাকবে।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ وَيَرْجِعُ عَلَى شَرِيْكِهِ بِحِصَّةٍ مِنْ ثَمَنِهِ لِاَنَّهُ اشْتَرَى نِصْفَهُ بِوَكَالَتِهِ وَنَقَدَ الثَّمَنَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ وَقَدْ بَيَّنَّاهُ، هٰذَا إِذَا اشْتَرَى اَحَدُهُمَا بِاَحَدِ الْمَالَيْنِ اَوَّلًا ثُمَّ هَلَكَ مَالُ الْاٰخَرِ . اَمَّا اِذَا هَلَكَ مَالُ اَحَدِهِمَا ثُمَّ اشْتَرَى الْاٰخَرُ بِمَالِ الْاٰخَرِ، اِنْ صَرَّحَا بِالْوَكَالَةِ فِيْ عَقْدِ الشَّرِكَةِ فَالْمُشْتَرَى مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا عَلٰى مَا شَرَطَا؛ لِاَنَّ الشَّرِكَةَ اِنْ بَطَلَتْ فَالْوَكَالَةُ الْمُصَرَّحُ بِهَا قَائِمَةٌ فَكَانَ مُشْتَرَكًا بِحُكْمِ الْوَكَالَةِ، وَيَكُوْنُ شَرِكَةَ مِلْكٍ وَيَرْجِعُ عَلٰى شَرِيْكِهِ بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ لِمَا بَيَّنَّاهُ، وَاِنْ ذَكَرَا مُجَرَّدَ الشَّرِكَةِ وَلَمْ يَنُصَّا عَلَى الْوَكَالَةِ فِيْهَا كَانَ الْمُشْتَرَى لِلَّذِي اشْتَرَاهُ خَاصَّةً؛ لِاَنَّ الْوُقُوْعَ عَلَى الشَّرِكَةِ حُكْمُ الْوَكَالَةِ الَّتِي تَضَمَّنَتْهَا الشَّرِكَةُ، فَاِذَا بَطَلَتْ يَبْطُلُ مَا فِيْ ضِمْنِهَا، بِخِلَافِ مَا اِذَا صَرَّحَ بِالْوَكَالَةِ لِاَنَّهَا مَقْصُوْدَةٌ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র) বলেন, আর সে উক্ত দ্রব্যের মূল্যের ঐ পরিমাণ অংশ অংশীদারের কাছে থেকে ফেরত নিয়ে নিবে। কেননা উক্ত দ্রব্যের অর্ধেক তো সে উকিল হিসাবে ক্রয় করেছে এবং মূল্য নিজের মাল থেকে পরিশোধ করেছে। এ বিধান আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি।

এ বিধান তখন হবে, যখন দুজনের একজন দুই মালের একটি দ্বারা প্রথমে খরিদ করেছে এরপর অপরজনের মাল নষ্ট হয়েছে।

পক্ষান্তরে যদি একজনের মাল আগেই নষ্ট হয়ে যায়, তারপর অন্যজন তার মাল দ্বারা খরিদ করে, তাহলে যদি অংশীদারিত্বের চুক্তির মধ্যে ওয়াকালাতের কথা স্পষ্টরূপে উল্লেখ করে থাকে তাহলে উভয়ের নির্ধারিত শর্ত অনুযায়ী খরিদকৃত দ্রব্য উভয়ের শরিকানায় থাকবে।

কেননা অংশীদারিত্ব বাতিল হওয়া সত্ত্বেও স্বতন্ত্রভাবে স্পষ্টরূপে উল্লেখকৃত ওকালত বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং ওকালাতের ফলশ্রুতিতে (খরিদকৃত দ্রব্য) উভয়ের শরিকানায় থাকবে। আর তা হবে মালিকানা ভিত্তিক শরিকানা।

আর আমাদের পূর্ব বর্ণিত কারণে সে তার শরিকদারের কাছ থেকে তার অংশের পরিমাণ মূল্য ফেরত নিবে।

আর যদি শুধু অংশীদারিত্বের কথা উল্লেখ করে থাকে এবং ওয়াকালাতের বিষয়টি তাতে উল্লেখ না করে থাকে তাহলে খরিদকৃত দ্রব্যটি বিশেষভাবে তারই হবে, যে খরিদ করেছে।

কেননা উক্ত ক্রয় অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে হওয়া অংশীদারি চুক্তির অন্তর্গত ওয়াকালাতের ফলশ্রুতিতে হয়ে থাকে। কিন্তু অংশীদারী চুক্তি যখন বাতিল হয়ে যাবে তখন তার অন্তর্গত ওকালাতও বাতিল হয়ে যাবে।

পক্ষান্তরে ওয়াকালাতের কথা স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা তখন তা (স্বতন্ত্র একটি উদ্দেশ্য বিষয়) হয়ে যায়।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যে শরিক নিজের মাল দ্বারা দ্রব্য ক্রয় করেছে সে শরিক অপর শরিকের কাছ থেকে তার অংশের মূল্য ফেরত নিবে। কেননা ক্রয়কারী শরিক অপর শরিকের অংশটুকু তার উকিল হিসাবে ক্রয় করেছে এবং নিজের পকেট থেকে তার মূল্য পরিশোধ করেছে। অতএব, সে এখন মুয়াক্কিলের কাছ থেকে তথা অপর শরিকের কাছ থেকে মূল্য ফেরত নিবে।

উপরিউক্ত বিধান প্রযোজ্য হওয়ার জন্য শর্ত হলো এক শরিক তার নিজ মাল দ্বারা দ্রব্য ক্রয় করার পর অপর শরিকের মাল ধ্বংস হওয়া।

পক্ষান্তরে যদি এক শরিকের মাল ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর অন্য শরিক তার নিজ মাল দ্বারা কিছু ক্রয় করে, তাহলে এর হুকুম পূর্বের মতো হবে না বরং এক্ষেত্রে দুটি সুরত হতে পারে।

১. যদি শিরকাতের আকদের মধ্যে ওয়াকালাতের কথা সুস্পষ্ট রূপে উল্লেখ করে থাকে, তাহলে ক্রয়কৃত দ্রব্য সেই ওয়াকালাতের। ফলে উভয়ের মাঝে যৌথ থাকবে এবং এটি তাদের মাঝে শিরকাতে মিল্ক হবে। এবং ক্রয়কারী শরিক অপর শরিকের কাছ থেকে তার অংশ পরিমাণ দ্রব্যের মূল্য ফেরত আনবে।

কেননা আলোচ্য সুরতে যদিও শিরকাত বাতিল হয়েছে। কিন্তু ওয়াকালাতের বিষয় স্পষ্ট রূপে উল্লেখ করার কারণে ওয়াকালাতের আকদ বিদ্যমান এবং এর ফলেই খরিদকৃত দ্রব্যটি এখন উভয়ের মাঝে শরিকানায় থাকবে।

২. শিরকাতের আকদের মাঝে যদি ওকালাতের কথা স্বতন্ত্রভাবে এবং স্পষ্ট রূপে উল্লেখ না করে থাক, তাহলে শিরকাতের আকদ বাতিল হওয়ার সাথে সাথে, শিরকাতের অন্তর্গত ওকালাতও বাতিল হয়ে যাবে। ফলে এখন খরিদকৃত দ্রব্যটি বিশেষভাবে খরিদকারীর মালিকানা বলেই গণ্য হবে। দ্রব্যটি যৌথ হবে না। কেননা সম্পদটি যৌথ হতো শিরকাত কিংবা ওয়াকালাতের ভিত্তিতে। আলোচ্য সুরতে শিরকাত বাতিল হয়ে গেছে এক শরিকের মাল ধ্বংস হওয়ার দ্বারা। আর ওয়াকালাতের বিষয়টি স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ না হওয়ারে কারণে তাও শিরকাতের অন্তর্গত বিষয় হিসাবে শিরকাতের মতোই বাতিল হয়ে গেছে। বিধায় শিরকাত ও ওকালাত উভয় বিষয় অবিদ্যমান থাকার কারণে ক্রয়কৃত দ্রব্য যৌথ হবে না; বরং তা শুধু ক্রয়কারী ব্যক্তির একক সম্পদ হিসাবে পরিগণিত হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ وَتَجُوْزُ الشَّرِكَةُ وَإِنْ لَمْ يَخْلِطَا الْمَالَ وَقَالَ زُفَرُ وَالشَّافِعِيُّ : لَا تَجُوْزُ لِاَنَّ الرِّبْحَ فَرْعُ الْمَالِ، وَلَا يَقَعُ الْفَرْعُ عَلَى الشَّرِكَةِ اِلَّا بَعْدَ الشَّرِكَةِ فِي الْاَصْلِ وَاَنَّهُ بِالْخَلْطِ، وَهٰذَا لِاَنَّ الْمَحَلَّ هُوَ الْمَالُ وَلِهٰذَا يُضَافُ اِلَيْهِ، وَيُشْتَرَطُ تَعْيِيْنُ رَاْسِ الْمَالِ، بِخِلَافِ الْمُضَارَبَةِ؛ لِاَنَّهَا لَيْسَتْ بِشَرِكَةٍ، وَإِنَّمَا هُوَ يَعْمَلُ لِرَبِّ الْمَالِ فَيَسْتَحِقُّ الرِّبْحَ عِمَالَةً عَلَى عَمَلِهِ، اَمَّا هُنَا بِخِلَافِهِ، وَهٰذَا اَصْلٌ كَبِيْرٌ لَهُمَا حَتّٰى يُعْتَبَرُ اِتِّحَادُ الْجِنْسِ . وَيُشْتَرَطُ الْخَلْطُ وَلَا يَجُوْزُ التَّفَاضُلُ فِي الرِّبْحِ مَعَ التَّسَاوِيْ فِي الْمَالِ . وَلَنَا اَنَّ الشَّرِكَةَ فِي الرِّبْحِ مُسْتَنِدَةٌ اِلَى الْعَقْدِ دُوْنَ الْمَالِ؛ لِاَنَّ الْعَقْدَ يُسَمّٰى شَرِكَةً فَلَا بُدَّ مِنْ تَحَقُّقِ مَعْنَى هٰذَا الْاِسْمِ فِيْهِ فَلَمْ يَكُنْ الْخَلْطُ شَرْطًا، وَلِاَنَّ الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيْرَ لَا يَتَعَيَّنَانِ فَلَا يُسْتَفَادُ الرِّبْحُ بِرَاْسِ الْمَالِ، وَاِنَّمَا يُسْتَفَادُ بِالتَّصَرُّفِ لِاَنَّهُ فِي النِّصْفِ اَصِيْلٌ وَفِي النِّصْفِ وَكِيْلٌ . وَاِذَا تَحَقَّقَتْ الشَّرِكَةُ فِي التَّصَرُّفِ بِدُوْنِ الْخَلْطِ تَحَقَّقَتْ فِي الْمُسْتَفَادِ بِهِ وَهُوَ الرِّبْحُ بِدُوْنِهِ، وَصَارَ كَالْمُضَارَبَةِ فَلَا يُشْتَرَطُ اِتِّحَادُ الْجِنْسِ وَالتَّسَاوِيْ فِي الرِّبْحِ، وَتَصِحُّ شَرِكَةُ التَّقَبُّلِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, অংশীদারী চুক্তি বৈধ হবে যদিও উভয় শরিক তাদের মাল পরস্পরে মিশ্রিত না করে। ইমাম যুফার (র.) ও ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন, বৈধ হবে না। কেননা মুনাফা হচ্ছে মূলধনের অনুবর্তী। আর মূলবস্তুতে অংশীদারিত্ব সাব্যস্ত হওয়ার পরেই কেবল অনুবর্তীর ক্ষেত্রে অংশীদারিত্ব সাব্যস্ত হয়। আর তা হতে পারে মিশ্রণের মাধ্যমে।

(মুনাফা যে মূলধনের অনুবর্তী) এর কারণ এই যে, মূলধনই হলো অংশীদারী চুক্তির ক্ষেত্র। এ কারণেই চুক্তিটিকে মূলধনের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়। তদুপরি মূলধনকে নির্ধারিত করে নেওয়ার শর্তারোপ করা হয়।

মোদারাবার– বিষয়টি ভিন্ন কেননা তা মূলত: অংশীদারিত্ব নয়। কেননা সেখানে শ্রমদাতা পক্ষ মূলধন বিনিয়োগকারী পক্ষের অনুকূলে শ্রম দিয়ে থাকে। এবং শ্রমের মজুরি রূপে মুনাফার হকদার হয়। কিন্তু এখানে বিষয়টি তার বিপরীত। এটি ইমাম যুফার (র.) ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি এ কারণেই তাদের মতে উভয়ের মূলধনের জাতিগত অভিন্নতা বিবেচনা যোগ্য, এবং উভয়ের সম্পদের মিশ্রণ শর্ত আর মূলধনের সমতার ক্ষেত্রে মুনাফার তারতম্য বৈধ নয়। আর মাল বা মূলদ্রব্য বিদ্যমান না থাকার কারণে ফরমায়েশ ও কাজ গ্রহণের অংশীদারিত্ব বৈধ নয়।

আমাদের দলিল এই যে, মুনাফার অংশীদারিত্বের বিষয়টি মূলতঃ চুক্তির সাথে সম্পৃক্ত, মূলধনের সাথে নয় কেননা চুক্তিকেই মূলতঃশিরকাত বলা হয় (মূলধনকে নয়)। সুতরাং অংশীদারিত্ব শব্দের মর্ম মুনাফাতেও প্রযুক্ত হওয়া অপরিহার্য। সুতরাং মূলধনের মিশ্রণ (জাতিগত অভিন্নতা, মুনাফার সমতা কিছুই) শর্ত হবে না

তাছাড়া দিরহাম ও দীনার নির্ধারিত হয় না। সুতরাং মুনাফা মূলধনের বিনিময়ে লব্ধ হয় না; বরং তা লব্ধ হয় ব্যবহারের মাধ্যমে। কেননা অর্ধেক মূলধনের ক্ষেত্রে সে মূলব্যক্তি আর বাকি অর্ধেকের ক্ষেত্রে সে আর মূলধনের

https://e-ilm.weebly.com/

মিশ্রণ ছাড়া ব্যবহারের মধ্যে যখন অংশীদারিত্ব সাব্যস্ত হলো, তখন ব্যবহারের মাধ্যমে লব্ধ মুনাফার মধ্যেও মূলধনের মিশ্রণ ছাড়াই অংশীদারিত্ব সাব্যস্ত হবে। এবং তা মুদারাবার অনুরূপ হয়ে যাবে। সুতরাং মূলধনের জাতিগত অভিন্নতা এবং মুনাফার সমতা শর্ত হবে না। আর ফরমায়েশ গ্রহণের অংশীদারিত্বও বৈধ হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিউক্ত ইবারতে একটি নীতিগত ইখতিলাফী মাসআলা আলোচিত হয়েছে। যার সংক্ষেপ নিম্নরূপ ঃ

ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মুহাম্মদ, ইমাম আবূ ইউসুফ, ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) সহ আরো অন্যান্য ইমামের মতে উভয় শরিকের মাল পরস্পরে মিশ্রিত করা ছাড়াই শিরকাত শুদ্ধ হয়।

পক্ষান্তরে ইমাম যুফার (র.) ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে উভয় শরিকের মাল পরস্পরে সংমিশ্রণ করা ছাড়া শিরকাত শুদ্ধ হয় না।

দলিল পর্ব :

ইমাম যুফার (র.)ও ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, পুঁজি হলো মূল আর মুনাফা হলো তার অনুবর্তী। আর কোনো অনুবর্তী বিষয়ে শিরকাত সাব্যস্ত হতে পারে না, মূল বস্তুতে শিরকাত সাব্যস্ত হওয়া ব্যতীত। অতএব, পুঁজি বা মূলধনের ক্ষেত্রে প্রথমে শিরকাত সাব্যস্ত হতে হবে। এরপর মুনাফার মধ্যে শিরকাত সাব্যস্ত হবে। আর মূলধনে শিরকাত সাব্যস্ত হওয়ার উপায় হলো উভয়ের মূলধন সংমিশ্রিত করা। কেননা শিরকাতের অর্থই হলো সংমিশ্রণ।

আর পুঁজিকে মূলবস্তু এবং মুনাফাকে তার অনুবর্তী বলার কারণ হলো, পুঁজিই হলো আকদে শিরকাতের মহল বা ক্ষেত্র। অর্থাৎ পুঁজির উপরেই মূল চুক্তিটি সম্পাদিত হয়। এ কারণে শিরকাতকে পুঁজির সাথে সম্পৃক্ত করা হয়ে থাকে। বলা হয় যৌথ পুঁজিতে ব্যবসা করে এই লাভ হয়েছে। এবং পুঁজি মূলবস্তু হওয়ার কারণেই আকদের সময় তা নির্ধারণ করে নেওয়ার শর্ত রয়েছে।

পক্ষান্তরে মুদারাবার ক্ষেত্রে মাল মিশ্রিত করা ছাড়াই আকদ সহীহ হয়। কারণ সেটা শিরকাত বা অংশীদারী কারবার নয়; বরং সেখানে এক পক্ষ পুঁজি দেয়, অপর পক্ষ শ্রম দেয়। শ্রমদাতা তার শ্রমের বিনিময়ে অর্জিত মুনাফায় অংশীদার হয়। পক্ষান্তরে শিরকাতের মধ্যে উভয় পক্ষই সম্পদ দিয়ে পরস্পরে একে অপরের অংশীদার হয়। মিশ্রণ ব্যতীত শিরকাত সহীহ নয়। এটি ইমাম যুফার (র.) ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি। এ মূলনীতির ভিত্তিতে তারা আরো অনেক মাসআলা নির্গত করেন। যেমন- উভয় শরিকের সম্পদ এক জাতীয় হওয়া। পুঁজি সমান হওয়া অবস্থায় মুনাফায় তারতম্য করা জায়েজ না হওয়া। ফরমায়েশ গ্রহণ ও কাজ গ্রহণের অংশীদারিত্ব বৈধ না হওয়া ইত্যাদি।

আহনাফ, ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর দলিল :

১. মুনাফার সম্পর্ক পুঁজির সাথে নয়; বরং আকদের সাথে। তা এভাবে যে, মুনাফা অর্জন হয় মূলত তসরুফ দ্বারা তথা কাজ কারবারের দ্বারা, আর কাজ কারবার বা তসরুফ জায়েজ হয় আকদের দ্বারা। অতএব, বলা যায় মুনাফা অর্জন হয় আকদের দ্বারা। এ হিসাবে আকদ হলো মূল, আর মুনাফা হলো তার অনুবর্তী। আর আকদটি মূল হওয়ার কারণেই আকদকে শিরকাত বলা হয়। পুঁজিকে শিরকাত বলা হয় না। আর মূলের মধ্যে তথা আকদের মধ্যে যখন শিরকাতের মর্ম সম্পদের সংমিশ্রণ ছাড়াই সাব্যস্ত হয়, তখন অনুবর্তী বিষয় তথা মুনাফার মধ্যেও সম্পদের মিশ্রণ ছাড়াই শিরকাত বাস্তবায়িত হবে। অতএব, শিরকাত সহীহ হওয়ার জন্য সম্পদের সংমিশ্রণ শর্ত হবে না। উভয়ের সম্পদ এক জাতীয় হওয়া আবশ্যক হবে না।

দলিল :– ২. পুঁজি তথা দিরহাম-দীনার নির্ধারিত হয় না। অর্থাৎ নির্দিষ্ট কোনো দিরহাম বা দীনার দ্বারা কিছু ক্রয় করলে সেই দিরহাম বা দীনারই পরিশোধ করা অপরিহার্য হয় না; বরং অন্য দিরহাম বা দীনারও পরিশোধ করা যায়। অতএব, অর্জিত মুনাফার সম্পর্ক দিরহাম-দীনার তথা পুঁজির সাথে নয়; বরং মুনাফার সম্পর্ক তসরুফ বা কারবারের সাথে। আর তসরুফ বা কারবার জায়েজ হয়ে থাকে সম্পদ মিশ্রিত করা ছাড়াই এ কারণেই প্রত্যেক শরিক অংশীদারী-সম্পদের মধ্যে তসরুফ করে থাকে, নিজের সম্পদের মূল ব্যক্তি হিসাবে আর অন্য শরিকের সম্পদে উকিল হিসাবে। সুতরাং সম্পদের সংমিশ্রণ ব্যতীতই যখন তসরুফের মধ্যে শিরকাত সাব্যস্ত হয়ে যায়, তখন তসরুফ দ্বারা যা অর্জন হয় তার মধ্যেও তথা মুনাফার মধ্যেও শিরকাত সাব্যস্ত হবে সম্পদ মিশ্রিত করা ব্যতীতই। ফলে শিরকাতের ব্যাপারটি মুদারাবাহ-এর মতো হয়ে যাবে। অর্থাৎ মুদারাবার মধ্যে যেমন সম্পদের সংমিশ্রণ শর্ত নয়, তেমনি শিরকাতের মধ্যেও সম্পদের সংমিশ্রণ শর্ত হবে না। সম্পদের এক জাতীয়তা ও মুনাফার সমতাও শর্ত হবে না। এমনকি ফরমায়েশ গ্রহণের শিরকাতও বৈধ হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ وَلَا يَجُوْزُ الشَّرِكَةُ إِذَا شُرِطَ لِأَحَدِهِمَا دَرَاهِمُ مُسَمَّاةٌ مِنَ الرِّبْحِ لِأَنَّهُ شَرْطٌ يُوْجِبُ انْقِطَاعَ الشَّرِكَةِ فَعَسَاهُ لَا يُخْرِجُ إِلَّا قَدْرَ الْمُسَمّٰى لِأَحَدِهِمَا، وَنَظِيْرُهُ فِي الْمُزَارَعَةِ قَالَ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُفَاوِضَيْنِ وَشَرِيْكَيِ الْعِنَانِ اَنْ يُبْضِعَ الْمَالَ لِأَنَّهُ مُعْتَادٌ فِيْ عَقْدِ الشَّرِكَةِ، وَلِأَنَّ لَهُ اَنْ يَسْتَأْجِرَ عَلَى الْعَمَلِ، وَالتَّحْصِيْلُ بِغَيْرِ عِوَضٍ دُوْنَهُ فَيَمْلِكُهُ، وَكَذَا لَهُ اَنْ يُوْدِعَهُ لِأَنَّهُ مُعْتَادٌ وَلَا يَجِدُ التَّاجِرُ مِنْهُ بُدًّا . قَالَ وَيَدْفَعُهُ مُضَارَبَةً؛ لِأَنَّهَا دُوْنَ الشَّرِكَةِ فَيَتَضَمَّنُهَا . وَعَنْ اَبِيْ حَنِيْفَةَ اَنَّهُ لَيْسَ لَهُ ذٰلِكَ لِأَنَّهُ نَوْعُ شَرِكَةٍ، وَالْأَصَحُّ هُوَ الْأَوَّلُ، وَهُوَ رِوَايَةُ الْأَصْلِ؛ لِأَنَّ الشَّرِكَةَ غَيْرُ مَقْصُوْدَةٍ، وَإِنَّمَا الْمَقْصُوْدُ تَحْصِيْلُ الرِّبْحِ كَمَا إِذَا اسْتَأْجَرَهُ بِأَجْرٍ بَلْ اَوْلٰى؛ لِأَنَّهُ تَحْصِيْلٌ بِدُوْنِ ضَمَانٍ فِيْ ذِمَّتِهِ، بِخِلَافِ الشَّرِكَةِ حَيْثُ لَا يَمْلِكُهَا لِأَنَّ الشَّيْءَ لَا يَسْتَتْبِعُ مِثْلَهُ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি মুনাফা থেকে নির্দিষ্ট সংখ্যক দিরহাম কোনো একজনের অনুকূলে শর্ত করা হয় তাহলে অংশীদারিত্ব বৈধ হবে না। কেননা এটা এমন শর্ত যা অংশীদারিত্ব চুক্তির বিনাশ হওয়াকে অপরিহার্য করতে পারে। তা এভাবে যে, দু'জনের একজনের জন্য নির্ধারিত পরিমাণই শুধু মুনাফা হলো, এর সদৃশ বিধান বর্গাচাষের ক্ষেত্রে রয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, মুফাওয়াযা ও ইনান চুক্তির শরিকদ্বয়ের প্রত্যেকেই ব্যবসার উদ্দেশ্যে কাউকে মূলধন দিতে পারে। কেননা অংশীদারিত্ব চুক্তিতে এর প্রচলন রয়েছে। তাছাড়া তার তো পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাজে নিয়োগ করার অধিকার রয়েছে। আর পারিশ্রমিক ছাড়া বিনিয়োগ করা তার চেয়ে নিম্ন স্তরের। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই সে তার অধিকারী হবে। অদ্রূপ তার অধিকার রয়েছে মাল আমানত রাখার : কেননা এটি প্রচলিত ব্যাপার। আর সময় বিশেষ একজন ব্যবসায়ীর এছাড়া উপায়ও থাকে না।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, মুদারাবার ভিত্তিতেও কাউকে মূলধন প্রদান করতে পারে। কেননা এটা অংশীদারিত্ব হতে নিম্নস্তরের। সুতরাং অংশীদারী চুক্তি এটাকে অন্তর্ভুক্ত করবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে তা বৈধ না বলে বর্ণিত রয়েছে। কেননা এটা এক ধরনের অংশীদারি চুক্তি তবে প্রথম মত (বৈধতার মত) বিশুদ্ধতম। আর তা হলো মাবসূতের বর্ণনা। কেননা অংশীদারিত্ব এখানে মূল উদ্দেশ্য নয়। মূল উদ্দেশ্য হলো মুনাফা অর্জন। যেমন-পারিশ্রমিকের বিনিময়ে নিয়োগের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। বরং এটা তার চেয়ে উত্তম। কেননা এতে নিজের উপর দায় বহন ছাড়া মুনাফা অর্জন হয়। অংশীদারিত্বের বিষয়টি ভিন্ন। অর্থাৎ কারো সাথে অংশীদারী চুক্তি করার অধিকারী সে হলো না। কেননা কোনো কিছু তার সমস্তরের জিনিসের অনুবর্তী হয় না

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিউক্ত ইবারতের সারমর্ম হলো, দুই অংশীদারের মধ্য থেকে কোনো একজনের জন্য যদি নির্ধারিত পরিমাণ মুনাফা শর্ত করা হয়, তাহলে শিরকাত বৈধ হবে না। যেমন– শর্ত করা হলো, মুনাফা যাই হোক প্রতিমাসে আমাকে (এক পক্ষকে) ৫,০০০ (পাঁচ হাজার টাকা) করে দিতে হবে। এরূপ শর্ত দ্বারা শিরকাত অবৈধ হয়ে যায়। কেননা হতে পারে কোনো মাসে মোট মুনাফাই হবে পাঁচ হাজার টাকা। তখন পুরো মুনাফা এক পক্ষ নিয়ে যাবে, অপর পক্ষ বঞ্চিত হবে। এটি শিরকাত চুক্তির পরিপন্থি বিষয়। তাই এ ধরনের শর্ত দ্বারা শিরকাত অবৈধ হয়ে যায়।

https://e-ilm.weebly.com/

এর অনুরূপ মাসআলা হলো মুযারা'আর মাসআলা, যেমন- মুযারা'আর ক্ষেত্রে দু'টি পক্ষ থাকে, ১. জমিদাতা ২. চাষী। এই দুপক্ষের মধ্য থেকে কোনো এক পক্ষের জন্য যদি উৎপন্ন ফসলের নির্দিষ্ট পরিমাণ শর্ত করা হয়, তাহলে মুযারা'আ বাতিল হয়ে যায়। যেমন- শর্ত করা হলো, জমিদাতাকে পাঁচ মণ গম বা ধান দিতেই হবে। এমতাবস্থায় হতে পারে যে, জমিতে ফসলই হলো পাঁচ মণ। তাহলে পুরো ফসল জমিদাতা নিয়ে যাবে আর চাষী বঞ্চিত হবে। এটা মুযারা'আ চুক্তির পরিপন্থি। তাই এরূপ শর্ত দ্বারা মুযারা'আ অবৈধ হয়ে যায়।

قَوْلُهُ : وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُفَاوِضَيْنِ وَشَرِيكَيِ الْعِنَانِ الخ : উপরিউক্ত ইবারতে শরিকদের সম্পর্কিত দু'টি হুকুম আলোচনা করা হয়েছে।

১. শিরকাতে মুফাওয়াযা এবং শিরকাতে ইনানের চুক্তিতে আবদ্ধ শরিকদ্বয়ের জন্য জায়েজ আছে, শিরকাতের মাল বাদাআত হিসাবে অন্যকে দেওয়া, বাদাআতের অর্থ হলো কাউকে এ শর্তে মাল দেওয়া যে, সে মাল দ্বারা ব্যবসা করে যে মুনাফা হবে, সেই মুনাফা মূলধনের সাথে মিলিয়ে একসঙ্গে ফিরিয়ে দিবে। অর্থাৎ বিনা পারিশ্রমিকে ব্যবসা করে দেওয়া। এ বিষয়টি জায়েজ হওয়ার পক্ষে মুসান্নিফ (র.) দু'টি দলিল পেশ করেছেন।

ক. শিরকাতের ক্ষেত্রে বাদাআতের বিষয়টি একটি প্রচলিত ব্যাপার। অর্থাৎ শরিকদ্বয় শিরকাতের মাল বিনা পারিশ্রমিকে ব্যবসায় খাটিয়ে, মুনাফা করে দেওয়ার জন্য অন্যকে দিয়ে থাকে। অতএব, বিষয়টি প্রচলিত হওয়ার কারণে জায়েজ।

খ. যে কোনো শরিকের জন্য এটা জায়েজ আছে যে, ব্যবসার কাজের জন্য সে শ্রমিক নিয়োগ করতে পারে। আর শ্রমিক নিয়োগের অর্থ হলো পারিশ্রমিক দিয়ে লোক খাটিয়ে ব্যবসা করা এবং মুনাফা লাভ করা। আর বাদাআতের মধ্যে বিনা পারিশ্রমিকে লোক খাটিয়ে ব্যবসা করা হয়। অতএব, পারিশ্রমিকের বিনিময়ে লোক খাটানো জায়েজ হলে বিনা পারিশ্রমিকে লোক খাটানো অবশ্যই জায়েজ হবে।

২. শরিকরা শিরকাতের মাল কারো নিকট আমানত রাখতে পারবে। এ দাবির পক্ষেও গ্রন্থকার দু'টি কারণ পেশ করেছেন।

ক. শিরকাতের মাল আমানত রাখার প্রচলন আছে।

খ. কোনো কোনো সময় আমানত রাখা ব্যতীত উপায় থাকে না। তখন বাধ্য হয়ে আমানত রাখতে হয়। অতএব, তা জায়েজ হবে।

قَوْلُهُ : وَيَدْفَعُهُ مُضَارَبَةً؛ لِأَنَّهَا دُونَ الشَّرِكَةِ الخ : উপরিউক্ত ইবারতের সারমর্ম হলো এই যে, শরিকদ্বয় শিরকাতের মাল মুদারাবার ভিত্তিতে অন্যকে দিতে পারবে কি-না এ ব্যাপারে দু'টি বর্ণনা রয়েছে।

১. জাহিরে রেওয়ায়েত ও মাবসূতের বর্ণনা হলো শরিকদ্বয় শিরকাতের মাল মুদারাবার ভিত্তিতে অন্যকে দিতে পারবে।

২. ইমাম আবূ হানীফা (র.) হতে হাসান ইবনে যিয়াদের বর্ণনা হলো শিরকাতের মাল মুদারাবার ভিত্তিতে দেওয়া যাবে না। বর্ণনা দু'টির মধ্যে প্রথমোক্ত বর্ণনাটি অধিক বিশুদ্ধ। দ্বিতীয় বর্ণনার পক্ষে যুক্তি হলো এই যে, মুদারাবা এক প্রকার শিরকাত। আর শরিকদের জন্য শিরকাতের মাল দ্বারা তৃতীয় আরেক জনের সাথে শিরকাত করা জায়েজ নেই। তাই শিরকাতের মাল দ্বারা মুদারাবা করাও জায়েজ নয়। যেহেতু মুদারাবা এক প্রকারের শিরকাত।

প্রথম বর্ণনার পক্ষে যুক্তি রয়েছে একাধিক।

১. শিরকাত উচ্চস্তরের আর মুদারাবা নিম্নস্তরের। কেননা শিরকাতের মুনাফা ও ক্ষতি উভয় পক্ষকে ভোগ করতে হয়। কিন্তু মুদারাবায় ক্ষতি হলে মুদারিব সে ক্ষতি ভোগ করে না। আর উচ্চ স্তরের জিনিস নিম্নস্তরের জিনিসকে অন্তর্ভুক্ত করে থাকে। সে হিসাবে শিরকাত মুদারাবাকে অন্তর্ভুক্ত করবে।

২. শরিকদ্বয় পারিশ্রমিকের বিনিময়ে লোক নিয়োগ করে ব্যবসা করতে পারে। এর দ্বারা শরিকের জিম্মায় নিয়োগকৃত ব্যক্তির প্রারিশ্রমিক ওয়াজিব হয়। পক্ষান্তরে মুদারাবার ভিত্তিতে কাউকে মূলধন দিলে সেক্ষেত্রে শরিকের জিম্মায় কোনো প্রকার প্রদেয় ওয়াজিব হয় না। অতএব, পারিশ্রমিক সহ লোক খাটানো জায়েজ হলে পারিশ্রমিক ছাড়া লোক খাটানো তথা মুদারাবার ভিত্তিতে মূলধন দেওয়া আরো উত্তমরূপে জায়েজ হবে।

প্রথম বর্ণনার পক্ষে যুক্তির জবাব : মুদারাবাকে শিরকাতের সাথে কিয়াস করা সঠিক নয়। কেননা মুদারাবার ক্ষেত্রে শিরকাত মূল উদ্দেশ্য হয় না। মূল উদ্দেশ্য হয় মুনাফা অর্জন। তাই এটা জায়েজ হবে।

পক্ষান্তরে শিরকাত যেখানে মূল উদ্দেশ্য হয় সেখানে জায়েজ হবে না। কেননা কোনো জিনিস তার সমস্তরের জিনিসের অনুগামী হয় না। অতএব, এক শিরকাতের অধীনে আরেক শিরকাত হতে পারবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ وَيُوَكِّلُ مَنْ يَتَصَرَّفُ فِيْهِ لِاَنَّ التَّوْكِيْلَ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ مِنْ تَوَابِعِ التِّجَارَةِ وَالشَّرِكَةُ انْعَقَدَتْ لِلتِّجَارَةِ. بِخِلَافِ الْوَكِيْلِ بِالشِّرَاءِ حَيْثُ لَا يَمْلِكُ اَنْ يُوَكِّلَ غَيْرَهُ لِاَنَّهُ عَقْدٌ خَاصٌّ طُلِبَ مِنْهُ تَحْصِيْلُ الْعَيْنِ فَلَا يَسْتَتْبِعُ مِثْلَهُ قَالَ وَيَدُهُ فِي الْمَالِ يَدُ اَمَانَةٍ لِاَنَّهُ قَبَضَ الْمَالَ بِاِذْنِ الْمَالِكِ لَا عَلَى وَجْهِ الْبَدَلِ وَالْوَثِيْقَةِ فَصَارَ كَالْوَدِيْعَةِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, **মূলধন ব্যবহার করার জন্য সে কাউকে উকিল নিযুক্ত করতে পারে।** কেননা বেচা-কেনার জন্য উকিল নিযুক্ত করা ব্যবসায়েরই অনুষঙ্গ। আর ব্যবসা করার জন্যই অংশীদারী চুক্তি সম্পন্ন করা হয়েছে। ক্রয়ের জন্য নিযুক্ত উকিলের বিষয়টি ভিন্ন। অর্থাৎ সে অন্যকে উকিল নিযুক্ত করতে পারবে না। কেননা এটি একটি বিশেষ চুক্তি, যার দ্বারা তার থেকে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের বাস্তবায়ন তলব করা হয়েছে। সুতরাং এ চুক্তি নিজের সদৃশ আরেকটি চুক্তিকে অনুগামী বানাতে পারবে না।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, **মাল তার হাতে আমানত রূপে থাকবে।** কেননা এটা হলো বদল ছাড়া এবং ঋণের নিরাপত্তার জামানত ছাড়া মালিকের অনুমতিক্রমে মাল কবজায় আনয়ন। সুতরাং এটা আমানত বা গচ্ছিত সম্পদের মতই হলো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিউক্ত ইবারতের মর্ম হলো এই যে, শরিকদ্বয় শিরকাতের মাল দ্বারা যেমন নিজে ব্যবসা করতে পারে বা ব্যবসার কাজকর্ম নিজে আঞ্জাম দিতে পারে। তেমনি উকিলের মাধ্যমেও আঞ্জাম দিতে পারে। অর্থাৎ কোনো মাল বেচার জন্য কিংবা কোনো মাল খরিদ করার জন্য শরিকদ্বয় উকিল নিয়োগ করতে পারবে। কারণ উকিল নিয়োগ করা হয় ব্যবসার জন্য, আর ব্যবসাই শিরকাতের উদ্দেশ্য। তাই উকিল নিয়োগ করার দ্বারা শিরকাতের কোনো সমস্যা হবে না।

পক্ষান্তরে কেউ যদি কাউকে উকিল বানায় নির্দিষ্ট কোনো কিছু ক্রয় করে এনে দেওয়ার জন্য, তাহলে সে উকিল আবার অন্য আরেকজনকে উকিল বানাতে পারবে না। কারণ সে যদি আরেক জনকে উকিল বানায় তাহলে একটি বস্তু নিজের সমস্তরের আরেকটি বস্তু অনুবর্তী করে নেওয়া আবশ্যক হয় যা জায়েজ নয়।

قَوْلُهُ : وَيَدُهُ فِي الْمَالِ يَدُ اَمَانَةٍ لِاَنَّهُ الخ : উপরিউক্ত ইবারতের মর্ম হলো, শিরকাতে মুফাওয়াযা বা শিরকাতে ইনানের মাধ্যমে পরস্পর চুক্তিবদ্ধ শরিকদ্বয়ের হাতে শিরকাতের যে মাল থাকে, তা আমানত স্বরূপ থাকে। কোনো শরিকের হাতে যদি শিরকাতের মাল ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে দায়হীনভাবে ধ্বংস হবে। অর্থাৎ মাল ধ্বংস হওয়ার কারণে কোনো ভর্তুকি দিতে হবে না। কেননা প্রত্যেক শরিকের হাতে অপর শরিকের যে মাল রয়েছে, তা তার মালিকের অনুমতিক্রমে সে কবজা করেছে। কোনোরূপ বিনিময় দানের ভিত্তিতে কবজা করেনি কিংবা কোনো ঋণের জামানত রূপেও কবজা করেনি। যদি বিনিময় দানের ভিত্তিতে কবজা করা হতো কিংবা ঋণের জামানতরূপে কবজা করা হতো, তাহলে ধ্বংসে হয়ে গেলে অবশ্যই ভর্তুকি দিতে হতো।

বিনিময় দানের ভিত্তিতে গ্রহণ করা হয় যেমন ক্রয়ের উদ্দেশ্যে পণ্য গ্রহণ করা। অর্থাৎ কোনো দ্রব্যের দাম-দর ঠিক করার পর যদি ক্রেতা ঐ দ্রব্যটি কবজা করে নেয় এরপর ক্রেতার হাতে দ্রব্যটি ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে ক্রেতাকে সে দ্রব্যের যেমান দিতে হয় অর্থাৎ দ্রব্যের মূল্য পরিশোধ করতে হয়। কারণ সে দ্রব্যটি বিনিময় দানের ভিত্তিতে গ্রহণ করেছিল।

আর ঋণের জামানত স্বরূপ গ্রহণ করা হয় যেমন বন্ধকি সম্পদ। অর্থাৎ কোনো পাওনাদার ব্যক্তি যদি নিজের পাওনা নিশ্চিত করার জন্য ঋণী ব্যক্তির কাছ থেকে কোনো বন্ধক গ্রহণ করে, এরপর সেই বন্ধকি মাল তার হাতে ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে তা জেমানসহ ধ্বংস হয়।

পক্ষান্তরে শিরকাতের সম্পদ কোনো শরিক বদলা দানের ভিত্তিতে কিংবা ঋণের জামানতরূপে কবজা করে না। বরং তা মালিকের অনুমতিক্রমে কবজা করে, বিধায় তা আমানতের সম্পদের মতো। সুতরাং আমানতের সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেলে যেমন কোনো দায় আরোপিত হয় না, তেমনি শিরকাতের সম্পদ শরিকের হাতে ধ্বংস হয়ে গেলেও কোনো দায় আরোপিত হবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ وَاَمَّا شَرِكَةُ الصَّنَائِعِ وَيُسَمّٰى شَرِكَةَ التَّقَبُّلِ كَالْخَيَّاطِيْنَ وَالصَّبَّاغِيْنَ يَشْتَرِكَانِ عَلٰى اَنْ يَتَقَبَّلَا الْاَعْمَالَ وَيَكُوْنَ الْكَسْبُ بَيْنَهُمَا فَيَجُوْزُ ذٰلِكَ وَهٰذَا عِنْدَنَا . وَقَالَ زُفَرُ وَالشَّافِعِيُّ رحـ : لَا يَجُوْزُ لِاَنَّ هٰذِهِ شَرِكَةٌ لَا يُفِيْدُ مَقْصُوْدَهَا وَهُوَ التَّثْمِيْرُ؛ لِاَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، وَهٰذَا لِاَنَّ الشَّرِكَةَ فِي الرِّبْحِ تُبْتَنٰى عَلَى الشَّرِكَةِ فِي الْمَالِ عَلٰى اَصْلِهِمَا عَلٰى مَا قَرَّرْنَاهُ . وَلَنَا اَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ التَّحْصِيلُ وَهُوَ مُمْكِنٌ بِالتَّوْكِيْلِ، لِاَنَّهُ لَمَّا كَانَ وَكِيْلًا فِي النِّصْفِ اَصِيْلًا فِي النِّصْفِ تَحَقَّقَتِ الشَّرِكَةُ فِي الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ وَلَا يُشْتَرَطُ فِيْهِ اتِّحَادُ الْعَمَلِ وَالْمَكَانِ خِلَافًا لِمَالِكٍ وَزُفَرَ فِيْهِمَا؛ لِاَنَّ الْمَعْنَى الْمُجَوِّزَ لِلشَّرِكَةِ وَهُوَ مَا ذَكَرْنَاهُ لَا يَتَفَاوَتُ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, আর **شَرِكَةُ الصَّنَائِعِ** বা পেশাগত অংশীদারিত্ব, যার অপর নাম شَرِكَةَ التَّقَبُّلِ বা ফরমায়েশ গ্রহণের অংশীদারিত্ব। এর রূপ এই যে, দু'জন দর্জি বা দু'জন রং মিস্ত্রী এই শর্তে অংশীদারিত্ব চুক্তি করল যে, তারা উভয়ে ফরমায়েশ গ্রহণ করবে এবং লব্ধ উপার্জন দু'জনের মাঝে ভাগ হবে। তবে তা জায়েজ আছে। এ হলো আমাদের মাযহাব।

ইমাম যুফার (র.) ও ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন, জায়েজ হবে না। কেননা এ হলো এমন অংশীদারি চুক্তি যা দ্বারা অংশীদারিত্বের উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হয় না। আর তা হচ্ছে মুনাফা অর্জন। কেননা মুনাফা অর্জনের জন্য মূলধন অনিবার্য। আর তা এই জন্য যে, ইমাম যুফার ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মূলনীতি অনুযায়ী মুনাফার অংশীদারিত্বের ভিত্তি হলো মূলধনে অংশীদারিত্ব। যেমন ইতিপূর্বে আমরা বর্ণনা করে এসেছি।

আমাদের দলিল এই যে, অংশীদারি চুক্তির উদ্দেশ্য হলো মুনাফা অর্জন। আর তা একে অপরকে উকিল নিয়োগ করার মাধ্যমে সম্ভব। কেননা সে যখন অর্ধেকের ক্ষেত্রে মূল ব্যক্তি এবং বাকি অর্ধেকের ক্ষেত্রে উকিল হবে তখন লব্ধ মালের ক্ষেত্রে অংশীদারিত্ব সাব্যস্ত হয়ে যাবে। আর সে ক্ষেত্রে কাজ ও স্থানের অভিন্নতাও শর্ত নয়। এই দুই ক্ষেত্রে ইমাম মালেক ও ইমাম যুফার (র.) ভিন্নমত পোষণ করেছেন।

(আমাদের দলিল এই যে,) অংশীদারিত্ব চুক্তির বৈধতা দানকারী যে বিষয়টি আমরা উল্লেখ করেছি, তা এই কারণে বিঘ্নিত হয় না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিউক্ত ইবারতে শিরকাতের তৃতীয় প্রকার সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। শিরকাতের তৃতীয় প্রকার হলো শিরকাতুস সানায়ে, বা পেশাগত অংশীদারিত্ব। এর অপর নাম শিরকাতুত তাকাব্বুল বা ফরমায়েশ গ্রহণের অংশীদারিত্ব।

এই শিরকাতের স্বরূপ হলো এই যে, দু'জন কর্মজীবি মানুষ যেমন দু'জন দর্জি কিংবা দু'জন মিস্ত্রী এই শর্তে পরস্পর চুক্তিবদ্ধ হওয়া যে, আমরা উভয়ে কাজের ফরমায়েশ বা অর্ডার নিব এরপর অর্ডার প্রাপ্ত কাজগুলো উভয় মিলে করে শেষ করব। যা উপার্জন হবে তা আমরা উভয়ে ভাগ করে নিব।

https://e-ilm.weebly.com/

এরূপ চুক্তি জায়েজ হওয়ার ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে। আহনাফ ও ইমাম মালেক (র.)-এর মতে আলোচ্য শিরকাত জায়েজ আছে। পক্ষান্তরে ইমাম যুফার (র.) ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে আলোচ্য শিরকাত জায়েজ নেই।

ইমাম যুফার ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল : শিরকাতের উদ্দেশ্য হলো মাল বাড়ানো, এর জন্য শর্ত হলো মাল থাকা অর্থাৎ মূলধন থাকা। মূলধন না থাকলে তা বাড়ানোর কল্পনা করা যায় না। আর আলোচ্য শিরকাতে যেহেতু কোনো মূলধন থাকে না। তাই এ শিরকাত দ্বারা মূলধন বাড়ানো যাবে না। তথা শিরকাতের উদ্দেশ্যই হাসিল হবে না। সুতরাং এ শিরকাত জায়েজ নয়।

তাছাড়া ইমামদ্বয়ের মূলনীতি অনুযায়ী মুনাফায় অংশীদার হওয়ার বিষয়টি মূলধনে অংশীদার হওয়ার উপর নির্ভর করে। অতএব, যেখানে মূলধনে অংশীদারিত্ব নেই, সেখানে মুনাফায়ও অংশীদারিত্ব সাব্যস্ত হবে না। আর যেখানে মূলধনই নেই সেখানে মূলধনে অংশীদারিত্বেরও প্রশ্ন নেই। সুতরাং শিরকাতই নেই।

আহনাফের দলিল : আহনাফ বলেন, অংশীদারি চুক্তির উদ্দেশ্য হলো সম্পদ অর্জন। এটা মূলধন ছাড়াও উকিল নিয়োগের মাধ্যমে সম্ভব। কেননা শরিকদ্বয়ের প্রত্যেকে যখন অর্ধেক কাজ আসীল বা মূল ব্যক্তি হিসাবে করবে এবং বাকি অর্ধেক কাজ অপর শরিকের উকিল হিসাবে করবে, তখন উক্ত কাজের বিনিময়ে উপার্জিত সম্পদের মাঝে শিরকাত সাব্যস্ত হবে। অর্থাৎ উপার্জিত সম্পদ উভয়ের মাঝে যৌথ হবে, পরে তা তারা ভাগাভাগি করে নিবে।

মোটকথা, শিরকাতের উদ্দেশ্য তথা সম্পদ অর্জন কেবল পুঁজির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং তা কাজের মাধ্যমেও হতে পারে। সুতরাং শিরকাতুস সানায়ের মধ্যে যদিও মূলধন বা পুঁজি নেই। তবু তার দ্বারা শিরকাতের উদ্দেশ্য হাসিল হয়। বিধায় তা জায়েজ।

আর মুনাফায় অংশীদারিত্ব সাব্যস্ত হওয়ার জন্য মূলধনে অংশীদারিত্ব জরুরি নয়। বরং কাজে অংশীদারিত্বের মাধ্যমেও মুনাফায় অংশীদারিত্ব সাব্যস্ত হতে পারে। যেমন- আলোচ্য শিরকাতের মধ্যে হয়ে থাকে। এতএব, এ শিরকাত জায়েজ।

আলোচ্য শিরকাত সহীহ হওয়ার জন্য উভয়ের কাজ এবং স্থান এক হওয়া ইমাম মালেক (র.) ও ইমাম যুফার (র.)-এর মতে শর্ত। আমাদের মতে শর্ত নয়। কারণ শিরকাত জায়েজ হওয়ার যে মূল কারণটি আমরা বর্ণনা করেছি, তা স্থান ও কাজের ভিন্নতা দ্বারা বিঘ্নিত হয় না। তাই কাজ ও স্থান এক না হলেও শিরকাত জায়েজ হওয়ার মূল হেতু যেহেতু বিদ্যমান থাকে সেহেতু কাজ ও স্থান এক হওয়া শর্ত নয়।

https://e-ilm.weebly.com/

وَلَوْ شَرَطَا الْعَمَلَ نِصْفَيْنِ وَالْمَالَ اَثْلَاثًا جَازَ وَفِي الْقِيَاسِ : لَا يَجُوْزُ؛ لِاَنَّ الضَّمَانَ بِقَدْرِ الْعَمَلِ، فَالزِّيَادَةُ عَلَيْهِ رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ فَلَمْ يَجُزِ الْعَقْدُ لِتَأْدِيَتِهِ اِلَيْهِ، وَصَارَ كَشَرِكَةِ الْوُجُوْهِ، وَلٰكِنَّا نَقُوْلُ : مَا يَأْخُذُهُ لَا يَأْخُذُهُ رِبْحًا لِاَنَّ الرِّبْحَ عِنْدَ اِتِّحَادِ الْجِنْسِ، وَقَدْ اِخْتَلَفَ لِاَنَّ رَأْسَ الْمَالِ عَمَلٌ وَالرِّبْحَ مَالٌ فَكَانَ بَدَلَ الْعَمَلِ وَالْعَمَلُ يُتَقَوَّمُ بِالتَّقْوِيْمِ فَيَتَقَدَّرُ بِقَدْرِ مَا قُوِّمَ بِهِ فَلَا يَحْرُمُ، بِخِلَافِ شَرِكَةِ الْوُجُوْهِ؛ لِاَنَّ جِنْسَ الْمَالِ مُتَّفِقٌ وَالرِّبْحُ يَتَحَقَّقُ فِي الْجِنْسِ الْمُتَّفِقِ، وَرِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ لَا يَجُوْزُ اِلَّا فِي الْمُضَارَبَةِ ـ

অনুবাদ : যদি কাজ অর্ধেক অর্ধেক আর মুনাফা তিন ভাগ করার শর্ত করে তাহলে জায়েজ হবে। কিয়াস অনুযায়ী জায়েজ হয় না। কেননা দায় বহন হচ্ছে কাজ পরিমাণ। সুতরাং অতিরিক্তটুকু হবে এমন জিনিসের মুনাফা, যার দায় সে বহন করে নি। সুতরাং চুক্তিটি এতে উপনীত হওয়ার কারণে বৈধ হবে না এবং তা شَرِكَةُ الْوُجُوْهِ বা পরিচয় ভিত্তিক অংশীদারির ন্যায় হবে। তবে আমরা বলি যে, সে যা নিচ্ছে তা মুনাফা হিসাবে নিচ্ছে না। কেননা মুনাফা হয় জাতিগত অভিন্নতার ক্ষেত্রে। অথচ এখানে জাতিগত ভিন্নতা রয়েছে। কেননা মূলধন হচ্ছে কর্ম আর মুনাফা হচ্ছে অর্থ। সুতরাং এটা হবে কর্মের বিনিময়। আর কর্ম মূল্য দ্বারা মূল্যায়িত হতে পারে। সুতরাং উভয় পক্ষের সম্মতিতে যে পরিমাণ দ্বারা মূল্যায়িত করা হবে সেই পরিমাণ দ্বারা পরিমাণিত হবে এবং তা হারাম হবে না। পরিচয় ভিত্তিক অংশীদারির বিষয়টি ভিন্ন। কেননা তাদের জিম্মায় যে "অর্থদ্রব্য" সাব্যস্ত হবে তা অভিন্ন। এই জাতিগত অভিন্নতার ক্ষেত্রে মুনাফা সাব্যস্ত হয়। আর মুদারাবা ছাড়া অন্য কোনো ক্ষেত্রে যে জিনিসের দায় বহন করা হয় না, তার মুনাফা ভোগ করা বৈধ নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পেশাগত অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে যদি শরিকদ্বয় এরূপ শর্ত করে যে, তারা উভয়ে কাজ করবে সমান সমান, কিন্তু উপার্জিত অর্থ বণ্টন হবে তিন ভাগ করে। অর্থাৎ উপার্জিত অর্থের তিন ভাগের দু'ভাগ একজন পাবে। আর এক ভাগ অপরজন পাবে। তাহলে কিয়াস অনুযায়ী এটা জায়েজ হয় না। কেননা মুনাফা সাব্যস্ত হয় দায় বহনের দ্বারা। আর আলোচ্য শিরকাতে দায় বহন করা হয় কাজের দ্বারা। অতএব, যে যতটুকু কাজ করবে সে ততটুকু মুনাফা ভোগ করবে। সে হিসাবে শরিকদ্বয় যদি সমান অর্ধেক অর্ধেক কাজ করে, তাহলে মুনাফাও অর্ধা-অর্ধিহারে সমানভাবে বণ্টিত হবে। কেউ যদি বেশি মুনাফা ভোগ করে, তাহলে তা দায় বহন ব্যতীত মুনাফা ভোগ করার অন্তর্ভুক্ত হবে। যা হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে। আর আলোচ্য সুরতে যেহেতু এ নিষিদ্ধ বিষয়টিই অনিবার্য হয়ে থাকে, সেহেতু সুরতটি কিয়াস অনুযায়ী জায়েজ নয়।

কিন্তু ইস্তিহসান বা সূক্ষ্ম কিয়াস দ্বারা সুরতটিকে জায়েজ সাব্যস্ত করা হয়েছে। সূক্ষ্ম কিয়াসটি এই যে, আমরা বলব, আলোচ্য সুরতে যে শরিক কাজের তুলনায় অধিক উপার্জন নিচ্ছে, সে মুনাফা নিচ্ছে না। অর্থাৎ কোনো এক শরিক অতিরিক্ত যা নিচ্ছে তা মুনাফা নয়। কেননা মুনাফা হওয়ার জন্য শর্ত হলো খাটানো জিনিস ও উপার্জিত জিনিস এক জাতীয় হওয়া। যেমন- এক হাজার টাকা ব্যবসায় খাটিয়ে যদি দুইশ টাকা উপার্জন করা হয়, তাহলে এই উপার্জিত দুইশ টাকাকে মুনাফা বলা যাবে, কেননা খাটানো হয়েছে টাকা, উপার্জনও হয়েছে টাকা, উভয়ের জাত এক। পক্ষান্তরে আলোচ্য শিরকাতে যে অর্থ উপার্জন করা হয়, তা অর্থ খাটিয়ে করা হয় না। বরং উভয় শরিক শ্রম ব্যয় করে অর্থ উপার্জন করে। সুতরাং শ্রম ও অর্থ এক জাতীয় না হওয়ার কারণে এ অর্থকে মুনাফা বলা যায় না। বরং এ অর্থকে বলতে হবে শ্রমের বিনিময়। আর শ্রমকে অর্থ দ্বারা মূল্যায়ন করা যায়। অতএব, উভয় শরিকের সম্মতিতে যার শ্রমের যে মূল্য নির্ধারণ করা হবে, তাই তার শ্রমের মূল্য হবে এবং সে মূল্য গ্রহণ করা তার পক্ষে হারাম হবে না। সুতরাং আলোচ্য সুরতে যার জন্য উপার্জনের দুই ভাগ শর্ত করা হয়েছে, তার শ্রমের মূল্য হলো উপার্জিত অর্থের দুই ভাগ। আর যার জন্য উপার্জিত অর্থের এক ভাগ শর্ত করা হয়েছে তার শ্রমের মূল্য হলো এক ভাগ। প্রত্যেকের জন্যই প্রত্যেকের শ্রমের মূল্য ভোগ করা হালাল।

উপরিউক্ত বিষয়টি شَرِكَةُ الْوُجُوْهِ বা পরিচয় ভিত্তিক অংশীদারিত্বের মতো নয়। পরিচয় ভিত্তিক অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে বিনিয়োগকৃত বস্তু ও উপার্জিত বস্তু এক হয়ে থাকে। ফলে সেটা মুনাফা বলে গণ্য হয় এবং দায়ের অতিরিক্ত মুনাফা ভোগ করা হারাম হয়। দায় বহন ব্যতীত মুনাফা ভোগ করা কোনো ক্ষেত্রেই জায়েজ নয়। কেননা নবী করীম ﷺ তা নিষেধ করেছেন, তবে মুদারাবা ব্যতিক্রম। কেবল মুদারাবার মধ্যেই তা জায়েজ।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ وَمَا يَتَقَبَّلُهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ الْعَمَلِ يَلْزَمُهُ وَيَلْزَمُ شَرِيْكَهُ حَتّٰى أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُطَالَبُ بِالْعَمَلِ وَيُطَالِبُ بِالْأَجْرِ وَيَبْرَأُ الدَّافِعُ بِالدَّفْعِ إِلَيْهِ وَهٰذَا ظَاهِرٌ فِي الْمُفَاوَضَةِ وَفِيْ غَيْرِهَا إِسْتِحْسَانٌ . وَالْقِيَاسُ خِلَافُ ذٰلِكَ لِأَنَّ الشَّرِكَةَ وَقَعَتْ مُطْلَقَةً وَالْكَفَالَةُ مُقْتَضَى الْمُفَاوَضَةِ . وَجْهُ الْإِسْتِحْسَانِ أَنَّ هٰذِهِ الشَّرِكَةَ مُقْتَضِيَةٌ لِلضَّمَانِ؛ أَلَا تَرٰى أَنَّ مَا يَتَقَبَّلُهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ الْعَمَلِ مَضْمُوْنٌ عَلَى الْآخَرِ، وَلِهٰذَا يَسْتَحِقُّ الْأَجْرَ بِسَبَبِ نَفَاذِ تَقَبُّلِهِ عَلَيْهِ فَجَرٰى مَجْرَى الْمُفَاوَضَةِ فِيْ ضَمَانِ الْعَمَلِ وَاقْتِضَاءِ الْبَدَلِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, **দু'জনের যে কেউ, যে কাজ গ্রহণ করবে, তা সম্পন্ন করা তার উপর এবং তার শরিকের উপর আবশ্যক হবে।** সুতরাং উভয়ের প্রত্যেকের কাছে কাজের তাগাদা দেওয়া যাবে এবং উভয়ের প্রত্যেকেই পারিশ্রমিকের তাগাদা করতে পারবে। **আর পরিশোধকারী যার কাছেই পরিশোধ করুক দায়মুক্ত হয়ে যাবে।** এই পেশাগত অংশীদারিত্ব যদি মুফাওয়াযার সূরতে হয় তাহলে উক্ত বিধানের যৌক্তিকতা সুপ্রকাশিত। পক্ষান্তরে অন্যান্য ক্ষেত্রে এ বিধান হলো সূক্ষ্ম কিয়াস ভিত্তিক। সাধারণ কিয়াসের দাবি অবশ্য ভিন্ন।

কেননা এখানে অংশীদারি চুক্তি নিঃশর্তভাবে সংঘটিত হয়েছে। আর কাফালাত হচ্ছে মুফাওয়াযার অনিবার্য দাবি। আর সূক্ষ্ম কিয়াসের দলিল এই যে, এই পেশাগত অংশীদারি চুক্তি দায় গ্রহণকে অনিবার্য করে। তাই তো দু'জনের একজন যে কাজ গ্রহণ করে অন্যের উপরও তা দায়যুক্ত হয়। আর যেহেতু অপরের ফারমায়েশ গ্রহণ তার উপরও কার্যকর, সেহেতু সে পারিশ্রমিকের হকদার হয়। সুতরাং কাজের দায় গ্রহণ এবং বিনিময় অপরিহার্য হওয়ার ক্ষেত্রে তা মুফাওয়াযার স্থলবর্তী হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিউক্ত ইবারতে বর্ণিত মাসআলার সারমর্ম হলো এই, শরিকদ্বয়ের একজন যদি কোনো কাজের ফরমায়েশ বা অর্ডার গ্রহণ করে, তাহলে সে কাজটি সম্পন্ন করা উভয় শরিকের দায়িত্বে জরুরি হয়ে যাবে। ফলে ফরমায়েশদাতা কাজটির জন্য উভয় শরিকের নিকট তাগাদা করতে পারবে এবং উভয় শরিক ফরমায়েশ দাতার কাছে পারিশ্রমিক তলব করতে পারবে এবং শরিকদ্বয়ের যে কোনো একজনের কাছে পারিশ্রমিক পরিশোধ করলেই পরিশোধ করা হয়ে যাবে।

উপরিউক্ত হুকুমটি মুফাওয়াযার ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট কিয়াস মুতাবিক। কারণ মুফাওয়াযা ওকালত এবং কাফালতের উপর সম্পাদিত হয়। বিধায় সেখানে এক শরিক অপর শরিকের কাফিল হয়ে থাকে। ফলে একজনের উপর যে দায়িত্ব বর্তায়, অপর জনের উপরও তা বর্তায়। একজন যা কিছুর হকদার হয়, অপরজনও তার হকদার হয়।

মোটকথা, মুফাওয়াযার মধ্যে কাফালাত থাকার কারণে এক শরিক অপর শরিকের স্থলবর্তী বলে গণ্য হয়।

পক্ষান্তরে অন্যান্য শিরকাতে যদি কাফালতের কথা উল্লেখ না থাকে, তাহলে বাহ্যিক কিয়াস অনুযায়ী এক শরিক অপর শরিকের কাফিল হয় না। সে হিসাবে একজনের উপর যা বর্তায়, অপরজনের উপর তা বর্তাবে না, একজন যা কিছুর হকদার হবে, অপরজন তার হকদার হবে না।

কিন্তু ইস্তিহসান তথা সূক্ষ্ম কিয়াসের ভিত্তিতে অন্যান্য শিরকাতের মধ্যে এক শরিককে অপর শরিকের স্থলাবর্তী সাব্যস্ত করা হয়েছে। সেই সূক্ষ্ম কিয়াসটি হলো এই যে, পেশাগত অংশীদারিত্ব যেমন বা দায় গ্রহণকে অনিবার্য করে। এ কারণে একজন যে ফরমায়েশ গ্রহণ করে, অপর জনের উপরও তা আরোপিত হয় এবং এরই ফলশ্রুতিতে ফরমায়েশ গ্রহণকারী যেমন পারিশ্রমিকের হকদার হয়, তেমনি অপর শরিকও পারিশ্রমিকের হকদার হয়। অতএব, দায় আরোপিত হওয়া এবং পারিশ্রমিকের হকদার হওয়ার দিক বিবেচনা করে পেশাগত অংশীদারিত্বকেও শিরকাতে মুফাওয়াযার অনুরূপ সাব্যস্ত করা হয়েছে বা মুফাওয়াযার অনুরূপ হয়ে গেছে।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ وَاَمَّا شِرْكَةُ الْوُجُوْهِ فَالرَّجُلَانِ يَشْتَرِكَانِ وَلَا مَالَ لَهُمَا عَلٰى اَنْ يَشْتَرِيَا بِوُجُوْهِهِمَا وَيَبِيْعَا فَتَصِحُّ الشَّرِكَةُ عَلٰى هٰذَا سُمِّيَتْ بِهِ لِاَنَّهُ لَا يَشْتَرِي بِالنَّسِيْئَةِ اِلَّا مَنْ كَانَ لَهُ وَجَاهَةٌ عِنْدَ النَّاسِ وَاِنَّمَا تَصِحُّ مُفَاوَضَةً لِاَنَّهُ يُمْكِنُ تَحْقِيْقُ الْكَفَالَةِ وَالْوَكَالَةِ فِي الْاَبْدَالِ. وَاِذَا اُطْلِقَتْ تَكُوْنُ عِنَانًا لِاَنَّ مُطْلَقَهُ يَنْصَرِفُ اِلَيْهِ وَهِيَ جَائِزَةٌ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رح. وَالْوَجْهُ مِنَ الْجَانِبَيْنِ مَا قَدَّمْنَاهُ فِيْ شِرْكَةِ التَّقَبُّلِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, পরিচয় ভিত্তিক অংশীদারিত্বের রূপ এই যে, মূলধন নেই এমন দু'জন এই শর্তে অংশীদারি চুক্তি করল যে, তারা নিজেদের পরিচয় (ও আস্থা) কে কাজে লাগিয়ে ক্রয় ও বিক্রয় করবে। এই ভিত্তিতে অংশীদারি বৈধ হবে। এ ধরনের চুক্তিকে شِرْكَةُ الْوُجُوْهِ বলে নামকরণের কারণ হলো এই যে, কেবল এমন ব্যক্তিই বাকিতে ক্রয় করতে পারে, মানুষের কাছে যার পরিচিতি বা মর্যাদা রয়েছে।

আলোচ্য শিরকাত মুফাওয়াযা রূপে শুদ্ধ হবে। কেননা পণ্যদ্রব্য ও অর্থদ্রব্য উভয় প্রকার বিনিময়ের ক্ষেত্রে কাফালাত এবং ওকালাত সাব্যস্ত হওয়া সম্ভব। আর যদি চুক্তিটি নিঃশর্ত রাখা হয়, তাহলে তা শিরকাতুল ইনান হবে। কেননা নিঃশর্ত চুক্তি সে দিকেই প্রত্যাবর্তিত হয়।

আলোচ্য শিরকাতটি আমাদের মতে জায়েজ। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। আর উভয় পক্ষের যুক্তি তাই, যা আমরা ফরমায়েশ গ্রহণের অংশীদারিত্বের বর্ণনায় উল্লেখ করে এসেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

গ্রন্থকার (র.) উপরিউক্ত ইবারতে শিরকাতের চতুর্থ প্রকারের সুরত বা রূপ রেখা বর্ণনা করেছেন এবং এর নামকরণের কারণও বর্ণনা করেছেন। যার সারমর্ম নিম্নরূপ : দু'জন লোকের কাছে কোনো পুঁজি বা মূলধন নেই। এমতাবস্থায় তারা দু'জন এ মর্মে পরস্পর চুক্তিবদ্ধ হলো যে, তারা উভয়ে নিজের পরিচয়, আস্থা, আমানতদারি ও ব্যক্তিত্বকে কাজে লাগিয়ে বাকিতে পণ্য ক্রয় করবে। অতঃপর তা বিক্রি করে যা মুনাফা হবে তা উভয়ে ভাগ করে নিবে। এরূপ শিরকাতকে শিরকাতুল উজূহ বলে। অর্থাৎ পরিচয় ভিত্তিক শিরকাত। এরূপ শিরকাত করা শরিয়তে অনুমোদিত।

এ শিরকাতকে শিরকাতুল উজূহ বলে নামকরণের কারণ হলো, এ শিরকাতে কোনো পুঁজি থাকে না, থাকে শুধু শরিকদ্বয়ের পরিচিতি। এই পরিচিতির উপর ভিত্তি করেই এ শিরকাত সম্পাদিত হয়। তাই একে শিরকাতুল উজূহ বা পরিচয় ভিত্তিক শিরকাত বলা হয়।

قَوْلُهُ : وَاِنَّمَا تَصِحُّ مُفَاوَضَةً لِاَنَّهُ يُمْكِنُ الخ : উপরিউক্ত ভাষ্যের সার সংক্ষেপ হলো, যে দু'জন লোক পরস্পরে শিরকাতুল উজূহের চুক্তিতে চুক্তিবদ্ধ হলো, তারা যদি কাফিল হওয়ার উপযুক্ত হয়, তাহলে শিরকাতটি শিরকাতে মুফাওয়াযারূপে সম্পাদিত হতে পারে। কারণ শিরকাতে মুফাওয়াযা সম্পাদিত হয় ওকালাত এবং কাফালাতের উপর। আর আলোচ্য সুরতে ওকালাত, কাফালাত বাস্তবায়ন করা সম্ভব। তবে শর্ত হলো চুক্তি করার সময় মুফাওয়াযা বা তার অনুরূপ কোনো শব্দ উল্লেখ করতে হবে।

যদি শিরকাতে মুফাওয়াযা রূপে শুদ্ধ হয় তাহলে যে কোনো শরিকের ক্রয়কৃত দ্রব্য উভয় শরিকের অর্ধা-অর্ধি মালিকানা বলে গণ্য হবে এবং প্রত্যেক শরিকের জিম্মায় ক্রয়কৃত দ্রব্যের অর্ধেক মূল্য আরোপিত হবে।

আর যদি চুক্তি সম্পাদনের সময় মুফাওয়াযা বা তার অনুরূপ কোনো শব্দ কিংবা ওকালাত-কাফালাতের কথা উল্লেখ না করা হয়, তাহলে শিরকাতটি শিরকাতুল ইনানে পরিণত হবে। কারণ নিঃশর্ত রূপে সম্পাদিত যে কোনো শিরকাতই শিরকাতে ইনান হয়ে থাকে। শিরকাতে ইনান লোক সমাজে অধিক প্রচলিত হওয়ার কারণে।

শিরকাতুল উজূহ আহনাফ ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের মতে জায়েজ আছে। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালেক (র.)-এর মতে জায়েজ নেই। উভয় মতের দলিল প্রমাণ শিরকাতুস সানায়ের আলোচনার অধীনে অতিবাহিত হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَكِيْلُ الْآخَرِ فِيْمَا يَشْتَرِيْهِ لِاَنَّ التَّصَرُّفَ عَلَى الْغَيْرِ لَا يَجُوْزُ اِلَّا بِوَكَالَةٍ اَوْ بِوِلَايَةٍ وَلَا وِلَايَةَ فَتَتَعَيَّنُ الْوَكَالَةُ فَاِنْ شَرَطَا اَنَّ الْمُشْتَرِى بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَالرِّبْحُ كَذٰلِكَ يَجُوْزُ، وَلَا يَجُوْزُ اَنْ يَتَفَاضَلَا فِيْهِ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, তারা যা খরিদ করবে, সে ক্ষেত্রে প্রত্যেকে অপরের উকিল হবে। কেননা উকিল হওয়া বা অভিভাবক হওয়া ছাড়া অন্যের উপর তসরুফ করা বৈধ হয় না। আর এখানে (শিরকাতের ক্ষেত্রে) অভিভাবকত্ব নেই। সুতরাং উকিল হওয়াই নির্ধারিত হয়ে গেল।

যদি তারা এরূপ শর্ত করে যে, ক্রয়কৃত বস্তু তাদের অর্ধেক অর্ধেক হবে এবং মুনাফাও অনুরূপ হবে তাহলে তা জায়েজ হবে। কিন্তু মুনাফায় বেশ-কম করা জায়েজ হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরকাতুল উজূহের চুক্তিতে আবদ্ধ শরিকদ্বয়ের একজন যদি কিছু ক্রয় করে, তাহলে সে উক্ত ক্রয়ের ক্ষেত্রে অপর শরিকের উকিল হবে। অর্থাৎ অর্ধেক বস্তু নিজের জন্য মূল ব্যক্তি হিসাবে ক্রয় করবে এবং অর্ধেক বস্তু অপর শরিকের পক্ষ থেকে উকিল হিসাবে ক্রয় করবে।

কারণ একজনের পক্ষ থেকে অপরজনের তসরুফ দুই কারণে হয়ে থাকে। ১. একজন অপরজনের উকিল হওয়ার কারণে। ২. একজন অপরজনের ওলি বা অভিভাবক হওয়ার কারণে। আর এটা সুস্পষ্ট যে, শরিকদ্বয় একজন অপরজনের ওলি বা অভিভাবক। অতএব, এটাই নিশ্চিত যে, তারা একজন অপরজনের উকিল হওয়ার ভিত্তিতে একজনের পক্ষ থেকে অপরজন তসরুফ করে থাকে।

শরিকদ্বয় যদি এরূপ শর্ত করে যে, ক্রয়কৃত বস্তু তাদের মাঝে অর্ধেক-অর্ধেক হবে এবং মুনাফাও অর্ধেক-অর্ধেক হবে, তাহলে এরূপ শর্তে শিরকাত জায়েজ হবে।

পক্ষান্তরে কম-বেশির শর্ত করলে জায়েজ হবে না। অর্থাৎ যদি এরূপ শর্ত করে যে, ক্রয়কৃত বস্তু দু'জনের মাঝে অর্ধেক-অর্ধেক হবে। কিন্তু মুনাফা বণ্টন করা হবে তিন ভাগে ভাগ করে। এক জনের দুই ভাগ, আরেক জনের এক ভাগ, তাহলে এরূপ শর্ত বাতিল বলে গণ্য হবে এবং মুনাফা বণ্টণ হবে যেমান অনুপাতে। অর্থাৎ উভয় শরিক যদি অর্ধেক দ্রব্যের জামিন হয়ে থাকে, তাহলে মুনাফাও অর্ধা-অর্ধি বণ্টিত হবে। আর যদি এক শরিক এক ভাগের জামিন এবং অপর শরিক দুই ভাগের জামিন হয়, তাহলে মুনাফা এভাবেই পাবে। যে শরিক ক্রয়কৃত দ্রব্যের দুই ভাগের জামিন হয়েছিল সে দুই ভাগ মুনাফা পাবে। আর যে এক ভাগের জামিন হয়েছিল সে মুনাফাও একভাগ পাবে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَإِنْ شَرَطَا أَنْ يَكُوْنَ الْمُشْتَرٰى بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا فَالرِّبْحُ كَذٰلِكَ، وَهٰذَا لِأَنَّ الرِّبْحَ لَا يُسْتَحَقُّ إِلَّا بِالْمَالِ أَوِ الْعَمَلِ أَوْ بِالضَّمَانِ فَرَبُّ الْمَالِ يَسْتَحِقُّهُ بِالْمَالِ، وَالْمُضَارِبُ يَسْتَحِقُّهُ بِالْعَمَلِ، وَالْأُسْتَاذُ الَّذِي يُلْقِي الْعَمَلَ عَلَى التِّلْمِيْذِ بِالنِّصْفِ بِالضَّمَانِ، وَلَا يُسْتَحَقُّ بِمَا سِوَاهَا: أَلَا تَرٰى أَنَّ مَنْ قَالَ لِغَيْرِهِ تَصَرَّفْ فِيْ مَالِكَ عَلٰى أَنَّ لِيْ رِبْحَهُ لَمْ يَجُزْ لِعَدَمِ هٰذِهِ الْمَعَانِيْ . وَاسْتِحْقَاقُ الرِّبْحِ فِيْ شَرِكَةِ الْوُجُوْهِ بِالضَّمَانِ عَلٰى مَا بَيَّنَّا وَالضَّمَانُ عَلٰى قَدْرِ الْمِلْكِ فِي الْمُشْتَرٰى وَكَانَ الرِّبْحُ الزَّائِدُ عَلَيْهِ رِبْحَ مَا لَمْ يُضْمَنْ فَلَا يَصِحُّ اِشْتِرَاطُهُ إِلَّا فِي الْمُضَارَبَةِ وَالْوُجُوْهُ لَيْسَتْ فِيْ مَعْنَاهَا، بِخِلَافِ الْعِنَانِ؛ لِأَنَّهُ فِيْ مَعْنَاهَا مِنْ حَيْثُ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَعْمَلُ فِيْ مَالِ صَاحِبِهِ فَيُلْحَقُ بِهَا، وَاللّٰهُ أَعْلَمُ ـ

অনুবাদ : আর যদি শর্ত করে যে, ক্রয়কৃত দ্রব্য উভয়ের মাঝে তিন ভাগে বণ্টিত হবে তাহলে মুনাফাও সেভাবে বণ্টিত হবে।

এ বিধান একারণে যে, মূলধন কিংবা শ্রম কিংবা দায় বহন ব্যতীত মুনাফার অধিকারী হওয়া যায় না। সুতরাং মূলধন বিনিয়োগকারী মূলধনের বিপরীতে মুনাফার অধিকারী হয়। আর মুদারিব শ্রমের বিনিময়ে মুনাফার অধিকারী হয়। ওস্তাদ কারিগর যে অর্ধেক (বা কম-বেশি) মুনাফার শর্তে শাগরিদ কারিগর দিয়ে কাজ করায়, সে দায় বহনের বিনিময়ে মুনাফার অধিকারী হয়। এছাড়া অন্য কোনো উপায়ে মুনাফার হকদার হওয়া যাবে না।

তুমি কি লক্ষ্য করছ না যে, কেউ যদি অন্যকে বলে, তুমি তোমার মূলধন এই শর্তে পরিচালনা করো যে, তার মুনাফা আমার হবে, তাহলে উপরিউক্ত তিনটি কারণের কোনো একটি না থাকায় তা বৈধ হয় না।

আর পরিচয়ভিত্তিক অংশীদারিত্ব চুক্তিতে দায় বহনের বিনিময়ে মুনাফার অধিকার হয়। যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করে এসেছি। আর দায় বহন তো হবে ক্রয়কৃত বস্তুতে মালিকানার পরিমাণের ভিত্তিতে, সুতরাং মালিকানার পরিমাণের অতিরিক্ত যে মুনাফা, তা হবে যে মালের দায়ভার বহন করে নি তার মুনাফা, সুতরাং মুদারাবা ছাড়া অন্য কোনো ক্ষেত্রে এই শর্ত আরোপ করা বৈধ হবে না। আর পরিচয় ভিত্তিক অংশীদারি মুদারাবার সদৃশ বা সমর্থক নয়। ইনানের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা এই দিক থেকে তা মুদারাবার সদৃশ যে, শরিকদ্বয়ের প্রত্যেকে অপরের মূলধনের মধ্যে তসরুফ করে। সুতরাং তা মুদারাবার সাথে সম্পৃক্ত হবে। আল্লাহ সর্বাধিক জ্ঞানী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিউক্ত ইবারতের সারমর্ম হলো এই যে, শিরকাতুল উজূহের মাধ্যমে চুক্তিবদ্ধ শরিকদ্বয় যদি চুক্তির সময় এরূপ শর্ত করে যে, ক্রয়কৃত পণ্য আমাদের মাঝে তিন ভাগে ভাগ হবে। অর্থাৎ এক শরিক দ্রব্যের দুই ভাগের মালিক আর অপর শরিক দ্রব্যটির এক ভাগের মালিক হবে।

তাহলে মুনাফাও তাদের মাঝে তিন ভাগে বণ্টিত হবে। অর্থাৎ যে শরিক পণ্যের দুই অংশের মালিক ছিল, সে মুনাফারও দুই অংশ পাবে। আর যে শরিক পণ্যের এক তৃতীয়াংশের মালিক ছিল, সে মুনাফা থেকেও এক তৃতীয়াংশ পাবে।

মোটকথা পণ্যের মালিকানা এবং মুনাফার মাঝে সমতা রক্ষা করা অপরিহার্য।

https://e-ilm.weebly.com/

উক্ত হুকুমের দলিল হিসাবে গ্রন্থকার (র.) বলেন, যেকোনো লেনদেনে মুনাফার অধিকারী হওয়া যায় তিনটি বিষয়ের দ্বারা ১. মূলধনের দ্বারা, ২. শ্রমের দ্বারা, ৩. দায়ভার বহনের দ্বারা। মূলধনের দ্বারা মুনাফার অধিকারী হওয়ার উদাহরণ হলো, রাব্বুল মালের মুনাফা। অর্থাৎ রাব্বুল মাল বা পুঁজিপতি ব্যক্তি মুদারিবকে মাল বা পুঁজি দেয়। মুদারিব সেই পুঁজি দ্বারা ব্যবসা করে মুনাফা অর্জন করে। সেই মুনাফার একটি অংশ রাব্বুল মাল পেয়ে থাকে, মূলধনের বিনিময়ে শ্রমের বিনিময়ে মুনাফার অধিকারী হওয়ার উদাহরণ হলো, মুদারিবের মুনাফা। তার কোনো পুঁজি বা মূলধন থাকে না। সে অন্যের পুঁজিতে শ্রম দেয় এবং এই শ্রমের বিনিময়ে অর্জিত মুনাফার একটি অংশ সেও পায়। আর দায় বহনের মাধ্যমে মুনাফার অধিকারী হওয়ার দৃষ্টান্ত হলো, উস্তাদ পেশাজীবিদের মুনাফা লাভ করা। অর্থাৎ বিভিন্ন পেশায় দেখা যায়, যেমন- টেইলর, কাঠ মিস্ত্রীদের সমাজে, যে বড় টেইলর হয় বা বড় মিস্ত্রী হয়, তার কাছে অনেক স্বল্প বয়সী লোক কাজ শেখার জন্য আসে। বড় টেইলর বা মিস্ত্রী এই কাজ শিখতে আসা লোকদেরকে নিজের দোকানেই কাজ শেখায়, শেখানোর পন্থা এই হয়ে থাকে যে, বড় টেইলর বা মিস্ত্রী লোকদের কাজের অর্ডার গ্রহণ করে। এরপর কাজ করায় ঐ শিখতে আসা লোকদের মাধ্যমে, বড় টেইলর বা উস্তাদ মিস্ত্রী তেমন কোনো কাজ করে না। কাজ শেষে যে অর্থ উপার্জন হয়, তার অর্ধেক বা নির্দিষ্ট একটি অংশ শিখতে আসা লোকদেরকে দেয়। বাকি অর্ধেক বা অবশিষ্ট মুনাফা উস্তাদ নিয়ে যায়। লক্ষণীয় বিষয় হলো, উস্তাদ তেমন কোনো কাজ করেনি, কাজ করেছে শিষ্যরা, তথাপি উস্তাদ যে অর্ধেক বা তার চেয়েও বেশি মুনাফা নিয়ে যাচ্ছে তা কিসের বিনিময়ে? চিন্তা করলে দেখা যায়, উস্তাদ কোনো মূল্য খাটায়নি, কোনো শ্রমও দেয় নি। বরং সে শুধু অর্ডারকারী লোকের নিকট থেকে কাজটির দায়ভার গ্রহণ করেছে। অর্থাৎ কাজটি সম্পন্ন করে দেওয়ার জিম্মাদারী গ্রহণ করেছে। তাই অর্ডারকারী লোক এসে তার কাজটির ব্যাপারে উস্তাদকে জিজ্ঞাসা করে। শিষ্যদেরকে নয়। অতএব, বুঝা যায়, উস্তাদ মিস্ত্রী বা টেইলর যে মুনাফা নিয়ে থাকে সেটা কেবল দায়ভার গ্রহণের বিনিময়ে।

গ্রন্থকার বলেন, মূলধন, শ্রম, দায়ভার গ্রহণ, এ তিন মাধ্যম ছাড়া অন্য কোনো মাধ্যমে মুনাফার হকদার হওয়া যায় না। একথার প্রমাণ স্বরূপ তিনি বলেন, কেউ যদি কাউকে বলে যে, তুমি তোমার মূলধন খাটাও, ব্যবসা কর এ শর্তে যে, যা মুনাফা হবে তা আমি নিয়ে যাব। তাহলে এ নির্দেশ বা চুক্তি সহীহ হয় না। কেননা এক্ষেত্রে সে মূলধন দেয় নি, শ্রম দেয় নি, দায়ভারও গ্রহণ করে নি, কিন্তু মুনাফা নিয়ে যাচ্ছে- তাই এটা জায়েজ নয়।

আর শিরকাতুল উজূহের ক্ষেত্রেও মুনাফার অধিকার লাভ করা হয় দায়ভার গ্রহণের মাধ্যমে আর দায়ভার গ্রহণ হয় মালিকানার পরিমাণ অনুযায়ী। অর্থাৎ যে শরিক ক্রয়কৃত পণ্যের যতটুকুর মালিক হয়, সে ততটুকুর দায়ভার গ্রহণ করে। আর যতটুকু দায়ভার গ্রহণ করবে, ততটুকু মুনাফাই সে ভোগ করবে। যেমন- ক্রয়কৃত পণ্যের অর্ধেকের মালিক হলে অর্ধেকের দায়ভার গ্রহণ করা হয়। ফলে তার মুনাফা থেকেও অর্ধেক প্রাপ্য হয়। এমতাবস্থায় যদি সে অর্ধেকের বেশি মুনাফা ভোগ করে, তাহলে সেটা এমন সম্পদের মুনাফা ভোগ করা হবে, যার দায়ভার সে গ্রহণ করে নি। যা হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে।

মোটকথা, শিরকাতুল উজূহের মধ্যে উভয় শরিক মুনাফার হকদার হয়ে থাকে ক্রয়কৃত পণ্যের দায়ভার গ্রহণের বিনিময়ে। তাই যে যতটুকু দায় গ্রহণ করবে, সে ততটুকু মুনাফার হকদার হবে। তার চেয়ে বেশি নিলে দায় বহন ব্যতীত মুনাফা ভাগ হবে, যা সম্পূর্ণ নাজায়েজ। প্রসঙ্গক্রমে গ্রন্থকার বলেন, দায় বহন করা ব্যতীত অতিরিক্ত শর্ত আরোপ করা একমাত্র মুদারাবার মধ্যে সহীহ। অন্য কোথাও সহীহ নয়। অতএব, শিরকাতুল উজূহ যেহেতু মুদারাবার পর্যায়ভুক্ত নয়। সেহেতু শিরকাতুল উজূহের মধ্যেও দায় বহন ব্যতীত অতিরিক্ত মুনাফার শর্ত করা জায়েজ নয়।

তবে শিরকাতুল ইনান মুদাবাবার পর্যায়ভুক্ত। কেননা মুদারাবার মধ্যে যেমন এক পক্ষের মাল থাকে এবং আরেক পক্ষ সেই মালে শ্রম দেয়, তেমনি শিরকাতুল ইনানের মধ্যেও উভয় পক্ষের মাল থাকে এবং এক পক্ষ অপর পক্ষের মালে শ্রম দেয়। কেমন যেন শিরকাতে ইনানের প্রত্যেক পক্ষ অপর পক্ষের জন্য রাব্বুল মাল এবং মুদারিব উভয়ই। এ হিসাবে শিরকাতুল ইমান মুদারাবার পর্যায়ভুক্ত। তাই এটা মুদারাবার হুকুমের আওতাভুক্ত হবে। মুদারাবার মধ্যে যেমন দায় বহন ছাড়া মুনাফার হকদার হওয়া যায়, তেমনি ইনানের মধ্যেও দায় বহন ব্যতীত মুনাফার হকদার হওয়া যায়। অর্থাৎ দায় বহনের তুলনায় অতিরিক্ত মুনাফার শর্ত করা জায়েজ হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

فَصْلٌ فِى الشَّرْكَةِ الْفَاسِدَةِ : وَلَا يَجُوْزُ الشَّرْكَةُ فِي الْاِحْتِطَابِ وَالْاِصْطِيَادِ، وَمَا اصْطَادَهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اَوْ اِحْتَطَبَهُ فَهُوَ لَهُ دُوْنَ صَاحِبِهِ، وَعَلٰى هٰذَا الْاِشْتِرَاكُ فِيْ اَخْذِ كُلِّ شَيْءٍ مُبَاحٍ؛ لِاَنَّ الشَّرْكَةَ مُتَضَمِّنَةٌ مَعْنَى الْوَكَالَةِ، وَالتَّوْكِيْلُ فِيْ اَخْذِ الْمَالِ الْمُبَاحِ بَاطِلٌ لِاَنَّ اَمْرَ الْمُوَكِّلِ بِهٖ غَيْرُ صَحِيْحٍ، وَالْوَكِيْلُ يَمْلِكُهُ بِدُوْنِ اَمْرِهٖ فَلَا يَصْلُحُ نَائِبًا عَنْهُ، وَاِنَّمَا يَثْبُتُ الْمِلْكُ لَهُمَا بِالْاَخْذِ وَاِحْرَازِ الْمُبَاحِ، فَاِنْ اَخَذَاهُ مَعًا فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ لِاسْتِوَائِهِمَا فِيْ سَبَبِ الِاسْتِحْقَاقِ، وَاِنْ اَخَذَهُ اَحَدُهُمَا وَلَمْ يَعْمَلِ الْاٰخَرُ شَيْئًا فَهُوَ لِلْعَامِلِ، وَاِنْ عَمِلَ اَحَدُهُمَا وَاَعَانَهُ الْاٰخَرُ فِي عَمَلِهٖ بِاَنْ قَلَعَهُ اَحَدُهُمَا وَجَمَعَهُ الْاٰخَرُ، اَوْ قَلَعَهُ وَجَمَعَهُ وَحَمَلَهُ الْاٰخَرُ فَلِلْمُعِيْنِ اَجْرُ الْمِثْلِ بَالِغًا مَا بَلَغَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ. وَعِنْدَ اَبِيْ يُوْسُفَ لَا يُجَاوَزُ بِهٖ نِصْفُ ثَمَنِ ذٰلِكَ، وَقَدْ عُرِفَ فِيْ مَوْضِعِهٖ ـ

অনুবাদ : অনুচ্ছেদ : অশুদ্ধ অংশীদারিত্ব সম্পর্কে : কাঠ কাটা ও শিকার করার ক্ষেত্রে অংশীদারিত্ব চুক্তি বৈধ হবে না। বরং উভয়ের প্রত্যেকে যা শিকার করবে এবং যে কাঠ সংগ্রহ করবে, তা তারই হবে। অপরজনের হবে না।

যে কোনো প্রাকৃতিক বৈধ জিনিস সংগ্রহে অংশীদারিত্ব চুক্তির ক্ষেত্রে একই বিধান রয়েছে। কেননা অংশীদারিত্বের মধ্যে ওকালাতের মর্ম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আর প্রাকৃতিকভাবে সবার জন্য বৈধ এমন বস্তু সংগ্রহের জন্য উকিল নিয়োগ করা বাতিল। কেননা তা সংগ্রহের ব্যাপারে মুয়াক্কিলের আদেশ প্রদান বৈধ নয়। তার নির্দেশ ছাড়া উকিল তার মালিক হতে পারে। সুতরাং এ ব্যাপারে সে মুয়াক্কিলের স্থলবর্তী হতে পারে না।

আর বৈধ জিনিসটি সংগ্রহ ও সংরক্ষণের মাধ্যমে তাদের উভয়ের মালিকনা সাব্যস্ত হবে। যদি উভয়ে এক সঙ্গে তা সংগ্রহ করে, তাহলে বস্তুটি তাদের মাঝে অর্ধা-অর্ধি হবে, হকদার হওয়ার সবব তথা সংগ্রহের ক্ষেত্রে উভয়ে সমান হওয়ার কারণে।

আর যদি একজন সংগ্রহ করে থাকে এবং অপরজন কোনো কাজ না করে থাকে, তাহলে তা যে কাজ করেছে তারই হবে আর যদি একজন কাজ করে থাকে এবং অপরজন তার কাজে সাহায্য করে থাকে, যেমন– একজন শিকড় উপড়ালো আর অপরজন তা জমা করল। কিংবা একজন উপড়ালো এবং জমা করল আর অপরজন তা বহন করল, তাহলে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে সাহায্যকারী ব্যক্তি প্রচলিত পারিশ্রমিক পাবে। পরিমাণে তা যাই হোক।

আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে পারিশ্রমিক ঐ বস্তুর অর্ধেকের মূল্য অতিক্রম করতে পারবে না। আর তা যথাস্থানে আলোচিত হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

গ্রন্থকার (র.) ইতিপূর্বে শুদ্ধ অংশীদারির আলোচনা থেকে অবসর হওয়ার পর এ পর্যায়ে অশুদ্ধ অংশীদারিত্ব সম্পর্কে আলোচনা শুরু করেছেন।

গ্রন্থকার বলেন, কাঠ কাটা, পশু-পাখি শিকার করা এবং এ জাতীয় অন্যান্য প্রাকৃতিক মুবাহ সম্পদ যেমন, পাহাড়ী ফল-ফুল, লবণ, বরফ, সুরমা ইত্যাদি সংগ্রহের কাজে অংশীদারিত্ব চুক্তি করা বৈধ নয়। তাই এসব জিনিস যে যা সংগ্রহ করবে, সে তা নিয়ে যাবে। একজনের সংগ্রহকৃত বস্তুতে অপরজনের কোনো হক সাব্যস্ত হবে না।

মুবাহ বস্তুর সংগ্রহের কাজে শিরকাত সহীহ না হওয়ার কারণ হলো, শিরকাতের ভিতরে ওকালাত থাকে। আর ওকালাতের মর্ম হলো মুয়াক্কিল কর্তৃক উকিলকে কোনো কাজের আদেশ করা। কিন্তু মুবাহ জিনিস যেহেতু সবারই জন্য হালাল, তাই সকলেই তা সংগ্রহ করতে পারে। সে হিসাবে উকিল ব্যক্তিও তা নিজে সংগ্রহ করতে পারে। এটা সংগ্রহের জন্য মুওয়াক্কিলের আদেশের প্রয়োজন নেই। অতএব, এক্ষেত্রে মুয়াক্কিলের আদেশ করা সহীহ নয়। আর আদেশ সহীহ না হওয়ার কারণে ওকালাত সাব্যস্ত হয় না, আর ওকালাত সাব্যস্ত না হওয়াতে শিরকাত শুদ্ধ হয় না।

শিরকাত শুদ্ধ না হলে প্রত্যেকে যা সংগ্রহ করবে, তার উপর তারই মালিকানা সাব্যস্ত হবে। তবে এই মালিকনা কখন সাব্যস্ত হবে, এ সম্পর্কে গ্রন্থকার বলেন, মুবাহ বস্তুর উপর মালিকানা সাব্যস্ত হয় দু'টি কাজের মাধ্যমে। ১. সংগ্রহ করা। ২. সংরক্ষণ করা। অতএব, যদি কোনো বস্তু একজনে আগে সংগ্রহ করে এবং সংরক্ষণ করে ফেলে তাহলে সে-ই উক্ত বস্তুর মালিক হবে। যদি কোনো বস্তু দু'জনে একই সাথে সংগ্রহ করে, তাহলে বস্তু দু'জনের মাঝে অর্ধাঅর্ধি ভাগ করা হবে। কারণ হকদার হওয়ার সবব তথা সংগ্রহ করা এবং সংরক্ষণ করা উভয় থেকে পাওয়া গেছে। তাই উভয়ের মালিকানা সাব্যস্ত হবে। যদি একজন কাজ করে, অপরজন কিছুই না করে, তাহলে যে কাজ করেছে সে মালিক হবে। যে কাজ করেনি সে কিছুই পাবে না।

যদি একজন কাজ করে এবং অপরজন তাকে সাহায্য করে, তাহলে বস্তুর মালিক মূল ব্যক্তি হবে। সাহায্যকারী ব্যক্তি তার কাজের উপযুক্ত মূল্য তথা পারিশ্রমিক পাবে। তার পরিমাণ যাই হোক তাই তাকে দিতে হবে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, সাহায্যকারী ব্যক্তিকে যে পারিশ্রমিক দেওয়া হবে, তার পরিমাণ সংগ্রহকৃত বস্তুর অর্ধেকের মূল্যের চেয়ে বেশি হতে পারবে না। এ প্রসঙ্গে কিতাবুল ইজারায় আলোচিত হয়েছে। তবে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর কথাই অধিক পরিষ্কার। কারণ সে অশুদ্ধ আকদের মাধ্যমে একজনের শ্রম ভোগ করেছে পূর্ণরূপে। অতএব, তার উপর এর পূর্ণ পারিশ্রমিক ওয়াজিব হবে। পরিমাণ কতটুকু তা দেখার বিষয় নয়।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ وَاِذَا اشْتَرَكَا وَلِاَحَدِهِمَا بَغْلٌ وَلِلْاٰخَرِ رَاوِيَةٌ يَسْتَقِيْ عَلَيْهَا الْمَاءَ فَالْكَسْبُ بَيْنَهُمَا لَمْ تَصِحَّ الشَّرْكَةُ، وَالْكَسْبُ كُلُّهُ لِلَّذِي اِسْتَقٰى، وَعَلَيْهِ اَجْرُ مِثْلِ الرَّاوِيَةِ اِنْ كَانَ الْعَامِلُ صَاحِبَ الْبَغْلِ، وَاِنْ كَانَ صَاحِبَ الرَّاوِيَةِ فَعَلَيْهِ اَجْرُ مِثْلِ الْبَغْلِ اَمَّا فَسَادُ الشَّرْكَةِ فَلِانْعِقَادِهَا عَلٰى اِحْرَازِ الْمُبَاحِ وَهُوَ الْمَاءُ، وَاَمَّا وُجُوْبُ الْاَجْرِ فَلِاَنَّ الْمُبَاحَ اِذَا صَارَ مِلْكًا لِلْمُحْرِزِ وَهُوَ الْمُسْتَقِيْ، فَقَدِ اسْتَوْفٰى مَنَافِعَ مِلْكِ الْغَيْرِ وَهُوَ الْبَغْلُ اَوْ الرَّاوِيَةُ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ فَيَلْزَمُهُ أَجْرُهُ ـ وَكُلُّ شِرْكَةٍ فَاسِدَةٍ فَالرِّبْحُ فِيْهِمَا عَلٰى قَدْرِ الْمَالِ، وَيَبْطُلُ شَرْطُ التَّفَاضُلِ لِاَنَّ الرِّبْحَ فِيْهَا تَابِعٌ لِلْمَالِ فَيَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهٖ، كَمَا اَنَّ الرَّيْعَ تَابِعٌ لِلْبَذْرِ فِي الْمُزَارَعَةِ، وَالزِّيَادَةُ اِنَّمَا تُسْتَحَقُّ بِالتَّسْمِيَةِ، وَقَدْ فَسَدَتْ فَبَقِيَ الْاِسْتِحْقَاقُ عَلٰى قَدْرِ رَأْسِ الْمَالِ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, **একজনের খচ্চর আছে, অপরজনের পানির মশক আছে, এমন দু'জন যদি এ শর্তে অংশীদারিত্বের চুক্তিতে আবদ্ধ হয় যে, এ দু'টি দ্বারা পানি বহন করে সেচ দিবে এরপর উপার্জিত অর্থ উভয়ের মাঝে বণ্টিত হবে, তাহলে এ অংশীদারিত্ব বৈধ হবে না। বরং সম্পূর্ণ উপার্জিত অর্থ সেই পাবে, যে সেচ দিয়েছে।** খচ্চরের মালিক যদি শ্রমদাতা হয় তাহলে তার উপর মশকের প্রচলিত ভাড়া সাব্যস্ত হবে। আর যদি মশকওয়ালা শ্রমদাতা হয় তাহলে তার উপর খচ্চরের প্রচলিত ভাড়া সাব্যস্ত হবে।

চুক্তিটি ফাসেদ হওয়ার কারণ এই যে, প্রাকৃতিকভাবে বৈধ একটি বস্তু তথা পানি সংরক্ষণের উপর চুক্তিটি সংঘটিত হয়েছে। আর ভাড়া সাব্যস্ত হওয়ার কারণ এই যে, বৈধ বস্তুটি যখন সংরক্ষণকারী তথা সেচ দানকারীর মালিকানায় এসে গেল, তখন (অবস্থা এই দাঁড়ালো যে,) অন্যের মালিকানাধীন বস্তুর অর্থাৎ খচ্চর বা মশকের ফায়দা সে গ্রহণ করেছে একটি অশুদ্ধ চুক্তির মাধ্যমে। সুতরাং তার উপর ঐ বস্তুর ভাড়া সাব্যস্ত হবে।

আর যে কোনো অবৈধ চুক্তির মুনাফা মূলধনের পরিমাণের ভিত্তিতে বণ্টিত হবে এবং বেশ-কমের শর্ত বাতিল হবে।

কেননা অংশীদারিত্ব চুক্তিতে মুনাফা হচ্ছে মূলধনের অনুবর্তী। সুতরাং তার পরিমাণ দ্বারাই তা পরিমিত হবে। যেমন বর্গাচাষের ক্ষেত্রে ফসল বীজের অনুবর্তী হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে অতিরিক্ত পরিমাণের হকদার সাব্যস্ত হয় (আকদের সময় আলাদাভাবে) উল্লেখ করার কারণে কিন্তু এখানে সেই উল্লেখ অশুদ্ধ হয়ে গেছে। সুতরাং এখন মূলধনের পরিমাণে মুনাফার হকদারিত্ব বাকি থাকল।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আলোচ্য মাসআলাটি শিরকাতে ফাসেদার দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত স্বরূপ। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে মাসআলাটি পূর্বের মাসআলারই অনুরূপ: অতএব মাসআলাটির সার-সংক্ষেপ মোটামুটি এই–

* মুবাহ সম্পদ সংগ্রহের ব্যাপারে শিরকাত করার কারণে তা ফাসেদ হয়েছে।
* ফলে সংগৃহীত বস্তুতে উভয়ের মালিকানা সাব্যস্ত হয় নি।
* যে কাজ করেছে বা শ্রম দিয়েছে কেবল তার মালিকনা সাব্যস্ত হয়েছে। আর আলোচ্য মাসআলায় শ্রমদাতা হলো সেচ দানকারী ব্যক্তি।
* আকদে ফাসেদ বা অশুদ্ধ আকদের মাধ্যমে অন্যের উপকারিতা ভোগ করার কারণে ভোগকারীর উপর লব্ধ উপকারিতার প্রচলিত বিনিময় ওয়াজিব হবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে এর পরিমাণ যা-ই হয়, তাই দিতে হবে আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে প্রচলিত বিনিময়ের পরিমাণ সংগৃহীত বস্তুর অর্ধেকের মূল্যের চেয়ে বেশি হতে পারবে না।

قَوْلُهُ : وَكُلُّ شِرْكَةٍ فَاسِدَةٍ فَالرِّبْحُ الخ : **বর্ণিত মাসআলার সারমর্ম :** কোনো আকদে শিরকাত ফাসেদ হয়ে গেলে অর্জিত মুনাফা কিভাবে বন্টন হবে আকদের মাঝে যে শর্ত ছিল সে শর্ত মুতাবেক বণ্টিত হবে, না কি প্রত্যেক শরিকের মূলধনের পরিমাণ অনুপাতে বণ্টিত হবে এ সম্পর্কে গ্রন্থকার বলেন, আকদ যখন ফাসেদ হয়ে গেছে, তখন আকদের সময় উল্লিখিত শর্ত আর কার্যকরি থাকবে না। অতএব, যদিও আকদের সময় কম-বেশ করে মুনাফা বন্টনের শর্ত করা হয়ে থাকে, কিন্তু এখন কম-বেশ করে মুনাফা বন্টন করা হবে না। বরং মূলধনের পরিমাণ অনুযায়ী মুনাফা বন্টন করা হবে। অর্থাৎ উভয় শরিক যদি সমান অর্ধেক অর্ধেক মূলধনের মালিক হয়ে থাকে, তাহলে মুনাফাও অর্ধা-অর্ধি হারে বণ্টিত হবে আর যদি মূলধনের মালিকানার ক্ষেত্রে শরিকদ্বয়ের মাঝে কম-বেশ থাকে, তাহলে সেরকম কম-বেশ করেই মুনাফা বন্টন হবে। যেমন এক শরিক যদি মূলধনের দুই তৃতীয়াংশের মালিক হয়, তাহলে সে মুনাফার দুই তৃতীয়াংশ পাবে। আর যে শরিক মূলধনের এক তৃতীয়াংশের মালিক হবে, সে মুনাফা থেকেও এক তৃতীয়াংশ পাবে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَاِذَا مَاتَ اَحَدُ الشَّرِيْكَيْنِ اَوْ اِرْتَدَّ وَلَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ بَطَلَتْ الشَّرْكَةُ لِاَنَّهَا تَتَضَمَّنُ الْوَكَالَةَ، وَلَا بُدَّ مِنْهَا لِيَتَحَقَّقَ الشَّرْكَةُ عَلٰى مَا مَرَّ، وَالْوَكَالَةُ تَبْطُلُ بِالْمَوْتِ، وَكَذَا بِالِالْتِحَاقِ مُرْتَدًّا اِذَا قَضَى الْقَاضِيْ بِلَحَاقِهِ؛ لِاَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمَوْتِ عَلٰى مَا بَيَّنَّاهُ مِنْ قَبْلُ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ مَا اِذَا عَلِمَ الشَّرِيْكُ بِمَوْتِ صَاحِبِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ؛ لِاَنَّهُ عَزْلٌ حُكْمِيٌّ، فَاِذَا بَطَلَتْ الْوَكَالَةُ بَطَلَتْ الشَّرْكَةُ، بِخِلَافِ مَا اِذَا فَسَخَ اَحَدُ الشَّرِيْكَيْنِ الشَّرْكَةَ حَيْثُ يَتَوَقَّفُ عَلٰى عِلْمِ الْاٰخَرِ لِاَنَّهُ عَزْلٌ قَصْدِيٌّ، وَاللّٰهُ اَعْلَمُ .

অনুবাদ : শরিকদ্বয়ের একজন যখন মারা যায় অথবা মুরতাদ হয়ে দারুল হরবে চলে যায় তখন শিরকাত বাতিল হয়ে যায়।

কেননা শিরকাত ওকালাতকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং পূর্বের বর্ণনা অনুযায়ী শিরকাত বাস্তবায়িত হতে হলে ওকালাত বিদ্যমান থাকা জরুরি। অথচ মৃত্যুর দ্বারা এবং তেমনিভাবে মুরতাদ অবস্থায় দারুল হরবে চলে যাওয়ার দ্বারা ওকালাত বাতিল হয়ে যায়; অবশ্য কাজি সাহেব যদি তার চলে যাওয়ার ব্যাপারে রায় ঘোষণা করেন। কেননা এটি মৃত্যুর সমকক্ষ। যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করে এসেছি।

শরিকদার তার শরিকের মৃত্যুর কথা জানলো কি জানলো না, তাতে কোনো পার্থক্য হবে না। কেননা এটা হলো বিধানগত অপসারণ। সুতরাং ওকালাত যখন বাতিল হয়ে গেল তখন অংশীদারিত্বও বাতিল হয়ে যাবে।

পক্ষান্তরে শরিকদ্বয়ের একজন যদি শিরকাত বাতিল করে দেয়, তাহলে তা অপরজনের অবগতির উপর মওকুফ থাকবে। কেননা এটা হলো স্বেচ্ছায় অপসারণ। আল্লাহই অধিক অবগত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

বর্ণিত মাসআলার সার নির্যাস হলো, শিরকাতের জন্য ওকালাত জরুরি। তাই কোনো কারণে যদি ওকালাত বাতিল হয়ে যায়, তাহলে শিরকাত বাতিল হয়ে যাবে। উদাহরণ স্বরূপ মৃত্যুর দ্বারা এবং মুরতাদ হয়ে দারুল হরবে চলে যাওয়ার দ্বারা ওকালাত বাতিল হয়। অতএব, শরিকদ্বয়ের একজন যদি মারা যায় কিংবা মুরতাদ হয়ে দারুল হরবে চলে যায় এবং আদালতের পক্ষ থেকে এর রায় ঘোষিত হয়ে যায়, তাহলে এর দ্বারা ওকালাত বাতিল হয়ে যাবে এবং ফলশ্রুতিতে শিরকাতও বাতিল হয়ে যাবে।

মৃত্যু বা মৃত্যুতুল্য মুরতাদ হওয়ার ব্যাপারটি যেহেতু হুকমি বা বিধানগত বা আইনগত অপসারণ, সেহেতু তা অপর শরিকের অজান্তেও কার্যকর হবে। যেমন শিরকাত ছাড়াও সাধারণ ওকালাতের ক্ষেত্রে মুওয়াক্কিল যদি মারা যায়, তাহলে উকিল আইনগতভাবে অপসারিত হয়ে যায়। যদিও মুয়াক্কিলের মৃত্যু সম্পর্কে উকিল অনবগত হয়। তদ্রূপ শিরকাতের আওতাধীন ওকালাতের ক্ষেত্রেও এক শরিক মারা যাওয়ার দ্বারা অপর শরিকের ওকালাত হতে অপসারিত হয়ে যাবে। শরিকের মৃত্যু সম্পর্কে সে জানুক বা নাই জানুক। আর ওকালাত বাতিল হওয়ার সাথে সাথে শিরকাতও বাতিল হয়ে যাবে।

পক্ষান্তরে শরিকদের একজন যদি শিরকাত বাতিল করে দেয়, তাহলে অপর শরিকের অবগতি ছাড়া তা বাতিল হবে না। কেননা এটি ইচ্ছাকৃতভাবে উকিলকে অপসারণ করা। এটি কার্যকরি হওয়ার জন্য উকিলের অবগতি আবশ্যক। অন্যথায় সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অতএব, ইচ্ছাকৃতভাবে শিরকাত বাতিল করা হলে তা অপর শরিকের অবগতির উপর মওকুফ থাকবে।

https://e-ilm.weebly.com/

فَصْلٌ : وَلَيْسَ لِاَحَدِ الشَّرِيْكَيْنِ اَنْ يُؤَدِّيَ زَكَاةَ مَالِ الْاٰخَرِ اِلَّا بِاِذْنِه، لِاَنَّهٗ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ التِّجَارَةِ، فَاِنْ اَذِنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِه اَنْ يُؤَدِّيَ زَكَاتَهٗ . فَاَدّٰى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَالثَّانِي ضَامِنٌ عَلِمَ بِاَدَاءِ الْاَوَّلِ اَوْ لَمْ يَعْلَمْ، وَهٰذَا عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ رحـ. وَقَالَا : لَا يَضْمَنُ اِذَا لَمْ يَعْلَمْ وَهٰذَا اِذَا اَدَّيَا عَلَى التَّعَاقُبِ، اَمَّا اِذَا اَدَّيَا مَعًا ضَمِنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَصِيْبَ صَاحِبِه . وَعَلٰى هٰذَا الْاِخْتِلَافِ الْمَاْمُوْرُ بِاَدَاءِ الزَّكَاةِ اِذَا تَصَدَّقَ عَلَى الْفَقِيْرِ بَعْدَمَا اَدّٰى الْاٰمِرُ بِنَفْسِه . لَهُمَا اَنَّهٗ مَاْمُوْرٌ بِالتَّمْلِيْكِ مِنَ الْفَقِيْرِ، وَقَدْ اَتٰى بِه فَلَا يَضْمَنُ لِلْمُوَكِّلِ، وَهٰذَا لِاَنَّ فِيْ وُسْعِهِ التَّمْلِيْكَ لَا وُقُوْعَهٗ زَكَاةً لِتَعَلُّقِه بِنِيَّةِ الْمُوَكِّلِ، وَاِنَّمَا يُطْلَبُ مِنْهُ مَا فِيْ وُسْعِه وَصَارَ كَالْمَاْمُوْرِ بِذَبْحِ دَمِ الْاِحْصَارِ اِذَا ذَبَحَ بَعْدَمَا زَالَ الْاِحْصَارُ وَحَجَّ الْاٰمِرُ لَمْ يَضْمَنِ الْمَاْمُوْرُ عَلِمَ اَوْ لَا . وَلِاَبِيْ حَنِيْفَةَ رحـ اَنَّهٗ مَاْمُوْرٌ بِاَدَاءِ الزَّكَاةِ وَالْمُؤَدّٰى لَمْ يَقَعْ زَكَاةً فَصَارَ مُخَالِفًا.

অনুবাদ : অনুচ্ছেদ : শরিকদ্বয়ের কারো জন্য অপরজনের অনুমতি ছাড়া তার মালের জাকাত আদায় করার অধিকার নেই। কেননা জাকাত আদায় করা ব্যবসায়িক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে যদি উভয়ের প্রত্যেকে অপরজনকে জাকাত আদায় করার অনুমতি প্রদান করে এবং প্রত্যেকে জাকাত আদায় করে তাহলে দ্বিতীয়জন দায় বহনকারী হবে, প্রথমজনের আদায় করা সম্পর্কে অবগত হোক বা না হোক। এ হলো ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত।

সাহেবাইন (র.) বলেন যদি অবগত না হয়, তাহলে দায় বহনকারী হবে না। (দ্বিতীয়জন দায় বহন করবে।) এ হলো তখন, যখন উভয়ে আগে পিছে করে আদায় করে। পক্ষান্তরে যদি উভয়ে একসাথে আদায় করে তাহলে উভয়ের প্রত্যেকে অপরজনের হিসসার দায় বহন করবে।

একই মতপার্থক্য হবে যদি জাকাত আদায়ে আদিষ্ট ব্যক্তি আদেশদাতা নিজেই আদায় করার পর কোনো দরিদ্রকে (ঐ পরিমাণ মাল) জাকাত দান করে।

সাহেবাইনের দলিল এই যে, সে তো দরিদ্রকে মালিক বানানোর ব্যাপারে আদিষ্ট। আর সে তাই করেছে সুতরাং মুওয়াক্কিকলের অনুকূলে দায় বহন করবে না। তা এজন্য যে, মালিক বানানোই তার সাধ্যে ছিল; জাকাতরূপে পরিগণিত হওয়া তার সাধ্যে নেই। কেননা এটা মুওয়াক্কিলের নিয়তের সাথে সম্পৃক্ত। সুতরাং তার সাধ্যায়ত্ত বিষয়ই তার কাছে দাবি করা যাবে। বিষয়টা এমন হলো যে, অবরুদ্ধ ব্যক্তির পক্ষ হতে দম দেওয়ার জন্য আদিষ্ট ব্যক্তি যদি অবরুদ্ধতা শেষ হওয়ার পর এবং আদেশ দাতা (অর্থাৎ অবরুদ্ধ ব্যক্তি) হজ পালন করার পর জবাই করে তাহলে আদিষ্ট ব্যক্তি ক্ষতিপূরণের দায় বহন করবে না। বিষয়টা সে অবগত হোক বা না হোক।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল এই যে, সে তো জাকাত আদায়ের ব্যাপারে আদিষ্ট। অথচ আদায়কৃত মাল জাকাত হিসাবে গণ্য হয় নি। সুতরাং সে আদেশের বিরুদ্ধাচরণকারী হলো।

https://e-ilm.weebly.com/

وَهٰذَا لِاَنَّ الْمَقْصُوْدَ مِنَ الْاَمْرِ اِخْرَاجُ نَفْسِهِ عَنْ عُهْدَةِ الْوَاجِبِ؛ لِاَنَّ الظَّاهِرَ اَنَّهُ لَا يَلْتَزِمُ الضَّرَرَ اِلَّا لِدَفْعِ الضَّرَرِ. وَهٰذَا الْمَقْصُوْدُ حَصَلَ بِاَدَائِهِ وَعَرٰى اَدَاءَ الْمَاْمُوْرِ عَنْهُ فَصَارَ مَعْزُوْلًا عَلِمَ اَوْ لَمْ يَعْلَمْ؛ لِاَنَّهُ عَزْلٌ حُكْمِيٌّ. وَاَمَّا دَمُ الْاِحْصَارِ فَقَدْ قِيْلَ هُوَ عَلٰى هٰذَا الْاِخْتِلَافِ. وَقِيْلَ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ. وَوَجْهُهُ اَنَّ الدَّمَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَيْهِ فَاِنَّهُ يُمْكِنُهُ اَنْ يَصْبِرَ حَتّٰى يَزُوْلَ الْاِحْصَارُ. وَفِيْ مَسْاَلَتِنَا الْاَدَاءُ وَاجِبٌ فَاعْتُبِرَ الْاِسْقَاطُ مَقْصُوْدًا فِيْهِ دُوْنَ دَمِ الْاِحْصَارِ.

অনুবাদ : এটা এজন্য যে, আদেশের উদ্দেশ্য ছিল নিজেকে অবশ্য পালনীয় বিধানের দায় থেকে বের করে আনা কেননা স্বাভাবিক বিষয় এই যে, একটা ক্ষতি রোধ করার জন্যই সে আরেকটা ক্ষতি মেনে নিবে, আর এ উদ্দেশ্য সে নিজে আদায় করার মাধ্যমে অর্জিত হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে আদিষ্ট ব্যক্তির আদায় এ উদ্দেশ্য হতে খালি। সুতরাং সে অপসারিত হবে। অবগত হোক বা না হোক, কারণ এ হলো বিধানগত অপসারণ।

আর অবরুদ্ধতার দম সম্পর্কে বক্তব্য এই যে, কারো কারো মতে এ ক্ষেত্রেও পূর্বরূপ মতভিন্নতা রয়েছে। আর কারো কারো মতে উভয় ক্ষেত্রের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। সেটা এই যে, মূলত অবরুদ্ধ ব্যক্তির উপর তো দম ওয়াজিব নয়। কেননা তার পক্ষে সম্ভব ছিল অবরুদ্ধতা শেষ হওয়া পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করা।

পক্ষান্তরে আমাদের আলোচ্য জাকাতের মাসআলায় জাকাত আদায় করা ওয়াজিব। সুতরাং কর্তব্য দায় রহিত করার বিষয়টি এখানে উদ্দেশ্যরূপে বিবেচ্য। আর অবরুদ্ধতার দমের বিষয়টি তা নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

বক্ষ্যমাণ অনুচ্ছেদে এমন কিছু মাসআলা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে যেগুলো শিরকাতের মূল প্রসঙ্গের সাথে গভীর সম্পর্কশীল নয়। মোটামুটি সম্পৃক্ত। তাই এগুলোকে সর্বশেষে ভিন্ন অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে।

পূর্বোক্ত ইবারতে একটি মতভেদপূর্ণ মাসআলা আলোচিত হয়েছে। তবে মতভেদপূর্ণ মাসআলার ভূমিকায় বলা হয়েছে, যে দু'জন ব্যক্তি পরস্পর শিরকাতের চুক্তিতে চুক্তিবদ্ধ হয়, তারা একজন অপর জনের সম্পদের জাকাত আদায় করতে পারবে না। কারণ শিরকাতের চুক্তি সংঘটিত হয়েছে বাণিজ্যিক কাজের জন্য। জাকাত আদায় করা বাণিজ্যিক কাজ নয়। তাই এটা শিরকাতের চুক্তির আওতায় পড়ে না। সুতরাং এক শরিক অপর শরিকের সম্পদের জাকাত আদায় করতে পারবে না।

হ্যাঁ, তবে যদি কোনো শরিক অপর শরিককে নিজের জাকাত আদায় করার অনুমতি দান করে, তাহলে এই অনুমতির ভিত্তিতে অপর শরিক তার জাকাত আদায় করতে পারবে।

মতভেদপূর্ণ মাসআলা : মাসআলাটির সুরত হলো এই যে, শরিকদ্বয়ের প্রত্যেকেই অপরজনকে বলল, তুমি আমার সম্পদের জাকাত আদায় করে দিও। (প্রকাশ থাকে যে, এর দ্বারা দু'জনের প্রত্যেকেই অপরজনের উকিল হয়েছে) এরপর উভয় শরিক জাকাত আদায় করল। অর্থাৎ এক শরিক প্রথমে নিজেই নিজের জাকাত আদায় করল। তারপর অপর শরিক প্রথম শরিকের উকিল হিসাবে তার জাকাত আদায় করল। ফলে এক ব্যক্তির জাকাত দুইবার আদায় হয়ে গেল, একবার আদায় করল ব্যক্তি নিজে। দ্বিতীয়বার আদায় করল তার উকিল। এমতাবস্থায় কী হুকুম এ নিয়ে ইমাম আবূ হানীফা (রা.) ও সাহেবাইন (র.)-এর মাঝে মতভেদ রয়েছে।

মতভেদ বর্ণনার পূর্বে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আলোচ্য মাসআলাটিতে কয়েকটি অবস্থা হতে পারে।

https://e-ilm.weebly.com/

১. মুওয়াক্কিল এবং উকিল অর্থাৎ উভয় শরিক একসাথে বা একই সময়ে জাকাত আদায় করেছে।

২. প্রথমে মুওয়াক্কিল আদায় করেছে, পরে উকিল আদায় করেছে এবং মুওয়াক্কিলের আদায় করার ব্যাপারে উকিল অবগত ছিল না।

৩. প্রথমে মুওয়াক্কিল আদায় করেছে, পরে উকিল আদায় করেছে এবং মুওয়াক্কিলের আদায় করার ব্যাপারে উকিল অবগত ছিল।

ইমামগণের মতামত :

উপরিউক্ত তিন অবস্থায়ই সাহেবাইনের একটি মাত্র সিদ্ধান্ত। তা হলো এই যে, কোনো অবস্থাতেই উকিলের উপর জেমান বা ভর্তুকি দেওয়া আবশ্যক হবে না।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মত হলো, প্রথম অবস্থায় অর্থাৎ উভয় শরিক যদি একই সময়ে আদায় করে থাকে, তাহলে প্রত্যেক শরিক অপর শরিকের হিসসার জামিন হবে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থায় উকিল, মুওয়াক্কিলের অনুকূলে জামিন হবে। অর্থাৎ উকিলের উপর আদায়কৃত অর্থের ভর্তুকি দেওয়া অনিবার্য হবে।

نَصِيْبُ صَاحِبِهِ পর্যন্ত ইবারতে উপরিউক্ত আলোচনা সন্নিবেশিত রয়েছে।

এরপর আলোচ্য মাসআলার অনুরূপ আরেকটি মাসআলার প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য গ্রন্থকার বলেন, وَعَلٰى هٰذَا الْاِخْتِلَافُ الخ অর্থাৎ শিরকাত ছাড়াই সাধারণ অবস্থাতেও যদি কেউ কাউকে আদেশ করে তার জাকাত আদায় করে দেওয়ার জন্য, এরপর আদেশকারী ব্যক্তি নিজের জাকাত নিজেই আদায় করে দেয়, তারপর আদিষ্ট ব্যক্তি আদায় করে, তাহলে উক্ত মাসআলায়ও পূর্বের মাসআলার মতভেদ কার্যকর হবে। অর্থাৎ কোনো অবস্থাতেই উকিলের উপর তথা আদিষ্ট ব্যক্তির উপর জেমান ওয়াজিব হবে না। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে ওয়াজিব হবে।

দলিল পর্ব : لَهُمَا اَنَّهُ مَامُوْرٌ .... الخ থেকে সাহেবাইনের দলিল বর্ণনা করা হয়েছে।

সাহেবাইনের দলিলের সারমর্ম হলো মুওয়াক্কিল উকিলকে আদেশ করেছিল, তার সম্পদের একটি অংশের মালিক ফকিরদেরকে বানিয়ে দেওয়ার জন্য। অর্থাৎ মুওয়াক্কিলের সম্পদের চল্লিশ ভাগের একভাগ ফকির বা দরিদ্র লোকদেরকে দিয়ে দেওয়ার জন্য। উকিল সে কাজটিই আঞ্জাম দিয়েছে। অতএব, নির্দেশিত কাজ আঞ্জাম দেওয়ার কারণে সে কোনো কিছুর জামিন হবে না। কারণ উকিলের সাধ্য এতটুকুই ছিল যে, সে মুওয়াক্কিলের কিছু মাল দরিদ্রের হাতে তুলে দিতে পারে। অতএব, এটুকুই তার থেকে তলব করা যাবে। সেই মালটুকু জাকাতরূপে তুলে দেওয়া উকিলের সাধ্যের ভিতরে নয়। কেননা ফকিরের হাতে তুলে দেওয়া সম্পদ জাকাত হওয়া না হওয়ার বিষয়টি মুওয়াক্কিলের নিয়তের উপর নির্ভরশীল। অতএব, ফকিরের হাতে তুলে দেওয়া সম্পদ জাকাত হলো কি হলো না এ ব্যাপারে উকিল দায়ী হবে না। কারণ এটা তার সাধ্যের ভিতরে নয়।

মোটকথা উকিলকে যে কাজের আদেশ করা হয়েছিল সে কাজই সে করেছে। তাই তার কোনো দোষ নেই, তার উপর কোনো দায় আরোপিত হবে না।

وَصَارَ كَالْمَامُوْرِ بِذَبْحِ دَمٍ .... الخ বলে সাহেবাইন (র.) নিজ মতের পক্ষে একটি নজির বা কিয়াস পেশ করেছেন। যার সারমর্ম নিম্নরূপ :

কেউ হজ করতে গিয়ে শত্রু কর্তৃক (উদাহরণ স্বরূপ) অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে এবং সে অন্য একজনকে আদেশ করেছে তার পক্ষ থেকে একটি দম দিয়ে দেওয়ার জন্য অর্থাৎ একটি পশু কুরবানি করে দেওয়ার জন্য। কিন্তু পরে অবরুদ্ধতা শেষ হয়ে গেছে এবং আদেশকারী ব্যক্তি হজ পালন করে নিয়েছে। এরপর সেই আদিষ্ট ব্যক্তি প্রথমে অবরুদ্ধ, পরে হজ সমাপনকারী ব্যক্তির পক্ষ থেকে দম দিয়েছে।

এমতাবস্থায় হুকুম হলো আদিষ্ট ব্যক্তির উপর কোনো যেমান ওয়াজিব হবে না। আদেশকারী ব্যক্তির হজ পালন সম্পর্কে সে জানুক বা নাই-জানুক।

অতএব, এ মাসআলাটিও আলোচ্য মাসআলার অনুরূপ হলো।

https://e-ilm.weebly.com/

قَوْلُهُ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ الخ ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল : ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, উকিলকে আদেশ করা হয়েছিল মুওয়াক্কিলের পক্ষ থেকে জাকাত আদায় করার জন্য। কিন্তু উকিলের আদায়কৃত অর্থ জাকাত হয়নি। কেননা উকিলের পূর্বে মুওয়াক্কিল নিজে যা আদায় করেছে তা জাকাত হিসাবে আদায় হয়েছে। সুতরাং উকিলের আদায়কৃত অর্থ জাকাত না হওয়ার কারণে, উকিল আদেশের বিরুদ্ধাচরণকারী বলে গণ্য হবে এবং তার উপর যেমান ওয়াজিব হবে।

উকিল যে আদেশের বিরুদ্ধাচরণকারী হয়েছে এ বিষয়টিকে আরো একটু ব্যাখ্যা করা হয়েছে وَهَذَا لِأَنَّ الْمَقْصُودَ الخ বলে।

ব্যাখ্যার নির্যাস হলো, মুওয়াক্কিল যে, উকিলকে আদেশ করেছিল, সে আদেশের উদ্দেশ্য ছিল নিজেকে ওয়াজিব দায়িত্ব থেকে মুক্ত করা। অর্থাৎ মুওয়াক্কিলের উপর যে জাকাত ওয়াজিব হয়েছিল, সেই ওয়াজিব আদায় করা। কেননা একটি ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্যই মানুষ সাধারণ আরেকটি ক্ষতিকে মেনে নেয়। অর্থাৎ নিজের সম্পদ ফকিরকে দিয়ে দেওয়া, এটি একটি ক্ষতি। আর ওয়াজিব হুকুম অনাদায়ের কারণে আল্লাহর শাস্তির সম্মুখীন হওয়া আরেকটি ক্ষতি। দ্বিতীয় ক্ষতিটি থেকে বাঁচার জন্য মানুষ প্রথম ক্ষতিটি মেনে নেয়। আর এই উদ্দেশ্যটি মুওয়াক্কিলের আদায়ের মাধ্যমেই অর্জিত হয়ে গেছে। ফলে উকিলের আদায়টি উদ্দেশ্যহীন বা বেফায়দা হয়েছে।

আরো উল্লেখ্য যে, মুওয়াক্কিলের যাকাত আদায়ের মাধ্যমে উকিল তার ওকালাত থেকে মা'যুল বা অপসারিত হয়ে যায় হুকমিভাবে। বিধানগতভাবে তাই এ অপসারণ উকিলের জানা, অজানা উভয় অবস্থাতে কার্যকর হবে।

মোটকথা, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর বক্তব্য অনুযায়ী উকিলকে যে কাজের আদেশ করা হয়েছিল, উকিল সে কাজ করেনি। বরং সে অনর্থক মুওয়াক্কিলের অর্থ ফকিরের হাতে তুলে দিয়েছে। সুতরাং তাতে উপরিউক্ত অর্থের দায় আরোপিত হবে।

সাহেবাইনের কিয়াসের জবাব :

সাহেবাইন বলেছিলেন, আমাদের আলোচ্য মাসআলাটি হজের পথে অবরুদ্ধতা জনিত কারণে ওয়াজিব হওয়া দম আদায়ের ব্যাপারে আদিষ্ট ব্যক্তির মাসআলার অনুরূপ হয়েছে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর জবাবে বলেন, দমের মাসআলাটিতে দু'রকম মত রয়েছে। কারো কারো মতে দমের মাসআলাটিও জাকাতের মাসআলার মতোই মতভেদপূর্ণ। আর কারো কারো মতে দমের মাসআলা এবং আলোচ্য মাসআলার মাঝে পার্থক্য রয়েছে। তাই একটিকে অপরটির সাথে মিলানো ঠিক হবে না।

পার্থক্যটি এই যে, দমের মাসআলায়, অবরুদ্ধ ব্যক্তির পক্ষে দম দেওয়া ওয়াজিব ছিল না। বরং অবরোধ অবস্থা শেষ হওয়া পর্যন্ত তার ধৈর্য ধরলেও হতো। কিন্তু আলোচ্য মাসআলায় জাকাত দেওয়া ওয়াজিব। জাকাত না দিয়ে অন্য কোনো উপায় অবলম্বন করার সুযোগ নেই। অতএব, জাকাত আদায় করা মুখ্য উদ্দেশ্য হিসাবে বিবেচিত একটি কাজ, কিন্তু দম দেওয়া সেরূপ নয়।

অতএব, এহেন পার্থক্য থাকা অবস্থায় একটি মাসআলাকে অপর মাসআলার সাথে তুলনা করা সঠিক নয়।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ وَإِذَا أَذِنَ أَحَدُ الْمُتَفَاوِضَيْنِ لِصَاحِبِهِ أَنْ يَشْتَرِيَ جَارِيَةً فَيَطَأَهَا فَفَعَلَ فَهِيَ لَهُ بِغَيْرِ شَيْءٍ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ، وَقَالَا : يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِنِصْفِ الثَّمَنِ لِأَنَّهُ أَدَّى دَيْنًا عَلَيْهِ خَاصَّةً مِنْ مَالٍ مُشْتَرَكٍ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ بِنَصِيْبِهِ كَمَا فِيْ شِرَاءِ الطَّعَامِ وَالْكِسْوَةِ (وَهٰذَا) لِأَنَّ الْمِلْكَ وَاقِعٌ لَهُ خَاصَّةً وَالثَّمَنُ بِمُقَابَلَةِ الْمِلْكِ . وَلَهُ أَنَّ الْجَارِيَةَ دَخَلَتْ فِي الشَّرِكَةِ عَلَى الْبَتَاتِ جَرْيًا عَلٰى مُقْتَضَى الشَّرِكَةِ إِذْ هُمَا لَا يَمْلِكَانِ تَغْيِيْرَهُ فَأَشْبَهَ حَالَ عَدَمِ الْإِذْنِ، غَيْرَ أَنَّ الْإِذْنَ يَتَضَمَّنُ هِبَةَ نَصِيْبِهِ مِنْهُ؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ لَا يَحِلُّ إِلَّا بِالْمِلْكِ، وَلَا وَجْهَ إِلٰى إِثْبَاتِهِ بِالْبَيْعِ لِمَا بَيَّنَّا أَنَّهُ مُخَالِفٌ مُقْتَضَى الشَّرِكَةِ فَأَثْبَتْنَاهُ بِالْهِبَةِ الثَّابِتَةِ فِيْ ضِمْنِ الْإِذْنِ، بِخِلَافِ الطَّعَامِ وَالْكِسْوَةِ؛ لِأَنَّ ذٰلِكَ مُسْتَثْنًى عَنْهَا لِلضَّرُوْرَةِ فَيَقَعُ الْمِلْكُ لَهُ خَاصَّةً بِنَفْسِ الْعَقْدِ فَكَانَ مُؤَدِّيًا دَيْنًا عَلَيْهِ مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ . وَفِيْ مَسْأَلَتِنَا قَضٰى دَيْنًا عَلَيْهِمَا لِمَا بَيَّنَّا وَلِلْبَائِعِ أَنْ يَأْخُذَ بِالثَّمَنِ أَيَّهُمَا شَاءَ بِالْاِتِّفَاقِ لِأَنَّهُ دَيْنٌ وَجَبَ بِسَبَبِ التِّجَارَةِ، وَالْمُفَاوَضَةُ تَضَمَّنَتِ الْكَفَالَةَ فَصَارَ كَالطَّعَامِ وَالْكِسْوَةِ ـ

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, **শিরকাতুল মুফাওয়াযার মাধ্যমে চুক্তিবদ্ধ শরিকদ্বয়ের একজন যদি অপর জনকে একটি দাসী ক্রয় করে তার সাথে সহবাস করার অনুমতি প্রদান করে, আর সে তা করে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে কোনো আর্থিক দায় ছাড়াই দাসীটি তার হয়ে যাবে। কিন্তু সাহেবাইন বলেন, অনুমতিদাতা অপরজন থেকে অর্ধেক মূল্য ফেরত নিবে।** কেননা সে একান্তভাবে নিজের উপর সাব্যস্ত ঋণ শরিকানা মাল থেকে পরিশোধ করেছে। সুতরাং অপর শরিক তার কাছ থেকে নিজের হিসসা ফেরত নিবে। যেমন খাদ্য ও পোষাক ক্রয়ের ক্ষেত্রে। এটা এজন্য যে, দাসীর মালিকানা একান্তভাবে তার অনুকূলে সাব্যস্ত হয়েছে আর মালিকানার বিপরীতেই মূল্য সাব্যস্ত হয়ে থাকে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল এই যে, অংশীদারিত্বের দাবি মতে দাসীটি নিশ্চিতরূপেই অংশীদারি সম্পদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কেননা তারা চুক্তির প্রকৃতি পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখে না। সুতরাং (মূল্য ফেরত না নেওয়ার ক্ষেত্রে) এটা অনুমতি প্রদান না করার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হলো। তবে অনুমতিটা নিজের অংশ হেবা করে দেওয়ার দিককে অন্তর্ভুক্ত করে। কেননা মালিকানা ছাড়া সহবাস বৈধ হয় না। আর বিক্রয়ের মাধ্যমে তা সাব্যস্ত করার কোনো কারণ নেই। কেননা আমরা বর্ণনা করে এসেছি যে, এটা অংশীদারিত্বের দাবির বিরোধী তাই আমরা অনুমতির অন্তর্গতরূপে সাব্যস্ত হেবার মাধ্যমে কথিত মালিকানা সাব্যস্ত করি। খাদ্য ও পোষাকের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা অনিবার্য প্রয়োজন বিবেচনায় সেটাকে ব্যতিক্রম ধরা হয়েছে। সুতরাং মূল চুক্তি বলেই তা তার একান্ত মালিকানায় এসে যাবে। ফলে সে অংশীদারি মাল থেকে নিজস্ব ঋণ আদায়কারী হবে।

পক্ষান্তরে আমাদের আলোচ্য মাসআলায় আমাদের বর্ণিত কারণে উভয়ের উপর সাব্যস্ত ঋণ আদায়কারী হবে।

বিক্রেতা সর্বসম্মতিক্রমেই দু'জনের যে কারো কাছ থেকে মূল্য গ্রহণ করতে পারবে। কেননা এটা হলো ব্যবসায়িক কারণে সাব্যস্ত ঋণ, আর মুফাওয়াযা চুক্তি কাফালাতকে অন্তর্ভুক্ত করে। সুতরাং তা খাদ্যও পোষাক ক্রয়ের মতো হলো।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিউক্ত ইবারতে একটি মতভেদ পূর্ণ মাসআলা আলোচনা করা হয়েছে।

মাসআলাটির সুরত হলো এই যে, শিরকাতুল মুফাওয়াযার মাধ্যমে পরস্পর চুক্তিবদ্ধ দু'জন শরিক ব্যক্তির একজন অপরজনকে এ মর্মে অনুমতি প্রদান করল যে, সে যেন একটি বাঁদি ক্রয় করে তার সাথে সহবাস করে। অনুমতি মুতাবেক অপর শরিক বাঁদি ক্রয় করে তার সাথে সহবাস করল। এমতাবস্থায় তিন ইমাম এ ব্যাপারে একমত যে, বাঁদিটি সহবাসকারীর মালিকানা হবে। কিন্তু তার কাছ থেকে অপর শরিক কোনো অর্থ ফেরত পাবে কি না? এ নিয়ে তিন ইমামের মাঝে মতপার্থক্য হয়েছে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মত হলো, বাঁদি ক্রয়কারী এবং সহবাসকারী শরিক বাঁদিটির মালিক হয়ে যাবে, কোনোরূপ অর্থিক দায় বহন করা ছাড়াই। অর্থাৎ অপর শরিক তার কাছ থেকে কোনো অর্থ ফেরত পাবে না।

সাহেবাইনের মত হলো, বাঁদি ক্রয়কারী ও সহবাসকারীর কাছ থেকে অপর শরিক বাঁদির অর্ধেক মূল্য ফেরত নিবে।

দলিল পর্ব : সাহেবাইন (র.) বলেন, ক্রয়কারী শরিক বাঁদিটি নিজের জন্য ক্রয় করেছে। বাঁদিটি তার ব্যক্তিগত মালিকানা। তাই এর মূল্যও শুধু তার উপরই সাব্যস্ত হবে। কিন্তু সে বাঁদির মূল্য পরিশোধ করেছে শরিকানা সম্পদ থেকে। যেখানে অর্ধেক সম্পদ অপর শরিকের। তাই অপর শরিক তার কাছ থেকে বাঁদির অর্ধেক মূল্য ফেরত নিবে। সাহেবাইন বলেন, এ মাসআলাটি হুবহু এমনই, যেমন কোনো শরিক যদি শরিকানা সম্পদ দ্বারা নিজের জন্য ও নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য খাদ্য, বস্ত্র খরিদ করে, তাহলে খাদ্য বস্ত্রের অর্ধেক মূল্য অপর শরিককে ফেরত দিতে হয়। নতুবা অন্যের টাকা দ্বারা নিজের জিনিস ক্রয় করা হয়। যা সম্পূর্ণ হারাম। আলোচ্য মাসআলাতেও নিজের বাঁদি ক্রয় করা হয়েছে অন্যের টাকায়। তাই অন্য শরিককে তার টাকা ফেরত দেওয়া আবশ্যক।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল : ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, ক্রয়কারী যখন বাঁদির মূল্য শরিকানা সম্পদ দ্বারা পরিশোধ করেছে, তখন বাঁদিটি নিশ্চিত যৌথ সম্পদ তথা শিরকাতের আওতাধীন সম্পদ হয়ে গেছে। যেমন এক শরিকের অনুমতি ছাড়াই যদি অপর শরিক একটি বাঁদি ক্রয় করত, তাহলে যৌথ সম্পদ হতো, অনুমতিক্রমে ক্রয় করা অবস্থায়ও তেমনি যৌথ সম্পদ হয়েছে, যেহেতু মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে যৌথ মাল থেকে।

কিন্তু ব্যাপার হলো, নিরঙ্কুশ ব্যক্তি মালিকানাধীন বাঁদি ব্যতীত সহবাস করা বৈধ নয়। অথচ আলোচ্য মাসআলায় ক্রয়কারী শরিক বাঁদির সাথে সহবাস করেছে। এর দ্বারা বুঝা যায় বাঁদিটি তার ব্যক্তি মালিকানা। অতএব, তার ব্যক্তি মালিকানা সাব্যস্ত করার একটিই পথ এই যে, আমরা বলব, অপর শরিক যে তাকে বাঁদি ক্রয় করে সহবাস করার অনুমতি দিয়েছিল, সেই অনুমতির অধীনে সে নিজের অংশটুকু ক্রয়কারী শরিককে দান করে দিয়েছে। তাই বাঁদিটি ক্রয়কারী শরিকের ব্যক্তি মালিকানা হয়েছে এবং তার সহবাস করা তার জন্য বৈধ হয়েছে। আর অপর শরিক যেহেতু নিজের অংশ দান করে দিয়েছে তাই সে বাঁদি ক্রয়কারী শরিকের নিকট থেকে কিছু ফেরত পাবে না।

সাহেবাইনের কিয়াসের জবাব : সাহেবাইন বলেছিলেন, বাঁদিটি ব্যক্তিগত খাদ্য-বস্ত্রের মতো হয়েছে। এর জবাব হলো, বাঁদি খাদ্য-বস্ত্রের মতো নয়। কারণ খাদ্য বস্ত্র হলো নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস। তাই তা শিরকাতের আক্দ হতে মুসতাসনা বা ব্যতিক্রম থাকে সবসময়। তাই যখনই কোনো শরিক খাদ্য বা বস্ত্র কিনে, তখন কেনার দ্বারাই তা তার ব্যক্তি মালিকানা হয়ে যায়। তাই যৌথ সম্পদ দ্বারা তার মূল্য পরিশোধ করলে অর্ধেক মূল্য অপর শরিক কে ফেরত দিতে হয়। পক্ষান্তরে বাঁদি কোনো নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস নয়। তাই তা ক্রয় করার দ্বারা ক্রয়কারীর ব্যক্তি মালিকানা সাব্যস্ত হবে না। বরং তা যৌথ সম্পদ হিসাবে গণ্য হবে এবং যৌথ সম্পদ হতেই তার মূল্য পরিশোধ করতে হবে। অতএব, যৌথ সম্পদকে ব্যক্তি সম্পদের সাথে তুলনা করা সঠিক নয়।

قَوْلُهُ وَلِلْبَائِعِ اَنْ يَّاْخُذَ بِالثَّمَنِ اَيُّهُمَا الخ : বক্ষ্যমাণ মাসআলাটি পূর্বের মাসআলারই তাতিম্মা স্বরূপ। পূর্বের মাসআলায় আলোচিত বাঁদির মূল্য বিক্রেতা কার কাছে তলব করবে, এ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, বিক্রেতা ক্রেতা ও ক্রেতার শরিকদার উভয়ের কাছে থেকেই বাঁদির মূল্য গ্রহণ করতে পারবে। ক্রেতার কাছ থেকে গ্রহণ করতে পারবে। কারণ সেই খরিদকারী মূল ক্রয়কারী। আর তার শরিকদারের কাছ থেকে তলব করতে পারবে, এ কারণে যে, সে ক্রয়কারীর কফীল। কেননা শিরকাতে মুফাওয়াযা কাফালাতকে অন্তর্ভুক্ত করে। তাই ঐ পন্থায় শরিকদ্বয় পরস্পর একে অপরের কাফীল হয়ে থাকে। ফলে বাণিজ্যগত কারণে একজনের যে ঋণ আরোপিত হয়, তা অপর জনের উপরও বর্তায়। অতএব, যদি কোনো এক শরিক ব্যবসার উদ্দেশ্যে খাদ্য বা বস্ত্র খরিদ করে, তাহলে যেমন উক্ত খাদ্য ও বস্ত্রের মূল্য অপর শরিকের কাছে তলব করা যায়, তেমনি এক শরিকের অনুমতিক্রমে অপর শরিকের ক্রয়কৃত বাঁদীর মূল্যও অপর শরিকের কাছে তলব করা যাবে। গ্রন্থকার (র.) فَصَارَ كَالطَّعَامِ وَالْكِسْوَةِ বলে একথাটিই বুঝাতে চেয়েছেন। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

https://e-ilm.weebly.com/

كِتَابُ الْوَقْفِ

অধ্যায় : ওয়াক্ফ

ওয়াক্ফ সম্পর্কিত কিছু জরুরি জ্ঞাতব্য বিষয় :

● **ওয়াক্ফের আভিধানিক অর্থ :** وَقْفٌ শব্দটি মাসদার বা ক্রিয়ামূল। বাবে ضرب থেকে ব্যবহৃত হয়। এর আভিধানিক অর্থ হলো– আটক করা বা আবদ্ধ করা।

● **ওয়াক্ফের পারিভাষিক সংজ্ঞা :** ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে ওয়াক্ফের সংজ্ঞা হলো– حَبْسُ الْعَيْنِ عَلٰى مِلْكِ الْوَاقِفِ وَالتَّصَدُّقُ بِالْمَنْفَعَةِ অর্থাৎ কোনো বস্তু (সম্পদ) ওয়াক্ফকারীর মালিকানায় আবদ্ধ করে রাখা এবং এর (সম্পদের) মুনাফা সদকা করে দেওয়া।

সাহেবাইনের মতে– حَبْسُ الْعَيْنِ عَلٰى حُكْمِ مِلْكِ اللّٰهِ تَعَالٰى অর্থাৎ আল্লাহর মালিকানা বিধানের ভিত্তিতে বস্তুকে আবদ্ধ করা (এবং এর মুনাফা সদকা করা)।

● **ওয়াক্ফ শুদ্ধ হওয়ার শর্তসমূহ :**

১. ওয়াক্ফকারী স্বাধীন হওয়া।

২. আকেল বা বোধসম্পন্ন হওয়া।

৩. প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া।

৪. শর্তযুক্ত না হওয়া, বরং নিঃশর্তভাবে তাৎক্ষণিক কার্যকর হওয়া। অতএব, কেউ যদি এরূপ বলে যে, যদি আমার ছেলে ফিরে আসে, তাহলে আমার বাড়িটি গরিব-মিসকিনের জন্য ওয়াক্ফ। এর পরে যদি তার ছেলে ফিরে আসে, তাহলেও ওয়াক্ফ কার্যকর হবে না। কারণ শর্তযুক্ত ওয়াক্ফ শুদ্ধ নয়।

৫. ওয়াক্ফকারী ব্যক্তি মাহজুর না হওয়া তথা লেনদেনের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত না হওয়া। অতএব, যদি বুদ্ধিহীন হওয়ার কারণে কিংবা অন্য কোনো কারণে কারো উপর আদালতের পক্ষ থেকে এরূপ নির্দেশ জারি করা হয় যে, সে কোনো লেনদেন করতে পারবে না। এমতাবস্থায় সে যদি কোনো কিছু ওয়াক্ফ করে তাহলে তার ওয়াক্ফ শুদ্ধ হবে না।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে ওয়াক্ফসম্পত্তি ওয়াক্ফকারীর মালিকানা হতে বের হওয়ার জন্য বিশেষ শর্ত হলো, মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থার সাথে ওয়াক্ফকে সম্পৃক্ত করা। অথবা সে সম্পর্কে আদালতের নির্দেশ থাকা। তবে এ বিষয়ে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতবিরোধ রয়েছে।

উল্লেখ্য যে, ওয়াক্ফ সহীহ হওয়ার জন্য ওয়াক্ফকারী ব্যক্তি মুসলমান হওয়া শর্ত নয়। সুতরাং কোনো অমুসলিম ব্যক্তি যদি নিজের সম্পদ তার ভবিষ্যৎ বংশধরের জন্য ওয়াক্ফ করে তাহলে তা শুদ্ধ হবে।

● **ওয়াক্ফের রুকন :** ওয়াক্ফের রুকন হলো ওয়াক্ফ করার বিশেষ শব্দসমূহ। যেমন– এরূপ বলা যে, আমার এ জমিটি গরিব-মিসকিনের জন্য চিরস্থায়ীভাবে সদকা করলাম বা ওয়াক্ফ করলাম.

কিছু পারিভাষিক শব্দ

১. وَاقِفٌ - যে ব্যক্তি ওয়াক্ফ করে।

২. مَوْقُوْفٌ বা ওয়াক্ফকৃত সম্পদ। এর বহুবচন أَوْقَافٌ।

৩. مَوْقُوْفٌ عَلَيْهِمْ - যাদের উপর ওয়াক্ফ করা হয়।

৪. جِهتِ وَقْف বা ওয়াক্ফের খাত। যেমন- গরিব-মিসকিন, হাজী, আত্মীয়স্বজন ইত্যাদি।

৫. مُتَوَلِّي، قَيِّمٌ - ওয়াক্ফ সম্পত্তি দেখাশুনার জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি, তত্ত্বাবধায়ক

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ (رحـ) : لَا يَزُوْلُ مِلْكُ الْوَاقِفِ عَنِ الْوَقْفِ اِلَّا اَنْ يَحْكُمَ بِهِ الْحَاكِمُ اَوْ يُعَلِّقَهُ بِمَوْتِهِ فَيَقُوْلَ اِذَا مِتُّ فَقَدْ وَقَفْتُ دَارِيْ عَلٰى كَذَا . وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ يَزُوْلُ مِلْكُهُ بِمُجَرَّدِ الْقَوْلِ . وَقَالَ مُحَمَّدٌ : لَا يَزُوْلُ حَتّٰى يَجْعَلَ لِلْوَقْفِ وَلِيًّا وَيُسَلِّمَهُ اِلَيْهِ قَالَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : اَلْوَقْفُ لُغَةً . هُوَ الْحَبْسُ يَقُوْلُ وَقَفْتُ الدَّابَّةَ وَاَوْقَفْتُهَا بِمَعْنًى . وَهُوَ فِي الشَّرْعِ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) : حَبْسُ الْعَيْنِ عَلٰى مِلْكِ الْوَاقِفِ وَالتَّصَدُّقُ بِالْمَنْفَعَةِ بِمَنْزِلَةِ الْعَارِيَةِ . ثُمَّ قِيْلَ الْمَنْفَعَةُ مَعْدُوْمَةٌ فَالتَّصَدُّقُ بِالْمَعْدُوْمِ لَا يَصِحُّ، فَلَا يَجُوْزُ الْوَقْفُ اَصْلًا عِنْدَهٗ، وَهُوَ الْمَلْفُوْظُ فِي الْاَصْلِ . وَالْاَصَحُّ اَنَّهٗ جَائِزٌ عِنْدَهٗ اِلَّا اَنَّهٗ غَيْرُ لَازِمٍ بِمَنْزِلَةِ الْعَارِيَةِ، وَعِنْدَهُمَا حَبْسُ الْعَيْنِ عَلٰى حُكْمِ مِلْكِ اللّٰهِ تَعَالٰى فَيَزُوْلُ مِلْكُ الْوَاقِفِ عَنْهُ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى عَلٰى وَجْهٍ تَعُوْدُ مَنْفَعَتُهٗ اِلَى الْعِبَادِ فَيَلْزَمُ وَلَا يُبَاعُ وَلَا يُوْهَبُ وَلَا يُوْرَثُ . وَاللَّفْظُ يَنْتَظِمُهُمَا وَالتَّرْجِيْحُ بِالدَّلِيْلِ .

অনুবাদ : ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তি থেকে ওয়াক্‌ফকারীর মালিকানা রহিত হবে না, যদি না শাসক তার মালিকানা বিলোপের ঘোষণা করেন। কিংবা সে নিজে মৃত্যুর সাথে সম্পৃক্ত করে বলে যে, আমার যখন মৃত্যু হবে তখন থেকে আমি আমার বাড়িটি এ কাজের জন্য ওয়াক্‌ফ করলাম।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, ওয়াক্‌ফের ঘোষণা দেওয়া মাত্র তার মালিকানা রহিত হয়ে যাবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তির জন্য মুতাওয়াল্লী নিয়োগ ও তার কাছে অর্পণের পূর্ব পর্যন্ত মালিকানা বিলুপ্ত হবে না।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, আভিধানিকভাবে ওয়াক্‌ফ অর্থ– আবদ্ধ করা। যেমন অভিন্ন অর্থে বলা হয় وَقَفْتُ الدَّابَّةَ و اَوْقَفْتُهَا আমি সওয়ার থামালাম।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মতে- শরিয়তের পরিভাষায় ওয়াক্‌ফ অর্থ কোনো বস্তুকে ওয়াক্‌ফকারীর (মালিকের) মালিকানায় আবদ্ধ করে দেওয়া এবং তার মুনাফা সদকা করে দেওয়া– কোনো কিছু আরিয়াত দেওয়ার মতো। (আরিয়াত অর্থ হলো কাউকে কোনো বস্তু দেওয়া, তা দ্বারা উপকৃত হওয়ার জন্য। এরপর বস্তুটি আবার মালিকের নিকট ফিরিয়ে দেওয়া।)

অতঃপর আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে যে, বস্তুর মুনাফা তো অস্তিত্বহীন বিষয়। আর অস্তিত্বহীন বিষয় সদকা করা বৈধ নয়। সুতরাং ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে ওয়াক্‌ফ মূলতই জায়েজ না হওয়ার কথা। এ বিষয়টি মাবসূতে উল্লেখ রয়েছে। তবে বিশুদ্ধতম মত এই যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতেও ওয়াক্‌ফ করা বৈধ। তবে আরিয়াত প্রদানের মতো এটাও বাধ্যতামূলক নয়।

সাহেবাইনের মতে ওয়াক্‌ফ অর্থ আল্লাহর মালিকানার বিধানের ভিত্তিতে বস্তুকে আবদ্ধ করা। সুতরাং ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তির মালিকানা ওয়াক্‌ফকারীর থেকে রহিত হয়ে আল্লাহর মালিকানায় এমনভাবে চলে যায় যে, তার মুনাফা বান্দার দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়। সুতরাং তা বাধ্যতামূলক হবে এবং তা বিক্রি করা, হেবা করা এবং মিরাশরূপে বণ্টন করা যাবে না। وقف শব্দটি অবশ্য উভয় অর্থেরই অবকাশ রাখে। তবে প্রমাণের দ্বারা অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।

https://e-ilm.weebly.com/

لَهُمَا ‹قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ حِيْنَ أَرَادَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِأَرْضٍ لَهُ تُدْعَى ثَمْغٌ : تَصَدَّقْ بِأَصْلِهَا لَا يُبَاعُ وَلَا يُوْرَثُ وَلَا يُوْهَبُ› " وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ مَاسَّةٌ إِلَى أَنْ يَلْزَمَ الْوَقْفُ مِنْهُ لِيَصِلَ ثَوَابُهُ إِلَيْهِ عَلَى الدَّوَامِ، وَقَدْ أَمْكَنَ دَفْعُ حَاجَتِهِ بِإِسْقَاطِ الْمِلْكِ وَجَعْلِهِ لِلّٰهِ تَعَالَى. إِذْ لَهُ نَظِيْرٌ فِي الشَّرْعِ وَهُوَ الْمَسْجِدُ فَيُجْعَلُ كَذٰلِكَ . وَلِأَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ ‹لَا حَبْسَ عَنْ فَرَائِضِ اللّٰهِ تَعَالَى› " وَعَنْ شُرَيْحٍ : جَاءَ مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ بِبَيْعِ الْحَبْسِ لِأَنَّ الْمِلْكَ بَاقٍ فِيْهِ بِدَلِيْلِ أَنَّهُ يَجُوْزُ الْاِنْتِفَاعُ بِهِ زِرَاعَةً وَسُكْنٰى وَغَيْرَ ذٰلِكَ وَالْمِلْكُ فِيْهِ لِلْوَاقِفِ؛ أَلَا تَرٰى أَنَّ لَهُ وِلَايَةَ التَّصَرُّفِ فِيْهِ بِصَرْفِ غَلَّاتِهِ إِلٰى مَصَارِفِهَا وَنَصْبُ الْقُوَّامِ فِيْهَا إِلَّا أَنَّهُ يَتَصَدَّقُ بِمَنَافِعِهِ فَصَارَ شَبِيْهَ الْعَارِيَةِ، وَلِأَنَّهُ يُحْتَاجُ إِلَى التَّصَدُّقِ بِالْغَلَّةِ دَائِمًا وَلَا تَصَدُّقَ عَنْهُ إِلَّا بِالْبَقَاءِ عَلٰى مِلْكِهِ، وَلِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُزَالَ مِلْكُهُ، لَا إِلٰى مَالِكٍ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَشْرُوْعٍ مَعَ بَقَائِهِ كَالسَّائِبَةِ . بِخِلَافِ الْإِعْتَاقِ لِأَنَّهُ إِتْلَافٌ، وَبِخِلَافِ الْمَسْجِدِ .

অনুবাদ : সাহেবাইনের দলিল এই যে, হযরত ওমর (রা) যখন তাঁর মালিকানাধীন ছাম্‌গ নামক ভূমি সদকা করতে মনস্থ করলেন তখন নবী করীম ﷺ তাকে বলেছিলেন– تصدق بأصلها لا يباع ولا يورث ولا يوهب অর্থাৎ মূলভূমিকে সদকা করো যা কখনো বিক্রি করা যাবে না, মিরাশরূপে বণ্টন করা যাবে না এবং হেবা করা যাবে না।

তাছাড়া এ কারণে যে, তার দিক থেকে ওয়াক্‌ফ বাধ্যতামূলক হওয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। যেন এর ছওয়াব সর্বদা তার নিকট পৌঁছতে থাকে। আর মালিকানা রহিত করে আল্লাহর দিকে স্থানান্তরিত করার মাধ্যমে তার প্রয়োজনকে পূর্ণ করা সম্ভব। কেননা শরিয়তে এর নজির রয়েছে। যেমন- মসজিদ। সুতরাং এটাকেও সেরূপ করা হবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, নবী করীম ﷺ -এর বাণী– لا حبس عن فرائض الله تعالى অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত ফারায়েয থেকে কোনো মাল আবদ্ধ রাখার অবকাশ নেই। আর শুরাইহ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, মুহাম্মদ ﷺ আবদ্ধ সম্পত্তি বিক্রির বৈধতা নিয়ে এসেছেন। তাছাড়া এ কারণে যে, বান্দার মালিকানা এখনও বিদ্যমান রয়েছে। এ কারণেই চাষাবাদ, বসবাস ও অন্যান্য উপায়ে তা দ্বারা উপকৃত হওয়ার বৈধতা আছে। আর তাতে মালিকানা হচ্ছে ওয়াক্‌ফকারীর। তুমি কি লক্ষ্য করনি যে, ওয়াকফকৃত সম্পত্তির আয় যথার্থ ক্ষেত্রগুলোতে খরচ করার বিষয়টি পরিচালনা করার কর্তৃত্ব হলো তার। আর তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করার অধিকারও তার। কিন্তু অবশ্যই সে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির মুনাফা সদকা করে দিবে। সুতরাং এটি আরিয়াতের সদৃশ হলো।

তাছাড়া (দ্বিতীয়) কারণ এই যে, সম্পত্তির আয় সদকা করার প্রয়োজন সর্বদাই রয়েছে। অথচ সম্পত্তিটি তার মালিকানায় না থাকলে তার পক্ষ থেকে সদকা হবে না। তৃতীয় কারণ এই যে, কোনো মালিকের হাতে নাস্তকরণ ছাড়া তার মালিকানা বিলুপ্ত করা সম্ভব নয়। কেননা মালিকানা গ্রহণের গুণ বিদ্যমান থাকা অবস্থায় তা শরিয়ত সম্মত নয়। যেমন– (মান্নত করে) ছেড়ে দেওয়া পশু। আজাদ করার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা এটা হলো মালিকানা রহিত করা। মসজিদের বিষয়টি ভিন্ন।

https://e-ilm.weebly.com/

لِاَنَّهُ جُعِلَ خَالِصًا لِلّٰهِ تَعَالٰى وَلِهٰذَا لَا يَجُوْزُ الْاِنْتِفَاعُ بِهِ، وَهٰهُنَا لَمْ يَنْقَطِعْ حَقُّ الْعَبْدِ عَنْهُ فَلَمْ يَصِرْ خَالِصًا لِلّٰهِ تَعَالٰى . قَالَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : قَالَ فِي الْكِتَابِ : لَا يَزُوْلُ مِلْكُ الْوَاقِفِ اِلَّا اَنْ يَحْكُمَ بِهِ الْحَاكِمُ اَوْ يُعَلِّقَهُ بِمَوْتِهِ، وَهٰذَا فِيْ حُكْمِ الْحَاكِمِ صَحِيْحٌ: لِاَنَّهُ قَضَاءٌ فِيْ مُجْتَهَدٍ فِيْهِ، اَمَّا فِيْ تَعْلِيْقِهِ بِالْمَوْتِ فَالصَّحِيْحُ اَنَّهُ لَا يَزُوْلُ مِلْكُهُ اِلَّا اَنَّهُ تَصَدَّقَ بِمَنَافِعِهِ مُؤَبَّدًا فَيَصِيْرُ بِمَنْزِلَةِ الْوَصِيَّةِ بِالْمَنَافِعِ مُؤَبَّدًا فَيَلْزَمُ، وَالْمُرَادُ بِالْحَاكِمِ الْمَوْلٰى، فَاَمَّا الْمُحَكَّمُ فَفِيْهِ اخْتِلَافُ الْمَشَايِخِ . وَلَوْ وَقَفَ فِيْ مَرَضِ مَوْتِهِ قَالَ الطَّحَاوِيُّ : هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْوَصِيَّةِ بَعْدَ الْمَوْتِ . وَالصَّحِيْحُ اَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ)، وَعِنْدَهُمَا يَلْزَمُهُ اِلَّا اَنَّهُ يُعْتَبَرُ مِنَ الثُّلُثِ وَالْوَقْفُ فِي الصِّحَّةِ مِنْ جَمِيْعِ الْمَالِ، وَاِذَا كَانَ الْمِلْكُ يَزُوْلُ عِنْدَهُمَا يَزُوْلُ بِالْقَوْلِ عِنْدَ اَبِيْ يُوْسُفَ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ بِمَنْزِلَةِ الْاِعْتَاقِ لِاَنَّهُ اِسْقَاطُ الْمِلْكِ .

অনুবাদ : কেননা তা একান্তভাবে আল্লাহর জন্য করা হয়েছে। এ কারণেই তা দ্বারা কোনোভাবে উপকৃত হওয়া জায়েজ নয়। পক্ষান্তরে এখানে ওয়াকফের সম্পত্তি থেকে বান্দার হক রহিত হয়নি। তাই সেটা একান্তভাবে আল্লাহর জন্য হলো না। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, (ইমাম কুদূরী) তার কিতাবে বলেছেন, ওয়াক্ফকারীর মালিকানা বিলুপ্ত হবে না, যদি না শাসক তা বিলুপ্ত হওয়ার আদেশ দেন কিংবা সে ওয়াক্ফকে নিজের মৃত্যুর সাথে সম্পৃক্ত না করে।

শাসকের ফয়সালার ক্ষেত্রে এটা সঠিক কথা। কেননা এটা ইজতিহাদী বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান। কিন্তু মৃত্যুর সাথে সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ মত এই যে, তাতে ওয়াক্ফকারীর মালিকানা রহিত হবে না। তবে সেটা হবে স্থায়ীভাবে সম্পত্তির মুনাফা সদকা করে দেওয়া। সুতরাং তা স্থায়ীভাবে কোনো কিছুর মুনাফা সদকা করা সম্পর্কিত অসিয়তের সমতুল্য হলো। সুতরাং (ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে) তা বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে। আর শাসক দ্বারা উদ্দেশ্য হলো শাসকের পক্ষ থেকে বিচারকার্যে নিযুক্ত ব্যক্তি।

পক্ষান্তরে দুই পক্ষের সম্পত্তিতে নিযুক্ত 'সালিসের' ঘোষণা সম্পর্কে মাশায়েখগণ মতভিন্নতা পোষণ করেন। যদি মৃত্যুশয্যায় ওয়াক্ফ করে তাহলে ইমাম ত্বহাবী (র.) বলেন, এটা মৃত্যু পরবর্তী অসিয়তের পর্যায়ভুক্ত হবে। তবে বিশুদ্ধ বর্ণনা এই যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে এই ওয়াক্ফ তার উপর বাধ্যতামূলক হবে না। আর সাহেবাইনের মতে বাধ্যতামূলক হবে। তবে তা এক তৃতীয়াংশ সম্পত্তি থেকে গ্রহণীয় হবে। পক্ষান্তরে সুস্থ অবস্থায় ওয়াক্ফ করলে সমগ্র সম্পত্তি থেকে বিবেচ্য হবে।

সাহেবাইনের মতে যখন মালিকানা বিলুপ্ত হয়। তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে ওয়াক্ফের কথা উচ্চারণ করা মাত্র বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এটা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এরও বক্তব্য। যেমন- আজাদ করার ব্যাপারে। কেননা এটাও মালিকানা রহিতকরণমূলক বক্তব্য।

https://e-ilm.weebly.com/

وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رحـ لَا بُدَّ مِنَ التَّسْلِيْمِ إِلَى الْمُتَوَلِّي لِاَنَّهُ حَقُّ اللّٰهِ تَعَالٰى، وَاِنَّمَا يَثْبُتُ فِيْهِ فِيْ ضِمْنِ التَّسْلِيْمِ إِلَى الْعَبْدِ لِاَنَّ التَّمْلِيْكَ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَهُوَ مَالِكُ الْاَشْيَاءِ لَا يَتَحَقَّقُ مَقْصُوْدًا، وَقَدْ يَكُوْنُ تَبعًا لِغَيْرِهِ فَيَاْخُذُ حُكْمَهُ فَيَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الزَّكَاةِ وَالصَّدَقَةِ .

অনুবাদ : আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে মুতাওয়াল্লীর হাতে অর্পণ করা অপরিহার্য। কেননা এটা আল্লাহর হক, যা বান্দার হাতে অর্পণের মধ্য দিয়ে ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তিতে সাব্যস্ত হয়। কেননা আল্লাহ যেহেতু সকল বস্তুর মালিক সেহেতু স্বতন্ত্র উদ্দেশ্যরূপে আল্লাহকে মালিক বানানো সাব্যস্ত হতে পারে না। তবে অন্যকে মালিক বানানোর অনুবর্তীরূপে সাব্যস্ত হতে পারে। তখন তাকে মালিক বানানোর হুকুম সাব্যস্ত হবে এবং এটা জাকাত ও সদকায় পর্যবসিত হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিউক্ত সুদীর্ঘ ইবারতে ৬টি বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। বিষয়গুলো নিম্নরূপ :

১. ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তি হতে ওয়াক্‌ফকারীর মালিকানা কখন রহিত হবে– এ সম্পর্কে ইমামত্রয়ের মতামত।
২. ওয়াক্‌ফের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ।
৩. সাহেবাইনের দলিল ও ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল।
৪. দুটি প্রশ্নের উত্তর।
৫. ইমাম কুদূরীর ইবারত সম্পর্কে হিদায়া প্রণেতার মন্তব্য।
৬. প্রাসঙ্গিক মাসআলা।

উপরিউক্ত প্রসঙ্গগুলো ধারাবাহিকভাবে সবিস্তারে নিম্নে আলোচিত হলো–

১. ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তি হতে ওয়াক্‌ফকারীর মালিকানা কখন বা কিভাবে রহিত হবে।

এ সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফা (র.)ও সাহেবাইন (র.)-এর মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে।

قَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ رحـ الخ - ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তি হতে ওয়াক্‌ফকারীর মালিকানা বিলুপ্ত হওয়ার দুটি সুরত।

ক. শাসকের পক্ষ থেকে যদি এ মর্মে রায় ঘোষণা হয় যে, অমুকের ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি হতে তার মালিকানা বিলুপ্ত হয়েছে, তাহলে মালিকানা বিলুপ্ত হবে।

খ. ওয়াক্‌ফকারী ব্যক্তি যদি ওয়াক্‌ফকে নিজের মৃত্যুর সাথে সম্পৃক্ত করে তাহলেও মালিকানা বিলুপ্ত হবে। অর্থাৎ ওয়াক্‌ফকারীকে এরূপ বলতে হবে যে, আমি যখন মৃত্যুবরণ করব, তখন আমার বাড়িটি কিংবা অমুক সম্পদটি অমুক খাতে ওয়াক্‌ফ হয়ে যাবে।

উক্ত দু-সুরতের কোনো সুরত না হলে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি থেকে ওয়াক্‌ফকারীর মালিকানা বিলুপ্ত হবে না।

قَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ رحـ الخ : ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, ওয়াক্‌ফকারী ব্যক্তি ওয়াক্‌ফের ঘোষণা উচ্চারণ করা মাত্র তার মালিকানা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। অর্থাৎ ব্যক্তি যখন একথা বলবে যে, আমি আমার অমুক সম্পদটি ওয়াক্‌ফ করলাম, তখনই সম্পদটি তার মালিকানা থেকে বের হয়ে যাবে।

وَقَالَ مُحَمَّدٌ رح الخ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, ওয়াক্‌ফকারী ব্যক্তি যখন নিজের ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি দেখাশোনার জন্য একজনকে তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে নিযুক্ত করবে এবং ওয়াক্‌ফ সম্পদটি তার হাতে বুঝিয়ে দিবে, তখনই উক্ত সম্পদ হতে তার মালিকানা বিলুপ্ত হবে। এর পূর্বে নয়।

https://e-ilm.weebly.com/

২. ওয়াক্‌ফের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ :

قَوْلُهُ : قَالَ الْوَقْفُ لُغَةً الخ : হিদায়া গ্রন্থকার বলেন- الْوَقْفُ শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো الْحَبْسُ অর্থাৎ আবদ্ধ করা, আটক করা, যেমন- وقف শব্দটির ব্যবহারে মানুষ বলে থাকে وَقَفْتُ الدَّابَّةَ বা أَوْقَفْتُ الدَّابَّةَ অর্থাৎ আমি পশুটি আবদ্ধ করলাম, পশুটি থামালাম।

ওয়াক্‌ফের পারিভাষিক অর্থ ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে- حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَى مِلْكِ الْوَاقِفِ وَالتَّصَدُّقُ بِالْمَنْفَعَةِ بِمَنْزِلَةِ الْعَارِيَةِ অর্থাৎ মূল সম্পত্তি ওয়াক্‌ফকারীর মালিকানায় আবদ্ধ রাখা এবং আরিয়াতের মতো তার মুনাফা সদকা করে দেওয়া। অর্থাৎ যখন কেউ কাউকে কোনো জিনিস আরিয়াত প্রদান করে তথা কর্জ দান করে, তখন প্রদানকৃত বস্তুটি দাতার মালিকানায়ই থাকে। তবে বস্তুটির মুনাফা ভোগ করে কর্জ গ্রহণকারী ব্যক্তি। পরবর্তী সময় মালিক তার সম্পদটি ফিরিয়ে আনতে পারে। ঠিক তদ্রূপ ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মতে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি ওয়াক্‌ফকারীর মালিকানায়ই থাকবে এবং সম্পদের মুনাফাটুকু সদকা হবে। অতএব, ওয়াক্‌ফকারী ব্যক্তি কোনো সময় তার সম্পদ নিজ হাতে ফিরিয়ে আনতে পারবে এবং ইচ্ছা করলে তা বিক্রিও করতে পারবে।

قَوْلُهُ : ثُمَّ قِيْلَ الْمَنْفَعَةُ الخ : ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মাযহাব সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপিত হয় যে, মুনাফা একটি অস্তিত্বহীন বিষয়। আর অস্তিত্বহীন বিষয় সদকা করা জায়েজ নয়। তাই ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতানুসারে ওয়াক্‌ফ জায়েজ না হওয়া উচিত। আল মাবসূত নামক কিতাবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর পক্ষ থেকে একথাই বর্ণিত আছে। কিন্তু বিশুদ্ধ কথা হলো, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতেও ওয়াক্‌ফ জায়েজ আছে। কিন্তু তা বাধ্যতামূলক নয়। যেমন আরিয়াত বাধ্যতামূলক নয়।

সাহেবাইনের মতে ওয়াক্‌ফের সংজ্ঞা হলো- حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَى حُكْمِ مِلْكِ اللّٰهِ تَعَالٰى আল্লাহর মালিকানার বিধানের ভিত্তিতে সম্পত্তিকে আবদ্ধ রাখা। তাই ওয়াক্‌ফকৃত সম্পদ থেকে ওয়াক্‌ফকারীর মালিকানা বিলুপ্ত হয়ে তা আল্লাহর মালিকানায় চলে যাবে এবং মুনাফা আল্লাহর বান্দারা ভোগ করবে। ফলে ওয়াক্‌ফকারীর উপর ওয়াক্‌ফ বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে। তাই সে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি বিক্রয় করতে পারবে না, হেবা করতে পারবে না, তার মৃত্যুর পর সম্পত্তি মিরাশ হিসাবে বণ্টনও করা যাবে না।

وقف শব্দটি উভয় মতকে অন্তর্ভুক্ত করে। অর্থাৎ উভয় মতানুসারে ওয়াক্‌ফ শুদ্ধ হয়ে যাবে। মালিকের মালিকানা বিলুপ্ত হোক বা না হোক। তবে মত দুটির একটি অপরটির উপর প্রাধান্য লাভ করবে দলিলের ভিত্তিতে।

৩. সাহেবাইনের দলিল :

لَهُمَا قَوْلُ النَّبِيِّ لِعُمَرَ الخ সাহেবাইনের দলিল হলো :

১. হযরত ওমর (রা) যখন তাঁর মালিকানাধীন ছাম্‌গ নামক ভূমি ওয়াক্‌ফ করার জন্য মনস্থ করেছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বলেছিলেন- تَصَدَّقْ بِاَصْلِهَا لَا يُبَاعُ وَلَا يُوْهَبُ وَلَا يُوْرَثُ অর্থাৎ তুমি মূল ভূমিটি সদকা করে দাও। যাতে তা বিক্রি না করা হয়, দান না করা হয় এবং মিরাশরূপে বণ্টন না করা হয়।

নবী করীম ﷺ -এর এ উক্তি দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ওয়াক্‌ফের সম্পদটি ওয়াক্‌ফকারীর মালিকানা হতে বেরিয়ে যায়, তাই সে সম্পদ পরে আর কখনো বিক্রয় করা যায় না, হেবা করা যায় না এবং ওয়াক্‌ফকারীর মৃত্যুর পর তার মিরাশরূপেও বণ্টন করা যায় না।

হযরত ওমর (রা) -এর ওয়াক্‌ফ সম্পর্কিত হাদীসটি ইমাম বুখারী, মুসলিমসহ ছয় ইমামই বর্ণনা করেছেন। হাদীসটির শব্দমালা নিম্নরূপ-

عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض قَالَ أَصَابَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ بِخَيْبَرَ اَرْضًا فَاَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ اَنْفَسَ مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِيْ بِهِ؟ قَالَ اِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ اَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ عُمَرُ رض اَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوْهَبُ وَلَا يُوْرَثُ فِى الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبٰى وَالرِّقَابِ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيْلِ لَاجُنَاحَ عَلٰى مَنْ وَلِيَهَا اَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوْفِ وَيُطْعِمَ صَدِيْقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيْهِ۔

https://e-ilm.weebly.com/

অর্থাৎ নাফে'র সূত্রে হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমর (রা) খাইবার এলাকায় (গনিমত হিসাবে) একটি জমি লাভ করেছিলেন। অতপর তিনি নবী ﷺ এর কাছে এসে বললেন, আমি একটি ভূমি পেয়েছি অতি মূল্যবান, এরূপ মূল্যবান সম্পদ অতীতে কখনো আমার অধিকারে আসেনি। (আমি এ ভূমিটি সদকা করতে চাই) তাই আপনি কী পরামর্শ দেন? তখন নবী করীম ﷺ বললেন, ইচ্ছে হলে তুমি মূলভূমিটি আবদ্ধ রেখে তা সদকা করে দিতে পার। অতঃপর হযরত ওমর (রা) ভূমিটি সদকা করে দিলেন এ শর্তে যে, ভূমিটি বিক্রি করা যাবে না, হেবা করা যাবে না, মিরাশরূপে বণ্টনও করা যাবে না। যাদের জন্য সদকা করা হলো, তারা হলেন গরিব-মিসকিন, নিকটাত্মীয়, গোলাম-বন্দি, যোদ্ধা, মেহমান ও মুসাফির। যে ব্যক্তি এ সম্পদের তত্ত্বাবধান করবে, সে তা থেকে ন্যায়সঙ্গতভাবে খেতে পারবে এবং তার বন্ধুকেও খাওয়াতে পারবে। (অর্থাৎ ভোগ করতে পারবে।) তবে সঞ্চয় করতে পারবে না।

২. সাহেবাইনের দ্বিতীয় দলিল হলো, وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ مَاسَّةٌ الخ ওয়াকফকারী ব্যক্তির মালিকানা বিলুপ্ত করার প্রয়োজনও রয়েছে। কেননা সে সর্বদা ছওয়াব পাওয়ার মুখাপেক্ষী। আর তার এ প্রয়োজন পূরণ করা সম্ভব তার মালিকানা বিলুপ্ত করার মাধ্যমে, সুতরাং তার মালিকানা বিলুপ্ত করার মাধ্যমেই তার প্রয়োজন পূরণ করা হবে।

শরিয়তে এর নজিরও রয়েছে। তা হলো মসজিদ। কেননা যে ব্যক্তি মসজিদ ওয়াকফ করে তার মালিকানা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং এর বিনিময়ে সে সর্বদা ছওয়াব লাভ করতে থাকে। অতএব, সাহেবাইনের মতে সাধারণ ওয়াক্ফের ক্ষেত্রেও ওয়াক্ফকারীর মালিকানা বিলুপ্ত করা হবে, যাতে করে সে ছওয়াব লাভ করতে পারে।

وَلِأَبِي حَنِيْفَةَ رح الخ : ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর দলিল :

১. নবী করীম ﷺ -এর বাণী- لَا حَبْسَ عَنْ فَرَائِضِ اللّٰهِ تَعَالٰى আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ফারায়েয থেকে কোনো সম্পদ আবদ্ধ রাখার অবকাশ নেই। এ হাদীসটি ইমাম দারাকুতনী, ইমাম ত্বহাবী, ইবনে আবী শায়বাহ প্রমুখ বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটির মর্ম হলো, মৃত ব্যক্তির সম্পদে তার ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকারীদের জন্য আল্লাহ তা'আলা যে অংশ নির্ধারণ করে রেখেছেন মৃত ব্যক্তির সম্পদ থেকে সেসব নির্ধারিত অংশ দিয়ে দিতে হবে। ওয়ারিশদের অংশ না দিয়ে মৃতের সম্পদ অন্য কোনো খাতে আবদ্ধ রাখার অবকাশ নেই।

সুতরাং এ হাদীসটি দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ওয়াক্ফ সম্পদ থেকে ওয়াক্ফকারীর মালিকানা বিলুপ্ত হয় না; বরং তার মৃত্যুর পর সে সম্পদ ওয়ারিশদের মাঝে নির্ধারিত হারে বণ্টন করে দিতে হবে।

২. عَنْ شُرَيْحٍ جَاءَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَيْعِ الْحَبْسِ হযরত মুহাম্মদ ﷺ আবদ্ধ সম্পদ বিক্রি করার বৈধতা নিয়ে আগমন করেছেন। এ উক্তিটি ইবনে আবী শায়বা, বায়হাকী, ত্বহাবী (র.) প্রমুখ বর্ণনা করেছেন।

উক্তিটির মর্ম হলো, আবদ্ধ বা ওয়াক্ফ সম্পদ বিক্রি করা অতীতকালে বৈধ মনে করা হতো না; কিন্তু হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর বৈধতা নিয়ে এসেছেন। অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর শরিয়তে আবদ্ধ তথা ওয়াক্ফ সম্পত্তি বিক্রি করা বৈধ আছে।

শুরাইহ-র পরিচিতি : তিনি কাজি শুরাইহ নামে পরিচিত। ইসলামি ইতিহাসে তিনি একজন প্রসিদ্ধ কাজি বা বিচারক হিসাবে খ্যাত। তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতা ছিল প্রবাদতুল্য। তিনি হযরত ওমর, উসমান ও আলী (রা.) তিন খলিফার শাসনামলেই বিচারকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

৩. وَلِأَنَّ الْمِلْكَ بَاقٍ فِيْهِ الخ তৃতীয় দলিল হিসাবে বলা হয় যে, ওয়াক্ফের সম্পত্তিতে মানুষের মালিকানা অবশিষ্ট থাকে। তাই এ সম্পদ দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়ে থাকে নানাভাবে। যেমন- চাষাবাদ করে, বসবাস করে, ভাড়া দিয়ে ও অন্যান্য উপায়ে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, উক্ত সম্পদে মানুষের মালিকানা আছে। আর সেই মালিকানাটি হলো ওয়াক্ফকারীর। তাইতো ওয়াক্ফকারী ব্যক্তি ওয়াক্ফকৃত সম্পদে তাসাররুফের অধিকারী হয়ে থাকে। ওয়াক্ফকৃত সম্পদের আয় সে বিভিন্ন উপযুক্ত খাতে ব্যয় করে, ওয়াক্ফকৃত সম্পদের দেখা-শুনার জন্য তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করে ইত্যাদি। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ওয়াক্ফকৃত সম্পদের উপর মূলত ওয়াক্ফকারীর মালিকানাই বহাল থাকে। তবে উক্ত সম্পদের আয় ও মুনাফা তাকে সদকা করতে হয়। এ দিকে লক্ষ্য করে ওয়াকফের বিষয়টি আরিয়াতের মতোই হয়ে যায়। কেননা আরিয়াতের বস্তুটি মালিকের মালিকানায়-ই থাকে। কিন্তু এর মুনাফা ভোগ করে অন্যজন। তদ্রূপ ওয়াক্ফ সম্পদও ওয়াক্ফকারীর মালিকানায় থাকে, কিন্তু তার মুনাফা ভোগ করে অন্যরা।

https://e-ilm.weebly.com/

৪. وَلِأَنَّهُ يَحْتَاجُ اِلَى التَّصَدُّقِ الخ ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর চতুর্থ দলিল হলো এই যে, ওয়াকফকারী ব্যক্তি সর্বদা ওয়াকফ সম্পদের আয় সদকা করার মুখাপেক্ষী। অর্থাৎ ওয়াকফের আয় সর্বদা তাকে সদকা করতে হয়। আর সম্পদের আয় সদকা করার জন্য জরুরি হলো সম্পদটি তার মালিকানায় থাকা। কেননা মূল সম্পদটিই যদি তার মালিকানা হতে বেরিয়ে যায় তাহলে সে উক্ত সম্পদের আয়ের মালিক হতে পারবে না এবং তার সদকাও করতে পারবে না; অতএব, সম্পদের আয় বা মুনাফা সদকা করার স্বার্থেই সম্পদটি ওয়াক্‌ফকারীর মালিকানাধীন থাকা আবশ্যক।

৫. ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর পঞ্চম দলিল হলো, وَلِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الخ অর্থাৎ কোনো সম্পদের উপর থেকে সংশ্লিষ্ট মালিকের মালিকানা বিলুপ্ত করতে হলে, সম্পদটির উপর অন্য আরেকজনের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়া অত্যাবশ্যক। কোনো সম্পদ কারো মালিকানাধীন না করেই পূর্ব মালিকের মালিকানা বিলুপ্ত করে দেওয়া শরিয়তের দৃষ্টিতে জায়েজ নয়। যেমন জাহেলি যুগে প্রচলন ছিল, আল্লাহর নামে বা দেবতার নামে পশু মান্নত করে তা ছেড়ে দিত। কাউকে এর মালিক বানানো হতো না। ছেড়ে দেওয়া পশুকে সায়েবা বলা হতো। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমে উক্ত প্রথার নিন্দা করেছেন এবং তা নিষিদ্ধ করেছেন। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, কোনো সম্পদ কারো মালিকানাধীন না করে পূর্ব মালিকের মালিকানা বিলুপ্ত করা বৈধ নয়। সুতরাং ওয়াক্‌ফের সম্পদ যেহেতু কারো মালিকানায় প্রবেশ করে না, সেহেতু তা থেকে পূর্ব মালিকের মালিকানা বিলুপ্ত হবে না। বরং ওয়াক্‌ফের সম্পদ ওয়াক্‌ফকারীর মালিকানায়-ই থেকে যাবে। এবং এটাই ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর বক্তব্য।

৪. দুটি প্রশ্নের উত্তর।

প্রশ্ন : ১. ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিলে বলা হয়েছে, কোনো সম্পদের উপর নতুন কারো মালিকানা প্রতিষ্ঠিত না করে পূর্ব মালিকের মালিকানা বিলুপ্ত করা বৈধ নয়। এ কথাটির উপর প্রশ্ন উত্থাপন করা হয় যে, উপরিউক্ত বক্তব্য সঠিক হলে إِعْتَاقْ তথা গোলাম-বাঁদি আজাদ করা অবৈধ হওয়া উচিত। কেননা সেখানে গোলাম-বাঁদির উপর অন্য কারো মালিকানা প্রতিষ্ঠিত না করেই পূর্ব মালিকের মালিকানা বাতিল করা হয়। গ্রন্থকার এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন بِخِلَافِ الْإِعْتَاقِ وَلِأَنَّهُ إِتْلَافٌ বলে। যার সারমর্ম হলো এই যে, গোলাম-বাঁদি আজাদ করার ক্ষেত্রে পূর্ব মালিকের মালিকানা বিলুপ্ত করা হয় না; বরং সেখানে গোলাম-বাঁদির মালিকানাধীন হওয়ার বৈশিষ্ট্যটি বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়। অর্থাৎ গোলাম-বাঁদিকে যে সাধারণ অবস্থায় مَمْلُوكٌ বা কোনো ব্যক্তির মালিকানাধীন সম্পদ মনে করা হতো, আজাদ করার মাধ্যমে তাদের সম্পদ হওয়ার বৈশিষ্ট্যটি বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়। কথাটি এভাবেও বলা যায় যে, আজাদ করার পূর্বে গোলাম-বাঁদি সম্পদ হিসাবে গণ্য হয়। আর আজাদ করার পর তারা সম্পদ থাকে না। বরং মানুষ বলে গণ্য হয়। অতএব, তারা যখন সম্পদই থাকে না, তখন তাদের উপর কারো মালিকানা সাব্যস্ত হওয়ার প্রশ্নই উঠে না। কেননা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর বক্তব্য ছিল, মালিকানাধীন হওয়ার উপযুক্ত কোনো বস্তুকে তথা সম্পদকে অন্যের মালিকানায় প্রবিষ্ট না করে পূর্ব মালিকের মালিকানা বিলুপ্ত করা বৈধ নয়। অতএব, গোলাম-বাঁদি আজাদ করার বিষয়টি দ্বারা ইমাম আবূ হানীফার বক্তব্যের উপর প্রশ্ন উত্থাপিত হয় না।

প্রশ্ন : ২. একই বক্তব্যের উপর পূর্বের প্রশ্নের মতোই আরেকটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় মসজিদ নিয়ে। কেননা মসজিদের জায়গা কারো মালিকানায় প্রবেশ করে না, অথচ তা থেকে পূর্ব মালিকের মালিকানা বিলুপ্ত হয়ে যায়। অতএব, ওয়াক্‌ফের সম্পদের ক্ষেত্রেও এমন হতে পারবে। সুতরাং ওয়াক্‌ফের সম্পদের উপর কারো মালিকানা প্রতিষ্ঠা হবে না এবং তা থেকে পূর্বে ওয়াক্‌ফকারীর মালিকানাও বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

এ প্রশ্নের জবাব হলো, সাধারণ ওয়াক্‌ফকৃত সম্পদকে যে মসজিদের সাথে কিয়াস করা হয়েছে, তা ঠিক হয়নি। কেননা মসজিদের নিরেট হক আল্লাহর, তাতে বান্দার কোনো হক থাকে না। তাই তা দ্বারা কারো জন্য উপকৃত হওয়া জায়েজ হয় না। পক্ষান্তরে সাধারণ ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি মসজিদের মতো নিরেট আল্লাহ তা'আলার হক নয়। বরং তাতে বান্দার হক সম্পৃক্ত থাকে। তাই তা দ্বারা মানুষ বিভিন্নভাবে উপকৃত হয়ে থাকে।

সুতরাং যা নিরেট আল্লাহর হক নয়, তাতে নিরেট আল্লাহর হকের সাথে কিয়াস করা সঠিক নয়।

https://e-ilm.weebly.com/

৫. ইমাম কুদূরী (র.) -এর ইবারত সম্পর্কে হিদায়া প্রণেতার বক্তব্য : ইমাম কুদূরী (র.) বলেছেন, ওয়াক্ফ সম্পদ থেকে ওয়াক্ফকারীর মালিকানা বিলুপ্ত হয় না, তবে সে সম্পর্কে হাকিম তথা আদালতের পক্ষ থেকে রায় ঘোষিত হলে কিংবা ওয়াক্ফকারী যদি ওয়াক্ফকে নিজের মৃত্যুর সাথে সম্পৃক্ত করে, তাহলে।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, এ বক্তব্যের প্রথমাংশটি সহীহ। অর্থাৎ আদালতের রায় ঘোষণার মাধ্যমে যে ওয়াক্ফকারীর মালিকানা বিলুপ্ত হয়ে যায়- একথাটি সঠিক। কেননা ওয়াক্ফ বাধ্যতামূলক হওয়ার বিষয়টি একটি ইজতেহাদী বিষয়। আর কোনো ইজতেহাদী বিষয়ে আদালতের রায় কার্যকর হয়ে থাকে। তাই আদালতের পক্ষ হতে ওয়াক্ফ বাধ্যতামূলক হওয়ার তথা ওয়াক্ফকারীর মালিকানা বিলুপ্ত হওয়ার রায় ঘোষণার ফলে ওয়াক্ফকারীর মালিকানা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। ওয়াক্ফ বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে।

কিন্তু ইমাম কুদূরী (র.)-এর বক্তব্যের দ্বিতীয় অংশটি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। কেননা কোনো ব্যক্তি যদি ওয়াক্ফকে নিজের মৃত্যুর সাথে সম্পৃক্ত করে এরূপ বলে যে, আমি মারা গেলে আমার অমুক সম্পদটি অমুক খাতে ওয়াক্ফ। তাহলে এর দ্বারা উক্ত সম্পদ হতে তার মালিকানা বিলুপ্ত হবে কি-না, এ নিয়ে মাশায়েখগণের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে : কতিপয় মাশায়েখের মতে মৃত্যুর সাথে সম্পৃক্ত করার দ্বারা ওয়াক্ফকারীর মালিকানা বিলুপ্ত হবে। আর অন্য কতিপয় মাশায়েখ বলেন, মৃত্যুর সাথে সম্পৃক্ত করে ওয়াক্ফ করা হলেও মালিকানা বিলুপ্ত হবে না। এ মতটিই বিশুদ্ধ। কেননা ওয়াক্ফকারী ব্যক্তি ওয়াক্ফের মাধ্যমে সম্পদের আয় বা মুনাফা সদকা করে থাকে। এর দ্বারা মূল সম্পদের মালিকানা বিলুপ্ত হওয়ার কোনো প্রয়োজন হয় না। তাই মূল সম্পদ ওয়াক্ফকারীর মালিকানাধীন থাকবে এবং এর মুনাফা সদকা হয়ে যাবে।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, কিন্তু মৃত্যুর সাথে সম্পৃক্ত করে ওয়াক্ফ করা হলে বুঝা যায়, সম্পদের মুনাফাসমূহ সে স্থায়ীভাবে সদকা করেছে। সে হিসাবে ওয়াক্ফটি বাধ্যতামূলক হয়ে যায়।

وَالْمُرَادُ بِالْحَاكِمِ ইবারতে উল্লিখিত হাকিম দ্বারা বুঝানো হয়েছে স্বয়ং শাসক কিংবা শাসকের পক্ষ হতে নিয়োগপ্রাপ্ত বিচারক।

পক্ষান্তরে বাদী-বিবাদীর সম্মতিতে নির্দিষ্ট একটি বিষয়ের সমাধানের জন্য যদি কাউকে সালিস বানানো হয় তাহলে তার সমাধান কার্যকর হবে কিনা? এ বিষয়ে মাশায়েখগণের দ্বিমত রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, বাদী-বিবাদীর সম্মতিতে নিযুক্ত সালিসের ফয়সালা কার্যকর হবে না। তবে বিশুদ্ধ মত হলো সালিসের ফয়সালা কার্যকর হবে। তবে একথা ফতোয়া হিসাবে প্রচার করা যাবে না। -(বেনায়াহ)

৬. একটি প্রাসঙ্গিক মাসআলা : কেউ যদি অন্তিম রোগে শয্যাশায়ী অবস্থায় ওয়াক্ফ করে তাহলে ইমাম ত্বহাবী (র.) বলেন, উক্ত ওয়াক্ফ মরণোত্তর অসিয়তের সমকক্ষ হবে। অর্থাৎ তা বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর বিশুদ্ধ মত হলো তা বাধ্যতামূলক হবে না, যেমন সুস্থ অবস্থায় ওয়াক্ফ করলে বাধ্যতা মূলক হয় না তবে সাহেবাইনের মতে অন্তিম রোগীর ওয়াক্ফ বাধ্যতামূলক হবে। এবং ওয়াক্ফকারীর গোটা সম্পদের এক তৃতীয়াংশের মাধ্যমে উক্ত ওয়াক্ফ কার্যকর হবে। পক্ষান্তরে সুস্থ অবস্থার ওয়াক্ফ গোটা সম্পদ হতেই কার্যকর হয়।

* সাহেবাইনের মতে ওয়াক্ফকারীর মালিকানা বিলুপ্ত হয়ে যায়। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন- ওয়াক্ফের কথা বলা মাত্রই মালিকানা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। যেমন- দাস-দাসী আজাদ করার ক্ষেত্রে আজাদ করার কথা বলা দ্বারাই মালিকানা বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং দাস-দাসী আজাদ হয়ে যায়। এটি ইমাম শাফেয়ী (র.), ইমাম মালেক (র.) ও অধিকাংশ আলেমেরও অভিমত। আল মুনয়া নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) এর মত অনুসারেই ফতোয়া প্রদান করা উচিত

ইমাম মুহাম্মাদ (র.) -এর মতে, ওয়াক্ফের সম্পদ মুতাওয়াল্লীর হাতে সোপর্দ করা আবশ্যক। কেননা ওয়াক্ফের সম্পদ (তাদের মতে) আল্লাহর মালিকানা। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এমনিতেই সব কিছুর মালিক হওয়ার কারণে বিশেষ একটি সম্পদের মালিক তাকে বানানো সম্ভব নয়। তাই সম্পদ কোনো বান্দার হাতে সোপর্দ করা হবে। এবং এরই মাধ্যমে তা আল্লাহর মালিকানায় চলে গেছে বলে সাব্যস্ত হবে। যেমন- জাকাত, সদকা। এগুলো ফকিরকে দিয়ে দেওয়া হয় এবং এর মাধ্যমে আল্লাহর হাতে পৌঁছে গেছে বলে গণ্য করা হয়।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ وَإِذَا صَحَّ الْوَقْفُ عَلَى اِخْتِلَافِهِمْ وَفِيْ بَعْضِ النُّسَخِ : وَإِذَا اُسْتُحِقَّ مَكَانَ قَوْلِهِ إِذَا صَحَّ خَرَجَ مِنْ مِلْكِ الْوَاقِفِ وَلَمْ يَدْخُلْ فِيْ مِلْكِ الْمَوْقُوْفِ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَوْ دَخَلَ فِيْ مِلْكِ الْمَوْقُوْفِ عَلَيْهِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ بَلْ يَنْفُذُ بَيْعُهُ كَسَائِرِ اَمْلَاكِهِ، وَلِأَنَّهُ لَوْ مَلَكَهُ لَمَا انْتَقَلَ عَنْهُ بِشَرْطِ الْمَالِكِ الْأَوَّلِ كَسَائِرِ أَمْلَاكِهِ . قَالَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : وَقَوْلُهُ خَرَجَ عَنْ مِلْكِ الْوَاقِفِ يَجِبُ اَنْ يَكُوْنَ قَوْلُهُمَا عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي سَبَقَ تَقْرِيْرُهُ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, **ইমামগণের মতপার্থক্য অনুযায়ী যখন ওয়াক্ফ সহীহ হয়ে যাবে** (কোনো কোনো অনুলিপিতে وإذا صح শব্দের স্থলে وإذا اُسْتُحِقَّ শব্দ রয়েছে) **তখন তা ওয়াক্ফকারীর মালিকানা থেকে বের হয়ে যাবে, কিন্তু যার নামে ওয়াক্ফ করা হয়েছে তার মালিকানায় প্রবেশ করবে না।** কেননা যদি তার মালিকানায় প্রবেশ করে তাহলে সম্পদটি তার কাছে স্থিত হয়ে থাকবে না; বরং তার মালিকানার অন্যসব সম্পত্তির মতো তাতে তার বিক্রয় কার্যকর হবে।

তাছাড়া দ্বিতীয় কারণ হলো, যদি সে এটার মালিক হয়ে যায় তাহলে প্রথম মালিকের (ওয়াক্ফকারীর) শর্ত অনুযায়ী সম্পদটি তার থেকে হস্তান্তরিত হতে পারবে না, যেমন তার অন্যান্য সম্পদ হস্তান্তরিত হয় না।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, কুদূরী (র.) যে বলেছেন, "ওয়াক্ফকারীর মালিকানা থেকে বের হয়ে যাবে" এক্ষেত্রে সাহেবাইনের মতামত তেমনই হওয়ার কথা যেমন মতপার্থক্য বর্ণনার ক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিউক্ত ইবারতের সারমর্ম হলো, ওয়াক্ফ সম্পত্তি (সাহেবাইনের মতানুসারে) ওয়াক্ফকারীর মালিকানা থেকে বের হয়ে যায়, কিন্তু যার জন্য ওয়াক্ফ করা হয়েছে তার মালিকানায়ও প্রবেশ করে না। ওয়াক্ফ সম্পত্তি যার জন্য ওয়াক্ফ করা হয়েছে তার মালিকানায় প্রবেশ না করার পেছনে দুটি দলিল রয়েছে।

১. ওয়াক্ফ সম্পত্তিটি যদি যার জন্য ওয়াক্ফ করা হয়েছে তার মালিকানা হয়ে যায়, তাহলে সে উক্ত সম্পত্তিটি বিক্রি করে দিতে পারবে। যেমন– সে তার অন্যান্য সম্পদ বিক্রি করে দিতে পারে। এমতাবস্থায় সম্পদটি তার নিকট স্থায়ী হবে না। অথচ ওয়াক্ফের উদ্দেশ্য হলো সম্পদটি তার হাতে স্থায়ী হওয়া। সুতরাং এটাই সিদ্ধান্ত যে, যার জন্য ওয়াক্ফ করা হয়েছে, ওয়াক্ফ সম্পদ তার মালিকানা হবে না। বরং সে শুধু সম্পদের মুনাফা ভোগ করতে পারবে।

২. ওয়াক্ফ সম্পদটি যদি যার জন্য ওয়াক্ফ করা হয়েছে তার মালিকানা হয়ে যায়, তাহলে ওয়াক্ফকারীর আরোপিত শর্ত অনুযায়ী সম্পদটি অন্যদের হাতে হস্তান্তরিত হতে পারবে না। যেমন তার মালিকানাধীন অন্যান্য সম্পদ কারো হাতে হস্তান্তরিত হয় না।

ধরা যাক, ওয়াক্ফকারী ব্যক্তি সম্পদ ওয়াক্ফ করার সময় শর্ত আরোপ করল যে, আমার সম্পদটি এবং বংশের ভবিষ্যৎ দরিদ্র প্রজন্মের জন্য ওয়াক্ফ। এমতাবস্থায় সম্পদটি এক প্রজন্মের হাত থেকে অপর প্রজন্মের হাতে হস্তান্তরিত হতে থাকবে এটি ওয়াক্ফকারীর আরোপিত শর্তের দাবি। সুতরাং যদি সম্পদটি প্রথম প্রজন্মের মালিকানা হয়ে যায় তাহলে তা আর পরবর্তী প্রজন্মের হাতে পৌঁছতে পারবে না। কেননা হতে পারে প্রথম প্রজন্মই তা বিক্রি করে ফেলবে। বিধায় ওয়াক্ফকারীর শর্ত বলবৎ রাখার উদ্দেশ্যে এটাই সিদ্ধান্ত যে, ওয়াক্ফ সম্পদ কারো মালিকানা হবে।

বরং যার বা যাদের জন্য ওয়াক্ফ করা হয়েছে তারা কেবলই ওয়াক্ফ সম্পদের মুনাফা ভোগ করতে পারবে।

قَالَ وَقَوْلُهُ إِذَا الخ হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, ইমাম কুদূরী (র.) যে বলেছেন, "ওয়াক্ফ যখন সহীহ হয়ে যায়, তখন ওয়াক্ফ সম্পদটি ওয়াক্ফকারীর মালিকানা হতে বেরিয়ে যায়" এ কথাটি সাহেবাইনের কথা বা মত, ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মত নয়। কেননা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে ওয়াক্ফ সম্পদ ওয়াক্ফকারীর মালিকানাধীন থাকে। যেমন চলতি অধ্যায়ের শুরুতে আলোচিত হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ وَوَقْفُ الْمُشَاعِ جَائِزٌ عِنْدَ اَبِيْ يُوْسُفَ لِاَنَّ الْقِسْمَةَ مِنْ تَمَامِ الْقَبْضِ وَالْقَبْضُ عِنْدَهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ فَكَذَا تَتِمَّتُهُ . وَقَالَ مُحَمَّدٌ (رح) : لَا يَجُوْزُ لِاَنَّ اَصْلَ الْقَبْضِ عِنْدَهُ شَرْطٌ فَكَذَا مَا يَتِمُّ بِهِ، وَهٰذَا فِيْمَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ، فَاَمَّا فِيْمَا لَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ فَيَجُوْزُ مَعَ الشُّيُوْعِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ (رح) اَيْضًا لِاَنَّهُ يَعْتَبِرُهُ بِالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ الْمُنَفَّذَةِ اِلَّا فِي الْمَسْجِدِ وَالْمَقْبَرَةِ، فَاِنَّهُ لَا يَتِمُّ مَعَ الشُّيُوْعِ فِيْمَا لَا يَحْتَمِلُ أَيْضًا عِنْدَ اَبِيْ يُوْسُفَ، لِاَنَّ بَقَاءَ الشَّرِكَةِ يَمْنَعُ الْخُلُوْصَ لِلّٰهِ تَعَالٰى، وَلِاَنَّ الْمُهَايَاةَ فِيْهِمَا فِيْ غَايَةِ الْقُبْحِ بِاَنْ يُقْبَرَ فِيْهِ الْمَوْتٰى سَنَةً، وَيُزْرَعَ سَنَةً وَيُصَلّٰى فِيْهِ فِيْ وَقْتٍ وَيُتَّخَذَ اِصْطَبْلًا فِيْ وَقْتٍ، بِخِلَافِ الْوَقْفِ لِاِمْكَانِ الْاِسْتِغْلَالِ وَقِسْمَةِ الْغَلَّةِ . وَلَوْ وَقَفَ الْكُلَّ ثُمَّ اُسْتُحِقَّ جُزْءٌ مِنْهُ بَطَلَ فِي الْبَاقِيْ عِنْدَ مُحَمَّدٍ (رح) لِاَنَّ الشُّيُوْعَ مُقَارِنٌ كَمَا فِي الْهِبَةِ، بِخِلَافِ مَا اِذَا رَجَعَ الْوَاهِبُ فِي الْبَعْضِ اَوْ رَجَعَ الْوَارِثُ فِي الثُّلُثَيْنِ بَعْدَ مَوْتِ الْمَرِيْضِ وَقَدْ وَهَبَ اَوْ وَقَفَ فِيْ مَرَضِهِ وَفِي الْمَالِ ضِيْقٌ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, আবূ ইউসুফ (র.) এর মতে এজমালী সম্পত্তি ওয়াকফ করা জায়েজ আছে। কেননা বণ্টন হচ্ছে দখল বুঝে নেওয়ার পূর্ণাঙ্গ পর্যায়। আর তার মতে দখল শর্ত নয়। সুতরাং তার পূর্ণাঙ্গ পর্যায় যেটা সেটাও শর্ত হবে না।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, এটা জায়েজ নয়। কেননা মূল দখল বুঝে নেওয়া তার মতে শর্ত সুতরাং যা দ্বারা দখল পূর্ণাঙ্গ হয় (অর্থাৎ বণ্টন) তাও শর্ত হবে।

এ মতপার্থক্য হলো সেই ক্ষেত্রে যা বণ্টনযোগ্য। পক্ষান্তরে যা বণ্টনযোগ্য নয়, সে ক্ষেত্রে ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর মতেও এজমালী অবস্থায় ওয়াকফ বৈধ হবে। কেননা এটাকে তিনি হেবার সাথে এবং কার্যকর সদকার সাথে কিয়াস করেন। মসজিদ ও কবরস্থানের বিষয়টি ভিন্ন। অর্থাৎ ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে বণ্টনযোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও এজমালি অবস্থায় ওয়াকফ সম্পন্ন হবে না। কেননা শরিকানার বিদ্যমানতা একান্তভাবে আল্লাহর জন্য হওয়ার পথে প্রতিবন্ধক। তাছাড়া এ সকল ক্ষেত্রে পালাক্রম প্রয়োগ করা অত্যন্ত ঘৃণ্য। যেমন– একবছর কবরস্থানরূপে তাতে মৃতকে দাফন করা। এরপর আবার একবছর ফসল করা কিংবা একবছর মসজিদরূপে ব্যবহার করা। আবার একবছর আস্তাবলরূপে ব্যবহার করা।

(এ দুটি ক্ষেত্র ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে এজমালি সম্পত্তি) ওয়াকফ করার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা সেটাকে কাজে লাগানো ও উৎপাদন বণ্টন করা সম্ভব।

যদি সবটুকু সম্পত্তি ওয়াকফ করা হয়, তারপর তার একাংশের কোনো হকদার প্রমাণিত হয় তাহলে ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর মতে অবশিষ্ট অংশের ওয়াকফ বাতিল হয়ে যাবে। কারণ সম্পত্তিটি ওয়াকফ করার সময় তাতে অংশীদারিত্ব বিদ্যমান ছিল, যেমন হেবার ক্ষেত্রে।

পক্ষান্তরে হেবাকারী যদি আংশিক হেবা প্রত্যাহার করে কিংবা অসুস্থ ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারীরা দুই-তৃতীয়াংশ প্রত্যাহার করে আর অবস্থা এই যে, সে মৃত্যুশয্যায় হেবা করেছিল বা ওয়াকফ করেছিল আর সম্পত্তিতেও সংকীর্ণতা রয়েছে (অর্থাৎ আর কোনো সম্পত্তি নেই) তাহলে বিষয়টি ভিন্ন হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

لِاَنَّ الشُّيُوْعَ فِيْ ذٰلِكَ طَارِئٌ . وَلَوْ اُسْتُحِقَّ جُزْءٌ مُمَيَّزٌ بِعَيْنِهٖ لَمْ يَبْطُلْ فِي الْبَاقِي لِعَدَمِ الشُّيُوْعِ وَلِهٰذَا جَازَ فِي الِابْتِدَاءِ، وَعَلٰى هٰذَا الْهِبَةُ وَالصَّدَقَةُ الْمَمْلُوْكَةُ .

অনুবাদ : কেননা এই অংশীদারিত্ব পরবর্তীকালে উদ্ভূত। আর যদি পৃথক করা সম্ভব এরূপ নির্ধারিত কোনো অংশের হকদার বের হয়ে আসে তাহলে অবশিষ্টাংশে ওয়াক্‌ফ বাতিল হবে না। কেননা এখানে অংশীদারিত্ব নেই। এ কারণেই তো প্রাথমিক অবস্থায়ও আংশিক ওয়াক্‌ফ করা বৈধ ছিল। হেবা ও মালিকানায় দিয়ে দেওয়া সদকা সম্পর্কেও একই কথা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিউক্ত ইবারত মোট তিনটি মাসআলা বর্ণিত হয়েছে।
১. এজমালি সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করা জায়েজ কি-না?
২. ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তিতে অনির্ধারিত অংশের হকদার বের হলে উক্ত ওয়াক্‌ফের হুকুম কী?
৩. ওয়াক্‌ফ সম্পত্তিতে নির্ধারিত অংশের হকদার বের হলে তার হুকুম কি?
মাসআলা তিনটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা নিম্নরূপ :

মাসআলা নং-১. : وَقْفُ الْمُشَاعِ جَائِزٌ عِنْدَ اَبِيْ الخ মূল মাসআলায় প্রবেশের পূর্বে জেনে নেওয়া আবশ্যক যে, اَلْمُشَاعُ শব্দটি اسم مفعول -এর সীগাহ, মাসদার হলো الاشاعة। অর্থ হলো– ছড়ানো, বিস্তার করা, প্রসারিত করা। সে হিসাবে اَلْمُشَاعُ শব্দের অর্থ হচ্ছে যাকে ছড়িয়ে রাখা হয়েছে। আবার المشاع শব্দটি اسم ظرف ও হতে পারে। তখন তার অর্থ হবে– যে স্থানে কোনো কিছু ছড়িয়ে রাখা হয়। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে শব্দটির অর্থ করা হয় এজমালি সম্পত্তি বা অবণ্টিত সম্পত্তি বলে। সংজ্ঞা হিসাবে বলা যায়, যে সম্পদে একাধিক ব্যক্তির মালিকানা থাকে কিন্তু প্রত্যেকের মালিকানাধীন অংশ অপর মালিকের অংশ হতে পৃথক করা হয় না, বরং সম্পদটি সকল মালিকের মাঝে অবণ্টিত অবস্থায় মালিকানাধীন থাকে, সে সম্পদকেই مشاع বা এজমালী সম্পদ বলা হয়। সুতরাং যেন উক্ত সম্পদে সকল মালিকের মালিকানা ছড়ানো অবস্থায় বিদ্যমান থাকে। যেমন– ধরা যাক পিতা মৃত্যুবরণ করেছে এবং উত্তরাধিকার হিসাবে একবিঘা জমি রেখে গেছে। মৃত ব্যক্তির তিন ছেলে আছে। এমতাবস্থায় মৃতের উত্তরাধিকারী হিসাবে তিন ছেলেই পিতার রেখে যাওয়া একবিঘা জমির মালিক। এরপর যতদিন পর্যন্ত জমিটি তিন ছেলের মাঝে বণ্টন করা না হবে অর্থাৎ জমিটির কোন অংশ কোন ছেলের এভাবে নির্ধারণ করে না দেওয়া হবে, ততদিন পর্যন্ত জমিটি مشاع বা এজমালী তথা অবণ্টিত সম্পদ বলে গণ্য হবে। এরপর যখন জমিটির একেক অংশ একেক ছেলের মালিকানা রূপে নির্ধারণ করে দেওয়া হবে তখন তা আর এজমালি বা مشاع থাকবে না; বরং তা হয়ে যাবে বণ্টিত সম্পত্তি।

চিত্রাকারে মুশা' ও বণ্টিত সম্পত্তির নমুনা

১. এজমালি যায়েদ, ওমর, বকর	২. বণ্টিত যায়েদ, ওমর, বকর		
মালিকত্রয়	মালিকত্রয়		
মুশা' বা ইজমালি সম্পত্তি	যায়েদের অংশ	ওমরের অংশ	বকরের অংশ

মূল মাসআলা : ইজমালী বা অবণ্টিত শরিকানা সম্পদ ওয়াক্‌ফ করা জায়েজ আছে কি-না? এ ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে।

ইমাম আবূ ইউসুফ, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর মতে অবণ্টিত সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করা জায়েজ আছে।

পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মাদ (র.)-এর মতে অবণ্টিত সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করা জায়েজ নয়।

এ মতপার্থক্যটি মূলতঃ আরেকটি মতপার্থক্যের উপর ভিত্তি করে হয়েছে। তাহলো এই যে, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) এর মতে ওয়াক্‌ফ সহীহ হওয়ার জন্য ওয়াক্‌ফকৃত সম্পদ কবজা করা শর্ত নয়। তাই কবজার পরিপূরক বিষয় অর্থাৎ

https://e-ilm.weebly.com/

বন্টনও তার মতে আবশ্যক নয়। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর মতে ওয়াক্ফ সহীহ হওয়ার জন্য কবজা শর্ত। তাই তার মতে কবজার পরিপূরক বিষয় বন্টনও শর্ত।

এই মতপার্থক্য ঐ সম্পদের ক্ষেত্রে যা বন্টন করার উপযুক্ত, যেমন- বড় ঘর, বাড়ি, ফসলি-ভূমি ইত্যাদি। পক্ষান্তরে যদি সম্পদটি বন্টনযোগ্য না হয় অর্থাৎ খুব ছোট হয় যেমন- গোসলখানা, কূপ ইত্যাদি তাহলে তা অবন্টিত অবস্থায় ওয়াক্ফ করা জায়েজ হবে সর্বসম্মতিক্রমে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর মতও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতের অনুরূপ।

বন্টনের অযোগ্য সম্পদের ওয়াক্ফকে ইমাম মুহাম্মাদ (র.) হেবা এবং কার্যকর সদকার সাথে কিয়াস করেন। অর্থাৎ তিনি বলেন, অবন্টিত কোনো সম্পত্তি যদি হেবা করা হয় বা সদকা হিসাবে ফকিরের হাতে তুলে দেওয়া হয়, তাহলে তা যেমন জায়েজ হয়ে যায়, তেমনি বন্টন অযোগ্য সম্পদ ওয়াক্ফ করা হলেও তা জায়েজ হয়ে যাবে।

إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ وَالْمَقْبَرَةِ কিন্তু বন্টন অযোগ্য সম্পদটি মসজিদ কিংবা কবরস্থান হিসাবে ওয়াক্ফ করা হলে তা জায়েজ হবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতেও জায়েজ হবে না। কেননা মসজিদ হিসাবে ওয়াক্ফকৃত জমি নিরেট আল্লাহর হক হিসাবে গণ্য হয়। অতএব, যদি সম্পদটি এজমালি হয় তাহলে তা নিরেট আল্লাহর হক হতে পারে না। আবার এজমালি সম্পদ হিসাবে তা পালাক্রমে ভোগ করাও সম্ভব নয়। কেননা কবরস্থানকে পালাক্রমে ভোগ করতে গেলে এরূপ হবে যে, ওয়াক্ফকৃত সম্পদ হিসাবে তাতে এক বছর মুর্দা দাফন করা হবে, পরে আরেক বছর শরিকদার ব্যক্তি তাতে চাষাবাদ করবে। কিংবা ওয়াক্ফ সম্পদ হিসাবে এক বছর জায়গাটি মসজিদরূপে ব্যবহৃত হবে, পরে আরেক বছর শরিকদার ব্যক্তি তা গরু-ছাগলের গোয়াল বা খোয়াড় হিসাবে ব্যবহার করবে। বলাবাহুল্য যে, এরূপ ব্যবহার অতি জঘন্য। তাই ইমামগণ এ ব্যাপারে একমত যে, বন্টনের অযোগ্য এজমালী সম্পত্তি মসজিদ বা কবরস্থান হিসাবে ওয়াক্ফ করা দুরস্ত নয়।

بِخِلَافِ الْوَقْفِ لِإِمْكَانِ الخ পক্ষান্তরে যদি উপরিউক্ত ধরনের সম্পদ মসজিদ ও কবরস্থান ছাড়া অন্য কোনো খাতে ওয়াক্ফ করা হয় তাহলে তা জায়েজ হবে। কেননা তখন সম্পদটি পালাক্রমে ব্যবহার করা কিংবা তার মুনাফা বন্টন করার সম্ভব। যেমন- ওয়াক্ফ সম্পদটি কারো নিকট লিজ দিয়ে দেওয়া হলো এবং এ থেকে প্রাপ্ত অর্থ ভাগাভাগি করে নিয়ে গেল। যাদের জন্য ওয়াক্ফ করা হয়েছে তারা কিছু নিল, আর শরিকদার কিছু নিল, এমনটি সম্ভব। বিধায় মসজিদ ও কবরস্থান ছাড়া সাধারণ খাতে বন্টনের অযোগ্য এজমালি সম্পদ ওয়াক্ফ করা জায়েজ আছে।

মাসআলা নং ২ : وَلَوْ وَقَفَ الْكُلَّ ثُمَّ اسْتُحِقَّ جُزْءٌ الخ কেউ একটি জমি ওয়াক্ফ করল, কিছুদিন পর উক্ত জমির কোনো হকদার বেরিয়ে আসল। যেমন- কেউ প্রমাণ করল যে, সে উক্ত জমির এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশের হকদার, এমতাবস্থায় ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, জমিটির অবশিষ্ট অংশের ওয়াক্ফও বাতিল হয়ে যাবে। কেননা হকদার বের হওয়ার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, জমিটি ওয়াক্ফ করার সময় এজমালি ছিল। আর এজমালি সম্পদ ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে ওয়াক্ফ করা জায়েজ নয়, তাই এজমালি প্রমাণিত হওয়ার দ্বারা ওয়াক্ফ বাতিল হয়ে যাবে।

পক্ষান্তরে যদি এজমালি অবস্থাটি পরে উদ্ভূত হয় তাহলে ওয়াক্ফ বাতিল হবে না। যেমন- কেউ একটি সম্পদ হেবা করল। কয়েকদিন পর অর্ধেক সম্পদের বা এক-তৃতীয়াংশ সম্পদের হেবা রুজু করল। এমতাবস্থায় অবশিষ্ট সম্পদের হেবা বাতিল হবে না। যতটুকু সম্পদের হেবা রুজু করেছে কেবল ততটুকু হেবাই বাতিল হবে।

কিংবা যেমন কোনো ব্যক্তি অন্তিম রোগে আক্রান্ত অবস্থায় গোটা সম্পদ ওয়াক্ফ করে দিল বা হেবা করল। হেবাকারীর বা ওয়াক্ফকারীর মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারীরা দুই-তৃতীয়াংশ সম্পদের হেবা কিংবা ওয়াক্ফ রুজু করল। ফলে হেবাকৃত কিংবা ওয়াক্ফকৃত সম্পদটি এজমালি হয়ে গেল। এমতাবস্থায় রুজুকৃত অংশটুকুর হেবা এবং ওয়াক্ফ বাতিল হয়ে যাবে, কিন্তু অবশিষ্টাংশের হেবা-ওয়াক্ফ বাতিল হবে না।

মোটকথা, হেবা কিংবা ওয়াক্ফের গোড়াতেই যদি এজমালি অবস্থা বিদ্যমান থাকে, তাহলে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে ওয়াক্ফ বাতিল হয়ে যায়। কিন্তু পরবর্তীতে সৃষ্ট এজমালি অবস্থা দ্বারা পূর্বকৃত হেবা এবং ওয়াক্ফ বাতিল হয় না।

মাসআলা নং ৩ : وَلَوْ اسْتُحِقَّ جُزْءٌ مُعَيَّنٌ الخ ওয়াক্ফকৃত বা হেবাকৃত সম্পত্তিতে যদি নির্দিষ্ট একটি অংশের হকদার বের হয়ে আসে তাহলে এর দ্বারা অবশিষ্টাংশের ওয়াক্ফ বা হেবা বাতিল হবে না। যেমন- কোনো ব্যক্তি এক-বিঘা জমি ওয়াক্ফ করল। কিছুদিন পরে একজন প্রমাণ করল যে, ওয়াক্ফকৃত জমিটির পূর্বপার্শ্ব থেকে সে অর্ধেকের মালিক। এমতাবস্থায় পূর্বপার্শ্ব থেকে অর্ধেক জমিতে ওয়াক্ফ বাতিল হয়ে যাবে এবং তা দাবিদারের মালিকানা বলে গণ্য হবে। আর পশ্চিমপার্শ্ব থেকে বাকি অর্ধেক জমিতে ওয়াক্ফ বহাল থাকবে। কারণ আলোচ্য সুরতে সম্পদটি এজমালি হয়নি। এ কারণে ওয়াক্ফকারীর জন্য জায়েজ আছে যে, সে প্রথমেই অর্ধেক জমি ওয়াক্ফ করতে পারে।

হেবাকৃত সম্পদে কিংবা ফকিরের হাতে তুলে দিয়ে তার মালিকানাধীন করে দেওয়া হয়েছে এমন সম্পদে যদি নির্দিষ্ট অংশের দাবিদার বের হয় তাহলেও তার হুকুম ওয়াক্ফের অনুরূপ। অর্থাৎ দাবিদারের অংশে হেবা বাতিল হবে। বাকি অংশে হেবা বাতিল হবে না, বহাল থাকবে।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ : وَلَا يَتِمُّ الْوَقْفُ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ حَتّٰى يَجْعَلَ اٰخِرَهُ بِجِهَةٍ لَا تَنْقَطِعُ اَبَدًا .

وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ (رحـ) : اِذَا سَمّٰى فِيْهِ جِهَةً تَنْقَطِعُ جَازَ وَصَارَ بَعْدَهَا لِلْفُقَرَاءِ وَاِنْ لَمْ يُسَمِّهِمْ. لَهُمَا اَنَّ مُوْجَبَ الْوَقْفِ زَوَالُ الْمِلْكِ بِدُوْنِ التَّمْلِيْكِ وَاَنَّهُ يَتَاَبَّدُ كَالْعِتْقِ. فَاِذَا كَانَتِ الْجِهَةُ يُتَوَهَّمُ انْقِطَاعُهَا لَا يَتَوَفَّرُ عَلَيْهِ مُقْتَضَاهُ، فَلِهٰذَا كَانَ التَّوْقِيْتُ مُبْطِلًا لَهُ كَالتَّوْقِيْتِ فِي الْبَيْعِ . وَلِاَبِيْ يُوْسُفَ اَنَّ الْمَقْصُوْدَ هُوَ التَّقَرُّبُ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى وَهُوَ مُوَفَّرٌ عَلَيْهِ، لِاَنَّ التَّقَرُّبَ تَارَةً يَكُوْنُ فِي الصَّرْفِ اِلٰى جِهَةٍ تَنْقَطِعُ وَمَرَّةً بِالصَّرْفِ اِلٰى جِهَةٍ تَتَاَبَّدُ فَيَصِحُّ فِي الْوَجْهَيْنِ وَقِيْلَ اِنَّ التَّاْبِيْدَ شَرْطٌ بِالْاِجْمَاعِ، اِلَّا اَنَّ عِنْدَ اَبِيْ يُوْسُفَ لَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ التَّاْبِيْدِ لِاَنَّ لَفْظَةَ الْوَقْفِ وَالصَّدَقَةِ مُبْنِيَةٌ عَنْهُ لِمَا بَيَّنَّا اَنَّهُ اِزَالَةُ الْمِلْكِ بِدُوْنِ التَّمْلِيْكِ كَالْعِتْقِ، وَلِهٰذَا قَالَ فِي الْكِتَابِ فِيْ بَيَانِ قَوْلِهِ وَصَارَ بَعْدَهَا لِلْفُقَرَاءِ وَاِنْ لَمْ يُسَمِّهِمْ، وَهٰذَا هُوَ الصَّحِيْحُ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ (رحـ) ذِكْرُ التَّاْبِيْدِ شَرْطٌ لِاَنَّ هٰذَا صَدَقَةٌ بِالْمَنْفَعَةِ اَوْ بِالْغَلَّةِ، وَذٰلِكَ قَدْ يَكُوْنُ مُؤَقَّتًا وَقَدْ يَكُوْنُ مُؤَبَّدًا فَمُطْلَقُهُ لَايَنْصَرِفُ اِلَى التَّاْبِيْدِ فَلَا بُدَّ مِنَ التَّنْصِيْصِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মতে ওয়াক্ফ পূর্ণতা লাভ করবে না যদি তার শেষে চিরস্থায়ী কোনো দিক বা খাত উল্লেখ না করে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, অস্থায়ী কোনো খাত উল্লেখ করলেও ওয়াক্ফ জায়েজ হয়ে যাবে। অতঃপর ঐখাত বন্ধ হয়ে গেলে তা গরিব-মিসকিনদের জন্য হয়ে যাবে। যদিও (ওয়াক্ফ করার সময়) তাদের কথা উল্লেখ না করে থাকে।

তারফাইনের দলিল এই যে, ওয়াক্ফের দাবি হলো নতুন কোনো মালিকানায় অন্তর্ভুক্তি ছাড়াই মালিকানা বিলুপ্ত হওয়া। আর তা হবে চিরস্থায়ীভাবে দাস-দাসী মুক্ত করার ন্যায়। সুতরাং (উল্লেখকৃত) খাতটি যদি বন্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাপূর্ণ হয়, তাহলে সেখানে ওয়াক্ফের দাবি পূর্ণ হয় না। এ কারণেই সাময়িক বিক্রির ন্যায় সাময়িক ওয়াক্ফও বাতিল বলে গণ্য হবে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল এই যে, আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা। আর তা এখানে বিদ্যমান আছে। কেননা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন কখনো অস্থায়ী খাতে ওয়াক্ফ করার মাধ্যমে হয়, আবার কখনো স্থায়ী খাতে ওয়াক্ফ করার মাধ্যমে হয়। সুতরাং ওয়াক্ফের দুই সুরতই বৈধ হবে।

আর কেউ কেউ বলেন, ওয়াক্ফের খাত চিরস্থায়ী হওয়া সর্বসম্মতিক্রমেই শর্ত। তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে চিরস্থায়ী হওয়ার কথা উল্লেখ করা শর্ত নয়। কারণ ওয়াক্ফ এবং সদকার শব্দই তা চিরস্থায়ী হওয়ার বিষয়টি বুঝিয়ে থাকে। এর কারণ আমরা পূর্বে বর্ণনা করে এসেছি যে, দাস মুক্তির ন্যায় এটাও হচ্ছে মালিকানায় অর্পণ ব্যতীত বিদ্যমান মালিকানা রহিতকরণ। এ কারণেই কুদূরী কিতাবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মত বর্ণনাকালে বলা হয়েছে যে, পরবর্তীতে তা গরিব-মিসকিনদের জন্য হয়ে যাবে যদিও তাদের কথা উল্লেখ না করা হয়। আর এটাই বিশুদ্ধ অভিমত।

আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে চিরস্থায়ী খাত উল্লেখ করা শর্ত। কেননা ওয়াক্ফ হচ্ছে মুনাফা বা ফসল সদকা করা। তা সাময়িক হতে পারে, স্থায়ীভাবেও হতে পারে। সুতরাং নিঃশর্ত ওয়াক্ফকে স্থায়ী ওয়াক্ফের অভিমুখী করে দেওয়া সম্ভব নয়। তাই স্থায়িত্বের বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা আবশ্যক।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিউক্ত ইবারতে একটি ইখতিলাফী মাসআলা আলোচিত হয়েছে। যার সারমর্ম হলো এই যে, ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, ওয়াক্‌ফ পূর্ণতা লাভ করার জন্য শর্ত হলো, ওয়াক্‌ফ করার সময় এমন একটি খাত উল্লেখ করা যা কখনো শেষ হবে না। যেমন– এভাবে বলা যে, "আমার ওয়াক্‌ফ সম্পদটি গরিব-মিসকিন, দীন শিক্ষার্থীদের জন্য ওয়াক্‌ফ করা হলো।" এমন বলার দ্বারা একটি স্থায়ী খাত উল্লেখ করা হলো, কেননা গরিব, মিসকিন, দীন শিক্ষার্থী ইত্যাদির ধারা সব সময়ই থাকবে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, চিরস্থায়ী খাত উল্লেখ করা শর্ত নয়। এরকম শর্ত উল্লেখ ছাড়াও ওয়াক্‌ফ পূর্ণ হয়ে যায়। তাই যদি কেউ কোনো সম্পদ অস্থায়ী কোনো খাতে ওয়াক্‌ফ করে, যেমন– নিজের ছেলের জন্য, কিংবা নিজের ভাইয়ের জন্য অথবা নির্দিষ্ট একটি মাদরাসার জন্য, তাহলে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে সেই ওয়াক্‌ফ শুদ্ধ হবে। এরপর যখন তার ভাই বা ছেলে না থাকবে কিংবা নির্দিষ্ট মাদরাসাটি বন্ধ হয়ে যাবে, তখন ওয়াক্‌ফ সম্পদ সাধারণ গরিব-মিসকিন ও যে কোনো মাদরাসার জন্য হয়ে যাবে। যদিও তাদের কথা ওয়াক্‌ফকারী ব্যক্তি ওয়াক্‌ফের সময় উল্লেখ করেনি।

দলিল পর্ব : ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর দলিল হলো এই যে, ওয়াক্‌ফ করার অর্থ হলো নিজের সম্পদের উপর অন্যের মালিকানা প্রতিষ্ঠা করা ব্যতীত নিজের মালিকানা বিলুপ্ত করে দেওয়া। এ বিষয়টির দাবি হলো চিরস্থায়ী হওয়া। যেমন– গোলাম-বাদী আজাদ করলে মালিকানা বিলুপ্ত হয়ে থাকে এবং তা চিরস্থায়ীভাবে হয়ে থাকে। ওয়াক্‌ফের মধ্যেও তেমনি হওয়া উচিত।

সুতরাং যদি ওয়াক্‌ফের জন্য এমন কোনো খাত উল্লেখ করা হয়, যা কিছুকাল পর শেষ হয়ে যাবে, তাহলে ওয়াক্‌ফের দাবি পূরণ হয় না তথা ওয়াক্‌ফটি চিরস্থায়ী হয় না। বিধায় ওয়াক্‌ফ শুদ্ধ হবে না। যেমন- কেউ যদি দশ-বিশ বছরের জন্য ওয়াক্‌ফ করে তাহলে শুদ্ধ হয় না।

চিরস্থায়ী না হওয়ার কারণে অশুদ্ধ হওয়ার একটি নযীর হলো বিক্রয় অর্থাৎ ক্রয়বিক্রয় চিরস্থায়ী হতে হয়। কেউ যদি কোনো পণ্য একমাসের জন্য বা পনের দিনের জন্য বিক্রি করে তাহলে তা শুদ্ধ হয় না। তেমনি ওয়াক্‌ফও চিরস্থায়ী হতে হয়। অতএব, তার জন্য চিরস্থায়ী খাত উল্লেখ করা আবশ্যক। চিরস্থায়ী খাত উল্লেখ করা না হলে তা শুদ্ধ হবে না।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল হলো এই যে, ওয়াক্‌ফের আসল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জন করা। এটি দু-ভাবে হয়ে থাকে। অস্থায়ী খাতে সম্পদ ব্যয় করার মাধ্যমেও হতে পারে। স্থায়ী খাতে ব্যয় করার মাধ্যমেও হতে পারে। অতএব, ওয়াক্‌ফের সময় স্থায়ী খাতের কথা উল্লেখ করা হোক কিংবা অস্থায়ী খাতের কথা উল্লেখ করা হোক, উভয় অবস্থায় ওয়াক্‌ফ সহীহ হয়ে যাবে।

কতিপয় মাশায়েখ বলেছেন, ওয়াক্‌ফ চিরস্থায়ীভাবে হওয়া সকলের মতেই শর্ত। কিন্তু মতপার্থক্য হলো এতটুকু যে, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, ওয়াক্‌ফ করার সময় তা চিরস্থায়ী হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট শব্দে উল্লেখ করা জরুরি নয়। কারণ ওয়াক্‌ফ শব্দ থেকে বুঝা যায় যে, এটা চিরস্থায়ী বিষয়। কেননা পূর্বে বলা হয়েছে যে, ওয়াক্‌ফের অর্থ হলো অন্যের মালিকানায় প্রবেশ করানো ব্যতীত নিজের মালিকানা বিলুপ্ত করে দেওয়া। এটা কখনো সাময়িক হতে পারে না। কেবলই চিরস্থায়ী হতে পারে। অতএব, চিরস্থায়ী হওয়ার কথা পৃথকভাবে বলার প্রয়োজন নেই। যেমন- দাস-দাসী আজাদ করার বিষয়টি চিরস্থায়ী হয়ে থাকে। কিন্তু সেখানে চিরস্থায়ী হওয়ার কথা উল্লেখ করতে হয় না। আজাদ করার ঘোষণা দিলেই তা কার্যকর হয়ে যায়। তদ্রূপ ওয়াক্‌ফের ক্ষেত্রেও হওয়া বাঞ্ছনীয়।

তাই ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মাযহাব বর্ণনার ক্ষেত্রে কুদূরী কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ওয়াক্‌ফ করার সময় যদি কোনো অস্থায়ী খাত উল্লেখ করা হয় তাহলেও ওয়াক্‌ফ সহীহ হয়ে যাবে। পরবর্তীকালে যখন উল্লিখিত খাতটি বন্ধ হয়ে যাবে তখন ওয়াক্‌ফটি গরিব-মিসকিনদের জন্য বলে গণ্য হবে এবং তা স্থায়ীভাবে চলতে থাকবে। যদিও ওয়াক্‌ফের সময় গরিব-মিসকিনদের কথা উল্লেখ করা না হয়। আর এটিই বিশুদ্ধ অভিমত।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, ওয়াক্‌ফ মানে হলো সম্পদের মুনাফা সদকা করা। এটা স্থায়ীভাবে হতে পারে, অস্থায়ীভাবেও হতে পারে। অতএব, স্থায়ী বা অস্থায়ী হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট করে উল্লেখ করা জরুরি। যদি স্থায়ীভাবে হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট উল্লেখ করে তাহলে তা ওয়াক্‌ফ হবে। যদি স্থায়ী-অস্থায়ী কিছুই না বলে তাহলে তা স্থায়ী হিসাবে ধরে নেওয়া হবে না। কেননা তা অস্থায়ীভাবে হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলসহ অধিকাংশ আলেমের মতামত হলো, স্থায়ী-অস্থায়ী কিছুই উল্লেখ করা না হলে তা স্থায়ী বলে গণ্য হবে, যা ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর অভিমত। সুতরাং এ মাসআলায় ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতই অগ্রগণ্য। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ وَيَجُوْزُ وَقْفُ الْعَقَارِ لِاَنَّ جَمَاعَةً مِنَ الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَقَفُوْهُ وَلَا يَجُوْزُ وَقْفُ مَا يُنْقَلُ وَيُحَوَّلُ قَالَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : وَهٰذَا عَلَى الْاِرْسَالِ قَوْلُ اَبِيْ حَنِيْفَةَ وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ : اِذَا وَقَفَ ضَيْعَةً بِبَقَرِهَا وَاُكْرَتِهَا وَهُمْ عَبِيْدُهٗ جَازَ وَكَذَا سَائِرُ اٰلَاتِ الْحِرَاثَةِ لِاَنَّهٗ تَبَعٌ لِلْاَرْضِ فِيْ تَحْصِيْلِ مَا هُوَ الْمَقْصُوْدُ، وَقَدْ يَثْبُتُ مِنَ الْحُكْمِ تَبَعًا مَا لَا يَثْبُتُ مَقْصُوْدًا كَالشُّرْبِ فِي الْبَيْعِ وَالْبِنَاءِ فِي الْوَقْفِ، وَمُحَمَّدٌ (رح) مَعَهٗ فِيْهِ، لِاَنَّهٗ لَمَّا جَازَ اِفْرَادُ بَعْضِ الْمَنْقُوْلِ بِالْوَقْفِ عِنْدَهٗ فَلَاَنْ يَجُوْزَ الْوَقْفُ فِيْهِ تَبَعًا اَوْلٰى.

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ভূ-সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করা বৈধ আছে। কেননা সাহাবীদের এক জামাত তা করেছেন। **স্থানান্তরযোগ্য এবং অস্থাবর সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করা জায়েজ নেই।** হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, সর্বাবস্থায় এটা নাজায়েজ হওয়া ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মত। **পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেছেন, যদি কেউ হালের বলদ ও চাষীদেরসহ জমি ওয়াক্‌ফ করে এবং চাষীরা ওয়াক্‌ফকারীর গোলাম হয়, তাহলে সে ওয়াক্‌ফ জায়েজ আছে।**

চাষাবাদের অন্যান্য উপকরণ সম্পর্কেও একই কথা। কেননা জমির উদ্দেশ্য তথা ফসল অর্জন করার ক্ষেত্রে এগুলো হচ্ছে জমির অনুবর্তী সামগ্রী। আর অনুবর্তীরূপে এমন সকল বিধান সাব্যস্ত হয়, যা স্বতন্ত্র উদ্দেশ্যরূপে সাব্যস্ত হয় না। যেমন– বিক্রির ক্ষেত্রে সেচ অধিকার অন্তর্ভুক্ত হওয়া এবং ওয়াক্‌ফের ক্ষেত্রে ভবন অন্তর্ভুক্ত হওয়া।

এ মাসআলায় ইমাম মুহাম্মদ (র.) ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর সাথে। কেননা তাঁর মতে কিছু কিছু স্থানান্তরযোগ্য বস্তু যখন স্বতন্ত্রভাবে ওয়াক্‌ফ করা বৈধ, তখন অনুবর্তী হিসাবে ওয়াক্‌ফ করা আরো উত্তমরূপে বৈধ হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

জমি এবং যে কোনো স্থাবর সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করা জায়েজ, কেননা অনেক সাহাবী স্থাবর সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করেছেন। 'হযরত আরকাম ইবনে আবিল আরকাম' এ সকল সাহাবীদের অন্যতম। তার ছেলে উসমান বর্ণনা করেন, আমার পিতা ছয়জনের পরে ইসলাম গ্রহণকারী সপ্তম মুসলমান। (সাফা) এলাকায় তার একটি বাড়ি ছিল। যেখানে রাসূল ﷺ থাকতেন এবং লোকদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতেন, তা'লীম দিতেন। অনেকেই সেই বাড়িতে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। হযরত ওমর (রা.)ও তাদের একজন। এমনকি বাড়িটির নামই রাখা হয়েছিল দারুল ইসলাম। পরবর্তী কালে হযরত আরকাম (রা.) বাড়িটি নিজ সন্তানদের জন্য ওয়াক্‌ফ করেছিলেন।– (হাকেম)

প্রসিদ্ধ সাহাবী তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান গনী (রা.)-এর ঘটনা প্রসিদ্ধ আছে যে, তিনি পঁয়ত্রিশ হাজার দিরহামের বিনিময়ে বীরে রূমাহ (একটি কূপ বিশেষ) ক্রয় করে ওয়াক্‌ফ করেছিলেন। তা আজ অবধি বিদ্যমান।

হযরত যুবাইর (রা)-এর ওয়াক্‌ফ সম্পর্কিত হাদীস বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে। হযরত আবূ বকর (রা) তার মক্কার বাড়ি, হযরত ওমর (রা) নিজের জমি এবং হযরত আলী (রা) মক্কা, মিশর ও মদীনায় অবস্থিত নিজ বাড়ি, জমিন ও অন্যান্য মালামাল সন্তানদের জন্য ওয়াক্‌ফ করেছেন।

বুখারী শরীফে হযরত আমর ইবনুল আস (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মৃত্যুর সময় দিরহাম-দিনার, দাস-দাসী ও অন্য কোনো সম্পদই রেখে যাননি। তবে একটি সাদা খচ্চর ছিল, যার উপর তিনি আরোহণ করে কোথাও যেতেন। কিছু অস্ত্র ছিল আর একটি জমি ছিল, যা তিনি আল্লাহর রাস্তায় সদকা করেছিলেন।

https://e-ilm.weebly.com/

قَوْلُهُ : وَلَا يَجُوزُ وَقْفُ مَا يَنْتَقِلُ وَيُحَوَّلُ الخ : উপরিউক্ত ইবারতে একটি ইখতিলাফী মাসআলা আলোচনা করা হয়েছে। মাসআলাটি হলো, স্থানান্তরযোগ্য ও অস্থাবর সম্পত্তি ওয়াক্ফ করা জায়েজ আছে কিনা ? এ ব্যাপারে দুটি মত রয়েছে–

১. ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, কোনো অবস্থাতেই স্থানান্তরযোগ্য এবং অস্থাবর সম্পদের ওয়াক্ফ সহীহ হবে না।

২. ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, স্থাবর সম্পদের অনুগামী হিসাবে অস্থাবর সম্পদ ওয়াক্ফ করলে সহীহ হবে। যেমন- কেউ যদি জমি ওয়াক্ফ করে এবং তার সাথে হালের বলদ ও চাষী গোলামও ওয়াক্ফ করে তাহলে তা জায়েজ হবে। অনুরূপভাবে জমির সাথে যদি হালচাষের অন্যান্য আসবাব বা উপকরণ ওয়াক্ফ করা হয় তাহলেও সহীহ হবে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর যুক্তি হলো, অনেক হুকুম রয়েছে যা স্বতন্ত্রভাবে সাব্যস্ত হয় না, কিন্তু অন্যের অনুগামী হিসাবে সাব্যস্ত হয়। যেমন– শুধু সেচের অধিকার বিক্রি করা জায়েজ হয় না। কিন্তু জমি বিক্রি করা হলে জমির সাথে সেচের অধিকারও বিক্রি হয়ে থাকে। তদ্রূপ শুধু ভবন ওয়াক্ফ করা জায়েজ হয় না, কিন্তু ভূমি ওয়াফ্ক করা হলে ভূমির সাথে ভবনও ওয়াক্ফ হয়ে যায়।

সুতরাং আলোচ্য মাসআলায়ও হালের বলদ বা অন্যান্য আসবাব যদিও স্বতন্ত্রভাবে ওয়াক্ফ করা জায়েজ নয়, কিন্তু জমির সাথে অনুগামী রূপে ওয়াক্ফ করা হলে জায়েজ হবে।

এ মাসআলায় ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মত ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতের অনুরূপ। কারণ, ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে কুরআনের কপি, মুর্দার খাটিয়া, কুড়াল, করাত এ জাতীয় অস্থাবর বস্তু স্বতন্ত্রভাবেই ওয়াক্ফ করা জায়েজ আছে। সুতরাং স্থাবর সম্পদের অনুবর্তীরূপে ওয়াক্ফ করা হলে আরো উত্তমরূপে জায়েজ হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَقَالَ مُحَمَّدٌ (رحـ) : يَجُوْزُ حَبْسُ الْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ مَعْنَاهُ وَقْفُهُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، وَاَبُوْ يُوْسُفَ (رحـ) مَعَهُ فِيْهِ عَلٰى مَا قَالُوْا، وَهُوَ اِسْتِحْسَانٌ . وَالْقِيَاسُ اَنْ لَا يَجُوْزَ لِمَا بَيَّنَّاهُ مِنْ قَبْلُ . وَوَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ الْاٰثَارُ الْمَشْهُوْرَةُ فِيْهِ : مِنْهَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ ﴿وَاَمَّا خَالِدٌ فَقَدْ حَبَسَ اَدْرُعًا وَاَفْرَاسًا لَهُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَطَلْحَةُ حَبَسَ دُرُوْعَهُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى﴾ وَيُرْوٰى وَاَكْرَاعَهُ . وَالْكُرَاعُ : الْخَيْلُ . وَيَدْخُلُ فِيْ حُكْمِهِ الْاِبِلُ؛ لِاَنَّ الْعَرَبَ يُجَاهِدُوْنَ عَلَيْهَا، وَكَذَا السِّلَاحُ يُحْمَلُ عَلَيْهَا وَعَنْ مُحَمَّدٍ (رحـ) اَنَّهُ يَجُوْزُ وَقْفُ مَا فِيْهِ تَعَامُلٌ مِنَ الْمَنْقُوْلَاتِ كَالْفَاْسِ وَالْمَرِّ وَالْقَدُوْمِ وَالْمِنْشَارِ وَالْجِنَازَةِ وَثِيَابِهَا وَالْقُدُوْرِ وَالْمَرَاجِلِ وَالْمَصَاحِفِ . وَعِنْدَ اَبِيْ يُوْسُفَ (رحـ) لَا يَجُوْزُ؛ لِاَنَّ الْقِيَاسَ اِنَّمَا يُتْرَكُ بِالنَّصِّ، وَالنَّصُّ وَرَدَ فِي الْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ فَيُقْتَصَرُ عَلَيْهِ . وَمُحَمَّدٌ (رح) يَقُوْلُ : الْقِيَاسُ قَدْ يُتْرَكُ بِالتَّعَامُلِ كَمَا فِي الِاسْتِصْنَاعِ، وَقَدْ وُجِدَ التَّعَامُلُ فِيْ هٰذِهِ الْاَشْيَاءِ .

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, ঘোড়া ও অস্ত্র আবদ্ধ করা জায়েজ আছে। (حبس) এর অর্থ হলো আল্লাহর রাস্তায় ওয়াক্‌ফ করা। মাশায়েখগণের বর্ণনা মতে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) এ ক্ষেত্রে তার সাথে রয়েছেন। আর এটি সূক্ষ্ম কিয়াসের দাবি। সাধারণ কিয়াসের দাবি হলো জায়েজ না হওয়া। এর কারণ আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি।

সূক্ষ্ম কিয়াসের ভিত্তি হচ্ছে এ সম্পর্কিত মাশহূর হাদীসসমূহ। তন্মধ্যে একটি এই যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন–

وَأَمَّا خَالِدٌ فَقَدْ حَبَسَ أَدْرُعًا وَأَفْرَاسًا لَه فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَطَلْحَةُ حَبَسَ دُرُوْعَهُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى

অর্থাৎ আর খালেদ তো তার কিছু বর্ম ও ঘোড়া আল্লাহর রাস্তায় আবদ্ধ রেখেছে (ওয়াক্‌ফ করেছে)। আর তালহা তার বর্মসমূহ আল্লাহর রাস্তায় ওয়াক্‌ফ করেছে। কোনো কোনো বর্ণনায় وَأَكْرَاعَهُ রয়েছে। اَلْكُرَاعُ শব্দের অর্থ হলো ঘোড়া। উটও ঘোড়ার বিধানের অন্তর্ভুক্ত হবে। কেননা আরবীয় লোকেরা উটে আরোহণ করে যুদ্ধ করে। তদ্রূপ তার উপর অস্ত্রও বহন করা হয়।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, যে সকল স্থানান্তরযোগ্য বস্তু ওয়াক্‌ফ করার প্রচলন রয়েছে, সেগুলো ওয়াক্‌ফ করা জায়েজ হবে। যেমন– কুড়াল, বেলচা, বাটালি, করাত, জানাযার খাটিয়া ও তার পর্দা, ডেগ-ডেগচি ও কুরআনের কপি ইত্যাদি।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) এর মতে তা জায়েজ নয়। কেননা কিয়াস বর্জন করা হয় নস বা শরিয়তের প্রত্যক্ষ বাণীর কারণে। আর নস শুধু ঘোড়া ও অস্ত্রের ক্ষেত্রে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং তাতেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর জবাব এই যে, কখনো লোক প্রচলনের কারণেও কিয়াস বর্জন করা হয়। যেমন– মাল তৈরির ফরমায়েশ করার ক্ষেত্রে। আর উপরিউক্ত জিনিসগুলো ওয়াক্‌ফ করার ক্ষেত্রে লোক প্রচলন পাওয়া যায়।

https://e-ilm.weebly.com/

وَعَنْ نُصَيْرِ بْنِ يَحْيٰى أَنَّهُ وَقَفَ كُتُبَهُ إِلْحَاقًا بِالْمُصْحَفِ، وَهٰذَا صَحِيْحٌ لِاَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ يُمْسَكُ لِلدِّينِ تَعْلِيْمًا وَتَعَلُّمًا وَقِرَاءَة . وَاَكْثَرُ فُقَهَاءِ الْاَمْصَارِ عَلٰى قَوْلِ مُحَمَّدٍ (رحـ)، وَمَا لَا تَعَامُلَ فِيْهِ لَا يَجُوْزُ عِنْدَنَا وَقْفُهُ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رحـ) : كُلُّ مَا يُمْكِنُ الْاِنْتِفَاعُ بِهٖ مَعَ بَقَاءِ اَصْلِهٖ وَيَجُوْزُ بَيْعُهُ يَجُوْزُ وَقْفُهُ؛ لِاَنَّهُ يُمْكِنُ الْاِنْتِفَاعُ بِهٖ، فَاَشْبَهَ الْعَقَارَ وَالْكُرَاعَ وَالسِّلَاحَ . وَلَنَا اَنَّ الْوَقْفَ فِيْهِ لَا يَتَاَبَّدُ، مِنْهُ عَلٰى مَا بَيَّنَّاهُ فَصَارَ كَالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيْرِ، بِخِلَافِ الْعَقَارِ، وَلَا مُعَارِضَ مِنْ حَيْثُ السَّمْعُ وَلَا مِنْ حَيْثُ التَّعَامُلُ فَبَقِيَ عَلٰى اَصْلِ الْقِيَاسِ . وَهٰذَا لِاَنَّ الْعَقَارَ يَتَاَبَّدُ، وَالْجِهَادُ سَنَامُ الدِّيْنِ، فَكَانَ مَعْنَى الْقُرْبَةِ فِيْهِمَا اَقْوٰى فَلَا يَكُوْنُ غَيْرُهُمَا فِيْ مَعْنَاهُمَا .

অনুবাদ : নুসাইর ইবনে ইয়াহইয়া সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি কুরআনের কপির পর্যায়ভুক্ত ধরে নিজের কিতাবসমূহ ওয়াক্ফ করেছেন। এবং এটা শুদ্ধ। কেননা (কুরআন ও কিতাব) এর প্রত্যেকটি শিক্ষাদান, শিক্ষাগ্রহণ ও অধ্যয়নের মাধ্যমে দীন হাসিলের জন্য সংরক্ষণ করা হয়।

দেশের অধিকাংশ ফকীহ ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতের সমর্থক। আর যেসব বস্তু (ওয়াকফ করার ক্ষেত্রে) লোক প্রচলন নেই, সেসব বস্তুর ওয়াকফ করা আমাদের মতে জায়েজ নয়। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, যেসব বস্তুর মূল সত্তা বিদ্যমান রেখে তা দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় এবং তা বিক্রি করা বৈধ হয়, সেসব বস্তু ওয়াকফ করাও বৈধ। কেননা সেগুলো দ্বারা উপকৃত হওয়া সম্ভব হওয়ার কারণে, সেগুলো ভূমি, ঘোড়া ও অস্ত্রের পর্যায়ভুক্ত হয়ে গেছে

আমাদের দলিল এই যে, এগুলোকে ওয়াক্ফ করার ক্ষেত্রে চিরস্থায়িত্বের দিক নেই। অথচ আমরা বর্ণনা করে এসেছি যে, এ হলো শর্ত। সুতরাং এগুলো দিরহাম-দিনারের মতো হয়ে গেল। ভূ-সম্পত্তির বিষয়টি ভিন্ন। আর এক্ষেত্রে শরিয়তের কোনো বিরুদ্ধ বাণী নেই এবং প্রচলনের দিক থেকেও কোনো বিরুদ্ধ প্রচলন নেই। সুতরাং এগুলো মূল কিয়াসের উপরই বহাল থাকবে। আর তা এজন্য যে, ভূ-সম্পত্তি স্থায়ী হয়। আর জিহাদ হলো দীনের গুরুত্বপূর্ণ বিধান। তাই এ দুটোতে ইবাদতের দিকটি অত্যন্ত শক্তিশালী। সুতরাং অন্যগুলো এ দুটোর পর্যায়ভুক্ত হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিউক্ত ইবারতে দুটি মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রথম মাসআলাটির সারমর্ম হলো এই যে, সাধারণ কিয়াস অনুযায়ী ঘোড়া ও অস্ত্র ওয়াক্ফ করা জায়েজ হয় না। কেননা ওয়াকফ চিরস্থায়ী হতে হয় আর এসব জিনিস চিরস্থায়ী নয়। তাই এগুলোর ওয়াকফ সহীহ নয়।

কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) সূক্ষ্ম কিয়াসের উপর ভিত্তি করে বলেন, ঘোড়া এবং অস্ত্র ওয়াকফ করা জায়েজ আছে। আর এই সূক্ষ্ম কিয়াসের ভিত্তি হলো প্রসিদ্ধ হাদীসসমূহের উপর। যেমন- বর্ণিত আছে যে, হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালিদ (রা.) সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, খালেদ তো ঘোড়া এবং বর্ম আল্লাহর রাস্তায় ওয়াকফ করে দিয়েছে। আর তালহাও তার বর্মসমূহ আল্লাহর রাস্তায় ওয়াকফ করে দিয়েছে।

হাদীসটির মূল বিবরণ এই যে, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত ওমর (রা.)-কে সদকা উসুল করার দায়িত্বে নিয়োগ করে পাঠালেন। তখন ইবনে জামীল, খালেদ ইবনে ওয়ালিদ ও আব্বাস (রা.) সদকা

https://e-ilm.weebly.com/

দিতে অস্বীকৃতি জানালেন। বিষয়টি রাসূল ﷺ -এর কর্ণগোচর হলে তিনি বললেন, ইবনে জামীলের সদকা আদায় না করার কারণ হলো, সে দরিদ্র ছিল পরে আল্লাহ তাকে ধনী করেছেন। আর খালেদ ইবনে ওয়ালিদ (রা.) সম্পর্কে বললেন, তোমরা তার কাছে সদকা চেয়ে অন্যায় করেছ। কেননা সে তো বর্ম ও যুদ্ধের অন্যান্য অস্ত্রসমূহ আল্লাহর রাস্তায় ওয়াক্ফ করে দিয়েছে। আর হযরত আব্বাস (রা.) সম্পর্কে বললেন, তার জাকাত আমিই আদায় করব। -(বুখারী ও মুসলিম)

হযরত তালহা (রা.) যে বর্ম ওয়াক্ফ করেছেন- এ সম্পর্কিত হাদীসটির ভিত্তি পাওয়া যায় না।

উট ঘোড়ার হুকুমের পর্যায়ভুক্ত। কারণ ঘোড়া যেমন যুদ্ধের কাজে ব্যবহৃত হয়, উটও তেমনই যুদ্ধের কাজে ব্যবহৃত হয়। কেননা আরবীয় লোকগণ উটের উপর আরোহণ করে যুদ্ধ করেন এবং উটকে অস্ত্র বহনের কাজেও ব্যবহার করে থাকেন।

দ্বিতীয় মাসআলাটির সারমর্ম হলো, তাতে তিনটি মত রয়েছে–

১. ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেছেন, স্থানান্তরযোগ্য যেসব বস্তু ওয়াক্ফ করার প্রচলন আছে সেসববস্তু ওয়াক্ফ করা জায়েজ।

২. ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, জায়েজ নেই।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল হলো, কিয়াসের দাবি হচ্ছে কোনো স্থানান্তরযোগ্য বস্তুর ওয়াক্ফই জায়েজ না হওয়া। কিন্তু ঘোড়াও অস্ত্রের ক্ষেত্রে এ কিয়াস বর্জন করা হয়েছে নস থাকার কারণে। পক্ষান্তরে অন্যান্য বস্তুর ক্ষেত্রে কোনো নস নেই, সুতরাং সেগুলোর ওয়াক্ফ কিয়াস মুতাবেক অশুদ্ধ হবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো, নস এর কারণে যেমন কিয়াস বর্জন করা যায়, তেমনি তা'আমুল বা লোক প্রচলনের কারণেও কিয়াস বর্জন করা যায়। যেমন– অর্ডার বা ফরমায়েশ দিয়ে বিভিন্ন জিনিস তৈরি করানোর বিষয়টি সাধারণ কিয়াস অনুযায়ী শুদ্ধ নয়। কিন্তু বিষয়টি লোক সমাজে প্রচলিত হওয়ার কারণে কিয়াস বর্জন করা হয়েছে এবং তা বৈধ সাব্যস্ত করা হয়েছে। তেমনি লোক প্রচলনের কারণে ওয়াক্ফের ক্ষেত্রে কিয়াস বর্জন করা হবে এবং যে সব বস্তু ওয়াক্ফ করার প্রচলন আছে সেগুলোর ওয়াক্ফ জায়েজ সাব্যস্ত করা হবে। যেমন- কুড়াল, কোদাল, বাটালি, খাটিয়া ইত্যাদির ওয়াকফ করার প্রচলন আছে। তাই এগুলো ওয়াক্ফ করা জায়েজ। পক্ষান্তরে যেসব বস্তু ওয়াক্ফ করার প্রচলন রয়েছে, সেসব বস্তু ওয়াক্ফ করা আমাদের মতে জায়েজ নেই।

৩. এক্ষেত্রে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতভেদ আছে। তিনি বলেন, যেসব বস্তুর মূল সত্তা বহাল রেখে তা দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় এবং বিক্রি করা বৈধ হয়, সেসব বস্তুই ওয়াক্ফ করা যাবে।

তার যুক্তি হলো, উল্লিখিত দিক বিবেচনায় এসব অস্থাবর সম্পদ স্থাবর সম্পদের তথা ভূমির সমতুল্য হয়ে যায় এবং ঘোড়াও অস্ত্রের ন্যায় হয়ে যায়। বিধায় ভূমি, ঘোড়া ও অস্ত্রের মতো এগুলোও ওয়াক্ফ করা জায়েজ হবে।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর বিপরীতে আমাদের দলিল হলো, আমরা পূর্বেই বলে এসেছি। ওয়াক্ফ স্থায়ীভাবে হওয়া শর্ত। অথচ স্থানান্তরযোগ্য জিনিস স্থায়ী হয় না। যেমন- দিরহাম-দীনার স্থায়ী হয় না। তাই দিরহাম-দিনারের মতোই স্থানান্তরযোগ্য জিনিসের ওয়াক্ফ নাজায়েজ হবে।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিলের জবাব : ইমাম শাফেয়ী (র.) স্থানান্তরযোগ্য বস্তুকে ভূমি, ঘোড়া ও অস্ত্রের সাথে কিয়াস করেছেন। এ কিয়াসটি সঠিক নয়। কারণ, ভূমি একটি স্থায়ী সম্পদ, এটা স্থানান্তরের অনুপযুক্ত। সুতরাং তার সাথে অস্থায়ী এবং স্থানান্তরযোগ্য জিনিসকে কিয়াস করা যাবে না।

ঘোড়া ও অস্ত্রের ব্যাপারে নস এসেছে। যার ফলে ঘোড়া ও অস্ত্রের মধ্যে কিয়াস বর্জন করে তার ওয়াক্ফ জায়েজ সাব্যস্ত করা হয়েছে। পক্ষান্তরে ঘোড়া ও অস্ত্র ছাড়া অন্যান্য বস্তুর ক্ষেত্রে নস আসেনি, তাই এগুলোকে ঘোড়া ও অস্ত্রের সাথে কিয়াস করা যাবে না। বরং এগুলোকে সাধারণ কিয়াসের উপরেই রাখা হবে।

তাছাড়া ভূমি চিরদিন থাকে। ঘোড়া ও অস্ত্র দ্বারা জিহাদ হয়, আর জিহাদ হলো ইসলামের অতি গুরুত্বপূর্ণ বিধান, তাই ভূমি ও ঘোড়া-অস্ত্রের মর্যাদা ভিন্ন। অন্যান্য অস্থাবর সম্পদ বা স্থানান্তরযোগ্য জিনিস সেগুলোর সমকক্ষ নয়। বিধায় উভয়ের হুকুম এক করা যায় না।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ وَإِذَا صَحَّ الْوَقْفُ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ وَلَا تَمْلِيْكُهُ، إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ مُشَاعًا عِنْدَ أَبِيْ يُوْسُفَ (رح) فَيَطْلُبُ الشَّرِيْكُ الْقِسْمَةَ فَيَصِحُّ مُقَاسَمَتُهُ أَمَّا امْتِنَاعُ التَّمْلِيْكِ فَلِمَا بَيَّنَّا . وَأَمَّا جَوَازُ الْقِسْمَةِ فَلِأَنَّهَا تَمْيِيْزٌ وَإِفْرَازٌ، غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ الْغَالِبَ فِيْ غَيْرِ الْمَكِيْلِ وَالْمَوْزُوْنِ مَعْنَى الْمُبَادَلَةِ، إِلَّا أَنَّ فِي الْوَقْفِ جَعَلْنَا الْغَالِبَ مَعْنَى الْإِفْرَازِ نَظَرًا إِلَى الْوَقْفِ فَلَمْ يَكُنْ بَيْعًا وَتَمْلِيْكًا؛ ثُمَّ إِنْ وَقَفَ نَصِيْبَهُ مِنْ عَقَارٍ مُشْتَرَكٍ فَهُوَ الَّذِيْ يُقَاسِمُ شَرِيْكَهُ؛ لِأَنَّ الْوِلَايَةَ لِلْوَاقِفِ وَبَعْدَ الْمَوْتِ إِلَى وَصِيِّهِ، وَإِنْ وَقَفَ نِصْفَ عَقَارٍ خَالِصٍ لَهُ فَالَّذِيْ يُقَاسِمُهُ الْقَاضِيْ أَوْ يَبِيْعُ نَصِيْبَهُ الْبَاقِيْ مِنْ رَجُلٍ، ثُمَّ يُقَاسِمُهُ الْمُشْتَرِيْ ثُمَّ يَشْتَرِيْ ذٰلِكَ مِنْهُ لِأَنَّ الْوَاحِدَ لَا يَجُوْزُ أَنْ يَكُوْنَ مُقَاسِمًا وَمُقَاسَمًا، وَلَوْ كَانَ فِي الْقِسْمَةِ فَضْلُ دَرَاهِمَ إِنْ أَعْطَى الْوَاقِفَ لَا يَجُوْزُ لِامْتِنَاعِ بَيْعِ الْوَقْفِ، وَإِنْ أَعْطَى الْوَاقِفُ جَازَ وَيَكُوْنُ بِقَدْرِ الدَّرَاهِمِ شِرَاءً

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, **ওয়াক্ফ যখন শুদ্ধ হয় (অর্থাৎ বাধ্যতামূলক হয়ে যায়) তখন তা বিক্রি করা এবং কারো মালিকানায় প্রদান করা জায়েজ নয়। তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে যদি এজমালী সম্পত্তি হয়, আর শরিকদার বণ্টন দাবি করে তাহলে বণ্টন করা বৈধ হবে।** কাউকে মালিক বানানোর নিষিদ্ধতার কারণ আমরা পূর্বে বর্ণনা করে এসেছি।

আর বণ্টন বৈধ হওয়ার কারণ এই যে, বণ্টন অর্থ হলো পৃথকীকরণ ও আলাদাকরণ। বেশির চেয়ে বেশি এই হবে যে, মাপ ও ওজনের বস্তু ছাড়া অন্যান্য বস্তুর ক্ষেত্রে বিনিময়ের দিকটি প্রধান, কিন্তু ওয়াক্ফের ক্ষেত্রে ওয়াক্ফের স্বার্থ রক্ষার জন্য পৃথকীকরণের দিকটাকেই আমরা প্রাধান্য দিয়েছি। সুতরাং তা বিক্রি বা অন্যকে মালিক বানানো হয় নি।

অতঃপর (কুদূরীর মূল বক্তব্যের প্রেক্ষিতে) লোকটি যদি এজমালি ভূ-সম্পত্তি থেকে নিজের অংশ ওয়াক্ফ করে তাহলে সে নিজেই তার শরিকদারের সাথে বণ্টন করবে। কেননা এ কর্তৃত্ব ওয়াক্ফকারীর হাতে এবং তার মৃত্যুর পর তার নিযুক্ত অছীর হাতে অর্পিত। আর যদি নিজের একক মালিকানাধীন ভূ-সম্পত্তির অর্ধেক ওয়াক্ফ করে তাহলে কাজি তা বণ্টন করে দিবে। কিংবা নিজের অবশিষ্টাংশ কোনো লোকের কাছে বিক্রি করবে। অতঃপর ক্রেতা তা বণ্টন করে নিবে। এরপর ওয়াক্ফকারী ক্রেতা থেকে তা পুনঃক্রয় করে নিবে। কেননা একই ব্যক্তি বণ্টন দাবিকারী ও বণ্টন গ্রহণকারী হতে পারে না।

আর বণ্টনের ক্ষেত্রে যদি কিছু দিরহাম উদ্বৃত্ত থাকে এবং ক্রেতা সেটা ওয়াক্ফকারীকে প্রদান করে তাহলে তা জায়েজ হবে না। কেননা ওয়াক্ফকৃত সম্পত্তি বিক্রি করা নিষিদ্ধ। পক্ষান্তরে ওয়াক্ফকারী যদি উদ্বৃত্ত দিরহাম দিয়ে দেয়, তাহলে জায়েজ হবে এবং ঐ দিরহাম পরিমাণ ক্রয় সাব্যস্ত হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ওয়াক্ফ যখন শুদ্ধ হয়েছে বলে মেনে নেওয়া হয় এবং ওয়াকফ যখন চূড়ান্ত হয়ে যায়, তখন আর তা বিক্রি করা যায় না, কিংবা অন্য কোনো সূত্রে তা কারো মালিকানায় প্রদান করা যায় না। মোটকথা, কাউকে কোনোসূত্রে ওয়াক্ফ সম্পত্তির মালিক বানানো যায় না।

তবে একটি সুরতে ওয়াক্ফ সম্পত্তি বিক্রি করা যায় বলে কারো সন্দেহ হতে পারে। গ্রন্থকার সে সন্দেহ নিরসনের উদ্দেশ্যে বলেন- إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ مُشَاعًا عِنْدَ أَبِيْ يُوْسُفَ (رح) الخ অর্থাৎ ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতানুসারে যদি কেউ এজমালি সম্পত্তি ওয়াকফ করে, এরপর শরিকদার ব্যক্তি সম্পত্তিটি বণ্টন করার দাবি জানায় তাহলে সম্পত্তিটি বণ্টন করা যাবে।

https://e-ilm.weebly.com/

এক্ষেত্রে কেউ বলতে পারে যে, জমি বন্টনের মধ্যে বিক্রির মর্ম বিদ্যমান আছে। কেননা সম্পত্তিটি যখন এজমালী ছিল, তখন পূর্ণ জমিতেই উভয় শরিকের মালিকানা ব্যাপৃত ছিল। এরপর যখন ভাগ-বন্টনের মাধ্যমে উভয়ের মালিকানা পৃথক করা হলো, তখন যেন প্রত্যেক মালিকই নিজ সম্পদের অর্ধাংশ অপর মালিকের অর্ধেক সম্পদের বিনিময়ে আদান-প্রদান করল, আর সম্পদের বিনিময়ে সম্পদ আদান-প্রদান করাকেই বিক্রি বলা হয়। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, আলোচ্য সুরতে ওয়াক্ফ সম্পত্তি বিক্রি করা হয়ে থাকে।

এসন্দেহের জবাব হলো এই যে, এখানে মূলত বিষয় রয়েছে দুটি। এক. এজমালী সম্পদ বন্টনের মাধ্যমে ওয়াক্ফ সম্পত্তিকে পৃথক করা। দুই. বিক্রি করা বা মালিক বানানো।

প্রকাশ থাকে যে, প্রথমোক্ত বিষয়টি ওয়াক্ফের সম্পদকে অন্য সম্পদ হতে পৃথক করে, যা ওয়াক্ফের জন্য অতি অনুকূল ব্যাপার, তাই এটা জায়েজ এবং করণীয়।

দ্বিতীয় বিষয়টি জায়েজ নেই। এটি জায়েজ না হওয়ার দলিল পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ সেসকল হাদীস, যেগুলোতে বলা হয়েছে, ওয়াক্ফের সম্পদ বিক্রি করা যায় না, হেবা করা যায় না, সদকা করা যায় না। আর আকলী দলিল হলো ওয়াক্ফের সম্পদ কারো মালিকানা হয়ে গেলে তা স্থায়ী হয় না, অথচ ওয়াক্ফ সম্পদ স্থায়ী-হওয়া জরুরি।

মোটকথা দলিল প্রমাণের আলোকে ওয়াক্ফ সম্পদ বিক্রি করা বা কাউকে মালিক বানানো জায়েজ নেই, কিন্তু তা বন্টন করা জায়েজ আছে। তবে বন্টনের মাঝে যে বিক্রির অর্থ বিদ্যমান রয়েছে তার জবাব হলো, ওয়াক্ফের স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে বিক্রির অর্থের উপর বন্টনের দিকটিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। অতএব, ধরে নিতে হবে যে, আলোচ্য ক্ষেত্রে কেবল বন্টন করা হয়, কোনো ক্রয়বিক্রয় হয় না এবং কাউকে ওয়াক্ফ সম্পদের মালিক বানানো হয় না।

তিনটি প্রাসঙ্গিক মাসআলা :

১. ثُمَّ إِنْ وَقَفَ نَصِيْبَهُ مِنْ عَقَارٍ مُشْتَرَكٍ الخ ওয়াক্ফকারী ব্যক্তি যদি এজমালি সম্পত্তি হতে নিজের অংশ ওয়াক্ফ করে, তাহলে তারই দায়িত্ব হবে শরিকদারের কাছে বন্টন দাবি করা। কেননা ওয়াক্ফ সম্পত্তি পৃথক করা ওয়াক্ফকারীরই দায়িত্ব। এবং তার মৃত্যুর পর তার অছীর উপর এ দায়িত্ব অর্পিত হয়।

২. কেউ যদি নিজের একক মালিকানাধীন ভূমির অর্ধেক ওয়াক্ফ করে তাহলে এ ক্ষেত্রে বন্টনের কাজটি ওয়াক্ফকারী নিজে করবে না। কেননা ওয়াক্ফকারী ব্যক্তি নিজে বন্টনের কাজ করলে مقاسِم তথা বন্টনকারী ও مقاسَم তথা বন্টন গ্রহণকারী এক হয়ে যায়। অথচ مقاسمة বা বন্টন ক্রিয়া দুই পক্ষের মাঝে হওয়ার দাবিদার। সুতরাং ওয়াক্ফকারী নিজের বন্টনের কাজটি করবে না। বরং দেশের কাজি বন্টন করে দিবেন।

কিংবা সমস্যা সমাধানের আরেকটি প্রক্রিয়া এই হতে পারে যে, ওয়াক্ফকারী ব্যক্তি নিজের অংশটুকু অর্থাৎ যে অংশটুকু ওয়াক্ফ করে নি, সেটুকু একজনের কাছে বিক্রি করে দিবে। অতঃপর এই ক্রেতা ব্যক্তি বন্টন দাবি করে অর্ধেক জমি পৃথক করে নিবে। এরপর ওয়াক্ফকারী পুনরায় সেই ক্রেতার নিকট থেকে তার ভূমি ক্রয় করে নিবে। এই কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমেও বন্টন দাবিকারী ও বন্টন গ্রহণকারী এক হয়ে যাওয়ার সমস্যা হতে রক্ষা পাওয়া যায়।

৩. وَلَوْ كَانَ فِي الْقِسْمَةِ فَضْلُ الخ ভূমি বন্টনের ক্ষেত্রে কখনো কখনো কিছু দিরহাম-দিনার তথা টাকা-পয়সাও সংযুক্ত করার প্রয়োজন হয়। যেমন- একটি ভূমি সমান দু-ভাগে ভাগ করা হলো, কিন্তু দুটি ভাগের একটি ভাগ বেশি উন্নত বা উর্বর, অপর ভাগটি তুলনামূলক কম উন্নত বা কম উর্বর। কিংবা একটি অংশ রাস্তার পাশে অপর অংশটি পিছন দিকে। এমতাবস্থায় সমতা বিধান করার একটি পদ্ধতি এই থাকে যে, উন্নত অংশের গ্রহণকারী ব্যক্তি অনুন্নত অংশ গ্রহণকারীকে কিছু অর্থ দিয়ে দিবে। ফলে উভয়ের মাঝে সমতা রক্ষা হবে, উভয়ই সন্তুষ্ট থাকবে।

ওয়াক্ফের সম্পদকে সাধারণ সম্পদ হতে পৃথক করার জন্য বন্টন করার সময় যদি বর্ণিতরূপে কিছু অর্থ আদান প্রদান করার প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে সেখানে দুটি অবস্থা হতে পারে।

১. অর্থগুলো ওয়াক্ফকারীকে দেওয়া হবে।

২. অর্থগুলো ওয়াক্ফকারী ক্রেতাকে দিবে। প্রথম অবস্থাটি জায়েজ নেই। দ্বিতীয় অবস্থাটি জায়েজ আছে।

কারণ আলোচ্য সুরতে যে ব্যক্তি অর্থ গ্রহণ করে সে মূলত: নিজের সম্পদের কিয়দাংশ অপর পক্ষের কাছে বিক্রি করে থাকে এবং তারই বিনিময়ে সে অর্থগুলো গ্রহণ করে থাকে। সুতরাং ওয়াক্ফকারী যদি অর্থ গ্রহণ করে, তাহলে সে যেন ওয়াক্ফ সম্পত্তির কিছু অংশ বিক্রি করল। অথচ ওয়াক্ফ সম্পত্তি বিক্রি করা জায়েজ নেই। তাই ওয়াক্ফকারী ব্যক্তির অর্থ গ্রহণ জায়েজ হবে না। পক্ষান্তরে যদি ওয়াক্ফকারী অর্থ প্রদান করে এবং ক্রেতা সেগুলো গ্রহণ করে, তাহলে কোনো সমস্যা নেই। কারণ তখন ওয়াক্ফকারী ব্যক্তি হবে ক্রেতা। সে যেন অপর পক্ষের সম্পদের কিছু অংশ অর্থের বিনিময়ে ক্রয় করে ওয়াক্ফ করছে। ওয়াক্ফের সম্পদ বিক্রি করছে না। সুতরাং তা জায়েজ এবং কাম্য।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ وَالْوَاجِبُ اَنْ يُبْتَدَا مِنْ اِرْتِفَاعِ الْوَقْفِ بِعِمَارَتِهِ شَرَطَ ذٰلِكَ الْوَاقِفُ اَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ لِاَنَّ قَصْدَ الْوَاقِفِ صَرْفُ الْغَلَّةِ مُؤَبَّدًا، وَلَا تَبْقٰى دَائِمَةً اِلَّا بِالْعِمَارَةِ فَيَثْبُتُ شَرْطُ الْعِمَارَةِ اقْتِضَاءً وَلِاَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ وَصَارَ كَنَفَقَةِ الْعَبْدِ الْمُوْصٰى بِخِدْمَتِهِ، فَاِنَّهَا عَلَى الْمُوصٰى لَهُ بِهَا . ثُمَّ اِنْ كَانَ الْوَقْفُ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَلَا يَظْفُرُ بِهِمْ، وَاَقْرَبُ اَمْوَالِهِمْ هٰذِهِ الْغَلَّةُ فَيَجِبُ فِيْهَا . وَلَوْ كَانَ الْوَقْفُ عَلٰى رَجُلٍ بِعَيْنِهِ وَاٰخِرُهُ لِلْفُقَرَاءِ فَهُوَ فِيْ مَالِهِ : اَيُّ مَالٍ شَاءَ فِيْ حَالِ حَيَاتِهِ . وَلَا يُؤْخَذُ مِنَ الْغَلَّةِ؛ لِاَنَّهُ مُعَيَّنٌ يُمْكِنُ مُطَالَبَتُهُ، وَاِنَّمَا يَسْتَحِقُّ الْعِمَارَةَ عَلَيْهِ بِقَدْرِ مَا يَبْقٰى الْمَوْقُوْفُ عَلَى الصِّفَةِ الَّتِيْ وَقَفَهُ، وَاِنْ خَرِبَ يَبْنِي عَلٰى ذٰلِكَ الْوَصْفِ؛ لِاَنَّهَا بِصِفَتِهَا صَارَتْ غَلَّتُهَا مَصْرُوْفَةً اِلَى الْمَوْقُوْفِ عَلَيْهِ . فَاَمَّا الزِّيَادَةُ عَلٰى ذٰلِكَ فَلَيْسَتْ بِمُسْتَحَقَّةٍ عَلَيْهِ وَالْغَلَّةُ مُسْتَحَقَّةٌ لَهُ فَلَا يَجُوْزُ صَرْفُهَا اِلٰى شَيْءٍ اٰخَرَ اِلَّا بِرِضَاهُ، وَلَوْ كَانَ الْوَقْفُ عَلَى الْفُقَرَاءِ فَكَذٰلِكَ عِنْدَ الْبَعْضِ، وَعِنْدَ الْاٰخَرِيْنَ يَجُوْزُ ذٰلِكَ، وَالْاَوَّلُ اَصَحُّ لِاَنَّ الصَّرْفَ اِلَى الْعِمَارَةِ ضَرُوْرَةُ اِبْقَاءِ الْوَقْفِ وَلَا ضَرُوْرَةَ فِي الزِّيَادَةِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, **ওয়াকফকৃত সম্পদের আয় সর্বপ্রথম ব্যয় করবে ওয়াকফের প্রয়োজনীয় উন্নয়নে। ওয়াকফকারী এ শর্ত আরোপ করুক কিংবা না করুক।** কেননা ওয়াকফকারীর উদ্দেশ্য হলো স্থায়ীভাবে উৎপাদন ব্যয় করা আর উন্নয়ন ছাড়া তার স্থায়িত্ব বহাল থাকবে না। সুতরাং অনিবার্য দাবি হিসাবে উন্নয়নের শর্ত যুক্ত হবে। তাছাড়া আরেক কারণ এই যে, দায় বহনের বিনিময়েই ফল ভোগের অধিকার সাব্যস্ত হয়। সুতরাং এটা ঐ গোলামের ভরণ-পোষণের মতো হলো, যার খেদমত সম্পর্কে কারো অনুকূলে অসিয়ত করা হয়েছে। তা খেদমতের জন্য অসিয়তকৃত ব্যক্তিকেই বহন করতে হবে।

যদি দরিদ্রদের জন্য ওয়াকফ করা হয় এবং (তাদের সংখ্যা অনেক হওয়ার কারণে) সবাইকে পাওয়া না যায় এবং ওয়াকফ সম্পদ হতে লব্ধ আয়ই তাদের সহজলভ্য মাল হয় তাহলে তা থেকেই উন্নয়ন ব্যয় সাব্যস্ত হবে।

আর যদি নির্দিষ্ট কোনো লোকের নামে ওয়াকফ করে এবং পরিশেষে তা মিসকিনদের জন্য হয়, তাহলে উন্নয়ন ব্যয় ঐ লোকটির জীবদ্দশায় তার সম্পত্তিতে সাব্যস্ত হবে। সে নিজের যেকোনো সম্পত্তি থেকে তা আদায় করতে পারে। আর তা ওয়াকফকৃত আয় থেকে নেওয়া যাবে না। কেননা যার জন্য ওয়াকফ করা হয়েছে সে নির্দিষ্ট। সুতরাং তার কাছে দাবি উত্থাপন করা সম্ভব। অবশ্য তার উপর ঐ পরিমাণ উন্নয়ন ব্যয় ওয়াজিব হবে, যা দ্বারা ওয়াকফকৃত সম্পত্তি ওয়াকফকালীন অবস্থার উপর বহাল থাকতে পারে।

আর যদি বিনষ্ট হয়ে যায়, তাহলে ঐ গুণ অনুযায়ী তাকে পুনর্নির্মাণ করতে হবে। কেননা ঐগুণ সহ-ই তার আয় ওয়াকফপ্রাপ্ত ব্যক্তির নামে ওয়াকফ করা হয়েছে। এর অতিরিক্ত কোনো ব্যয় তার উপর হক হিসাবে সাব্যস্ত হবে না। ওয়াকফকৃত সম্পত্তির আয় তার প্রাপ্য। সুতরাং তার সম্মতি ছাড়া অন্য কোনো খাতে তা ব্যয় করা যাবে না।

আর যদি ওয়াকফটি গরিব-মিসকিনদের নামে হয়, তাহলেও কোনো কোনো মতে একই বিধান হবে। আর অনেকের মতে তা জায়েজ হবে। প্রথম মতটি অধিকতর বিশুদ্ধ। কেননা উন্নয়ন কাজে ব্যয় করা হলো ওয়াকফকৃত সম্পত্তির অস্তিত্ব বজায় রাখার প্রয়োজনে। আর অতিরিক্ত পরিমাণে সে প্রয়োজনটি নেই।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

বর্ণিত মাসআলার ব্যাখ্যা নিম্নরূপ :

ওয়াক্ফ সম্পত্তি সর্বপ্রথম সম্পদের সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও তার প্রয়োজনীয় কাজে ব্যয় হবে। ওয়াক্ফকারী এ শর্তটি করুক বা না করুক।

এ দাবিটির পক্ষে মুসান্নিফ (র.) তিনটি দলিল পেশ করেছেন।

১. لِأَنَّ قَصْدَ الْوَاقِفِ الخ ওয়াক্ফকারী ব্যক্তির উদ্দেশ্য হলো সম্পদের মুনাফা স্থায়ীভাবে সদকা করা। এর জন্য আবশ্যক হলো সম্পদটি স্থায়ী হওয়া। তাই সম্পদ স্থায়ী রাখার জন্য জরুরি ব্যয় অবশ্যই সম্পদের মুনাফা থেকে করতে হবে। অন্যথায় হয়তো সম্পদটি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। যার ফলে ওয়াক্ফকারীর উদ্দেশ্য পণ্ড হয়ে যাবে।

২. وَلِأَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ দায়ভার বহনের মাধ্যমেই সম্পদের মুনাফা ভোগের অধিকার সাব্যস্ত হয়। অতএব, যারা ওয়াকফ সম্পত্তিটির মুনাফা ভোগ করবে, তাদেরই দায়িত্ব হবে সম্পত্তিটির প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার বহন করা।

৩. وَصَارَ كَنَفَقَةِ الْعَبْدِ الخ কেউ যদি কারো জন্য এরূপ অসিয়ত করে যে, আমার গোলামটি অমুকের কাজ করবে, তাহলে এ গোলামের ভরণ-পোষণের দায়িত্বও তার উপর বর্তাবে। কারণ সে গোলামের মুনাফা ভোগ করবে। তাই সে গোলামের দায়ভারও বহন করবে।

ওয়াক্ফ সম্পদও তেমনি, যারা এর মুনাফা ভোগ করবে, তারাই এর প্রয়োজনীয় খরচও বহন করবে।

ثُمَّ إِنْ كَانَ الْوَقْفُ الخ ওয়াক্ফ সম্পদের দুটি অবস্থা হতে পারে। একটি অবস্থা হলো এই যে, সম্পদটি অনির্দিষ্টভাবে দরিদ্রদের জন্য ওয়াক্ফ করা হয়েছে। এমন অবস্থায় তাদের সংখ্যা হবে অনেক। তাদের সবাইকে একত্র করে তাদের থেকে খরচের অর্থ উশুল করা হবে না। পাশাপাশি দরিদ্র লোকদের যত সম্পদ আছে, তন্মধ্যে সবচেয়ে সহজলভ্য সম্পদটি হলো ওয়াক্ফ সম্পত্তির আয়। অতএব, তাদের এ সম্পদ দ্বারাই অর্থাৎ ওয়াক্ফ সম্পদের আয় দ্বারাই ওয়াক্ফের প্রয়োজনীয় কাজ আঞ্জাম দেওয়া হবে।

দ্বিতীয় অবস্থাটি হলো, সম্পদটি নির্দিষ্টভাবে কারো জন্য ওয়াক্ফ করা হয়েছে। এমন অবস্থায় এ নির্দিষ্ট ব্যক্তির দায়িত্বে ওয়াকফের জরুরি ব্যয় আবশ্যক হবে। সে ব্যক্তির যে কোনো সম্পদ দ্বারা সেই ব্যয় বহন করবে। উক্ত ব্যয়ের অর্থ তখন ওয়াকফের আয় থেকে নেওয়া জরুরি নয়।

উল্লেখ্য যে, নির্দিষ্ট ব্যক্তির কী পরিমাণ খরচ আবশ্যক হবে এ সম্পর্কে কথা হলো, ওয়াক্ফ সম্পদটি নিজ অবস্থায় বহাল রাখার জন্য যে পরিমাণ অর্থ খরচ করা দরকার হয়, সে পরিমাণই আবশ্যক হবে। বেশি নয়। যদি ওয়াক্ফ সম্পদটি বিনষ্ট হয়ে যায়, তাহলে পূর্বের গুণাগুণসহ পুনরায় নির্মাণ করা তার দায়িত্বে আবশ্যক হবে।

ওয়াক্ফের যাবতীয় আয় বা মুনাফাও সে ভোগ করবে। তার সম্মতি ছাড়া ওয়াক্ফের আয় অন্য খাতে ব্যয় করা যাবে না।

ওয়াক্ফ যদি সাধারণভাবে দরিদ্রদের জন্য করা হয়, তাহলে ওয়াকফের উন্নয়নে কী পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা যাবে এ নিয়ে দুটি মত রয়েছে। একটি মত হলো, এ সুরতের বিধানও পূর্বের বিধানের মতো। অর্থাৎ নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য ওয়াক্ফ করার সুরতে যেমন ওয়াক্ফ সম্পত্তিটিকে আপন অবস্থায় বহাল রাখার জন্য যে পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন হয়, সে পরিমাণ অর্থ ঐ ব্যক্তির উপর ওয়াজিব হয়, তেমনি অনির্দিষ্টভাবে দরিদ্রদের জন্য ওয়াক্ফ করার সুরতেও সে পরিমাণ অর্থই খরচ করা হবে যে পরিমাণ অর্থ খরচ করা হলে ওয়াক্ফ সম্পত্তিটি আপন অবস্থায় বহাল থাকতে পারে।

দ্বিতীয় মতটি হলো, অতিরিক্ত পরিমাণ অর্থ খরচ করা জায়েজ হবে। এই মত দুটির মধ্যে প্রথম মতটি অধিক বিশুদ্ধ। কারণ ওয়াক্ফ সম্পত্তির মুনাফা বা আয়ের হকদার মূলত ঐ সব লোকেরা, যাদের জন্য ওয়াক্ফ করা হয়েছে। কিন্তু তা ওয়াক্ফ সম্পত্তির উন্নয়নের কাজে ব্যয় করা হয়, সম্পত্তিটিকে লাভজনক অবস্থায় বহাল রাখার প্রয়োজনে। তাই অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে যেহেতু এ প্রয়োজনটি অনুপস্থিত সেহেতু অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করা জায়েজ হবে না। কেননা বিশেষ প্রয়োজনে যা বৈধ হয়, তার বৈধতা ঐ প্রয়োজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। সুতরাং যতটুকু মুনাফা ব্যয় করলে প্রয়োজন পূরণ হয়ে যায় ততটুকু ব্যয় জায়েজ হবে, বেশি নয়।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ فَإِنْ وَقَفَ دَارًا عَلَى سُكْنٰى وَلَدِهٖ فَالْعِمَارَةُ عَلٰى مَنْ لَهُ السُّكْنٰى لِأَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ عَلٰى مَا مَرَّ فَصَارَ كَنَفَقَةِ الْعَبْدِ الْمُوصٰى بِخِدْمَتِهٖ قَالَ فَإِنِ امْتَنَعَ مِنْ ذٰلِكَ، أَوْ كَانَ فَقِيْرًا أَجَرَهَا الْحَاكِمُ وَعَمَّرَهَا بِأُجْرَتِهَا. وَإِذَا عَمَّرَهَا رَدَّهَا إِلٰى مَنْ لَهُ السُّكْنٰى لِأَنَّ فِيْ ذٰلِكَ رِعَايَةَ الْحَقَّيْنِ حَقِّ الْوَاقِفِ وَحَقِّ صَاحِبِ السُّكْنٰى، لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يُعَمِّرْهَا تَفُوْتُ السُّكْنٰى أَصْلًا. وَالْأَوَّلُ أَوْلٰى، وَلَا يُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ عَلَى الْعِمَارَةِ لِمَا فِيْهِ مِنْ إِتْلَافِ مَالِهٖ فَأَشْبَهَ امْتِنَاعَ صَاحِبِ الْبَذْرِ فِي الْمُزَارَعَةِ فَلَا يَكُوْنُ امْتِنَاعُهُ رِضًا مِنْهُ بِبُطْلَانِ حَقِّهٖ لِأَنَّهُ فِيْ حَيِّزِ التَّرَدُّدِ، وَلَا يَصِحُّ إِجَارَةُ مَنْ لَهُ السُّكْنٰى لِأَنَّهُ غَيْرُ مَالِكٍ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি (কোনো পিতা) নিজ সন্তানদের বসবাসের জন্য একটি বাড়ি ওয়াক্‌ফ করে, তাহলে বসবাসের অধিকার যার হবে, উন্নয়ন ব্যয়ও তার উপর বর্তাবে। কেননা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, দায়ভার বহনের বিনিময়েই মুনাফা ভোগ করার অধিকার সাব্যস্ত হয়। সুতরাং এটা ঐ গোলামের খরচ বহনের মতো হলো, যার খেদমতের অসিয়ত করা হয়েছে কারো অনুকূলে।

যদি সে তা প্রদানে বিরত থাকে কিংবা সে দরিদ্র হয় তাহলে শাসক (বা বিচারক) তা ভাড়ায় দিবেন এবং ভাড়ার আয় দিয়ে তার উন্নয়ন করবেন। অতঃপর যার বসবাসের অধিকার তার কাছে প্রত্যর্পণ করবেন। কেননা এতে ওয়াক্‌ফকারীর হক ও বসবাসকারীর হক, উভয় হকের রেওয়ায়েত করা হয়। কারণ সেটার উন্নয়ন সাধন না করলে মূলতঃই বসবাস যোগ্যতা রহিত হয়ে যাবে। সুতরাং উন্নয়ন সাধনই উত্তম হবে।

আর উন্নয়ন করা থেকে যে বিরত থাকতে চায়, তাকে বাধ্য করা যাবে না। কেননা এতে তার মাল নষ্ট করা হয় (তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে)। সুতরাং এটি বর্গাচাষের ক্ষেত্রে বীজদাতার বীজ দান থেকে বিরত থাকার সদৃশ হলো। ফলে তার বিরত থাকা তার হক বাতিল হওয়ার ব্যাপারে সম্মতি বলে গণ্য হবে না। কেননা সে দ্বিধাগ্রস্ততার পর্যায়ে রয়েছে। বসবাসের অধিকার যার তার পক্ষ থেকে (ওয়াক্‌ফ বাড়িটি) ভাড়ায় প্রদান বৈধ নয়; যেহেতু সে উহার মালিক নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিউক্ত মাসআলাটি পূর্ববর্ণিত মাসআলার একটি শাখা মাসআলা। মাসআলার সারকথা হলো পিতা তার ছেলেদের বসবাসের জন্য বাড়ি ওয়াকফ করেছে। এমতাবস্থায় বাড়িটির সংরক্ষণ, উন্নয়নের দায়িত্ব কার উপর বর্তাবে, এসম্পর্কে ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, বাড়িতে যে বাস করবে তার উপরই এসব দায়িত্ব বর্তাবে। কেননা হাদীসে বলা হয়েছে اَلْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ দায়ভার বহনের ফলে মুনাফা ভোগের অধিকার অর্জন। তাই যে ব্যক্তি বাড়ির মুনাফা ভোগ করবে, সে-ই দায়ভার বহন করবে।

গ্রন্থকার আরো বলেন, সুতরাং বাড়িটির মাসআলা হুবহু ঐ গোলামের মাসআলার মতো হলো যে গোলামের খেদমতের ব্যাপারে কারো জন্য অসিয়ত করা হয়। ফলে যার জন্য অসিয়ত করা হয়েছে এবং যে গোলামের খেদমত ভোগ করে গোলামের যাবতীয় খরচ বা দায়ও সেই বহন করে থাকে।

https://e-ilm.weebly.com/

قَوْلُهُ : فَإِنْ امْتَنَعَ مِنْ ذٰلِكَ، أَوْ كَانَ فَقِيْرًا الخ : বর্ণিত মাসআলার সারনির্যাস হলো, ওয়াকফ বাড়িতে যে বাস করে তার দায়িত্ব হলো বাড়ির সংস্কার ও উন্নয়নমূলক কাজ করা। যদি সে এ কাজগুলো করতে না চায় কিংবা দরিদ্র হওয়ার কারণে কাজগুলো করার ক্ষমতা না থাকে তাহলে বাড়িটি বিনষ্ট হতে দেওয়া যাবে না; বরং কাজি সাহেব বাড়িটি কারো কাছে ভাড়া দিবেন এবং ভাড়া বাবদ যে অর্থ আয় হবে, তা দিয়ে বাড়ির সংস্কারের কাজ আঞ্জাম দিবেন। এরপর পুনরায় বাড়িটি বসবাসের অধিকারী ব্যক্তির হাতে ফিরিয়ে দিবেন।

গ্রন্থকার বলেন, এ কর্মপন্থা অবলম্বন করা হলে ওয়াক্ফকারী এবং বসবাসকারী উভয়ের হক রক্ষা করা হয়। অর্থাৎ ওয়াক্ফকারী ব্যক্তির ওয়াক্ফটি বহাল থাকে এবং বসবাসকারীও তাতে বসবাস করতে পারে। পক্ষান্তরে যদি বাড়িটি ভাড়া দিয়ে তা সংস্কারের ব্যবস্থা করা না হয়, তাহলে ওয়াক্ফকারীর ওয়াক্ফটি ধ্বংস হবে এবং বসবাসকারীর বসবাসের অধিকারও শেষ হবে। তাই বাড়িটি ভাড়ায় দিয়ে তা সংস্কার করাই উত্তম।

বসবাসের অধিকারী ব্যক্তি যখন বাড়ি সংস্কার করা থেকে বিরত থাকে তখন তাকে এ কাজের জন্য বাধ্য করা যাবে না। কারণ তাকে বাধ্য করা হলে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার সম্পদ নষ্ট করা হয়।

গ্রন্থকার বলেন, আলোচ্য মাসআলাটি আরেকটি মাসআলার সদৃশ। সে মাসআলাটি হলো, দুজন ব্যক্তি পরস্পরে বর্গাচাষের চুক্তিতে চুক্তিবদ্ধ হলো। এর মধ্যে একজনের দায়িত্ব বর্তালো বীজ দান করা। যদি পরবর্তীতে এ লোকটি বীজ দেওয়া থেকে বিরত থাকে, তাহলে তাকে বীজ দেওয়ার জন্য বাধ্য করা যায় না।

কেননা বাধ্য করা হলে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার মাল নষ্ট করা হয়। আলোচ্য মাসআলায়ও তেমনি বাড়িতে বাসকারী ব্যক্তিকে বাড়ি সংস্কারের জন্য বাধ্য করা যাবে না। তবে তার এ বিরত থাকাকে নিজের হক বাতিল হওয়ার ব্যাপারে সম্মতি বলেও ধরা যাবে না। কারণ এখানে অনেকগুলো সম্ভাবনা বিদ্যমান রয়েছে। যেমন- হতে পারে আর্থিক অসামর্থ্যের কারণে সে বিরত রয়েছে। এমনও হতে পারে যে সে এ আশায় আছে, কাজি সাহেব বাড়িটি সংস্কার করে দিবেন। আবার এ সম্ভাবনাও আছে যে, সে হয়তো নিজের হক বাতিল করতে সম্মত। সুতরাং তার বিরত থাকার পিছনে এতগুলো সম্ভাব্য কারণ থাকা অবস্থায় এটি ধরে নেওয়া যাবে না, সে সংস্কার করা থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে নিজের হক বাতিল করতে চায়।

وَلَا يَصِحُّ إِجَارَةُ الخ বসবাসকারীর পক্ষ থেকে বাড়িটি ভাড়ায় প্রদান করা জায়েজ হবে না। কেননা ভাড়ায় দেওয়ার মর্ম হলো, কাউকে অর্থের বিনিময়ে নিজ সম্পদের দ্বারা উপকৃত হওয়ার মালিক বানানো। এটি সম্পদের মালিকই করতে পারে। সুতরাং বাড়িতে বসবাসের অধিকারী ব্যক্তি যেহেতু বাড়ির মালিক নয়, সেহেতু সে তা করতে পারবে না। তাই ভাড়ায় প্রদানের কাজটি কাজি সাহেব করবেন।

https://e-ilm.weebly.com/

قال وما انهدم من بناء الْوَقْفِ والته صرفه الْحَاكِمُ في عمارة الْوَقْفِ ان احْتاج إِلَيْهِ. وَإِنْ اسْتغنى عنْهُ اَمْسكه حتى يَحْتاجَ إِلى عِمارَتِه فيصْرفه فِيْهَا: لأَنَّه لا بُدَّ مِنَ الْعِمارَةِ لِيبْقى على التَّابِيْد فيحْصُل مقْصُوْدُ الْوَاقِف . فَإِنْ مَسَتِ الْحَاجَةُ اِلَيْهِ في الْحَالِ صرفها فِيْها. وَإِلَّا امْسكها حتّى لا يَتعَذَّرَ عَلَيْهِ ذلك اوان الْحاجَةِ فيبْطُلَ الْمَقْصُوْدُ. وَإِنْ تعَذَّرَ اعادَةُ عَيْنِه اِلَى مَوْضِعِه بِيْعَ وصُرِفَ ثمنُهُ إِلَى الْمَرَمَّةِ صرْفًا لِلْبَدَلِ إِلَى مَصْرِفِ الْمُبْدَلِ ولَا يَجُوْزُ انْ يَقْسِمهُ يَعْنِي النَّقْضَ بَيْنَ مُسْتَحِقّي الْوَقْفِ لِأَنَّهُ جُزْءٌ مِنَ الْعَيْنِ وَلَا حَقَّ لِلْمَوْقُوْفِ عَلَيْهِمْ فِيْهِ : وَإِنَّمَا حَقُّهُمْ فِي الْمَنَافِعِ، وَالْعَيْنُ حَقُّ اللّٰهِ تَعَالى فَلا يَصْرِفُ إِلَيْهِمْ غَيْرَ حقِّهِمْ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ওয়াক্‌ফের যে ভবন ধসে পড়েছে এবং যে যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়ে গেছে, শাসক সেগুলোকে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করবে, যদি প্রয়োজন হয়। আর যদি তখন প্রয়োজন না হয়, তাহলে সংরক্ষণ করে রেখে দিবেন। যখন উন্নয়নের প্রয়োজন হবে, তখন সেগুলোকে উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করবেন। কেননা ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তি যেন স্থায়ীভাবে বিদ্যমান থাকে এবং ওয়াক্‌ফকারীর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, সে জন্য উন্নয়ন ও সংস্কার অপরিহার্য।

সুতরাং যদি তৎক্ষণাৎ সেগুলোর প্রয়োজন হয় তাহলে সেগুলোকে সংস্কারে কাজে ব্যবহার করবে ; পক্ষান্তরে যদি তৎক্ষণাৎ প্রয়োজন না হয়, তাহলে সংরক্ষণ করে রেখে দিবে, যাতে প্রয়োজনের সময় জোগাড় করা কষ্টকর না হয় এবং ওয়াক্‌ফকারীর উদ্দেশ্য নষ্ট না হয়।

আর যদি সেগুলোকে যথাস্থানে পুনঃস্থাপন সম্ভব না হয় তাহলে বিক্রি করে সেগুলোর মূল্য মেরামত কাজে ব্যয় করবে। এটা হবে মূলকে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে তার স্থলবর্তীকে ব্যবহার করা।

ওয়াক্‌ফকৃত সম্পদের হকদারদের মাঝে তার ভগ্নাবশেষগুলো বণ্টন করে দেওয়া জায়েজ হবে না। কেননা এগুলো ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির বস্তুসত্তার অংশ ; আর যাদের জন্য ওয়াক্‌ফ করা হয়েছে, ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির বস্তুসত্তায় তাদের কোনো হক নেই। তাদের হক হলো কেবল মুনাফার মধ্যে। বস্তুসত্তা হলো আল্লাহর হক ; সুতরাং যা তাদের হক নয়, তা তাদের খাতে ব্যয় করা হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

বর্ণিত মাসআলার দুটি অংশ। প্রথম অংশটির সারমর্ম হলো, ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি ধসে পড়লে বা নষ্ট হয়ে গেলে তার ভগ্নাবশেষগুলো তার মেরামতের কাজে তৎক্ষণাৎ কিংবা পরে ব্যবহার করতে হবে। যদি সেগুলো মেরামতের সময় পুনঃস্থাপন সম্ভব না হয়, তাহলে সেগুলো বিক্রি করে তার মূল্য মেরামতের কাজে ব্যয় করা হবে। যাতে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তিটি স্থায়ী হয় এবং ওয়াক্‌ফকারীর উদ্দেশ্য হাসিল হয়।

দ্বিতীয় অংশটির সারমর্ম হলো, ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির ভগ্নাবশেষগুলো ওয়াক্‌ফসম্পত্তির বস্তুসত্তার অংশ ; যার মধ্যে বান্দার কোনো হক নেই; বরং সেগুলো আল্লাহর হক ; তাই সেগুলো ঐসব লোকদের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া যাবে না যাদের জন্য ওয়াক্‌ফ করা হয়েছে। কেননা তাদের হক হলো শুধু সম্পত্তির মুনাফার মধ্যে ; সুতরাং যদি ভগ্নাবশেষগুলো তাদের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া হয়, তাহলে আল্লাহর হক বান্দার মাঝে বণ্টন করে দেওয়া হয়। তাই এটা জায়েজ নয়।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ وَاِذَا جَعَلَ الْوَاقِفُ غَلَّةَ الْوَقْفِ لِنَفْسِهِ اَوْ جَعَلَ الْوِلَايَةَ اِلَيْهِ جَازَ عِنْدَ اَبِيْ يُوْسُفَ قَالَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : ذَكَرَ فَصْلَيْنِ شَرْطَ الْغَلَّةِ لِنَفْسِهِ وَجَعْلَ الْوِلَايَةِ اِلَيْهِ .اَمَّا الْاَوَّلُ فَهُوَ جَائِزٌ عِنْدَ اَبِيْ يُوْسُفَ، وَلَا يَجُوْزُ عَلٰى قِيَاسِ قَوْلِ مُحَمَّدٍ وَهُوَ قَوْلُ هِلَالِ الرَّازِيْ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ . وَقِيْلَ اِنَّ الْاِخْتِلَافَ بَيْنَهُمَا بِنَاءٌ عَلَى الْاِخْتِلَافِ فِيْ اشْتِرَاطِ الْقَبْضِ وَالْاِفْرَازِ. وَقِيلَ هِيَ مَسْاَلَةٌ مُبْتَدَاَةٌ. وَالْخِلَافُ فِيْمَا اِذَا شَرَطَ الْبَعْضَ لِنَفْسِهِ فِيْ حَيَاتِهِ وَبَعْدَ مَوْتِهِ لِلْفُقَرَاءِ، وَفِيْمَا اِذَا شَرَطَ الْكُلَّ لِنَفْسِهِ فِيْ حَيَاتِهِ وَبَعْدَ مَوْتِهِ لِلْفُقَرَاءِ سَوَاءٌ؛ وَلَوْ وَقَفَ وَشَرَطَ الْبَعْضَ اَوِ الْكُلَّ لِاُمَّهَاتِ اَوْلَادِهِ وَمُدَبَّرِيْهِ مَا دَامُوْا اَحْيَاءً، فَاِذَا مَاتُوْا فَهُوَ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ، فَقَدْ قِيْلَ يَجُوْزُ بِالْاِتِّفَاقِ، وَقَدْ قِيْلَ هُوَ عَلَى الْخِلَافِ اَيْضًا وَهُوَ الصَّحِيْحُ لِاَنَّ اشْتِرَاطَهُ لَهُمْ فِيْ حَيَاتِهِ كَاشْتِرَاطِهِ لِنَفْسِهِ . وَجْهُ قَوْلِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ اَنَّ الْوَقْفَ تَبَرُّعٌ عَلٰى وَجْهِ التَّمْلِيْكِ بِالطَّرِيْقِ الَّذِيْ قَدَّمْنَاهُ، فَاشْتِرَاطُهُ الْبَعْضَ اَوْ الْكُلَّ لِنَفْسِهِ يُبْطِلُهُ؛ لِاَنَّ التَّمْلِيْكَ مِنْ نَفْسِهِ لَا يَتَحَقَّقُ فَصَارَ كَالصَّدَقَةِ الْمُنَفَّذَةِ، وَشَرْطِ بَعْضِ بُقْعَةِ الْمَسْجِدِ لِنَفْسِهِ.

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ওয়াক্ফকারী যদি ওয়াকফের আয় নিজের নামে নির্ধারিত করে কিংবা তার পরিচালনা কর্তৃত্ব নিজের হাতে রাখে, তাহলে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে তা জায়েজ আছে।

হেদায়াগ্রন্থকার বলেন, ইমাম কুদূরী (র.) এখানে দুটি বিষয় উল্লেখ করেছেন। প্রথমত ওয়াকফের আয় নিজের নামে শর্ত করা। দ্বিতীয়ত পরিচালনা কর্তৃত্ব নিজের হাতে রাখা।

প্রথমটি ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে বৈধ। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর বক্তব্যের কিয়াসে তা বৈধ নয়। এটা হিলাল রাযীরও মত। ইমাম শাফেয়ী (র.)ও তাই বলেন।

কোনো কোনো মতে ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতপার্থক্যের ভিত্তি হচ্ছে (তত্ত্বাবধায়কের) দখল বুঝে নেওয়া এবং পৃথক করে নেওয়ার শর্ত আরোপের ব্যাপারে মতপার্থক্যের উপর। আর কোনো কোনো মতে এটি স্বতন্ত্র একটি মতপার্থক্য পূর্ণ মাসআলা। জীবদ্দশায় কিছু অংশ নিজের জন্য এবং মৃত্যুর পর দরিদ্রদের জন্য এরূপ শর্ত করার ক্ষেত্রে এবং জীবদ্দাশায় সর্বাংশ নিজের জন্য এবং মৃত্যুর পর দরিদ্রদের জন্য এরূপ শর্ত করার ক্ষেত্রে তাদের (ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতপার্থক্য একই রকম।

আর যদি ওয়াকফ করার সময় এ শর্ত আরোপ করে যে, আয়ের কিছু অংশ বা সর্বাংশ তার উম্মে ওয়ালাদ ও মুদাব্বারদের জন্য হবে যতদিন তারা জীবিত থাকে। এরপর যখন তারা মারা যাবে তখন তা গরিব মিসকিনদের জন্য হবে তাহলে কোনো কোনো মতে সর্ব সম্মতিক্রমে তা বৈধ হবে। আবার কোনো কোনো মতে এটাও মতানৈক্য পূর্ণ। এটাই বিশুদ্ধ মত। কেননা নিজের জীবদ্দশায় তাদের জন্য বরাদ্দের শর্ত করা আর নিজের জন্য বরাদ্দের শর্ত করা একই কথা। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতামতের কারণ এই যে, ওয়াকফ করার অর্থ হলো আমাদের পূর্ববর্ণিত পন্থায় (অর্থাৎ আল্লাহ সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে) মালিকানা প্রদানের ভিত্তিতে স্বেচ্ছাদান করা। সুতরাং আয়ের কিছু অংশ বা সর্বাংশ নিজের জন্য শর্তকারণ ওয়াকফ্কে বাতিল করে দিবে। কেননা নিজের মালিকানা থেকে নিজেকে মালিকানা প্রদান করা সাব্যস্ত হয় না। সুতরাং এটা কার্যকর সদকার কিছু অংশ নিজের জন্য বরাদ্দ করা এবং মসজিদের কিছু ভূমি নিজের জন্য বরাদ্দের শর্ত করার মতোই হলো।

https://e-ilm.weebly.com/

وَلِاَبِيْ يُوْسُفَ مَا رُوِيَ ﴿اَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يَاْكُلُ مِنْ صَدَقَتِهٖ﴾ وَالْمُرَادُ مِنْهَا صَدَقَتُهُ الْمَوْقُوْفَةُ، وَلَا يَحِلُّ الْاَكْلُ مِنْهَا اِلَّا بِالشَّرْطِ، فَدَلَّ عَلٰى صِحَّتِهٖ، وَلِاَنَّ الْوَقْفَ اِزَالَةُ الْمِلْكِ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى عَلٰى وَجْهِ الْقُرْبَةِ عَلٰى مَا بَيَّنَّاهُ، فَاِذَا شَرَطَ الْبَعْضَ اَوِ الْكُلَّ لِنَفْسِهٖ. فَقَدْ جَعَلَ مَا صَارَ مَمْلُوْكًا لِلّٰهِ تَعَالٰى لِنَفْسِهٖ لَا اَنَّهٗ يَجْعَلُ مِلْكَ نَفْسِهٖ لِنَفْسِهٖ، وَهٰذَا جَائِزٌ، كَمَا اِذَا بَنٰى خَانًا اَوْ سِقَايَةً اَوْ جَعَلَ اَرْضَهٗ مَقْبَرَةً، وَشَرَطَ اَنْ يَنْزِلَهٗ اَوْ يَشْرَبَ مِنْهُ اَوْ يُدْفَنَ فِيْهِ، وَلِاَنَّ مَقْصُوْدَهُ الْقُرْبَةُ وَفِي التَّصَرُّفِ اِلٰى نَفْسِهٖ ذٰلِكَ. قَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ ﴿نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلٰى نَفْسِهٖ صَدَقَةٌ﴾. وَلَوْ شَرَطَ الْوَاقِفُ اَنْ يَسْتَبْدِلَ بِهٖ اَرْضًا اُخْرٰى اِذَا شَاءَ ذٰلِكَ فَهُوَ جَائِزٌ عِنْدَ اَبِيْ يُوْسُفَ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ الْوَقْفُ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ . وَلَوْ شَرَطَ الْخِيَارَ لِنَفْسِهٖ فِي الْوَقْفِ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ جَازَ الْوَقْفُ وَالشَّرْطُ عِنْدَ اَبِيْ يُوْسُفَ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ الْوَقْفُ بَاطِلٌ. وَهٰذَا بِنَاءٌ عَلٰى مَا ذَكَرْنَا .

অনুবাদ : ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল হলো এই বর্ণনা যে, নবী করীম ﷺ নিজে সদকা থেকে খাদ্য গ্রহণ করতেন। আর এ সদকা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ওয়াক্‌ফকৃত সদকা। অথচ নিজের জন্য শর্তারোপ ছাড়া তা থেকে আহার করা হালাল নয়। সুতরাং বর্ণনাটি এরকম শর্তারোপের বৈধতা প্রমাণ করে।

তাছাড়া এ কারণে যে, ওয়াক্‌ফ হলো ছওয়াবের নিয়তে নিজের মালিকানা রহিত করে আল্লাহর নামে সাব্যস্ত করা। যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করে এসেছি। সুতরাং যখন অংশ বিশেষ বা সর্বাংশ নিজের জন্য বরাদ্দ করার শর্ত আরোপ করবে, তখন যা আল্লাহর মালিকানাধীন হয়ে গেছে তা নিজের মালিকানায় আনয়ন করা হবে নিজের মালিকানাধীন বস্তুকে নিজের মালিকানায় আনয়ন করা নয়। আর এটার বৈধতা রয়েছে। যেমন কেউ একটি সরাইখানা নির্মাণ করল, কিংবা পানি পান উৎস (কূপ, নলকূপ ইত্যাদি) স্থাপন করল কিংবা নিজের ভূমিকে কবরস্থান বানালো আর এই শর্ত আরোপ করলো যে, সে উক্ত সরাই খানায় অবতরণ করবে, উক্ত পানির উৎস হতে পানি পান করবে এবং উক্ত কবরস্থানে তাকে দাফন করা হবে।

তাছাড়া এ কারণে যে, তার (ওয়াক্‌ফকারীর) উদ্দেশ্য তো হলো ছওয়াব হাসিল করা। আর নিজের ব্যয় করতে ছওয়াব রয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- نفقة الرجل على نفسه صدقة অর্থাৎ মানুষের নিজের জন্য খরচ করাটাও সদকা।

ওয়াকফকারী যদি এ শর্ত আরোপ করে যে, যখন সে ইচ্ছা করবে ওয়াক্‌ফকৃত ভূমিকে অন্য ভূমি দ্বারা বদল করতে পারবে তাহলে ইমাম অবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে তা জায়েজ আছে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে ওয়াক্‌ফ জায়েজ কিন্তু শর্ত বাতিল। আর যদি ওয়াকফ করার ক্ষেত্রে নিজের জন্য তিন দিনের ইচ্ছাধিকারের শর্ত আরোপ করে, তাহলে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে ওয়াকফ ও শর্ত দুটোই বৈধ। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে ওয়াক্‌ফ বাতিল হয়ে যাবে।

এটা হচ্ছে আমাদের পূর্ববর্ণিত মাসআলার ভিত্তিতে। যেহেতু ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে ওয়াকফকারী নিজের জন্য ওয়াকফের আয় ব্যতিক্রমরূপে সাব্যস্ত করতে পারে, সেহেতু ইচ্ছাধিকার শর্তও আরোপ করতে পারে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَاَمَّا فَصْلُ الْوِلَايَةِ فَقَدْ نَصَّ فِيْهِ عَلٰى قَوْلِ اَبِيْ يُوْسُفَ، وَهُوَ قَوْلُ هِلَالٍ اَيْضًا وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ . وَذَكَرَ هِلَالٌ فِيْ وَقْفِهٖ وَقَالَ اَقْوَامٌ : اِنْ شَرَطَ الْوَاقِفُ الْوِلَايَةَ لِنَفْسِهٖ كَانَتْ لَهٗ وِلَايَةٌ، وَاِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ لَمْ تَكُنْ لَهٗ وِلَايَةٌ . قَالَ مَشَايِخُنَا : اَلْاَشْبَهُ اَنْ يَكُوْنَ هٰذَا قَوْلُ مُحَمَّدٍ، لِاَنَّ مِنْ اَصْلِهٖ اَنَّ التَّسْلِيْمَ اِلَى الْقَيِّمِ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الْوَقْفِ، فَاِذَا سَلَّمَ لَمْ يَبْقَ لَهٗ وِلَايَةٌ فِيْهِ . وَلَنَا اَنَّ الْمُتَوَلِّيْ اِنَّمَا يَسْتَفِيْدُ الْوِلَايَةَ مِنْ جِهَتِهٖ بِشَرْطِهٖ فَيَسْتَحِيْلُ اَنْ لَا يَكُوْنَ لَهُ الْوِلَايَةُ وَغَيْرُهٗ يَسْتَفِيْدُ الْوِلَايَةَ مِنْهُ، وَلِاَنَّهٗ اَقْرَبُ النَّاسِ اِلٰى هٰذَا الْوَقْفِ فَيَكُوْنُ أَوْلٰى بِوِلَايَتِهٖ، كَمَنْ اِتَّخَذَ مَسْجِدًا يَكُوْنُ اَوْلٰى بِعِمَارَتِهٖ وَنَصْبِ الْمُؤَذِّنِ فِيْهِ، وَكَمَنْ اَعْتَقَ عَبْدًا كَانَ الْوَلَاءُ لَهٗ لِاَنَّهٗ اَقْرَبُ النَّاسِ اِلَيْهِ . وَلَوْ اَنَّ الْوَاقِفَ شَرَطَ وِلَايَتَهٗ لِنَفْسِهٖ وَكَانَ الْوَاقِفُ غَيْرَ مَأْمُوْنٍ عَلَى الْوَقْفِ فَلِلْقَاضِيْ اَنْ يَنْزِعَهَا مِنْ يَدِهٖ نَظَرًا لِلْفُقَرَاءِ، كَمَا لَهٗ اَنْ يُخْرِجَ الْوَصِيَّ نَظَرًا لِلصِّغَارِ، وَكَذَا اِذَا شَرَطَ اَنْ لَيْسَ لِلسُّلْطَانِ وَلَا لِقَاضٍ اَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ يَدِهٖ وَيُوَلِّيَهَا غَيْرَهٗ لِاَنَّهٗ شَرْطٌ مُخَالِفٌ لِحُكْمِ الشَّرْعِ فَبَطَلَ ـ

অনুবাদ : আর পরিচালনার কর্তৃত্ব বা দায়িত্ব নিজের হাতে রাখার বিষয়টিকে ইমাম কুদূরী (র.) ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর মত বলে স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন। এটা শাইখ হিলাল-এর অভিমত এবং এটাই প্রকাশিত মাযহাব।

শায়খ হিলাল তাঁর কিতাবের ওয়াক্ফ অধ্যায়ে বলেছেন, একদল মাশায়েখ মত প্রকাশ করেছেন যে, ওয়াকফকারী যদি পরিচালনা কর্তৃত্ব নিজের জন্য থাকার শর্ত আরোপ করে তাহলে এ অধিকার তারই হবে। আর যদি শর্ত আরোপ না করে তাহলে তার কোনো কর্তৃত্ব থাকবে না।

আমাদের মাশায়েখগণ বলেছেন, এটাই অধিকতর যুক্তিসম্মত যে, এটা ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমত। কেননা তাঁর মূলনীতি এই যে, ওয়াক্ফ বৈধ হওয়ার জন্য শর্ত হলো তত্ত্বাবধায়কের হাতে অর্পণ করা। আর যখন অর্পণ করবে, তখন তাতে তার কোনো কর্তৃত্ব থাকবে না।

আমাদের দলিল এই যে, নিযুক্ত তত্ত্বাবধায়ক তারই পক্ষ হতে তারই আরোপিত শর্তের কারণে কর্তৃত্বভার লাভ করে থাকে। সুতরাং এটা অসম্ভব যে, অন্য লোক তার পক্ষ হতে কর্তৃত্ব লাভ করবে, অথচ তার নিজের জন্য কর্তৃত্ব সাব্যস্ত হতে পারবে না। তাছাড়া দ্বিতীয় দলিল এই যে, সেই হচ্ছে ওয়াক্ফকৃত সম্পত্তির নিকটতম ব্যক্তি। সুতরাং এর পরিচালনা কর্তৃত্বের ব্যাপারে সেই হবে অধিকতর হকদার। যেমন কেউ যদি মসজিদ বানায় তাহলে তার উন্নয়ন ও সংস্কারের ব্যাপারে এবং তাতে মুয়াজ্জিন নিয়োগের ব্যাপারে সেই অধিক হকদার হয়। তেমনি যে ব্যক্তি গোলাম আজাদ করল তার ওয়ালা (উত্তরাধিকার) তারই হয়ে থাকে, কেননা আজাদকারীই হচ্ছে তার নিকটতম ব্যক্তি।

যদি এমন হয় যে, ওয়াক্ফকারী পরিচালনাভার নিজের হাতে রাখার শর্ত আরোপ করল, কিন্তু ওয়াকফের সম্পত্তি হেফাজতের ক্ষেত্রে সে নির্ভরযোগ্য নয়, তাহলে দরিদ্রদের হক নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজির অধিকার রয়েছে। তার হাত থেকে তা নিয়ে নেওয়ার। যেমন তার অধিকার রয়েছে ছোট বাচ্চাদের স্বার্থ রক্ষার্থে ওয়াসীকে সম্পত্তির পরিচালনা থেকে বের করে দেওয়ার।

তদ্রূপ যদি সে শর্ত করে যে, কোনো শাসকের বা বিচারকের অধিকার হবে না যে, তা তার কব্জা থেকে নিয়ে অন্য কাউকে এর মুতাওয়াল্লী বানাবে। কেননা এটা শরিয়তের বিধান বিরোধী শর্ত। সুতরাং তা বাতিল হয়ে যাবে।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরে বর্ণিত ইবারতে ব্যাখ্যা নিম্নরূপ- قَالَ وَإِذَا جَعَلَ الخ ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ওয়াকফকারী ব্যক্তি যদি ওয়াকফের আয় নিজের জন্য বরাদ্দ করে, কিংবা ওয়াকফ সম্পদের পরিচালনার দায়িত্ব নিজের হাতে রেখে দেয়, তাহলে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে তা জায়েজ হবে। বলখের মাশায়েখগণ এ মতই গ্রহণ করেছেন এবং সদরুশশাহীদ (র.) এ অনুযায়ী ফতোয়া দিয়েছেন)।

قَالَ : ذَكَرَ فَصْلَيْنِ হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, ইমাম কুদূরী (র.) এখানে দুটি মাসআলা আলোচনা করতে চান একটি হলো, ওয়াকফকারী ব্যক্তির নিজের জন্য ওয়াকফের আয় বরাদ্দ করতে মাসআলা। অপরটি হলো, ওয়াকফের পরিচালনার দায়িত্ব নিজ হাতে রাখার মাসআলা।

প্রথম মাসআলার বিস্তারিত বিবরণ : ওয়াকফকারী ব্যক্তি যদি ওয়াকফের আয় পূর্ণ বা আংশিক নিজের জন্য বরাদ্দ করে তাহলে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে তা জায়েজ হবে।

ইমাম মুহাম্মদ ইমাম শাফী, ও হিলাল রাযী প্রমুখের মতে তা জায়েজ হবে না।

হিলাল রাযীর পরিচয় : তার নাম হলো হিলাল ইবনে ইয়াহইয়া আল বাসরী। তিনি ইউসুফ ইবনে খালিদ আল বাসরীর শিষ্য। তিনি ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর শিষ্য। বর্ণিত আছে ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম যুফার (র.) হতেও হিলাল রাযী ফিকহ অর্জন করেছেন।

اَلْمُغْرِبُ নামক কিতাবে উল্লেখ আছে, উপরিউক্ত আলেমের নাম (هِلَالُ الرَّازِيُّ) হিলাল রাযী বলা ভুল। সঠিক শব্দ হলো هِلَالُ الرَّأْي (বিস্তারিত দ্রষ্টব্য, বেনায়া ও তার পার্শ্বটীকা)

وَقِيلَ اِنَّ الْاِخْتِلَافَ الخ উপরিউক্ত ইখতিলাফটি সম্পর্কে দু-রকম মত পাওয়া যায়।

একটি মত হলো এই যে, উপরিউক্ত ইখতিলাফটি অন্য আরেকটি ইখতিলাফের উপর ভিত্তি করে হয়েছে। তা হলো এই যে, ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে ওয়াকফের সম্পত্তি ওয়াকফকারীর অন্যান্য সম্পদ হতে পৃথক করে মুতাওয়াল্লীর হাতে সোপর্দ করা শর্ত। তাই তার মতে আলোচ্য মাসআলা না জায়েজ। অর্থাৎ ওয়াকফের আয় নিজের জন্য বরাদ্দ করা জায়েজ নয়। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে পৃথক করা ও সোপর্দ করা শর্ত নয়। তাই তার মতে আলোচ্য মাসআলা জায়েজ। অর্থাৎ ওয়াকফের আয় ওয়াকফকারীর নিজের জন্য বরাদ্দ করা জায়েজ আছে।

দ্বিতীয় মতটি হলো এই যে, আলোচ্য ইখতিলাফটি একটি স্বতন্ত্র ইখতিলাফ, যা অন্য কোনো ইখতিলাফের ভিত্তিতে নয়। এ মতটিই প্রাধান্যযোগ্য। -[ফাতহুল কাদীর ৫ম খ. ৩৭ পৃষ্ঠা]

وَالْخِلَافُ فِيمَا إِذَا شَرَطَ আলোচ্য ইখতেলাফী মাসআলায় দুটি সুরত হতে পারে। ১. ওয়াকফকারী ব্যক্তি ওয়াকফ সম্পত্তির আয়ের অংশবিশেষ যেমন অর্ধেক বা এক তৃতীয়াংশ কিংবা এক চতুর্থাংশ নিজের জীবদ্দশায় নিজের জন্য বরাদ্দ করল এবং তার মৃত্যুর পর তা দরিদ্রদের জন্য হওয়ার শর্ত করল। ২. ওয়াকফকারী ব্যক্তি ওয়াকফ সম্পত্তির পূর্ণ আয় নিজের জীবদ্দশায় নিজের জন্য বরাদ্দ করল এবং মৃত্যুর পর তা দরিদ্রদের জন্য হওয়ার শর্ত করল।

গ্রন্থকার বলেন, উভয় সুরতে ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর ইখতিলাফ করবেন। অর্থাৎ ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে উভয় সুরত নাজায়েজ আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে উভয় সুরত জায়েজ।

وَلَوْ وَقَفَ وَشَرَطَ الْبَعْضَ اَوِ الْكُلَّ الخ - কেউ যদি কোনো সম্পদ ওয়াকফ করে এবং এ শর্ত আরোপ করে যে, উক্ত সম্পদের আংশিক আয় কিংবা পূর্ণ আর তার জীবদ্দশায় তার উম্মে ওয়ালাদ ও মুদাব্বারগণ ভোগ করবে। তাদের মৃত্যুর পর সাধারণ গরিব-মিসকিনরা ভোগ করবে, তাহলে এটা জায়েজ হবে কিনা এ বিষয়ে দু'রকম মত পাওয়া যায়।

কোনো কোনো মতে, এটা সর্বসম্মতিক্রমে জায়েজ। কোনো কোনো মতে এটা পূর্বোক্ত ইখতিলাফের আওতাভুক্ত এটিই বিশুদ্ধ মত। কেননা নিজের জীবদ্দশায় নিজ মুদাব্বার ও উম্মে ওয়ালাদদের জন্য আয় বরাদ্দ করা আর নিজের জন্য বরাদ্দ একই কথা। তাই তাতে পূর্বোক্ত ইখতিলাফই কার্যকর হবে। অর্থাৎ ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে জায়েজ হবে না, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে জায়েজ হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

দলিল পর্ব : আলোচ্য মাসআলায় ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতের পক্ষে দলিল ওয়াকফের মর্ম হলো নিজে সম্পদ হতে নিজের মালিকানা রহিত করে আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশায় অন্যকে উক্ত সম্পদের মুনাফার মালিক বানিয়ে দেওয়া।

অতএব, যদি আংশিক আয় বা পূর্ণ ওয়াকফকারীর নিজের জন্য বরাদ্দ করে, তাহলে ওয়াকফের মর্ম বাস্তবায়িত হয় না। তাই এটা জায়েজ হবে না। কেননা ব্যক্তি নিজেকে নিজের সম্পদের বা তার মুনাফার মালিক বানাতে পারে না। অথচ ওয়াকফের আয় নিজের জন্য বরাদ্দ করলে এটাই অবধারিত হয়।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, ওয়াকফের আয় নিজের জন্য বরাদ্দ করা হলে তা সদকার অংশ বিশেষ নিজের জন্য বরাদ্দ করার মতো হয়ে যায় এবং মসজিদের জন্য জমি ওয়াকফ করে তার কিছু অংশ নিজের জন্য বরাদ্দ করার মতো হয়ে যায়। অতএব, এ বিষয় দু'টি যেমন জায়েজ নয়। তেমনি ওয়াকফের আয়, নিজের জন্য বরাদ্দ করাও জায়েজ হবে না।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল :

১. শাইখুল ইসলাম খাহারযাদাহ (র.) তার মাবসূতে উল্লেখ করেছেন যে, যাইদ ইবনে সাবিত (রা.) বর্ণনা করেছে যে, নবী করীম ﷺ তার সদকা থেকে খাদ্য গ্রহণ করতেন। আর এ ক্ষেত্রে সদকা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ওয়াকফকৃত সদকা। আবার ওয়াকফকৃত সদকাও শর্ত করা ব্যতীত ভোগ করা জায়েজ নয়।

সুতরাং উক্ত বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ওয়াকফের আয় নিজের জন্য বরাদ্দ করা জায়েজ আছে।

২. وَلِأَنَّ الْوَقْفَ إِزَالَةٌ ওয়াকফর অর্থ হলো, নিজের মালিকানা বিলুপ্ত করে আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে আল্লাহর মালিকানায় দিয়ে দেওয়া।

সুতরাং ওয়াকফের আয় নিজের জন্য বরাদ্দ করলে, আল্লাহর মালিকানাধীন জিনিস নিজের জন্য বরাদ্দ করা হয়। বা নিজেকে মালিক বানানো হয়। নিজের মালের মালিক নিজেকে বানানো হয় না।

আর আল্লাহর মালিকানাধীন জিনিসের মালিক নিজেকে বানানো জায়েজ আছে। যেমন কেউ যদি একটি সরাইখানা নির্মাণ করে এবং এই শর্ত করে যে, সে নিজেও উক্ত সরাইখানায় অবস্থান করবে। তাহলে তা জায়েজ হয়। অনুরূপ যদি কূপ বা নলকূপ স্থাপন করে এ শর্ত আরোপ করে যে, সে নিজেও তা থেকে পানি পান করবে তাহলে তা জায়েজ হয়। তদ্রূপ যদি নিজ ভূমিকে কবরস্থান বানিয়ে এ শর্ত করে যে, কবরস্থানে তাকেও দাফন করা হবে, তাহলে তাও জায়েজ হয়। অথচ এসব ক্ষেত্রেও আল্লাহর মালিকানধীন বিষয়কে নিজের মালিকানা করা হয়। সুতরাং ওয়াকফের আংশিক বা পূর্ণ আয় নিজের জন্য বরাদ্দ করাও জায়েজ হবে।

৩. وَلِأَنَّ الْمَقْصُوْدَ مِنْهُ ওয়াকফের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা তথা ছওয়াব অর্জন করা। আর নিজের জন্য খরচ করাতেও ছওয়াব রয়েছে। কেননা রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, ব্যক্তি নিজের জন্য যা ব্যয় করে, তা সদকা, নিজ স্ত্রী সন্তানাদি ও গোলাম-বাঁদির জন্য যা খরচ করে তাও সদকা। (হাদীসটি নির্ভরযোগ্য সনদে ইবনে মাজাহ ও নাসায়ী শরীফে বর্ণিত হয়েছে)

ইবনে হিব্বান (র.) হযরত আবূ সাঈদ (র.) থেকে মারফূ'রূপে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি হালাল তরিকায় সম্পদ উপার্জন করে, অতঃপর তা দ্বারা নিজের খাবার কিংবা পোশাকের ব্যবস্থা করে অথবা আল্লাহর কোনো মাখলুককে দান করে, সে ব্যক্তির জন্য উক্ত ব্যয় জাকাত স্বরূপ। -[সহীহ ইবনে হিব্বান ও মুসতাদরাকে হাকিম]

এ প্রসঙ্গে এছাড়াও অনেক হাদীস রয়েছে। সুতরাং ওয়াকফের আয় নিজের জন্য বরাদ্দ করাতেও ওয়াকফের মূল উদ্দেশ্য যেহেতু অর্জন হয়, সেহেতু তা জায়েজ হবে।

وَلَوْ شَرَطَ الْوَاقِفُ أَنْ يَّسْتَبْدِلَ الخ ওয়াকফকারী ব্যক্তি যদি এ শর্ত আরোপ করে যে, কখনো তার ইচ্ছা হলে ওয়াকফের ভূমিটি অন্য ভূমি দ্বারা পরিবর্তন করতে পারবে, তাহলে এখন শর্তসহ ওয়াকফ জায়েজ হবে। বিশুদ্ধ হবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে। শাইখ হিলাল (র.)ও তাই বলেন এবং এ মতের উপরই ফতোয়া প্রদান করা হয়। -[খুলাসাতুল ফাতাওয়া, খণ্ড ৪. পৃ. ৪১৩]

পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে ওয়াকফ জায়েজ হবে কিন্তু আরোপিত শর্তটি বাতিল হবে। এটি ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর অভিমত।

وَلَوْ شَرَطَ الْخِيَارَ لِنَفْسِهِ الخ ওয়াকফকারী যদি নিজের জন্য তিন দিন ইচ্ছাধিকারের শর্ত আরোপ করে, অর্থাৎ যদি এরূপ বলে যে, ভূমিটি ওয়াকফ করার বা না করার ব্যাপারে আমার তিন দিন পর্যন্ত এখতিয়ার থাকবে- তাহলে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে ওয়াকফ এবং শর্ত উভয়টি জায়েজ হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে ওয়াকফ এবং শর্ত উভয়টি বাতিল হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

উল্লেখ্য যে, তিনি দিনের সময়সীমা উল্লেখ করার দ্বারা নির্দিষ্ট সময়কাল বুঝানো উদ্দেশ্য সুতরাং খিয়ারের সময়কাল যদি নির্ধারিত হয়, তাহলে উপরিউক্ত মতভেদ । আর যদি সময়সীমা নির্ধারিত না থাকে, তাহলে ইমাম মুহাম্মদ ও আবূ ইউসুফ উভয়ের মতে ওয়াকফ বাতিল হবে ।

وَهٰذَا بِنَاءٌ عَلٰى مَا ذَكَرْنَا এই মতভেদের ভিত্তি হলো পূর্ববর্ণিত মতভেদ ; অর্থাৎ ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর মতে যেহেতু ওয়াকফের আয় সারা জীবন নিজের জন্য বরাদ্ধ জায়েজ, সেহেতু তিন দিনের এখতিয়ার রাখাও জায়েজ আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে যেহেতু ওয়াকফের আয় নিজের জন্য বরাদ্ধ করা জায়েজ নয়, সেহেতু এখতিয়ার রাখাও জায়েজ নয়

দ্বিতীয় মাসআলা বিস্তারিত বিবরণ :

وَأَمَّا فَصْلُ الْوِلَايَةِ الخ ওয়াকফ সম্পত্তির তত্ত্বাবধান অধিকার বা পরিচালনার দায়িত্ব-কর্তৃত্ব সম্পর্কে ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ওয়াকফকারী ব্যক্তি যদি পরিচালনার দায়িত্ব নিজের জন্য সংরক্ষিত থাকবে বলে শর্ত আরোপ করে তাহলে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে তা জায়েজ হবে । এটা শাইখ হিলাল (র.)-এরও অভিমত এবং এটাই প্রকাশিত মাযহাব

শাইখ হিলাল (র.) তার কিতাবের ওয়াকফ অধ্যায়ে কতিপয় মাশায়েখের বক্তব্য উল্লেখ করেছেন যে, ওয়াকফকারী যদি ওয়াকফের সময় পরিচালনার কর্তৃত্ব নিজের হাতে রাখার শর্ত আরোপ করে, তাহলে তার জন্য কর্তৃত্ব সংরক্ষিত থাকবে

আর যদি শর্ত আরো না করে তাহলে তার কোনো কর্তৃত্ব থাকবে না । আমাদের মাশায়েখগণ বলেন, এটি ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মত হওয়া অধিক যুক্তি সম্মত ।

প্রকাশ থাকে যে, উপরিউক্ত বর্ণনা অনুসারে ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মাঝে কোনো মতপার্থক্য প্রতিভাত হয় না । অথচ দলিল বর্ণনা দ্বারা প্রতিভাত হয় যে, ইমামদ্বয়ের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে ; তাই এখানে হিদায়ার অন্যতম ভাষ্যকার আল্লামা ইবনুল হুমাম (র.)-এর বক্তব্য উদ্ধৃত করার প্রয়োজন অনুভব হয় ।

আল্লামা ইবনুল হুমাম (র.) বলেন, ফাতাওয়ায়ে কাযীখানে রয়েছে, ইমাম মুহাম্মদ (র.) সিয়ারে উল্লেখ করেছেন, কেউ যদি একটি ভূমি ওয়াকফ করে এবং তা মুতাওয়াল্লীর হাতে অর্পণ করে দেয়, তাহলে তাতে তার (ওয়াকফকারীর) কোনো কর্তৃত্ব থাকবে না । হ্যাঁ, যদি সে নিজের জন্য কর্তৃত্বের শর্ত আরোপ করে থাকে, আর যদি ওয়াকফের প্রারম্ভে এ শর্ত না করে থাকে তাহলে ওয়াকফ সম্পদ মুতাওয়াল্লীর হাতে অর্পণের পরে ওয়াকফকারীর কোনো কর্তৃত্ব থাকে না এ মাসআলাটির ভিত্তি হলো এই যে, ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে, ওয়াকফ সম্পদ মুতাওয়াল্লীর হাতে অর্পণ করা শর্ত সুতরাং অর্পণ করার পর তার কোনো কর্তৃত্ব থাকবে না । তবে শর্ত করে থাকলে থাকবে । আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে মুতাওয়াল্লীর হাতে অর্পণ করা শর্ত নয় । অতএব, ওয়াকফকারীর জন্য কর্তৃত্ব সংরক্ষিত থাকবে, যদিও সে এর শর্ত না করে । -[ফাতহুল কাদীর খ. ৫, পৃ. ৪৪২]

মোটকথা, ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মধ্যকার মতভেদ টি হলো এই যে, ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে ওয়াকফকারী ব্যক্তি যদি ওয়াকফ করার সময় কর্তৃত্বের শর্ত আরোপ করে তাহলে তার কর্তৃত্ব থাকবে, অন্যথায় থাকবে না । আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে শর্ত করুক আর না করুক সর্বাবস্থায় ওয়াকফকারীর কর্তৃত্ব থাকবে ।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর ১নং দলিল : .... لِأَنَّ الْمُتَوَلِّيْ, অর্থাৎ মুতাওয়াল্লী ওয়াকফ সম্পদ পরিচালনার কর্তৃত্ব লাভ করে ওয়াকফকারীর পক্ষ হতে, তারই শর্তক্রমে । তাই এমনটি অসম্ভব যে, ওয়াকফকারীর পক্ষ থেকে অন্য ব্যক্তি কর্তৃত্ব লাভ করবে আর তার কর্তৃত্ব থাকবে না ।

উল্লেখ্য যে, গ্রন্থকার (র.) ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল বর্ণনা করেছেন আমাদের দলিল বলে । এ থেকে এ দিকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, গ্রন্থকারের নিকট ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মত গ্রহণযোগ্য ।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর ২নং দলিল : .... وَلِأَنَّهُ أَقْرَبُ, ওয়াকফকারী ব্যক্তিই হলো ওয়াকফ সম্পদের সর্বাধিক নিকটতম ব্যক্তি । অতএব, সেই তার পরিচালনা ক্ষমতার জন্য সর্বাধিক উপযুক্ত বলে গণ্য হবে

যেমন কেউ যদি মসজিদ নির্মাণ করে তাহলে সেই উক্ত মসজিদ দেখা-শোনা করাও তাতে মুয়াজ্জিন নিয়োগ করার হকদার হয়ে থাকে । তেমনি কেউ যদি গোলাম আজাদ করে, তাহলে সেই তার উত্তরাধিকার লাভের উপযুক্ত হয়ে থাকে, নিকটবর্তীতার কারণে । সুতরাং ওয়াকফের ক্ষেত্রেও ওয়াকফকারী ব্যক্তি সর্বাধিক নিকটবর্তী হওয়া কারণে পরিচালনার কর্তৃত্ব সেই লাভ করবে

আনুষঙ্গিক আলোচনা : ১. ওয়াকফকারী ব্যক্তি যদি পরিচালনার দায়িত্ব নিজ হাতে রাখে, কিন্তু অনির্ভর যোগ্য হয়, তাহলে কাযী সাহেব তার হাত থেকে কর্তৃত্ব নিয়ে যাবে এবং উপযুক্ত মুতাওয়াল্লীর হাতে সোপর্দ করবে যাতে দরিদ্রদের হক নিরাপদ থাকে, নিশ্চিত থাকে । যেমন ছোট বাচ্চাদের হক নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে কোন অযোগ্য অছির হাত থেকে দায়িত্ব নিয়ে নেওয়া হয়

আনুষঙ্গিক আলোচনা : ২. ওয়াকফকারী যদি শর্ত করে যে, কাজি বা সুলতান কখনো তার হাত থেকে পরিচালনার দায়িত্ব উঠিয়ে, নিয়ে অন্য কে দিতে পারবে না, তাহলে এটি শরিয়তের বিধান বিরোধী একটি শর্ত হওয়ার কারণে বাতিল বলে গণ্য হবে

https://e-ilm.weebly.com/

فَصْلٌ : وَإِذَا بَنَى مَسْجِدًا لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ عَنْهُ حَتَّى يُفْرِزَهُ عَنْ مِلْكِهِ بِطَرِيْقِهِ وَيَأْذَنَ لِلنَّاسِ بِالصَّلَاةِ فِيْهِ، فَإِذَا صَلَّى فِيْهِ وَاحِدٌ زَالَ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ عَنْ مِلْكِهِ أَمَّا الْإِفْرَازُ فَلِأَنَّهُ لَا يَخْلُصُ لِلّٰهِ تَعَالَى إِلَّا بِهِ، وَأَمَّا الصَّلَاةُ فِيْهِ فَلِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ التَّسْلِيْمِ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ، وَيُشْتَرَطُ تَسْلِيْمُ نَوْعِهِ، وَذٰلِكَ فِي الْمَسْجِدِ بِالصَّلَاةِ فِيْهِ، أَوْ لِأَنَّهُ لَمَّا تَعَذَّرَ الْقَبْضُ فَقَامَ تَحَقُّقُ الْمَقْصُوْدِ مَقَامَهُ ثُمَّ يُكْتَفَى بِصَلَاةِ الْوَاحِدِ فِيْهِ فِيْ رِوَايَةٍ عَنْ أَبِيْ حَنِيْفَةَ، وَكَذَا عَنْ مُحَمَّدٍ؛ لِأَنَّ فِعْلَ الْجِنْسِ مُتَعَذِّرٌ فَيُشْتَرَطُ أَدْنَاهُ . وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ الصَّلَاةُ بِالْجَمَاعَةِ؛ لِأَنَّ الْمَسْجِدَ بُنِيَ لِذٰلِكَ فِي الْغَالِبِ وَقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ : يَزُوْلُ مِلْكُهُ بِقَوْلِهِ جَعَلْتُهُ مَسْجِدًا لِأَنَّ التَّسْلِيْمَ عِنْدَهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ؛ لِأَنَّهُ إِسْقَاطٌ لِمِلْكِ الْعَبْدِ فَيَصِيْرُ خَالِصًا لِلّٰهِ تَعَالَى بِسُقُوْطِ حَقِّ الْعَبْدِ وَصَارَ كَالْإِعْتَاقِ، وَقَدْ بَيَّنَّاهُ مِنْ قَبْلُ .

অনুবাদ : অনুচ্ছেদঃ কেউ যদি মসজিদ নির্মাণ করে তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত সেটাকে যথাযথভাবে নিজের মালিকানা থেকে পৃথক না করবে এবং সেখানে লোকদেরকে নামাজ পড়ার অনুমতি না দিবে ততক্ষণ তা তার মালিকানা থেকে বের হবে না। তবে যখনই (তার অনুমতিক্রমে) একজন মানুষ সেখানে নামাজ পড়বে তখনই ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তা তার মালিকানা থেকে বের হয়ে যাবে। পৃথক করার শর্ত এজন্য যে, এছাড়া জিনিসটি আল্লাহর জন্য খালেস হতে পারে না।

আর তাতে নামাজ পড়ার শর্ত এজন্য যে, ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে অর্পণ করা আবশ্যক। আর প্রতিটি জিনিসের ক্ষেত্রে ঐ শ্রেণির অর্পণ হলো শর্ত। তাই মসজিদের ক্ষেত্রে এই অর্পণ সম্পন্ন হবে তাতে নামাজ পড়ার দ্বারা। কিংবা এ কারণে যে, এখানে যেহেতু কবজা করার বাহ্যিকরূপ সম্ভব নয় (কারণ প্রকৃত কবজা ও দখল আল্লাহর) সেহেতু উদ্দেশ্যকে কবজার স্থলবর্তী করা হবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে প্রাপ্ত এক বর্ণনা মতে এতে একজনের নামাজ আদায়ই যথেষ্ট। ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকেও এরূপ বর্ণিত রয়েছে। কেননা নামাজের (সংখ্যাগত সমগ্র) জাতিসত্তার বাস্তবায়ন অসম্ভব। তাই তার সর্বনিম্নপরিমাণ শর্ত হবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) হতে অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, জামাতের সাথে নামাজ আদায় করা শর্ত হবে। কেননা সাধারণত এ উদ্দেশ্যেই মসজিদ নির্মিত হয়ে থাকে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, একে মসজিদ করলাম বলা দ্বারাই তার মালিকানা রহিত হয়ে যাবে। কেননা তার মতে ওয়াক্‌ফ যেহেতু বান্দার মালিকানা রহিত করার নাম, সেহেতু (মুতাওয়াল্লীর নিকট) অর্পণ করা শর্ত নয়। সুতরাং বান্দার হক রহিত হওয়ার দ্বারাই সেটা আল্লাহর জন্য খালেছ হয়ে যাবে। আর তা হয়ে গেল (দাস-দাসী) আজাদ করার মত এবং তা আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মসজিদের জন্য ভূমি ওয়াকফ করা হলে তার বিধান অন্যান্য ওয়াকফের বিধান হতে কিছুটা ভিন্ন হয়ে থাকে। তাই গ্রন্থকার (র.) মসজিদ সম্পর্কিত ওয়াকফের বিধি-বিধান স্বতন্ত্র অনুচ্ছে বর্ণনা করেছেন।

মসজিদ হিসাবে ওয়াকফ সম্পত্তির মালিকানা কখন রহিত হবে এ সম্পর্কে তিনটি বর্ণনা পাওয়া গেল।

১. ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে একজন লোক ওয়াকফের জায়গায় নামাজ আদায় করলে ওয়াকফকারীর মালিকানা রহিত হয়ে যায়।

২. ইমাম মুহাম্মদ (র.) হতে অন্য বর্ণনা মতে, জামাতের সাথে নামাজ পড়লেই মালিকানা রহিত হয়ে যায়। প্রকাশ থাকে যে, নামাজ আদায় করাটাই এক্ষেত্রে মুতাওয়াল্লীর হাতে অর্পণ করার স্থলাবর্তী।

৩. ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে মসজিদ বানালাম বলার দ্বারা মালিকনা রহিত হয়ে যায়। কারণ তার মতে সাধারণ ওয়াকফের ক্ষেত্রে অর্পণ শর্ত নয়। তাই মসজিদের ক্ষেত্রে নামাজ আদায়ও শর্ত নয়। বরং দাসমুক্ত করার ন্যায় কেবল ঘোষণাই যথেষ্ট হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ : وَمَنْ جَعَلَ مَسْجِدًا تَحْتَهُ سِرْدَابٌ اَوْ فَوْقَهُ بَيْتٌ وَجَعَلَ بَابَ الْمَسْجِدِ اِلَى الطَّرِيْقِ، وَعَزَلَهُ عَنْ مِلْكِه فَلَهُ اَنْ يَبِيْعَهُ، وَاِنْ مَاتَ يُوْرَثُ عَنْهُ: لِاَنَّهُ لَمْ يَخْلُصْ لِلّٰهِ تَعَالٰى لِبَقَاءِ حَقِّ الْعَبْدِ مُتَعَلِّقًا بِه. وَلَوْ كَانَ السِّرْدَابُ لِمَصَالِحِ الْمَسْجِدِ جَازَ كَمَا فِيْ مَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ . وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ : اِذَا جَعَلَ السُّفْلَ مَسْجِدًا وَعَلٰى ظَهْرِه مَسْكَنٌ فَهُوَ مَسْجِدٌ: لِاَنَّ الْمَسْجِدَ مِمَّا يَتَابَّدُ، وَذٰلِكَ يَتَحَقَّقُ فِي السُّفْلِ دُوْنَ الْعُلُوِّ . وَعَنْ مُحَمَّدٍ عَلٰى عَكْسِ هٰذَا: لِاَنَّ الْمَسْجِدَ مُعَظَّمٌ، وَاِذَا كَانَ فَوْقَهُ مَسْكَنٌ اَوْ مُسْتَغَلٌّ يَتَعَذَّرُ تَعْظِيْمُهُ. وَعَنْ اَبِيْ يُوْسُفَ اَنَّهُ جَوَّزَ فِي الْوَجْهَيْنِ حِيْنَ قَدِمَ بَغْدَادَ وَرَاٰى ضِيْقَ الْمَنَازِلِ فَكَاَنَّهُ اِعْتَبَرَ الضَّرُوْرَةَ . وَعَنْ مُحَمَّدٍ اَنَّهُ حِيْنَ دَخَلَ الرَّيَّ اَجَازَ ذٰلِكَ كُلَّهُ لِمَا قُلْنَا .

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, কেউ যদি এমন মসজিদ তৈরি করে যার নীচে (ভূগর্ভস্থ) কক্ষ রয়েছে কিংবা যার উপর (বিভিন্ন তালা) বা ঘর রয়েছে আর মসজিদের দরজা (বা প্রবেশ পথ) রাস্তার দিকে খুলে দেয় অতঃপর সেটা সে নিজের মালিকানা থেকে পৃথক করে দেয়, তাহলে তা সে বিক্রি করতে পারবে এবং মৃত্যুর পর তা তার পক্ষ হতে উত্তরাধিকারভুক্ত হবে। কেননা তার সাথে বান্দার হক যুক্ত থাকার কারণে তা আল্লাহর জন্য খালেস হয়নি। আর যদি ভূগর্ভস্থ কক্ষ মসজিদের জন্য নির্ধারিত হয়ে থাকে, তাহলে ওয়াকফ জায়েজ হবে ; যেমন বাইতুল মুকাদ্দাস মসজিদে রয়েছে।

হাসান ইবনে যিয়াদ ইমাম আবূ হানীফা (র.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, নীচের অংশকে মসজিদ এবং তার উপরের অংশ কে যদি বাসস্থানরূপে নির্ধারিত করে তাহলে তা মসজিদে রূপে গণ্য হবে। কেননা মসজিদ চিরস্থায়ী হয়ে থাকে, আর তা নীচের অংশেই হতে পারে, উপরের অংশে নয়।

আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) হতে এর বিপরীত মত বর্ণিত হয়েছে। কেননা মসজিদের সম্মানযোগ্য ঘর। কিন্তু তার উপরে যদি বাসস্থান থাকে কিংবা ভাড়া দেওয়া ঘর থাকে, তাহলে তার সম্মান রক্ষা করা কঠিন হয়ে যায়।

আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বাগদাদে এসে বাড়িঘরের সংকীর্ণতা দেখে উভয় ক্ষেত্রেই তিনি (মসজিদরূপে) অনুমোদন করেছেন, অর্থাৎ যেন তিনি প্রয়োজনের দিক বিবেচনা করেছেন।

আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি যখন রায় শহরে প্রবেশ করলেন, তখন তিনি আমাদের কথিত প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে সবগুলো সুরতকেই (মসজিদরূপে) অনুমোদন করেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিউক্ত ইবারতে মোট তিনটি মত বর্ণিত হয়েছে–

১. মসজিদের নীচে বা উপরে যদি বাসস্থান থাকে তাহলে যাহিরে রেওয়ায়েত অনুযায়ী তা মসজিদ হবে না

২. তবে যদি নীচ তলাকে মসজিদের কাজের জন্য নির্ধারণ করে দেওয়া হয়, তাহলে হবে। ২. নীচতলা মসজিদ ও উপর তলায় বাসস্থান হলে হাসান ইবনে যিয়াদের সূত্রে বর্ণিত আবূ হানীফা (র.)-এর মতানুসারে মসজিদ হবে ; ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে হবে না। কারণ মসজিদের উপরে বাসস্থান হলে মসজিদের সম্মান রক্ষা করা সম্ভব হবে না

৩. উপরে মসজিদ ও নীচে বাসস্থান হলে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে মসজিদ হবে

পরবর্তীতে জায়গার সংকীর্ণতা বিবেচনা করে ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) নিজের রায় পরিবর্তন করেছেন এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বর্ণিত সব কয়টি সুরতেই মসজিদ হবে বলে অনুমোদন করেছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ وَكَذٰلِكَ اِنِ اتَّخَذَ وَسَطَ دَارِهِ مَسْجِدًا وَاَذِنَ لِلنَّاسِ بِالدُّخُوْلِ فِيْهِ يَعْنِيْ لَهُ اَنْ يَبِيْعَهُ وَيُوْرَثُ عَنْهُ؛ لِاَنَّ الْمَسْجِدَ مَا لَا يَكُوْنُ لِاَحَدٍ فِيْهِ حَقُّ الْمَنْعِ، وَاِذَا كَانَ مِلْكُهُ مُحِيْطًا بِجَوَانِبِهِ كَانَ لَهُ حَقُّ الْمَنْعِ فَلَمْ يَصِرْ مَسْجِدًا، وَلِاَنَّهُ اَبْقَى الطَّرِيْقَ لِنَفْسِهِ فَلَمْ يَخْلُصْ لِلّٰهِ تَعَالٰى وَعَنْ مُحَمَّدٍ اَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوْرَثُ وَلَا يُوْهَبُ اِعْتَبَرَهُ مَسْجِدًا، وَهٰكَذَا عَنْ اَبِيْ يُوْسُفَ اَنَّهُ يَصِيْرُ مَسْجِدًا؛ لِاَنَّهُ لَمَّا رَضِيَ بِكَوْنِهِ مَسْجِدًا وَلَا يَصِيْرُ مَسْجِدًا اِلَّا بِالطَّرِيْقِ دَخَلَ فِيْهِ الطَّرِيْقُ وَصَارَ مُسْتَحِقًّا كَمَا يَدْخُلُ فِي الْاِجَارَةِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرٍ .

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন (একই বিধান হবে) **তদ্রূপ যদি নিজের বাড়ির মধ্যস্থলে মসজিদ বানায় এবং মানুষকে তাতে প্রবেশের অনুমতি দেয়।** অর্থাৎ তার বিক্রি করার অধিকার থাকবে এবং সেটা তার পক্ষ থেকে উত্তরাধিকার হবে। কেননা মসজিদ এমন স্থল ও ভবনকে বলে যেখানে কারো (কাউকে) বাঁধাদানের অধিকার না থাকে। অথচ তার মালিকানাধীন ভূমি যদি মসজিদের চতুর্দিক বেষ্টন করে থাকে তখন তার বাঁধা দানের অধিকার থাকবে। সুতরাং তা মসজিদ হলো না। কেননা সে নিজের জন্য রাস্তা রেখেছে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার জন্য খালেস হলো না।

আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, বিক্রি করা যাবে না তাতে উত্তরাধিকারও জারি হবে না এবং তা হেবা করা যাবে না। এটা কে তিনি মসজিদ গণ্য করেছেন। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে যে, তা মসজিদ হবে। কেননা যখন সে সেটাকে মসজিদ বানাতে রাজি হয়েছে, আর রাস্তা ছাড়া মসজিদ হতে পারে না। তখন রাস্তা তার অন্তর্ভুক্ত হবে এবং তা (মসজিদের) প্রাপ্যরূপে গণ্য হবে। যেমন বাড়ি ভাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে উল্লেখ করা ছাড়াই রাস্তা অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিউক্ত ইবারতের সারমর্ম হলো, কেউ যদি নিজ বাড়ির মাঝখানে মসজিদ নির্মাণ করে, ফলে মসজিদের চার পাশে তার মালিকানাধীন ভূমিতে বেষ্টিত হয়ে যায়, তাহলে উক্ত মসজিদ মসজিদরূপে গণ্য হবে কিনা এ নিয়ে দুটি মত বর্ণিত হয়েছে।

১. মসজিদ রূপে গণ্য হবে না। কারণ মসজিদের চার পাশে নিজের ভূমি থাকার কারণে বাধা দেওয়ার অধিকার থাকবে। অথচ মসজিদে কেউ কাউকে বাধা দিতে পারে না।

২. ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে তা মসজিদ বলে গণ্য হবে এবং পার্শ্ববর্তী ভূমিতে মসজিদের যাতায়াতের জন্য রাস্তা বানিয়ে দিতে হবে। তা মসজিদের হক বলে গণ্য হবে। যেমন বাড়ি ভাড়া দিলে রাস্তার কথা উল্লেখ না করলেও রাস্তা দিতে হয়।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ وَمَنِ اتَّخَذَ اَرْضَهُ مَسْجِدًا لَمْ يَكُنْ لَهُ اَنْ يَرْجِعَ فِيْهِ وَلَا يَبِيْعَهُ وَلَا يُوْرَثُ عَنْهُ لِاَنَّهُ تَجَرَّدَ عَنْ حَقِّ الْعِبَادِ وَصَارَ خَالِصًا لِلّٰهِ، وَهٰذَا لِاَنَّ الْاَشْيَاءَ كُلَّهَا لِلّٰهِ تَعَالٰى، وَاِذَا اَسْقَطَ الْعَبْدُ مَا ثَبَتَ لَهُ مِنَ الْحَقِّ رَجَعَ اِلٰى اَصْلِهِ فَانْقَطَعَ تَصَرُّفُهُ عَنْهُ كَمَا فِي الْاِعْتَاقِ . وَلَوْ خَرِبَ مَا حَوْلَ الْمَسْجِدِ وَاسْتُغْنِيَ عَنْهُ يَبْقٰى مَسْجِدًا عِنْدَ اَبِيْ يُوْسُفَ لِاَنَّهُ اِسْقَاطٌ مِنْهُ فَلَا يَعُوْدُ اِلٰى مِلْكِهِ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَعُوْدُ اِلٰى مِلْكِ الْبَانِيْ، اَوْ اِلٰى وَارِثِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ؛ لِاَنَّهُ عَيَّنَهُ لِنَوْعِ قُرْبَةٍ، وَقَدْ اِنْقَطَعَتْ فَصَارَ كَحَصِيْرِ الْمَسْجِدِ وَحَشِيْشِهِ اِذَا اُسْتُغْنِيَ عَنْهُ، اِلَّا اَنَّ اَبَا يُوْسُفَ يَقُوْلُ فِي الْحَصِيْرِ وَالْحَشِيْشِ اِنَّهُ يُنْقَلُ اِلٰى مَسْجِدٍ اٰخَرَ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কেউ যদি নিজের জমিকে মসজিদ বানিয়ে ফেলে তাহলে সেটা ফেরত নেওয়ার এবং বিক্রি করার অধিকার তার থাকে না এবং তা তার পক্ষ থেকে উত্তরাধিকার হয় না। কেননা তা বান্দার হক থেকে পৃথক হয়ে গেছে এবং আল্লাহর জন্য খালিস হয়ে গেছে। কারণ যাবতীয় বস্তু প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর মালিকানাধীন। আর বান্দার যে হক সাব্যস্ত হয়েছিল তা যখন সে রহিত করে দিল, তখন তা প্রকৃত অবস্থায় ফিরে যাবে এবং তাতে তার হস্তক্ষেপের অধিকার রহিত হয়ে যাবে। যেমন গোলাম আজাদ করার ক্ষেত্রে।

মসজিদের পার্শ্ববর্তী এলাকা যদি বিরাণ হয়ে যায় এবং মসজিদের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যায়, তাহলে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে তা মসজিদ রূপেই বহাল থাকবে। কেননা এটা হলো বান্দার পক্ষ হতে মালিকানা রহিত করণ। সুতরাং তা আর মালিকানার দিকে ফিরে আসতে পারে না।

ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে প্রতিষ্ঠাতার কিংবা তার মৃত্যুর পরে তার উত্তরাধিকারীদের মালিকানায় ফিরে যাবে। কেননা এটাকে সে বিশেষ প্রকার ছওয়াবের কাজের জন্য নির্ধারিত করেছিল। আর তা বন্ধ হয়ে গেছে। সুতরাং এটা মসজিদের অপ্রয়োজনীয় চাটাই ও মাদুরের মতো হলো। তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) চাটাই ও মাদুর সম্পর্কে বলেন যে, এগুলো অন্য মসজিদে স্থানান্তর করা হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

জমিকে মসজিদে রূপান্তরিত করলে তা আর বেচা যায় না, ফেরত নেওয়া যায় না এবং মিরাসও হয় না। এ ব্যাপারে হানাফী মাযহাবের সকল ফকীহ একমত। কারণ সর্বকিছুর মালিক হলেন আল্লাহ তা'আলা। এরপর বিভিন্ন কিছুতে আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে ভোগের অধিকার দিয়েছেন। ওয়াকফকারী জমিকে মসজিদ বানানোর মাধ্যমে নিজের সে অধিকার রহিত করে দিয়েছে। তাই তাতে কোনোরূপ হস্তক্ষেপের অধিকার আর সে পাবে না। বরং সম্পদটি প্রকৃত অবস্থায় আল্লাহর মালিকানায় ফিরে যাবে। যেমন দাস-দাসী আজাদ করলে চিরতরে মালিকানা রহিত হয়ে যায়। কখনো তা ফেরত পাওয়া যায় না।

মসজিদের পার্শ্ববর্তী জনবসতি বিরান হয়ে গেলে এবং মসজিদের প্রয়োজন শেষ হয়ে, ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে তা প্রতিষ্ঠাতার মালিকানায় ফিরে যাবে, কিংবা তার অবিদ্যমানে তার উত্তরাধিকারীদের মালিকানা হয়ে যাবে।

তার যুক্তি হলো, মসজিদ বানানো হয়েছিল নির্দিষ্ট এক প্রকার ছওয়াবের কাজের জন্য। যার সুযোগ এখন শেষ হয়ে গেছে, তাই তা পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাবে। যেমন মসজিদের চাটাই, মাদুর ইত্যাদি প্রয়োজন শেষ হলে যেমন মালিকের মালিকানায় ফিরে যায়।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, ওয়াকফ করার অর্থ হলো মালিকানা রহিত করা। তাই তা পুনরায় মালিকানা হওয়ার কোনো অবকাশ নেই। প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলেও তা চিরদিন মসজিদ হিসাবেই থাকবে। অনুরূপভাবে তার মতে মসজিদের চাটাই, মাদুর ইত্যাদির প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়ে গেলে অন্য মসজিদে স্থানান্তর করবে।

প্রকাশ থাকে যে, মসজিদ ও মসজিদের চাটাই মাদুর সম্পর্কে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতানুসারেই ফতোয়া।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ وَمَنْ بَنَى سِقَايَةً لِلْمُسْلِمِيْنَ اَوْ خَانًا يَسْكُنُهُ بَنُو السَّبِيْلِ اَوْ رِبَاطًا اَوْ جَعَلَ اَرْضَهُ مَقْبَرَةً لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ عَنْ ذٰلِكَ حَتّٰى يَحْكُمَ بِهِ الْحَاكِمُ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ؛ لِاَنَّهُ لَمْ يَنْقَطِعْ عَنْ حَقِّ الْعَبْدِ؛ اَلَا تَرٰى اَنَّ لَهُ اَنْ يَنْتَفِعَ بِهٖ فَيَسْكُنُ فِي الْخَانِ وَيَنْزِلُ فِي الرِّبَاطِ وَيَشْرَبُ مِنَ السِّقَايَةِ، وَيُدْفَنُ فِي الْمَقْبَرَةِ فَيُشْتَرَطُ حُكْمُ الْحَاكِمِ اَوِ الْاِضَافَةُ اِلٰى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ كَمَا فِي الْوَقْفِ عَلَى الْفُقَرَاءِ. بِخِلَافِ الْمَسْجِدِ؛ لِاَنَّهُ لَمْ يَبْقَ لَهُ حَقُّ الْاِنْتِفَاعِ بِهٖ فَخَلَصَ لِلّٰهِ تَعَالٰى مِنْ غَيْرِ حُكْمِ الْحَاكِمِ۔

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কেউ যদি মুসলমানদের জন্য পানকেন্দ্র (পানির উৎস যেমন কূপ, নলকূপ ইত্যাদি) স্থাপন করে কিংবা মুসাফিরদের অবস্থানের জন্য সরাইখানা কিংবা মুসাফিরখানা তৈরি করে কিংবা নিজের ভূমিকে কবরস্থান বানায় তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে শাসকের আদেশের পূর্ব পর্যন্ত তা থেকে তার মালিকানা বিলুপ্ত হবে না। কেননা সেটা বন্দার হক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়নি ; দেখুন না তা দ্বারা তার উপকৃত হওয়ার অধিকার থাকে ; তাই সে সরাইখানায় বাস করতে পারে, মুসাফিরখানায় অবস্থান করতে পারে, পানকেন্দ্র হতে পানি পান করতে পারে এবং কবরস্থানে সমাহিত হতে পারে। সুতরাং শাসকের নির্দেশ কিংবা মৃত্যু পরবর্তী সময়ের সম্পৃক্ত করার শর্ত থাকবে ; যেমন গরিব-মিসকিনদের নামে ওয়াক্ফ করার ক্ষেত্রে (শর্ত থাকে) মসজিদের বিষয়টি ভিন্ন ; কেননা তা দ্বারা উপকৃত হওয়ার অধিকার তার থাকে না। বিধায় বিচারকের বা শাসকের নির্দেশ ছাড়াই তা আল্লাহর জন্য খালিস হয়ে যায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

خَان সরাইখানা, পথিক ও মুসাফিরদের বিশ্রাম করার জন্য কিংবা রাত্রি যাপনের জন্য যে ঘর নির্মাণ করা হয়, তা যাত্রী ছাউনী।

رِبَاط কেল্লা, দুর্গ, সীমান্ত পাহারায় নিয়োজিত সৈন্যদের অবস্থান কেন্দ্র, সরাইখানা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়।

মাসআলার সারমর্ম হলো সরাইখানা, কবরস্থান, পানকেন্দ্র ও এ জাতীয় জনকল্যাণমূলক কাজে ওয়াকফকৃত ভূমি থেকে ওয়াকফকারীর মালিকানা বিলুপ্ত হওয়ার জন্য শর্ত হলো (ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে) ওয়াকফ সম্পর্কে শাসকের রায় কিংবা মৃত্যুর পরবর্তী সময়ের সাথে সম্পৃক্ত করণ।

আর মসজিদের ক্ষেত্রে এ ধরনের কিছুই শর্ত নয়। পার্থক্যের কারণ হলো, সাধারণ ওয়াকফ দ্বারা ওয়াকফকারী ব্যক্তি উপকৃত হতে পারে ; মসজিদের জন্য ওয়াকফকৃত সম্পদ দ্বারা ওয়াকফকারী উপকৃত হতে পারে না।

প্রকাশ থাকে যে, মসজিদের ওয়াকফের বিধান অন্যান্য ওয়াকফের বিধান হতে অনেকটা ভিন্ন। যেমন, মসজিদের ক্ষেত্রে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মত হলো, তা মুতাওয়াল্লীর হাতে অর্পণ করা শর্ত নয়। অথচ তার মতে অন্যান্য ওয়াকফ সম্পদ মুতাওয়াল্লীর হাতে অর্পণ করা শর্ত। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে মসজি‌দের জন্য ওয়াকফের ক্ষেত্রে এজমালি ও শরিকানা সম্পত্তি ও বাধা নয়। মসজিদের জন্য ওয়াকফকৃত ভূমি শাসকের নির্দেশ ও মৃত্যুর পরের সাথে সম্পৃক্ত করা ছাড়াই মালিকানা থেকে বের হয়ে যায়। অথচ অন্যান্য ওয়াকফ সম্পত্তির ক্ষেত্রে শাসকের আদেশ বা মৃত্যুর পরের সাথে সম্পৃক্ত করা ব্যতীত (ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে) ওয়াকফকারীর মালিকানা বিলুপ্ত হয় না।

https://e-ilm.weebly.com/

وَعِنْدَ اَبِيْ يُوْسُفَ يَزُوْلُ مِلْكُهُ بِالْقَوْلِ كَمَا هُوَ اَصْلُهُ، اِذِ التَّسْلِيْمُ عِنْدَهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ وَالْوَقْفُ لَازِمٌ . وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ اِذَا اسْتَقَى النَّاسُ مِنَ السِّقَايَةِ وَسَكَنُوْا الْخَانَ وَالرِّبَاطَ وَدُفِنُوْا فِي الْمَقْبَرَةِ زَالَ الْمِلْكُ؛ لِاَنَّ التَّسْلِيْمَ عِنْدَهُ شَرْطٌ وَالشَّرْطُ تَسْلِيْمُ نَوْعِهِ، وَذٰلِكَ بِمَا ذَكَرْنَاهُ . وَيُكْتَفٰى بِالْوَاحِدِ لِتَعَذُّرِ فِعْلِ الْجِنْسِ كُلِّهِ، وَعَلٰى هٰذَا الْبِئْرُ الْمَوْقُوْفَةُ وَالْحَوْضُ، وَلَوْ سَلَّمَ اِلَى الْمُتَوَلِّيْ صَحَّ التَّسْلِيْمُ فِيْ هٰذِهِ الْوُجُوْهِ كُلِّهَا؛ لِاَنَّهُ نَائِبٌ عَنِ الْمَوْقُوْفِ عَلَيْهِ، وَفِعْلُ النَّائِبِ كَفِعْلِ الْمَنُوْبِ عَنْهُ، وَاَمَّا فِي الْمَسْجِدِ فَقَدْ قِيْلَ لَا يَكُوْنُ تَسْلِيْمًا؛ لِاَنَّهُ لَا تَدْبِيْرَ لِلْمُتَوَلِّيْ فِيْهِ، وَقِيْلَ يَكُوْنُ تَسْلِيْمًا؛ لِاَنَّهُ يَحْتَاجُ اِلٰى مَنْ يَكْنُسُهُ وَيُغْلِقُ بَابَهُ، فَاِذَا سُلِّمَ اِلَيْهِ صَحَّ التَّسْلِيْمُ، وَالْمَقْبَرَةُ فِيْ هٰذَا بِمَنْزِلَةِ الْمَسْجِدِ عَلٰى مَا قِيْلَ؛ لِاَنَّهُ لَا مُتَوَلِّيَ لَهُ عُرْفًا . وَقِيْلَ هِيَ بِمَنْزِلَةِ السِّقَايَةِ وَالْخَانِ فَيَصِحُّ التَّسْلِيْمُ اِلَى الْمُتَوَلِّيْ؛ لِاَنَّهُ لَوْ نُصِبَ الْمُتَوَلِّيْ يَصِحُّ، وَاِنْ كَانَ بِخِلَافِ الْعَادَةِ ـ

অনুবাদ : আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে বলার দ্বারাই মালিকনা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এটাই তাঁর মূলনীতি। কেননা তাঁর মতে মুতাওয়াল্লীর হাতে অর্পণ করা শর্ত নয় এবং ওয়াক্‌ফ (তার মতে) বাধ্যতামূলক .

আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে মানুষ যখন প্রাণকেন্দ্র হতে পান করবে, সরাইখানা ও মুসাফির খানায় অবস্থান করবে এবং কবরস্থানের দাফন করবে তখন ওয়াকফকারীর মালিকানা রহিত হয়ে যাবে। কেননা তার মতে (মুতাওয়াল্লীর হাতে) অর্পণ করা শর্ত। আর এ শর্ত পূর্ণ হয় ওয়াকফকৃত প্রত্যেক প্রকার বস্তুর যথাযথ অর্পণের মাধ্যমে। আর সেটা আমাদের বর্ণিত কাজসমূহ দ্বারাই হবে। তবে এক জনের ব্যবহারের দ্বারা অর্পন সাব্যস্ত হয়ে যাবে। কেননা সমগ্র জাতিসত্তার ব্যবহার সাব্যস্ত করা সম্ভব নয়।

ওয়াক্‌ফকৃত কূপ ও হাউজ সম্পর্কেও একই হুকুম। আর যদি মুতাওয়াল্লীর হাতে অর্পণ করে দেয় তাহলে এ সকল ক্ষেত্রে অর্পণ শুদ্ধ হবে। কেননা মুতাওয়াল্লী হলো যাদের নামে ওয়াকফকারী হয়েছে তাদের নায়েব। আর নায়েবের কর্ম মূল ব্যক্তির কর্মের ন্যায়।

মসজিদ সম্পর্কে কেউ কেউ বলেছেন যে, তাতে অর্পণ সাব্যস্ত হবে না। কারণ মসজিদের ক্ষেত্রে মুতাওয়াল্লীর কোনো ভূমিকা নেই।

আবার কেউ কেউ বলেছেন, তা অর্পণ বলে সাব্যস্ত হবে। কেননা মসজিদ ঝাড়ু দেওয়া এবং দরজা-জানালা বন্ধ করার লোকের প্রয়োজন হয়। সুতরাং তার হাতে অর্পণ করলে অর্পণ সিদ্ধ হবে।

কোনো কোনো মতে কবরস্থান এক্ষেত্রে মসজিদের পর্যায়ভুক্ত। কেননা লোক প্রচলন হিসাবে এর কোন মুতাওয়াল্লী থাকে না।

আর কেউ কেউ বলেছেন যে, এটি পানকেন্দ্র ও সরাই খানার পর্যায়ভুক্ত। সুতরাং মুতাওয়াল্লীর হাতে অর্পণ করা সিদ্ধ হবে। কেননা মুতাওয়াল্লী নিয়োগ করা হলে তা বৈধ হয়, যদিও এর প্রচলন নেই।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মসজিদ ব্যতীত অন্যান্য সাধারণ ওয়াক্‌ফ সম্পদ হতে ওয়াক্‌ফকারীর মালিকানা বিলুপ্ত হওয়া সম্পর্কে সাহেবাইনের মতামত বর্ণিত হয়েছে এই ইবারতে।

যার সারসংক্ষেপ এই যে, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে যেহেতু ওয়াকফ সম্পদ মুতাওয়াল্লীর হাতে অর্পণ করা শর্ত নয়, সেহেতু ওয়াকফের ঘোষণা করা দ্বারা ওয়াক্‌ফকারীর মালিকনা বিলুপ্ত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে ওয়াক্‌ফ সম্পদ মুতাওয়াল্লীর হাতে অর্পণ করা শর্ত। তাই তার মতে কেবল ঘোষণা দ্বারা মালিকনা বিলুপ্ত হবে না। বরং অর্পণ করার পরই মালিকানা বিলুপ্ত হবে। আর এক এক সম্পদের অর্পণ এক এক রকম হয়ে থাকে। যেমন পানির উৎস হতে পানি করা দ্বারা, সরাইখানায় কোনো মুসাফির অবস্থান করা দ্বারা, কবরস্থান কাউকে দাফন করা দ্বারা। অতএব, এসব কাজের দ্বারা সংশ্লিষ্ট ওয়াকফ সম্পত্তি হতে ওয়াক্‌ফকারীর মালিকনা বিলুপ্ত হবে। আর যাদের জন্য ওয়াকফ করা হয়েছে, তাদের সকালের কাজ বাস্তবায়ন যেহেতু সম্ভব নয়, সেহেতু একজনের কাজ দ্বারা অর্পণ সাব্যস্ত হবে। যেমন সরাইখানা ওয়াক্‌ফ করা মুসাফিরদের অবস্থানের জন্য। এখন সকল মুসাফিরের অবস্থান কর্ম বাস্তবায়ন করা অসম্ভব বিধায় একজন মুসাফির অবস্থান করলেই অর্পণ সাব্যস্ত হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে কবরস্থান ওয়াক্‌ফ করা হয়েছে। মুসলমানদের দাফন করার জন্য। এখন সকল মুসলমানকে দাফন করা সম্ভব নয় বিধায় একজনকে দাফন করার দ্বারাই অর্পণ সাব্যস্ত হবে এবং ওয়াকফকারীর মালিকানা বিলুপ্ত হবে।

সাধারণ ওয়াক্‌ফ সম্পত্তিতে উপরিউক্ত কাজ ছাড়াই মুতাওয়াল্লীর হাতে সোপর্দ করলেও অর্পণ সাব্যস্ত হবে।

কারণ মুতাওয়াল্লী হচ্ছে ঐসব লোকের নায়েব, যাদের জন্য ওয়াক্‌ফ করা হয়েছে। তাই মুতাওয়াল্লীর কাজ তাদের কাজের স্থানভিত্তিক ।

বিঃ দ্রঃ মাবসূতে উল্লেখ রয়েছে যে, এ সকল মাসআলায় সাহেবাইনে মতের উপর ফতোয়া প্রদান করা হয় এবং এর উপরই উম্মতের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

মসজিদ সম্পর্কে দুটি মত। ১. মুতাওয়াল্লীর হাতে অর্পণ করলে অর্পণ সাব্যস্ত হবে না। কারণ মসজিদের ক্ষেত্রে মুতাওয়াল্লীর কোনো ভূমিকা নেই। ২. মুতাওয়াল্লীর হাতে অর্পণ করলে অর্পণ সাব্যস্ত হবে। কারণ মসজিদ ঝাড়ু দেওয়ার জন্য এবং দরজা-জানালা বন্ধ করার জন্য একজন লোকের প্রয়োজন।

কবরস্থানের ব্যাপারেও দুটি মত। ১. কবরস্থান মসজিদের পর্যায়ভুক্ত। অর্থাৎ মুতাওয়াল্লীর হাতে অর্পণ করলে অর্পণ সাব্যস্ত হবে না। কারণ লোক প্রচলনে কবরস্থানের কোনো মুতাওয়াল্লী থাকে না।

২. কবরস্থান, সরাইখানা ইত্যাদির পর্যায়ভুক্ত। কারণ কবরস্থানের মুতাওয়াল্লী নিয়োগ করলে তা জায়েজ হয়। প্রচলন না থাকা সত্ত্বেও। তাই তার হাতে অর্পণ সাব্যস্ত হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَلَوْ جَعَلَ دَارًا لَهُ بِمَكَّةَ سُكْنَى لِحَاجِّ بَيْتِ اللّٰهِ وَالْمُعْتَمِرِيْنَ، اَوْ جَعَلَ دَارَهُ فِيْ غَيْرِ مَكَّةَ سُكْنَى لِلْمَسَاكِيْنِ، اَوْ جَعَلَهَا فِيْ ثَغْرٍ مِنَ الثُّغُوْرِ سُكْنَى لِلْغُزَاةِ وَالْمُرَابِطِيْنَ . اَوْ جَعَلَ غَلَّةَ اَرْضِهِ لِلْغُزَاةِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَدَفَعَ ذٰلِكَ اِلٰى وَالٍ يَقُوْمُ عَلَيْهِ فَهُوَ جَائِزٌ، وَلَا رُجُوْعَ فِيْهِ لِمَا بَيَّنَّا اِلَّا اَنَّ فِي الْغَلَّةِ تَحِلُّ لِلْفُقَرَاءِ دُوْنَ الْاَغْنِيَاءِ، وَفِيْمَا سِوَاهُ مِنْ سُكْنَى الْخَانِ وَالْاِسْتِقَاءِ مِنَ الْبِئْرِ وَالسِّقَايَةِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ يَسْتَوِيْ فِيْهِ الْغَنِيُّ وَالْفَقِيْرُ، وَالْفَارِقُ هُوَ الْعُرْفُ فِي الْفَصْلَيْنِ . فَاِنَّ اَهْلَ الْعُرْفِ يُرِيْدُوْنَ بِذٰلِكَ فِي الْغَلَّةِ الْفُقَرَاءَ، وَفِيْ غَيْرِهَا التَّسْوِيَةَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ، وَلِاَنَّ الْحَاجَةَ تَشْمَلُ الْغَنِيَّ وَالْفَقِيْرَ فِي الشُّرْبِ وَالنُّزُوْلِ . وَالْغَنِيُّ لَا يَحْتَاجُ اِلٰى صَرْفِ هٰذَا الْغَلَّةِ لِغِنَاهُ، وَاللّٰهُ تَعَالٰى اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .

অনুবাদ : যদি কেউ মক্কাস্থ নিজের বাড়িকে হাজী ও ওমরাকারীদের বাসস্থান বানিয়ে দেয় কিংবা মক্কা ছাড়া অন্য কোথাও নিজের বাড়িকে গরিব-মিসকিনদের আশ্রয় কেন্দ্র বানিয়ে দেয় কিংবা সীমান্ত এলাকায় কোনো বাড়িকে মুজাহিদ ও সীমান্ত প্রহরীদের জন্য বাসস্থান বানিয়ে দেয় কিংবা নিজের জমির ফসলকে আল্লাহর পথের সৈনিকদের জন্য ওয়াকফ করে দেয় এবং তা একজনে মুতাওয়াল্লীর হাতে অর্পণ করে, যিনি তার তত্ত্বাবধান করবেন, তাহলে তা জায়েজ হবে। আর আমাদে পূর্ববর্ণিত কারণে তা ফেরত দেওয়া যাবে না। তবে ফসলের ক্ষেত্রে গরিবদের জন্য তা ব্যবহার করা হালাল হবে, ধনীদের জন্য নয়। এছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন সরাইখানায় অবস্থান করা, কূপ ও পানকেন্দ্র হতে পানি সংগ্রহ করা ইত্যাদির ক্ষেত্রে ধনী-গরিব সমান। উভয় ক্ষেত্রে পার্থক্যকারী হলো লোক প্রচলন। কেননা লোক সমাজ ফসলের ক্ষেত্রে গরিবদের উদ্দেশ্য করে থাকে। পক্ষান্তরে অন্য সকল ক্ষেত্রে গরিব ও ধনীর মাঝে সমতা উদ্দেশ্য করে।

তা ছাড়া পানি সংগ্রহ করাও অবস্থান করার প্রয়োজন তো ধনী-গরিব উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। পক্ষান্তরে ধনী ব্যক্তি তার ধনাঢ্যের কারণে এ জাতীয় আয় ভোগ করার মুখাপেক্ষী নয়। (সঠিক বিষয় আল্লাহই ভালো জানেন)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিউক্ত ইবারতে চারটি ওয়াকফ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

১. মক্কায় অবস্থিত বাড়িঘর হাজী ও ওমরাকারীদের জন্য ওয়াকফ করে দেওয়া।

২. মক্কা ছাড়া অন্য কোথাও অবস্থিত বাড়িঘর গরিবদের জন্য আশ্রয় কেন্দ্র হিসাবে ওয়াকফ করে দেওয়া।

৩. মুসলিম দেশের সীমান্ত এলাকায় অবস্থিত কোন বাড়িঘর মুজাহিদ অথবা সীমান্ত প্রহরীদের জন্য ওয়াকফ করে দেওয়া

৪. নিজের ভূমির আয় আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদদের জন্য ওয়াকফ করে দেওয়া।

গ্রন্থকার বলেন, উল্লিখিত সকল প্রকার ওয়াকফ সম্পত্তি মুতাওয়াল্লীর হাতে তুলে দেওয়ার দ্বারা ওয়াকফ সাব্যস্ত হয়ে যাবে। পরে আর কখনো তা ফেরত নিতে পারবে না।

এর কারণ পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আল্লাহর মালিকানাধীন সম্পদে বান্দার যে ভোগাধিকার সাব্যস্ত হয়েছিল, ওয়াকফের মাধ্যমে সে তা রহিত করে দিয়েছে। ফলে তা প্রকৃত অবস্থায় ফিরে গিয়েছে অর্থাৎ আল্লাহর মালিকানায় চলে গেছে, তাই আর তা বান্দার মালিকানায় ফিরে আসবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

উপরে বর্ণিত ওয়াক্‌ফসমূহের মাঝে বিধানগত একটু পার্থক্য রয়েছে এই যে, ওয়াকফকৃত ভূমির ফসল বা আয় কেবল গরিবরা ভোগ করতে পারবে। ধনীরা তা ভোগ করতে পারবে না। পক্ষান্তরে ওয়াকফকৃত সরাইখানা, বাড়ি, পানকেন্দ্র ইত্যাদি ধনী-গরিব সবাই ভোগ করতে পারবে।

গ্রন্থকার এ পার্থক্যের পিছনে দুটি কারণ বর্ণনা করেছেন।

১. ভূমির আয় ওয়াক্‌ফ করার সময় লোকজন এ উদ্দেশ্যেই করে থাকে যে, এটা গরিবরা ভোগ করবে। ধনীদের উদ্দেশ্যে করে না। পক্ষান্তরে সরাইখানা, কবরস্থান, পানকেন্দ্র, বাড়ি ইত্যাদি ধনী-গরিব সকলের উদ্দেশ্যে ওয়াক্‌ফ করা হয়। তাই তা সকলে ভোগ করতে পারবে।

২. সরাইখানা, বাড়ি, পানকেন্দ্র ইত্যাদি ব্যবহারের প্রতি ধনী-গরিব সবাই মুখাপেক্ষী হয়। পক্ষান্তরে ওয়াকফকৃত ভূমি থেকে লব্ধ আয় ভোগ করার প্রতি শুধু গরিব মানুষই মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। ধনীরা নিজের সচ্ছলতার কারণে এ ধরনের অর্থের প্রতি মুখাপেক্ষী থাকে না। (وَاللّٰهُ اَعْلَمُ)

কিছু জরুরি মাসআলা :

১. মসজিদের জায়গার কোনো গাছ লাগানো হলে তা মসজিদের সম্পদ বলে গণ্য হবে।

২. কেউ যদি এ উদ্দেশ্যে একটি গাছ ওয়াক্‌ফ করে যে, লোকেরা গাছের পাতা, ফল ও কাণ্ড দ্বারা উপকৃত হবে, তাহলে তা জায়েজ হবে। অতঃপর যদি গাছটির পাতা বা ফল দ্বারা উপকৃত হওয়া সম্ভব হয়, তাহলে গাছটি কাটা যাবে না। অন্যথায় গাছটি কেটে সদকা করে দেওয়া হবে। -[আল মুযমারাত]

৩. যদি কোনো মসজিদে আপেল গাছ থাকে, তাহলে সদরুশ শহীদ (র.) বলেছেন, এ গাছের ফল দ্বারা রোজাদারদের ইফতার করা জায়েজ হবে না।

৪. এক ব্যক্তি মসজিদের ইমারত বানানোর জন্যে লোকদের থেকে অর্থ সংগ্রহ করল, অতঃপর তা থেকে কিছু অর্থ নিজের প্রয়োজনে খরচ করে ফেলল, এরপর তার সাথে তার বিনিময় মিলিয়ে নিল এমনটি করা তার জন্য জায়েজ নয়। সে এর জামিন হবে। তদুপরি এর পরিণতি এড়ানোর জন্য শাসকের অনুমতি নিয়ে নিবে। যদি তা সম্ভব না হয়, তাহলে সে পরিমাণ সম্পদ মসজিদে খরচ করে দিবে। আর যদি ঐ মালের প্রকৃত মালিকের সাথে সাক্ষাৎ হয়ে যায়, তাহলে তার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে নেওয়াই মুক্তির পথ।

৫. যদি কোনো আলেম ফকির-মিসকিনদের সুয়াল করে এবং লোকজন যাদের সব এক সাথে মিলে যায়, তাহলে ঐ আলেম সকলের জামিন হবে। এমনকি যদি দাতাগণ জাকাতের নিয়ত করে থাকে, তাহলে জাকাত আদায় হবে না। এর থেকে বাঁচার জন্য ফকির-মিসকিনদের কর্তব্য হলো, তারা তাকে উসুল করার অনুমতি দিয়ে দিবে, যেন সে তাদের মাল মিলিয়ে রাখতে পারে। -[আল মুহীত]

৬. যদি কোনো ব্যক্তি নেক কাজ করার উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং সে দরিদ্র লোকদের অনুমতি ব্যতীত তাদের জন্য সুওয়াল করে কিছু অর্থ সংগ্রহ করে, তাহলে সে এক্ষেত্রে আমীন হবে। অর্থাৎ সংগ্রহকৃত মাল তার কাছে আমানত হিসাবে থাকবে।

অতঃপর যদি একজনের প্রদত্ত মাল অন্যজনের মালের সাথে মিলিয়ে ফেলে তাহলে দরিদ্রদেরকে সে নিজের মাল দিয়ে দিবে এবং লোকদের মালের জামিন হবে। এমতাবস্থায় লোকদের জাকাত আদায় হয়ে যাবে। এজন্য উচিত হলো দরিদ্র লোকেরা তাকে উসুল করার জন্য ওয়াকীল বানিয়ে দিবে যে সে তাদের মাল মিলিয়ে রাখতে পারে। -[আল মুযমারাত]

৭. যদি কেউ নিজের সম্পদ কল্যাণের কাজে ব্যয় করতে চায়, তাহলে তার কর্তব্য হবে, তা ইলমে ফিকহ শিক্ষার্থীদের জন্য ব্যয় করা। কেননা নফল ইবাদতে মশগুল হওয়া অপেক্ষা ইলম শিক্ষায় মগ্ন থাকা উত্তম। ইলমে তাফসীর ও ইলমে হাদীস শিক্ষার্থীরাও এ হুকুমের আওতাভুক্ত। কারণ এসবের উপকারিতা দীর্ঘ দিন স্থায়ী হয়ে থাকে। -[মুযমারাত]

৮. কেউ যদি মসজিদে কূপ খনন করে দেয় এবং এর দ্বারা লোকদের ফায়দা হয়, কোনো ক্ষতি না হয়, তাহলে তা জায়েজ হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَمَنْ وَطِئَ اَجْنَبِيَّةً فِيْمَا دُوْنَ الْفَرْجِ يُعَزَّرُ لِاَنَّهُ مُنْكَرٌ لَيْسَ فِيْهِ شَيْءٌ مُقَدَّرٌ وَمَنْ اَتَى امْرَاَةً فِي الْمَوْضِعِ الْمَكْرُوْهِ اَوْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ وَيُعَزَّرُ، وَقَالَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ : وَيُوْدَعُ فِي السِّجْنِ، وَقَالَا : هُوَ كَالزِّنَاء فَيُحَدُّ وَهُوَ اَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ، وَقَالَ فِيْ قَوْلٍ يُقْتَلَانِ بِكُلِّ حَالٍ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ "﴿اُقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُوْلَ﴾" وَيُرْوٰى "﴿فَارْجُمُوا الْاَعْلٰى وَالْاَسْفَلَ﴾" وَلَهُمَا اَنَّهُ فِيْ مَعْنَى الزِّنَاء لِاَنَّهُ قَضَاءُ الشَّهْوَةِ فِيْ مَحَلٍّ مُشْتَهًى عَلٰى سَبِيْلِ الْكَمَالِ عَلٰى وَجْهٍ تَمَحَّضَ حَرَامًا لِقَصْدِ سَفْحِ الْمَاءِ . وَلَهُ اَنَّهُ لَيْسَ بِزِنَاءٍ لِاِخْتِلَافِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ فِيْ مُوْجِبِهِ مِنَ الْاِحْرَاقِ بِالنَّارِ وَهَدْمِ الْجِدَارِ وَالتَّنْكِيْسِ مِنْ مَكَانٍ مُرْتَفِعٍ بِاتِّبَاعِ الْاَحْجَارِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ، وَلَا هُوَ فِيْ مَعْنَى الزِّنَاء لِاَنَّهُ لَيْسَ فِيْهِ اِضَاعَةُ الْوَلَدِ وَاشْتِبَاهُ الْاَنْسَابِ، وَكَذَا هُوَ اَنْدَرُ وُقُوْعًا لِاِنْعِدَامِ الدَّاعِيْ مِنْ اَحَدِ الْجَانِبَيْنِ وَالدَّاعِيْ اِلَى الزِّنَاء مِنَ الْجَانِبَيْنِ . وَمَا رَوَاهُ مَحْمُوْلٌ عَلَى السِّيَاسَةِ اَوْ عَلَى الْمُسْتَحِلِّ اِلَّا اَنَّهُ يُعَزَّرُ عِنْدَهُ لِمَا بَيَّنَّاهُ ـ

অনুবাদ : কেউ যদি অন্য রমণীর সঙ্গে জরায়ুর বাইরে সঙ্গম করে, তাহলে শাস্তির বিধান করা হবে। কেননা এটি এমন অপরাধ, যার জন্য নির্ধারিত কোনো হদ্দ নেই।

কেউ যদি অন্য রমণীর গুহ্যদ্বারে সঙ্গম করে কিংবা কোনো পুরুষের সাথে সমকামিতা করে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তার উপর কোনো হদ্দ নেই। তবে তাকে শাস্তি প্রদান করা হবে। আর [শাস্তির স্বরূপ সম্পর্কে] ইমাম মুহাম্মদ (র.) জামে সগীর কিতাবে বলেছেন, তাকে কারাদণ্ড প্রদান করা হবে।

পক্ষান্তরে সাহেবাইনের মতে এটা জেনার পর্যায়ভুক্ত। সুতরাং তার উপর হদ্দ জারি করা হবে। এটা ইমাম শাফেয়ী (র.) থেকে প্রাপ্ত দু'টি মতের একটি। তার অন্য মত এই যে, উভয়কে সর্বাবস্থায় হত্যা করা হবে। কেননা নবী করীম ﷺ বলেছেন, اُقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُوْلَ [ভোগী ও ভোগা উভয়কে হত্যা করো] অন্য বর্ণনায় রয়েছে فَارْجُمُوا الْاَعْلٰى وَالْاَسْفَلَ [উপরের ও নিচের দুটোকেই রজম কর]।

সাহেবাইনের দলিল এই যে, এটা জেনার মর্মের অন্তর্ভুক্ত। কেননা এখানে সম্পূর্ণ হারামরূপে শুধু বীর্য স্খলনের উদ্দেশ্যে পূর্ণ যৌনানন্দ লাভের স্থানে যৌনানন্দ পূর্ণ করা হয়েছে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল এই যে, এটা জেনা নয়। কেননা এর নির্ধারিত শাস্তি সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরামের মতভিন্নতা রয়েছে। যেমন আগুনে পুড়িয়ে মারা, দেয়াল ধ্বসিয়ে হত্যা করা, উঁচুস্থান থেকে ফেলে দেওয়া এবং সেই সাথে পিছনে পাথর গড়িয়ে দেওয়া ইত্যাদি। আবার জেনার মর্মের অন্তর্ভুক্তও নয়। কেননা এতে সন্তানকে নষ্টের মুখে ফেলে দেওয়ার এবং বংশ পরিচয় সন্দেহযুক্ত করার বিষয়টি নেই। তদ্রূপ এমন ঘটনাও বিরল। কেননা এখানে দুই তরফের এক তরফে চাহিদা নেই। পক্ষান্তরে জেনার চাহিদা উভয় তরফে বিদ্যমান।

https://e-ilm.weebly.com/

وَمَنْ وَطِئَ بَهِيْمَةً لا حدَّ عَلَيْه لِاَنَّهُ لَيْسَ فِيْ مَعْنَى الزِّنَاءِ فِيْ كَوْنِهٖ جِنَايَةً وَفِيْ وُجُوْدِ الدَّاعِيْ لِاَنَّ الطَّبْعَ السَّلِيْمَ يَنْفِرُ عَنْهُ وَالْحَامِلُ عَلَيْهِ نِهَايَةُ السَّفَهِ اَوْ فَرْطُ الشَّبَقِ وَلِهٰذَا لَا يَجِبُ سَتْرُهٗ اِلَّا اَنَّهٗ يُعَزَّرُ لِمَا بَيَّنَّاهُ، وَالَّذِي يُرْوٰى اَنَّهٗ تُذْبَحُ الْبَهِيْمَةُ وَتُحْرَقُ فَذٰلِكَ لِقَطْعِ التَّحَدُّثِ بِهٖ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ وَمَنْ زَنٰى فِيْ دَارِ الْحَرْبِ اَوْ فِيْ دَارِ الْبَغْيِ ثُمَّ خَرَجَ اِلَيْنَا لَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ. وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللّٰهُ يُحَدُّ لِاَنَّهٗ اِلْتَزَمَ بِاِسْلَامِهٖ اَحْكَامَهٗ اَيْنَمَا كَانَ مَقَامُهٗ . وَلَنَا قَوْلُهٗ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ "﴿لَا تُقَامُ الْحُدُوْدُ فِيْ دَارِ الْحَرْبِ﴾" وَلِاَنَّ الْمَقْصُوْدَ هُوَ الِانْزِجَارُ وَ وِلَايَةُ الْاِمَامِ مُنْقَطِعَةٌ فِيْهِمَا فَيُعَرَّى الْوُجُوْبُ عَنِ الْفَائِدَةِ، وَلَا يُقَامُ بَعْدَ مَا خَرَجَ لِاَنَّهَا لَمْ تَنْعَقِدْ مُوجِبَةً فَلَا تَنْقَلِبُ مُوْجِبَةً .

অনুবাদ : কেউ যদি পশুর সাথে সঙ্গম করে তাহলে তার উপর হদ্দ ওয়াজিব হবে না। কেননা অপরাধের ক্ষেত্রে এবং আগ্রহের বিদ্যমানতার ক্ষেত্রে এতে জেনার মর্মার্থ নেই। কেননা সুস্থ রুচি তা ঘৃণা করে। আর চূড়ান্ত নির্বুদ্ধিতা এবং প্রবল কামেচ্ছা একাজে প্ররোচিত করে। এ কারণেই পশুর লজ্জাস্থান ঢেকে রাখা ওয়াজিব নয়। তবে আমাদের পূর্ব বর্ণিত কারণে তাকে শাস্তি প্রদান করা হবে। আর উক্ত পশুটিকে জবাই করে জ্বালিয়ে ফেলার যে সিদ্ধান্ত বর্ণিত হয়েছে তার উদ্দেশ্য হচ্ছে এ প্রসঙ্গের আলোচনার গোড়া কেটে দেওয়া, কিন্তু তা ওয়াজিব নয়।

কেউ যদি দারুল হরবে কিংবা বিদ্রোহীদের অধিকৃত অঞ্চলে জেনার অপরাধ করে অতঃপর আমাদের দারুল ইসলামে চলে আসে, তাহলে তার উপর হদ্দ কায়েম করা হবে না। আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে হদ্দ কায়েম করা হবে।

কেননা তার অবস্থান যেখানেই হোক, ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে সে ইসলামের বিধানসমূহ পালনে দায়বদ্ধ হয়েছে। আমাদের দলিল হলো নবী করীম ﷺ-এর বাণী – لَا تُقَامُ الْحُدُوْدُ فِيْ دَارِ الْحَرْبِ। –[দারুল হরবে হদ্দ কায়েম করা হবে না]

তাছাড়া হদ্দ কায়েমের উদ্দেশ্য যেহেতু বিরত রাখা, আর উক্ত দুই স্থানে [মুসলিম] শাসকের কর্তৃত্ব ও অভিভাবকত্ব নেই, সেহেতু সে ক্ষেত্রে হদ্দ ওয়াজিব করা বেকায়দা হবে। দারুল ইসলামে চলে আসার পর ও হদ্দ কায়েম করা হবে না। কেননা জেনার অপরাধটি হদ্দ ওয়াজিবকারী হয়নি। সুতরাং পরবর্তীতে হদ্দ ওয়াজিবকারী রূপে প্রত্যাবর্তিত হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পশুর সাথে সংগম অত্যন্ত ঘৃণিত ও অরুচিকর কাজ। এমন অপরাধীর হদ্দ যদিও নির্ধারিত নেই। তথাপি তাকে তার অপরাধের যথোপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে। আর কোনো কোনো বর্ণনা অনুযায়ী উক্ত পশুটিকে জবাই করে জ্বালিয়ে দিতে হবে। তবে তা ওয়াজিব নয়। অপরাধীর শাস্তি কি হবে তা শাসক কিংবা তার প্রতিনিধি নির্ধারণ করবেন। তিনি ভালো মনে করলে তাকে হত্যা করতে পারেন।

এ প্রসঙ্গে এক হাদীসে সুস্পষ্ট বর্ণিত রয়েছে যে, যে কেউ পশুর সাথে এমন ঘৃণ্য কাজ করে সে অভিশপ্ত। তাকে তোমরা হত্যা করে ফেল এবং ঐ পশুটিকেও হত্যা করে ফেল।। যেন কেউ বলতে না পারে যে, এটি ঐ পশু যার সাথে এমন কিছু করা হয়েছিল। –এ হাদীস ইমাম আহমদ (র.), ইমাম আবূ দাউদ (র.), ইমাম নাসায়ী, এবং হাকিম বর্ণনা করেন।

https://e-ilm.weebly.com/